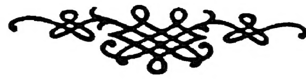
গল্পসমগ্র



শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়



মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

আমার প্রিয় গল্পলেখক
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
সন্তোষকুমাব ঘোষ
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
ও
বিমল কর
এঁদের স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের কথা

নয় বছর আগে বেরিয়েছে আমার 'কবিতা সমগ্র'। তারপর পাঁচ বছর আগে বেরোল 'উপন্যাস সমগ্র'। এবার আমার শতাধিক গল্প নিয়ে 'গল্প সমগ্র' প্রকাশিত হল। সব মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, এক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট কাজ করা গেছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, লেখালেখির ব্যাপারে এইখানেই ইতি টানছি। তা সম্ভবও নয়। এ এমন একটা অভ্যেস বা নেশা যে, যতদিন হাত-পা চলছে ততদিন এই কাজে জড়িয়ে থাকতেই হবে। অনেকেই কিছু না জেনে, না বুঝে, চমৎকারভাবে জীবনযাপন করে যায়, তারা কত সুখী। আমি আজীবন লিপিবদ্ধ করার কাজে লেগে রইলাম। নিজেকেই প্রশ্ন করি, কেন? এতে কার কী উপকার হল? নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখলে সবটাই নিষ্ফল। হাজার হাজার বইয়ের মধ্যে আমার তিনখানা 'সমগ্র' তিন বিন্দু জল। তার বেশি কিছু নয়। তবু ভাবি, থাক না ওই তিন বিন্দুই একটু আলাদা রকমের তরলতা। আমাদের জীবনকাল—এই যে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ—একে আমি এক দীর্ঘ মলমাস বলে মনে করি। একুশ শতকে অনেক কিছুই বদলে যাবে, যেতে শুরু করেছে। এই দীর্ঘ মলমাস আমি কীভাবে কাটালাম, কীভাবে দেখলাম আর পেলাম জীবনকে, তার একটা দলিল থেকে যাক। সমবয়স্ক সহযাত্রী বন্ধুবান্ধব একের পর এক যাকে বলে প্রয়াত, তাই হয়ে যাচ্ছে। কোনদিন আমার শরীরও হঠাৎ নিবে যাবে। তার আগে কাজগুলো একটু গুছিয়ে রেখে যাই। নতুন কাজ কিছু থাকলে, তা পরবর্তী সংস্করণে ঢুকে যাবে, তাতে তো কোনও বাধা নেই। আমার ওপর জনপ্রিয়তার চাপ কম। বছরে সামান্য কয়েকটি লেখা তৈরি করে উঠতে পারি। যদিও, বাইরে থেকে দেখলে, সারাক্ষণ এই নিয়েই লেগে আছি।

বড় মাপের হলে উপন্যাস, মাঝারি মাপের হলে বড় গল্প আর ছোট মাপের হলে ছোট গল্প—আসলে সবই এক বস্তু, অর্থাৎ কাহিনী বলে যাওয়া, বৃত্তান্ত বর্ণনা করে পাঠকের কৌতূহল মেটানো, এই মতে আমি বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি, উপন্যাস আর ছোট গল্প—দুটো আলাদা জাতের সাহিত্যকর্ম। বড় গল্প বলে কিছু হয় না। আর, শুধু কৌতূহল মিটিয়েই বা পাঠকের অবসর সময় কাটাতে সাহায্য করেই যদি দায় চুকে যেত, তা হলে তো খবরের কাগজই সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম। খবরের কাগজ পড়ার পরেও যে সাহিত্য পড়ে, সে নিশ্চয় সাহিত্য থেকে এমন কিছু পেতে চায়, যা খবরের কাগজে থাকে না। অর্থাৎ, খবর ছাড়া অন্য কিছু, আরও কিছু।

সেই 'কিছু'টা বোধহয় রস। বোধহয় ঘটনার মধ্যেকার সত্য। এবং অবশ্যই ভাষা দিয়ে রচিত শিল্পবস্তুর আস্বাদ। ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরে এই সব মহামূল্য বস্তু আঁটিয়ে দেওয়া বেশ শক্ত কাজ। প্রত্যেক লেখক নিজের নিজের বিশ্বাস, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, কল্পনাশক্তি, পর্যবেক্ষণক্ষমতা এবং ভাষার ওপর দখল অনুযায়ী এই শক্ত কাজটি সম্পন্ন করতে চান। তার ফলে কিছু কিছু লেখা উতরে যায়, সব লেখা উতরোয় না। যে ব্যক্তি কবিতাও লেখে, তার সম্পর্কে একটা ধারণা থাকে দেখছি যে, ও তো কবি—মানে আত্মমগ্ন, বাস্তবের অনেক ওপর স্তরে কল্পনার জগতে সতত সাঁতার কাটছে, জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে ও আবার কি গল্প লিখবে? বড় করে দেখার নামে তাকে ছোট করে দেখাই রেওয়াজ। কিন্তু লোকে ভুলে যায়, কবিও একজন সাধারণ মানুষ, ইচ্ছে করলে সে তার ভাবুকসত্তাকে সংযত করে পর্যবেক্ষক সত্তাকে জাগাতে সক্ষম। আর, মন খুলে দিলে পর জাগতিক সব কর্মকাণ্ডই তার চোখের

সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মূলত, এই দুই সত্তা পরস্পরের পরিপূরক। একই প্রেরণা থেকে গল্প এবং কবিতা দুইই রচিত হওয়া কোনও অসম্ভব ঘটনা নয়, কেবল প্রক্রিয়াটা আলাদা।

গল্প আমি কবিতার পাশাপাশি আগেও অনেক লিখেছি। কিন্তু চল্লিশ বছর বয়েস হওয়ার আগের সব লেখাকে নির্মমভাবে বর্জন করেছি এই ভেবে যে, বয়স পরিণত না হলে নিরীক্ষণশক্তি স্বচ্ছ হয় না। এই সংগ্রহে সুতরাং আমার প্রায় সব গল্পই চল্লিশোর্ধ্বকালের রচনা। মোটামুটিভাবে ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত এদের রচনাকাল। সর্বসাকুল্যে তিরিশ বছর।

গল্পগুলি রচনাকাল অনুসারে সাজানো হয়নি। তবে সব গল্পের শেষে রচনাসালের উল্লেখ আছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, তারই বা কী দরকার, মাত্রই তো তিরিশ বছর। পরে বিবেচনা করে দেখলাম, সালটা থাকলে কোনও কোনও লেখার পশ্চাৎপট বোঝা সহজ হয়। যেমন 'বাচ্চা হনুমানের সুবর্ণজয়ন্তী' যখন লিখেছি, তখন কলকাতার টেলিফোন ব্যবস্থা ছিল এক বিরক্তিকর বিড়ম্বনা। এখন আর সেটা নেই। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপতি এবং শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে যে কূট রাজনৈতিক জুয়াখেলা অনেক বছর ধরে চলে আসছে, তার একটি প্রতিচিত্র আছে 'ও ক্যালকাটা' গল্পে। রচনাকাল এখানেও জরুরি ছিল কেন না, বলা তো যায় না, অদূর ভবিষ্যতে মুক্ত অর্থনীতির কল্যাণে প্রগতিশীল শ্রমিক সংঘগুলির ওপর থেকে রাজনীতির অশুভ প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। 'শহিদ' গল্পটিও একটি বিশেষ ঘটনা মনে রেখে লেখা, যখন দুষ্টচক্র দমন করতে গিয়ে কলকাতার একজন সৎ ও সাহসী পুলিশ অফিসারকে নৃশংসভাবে নিহত হতে হয়।

চলমান জীবনকে সম্পূর্ণভাবে দেখানো যায় না, ছোটগল্পের এই হল এক প্রধান সমস্যা। আবার প্রধান মজাও। এক লহমা দৃষ্টিপাতে ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকে নিগূঢ় সত্যকে আবিষ্কার করা এবং তারপর বিশ্বাসযোগ্যভাবে তাকে উপস্থাপিত করা, প্রথম থেকে শেষ অবধি পাঠককে হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে চলা—এই হল ছোটগল্পের কৌশলের দিক। কোথা থেকে শুরু করতে হবে, কীভাবে শেষ করতে হবে। কী পরম্পরায় টাল খেতে খেতে এগোবে গল্প তার লক্ষ্যের দিকে—এ সবের হিশেব শুধু প্রতিভা দিয়ে করা যায় না। কিছু মুনশিয়ানাও লাগে। নিগূঢ় সত্য কখনও ধুলোর নীচে, কখনও সাজগোজের আড়ালে, আবার কখনও সোনার কৌটোর মধ্যে পোকার মতো চাপা থাকে। তাকে খুঁজে বার করতে গবেষকের অনুসন্ধিৎসা দরকার হয়। লেখককে একথাও মনে রাখতে হয় যে, প্রখর আলোর সামনে পড়ে গেলে পাঠক তা সহ্য করতে পারবে না। চোখ বুজে ফেলবে। তার কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া যাবে না। তাই উপস্থাপনে লেখক সাংকেতিকতার আশ্রয় নেন। আভাসে ইঙ্গিতে কাজ সারেন। মনোযোগী পাঠক তাতেই বুঝে ফেলে ব্যাপারটা। ছবিতে গল্প দেখতে অভ্যস্ত এই প্রজন্মের অধৈর্য পাঠক এত সব সূক্ষ্ম কারুকাজ ধরতে পারে না আজকাল। তাই 'তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর যখন টেলিফোন পাই, 'আপনার কুকুর নিয়ে গল্পটি ভালো লাগল,' তখন দুঃখ হয়। আমি কী করে বোঝাব, ওটা কুকুর নিয়ে গল্প নয়? বা 'সেমিকোলন' পেনশন নিয়ে গল্প নয়, কি, 'বালি' মেয়ে পকেটমার নিয়ে গল্প নয়—সবই সংকটে পড়ে যাওয়া অসহায় মানুষের গল্প। তার প্রতি লেখকের সহানুভূতি আছে।

এর আগে 'শ্রেষ্ঠ গল্প' আর 'নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ' নামে আমার দুটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গল্পসমগ্রের প্রথম সাতাশটি গল্প এই বই দুটি থেকে নেওয়া। 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সমালোচনা প্রসঙ্গে অনেক প্রশংসা করার পর জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, 'এর মধ্যে একটিও প্রেমের গল্প নেই।' আমি প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যাই। পরে নিজের গল্পগুলি আবার পড়ি। পড়ে দেখি, দুটি বাদে আর সবগুলিই প্রেমের গল্প। অর্থাৎ, নরনারীর প্রাকৃতিক সম্পর্কের বহুবিধ বৈচিত্র্য আছে তার মধ্যে। যা নেই, তা হল, তরুণ-তরুণীর প্রথম মেলামেশা নিয়ে রোমাঞ্চ, মিষ্টি মিষ্টি সংলাপ আর নানা প্রতিবন্ধ উত্তীর্ণ হয়ে শেষমেশ তাদের মিলন। বিবাহে যার পরাকাষ্ঠা। এ রকম লেখা তো অনেক হয়েছে। আমি ভাবি, জনপ্রিয়তা কুড়োতে আমাকেও এই স্বপ্নবেচার কাজ করতে হবে? জীবন কি এত সরল আছে আর? লিপিবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত হয়ে, কী বলব ভালবেসে জীবন উৎসর্গ করে দিচ্ছে, এমন চরিত্র তো দেখি

না সচরাচর। শিক্ষিত, আত্মসচেতন নরনারী পদে পদে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তুলবে, এটাই তো স্বাভাবিক। আমাদের মা-ঠাকুমারা যে জীবনযাপন করে গেছেন, তাই কি আদর্শ নারীজীবন ছিল? পরনির্ভর দাম্পত্যে আমরা তাঁদের প্রশ্নাতীত আনুগত্য দেখে ধন্য ধন্য করেছি। কখনও তাঁদের মন বুঝতে চাইনি। বস্তুত পরদা সরিয়ে তাঁদের ভাল করে দেখাই হয়নি। পাছে আব্রু নষ্ট হয়ে যায়।

একজন সমালোচক আমাকে ব্যতিক্রমী লেখক আখ্যা দিয়েছেন। তাতে আমার আপত্তি নেই। জীবনকে আমি ভালবাসি, তার মধ্যে নানা বৈচিত্র্য খুঁজে ফিরি। মানুষ যে কত রকমভাবে বাঁচার পথ খুঁজে নেয়, দুমড়েমুচড়ে গেলেও আনন্দে টিকে থাকতে চায়, টিকে থাকে, দেখে আশ্চর্য লাগে। তাই আমার গল্পে 'মৃত্যু' বিষয় হিশেবে কখনও প্রশ্রয় পায়নি। সংঘবদ্ধ মানুষের চেয়ে ব্যক্তি মানুষকে আমি বড় করে দেখেছি, কেন না তাকেই অসতর্কভাবে, অপ্রস্তুত অবস্থায় শনাক্ত করা যায়। সংঘবদ্ধ হলে বোঝা যায় না প্রত্যেকটি মানুষ একে অপরের চেয়ে পৃথক। প্রত্যেকটি মানুষ এক-একটি দ্বীপ। আমার গল্পের মধ্য দিয়ে আমি কখনও কোনও মতবাদও প্রচার করতে চাইনি।

নিহিত সত্যের উদ্‌ঘাটন আমার গল্পের প্রধান লক্ষ্য হলেও পাঠককে কখনও আমি সাহিত্যপাঠের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চাইনি। সেই অর্থে আমার সব গল্পই মন-রাখা, মন-গড়া সব চরিত্রই কাল্পনিক। একটুখানি বীজ থেকে গল্প বানিয়ে তুলতে আমায় কোনও সমস্যায় পড়তে হয় না। সমস্যা হয় চরিত্রদের নামকরণ নিয়ে। গল্পেরও নামকরণ নিয়ে।

এই নাম-সমস্যা সমাধান করার জন্যে আমি পুরুষ আর মেয়ে নামের দুটি পৃথক তালিকা তৈরি করে রাখি সব সময়। নামগুলি সংগ্রহ করি বিভিন্ন বিজ্ঞাপন থেকে। জন্মদিন আর বিবাহবার্ষিকীর অভিনন্দনে অনেক ডাক-নাম পাওয়া যায়। পঞ্চায়েত, পুরসভার নির্বাচন ঘোষণায়, ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি হুকুমনামায়, শেয়ার হারানোর নোটিশে, পাঠকদের চিঠিপত্রের কলামে পদবিসহ বহু ব্যক্তির নাম প্রকাশিত হয় নিয়মিত। তা থেকে পছন্দসই নামগুলি আমি টুকে রাখি এবং জায়গামতো ব্যবহার করি। পারতপক্ষে কোনও পরিচিত ব্যক্তির নাম আমি গল্পে ব্যবহার করি না। তা সত্ত্বেও একবার এক প্রভাবশালী ব্যক্তির স্ত্রীর ডাকনামের সঙ্গে আমার গল্পের এক চরিত্রনামের মিল হয়ে যাওয়ায় আমায় মুশকিলে পড়তে হয়েছে।

গল্প লেখা শেষ হয়ে গেলে তার নামকরণের প্রশ্ন আসে। সেখানেও চিন্তায় পড়তে হয়। এমন একটা নাম চাই, যা গল্পের পক্ষে প্রাসঙ্গিক হবে আবার গল্পের গোপন কথাটি আগেভাগে ফাঁশ করে দেবে না। একটা সংগতি থাকবে কোথাও। গল্পের নামে বা চরিত্রনামে অভিনবত্ব আনতে কোনও কোনও লেখক চমকপ্রদ শব্দ ও বাক্যাংশ আমদানি করেন দেখছি। কিন্তু আমি মনে করি, এই প্রক্রিয়ায় পাঠককে মূল বিষয় থেকে সরিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়। এই সংকলনে 'উশুল' নামে একটি গল্প আছে। পত্রিকায় প্রকাশের সময় তার অন্য একটা নাম ছিল। আমার শ্রদ্ধেয় একজন লেখক তখন বলেছিলেন, এ তুমি কী করলে? পাঠকের জন্যে কিছু রাখলে না? সেই ঘটনার পর থেকে আমি গল্পের নামকরণ ব্যাপারেও সাবধান হয়ে গেছি।

গল্প লেখা নিয়ে এইরকম খুঁটিনাটি সমস্যা অনেক আছে। প্রত্যেক লেখককে তা ঠেকে ঠেকে শিখতে হয়। আমি ভাবি, সৃজনশীল সাহিত্যরচনার ওপর যদি একটা সাধারণ পাঠক্রম থাকত, তা হলে আমরা অনেক তুচ্ছ ভুল এড়িয়ে যেতে পারতাম। অনেক বেশি সংখ্যায়, নিখুঁত গল্প লেখা হত বাংলায়। সম্প্রতি 'গল্প নিয়ে অল্প কথা' নামে একটি বই লিখে তার মধ্যে আমি সেই সব বিষয়ে আলোচনা করেছি।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচি

কলতলার পাশের ঘর	...	৩
নেশা	...	৮
খেলাঘর	...	১৬
তনুকার আমি	...	২৩
তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক	...	২৬
অমিতাভ, আপনাকে নিয়ে	...	৩৫
মচমচ শব্দ	...	৪০
পানতুয়া	...	৪৮
প্রয়োজন	...	৫১
পাশ ফেরা	...	৫৬
ওরা অপেক্ষা করছে	...	৬৭
জাংক	...	৭৫
গাণ্ডীব	...	৮৩
দুরন্ত দুপুর	...	৯২
ইচ্ছাপুরম	...	৯৭
আতর	...	১০১
মিসেস মার্টিন	...	১২০
অডিকোলনের গন্ধ	...	১২৪
কম্প্রেসর	...	১৩০
প্রধান অতিথির ভাষণ	...	১৩৭
শুধু শহিদদের জন্যে	...	১৪৪
বিপণন	...	১৪৯
অপসংহতি	...	১৫৩
দুই সতিন	...	১৫৭
নন্দনতত্ত্ব	...	১৬১
জৈব	...	১৬৮
ও ক্যালকাটা	...	১৭৫
সেমিকোলন	...	১৯৯
আংটি	...	২০৮
লকার	...	২১৭
শহিদ	...	২২১
ভোজালি ও নয়নতারা	...	২৩০
বেনে বউ	...	২৩৫
কৃষিভূমি	...	২৩৮
ঝিনুক	...	২৪২
মিৎসুপিসির সঙ্গে দেশভ্রমণ	...	২৬১
টান	...	২৯৬

মুড়ি	...	৩০৪
সভাপতি	...	৩০৯
চেনা লোক	...	৩১৫
কদর্য	...	৩২৪
উশুল	...	৩৩০
অন্য রকম	...	৩৩৫
আড়াল	...	৩৫৭
সুভদ্রাহরণ পালা	...	৩৬২
বলিদান	...	৩৬৮
বাড়ির নাম আকুল	...	৩৭৪
মাধুর্য	...	৩৮০
জিভে জল	...	৩৮৬
পম্পার একদিন	...	৩৮৯
ক্রিস্টিনের পাপা	...	৩৯৩
পিংক লিলি	...	৩৯৬
বালি	...	৪০২
মহাপুরুষ	...	৪১০
বাচ্চা হনুমানের সুবর্ণ জয়ন্তী	...	৪১৫
নতুন বাসা	...	৪১৯
অতিরিক্ত	...	৪২৪
পতাকা	...	৪৩৫
দুটি দুটি	...	৪৪০
কাকতালীয়	...	৪৪৪
অবিশ্বাস্য টুয়াটারা	...	৪৪৯
ছুটি	...	৪৫২
ফুল	...	৪৫৮
কালচারের প্রশ্ন	...	৪৬১
একটি স্মরণীয় ঘটনা	...	৪৬৫
চতুর্ভূত	...	৪৬৯
মেরুন রঙের মিনিবাস	...	৪৭১
লৌকিকতার পরিবর্তে	...	৪৭৬
পাতা ও পাখিদের আলোচনা	...	৪৮০
লালচে কালো চা-পাতা	...	৪৮৫
সাপ পোষ মানে না	...	৪৮৮
রত্ন শিকদার	...	৪৯৩
যেমন পাজামা, যেমন ছাতা	...	৪৯৭
আপেলে দ্বিতীয় কামড় বা আপেক্ষিকতা	...	৫০১
ছেলেরা হারাবেই	...	৫০৬
আত্মপক্ষ	...	৫১১
ছুট	...	৫১৯
ছায়ানট	...	৫২০
বি-হাই	...	৫২৮
সেতু	...	৫৩৫
জলভ্রমি	...	৫৩৯

রাতকানা	...	৫৪৩
যেহেতু মানুষ	...	৫৪৮
মাছের ডিম ও মহাপুরুষ	...	৫৬৪
ভালবাসার দাগ	...	৫৭০
মনের কথা	...	৫৭৪
আপনারে পর	...	৫৭৮
মানুষের মাপ	...	৫৮৪
উবে যাওয়া না-যাওয়া	...	৫৯০
জয়যাত্রা	...	৫৯৭
চাহিদা	...	৬০৯
আয়নার সামনে	...	৬১৩
প্রার্থী	...	৬১৭
কিছু হাসি, কাশি আর ঘামের গন্ধ	...	৬২০
জোড়া খাট	...	৬২৩
দুই প্রজন্ম	...	৬২৫
বিজ্ঞাপনের বিরতি	...	৬২৮
ছাগল	...	৬৩৩
কন্যাপক্ষ	...	৬৩৮
যাচাই	...	৬৪১
জরিমানা	...	৬৪৭
সভাঘরে একদিন	...	৬৫৩
চারকোণা	...	৬৫৫
ইচ্ছে	...	৬৫৭
উত্তরণ	...	৬৬২
কারিগর	...	৬৬৫
শিশিরকণা	...	৬৭১
ফাইনাল সিলেকশন	...	৬৭৪
জমিন	...	৬৭৬

গল্পসমগ্র

❀ কলতলার পাশের ঘর

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চোদ্দো দিন বিশ্রাম নেবার পর শিবশংকর চক্রবর্তীর হৃদযন্ত্র তেহাই দেওয়া বন্ধ করল। নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যে শরীর জীবনে কোনওদিন অপর হাতের সযত্ন-স্পর্শ পায়নি, এই ক'দিনের আরামে সে যেন বর্তে গেছে। ওয়ার্ডে ফিরে এসে শিবশংকর তার কৃতজ্ঞতার কথা সবাইকে জানায়।

পাশের খাটে থাকে গুরুপদ নামের একটা জোয়ান ছোকরা। মহিষাদল না পানখই গ্রাম থেকে এসেছে। তার হৃদযন্ত্রে ফুটো। সে যখন হাঁপায়, তখন রবারের পুতুল টিপলে যেমন হয়, তেমনই পিঁ-পিঁ করে শব্দ বেরোয়। গুরুপদ যেখান থেকে এসেছে, সেখানে ওর অসুখের চিকিৎসা হতে পারে এমন কোনও হাসপাতাল নেই। কলকাতার এই হাসপাতালে আগেও তিনবার এসে থেকেছে ও, এবারে একটু বেশিদিন ধরে আছে। ওর হৃদযন্ত্রের ফুটো সেলাই করা হবে। সে নাকি এক মেজর অপারেশন।

"অপারেশন বর্গীর চেয়েও বড়।"

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে গুরুপদ। ওর নীচের ঠোঁট কালো। হাসলে পর চোখে পড়ে, মুখের ভেতরটাও বেশ কালো। কাকের মুখের মতো। হয়তো বহুকাল ধরে বিড়ি খাওয়ার দরুন এমন হয়েছে। এখন তো বিড়ি খাওয়া একদম বারণ।

"আসলে ডাক্তারগুলো আনাড়ি, তারা ভরসা পাচ্ছে না। আর যিনি ধেড়ে, তিনি নিজের ধান্দায় এত ব্যস্ত যে, একটা ডেট দিতে পারছেন না। কেবল দিন পিছোচ্ছেন। এদিকে হাঁপাতে হাঁপাতে আমি কুঁজো হয়ে গেলাম।"

হাসপাতালে থেকে থেকে গুরুপদর মন খিঁচড়ে গেছে।

শিবশংকরকে জিজ্ঞেস করে, "আপনি কার রেফারেন্সে এসেছেন?"

শিবশংকর বলে, "রেফারেন্স তো কারও নিয়ে আসিনি। ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই। তো, রাস্তার লোকেরা ধরাধরি করে নিয়ে এসে ভরতি করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ যদি রেফারেন্স দিয়ে থাকে তো জানি না।"

গুরুপদ বলে, "কৃতজ্ঞ হবার কিছু নেই, দাদা। ওই বাতানুকূল ঘর আপনার জন্যে নয়, মেশিনগুলোর জন্যে তৈরি হয়েছে। ওই ঘরে ধুলো ঢুকলে মেশিনগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠবে, তাই অত পরিচ্ছন্ন। তা ছাড়া"...

আবার একটা ফিচকে হাসি হাসে গুরুপদ। লাল কম্বলটা কোলের ওপর থেকে সরিয়ে বলে, "কিছুদিন ইনটেনসিভে থাকলে মনটা নরম হয়।"

এ কথার নিহিতার্থ প্রথমে বোঝেনি শিবশংকর। বুঝল দিনকয়েক পরে। বুধবার সকালে এগারোটার সময় ওয়ার্ডবয় এসে খবর দিল, বড় ডাক্তার দোতলার চেম্বারে ওকে ডাকছেন। বস্তুত, ওকে নিয়েই গেল লিফটে চড়িয়ে।

"আপনি তো ভাল আছেন।" কাগজপত্র দেখতে দেখতে বললেন ডাক্তার চোক্‌সি।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনাকে ছেড়ে দেব। সাবধানে থাকবেন।"

"আজ্ঞে।"

"ওষুধ লিখে দেব, নিয়ম করে খাবেন। আর ছ'মাস অন্তর একবার করে চেকআপ করিয়ে যাবেন, কেমন?"

"আবার চেকআপ?"

"দেখুন, হার্টের ব্যাপার। এ তো ম্যালেরিয়া বা টাইফয়েড নয় যে, এক কোর্স খেয়ে নিলেন, সেরে গেল। ভাইটাল অর্গান ওটা। বলতে পারেন, শরীরের পাম্পিং স্টেশন। সর্বক্ষণ ব্যস্ত। সেইখানে তাল কেটেছে আপনার।"

"সমে ফিরে এসে তো ঠিক চলছে এখন।"

এবার বিরক্ত হয়ে ডাক্তার চোক্‌সি বললেন, "আবার বিগড়োতে কতক্ষণ! আবহাওয়ায় যা পলিউশন আর জীবনে যা টেনশন এই কলকাতায়।"

শিবশংকর চক্রবর্তী এতক্ষণ পর সাহস করে বলতে পারল,—

"স্যার, আমার জীবনে কোনও টেনশন নেই।"

আর কাগজপত্রের ভেতর দিয়ে নয়, এবার সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার চোক্‌সি। যেন শিবশংকর না, শিবরাম চক্রবর্তীকে দেখছেন সামনে। গোলপানা মুখ, গায়ে সিল্কের জামা। টেনশনহীন জীবন। জেরা করে কিছু কিছু মিলও পেলেন।

হাওড়া থেকে শিয়ালদা অবধি অঞ্চলকে, মহাত্মা গান্ধী রোডকে মাঝখানে রেখে, যদি একটা প্রকাণ্ড পমফ্রেট মাছের কাঁটার মতো ভাবা যায়, তবে মুড়োর দিক থেকে সতেরো নম্বর বাঁয়ে হল হরিহর সাউ লেন। ওই গলি এঁকেবেঁকে নাম বদলে এক জায়গায় বিবেকানন্দ রোডের সঙ্গে মিশেছে। মহাত্মা গান্ধী আর বিবেকানন্দ—এই দুইয়ের মাঝ বরাবর একটা বহুজাতিক বস্তি আছে, সেই বস্তির মেয়েপুরুষ যে-কল থেকে জল নেয়, তার দুটো বাড়ি পরে নীচের তলায় শিবশংকরের আস্তানা। একখানা ঘর। তেত্রিশ বছর। মনে হয় যেন এই তো সেদিন। কলকাতার এই জায়গাটা তেত্রিশ বছরে একটুও বদলায়নি। শিবশংকরের ঘরে ঢোকার মুখে আগে একটা বাঁকাচোরা কুলগাছ ছিল, আয়ু ফুরিয়ে যাওয়ায় সেটা মরে গেছে, এইটুকুই পরিবর্তন। এখন তক্তপোশ থেকে সরাসরি কলতলাটা দেখা যায়।

চণ্ডীদাসের মতো না, শিবরাম চক্রবর্তীর মতো তো একেবারেই না, শিবশংকর নিজের মতো করে ওই কলতলা থেকে প্রেরণা পায়।

দিনের মধ্যে একবার কি দু'বার বাড়ির ভেতর দিকটায় যায় সে, সেখানেও বহু বেওয়ারিশ লোকের বাস। নিজের কাজ সেরে চলে আসে। কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয় না। এইভাবে তেত্রিশ বছর চলেছে।

ওর বউ নেই, ছেলেপুলে নেই, সম্পত্তি নেই, কাজের লোক নেই। কিচেন নেই, টয়লেট নেই, গাড়ি নেই, চাকরি নেই, দেনাদার নেই, উচ্চাশা নেই, পাওনাদার নেই, বন্ধু নেই, শত্রু নেই। সুতরাং ওর জীবনে কোনও টেনশন নেই। বইপাড়ায় ঘুরে ঘুরে প্রুফ পড়ে ও, তাইতেই দিন চলে যায়।

দেশ স্বাধীন হবার সময় ও ছোট ছিল। তবু কলকাতার টানে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে। খবরের কাগজ, তানসেন গুলি, ছারপোকার বিষ, ধূপকাঠি—সবকিছুই বিক্রি করেছে একসময়। জেনেছে, পাঁচ টাকার কাজ করে না দিলে কেউ দু'টাকা মজুরি দেয় না। বাকি তিন টাকা মহাজনের মুনাফা। ক্রমে ও কাজ করার উৎসাহ হারিয়েছে। লোক ঠকিয়েও এক ধরনের রোজগার হয়। কিছুদিন এক জ্যোতিষীর শাগরেদ ছিল। মাদুলি বানাত। কালীঠাকুর পরিষ্কার করত। শ্বেতপাথরের মহাদেব মাজত। সেখানেও ওর মন টিকল না। বড়লোক যজমানদের ব্লাফ দিয়ে টাকা কামাত জ্যোতিষশাস্ত্রী, নিজের দক্ষিণা দেখাত কম, স্বস্ত্যয়নের ফর্দই বড়। একবস্তা লালপাড় শাড়ি, কি গামছা, কি পেতলের কলসি, পিলসুজ, গামলা নিজের কাছ থেকে নিজে ঘুরে ঘুরে কিনত যজমানের টাকায়। মা কালীকে দেওয়া সোনার জিভ আর সোনার নোয়া ভেঙে দ্বিতীয় পক্ষের বউয়ের জন্যে গয়না গড়াত। আর সন্দেহ করত, শিবশংকর প্রণামীর বাকস থেকে টাকা সরায়। নিজের মনে শান্তি ছিল না জ্যোতিষশাস্ত্রীর।

কলকাতা শহরের নিষ্ঠুর চেহারা ও নানাভাবে দেখেছে। এ এমন একটা শহর যাকে কেউ ভালবাসে না। শুধু ভোগের জন্যে আর ভোগের পর ছাই-খোসা ফেলতে ব্যবহার করে। এখানে মানুষ একটু গায়ে আঁচড় লাগলেই খ্যাঁক করে ওঠে। আগে নাকি এমনটা ছিল না। পার্টিশনের পর থেকে ক্রমে জনসংখ্যার

চাপে নাকি শহরটার চরিত্র নষ্ট হয়েছে। যাই হোক, শিবশংকর এই শহরের একজন পুরনো বাসিন্দা।

ওর ঘরভাড়া এগারো টাকা। খাইখরচ বাড়তে বাড়তে মাসে এখন দুশো-আড়াইশো টাকায় দাঁড়িয়েছে। যেহেতু ওর কোনও চাকরি নেই, তাই ওর রাহাখরচ বলতেও তেমন কিছু নেই। পায়ে হাঁটে, পার্কে বিনা পয়সার হাওয়া খায়। শখ হলে ট্রামে চড়ে। এইটুকু টাকা ওকে রোজগার করে নিতে হয়। অসুখবিসুখ ওর করেনি কখনও, তাই ওষুধের খরচ ছিল না, এবার বুঝি সেটা জুটল। জ্ঞানত, শিবশংকর কখনও কারও উপকার করেনি। কোনও আন্দোলনে, মিছিলে সামিল হয়নি ও। ওসব অন্যদের ব্যাপার। এক পয়সা চাঁদা দেয়নি কোনওদিন, একফোঁটা রক্ত দেয়নি ব্লাড ব্যাঙ্কে। দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজোর সময় চাঁদাব জন্যে কত লোকের ওপর জুলুম হয়, শিবশংকরকে ছোঁয় না কেউ। ভিখিরি কোনওদিন ওর দিকে হাত বাড়ায়নি এমন মার্কামারা ওর ব্যক্তিত্ব।

পৃথিবীতে কত কী ঘটছে রোজ, শিবশংকরের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। ও খবরের কাগজ পড়ে না। পড়ে না বললে অবশ্য ভুল বলা হল। ও পুরনো কাগজ কিলোদরে কেনে, সেইগুলো পড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। পড়া হয়ে গেলে আবার কিলোদরে বেচে দেয়।

জীবনে কোনওদিন ও কারও ক্ষতি করেনি। একবার ছাড়া।

সে অনেকদিন আগের কথা।

ওই হরিহর সাউ লেনের একটা মেয়ে কলতলায় চান করতে আসত। বেলায় আসত যখন জায়গাটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। হাতে টিনের বালতি, কোমরে গামছা। ওই সময়টায় সরু হয়ে জল পড়ে, তাই ওকে অনেকক্ষণ ধরে চান করতে হত। মেয়েটা দাঁত দিয়ে খুঁট ধরার ছলে শিবশংকরকে গা দেখাত, গায়ের খাঁজগুলো দেখাত। দু'হাত ওপরে তুলে গামছা দিয়ে চুল ঝাড়ত ফটাস ফটাস শব্দ করে। পা মোছার ছুতোয় উরু অবধি তুলে দিত শাড়ি। আর অন্য দিকে মুখ করে হাসত।

নিশ্চল শিবশংকর পুরনো কাগজ পড়ত সেই সময়। এইভাবে অনেকদিন গেছে।

একদিন মেয়েটাকে ও হাতছানি দিয়ে ডাকে, "এই রুলি, শোন।"

প্রথমটা ইতস্তত করে রুলি। তারপর, হয়তো এতদিনের চোখাচোখি পরিচয়ের, কিংবা ওর মনের মধ্যে তৈরি-করা অন্তরঙ্গতার প্রভাবে, দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, "কী?"

"ভেতরে আয়, তবে বলব।"

ভেতরে এলে পর শিবশংকর দরজাটা ভেজিয়ে দেয়, বন্ধ করে না।

বলে, "ভিজে কাপড়চোপড়গুলো খুলে একটু দাঁড়া, আমি তোর সবটা গা দেখি। কতদিন ধরে একটু একটু দেখাচ্ছিস।"

"যাঃ", বললেও রুলি পালিয়ে যায়নি। দাঁড়িয়েই ছিল। তখন অগত্যা, জেলেরা যেভাবে জাল ছাড়িয়ে মাছ বার করে, তেমনিভাবে ভিজে শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ও রুলির দেহটা বার করে আনে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। ওর মনে হয়, মেয়েমানুষের শরীর কেমন যেন বেঢপ, শ্রীহীন। মুখটা আর পায়ের কাছটা ছাড়া বাকিটা চোখ মেলে দেখা যায় না। এমন কুৎসিত। একটা পোকার মতো।

দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে রুলি মেজেতে বসে পড়েছিল। পা মুড়ে বসে হাঁপাচ্ছিল। শিবশংকরের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না।

একেই বোধহয় লজ্জা বলে। পুরুষের সামনে মেয়েরা একবার, জীবনে প্রথমবার এই রকম লজ্জা পায়, ভেবেছিল শিবশংকর, রুলি আর কোনওদিন লজ্জা পাবে না। এরপর শুধু লিপ্সা নিয়ে ওর জীবন কাটবে, ভেবে কষ্ট একটু হয়েছিল শিবশংকরের। ওর হাতে রুলির ক্ষতি হল। তারপর ভুলে গেছে।

যাবার আগে রুলি জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি আমায় বিয়ে করবেন?"

"করব, করব, নিশ্চয়ই করব", একটা রুপোর টাকা ওর হাতে গুঁজে দিতে দিতে শিবশংকর তখন বলেছিল, "আর একটু বড় হ!"

এই ঘটনার পর বহুবার রুলি কলতলায় এসেছে। চান করেছে, চুল ঝেড়েছে, বালতি ভরতি করে জল নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। তেমন করে আর তাকায়নি। মনে মনে হয়তো বলেছে, মিথ্যুক, কিন্তু মুখ ফুটে বলেনি কিছু। যথেষ্ট বড় হয়ে যাবার অনেক পরে ওর বিয়ে হয়ে গেছে, কিংবা পাড়া ছেড়ে চলে গেছে ওরা। খবর রাখেনি শিবশংকর।

"আমার জীবনে কোনও টেনশন নেই", বলতে গিয়ে স্বভাবত এইসব কথা মনে পড়েনি শিবশংকরের।

ডাক্তার চোক্‌সি টেবিলে দু'বার তেরেকেটেতাক ধেরেকেটেতাক বাজিয়ে বললেন, "পেসমেকার লাগিয়ে নিন, তা হলে নিশ্চিন্ত।"

"পেসমেকার? সেটা কী জিনিস?"

"একটা যন্ত্র। ঘড়ির মতন ছোট্ট একটা যন্ত্র। বুকের চামড়ার নীচে পরে নিতে হয়। হৃদযন্ত্রের সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে ওটাও চলে। হৃদযন্ত্র তালে ভুল করলে যন্ত্রটা ভুল শুধরে দেয়। আজকাল তো অনেকে পেসমেকার পরে হিল্লিদিল্লি-মধুপুর ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"তাই?"

অমর হবার বাসনা শিবশংকরের নেই, তবু মরে যাবার ইচ্ছেও তেমন প্রবল নয় ওর। ওর বউ নেই, ছেলেপুলে নেই, চাকরি নেই, উচ্চাশা নেই, বন্ধু নেই, শত্রু নেই। এই হাসপাতালে দু'সপ্তাহ আছে, কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি।

নাকি এসেছিল? হনুমানপ্রসাদ নামের হিন্দুস্থানি লোকটা এসেছিল। পাড়ায় ঘুরে ঘুরে তরিতরকারি বিক্রি করে ও। বিবেকানন্দ রোডের ওপর এক গাড়িবারান্দার নীচে শোয়। ইনটেনসিভ কেয়ারে থাকার সময় ওকে দেখা করতে দেয়নি হাসপাতালের স্টাফ। নাম লিখে রেখে গেছে। লোকটা মুখচেনা। তবে কি ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ার সময় কাছেপিঠে ছিল হনুমানপ্রসাদ? হাসপাতালে ভরতি করার সময় পাবলিকের সঙ্গে সে-ও এসেছিল নাকি? ওর ঘরের ঠিকানা কি সে-ই দিয়েছে? ডাক্তার চোক্‌সি বললেন, "খরচের কথা ভাবছেন?"

"হ্যাঁ।"

"পনেরো হাজার।"

"অত টাকা আমি কোথায় পাব স্যার? কেউ নেই আমার। কিছু নেই। তবে, যন্ত্রটা লাগিয়ে বছর দশেক যদি বাঁচি, তবে মাসে মাসে কিছু কিছু দিয়ে শোধ করে দেব। আপনার ক্ষতি হোক, আমি চাই না।"

"কেউ নেই আপনার ভাবছেন কেন? আপনার এক শুভার্থী আছে। সে খরচ দিতে রাজি হয়েছে। তার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।"

"কে সে? হনুমানপ্রসাদ? সে অত টাকা দেবে আমার জন্যে? কেন দেবে?"

"তা আমি জানি না", ডাক্তার চোক্‌সি হাসতে হাসতে বললেন, "কত রকম মানুষ পৃথিবীতে থাকে, আপনি জানেন না। ও আবার আসবে, আপনি কথা বলে নিন।"

এর দেড় মাস পরে একদিন শিবশংকর হনুমানপ্রসাদের হাত ধরে ট্যাক্সি থেকে নামল নিজের আস্তানার সামনে। তখন সকাল দশটা-সাড়ে দশটা বাজে। কলতলায় মেয়ে-পুরুষ ছিল যারা, তারা সকৌতুকে লক্ষ করল, অনেকদিন তালাবন্ধ ঘরটা আবার খুলছে। নাম-না-জানা পুরনো বাসিন্দা, গোলগাল চেহারা, গায়ে সিল্কের জামা, ঘরে ঢুকে তক্তপোশটায় বসল গিয়ে। হনুমানপ্রসাদ ঘর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করছে।

কুমারী মেয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়ে দু'মাস পর আবার যখন বাড়ি ফিরে আসে, পাড়ার লোক ঠিক বুঝতে পারে, ও গর্ভপাত করিয়ে এসেছে। কাউকে বলে দিতে হয় না। আজকাল ভ্যাসেকটমি করা পুরুষমানুষকেও তার হাসি দেখলে চিনতে পারা যায়। সুতরাং হরিহর সাউ লেনের লোকেরা, বিশেষ করে আড্ডাবাজ ছোকরার দল, শিবশংকরের পেসমেকারের খবর জেনে যাবে, তাতে আশ্চর্য কী? খুব বড়লোক না হলে ওই গয়না পরতে পারে না কেউ। তার মানে, ওই একঘরের বাসিন্দা, যে কোনওদিন এক পয়সা চাঁদা দেয়নি, ভিক্ষে দেয়নি, ব্লাড ব্যাঙ্কে একফোঁটা রক্ত দান করেনি, তার পেটে পেটে অনেক রেস্ত ছিল। আর, ছিল বলেই, জমানো টাকায় পেসমেকার গড়িয়ে বুকে পরতে পেরেছে। জেল্লা এসেছে চেহারায়। হনুমানপ্রসাদকে চাকর রেখেছে।

বাইরে থেকে ওই রকম দেখায়।

শিবশংকর তক্তপোশে শোয়। হনুমানপ্রসাদ মাদুর পেতে, মেজেয়। কখনও কম্বল বিছিয়ে নেয়। একতলার ঘর, তেমন রোদ্দুর ঢোকে না, ঠান্ডা। শিবশংকরের অস্বস্তি হয়। মনে মনে জানে, আসলে সে নিজেই অধমর্ণ।

হনুমানপ্রসাদকে বলে, "টাকাটা তুই বৃথাই খরচ করলি। কবে মরব ঠিক নেই। এই ঘরখানা পেতে পেতে তুই বুড়ো হয়ে যাবি। তোর বউ গ্রামে থেকে পচবে।"

"ছিঃ বাবু, ও-কথা বলবেন না।"—হনুমান বলে, "আমার কোনও জলদি নেই।"

"অতগুলো টাকা তোর ব্যবসায় খাটালে কত বেশি রোজগার করতিস বল।"

"মাথার ওপর ছাউনি তো মিলেছে বাবু আপনার কিরপায়। কিছুদিন ব্রাহ্মণের সেবা করি।"

যেতে-আসতে পাড়ার লোক দেখে, বস্তির মেয়ে-পুরুষ কলতলায় চান করতে করতে দেখে, ঘরের কোণে স্টোভ জ্বালিয়ে হনুমানপ্রসাদ রান্না করছে। মাথায় ঝুড়ি নিয়ে ও আর তরিতরকারি ফিরি করে না। সিঁড়ির মুখটায় বসে বেচে। ঘবের একপাশে কাঠের শেলফ খাটিয়ে তাতে টুকিটাকি মনিহারি সওদা রেখেছে। শিবশংকর তক্তপোশে বসে পুরনো খবরের কাগজ পড়ে। পারতপক্ষে খাট থেকে আজকাল নামে না। ব্যবহারিকভাবে আগের চেয়ে অনেক সুখে আছে ও, কিন্তু কৃতজ্ঞতার বোঝা নিয়ে বুকের মধ্যে পেসমেকারটা ওর বিমর্ষতার উৎস। আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না শিবশংকরের। ছাপান্ন বছর বয়স হল, এবার গেলেই হয়।

কৃতজ্ঞতা তবু সয়, কিন্তু অনুশোচনা একদম নয়। এতদিন পব রুলির কথা মনে পড়ে শিবশংকরের। জেলেরা যেভাবে জাল ছাড়িয়ে মাছ বার করে, তেমনিভাবে ভিজে শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ও রুলির দেহটা বার করে এনেছিল। খুব কুৎসিত ছিল কি সে-দেহ? না বোধহয়। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেওছে, কিন্তু স্পর্শের কোনও স্মৃতি নেই। মনে পড়ে, আঙুল ঢুকিয়ে নেড়ে নেড়ে কানের জল বার করছিল ও, আর ফলসার মতো ওর বুকের বোঁটা দুটো নড়ছিল থরথর করে। না, রুলিকে শিবশংকর ধর্ষণ করেনি, তার শ্লীলতাহানিও করেনি। শুধু খুলে নিয়েছিল ওর লজ্জা, মেয়েরা যা একবারই খোলে জীবনে। রুলি জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আমায় বিয়ে করবেন?

গভীর অনুশোচনায় শিবশংকরের বুকের মধ্যে কষ্ট হয়। কৃতজ্ঞতা, অনুশোচনা, অপরাধবোধ—এসব কোনওদিন ছিল না ওর, পেসমেকারটা লাগাবার পর থেকে হচ্ছে। দামি জিনিস। মেড ইন ইউ এস এ। স্টেনলেস স্টিলের তৈরি, ছাগলের চামড়া দিয়ে বাঁধানো, খেলো প্লাস্টিক না। ঘড়িটা ইলেকট্রনিক। ওর হৃদয়ের যা ঘাটতি, সব পূরণ করে দিয়েছে ওই মূল্যবান পেসমেকার।

পলিউশন, টেনশন সহ্য করে মানুষ বাঁচে।

কিন্তু বেঁচে থাকার স্পৃহা না-থাকলে মানুষ বাঁচে না। স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীতে যত লোক মরে, তার অধিকাংশ লিপ্সা হারানোর ফলে মরে। ওই অপরাধবোধ, অনুশোচনা, কৃতজ্ঞতা, পুরনো স্মৃতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি, কী হতে পারত, কী হল না জীবনে, এইসব চিন্তাভাবনা—এ হল সেই আলো-দপদপ সিটি-বাজানো পুলিশের গাড়ির মতো, যার একটু পেছনেই মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি যায় নিশ্চুপে!

হরিহর সাউ লেনে সেই মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি পৌঁছে গেল একদিন। তখন ভোর। বুকের অসুখে যা হয়, হনুমানপ্রসাদ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখে, বাবু ছিটকিনি খোলার জন্যে বন্ধ দরজাটা আঁচড়াচ্ছে। আঁচড়াতে আঁচড়াতে পড়ে গেল ঝুপ করে।

কোনও রকমে বাবুকে মেজেতে শুইয়ে ও ছুটল ডাক্তার চোক্‌সির বাড়ি। ধরে আনল তাঁকে। ঘরখানা দেখে তিনি অবাক হলেন কিনা, বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ রইলেন। তারপর ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে লিখতে বললেন, "তুমি দুঃখ কোরো না হনুমান। এই হল জীবন।"

তারপর কোনও ফি না নিয়ে একসময় চলে গেলেন। মেশিনটা কি দু'নম্বরি, ডাক্তারবাবু? এ প্রশ্ন করার আগে চলে গেলেন ডাক্তার চোক্‌সি।

দাঁতন ঘষতে ঘষতে কলতলায় এসে পঞ্চানন রিকশাওয়ালা দেখে, শিবশংকরের ঘরের দরজা ভেজানো, আর চৌকাঠের ওপর বসে হনুমানপ্রসাদ কাঁদছে।

দেখতে দেখতে পাড়ার লোক জড়ো হয়ে গেল। সকলের চোখে জল। লোকটিকে চেনে না ওরা, কিন্তু ছোটবেলা থেকে দেখছে। ওই তক্তপোশে বসে কাগজ পড়ত। আর মাঝে মাঝে কলতলার দিকে তাকিয়ে থাকত। কারুর সঙ্গে কথা বলত না। হায়, হায়, পেসমেকার লাগিয়ে দু'বছরও বাঁচল না।

কাউকে কিছু বলতে হল না, ঠিক সময় পাড়ার নেতৃস্থানীয় ছোকরা চামু তার চার শাগরেদসহ উপস্থিত। মানিকতলা থেকে একখানা খাট, কিছু ফুল, ধূপকাঠি আর অগুরু নিজেরাই কিনে এনেছে। মড়া যদি বেওয়ারিশ হয়, তাই ভেবে। কিন্তু হনুমানপ্রসাদ সব দাম মিটিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, আলাদা

করে একশো টাকা আর ডেথ সার্টিফিকেটখানা চামুর হাতে দিয়ে বলল, "রাখো বাবু, দরকার হবে। আমি আর যেতে পারছি না বাবু, তোমরা দেখো, যেন বাবুর সদ্‌গতি হয়। ভারী পুণ্যাত্মা ছিলেন।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" বলে ওরা শিবশংকরের বডি তুলে নিল কাঁধে। হইহই করতে করতে, হরিবোল দিতে দিতে বিবেকানন্দ রোডের দিকে ছুটল। তখন আপিসযাত্রীরাও বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। রবীন্দ্র সরণি পার হবার আগে চামু হাঁক দেয়, "বডি নামা।"

অনেকখানি পথ। একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। কিন্তু চামুর মাথায় অন্য চিন্তা। যেমন করে হোক, একটা ডাক্তার পাওয়া দরকার। ডেন্টিস্ট হলেও চলবে। এই বডির বুকে ব্র্যান্ড নিউ পেসমেকার। চিতায় তোলার আগে ওটা খালাস করতে হবে না?

কেউ আর রাজি হয় না। শেষে এক ডেন্টিস্টকেই ঝাড় দেবার ভয় দেখাতে সে নিমরাজি হল। ধরাধরি করে সবাই মিলে মড়াকে নিয়ে তুলল তার চেম্বারে। গদিওলা চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিল।

মড়া হলে কী হবে, অপারেশন তো। ছুরি-কাঁচি ভাল করে ফুটিয়ে নিয়ে রেডি হয় ডেন্টিস্ট।

চামু বলে, "পনেরো হাজার টাকার মাল হাপিশ করে গুরু পালাচ্ছিলেন। মেড ইন ইউ এস এ। বুকে থাকলে বোমার মতো ফাটবে।"

ছ'জোড়া চোখের সামনে শিবশংকরের বুকের কাপড় যখন খোলা হল, তখন সবাই দেখে, পুরনো কাটা দাগটার পাশে নতুন একটা কাটা দাগ, নতুন সেলাই। খানিকটা লাল মাংস বেরিয়ে আছে।

শালা হনুমানপ্রসাদ! চামু লাফিয়ে ওঠে রাগে। কিন্তু তখন আর রাগ করে কী লাভ! মিথিলা এক্সপ্রেস ধরে হনুমান তখন মজঃফরপুরের পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। কিছুদিন ঠান্ডা হয়ে খেতিবাড়ির একটা ব্যবস্থা করবে সে। তারপর বালবাচ্চা নিয়ে কলকাতার বাড়িতে এসে উঠবে, এই রকম তার প্ল্যান। আপাতত একখানা ঘর। পরে আস্তে আস্তে আরও একখানা, আরও একখানা, আরও একখানা। তারপর—আর ভাবতে পারে না।

১৯৮৮

নেশা

স্বামীর ছত্রছায়ায় যে-মেয়েরা নিত্যনিয়ত থাকে, বাস করে, সুব্রত লক্ষ করেছে, তারা ক্রমশ বোকা হয়ে যায়। মেয়েরা স্বভাবতই একটু বোকা, এই রকম একটা মত প্রথম যৌবনে ও চালু করেছিল বান্ধবীদের খ্যাপাবার জন্যে, কিন্তু পুরোপুরি সে-মত ও নিজে বিশ্বাস করত না। ওরা তাড়াতাড়ি পরিণত হয়ে ওঠে, পুরুষদের ছাপিয়ে যায়। তারপর একটা বয়েস অবধি ওদের আকর্ষণ শক্তি এত তীব্র থাকে যে, বুদ্ধিসুদ্ধি মাপার প্রশ্ন তোলে না কেউ। হাসলে মধুর, কাঁদলেও মধুর, মিষ্টি করে কথা বললে মন গলে যায়, ঝগড়া করলে সুন্দর দেখায়। সেটা ওদের শিকার ধরার বয়েস।

ল' অফ ডিমিনিশিং ইউটিলিটি কাজ করতে শুরু করে তার পরে। এবং দ্রুত।

এখন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হয়েছে বলে না, আসলে নতুন ফ্ল্যাটবাড়িতে উঠে আসার পর ওর মত বদলেছে। বহুতল বাড়ির কন্দরে কন্দরে এক-একটি পরিবার। ছোট, সুখী-অসুখী দু'রকমই। বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত; এদের অনেক সমস্যা—যেমন জল, বিদ্যুৎ, ভৃত্য, বাজার, এমনকী ছোটখাটো অসুখবিসুখ—এজমালি ধরনের। অনেক কাছ থেকে দেখা যায় এইসব লোকজন। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে বাঙালিদের যৌথ পরিবার ভেঙে ভেঙে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতায়, অন্যান্য শহরে। সুব্রতর মনে হয়, তাদের ক্লান্ত বংশধরেরা আবার অন্য একরকম যৌথ পরিবার গড়বার চেষ্টা করছে এইসব বহুতল ফ্ল্যাটবাড়িতে। মধ্যবয়স্ক পুরুষ, মহিলা, অল্পসংখ্যক তরুণ-তরুণী এবং একগুচ্ছ

ভৃত্যলালিত শিশু—এরা সবাই পোড়খাওয়া মানুষ। এদের মধ্যে যে-মেয়েরা—বা মহিলারা বলাই উচিত—স্বামীর ছত্রছায়ায় থাকে না, অন্যদের তুলনায় তারা বেশি সপ্রতিভ, স্মার্ট, আত্মসচেতন।

পুরনো পাড়ায় গা বাঁচিয়ে এসেছ এতকাল, এবার তুমি ধরা পড়ে যাবে, মিতা বলেছিল।

কারুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না, ধরা পড়ার কী আছে!

গাড়ি থেকে নামার সময় দেখবে, লিফটে ওঠার সময় দেখবে, সিঁড়িতে, গেটের মুখে, কোথাও-না-কোথাও। চোখ দেখে বুঝবে, গন্ধে নাকে কাপড় দেবে ওরা।

শিফটিংয়ের তোড়জোড় চলছিল। দশ বছরের ছেলে বাবলু তার বইপত্র এগিয়ে দিচ্ছিল মাকে। বাকস বোঝাই করছে মিতা। জিনিসপত্র বস্তায় বাঁধছে, যাতে সবকিছু এক ট্রিপেই চলে যায়।

বাবলু তখন বলে কী, বাবা, নতুন বাড়িতে গিয়ে তুমি না ড্রিংক করা ছেড়ে দিয়ো। কী দরকার।

সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশি। সুব্রত বিরক্ত হয়।

চুপ কর। নিজের পয়সায় কিনে খাই। লোকের কী?

যদি নিন্দে হয়।

উড়িয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু একেবারে সাবধান যে হয়নি তা নয়। একশো ফ্ল্যাটের বাড়ি, প্রথম প্রথম অনেকেই আলাপ-পরিচয় করতে এসেছে। সংবাদপত্রে সুব্রতর আর্টিকেল বেরোয় মাঝে মাঝে, সেই সূত্র ধরে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে কেউ কেউ। ও ঘেঁষতে দেয়নি কাউকে। তা ছাড়া, পুরনো পাড়ায় ঘুপচি একতলার বদলে এখানে তিনতলায় দক্ষিণখোলা বারান্দা। বসে বসে লোকজন দেখে সময় কেটে যায়। সুব্রত বাইরে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছে।

সন্ধেবেলা স্নানটান করে, লুঙ্গি পরে, নিজের বারান্দায় বসে নিজের পানীয় নিজে খায়। কোনও ঝামেলা নেই। বন্ধুবান্ধব এলে আড্ডা হয়, না এলে বইটই পড়ে, পত্রপত্রিকা। এ বয়সে আর ছুটোছুটি ভাল লাগে না। এই সময়টা মিতা ঘুরঘুর করে আশেপাশে।

মাস ছয়েকের মধ্যেই অবশ্য সুব্রত দেখেছে, এই ফ্ল্যাটবাড়ির অনেকেই মদ্যপ। চোখের নীচে থলি, ফোলা ফোলা মুখ, ভাসা অস্বচ্ছ দৃষ্টি দেখে বোঝা যায়। আমুদে স্বভাব। মদ্যপ হলেই লম্পট হবে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার টিনের বাটি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে—এই রকম একটা ধারণা ছোটবেলায় দেওয়া হয়েছিল, সুব্রত তা ভুল প্রমাণ করেছে। এরাও করেছে। সচ্ছলতার একটা পর্যায়ে অপচয়স্পৃহা জাগে, সেই স্পৃহা আয়ত্তের মধ্যে রাখলে খুব একটা ক্ষতি হয় না কারও। কতটুকুই বা জীবন। একদিন ধড়ফড় করতে করতে মরে যাবে। ধনী বিধবা বা অকর্মণ্য পুত্র রেখে যাওয়ার কোনও অর্থ হয় না।

ছোট ছেলেপুলে যেখানে যাবে, খেলার সঙ্গী জুটিয়ে নেবে, জানা কথা। বাবলুও নিয়েছে। পুরনো পাড়ায় খেলার জায়গা ছিল পিচের রাস্তা, এখানে নীচের তলার পার্কিং স্পেস। সন্ধের আগে বাবুরা ফেরেন না, সুতরাং সারা বিকেল বাচ্চারা শান-বাঁধানো এক বিরাট মাঠের মতো জায়গায় খেলতে পারে। গাড়িঘোড়ার ভয় নেই, নিরাপদ। বাবলু এমন মজেছে যে, পুরনো পাড়ার প্রাণাধিক বন্ধু জয় বা সম্রাটকে ওর আর মনে পড়ে না।

অবাক করেছে মিতা নিজে। বিয়ের আগে কলেজে পড়াত। বাচ্চা হবার সময় চাকরি ছেড়ে দেয়। তারপর থেকে সংসারের ন্যানজারি নিয়ে বেচারি নাকাল। একতলার ফ্ল্যাটে একা থেকে থেকে প্রায় নিউরোটিক হয়ে গিয়েছিল। এখানে একটু খোলা আকাশ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে যেন। তার চেয়ে বড় কথা, নানান ফ্ল্যাটে ওর এখন অনেক সখী। প্রথমদিকে বলত মিসেস চৌধুরী, মিসেস রায়, মিসেস নাথ, মিস দত্ত। দু'মাসের মধ্যে ওরা হয়ে গেছে শ্রীলতা, শম্পাদি, বেবি, মাসিমা। এরা একে অন্যকে সাহায্য করে কাজেকর্মে। দুপুরের দিকে কোনও এক ফ্ল্যাটে জড়ো হয়ে আড্ডা দেয়। বিশেষ কিছু রান্না হলে একবাটি হয়তো চাখতে পাঠানো হল। অন্য এক সুস্বাদু ব্যঞ্জনে পূর্ণ হয়ে বাটিটা ফেরে পরের দিন। নিঃসন্তান মাসিমা অনেক ওষুধবিষুধের খবর রাখেন, টোটকা, হোমিওপ্যাথিক। ছেলেমানুষ তোমরা, লেখাপড়া শিখেছ, ঘরকন্নায় মন নেই, মাসিমা বলেন। এরা তাঁর বিচারবুদ্ধির সুযোগ নিতে পারে। পুরনো আমলের মানুষ।

সন্ধেবেলা থেকে পরের দিন আপিস যাওয়া পর্যন্ত এদের টিকি দেখা যাবে না। মিতার কাছে খবর পায় সুব্রত, উপচে-পড়া কিছু গল্পের ভগ্নাংশ, ঘটে-যাওয়া কোনও ঘটনার সারাংশ বা। রবিবারে এদের

হাবভাব দেখলে মনে হয়, এরা পুরুষ প্রতিবেশীদের মতো—পরস্পরের সঙ্গে অল্পই পরিচিত। দেখা হলে চোখাচোখি, মৃদু হাস্যবিনিময়। যে-যার নিজের পরিবারে সাঁটা।

সেদিন সকাল থেকে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল সুব্রতর। ক্লান্তি। আগের দিন একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। তা ছাড়া মোটা টাকার একটা প্রবন্ধের ফরমাশ আছে। আপিস গেল না।

স্নান করে বেলায় টাইপরাইটার নিয়ে বসেছে। বাবলু স্কুলে। মিতা উসখুস করছে, ফটফট করে ঝাড়ন পেটাচ্ছে ফার্নিচারে, মুখে অনর্গল মৃদু নালিশ। রান্নাঘরে ফুটছে ভেটকি মাছের ঝোল। এর মধ্যেই খট শব্দে এগিয়ে চলেছে সুব্রতর চিন্তা কাগজের ওপর। অভ্যেস।

ডিং ডং বেল পড়ল দরজায়।

মিতা, মিতাদি, শিগগির এসো, দেখে যাও। এ সুযোগ আর পাবে না। ঢাকা থেকে স্মাগলড। কী পাড়, কী খোল! কালোর ওপর লাল বুটি, দুটো মাত্র আছে, একটা তুমি নিতে পারো।

বাইরের ঘরে প্রগলভ দু'জন মহিলার কণ্ঠস্বর। মিতার আকস্মিক অস্বস্তি।

অনুমান করতে পারছে সুব্রত। নিশ্চিত আগে থেকে প্ল্যান করা ছিল, আজ আপিসটা কামাই করার ফলে ভেস্তে গেছে। হঠাৎ ভাবে সুব্রত, আচ্ছা, কোন জীবনটা মিতার আসল? প্রতিবেশীদের সঙ্গে যে-জীবন, সেটা, না ওর সঙ্গে যে অংশটুকু, সেটা? অন্যটা কি অভিনয়? এত টান যাদের সঙ্গে, কারা তারা? লিফটে যেতে-আসতে এদের দেখেছে কি?

খালি-গায়ের ওপর আধময়লা জামাটা চড়িয়ে নেয়। টাইপরাইটার থামিয়ে উঠে পড়ে সুব্রত। সিগারেট টানতে টানতে বেরিয়ে আসে।

মুখচেনা দু'জন মহিলা মিতার সমবয়সি হবে, বিবাহিত। মুখে প্রসাধন নেই। সাধাসিধে শাড়ি পরনে, কোমরে আঁচল গোঁজা। একজনের চোখে চশমা। সোফায় বসে ওরা ভাঁজ খুলে খুলে নতুন শাড়ি দেখছে প্রচণ্ড উৎসাহে। মিতাও।

এত শাড়ি কে দিল? সুব্রত প্রশ্ন করে।

আগন্তুক দু'জন চমকে তাকায়। এক মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত।

চশমা-পরা মেয়েটি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, তোমার কর্তা বুঝি আপিস যাননি? বলবে তো!

অপরজন অপেক্ষাকৃত কালো। অপেক্ষাকৃত রোগা। লম্বাটে মুখ, চোখদুটি বড় বড়। ছোট কপালে ছোট খয়েরি রঙের টিপ। সে-ই কথা বলল, একটা শাড়ি কিনে দিন না বউকে। দোকানে এ-শাড়ি পাবেন না।

আমার টাকা কোথায়। সুব্রত হাসতে হাসতে বলে।

চশমার পেছন থেকে ফরসা মেয়েটির চোখ কৌতুকে ঝলকে ওঠে, ইস, আপনার টাকা নেই একটা শাড়ি কেনার, তাও শুনতে হবে? বিশ্বাস করতে হবে।

আসল টাঙ্গাইল, মিতা গম্ভীর স্বরে বলল, তুমি না দাও, আমি নিজের টাকায় কিনব।

কালো মেয়েটি ছ'তলা বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটের মিসেস নাথ। অন্যজন মিসেস চৌধুরী, দশতলা আটত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট। মিতা পরিচয় করিয়ে দিল।

শাড়িগুলো বগলদাবা করে উঠে দাঁড়ায় দু'জন।

মিসেস নাথ বলে, আমরা মাসিমার ফ্ল্যাটে; আসবে তো এসো। ভদ্রলোক বেশিক্ষণ থাকবেন না কিন্তু।

ওরা চলে যাচ্ছিল, খপ করে ধরে ফেলল মিতা। কোলে নিয়ে যে-শাড়িটাকে আদর করছিল একটু আগে, সেটা কেড়ে নিল টান দিয়ে। বেরুবার মুখে তিনজন মহিলার ঈষৎ অস্বাভাবিক চঞ্চলতা সিগারেট খেতে খেতে উপভোগ করছিল সুব্রত।

মিতা ফিরে আসে। ওরা লিফটের দিকে এগিয়ে যায়। সবাই এখন মাসিমার ফ্ল্যাটে জমায়েত হবে।

মিতা চেঁচিয়ে ওঠে, এই পাখি, বোলো, আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।

শাড়িটা হাতে নিয়ে সটান সুব্রতর সামনে এসে দাঁড়াল মিতা। বলে, টাকা দাও।

সুব্রত বলে, পাখি কার নাম?

ওদের একজনের, বুঝতেই পারছ। দাও শিগগির।

কত টাকা?

দু'শো তো দাও। তারপর দেখি।

অত টাকা এখুনি পাব কোথায়? তুমি সংসার থেকে নিয়ে নাও না।

কালকেই শোধ করে দেবে।

ঝমঝম করে গোদরেজের আলমারি খোলার শব্দ হয়। ঝমঝম করে আলমারি বন্ধ করার শব্দ হয়। খসখস করে শব্দ হয় মিতার ব্যস্ততার। ন'তলায় মাসিমা অর্থাৎ রিটায়ার্ড চিফ ইঞ্জিনিয়াবের স্ত্রী মিসেস রায়ের ফ্ল্যাট। ক্রিং ক্রিং, লিফট, লিফট।

সুব্রত ফিরে আসে টাইপরাইটারের কাছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রবন্ধটার খেই ধরে ফেলে আবার। কাজ চলতে থাকে খট খট, খট খট। বাইরে রাস্তায় মিনিবাসের চিলচিৎকার এখন কমে এসেছে। রান্নাঘরে বোধহয় নিমপাতা ভাজছে কাজের ছেলেটা। মাস তিনেক হল এসেছে, বেশ চুপচাপ। কতদিন টেকে দেখা যাক। এখন এদের যা চাহিদা, এক ফ্ল্যাটের কাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনও ফ্ল্যাটে পাঁচ-দশ টাকা বেশি দিয়ে ডেকে নেবে।

এত বড় অট্টালিকা। কত লোক গেট দিয়ে আসে-যায়। কত রকম হাঁটার ভঙ্গি। লিফটে একসঙ্গে ওঠে, নামে। সিঁড়িতে দেখা হয়। বিশেষ করে কাউকে মনে থাকে না। একবার আলাপ-পরিচয় হয়ে গেলে অবশ্য অন্য কথা। এই যেমন মিসেস নাথ। যার ডাকনাম পাখি। বারান্দা থেকে দেখা যায়, সকালে ছোট একটি মেয়ের হাত ধরে স্কুলে চলেছে। সরু সিঁথি। হাতে বইয়ের বাকস, জলের বোতল। বিকেলের দিকে, সন্ধের পরে প্রায়ই ওকে যেতে-আসতে দেখা যায়। কখনও একা, কখনও সঙ্গে কেউ। মিতার কাছে শোনা: পাখির স্বামী মিস্টার অরুণ নাথ, যার নাম নীচের লেটারবক্সে জ্বলজ্বল করে, কলকাতায় থাকে না। বোম্বাই না দিল্লি কোথায় এক ওযুধ কোম্পানির রিজিওন্যাল ম্যানেজার। কলকাতায় বদলির চেষ্টা করছে। ভবানীপুরে ওর বাপের বাড়ি। বাবা না মা কে যেন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় পাখি কলকাতায় চলে আসে। তারপর ফ্ল্যাটটা হঠাৎ পেয়ে গেল কপালজোরে। ওর দাদা কাজ করে পূর্ত দপ্তরে, সে বলল. পুরো টাকা একসঙ্গে যদি দিতে পারিস, একটা দারুণ ফ্ল্যাট পাইয়ে দিতে পারি। হাজার স্কোয়ার ফুট, মাত্র একলাখ টাকা। অরুণকে লেখ না। অনেকে লাইন দিয়ে আছে, তবে আমি বললে ওরা কথা রাখবে। ফ্ল্যাট পেয়ে পাখি আর ফিরে যায়নি।

ছ'তলা বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটের এই হল সামান্যতম ইতিকথা। প্রত্যেকটির পেছনে এই রকম ছোট ছোট ইতিকথা আছে। ছাপোষা মানুষ সবাই, সঞ্চয় সর্বস্ব দিয়ে একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। কত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, কত পরামর্শ-আলোচনা, ধার-দেনা করে অর্থ সংগ্রহ। সুব্রতর নিজেরই জমি ছিল যোধপুর পার্কে, বেচে দিতে হল। ঠিকেদার লাগিয়ে রোদ্দুরে ছাতা-মাথায় দাঁড়িয়ে দেয়াল তোলা, ছাদ জমানো ওর কর্ম নয়। দিনকাল যা পড়ছে, ছোট ছোট ইউনিটের বাড়ি কলকাতায় আর বেশিদিন হাওয়া-বাতাস পাবে না।

অনেকদিন বেরোয়নি, মুখ বদলের জন্যে সুব্রত কনসুলেটের পার্টিতে আসতে রাজি হয়েছিল। আর গোল বাধল সেইদিনই। বিনা পয়সায় মদ খাওয়াটা বড় আকর্ষণ না, সত্যি কথা বলতে কী, বিদেশিদের ককটেলে সোডা থাকে বড় বেশি। এক জালা গিললে তবে একটু নেশা হয়। অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, মতামত বিনিময় হয়, সেইটাই আসল। লেখার পয়েন্ট পাওয়া যায়। জানা যায়, হাওয়া কোন দিকে বইছে।

লনের আলো-আঁধার আবছায়ায় ছড়ানো জটলা। গুচ্ছ গুচ্ছ মেয়ে-পুরুষ। ট্রে-হাতে উর্দি-পরা বেয়ারা ঘুরঘুর করছে। ক্লিং ক্লিং শব্দ হচ্ছে কাচের গ্লাসে।

হঠাৎ ফণী পালের আবির্ভাব। আরে দাদা, আমাদের ভুলেই গেছ একেবারে—পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল।

সুব্রত তাকিয়ে দেখল, ফণী একটু মোটা হয়েছে। ছোকরাকে একসময় পছন্দ করত ও। ধারালো ভাষা ছিল কলমে, পরিচ্ছন্ন চিন্তা ছিল মাথায়। এখন গেঁজে গেছে। একটা কেচ্ছাকাগজের সম্পাদনা করে, আর কালো টাকায় কেনা মদ খায়।

কেমন আছ? জিজ্ঞেস করে সুব্রত।

ফাস ক্লাস। কিন্তু তুমি দাদা অফ হয়ে গেলে? শরীরটরির ভাল তো?

ভাল। বিশেষ বেরোই না আজকাল।

সেই ভাল। নিজের মনে থাকো, সেই ভাল। মোটা ফ্রেমের চশমার পেছনে ফণী পালের বড় বড়

চোখদুটো যেন মতলব ভাঁজতে থাকে। ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটরের মতো নানান রকম অঙ্ক ছুটোছুটি করতে দেখা যায়।

পাজি লোকে ভরে গেছে, জানো। ফণী সুব্রতর বাহুতে টোকা দিয়ে বলে, ওই দেখছ, হেঁ হেঁ করে হাসছে, ব্যাটা স্পাই।

সুব্রত উদ্দিষ্ট লোকটিকে চিনল না।

তোমার লিভারের কমপ্লেইন এখন নেই তো? ফণী একটু পরে আবার কথা তোলে।

এই প্রসঙ্গে একটু অস্বস্তি বোধ করে সুব্রত। ও ব্যথা কি কমবার? ওষুধবিষুধ খেয়ে চাপা দিয়ে রাখা। তাই সুব্রত উত্তর দেয় না।

আমার কাগজে একটা লেখা দাও না দাদা। দেবে?

কী লেখা? সুব্রত ফণীর দিকে তাকায়—সময় পাই না ভাই। হাতে এত কাজ জমে গেছে, নিজের লেখা ভাবতে পারি না।

আমার কাগজ বলে ঘেন্না করছ সুব্রতদা? ফণীর কণ্ঠস্বর গাঢ় শোনায়।—ইচ্ছে হলে অন্য নামে লিখো। টাকা দেব আমি। কোনওদিন ঠকিয়েছি তোমায়, বলো?

ঠিক আছে, ঠিক আছে। সুব্রত দু'-চার পা এগিয়ে অন্য একজনের সঙ্গে আলাপ জমায়। ফণীকে বেশিক্ষণ সহ্য করা মুশকিল।

ঘুরতে ঘুরতে, কথা বলতে বলতে লনের ওই প্রান্তে গিয়ে হাজির হয়েছে কখন, টের পায়নি সুব্রত। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। কেউ কেউ চেয়ারে বসে পড়েছে, দেখা যায়। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব। সুব্রত একটা খালি চেয়ার খুঁজছিল।

কোথা থেকে ফণী পাল আবার।

চলো, কেটে পড়ি দাদা।

অনিচ্ছা ছিল না সুব্রতর। তবে, ফণীর সঙ্গে বাইরে কোথাও বসে গেলে ঝুঁকি নেওয়া হবে। গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে ওকে। মনে পড়ল মিতার সাবধানবাণী। এক বাড়ি লোক, বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। সুব্রত নামল—টলছে। দারোয়ান চাবি নিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল—টলছে! সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল—টলছে। লিফটের দিকে এগোল টলতে টলতে।

এখনও আটটা বাজেনি। দোকান থেকে একটা শিশি কিনে বাড়িতে বসে খাওয়াই ভাল। লোডশেডিংয়ের উৎপাত কিছুদিন হল কমেছে।

ফিরে এসে দেখে ফ্ল্যাটে তালা বন্ধ। মিতা ছেলেকে নিয়ে বেরিয়েছে কোথাও। চাকরটাও নেই। সুব্রত দেরিতে ফিরবে, সুতরাং সন্ধেবেলাটা ওদের ছুটি।

ফণী বলল, এই বাড়িতে অন্য ফ্ল্যাটে আমার চেনা একজন থাকে। চলো, সেখানেই বসি।

অগত্যা। আবার লিফটে উঠে ওপরের দিকে চলল।

দরজা খুলল পাখি। কুণ্ঠিতভাবে সুব্রত জানাল, ওর স্ত্রী তালা দিয়ে বেরিয়েছে। সুতরাং—, খুব অসুবিধে হবে কিনা।

পাখি বলল, আপনি তো কারুর বাড়ি যান না। কতদিন মিতাদিকে বলেছি নিয়ে আসতে। বসুন।

বোকার মতো সুব্রত বলল, এই তো এলাম।

বাধ্য হয়ে।

ফ্ল্যাটটা চিনে গেলাম, এরপর সড়গড় হয়ে যাবে। মেয়েকে দেখছি না?

পাশের ফ্ল্যাটে টিভি দেখছে।

এতক্ষণ পর যেন চোখে পড়েছে, পাখি ফণীর দিকে তাকিয়ে হাসল। সুব্রতকে জিজ্ঞেস করল, একে কোথায় পেলেন?

উত্তর দেবার আগেই ফণী নিজে কথা বলল।

ককটেল পার্টিতে দেখা। আমিই তো নিয়ে এলাম। বললাম, চেনা একজন থাকে। কী রকম চেনা তা অবশ্য বলিনি। একটু থেমে ফণী বলল, দুটো গেলাস দেবে?

বলে প্যান্টের পকেট থেকে কষ্টেসৃষ্টে শিশিটা টেনে বার করে।

সুব্রত পাখির চোখে কৌতুক লক্ষ করে। শুনতে পায় পাখি বলছে:

আর ঠান্ডা জল? অ্যাশট্রে? তারপর মিউজিক?

অপমান করছ? ফণী গম্ভীর হবার চেষ্টা করল।

ওরা বেতের সোফায় বসেছিল। বাস্তবিক, পাখি উঠে গিয়ে রান্নাঘর থেকে গ্লাস, ফ্রিজ থেকে জলের বোতল, আড়াল থেকে ছাইদানি এনে দেয়।

বলে, চোখ দেখে বুঝেছি, বেশ তো খেয়েছ। আর না খেলে হয় না?

দূর। স্রেফ জল। ব্যাটাদের খিস্তি দিতে হবে। ভেবেছে কী?

পাখি জিজ্ঞেস করল, একটু আলু ভেজে দেব? না না, ঠাট্টা করছি না।

চুপ করে ছিল, সুব্রত কথা বলে এবার।—দরকার নেই, আপনাকে অকারণ বিব্রত করা। বরং এখানে এসে বসুন। কথা বলি।

পাখি সুব্রতর কাছে এসে বসে। ফণী সামনাসামনি।

কথায় কথায় ফণী বলল, কী রকম চেনা জানো? এই যে পাখি...আমার কী রকম চেনা, বলেছি? বলিনি? তবে শোনো—

সেই ধানাইপানাই শুরু করবে তো? পাখি বাধা দেয়।

না, না, ধানাইপানাই কেন! দু'কথায় সেরে দেব।...ফুলল আর মরল।...পাখি খুব ভাল মেয়ে জানো!...ওকে ভালটাল বাসতাম। অনেকদিন আগে অবশ্য। চাকরি না পেলে তো বিয়ে করা যায় না, তাই বিয়ে হচ্ছিল না। চাকরি আমার হলই না কোনওদিন, আর এদিকে চাকরিওলা একজন এসে পাখিকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

ফণী বলতে থাকে, তা বলে কোনওদিন আমি বলব না, পাখি বিট্রে করেছে। খুব ভাল মেয়ে ও। আমি যে মাঝে মাঝে আসি এখানে, ও আমায় এক দিনও তাড়িয়ে দেয় না।

পাখি সুব্রতর দিকে তাকায়। সপ্রতিভভাবে পা মেলে বসে। সুব্রতকে জিজ্ঞেস করে, শুনলেন তো। এ রকম সাংঘাতিক মেয়ে আপনি দেখেছেন?

খেতে খেতে মাথার মধ্যে নেশাটা গুনগুন করে উঠেছে বেশ। সুব্রত কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে পাখির মুখের দিকে। তাতেই কথা এসে যায়।

বলে, আপনি ওকে ভালবাসেন।

না।

দেখছি আমি, ভালবাসেন। আচ্ছা, পছন্দ করেন বলতে দোষ নেই?

বাজে কথা। কিছুই দেখছেন না। চোখ লাল করে তাকিয়ে আছেন। ব্যাপার কী জানেন, অনেকদিন আগে ওর সঙ্গে আমার একটা মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, সেই সম্পর্কের স্মৃতিকে আমি অসম্মান করতে পারি না। পাখি বলল, ভাল আমি কাউকে বাসি না। বাসতে পারলাম না, এই জিনিসের জন্যে।

গ্লাসের দিকে আঙুল দেখাল পাখি।

একজন বিবাহিতা মহিলার মুখে এ রকম মারাত্মক কথা শুনবে সুব্রত ধারণা করতে পারেনি।

বলেন কী মিসেস নাথ? এই নির্জীব, ব্যক্তিত্বহীন জিনিসটার ওপর এত রাগ। সত্যি বলছেন?

নির্জীব? হ্যাঁ, জিনিসটা সত্যি তাই। আমার আপত্তি হচ্ছে আসক্তিতে। রাগের কথা তুলছেন কেন? রাগ করলে শুনছে কে? এত কথা আমি বলতাম না। বলা উচিত না আমার। ফণী যে তুলল।

এরা কথা বলছে, ফাঁকতালে ফণী পাল ঢালছে আর খাচ্ছে। এখন আর কথা বলছে না। মোটা চশমার পেছনে চোখদুটো পিটপিট করছে ওর।

পাখি বলছে, স্বাভাবিক জীবনে মানুষের সবকিছুই আছে। কষ্ট আছে, গ্লানি আছে, অপমান আছে; কিছুই স্থায়ী নয়, কিছুই খাঁটি নয়—এই ধরনের ব্যর্থতাবোধ আছে। তাই না? ব্যক্তিগতভাবে আমাদের তার মুখোমুখি দাঁড়ানো দরকার। তবেই অতিক্রম করা যাবে। নেশা করলে সমস্যাটা পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়, আমি মনে করি।

এত কথা পাখি বলল। বেশ গুছিয়ে বলল। মিতা কোনওদিন সুব্রতকে বলেনি। মিতার বোধ সম্ভবত এত প্রখর নয়।

শিশির জিনিস খতম হলে পর ঘড়ি দেখল ফণী। নটা বেজে গেছে। এরপর আর কোনও ট্যাক্সি যাদবপুর যাবে না।

উঠে দাঁড়িয়ে ফণী বলে, নেশা করা ছেড়ে দেব সুব্রতদা। বড় ক্ষতি হয়। কোনও মানে হয় না। পাখি, তুমি ঠিকই বলেছ।

মনে হয় ফণী অনুতপ্ত। উৎসাহিত হয়ে পাখি ওর হাত ধরে হঠাৎ, সত্যি বলছ?

সত্যি।

ছেড়ে দাও। একমাস না খেয়ে দেখো, আর খেতে ইচ্ছে করবে না। নেশা-ছাড়া জীবন সুন্দর লাগবে।

জড়ানো গলায় ফণী বলে, তুমি আমায় বিট্রে করেছ, কোনওদিন বলব না। আমি ছোটলোক বলে কেউ ভালবাসেনি আমায়। আমি মাতাল, ছোটলোক।

পাখির চোখ ছলছল করে ওঠে। ওর সুন্দর লম্বাটে শ্যামবর্ণ মুখখানি পাখির মতোই একটুখানি তুলে বলল, আমি তোমায় ভালবাসব ফণী। তুমি আমার কথা রাখবে?

সুব্রত তাকিয়ে দেখে। ওর মনে হয়, এই রকম গ্রীবা তুলে কোকিলও ডাকে।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কথা কয় না সুব্রত। ফণী দুবার ঢেকুর তোলে, তারপর গুড়গুড় করে হাসে। বলে, যতদিন পারা যায় এইভাবে চলুক, কী বলো দাদা।

তিনতলায় নেমে সুব্রত পিছন ফিরল। আমি আর নামলাম না। যেতে পারবে তো।

ফণী পাল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একবার। বলল, আমার লেখাটার কথা মনে থাকে যেন। ফোন করব। তারপর আবার নামতে থাকে। দুলতে দুলতে নামতে থাকে।

প্রথম দিন লক্ষ করেনি মিতা। দ্বিতীয় দিন লক্ষ করল, কিছু বলল না। তৃতীয় দিন সন্ধেবেলা, আটটা নাগাদ, বাবলুকে বলল, বাবাকে জিজ্ঞেস কর, ঠান্ডা জল লাগবে কিনা।

বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে সুব্রত বই পড়ছিল। ইংরেজি পেপার ব্যাক। বলল, লাগবে না।

রাত্রে শোবার সময় জানতে চাইল মিতা, তোমার শরীর খারাপ নাকি?

না তো।

ক'দিন ধরে ড্রিংক করছ না, কী ব্যাপার?

ছেড়ে দেব ভাবছি। দেখি না চেষ্টা করে কিছুদিন।

মিতা অবাক হয়। বলে, সে তো খুব ভাল কথা। ভাবছি, এতদিনে আমার কথা সিরিয়াসলি নিলে।

সুব্রত একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে। মিতা লক্ষ করে, কিছুক্ষণ উসখুস করে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সুব্রত।

ফ্ল্যাটবাড়ির নীচে একটা ক্লাবঘর তৈরি হয়েছে। বিকেলে ছেলেপুলেরা ক্যারাম খেলে। সন্ধেবেলা বড়রা তাস খেলে। বাংলা বইয়ের একটা ছোট লাইব্রেরি মতন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে এরা। সুব্রত সেখানে যেতে শুরু করেছে মাঝে মাঝে। মন্দ লাগছে না। এরা সাধারণ সচ্ছল মানুষ। সুব্রতকে প্রতিভাবান জ্ঞানে শ্রদ্ধা করছে।

একদিন সিঁড়ির মুখে দেখা হল পাখির সঙ্গে।

সুব্রত বলল, ভাল?

পাখি বলল, ভাল?

আর কোনও কথা হল না।

আর একদিন ফেরার সময় মনোহরপুকুর রোড ধরে পাখিকে হেঁটে আসতে দেখল। পাশে একজন বয়স্কা মহিলা। আস্তে আস্তে হাঁটছেন।

কী মনে হল, গাড়ি থামাল সুব্রত।

মিসেস নাথ কি বাড়ির দিকে?

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ওরা।

সুব্রত নেমে দাঁড়ায়। আবার বলে, যদি বাড়ির দিকে যান, একটা লিফট দিতে পারি।

ওরা কৃতজ্ঞ হয়ে পিছনের সিটে ওঠে। পাখি ধন্যবাদ দেয়। সঙ্গিনী মাকে সুব্রতর পরিচয় দেয়। তিনতলায় দশ নম্বর ফ্ল্যাট। নামকরা সাংবাদিক।

আর কোনও কথা হল না। সুব্রতর মনে হল, একা থাকলে পাখি পিছনের সিটে না বসে ওর পাশে বসত। ফণী রাসকেলটা আর কোনওদিন এসেছিল কিনা জিজ্ঞেস করত তা হলে।

স্বীকার করা ভাল, সন্ধের দিকে এক-এক দিন খেতে খুব ইচ্ছে করে। তেষ্টা পায়। মেজাজ খারাপ

হয়। বাড়িতে বোতল রাখছে না আজকাল, তাই ইচ্ছে হলেও উপায় থাকে না। মনে হয়, কোনও বন্ধুর আস্তানায় একবার ঢুঁ মারলে দু'পাত্র জুটে যাবে। অসুবিধে কী। ভয় কাকে?

ভয় সুব্রতর নিজেকেই।

এর আগে কখনও চেষ্টা করে দেখেনি। দেখাই যাক না। একমাস পুরে গেলে হয়তো একেবারে ছেড়ে দিতে পারবে। এই সুযোগে অসুস্থ লিভারের বিশ্রাম তো হচ্ছে।

মিতা একদিন জিজ্ঞেস করে বসল, পাখির ফ্ল্যাটে তুমি গিয়েছিলে নাকি? বলোনি তো।

বলব আবার কী? ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ দেখে চলে গেলাম। আমার সঙ্গে ফণী ছিল, ফণী পাল। ওকে চেনো। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে এলাম।

কথাবার্তা? না, উৎপাত করেছ তোমরা? মিতা জেরা করতে থাকে। ওখানে বসে ড্রিংক করেছ। একা থাকে বেচারা। দু'জন পুরুষমানুষ গিয়ে মাতলামো করলে তাকে উৎপাত করা বলে না তো কী বলে?

মিসেস নাথ তোমায় রিপোর্ট করেছে এইভাবে? সুব্রত রেগে যায়।—অত্যন্ত অন্যায়। দেখা হলে আমি কৈফিয়ৎ চাইব।

মিতার কণ্ঠস্বর থেকে লাবণ্য ঝরে যায় এবার। সুচের মতো ছুড়তে থাকে বাক্য।

আর লজ্জা বাড়িয়ো না। যথেষ্ট হয়েছে। আগেই বলেছিলাম, বুদ্ধিভ্রংশ হয় যা খেলে, তা খাওয়া কেন। গায়ে গায়ে ফ্ল্যাট, এক কথা থেকে একশো কথা ছড়াবে।

কী যা-তা বকছ? সুব্রত চেঁচিয়ে ওঠে।—তোমার বান্ধবীর সঙ্গে প্রেম করার ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। ও যদি মনে করে থাকে—

অমনি মিতা লুফে নেয় কথাটা।—ও কেন মনে করবে? ওর তো ভালই লাগবে। নামকরা লোকেরা ওর ফ্ল্যাটে যাওয়া-আসা করছে, ওর কত গর্ব।

এবার অবাক হয় সুব্রত।

এভাবে কথা বলছ কেন? তোমার সঙ্গে কি ওর ঝগড়া হয়ে গেছে?

এখনও হয়নি। দরকার হলে হবে। আমার সংসারের দিকে হাত বাড়ালে, আমি সহ্য করব না, যে যত বন্ধুই হোক।

সুব্রত না হেসে পারল না।—অনেকদূর ভেবে ফেলেছ!

বিস্ফোরণ প্রতিদিন হয় না, কিন্তু মনকষাকষি চলতে থাকে। খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে প্রায় একমাস হল, সুব্রত ভেবেছিল, মিতা খুশি হয়ে উঠবে, উৎসাহ দেবে; চেষ্টা করলে মানুষ কী না পারে। তার বদলে ওর না খাওয়া নিয়ে খোঁটা দিচ্ছে! কতদিন পারো দেখি! মাসিমা বলছিলেন, একেবারে ছেড়ে দিলে স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে। হাত কাঁপবে। মাথা ঘুরবে। অনেকদিনের অভ্যেস, বদঅভ্যেস কমিয়ে ফেলা উচিত। একেবারে ছেড়ে দেওয়া ঠিক না। তোমার ইনসমনিয়া হচ্ছে, আমি তো দেখছি।

এই মাসটা থাক। তারপর একটু একটু খাব। সুব্রত আশ্বস্ত করল মিতাকে শেষপর্যন্ত।

কনসুলেটে কাজ করে মিহির বসু। সুব্রত বলে, হামবাগ। মিতা তাকে টেলিফোন করল একদিন দুপুরবেলা।

কতদিন আসেন না। কেমন আছেন?

চলছে একরকম। আপনারা ভাল? সুব্রতদার খবর কী? কিছুদিন আগে আমাদের ককটেল পার্টিতে একনিমেষের জন্যে দেখা হয়েছিল। হঠাৎ কখন কেটে পড়লেন, জানতে পারিনি।

ড্রিংক করা ছেড়ে দিয়েছে।

ছেড়ে দিয়েছে? বলেন কী বউদি, সুব্রতদা—কল্পনা করা যায় না। সিরিয়াস কিছু? ডাক্তারের বারণ নাকি?

না না, নিজেই। কী মনে হয়েছে কে জানে। ভালই তো।

সে তো বটেই। ছাড়তে পারলে তো খুবই ভাল। একদিন গিয়ে কংগ্রাচুলেট করে আসব।

আসবেন। আর বুঝিয়ে বলবেন, কোনও ব্যাপারেই একগুঁয়েমি ভাল না। খিদে হচ্ছে না, ঘুম হচ্ছে না, সব সময়ে মেজাজ খারাপ। ভয় করে, বড় একটা অসুখবিসুখ না বাধিয়ে বসে। ওর নার্ভ তো দুর্বল।

আসব, আসব। এই শনিবারেই আসব। বাড়িতে থাকবেন তো?

থাকব আমরা। ফোন করেছি, আপনি যেন বলবেন না।

সুব্রত জানত না কিছুই। নীচের তলায় ক্লাবঘরে বসে দাবা খেলছিল পাঁচতলার বিশ্বাসের সঙ্গে। কাজের ছেলেটা গিয়ে ডেকে আনল।

ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখে, মিহির বসু। তার বউ আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। বিদেশি পারফিউমের গন্ধে ঘর ভরপুর। ক্যাবিনেটের ওপর একটা জলজ্যান্ত স্কচের বোতল। মিহির বিদেশি সিগারেট খায়।

ব্যাপার কী?

একটা ভাল জিনিস পেয়ে গেলাম। ভাবলাম তোমাকে প্রেজেন্ট করি। সমঝদার লোককে খাঁটি জিনিস দিয়ে সুখ।

আর দু'দিন পরে এক মাস পূর্ণ হত। সুব্রত একবার মিতার দিকে কাতর চোখে তাকায়।

মিহির বলল, বেশি না খেলেই হল। একেবারে ছেড়ে দেওয়া মোটে কাজের কথা নয়। ব্রেকডাউন হয়ে যাবে সুব্রতদা।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল সুব্রত। ব্রেকডাউন। ভাল বলেছ।

তারপর বলল, মাথা খারাপ? অমৃত বলে কথা! যে একবার এর স্বাদ পেয়েছে, সে কি ছাড়তে পারে। যে কদিন বাঁচি, ফুর্তি করে যাই, কী বলো?

তারপর মিতাকে বলল, ভাল জিনিসের সঙ্গে ভাল খাবার চাই। চিজ আর টম্যাটো দিয়ে অমলেট করে দাও। আর প্লিজ, ছেলেটাকে বলো, ঠান্ডা সোডা নিয়ে আসুক। জল দিয়ে এ জিনিস জমবে না।

খানিক পরে হাসাহাসির শব্দ শুনে বাবলু পড়ার ঘর থেকে বাইরে উঁকি মেরে দেখে, বাবা অনেকদিন পরে আবার মদ খাচ্ছে।

গেটের মুখে পাখির সঙ্গে দেখা। চুলে শ্যাম্পু করেছে।

ওরা একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে লিফটের কাছে আসে। এসে দাঁড়ায়, অপেক্ষা করে। ইনডিকেটরের তির ওপর দিকে উঠছে।

সুব্রত বলল, একমাস বলেছিলেন, চেষ্টা করলাম। পারলাম না।

পাখি বলল, শুনেছি।

ওর কালো এবং সুন্দর মুখের ওপর আরও কালো অসুন্দর একটা ছায়া পড়ল যেন।

মিতা বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ,—আস্তে আস্তে পাখি বলল,—মিতাদি বলছিল, চেষ্টা তো করলে, পারলে?

১৯৭৯

খেলাঘর

নীচের তলায় দীপঙ্কর সরকার, কার্ডিওলজিস্টের চেম্বার। লম্বাটে বড় হলখানা পালিশ-করা কাঠ দিয়ে দু'ভাগ করা। রাস্তার দিকটায় ওয়েটিংয়ের ব্যবস্থা। বারো-চোদ্দো জনের মতো গদিওলা আসন তিন দেয়াল ঘেঁসে সাজানো, মাঝখানে প্রশস্ত গোল টেবিল উপচে পড়ছে ইংরেজি পত্রপত্রিকায়। এককোণে জাবনা রাখার পাত্রের মতো বিরাট এক ছাইদান, তার গায়ে সাদা হরফে লেখা, 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'। ইংরেজি ভাষায় লেখা এই বাণী সর্বভাষাভাষী হৃদরোগীর পাঠ্য। দেয়ালে প্রায় পাঁচশো জনকে নিয়ে এক গ্রুপ ফটো। রয়্যাল কলেজ, এডিনবরায় তোলা, তিরিশ বছর আগে দীপঙ্কর যেখান থেকে পাশ করে ডাক্তার হয়েছিলেন। অন্য কোণে মা কালীর ছবি—একটা তক্তার ওপর রাখা, ছবির গলায় লাল কাগজের তৈরি জবাফুলের মালা।

ভিতরের দিকটায় চেম্বার ও চেকআপের ব্যবস্থা। বড় টেবিল, একটি দোলন ও দুটি স্থির চেয়ার। অদূরে সরু বিছানা, ওজন-ঘড়ি ও নানা প্রকার বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র। পাশের কামরার মতো এ-কামরারও সিলিং থেকে ঝোলে পাখা। টেবিলের ওপর সাদা টেলিফোন।

ডাক্তার সরকার এই চেম্বারে বসে রবিবার বাদে প্রতিদিন সন্ধে ছ'টা থেকে রাত প্রায় দশটা অবধি নানান মাপের, নানান বয়সের মানুষের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ ও আয়ু পরীক্ষা করেন। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যবস্থাপত্র ও উপদেশ দেন। কাজ সারা হলে ওপরতলায় উঠে যান। স্বোপার্জিত আরাম এবং বিশ্রাম উপভোগ করেন। স্ত্রী জীবিত থাকার সময় টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখার যে-রীতি প্রচলিত ছিল, এখনও তা বহাল আছে। রাত দশটার পর কলকাতার কন্দরে কন্দরে চিতাবাঘের খেলা শুরু হয়ে যায়, রিসিভারটি নামিয়ে না রাখলে দীপঙ্কর সরকার, কার্ডিওলজিস্টের বেডরুমে সারারাত ধরে দমকলের ঘণ্টা বাজবে।

দোতলায় ঠিক ওপরের ঘরটি বেবির খেলাঘর। মানে স্নান, সাজগোজ ও শোওয়া ছাড়া যতক্ষণ বেবি বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ এই ঘরটিই ওর আস্তানা। সময় কাটাবার অনেক রকম ব্যবস্থা আছে এ-ঘরে। বন্ধুবান্ধব এলে বসে, শোয়, আড্ডা মজা করা যায়। মিউজিক আছে, যুবক-যুবতীদের উপযুক্ত পত্রপত্রিকা আসে নিয়মিত। মা-হারা মেয়েটা নিজের মনে থাকুক, কোনও ব্যাপারে ওকে বাধা দেন না দীপঙ্কর সরকার। বাইশ বছর বয়েসের মেয়ে বেবি আদুরে তুলতুলে সুন্দরী এবং একটু খামখেয়ালি গোছের, এ-কথা বাড়ির পাঁচ-সাত জন কাজের লোক, ড্রাইভার—এরা তো জানেই, আর জানে খেলাঘরের মধ্যে আনাচেকানাচে লুকিয়ে থাকা আরশোলারা, নিয়মিত সপ্তাহান্তিক গরলসেচন সত্ত্বেও যারা বেঁচে আছে।

চিক্ তাদের একজন।

খেলাঘরের উত্তর দিকে জানলা। জানলার নীচের অংশ কেটে, সেই গর্তে এয়ারকন্ডিশনারটি বসানো একটি ইস্পাতের ফ্রেমের মধ্যে। ফ্রেম ও কাঠের মাঝামাঝি সূক্ষ্ম ফাটলের নিভৃতে চিক্ তার একান্ত মাদি ও অসংখ্য সন্তানসন্ততি নিয়ে কিছুকাল ধরে বসবাস করছিল। আজ দুপুরের নিধনযজ্ঞে মাদিটি মারা যায়। বিষবাষ্পের আক্রমণে ফাটল ছেড়ে সবাইকেই যত্রতত্র পালাতে হয়েছিল, কিন্তু আত্মগোপন করতে গিয়ে সে-বেচারি চলন্ত মেশিনের মধ্যে বহিষ্কৃত বাষ্প ও গরম ঝড়ের মধ্যে পড়ে যায়। কম্প্রেসরের কাছাকাছি ঠান্ডা অঞ্চলে ঢুকে পড়ার ফলে চিক বেঁচে গেছে।

সন্ধের দিকে বাইরের দেয়ালে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ প্রিয় গন্ধ পেয়ে চিক্ শুঁড় ফেরায়। দেখে, কার্নিশের নীচে ঠিক আর একজন। শরণার্থী মাদিটি তখনও ধুঁকছিল, কাছে গিয়ে চিক্ তার পরিচর্যা করে, শুশ্রূষা করে। শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে প্রীতি জানায়। তার গোমেদ রঙের শরীরে শুঁড় বুলোয়।

একটু সুস্থ হয়ে উঠলে পর ওকে জিজ্ঞেস করে, "নাম কী?"

"তি।"

নাম শুনে মুগ্ধ হয় চিক্। শুধু 'তি'। তারপর তাকে নিজস্ব নিভৃতে ডেকে নিয়ে আসে। কম্প্রেসরের ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগলে ঘুমিয়ে পড়ে তি।

এই অবসরে বেরিয়ে পড়ে চিক্। বেবির খেলাঘরের মধ্যে উঁকি দেয় ফাটল থেকে। দেখে, আলো জ্বলছে।

চিক্ দেখল, কাছেই ডান দিকে, দেয়ালের কোণটায় একটা মাঝারি গোছের টেবিল আনা হয়েছে। তার ওপর খাবারের বাকস। দুটো বড় ফ্লাস্ক আর একরাশ মাটির সরা ও ভাঁড়। ডানদিকে লম্বা দেয়াল ঘেঁষে লাল বড় সোফা, ছোট সোফা—তারপর বেবির মিউজিক কর্নার, যেমন থাকে, তেমনই। বঁদিকের দেয়াল ঘেঁষেও, দরজার পাশটিতে সেই ক্রিম রঙের ঢাকনা-দেওয়া নিচু ডিভান ঠিকঠাক। তারপর ঘরের ওদিকের কোণ ঘেঁষে—যেখানে বেবির পুতুলের র‍্যাক, তার নীচে মেজের ওপর প্রশস্ত ফোমের একটা গদিতে চাদর ঢাকা দেওয়া হচ্ছে। চিক্ দেখল, আটপৌরে পোশাক—একটা ঘাগরা ও কাঁচুলি পরে বেবি খেলাঘরের মাঝখানে দাঁড়ানো; জঞ্জাল সাফ করাচ্ছে, ঘর সাজাচ্ছে। চাকরদের নির্দেশ দিচ্ছে আঙুল দেখিয়ে। বাঁ হাত দিয়ে বুকের ওপর চেপে-ধরা একটা প্রকাণ্ড ভেলভেটের ভালুক। ওর পিঠের ওপর দুলছে শুকনো চুলের ঝাড়, মাঝখানটায় সরু লোহার চেন দিয়ে বাঁধা। বেবি বলছে, "যা রাখার সব রেখে

যাও। ওরা এসে গেলে আর কেউ এ-ঘরে ঢুকবে না, এ-দিকে থাকবে না, বুঝলে?"

সবকিছু দেখে চিক্ খুব খুশি হয়। যেন তি আসছে বলে এতসব আয়োজন। খেলাঘরের মধ্যে সে সেঁধিয়ে যায় আরেকটু। আবার গন্ধ পায়। না, বিষের গন্ধ না। ঠান্ডা বাতাস, তৈলাক্ত খাবার আর পরিচ্ছন্নতা—সব মিলিয়ে এক উত্তেজক চকোলেটের মতো গন্ধ।

করকরে করাতের পাগুলো দু'-চার বার দেয়ালে ঘষে চিক্ ভেতরে ঢুকে যায়।

খানিকটা ঘুমিয়ে নেবার পর তি সুস্থবোধ করে। পেট্রোল পাম্পের কাঁটার মতো দুটো শুঁড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আশপাশ বুঝে নেয়। তার নধর শরীর থেকে গোমেদ রঙের পাখাদুটি দু'-চার বার তুলে ফরফর শব্দ করে। তারপর সামনে দিকে চোখ পড়তে দেখে, মুখোমুখি বসে আছে তার নতুন প্রণয়ী—চিক্। উত্তেজনায় তার শুঁড় থরথর করে কাঁপছে। তি আপত্তি করে না।

দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাটাবার পর একসময় তি বলে ওঠে, "খিদে পেয়েছে।"

খিদে চিকেরও পেয়েছে, কিন্তু বেবির খেলাঘর অন্ধকার না হলে তো খাবারের সন্ধানে বেরুনো যাবে না। অন্ধকার হতে আর কত দেরি হতে পারে, জানার জন্যে চিক্ আর তি দু'জনে ফাটলের মুখটিতে এসে উপস্থিত হয়। বেবির খেলাঘর চিকের চেনা, কিন্তু তি-র কাছে এক সম্পূর্ণ নতুন জগত, তাই চিক ওকে ক্রমশ সবকিছুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। খেলাঘরের আড্ডা এখন জমজমাট।

ডান দিকের দেয়াল-ঘেঁষা লাল বড় সোফাটায় প্রথম যে বসে আছে, সে রীনা। পরনে হলুদ-লাল বাটিক শাড়ি, সেই রঙেরই দুটো রুমাল জুড়ে সেলাই করা খাটো ব্লাউজ। শীতলপাটির মতো মসৃণ পাতা পেট—পায়ের ওপর পা তুলে বসার জন্যে ভাঁজ খেয়েছে, মাঝখানে নিটোল জলভ্রমি নাভি। এত নিটোল চুকচুকে ও নিখুঁত যে মনে হয়, ওর কপালের প্রকাণ্ড কুমকুমের টিপটার মতো কৃত্রিম। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা রীনার ফুলকি চুল অল্প অল্প উড়ছিল কিন্তু বিরক্ত করছিল না যখন পাশে-বসা জয়তী ওকে জিজ্ঞেস করল,—"তোমাদের ঝগড়া হয় না ভাই?"

জয়তী অত্যন্ত ফরসা। একটু রোগা ও দুর্বল দেখতে এখনও, যদিও ওর গর্ভপাত ঘটেছে প্রায় এক বছর আগে। চোখদুটি বড় ও কৌতুকে ভরা, তার ওপর প্রকাণ্ড এক গো গো চশমা। গলা-বুক খোলা ঢাউস এক ম্যাকসি পরে এসেছে, ফলে, কাঁধের দু'পাশে ফিতে থাকায় বেশি ফরসা জায়গাটা ঘরের অল্প আলোতেও স্পষ্ট চোখে পড়ে।

"হয় না আবার!"—একটা লম্বা হোলডারে লাগানো সিগারেটে পাফ দিয়ে রীনা বলল, "লোকটিকে দেখে যত শান্তশিষ্ট মনে হয়, আসলে তো তা নয়!" বলে আড়চোখে তাকায় জয়তীর ও-পাশে ছোট সোফায়-বসা অতনুর দিকে। অতনুর উরুর ওপর রাখা ওয়াইল্ড য়ুথ পত্রিকার পুরনো সংখ্যাটির দিকে।

অতনুর হাতে একটা মাটির ভাঁড়। চুপচাপ বসে সিপসিপ করে তাড়ি খাচ্ছে। একটু আগে ফতুর হয়েছে, সে-শোক কাটেনি এখনও।

ওর কোমরের বেল্ট এত চওড়া ও প্রকট কালো যে মনে হয়, মানুষটাকে দু'খণ্ড করে কেটে আবার জোড়া দেওয়া হয়েছে। কান পর্যন্ত ঢাকা চুল থেকে কোমর অবধি অংশ বেশ টাইট, কোমরের নীচের অংশ ঢলঢলে।

জয়তী এবার অতনুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "মিটমাট হয় কী করে?"

অতনুর মেজাজটা খিঁচড়ে ছিল একটু। বলল, "যেভাবে পৃথিবীর সব স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া মিটে যায়, সেইভাবে।"

তারপর কথাটা নিজের কানেই কটু শোনাল বলে সম্ভবত, ভাঁড়টা দেখিয়ে জয়তীকে জিজ্ঞেস করল, "খাবে একটু?"

"ওতে কোনও ইফেকট হয় না, মাথা ধরে যায়। অন্য কিছু যদি থাকে, দাও—"

অতনু উঠে দাঁড়ায়। রীনাকে জিজ্ঞেস করে। তারপর দু'জনকেই একভাঁড় করে লাল রঙের পানীয় ঢেলে দেয় ফ্লাস্ক থেকে। তারপর জয়তীর পাশে এসে বসে।

"দেখো, দু'জন মানুষ তো একরকম হয় না। অথচ নিজেদের দরকারেই দু'জন মানুষকে একসঙ্গে বসবাস করতে হয়। এই সত্যি কথাটা আমরা প্রথম থেকে জানি। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ যতদিন থাকবে, ততদিন আমরা একসঙ্গে থাকব। তারপর থাকব না। ব্যক্তিগত টান ছাড়া আমরা কেউ কারুর ওপর নির্ভরশীল নই।"

মন দিয়ে শুনল জয়তী। বলল, "উৎপলও এই কথাই বলে। কিন্তু, আমি কিছুতেই সাহস করে ওর ফ্ল্যাটে এসে উঠতে পারছি না। এক এক সময় কী বিচ্ছিরি লাগে না!"

তারপর রীনার দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলল, "আমার খালি ভয় হয়, আবার যদি একটা—! রোগা মেয়েরা খুব ফার্টাইল হয়, তাই না?"

"ট্রিয়ো!" হঠাৎ ওপাশ থেকে চিৎকার করে উঠল বেবি। রীনা, জয়তী আর অতনু—তিনজনে খেলাঘরের ওই কোণটার দিকে তাকাল, যেখানে পুতুলের র‍্যাকগুলোর নীচের ফোমের গদির ওপর বসে ওরা তাস খেলছে। দেখে, বেলবটস আর খাটো শার্ট-পরা বেবির কোলের সামনে এককাঁড়ি কারেন্সি নোট জমে গেছে। আরও কিছু টাকা ও খুচরো নিজের দিকে টানছে তখন।

ওর বাঁ পাশে মেজেতে একটা বড় ভাঁড়। তার মধ্যে ভরতি সবুজ পানীয়। টাকা জেতার নেশায় অনেকক্ষণ এদিকে নজর পড়েনি বেবির। এবার ঢক ঢক করে খেয়ে নিল সবটা। হাসতে হাসতে বলল, "খেলা কি চলবে, না বন্ধ করব?"

ওর সামনে-বসা উৎপল নির্বিকারভাবে সিগারেটের খোল খালি করে দেশলাই কাঠি দিয়ে গাঁজার গুঁড়ো ভরছিল। ওর পায়ের কাছে শেষ সম্বল একটা ভাঁজ-করা দশটাকার নোট। উঁচু চোয়াল দুটো ছড়িয়ে হাসল উৎপল। খোলা বুকে ওর ঝুলছে একটা লম্বা সাদা চেন, তার নীচে বাঘনখ ধরনের লকেট। লকেটটা দিয়ে বুক চুলকোতে চুলকোতে বলল, "অনটন কাকে বলে, এবার একটু বুঝতে পারছি।"

দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা দুটো দু'দিকে ছড়িয়ে বসে আছে মীরাদি। চোখ লাল। ওর প্রসাধনমুক্ত মুখ, অলংকারহীন হাত এবং নীল সাফারির অন্তরালে ঋজু শক্ত শরীর দেখে মীরাদিকে পুরুষমানুষ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বয়েস অন্যদের চেয়ে বেশি, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, কিন্তু মেজাজে তরুণ।

উলটো দিকের দেয়ালে, ফাটলের ফাঁকে দুটি আরশোলা। চিক্ তার নতুন সঙ্গিনী তি-কে বলে, "ওই হল মীরাদি, আগে বেবির গভর্নেস ছিল, এখন বন্ধু।"

অতনু বলল, "মিউজিক হোক।"

রীনা বলল, "সত্যি, দম বন্ধ হয়ে আসছে। রিল্যাক্স করা যাক।"

খেলাঘরের ঠিক নীচের তলার ঘরে দীপঙ্কর সরকার তখন তাঁর কুড়ি নম্বর পেশেন্টের হাত থেকে পঞ্চাশ টাকা নিতে নিতে বলছেন, "শুধু ফ্যাট-ফ্রি ডায়েট বা তিন মাইল করে হাঁটা যথেষ্ট নয়। রিল্যাক্স করবেন, টেনশন বাঁচিয়ে চলবেন।"

পেশেন্ট বলল, "কখন রিল্যাক্স করি বলুন! সবসময় দুশ্চিন্তা। মন্দা বাজার, তার ওপর ভয়, এই বুঝি রেইড হল। রাত্রে ঘুম হয় না ভাল।"

"ট্যাবলেট তো দিলাম।"

"তাতেও রাত একটা-দুটো অবধি ঘুম আসে না।"

এমন সময় টেলিফোন বাজে।

ডাক্তার রিসিভার তুললেন।

"..."

"অ"

"... ... ..."

"অ"

"... ... ..."

"..."

"... ..."

"শুনছি, শুনছি।"

"... ... ..."

"আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। ওই ইঞ্জেকশন আর একটা দাও। কাল সকালে কেমন থাকে জানিয়ো।"

"... ... ..."

"আরে বাবা, আমি কি ভগবান? বাঁচবার হলে এতেই বাঁচবে।"

টেলিফোন নামিয়ে রাখেন। দেখেন, অপেক্ষমান বলির পাঁঠার মতো পেশেন্ট ভদ্রলোক তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে।

জুয়ার আসর ভেঙে গেল। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকাপয়সা বেলবটসের পকেটে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল বেবি। হাত ধরে টেনে দাঁড় করালো মীরাদিকে। মীরাদি ক্রিম রঙের ডিভানের ওপর গিয়ে বসল। উৎপলও দাঁড়িয়েছে। অনেক পরিশ্রম করে তৈরি করা জিনিসটা এবার ধরাবে, এমন সময় বেবি ওর দিকে এগিয়ে এসে হাতদুটো তুলে বলল, "আমায় একটু জড়িয়ে ধরো তো।"

উৎপল কথা শোনে। দাঁড়ানো অবস্থাতেই ওরা অনেকক্ষণ পরস্পরকে আলিঙ্গন করে থাকে। একসময় উৎপল বেবির তুলতুলে মুখটা মুখের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করতেই বেবি বলে ওঠে, "না, এখন ইচ্ছে করছে না। এবার ছেড়ে দাও।"

জয়তীর ফরসা কাঁধের ওপর অতনুর ছড়ানো হাত। ওর কোলের ওপর খোলা ওয়াইল্ড য়ুথ পত্রিকা। যুগ্মভাবে একটা ছবি দেখছে ওরা—দু'পা তুলে দাঁড়ানো একটা ব্রাউন ঘোড়া আর তার পিঠের ওপর বসা রমণীমূর্তি, যার পরনে দৃপ্ত জিনস, যার কোমরবন্ধের ওপরের অংশ সবটা অনাবৃত।

"খুব স্মার্ট ছবিটা।" অতনু বলে।—"রোবস্ট বিউটি।"

ছবিটার বিশেষ এক অংশে আঙুল রেখে জয়তী মন্তব্য করে,—"এইখান থেকে গলগল করে দুধ বেরোচ্ছে, ভাবলে কী ঘেন্না করে না!"

অতনু বলে, "নেচার বড় সেকেলে।"

রেডিয়োগ্রামের ডালা খুলে বেবি ডিস্কটা লাগাতে যাচ্ছে; এমন সময় দুম করে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। এয়ারকন্ডিশনারের মৃদু গুনগুন শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খেয়াল হল, এতক্ষণ চলছিল মেশিনটা।

চুপচাপ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বেবি টের পায়, আর কারুর দু'খানা হাত পেছন থেকে প্রথমে ওর কোমর, তারপর ওর বুক চেপে ধরল। বেবি বাধা দিল না। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে হাত দুটোকে খেলতে দিল খানিকক্ষণ। তারপর একসময় চলে গেল হাতটা।

কেউ কথা বলছে না। থমথমে অন্ধকার ঘরে চুক করে শব্দ হল কোথাও।

তি বলল, "অন্ধকার হল, বেরুবে না?"

চিক্ বলল, "কিন্তু ঘর তো খালি হয়নি। ওরা ভেতরে আছে। এখুনি মোমটোম জ্বালবে। এ রকম অন্ধকার বেশিক্ষণ থাকে না।"

তি বলল, "খুব খিদে পেয়েছে অনেকক্ষণ থেকে। কত খাবার ছড়ানো চারদিকে, একটু বেরুই না, চলো।"

অগত্যা চিক্ বলল, "বেশ, চলো। কিন্তু বেশিদুর যাব না আমরা। কাছাকাছি যা পাব, খেয়ে নেব, হ্যাঁ?"

খাবারের গন্ধ অনুসরণ করে চিক্ আর তি দুটিতে সাবধানে এগোয়। কিছু কিছু খাবার টেবিলটার ওপর রয়েছে এখনও, ওরা টেবিল অবধি গেল না। মেজেয় পড়েছিল স্যান্ডউইজের টুকরো, প্যাটির ভেতরের মাংসকণা, সুস্বাদু পানীয়ের দু'-চারটে ফোঁটা। তাইতেই ওদের উদরপূর্তি হয় আপাতত। বেশি ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না ভেবে ওরা যখন ফিরছে, ফাটল থেকে তখনও খানিক দূরে, আলো জ্বলে উঠল আবার। বেবির খেলাঘর আবার ঝলমল করে উঠল আলোময় আসবাব ও মানুষে। ঠান্ডা মেশিনটা আবার ভুরভুর করে ছড়াতে লাগল আরাম। নেশার আরাম।

মিউজিক কর্নারের পাশে ছোট সোফাটায় বসে ছিল বেবি। আলো জ্বলে উঠতে উঠে দাঁড়াল। একটু টলে গেল যেন। একবার ডিস্কটার দিকে মুখ ফেরাল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে নিল মুখ। পুতুল রাখার জায়গায় একটা কালো লোমওলা কুকুর, কাচের চোখ,—তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কোমরে হাত দিয়ে। প্রচণ্ড চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "টেড, তুমি দেখেছ? দেখেছ, কে আমায় অপমান করল? এদের মধ্যে কে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমার বুকে হাত দিয়েছে, তুমি বলতে পারো, টেড? বলতে পারো?"

জয়তী একবার অতনুর দিকে, একবার রীনার দিকে তাকায়। হতভম্ব। তারপর উৎপলের দিকে তাকায়। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। রীনা একবার অতনুর দিকে, একবার উৎপলের দিকে তাকায়। কিছু

বুঝতে পারে না। ঝিমভাব কেটে গেছে মীরাদির। সে কেবল পাগলি মেয়েটার কাণ্ডকারখানা দেখে ঈষৎ বেদনা-মেশানো কৌতুক অনুভব করে।

টেডকে কোলে নিয়ে বেবি এদিকে এল। প্রথমে অতনুর সামনে দাঁড়াল। টেডকে জিজ্ঞেস করল, "এ?"

তারপর উৎপলের সামনে। টেডকে জিজ্ঞেস করল "এ?"

কোনও উত্তর না-পেয়ে ঘুরে ঘুরে রীনা, জয়তী এবং মীরাদির সামনেও দাঁড়াল। ওদের মুখের ওপর আঙুল রেখে সেই একই প্রশ্ন—"এ?"

তারপর ছুড়ে ফেলে দিল পুতুলটাকে।

ঘটনার আকস্মিকতা কাটলে রীনা কথা বলে উঠল প্রথম।

ঠান্ডা গলায় ধীরে ধীরে বলল, "দেখো বেবি, কী হয়েছে আমি জানি না। তবে, এটুকু বলতে পারি, অতনু এ-কাজ করবে না।"

বেবি হাসতে হাসতে বলে, "তোমার বিশ্বস্ত, একান্ত পুরুষ?"

"বিশ্বস্ত বলে মোটেই নয়। এসব সামান্য ফষ্টিনষ্টি ওকে লুকিয়ে করতে হবে কেন। আমার তো কোনও আপত্তি নেই।"

"আমারও তো সেই কথা", এবার জয়তী বলার চেষ্টা করে, "আমি উৎপলকে বাধা দিই না, দিয়েছি কখনও, বলো? আমার তো বলা আছে, মুখ বদলাবার জন্যে মাঝেমধ্যে তুমি যা খুশি করো, কিছু বলব না। আমারও সে-স্বাধীনতা আছে। তবে, স্টেডি থাকতে হলে আমার সঙ্গে—।"

খানিকক্ষণ আবার থমথমে।

তারপর অতনু নিজে থেকেই বলে ওঠে, "আমার কিছু বলার নেই, বেবি। এ-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুনতেও আমার প্রবৃত্তি নেই।"

মীরাদি এবার উঠে দাঁড়ায়। বেবির হাত ধরে। বলে, "কী ছেলেমানুষি হচ্ছে!"

খিলখিল করে হেসে ওঠে বেবি। ধারালো ছুরির মতো চোখ বার করে হাসে, "ছেলেমানুষি বলছ? একটা জলজ্যান্ত ঘটনাকে উড়িয়ে দিচ্ছ?"

"হ্যাঁ দিচ্ছি। চুপ করে একটু বসো তো। নেশাটা মাথায় চড়ে গেছে হঠাৎ। কী খেয়েছ?"

"ভাং।"

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার হাসে বেবি। আস্তে আস্তে হাসে। শার্টের কলারের কাছে আঙুল নিয়ে খুটখুট করে। তারপরে হঠাৎ চোঁ-শব্দ করে খুলে দেয় সামনের জিপ। শার্টের দুটি অংশ দু'পাশে সরে যায় পরদার মতন, বেরিয়ে আসে ওর নধর, সুন্দর, কচি স্তনদুটি। তাদের শিখরে ফোসকার মতন দুটি বৃন্ত।

"কী আছে এতে, এ্যাঁ?" বেবি কাতর স্বরে জানায়, "তোমাদের এত লোভ কীসের জন্যে?"

এই কথা শুনে উপস্থিত সকলেরই মায়া হয় ওর জন্যে। মনে হয়, সত্যি, কাম-উদ্রেককারী এই অঙ্গবিশেষ বেবির নিষ্পাপ নিরপরাধ শরীরে বৃথাই ফলেছে, শুধু ব্যথা দেবার জন্যে ফলেছে!

চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায় সবাই।

"চললে?" জিজ্ঞেস করে বেবি।

উৎপল বলল, "সকলের হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

রীণা তার সূর্যাস্তের মতো বিশাল কুমকুমের টিপ, লাল-হলুদ বাটিক-মোড়া কৃষ্ণচূড়ার থোকার মতো ঊর্ধ্বাঙ্গ আর জলভ্রমির মতো নাভির পেছন থেকে বেবির উদ্দেশে বলল, "আজকের অপূর্ব সন্ধেটির জন্যে ধন্যবাদ।"

দরোজার ল্যাচ খুলতে যাবে রীনা, বেবি বলে উঠল, "দাঁড়াও।" তারপর তার বেলবট্সের দু'পকেট থেকে দোমড়ানো নোটগুলো মুঠো করে ছুড়ে ফেলতে লাগল।

"নিয়ে যাও। এগুলোও নিয়ে যাও। যদিও জিতে নিয়েছিলাম এইসব টাকা, দাম হিসেবে নিইনি। তবু, নিয়ে যাও। আমার চাই না।"

টাকাগুলো যখন মেঝেতে ছড়াচ্ছে বেবি, ঠিক নীচের ঘরে তখন দীপংকর সরকার, কার্ডিওলজিস্ট, বাঁ দিকের ড্রয়ার থেকে নোটগুলো বার করে গুনছিলেন। পেশেন্টরা সব চলে গেছে আশ্বস্ত হয়ে। এখন উনি একা।

গুনছিলেন আর আলাদা করে সাজিয়ে রাখছিলেন। রসিদ দেওয়া হয়েছে সাতজনকে। পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশ—তিনশো পঞ্চাশ টাকা, তার ওপর আরও একশো টাকা যোগ করে, মোট চারশো পঞ্চাশ টাকা সরিয়ে রাখলেন। সোমবার ব্যাংকে জমা পড়বে। বাকি টাকা ভাঁজ করে জামার পকেটে নিলেন। ওপরতলার মেজেয় প্রচুর টাকা গড়াগড়ি যাচ্ছে, দীপংকর টের পাননি অবশ্য।

সবাই চলে গেলেও মীরাদি থেকে যায়।

দরোজা বন্ধ করে বেবির কাছে এসে বসে। ওর জামার চেনটা তুলে দেয়। তারপর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বড় সোফায় বসায় ওকে। ছড়ানো টাকাগুলো কুড়িয়ে তুলে রাখে। টেড কুকুরটা ডিভানের নীচে ঢুকে গিয়েছিল, বার করে আনে। রেখে দেয় র‍্যাকে।

বেবির পাশটিতে এসে বসে মীরাদি।

বলে, "কী কাণ্ড করলে বলো তো।"

বেবি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, "আই হেইট মেন। দে আর ফিল্‌থি।"

বেবির মুখখানা দু'হাতে ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে আনে মীরাদি, বলে, "আমি তোমায় কত ভালবাসি, তুমি বোঝো না?"

তারপর রাগে ও অভিমানে ফোলা ওর নীচের ঠোঁট মুখের মধ্যে নিয়ে গভীর চুমো খায় মীরাদি। বেবি চোখ বোজে।

একটু পরে বেবি যেন ঘুমের মধ্যে থেকে অনুরোধ জানায়, "মীরাদি, আমায় খুলে দাও, একটু আদর করো। খুব কান্না পাচ্ছে।"

বেবি ঘুমিয়ে পড়লে পর মীরাদি আলো নিবিয়ে দেয় ঘরের। ওর নীরোম শরীরের ওপর চাদর ঢেকে দেয়। দরোজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে আসে খেলাঘর থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে দু'-এক পা নেমেছে, নীচে দীপংকরের জুতোর শব্দ পেল। উঠছেন।

মুখোমুখি হতে দীপংকর জিজ্ঞেস করলেন, "চললে?"

"হ্যাঁ। রাত হল।"

"মামণি?"

"ঘুমোচ্ছে।"

কী ভাবলেন দীপংকর। হাই তুললেন। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে।

বললেন, "বারোটার আগে তো আমার ঘুম আসবে না। থেকে যাও না। খুব অসুবিধে হবে?"

মীরাদি তার সাফারি-ঢাকা নীল পোশাকটার আড়ালে মৃত বা অচেতন মেয়েমানুষটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করল। উত্তর দিল না।

দীপংকর বললেন, "কিছুক্ষণ বকবক করতাম আর কী।"

মীরাদি রাজি হয়। ওর মনটা খুশি আছে। বেবি আমার, একা আমার, জোর করে এ-কথা তো বলতে পারবে না কোনওদিন। তবে, এ-ও ঠিক, অন্য কেউ হাত বাড়ালে ও ছিনিয়ে আনবে। মনটা খুশি কারণ বেবি আজ মীরাদিকে সন্দেহ করেনি। আশেপাশে কেউ নেই। পকেট থেকে চাবির রিং বার করে বলল, "কাউকে ডাকো, গাড়িটা তুলে দিক।"

অন্ধকার খেলাঘরের মধ্যে ততক্ষণে দুটি আরশোলা—চিক্ আর তি—তাদের বিবাহবাসর খুব সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপন করছে। এয়ারকন্ডিশনারের চারপাশের ফাটল থেকে বেরিয়ে পড়েছে কয়েকজন ধাড়ি ও বিপুল সংখ্যক ছানাপোনা। সোফার পিছনের পাড়া থেকে আরও কয়েকজন ধাড়ি ও অজস্র ছানাপোনা। মিউজিক কর্নারের পিছন থেকে আরও। পুতুলের র‍্যাক থেকে আরও।

বাচ্চারা ছুটোছুটি করে খেলা করছে ঘরময়। প্রচুর খাদ্যদ্রব্য রাখা—একরাত্রে ওরা শেষ করতে পারবে না। প্রয়োজন নেই, তবু ধাড়িরা কিছুটা সাবধানে খোরাফেরা করছে ইতস্তত। নতুন দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

একসময় চিক্‌কে একটু নিভৃতে পেয়ে তি তার গোমেদ রঙের মুখটা তুলে বলল, 'এই শোনো, ওদের মতো আমাদেরও অনেক ছেলেপুলে হবে তো?'

১৯৭৪

❋ তনুকার আমি

শ্বশুরবাড়ির সব কিছুই কি মানুষের মনের মতন হয়? হয় না। একটা নতুন জায়গা। অন্য একটা সংসার, অন্য রকম লোকজন। বাইরে থেকে আসা মেয়েটিকে প্রথম প্রথম যদি তারা, তাদের কেউ, সন্দেহের চোখে দেখে, তবে দোষ দেওয়া যায় না। বাড়ির ছেলেটির হাত ধরে তো ঢুকলে লজ্জায় জড়োসড়ো একটা রেশমের বস্তা, ক্রমশ তোমার পরিচয় মিলবে। তোমার ব্যবহার পছন্দ হলে, আমাদের ভালবাসার জানলাগুলো খুলে দেব—এই রকম একটা ভাব।

শয্যাশায়ী একটি শাশুড়ি। সবচেয়ে ভাল ঘরখানা জুড়ে তাঁর গদিওলা জোড়াখাট শ্বশুরের আমলের। ঘরের দু'-দু'খানা বড় জানলা দিয়ে হু-হু করে বাতাস আসে, তবু তাঁর শ্বাসের কষ্ট। কোমরে বাত। কর্তা বেঁচে থাকতেই এইসব উপসর্গ ছিল, মারা যাওয়ার পর বেড়েছে। সারারাত বসে কাটান, দিনেরবেলা এপাশ-ওপাশ করেন। মোটা গদিওলা খাটে বুড়ির শরীরের হাড়গুলো চিতার আগুনের জন্য টাটায়।

চন্দন বলে, "এইভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। এ-অসুখ তো সারার নয়।"

তনুকা বলে, "তা কেন। মা আছেন, আমাদের কতখানি ভরসা।"

ওপরের দু'ভাই চঞ্চল আর চন্দন। বিবাহিত। সিঁড়ির ওপাশটায় পাশাপাশি ওদের দু'খানা ঘর। নীচের দু'ভাই অম্বর আর অর্জন এখনও আইবুড়ো, তাই শাশুড়ির পাশের ঘরটায় একসঙ্গে থাকে। মাঝখানে একটি বোন, তার বিয়ে হয়ে গেছে কবে। কলকাতায় এলে মায়ের ঘরে ওর আস্তানা। তনুকার ছোড়দি।

এদের সবাইকেই ক্রমে ক্রমে ভালবেসে ফেলেছে তনুকা। একসঙ্গে থাকতে থাকতে ভাল না-বেসে পারা যায় নাকি? এমনকী, বড়দিকেও। মানে, চঞ্চলের বউ মিতালি। ফরসা, ঢিপসি মোটা। গোলপানা মুখ। এত বড় বড় মাই। কালীঘাটের পটের মতো দেখতে। সাত বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও সিঁথি জুড়ে লম্বা সিঁদুর পরে, কপালে বিশাল টিপ। প্রতি শনিবার যত্ন করে আলতা পরে পায়ে। এমন গ্রাম্য স্বভাব বড়দির। ওদের তিন বছরের ফুটফুটে মেয়ে মুন্নি—মেয়ে তো নয়, একটা খরগোশ—ইভা নাগের মতো ঠান্ডা গলায় সারাক্ষণ মুন্নিকে বকে বড়দি। এত বড় সংসারে ওই একটা বাচ্চা, সারাদিন এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়ানো ওর কাজ। বড়দির নালিশ, সকলের আদরে ও নাকি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মানুষ হচ্ছে না। তনুকার হাসি পায়, মানুষ হবার বয়েস কি ওর পার হয়ে গেছে!

অথচ ভোর হতে-না-হতে নিজেরাই ওরা মেয়েকে ঘর থেকে বার করে দেয়। "যা, কাকিমার কাছে যা।"

দু'জনে লেপের নীচে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে, গেঞ্জি-পরা চন্দনের বুকের মধ্যে তনুকার মুখ, গরম গরম শ্বাস ফেলছে এ-ওর শরীরের ওপর, কি মুখে মুখ লাগিয়ে পড়ে আছে আবেশে অবশ হয়ে, এমন সময় দরোজায় খটখট শব্দ। "কাকিমা, আমি এসে গেছি।"

"তো রাজা করেছ।" চন্দন বিরক্ত হয়ে বলে, "এসব বউদির কারসাজি। নিজেরা এখন মজা লুটবেন।"

তনুকা কিন্তু বিরক্ত হয় না। এই সময় বাচ্চা মেয়ে মুন্নিকে ঘাঁটতে ওর ভালই লাগে।

ঘুমচোখে দরোজার ছিটকিনি খুলে বলে, "আয়। উঃ, কী শীত। পায়ে মোজা নেই কেন?"

"এই তো মোজা," মুঠো-করা বাঁ হাতখানা তুলে দেখায় মুন্নি, "তুমি পরিয়ে দেবে।"

ওকে কোলে করে তুলে আনে বিছানায়। একপাশটিতে শোয়াতে গেলে ও শোবে না। চন্দন আর তনুকার মাঝখানেই ওর শোয়া চাই। এমন পাজি, কাউকে আদরের ভাগ দেবে না ও।

"ওই জন্যেই তাড়িয়ে দেয় ওরা।" ওপাশ ফিরে শুতে গিয়ে গজগজ করে চন্দন।

নিজের মনে হাসে তনুকা।

মুন্নির সন্দেশের মতো ছোট ছোট পায়ে মোজা পরাতে পরাতে বলে, "তুই ভারী দুষ্টু।"

মুন্নি বলে, "তুমি দুষ্টু।"

তনুকা বলে, "ওই দ্যাখ, কাকা রাগ করেছে। বল্ কাকা, আমি ছোট আমাকে হিংসে করতে নেই।"

"কাকা, আমি ছোট আমাকে হিংসে করতে নেই।"

"বল, কাকিমা রাত্তিরে তোমার, ভোরবেলা আমার। কেমন?"

"কাকিমা রাত্তিরে তোমার, ভোরবেলা আমার।"

"বল, কাকিমাকে একটা বেবি কিনে দাও, তা হলে আমি আর আসব না।"

"কাকিমাকে একটা বেবি কিনে দাও", বলেই একটু থমকায় মুন্নি, তারপর বলে, "তা হলেও আমি আসব।"

পাকা বুড়ি!

এবার আর চন্দন না হেসে থাকতে পারে না। এপাশ ফিরে তাকায় মুন্নির দিকে, বউয়ের দিকে। তারপর দুটো লম্বা লোমওলা হাত বাড়িয়ে "তবে রে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি", বলতে বলতে দু'জনকেই কাতুকুতু দেয়। খুব কাতুকুতু দেয়। হাসির হুল্লোড়ে পালিয়ে যায় ঘুম।

দেওর দু'জন এমনিতে নিজের মনে থাকে। একজন নতুন চাকরিতে ঢুকেছে, অম্বর। অর্জন যাদবপুরে পড়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং। ওদের আড্ডা নীচের তলায়। সেখানে বসার ঘর। ঘরের একপাশে তিন ঠ্যাঙের ওপর বসানো প্রকাণ্ড টিভি সেট। টিভি-র নীচে গণেশের বাহন ইঁদুরের মতো একটা স্টেবিলাইজার। উলটোদিকের দেয়ালে স্টিরিয়োর দুটো কান। হইহই আর শব্দ ছাড়া ওরা বাঁচে না। আর তার সঙ্গে চা।

সকাল নেই, বিকেল নেই, কথায় কথায় হাঁক ওঠে, "লক্ষ্মীকান্ত! চা।"

পুরনো ঠাকুর এই লক্ষ্মীকান্ত দুই ভাইকে ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে উঠতে দেখেছে। খেপে খেপে সে চা জুগিয়ে যায়। অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে শাসায়, "এবার কিন্তু মা বকবেন।"

সেই সময় হয়তো ওদের একজনের খেয়াল চাপল, কফি। অমনি ডাক পড়ল, "বউদি, বউদি।"

"কী হল?" সাড়া দেয় তনুকা। ও হাসে, এ-ডাক ওকেই। দেওররা বড়দিকে বিরক্ত করে না। কী দরকার। ও হয়তো ঘরে টুকটাক কাজ করছে, নয়তো মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত। ঝাড়া হাত-পা তো এইজন্যই। তা ছাড়া তনুকার সঙ্গে মেজাজে ওদের মেলে বেশি।

"একটু কফি খাওয়াবে?"

তনুকা হয়তো বলল, "দুধ নেই।"

"কালোই হোক। শয়তানের মতো কালো—"

"আর নরকের মতো উত্তপ্ত—"

"পাপের মতো মধুর।"

কপট রাগে তনুকা তখন বলবে, "নরকই বটে! সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরটাকে কী করে রেখেছ তোমরা। জানলা খুলে দাও। শব্দ কমাও।"

কিন্তু কফিটা তৈরি করে দেবে যত্ন করে।

লোকে বলবে, মজে আছে। এই সংসারের পানাপুকুরে মজে আছে তনুকা। নিজের অস্তিত্ব বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই ওর' বলুক।

শ্বশুরকে ও দেখেনি শ্বশুরের ছবি দেখেছে। শৌখিন গোঁফ, টেরি-কাটা বাবরি চুল। কাঁধের কাছে পাঞ্জাবির বোতাম। চোখদুটি ভাবুকের মতো। শ্বশুরের কাছে ও কৃতজ্ঞ এই বাড়ির বাথরুমটার জন্য। যেটা ওদের শোবার ঘর, ঠিক তার নীচের ঘরটা, একই মাপের, ওই হল বাথরুম। শুধু স্নানের জন্য এত বড় একটা ঘর আজকাল কেউ করে না। তাতে গিজার, শাওয়ার, বাথটাব অবধি আছে। জানলার ওপরে সাদা ও রঙিন কাচ। একপাশে প্রকাণ্ড আয়না, শুকনো কাপড় পরার জায়গা। মার্বেল পাথরের কালো মেজে।

ওই বাথরুমটা তনুকার হারিয়ে যাবার জায়গা। সকলে যে-যার কাজে চলে গেলে পর ও বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দেয়। তারপর দেড়ঘণ্টা ধরে কী যে ও করে সে কেবল তনুকা জানে আর ভগবান জানেন। ঘরের তিনকোণে তিনটি আকর্ষণ—বাথটাব, গিজার আর মানুষ-প্রমাণ আয়না, এর মধ্যে, হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব, তনুকার মতো একজন মানুষকে ছেড়ে দিলে সে

হারিয়ে যাবেই। ও যেন একান্ত এক রাজহাঁস, একটু ধূসর, ঠোঁটসুদ্ধ মাথাটাকে নিজের পালকের মধ্যে সেঁধিয়ে দিয়ে চুপ করে ভেসে থাকতে চায়। অনেকক্ষণ।

তনুকা বেশ লম্বা। একটু রোগা কিন্তু সুন্দর। দীর্ঘ ওর গ্রীবাটি, তাই রাজহাঁসের তুলনা।

হঠাৎ শিকারির দেখা পেলে ভীত বিব্রত রাজহাঁস যেমন অওং অওং শব্দ করতে করতে ডানা মেলে উঠে পড়ে আকাশে, তির্যক রেখায় চিরে দেয় আকাশ, সেদিন দুপুরে তনুকা সেই রকম ভাবে বাথরুম থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। বুকের ওপর পেটিকোট ধরা।

"কে? কে? কে ওখানে?"

"কোথায় কে? কার কথা বলছেন বউদি?" বুড়ো লক্ষ্মীকান্ত বেরিয়ে আসে রান্নাঘর থেকে।

"ওই জানলার কাচে একটা মুখ। আমি স্পষ্ট দেখেছি। আমি তাকাতেই সরে গেল।" বলতে বলতে তনুকার গলার কাছটা কাঁপছিল।

এই নিয়ে সারাবাড়িতে হইচই।

কথাটা শাশুড়ির কানে যেতে তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন, "কে আবার বাথরুমে উঁকি মারবে বউমা? ও তোমার চোখের ভুল।"

"ভুল নয় মা, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

অম্বর আপিশে যায়নি সেদিন। তাই সে-ও শুনল তনুকা বলছে, "ছিঃ ছিঃ! কী অসভ্য, নোংরা হতে পারে মানুষের মন!"

কলেজের ভাত খেতে খেতে অর্জন শুনল। মুখ ভার করে বেরিয়ে গেল সে। দুপুরে খেতে এসে চন্দনও শুনল, কে যেন তনুকার স্নান করার সময় বাথরুমে উঁকি দিয়েছে আজ। ছোটলোক। এ-বাড়িতে এ রকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। চেপে যাও, এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ো না, বলতে গিয়েও স্ত্রীর রুদ্রমূর্তি দেখে চুপ করে গেল চন্দন।

সারাদিন গজগজ করে সন্ধের দিকে থামল তনুকা। টিভি-তে সেদিন বাংলা ছবির দিন।

এসব তুচ্ছ ঘটনা কেউ মনে রাখে না। একটা রবিবারে সব ফাঁক জোড়া লেগে যায়।

কেবল ভুলতে পারে না চন্দন। কালপ্রিট চন্দনের মনের মধ্যে দৃশ্যটা লেগে থাকে। তনুকার উলঙ্গ শরীরের ওপর নীল-সবুজ কাচের আলো পড়েছে। একটা পা সামনের দিকে বাড়িয়ে দাঁড়ানো, উলঙ্গ এবং বাঁকা পিঠের ওপর চুলের ঝাড় ছড়িয়ে পড়েছে। হাতদুটো মুখখানাকে ধরে রয়েছে ফুলদানির মতো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছে তনুকা। না, দাঁড়িয়ে না, একটু একটু নাচছে যেন। স্তনদুটো দুলে দুলে উঠছে, ওই তো। কী সুন্দর, রাজহাঁসের মতো বাঁকা ওর গলার কাছটা, লহরিত ওর সমস্ত শরীর। স্বামী হয়েও চারকোনা জগতের মানুষ চন্দন স্ত্রীর এই রূপ কোনওদিন প্রত্যক্ষ করেনি।

একদিন রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে ওদের ঘনিষ্ঠতা হল। উলটুল লেপ আর বালিশের স্তূপের ওপর চিত হয়ে শুয়ে ক্লান্ত অভিযাত্রীর মতো হাঁপাচ্ছে দু'জন। চন্দনের লোমওলা বাঁহাতটা তনুকার পেটের ওপর দিয়ে গিয়ে ওর যোনিটাকে মুঠো করে ধরে আছে। মুঠোটা আলগা। মশারির চালির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলে যায় চন্দন। বাথরুমের সেই ঘটনার কথা।

"মনে হল, তুমি না, আমি কোনও ছবি দেখছি। পেইন্টিং।"

"ও তুমি।" তনুকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে যায়। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর চন্দনের হাতখানা সরিয়ে দিতে দিতে বলে, "আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সবই তো তোমার চেনা। তাই না? এই ঠোঁট, নাক, কপাল, এই বুক, কোমর, এই আমার পাদুটো—এদের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা কম হয়নি। এই আমার শরীর। বিছানার এই আমি, শোবার ঘরের আমি তোমার বউ। কিন্তু বাথরুমের আমিটা আলাদা মানুষ। একলা। কেউ তাকে চেনে না। কারুর সঙ্গে তার ভাব নেই।"

চন্দন বলে—"সেদিন উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়ে তাই মনে হল।"

তনুকা বলে—"সেদিন তুমি তাকে অপমান করেছ।"

১৯৮৪

❋ তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক

উনুনের ধোঁয়ার গন্ধ নাকে আসতেই চোখ খুলে তাকায় মাধব। সময় হয়েছে তা হলে। নাকি আর একটুক্ষণ অপেক্ষা করা দরকার? কী ভেবে ঘাড়টা বাঁ দিকে বেঁকিয়ে কানদুটো খাড়া করে দেয়। না, সেই পরিচিত শব্দটা এখনও শোনা যাচ্ছে না। সুতরাং সামনে ছড়ানো পাদুটোর ওপর হলুদ রঙের মুখখানা পেতে চোখ বুজে ঝিমোবার চেষ্টা করে। ঘুম আসে না। পিঠের ওপর লেজের গোড়ার কাছে একটা বদখত জায়গায় কুটকুট করছে। ওখানে ঘা আছে একটা। মাছি বসছে তার মানে।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে সহ্য করল মাধব। আলস্য। তা ছাড়া, মাছি তাড়াবার চেষ্টায় খিঁচিয়ে উঠলেই ঘুমটা যাবে ভেঙে। লেজ নেড়ে, লেজ ঝাপটে যতটা সম্ভব প্রতিকাব করার চেষ্টা করল।

মানুষদের বাড়ির সিঁড়িতে শুয়ে আছে ও। তিনধাপ সিঁড়ি রাস্তা থেকে উঠেছে বাড়ির সদর দরোজায়। সবচেয়ে ওপরেরটা, যেটা দরোজার চৌকাঠের সঙ্গে লাগানো, অন্য সিঁড়িগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত চওড়া, সেইটাই ওর পছন্দ। যেভাবে খুশি শোওয়া যায় ওখানটায়। অন্তত, যতক্ষণ না বাড়ির লোকজন জাগছে, যতক্ষণ না মানুষদের ঝি খালি দুধের বোতল টুং টুং করতে করতে বেরোচ্ছে ওই দরোজা দিয়ে।

তখন মাধবকে উঠতেই হবে। না হলে ওই ঝি-মানুষটা চেঁচাবে, "যাঃ যাঃ, দূর হ এখান থেকে। যত আপদ এখানে জোটে।"

মাধব যদি খানিকটা সরে শোয় কিংবা বেরোবার মতো জায়গা ছেড়ে দিয়ে সিঁড়ির একপাশে সামনের পাদুটো সোজা করে বসে, আদর কাড়বার জন্যে লেজ নাড়ে ঘন ঘন, তা হলেও ঝি-মানুষটার গালিগালাজ থেকে নিষ্কৃতি নেই।

ধোঁয়ার গন্ধ কমে আসে ক্রমশ। মাধব উঠে বসে এবার। চেয়ে দেখে, পারুল রাস্তার মুখটায় ছাইগাদার ওপব শুয়ে ঘুমোচ্ছে তখনও। এই পাশ ফিরেই ঘুমোচ্ছে বলে মাধব ওর সাদায়-কালোয় মেশানো ছোট্ট মুখটা, বেরিয়ে থাকা দু'জোড়া পা আর সেই দু'জোড়া পায়ের মাঝখানে পারুলের সাদা পেট, সারি সারি সাজানো দুধের গুটি দেখতে পায়। শ্বাস-প্রশ্বাসে নড়ছে। এখন শীত নেই, তবু ভোরের দিকে কেমন ছমছম করে। ছাইগাদায় শুয়ে তাই পারুল আরাম পায়।

হাই তুলল মাধব। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ওর প্রকাণ্ড লম্বা জিভ দিয়ে চেটে চেটে পরিষ্কার করল। মাথার পেছনটায় এঁটুলির বাসা, চুলকোচ্ছে, পায়ের নখ দিয়ে খুঁচিয়ে দু'-একটাকে গা-ছাড়া করতে পেরে স্বস্তি পেল। পিঠের যেখানটায় ঘা, সেখানে চেটে চেটে তুলে ফেলল সব ময়লা। ঘা-টা সেরে এসেছে প্রায়। আবার একটা চোট যদি না লাগে, তবে ওখানে লোম গজাবে শিগ্‌গির।

মাধবকে কুকুর সমাজের নেতা বললে ভুল বলা হবে। একটা সামান্য অঞ্চলে ও কর্তৃত্ব করে। পর পর দুটো সমান্তরাল পিচের রাস্তা, মাঝখানে মানুষদের আস্তানা, তারপর রেলিং-ঘেরা একটা পার্ক—ওই অবধি ওর সীমানা। ওর ওপারে অন্যদের রাজত্ব। মাধবের নিজের আয়ত্তে আছে একটা মাংসের দোকান, দুটো চায়ের স্টল, একটা ভাতের হোটেল। আট-ন'টা ছোট আবর্জনাস্তূপ, যেগুলো মাঝে মাঝে সাফ হয়ে যায়। ঘুরে বেড়ানো আর শোওয়া-বসার জন্যে অপর্যাপ্ত খোলা জায়গা, পথ, ফুটপাথ, গলিঘুঁজি আর আড়াল।

মাধব হয়তো জানে না, আদিম নেকড়ে বাঘ থেকে কুকুরের উৎপত্তি। এই দুই প্রাণীর স্বভাব চরিত্রে ঢের মিল রয়েছে। আকারে তো আছেই। নেকড়ে বংশে উদ্ভূত হয়েও একসময় ওরা অরণ্যবাস পরিত্যাগ করে। মানুষ-সমাজের কাছাকাছি চলে আসে খাদ্যের আর নিরাপত্তার খোঁজে। মানুষের সঙ্গে মিশে ওরা স্বভাবচ্যুত হয়েছে ক্রমে ক্রমে। পোষ মেনেছে মানুষের। শিকার করা ভুলে গিয়ে শিখেছে মানুষের কাছে ভিক্ষে করা। মানুষের দাসত্ব করা।

মাধব জানে না যে, বনমানুষের থেকে হঠাৎ আলাদা হয়ে না গেলে প্রায়-মানুষ এবং তারপর আসল মানুষ আজ সগর্বে দু'পায়ে হেঁটে চলে বেড়াত না। ওদের গায়ে আর সব প্রাণীর মতো লোম থাকত। দু'পায়ে হাঁটতে শিখে ওদের বুদ্ধি খুলে গেছে। অন্য সব প্রাণীকে বশীভূত করে নিজেদের কাজে লাগায় ওরা। ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে তার পিঠে চড়ে, তাকে দিয়ে গাড়ি টানায়। গোরু-মোষকে পোষ মানিয়ে

ওদের দুধ টেনে নেয়, ওদের মাংস খায়। ওদের চামড়া দিয়ে জুতো বানায়। যাদের পোষ মানাতে পারেনি, তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এই মানুষেরাই। ওরা দেখতে কেমন সভ্যভব্য, শান্তশিষ্ট, কিন্তু আসলে সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী ওরা। জানে না মাধব ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ, কিন্তু কিছু কিছু বুঝতে হয়তো পারে। তবে প্রতিবাদ করার সাধ্য ওদের নেই। কুকুরেরা ক্রমশ ইতর হয়ে গেছে মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে। বেড়ালের চেয়েও ইতর। আত্মবিস্মৃত এক প্রাণীসমাজ এইসব কুকুরের দল।

উঠে দাঁড়িয়ে এবার মাধব আড়মোড়া ভাঙে। তারপর একলাফে সিঁড়ি থেকে নেমে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। ওর সহচরী পারুলের দিকে একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকায়, কিন্তু তার কাছে যায় না। জাগায় না তাকে। পারুল কিন্তু চোখ পিটপিট করে দেখেছে, মাধবের হলুদ রঙের শরীরটা, না, শরীরের ছায়াটা, দুলকি চালে হাঁটতে হাঁটতে ডান দিকে ঘুরে গেল। অমনি সে ধড়মড় করে উঠে, কোনওক্রমে গা ঝেড়ে, ওদিকে ছুট দেয়। এখন কোনও ধোঁয়ার না, দুধ জ্বাল দেবার তীব্র মিষ্টি গন্ধ ওর নাকে এসে লাগছে।

এরপর মাধব আর পারুলকে দেখা গেল চায়ের দোকানের সামনে। ফুটপাথের ওপর একটা আধমরা তেঁতুলগাছ। তেঁতুলগাছের গোড়া সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। বাঁধানো জায়গাটায় রাখা আছে তিনটে কাচের বয়াম, এক মাপের, বয়ামের ভেতর থরে থরে সাজানো বিস্কুট আর কেক। একটা ডেকচি-ভরতি দুধ আর খানকয়েক ছোট ছোট কাচের গেলাস। পাশে উনুন জ্বলছে, উনুনের ওপর ছোট-বড় দুটো কেটলিতে জল ফুটছে। ফুটপাথের ওপর কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে, আর চা খাচ্ছে। উননের ওদিকটায় একজন বসা-মানুষ অনবরত চা ঢেলে যাচ্ছে গেলাসে গেলাসে। মাধব আর পারুল এইসব মানুষদের কণ্ঠস্বর চেনে যদিও ওদের ভাষা বোঝে না। এদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গায়ের গন্ধ শোঁকে। মানুষেরা অনেকেই ওদের বন্ধু নয়।

ঠিক জায়গাটিতে এসে ওরা দু'জন থেমে গেল। পরনে লুঙ্গি, গায়ে চাদর, আর পায়ে টায়ারের চটি-পরা লোকটির সামনে বসে পড়ল, আর লেজ নাড়তে লাগল ঘন ঘন।

লোকটি ক্যাঁৎ করে এক লাথি মারল পারুলকে।

কেঁউ শব্দে চেঁচিয়ে উঠল পারুল। চট করে সরে গেল দূরে। মাধব বসেই রইল, কিন্তু মুখটা তুলে লোকটিকে চেনবার চেষ্টা করল একবার। না, ভুল হয়নি। এ তো সেই জন, যে বিস্কুট ছুড়ে দেয় ওদের। একটু দূর থেকে পারুলও লোকটিকে লক্ষ করছে এবং লাথি মারলেও লোকটি আসলে বন্ধুভাবাপন্ন ভেবে পুনরায় লেজ নাড়তে শুরু করেছে।

লোকটি খ্যাক খ্যাক করে কাসল না হাসল, ওরা দু'জনের কেউ বুঝতে পারে না। রাগের স্বরে কতকগুলো কথা বলল। তার মানে অন্য কোনও কারণে ওর মেজাজ খারাপ। রেগে রয়েছে। পারুলকে লাথি মেরে সেই চাপা রাগ বা বিরক্তি ঝেড়েছে ও। আসলে ও মানুষ খারাপ না। দয়ালু।

হঠাৎ টপ করে এক টুকরো নোনতা বিস্কুট পারুলের গায়ের ওপর এসে পড়ে। লোকটি, যার নাম দাসু, ঢিল ছোড়ার মতো করে বিস্কুট ছুড়ে মারল। বিস্কুটের টুকরো মুখের মধ্যে পুরে এবার পারুল সাহস পায়। লাথির কথা একদম ভুলে যায়। দাসুর কাছে লেজ-নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসে।

মাধব বসে বসে দেখছে সব। দাসু আবার পারুলকে বিস্কুট দিল। মাধবকে দিল না। পারুল খায়, আর লেজ নাড়ে কৃতজ্ঞতায়। লম্বা জিভ বার করে নিজের মুখ চাটে। এখন সরাসরি পারুলের সঙ্গে দাসুর সম্পর্ক। দাসু বিস্কুট দিয়ে যাচ্ছে, আর পারুল খেয়ে যাচ্ছে। পারুলের একবারও মনে হচ্ছে না যে, এ রকম হওয়ার কথা নয়। অন্যান্য দিন এই সময়ে ওদের দু'জনকেই ফেরাফেরি করে বিস্কুট খাওয়ায় দাসু। মাধব প্রথমে অবাক হয়। তারপর লেজ-নাড়ানো থামিয়ে গরগর করতে থাকে। একসময় এ-অবিচার সহ্য করতে না পেরে, দাসুর দিকে না, পারুলের দিকে মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে যায়। ফুটপাথের ওপর সদ্য-পড়া এক টুকরো কেক পারুলের কাছ থেকে কেড়ে খেতে গিয়ে এবার মাধব একখানা লাথি খেল।

লাথি ঝাড়ার পর এমন এক কড়া ধাতানি দিল দাসু যে, মাধবের আর বুঝতে বাকি রইল না, দিনটা খারাপ। আজ এখানে কিছু পাবার সম্ভাবনা নেই। বুঝে ফেলে মাধব আর দাঁড়ায় না। দুলকি চালে হাঁটা দেয় বড় রাস্তা থেকে ভেতরের রাস্তার দিকে। পারুল অভুক্ত না হলেও মাধবকে অনুসরণ করে। ওরা স্থানত্যাগ করলে পর আড়াল থেকে বেরিয়ে বুড়ো ত্রিলোচন দাসুর টায়ার-কাটা চটি থেকে একটু তফাতে এসে দাঁড়ায়। ভাবটা, ও কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। দাসুর কাছে ওর কিছুই প্রার্থনা করার নেই। না না, আজকাল তেমন খিদে আর পায় কই।

একসময় কুচকুচে কালো ছিল ত্রিলোচন, শুধু কপালের কাছে একটা সাদা দাগ। বেশ লোম ছিল ওর লেজে এবং লেজটা প্রায় মাটি অবধি ঝুলত। তার মানে, উঁচু বংশের রক্ত আছে ওর শরীরে। বাপ-মা'দের কেউ না, দিদিমা অথবা ঠাকুমা কিংবা আরও পূর্বপুরুষ কেউ অ্যালসেশিয়ান বংশের রাজপুরুষের সংসর্গে আসবার সুযোগ পেয়েছিল। তাই ত্রিলোচনের চরিত্র অন্যদের চেয়ে আলাদা, ওর দীনতা কম, ওর আভিজাত্যবোধ গোছের একটা গাম্ভীর্য আছে। সেই অ্যালসেশিয়ান বংশের রাজপুরুষ মানুষ-রচিত স্বাতন্ত্র্য ও নিরাপত্তার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবৃত্তির কোন দুর্নিবার তাড়নায় যে সাধারণ একজন কুকুরির সঙ্গে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও মিলিত হয়েছিলেন, তা আর জানার কোনও উপায় নেই, তবে তার ফলে যে, উক্ত বংশের প্রভাব খানিকটা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন, ত্রিলোচনকে দেখে তা বোঝা যায়।

সবটা আর বোঝা যায় না এখন। কপালের সাদা দাগটা তৃতীয় নেত্র হয়ে এখনও আছে, কিন্তু বাকি দুটি চোখের একটি নষ্ট। কালো কুচকুচে লোম মাথা ও পিঠের ওপর থেকে প্রায় ঝরে গেছে। গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ছাই রঙের খরখরে চামড়া, কিছু ঘা। বুড়ো হলে কী হবে, ত্রিলোচনের চারটি পা-ই এখনও পর্যন্ত অক্ষত। শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ। মানুষের প্রতি ঘৃণা ও গোপনে লালন করে, কিন্তু ওর আচরণে তা প্রকাশ পায় না।

সে আজ বছর পাঁচেক আগের কথা। তখন ত্রিলোচন যুবক।

পাড়ার পশ্চিম দিকে ভাতের হোটেলের গায়ে মানুষদের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। বাড়িটার সামনে ছিল বালি আর পাথরকুচির দুটি স্তূপ। সেদিন দুপুরে হোটেলের উচ্ছিষ্ট ভাত, তরিতরকারি আর হাড়গোড় খানিকটা খেয়ে ওই বালির স্তূপে শুয়ে বিশ্রাম করছিল ত্রিলোচন। সামনের পা দুটির ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়েই পড়েছিল বলতে গেলে। এমন সময় পরিচিত এক তীব্র সুগন্ধ ওর নাকে আসে। অতি উত্তেজক সে-গন্ধ। ত্রিলোচন বুঝতে পারে কাছাকাছি কোথাও এক যুবতীর দেহে কামনার উদ্রেক হয়েছে। সে অস্থির হয়ে ওঠে। ঘ্রাণের সূত্র অনুসরণ করে সে নির্মীয়মাণ বাড়িটির মধ্যে ঢুকে যায়। ঢের ইট, পাথর, লোহার গরাদ আর বালির স্তূপ পার হয়ে পৌঁছে যায় বাড়িটার পেছনে। এবং যাকে খুঁজছিল, দেখতে পায় তাকে। একটি ধবধবে সাদা রঙের কুকুরি। গলায় বকলশ আঁটা। বকলশটা লোহার চেন দিয়ে একটা থামের সঙ্গে বাঁধা। জায়গাটা স্যাঁতসেতে ঠান্ডা এবং ছায়াচ্ছন্ন।

মেয়েটি ত্রিলোচনকে আহ্বান করেছিল। ত্রিলোচন কাছে যেতে অনেকবার ওর মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চেটে ওর স্নেহ জানিয়েছিল। খেলা করতে করতে ছুটে ছুটে পালাচ্ছিল চেনবাঁধা অবস্থাতেই—মেয়েরা যে রকম পালাবার ভান করে—কিন্তু ত্রিলোচন সঙ্গমের জন্যে উদ্যত হতেই, সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। স্বভাবত, ত্রিলোচনের লক্ষ তখন একদিকে। পৃথিবীর আর কোথায় কী ঘটছে, কে বেঁচে আছে কে মরে গেল, কোথায় বেধে গেল দুই দল কুকুরের মধ্যে লড়াই, কিছুতেই ওর ভ্রূক্ষেপ নেই।

ঠিক সেই সময় এক বালক-মানুষ কোথা থেকে এসে একমুঠো বালি ছুড়ে দিয়েছিল ত্রিলোচনের মুখের ওপর, চোখের ওপর।

প্রথমে ভয়ে পালায় ও। কেঁউ কেঁউ করে চিৎকার করতে থাকে যন্ত্রণায়। চোখের মধ্যে অনেকগুলো বালির কণা করকর করছে। কী করে চোখের ভেতর থেকে ওগুলো বার করতে হয়, ও বুঝতে পারছে না। চোখের যন্ত্রণায় দিশাহারা হয়ে ত্রিলোচন ফিরে আসে সেই আগেকার বালির স্তূপে। সেখানে গড়াগড়ি খেতে থাকে। আর সামনের পা দিয়ে যথাসাধ্য ঘষতে থাকে ওর আহত চোখ। শুনতে পায়, দূরে ওর সুন্দরী বান্ধবী—ওর ক্ষণকালের প্রেমিকা—বিপুল চিৎকারে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

ঘষতে ঘষতে নিজেরই নখ লেগে চোখটা গলে গিয়েছিল ত্রিলোচনের।

রাস্তার ওপর এই চায়ের দোকানে গ্রাহক আসা-যাওয়া করে পর্বে পর্বে। ভোর থেকে ঘণ্টা দুয়েক, সাড়ে সাতটা অবধি শুধু চা আর বিস্কুট। তারপর ওই প্রকাণ্ড উননের ওপর নতুন কয়লা ফেলে দোকানি ময়দা মাখে সিঙাড়া ভাজার জন্যে। তার এক অনুচর বাঁধানো জায়গাটায় বসে জিলিপি ভাজার জন্যে পচা ময়দা ঘেঁটে মোলায়েম করে। উননে রস গরম হয়। তেল ফোটে। বাঁধানো জায়গার ওপরে মাথা-বরাবর একটা কাপড়ের চালি টাঙানো, যাতে গাছের পাতাগুলি, পাখির বিষ্ঠা না পড়ে খাবারের ওপর। কাকেদের চোখের আড়ালে যাতে থাকে এই উন্মুক্ত রান্নাঘর।

ত্রিলোচনকে এখানকার কেউ তেমন পছন্দ করে না। ও কদাকার। ও নিস্পৃহ। ও কারও খোশামোদ

করে না। খিদে পেলে ওকে মানুষের কাছে আসতেই হয়। কারণ দুনিয়ার সব খাদ্য তো মানুষেরই আয়ত্তে। খাদ্য অর্জন করতে হলে যে কিছু কাজ করে দিতে হয়, সে-বোধ ত্রিলোচনের কম।

গোরু-মোষ দুধ দেয়, মানুষ তাদের দেখাশোনা করে। ছাগল দুধ দেয়, মাংস দেয়, মুরগি ডিম দেয়, মানুষ তাদের যত্ন করে পোষে। কুকুর কী দেয় মানুষকে? কিছু না। কেন মানুষ কুকুরকে খেতে দেবে যদি না তার বিনিময়ে কুকুর, আর কিছু না পারুক, একটু কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, একটু মোসাহেবি করে। কুকুরের কাছে মানুষ দুধ চায় না, মাংস চায় না, ডিম চায় না, শুধু কুকুরের মতো ব্যবহার চায়।

টায়ার-কাটা চপ্পল-পরা দাসু চলে যাওয়ার পব আরও অনেক লোকের সঙ্গে এসেছে ভূতো। ভূতো রোগা চেহারার ছোকরা। ওর পরনে প্যান্ট-শার্ট। মুখে ছাঁটা দাড়ি। হাতে ঘড়ি আর ইস্পাতের শক্ত বালা। সকাল সকাল চান করে ও জিলিপি আর সিঙাড়া খেতে চলে আসে। সকালবেলাতেই ওর বেশি কাজ। সাড়ে আটটা থেকে এগারোটা। এই সময়টায় ভূতো বড় রাস্তার দোকানগুলো থেকে তোলা আদায় করে পুলিশের হয়ে। আর বাবুদের জন্যে শাট্‌ল-ট্যাক্সি ধরে দেয়। কাঁচা টাকা রোজগার ওর, মনটাও দরাজ।

পারুলকে ভূতো জিলিপি খাওয়ায়। মাধবকেও। ওরা পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে মানুষের মতো দাঁড়াবে, মুখটা উঁচু করে হাঁ করবে, তবে ভূতো সেই মুখে জিলিপি ফেলবে ভেঙে ভেঙে। মাধবটা বেশিক্ষণ ওভাবে দাঁড়াতে পারে না, দু'-তিনটে মাত্র পাপড়ি পায়। পারুল অনেক সেয়ানা। ও ভূতোর হাতও চেটে দেয়।

কখনও ভূতো পারুলেব সাদায়-কালোয় মেশানো ছোট মুখটা খপ করে চেপে ধরে মুঠোয় আর বুকে সুড়সুড়ি দেয়। কাতুকুতু লাগে পারুলের। কেঁই কেঁই শব্দ করে ও আদিখ্যেতা করে। ভাবটা, যাঃ কী অসভ্য!

ভূতো আদর করে বলে, "রান্ডি।"

দোকানি হা-হা করে হাসে।

ভূতো বলে, "আরে হ্যাঁ, সেদিন দেখি পার্কের মধ্যে আরেকটা কুত্তার সঙ্গে খেপ দিচ্ছে বেটি।"

মাধব বা পারুল, আজ কেউ নেই। জিলিপি খেতে খেতে কী মনে হল ভূতোর, একটা জিলিপি ছুড়ে দিল ত্রিলোচনের সামনে। মুখ ঘুরিয়ে ভাল চোখটা দিয়ে ত্রিলোচন ভূতোকে দেখল একবার। তারপর জিলিপিটা শুঁকল। তারপর খেয়ে ফেলল। খেয়ে আর দাঁড়াল না। পেছন ফিরে চলে গেল আস্তে আস্তে। এবার ও মাংসের দোকানের সামনে গিয়ে বসবে। কিছু ছাঁট আর তিনকোনা হাড় যদি পাওয়া যায়। নিদেনপক্ষে একটা চোয়াল কি কান। তা হলে সকালের মতো নিশ্চিন্ত। পার্কের রেলিংয়ের পাশে তখন একটু ঘুমিয়ে নেবে। ত্রিলোচন নিঃসঙ্গ, তাই ওর ঘুমটা একটু বেশি।

মাধব ও তার সতেরো জন সাঙ্গোপাঙ্গ এই পাড়াটা দখল করে আছে। পথ ও পথের আশেপাশে এদের জন্ম হয়েছে। পথেই এদের বসবাস, পথেই মৃত্যু। জীবিকা উঞ্ছবৃত্তি। মানুষের প্রতিবেশী এরা, মানুষের কৃপাপ্রার্থী, কিন্তু মানুষের আচরণের সঙ্গে এদের মিল নেই। মাধবদের সমাজ সম্পূর্ণ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত অরণ্যেরই সমাজ। যদিও শহরে এদের জীবন অরণ্যের চেয়ে নিরাপদ। বছরের বিশেষ একটা সময়ে কুকুরদের গর্ভসঞ্চার হয়, মানুষের মতো যে-কোনও সময়ে তা হয় না। দু'মাস পরে প্রসব করে কুকুরি—একসঙ্গে চারটি-ছ'টি অন্ধ-বধির পুত্র-কন্যা। তারা মাসখানেক সময় মায়ের কাছাকাছি ঘুরঘুর করে, দুধ চোষে, তারপর বড় হয়ে যায় প্রাকৃতিক নিয়মে। দু'বছর বয়সে ওদের যৌবন আসে, বারো বছর বয়সে আয়ু ফুরিয়ে যায়। বছরের কোনও এক সময় মাধবের সাঙ্গোপাঙ্গ বেড়ে যায় সংখ্যায়, আবার একটি-দুটি করে কমতে কমতে ওই সতেরোয় এসে থামে। প্রকৃতির এ হয়তো এক অলিখিত নিয়ম। প্রবৃত্তি-তাড়িত ওদের আত্মীয়তাবোধ, সুতরাং দু'জন সমর্থ কুকুর-কুকুরির সম্পর্কে কোনও জটিলতা নেই। কুকুর পরজন্মে বিশ্বাস করে না। কুকুরের পাপ-পুণ্য বোধ নেই।

মানুষের আছে।

তাই সেদিন হইহল্লা বাড়ির সামনে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল।

টের পাওয়া গিয়েছিল রাত্রেই যে, হইহল্লা বাড়িতে মানুষের ভূরিভোজ চলছে। সে ভোজের গন্ধ সকলেই পেয়েছে, কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে সবকিছু ভাল ঠাহর হয় না, তাই সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে মাধবের দলবল।

যে-যেখানে ছিল, প্রথমে জড়ো হয়েছিল ভাতের হোটেলের সামনে। কালো কুচকুচে কিংশুক, সাদা ও বাদামি মেশানো রঙের অর্ণব আর পাপড়ি, সাদা-কালো ছিটছিট রজত, কল্লোল, ইন্দ্রাক্ষী। শুধু সাদা রিন্টু। লেজকাটা মিলু। খোঁড়া তরুণ। তা ছাড়া মাধব, পারুল আর ত্রিলোচন তো আছেই।

কিছু আলাপ-আলোচনা হবার পর ওরা সদলবলে রওনা হয় হইহল্লা বাড়ির উদ্দেশে। দুলকি চালে চলল, যেন দেশ জয় করতে চলেছে। বলা বাহুল্য, মাধব ওদের নেতা, চলেছে সবার সামনে। অকারণ এক-একবার হউ হউ করে ডেকে উঠেছে মাধব। ভাবটা, এগিয়ে চলো বন্ধুগণ, আমি যখন আছি তখন কোনও ভয় নেই।

পার্কের উলটোদিকে তিনরাস্তার মোড়ে ওই হইহল্লা বাড়ি। ওরা পৌঁছে দেখে বাস্তবিক, প্রচুর খাবার, কলাপাতা আর মাটির ভাঁড়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর পোলাও, মাংস, চাটনি, দই, লুচি, লাড্ডু, ডাঁই হয়ে রয়েছে বাড়িটার সামনে। কিন্তু—

কিন্তু দাবিদার অনেক।

পার্কের ওপার থেকে এসে জুটেছে ভুবনের দল। এখনও রাস্তা পার হয়নি। ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে গরগর করছে। মাধব স্পষ্ট দেখল, ওই তো ওদের সকলের সামনে ভুবন নিজে দাঁড়িয়ে দলের সাঙ্গোপাঙ্গদেব সীমানা অতিক্রম করার জন্যে প্ররোচিত করছে। হউ হউ ডাকছে ঘনঘন। তার একটাই বক্তব্য : কীসের ভয়? ঝাঁপিয়ে পড়ো বন্ধুগণ। যা পারো লুটেপুটে খেয়ে নাও। মাধব দেখল, ভুবনের লেজ শক্ত খাড়া হয়ে উঠে আছে, স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর ওর কপালের চামড়া কুঁচকোনো। পেছনের পাদুটো ধুলোর ওপর ঘষছে বার বার। ধুলো উড়ছে। ওদের দিকে রোদ্দুর।

আবার বড় রাস্তার দিক থেকে এসেছে ছোট-বড় মাপের কিছু মানুষ। তারা শুরু করে দিয়েছে খাওয়া। ওই তো, কলাপাতার ডাঁইয়ের ওপর বসে হাড় চুষছে একজন। চকাস চকাস শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। ওই তো, জিভ বার করে ভাঙা ভাঁড় চাটছে ওদের কেউ। গবগব করে গিলছে পাশাপাশি বসা দুটো বুড়ো মানুষ, তাদের হাত-পা সরু সরু। তাদের মুখে দাঁত নেই। এ অন্যায়। মানুষ এখানেও কুকুরের খাদ্যে ভাগ বসাবে। এ সহ্য করা যায় না। মাধব বলতে চায়, তোমরা কাল রাত্রে তো বাড়ির মধ্যে বসে চেটেপুটে সব খেয়েছ, তাতে তৃপ্তি হয়নি? আবার ভোর হতে-না-হতে ছুটে এসেছ আমাদের জন্যে রাখা উচ্ছিষ্ট থেকে কেড়ে খেতে? তোমাদের লজ্জা করে না? তোমাদের প্রাণের ভয় নেই?

এইসব কথা বলতে চায় মাধব। ও কি জানে, কাল রাত্রে যারা আরামে চর্ব-চুষ্য খেয়ে গেছে আর আজ সকালে যারা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে একই খাবার, ওরা একরকম মানুষ না? ও জানে না।

মাধবের দল প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মানুষগুলোর ওপর। সকলে না, কয়েকজন। খোঁড়া তরুণ আর বুড়ো ত্রিলোচন এগোয়নি। পাপড়ি, ইন্দ্রাক্ষী, রিন্টু আর লেজকাটা মিলু—অর্থাৎ মেয়েরা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁত খিঁচিয়েছে। পারুল কিন্তু ছিল ওর পাশে। মানুষগুলো প্রথমে ভয় পায়নি। হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই দিয়ে মেরেছে কুকুরদের। ভাঙা ভাঁড় ছুড়েছে এলোপাথাড়ি। তারপর কালো কুচকুচে কিংশুক যখন একটা ন্যাংটো ছোট মানুষের হাঁটু তাক করে কামড় দিল, আর সে-ব্যাটা পরিত্রাহি চিৎকার করে কেঁদে উঠল, তখন ওরা পিছু হঠতে থাকে।

মানুষেরা পিছু হঠছে দেখে ভুবনের দল তৎক্ষণাৎ সীমানা অতিক্রম করেছিল। ওরা সবাই। উচ্ছিষ্ট পাতা ও ভাঁড় তোলপাড় করে ওরা যা পেল, সাবাড় করতে শুরু করল। কেউ কেউ একটা কিছু মুখে তুলে ফিরে গেল নিজের এলাকায়, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, এই জৈব বোধে। ততক্ষণে মাধবের দলের মেয়েরাও কিছু সাহস পেয়েছে। লেজ নিচু করে গুটি গুটি এগিয়েছে ওরা। ঘেউ ঘেউ করে জানাতে চেয়েছে, ভয় ওরা পায়নি।

সকলের জন্যেই হয়তো যথেষ্ট খাবার ছিল, কিন্তু ভাগ করে খাওয়া কুকুরের স্বভাব না। খুঁটে খাওয়ার চেয়ে কেড়ে খাওয়াতেই ওদের তৃপ্তি বেশি। সুতরাং দেখতে দেখতে কুকুরদের মধ্যে বেধে গেল ঝগড়া। কে কোন দলের, ভুলে গিয়ে ওরা যে যাকে কাছে পেল তার সঙ্গে মারামারি শুরু করে দিল। মারামারি, কামড়াকামড়ি, চিৎকার-চেঁচামেচিতে হইহল্লা বাড়ির সামনেটা পরিণত হল এক নোংরা যুদ্ধক্ষেত্রে। ওই পথ দিয়ে মানুষের যাতায়াত বন্ধ হয় প্রায়।

এই সময়ে একদল লোক লাঠি হাতে বেরিয়ে আসে হইহল্লা বাড়ি থেকে। মাধব আর ভুবন, দুই নেতা, ওদের আগেভাগে দেখতে পেয়ে বা ওদের গন্ধ পেয়ে ছুটে পালায়। মেয়েরা স্বভাবত সতর্ক, তারাও ঠিক

সময়ে ফুটপাথ বদল করে নেয়। আর, যারা ছিল মগ্ন ও বিভোর, তাদের ঘাড়ে লাঠির প্রহার এসে লাগে। সবচেয়ে বেশি জখম হয় সাদা-বাদামি অর্ণব আর কালো ছিটছিট কল্লোল। অর্ণব পালাতে পারে না।

জনতা ছত্রভঙ্গ হবার পর সেখানে শান্তি ফিরে আসে। শুরু হয় যানবাহন চলাচল। একটা খোলা হলুদ রঙের ট্রাক এসে সমস্ত আবর্জনা তুলে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় অর্ণবকেও সেই সঙ্গে। সমস্ত অঞ্চলময় ছড়িয়ে যাওয়া কুকুরের দল মুখ চাটতে চাটতে, কিংবা আহত অঙ্গটি চাটতে চাটতে শোনে অর্ণবের আর্তনাদ ও বিলাপ।

এরপর যেসব ঘটনা ঘটতে থাকে পর পর, তা দুনিয়ার কোথাও কোনও কুকুর-সমাজে কখনও ঘটেনি।

দুই বিরোধী দলের নেতা মাধব আর ভুবনের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ভাতের হোটেলের পাশে নতুন চারতলা বাড়ি উঠেছে। নতুন মানুষ কয়েকজন এসে বসবাস করছে সে-বাড়িতে। বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড লোহার গেট, চারদিকে উঁচু পাঁচিল।

দেখতে দেখতে শীত পড়ে গেছে। একদিন সকালবেলা পাঁচিলের পুবদিকে রোদ্দুরের উত্তাপ উপভোগ করছিল ভুবন আর মাধব। আর পর্যালোচনা করছিল সেই হইহল্লা বাড়ির ঘটনা।

ভুবন বলল, "সে দিন রোগা মানুষদের ওপর ঝাঁপিয়ে-পড়া তোমাদের উচিত হয়নি।"

মাধব বলল, "কেন?"

"ওরা রাস্তার মানুষ। বাড়ির মানুষ আর রাস্তার মানুষ এক নয়।"

"ওরা যে আমাদের বরাদ্দ খাবার খেয়ে নিচ্ছিল।"

"তা হলেই বোঝো। মানুষ হয়ে যারা মানুষের খাবার পায় না, তারা কোথায় যাবে? কী খাবে তারা?"

মাধব বলল, "লাঠি হাতে মানুষগুলো ওদেরও মেরেছে মনে হয়।"

"মেরেই তো রেখেছে। না-হলে ওরা কুকুরের খাদ্য খায়?"

কথা হচ্ছিল, এমন সময় গেটের সামনে একটা মোটরগাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নামে একজন সাদা জুতো-পরা লোক, আর দুটো প্রকাণ্ড কালো কুকুর। নেকড়ের মতো চেহারা, শেয়ালের মতো লম্বা রোমশ লেজ। খাড়া কান। হাঁ-করা মুখ থেকে লম্বা জিভ বেরিয়ে রয়েছে। টপ টপ করে জল ঝরছে জিভ থেকে। চোখ দুটো হিংস্র। সাদা জুতো-পরা লোকটার হাতে দুটো লোহার চেন ওই দুই বিশাল কুকুরের গলায় বাঁধা।

মোটরগাড়ি থেকে নেমে লোকটা কুকুর দু'জনকে টানতে টানতে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

ভুবন বলে, "এরাও কুকুর।"

মাধব বলে, "একজন পুরুষ, অন্যজন মেয়ে।"

ভুবন বলে, "এরা রাজবংশের, তাই এত খাতির। এরা আমাদের মতো ছোটলোকদের সঙ্গে মেশে না। এদের ছেলেমেয়ে, তাদের ছেলেমেয়ে, সব অভিজাত রক্ত নিয়ে জন্মাবে। বাড়ির কুকুর আর রাস্তার কুকুর এক নয়।"

মাধব বলে, "কুকুর তো মানুষের বন্ধু হতে চেয়েছিল। মানুষ তাকে হেনস্থা করে।"

"একটা বিহিত করা দরকার।"

বলে ভুবন দাঁড়িয়ে ওঠে হঠাৎ। পেছনের পাদুটো ঘষতে থাকে ফুটপাথে।

"এখনই নয় ভাই", মাধব ওকে বোঝায়, "এর জন্যে প্রস্তুতি চাই।"

বিহিত মানে বিদ্রোহ নয়। খুনখারাপি নয়। সকলের জন্যে সমান অধিকার চাই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, এঁটোকাঁটা খেয়ে মানুষের দয়ায় বেঁচে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে। সকল মানুষের সঙ্গে সকল কুকুরের সমান অধিকার চাই।

ভুবনের জঙ্গি মেজাজ। মাধব অধৈর্য। কিছু একটা অ্যাকশন নেওয়ার জন্যে অস্থির। কিন্তু খোঁড়া তরুণের মাথা ঠান্ডা। সে মানুষের বাড়িতে থেকে এসেছে। মানুষের চালচলন সে জানে। মানুষ ঘর বানায়, ঘরের দরজা বানায়। সেই দরজা ইচ্ছে হলে খোলে, ইচ্ছে না করলে বন্ধ করে দেয়।

কানের ভাঁজ নেড়ে তরুণ বলে, "আশা করি আপনারা জানেন যে মানুষের শরীরে লোম নেই। মানুষ চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোয়। অতএব মধ্যরাত্রে তার টুঁটি ছিঁড়ে নেওয়া বা পেট ফাঁসিয়ে দেওয়া কোনও কঠিন কাজ না। আপনারা হয়তো ভুলে গেছেন যে, মানুষের রক্ত মানুষের মাংস খুব সুস্বাদু। আমরা যদি

একজোট হয়ে আক্রমণ চালিয়ে যাই, দুনিয়ার মানুষকে এক-এক করে সাবাড় করে দিই, তাদের ঘরবাড়ি, বাগান, বারান্দা দখল করে নিই, তাই দিয়ে আমাদের তিনপুরুষ হেসে-খেলে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু—"

আধমরা তেঁতুলগাছের গোড়ায় নির্জন দুপুরে মিটিং চলছিল। সিমেন্ট-বাঁধানো উঁচু জায়গাটায় বসে কথা বলছিল খোঁড়া তরুণ। গ্রামোফোন রেকর্ডে ছবির মতো ওর অন্তরঙ্গ ভঙ্গি। ভুবন আর মাধবের দুই দল থেকে জনা-তিরিশ সদস্য-সদস্যা সেখানে উপস্থিত। তারা মুখ নিচু করে শুনছে।

"কিন্তু কী?" সম্প্রতি মার-খাওয়া কালো-ছিটছিটে কল্লোল জিজ্ঞেস করে। কালো নাক তুলে আসল কথা জানতে চায়।

"প্রথমত, আমাদের একতা নেই। বিপদের সামনে আমাদের দলবন্ধন অটুট থাকে না। দ্বিতীয়ত, আমাদের স্বাজাত্যবোধ দৃঢ় নয়। মানুষের মুখাপেক্ষী থেকে থেকে আমাদের আত্মবিশ্বাস চলে গেছে। তৃতীয়ত, আমরা এমন কিছু উৎপাদন করতে জানি না, যা দিয়ে পেট চলে। অরণ্য-জীবন ছেড়ে এসেছি আমরা বহুকাল, কিন্তু সমাজ-জীবনের শিক্ষা নিইনি। তাই আমরা সকল মানুষের সঙ্গে সকল কুকুরের সমান অধিকার চাইব। কুকুরে কুকুরে শ্রেণী-বৈষম্য অস্বীকার করব।"

পেছন দিকে একটু তফাতে সামনের পাদুটো ছড়িয়ে তার ওপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল বুড়ো ত্রিলোচন। এবার সে হাই তোলে।

তরুণের নাড়ি-নক্ষত্র জানে ত্রিলোচন। আজ সে নেতা হয়েছে। বক্তৃতা দিচ্ছে। কী ছিল ও? মাংসের দোকানের পাশের বাড়ির দোতলায় মানুষের কেনা গোলাম হয়ে ছিল না? এতটুকু ফুটফুটে বাচ্চা, আর একটু হলে গাড়ি চাপা পড়ত দেখে, বজ্জাত ওকে আদর করে তুলে নিয়ে যায়। তরুণকে পোযে। তরুণকে দু'বছর বড় করে। ওদের দেওয়া বাটি-ভরতি দুধভাত আর রাঁধা মাংস খেয়েছে তরুণ দিনের-পর-দিন। 'কাম হিয়ার', 'সিট ডাউন' শিখেছে। বল কুড়িয়ে এনেছে মুখে করে। বজ্জাতের সোফায় শুয়ে ঘুমোত ওই তরুণ—বললে কেউ বিশ্বাস করবে আজ?

শোনা যায় একদিন বজ্জাতের বাড়িসুদ্ধ সবাই বেড়াতে চলে গিয়েছিল। ভুল করে তরুণকে বন্ধ করে রেখেছিল শোবার ঘরে। পরের দিন ফিরে এসে দেখে, সমস্ত ঘর নোংরা, বিছানায় গদি-বালিশ ছেঁড়া কুটিকুটি, সেগুন কাঠের খাট-আলমারি তরুণের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত। ঘরের দরোজা খুলতেই উপরন্তু তরুণ বজ্জাতের ছোট মেয়েকে কামড়ে দেয়। তখন বেদম প্রহার করে ওকে তাড়িয়ে দেয়নি বজ্জাত? পেছনের বাঁ পা-টা চিরদিনের মতো অচল করে দেয়নি? দরজা বন্ধ করে দেয়নি তরুণের মুখের ওপর? সেই খোঁড়া পা—মানুষের অত্যাচারের নিদর্শন—দেখিয়ে উনি এখন স্বাধীনতা সংগ্রামী সেজেছেন!

তরুণের বক্তৃতা মন দিয়ে শুনছে সকলে।

"এই পাড়ায় এগারোজন রাজবংশী অভিজাত কুকুর আছেন। তার মধ্যে তিনজন পুতুল। বাকি আটজন ভয়ংকর সব অ্যালসেশিয়ান, বুলটেরিয়র, ড্যালমেশিয়ান, বুলডগ। কোথাও একজন করে, কোথাও জোড়ায় জোড়ায়। তাঁদের সঙ্গে আগে বন্ধুত্ব করতে হবে। বোঝাতে হবে, আমাদের সঙ্গে আপনাদের কোনও শ্রেণীবিভেদ নেই। আমরা সকলেই মহারাজ নেকড়ে এবং রানি শেয়ালির বংশধর। আমরা সংকর প্রাণী, মানুষও তাই। ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা একদিন মানুষের কাছে সমান অধিকার দাবি করব।"

সমস্বরে ভেউ ভেউ চিৎকার করে অভিনন্দন জানায় উপস্থিত কুকুরেরা। খোঁড়া তরুণ, যুগ যুগ জিয়ো।

ঠিক হল, দুই দলের থেকে বেছে যারা অল্পবয়সি এবং সুন্দর দেখতে, তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মন জয় করে এক-একজনকে রাজি করাবে। পুরুষের কাছে যাবে মেয়ে, আর মেয়ের কাছে যাবে পুরুষ। বর্ষার শেষে যখন সকল প্রাণীর মন নরম হয়, শরীরে আবেগ জাগে, তখন এইসব দূত ও দূতীদের কাজ শুরু করতে হবে। দলের মূল লক্ষ্য স্মরণ রাখতে হবে সর্বক্ষণ, আত্মবিস্মৃত হলে চলবে না। ঘনিষ্ঠতার যদি প্রয়োজন হয় কোথাও, বৃহত্তর স্বার্থে ঘনিষ্ঠতা হবে, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে না।

এই দল থেকে রিন্টু, ইন্দ্রাক্ষী আর লুসি আর ভুবনের দল থেকে অল্পবয়সি অর্জুন, বিধুমুখী আর সৈরিন্ধ্রী নির্বাচিত হল। খোঁড়া হলেও তরুণ থাকছে পুতুল কুকুরদের জন্যে। ওরা তিনটেই মেয়ে। ওদের গায়ে মিষ্টি পাউডারের গন্ধ। পারুলকে যোগ দিতে বলা হয়েছিল। ও বলল, "আমাকে বাদ দাও ভাই।

আমার কি আর মন জয় করার বয়েস আছে!"

দিন যায়।

দেখতে দেখতে গ্রীষ্মকাল গিয়ে বর্ষাকাল আসে। বর্ষায় কুকুরদের ভারী কষ্ট।

ভাতের হোটেলের সামনে কল্লোল মাধবকে চেপে ধরে একদিন।

"কোনও খবর আছে?"

মাধব বলে, "কাজ চলছে। ধৈর্য ধরো।"

"আর যে পারি না। জলে ভিজলে পিঠটা বড় কনকন করে।"

উত্তর না দিয়ে মাধব অন্য দিকে চলে যায়।

দূর থেকে শুয়ে শুয়ে ত্রিলোচন দেখে, তিন পায়ে লাফাতে লাফাতে খোঁড়া তরুণ চলেছে গ্রিল-দেওয়া জানলার দিকে। ওই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে সাদা রঙের লোমওলা পুতুল কুকুর। তরুণ মুখে মুখ ঘষবে ওর।

বিধুমুখীর সঙ্গে ভুবনের দেখা হয় বাজারের সামনে একদিন।

"কতদূর?" জানতে চায় ভুবন।

"দেখা হয়েছে। কথা হয়েছে। বলেছে, ভেবে দেখবে।"

ঠিক আছে। ভুবন মুখ ঘুরিয়ে পার্কের দিকে হাঁটা দেয়।

একদিন অর্জুনের সঙ্গে দেখা হয় পারুলের। পারুল একটা শুকনো হাড় নিয়ে শুয়ে শুয়ে চিবোচ্ছিল ছাইগাদার ওপর। তেড়ে এসে অর্জুন সেটা কেড়ে নিল।

পারুল দিয়ে দিল হাড়টা।

জিজ্ঞেস কবল, "ওদিকের কী খবর?" অর্থাৎ মেয়ে ড্যালমেশিয়ানের সঙ্গে অর্জুনের ভাব হয়েছে কিনা।

"কাজ এগিয়েছে। বলেছে, ভেবে দেখবে।"

"কী বিচ্ছিরি দেখতে! ধাড়ি একটা। তোমার ভয় করে না?"

"ভয় কেন করবে।" অর্জুন শুকনো হাড়টা ফেলে দেয়।

চলে যেতে যেতে শোনে পারুল বলছে, "সাবধানে থেকো।"

ছুটতে ছুটতে এসে একদিন সৈরিন্ধ্রী খবর দিল, "ওরা রাজি। রবিবার ভোরবেলা নদীর ধারে আমাদের দলবেঁধে আসতে বলল। সেখানেই কুকুরদের সঙ্গে মানুষদের মোকাবিলা হবে।"

মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল সে-খবর। ভাতের হোটেল থেকে মাংসের দোকানে। সেখান থেকে চায়ের স্টলে। পার্কের চার কোণে। ছাইগাদায়। ও-পাড়ার শিবমন্দিরের চবুতরায়। সামনের রবিবার। নদীর ধারে। ভোরবেলা।

এইদিকে আশ্বিন মাসের ঢাকের শব্দও বেজে উঠল : ড্যাম ড্যাম, ড্যাম ড্যাম।

কুকুরদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ। কিন্তু দেখার চোখ তেমন প্রখর নয়। দূরের জিনিস অস্পষ্ট দেখে, রং তো চেনেই না। কেবল কালো বোঝে, আর সাদা বোঝে।

নদীর ধারে বিরাট বটগাছ। তার দু'পাশে অনেকখানি মাঠ। বটগাঠের নীচে বেঞ্চি পাতা। ভোরবেলা ওখানে যারা হাঁটতে আসে, দৌড়োতে আসে, তারা ক্লান্ত হলে পর ওই বেঞ্চিতে বসে বিশ্রাম নেয়।

রবিবার ভোরবেলা অনেক বাঘা বাঘা কুকুরকে সেখানে দৌড়োতে দেখা গেল। বড় লোম, ছোটো লোম, ল্যাকপেকে-পা আবার টিকটিকির মতো খুদে-পা। কারুর লম্বা ফুলঝাড়ুর মতো লেজ, কারুর কেটলির নলের মতো একটুখানি। কেউ খাঁদাবোঁচা, কেউ চোখামুখ। কারুর ঝোলা কান, কারুর খাঁড়ার মতো কান। সকলেরই গলায় সম্ভ্রান্ত বকলশ। বকলশের পেতলে নরম রোদ পড়ে চিকচিক করছে।

ওদের সঙ্গে মানুষেরাও এসেছে। বেড়ু করিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবে।

খানিকটা দূরে ঘন আমজামের বাগান। ছায়াচ্ছন্ন।

বাগানে জড়ো হয়েছে মাধব আর ভুবনের দলবল। অন্য পাড়া থেকে আরও কয়েকজন। সকলেরই চোখে আশা, আজ একটা হেস্তনেস্ত হবে। কারুর মুখে রা নেই।

মাধব সবচেয়ে সামনে। তার পাশে ভুবন আর খোঁড়া তরুণ।

তরুণ জিজ্ঞেস করে, "আমরা কি মিছিল করে এগোব, না ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব?"

মাধব বলে, "যুদ্ধ নয়, এ হবে শান্তির মিছিল। অহিংস।"

"আমারও সেই মত।" তরুণ বলল।

"মাধবদা, সময় হলে বোলো," ভুবন বলল, "জোরে একবার ঘেউ করে ডাক দিয়ো।"

পেছন থেকে ছোকরা অর্জুন এবার সামনে চলে আসে।

"দেখতে পাচ্ছ, চেনা মানুষেরা এসে গেছে?"

"কে কে?"

"ওই তো, পায়ে সাদা জুতো—জুজু। আধখানা প্যান্ট-পরা—কঞ্জুষ। ওই তো ভুলু, মাথায় টাক। বুদ্ধু—আঙুলে গাড়ির চাবি ঘোরাচ্ছে।"

"তুই দেখতে পাচ্ছিস?" মাধব জিজ্ঞেস করে, "আমি তো দেখছি কতকগুলো সাদা আর কালো ছায়া নড়াচড়া করছে।"

"ওতেই হবে। চলো, আমরা ওইদিকে এগোই।"

"ওদের কাছাকাছি এলে পর, আমরা কিন্তু স্লোগান দেব : মানুষের সমান অধিকার চাই। কুকুর মানুষ ভাই-ভাই। ওদের পোষা কুকুরেরাও স্লোগান দেবে।" অর্জুন বলল।

"মনোবলের জন্যে ওটা দরকার।" খোঁড়া তরুণ মন্তব্য করে।

বেঞ্চিতে বসে সিগারেট টানছিল কঞ্জুষ। পাশে ওর বউ মুনমুনিকে কোলে নিয়ে আদর করছে। মুনমুনির গোলাপি নাকে চুমু খাচ্ছে। সে-ই প্রথম লক্ষ করল।

"দেখো তো, ওদিকটা থেকে কী যেন আসছে।"

"কী আবার আসবে। ছাগল চরাতে নিয়ে যাচ্ছে।"

"ভাল করে দেখো না গো। ছাগল না। একটা কুকুরের পাল।"

তাই তো, একটা নেড়িকুত্তার পাল। সাদা, কালো, হলুদ। কালোয়-সাদায়, হলুদে-সাদায়, কালো ছিট-ছিট—হরেক রকম। ওরা যেন এ-দিকেই আসছে। ওই তো, কুকুরগুলো এবার একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠেছে। ঘেউ ঘেউ করেই চলেছে। ব্যাপার কী?

জুজু জগিং করতে করতে দাঁড়িয়ে যায়। ভুলু ওর কাছে এসে দাঁড়ায়। বুদ্ধু আঙুলের চাবি ঘোরানো বন্ধ করে বলে, "কামড়াবে নাকি?"

কঞ্জুষের বউ আবার লক্ষ করে, ওর কোলে-বসা মুনমুনিও গলা মিলিয়ে খ্যাক খ্যাক করে ডাকছে। কোল থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে।

ততক্ষণে আর সব বকলশ-বাঁধা কুকুরেরা খেলা ছেড়ে একপাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারাও শুরু করে দিয়েছে ডাকাডাকি। তাদের মুখ নেড়িকুকুরের পালের দিকে থাকা প্রত্যাশিত ছিল, তা না হয়ে উঁচিয়ে আছে মনিবদের দিকে।

কঞ্জুষ কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। হঠাৎ ও হা-হা করে হেসে উঠল।

বলল, "এরা বুঝি তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক? সমান অধিকার দাবি করছে?"

কঞ্জুষের বউ বলল, "কত শখ!"

জুজু বলল, "কুকুরের জাত, এদের মাথায় তোলা উচিত হয়নি।"

নদীর ধারে সূর্য উঠেছে। উড়ে বেড়াচ্ছে পাখি। লালচে রোদ্দুরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে জলে, ডাঙায়, মাঠে, বটগাছের পাতায়, কুকুর আর মানুষদের গায়ে। বাতাস বইছে ঠান্ডা। ঠান্ডা বাতাসে দুলে উঠছে গাছের পাতা। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী সেই বাতাস থেকে শ্বাস নিচ্ছে।

এই প্রশান্ত ও তৃপ্তিময় পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে কেবল সমবেত কুকুরের স্লোগানে : কুকুর মানুষ ভাই ভাই, মানুষের সমান অধিকার চাই।

হঠাৎ পকেট থেকে একটা লম্বা ঝকঝকে লোহার চেন বার করল কঞ্জুষ। চেনটা হাতে ধরে বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগল শূন্যে পাগলের মতো। তাই দেখে বকলশ-বাঁধা কুকুরেরা চুপ করে যায়।

কঞ্জুষ আচমকা চিৎকার করে ওঠে, "লিউ-ও-লিউ-লিউ-ও—"

এই চিৎকার শুনে যতগুলো বকলশ-বাঁধা কুকুর সেখানে ছিল—ছোট বড় মাঝারি, বাঘা, ল্যাকপেকে, সুন্দর, কুৎসিত, ছোট-লেজ, বড়-লেজ, খাড়া-কান পাতা-কান—সকলে, আগেকার

প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলটার ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যে—

(কঞ্জুষ চিৎকার করেই চলেছে, একটানা, "লিউ-ও-লিউ-ও-লিউ-ও-ও")

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা কামড়ে খামচে ছিঁড়ে মাড়িয়ে ছত্রখান করে দিল গোটা মিছিলটাকে। হিংসা পেয়ে বসলে যা হয়। ভুবন আর মাধবদের দল পরিস্থিতির অকল্পনীয় পরিবর্তনে প্রথমটা হতভম্ব এবং পরে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। যে-যেখানে পারে পালিয়ে যায়। যারা আহত হওয়ার ফলে পালাতে পারে না, তারা মৃত্যুবরণ করে।

আরও কিছুক্ষণ পরে রোদ আরেকটু চড়া হলে পর একটা খোলা হলুদ ট্রাক উপস্থিত হয় নদীর ধারে। মৃতদেহগুলি তুলে নিয়ে যায় সেই ট্রাকে।

ফাঁকা হয়ে যায় নদীতীরের মাঠ।

আমবাগানের আবছায়ায় লুকিয়ে শুয়ে ছিল পারুল। ভয়ে কাঁপছিল থরথর করে। কান দুটো একেবারে ঝুলে পড়েছে ওর।

গন্ধ শুঁকে শুঁকে সেখানে হাজির হয়, কে আবার, অর্জুন। ভুবনদের দলের সেই উজ্জ্বল ছোকরা। তার মাথার খানিকটা ছাল উঠে গিয়ে জায়গাটা লাল হয়ে আছে। জ্বালা করছে। জিভ দিয়ে চাটতে পারলে জ্বালা জুড়োত, কিন্তু ওইখানটায় জিভ পৌঁছোয় না। অর্জুনও ভয় পেয়েছে বেশ। তার চেয়ে বেশি মর্মাহত।

অর্জুন চুপচাপ এসে পারুলের পাশটিতে শুয়ে পড়ল। মাথাটা এগিয়ে দিল পারুলের মুখের কাছে। পারুল পরম স্নেহে ওর ক্ষতস্থান চাটতে লাগল।

আর একটু পরে ত্রাসের স্মৃতি মুছে যাবে। তখন দুলকি চালে হাঁটতে হাঁটতে ওরা শহরের দিকে এগোবে।

১৯৮৭

❀ অমিতাভ, আপনাকে নিয়ে

অমিতাভ, আপনি তো বলেছিলেন, আপনিই তো একদিন আপনার প্রাণের বন্ধু নিরঞ্জনকে তার বসার ঘরে বসে চা খেতে খেতে বলেছিলেন, "একটা ছোট মতন মেয়ে পেলে বিয়ে করি। এই বাউন্ডুলেপনা আর ভাল লাগে না।"

'ছোট মতন মেয়ে' কথাটা বলে আপনি নিরঞ্জনের স্ত্রী মৃদুলার দিকে চেয়েছিলেন। না, আমি বলছি না, আপনি অন্যায় করেছিলেন বা আপনার দৃষ্টিতে লালসা ছিল। আসলে, আপনি জানতেন মৃদুলার দুটি ছোট বোন আছে, তারা অবিবাহিত। মনে মনে হয়তো ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিল, মৃদুলা বলবে, সত্যি আপনি সংসারী হতে চান? আমরা সম্বন্ধ করব?

কিন্তু আপনি জানতেন না, বাঙালি মেয়ে যত অসহায়, যত অরক্ষণীয়া হোক, স্বেচ্ছায় একজন মাতাল মানে মদ্যপ—এবং চরিত্রহীন মানে নারী-সংসর্গে অভ্যস্ত—ছেলেকে বিয়ে করবে না, তার গলায় মালা দেবে না। তার চেয়ে বরং একজন সাধারণ কেরানি-টাইপের বর অনেক বেশি অভীষ্ট। আমাদের দেশে কৌমার্য এখনও, এই বাজারে, বহু শত গ্রাম সোনার দামে বিক্রি হয়।

আহা, ভুল বুঝব কেন? আমি জানি, আপনি যা বলেছিলেন, তাই চেয়েছিলেন আন্তরিকভাবে। একটি মেয়ের ভালবাসা পেলে আপনি জীবনটা বদলে ফেলবেন, এই তো? কিন্তু কে ঝুঁকি নেবে বলুন? কেন নেবে? আপনি অনেক টাকা রোজগার করেন, আপনি একা একটা ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি প্রতিষ্ঠান চালান, সেই কারণে কি? কখনও না। আপনার একাকিত্ব, ভৌতিক নির্জনতা, সঙ্গহীনতা—সে আপনার নিজের সমস্যা।

অমিতাভ, আপনার ছ'ফুট লম্বা চেহারা, আপনার এগারো ইঞ্চি হাতের পাঞ্জা, ভিক্ষের হাত সেদিন আপনাকে মানায়নি।

নিরঞ্জনের স্ত্রী মৃদুলা আপনাকে না দিক, শেষপর্যন্ত আপনি তো পেয়েছেন। রেখাকে পেয়েছেন। সেইখানে আপনার জিত জানবেন।

রেখাও আপনার হিসেবে 'ছোট মতন মেয়ে'। কিন্তু ও বিধবা। ওর স্বামী ভাস্কর ত্রিশ বছর বয়সে হার্ট-অ্যাটাকে মারা যায় ক্যানাডা নামক অন্য এক দেশে, ওটাওয়া নামক অন্য এক শহরে। সে-মৃত্যুর ব্যাপারে, অমিতাভ, আপনার কোনও দায়িত্ব ছিল না। আমি জানি।

এবং রেখা বলেছিল, "দেখো, বিয়ে জিনিসটা কী, তা তো আমি একবার দেখলাম, আবার এসবের মধ্যে গিয়ে কাজ কী?"

ইডেন গার্ডেনের উত্তর দিকের কোণটায় বসে আপনি বলেননি? বলেছিলেন, "রেখা, আমাকে একটা চান্স দাও। জীবনে আমি একটি মেয়েরও ভালবাসা পাইনি। অন্তত আমার নিজের বুক-ভরতি ভালবাসা জমে জমে পাথর হয়ে যাচ্ছে, তাকে একটা বহিষ্কারের সুযোগ দাও। আমায় করুণা করে ফিরিয়ে দিয়ো না।" প্রেমে পড়লে অল্পবয়সি ছেলেরা এই ধরনের কথা বলে শুনেছি। কিন্তু আপনিও?

রেখা আপনাকে শুধু করুণা করে গ্রহণ করেছে, এ-কথা আমি বলব না। ভাস্করের সঙ্গে তার মাত্র তিন বছরের দাম্পত্যজীবন হলেও সে যে কী বস্তু, তার স্বাদ সে পেয়েছে। তার সামনে অনন্ত কাল পড়ে আছে, কমপক্ষে আরও কুড়িটা উত্তেজিত বছর। নিশ্চিত সে ভেবেছে, এই কুড়ি বছর, এক হাজার সপ্তাহ, সাত হাজার দিন সে ভাস্করের ছবির দিকে চেয়ে বসে থাকবে, না জীবনটাকে অন্যভাবে তৈরি করে নেবার সুযোগ নেবে?

সুযোগ নিয়েছে এবং দিয়েছে—দুই-ই। আপনাকে শুধু একটি ছোট প্রশ্ন করেছে, "অমিতাভ, দেখো, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি তো? আমার সর্বনাশের শেষ সম্বল যদি তোমাকে দিই, তুমি তার অসম্মান করবে না?"

রেখা বলেছে, "আমি যেমন আছি, তেমনই বাকি জীবনটাও থাকতে পারব। তাতে কষ্ট আছে, দুঃখ আছে, জীবনের অপচয় আছে, কিন্তু হতাশা নেই।"

আপনি, অমিতাভ, ইডেন গার্ডেনের উত্তর কোণে বসে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, মনে আছে, "বিশ্বাস করে মানুষ ঠকে না?"

অথচ আজ আপনি ডাক্তার বোস, গাইনোকলজিস্টের চেম্বারে বসে অপেক্ষা করতে করতে ভাবছেন অন্য কথা।

ঘরটার চারদিকে সার সার চেয়ার পাতা, মাঝখানে একটা নিচু মতো লম্বা টেবিল। তার ওপর দু'পাশে দুটো ছাইদান আর মাঝখানে একরাশ সাময়িকপত্র। ইংরেজি, বাংলা—বেশিরভাগই পুরনো। ঘরটার দেয়ালে ডাক্তার বোসের ছাত্রবয়সের একটা ছবি, সম্ভবত বিলেত যাবার সময়ে তোলা। আর ফ্রেমে-বাঁধানো তাঁর এডিনবরা থেকে পাওয়া ডিগ্রি, ডিগ্রিটার নীচে বিভিন্ন কালিতে সই করা সাহেবদের নাম।

আপনাকে নিয়ে তিনজন পুরুষ এই ঘরটায় অপেক্ষমান। আর বাকি সবাই মহিলা। অর্থাৎ অনেকেই একা এসেছে, কেউ কেউ এসেছে দিদি বউদি মা মাসির সঙ্গে। হয়তো তাদের স্বামীদের সময় নেই বা আগ্রহ নেই। হয়তো বা নেহাতই রুটিন চেকআপ—স্বামীদের আসার প্রয়োজন ছিল না।

কারা রোগিণী, দেখে আপনি মোটামুটি বুঝতে পারলেন। গর্ভের মধ্যে অর্ধস্ফুট সন্তান নিয়ে যারা এসেছে তাদের তো স্পষ্টই চেনা যায়। উদাসীন বিষণ্ণ মুখ, ক্লান্ত চোখ, চোখের নীচে কালি। সিঁথিতে অল্প সিঁদুরের আভাস। প্রেমিকা ছিল এরা, আবার কখনও প্রেমিকা হয়ে যাবে, মাঝখানে একটা আরোপিত অসুস্থতা এদের কাতর করে রেখেছে। নারী নর্মসহচরী, কিন্তু এই নর্মকাণ্ডের মধ্যে ঢের বেদনা লুকোনো থাকে। কেন থাকে, কেন নারীই কেবল সে-বেদনা বহন করবে—প্রকৃতির এ পক্ষপাতিত্বে আপনার মন সায় দেয় না।

অন্য দু'জন পুরুষের একজন একটু বয়স্ক। হয়তো অভিজ্ঞ বলেই নির্বিকার। চুপচাপ বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন—এইমাত্র পার্শ্ববর্তিনীর উদ্দেশে কোনও রূঢ় মন্তব্য করলেন। কোনও মৃদু অনুযোগের উত্তরে সম্ভবত বলে উঠলেন, ন্যাকামি কোরো না। পার্শ্ববর্তিনীর দু'হাতের ফ্যাকাশে কবজিতে অনেকগুলি

সোনার চুড়ি ঢলঢল করছিল।

অন্যজন নব্য-যুবক। মুখের অপরাধীভাব গোপন করার জন্যে দ্রুত পা নাচাচ্ছে, এদিক-ওদিক চাইছে আর মাঝে মাঝে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছে—সোডা খাবে? কোকোকোলা খাবে? এক খিলি পান খাও না! আবার ঘন ঘন কবজি উলটে ঘড়ি দেখছে আর নিজের মনে বলছে, এত দেরি হয় কেন বুঝি না!

"ভালবাসার সন্তান সব!" কথাটা আপনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল হঠাৎ। শব্দটা কানে যেতে নিজেই চমকে উঠলেন।

রেখা আপনার ডান দিকে বসে নখ খুঁটছিল। হাতের চাপ দিয়ে প্রশ্ন করল চাপা গলায়, "বলছ কিছু?"

আপনি বললেন, "ডাকই পড়ে না। কখন থেকে এসে বসে আছি আমরা।"

"আমাদের পরের লোকেরা ঢুকে পড়ছে না তো?"

"না, না।" আপনি স্তোক দিলেন রেখাকে। "বারো মাস তিরিশ দিন এই চেম্বারে এমন ভিড়, তুমি তো আগেও দেখেছ। মানুষের তো কোনও মেটিং সিজন নেই!"

বলে, অমিতাভ, আপনি ডান দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করলেন। আর তখনই যেন একেবারে নতুন করে দেখলেন রেখাকে।

কী ফরসা টুকটুকে রং ছিল ওর। এখন ধোয়া মাছের মতো সাদা।

কী পাতলা গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট ছিল। এখন শুকনো কাগজ।

চোখদুটো তেমন বড় ছিল না, কিন্তু কেমন একটু লজ্জা ও ভয়-মাখানো, বেনেবউ পাখির মতো ছলছলিয়ে থাকত। আর এখন?

এখন সিঁথিতে সিঁদুর ওর জ্বলজ্বল করছে, আর মুখটা মাটির প্রদীপের মতো ম্লান।

আপনার মনে আছে সেই এক শনিবারের বিকেলের কথা? রেখার শ্বশুর—কী যেন নাম ভদ্রলোকের? বিপিনবাবু না পুলিনবাবু গোছের—তাঁর কাছে আপনি সটান গিয়ে বলেছিলেন, "আমার নাম অমিতাভ দত্ত। আমি রেখাকে বিয়ে করতে চাই।"

"রেখাকে? মানে বউমাকে?" ভদ্রলোক যেন আঁতকে উঠেছিলেন।

তাঁর সামনে ছ'ফুট লম্বা একটা দৈত্যের মতো চেহারার মানুষ। এগারো ইঞ্চি হাতের পাঞ্জাদুটো জোড়া করে অনুরোধ করছে, "আপনি অনুমতি দিন।" একটু ভয় পাওয়ার কথা বই কী। ভাবটা, যেন অনুমতি না দিলে মাথা ফাটিয়ে দেব!

একটু আত্মস্থ হয়ে ছোটমতো টাকমাথা মানুষটি বলেছিলেন, "কিন্তু তা কী করে সম্ভব? সে আমার পুত্রবধূ, ছেলের বিয়ে দিয়ে তাকে আমাদের পরিবারে নিয়ে এসেছি—"

আপনি বলেছিলেন, "ভাস্কর। সে তো মারা গেছে।"

"হ্যাঁ, গত বছর মারা গেছে। হিরের টুকরো ছেলে ছিল আমার। হঠাৎ সব ভাসিয়ে এমন করে চলে যাবে, কে জানত!" ভদ্রলোক চোখ মুছলেন।

"সত্যি, খুব দুঃখের কথা", আপনি বলেছিলেন, "কিন্তু মৃত্যুর ওপর কি মানুষের হাত আছে? মৃত্যুকে মেনে নিতে হয়। আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন তো?"

"করি। কিন্তু এ-শোকের কোনও সান্ত্বনা পাই না।"

"যতদিন বেঁচে আছে মানুষ, ততদিনই তার বেঁচে থাকার আনন্দ," বৃদ্ধটিকে আপনি বুঝিয়েছিলেন, "সার্থকভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা, তাতে কোনও পাপ হয় না, আপনি স্বীকার করবেন? যদি করেন, তবে আপনার ভাস্করের মতো আপনাদের বউমা রেখাও হিরের টুকরো মেয়ে, ওকে বাঁচতে দিন। ওর সামনে বিশাল জীবন পড়ে রয়েছে, ও একা।"

রেখা আপনাকে বলেছিল, ওর শ্বশুর অনুমতি না দিলে ও আবার বিয়ে করবে না। আইনের বাধা নেই, তা সত্ত্বেও। এবং সেই ছোটমতো টাকমাথা মানুষটি শেষপর্যন্ত অনুমতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে আনার সময়, বউমা, তোমায় কথা দিয়েছিলাম সুখে রাখব। আমি সে-কথা রাখতে পারিনি, আমার ছেলে বেইমানি করেছে।"

বিদায় নেবার দিন রেখার সমস্ত গহনাপত্র সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "আমি আশীর্বাদ করছি, তোমরা সুখী হও।"

মনে আছে অমিতাভ?

মনে আছে, আপনার প্রাণের বন্ধু নিরঞ্জন ও তার স্ত্রী মৃদুলা বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে এসে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল?

মৃদুলা বলেছিল, 'পরিটিকে কোথায় আবিষ্কার করলেন?"

আপনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "স্বর্গ থেকে নিয়ে এলাম।"

নিরঞ্জন আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে মুখখানা উঁচু করে আপনার কানে কানে বলেছিল, "তোমাকে রেখার উপযুক্ত হতে হবে। কাজটা সহজ নয়।"

কাজটা কঠিনও নয়, তা আপনি প্রমাণ করেছেন।

বহু বছরের স্বেচ্ছাচারিতার অভ্যেস আপনি একদিনে পরিত্যাগ করেছেন। এবং তার জন্যে অনুশোচনা বোধ করেননি। চ্যালেঞ্জ শুধু আপনার একার সামনে ছিল না, রেখার সামনেও ছিল। এবং আপনি খনিজ ম্যাঙ্গানিজ-এক্সপোর্টার— চ্যালেঞ্জের সামনে কাবু হবার পাত্র নন।

প্রথম প্রথম আপনার দুঃখ হত মৃত ভাস্করের জন্যে। মনে হত, সে কি রেখার শরীরে শুধু চামর বুলিয়ে পুজো করেছে? কোণে কোণে লুকোনো কত রত্নের ভাণ্ডার ছিল, খুঁজে দেখেনি? নাকি দাঁত-নখহীন একটা জরদ্গব ছিল লোকটা?

একদিন আপনি রেখাকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন কথাটা। অন্যভাবে।

"আমি যখন আদর করি, তুমি চোখ বুজে থাকো কেন?"

রেখা বলেছিল, "ধেৎ, কী যে বলো।"

"আমি লক্ষ করেছি। আমাকে তোমার ভয় করে নাকি?"

"ভয় কেন করবে?" বলেছিল রেখা, "ভালবাসলে কাউকে ভয় করে?"

আপনি বলেছিলেন, "দেখো, একদিন হাতেনাতে ধরিয়ে দেব তোমায়।"

কিন্তু ধরিয়ে দিতে পারেননি। কারণ রেখা ধরা দেয়নি। রেখা তারপর থেকে আর চোখ বুজে থাকত না। চেয়ে থাকত, আদর ফিরিয়ে দিত আরও আদর করে। যে রকমটি আপনি আর কারও কাছে পাননি।

তবু আপনার মনে হত, ও এক-এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এক-এক সময় ওর চোখের কোণে জল উঠে আসে। কিন্তু আপনি আর প্রশ্ন করতেন না। আপনি জানতেন, আপনার জীবনের শেষ যুদ্ধটি লড়তে হবে, একজন মৃত ব্যক্তির সঙ্গে।

"মিসেস দত্ত।"

ডাক শুনে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন আপনি।

একজন শাড়ি-পরা নার্স আপনার পাশে-বসা রেখাকে আঙুল হেলিয়ে ডাকল। আপনাকে বলল, "আগের কিছু কাজ আছে, সেরে নিই, তারপর আপনিও আসবেন।"

আপনি আর বসলেন না। ঘরেই পায়চারি করতে লাগলেন। রেখা ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেল ভেতরে। নার্সটির পিছু পিছু। ঘরটার মধ্যে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন আপনি। কেউ কেউ চলে গেছে। দু'-একজন নতুন পেশেন্ট এসে বসেছে সে-জায়গায়। সস্ত্রীক বয়স্ক ভদ্রলোকটি নেই। তাঁদের চেয়ারে দু'জন মারোয়াড়ি রমণী। দু'জনেরই বিশাল বপু, একজনের পায়ের পাতা দুটো পাউরুটির মতো ফোলা।

রেখার ওজন, রক্তচাপ, ইউরিন এবং কিছু যন্ত্রণাদায়ক শারীরিক লক্ষণ পরীক্ষা করা হয়ে গেলে পর আপনাকে একেবারে ডাক্তার বোসের খাস-কামরায় ডাকা হল। আপনি গিয়ে দেখলেন, ও সবেমাত্র সরু বিছানাটা থেকে নেমে চেয়ারে বসেছে, ব্লটিংকাগজে কালি শোষার মতো করে কপালের ঘাম মুছছে। আপনি ওর পাশটিতে গিয়ে বসলেন। পিঠের ওপর আলতো হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "লেগেছে খুব?"

"একটু।"

ডাক্তার বোস হাসতে হাসতে বকুনি দিলেন রেখাকে। বললেন, "আপনার নিজের দোষ। একটু অন্যমনস্ক থাকবেন তো, তা-না। আপনার সঙ্গে গল্প করার চেষ্টা করলাম কত, আপনি পাত্তাই দিলেন না।"

তারপর খসখস করে ডায়েরিতে নোট লিখতে লাগলেন। প্রেসক্রিপশন লিখলেন। কাগজের দিকে

চোখ রেখে বললেন, "ওজন বাড়ছে না কেন? পেট ভরে খান না? এখন দু'জনের খাবার একজনকে খেতে হবে তো।"

তারপর আপনার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "দু'বেলা একটু করে হাঁটা দরকার, তবেই খিদে হবে। আপনি সঙ্গে করে হাঁটাতে নিয়ে যান না?"

আপনি বললেন, "যাই।"

"আর মনটা প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করবেন। এই সময়ে মেয়েরা বড় ডেলিকেট স্টেট অফ মাইন্ডে থাকে।"

"যথাসাধ্য চেষ্টা করি আমি।" আপনি যেন আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করলেন অমিতাভ। "কিন্তু ও কিছুতে কথা শোনে না। জোর করলে কাঁদে।"

"ঠিক আছে।" ডাক্তার কাজ শেষ করে বলে উঠলেন, "এগুলো চলুক। পনেরো দিন পর আবার দেখিয়ে যাবেন।"

রেখা ঘর থেকে বেরিয়ে এলে পর আপনি চুপি চুপি ডাক্তার বোসকে জিজ্ঞেস করলেন, "চিন্তার কারণ নেই তো?"

চিন্তিত মুখে ডাক্তার উত্তর দিলেন, "না, তেমন কিছু না। একটু রক্তাল্পতা ছাড়া অন্য কোনও উপসর্গ নেই। আর তার ব্যবস্থা তো আমি করছিই। বাচ্চার হার্টবিট স্বাভাবিক, পজিশন ঠিক আছে, কিন্তু যথেষ্ট বাড়ছে না কেন? চব্বিশ সপ্তাহ হল, এখনও এতটুকু থাকবে?"

শুনে আপনার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল।

বললেন, "আগে একটা মিসক্যারেজ হয়েছে, এটাকে বাঁচাতেই হবে যেমন করে হোক।"

ডাক্তার চোখ তুলে আপনার দিকে চেয়ে হাসছেন দেখেও আপনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, "আচ্ছা, আমার নিজের কোনও চেকআপ দরকার মনে করেন তো বলুন।"

"আরে না না। সে সব আমি আগে দেখে নিয়েছি। আপনি ওঁর খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দেবেন একটু। যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে মা আর বাচ্চা দু'জনেরই ক্ষতি হচ্ছে।"

অথচ তার কোনওই কারণ নেই। টাকার অভাব নেই আপনার, রেখার প্রতি মনোযোগের অভাব নেই। তবে কেন রেখা আপনার সন্তানকে পৃথিবীর মুখ দেখতে দেবে না? সেটাকে বঞ্চিত করার জন্যে নিজে পর্যন্ত উপোস করে থাকে?

বাড়ি ফেরার পথে স্টিয়ারিংয়ে বসে আপনার মনে হল চিনে রেস্তোরাঁয় খেয়ে গেলে হয়। রেখাকে সামনে বসিয়ে পেট পুরে খাওয়াবেন ওর যা ইচ্ছে। ও খেলে তবে তো ওর গর্ভের ভেতরের অবোধ প্রাণীটা কিছু ভাগ পাবে। লাল ট্রাফিক লাইটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আপনার চোখে ভেসে উঠল, শীর্ষাসনের ভঙ্গিতে একটা শিশু মুখটা হাঁ করে রয়েছে। অথচ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে, অমিতাভ, আপনি টের পেতেন, গর্ভের ভেতরে অবস্থিত শিশুর খাদ্য শুধুমাত্র তার নাভির মধ্যে দিয়ে যায়। জন্মের আগে সে মুখ খোলে না।

রেখা বাদ সাধল, "না, বাড়িতে রান্না করা আছে, নষ্ট হবে। আগে থেকে ব্যবস্থা করে আর একদিন আসা যাবে।"

'ডেলিকেট স্টেট অফ মাইন্ড' ভেবে আপনি আর জোর করলেন না।

বাড়ি ফিরলেন, তখন ন'টা বেজে গেছে। এসে শুনলেন, আপনার আগেকার প্রাণের বন্ধু নিরঞ্জন এসেছিল সস্ত্রীক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেছে।

একটা ছোট্ট চিরকুটে লিখে রেখে গেছে, "আজ তোমাদের বিয়ের দিন। শুভকামনা জানাতে এসেছিলাম আমরা। তোমরা বাড়ি নেই, নিশ্চিত বাইরে কোথাও সেলিব্রেট করতে গেছ। একগুচ্ছ ফুল রইল, যখনই ফেরো, আমাদের কথা মনে করে গ্রহণ কোরো। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। মৃদুলা/নিরঞ্জন।"

এবার ফুলগুলোর দিকে চোখ পড়ল আপনার। একগুচ্ছ গোলাপ। টকটকে লাল, অন্তত পঞ্চাশখানা। সমস্ত বসার ঘরটা আলো করে আছে।

রেখা বলল, "আর একটু আগে ফিরতে পারলে দেখা হয়ে যেত।"

আপনি বললেন, "আজ বিয়ের দিন ছিল আমাদের। একবারও মনে পড়েনি তোমার? সত্যিই তো, আজ আমাদের সেলিব্রেট করা উচিত ছিল।"

রেখা বলল, "প্রত্যেকটা দিনই তো আমাদের বিয়ের দিন, তাই না? একটা বিশেষ দিনে উৎসব করার কী মানে? তা ছাড়া, তোমারও তো মনে পড়েনি!"

গোলাপের গুচ্ছ আপনি দু'হাতে তুলে নিলেন অমিতাভ। তুলে নিতে গিয়ে দেখলেন, ফুলগুলো আলাদা করে ছেঁড়া। গোলাপের পাতার সঙ্গে সরু কাঠি দিয়ে বাঁধা। আপনি বুঝতে পারলেন, নিরঞ্জন ওগুলো চৌরঙ্গি অঞ্চল থেকে কিনেছে।

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে খুব সস্তায় বিশেষ বিশেষ সময়ে গোলাপ, স্বর্ণচাঁপা, সাদা লিলি বিক্রি করে কয়েকজন লোক। ট্রাফিক আলোয় গাড়ি দাঁড়ালে সামনে এনে মেলে ধরে।

আপনি জানেন, ও-সব কবরের ফুল। সাহেব-মেমদের কবরখানা থেকে চুরি করে আনা।

বিরাট গোলাপের গুচ্ছ নাকের কাছে এনে আপনি গন্ধ শুঁকলেন। জেনুইন। মনে মনে বললেন, "হোক না কবরের ফুল, হোক না সুতো দিয়ে বাঁধা, গোলাপ গোলাপই।"

তারপর রেখাকে ডেকে বললেন, "এই শুনছ, হোক আজ রান্না নষ্ট। না হয়, ফ্রিজে রেখে দিতে বলো। আজ আমরা বাইরে খাব।"

১৯৭৪

মচমচ শব্দ

এক

সত্রাজিৎ সিংহ, বয়েস একষট্টি, মোটাসোটা চেহারা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মাথার চুল বেশিরভাগই কাঁচা, দেওদার স্ট্রিটে তার নিজের বাড়ির একতলায় পুরু গদিমোড়া চেয়ারে বসে ছিল। বেশ বড় ঘরখানা। চারদিকের দেয়ালে সিলিং অবধি উঁচু স্টিলের র‍্যাক বোঝাই আইনের বই আর চামড়া-বাঁধানো আইনের পত্রপত্রিকা। নানাবিধ মামলা-মোকদ্দমায় বিচারের ইতিবৃত্ত। নজির দেখাতে ওগুলো দরকার হয়। উকিলের চেম্বারে গেলে লোকে ওইসব বইয়ের ডাঁই দেখে অবাক হয়, ভাবে, কত-না অধ্যয়ন করলে মানুষ বড় আইনজীবী হয়।

তখন সন্ধে সাতটা হবে। একটু আগে একদল মক্কেল কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল। লোডশেডিং ছিল, এইমাত্র ইনভার্টারের লাল আলো নিবে গিয়ে সবুজ আলো জ্বলল। সাড়ে সাতটায় আর এক পার্টি আসবে।

মাথার ওপর পাখাটা পাঁচ নম্বরে ঘুরছে। একটু কমিয়ে দিলে হয়, ভাবল ও। আবার ভাবল, থাক গে। টেবিলের ওপর থেকে একটা ব্রিফ তুলে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। ভাল লাগছে না। চোখ দুটো জ্বালা করছে। গলার মধ্যে একটু ব্যথা।

একলা চেম্বারে বসে সত্রাজিৎ শুনল, পাড়ার কোনও বাড়িতে আরতির ঘণ্টা বাজছে। টিংটিং টিংটিং টিংটিং। এলোমেলো বাজনা, তবু একটা ছন্দ আছে যেন। শুনতে শুনতে কেমন যেন ঘোরের মধ্যে ঢুকে গেল সে। মনে হল, বসে নেই, দাঁড়িয়ে নেই, শুয়েও নেই, সে যেন বায়ুতরঙ্গে ভাসছে। গায়ের জ্বর উঠতে উঠতে ওই সময় একশো চারে ঠেকেছে।

পাশের ঘরে একজন ক্লার্ক আসে সন্ধেবেলা। স্টেনোগ্রাফার নন্দী আসে। ওদের নিজস্ব টেবিল ছাড়া ও-ঘরে দুটো বেঞ্চি পাতা। সেখানে অপেক্ষমান মক্কেলরা বসে বসে গুলতানি করে। চা আনায়,

সিগারেট আনায়। হাইকোর্টে স্যারের সেদিনকার পারফরমেন্স অ্যাকটিং করে দেখায়।

ডবল বেল বাজিয়ে সত্রাজিৎ স্টেনোকে ডাকল। বলল, "শরীরটা ভাল লাগছে না। আমি ওপরে যাচ্ছি।"

"ওরা এলে, কী বলব?"

"বলবে, কাল সকালে যেন আমায় ফোন করে।"

একটু থেমে আবার বলল, "কুমুদ ডাক্তারকে একটা কল দিয়ে দাও। বাড়ি ফেরার আগে যেন আমায় দেখে যায়।"

কুমুদ ডাক্তার এ-বাড়িতে আসে মাঝে মাঝে। বাড়ির আর তিনজন মেম্বার—সত্রাজিতের ছেলে, ছেলের বউ, আর ওদের আড়াই বছরের বাচ্চা—এদের অসুখবিসুখ লেগেই থাকে। সর্দি কাশি-পেটখারাপ ওদের নিত্যসঙ্গী। লোকে বলে, এইসব অসুখ নাকি গরিব লোকেদের হয়; নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে, যেখানে পুষ্টিকর খাদ্য বা উপযুক্ত জামাকাপড় জোটে না, সেখানেই ওদের প্রকোপ। এ-কথা ভুল; কলকাতা শহরের আবহাওয়া এতই দূষিত, জিনিসপত্রে এতই ভেজাল যে, পয়সাওলা লোকেদেরও নিত্য রোগভোগ থেকে নিস্তার নেই। একদিক থেকে সেটা ভালই। প্রকৃতির নিরপেক্ষতা প্রমাণ করে।

শুধু সত্রাজিৎ সিংহ অ্যাডভোকেটের শরীর নীরোগ। রক্তচাপ একটু ওপরের দিকে থাকে আজকাল, তাও আর সব ব্যাপারের মতো ওর আয়ত্তের মধ্যে। স্ত্রীর অকালবিয়োগ না হলে এটাও হত না। বিপদসংকেত বুঝতে দেরি করেনি সত্রাজিৎ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক বছর কাটতেই ডেকে পাঠিয়েছিল ছেলেকে।

গুলু নিজেও পাশ-করা উকিল। আরও দু'-একটা ডিপ্লোমা জুটিয়েছে। কিন্তু বাবার সঙ্গে প্র্যাকটিসে নামেনি। এখনকার প্রজন্মের অভিরুচি অনুযায়ী একটা বাঁধা চাকরি বেছে নিয়েছে। তার বাইরে ওর জীবন স্বাধীন। নিজের পেশায় আদ্যন্ত ডুবে থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করা কী ব্যাপার, ও স্বচক্ষে দেখেছে। বাবার কর্মব্রতের আদর্শ ওকে উৎসাহিত করেনি। জীবনটা সে নিজের মতো করে উপভোগ করতে চায়, টাকাপয়সা তো উপভোগেরই উপকরণ।

সেই উপভোগে বাধা পড়ল।

সত্রাজিৎ বলল, "গুলু, এবার তুমি বিয়ে করো।"

"বিয়ে? এখনই বিয়ে করার কী হল?"

"যথেষ্ট সময় হয়েছে। এখন তোমার বিয়ে করা দরকার।"

"ভেবে দেখব।" বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল গুলু, তখন সত্রাজিৎ বলেছিল, "তুমি না করলে আমি বিয়ে করব।"

"তুমি?"

"হ্যাঁ", সত্রাজিৎ বলেছিল, "এভাবে চলতে পারে না। বাড়িতে একটা মা না থাকলে চলে? সাদা রং আর ঘামের গন্ধ! দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়।"

"কেন, রান্নামাসি তো আছে।"

"রান্নামাসিকে দিয়ে সংসারের মায়ের কাজ চলে না। ধেড়ে খোকা তুমি এই সামান্য ব্যাপার যদি না বোঝো, না বুঝলে। আমি তোমায় সাত দিন সময় দিলাম।"

ওয়ার্নিং পেয়ে গুলু ছুটল ওর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে। বান্ধবী ছিল চার-পাঁচ জন, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করল। প্রাক্তন বান্ধবী ছিল যারা, যাদের বিয়েথা হয়ে গেছে, ডিভোর্স হয়ে গেছে, তাদের বাড়ি ধাওয়া করল সকাল-বিকেল।

বন্ধুরা সবাই বলল, "বাবাকে বিয়ে করতে দিস না।"

"তা হলে আমার স্বাধীন জীবন? তার কী হবে?"

ওরা বলল, "নতুন মা ঢুকলে তোকে চিরকালের মতো স্বাধীন করে দেবে রাস্তায়। নিজের পায়ে কুড়ুল মারিস না গুলু।"

তা হলে, ওকেই বিয়ে করতে হয়, কিন্তু কার সঙ্গে? ওদিকটা তো ভাবা হয়নি। এ কি জন্মদিন না অন্নপ্রাশন যে, একজন তৈরি থাকলেই হল। আবার বান্ধবীদের খুঁজে বেড়ায়। জনে জনে গিয়ে জিজ্ঞেস

করে, "আমাকে শিগগিরই একটা বিয়ে করতে হবে। তুই আমায় বিয়ে করবি?"

মেয়েদের যেমন স্বভাব, এই কথা শুনে ঠোঁট ওলটায়।

"শাড়ি দেব, গয়না দেব।"

"না, বাব্বা! কী দরকার!"

"ভালবাসব। এখনই কত ভালবাসি, তখন আরও বাসব।"

"ধুর!"

"সব সময় তোকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকব।"

গুলুর বুকে ঘুঁষি মেরে ওরা বলে, "ওয়াক! শুনলে বমি উঠে আসে।"

"আমাকে তোর পছন্দ নয়, বললেই পারতিস সাফ সাফ", গুলু হতাশ হয়ে বলে শেষের জনকে, "তা হলে, আমার বাবাকে বিয়ে কর। খুব রেস্‌পন্‌সিবল টাইপ। বেশ মজা হবে। তুই আমার সৎ-মা হয়ে থাকবি। আবার বন্ধুও।"

তখনই আসল কথা বেরিয়ে আসে। ওইসব চামড়া-বাঁধানো দুষ্টুদের কথা।

"ওই বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! ওখানে কে ঢুকবে!"

ভেবেছিল, ওরা সব প্রাণের বন্ধু, আসলে কেউই তা নয়। ওদের সকলের মনের কথা একজনের মুখ থেকে জেনে গুলুর চোখ খুলে যায়। খোলা চোখ জলে ভরে যায়। পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই। অগত্যা সে পাঁচ দিনের মাথায় বাবার কাছে ফিরে গিয়ে বলেছিল, "ঠিক আছে।"

"কী ঠিক আছে?"

"আমিই বিয়ে করব।"

সত্রাজিৎ তখন জানতে চায়, বিশেষ কাউকে পছন্দ করা আছে কিনা। তার উত্তরে গুলু মাথা নিচু করে মাথা নাড়ে। ওর শিরদাঁড়ায় মচমচ শব্দ হয়। ভারী করুণ সেই আত্মসমর্পণের দৃশ্য।

সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়াব পর তাকে কাজে পরিণত করতে সত্রাজিতের বেশি সময় লাগেনি। বার লাইব্রেরীতে বসেই কথা হয়। তারপর বিয়ে হয়। উকিলের মেয়ে কুসুম এ বাড়ির পুত্রবধূ, এখন একটি বাচ্চার মা।

বাড়ির দমবন্ধ আবহাওয়া এখন আর নেই। সত্রাজিতের রক্তচাপ আর বেশি বাড়েনি, কিন্তু যতটুকু উঠে গেছে, গেছেই। ওষুধ খেয়ে আর কুসুমের শুশ্রূষায় শারীরিক অস্বস্তি বলতে কিছু তার ছিল না। কাজে অবসর এত কম যে, মৃতা স্ত্রীকেও আজকাল আর মনে পড়ে না ভাল করে। কুসুমের মতোই ছিল বোধহয় দেখতে? নাকি, আর একটু মোটাসোটা! চটজলদি স্মৃতির অতলে তো ডুব দেওয়া যায় না। দিলে কেবল ওপরের স্তর থেকে ভুসভুস করে উঠে আসে যত সব কেস-ল। অপযুক্তির কচকচি। আর মৃত জজেদের মুখ।

বাড়ির কর্তার একশো চার জ্বর। সকলে তটস্থ, উদ্বিগ্ন। কুসুম নিজের আন্দাজমতো একটা জলপটি বানিয়ে শ্বশুরের কপালে রেখেছে। ফিডিং কাপে জল নিয়ে শিয়রে বসা। এত কাছ থেকে শ্বশুরের মুখখানা ও কখনও দেখেনি। যেন ঠিক রাবণের মতো। ঘন ঘন গরম নিশ্বাস পড়ছে। ওই প্রকাণ্ড কপালে ওইটুকু জলপটি যেন ইডেন গার্ডেনের ক্রিকেট পিচ! মনে হতেই হাসি পায়। কিন্তু হাসবার সাহস নেই।

বেশি রাত্রে কুমুদ ডাক্তার এল।

নাড়ি দেখল। জিভ দেখল। বুক-পিঠ ভাল করে পরীক্ষা করল। প্রেশার দেখতেও ভুলল না।

সত্রাজিৎ জিজ্ঞেস করল, "ম্যালেরিয়া?"

"না।"

"টাইফয়েড?"

"না।"

"সিরিয়স কিছু নিশ্চয়ই। হেপাটাইটিস?"

কুমুদ ডাক্তার এবার হেসে ওঠে। বলে, "আমার মনে হয়, ভাইরাল ইনফেকশন।"

অসন্তুষ্ট সত্রাজিৎ গজগজ করতে থাকে।

"ভাইরাল ইনফেকশন! চমৎকার বার করেছ তোমরা! ইংরিজিতে না বলে সরল বাংলায় বলো না কেন, 'আমি জানি না।' অ্যান্টিবায়োটিক গেলাবার জন্যে শক্ত শক্ত নাম বলতেই হবে?"

ডাক্তার বলল, "অ্যান্টিবায়োটিক না দিলে এ-জ্বর একশো ছয়-সাতে উঠে যাবে। তখন? বেলুন ফেটে গেলে— ?"

শিয়রে বসা বউমাকে উদ্দেশ করে ডাক্তার বলল, "সাতদিন কমপ্লিট রেস্ট। নো মক্কেল, নো ব্রিফ, নো টেলিফোন। যন্তরটা ঘর থেকে বার করে দাও। জ্বরটা কমতে দেরি হলে চিন্তা করার কিছু নেই। বড় পাজি এইসব ভাইরাস।"

"আমার শরীরে ঢুকল কী করে?" সত্রাজিৎ আহত স্বরে তর্ক করে।

"ঢুকলেই হল। ইমিউন সিস্টেম ভেঙে পড়ছে দেখলেই এরা এসে জোটে। কাগজে কত রকম লেখা বেরোচ্ছে এই নিয়ে, পড়েননি?"

"আমার ইমিউন সিস্টেম ভাঙবে কেন, ডাক্তার?"

"স্ট্রেস থেকে।"

"স্ট্রেস কোথায়? লোকেদের হয়ে মামলা লড়ি। কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেলেই ভুলে যাই। স্ট্রেস তাদের, আমার কোনও স্ট্রেস নেই।"

"আপনার মনে কোনও দুশ্চিন্তা নেই বলছেন? কোনও উদ্বেগ নেই? ঘুমের মধ্যে কলিংবেল শুনে জেগে ওঠেন না হঠাৎ? কড়ানাড়া? টেলিফোন? স্বপ্ন ছিঁড়ে মোটরের হর্ন বাজে না?"

খানিকক্ষণ ভেবে, চিন্তা করে, সত্রাজিৎ বলে, "বাজে। দেশের জন্যে বড় কষ্ট হয়। দারিদ্র্য, অশিক্ষা। কী যে হবে দেশটার। নির্ভর করা যায়, এমন একজন নেতা নেই। চারদিকে চুরি, জোচ্চুরি, শোষণ! আমরা কিছু করতে পারছি না!"

"সব চিন্তাভাবনা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিন," যাবার আগে ডাক্তার বলে গেছে, "নইলে অসুখ সারবে না। নানা রকম নতুন রোগ এসে জুড়ে বসবে। ডায়াবিটিস, ইসকিমিয়া, আলসার, ক্যান্সার—"

সত্রাজিৎ শুনে গেল চুপ করে। চোখ বুজে।

দুই

লোকে যে রকম সিগারেট ছেড়ে দেয় এককথায়, মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়, তেমনই এককথায়—কুমুদ ডাক্তারের একটা কথায়—সব ভাবনাচিন্তা ছেড়ে দিল সত্রাজিৎ। নিজেকে নিয়ে, পরিবারের লোকজনদের নিয়ে, টাকাপয়সা নিয়ে তেমন কোনও উদ্বেগ ওর ছিল না। দেশের জন্যে যতটুকু ছিল, তা-ও মাথা থেকে নামিয়ে দিল। মাথা হালকা। এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

কুসুম যত্ন করে। শ্বশুরের কথা শোনে। সিঁথিতে সিঁদুর না দিয়ে আগে লিপস্টিক দিত। শ্বশুরের কথায় আবার সিঁদুর দিচ্ছে।

স্বাভাবিক খাবার খেতে বলেছে ডাক্তার। কিন্তু মুখে অরুচি। কুসুম নিজের হাতে গরম সুপ রান্না করে দেয়, টোস্ট দিয়ে তাই তৃপ্তি করে খায়। খাটে শুয়ে শুয়ে সে জ্বরের ঘোর বেশ উপভোগ করে। কখনও এপাশ ফেরে, কখনও ওপাশ ফেরে, কখনও উঠে বসে বালিশ চটকায়। খাটটা একটু মচমচ করলে খুঁজে দেখে কোন জায়গা থেকে শব্দ আসছে। কোন জোড়ে ব্যথা লাগছে ওটার। খাট-বিছানার সঙ্গে এত নিবিড় পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা, আগে কখনও হয়নি তো। এখন মনে হয়, ওটা তো আসবাব নয়, যেন একটা বিশাল কোল। যেন মা।

এক-এক সময় এই মায়ের সঙ্গে খুনসুটি করতে ইচ্ছে হয় ওর। ছোটবেলায় যেমন করত। চিমটি কাটত মাকে। কামড়ে দিত। চুল ধরে টানত পেছন থেকে। মা বলত, আঃ লাগছে! বেশি লাগলে মা থাপ্পড় মারত গালে। আবার কোলে তুলে নিত আদর করে। আসলে, ছেলে তো মায়েরই গা, মারলে নিজেরই লাগত।

কেমন দেখতে ছিল মা? মনে করার চেষ্টা করে সত্রাজিৎ। মনে পড়ে না। মায়ের একটি ছবিও বাড়িতে নেই। নাকি আছে? কোথাও যত্ন করে ঢোকানো আছে? একদিন কুসুমকে খুঁজে দেখতে বলবে।

একদিন দুপুরে কী মনে করে, বিছানায় উলটো করে শুল সত্রাজিৎ। মাথার কাছে পা। পায়ের কাছে মাথা। আরে, ঘরটাকে একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে! বাঁ-দিকের জানলা ডান দিকে এসে গেছে। ডান দিকের ক্যাবিনেট বাঁয়ে। শিয়রের ওপর দেয়ালে যিশুর এমন সুন্দর একটা ছবি টাঙানো ছিল,

কোনওদিন মন দিয়ে দেখেনি, এখন সেটা চোখের একদম সামনে। শুয়ে শুয়ে যিশুর ছবি দেখতে ভারী আরাম।

পাশ ফিরতেই আটকে গেল ওর নজর। খাটের গায়ে সরু একটা ছিদ্র।

দুটো তক্তার জোড়ের মুখটায় একটা সরু ছিদ্র। অনেকক্ষণ ধরে ও দেখল গোল ছিদ্রটাকে। কোথা থেকে এল ওটা? পোকায় কেটেছে? না। কেউ পেরেক পোঁতার চেষ্টা করেছে ওখানে? মনে হয় না। তা হলে! ওখানে একটা কীল ছিল সম্ভবত। কীলটা পড়ে গেছে। পুটিং আলগা হয়ে যাওয়ায় খসে পড়ে গেছে কাঠের কীলটা। কত গভীর ওই ছিদ্র, ওর যাচাই করতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কড়ে আঙুলও ঢুকল না।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ওর চোখে পড়ল, জানলার পাশে ছোট টেবিলটার ওপর কাচের গ্লাস চাপা দেওয়া একটা কাগজ। ওর ডানদিকে এখন। গিয়ে দেখল, ওটা কুমুদ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন। হোক গে।

কোণ থেকে প্রেসক্রিপশনটা পাকাতে শুরু করে সত্রাজিৎ। কেউ দেখছে না তো? না। পাকাতে পাকাতে ওটা সরু কাঠির মতো হয়ে যায়। বেশ লম্বা—প্রায় পাঁচ-ছ' ইঞ্চি। এটা ঢুকিয়ে ছিদ্রের গভীরতা পরখ করা যাবে। কতদূর যায়, দেখা যাক। ভেতরে কোনও পোকা-দম্পতি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে নিশ্চিন্তে বসবাস করছে কিনা, দেখা যাক। ওরা কি কোনওদিন ভেবেছিল, ওই অন্ধকার নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে কেউ ওদের খুঁচিয়ে বার করবে? ভাইরাল ইনফেকশনে জ্বরের ঘোরে না পড়লে সত্রাজিৎ নিজে কি কোনওদিন ওদের সন্ধান করত? করত না। কেউই করত না। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। এখন এই শলাকা যাচ্ছে, সে তোমাদের স্পর্শ চায়। হে কীট-দম্পতি! আস্তে আস্তে কাঠিটা ছিদ্রের মধ্যে ঢোকাতে থাকে ও।

আর তখনই, খানিকটা জ্বরের ঘোরেই, ওর মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরোয়, "মামিমা, আমি জানি।"

বারো বছর বয়সের একটা স্মৃতি ওর চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। একদম ভুলে যাওয়া, চাপা-পড়া ঘটনা কোন ছিদ্রপথ দিয়ে ওপরে উঠে এল? হতভম্ব হয়ে বসে পড়ে সত্রাজিৎ। দেখতে দেখতে বিছানাটা আরও বড় হয়ে যায়, আরও মোটা, খাটের পায়াগুলো সিংহের থাবা পেয়ে আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

মচমচ শব্দ হয়। সত্রাজিৎ জ্বরের ঘোরে অস্পষ্ট শুনতে পায়, দূরে কেউ বলছে, কাঁটা বার করে দে, ওরে আমার লাগছে। কাঁটা বার করে দে!

পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি ছিলই, পায়ে চটিজোড়া গলিয়ে ও নীচে নামল দ্রুত। হাঁক দিল, "প্রফুল্ল, গাড়ি বার করো।"

নীচের তলায় আড্ডা জমেছিল বেশ, পোড়া বিড়ির গন্ধে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। ভেঙে গেল আচমকা। এর মধ্যে সাহেবের অসুখ সেরে যাবে, কে ভেবেছে! লাল টুকটুকে মারুতিখানা নিয়ে প্রফুল্ল নিঃশব্দে হাজির হয় দরোজার মুখে। সত্রাজিৎ বলে, "আহিরিটোলা চলো।"

"আহিরিটোলা? মানে, শোভাবাজার, বাগবাজার—ওই দিকে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ. কলকাতায় গাড়ি চালাও আর আহিরিটোলা চেনো না?"

প্রফুল্ল বলে, "কার বাড়ি স্যার? ওদিকটায় কখনও যাইনি তো।"

"চলো না। যেতে যেতে খুঁজে নেব। একসময় আমি ওই পাড়ায় থাকতাম। আমার নখদর্পণে ওই অঞ্চল।"

রবীন্দ্র সরণি ধরে সোজা উত্তরে গিয়ে জোড়াসাঁকো ছাড়িয়ে গাড়ি থামল। এই দিকে কোথাও আহিরিটোলা। আহিরিটোলায় কোথাও মামার বাড়ি। বাড়ির চেহারাটা নখদর্পণে বলা যায়, কিন্তু পাড়াটা একেবারে স্মৃতির বাইরে চলে গেছে।

খুঁজতে খুঁজতে একটা স্টিম লন্ড্রির সামনে গাড়ি থামাল সত্রাজিৎ। নাম স্নো-হোয়াইট। মনে মনে আওড়াল, 'তোমাকে আমি চিনি।' ভেতরে একটি মাঝবয়সি লোক চশমা পরে খবরের কাগজ পড়ছে। দোকানে আর কোনও লোক নেই, সে একা। সত্রাজিতের মনে হয়, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, ওর বাবা কি ওর ঠাকুরদা ওইখানে ঠিক ওইভাবে দুপুরবেলা বসে কাগজ পড়েছে। দৃশ্যটা বদলায়নি একটুও।

স্নো-হোয়াইট স্টিম লন্ড্রির মধ্যে সে নিজেই ঢুকে যায় হন্তদন্ত হয়ে।

জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, আহিরিটোলায় অনাথ দত্তর বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?"

“ঠিকানা?”

“সঙ্গে নেই। খুব পুরনো বাসিন্দা এখানকার।”

“পুরনো বাসিন্দা? বনেদি?” লোকটা কাগজ থেকে মুখ তুলে বলল, “তারা সব হারিয়ে গেছে ভিড়ে। পার্টিশনের পর পয়সাওলা রিফিউজিরা কলকাতায় এসে ওদের কোণঠাসা করে দিয়েছে, জানেন তো। বস্তি তুলে, পুকুর বুজিয়ে নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। তারাই মাতব্বর। আহিরিটোলা বাজারে যান, দোকানদার খদ্দের কারুর মুখে আর পিয়োর বাংলা ভাষা শুনতে পাবেন না। এত বছর হয়ে গেল, কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে ইশে-দিশে চালিয়ে যাচ্ছে। ভাবতে পারেন,—”

সত্রাজিৎ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “আদি স্নো-হোয়াইট লন্ড্রির সাইনবোর্ড দেখে ভাবলাম, যদি হাতবদল না হয়ে থাকে, তবে এর মালিক এখানকার খাস নিবাসী হবেন।”

“চার জেনারেশন। আমি অবধি টিকিয়ে রেখেছি। এর পর আর থাকবে না। কী নাম বললেন?”

“অনাথ দত্ত।”

“এই নামে কাউকে চিনি না। তবে, অনাথ দত্ত লেন বলে একটা গলি আছে। একটু এগিয়ে, বাঁয়ে—”

তাই তো!

উঁচু দেয়ালে নীল রঙের কলাই-করা প্লেটে দাদুর নাম দেখে অবাক হয়ে যায় সত্রাজিৎ। মনে মনে বলে, দাদু, তুমি অমর হয়ে গেছ। কত পুণ্য করেছিলে বলে আজ তোমার নামে গলি পেলে। তুমি তো ভিড়ে হারিয়ে যাওনি!

একটু ভেতরে ঢুকে বাড়িটা চিনতে পারল। দু'দিকে গেট। গেটের গায়ে ছোট ছোট কাঁঠালের মতো ঝুলছে লেটারবক্স—বি. এন. দত্ত, সি. এন. দত্ত, ডি. এন. দত্ত, কে. এন. দত্ত। দুই গেটের মাঝখানে গাড়িবারান্দা। লম্বা মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়ির কোলে টাইপিস্টদের কারখানা। জলস্রোতের মতো টাইপের কাজ চলছে।

এই বাড়িতে অনেকবার এসে থেকেছে সত্রাজিৎ। একবার দশ-বারো বছর বয়েসে। তখন দাদু বেঁচে নেই। দুই মামা ছিল। মামিরা ছিল। মামিদের ছেলেমেয়েরা ছিল। এই বাড়ির ভেতরে উঠোনে কত খেলা করেছে ওরা। কত গুন্ডামি করেছে।

না, সময় নষ্ট করা চলবে না। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। বুকের মধ্যে কেমন একটা চাপ। ভাইরাসগুলো বিদেয় হয়নি। না, ঘাবড়ালে চলবে না। ভুললে চলবে না, ও একটা কাজ নিয়ে এসেছে। খুঁজে বার করার কাজ। পঞ্চাশ বছরের অন্ধকার থেকে একটা কাঁটা— তাকে আলোয় নিয়ে আসা।

দুপুর শেষ হয়েছে প্রায়। বাড়িটা শুনসান। বাইরে থেকে দেখল, উঠোনে তিনটে তোলা উনুন থেকে ধোঁয়া উঠছে।

সত্রাজিৎ গাড়ি থেকে নেমে সোজা ঢুকে গেল ভেতরে। প্রথমে যার সঙ্গে দেখা হল, মাঝবয়েসি এক মহিলা চুল বাঁধছে, তাকে বলল, “আমি সত্রাজিৎ সিংহ। ডাকনাম 'সতা'। পুষ্প আমার মায়ের নাম।”

চুল ছেড়ে মহিলা উঠে দাঁড়ায়। সন্দেহের চোখে তাকায়। পুষ্প।

বলে, “আপনি একটু দাঁড়ান। ওকে ডেকে দিচ্ছি।”

“আমার হাতে বেশি সময় নেই। গায়ে জ্বর। একটা খুব দরকারি জিনিস সার্চ করতে এসেছি।”

মহিলা দ্রুত ঘরের ভেতরে চলে যায়। খানিকটা ভয়ই পেয়েছে বোধহয়। একটু পরে ঘরের মধ্যেকার কথোপকথন ওর কানে আসে।

নারী কণ্ঠ : বলছে, পুষ্পর ছেলে।

পুরুষ কণ্ঠ : পুষ্পপিসির ছেলে? তা, কী চায়?

নারী কণ্ঠ : বলছে, সার্চ করবে।

পুরুষ কণ্ঠ : পুলিশ?

নারী কণ্ঠ : পাজামা-পাঞ্জাবি পরা। ভদ্রলোকের মতো দেখতে। কী করে বলব পুলিশ কিনা! বলছে সময় নেই। গায়ে জ্বর।

পুরুষ কণ্ঠ : গায়ে জ্বর নিয়ে কী সার্চ করবে পুষ্পপিসির ছেলে? বাড়িতে ছেলেরা কেউ নেই। ভুতুকে ডাকো না।

নারী কণ্ঠ : এই সময় কেউ থাকে? তুমি একটু বেরোও।

পুরুষ কণ্ঠ : আমি খোঁড়ামানুষ, কী করে বেরুই? ওকেই ডেকে আনো। আর ও-বাড়িতে খবর দাও, ছেলেরা কেউ ফিরলেই যেন এখানে চলে আসে। যতসব উৎপাত এই দুক্যুরবেলা—

সত্রাজিৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে, একটা প্রকাণ্ড খাট। টেবিলের মতো উঁচু। মোটা গদি তার ওপর। খাটের দু'পাশে ফুলকাটা ফ্রেম। ওপরে মোটা ছত্রির ওপর মশারি তুলে রাখা। একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ তার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পা দুটো ফোলা। লাল মেজের ওপর শূন্যে দুলছে। ঘরে আলো কম। স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ।

"এটা কি দাদুর খাট?" প্রথমেই ও জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি দুলুদা, না বুলুদা? আমি সতা।"

"ও, সতা! এবার চিনতে পেরেছি। বড় উকিল হয়েছ। আমি দুলুদা।"

"বুলুদার খবর কী?"

"বুলু তো মারা গেছে অনেকদিন। ওর ছেলে আছে।"

"খুব বুড়ো হয়ে গেছ। অসুস্থ?"

"পা দুটো গেছে। দাঁড়িয়ে আছ কেন, বোসো। ওগো, সতাকে বসতে একটা মোড়া দাও। ওঃ, কতদিন পর দেখা! একেবারে যোগাযোগ নেই তো—" বৃদ্ধ কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বলল।

"আমি একটু শোব। আমার গায়ে জ্বর।"

"কী বললে? বসবে না, শোবে? কেন? এখন শোবার কী হয়েছে? ওগো, ওই গ্রুপছবিটা পেড়ে দাও না।"

সত্রাজিৎ চোখ তুলে ময়লা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখে, ছোট বড় নানা সাইজের ফ্রেমে বাঁধানো একরাশ ফটোগ্রাফ টাঙানো রয়েছে ঘরময়। মহিলা চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে। ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

দুলুদা বলল, "ওই কোণের ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখো। ঠাকুরদা, ঠাকুমা তখন দু'জনেই বেঁচে। বাবা, মা, কাকা, কাকিমা, পুষ্পপিসি—সবাই আছে ওই ছবিতে। নীচে-বসা আমরা ভাইবোন সবাই। তুমিও আছ ওর মধ্যে। পিসির কোলে। হে, হে, সবকিছু কত বদলে যায়।"

সত্রাজিৎ বলল, "আমার যখন বারো বছর বয়েস, তখন কারুর বিয়েতে একবার এখানে এসেছিলাম। ওই উঠোনে ভিয়েন বসেছিল। বিশাল কড়াইয়ে পান্তুয়া ভাজা হয়েছিল মনে আছে।"

"হ্যাঁ। তখন তো কেটারার হয়নি।"

"আমরা চুরি করে গরম ছানা খেতাম।"

"তাই বুঝি? তোমার মনে আছে? আমার কিছু মনে নেই।"

"সেই গরম ছানা খেয়ে আমার টাইফয়েড হয়। অনেকদিন ভুগেছিলাম। তোমার ওই খাটটায় শুয়ে থাকতাম। আর জানলা দিয়ে বিকেলের রোদ দেখতাম। আমি আর একবার ওই খাটে শোব দুলুদা।"

দুলুদা এবার চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ।

"বিশ্রাম করবে?"

"না, একটা জিনিস খুঁজব।"

"কী বলছ তুমি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বাপু। এখানে খোঁজার কী আছে? তুমি কি কোনও গুপ্তধনের সন্ধানে এসেছ?"

"গুপ্তধন? তা বলতে পারো দুলুদা।"

"এখানে কোনও গুপ্তধন নেই।"

"একটু শুতে পেলেই আমার সব মনে পড়ে যাবে। তোমরা কিছু মনে কোরো না। আমি কোনও ক্ষতি করব না। আমাকে মিথ্যে সন্দেহ কোরো না প্লিজ! আমার গায়ে জ্বর।"

এরপর আর অনুমতির অপেক্ষা না-করেই সত্রাজিৎ লাফিয়ে বিছানায় উঠে যায়। খাটটা মচমচ করে ওঠে।

চারজন মানুষ শুতে পারে পাশাপাশি, এত বড় খাট। সত্রাজিৎ বিছানায় গড়াগড়ি দেয় কিছুক্ষণ। গন্ধ শোঁকে। অনেকদিন পর একখানা মোটাসোটা শরীর পেয়ে খাটটা নানা রকম শব্দ করে। ব্যথায় না

পুলকে, সামান্য মানুষের তা বোঝার ক্ষমতা নেই।

খাটের এককোণে বসে দুলুদা ওর কাণ্ড দেখছে। চৌকাঠ থেকে সরে এসে ওর বউ স্বামীর পেছনটিতে দাঁড়িয়েছে। এক-একবার দরোজার দিকে তাকাচ্ছে, যদি বাড়ির ছেলেরা কেউ এসে পড়ে এই সময়ে তো নিশ্চিন্ত হয়।

"তোমার চশমাটা দাও তো দুলুদা।" সত্রাজিৎ বলল।

দুলুদার চশমা পরে সত্রাজিৎ খাটের কোণগুলো তল্লাশ করে। শুয়ে শুয়ে গড়াগড়ি খায় আর খোঁজে। কত পুরনো খাট। পালিশ মরে মরে কালো হয়ে গেছে ওর গা। ফাঁক হয়ে গেছে জোড়গুলো।

"একদিন সকালে মামার দেওয়া কিছু টাকা এই বিছানার ওপর রেখেছিল মামিমা। রেখে চলে গিয়েছিল। আমি তো জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান। দুপুরবেলা টাকাগুলো গুনে আলমারিতে রাখতে গিয়ে দেখে, একটা নোট কম। কোথায় গেল? কে নিয়েছে? এই নিয়ে বাড়িতে দারুণ হইচই। তখন দশ টাকার দাম কম ছিল না! এখনকার একশো টাকারও বেশি। হইচই তো হবেই।"

হঠাৎ কথা থামিয়ে সত্রাজিৎ বলে ওঠে, "একটা দেশলাই কাঠি দাও তো।"

"চুলের কাঁটা দিলে হবে? দেশলাই তো হাতের কাছে নেই।"

"তাই দাও।"

একটা বিশেষ জায়গায় সত্রাজিতের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। দুই তক্তার জোড় যেখানটায় সেখানে একটা গর্ত। কীল ছিল, পড়ে গেছে কবে! একটা ছোট্ট গোলপানা অন্ধকার বসে আছে ওইখানটায়। মনে মনে বলল, পেয়েছি।

"মামিমা জিজ্ঞেস করেছিল, সতা, তুই জানিস বাবা? টাকাটা কোথায় রাখলাম? কাকে দিলাম? আমি জ্বরের ঘোরে বলেছি, জানি না তো।"

চুলের কাঁটা ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে—আস্তে আস্তে—একটা পাকানো কাগজ টেনে বার করল সত্রাজিৎ। পাকানো কাগজটা খুলে দেখাল।

"এই দেখো, সেই দশ টাকার নোট। সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুখের ছাপ। এখনও তেমনই নতুন আছে। একটুও টসকায়নি।"

টাকাটা মুঠোর মধ্যে চেপে কাত হয়ে শুয়ে পড়ে সত্রাজিৎ। জ্বরটা বাড়ছে। বাড়ুক। আর একটু বলা বাকি আছে।

"জ্বরের ঘোরে সেদিন কখন উঠে বসেছিলাম বিছানায়। ওই গর্তটা দেখে ইচ্ছে হয়েছিল, ওর গভীরতা কত মেপে দেখি। দেখি পাতাল অবধি গেছে কিনা। কৌতূহল। তখন হাতের কাছে টাকাগুলো দেখে একটা নোট তুলে নিই। পাকিয়ে ঢুকিয়ে দিই। ঢুকিয়ে আর বার করতে পারি না। পাক খুলে গিয়ে নোটটা ভেতরে আটকে যায়। আবার জ্বরের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিশ্চয়। কী করেছি, কিচ্ছু মনে ছিল না। মামিমা জিজ্ঞেস করল কতবার, সতা, কেউ নিয়েছে, বলেছি, জানি না। কত হইচই হল বাড়িতে, তবু মনে পড়েনি।"

সত্রাজিৎ যেন প্রলাপের মতো বকে যাচ্ছে আর হাঁপাচ্ছে।

"পঞ্চাশ বছর ভুলে ছিলাম। পঞ্চাশ বছর আমার কোনও অসুখ করেনি, জানো দুলুদা। এই সেদিন চেম্বারে বসে বসে জ্বর এল তেড়ে। ডাক্তার বলল, ভাইরাল ইনফেকশন। ছেলেমানুষদের ব্যারাম। সাতদিন বিছানায় শোয়া। জ্বরের ঘোরে বিছানায় গড়াগড়ি দিই। জ্বর নামে না। মাথায় যন্ত্রণা। বুকে চাপ। আর তাতেই—ওঃ, কী আরাম লাগছে, কী বলব।"

দুলুদা আর তার বউ নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ওদের চোখে-মুখে আর ভয় নেই। তার বদলে শুভ্র ফেনার মতো গুরুজনসুলভ মমতা।

"ঘুমোক। একটু ঘুমিয়ে নিক বেচারা," দুলুদা বলল, "চশমাটা আমায় এনে দাও। আর লাঠিগাছটা দাও। একটু বাইরে গিয়ে বসি।"

দুলুদার বউ কোনও প্রতিবাদ করে না। স্বামীকে ধরে ধরে বাইরে নিয়ে আসে। যাবার আগে ঘরের বাতি নিবিয়ে দেয়।

বাইরে টাইপরাইটারের শব্দ কমে এসেছে। আহিরিটোলার পুরনো পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে সন্ধে আনার আবহমান শাঁখ বাজছে তখন।

১৯৯০

পানতুয়া

ওর নাম মুকুল।

মুখখানা কালো, লম্বাটে। ছোট ছোট চোখ, নাকটা ওপরদিকে চাপা। উঁচু কপাল। মাথার চুল ডগার দিকটা লালচে, ফাটা ফাটা। আজকে অবশ্য বেশ খানিকটা তেল মেখে চান করেছে। চুলের গোড়ায় রবারব্যান্ড বেঁধেছে।

মুকুলের বয়স নয় হতে পারে। আবার বারোও হতে পারে। পনেরো হলেও আমি আশ্চর্য হব না। আজকে পুজোর দিন, ওর গায়ে নতুন ফ্রক—সবুজ পাতার ওপর লাল ফুলছাপা। বড় বড় ফুলছাপা। ওর গায়ের হাড়-মাংস দেখে ওর বয়স বোঝার উপায় নেই। ও এখন মুকুল, হঠাৎ ফুল হবে একদিন ওর সহজাত অপুষ্টি সত্ত্বেও, যখন ওর গলা আর শরীরের লুকোনো গ্রন্থিগুলো থেকে হুড়হুড় করে রস গড়াতে শুরু করবে। সেই রস প্রাকৃতিক নিয়মে রক্তের সঙ্গে মিশে ওকে রাতারাতি করে তুলবে নারী—নধর, আকর্ষণীয় যুবতী। তখন মুকুলের মা তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে কোনও ইলেকট্রিক মিস্তিরি বা হোটেলের বেয়ারার সঙ্গে। কি ঝকঝকে কোনও হকারের সঙ্গে। একমাথা মেটে সিঁদুর মেখে, লাল শাড়ি পরে, ট্যাক্সি চড়ে মুকুল চলে যাবে কাঁকুলিয়ার বস্তি থেকে ড্যাং ড্যাং করে বেহালায় বা কাশীপুরের বস্তিতে। বার বার বাচ্চা আসবে ওর পেটে। সবগুলোকে মুকুল শেষ অবধি ধরে রাখতে পারবে না। আজন্ম অপুষ্টি ওকে মানুষ-জীবনের দায়িত্ব বহন করার ক্ষমতা তো দেয়নি। তারপর একদিন ও আর সব বউ-ঝির মতো রোগা ফ্যাকাশে অ্যানিমিক স্ত্রীযোনিসর্বস্ব এক মানুষমূর্তি হয়ে বাবুদের বাড়ি কাজে লেগে যাবে। মুকুলের মা যেমন লেগে গেছে।

কলকাতা শহরে উঁচু উঁচু বাড়ি উঠছে দেদার। এক-একটা বাড়িতে একশোটা করে সংসার, পাঁচ-সাতশো মানুষ। সকলেরই ঠিকে ঝি চাই। কোনও বাড়িতে একটা, কোনও বাড়িতে দুটো-তিনটে। একজন সকাল-বিকেল বাসন মেজে দিয়ে যায়, একজন হয়তো কাপড় কেচে দিয়ে যায়। যে-সংসারে বউদি রান্না করে না, সেখানে রান্নাটাও দু'ঘণ্টার ঠিকে কাজ। মাছ-মাংস, ফুলকপির তরকারি, রুটি-পরোটা তৈরি করে হাত ধুয়ে চলে যায় ঠিকে-ঝি। ওদের এখন খুব চাহিদা। ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িতে দিন-রাত বাইরের লোককে থাকতে দিতে হয় না। খেতে দিতে হয় না। কাজটুকু নিয়ে ছেড়ে দেওয়া।

মুকুল কিন্তু আজ এখানে খেতে বসেছে।

ধোয়া কলাপাতার ওপর লম্বা লম্বা বেগুনভাজা। ধুতির ওপর গামছা-পরা একজন মোটামতন দাদাবাবু দু'হাতা গরম গরম খিচুড়ি দিয়ে গেল ওর পাতে। ওঃ, তার মধ্যে এত বড় বড় ফুলকপি। মুকুল এদিক-ওদিক তাকায়, খিচুড়ি তোলে আর গেলে। ওর মাথা ঝুঁকে রয়েছে পাতের ওপর, বেঞ্চিতে-বসা শরীরটা প্রায় নিস্পন্দ, কেবল মাদুলি-পরা ডান হাতটাই নড়ছে দেখা যায়।

কে যে এতবড় একটা মাছের ল্যাজা থপ করে ওর পাতে ফেলে দিয়ে চলে গেল, মুকুল দেখতে পায়নি। অবাক হয়ে মাথা তুলতেই চোখ পড়ল। ওর নাম কৌশিক না। পাঁচতলার পশ্চিম দিকের ফ্ল্যাট, যাদের সবুজ রঙের গাড়ি আছে, সেই বাড়ির ছেলে। মুকুলের মা ওই বাড়িতে রান্নার কাজ করে সকালবেলা। মুকুলের মা কৌশিকদার কথা বলে বাড়িতে, ওর নাকি খিদে খুব বেশি। এক ঘণ্টা-দু'ঘণ্টা পর পর ওকে কিছু-না-কিছু খেতে দিতে হবে। না হলে বিস্কুট-জ্যাম-চানাচুর সব শেষ করে দেবে, পিঁয়াজ-টমাটো কেটে খেয়ে ফেলবে, এমন খিদে-পাগল ছেলে ওই কৌশিকদা। মুকুলের মাকে তাই রোজ আপিসের ঝোল-ভাত, রাত্তিরের রুটি-তরকারি, মাংস রেঁধে আবার একবাটি হালুয়া কি সুজির পায়েস করে রেখে আসতে হয়।

কৌশিকদা বলল, "খা, পেটভরে খা।"

পেটভরেই তো খাচ্ছে। এতবড় মাছ জন্মে কখনও খেয়েছে নাকি? এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে দেখল, লোকেদের পাত পরিষ্কার হয়ে আসছে, অথচ মুকুলের কাঁটা চোষা আর শেষ হচ্ছে না।

হঠাৎ একসময় মুকুল বিরাট হল্লা শুনে ভয়ে চমকে ওঠে। না, ভয় পাবার কিছু নেই। মা দুর্গার জয়ধ্বনি দিচ্ছে ওরা।

আবার সমবেত জয়ধ্বনি শোনা যায় পুজোমণ্ডপে: বোলো বোলো, দুর্গা মাইকি—জয়!! দুর্গা মাইকি জয়!!

জয়ধ্বনিতে যোগ দিতে পারে না মুকুল। ও তো এখানকার কেউ নয়। ওর ছোট বোন আকুল—যে ওই পেছন দিকে কোণের বেঞ্চিতে বসে খাচ্ছে—সে-ও এখানকার কেউ নয়। ওদের মা এই বিল্ডিংয়ে রান্নার কাজ করে। সে তার দুই মেয়েকে খাওয়াতে নিয়ে এসেছে। সে নিজেও খাবে। প্রত্যেক ফ্ল্যাট থেকে একজন করে কাজের লোক ভোগ খেতে আসতে পারবে, এই রকম নাকি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এ তার হকের খাওয়া। মেয়েদুটো কার, কে আর দেখতে যাচ্ছে এই ভিড়ে। কত ঠিকে ঝি এই বিল্ডিংয়ের গেট দিয়ে ঢোকে রোজ ভোরবেলা, কেউ কি তার হিসেব রাখে। না, তা রাখা সম্ভব? তা ছাড়া আজ পুজোর দিন। এমনিতেই কত বাইরের লোক, বাবুদের আত্মীয়স্বজন আসছে-যাচ্ছে। তাদের মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেজেগুজে। মুকুলও তো সেজেগুজে ওদের সঙ্গে মিশেই গেছে আজ। একেবারে মিশে গেছে।

শুধু কৌশিকদা চিনল। মায়ের সঙ্গে ওকে দেখেছে। চিনল বলেই অত বড় মাছটা দিয়ে গেল পাতে।

মুকুলের মায়ের নাম মেনকা। সে ওই দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরের ব্যাচে বসবে। তার পরনেও নতুন ছাপা শাড়ি, লাল ব্লাউজ। তার সিঁথিতে লাল সিঁদুর, যদিও তার বর অনেকদিন আগে সব ছেড়েছুড়ে চলে গেছে আসানসোল না কোথায় যেন। মেনকা এই বিল্ডিংয়ে তিন বাড়িতে ঠিকে কাজ করে সংসার চালায়। কৌশিকদের বাড়িতে রান্নার কাজ, অন্য দুটো ফ্ল্যাটে বাসন মাজা, কাপড় কাচার কাজ করে বেলায়। পুজোর সময় তিন বাড়ি থেকেই নতুন কাপড়জামা পেয়েছে ও। ন'তলার বউদি ওকে শাড়ি না দিয়ে ওর মেয়ে দুটোকে জামা দিয়েছে। এই পাড়ায় অন্য একটা বাড়িতে বাচ্চা খেলায় মুকুল, এই দু'-তিন মাস হল, ওরা কিছু দেয়নি। আর আকুল তো রান্নাবান্না করে নিজেদের বাসায়। মা ওকে গাড়িঘোড়ার শহরে বেরোতেই দেয় না। ন'তলার বউদি না দিলে পুজোয় ওদের নতুন জামা হত না।

কিছুক্ষণ থেকে পুজোমণ্ডপের পশ্চিম দিকে বাবুদের জটলা হচ্ছিল। হঠাৎ বুড়ো মতন একজন, ফরসা, চোখে চশমা, চেঁচিয়ে হাঁক দিলেন, "দারোয়ান! দারোয়ান!!"

খাকি হাফপ্যান্ট-পরা একজন লোক ছুটে এল কোথা থেকে।

এদিকে আঙুল দেখিয়ে রেগেমেগে বললেন, "বাইরের লোক ঢুকে পড়েছে, দেখতে পাওনি? কী দারোয়ানি করছ ওখানে বসে, অ্যাঁ?"

দারোয়ান মিনমিন করে কী বলল, শুনতে পাওয়া গেল না।

তারপর তিনি ভলান্টিয়ারদের ডেকে বললেন, "যত অচেনা লোক ঢুকেছে, সব ধরে বার করে দাও। এ কি লঙ্গরখানা নাকি?"

পাঁপড়-চাটনি শেষ হয়ে যাবার পর তখন সবে পায়েস পরিবেশন চলছে। পেছনে পানতুয়া।

মুকুলের সামনে এসে রোগা মতন এক ছোকরা পানতুয়া দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

"তুই কে রে?"

"আমি মুকুল।"

"কোন ফ্ল্যাটে কাজ করিস?"

"আমার মা কাজ করে। আমি করি না। আমি মায়ের সঙ্গে এসেছি।"

"মায়ের হাত ধরে ঢুকে পড়েছ! বাঃ! ওঠ, ওঠ বলছি, না হলে কান ধরে তুলে দেব।"

পায়েসের হাত চাটতে চাটতে মুকুল ভয়ে ভয়ে বলে, "একটা পানতুয়া দেন, নিয়ে চলে যাব।"

"পানতুয়া খাবে! কত শখ! উঠবি কি না—এক্ষুনি।"

উঠেই পড়েছিল মুকুল, এমন সময় ওর মা মেনকা ছুটে এসেছে মেয়ের কাছে।

"কী হয়েছে?"

ছোকরা মেনকাকে চিনেছে মনে হল। জিজ্ঞেস করল, "এ কে?"

"আমার মেয়ে।"

"গুষ্টিসুদ্ধ এখানে খেতে এসেছ?"

"তা কেন। ও আমার বদলে খাচ্ছে। তাতে অলেজ্জ কী হল বাবু? আমি তো এ-বিল্ডিংয়ে কাজ করি।"

"তুমি কাজ করো, তুমি খাবে।"

"আর আমার মেয়ে উপোস করবে? আপনি ভদ্দরনোক হয়ে এই কথা বলছেন? ওকে বকছেন?"

বেঞ্চিতে আর যারা বসে খাচ্ছিল, তাদের কয়েকজন চুপ করে ছিল এতক্ষণ। এবার তারা কথা বলল।

"ছেড়ে দাও সমু, ছেড়ে দাও। উৎসবের দিনে আর চেঁচামেচি বাড়িয়ো না। গরিব মানুষ।"

ছোকরা চুপ করে গেলেও মেনকা চুপ করল না।

"গরিব মানুষ আমরা বটি। তা বলে ভিকিরি নই। আমি এই বিল্ডিংয়ে তিন ফেলাটে কাজ করি। তিনটে খাওয়া আমার পাওনা। মেয়েকে এনেছি তো অন্যায় কী করেছি, আপনারা বলুন। সারা বচ্ছর আপনাদের সংসারে গতর খাটাই। আপনারা নেকাপড়া করেন, মোটা কাজ করতে পারেন না। সারা বচ্ছর আপনাদের আরাম আর জিনিস নষ্ট করা দেখি। মুখ বুজে দেখি। আর, একটা দিন একপাত খেতে দিতে আপনাদের বুক জ্বলে যায়!"

মেনকার খান্ডার মূর্তি দেখে ছোকরা পলায়ন করে। অন্য দু'জন ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন। ওকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।

আবার সমবেত কণ্ঠে জিগির শোনা যায়: বোলো বোলো দুর্গা মাইকি—জয়!

দু'হাতে দু'মেয়ের হাতের নড়া ধরে মেনকা যখন হনহন করে গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, দু'-একজন সুসজ্জিত মহিলা আড়চোখে তাকিয়ে হাসলেন। নারীজাতির একজন প্রতিভূ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে উঠেছে দেখে উৎসাহিত হয়ে নয়, কৌতুকে।

হাঁটতে হাঁটতে মুকুল ছোট বোনকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, "তুই পায়েস খেয়েছিস?"

"হুঁ।"

"পানতুয়া খেয়েছিস?"

"হুঁ, দুটো।"

"আমাকে দিল না।"

মা যে কেন হঠাৎ এত রেগে গেল, দু'জনে বুঝতে পারে না। ওরা দু'বোন তো লুকিয়ে লুকিয়েই খেতে এসেছিল পুজোমণ্ডপে। এখানকার নেমন্তন্নে ওদের তো ভাগ বসাবার কথা না।

মুকুল জানে না, ওর বয়সের মেয়ের পক্ষে বাবুদের বাড়িতে বাচ্চা খেলাবার চাকরি করারও কথা নয়। ছোট বোন আকুল, তারও কথা নয় হেঁশেল ঠেলার। নেমন্তন্ন না হোক, রোজ দু'বেলা ভাত-ডাল-তরকারি পেট ভরে খাবার জন্মগত অধিকার ওদের আছে। বাপ না থাকলে সে অধিকার চলে যায় না। এসব কিছুই জানে না মুকুল, তাই ফোকটে খেতে পেলে ধন্য হয়ে যায়। মেনকাও কি জানে, সংবিধানে কী লেখা আছে, না আছে। তবে ও বোধহয় কিছু কিছু টের পায়। ওর অ্যান্টিনা খুব প্রখর।

১৯৮৬

❀ প্রয়োজন

কোনও কোনও কাজের মধ্যে একটা আনন্দের ব্যাপার লুকোনো থাকে। কাজটা গতানুগতিক ও বাধ্যতামূলক হলে মন বিমুখ, সুতরাং আনন্দও বিলুপ্ত। বাজার করতে এলে চন্দনের প্রায়ই এই কথা মনে হয়। আজও হচ্ছিল।

চারদিকে নানান বয়সের, নানান রকম বেশভূষা পরা মেয়ে-পুরুষ ঘোরাঘুরি করছে। চোখে-মুখে অকারণ ব্যগ্রতা ও বিরক্তি। অনেকেরই হয়তো ইচ্ছে, সমস্ত বাজারটা হাতের থলেয় ঢুকিয়ে নিতে পারলে বেশ হত, পারছে না বলে চাপা ক্ষোভ। একটু-আধটু মাটি-কাদা স্বাভাবিকভাবেই ছড়ানো মাখানো ইতস্তত, তা বলে জায়গাটা এমন কিছু নোংরা নয়। চন্দনের মনে হল।

ভরা গোলপানা মুখ। ঢ্যাঙা। ফরসা। চওড়া কপাল, পাতলা কাঁচাপাকা চুল, আর চিবুকের নীচে অল্প ঝুলে-পড়া মাংস দেখলে অনুমান করা যায়, চন্দন নামের মানুষটির বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি কোথাও এসে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, উজ্জ্বল চোখদুটি ও-মুখে যেন একটু বেমানান।

কেনাকাটা ওকেও করতে হবে, কিন্তু কোনও তাড়া নেই। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বাবুটি যেন বেড়াতে এসেছেন।

একমুঠো মটরশুঁটি তুলে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, "কী দর?" আর ভাবে, কী অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় এইসব ছোট ছোট কৌটোর মধ্যে দানাগুলো সাজানো হয়ে যায়, কিছুই না জেনে আমরা কেমন খোসা ছাড়িয়ে ওদের খেয়ে ফেলি। একটু দূরে সাজানো সারি সারি ফুলকপির দিকে ওর দৃষ্টি যায়, মনে হয়, যেন ফুলকপিগুলো ব্যস্ত মানুষদের মুখে আলো ফেলছে। অন্যমনস্কভাবে সারা বাজারটার দিকে চোখ বুলিয়ে ওর বিশ্বাস হয়, শুধু ফুলকপি নয়,—টোম্যাটো, বেগুন, পিঁয়াজের দলও টিমটিম করে জ্বলছে, আলো করে রেখেছে জায়গাটা।

ভাঁজ-করা থলিটা পকেটে যেমনকার তেমনই। কিছুই কেনা হয়ে ওঠে না। ঘুরতে ঘুরতে একসময় চন্দন নিজেকে আবিষ্কার করে একটি বড়সড় কাতলা মাছের মুখোমুখি। যেন ওর দিকে তাকিয়ে মাছটা বলছে, আমাকে নেবে না?

চন্দন ভুলে যায়, বাড়িতে ছ'জন মাত্র মাছ খাবার লোক। বাচ্চাগুলো কাঁটা বাছতে অনিচ্ছুক। ভুলে যায়, কাজের লোক দু'জনের জন্যে কম দামের মাছ নিয়ে যাওয়ার কথা। একবারও মনে হয় না ওর, তিন-চার কিলোগ্রাম ওজনের একটা মাছ নিয়ে গেলে বাড়িতে কী হুলুস্থুলু পড়ে যাবে।

মাছের পিছল শরীরে ও হাত রাখে। দোকানিকে বলে, "ওজন করো তো।" ঠিক তখনই একটি বালা-পরা হৃষ্টপুষ্ট হাত পিছন থেকে সেই উজ্জ্বল আমিষ এবং অংশত চন্দনের হাত স্পর্শ করে 'যদিদং হৃদয়ং মম' সুরে বলে ওঠে, "মাছটা আমি নিয়েছি।"

সচকিত চন্দন মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মহিলাটির দিকে। সঙ্গে আর একজনও আছে।

সাধারণ প্রসাধনহীন বেশবাস, চোখে চশমা, উচ্চারিত স্বাস্থ্য। গম্ভীর মহিলাকে দেখে ও চিনতে পারে। "আরে শ্যামলী!"

স্বকর্ণে নিজের নাম শুনে সম্ভবত মহিলার গাম্ভীর্যে একটু চিড় খায়। বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন মুখমণ্ডলে—কচি ডাবের মতো ঈষৎ লম্বাটে মুখাবয়বের ওপর—কয়েকটা দ্রুত বৃষ্টির ফোঁটা পড়েই ভেঙে যায় যেন।

একবার পাশে দাঁড়ানো সঙ্গিনীর দিকে, একবার কাতলা মাছটির দিকে তাকিয়ে, মুখটা অল্প উঁচু করে ঢ্যাঙা চন্দনের চোখে চোখ রাখে শ্যামলী। স্মিত নিরাসক্ত স্বরে বলে, "আপনাকে চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু ঠিক প্লেইস করতে পারছি না।"

চন্দন বুঝতে পারে, ভুল হয়েছে। পরিণত বয়সি একজন মহিলাকে হঠাৎ দুম করে 'আরে শ্যামলী' বলে ডেকে ওঠা ওর ভুল হয়েছে। নিষ্ঠা ও সৌজন্য যে-বয়সে মানুষের কাছে প্রত্যাশিত, সে-বয়সে হঠাৎ আঠারো-কুড়ি বছর আগেকার প্রগলভতাকে লাফিয়ে উঠতে দেওয়া উচিত হয়নি। উচিত তখনও হয়নি, কিন্তু তখন—অর্থাৎ আজ থেকে আঠারো-কুড়ি বছর আগে—ভুল করার বয়সটা ছিল। চন্দন বুঝল, বাজারের প্রাকৃতিক শোভায় মগ্ন অন্যমনস্ক না থাকলে এই দ্বিতীয় ভুলটা ও করত না।

বলল, "আমি চন্দন সোম। মনে পড়ে? বিষ্ণুর সঙ্গে পড়তাম।" পর পর তিনটে বাক্য ও ইচ্ছে করেই উচ্চারণ করল। এবং বিষ্ণুর নামটা। যাতে বাজারের মৃদু হট্টগোলের মধ্যেও শ্যামলীর বিস্মরণভূমি সন্দেহাতীতভাবে বিদ্ধ হয়।

"এবার মনে পড়েছে," স্মিত নিরাসক্তি বজায় রেখেই শ্যামলী জানাল। পার্শ্ববর্তিনীর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "বিষ্ণুর ছোট বোন।"

মেয়েটিকে দেখল চন্দন। ওর চোখে কৌতূহল লক্ষ করল। আর লক্ষ করল, যুবতীর সম্মুখীন হলে প্রত্যেক পুরুষমানুষ প্রথমেই যা লক্ষ করে—শ্যামলীর স্তন দুটি এত বড় ছিল না, মেয়েটির দুটি অবশ্য অস্বাভাবিক রকম ছোট।

শ্যামলী বলল, "মনে পড়েছে" অর্থাৎ সবকিছুই মনে পড়েছে ওর। একটু লজ্জা করছিল চন্দনের। আঠারো-কুড়ি বছর আগেকার তুমি সম্বোধনে সে আর ফিরতে চাইল না।

"আপনারা বিদেশে কোথায় সেটল করেছিলেন না?"

"বার্মিংহামে ছিলাম।"

"তারপর?"

"এই তো দেখছেন, কলকাতায়।"

"ভাল। অনেক কাল পরে দেখা হল, তাই না? সব ভাল তো?" একটু চুপ করে থেকে চন্দন বলল, "ওসব দেশে ভারতীয়দের কোনও ফিউচার নেই।"

এতক্ষণ পর শ্যামলী যেন হাসল একটু। ননদের উদ্দেশে বলল, "চন্দনবাবু ইকনমিক্সের লোক।"

অর্থাৎ ছাত্রী মেয়েটি, প্রয়োজন হলে, তার সাহায্য নিতে পারে।

"এদিকে কোথায় থাকা হয়?" শ্যামলীই জিজ্ঞেস করল আগে। ননদের সুবিধের জন্যে অবশ্যই। অমুক পার্কের পিছনে বা অমুক মোড়ের পাশে না বলে চন্দন তার বাসার পুরো ঠিকানাটা বলল ভদ্রতাবশত। যদিও দু'জনের কারও সেটা মনে থাকবে না, ও জানে। তারপর শ্যামলী জানতে চাইল ওর ঘর-সংসারের মামুলি খবর। বাচ্চাকাচ্চা ক'টি, কোথায় পড়ে ইত্যাদি। ঢিলেঢালা কথাবার্তার ফাঁকে চন্দন এক-পা এক-পা করে কাতলা মাছটি থেকে পিছু হটতে থাকে। নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়ার পর হেসে, হাত তুলে, সংলাপের ছেদ টানল, "আচ্ছা, আবার এইভাবে কোনওদিন দেখা হয়ে যাবে।"

অনুরূপ ঘটনা, তার আকস্মিকতা, শহুরে মানুষের জীবনে বিশেষ রেখাপাত করে না। কত বিস্ময়কর দৃশ্য, কত অনির্বচনীয় আঘাত ও অনুভূতি অহরহ এইসব নরনারীর চৈতন্য স্পর্শ করে চলে যায়, ছায়া ফেলে যায়, সেই তুলনায় বাজারের ঘটনাটি নেহাতই তুচ্ছ। আমরা স্পষ্ট দেখলাম, শ্যামলী ও তার ননদ রুমা মুটের মাথায় সেই প্রকাণ্ড, অর্থাৎ একটি পরিবারের পক্ষে বৃহৎ, কাতলা মাছ ও অন্যান্য তরিতরকারি নিয়ে যখন একান্নবর্তী পরিবারের ভিড়ে প্রবেশ করে, তখন শ্বশুর, ভাশুর, দেওর, আর কয়েকজন স্ত্রীলোক এবং একপাল শিশু ও বালক-বালিকার হট্টগোলে তাকে আর আলাদা করে চেনা যায় না। যৌথ জীবনের শোরগোল তার একটি ব্যক্তিগত দুঃখ ও অপমানের বেদনাকে চাপা দিয়ে রাখে। বিষ্ণু—যাকে নিয়ে এই পরিবারের সঙ্গে শ্যামলীর সম্পর্ক, সে অনুপস্থিত; লোকটা জীবিত কিন্তু বিস্মৃত। যেন দলছুট একটা পাখি বাসা বেঁধেছে অন্যত্র।

আমরা দেখলাম, চন্দন বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হইচই পড়ে যায়।

"এত দেরি করতে আছে!" নীতার অনুযোগ।—"বারোটা বাজতে চলল, কখন রান্না হবে, কখন খেতে পাবে এরা?"

এরা বলতে নীতার দুই বোন, তাদের দুই স্বামী আর তাদের একটি করে শিশুপুত্র। পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সের সবসুদ্ধ চারটি ছাঁকা দৈত্য ইতিমধ্যে গৃহের একাংশ তোলপাড় করেছে। বালিশ ফুটো করে তুলো ছড়ানোর খেলাটি কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়েছে, চন্দনের মনে হল। কাজের লোকদুটি বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হয়ে রান্নাঘরের কোণটায় দাঁড়িয়ে, তাদের হাতে দুটি ভরতি থলি সমর্পণ করে সে নিশ্চিন্ত বোধ করে। মুঠো খুলে দেখে, আঙুলগুলো লাল হয়ে গেছে। ব্যথা।

নীতা ও অভ্যাগতেরা বেশ গল্পসল্প করছে, চন্দন দেখল। চা ও জলখাবারের পর্ব সাঙ্গ হয়েছে। ইতস্তত পড়ে আছে কিছু উচ্ছিষ্ট, গুঁড়ো, ভাঙা খাদ্যদ্রব্য। নীতার চেয়ে বয়সে ছোট দুটি শ্যালিকার দিকে চেয়ে ওর মন প্রসন্ন হল খানিকটা। মুখে কৃত্রিম বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, "বাজার করা কি আমার কাজ!

তোমরা আসছ, ভাবলাম নিজে দেখেশুনে মাছটাছ নিয়ে আসি। তাতেই দেরি হল।"

মিতা—সবচেয়ে ছোট জন—জুট কার্পেটের ওপর বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বেণী খুলছিল, স্নান করতে যাবে। সে বলল, "আপনারও কাণ্ড! বাড়িতে দু'-দুটো চাকর থাকতে—!"

আরেকটু প্রসন্ন হয়েছে চন্দনের মন। বলল, "ভালবাসি তাই, নইলে আর কী দরকার ছিল বলো।"

মিতার ওপরের বোন প্রীতা। তিন বোনের মধ্যে মোটাসোটা। উচ্ছল ও সরল প্রকৃতির মানুষ। চন্দন মাঝে মাঝে ডাকে গ্রঁ প্রি। একটা হাতল-ছাড়া বেতের চেয়ার পূর্ণ করে বসে ছিল দূরে জানলার কাছে। হঠাৎ চেয়ারটার ওপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ডাকল, "এদিকে এসো তো চন্দনদা।"

ওর মতলবটা অনুমান করতে না পারলেও, চন্দন এগিয়ে যায়। কাছে আসতেই প্রীতা ওর শাড়ির আঁচল দিয়ে চন্দনের মুখখানা মুছিয়ে দেয়। বলে, "মুখটা তেলতেলে হয়ে গেছে পরিশ্রমে, দেখেছ! চুলের ভেতরে ঘাম।"

আদর খেতে খেতে চন্দন প্রীতার পিঠ থাবড়ায় আস্তে আস্তে। চ্যাপলিনের মতো তালে তালে আওড়ায়, "লব লব লব লব লব লব লব লব লব। লব লব লব লব লব লব লব লব।"

ঘরসুদ্ধ সবাই হো-হো করে হাসে এই দৃশ্য দেখে। নীতাও হাসে। বলে, "হয়েছে হয়েছে, নাম তো। এই অবস্থায় বেশি লম্ফঝম্ফ করে না।"

চন্দন বলে, "বিকেলে সার্কাস দেখতে যাব, গ্রঁ প্রি তোমার অসুবিধে নেই তো?"

একটু দূর থেকে উপভোগ করছিল ভায়রাভাই দুটি। একজনের নাম অরুণ, অপর জনের তপন। নামের মানে দুই-ই এক, তাই কে কোনজন চন্দন মাঝে মাঝে ভুলে যায়। সম্বোধনের ঝুঁকি না নিয়ে তাই সে সিগারেট এগিয়ে দেয় ওদের দিকে। দায়িত্ববান মানুষের মতো স্বর নামিয়ে প্রশ্ন করে, "ট্রেন লেট ছিল না?"

পুরো একটি সপ্তাহ কলকাতায় কাটিয়ে অতিথিরা বিদায় নিল। রেখে গেল কিছু আনন্দিত স্মৃতি, ভাঙা খেলনা, কাচের বাসন, তছনছ সংসার। মোটা বকশিশ পাওয়ার ফলে কাজের লোকদুটি টিঁকে গেল এ-যাত্রা, তবে পরের রবিবার সারাটা দিন কেটে গেল নীতার বাড়িটা সাফ করতেই। চন্দন ছেলেমেয়ে দুটিকে সামলেছে আর ফাঁকে ফাঁকে গুছিয়েছে বইপত্র।

গোছাতে গিয়ে ও টের পেল, চিঠিটা নেই। চিঠিটা নেই কেন?

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, "বইপত্র নাড়াচাড়া করেছে কেউ? সব গোলমাল হয়ে গেছে দেখছি।"

"বড়রা পাতা উলটে দেখেছে হয়তো। বাচ্চারা ছোঁয়নি। গোলমাল হবার তো কথা নয়।" নীতা উত্তর দেয়।

"হয়েছে যখন বলছি, তখন হয়েছে। একটা জিনিস খুঁজে পাচ্ছি না।"

"কী জিনিস?"

"একটা চিঠি।"

"চিঠি!" নীতার কণ্ঠস্বরে তাচ্ছিল্য।

"হ্যাঁ, খুব দরকারি একটা চিঠি ছিল এই বইটার ভাঁজে। কোথায় গেল?"

"খুব দরকারি যখন, তখন বইয়ের ভাঁজে রেখেছিলে কেন? আমাকে দিলেই পারতে। আলমারিতে রেখে দিতাম।"

"ঠাট্টা করছ?" চন্দন এবার রেগে ওঠে।

নীতা সমান তাচ্ছিল্যসহকারে বলে, "হ্যাঁ, ঠাট্টা করছি। একদিন দুপুরে মিতুরা চিঠিটা হাতে নিয়ে হাসাহাসি করছিল। দেখতে চাইলাম। কিছুতে দেখাবে না। বলে, তোমার প্রাইভেট ব্যাপার, আমার দেখা উচিত না। পড়ে তো আমার চোখ কপালে! চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, কিন্তু আমি জানতে চাই, কে সে? কে ওই শ্যামলী না কী যেন নাম? ঘর-সংসার ফেলে তুমি নির্লজ্জের মতো কার পিছু নিয়েছ? আশ্চর্য, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। দিনের-পর-দিন ভণ্ডামি করে চলেছ।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" চন্দন সামাল দেবার চেষ্টা করে, "অত উত্তেজিত হবার কিছু নেই। অনেক পুরনো চিঠি ওটা। আমাদের বিয়ের আগের। অন্য রকম ভ্যালু ছিল ওটার, সে তুমি বুঝবে না।"

তখনও সন্ধে হয়নি। রান্নাঘরে চায়ের টুংটাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। চা না খেয়েই বেরিয়ে যায় চন্দন। নীতাকে মনে মনে গালাগালি দেয়, "নির্বোধ, ইডিয়ট।"

যেতে যেতে গলির মুখটায় দেখে, ওর ছেলেমেয়ে দুটি তিন চাকার সাইকেল চালাচ্ছে ছোট ভৃত্যটির পরিচালনায়।

আঠারো-কুড়ি বছর আগে শ্যামলী চন্দনের ভালবাসা ফিরিয়ে দিয়েছিল। লুপ্ত চিঠিটা সেই ঘটনার দলিল। লিখিত প্রস্তাবের লিখিত প্রত্যাখ্যান। এই ধরনের ডকুমেন্ট কেউ রেখে দেয় না সাধারণত। নষ্ট করে দেয়।

অপরিণত বয়সে কতই তো ভুল করে ছেলেমেয়েরা। কে বন্ধু, কে সুহৃদ, চিনতে জানে না। কোন আকর্ষণ যথার্থ প্রেম থেকে উদ্ভূত, পরখ করে না। বিশেষ একজনকে না পেলে, ভাবে, জীবন বুঝি অর্থহীন হয়ে যাবে। বা বিশেষ একজনকে পেলেই পৃথিবীতে নেমে আসবে স্বর্গ, কোনওপ্রকার দুঃখ, ক্লেশ, অপমান, অসুখ স্পর্শ করবে না তাদের। এইসব ভুল ক্রমশ ভেঙে যায়। ক্রমশ মুছে যায় ভুলের চিহ্ন রুমালে আতরের গন্ধের মতো। ঝাপসা হলুদ একটা দাগ হয়তো থেকে যায় কোথাও কোথাও—স্মৃতির মধ্যে। তা এতই ঝাপসা যে জটিল জীবন তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

"না, শ্যামলীর প্রতি আকর্ষণ আমি জিইয়ে রাখতে চাইনি।" কুয়াশা-ঘেরা নির্জন অন্ধকার মাঠে শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর শুয়ে বিধ্বস্ত চন্দন প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল—"আমি ভণ্ড নই। একজন মেয়ের কাছ থেকে যতখানি ভালবাসা, নিষ্ঠা, নির্ভরতা, সেবা আর শারীরিক সুখ পাওয়া সম্ভব আমি তা কানায় কানায় পেয়েছি। নীতা স্বেচ্ছায় সব দিয়েছে। ও ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমি জীবনযাপন করছি, আজ ভাবতে পারি না। নীতা, তোমার অস্তিত্ব আমার মধ্যে এত গভীরভাবে মিশে গেছে যে আজ বলতে পারব না, তুমি সুন্দর না কুৎসিত। বলতে পারব না, আর একটু রোগা বা মোটা আর-একটু লম্বা বা বেঁটে হলে তোমায় মানাত। তুমি যেমন, তুমি তাই। এই বয়সে আবার কোথায় যাব, কার কাছে গিয়ে হাত পাতব। শেকড়বাকড় তুলে নিয়ে কোথাও গিয়ে আবার নতুন করে সব শুরু করা কি যায়!"

চন্দনের চোখে জল ঠেলে উঠছে। ও আপন মনে কথা বলে যায়, "আর তুমি তো ভাল করে জানো। জানো না? নইলে চিঠিটার কথা ভুলে গিয়েছিলে কেন? কেন সেই দিনই জানতে চাওনি, শ্যামলী কে?"

এবার সে উঠে বসে। গলা ঝাড়ে। ভেজা ঘাসের ওপর হাত বুলোয়। তারপর নীতার উদ্দেশে অদূরে-দাঁড়ানো গাছটিকে বলে, "কিন্তু চিঠিটা তুমি ছিঁড়লে কেন? আমার সমস্ত পরিপূর্ণতার মধ্যে এক ফোঁটা কষ্ট ছিল, এক কণা অপ্রত্যাশিত অপমান—'লক্ষ্মীটি, তুমি দুঃখ পেয়ো না, তোমার সঙ্গে আমি সেই রকম ভাবে মিশিনি। বিষ্ণুর বন্ধু তুমি, আমারও বন্ধু তাই। পরেও থাকবে।...আমি খুব সাধারণ মেয়ে, আমার চেয়ে ঢের ভাল মেয়ের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হবে, ভালবাসা হবে, বলে রাখছি।' মাঝে মাঝে খুলে পড়তাম আর দেখতাম একটা ছোট বয়সের ভুল ফুলে-ফুল হয়ে রয়েছে।"

আঠারো-কুড়ি বছর পরেও আর একদিন শ্যামলী প্রায় সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করল। একটু অন্যভাবে। বলল, "খুব সাধারণ মানুষ আমি, এসব ঠিক বুঝি না।"

পার্ক স্ট্রিট ঘেঁষা একটা ছোট পার্ক। নাম অ্যালেন গার্ডেন। লাল রঙের উজ্জ্বল রেলিং দিয়ে ঘেরা। ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। পশ্চিম দিক থেকে বিকেলের রোদ পড়ছিল কোনাকুনি, সেই রোদে পিঠ দিয়ে একটু তফাতে বসেছিল ওরা দু'জন—অমলা দেবীর উপন্যাসের মলাটের ছবির মতো। পার্কটার তিনদিকে বিশাল উঁচু সব অট্টালিকা ভেদ করে খুব কম রোদের আলো পৌঁছোয় এখানে। পশ্চিম দিকে রাস্তার ওপারটায় একটা পুরনো বাড়ি ভেঙে সমান করে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর নতুন বাড়ির পাইলিং চলছে এখন, শব্দ হচ্ছে ঝমঝম। আগামী বছর শীতে বিকেলবেলা আর অ্যালেন গার্ডেনে রোদ ঢুকবে না।

চন্দন বলল, "আমিও খুবই সাধারণ মানুষ। অর্ডিনারি ফেলো। আপনাকে কোনও রকম বিব্রত করার ইচ্ছে আমার নেই, বিশ্বাস করুন।"

অক্সফোর্ডের দোকান থেকে বইটই ঘেঁটে একখানা পেপারব্যাক কিনে ফিরছিল চন্দন, পেট্রোল পাম্পের সামনে শ্যামলীর সঙ্গে দেখা। হঠাৎ। সম্ভবত এই তল্লাটে কোনও মেয়ে-স্কুলে ও পড়ায়।

কোথাও বসে একটু কফি খেলে হয়—প্রস্তাব করেছিল চন্দন, শ্যামলী রাজি হয়নি। ওর বাড়ি ফেরার তাড়া আছে। "দুটো-একটা কথা বলি, চলুন না," বলে প্রায় জোর করে শ্যামলীকে ও ধরে আনল এখানে। "হাঁটতে হাঁটতে কি কথা বলা যায়!"

চন্দন বলল, "আপনার চিঠিটা আমি রেখে দিয়েছিলাম।"

"কোন চিঠি?"

"সেই যে লিখেছিলেন আমার ভুল ধরিয়ে দিয়ে। অনেক কাল আগে।"

"আমার একেবারে মনে নেই।" বলে গাম্ভীর্য গলিয়ে হাসল শ্যামলী—"কী লিখেছিলাম?"

"বইয়ের ভাঁজে থাকত। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ত হঠাৎ। পড়তাম। মজা লাগত পড়তে।" পিংক রঙেব বাবাস্যুট পরে একটি ট্যাঁশ শিশু টলতে টলতে এদিকে আসছে, তার দিকে চেয়ে শ্যামলী বলল:

"কেন লিখেছিলাম, বলুন তো? আপনি ভুল করছেন না?"

"আমার প্রেম-নিবেদনের উত্তর। যাকে প্রত্যাখ্যান বলে আর কী।"

"ওঃ!" শ্যামলী উড়িয়ে দেয় কথাটা। তারপর সাদা স্কার্ফখানা ভাল করে জড়িয়ে নেয় গায়ে। বলে, "আমার কিচ্ছু মনে নেই।"

"মনে না-থাকাই স্বাভাবিক। তারপর কত ঘটনা ঘটে গেছে জীবনে। আমারই কি মনে থাকত? চর্চার অভাবে সবকিছু মুছে যায়।"

শ্যামলী চুপ।

ট্যাঁশ শিশুটি চন্দনের কাছাকাছি এসে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাততালি দিয়ে ওঠে। আর সেই উত্তেজনায় পড়ে যায় ঘাসে। চন্দন উঠে গিয়ে ওকে তুলে নেয় কোলে। ঘাসের টুকরো ঝেড়ে ফেলে দেয় জামা থেকে। এদিক-ওদিক তাকায়। একজন ফ্রক-পরা কালো আয়া এগিয়ে আসে তখন। তার হাতে শিশুটিকে ফিরিয়ে দিয়ে আবার এসে বসে।

বলে, "কিছুদিন আগে আমার স্ত্রী চিঠিটি আবিষ্কার করে। কিছু না বুঝেই ছিঁড়ে ফেলে দেয়।"

"ফেলবেই তো। অন্য মেয়ের চিঠি বাড়িতে রাখতে দেবে কেন?" শ্যামলী এবার স্পষ্টভাবে হাসে,—"আমি হলেও ছিঁড়ে ফেলতাম।"

"কিন্তু চিঠিটা আমার দরকার। আপনি আর একটা লিখে দিন।"

"তার মানে?"

"তার মানে তাই।" একটা ঘাসের চারা উপড়ে এনে দু'হাতে কচলাতে কচলাতে চন্দন বলে, "নষ্ট হয়ে যাওয়া চিঠিটা রিপ্লেইস করে দিন, এই অনুরোধ।"

চশমার ভেতর থেকে শ্যামলী সামনে একটু তফাতে বসা মধ্যবয়স্ক লোকটিকে লক্ষ করে। সন্দেহ হয়, এই অদ্ভুত অনুরোধের পিছনে কোনও মতলব আছে হয়তো। কোনও অভিসন্ধি, যার স্বরূপ ঠিক ধরা যাচ্ছে না এখন। তা যদি না হয় তবে ব্যাপারটা নেহাতই ছেলেমানুষি—যা এই বয়সে আর মানায় না।

চন্দন হঠাৎ প্রশ্ন করে ওঠে, "আপনি ভাবছেন পাগলামি, তাই না? কিন্তু তা নয় একেবারেই। দেখুন, আমরা সবকিছুই বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। স্বাভাবিক। নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি গ্রহণ করার জন্যে মনের মধ্যে সব সময় মোছামুছির কাজ চলে। যা অতিক্রান্ত, অতীত, যা অপ্রাসঙ্গিক, তা পুষে রাখার দরকার নেই, সেই জন্যেই তো? অথচ, কিছু কিছু জিনিস ব্যবহৃত হয়ে ক্ষয়ে গেলেও ফেলে দিতে ইচ্ছে করে না। অদ্ভুত! আমার প্রথম সারেন্ডর আর তার রিবাফ্—সেই অপমান ও বেদনার স্মৃতি তার একটা ব্যতিক্রম।"

"কিন্তু," শ্যামলী এবার ধীরে ধীরে বলে, "সবকিছু কত পালটে গেছে।"

"যাক না। আপনার চিঠিতে তো কোনও তারিখ ছিল না।"

"কিন্তু...সেই মন নিয়ে কি আজ এত বছর পর..."

"যায়। একটু চেষ্টা করলে নিশ্চয় পারবেন। আমি তো আপনার কাছে একস্ট্রা কিছু চাইছি না। যা আপনি নিজে থেকে দিয়েছিলেন, তা-ই আর একবার দিন। ডুপ্লিকেট। এমন কিছু নয় যে আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়, শ্যামলী বলে, "ওটা তো আপনার একটা চিঠির উত্তর ছিল, তাই না? সেটা আমি রাখিনি। তা হলে—"

চন্দন হাসে। নির্যাতিত ঘাস-চারাটি হাত থেকে ফেলে দেয়। চোখে উৎসাহ ফুটিয়ে বলে, "এতক্ষণে একটা যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন। তা হলে, তা হলে এক কাজ করা যাক। আমি আপনাকে একটা—খুব আবেগটাবেগ দিয়ে—চিঠি লিখি, আপনি তার উত্তর দেবেন। অনেক কিছু মনে পড়ে যাবে হয়তো সেই সময়কার ঘটনা।"

কৌতুক বোধ করে শ্যামলী। এবং সম্মত হয়। কথা হয়, চন্দন চিঠিটা শ্যামলীর বাড়ির ঠিকানায়, অর্থাৎ বিষ্ণুর ঠিকানায় পাঠালে ক্ষতি নেই, কেউ খুলে পড়বে না, কিন্তু শ্যামলীর উত্তর যেন চন্দনের বাসার ঠিকানায় পোস্ট করা না হয়। আবার নষ্ট হয়ে যাবার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। কলেজে পাঠানো যেতে পারে। এই সামান্য কারণে ওদের দু'জনের আবার দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া, ওরা বাহুল্য মনে করে।

চিঠি মকশো করতে বেশ হিমসিম খেয়ে গেল চন্দন। বুঝল, কিছুই আর আগের মতো করা যাচ্ছে না সহজে। 'আমাকে নাও', 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না', 'তোমাকে পাবার জন্যে আমি সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত', এইসব কথা কলমের ডগায় এসে আটকে যাচ্ছে। বোকা বোকা মনে হচ্ছে। মনে হল, মহিলারা কি এত সংবর্ধনার যোগ্য? অনভিজ্ঞ যুবকদের কাছে মেয়েরা প্রাপ্যের ঢের বেশি মনোযোগ আদায় করে নেয় না কি?

তবু হাল ছাড়ল না। উত্তরটা ওকে পেতেই হবে।

ঠিক দশ দিনের মাথায় উত্তর পেয়ে গেল চন্দন। খামে না। ইনল্যান্ডে লেখা।

শ্যামলী লিখেছে:

"আপনার চিঠির উপযুক্ত উত্তর দিতে কয়েক বছর দেরি হয়ে গেল। পূর্বেকার হঠকারিতার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। আপনি যে আমাকে এতকাল মনে রেখেছেন, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমি কি এত মনোযোগের যোগ্য?

বিষ্ণুর সঙ্গে গত তিন বছর আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তবু শ্বশুরবাড়ি আঁকড়ে আছি। দেশে ও আর ফিরবে না। নতুন করে আবার সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া যায় হয়তো। আপনার আগ্রহ থাকলে জানাবেন। আমি নিঃসন্তান। শ্যামলী।"

চিঠিখানা পড়ে চন্দন স্তম্ভিত। আর একবার পড়ে। চোখের সামনে অল্পক্ষণের জন্যে ভেসে ওঠে এক মহিলার অবয়ব—বয়স্ক, একটু স্থূল, অস্বাভাবিক বড় দুটি স্তন, চোখে চশমা। কচি ডাবের মতো মুখের নিম্নভাগ। মাথার পিছনে ছোট একটি খোঁপা। উজ্জ্বল গম্ভীর ব্যক্তিত্ব। পিঠের দিকে ছড়ানো সাদা স্কার্ফ।

"দিলে না", চন্দন তাকে বলে, "এবারেও তুমি দিলে না, শ্যামলী।"

তারপর অবয়বটি মিলিয়ে যায়।

১৯৭৬

❀ পাশ ফেরা

বাস টার্মিনাস থেকে পশ্চিম দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলে একটা মোড় পড়বে। মোড়টার নাম পুরনো কালীতলা। বাঁ দিকে একটা মিষ্টির দোকান—নাম 'মধুরে মধুর', ডান দিকে টিউবওয়েল। মোড়টা ছাড়িয়ে সোজা গেলেই ডান দিকে দেখবে একটা প্রশস্ত প্রবেশপথ। ভেতরে অনেকগুলো লাল রঙের বাড়ি। সবুজ জানলা। দেখতে একরকম সব বাড়ি চারতলা। ভেতরে ঢুকে পড়লে তোমার মনে হবে, এটা কলকাতা না, অন্য কোনও জায়গা। একটা লাল রঙের চারতলা বাড়ির পল্লি। হ্যাঁ, এই পল্লিরই নাম অনুপম হাউসিং এস্টেট। প্রবেশপথের ওপরে অর্ধবৃত্তাকার একটা সিমেন্টের ফলক আছে, কেউ লক্ষ

করে না। ওই ফলকে অনুপম হাউসিং এস্টেট নামটা উৎকীর্ণ করা আছে। একসময় বাড়িগুলির রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে নামটাও লাল রঙে লেখা হত চুনকামের পর। আজকাল আর লেখা হয় না। ফলকের ওপর টানা চুনকাম করা এক ধরনের সাদা রং, ময়লা ফাটা চেহারা, ওই সুন্দর আবাসনের অনুপম নামটি গাপ করে নিয়েছে। তবু জায়গাটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না। মনে রাখতে হবে, পুরনো কালীতলা, মিষ্টির দোকান, উলটো দিকে টিউবওয়েল। মোড় ছাড়িয়েই ডান দিকে লাল রঙের সার সার অনেকগুলো বাড়ি। কতগুলো? তা ত্রিশ-চল্লিশটা বাড়ি তো হবেই।

প্রত্যেক তলায় দুটি করে অর্থাৎ প্রত্যেক বাড়িতে আটটি করে ফ্ল্যাট। এক-একটি ফ্ল্যাটে এক-একটি পরিবার। সেই হিসেবে অনুপম হাউসিং এস্টেটে বসবাস করে অন্তত আড়াইশো পরিবার। এক হাজার জন মানুষ। একটা গোটা গ্রাম বললে অত্যুক্তি হবে না। গ্রামের মতো এখানকার সমাজ শ্রেণীবিভক্ত না হলেও বলা যায়, এরা কলকাতার মানুষের মতো বিচ্ছিন্ন নয়, সম্পর্কহীন নয়। ঘনিষ্ঠ না হলেও এরা পরস্পর পরস্পরকে চেনে, পরস্পরের খবর রাখে। সময়-অসময়ে বিপদেআপদে সাহায্য করে। যতখানি করা সম্ভব একজন মধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষে। একটু ঘুরিয়ে বললে, এই আড়াইশোটা পরিবার যেন একটা যৌথ পরিবারের ভাঙা টুকরো! টুকরোগুলো চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে না গিয়ে যেন একটা পল্লির মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আছে। পারস্পরিক নিরাপত্তার কথা ভেবে একত্র হয়ে আছে। গত কুড়ি বছর এরা একত্র হয়ে আছে। এইসব রাজ্য সরকারের কর্মচারীর দল এবং তাদের প্রত্যেকের পিছনে এক-একটি পরিবার। খোপে খোপে নিবদ্ধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আবার পল্লিময় বিস্তৃত হরিৎবর্ণ আত্মীয়তাবোধ এরা অনুভব করে।

এতদিন পরে বুঝি সম্পর্কে ফাটল ধরল।

কুড়ি বছর কিছু কম সময় নয়। একটা প্রজন্ম, একটা জেনারেশন।

ই ব্লকের চার নম্বর ফ্ল্যাটের বিদ্যার্থী পুরকায়স্থ যখন চক্রবর্তী বাগান লেনের অন্ধকার একতলা ছেড়ে দোতলার খোলামেলায় উঠে আসে, তখন ওর বয়স কত হবে? খুব জোর তিরিশ। ওর সরকারি চাকরির বয়স চার বছর, কি তার একটু বেশি। পরিবার বলতে দাদা আর বিধবা মা। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছে। প্রেম মানে ওই বেথুন কলেজের গেটের সামনে বিকেলবেলা দাঁড়িয়ে থাকা। তারপর দু'জন একত্র হলে রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো, পার্কে বসে বাদাম খাওয়া। একটু হাত ধরাধরি। আর কথা। কথার পাহাড় না কথার ঝরনা—কী বলা যাবে তাকে। কারুর শোনার ধৈর্য নেই। 'এই শোনো, আমার মনে হয়'—বলে একজন শুরু করতে-না-করতে অপর জন বলে ওঠে, 'কাল রাত্তিরে না অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম'—ওই মনে হয় আর ভাবছিলাম নিয়ে কথার ঝুড়ি, অনেকটাই তার প্রলাপ। ওই বয়সেই প্রলাপ বকা মানায়। তখন বিদ্যার্থী ছিল কী রোগা। ফরসা, একমাথা ঝাঁকড়া চুল। তখন ওর ঠোঁটের ওপর সরু একজোড়া গোঁফ ছিল। রূপা ছিল একটু কালো, কিন্তু গোলগাল। ওর চুল ছিল নিবিড় ও বিন্যস্ত। বেণী বেঁধে সামনের দিকে বুকের ওপর ঝুলিয়ে রাখত। তাতে ওকে বেশ সপ্রতিভ ও দৃপ্ত দেখাত। বছরের পর বছর এই প্রেম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তখন। এর না আছে অগ্রগতি, না আছে কোনও সঙ্গত পরিণতি।

একদিন বিদ্যার্থী রূপার পাশে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে, এমন সময় বৃষ্টি নামল! রূপা গুনগুন করে একটা গান ভাঁজছিল, গানের সুর গেল কেটে। অনেকখানি দৌড়ে মাথার ওপর ছাদ পেল ওরা।

রূপা বলে, "ধুৎ, আর ভাল লাগে না। এভাবে আর কতদিন চলবে বলো তো।"

বিদ্যার্থী অপরাধীর মতো থামা থামা গলায় বলে, "মাকে বলব?"

"কী?"

"এই, মানে আমাদের বিয়ের প্রস্তাব।"

"কী লাভ হবে বলে? এখনও তোমার দাদার বিয়ে হয়নি। সাততাড়াতাড়ি ছোট ছেলের বিয়েতে তোমার মা মত দেবেন না। তা ছাড়া চক্রবর্তী বাগান লেনে জায়গা কোথায়?"

"ওইটেই আসল পয়েন্ট।" বিদ্যার্থী এবার নিজের পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায় যেন। বলে, "আর কিছুদিন সবুর করো। সরকারি ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে শিগ্‌গির। নতুন বাড়িতে নতুন বউ নিয়ে উঠব। কেমন?"

"দেখো দেখো", রূপা তার ডান হাতখানা বিদ্যার্থীর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, "আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।"

ই ব্লক চার নম্বর ফ্ল্যাটের বিদ্যার্থী পুরকায়স্থ এখন অনেক বদলে গেছে। মাথায় টাক হয়েছে অল্প। কানের দু'পাশে চুল সাদা। পেটের ওপর অল্প ভুঁড়ি। সরু গোঁফজোড়া উঠে গেছে কবে। রূপাও বদলেছে। কুড়ি বছর তো কম সময় নয়। সেই চুলের ঢল আর নেই এখন। মাথার চাঁদি এখন নারকেল পাতার মতো ঝিরঝিরে। সিঁদুরের বিষ লেগে লেগে ক্ষয়ে গেছে সিঁথি। প্রায় নিস্তরঙ্গ শান্তিপূর্ণ জীবন ওকেও খানিকটা স্থবির করেছে। ওদের ভালবাসার ফসল, রূপা বলে, অঘ্রানের আমন ধান, একমাত্র মেয়ে মামনি, তার বয়স সতেরো, এবার মাধ্যমিক পাশ করল। দুটো লেটার পেয়েছে।

সেদিন দুপুরবেলা মামনি এফ ব্লকের তিন নম্বর ফ্ল্যাটের টুয়ার সঙ্গে গল্প করছিল। গল্পটা ছল। লক্ষ, নীচের মোটরবাইক। জাকারান্ডা গাছের আড়ালে ছায়ায় রোজ দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটা। কিংবা মোটরবাইকটার ওপর বসে থাকে। যেন ঘোড়ায় চড়েছে। চোখে আবার সানগ্লাস। কোমরে চওড়া বেল্ট। মুখে দাড়ি। মামনি ওকে চেনে।

এন ব্লকের শান্টু। শান্টুর মুখের ভাব, ওঃ কী বীরপুরুষ; আসলে একটি ভিতুর ডিম। মামনির ইচ্ছে করছিল, হাতের কমলালেবু থেকে একটা কোয়া খুলে ছেলেটার দিকে ছুড়ে মারে। নাঃ কোয়াটা অতদূর যাবে না। তা ছাড়া শান্টুকে আশকারা দেওয়াও উচিত হবে না। পেয়ে বসবে। ভিতু আছে থাক।

মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাতে গিয়ে মামনি দেখল, একটা ট্রাক এদিকে আসছে। হাউসিং এস্টেটের মধ্যে খানিকটা ঢুকে ই ব্লক। এই সময়ে পল্লিটা জনশূন্য থাকে। পুরুষেরা আপিস গেছে, মহিলারা দিনের কাজ সেরে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে হয়তো। বেকার যুবক কিছু আছে, তারা চারটের আগে বেরোবে না। পল্লির বাইরে শহরময় যখন বাস ও লরির যাতায়াতের গমগম শব্দ, ব্যস্তসমস্ত লোকের ভিড়, পল্লির ভেতরটা তখন শুনশান। মাঝে মাঝে কেবল আইসক্রিম কি বাসনওলার গলায় বিলম্বিত ধৈবতের সুর। আর নয়তো সেই বিচিত্র লোকটার একঘেয়ে কণ্ঠস্বর, যে এই পল্লির মধ্যে সারা দুপুর কখনও প্রকাশ্যে কখনও গাছের আড়াল থেকে হাঁক দেয়—ছাতা এলাম, ছাতা। চিনা, জাপানি, ইংলিশ। সেলাই মেরামত ছাতা।

ট্রাকটা ই ব্লকের সামনে এসে থামল। ড্রাইভারের পাশে-বসা দুটো লোক, লাফিয়ে নামল ট্রাক থেকে। একজন ছোকরা মতন, তার গায়ে লাল শার্ট, পরনে কালো প্যান্ট, কানঢাকা চুলের টেরি। অপরজন বয়স্ক, চোখে চশমা। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা। জাকারান্ডা গাছের আড়ালে ছায়ায় শান্টুকে দেখতে পেয়ে যে ছোকরা, সে এগিয়ে গেল ওর কাছে।

"এটা কি অনুপম?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা," এল ব্লকটা কোন দিকে হবে বলতে পারেন? এল সেভেন।"

সাহায্য করার কোনও রকম আগ্রহ না থাকলেও ছোকরার প্রশ্নের উত্তর দেয় শান্টু।

"সোজা এগিয়ে যান খানিকটা। ওই যে জলের ট্যাঙ্ক, তার কাছে দেখবেন একটা নিমগাছ। বেশ বড় গাছ। গাছের গোড়ায় সিমেন্ট-বাঁধানো নিচু বসার জায়গা। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে এক ব্লক ছেড়ে পরেরটা এল ব্লক। বাড়ির লেটারবক্স আছে। এল সেভেন। নাম কী?"

মামনি ওপর থেকে দেখে, ট্রাকের ওপর গাদা করা ফার্নিচার। কয়েকটা পুরনো হাতলছাড়া কালো রঙের চেয়ার, ডাইনিং টেবিল, ময়লা সোফা, বিছানার গদি—সব একসঙ্গে ডাঁই করা। ঝকঝকে নতুন একটা ফ্রিজও আছে ওর মধ্যে। একদিকে বস্তাবন্দি হাঁড়িকুড়ি, বাসনপত্র। গ্যাসের উনুন, সিলিন্ডার। শান্তিনিকেতনের কাজ-করা মোড়াটার ওপর একটা ফুলঝাঁটা শোয়ানো। ও রকম মোড়া একটা মামনিদেরও আছে। আরও অনেক জিনিস আছে মনে হয়, তবে সেগুলো পরদা দিয়ে ঢাকা। মামনির মনে হল, ওদের বাড়ির জিনিসপত্র কবজাটবজা খুলে আলাদা করে ট্রাকে তুলে দিলে ওই রকমই দেখাবে। সংসারে সাজিয়ে রাখা থাকলে বোঝা যায় না কত টুকিটাকি জিনিস দিয়ে গড়া হয় এক-একটা সংসার। সেসব জিনিসের খবর মায়েরা রাখে। মায়েরাই রাখে।

ততক্ষণে পাঞ্জাবি-পরা লোকটিও এগিয়ে গেছে শান্টুর কাছে।

শান্টু বলে, "সাত নম্বর ফ্ল্যাট মানে চারতলা। কাদের বাড়ি?"

"কারুর বাড়ি নয়, খালি ফ্ল্যাট। আমরা পজেশন নিতে যাচ্ছি।" বলে ওই দু'জন আবার ট্রাকের ওপর উঠে বসল।

দুই

অনুপম হাউসিং এস্টেটে ঢোকার মুখে পল্লির বেকার ছেলেরা বিকেল থেকে রাত ন'টা অবধি আড্ডা মারে। পাশেই পান-সিগারেটের দোকান। সেখান থেকে খেপে খেপে সিগারেট কেনে আর চাঁদা করে ফোঁকে। এই সময়টায় বাইরে থেকে লোকে বেড়াতে আসে। আবার পল্লি থেকে লোকে বেড়াতে বেরোয়, সিনেমা দেখতে যায় সেজেগুজে। সুশ্রী মেয়ে দেখলে এই বেকার যুবকদের তৎপরতা যায় বেড়ে, এরা সতর্ক হয়ে ওঠে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে যায় হয়তো। সুশ্রী মেয়েদের ফেলে-যাওয়া পারফিউমের গন্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এরা অন্যমনস্কভাবে গুনগুন করে অনেকক্ষণ। নারী সাহচর্য-বর্জিত এদের জীবনটা অন্ধকার। উচ্চাশা জাতীয় কোনও আবেগ হয়তো একসময় ছিল এদের, স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বড় হবার তুমুল প্রতিযোগিতায়, ক্রমাগত ফার্স্ট ডিভিশন মিস করার ফলে এরা এখন ইঞ্জিনছাড়া এক-একটি মালগাড়ি। নড়ে না, চড়ে না। গ্র্যাজুয়েট হবার গ্লানি এরা ঝেড়ে ফেলতে পারে না। তাই যে-কোনও ছুতোয় হম্বিতম্বি করে। বেয়াদব রিকশাওলা কি অনিচ্ছুক ট্যাক্সি ড্রাইভার এদের কাছে পার পাবে না। বাইরে থেকে কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি পল্লিতে ঢুকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে দেখতে পেলে এরা তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। আসল কথা, এই বীরু, পল্টু, বিভাস, শান্টু—এই বেকার ছেলের দল সমাজের কাজে লাগতে চাইছে, কিন্তু সমাজ ওদের কাজে লাগাচ্ছে না। ওদের লজ্জায় ফেলে রেখেছে। এখন হাত ধরে তুলে নিয়ে গিয়ে এদের যদি এক একটা চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়, তবে এদের উদ্যম আবার ফিরে আসতে পারে হয়তো। কিন্তু হাত ধরে নিয়ে যাবে এমন সখা কোথায়? নিয়ে গেলেও তাকে চেয়ার দেবে না বসতে, দেবে একটা পতাকা, বলবে শ্রেণীশত্রু, পার্টির শত্রু হটাও। পার্টির কাজ করো, ঠিক সময়ে ফল মিলবে।

আর একটা আড্ডা বসে পল্লির ভেতর ওই প্রকাণ্ড নিমগাছের নীচে। বুড়োদের আড্ডা। ভোরবেলা থেকে বসে, সকাল সাতটা-সাড়ে সাতটায় ভেঙে যায়। অনুপম হাউসিং এস্টেটের মধ্যে কোনও পার্ক নেই, তবে খোলামেলা জায়গা আছে বিস্তর। গাছ আছে। শিরীষ, কৃষ্ণচূড়া, ইউক্যালিপটাস আর বড় বড় পাতার কাঠচাঁপা। সরু সুরকির পথ আছে চৌহদ্দিজোড়া। সেই সুরকির পথ ধরে দু'পাক হেঁটে আসার পর বুড়োরা এখানে বসে গুলতানি করে।

সেদিন অর্ধচন্দ্রাকার বেদিতে বসে আছেন তিনজন।

এ ব্লক তিন নম্বর ফ্ল্যাটের রাধারঞ্জন দত্ত ওরফে রাধুবাবু বললেন, "কাল রাত্তিরে খুব বৃষ্টি হয়েছে মনে হয়।"

"মনে হয় কী মশায়, দেখছেন না বাড়িগুলোর দেয়াল এখনও ভেজা।" হাতের লাঠিটা তুলে দেখালেন ই ব্লক ছ'নম্বর ফ্ল্যাটের দেবব্রত ঘোষাল, "ওই দিকটায় বেশ জলও জমেছে দেখলাম।"

"প্রত্যেক বছরই এই সময় জল জমে।"

সি ব্লক চার নম্বর ফ্ল্যাটের নকুলচন্দ্র পাল বললেন, "দশগাড়ি ঘেঁষ কি সুরকি ফেলে দিলে জায়গাটা ভরাট হয়ে যায়। এতদিনেও তা সম্ভব হয়ে উঠল না। প্রত্যেক বছর এখান থেকে নালিশ গেছে। প্রত্যেক বছর শুনেছি ব্যবস্থা হবে।"

এঁদের তিনজনেরই বয়স ষাট কি তার কিছু বেশি। দেবব্রত কেবল পঁয়ষট্টি ছাড়িয়েছেন। একসময় এঁরা রাজ্য সরকারের কর্মী ছিলেন, এখন অবসরপ্রাপ্ত। নকুলচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অসুস্থ। ডায়াবেটিস আছে, চোখে ভাল দেখতে পান না। দুটি কন্যার বিবাহ দিয়েছেন, তারা দূরে দূরে থাকে। সঞ্চয় বলতে তেমন কিছু আর অবশিষ্ট নেই। পেনশনটুকু ভরসা। স্বামী-স্ত্রীর তাতেই চলে যায় কোনও রকমে। যখন এসেছিলেন প্রথম, তখন ফ্ল্যাটের ভাড়া ছিল তেষট্টি টাকা। ডি-এ মার্জ করার ফলে সেই ভাড়া বেড়ে বেড়ে উনআশি টাকায় দাঁড়ায়। এখন উনআশি টাকাই দিয়ে যাচ্ছেন অবসরের পর। দু'খানা শোবার ঘর, কোলে একটি খোলা বারান্দা, ভেতরে, রান্নাঘর আর বাথরুমের মাঝখানে খানিকটা জায়গা। সেখানে পাত পেড়ে একসঙ্গে কুড়িজন লোক খেতে পারে। কলকাতা শহরে এই ফ্ল্যাটের ভাড়া পাঁচশো টাকার কম নয়। অনুপম হাউসিং এস্টেট সেদিক থেকে দেখলে কলকাতা শহরের মধ্যে একটা দ্বীপ। নকুলচন্দ্রের স্ত্রী কাজলী বলেন, "আমরা এখান থেকে নড়ছি না। কোথায় যাব মরতে? সময়-অসময়ে পল্লির ছেলেরা, প্রতিবেশীরা ছুটে আসে সাহায্য করতে। কতখানি ভরসা। বালিগঞ্জে কী আছে? পাড়ায়

জল জমলে বালিগঞ্জের লোকেরা লাঠি দিয়ে মড়া ঠেলে দেয়, ওখানে মানুষ থাকে?"

এই গল্প নকুলচন্দ্রই বলেছিলেন স্ত্রীকে। সেই যেবার খুব বৃষ্টি হল সকাল থেকে একনাগাড়ে সন্ধে অবধি, সমস্ত পথঘাট ডুবে গেল। বৃষ্টি থেমে গেলে পর এক ভদ্রলোক নাকি বাগবাজার থেকে দক্ষিণ মুখে অন্ধকারেই রওনা হন। ভেবেছিলেন পথে যানবাহন একটা জুটে যাবে। কিছু না পেয়ে তারার আলোয় হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলেন। ঢাকুরিয়া পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেননি। কোমরজল ঠেলতে ঠেলতে অন্ধকারে ঠান্ডায় পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে জলেই পড়ে যান। পরদিন সকালে সেই মড়া ভেসে উঠেছিল, শার্ট-প্যান্ট পরা একটা বিশাল পেট। জলের স্রোতে বডিটা মেন রোড থেকে ঢুকে পড়েছিল ভেতরের রাস্তায়। এখানে-ওখানে আটকে যাচ্ছিল। কার বডি, কী করে মারা পড়ল, এসব খোঁজখবর বালিগঞ্জের লোকেরা করেনি। তারা শুধু নিজেদের দোরগোড়া থেকে লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে মড়াটাকে সরিয়ে দিয়েছিল। ঠেকতে ঠেকতে মড়াটা গিয়ে এক বস্তির মুখে পড়ে। সেখানে বস্তির লোকেরা ভদ্রলোকের ডেডবডি ভাসছে দেখে হাউমাউ করে ওঠে। পুলিশ জানতে পেরে মড়াটা তোলার ব্যবস্থা করে বিকেল নাগাদ। সংবাদটা বেরিয়েছিল সংক্ষেপে। গল্পটা মুখে মুখে ছড়ায়।

বালিগঞ্জে যারা থাকতে পায় না, তাদের ভারী রাগ বালিগঞ্জের লোকেদের ওপর।

নকুলচন্দ্র জিজ্ঞেস করেন—"কুঞ্জবাবু আজ অনুপস্থিত যে। শরীরটরির ভাল তো?"

রাধুবাবু বললেন, "কাল রাত্রে বোধহয় গুরুভোজন হয়েছে। সকাল সকাল উঠতে পারেননি।"

"কী করে জানলেন?"

"বৃষ্টির দিন, চারতলায় কখন ইলিশমাছ ভাজা হচ্ছে, কখন পায়েস রান্না হচ্ছে, কখন লুচি পড়ছে পাতে—দোতলার জানলা দিয়ে সব টের পাওয়া যায়। চম্পা বলে কী, বাবা, এবেলা তোমার আর কিছু খেয়ে কাজ নেই। গন্ধে যা খেয়েছ তাই বরং হজম করো।"

বলতে বলতে রাধুবাবু হাসেন।

"সুখী মানুষ। জীবনটা উপভোগ করতে জানেন। আমরা ষাট পেরোতে না পেরোতে বুড়ো হয়ে গেলাম।" দেবব্রত তাঁর কলপ-ওঠা ব্রাউন চুলে হাত বোলান।

এ ব্লক সাত নম্বর ফ্ল্যাটের কুঞ্জবিহারী সামন্ত পাকা লোক। তাঁর সংসারও অপেক্ষাকৃত বড়। 'অনুপম' যে এম আই জি নয়, রেন্টাল স্কিমের ফ্ল্যাট, চাকরির সঙ্গে যুক্ত এক আবাসন ব্যবস্থা, সুতরাং অবসর নিলে ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হতে পারে, এই কাণ্ডজ্ঞান ও তজ্জনিত দূরদর্শিতা তাঁর ছিল। বছর ছয়েক হল অবসর নিয়েছেন কুঞ্জবিহারী, তার এক বছর আগে তাঁর ছেলে অশোক চাকরি পেয়েছে ব্যাঙ্কে। তখন অশোকের নামে ব্রহ্মপুর নাকতলায় জমি কিনেছেন পাঁচ কাঠা। এখন ব্যাঙ্কের টাকায় বাড়ি উঠছে। যতদিন এভাবে চলে চলুক, তিনি বিশ্বাস করেন, মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই কিন্তু বেঁচে থাকতে থাকতে করে যাওয়া দরকার।

গত বছর এই নিমগাছের নীচে এক রবিবার সকালে আবাসীদের মিটিং হয়েছিল। সেই মিটিংয়ে উপস্থিত সকলে এককণ্ঠে দাবি জানায়, আমরা ফ্ল্যাট ছাড়ব না। সরকারের নোটিশ অগ্রাহ্য করব। আমরা মাসে মাসে ভাড়া দিয়ে আসছি, ভাড়া যখন বেড়েছে তখন বাড়তি ভাড়া দিয়েছি, আমরা স্ট্যাটুটারি টেনান্ট। সরকার আমাদের উচ্ছেদ করতে পারে না। আমরা মামলা করব হাইকোর্টে।

"ফ্ল্যাট নেবার সময়ে আমরা কিন্তু লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম চাকরির সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আবাসনে থাকার অধিকারেরও সমাপ্তি—এই শর্ত আমরা মানলাম। মনে পড়ে?" কুঞ্জবিহারী সামন্ত প্রকাশ্য সভায় এই প্রশ্ন রেখেছিলেন।

কুঞ্জবিহারী সে-দিন লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে, বেদির উপর দাঁড়িয়ে অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিলেন, "তবে আমরা যারা অবসর নিয়েছি, আমাদের পাওনাগন্ডা মেটাবার সময় বাড়িভাড়ার কথা উত্থাপন করেননি ওঁরা। কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসন ব্যবস্থায় সে-ব্যাপারে কড়াকড়ি আছে। বাড়ি না ছাড়লে পাওনা টাকা আটকে যায়। এটা দফতর বিশেষের গাফিলতির কারণে হয়েছে। এই গাফিলতির সুযোগ নিয়ে আমরা এখন দাবি করতে পারি যে, আমাদের তুলে দেবার ইচ্ছা সরকারের ছিল না। আমরা আবেদন করতে পারি যে উপস্থিত মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যারা রাজ্য সরকারের সেবা করেছি আজীবন, তারা আশ্রয়চ্যুত হলে অমানবিকতার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে সরকার আরও নতুন নতুন আবাসন পল্লি গঠন করুন, সরকারি কর্মীদের থাকতে দিন সেখানে। বাসগৃহ সমস্যা

সমাধানের প্রয়োজনীয়তা তো তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না।"

জনমত সেদিন তাঁর আপোসপন্থী যুক্তিতে সায় দেয়নি। তারা হাইকোর্টে মামলা ঠুকেছে। মামলা জিতেছে। সেই আনন্দে তারা আত্মহারা। অনুপমের মতো আরও সব রেন্টাল হাউসিং স্কিমের সদস্যরা একত্র হয়ে প্রস্তুত করেছে মামলার নথিপত্র। সুপ্রিম কোর্ট অবধি যায় তো যাক, ওরা লড়ে যাবে। এ হল মাটি কামড়ে থাকার লড়াই। বাঁচার লড়াই।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এভাবে পায়ের তলা থেকে তক্তা সরিয়ে নেবে কে ভেবেছিল! দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় বরাবর দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত মানুষের পক্ষে রায় দিয়েছে। এই মামলায় কিনা স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দিল, সরকারি সম্পত্তির ওপর জবরদখল বরদাস্ত করা হবে না। অনধিকারী—সে ভিখিরি, হকার, শরণার্থী বা প্রাক্তন সরকারি কর্মী, যে-ই হোক, পুলিশ দিয়ে সরকার তাকে উচ্ছেদ করতে পারে। উচ্ছেদ করবে। না করলে দেশের কোনও সম্পত্তিই আর রক্ষা করা যাবে না।

যাদের নামে ফ্ল্যাট তারা সবাই দিন কয়েকের মধ্যে নোটিশ পেয়ে গেল।

রাধুবাবু বলেন, "ফুটপাথের হকার আর আমরা এক হয়ে গেলাম।"

প্রবীণ দেবব্রত ঘোষাল বলতে চান, "তা ছাড়া আর কী। তখনই আমরা যদি একটু নরম হতাম, কুঞ্জবাবুর পরামর্শ শুনতাম! আফটার অল, ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন তো। বিচক্ষণ ব্যক্তি।"

একটু থেমে বললেন, "আজ দুপুরে একটা ট্রাক ঢুকতে দেখলাম। ফার্নিচার বোঝাই।"

"ভোরের দিকে দুটো-একটা করে ট্রাক রোজ বেরোচ্ছেও। কে আর পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হতে চায়! কিন্তু আমি যাব কোথায়?" অসুস্থ নকুলচন্দ্র হতাশ সুরে এই কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ান। তারপর পা বাড়ান বাড়ির দিকে। চা খাবার সময় হল।

নোটিশ পাওয়ার পর থেকে কারও মনে শান্তি নেই।

'অনুপম' থেকে দু'কদম গেলেই বাস টার্মিনাস। বিবাদী বাগ কুড়ি মিনিটের পথ মাত্র। সুতরাং বাবুরা কেউ এগারোটার আগে বেরোয় না। কাছে একটা ছোট বাজার বসে সকালবেলা। টাটকা মাছ, তরিতরকারি আসে বাজারে। অনেকেই সকালে বাজার করে। মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে আপিস যায়। কেউ কেউ টিফিন বাকসে পরোটা-আলুচচ্চড়িও নিয়ে যাবার সময় পায়। যারা নেয় না, তারা মহাকরণের চৌহদ্দিতে ঘুরে ঘুরে হরেক রকম টিফিন করে। পেটরোগাদের জন্যে বেলের মোরব্বা, কাঁচাগোল্লা, ডাব, বাতাবি লেবু, সেখানে যেমন সুলভ তেমনই মুখের সুখ করতে লুচি, আলুর দম, চপ, ধোসা, গরম গরম ঘুগনি। নিউ সেক্রেটারিয়েটে চমৎকার ক্যান্টিন আছে নীচের তলায়। আমিষ-নিরামিষ সব রকম খাবারই সেখানে সুস্বাদু ও সুলভ। সরকারি কর্মীরা অনেকক্ষণ ধরে টিফিন করার সুযোগ পায়।

সপ্তাহের অন্যদিনগুলো যেমন তেমন করে কেটে গিয়ে রবিবারে এসে বিশ্রাম নেয়। রবিবার বিশ্রামের দিন, উপভোগের দিন। সত্যি কথা বলতে গেলে, উপভোগ শুরু হয়ে যায় শনিবার রাত থেকে। কোনও ফ্ল্যাটে তাসের আড্ডা চলে মধ্যরাত্রি অবধি, কোথাও দাবার স্নায়ুযুদ্ধ। এইচ ব্লক এক নম্বর ফ্ল্যাটের প্রবীরচন্দ্র শনিবার-রবিবার হারমোনিয়াম বাজিয়ে রেওয়াজ করে। বিয়েথা করেনি, শরিফ মেজাজ, কোনও ভাবনা-চিন্তা করার অভ্যেস ওর নেই। আজকাল অনেক ফ্ল্যাটে টিভি হয়েছে। শনিবার-রবিবার দু'দিনই টিভি-তে বিশেষ প্রোগ্রাম থাকে। ফ্ল্যাটের সবাই একটা ঘরে জড়ো হয়ে, প্রবীর যাকে বলে টেলিভূষণ, সেই টেলিভূষণের কাচের দিকে ওত পেতে বসে থাকে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা। অতিথি অভ্যাগত এসে পড়লে তাদের সঙ্গে আর গল্পসল্প হয় না। তারাও বসে পড়ে। প্রবীরের ফ্ল্যাটে দেশি বিদেশি নানা রকম সংগীতের রেকর্ড ও ক্যাসেট আছে। ও ইচ্ছামতো বাজায়। একা শোনে।

রবিবার বাঙালি পরিবারে মাংস খাওয়ার দিন। পানের দোকানের পাশে পাঁঠার মাংসের দোকান। রবিবার সকালে সে-দোকানে অনেকগুলি পাঁঠার লাশ ঝুলতে দেখা যায়। বারোটার পর কুকুর ও কাকের জন্যে কয়েকটি খুর আর শিং ছাড়া আর কিছু পড়ে থাকে না। নিরীহ প্রাণীদের ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ততক্ষণে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে রান্না হচ্ছে। অনুপম হাউসিং এস্টেটময় তখন অনুপম মাংস রান্নার গন্ধ। বাইরের লোক হঠাৎ গিয়ে পড়লে অবাক হয়ে দেখবে, পরনে লুঙ্গি, খালি-গা, হাওয়াই চপ্পল পরা,

প্রায় একরকম দেখতে মাঝারি মাপের পুরুষেরা গুচ্ছ গুচ্ছ দাঁড়িয়ে হাসিতামাশা করছে কিংবা উচ্চস্বরে তর্ক করছে। যথাসময়ে বাড়ি ফিরে এরা মাংস-ভাত খেয়ে ঘুমোবে সারাদুপুর। বিকেলে ফোলা মুখ ও লালচে চোখ নিয়ে এরা নিজ নিজ ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে চা খাবে এবং অপেক্ষা করবে কখন টিভি-র বিশেষ প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে তার জন্যে। এই রকম ছকবাঁধা ওদের জীবন, ওদের ছুটির দিন।

ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবে এরাই সংখ্যায় বেশি। এদের এখনও অবসর নেওয়ার সময় হয়নি। এদের কেউ উঠে যেতে বলছে না। এরা নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন আড়াইশো ফ্ল্যাটেই ছিল এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত, যখন চাকরি থেকে অবসর নিলে লোকে উঠে যাবার কথা ভাবত না। তেষট্টি টাকা হোক আর উনআশি টাকা হোক, যতদিন নিয়মিত ভাড়া দিয়ে যেতে পারবে, ততদিন সম্মানজনকভাবে বসবাসের অধিকারও থাকবে, তাদের মনে এই জোরটুকু ছিল।

দেবব্রত ঘোষালের বয়স পঁয়ষট্টি। তিনি বিপত্নীক। একটি ছেলে আছে, বিভাস, সে বেকার। চাকরি থাকতে থাকতে ছেলের জন্যে কোনও সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে দিতে পারেননি কারণ তখন সে পড়াশোনা করত। মা মারা যাবার পর তার কী মতিভ্রম হল, হঠাৎ কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিল বিভাস। বি এ পাশ করে আইন পড়ছিল। বলল, “ব্যবসা করব বাবা। ওকালতি করে কী হয়?”

ব্যবসা বলতে কী বোঝায়, সে জানত না। কিছু সময় ও অর্থক্ষয় করার পর সে বুঝতে পারে যে, ও জিনিস তার দ্বারা হবে না।

ই ব্লক ছ'নম্বর ফ্ল্যাটে টিভি নেই। সেদিন রবিবার। সন্ধেবেলা দেবব্রত তাঁর ঘরে বসে ছিলেন। নীচের তলার চার নম্বর ফ্ল্যাটের শরদিন্দুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। বিভাস যথারীতি ওই সময় বাড়িতে নেই। ই ছয় ফ্ল্যাটটি শান্ত, কিন্তু সারা মহল্লা টিভি প্রদর্শিত ছায়াছবির শব্দে গমগম করছে। অসমবয়সি এই দুই প্রতিবেশীর স্বভাবে কোথাও মিল আছে। উভয়েই স্ত্রী-সম্পর্ক বর্জিত, উভয়েই চুলে কলপ লাগান।

কেউ কড়া নাড়ল দরোজায়।

বয়ঃকনিষ্ঠ শরদিন্দু দরোজা খুলে দেয়। প্যান্ট ও বুশশার্ট পরা একজন ভদ্রলোক, লম্বাটে মুখ, কানের নীচে পর্যন্ত ঝোলানো জুলপি আর তার সঙ্গে এক মহিলা। মহিলার কপালের টিপ ও সিঁথির মোটা সিঁদুররেখা দেখে অনুমান হয়, ওরা শহরতলি থেকে এসেছে। লোকটির বয়স ত্রিশের বেশি হবে না।

“এটা কি ই সিক্স?”

“হ্যাঁ।”

“ডি ঘোষাল থাকেন এখানে?”

“আমি দেবব্রত ঘোষাল। আসুন, ভেতরে আসুন। বসুন।”

নবাগত দু'জন বেডকভার-ঢাকা বিছানার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে।

লোকটি বলে,—“আমার নাম বেণু ঘোষ। শিবপুরে থাকি। ওঃ, এই ফ্ল্যাট খুঁজে বার করতে কালঘাম ছুটে গেছে। অনুপম হাউসিং এস্টেট কোথায় কেউ বলতেই পারে না। কোনও রকমে যদি খুঁজে বার করলাম তো ফ্ল্যাট খুঁজতে প্রাণান্ত। বাইরে একটা লোক নেই—যে জিজ্ঞেস করি।”

দেবব্রত বললেন, “হ্যাঁ, এই সময়ে সবাই টিভি দেখে।”

লোকটি টার্কিস রুমাল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছতে থাকে।

“একগ্লাস জল পেতে পারি? ওঃ যা গরম! পাখাটা একটু জোর করে দেবেন?”

শরদিন্দুই জল এনে দেয়। ঘুরিয়ে দেয় পাখার রেগুলেটর।

জলটল খেয়ে শান্ত হয়ে বসে লোকটি বলে, “এই ফ্ল্যাটটা আমার নামে অ্যালট করা হয়েছে। আমি স্মল স্কেল ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। আপনি কবে ফ্ল্যাট ছাড়ছেন জানতে পারলে আমি একটা শুভদিন দেখে শিফট করব।”

দেবব্রত হঠাৎ কোনও কথা বলতে পারলেন না। তাঁর বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শব্দ হতে লাগল। একবার শরদিন্দুর দিকে হতাশ চোখে তাকালেন দেবব্রত।

“আপনার কাছে অ্যালটমেন্ট লেটারটা আছে? একটু দেখাবেন? শরদিন্দুই জিজ্ঞেস করে।—“ফ্ল্যাট ভেকেট করার আগে কী করে আরেকজনের নামে বিলি হয় বুঝতে পারছি না।”

“ভেতর থেকে খবর পেয়েছি।” লোকটি বলল, “চিঠি ইস্যু হচ্ছে। আপনি কপি পাবেন। কিন্তু তখন আর খুব বেশিদিন সময় থাকবে না। রাজ্য সরকার পুলিশের সাহায্য নেবেন। নোটিশ অনুসারে

গতমাসেই তো আপনার ফ্ল্যাট ছাড়ার কথা, তাই না?"

"ছাড়ার কথা বললেই তো ছাড়া যায় না।" এবার দেবব্রত সামলে উঠেছেন, "বিশ বছর এইখানে আছি, বুঝলেন কিনা। এক দিনও ভাড়ার ব্যাপারে ডিফলটার হইনি। চাকরি থাকতে মাইনে থেকে কেটে নিয়েছে। রিটায়ার করার পর আমার ছেলে গিয়ে ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে আসে ভাড়া। প্রতি মাসের এক তারিখে জমা দেয়। আমার কাছে প্রত্যেকটি রসিদ আছে, বুঝলেন কিনা। এত সত্ত্বেও যদি আমাকে শেকড়বাকড় তুলে উঠে যেতে হয় এই বয়সে, তবে আমাকে উপযুক্ত সময় দিতে হবে। কলকাতা শহরে বাড়ি পাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়।"

লোকটি হা-হা করে হেসে উঠল। বেয়াদবের মতো বলল:

"নিজের বাড়ি নয়। এক পয়সা খরচ করেননি ইট গাঁথতে। ভাড়াটের স্বত্বও হারিয়েছেন ছ'-সাত বছর আগে। অথচ শেকড়বাকড় গজিয়ে ফেললেন এখানে। এ কি হকার স্টল?"

দেবব্রত লোকটির কথায় ব্যথা পান। শরদিন্দুও লোকটির গ্রাম্য ব্যবহারে বিরক্ত হয়।

বলে, "আপনার সরকারকে বলুন, কলকাতা ছেয়ে গেছে যেসব হাজার হাজার বেআইনি জবরদখল হকার-স্টলে, আগে সেগুলো উচ্ছেদ করুক। সেখানে বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে, আর, এখানে একটা অসহায় মধ্যবিত্ত পরিবার, এদের তাড়াতে এত হুড়োহুড়ি! পুলিশ আসবে। তা হলে আসুক পুলিশ। তখন দেখা যাবে। রাস্তায় পড়ে থেকে বেঘোরে মরার চেয়ে পুলিশের গুলিতে মরা ঢের ভাল। অন্তত আমি সেই রকম পরামর্শ দেব দেবুদাকে।

রুখে ওঠার ফলে লোকটি এবার একটু ঠান্ডা হল। সুর নামিয়ে বলল,—"আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমার ওপর রাগ করছেন কেন? সরকারের যেমন সিদ্ধান্ত হবে, তেমনই কাজ হবে। বলতে গেলে, আমরা সবাই তো এক হিসেবে সহকর্মী—তাই না? আমাদের সম্পর্ক সৌহার্দ্যের।"

লোকটি একটু চুপ করে থেকে শরদিন্দুকে জিজ্ঞেস করে, "আপনি কোন ডিপার্টমেন্ট?"

"আমি নীচের তলায় থাকি। ই ফোর। আমার নাম শরদিন্দু পুরকায়স্থ। ওকালতি করি। আলিপুরে। আমার ছোটভাই বিদ্যার্থীর নামে ফ্ল্যাট।"

"নমস্কার।" লোকটি বিনয়ে যেন গলে পড়তে চায়।—"খুব ভাল লাগল আলাপ করে। পরে দেখা হবে। আরও ভাল করে আলাপ হবে।"

অশেষ উদ্দীপনা বেণু ঘোষের। ও নাকি ক্রিকেট পাগল। এখানে এসে ও ছেলেদের নিয়ে ক্রিকেটে ক্লাব গড়ে তুলবে। ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাকি মিনিবাস আছে। ছুটিছাটার দিনে সেই মিনিবাসে চড়িয়ে অনুপম আবাসনের প্রতিবেশীদের ও ডায়মন্ডহারবার, দীঘা, বিষ্ণুপুর বেড়াতে নিয়ে যাবে। শিবপুরে কোনও লাইফ নেই। কূপমণ্ডুক সব। শিক্ষার আলো হাওয়া গায়ে লাগেনি। এইসব কথা ইনিয়েবিনিয়ে বলল।

রেল যাত্রীদের সঙ্গে তুলনা দিয়ে রসিকতা করল বেণু ঘোষ। স্টেশনে ওঠার সময় ঝগড়াঝাঁটি, জায়গা ধরে বসে থাকা, ধাক্কাধাক্কি করে ঢোকা। কী চেঁচামেচি চিৎকার। বাচ্চারা কেঁদে উঠছে। বোঁচকা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কী টেনশন। তারপর ট্রেন ছাড়ল। আস্তে আস্তে যাত্রীদের পরস্পরের মধ্যে ভাব হল। একজনের কৌটোর খাবার আরেকজন খায়। একজনের জলের পাত্র আরেকজন ভরে নিয়ে আসে। যেন কতকালের আত্মীয়। তারপর যখন রাত হবে, তখন দেখবেন, যারা সবচেয়ে বেশি ঝগড়া করছিল, তারাই ঘুমোতে ঘুমোতে এ-ওর ঘাড়ে ঢুলে পড়ছে।

বেণু ঘোষ বলে, "এ আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। এই হল জীবন। রেলগাড়িতে চড়ে বসলাম। আমার স্টেশন এলে নেমে গেলাম। ট্রেন কিন্তু চলছেই।"

লোকটির প্রগলভতায় শরদিন্দুর হাসি পায়। সে হেসে ফেলে বস্তুত। আর তাই দেখে দেবব্রত অপ্রসন্ন হন। তাঁর মনে হয়, রেলগাড়ির উপমাটা ঠিক নয়। কোথায় ঠিক নয় বুঝতে পারেন না।

বেণু ঘোষের সঙ্গিনী কোন ফাঁকে বিছানা থেকে নেমে গেছে কেউ লক্ষ করেনি। সে ঘুরে ঘুরে ফ্ল্যাটটি দেখেছে আর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়েছে। কে ভেবেছিল, এই রকম একটা থাকার জায়গা ওরা পাবে। ও ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে, শাশুড়ি না, ননদ না, শিবপুর থেকে কাউকে এখানে আনবে না। শুধু ওরা দুটিতে এই ফ্ল্যাটে থাকবে। ওরা ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভরতি করে দেবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। চার বছরে পড়ল, আর দেরি করলে কোথাও সিট পাবে না।

ভাবতে ভাবতে বউটি ডেকে ওঠে পাশের ঘর থেকে। সুর করে ডাকে:

"এই শোনো। এইখানে আমার ড্রেসিং টেবিলটা রাখব। কেমন? ওপরে আলোর পয়েন্ট আছে, জানলা থেকে আড়াল। কেমন? একবার এসো না। আর এইখানটায় বুবাইয়ের পড়ার টেবিল। কেমন?"

বেণু ঘোষ তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়; একবার দেবব্রত একবার শরদিন্দুর মুখের দিকে চায়। বউকে বলে, "হবে হবে। পরে এসব ভাবা যাবে।"

বলতে বলতে সে বউয়ের হাত ধরে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যায়।

শরদিন্দু দরো'জা বন্ধ করে ফিরে এলে পর দেবব্রত জিজ্ঞেস করেন, "কী মনে হল? ব্লাফ। তাই না?"

"ব্লাফ না হতেও পারে দেবুদা", শরদিন্দু অন্যমনস্কভাবে বলে, "আমার মনে হয়, ক্যাডার।"

চার

দিন যায়। এক-একটা করে দিন যায় আর ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে উদ্বেগ পেকে টাটিয়ে ওঠে ফোড়ার মতো।

যে-কোনও দিন পুলিশ হামলা করতে পারে।

আমরা যাদের কথা বললাম, সে রকম আরও অনেক পরিবার আছে অনুপম হাউসিং এস্টেটে। কুড়ি বছর ধরে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করছে এখানে। এখন এক অদৃশ্য ভয় ও আত্মরক্ষার বোধ থেকে পরিবারগুলি ক্রমশ দু'ভাগে বিভক্ত হতে থাকে। যাদের চলে যেতে হবে, তারা অসহায় এবং দুর্বল। তাদের মধ্যে যারা আপ্রাণ চেষ্টায় কোনও একটা বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারছে তারা কালক্ষেপ না করে চলে যাচ্ছে পল্লি ছেড়ে। কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠছে, কেউ শহরতলিতে বাড়ি ভাড়া করে উঠে যাচ্ছে। কলকাতার বাইরে বাড়িভাড়া কম। সুখ-সুবিধাও কম। তা হোক, যেমন সঙ্গতি, তেমন ব্যবস্থা। সরকারি ফ্ল্যাট অধিকার করে বসে থাকার ঝুঁকি আর নেওয়া যায় না। যারা অবসরপ্রাপ্ত, তারা স্বভাবত সংখ্যালঘু, বিদ্রোহ করার মতো মনের জোর তাদের নেই।

এক-একদিন ভোরবেলা দেখা যায়, খালি ট্রাক বা টেম্পো ঢুকছে অনুপম আবাসনে। কোনও-কোনও দিন একাধিক। কোনও একটা ব্লকের সামনে দাঁড়াচ্ছে। তারপর ফার্নিচার তোলার শব্দ হয়। বাসন তোলার শব্দ হয়। খুব ধীর, অভিমানী সেই শব্দ। একসময় ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার নির্বিকার শব্দ হয়। পাড়ার লোক ঘুম ভেঙে উঠে, পরদার ফাঁক দিয়ে দেখে, কারা চলল। যেন কেউ একটা মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে, সেই রকম শান্ত নিস্তব্ধ সম্ভাষণহীন এই বিদায়। এই অপসরণ।

মশারি তুলে রূপা ই ব্লকের দোতলার জানলা থেকে এ ব্লকের দিকে তাকিয়ে থাকে।

স্বামীকে ডেকে বলে, "শুনছ, কুঞ্জবাবুরা চললেন। একটা ট্রাক, পেছনে ট্যাক্সি। ওই তো, নাতির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

স্ত্রীর ডাকে ঘুম ভেঙে যায় বিদ্যার্থীর। একটা সুখস্বপ্ন নাগালের মধ্যে আসছিল, হঠাৎ ছিঁড়ে গেল স্বপ্নটা। পাশ ফিরে বালিশে মুখ ঘষতে ঘষতে সে স্বপ্নটা আবার ধরার চেষ্টা করে।

রূপা আবার ডাকে, "এই। একবার দেখবে না? এখান দিয়েই তো যাবে। নীচে না হয় না নামলে, বারান্দা থেকে অন্তত হাত নাড়ো। ওঁদের সঙ্গে আর জীবনে হয়তো দেখাই হবে না।"

"গুলি মারো।" বিদ্যার্থী বিরক্ত হয়ে আবার পাশ ফেরে।

চা খেতে খেতে রূপা আবার কথাটা পাড়ল।

"কুঞ্জবাবুরা চলে গেলেন? একবার উঠে দেখলে না।"

"চলে যাওয়ার আবার দেখার কী আছে? দু'কামরার ফ্ল্যাট থেকে ছ'কামরার নতুন দোতলা বাড়িতে চলে গেলেন। আরও আগেই যাওয়া উচিত ছিল। একজন সরকারি কর্মী বাসা পেত।"

"আজ তুমি এ-কথা বলছ? একদিন আমাদেরও এইভাবে চলে যেতে হবে। কেউ উঁকি মেরে দেখবে না। তার আর খুব বেশি দেরি নেই।"

বিদ্যার্থী বলে, "মরে না গেলে এখনও আট বছর।"

মেজাজ বিগড়ে যায় রূপার। এমনিতেই মনটা খারাপ, তার ওপর অকারণ মরার কথা আসে কী করে? যে-কেউ তো যে-কোনও সময়ে মরতে পারে। তা নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। এই আটটা বছরও দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

"এখন থেকে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁইয়ের কথা ভাবো", রূপা বলে। "শিরে সংক্রান্তি এলে আর মাথার ঠিক থাকবে না।"

মেয়ের বিয়ে দিয়ে আর বাড়ি করার টাকা বিদ্যার্থী পাবে কোথায়? আজকাল জমির যা দাম! মেটিরিয়ালের যা দাম!

বিদ্যার্থী বলে, "দাদাকে বলেছি। দাদা যদি জমি কেনার টাকাটা দেয়, তা হলে ধরাধরি করে—ইস্টার্ন বাইপাসের কাছে একটা প্লট ধরা যায়।"

"যদি কেন? টাকা জমিয়ে তোমার দাদা করবেন কী!"

"বাঃ, ব্যাচেলরের কি বার্ধক্য আসে না? দাদাও একদিন বুড়ো হবে। ওর রোজগার বন্ধ হবে। তখন?"

"তখন আমরা তো আছি। আমরা দেখব। এখন যেমন একসঙ্গে আছি, তখনও থাকব। নিজেদের একটা বাড়ি থাকলে খাওয়া-পরার আর কত খরচ।" বুদ্ধিমতীর মতো পরামর্শ দেয় রূপা। "ইস্টার্ন বাইপাস কোন দিকে গো?"

"বালিগঞ্জের কাছেই" বলে সিগাবেট ধরিয়ে উঠে যায় বিদ্যার্থী। রূপা যায় রান্নাঘরের দিকে।

একদিন ভোরবেলা হাঁটতে হাঁটতে সঙ্গীহীন রাধারঞ্জন দত্ত এ ব্লক থেকে ই ব্লক ছাড়িয়ে এইচ ব্লক অবধি চলে গেছেন। এইচ ব্লকের সামনে একটা কাঠচাঁপা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পড়লেন হঠাৎ। একতলার ঘবে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করছে প্রবীর। বোধহয় মীরার ভজন। আত্মসমর্পণের গান ভারী ভাল লাগছিল শুনতে। দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ, এমন সময় হঠাৎ একথোকা ফুল চাবির গোছার মতো থপ করে তাঁর পায়ের কাছে পড়ল।

কী মনে হল, ফুলের থোকাটা তুলে নিলেন রাধারঞ্জন। তারপব প্রবীরের ফ্ল্যাটে গিয়ে টোকা দিলেন।

গান থামিয়ে প্রবীর দরজা খোলে।

"আরে! রাধুবাবু যে! আসুন, আসুন। গরিবের বাড়িতে কী মনে করে?"

"এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমার গান শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভাবলাম, এই ফুল দিয়ে তোমায় গ্রিট করি।"

অগোছালো ঘর। আলুথালু বিছানা। মেজের ওপর একরাশ সিগারেটের টুকরো। ঘরের একপাশে আলনা, তার ওপর গাদা-করা জামাকাপড়। শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি, লুঙ্গি, তোয়ালে। বেডকভার অবধি। দু'পাটি চপ্পল ঘরের দুই কোনায়।

প্রবীর ঘর গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হারমোনিয়াম তুলে রাখে টেবিলের ওপর। বিছানায় বেডকভার চাপা দেয়।

রাধারঞ্জন ওর সংকোচ ও ব্যস্ততা দেখে মৃদু মৃদু হাসেন।

"আহা, আর জামা গায়ে দিতে হবে না। আমি এখুনি চলে যাব।"

আপ্যায়নে অনভ্যস্ত প্রবীর জিজ্ঞেস করে, "চা করি? কাজের লোকটি বেলায় আসে। আমিই চা করছি।"

"থাক থাক, তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না।"

"আমিও খাব। কখনও আসেন না। একদিন পায়ের ধুলো দিলেন দয়া করে, আর আমি এক কাপ চা খাওয়াতে পারব না? আমি আপনার বাড়িতে এই সময় গেলে চা পেতাম না? বলুন?"

"ঠিক আছে। তুমি একজন স্বাবলম্বী পুরুষ। গুণী লোক। দু'কাপ চা করতে আর কতটুকু পরিশ্রম? করো, করো।"

অপ্রত্যাশিতভাবে রাধুবাবুর সঙ্গে প্রবীরের বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

যাবার আগে রাধুবাবু গান শোনার নেমন্তন্ন করেন প্রবীরকে। সামনের শনিবার সন্ধেবেলা। বাড়িতে হারমোনিয়ম আছে। চম্পা একসময় গানটান করত। ইতিমধ্যে ওটা ঝেড়েমুছে রাখতে বলবেন।

দিন যায়।

অনুপম আবাসনে এখনও পুলিশ হামলা করেনি। হামলা করবে ভয়ে অনেকে আস্তে আস্তে ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে। মামনির প্রেমিক শাণ্টু, ওরাও চলে গেল সেদিন।

শূন্য ফ্ল্যাট পূর্ণ হতে সময় লাগে না। নিশ্চয় অনেক দরখাস্ত ছিল ওয়েটিং লিস্টে। সরকার তাদের ফ্ল্যাট দিতে পারছিল না। এখন ক্রমশ নতুন নতুন সরকারি কর্মীর পরিবার এসে অনুপম আবাসনে স্থান নিচ্ছে। লক্ষণীয় যে, অনেকেই এরা অল্পবয়স্ক, যুবক। এরা এসে পল্লির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছে। কিছুকালের মধ্যে এই পল্লিতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যা কমে গিয়ে বালক-বালিকার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেল।

এ ব্লক সাত নম্বর ফ্ল্যাটে এসেছে শত্রুঘ্ন দে নামে একজন সুপুরুষ ভদ্রলোক। তার বউয়ের নাম পিউ। ওদের একটি সাত বছরের ছেলে আছে, তার নাম অথৈ। কী সুন্দর নাম না?

অল্পদিনের মধ্যে রূপার সঙ্গে পিউর বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

শত্রুঘ্ন উত্তরবঙ্গে পোস্টেড ছিল অনেক বছর। পিউর বাপের বাড়ি উত্তরবঙ্গে। রায়গঞ্জ। ওখানেই ওদের আলাপ-পরিচয় হয়। তারপর বিয়ে। শত্রুঘ্ন জিদ ধরেছিল, বিয়েতে কিছু নেবে না। কেন নেবে না? অনেক কষ্টে পিউ ওকে রাজি করিয়েছিল। বাবার আছে, বাবা দিচ্ছে। তুমি না নিলে বাবা ছোটবোনকে দেবে। নিয়েছিল বলেই না আজ সুন্দর করে ফ্ল্যাট সাজাতে পেরেছে।

পিউ সে-সব গল্প আটখানা করে বলে রূপাকে। ওর বাবার ভীষণ আপত্তি ছিল ইন্টারকাস্ট বিয়েতে। জোর করে, মেয়ের অন্য জায়গায় সম্বন্ধ করছিলেন। পিউ একটার পর একটা সম্বন্ধ কীভাবে কাঁচিয়ে দিয়েছে, কীভাবে মাকে দলে টেনেছে, সেই গল্প বারবার বলতে ভালবাসে। ওর ঠোঁটদুটি খুব সুন্দর। পিঠ ছাড়িয়ে ওর দীর্ঘ চুল নেমে যায়। একদিন রূপারও এই রকম চুল ছিল। রূপাও লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করেছে বিদ্যার্থীর সঙ্গে। সে-সব গল্প ও আর তেমন উৎসাহ নিয়ে বলতে পারে না। অনেকদিন হল। তবু পিউদের গল্প শুনতে ওর ভাল লাগে। ভালবাসার গল্প, ভাল লাগারই কথা।

একদিন পিউ আর একটা ভালবাসার গল্প বলল।

ওদের ব্লকেই। দোতলায় তিন নম্বর ফ্ল্যাট। রাধারঞ্জন দত্ত নামে একজন থাকেন। এখনও ফ্ল্যাট ছাড়েননি। তাঁর মেয়ে চম্পাকে নিয়ে গল্প।

চম্পা চাকরি করে। কোথায় যেন টেলিফোন অপারেটর। বয়েস তিরিশের বেশি হবে, কিন্তু কী সাজগোজ! কী মেকআপ! মনে হয় কুড়ি। পিউ বলে, চম্পা নাকি ডিভোর্সি। বাচ্চাকাচ্চা নেই, তবু ডিভোর্সিকে কে বিয়ে করবে বলো? কুমারী মেয়েদেরই বিয়ে হয় না।

পিউ বলে, "একজন মধ্যবয়সি ভদ্রলোক দেখছি প্রায়ই ওই ফ্ল্যাটে আসে। খুব গানটান গায়। এক-একদিন চম্পাও তার সঙ্গে গলা মেলায়। একদিন কলকাতায় অ্যাম্বার হোটেলের সামনে শত্রুঘ্ন ওদের দু'জনকে পাশাপাশি হাঁটতে দেখেছে।

"মধ্যবয়সি কেন বলছ ভাই? ও তো প্রবীর। খুব ভদ্র ছেলে।" রূপা ওকে সংশোধন করে।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেলে পর রূপা অধিক রাত্রে স্বামীকে এই নতুন খবরটা বলতে চাইল।

"ওদের বিয়েটা হয়ে গেলেই ভাল, তাই না, বলো?" রূপা স্বামীকে ছুঁয়ে ফিসফিস করে বলে।

"চাকরি করলেও চম্পার স্বভাব বেশ মিষ্টি। আর প্রবীরবাবু একা একা বেচারা দিনরাত গান গায়। কোকিলের মতো। কেমন পাগল-পাগল ভাবে ঘুরে বেড়ায়।"

এবারও বিদ্যার্থী পাশ ফেরে। এসব গল্পে ওর কোনও আগ্রহ নেই। বিদ্যার্থীর ধারণা, এটা ভালবাসার গল্প না, এটা ফ্ল্যাট পাওয়ার গল্প। কেন যে রূপা এই সহজ সত্যটা বুঝতে পারে না, ভেবে অবাক হতে হতে সে ঘুমিয়ে পড়ে একসময়।

১৯৮৩

❀ ওরা অপেক্ষা করছে

সকাল সাতটা দশে স্কুলের বাস এসে দাঁড়ায় বড় রাস্তায় টিউবওয়েলের গা ঘেঁষে। এ-ফুট ও-ফুট থেকে একরকম পোশাক-পরা পাঁচটি মেয়ে ওখান থেকে ওঠে। প্রত্যেকের সঙ্গে বাড়ির বয়স্ক একজন কেউ—হয় মা, নয় তো দিদি, কিংবা বাড়ির রান্নামাসি। কেবল চুয়ার সঙ্গে আসে ওর বাবা। অত সকালে রাস্তায় খুব বেশি গাড়ি বেরোয় না। তবু পাড়ার এ-দিকটা তেমন নিরাপদ নয় ভেবে চুয়ার বাবা মেয়েকে গলি পার করে নিয়ে আসে। স্কুলের বাস ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। বিকেল চারটের সময় যখন ও ফেরে, তখন রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ, মেয়ে-পুরুষ, ঠেলা-রিকশা, বাস-ট্যাক্সি। জায়গাটা গমগম করে। গমগমে জায়গায় ভয় কম। চুয়া একাই খোলা দোকানগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে বাড়ি চলে আসে।

"বাবা, তোমার কাছে একটা টেনার হবে?"

"কেন?"

"দেবে কিনা বলো", মেয়ে বিরক্ত গলায় বলে, "রোজ রোজ হালুয়া খেতে আমার ভাল লাগে না।"

টাকাটা দিল পূষণ। তারপর খানিকক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটা আজও টিফিন না নিয়ে স্কুলে গেল। এই রকম কাণ্ড প্রায়ই ঘটছে। নীপাকে ও বহুবার বলেছে যে, একঘেয়ে খাবার, সে যত ভাল জিনিসই হোক না কেন, কারুর ভাল লাগে না। কোনওদিন একটু আলুছেঁচকি-পরোটা, কোনওদিন পাঁউরুটির ধারগুলো কেটে শশা-টম্যাটো চিজের টুকরো দিয়ে স্যান্ডউইচ, কোনওদিন ডিমের গোলায় রুটি ডুবিয়ে ভেজে ফ্রেঞ্চ টোস্ট করে দিলেই হয়। এক-আধদিন হালুয়া হল, নুড্‌ল হল, এই তো ভ্যারাইটি।'

নীপা অমনি বলে, "পিঁড়িতে বসে তোলা উনুনে রোজ রোজ নতুন টিফিন বানানো সম্ভব না। গ্যাস আনো, ওভেন আনো, ইলেকট্রিক হট প্লেট বসাও রান্নাঘরে, তারপর দেখো, পারি কিনা।"

ওটা ওর খোঁটা। আসল কথা, সকালের দু'ঘণ্টা মাত্র সময়ে মাছের ঝোল, ভাত, তিন প্রস্থ টিফিন তৈরি করতেই ও হিমশিম খেয়ে যায়। তোলা উনুন ছাড়া জনতা স্টোভ একটা আছে, কেরোসিন তেলের অভাবে সেটা অকেজো। কে লাইন দেবে রোজ? বাড়ির ঠিকে ঝি-কে বাবা-বাছা করে দুধটা, সপ্তাহের রেশনটা তোলাতে পারে, ওই অবধি। ওকে সাহায্য করার তো আর কেউ নেই।

রান্নাঘরটা যদি আর একটু বড় হত। যদি একটা উঁচু বেদি থাকত দেয়ালের গায়ে। যদি একটু আলো-বাতাস খেলত ঘরটায়—যেমন আজকালকার ফ্ল্যাটবাড়ির কিচেন হয়। আগে এ-সব কথা মনে হত না পূষণের। নীপাও ভাবত, হোক ছোট বাসা, তবু নিজের সংসারটি নিয়ে আছে, তাতেই সে খুশি। জ্ঞাতিগুষ্টির জন্যে হাঁড়ি ঠেলতে হচ্ছে না। গত কয়েক বছরে সংসার সাজাবার হরেক রকম গয়না বেরিয়ে গেল বাজারে, সেইসব গয়নার গুণকীর্তন শোনা যেতে লাগল যত্রতত্র। তা থেকেই বাসনায় আগুন লেগেছে। লোকেরা এখন অ্যাটাচড বাথরুমে চান করে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে পাখার নীচে এসে দাঁড়ায়, আর নীপাকে দূরের কলঘর থেকে গায়ে ভিজে কাপড় জড়িয়ে এতদূর আসতে হয়। আহিরিপুকুর রোডের এই গ্রাম্য ব্যবস্থা নীপার আর পছন্দ হয় না। ঘরে কি দাঁড়াবার জায়গা আছে একটু?

এর আগে সিকদারবাগান লেনে থাকত পূষণ। সে-ও ভাড়া বাড়ি, অনেকগুলো ঘর, অনেক মানুষ। দাদাদের সংসারে সে ছিল একজন ননএনটিটি। এক-একটি পরিবারের একখানা করে ঘর, সেখানে কাচ্চাবাচ্চা স্বামী স্ত্রীর ঢালাও বিছানা। বিছানা গুটিয়ে দিলে বেডরুম হয়ে যেত ড্রইংরুম। সে-বাড়ির বাইরে ঝুলত এস. কে. রাহা, টি. কে. রাহা, এন. কে রাহা, পি. কে. রাহা এই রকম সার সার নাম লেখা একটা প্রকাণ্ড লেটারবক্স। লেটারবক্সটা ছিল যৌথ, কিন্তু বাড়ির ভেতরের আয়োজন যৌথ ছিল না। পনেরো-ষোলো বছর আগেও সে-বাড়িতে রোজ সকালে গোয়ালা এসে দুধ দিয়ে যেত নানা মাপের ঘটিতে-বাটিতে ঢেলে। কোনওটাতে এক পোয়া, কোনওটাতে আধ সের। কোনওটায় গোরুর দুধ, কোনওটায় এক পো মোষের দুধ। যার যেমন অভিরুচি, যার যেমন সামর্থ্য। যৌথ পরিবার নামক মৃত প্রতিষ্ঠানের আজীবন সদস্য ঘোমটা দেওয়া দিদি-বউদিদের মুখগুলি নির্বিকার জলীয় চোখ মেলে দেখত সেই গোয়ালা।

নীপা বলেছিল, "ওই ভিমরুলের চাকে আমি ঢুকব না। আগে তুমি একটা বাসা নাও দক্ষিণ কলকাতায়।"

আহিরিপুকুর রোডের একতলায় দু'খানা শোবার ঘর, একটু উঠোন, রান্নাঘর, কলঘর আর সিঁড়ির নীচে খানিকটা অন্ধকার জায়গা মাত্র দুশো পঁচিশ টাকা ভাড়ায় পেয়ে যায় পূষণ। বাড়িওলা বলেছিল, "আগের ভাড়াটে যে ভাড়া দিত, আপনি তাই দেবেন তো? প্রায় এক বছর খালি পড়ে আছে, আপনি চুনকাম করিয়ে নিন। মাসে মাসে ভাড়া থেকে কেটে নেবেন, কেমন?"

সেই সময় বহু লোক কলকাতা থেকে পালিয়েছিল শ্রেণীশত্রু নিধনকারীদের ভয়ে। নিরাপত্তা ফিরে আসতে ক্রমে ক্রমে তারা ফিরতে থাকে। তারপর থেকেই বহুতল বাড়ি গড়ার ধুম পড়ে যায়। বাড়িভাড়াও বাড়তে বাড়তে মধ্যবিত্তের নাগাল ছাড়িয়ে গেছে।

সাত বছর চাকরি, তার মধ্যে আড়াই বছর প্রেম করার পর বিয়ে করে পূষণ। প্রথমত প্রেমজ এবং দ্বিতীয়ত অসবর্ণ, সুতরাং এ-বিয়েতে সিকদারবাগান লেনের সমর্থন ছিল না। ঘুরে ঘুরে ওষুধ বিক্রি করার চাকরি তার। মাইনে তখন সর্বসাকুল্যে ন'শো টাকা। সঞ্চয় ছিল হাজার তিনেক। তারই জোরে ও একটা ছোটখাটো পারিবারিক বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। নীপাকে বলেছিল, "আমি তো আছি, তোমার ভয় কীসের?"

ক্রমে সবকিছু কেমন সহজ সরল হয়ে গেল।

এই ষোলো বছরে দুটি সন্তান এল। প্রথমটি মেয়ে; পরেরটি ছেলে। ব্যাকরণসম্মতভাবে পাঁচ বছরের ব্যবধান ওদের বয়েসের। একটি সাদা রঙের ফ্রিজ এল। একটি বাদামি রঙের রঙিন টিভি। পুরুষ পরিশ্রমী হলে আর স্ত্রীলোক লক্ষ্মীমন্ত হলে যা হয়, সংসারে সচ্ছলতা এল। পূষণের আয় বাড়তে বাড়তে এখন মাসিক সাড়ে তিন হাজারে দাঁড়িয়েছে। বাড়িভাড়া সেই দুশো পঁচিশ টাকায় থেমে আছে, একটুও বাড়েনি। চুয়া ও চন্দন দু'জনেই ভাল স্কুলে পড়ে। ওদের আলাদা টিউটর। কী সৌভাগ্য!

কেবল স্থান-সংকুলান নিয়ে অশান্তি। ছোট ছোট দুটি ঘরে এতকিছু আর আঁটছে না। মেয়ে আর ফ্রিজ নিয়ে নীপা শোয় একটি ঘরে, অন্যটিতে টিভি আর ছেলেকে নিয়ে পূষণ। দুই ঘরের মাঝখানে ওদের বইপত্র, পড়ার টেবিল এমন ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত সাক্ষাৎ এখন প্রায় বন্ধ। সিঁড়ির নীচে ঘুপচি জায়গাটা কতকাল খালি ছিল, এখন সেখানে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এক য়ামাহা মোটরসাইকেল, পূষণের বাহন।

পূষণ ভাবে, ক্রমে এতকিছু তো হল, কিন্তু একটা ঠিকমতো বাসস্থান হল না। জমি কিনবে, না ফ্ল্যাট কিনবে, নাকি আর একটু বড় জায়গা দেখে উঠে যাবে আহিরিপুকুর রোড থেকে—এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতান্তর হতে হতে সম্পূর্ণ সুযোগটা আজ হাতছাড়া হয়ে গেছে ওদের। উপরন্তু বাড়িওলা বলতে শুরু করেছে, নীচের তলা ছাড়ুন, আমার মেয়ে-জামাই এসে থাকবে। না ছাড়েন তো জল বন্ধ করে দেব। পূষণের হাতে এমন রেস্ত নেই যে, উপযুক্ত কিচেন আর অ্যাটাচড বাথরুম আছে এমন কোনও ফ্ল্যাটে হুট করে উঠে যায়। এদিকে আহিরিপুকুরের দেয়ালগুলো সর্বক্ষণ মুখ ভ্যাঙচাচ্ছে। অথচ, ওরা ছেড়ে দিলে এই একতলা ঘুপচি হাজার টাকা ভাড়ায় নিয়ে নেবে কেউ।

চুয়াকে স্কুল-বাসে তুলে দিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে পূষণ। তারপর অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকে।

মায়ের তৈরি টিফিন প্রত্যাখ্যান করে মেয়েটা বাবার কাছ থেকে দশ টাকার নোটখানা চেয়ে নিয়ে গেল। স্কুলে হাবিজাবি কিনে খাবে। পেট খারাপ হবে। ওর মনে হয়, এই ক্ষোভ অনেক জমানো অসন্তোষের প্রতীক। নীপা, চুয়া, আর আপাতত শান্তশিষ্ট ছেলেটা—হঠাৎ সামান্য কারণে যে সবাই আজকাল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে, তার মূল রয়েছে অপরিসর বাসস্থানটির মধ্যে। ওরা তো বড় হচ্ছে, ঠেসাঠেসি করে থাকতে ওদের ভাল লাগছে না। ওরা আর একটু জায়গা চায়। হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচতে চায়। দমবন্ধ গরম থেকে বেরিয়ে হাওয়ায় আসতে চায়।

কলকাতা শহরে গিসগিস করছে লোক। অতটুকু জায়গাই বা ক'জনের আছে, সে-কথা ভেবে দেখে না কেন ওরা, সিকদারবাগানের আত্মীয়দের অবস্থা তো স্বচক্ষে দেখেছে, তা হলে? তা হলে? মনে হতেই এর উত্তরও ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। ওরা সিকদারবাগানের আত্মীয়দের মতো গরিব নয়। ওদের জীবনযাত্রার মান অনেক দিক থেকেই উচ্চ মধ্যবিত্তের মতো প্রস্ফুটিত, সাবলীল, অথচ ওই

আহিরিপুকুরের কৌটোটা তার চটা-ওঠা মেজে, শ্যাওলা-ধরা কলঘর, কালচে দেয়াল, নিচু দরজা যেন বয়ামের মধ্যে ওদের আটকে রেখেছে। সাদা ফ্রিজ আর রঙিন টিভি ওই কৌটোয় মানায় না। মোট কথা, সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে গেছে কোথাও। তাতেই সংসার শ্রীহীন। তাতেই এত খিটিমিটি।

পরনে পাজামা, গায়ে একটা শার্ট—এই অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে অন্য পাড়ায় ঢুকে পড়েছিল পূষণ। পাড়াটা বেশ নির্জন। দু'পাশে নতুন সব বাড়ি, চারতলা, ছ'তলা, আটতলা বাড়িগুলো গত কয়েক বছরে গড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে এক-আধটা গেটওলা বাড়ি দেখে বোঝা যায় একসময় এখানে আরও পুরনো বাড়ি ছিল, ভাঙা হয়েছে। পিচের রাস্তাটা বেশ চওড়া। পাশাপাশি চারখানা গাড়ি যেতে পারে। কী নাম রাস্তাটাব? যাই হোক, সম্ভবত শরৎ বসু রোডের একটা শাখা।

রাস্তার কোণে একটা কদমগাছ। গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে পূষণ। দেখে, গাছটায় অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। ফুলের ভারে গাছটা নুয়ে পড়েছে। আর, একজন হিন্দুস্থানি ছোকরা লাঠি পিটিয়ে আবার খাব সন্দেশের মতো গোল গোল ফুলগুলো পেড়ে নামাচ্ছে। ফোটা ফুল গাছে ঝুলছে মানুষ সইতে পারে না।

ঘাড় উঁচু করে পূষণ দেখল, একটা চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ি, অর্ধসমাপ্ত, তার বাইরের দেয়ালে তিন-চার রকম রঙের পোঁচ দেওয়া, খাপছাড়াভাবে। নীচের তলাটা সম্ভবত গ্যারেজ হবে। ওপরে প্রত্যেক তলায় সম্ভবত চারটে করে ফ্ল্যাট। প্রত্যেক ফ্ল্যাটের জন্যে একটা করে ঝুলবারান্দা—ঠিক নাম ব্যালকনি। স্থপতি যিনি, তিনি বেশ বুদ্ধিমান, মনে হল পূষণের, কেননা উত্তর-পশ্চিম খোলা জমিটার ওপর এমনভাবে বাড়িটা ছকেছেন যে, প্রত্যেক ফ্ল্যাটই দক্ষিণের বাতাস পাবে। জানলার ফোকরগুলো বেশ বড়। ওখানে লোহার গ্রিল বসবে। দরোজাগুলো আধুনিক একপাল্লার।

বাড়ির বাইরের জন্যে পূষণ মনে মনে হালকা পিংক রংটাই পছন্দ করল। ছাই কিংবা হলুদ রংটায় আভিজাত্য কম। ভেতরের ঘরের দেয়াল যদি আর একটু নীলচে পিংক হয়, আর পরদাগুলো যদি ঘোর মেরুন রঙের আবরণ হয়ে পেলমেট থেকে ঝোলে, তবে গৃহস্বামীর রুচির সুনাম হবে, মনে হল ওর। ওই ব্যালকনিতে থাকবে গোটা চারেক ফুলগাছের টব কি ক্যাকটাস আর দুটো সাদা পেইন্ট-করা বেতের চেয়ার। তার বেশি একটি জিনিসও নয়। দরকার পড়লে ভেতর থেকে মোড়া নিয়ে এসে বসো।

কোমরে হাত রেখে বিভোর হয়ে দেখছিল বাড়িটা। একসময় নেপালি এক দারোয়ান দাঁতন চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে আসে। পূষণকে অগ্রাহ্য করে ফুটপাথের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। খকখক করে কাশতে থাকে।

পূষণ ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "সব ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে গেছে?"

লোকটা ওর প্রশ্নের উত্তর দিল না।

আবার হাঁটতে থাকে পূষণ। ওর মন খারাপ হয়ে যায়। লোকটা কী ভাবল ওকে? ফালতু? ভাবল, সত্যি সত্যি যারা ফ্ল্যাট কিনতে চায়, তারা অনেক আগে থেকে টাকাপয়সা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়? শেষ মুহূর্তে বাড়ির সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায় না? ফ্ল্যাট কি ফ্রিজ না টিভি যে, দোকানে ঢুকে পছন্দ করলে আর তুলে নিয়ে গেলে? ফ্ল্যাট পেতে টাকা লাগে, তপস্যা লাগে।

রাস্তার বাঁক ঘুরতেই একদম অন্য রকম দৃশ্য।

ভাঙা-ভাঙা পাঁচিল ঘেরা একটা দোতলা বাড়ি। লোহার গেট একটা আছে, তার অবস্থাও জরাজীর্ণ। দোতলায় থামওলা প্রশস্ত বারান্দা, সেখানে বসে একজন বুড়ো মতন লোক কাগজ পড়ছে। বাড়িটার কার্নিসের গায়ে খোদাই করা তার জন্মসাল১৯১১। গেটের পাশে স্তম্ভের ওপর মার্বেল পাথরের অনুজ্জ্বল ফলক। তাতে লেখা 'মাতৃ-স্মৃতি'। ইংরেজি অক্ষরে আর. এন. ঘোষ।

এটাও ভাঙা হবে নিশ্চয়। এখানেও একটি চার-পাঁচ তলা ফ্ল্যাটবাড়ি উঠবে অচিরেই। তা যদি ওঠে, তবে ও তিনতলায় পুবমুখো ফ্ল্যাটটার জন্য চেষ্টা করবে যদি সামর্থ্যে কুলোয়। আজকাল ঋণ পাওয়া যায় নানা জায়গা থেকে। এখনও বারো বছর চাকরি আছে ওর। তার মধ্যে ঋণ শোধ করাও দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু যদি বলে, পাঁচ লাখ কি সাত লাখ? তা হলে? যদি বলে—

বুড়ো লোকটিকে জিজ্ঞেস করবে নাকি? রাস্তা থেকে হাঁক পেড়ে কি জিজ্ঞেস করা যায়, "ও ঘোষমশায়, এখানে ফ্ল্যাট তুলছেন? আমার একটা ফ্ল্যাট চাই কিন্তু।" এই পাজামা, শার্ট আর চটি পরা অবস্থায় পূষণকে ভাবী ফ্ল্যাটমালিক বলে তো মনে হচ্ছে না। যদি হাঁকিয়ে দেয়। পূষণ ভাবল, থাক, পরে

একসময় সেজেগুজে এসে খোঁজ নেবে না হয়। বলে-কয়ে যদি দর কমানো যায়।

এসব কিছুই ওকে করতে হল না। দোতলার বুড়ো ভদ্রলোক নিজেই বারান্দার রেলিং থেকে ঝুঁকে ডাকল, "কাকে চান? ও মশাই কাকে খুঁজছেন?"

"আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।" বলে দিল পূষণ।

"ওপরে উঠে আসুন। ও-দিক দিয়ে সিঁড়ি।

দেখাই যাক না। পূষণ নির্ভয়ে ওপরে উঠে গেল।

দুই

অনেকক্ষণ ধরে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হল। মত বিনিময় হল। পূষণ তখন ভুলে গেছে যে, আজ ওর কাজের দিন, ছুটির দিন নয়।

একসময় দু'জনেই উঠে দাঁড়ায়।

বুড়ো ভদ্রলোক, ওর নাম ক্রমবিকাশ নন্দী—ঘোষ পরিবারের জামাই, বলে, "তা হলে সেই কথাই রইল। রথের দিন তুমি এ-বাড়িতে উঠে আসছ।"

"আপনি?"

"তার আগেই এখান থেকে চম্পট দেব। ঘোয বংশ নির্বংশ হয়ে গেছে কবে। আমি একটা বাইরের লোক, বউ নেই, বাচ্চা নেই, আটাত্তর বছর বয়েসে যক্ষের ধন আগলাচ্ছি। তুমি আমায় মুক্তি দিলে।"

"কোথায় যাবেন স্থির করেছেন?"

"চেম্‌সফোর্ড। আমার ভাইপো কতদিন থেকে লিখছে, চলে এসো কাকু। এরপর তোমায় প্লেনে চড়তে দেবে না।"

পূষণ বলে, "আমি কি পারব? এত বড় বাড়ি?"

ক্রমবিকাশ ওর পিঠ চাপড়ে সাহস দেয়।

"পারবে না মানে? আলবাত পারবে। তুমি অসবর্ণ বিয়ে করার সাহস রাখো, আর সামান্য কেয়ারটেকারের দায়িত্ব নিতে ভয় পাচ্ছ, অ্যাঁ? জানো আমি যখন নাইনটিন থার্টিফাইভে ঘোষবাড়ির মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাই, ব্যান্ডেলে গিয়ে তাকে বিয়ে করি, তখন এরা বলেছিল, আমাকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। হাঃ হাঃ, ভাগ্যের পরিহাস দেখো। পঁচিশ লাখ টাকার সম্পত্তি, এর একমাত্র মালিক আজ আমি।"

বারো কাঠা জমির ওপর এই বাড়ি দাঁড়িয়ে। প্রায় আশি বছর এর বয়েস। অনেক ঝড়ঝাপটা এর ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। একসময় দুই ঘোড়ার ফিটন চড়ে কর্তামশায় পাটের দালালি করতে রয়্যাল এক্সচেঞ্জে যেতেন। তাঁর ছেলে ছিল স্টিবেডর, কলকাতার প্রথম দশটা অস্টিন গাড়ির একটা ছিল তার। রেস খেলে সে সর্বস্বান্ত হয়, কিন্তু বাড়িটা বেঁচে যায়। তার ছেলে যুদ্ধের সময় ঠিকেদারি করে বহু টাকা কামায় আর সেই সঙ্গে চরিত্রটি নষ্ট করে। এই বাড়ির জীবনে তিনটে আত্মহত্যা, একটা খুন, দুটো নিরুদ্দেশ আর একুশটা স্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ক্রমবিকাশের বাঁজা বউ সেই একুশতম।

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন, রাজধানী স্থানান্তর, বোমাবাজ তরুণ বিপ্লবীদের পাশাপাশি বড়লোক বাঙালিদের নেতৃত্বে স্বদেশি সংগ্রাম, মন্বন্তর, যুদ্ধকালীন গোরা পল্টনের আধিপত্য, সুভাষ বোস, স্বাধীনতা, দেশবিভাগ, দাঙ্গা, শরণার্থীদের বন্যা, কংগ্রেসের পতন থেকে নকশাল আন্দোলনের নামে আবার এলোপাথাড়ি মানুষ খুন পর্যন্ত অনেক উত্তেজনার গরম বাতাস এই বাড়ির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এ-বাড়ি সব ঘটনার নীরব সাক্ষী। এখন সে বৃদ্ধ। নিজের জন্মসাল কপালে পরে দাঁড়িয়ে আছে।

আজকাল ডেভেলাপার নামক এক জাতীয় ব্যবসায়ী বাজারে নেমেছে। তারা পুরনো বাড়ি ভেঙে ভেঙে বহুতল অট্টালিকা তুলছে কলকাতায়। টোবো টোবো গাল, সাফারি সুট-পরা এই রকম কিছু লোক ক্রমবিকাশকেও ধরেছিল। তাকে দু'বছর সমস্ত খরচ দিয়ে হোটেলে রাখবে বলেছিল। তারপর চারখানা ফ্ল্যাট দিয়ে দেবে জমি ও ইটকাঠের মূল্য বাবদ। বারো কাঠা জমির ওপর ন'তলা বাড়ি তুলবে।

সবাইকে হাঁকিয়ে দিয়েছে ক্রমবিকাশ। এত ভার এই ভিটে সইতে পারবে না। 'মাতৃ-স্মৃতি' নামের বাড়িটা যত বড়ই মনে হোক, ঘর খুব বেশি নেই। নীচে-ওপরে খানসাতেক। মার্বেল পাথরের ওজন

ধরলেও সব মিলিয়ে বাড়িটার ওজন সত্তর-আশি টনের বেশি হবে না। আসবাব আর মানুষের ওজন খুব জোর এক টন। বহুতল বাড়ি যখন লোহার কাঁটার ওপর দাঁড়াবে, আর তার মধ্যে পিলপিল করে মানুষ ঢুকবে লাইন দিয়ে, প্রত্যেক বর্গফুট ফাঁক জিনিস দিয়ে বুজিয়ে দেবে, তখন তার ওজন হবে কম-সে-কম দু'হাজার টন! ক্রমবিকাশ হিসেব করে দেখেছে। অসহ্য। এইভাবে চলতে থাকলে কলকাতা শহর একদিন বসে যাবে। ভাগীরথী নদী উথলে উঠবে।

"সতেরো শো তিরানব্বই সালের কলকাতা কেমন ছিল, দেখেছ ছবিতে?" ক্রমবিকাশ জিজ্ঞেস করে, "দূরে দূরে এক-একটা বাড়ি, উন্মুক্ত মাঠ, পালকিতে বা ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া-আসা করছে মানুষ। একটু-আধটু কাজ: বেশিটাই অবকাশ, কলকাতার পক্ষে এই হল আদর্শ বাতাবরণ। এ তো মার্সেই বা নাপোলি বন্দর নয়। পাহাড়-ঘেরা জিব্রালটর নয়। এখন চারদিকে থিকথিক করছে মানুষ। রোজ এক-একটা বহুতল বাড়ি থেকে কতখানি করে গার্বেজ বেরোয় দেখেছ? কল্পনা করা যায় না।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বুড়ো ভদ্রলোক পরামর্শ দেয়, "দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তোমরা চলে এসো। সলিসিটরকে ডেকে আমি একটা এগ্রিমেণ্ট করিয়ে রাখব, একদিন এসে নিয়ে যেয়ো, কেমন? যতদিন খুশি থাকবে। বড় জায়গায় হাত-পা ছড়িয়ে থাকলে মানুষ উদার হয়।"

তিন

কত রকম অবিশ্বাস্য ঘটনা জীবনে ঘটে।

মাতৃ-স্মৃতিতে দেড় বছর বসবাস করার পর নীপা এখন ভাবতেই পারে না, ওই আহিরিপুকুরের একতলার ঘুপচিতে বছরেব-পর-বছর কী করে বাস করেছে ও। টেলিফোন আর গ্যাস ছাড়া মানুষ বাঁচে কী করে!

ভাড়া দিতে হয় না। কেবল কর্পোরেশনের ট্যাক্সটা—তাও বছরে দু'হাজার টাকার কম। ঠিকে ঝি-কে ছাড়িয়ে একজন সব সময়ের কাজের লোক রেখেছে ওরা। তার নাম শ্রীদাম। তার প্রধান কাজ বাড়িটাকে পরিচ্ছন্ন রাখা আর ফাইফরমাশ খাটা। অবসর সময়ে নীপাকে ঘরকন্নায় সাহায্য করা। আর রয়েছে পাহারা দেবার জন্যে একটা কুকুর। তার নাম চ্যাম্প।

নীচের তলার একটা ঘরে মাঝারি মাপের সোফাসেট বসাতে হয়েছে। লোকজন এলে বসে। তার পাশেরটা ছেলেমেয়ের পড়ার ঘর। টিউটর আসে। দুই কোণে দু'খানা টেবিল। দুই দু'গুণে চারটে কাঠের চেয়ার। মেজেতে একটা মাদুর পাতা থাকে সর্বক্ষণ। তৃতীয় ঘরটা শ্রীদামের। একই রকম বড়সড়, মার্বেল পাথরের মেজে দাবার ছকের মতো সর্বক্ষণ উন্মুক্ত। শোবার সময় ও কোণ থেকে পাকানো বিছানাটা এনে পেতে নেয়। অন্য দুটো ঘরের সঙ্গে শ্রীদামের ঘরের পার্থক্য কেবল ইলেকট্রিক বাতির পাওয়ারের। একটা চল্লিশ ওয়াটের বাল্‌ব ঝোলে ঘরটার মাঝখানে। পাখা নেই। টিউবলাইট নেই।

ওপরে চুয়া আর চন্দন দুটি আলাদা ঘরে শোয়। ওদের বই, খাতা, ক্যাসেট, জামাকাপড় সব নিজের নিজের ঘরে। এখন তো বড় হচ্ছে ওরা। সবচেয়ে ভাল ঘরটার মাঝখানে জোড়াখাট পড়েছে। জানলায় লম্বা পরদা। এই ঘরের লাগোয়া একটা একান্ত স্নানের ঘর, কাপড় ছাড়ার জায়গা। বিশাল আয়নায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখা যায়। ভাগ্য ভাল, রান্নাঘরের মধ্যে পুরনো গ্যাসের লাইন আছে। চাবি ঘোরালে উনুন জ্বলে। বেদির ওপর একটা ইলেকট্রিক উনুনও বসিয়ে নিয়েছে নীপা। পশ্চিমঘেঁষা অপেক্ষাকৃত কম আলো-বাতাস যে-ঘরটায়, সেখানে খাবার টেবিল, চারখানা চেয়ার, এককোণে ফ্রিজ, অন্য কোণে টিভি। আগে টিভি-টা ঘাড়ের ওপর এসে ওদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকত, এখন ওরা অবসরমতো টিভি চালিয়ে দূর থেকে প্রোগ্রাম দেখে। এ-ঘরের শব্দ ও-ঘর অবধি যায় না।

সব মিলিয়ে, ওরা বেশ এঁটে গেছে এই দোতলা বাড়িটায়। একটি ঘরও বন্ধ করে রাখতে হয় না। এমনকী পূষণের য়ামাহা—সেও পেয়েছে নিজস্ব গ্যারাজঘর।

বাড়ির পেছনের বাগানটায় মাসে একবার ঝাঁট পড়ে। সেখানে নারকেল গাছ আছে চারটে, ন'টা সুপুরিগাছ। তা ছাড়া, আম, লেবু, আতা আর ডালিম গাছ একটি করে। অনেকটা জায়গা আছে শাকসবজি ফলাবার। কিন্তু সেখানে কেবল ঘাস গজায়।

প্রতিদিন চুয়াকে আর হালুয়া নিয়ে যেতে হয় না টিফিনে। সকালে যখন চা নিয়ে আসে শ্রীদাম, তখনই

শুয়ে শুয়ে নীপা বলে দেয় আজ কী টিফিন যাবে দিদির। ওস্তাদ ছেলে গ্যাস জ্বালিয়ে দু'মিনিটে সেটা বানিয়ে দেয়। তারপর ভাত নামিয়ে, তরকারি কুটে, মাছ বেছে, মশলা বেটে, বউদিকে ডাকে। এক ঘণ্টার মধ্যে রান্নার পাট শেষ। বিকেলের রুটি-তরকারি শ্রীদাম নিজেই করে। নীপাকে আর বিরক্ত করে না।

ক্রমবিকাশের বন্ধু ও প্রতিবেশী, এগ্রিমেন্টের উইটনেস প্রিয়নাথবাবু মাঝে মাঝে খোঁজখবর নিতে আসেন।

"কেমন আছ মা?"

"ভাল কাকাবাবু। চা খাবেন?" নীপা অভ্যর্থনা জানায়। কোনওদিন চা খান তিনি, কোনওদিন খান না।

চারজন মানুষের একটা পরিবার কলকাতা শহরের বুকের ওপর চার হাজার বর্গফুট কভার্ড এরিয়া নিয়ে বসবাস করছে, এক পয়সা ভাড়া দিচ্ছে না, দেখেও সুখ। ফাঁক পেয়ে অনধিকারী যাতে ঢুকে না পড়ে, তার জন্যে চ্যাম্প সর্বক্ষণ সজাগ। কেবল দুপুরবেলা একটু ঘুমোয়।

এইখানে শেষ করলে এটা চমৎকার একটা ইচ্ছাপূরণের গল্প হত। কিন্তু খটকা একটা থেকে যেত যে, ক্রমবিকাশ নন্দীর মতো মানুষ কি বাস্তবচরিত্র? ও রকম বুদ্ধু কেউ আছে আজকাল? কলকাতার বুকের ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে পঁচিশ লাখ টাকার সম্পত্তি কেউ এভাবে লিখে দিয়ে যায়? বলে যায়, বাড়িটার আয়ু ফুরিয়ে গেলে এখানে আর নতুন বাড়ি উঠবে না? ছেলেদের খেলার মাঠ হবে? পার্ক হবে?

আর, লেখক হিসেবে আমারও একটা দায়িত্ব থাকার কথা। সে-সব দিন তো আর নেই যখন উত্তরাধিকারসূত্রে কেউ কেউ বিপুল সৌভাগ্যের অধিকারী হত। জানতে হত না বাবুগিরি করার টাকা কোথা থেকে আসছে। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে অর্জন করতে হয়, এমনি এমনি হাতের মুঠোয় এসে পৌঁছোয় না, এ-প্রত্যয় লেখকের যদি না থাকে তো কার থাকবে? এই ধন্দে আটকে গিয়ে গল্পটা পড়ে রইল আড়াই বছর। তারপর—

একদিন প্রিয়নাথবাবু বেড়াতে বেড়াতে এসে গেটের সামনে দাঁড়ালেন। শীত শেষ হয়ে এসেছে, তবু তাঁর মাথায় কান-ঢাকা টুপি, দু'পায়ে পশমের মোজা, গলায় মাফলার। সারা শীতকাল হাঁপানিতে কষ্ট পেয়েছেন, শয্যাশায়ী ছিলেন তিনমাস। এখন একটু সুস্থ। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, "নীচে অনেক লোকজন দেখছি, ওরা কারা মা?"

"লোকজন?"

"হ্যাঁ। অনেক জিনিসপত্র লাদাই করা। অচেনা মুখ সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। টেম্পোগাড়ি ধোয়া হচ্ছে পিচকিরি দিয়ে। উনুনের ধোঁয়া।"

প্রথমে অবাক হয় নীপা। তারপর হেসে ওঠে।

বলে, "ওহো। না, না, অচেনা কেউ নয় কাকাবাবু। ওসব ওর আপিসের জিনিসপত্র। এখান থেকে শহরতলিতে সাপ্লাই হয়। আর কোণের ঘরে আমার মামা আছেন। ছানি কাটা হয়েছে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। কলকাতায় থেকে বিয়ের সম্বন্ধ করা তো সুবিধে।"

"তা অবশ্য ঠিক।" চা খেয়ে চলে গেলেন প্রিয়নাথবাবু, আর কিছু বললেন না সেদিন। নেমে যাচ্ছেন, পেছন পেছন চ্যাম্প ওঁর সঙ্গে গেট অবধি এল। কান-ঢাকা টুপি দেখে ঘেউ ঘেউ করে ওঠার বদলে ওঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

প্রিয়নাথ বললেন, "তোমার কাজে গাফিলতি হচ্ছে বাছা।"

কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করে। প্রিয়নাথের মনে হয়, ও বলল, "মনিব নিজেই নিয়ম লঙ্ঘন করছে, আমি কী করব বলুন।"

প্রিয়নাথের মন পড়ে থাকে বাড়িটার দিকে। বাড়িটার তো প্রাণ নেই যে বলবে, আঃ লাগছে, আমি এবার ভেঙে পড়ব! আমার গায়ের প্লাস্টার খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না!

চৈত্র মাস পার করে আর একদিন প্রিয়নাথ মাতৃ-স্মৃতির গেটগোড়ায় এসে অবাক। তখন সবে সন্ধে হয়েছে।

প্রিয়নাথ দেখেন, বাড়ির সামনে অনেকগুলো মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। রঙিন কাপড় দিয়ে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে ভেতরে। পেছন দিকটায় শামিয়ানা খাটানো—কাপড় জড়ানো খুঁটি কয়েকটা চোখে পড়ল তাঁর। ছাদটা ত্রিপল-ঢাকা, ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে লুচিভাজার মিষ্টি গন্ধ আসছে।

অপরিচিত লোকের সংখ্যা আগের চেয়ে ঢের বেশি। তারা দুমদাম শব্দ করে ছুটোছুটি করছে। সিঁড়ি

ভেঙে ওপরে উঠছে, নীচে নামছে। গ্যারাজের পাশে একটা প্রকাণ্ড জন্তুর মতো বসে আছে জেনারেটর। দু'জন ময়লা প্যান্ট-পরা মিস্ত্রি জন্তুটাকে খোঁচাখুঁচি করছিল, তাতেই বোধহয় হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠল সে। প্রচণ্ড শব্দ করে কাঁপতে লাগল।

প্রিয়নাথের মনে হল, সমস্ত বাড়িটাই কাঁপছে থরথর করে। অনেকদিন আগে বীরভানপুর নামে এক গ্রামে গিয়েছিলেন এই রকম সময়ে। নাকি, সেটা ছিল শ্রাবণ-ভাদ্র মাস? তা হতে পারে। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। বাড়িতে বাড়িতে লণ্ঠন আর কুপি জ্বলে। সন্ধের পর লোকে প্রকাণ্ড টর্চ হাতে পথে বেরোয় সেখানে। কিন্তু রাত্রের দিকে জলসা বা যাত্রা হলে আগে লোকে হ্যাজাক বাতি জ্বালাত। তখন সবে জেনারেটর চালু হয়েছে। শহর থেকে ঠেলাগাড়ি করে ছেলেরা দু'খানা জেনারেটর নিয়ে এল ভাড়া করে। গাছে গাছে তার বেঁধে ঝুলিয়ে দিল বড় বড় বাল্ব।

জেনারেটরের থরথর কাঁপুনি কী জিনিস, সেইদিন বুঝতে পেরেছিলেন প্রিয়নাথ। সমস্ত গ্রাম কাঁপছে, গাছপালা কাঁপছে। বিদ্যুতের অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আলোয় জেগে-ওঠা বীরভানপুর গ্রাম যেন তখনই হার্টফেল করবে, এই রকম ভাব। ছেলেছোকরা যারা, তারা তো উৎসবের আনন্দে মত্ত, তারা ভ্রূক্ষেপই কবছে না।

এখনও তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ে সেই দৃশ্য। ধরিত্রীর কাঁপনে সচকিত ভয়ার্ত সাপের দল মাটির তলা থেকে বেবিয়ে পড়েছে। আর সরসর করে তারা প্রাণ বাঁচাতে গাছে উঠে যাচ্ছে অন্ধের মতো, আবার টপ টপ কবে গাছ থেকে ঝরে পড়ছে। এত প্যানিক, এত সাপ প্রিয়নাথ কখনও দেখেননি। একটা নিঝুম গ্রামের ভেজা মাটির নীচে এত সাপ থাকতে পারে, কল্পনা করতে পারেননি। একশো-দেড়শোটা জ্যান্ত সাপ সজনেডাঁটার মতো অশ্বত্থগাছের ডালপালা ধরে ঝুলছে, এ-ঘটনা তিনি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতেন না।

তাঁর মনের মধ্যে কোনও অমঙ্গল চিন্তা জেগেছিল বোধহয়, না হলে কলকাতা শহরের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে বীরভানপুরের ঘটনা মনে পড়বে কেন।

প্রিয়নাথ গটগট করে দোতলায় উঠে গেলেন।

ডাকলেন, "নীপা। নীপা-মা কোথায়?"

অভ্যাগতদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল নীপা। বা ধারে-কাছে ছিলই না। একটু পরে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা পূষণ এসে সামনে দাঁড়ায়।

"আরে আপনি?"

"এখানে মোচ্ছব কীসের? মেয়ের বিয়ে নাকি?"

"না, না, আমার মেয়ের বিয়ে না। সিকদারবাগানে আমার দাদারা থাকেন, তাঁদের একজনের মেয়ের বিয়ে আজ। বেশি রাত্রে লগ্ন।"

"সে-তো নর্থ ক্যালকাটায়। কোথায় সিকদারবাগান—"

নর্থ ক্যালকাটায় তো জায়গা নেই। এখানে অনেক স্পেস, তো আমি বললাম, ঠিক আছে, এখানে এসেই বিয়ে দাও। আমার কোনও আপত্তি নেই।"

পূষণ একটু সংকোচ বোধ করে। প্রথমত, ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করা হয়নি, করা উচিত ছিল। আর দ্বিতীয়ত, বাড়ির মধ্যে এত লোকের ভিড় উনি পছন্দ করছেন না। বস্তুত, সে এ-বাড়ির কেয়ারটেকার, আন্ডারটেকার নয়। ক্রমবিকাশ নন্দী চলে যাবার আগে এই কথাটা বুঝিয়ে বলেছিল ওকে। বাড়িটাকে বাঁচিয়ে রাখা ওর দায়িত্ব, বাঁচিয়ে রাখলে সবচেয়ে বেশি লাভ ওর নিজের।

অন্যের হাতে পড়লে পাছে এই বাড়ি লোকে ভরে যায়, এই ভাবনায় ক্রমবিকাশ এখানে একা বাস করেছিল সতেরো বছর। বারো কাঠা জমির ওপর সত্তর-আশি টনের বেশি ভার পড়তে দেয়নি। সেই বাড়িতে আজ এত লোক, এত শব্দ—পূষণের সংকোচ বোধ হচ্ছিল।

প্রিয়নাথ বললেন, "তোমাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

"অসুবিধে? আর উপায় কী বলুন, কাকাবাবু? আমরা নীচের তলার দু'খানা ঘরে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছি।"

"আর বউমার মামাবাবু? তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে তো?"

"হয়ে গেছে, কিন্তু সে এক ছরকট—"

"ছরকট?"

"আজ্ঞে, পাত্রপক্ষ আসা-যাওয়া করছিল। মামাবাবু দরকষাকষি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এদিকে দক্ষিণ কলকাতার ছোঁয়াচ লেগে গেল মেয়েটার। এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে এমন খেপিয়ে দিল যে—"

"যে—কী হল?"

"ভেবে দেখুন আপনি, একটা সুউপায়ী সুদর্শন, ব্রাহ্মণের ছেলে, কলকাতার উপকণ্ঠে পৈতৃক বাটি, তার মার্কেট প্রাইস কত, সে ব্যাটা কিনা নিচু জাতের মেয়েকে বিয়ে করে বসল, এমন আহাম্মক—"

"আহাম্মক বলছ তুমি? নিজে তুমি কালপ্রিট একজন—"

"ওরও সেই একই হাল হয়েছে কাকাবাবু। পৈতৃক বাটি থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন সে-ও বউ নিয়ে এই নীচের তলার একটা ঘরে গাদাগাদি করে আছে।"

"আবার গাদাগাদি? তোমার মনে পড়ে পূষণ বাবা, ক্রমবিকাশ কী বলত প্রায়?"

"বড় জায়গায় হাত-পা ছড়িয়ে থাকলে মানুষ উদার হয়।"

"তোমরা কী হয়েছ?"

"উদার হয়েছি। এদের কারুর কাছ থেকে আমি এক পয়সা ভাড়া নিই না, বিশ্বাস করুন কাকাবাবু। বরং আমার গাঁটের পয়সা কিছু কিছু গুনাগার যায়। আপিসের স্টোর হয়েছে নীচে, টেম্পোর গ্যারাজ—তার জন্যে আমার এক পয়সা আয় বাড়েনি।"

প্রিয়নাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, "দু'খানা ঘরের ঘেঁষাঘেঁষিতে আবার ফিরে এসেছ তোমরা। এরপর আর উদার থাকবে না। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তুমি আপিসের কাছে মোটা টাকা ভাড়া ক্লেম করছ। মামাবাবুর জামাইকে পগিয়ে মাসে হাজার টাকা করে সার্ভিস চার্জ ঝাড়ছ, দোতলা আর ছাদ বিয়েবাড়ি হিসেবে ভাড়া খাটাচ্ছ, উপরন্তু কেটারার আর ডেকরেটারের কাছ থেকে কমিশন চুষছ রেগুলার, কারণ তোমার হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করার মানসিকতা নেই। এবার টাকা জমানো দরকার। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে টাকা কামানো দরকার, যাতে 'মাতৃ-স্মৃতি' ভেঙে পড়লেই তুমি নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠতে পারো। এ-ব্যাপারে নীপা মা কী বলে?"

"ও বলে, বুড়ো মানুষের কথায় কান দিয়ো না। যে ক'দিন পারি আমরা এনজয় করে নিই এসো।"

এনজয়! প্রিয়নাথ হাসলেন। ওঁর ফরসা মুখখানা কার্বাইড-মারা পেঁপের মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। জেনারেটরের আলোয় বাড়িটা পাড়ার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে ঝলমল করছে। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। জেনারেটরের শব্দে বাড়িটা থরথর করে কাঁপছে তখনও। ওই শব্দ আর কাঁপুনি ছাপিয়ে কানে আসছে নীচের গ্যারেজে চেনবন্দি পাহারাদার কুকুর চ্যাম্পের আর্তনাদ: আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাড়ি যাব।

প্রিয়নাথের মনে হয়, এই হল এনজয়মেন্টের স্বরূপ। এই হল কলকাতার আসল চেহারা। এইভাবে কাঁপতে কাঁপতে, ফুর্তিতে টলতে টলতে পঁচিশটা মৃত্যুর শরিক এই বাড়িটা সহ কলকাতা শহর একদিন বসে যাবে। উপচে উঠবে ভাগীরথী নদী। তার আগে—কিন্তু এ-বাড়ির নীচে কি একটাও সাপ নেই? নাকি তারা যন্ত্রণায় অভ্যস্ত? তারা অপেক্ষা করছে। কীসের জন্য অপেক্ষা করছে তারা?

এতক্ষণে নীপা এদিকে এসেছে। বড়লোক প্রতিবেশীদের আদর-অভ্যর্থনা করছিল। ভেলভেটের সিংহাসনে উপবিষ্ট নতুন কনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল তাদের। উপহারগুলো সংগ্রহ করে একটা ট্রাঙ্কে গাদা করছিল। এখন খুলে দেখবার সময় নেই। বলছিল, "ওপরের ছাদে প্রথম ব্যাচ বসছে, যাঁরা দূরে যাবেন, তাঁরা খেয়ে নিন।"

একটু আগে নীপা তার সবচেয়ে বড় শত্রু, বড় জা'র হাত ধরে মিনতি করছিল, "তোমার তো এদিকে আসাই হয় না দিদি। এসে যখন পড়েছ, তখন আমার বাড়িতে কিছুদিন থেকে যাও। তোমাকে সেবা করার সুযোগ দাও আমাকে।"

প্রিয়নাথের দিকে চোখ পড়তেই ও এদিকে ছুটে আসে। আঁচলটা কাঁধ থেকে খসিয়ে দেয়। হাত তুলে চুল ঠিক করতে করতে বলে, "কাকাবাবু, কতক্ষণ এসেছেন? আমি জানতেও পারিনি। আসুন, এ-ঘরে আসুন। একটু মিষ্টিমুখ করে যেতেই হবে। শ্রীদাম, এই শ্রীদাম! কোথায় যে যায়!"

তিনি যে নিমন্ত্রিত নন ভুলে গিয়ে প্রিয়নাথ নীপার পিছু পিছু এগিয়ে যান।

১৯৮৮

সুশান্তর নিজস্ব একটা থিয়োরি আছে। সেটা হল এই যে, জীবন, অর্থাৎ দাম্পত্যজীবন, একটা অবিরাম দ্বৈরথ। কে বড়, কে প্রধান, তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের আজীবন যুদ্ধ। বা, অন্যভাবে বলতে গেলে, স্বামী-স্ত্রীর পরিবারে স্বামীই তো প্রধান—সে বয়সে বড়, তার হাইট বেশি, ওজন বেশি, সে উপার্জন করে, সে বাইরের আক্রমণ থেকে সংসারকে রক্ষা করে, তার বাহুবল আছে। ওই যুদ্ধ হল স্বামীর ওপরে প্রাধান্য পাবার জন্য স্ত্রীজাতির লড়াই। স্রেফ ছুঁচ আর চুলের কাঁটা নিয়ে এই লড়াই তৃতীয় ব্যক্তির কাছে অদৃশ্য। অস্ত্র হিসেবে পারফিউমও ব্যবহৃত হয়।

এই যুদ্ধে শেষপর্যন্ত রণকুশলী মেয়েরাই জেতে। ওদের ধৈর্যের অন্ত নেই। কে বলে মেয়েরা আবেগপ্রবণ, অল্পে কাতর? কে বলে, মেয়েরা পুরুষের ওপর নির্ভরশীল, অন্তঃপুরের অন্তরাল নিয়ে সন্তুষ্ট? কাশীতে তো স্বচক্ষে দেখে এলেন, স্বাধীন প্রাচীন বিধবার দল হাজারে হাজারে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শহরটা। বুড়ো বয়সে বিপত্নীক হয়েই মানুষ বেশি মরে, পুনর্জীবন পায় বিধবা। স্বামীহীন, অধীনতামুক্ত অবসর। পরিচ্ছন্ন পুনর্জীবন। এই থিয়োরির ওপর বই লেখা যায়।

শোহিনী উপার্জনক্ষম হওয়া সত্ত্বেও টানা তিরিশ বছর সংসারের ওপর প্রভুত্ব করেছেন সুশান্ত। স্ত্রীর মতামত অগ্রাহ্য করেছেন বললে ভুল বলা হবে। শুধু স্ত্রী কেন, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাবার পর তাদেরও মতামত সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেছেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত তাঁর। সকলের ভোটাধিকার আছে, তিনি বলেছেন, তবে তাঁর নিজের আছে একটি অতিরিক্ত কাস্টিং ভোট। না, কাস্টিং ভোট না, ভিটো পাওয়ার। তিনি পরিবারের পরিচালক। পরিচালকের কাজটা গণতন্ত্র দিয়ে হয় না। আপিসের মতো সংসারও একটা প্রতিষ্ঠান এবং সেই প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে শাসনের দড়ি টান করে ধরে রাখতে হয়। সেতারের অতগুলো তার, প্রত্যেকটির কান মনে মলে টান করে বাঁধলে তবেই না সুর বেরোয়। সংসার সেই সেতার।

আপিস থেকে অবসর নেওয়ার দিন সহকর্মীদের বলেছিলেন, "ঠেকায় পড়লে আমায় খবর দিয়ো। লজ্জা কোরো না।"

"সে তো স্যার দেবই।" নতুন মেটিরিয়লস্ ম্যানেজার নিত্যানন্দ ভার্মা বলেছিল, "আপনি যখন থাকবেন না কাল থেকে, ডিপার্টমেন্ট কী করে চালাব ভাবতে পারছি না। সাপ্লায়াররা এক-একটা ক্রুক।" সুশান্তর নিজস্ব পি এ মিস নন্দী একান্তে ফাইল গুছোতে গুছোতে বলেছিল, "ডিপার্টমেন্ট ডকে উঠবে। মিস্টার ভার্মার কাছে স্যার আমি কাজ করতে পারব বলে মনে হয় না। চাকরি ছেড়ে দেব।"

"ছিঃ ছিঃ এ কেমন কথা।" সুশান্ত তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে। কেউ কি চিরকাল থাকে। আমার সঙ্গে কথা না বলে হুট করে চাকরি ছাড়বে না। মনের মতো করে তোমাকে তৈরি করেছি। ভার্মা নতুন লোক। ওকে অসুবিধেয় ফেললে কোম্পানির ক্ষতি হবে।"

ফেয়ারওয়েল লাঞ্চ হল, গ্রুপ ফোটো তোলা হল: সুশান্তর একপাশে ভার্মা, আর একপাশে মিস নন্দী। সন্ধেবেলা কোম্পানির গাড়িতে শেষবার চড়ে বাড়ি ফিরলেন। দুই ছেলে সৌরভ আর উজ্জ্বল ছুটে এল গেটের গাছে। মালা, ফুলের তোড়া, মানপত্র, ইয়ারফোনসহ একটি সুন্দর টেপরেকর্ডার, সব নামাল এক-এক করে। উর্দি-পরা মুসলমান ড্রাইভার ইলিয়াস নেমে সালাম করল তাঁকে—এসব ছবি স্পষ্ট মনে আছে সুশান্তর। ইলিয়াসকে উনি দশ টাকা টিপ্‌স দিয়েছিলেন, তাও মনে আছে। শোহিনী জিজ্ঞেস করে, "কাল থেকে আর আপিস যেতে হবে না তো?"

"না।"

"বাঁচা গেল। এবার একটু বিশ্রাম পাবে।"

"দিলে তো! মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝে জ্বালাবে।"

"সেই সকাল থেকে টেলিফোন? রাত অবধি মিটিং? তুমি একদম রাজি হবে না, বলে দিলাম। কোম্পানিকে ঢের দিয়েছ, এবার বাড়ির জন্যে সময় দাও।"

জবাব দেননি সুশান্ত। মেয়েদের ওই রকম কথা। কোম্পানি যেন ওর সতিন। আরে, যে-হাত খেতে

দিচ্ছে, তা কি কামড়াতে হয়? সে-দিন বোঝেননি। ক্রমে ক্রমে এখন বুঝেছেন। বাড়ির জন্যে সময় দাও, বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিল শোহিনী।

ছি, ছি, বলেছিলেন বটে, তবে মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা আশা ছিল, আপিস থেকে ভার্মার কি মিস নন্দীর একটা টেলিফোন আসবে। দেখতে দেখতে এক মাস, দু' মাস—এক বছর পর্যন্ত পার হয়ে গেল, কোনও সাড়াশব্দ নেই। মাঝে মাঝে এক-আধটা বাজে চিঠি আপিস থেকে রিডাইরেক্টেড হয়ে বাড়িতে আসে, মিস নন্দীর হাতের লেখা দেখতে পান খামের ওপর। যাক, মেয়েটা তা হলে টিঁকে আছে। আশ্বস্ত হন সুশান্ত।

একসময় তাঁর মনে হয়, যাক, ভালই হয়েছে। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নিয়ে চাকরি, ও-সম্পর্ক ছিঁড়ে যাওয়াই ভাল। তাঁর অনুশোচনা করার কী আছে? ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে, নিজের একটা বাড়ি হয়েছে তাঁর। ব্যাঙ্কে আর কোম্পানি ডিপোজিটে যে-টাকা জমানো রয়েছে, তার সুদে বাকি জীবন কেটে যাবে স্বচ্ছন্দে। তা ছাড়া, বাড়ির কেউই তো বেকার নয়।

ভোরে হাঁটতে যান, সকালে বাগান করেন, দুপুরে খেয়েদেয়ে একটু ঘুমোন, বিকেলে পার্কে গিয়ে বসেন, রাত্রে টিভি দেখেন বা তাস খেলেন—বেশ আরামে কেটে যায় সময়। কখনও বইটই পড়েন। বাড়ির সবাই কাজে বেরিয়ে গেলে পর বাংলা-ইংরেজি খবরের কাগজদুটো আয়ত্তে আসে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন কাগজদুটো।

রাত্রে ডবল বেডে শোহিনীর পাশে শোন আগের মতো।

একদিন শোহিনী বলল, "তুমি কেমন বুড়িয়ে যাচ্ছ।"

"কেন?"

"ওপাশ ফিরে শুয়ে থাকো। সারারাত নাক ডাকে।"

"তো কী করব? তুমি তো আজকাল ডাকো না।"

"আস্তে।" শোহিনী শোবার ঘরের বন্ধ দরোজার দিকে তাকায়। বলে, "ওসব আশা ছেড়ে দাও। আগে অন্তত দিনান্তে একবার হাত বাড়িয়ে ছুঁতে। খোঁজাখুঁজি করতে। এখন গ্রাহ্যই করো না। এতবড় জোড়া খাট খাঁ-খাঁ করে।"

"ফালতু সময় নষ্ট করে কী লাভ!" বিরক্ত হয়ে বিছানায় উঠে বসেন সুশান্ত। আড়চোখে একবার স্ত্রীর শোওয়া চেহারাটা দেখে নেন। গলা অবধি চাদরে ঢাকা। ফোলা ফোলা মুখটা বালিশের ওপর বসানো। যেন ফাটা ফুলকপি। আর মুখের চারদিকে ফুলকপির পাতার মতো ছড়ানো উসকোখুসকো কাঁচাপাকা চুল।

চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

দাড়ি কামাতে কামাতে নিজের মুখখানা দেখেন আয়নায়। এমন কী বুড়ো দেখাচ্ছে? বাষট্টি বছর বয়সে এর চেয়ে কচি কী করে দেখাবে? কানের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে ঠিক, কিন্তু সামনেটা যথেষ্ট কাঁচা। কলপ লাগালে কালো চুল মুখের সঙ্গে মানিয়ে যেত।

কাকে ইমপ্রেস করবেন? মেয়েকে না পুত্রবধূকে। ধুৎ, যাদের ব্যক্তিত্ব নেই তারা ওসব লাগায়।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনে হাসলেন সুশান্ত। শোহিনীকে মনে মনে বললেন, "নিজের দিকে তাকাও। পুরুষমানুষ এত সহজে বুড়ো হয় না। তুমি ভুলে গেছ শোহিনী যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন বলে পিকাসো আটষট্টি বছর বয়সেও সন্তানের জনক হতে পেরেছিলেন। শেষবার বিয়ে করেছিলেন যখন তাঁর বয়স সাতাত্তর। মেয়েরা দীর্ঘজীবী হয়, দীর্ঘ যৌবন পায় না।"

আর একদিন বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে শোহিনী হাউমাউ করতে থাকে। ভানু, ভানু, বলে চিৎকার করে ডাকে খানিকক্ষণ। ভানু ঘুমোচ্ছিল রান্নাঘরে—ছুটে আসে দোতলায়। "শুকনো কাপড়গুলো বৃষ্টিতে ভিজে গেল, তুলতে পারিসনি?"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কখন যে বৃষ্টি হল...আকাশ তো শুকনোই ছিল সারাদিন..." গজগজ করতে থাকে ভানু। কখন হঠাৎ ছরছর করে একপশলা বৃষ্টি হবে, ও কী করে জানবে। এটা তো বর্ষাকাল না।

ভিজে কাপড় নিঙড়োতে নিঙড়োতে শোহিনী বারান্দা থেকে ঘরে ঢোকে। সুশান্ত বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে শারদীয় পত্রিকা পড়ছিলেন। চশমা নামিয়ে তাকালেন স্ত্রীর দিকে। ব্যাপারটা কী?

"এতগুলো কাপড় বৃষ্টিতে ভিজে গেল, তুমি শুয়ে শুয়ে দেখলে, অ্যাঁ? রেলিং থেকে তুলে রাখতে পারলে না?"

কানে শুনলেন, কিন্তু কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগল সুশান্তর।

"আমি কাপড় তুলব? ও তো ভানুর কাজ।"

"বাড়িতে কেউ নেই। ভানু নীচে ঘুমোচ্ছে, তুমি জানো। তোমার নিজের কোনও কাজ নেই। জলজ্যান্ত তাকিয়ে দেখলে—একবার কষ্ট করে উঠলে না?"

স্ত্রীর আকস্মিক আক্রমণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন সুশান্ত। কিন্তু কোনওপ্রকার উত্তেজনা প্রকাশ না করে ধীরে ধীরে বললেন, "শোনো, এসব কাজ আমার না। রিটায়ার করেছি মানে এই নয় যে, আমি তোমাদের জামাকাপড় পাহারা দেব, বুঝেছ? আমি মুরারকা মেশিনসের মেটিরিয়লস ম্যানেজার, আমার সঙ্গে ভেবেচিন্তে কথা বলবে।"

বলেই বুঝলেন, কথাটা হাস্যকর শোনাল।

শোহিনী কিন্তু হাসল না। আর একটাও কথা বলল না। গম্ভীর মুখে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

এবারের মতো অস্ত্র সংবরণ করল।

সুশান্ত শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন।

এই বাড়িটা তাঁর। এর প্রত্যেকটি ঘর, বারান্দা, দরোজা-জানলা, মোজেকখচিত মেজে, ঘরে ঘরে পাখা, ডিসটেম্পার-করা দেয়াল, বাথরুমের সাদা টালি—সব তাঁর নিজের উপার্জনের টাকায় তৈরি। আর এরা—যারা এইসব ঘর নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে বসে আছে, হাওয়াই চপ্পলে চটাস চটাস শব্দ করে এঘর-ওঘর পায়চারি করছে, দেয়ালে ছবি টাঙাচ্ছে, তাঁর ছেলেরা, মেয়ে, স্ত্রী—এরা আসলে এক-একটা প্যারাসাইট। গাছকে জড়িয়ে উঠে আজ গাছকেই মারতে চাইছে। হেনস্থা করছে।

আর একদিনের কথা মনে পড়ল তাঁর। নিতান্ত ছোট্ট সামান্য ঘটনা কিন্তু ব্যঞ্জনা তার যথেষ্ট গভীর।

নূপুর স্কুলে গান শেখায়। জোড়া গ্যাসের একটা ফুরিয়েছে। কথা ছিল, স্কুল যাবার পথে ও গ্যাস সিলিন্ডারের অর্ডার দিয়ে যাবে। আজকাল কুড়ি-পঁচিশ দিনের আগে গ্যাস মেলে না, সুতরাং এই তৎপরতা।

খেতে বসে হঠাৎ ও বলল, "বাবা, আজ কি তোমার বাইরে কোনও কাজ আছে?"

"কেন?"

"বেরোতে দেরি হয়ে গেল। তুমি যদি গ্যাসের অর্ডারটা দিয়ে দাও।"

"ফেরার সময় দিস। দোকান তো পাঁচটা অবধি খোলা থাকে, তাই না?"

"হুঁ।" নূপুর বলল, "আমার ফিরতে দেরি হবে আজ। কাজ আছে। মা জানে।"

বলেছিলেন, ঠিক আছে। বারোটা নাগাদ একবার ব্যাঙ্কে যাবেন, ভেবেছিলেন সুশান্ত। তখন ও-কাজটা করে আসবেন। কিন্তু বেরোনো হল না। বারোটার ডাকে একটা গোলমেলে চিঠি এল। তারপর ফাইলপত্র খুলে তার জবাব মকশো করতে করতে বেজে গেল দেড়টা। তারপর খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেন। গ্যাসের কথা ভুলে গেলেন বেমালুম। রাত্রে খাওয়ার পর টিভি দেখছে সবাই। সারাদিন যে-যার কাজে থাকে। এই সময়টা একত্র হয়। এই সময়টা সোফায় বসে ড্রেসিংগাউন পরে সুশান্ত আরাম করে পাইপ খান। ওরা কথাবার্তা বলে নিজেদের মধ্যে, তর্কাতর্কি করে, মাকে খ্যাপায় রন্ধনকৌশল না-জানার জন্য। সুশান্ত চুপ করে বসে পাইপ খান, তারপর একসময় উঠে যান।

টিভি দেখতে দেখতে হঠাৎ শোহিনী মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, "গ্যাসের অর্ডার দিয়েছিস?"

"বাবা দিয়ে এসেছে।"

সুশান্ত বললেন, "না, আমি দিইনি। ভুলে গেছি।"

অমনি, অকারণে, হো-হো করে হেসে উঠল সবাই।

শোহিনী বলল, "ভুলে গেছ? আর চুপ করে বসে আছ? অদ্ভুত!"

সবাই সুশান্তর অপ্রস্তুত মুখের দিকে তাকাল একসঙ্গে।

"তো কী করব? ধেই ধেই করে নাচব? গ্যাসের অর্ডার দেওয়া কি আমার কাজ?"

"তো কী কাজ তোমার? সারাদিন কী করো? সংসারের কোন কাজে লাগো? যখন আপিস ছিল, তখন সকাল ন'টা থেকে সন্ধে সাতটা-আটটা অবধি বাইরে থাকতে। কেউ তোমায় সংসারের কুটোটা নাড়তে বলেনি তখন। এখন কাজ নেই, বসে আছ, বসে বসে ঢুলছ, একটা ছোট্ট কাজের ভার নিয়ে ভুলে গেলে! এ রকম ভুল তোমার আপিস থাকতে হয়েছে?"

নূপুর বলে, "যেতে দাও, কাল আমি দিয়ে আসব। একদিন দেরি হলে কী আর হবে।"

শোহিনী তবু ছাড়ে না তার লাগাম। বলে, "কী আর হবে? একদিন আগে গ্যাস ফুরোবে। তখন কেরোসিনের জন্যে ছুটতে হবে। কে ছুটবে? বাবা?"

এইভাবে কখনও কথা বলত না শোহিনী।

সুশান্ত বুঝতে পারেন, তিনি এখন একা হয়ে যাচ্ছেন। তিনি, এ-বাড়ির পরিচালক, প্রতিপালক, বয়োঃজ্যেষ্ঠ পুরুষ এক দিকে, আর তাঁর স্ত্রী শোহিনী, তাঁকে পরিত্যাগ করে, সন্তান-সন্ততির নেত্রী পদে, অপর দিকে। শোহিনী দলত্যাগী। শোহিনী স্বার্থপর। আজ যদি সুশান্তর কিছু একটা হয়, তা হলে শোহিনী সরাসরি সন্তানদের খপ্পরে পড়ে যাবে।

আগেভাগে সাবধান হয়ে তাই সে ওদের নিয়ে দল গড়েছে। এখন সুশান্তকে তার প্রয়োজন নেই। সংসার তাঁর সমস্ত রস নিঙড়ে এখন ছোবড়া করে দিয়েছে। ডবল বেডের একপ্রান্তে চিত হয়ে শুয়ে মনে হয়, তিনি যেন একটা সিঁড়ি,—ধাপগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে সরু হয়ে গেছে।

একসময় সেতারের মতো টান করে এই সংসারের তারগুলো বেঁধেছিলেন, বেঁধে রেখেছিলেন। ঢিলে হতে দেননি। আজ সেইসব তার ঢিলে হচ্ছে। আজ আর আগের মতো সুর বাজছে না।

কবে থেকে শোহিনী মুখ ফেরাতে শুরু করে? ভাবতে চেষ্টা করেন সুশান্ত।

উজ্জ্বলের বিয়ের পর?

তা হতে পারে। ওদের বিয়েতে তিনি বাধা দেননি, যদিও এ-বিয়েতে তাঁর সায় ছিল না। সায় ছিল না, তার প্রথম কারণ মধুমিতা দেখতে সুন্দর না। কী রকম পুরুষ-পুরুষ চেহারা। উজ্জ্বল কী করে যে এই মেয়ের সঙ্গে আড়াই বছর ধরে ঘোরাঘুরি করল এবং শেষপর্যন্ত এই মেয়েকে বিয়ে করাই মনস্থ করল, সুশান্ত ভেবে পান না। মেয়েরা আজকাল চাকরিবাকরি করছে—কেন শোহিনীও চাকরি করে—কিন্তু সে-চাকরির একটা ধরন আছে। স্কুলে পড়াও, কলেজে পড়াও। গান শেখাও যেমন নূপুর শেখায়। তা নয়। বিজ্ঞাপন জোগাড়ের কাজ—সে-কাজে কোনও সম্মান আছে? বিজ্ঞাপন জিনিসটাই তাঁর কাছে অশ্লীল মনে হয়। দ্বিতীয় কারণ ছিল মধুমিতার ওই পেশা। আর তৃতীয় কারণ, যা তিনি শোহিনী ছাড়া আর কারও কাছে ব্যক্ত করেননি, তা হল মধুমিতার বয়স। উজ্জ্বলের সমবয়সি—বা একটু বড়ই হবে। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য অন্তত দশ বছর না হলে দাম্পত্যজীবন সুখের হয় না বলে সুশান্তর বিশ্বাস, সেখানে সমবয়সি স্বামী-স্ত্রী? এ-বিয়ে টিঁকবে না। সুশান্ত জানেন, তাঁর ওই ছেলেটির কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছু নেই, তবু যদি মেয়েটার পিছু পিছু না ঘুরে বাপের উপর নির্ভর করত! কত ভাল বিয়ে দিতে পারতেন উজ্জ্বলের। বউয়ের রূপে-গুণে বাড়ি আলো হয়ে যেত।

মাঝে মাঝে অনুপস্থিত সেই অনুগত, বাধ্য, পুত্রবধূকে যেন দেখতে পান সুশান্ত।

ছোট্টখাট্টো চেহারা, লক্ষ্মীশ্রী মাখা মুখখানা। সবদিকে নজর। যেন শুনতে পান সে বলছে, "বাবা, আপনার শরীর কি ভাল নেই? পিঠের ব্যথাটা কি বেড়েছে? এককাপ গরম কফি করে দিই? ভানুকে একটু চিঁড়ে ভেজে দিতে বলি?"

চোখ খুলে দেখেন, সে না, এ মধুমিতা। ডাইনিং টেবিলের ওপাশ থেকে একটা কাচের বাটি তাঁর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বাটিতে ঘোলা ফ্যাটফ্যাটে স্যুপ—টম্যাটো স্যুপ। চামচে করে মুখে তুলে দেখলেন, ঠান্ডা।

এই স্যুপ খেতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে দিল্লির ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলের কথা। ক্ল্যারিজেস হোটেলের কথা। বম্বের তাজ! সে-সব স্যুপের কী স্বাদ, কী গন্ধ। কতবার ট্যুরে গিয়ে ওইসব হোটেলে থেকেছেন রাজার হালে। কাজ আর কতটুকু? কাজের আওয়াজই বেশি। আধঘণ্টা উদ্যোগ ভবন, একবেলা ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট। ব্রাঞ্চ আপিসে গিয়ে হম্বিতম্বি করা কিছুক্ষণ। ব্যস। তারপর হোটেলে ফিরে মৌজ করা। সে এক সময় ছিল।

কখন শোহিনী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে লক্ষ করেননি সুশান্ত। হঠাৎ শুনলেন, ও বলছে, "ওমা, ওটা কী দিয়েছ? স্যুপটা যে ঠান্ডা। তুমিও আচ্ছা মানুষ। বলছ না, স্যুপটা গরম করে দাও?"

এতবড় স্পর্ধা, মধুমিতা কোথায় লজ্জা পাবে, তা না, উলটে বলল, "বাবা তো ঠান্ডাই খান।"

ঠান্ডাই খান! হারামজাদি! ওই ন্যাকা মেয়ের কথা শুনে সুশান্তর সারা শরীর রাগে জ্বলে ওঠে। ইচ্ছে করে, ওর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন।

আবার সামলে নেন নিজেকে। না, ক্রোধ সংবরণ করা দরকার।

সুশান্ত বলেছিলেন, "বিয়ে করে করুক, তার আগে ফ্ল্যাট ভাড়া করতে বলো।"
"এত বড় বাড়ি থাকতে ওরা ফ্ল্যাটে থাকবে কোন দুঃখে?" অবাক হয়ে প্রশ্ন কবেছিল শোহিনী।
"এটা আমার বাড়ি।"
"ও-ও তোমাব ছেলে।"
"আমার বাড়িতে যে থাকবে, সে আমার কথামতো চলবে। সারাজীবন আমি কি ছেলেকে মদত দিয়ে যাব? ছেলের সংসার সামলাব?"
"তা হলে এতগুলো ঘর তৈরি করেছিলে কেন? আমাদের তো দু'খানা ঘর হলেই চলে যেত। এ বাড়ি কি মেটিবিয়লস ম্যানেজারের স্টেটাস সিম্বল তবে?"
সুশান্ত বলেছিলেন, "তা কেন। রিটায়ার করার পর নীচের তলা ভাড়া দিয়ে দেব। আয় হবে।"
যুদ্ধ বেধে গেলে শোহিনী নখ গুটিয়ে নেয় তখনকার মতো। আবার কোনও সুযোগে অন্য কোনওদিন কথাটা পাড়ে।
একদিন রাত্রে ক্লাবের পার্টি থেকে ফিরছেন। উত্তম খানাপিনার পর মেজাজটা ফুরফুরে। গাড়ির পেছনের সিটে সুশান্ত আর শোহিনী। শোহিনী বাঁ দিকে স্বামীর গা ঘেঁষে বসল। মুক্তোর বালা-পরা ফরসা হাতখানা স্বামীর উরুর ওপর রাখল। মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ পেলেন সুশান্ত।
"কী"
"আজ সকালে ওর মা আর বাবা এসেছিলেন।"
"কার মা-বাবা?"
"কার আবার?" মিতার।"
"মিতা কে?"
"মিতা কে জানো না? মধুমিতা। তোমাব ছেলের ফিয়াঁসে।"
'অ। তা কী বলে ওরা?"
"দিন ঠিক করতে চান। রেজিস্ট্রির পর একটা রিসেপশন তো হবে। কবে হলে তোমার সুবিধে—যখন ট্যুর থাকবে না, আর কী।"
"অ।" একটু থেমে সুশান্ত জানতে চান, "আর রিসেপশনের পর? রেসিডেন্স ঠিক হয়েছে?"
খুনখুন করে হাসে শোহিনী।"আর জ্বালিয়ো না বাপু। নিজের বাড়ি থাকতে হোটেলে উঠবে নাকি?"
"আমার বাড়ি।"
"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বাড়ি। বাড়ির অহংকারে গেলে! আমি বলছি কী, নীচের তলার পুবদিকের ঘরটা খালি করে দিই। ওঁরাই ফার্নিচার টার্নিচার দিচ্ছেন। ঘর সাজিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের আপত্তি করার কী কারণ থাকতে পারে বলো।"
ঠিক সেই আচ্ছন্ন মুহূর্তে কোনও কারণ খুঁজে পাননি সুশান্ত। ছেলেটার জন্যে কষ্টবোধ করলেন একটু। একেবারে মেরুদণ্ড বলতে কিছু নেই ছোঁড়ার। জীবনে দুঃখ পাবে। যাক গে, বউই ওকে প্রোটেকশন দিক।
এখন মনে করতে পারেন না, সেই সময়, তখন, তাঁর সম্মতির সঙ্গে কোনও শর্ত আরোপ করা ছিল কিনা। শর্ত যে, একসময় ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠে যাবে ওরা। আজ আর তা সম্ভব নয়। মাসের প্রথমে মায়ের হাতে দশটা একশো টাকার নোট গুঁজে দেয় উজ্জ্বল, শোহিনী তাতেই খুশি। শোহিনী তাতেই কৃতজ্ঞ। ওরা বাপের ঘাড়ে বসে খাচ্ছে না, খরচ দিয়ে থাকছে।
সুশান্তর মনে পড়ে...
নূপুরের বেলায় শোহিনী আবার উমেদারি করেছে। "মেয়েটা আত্মহত্যা করুক, তুমি চাও?"
আত্মহত্যা করবে কেন? শ্বশুরবাড়িতে মেয়েরা কি আত্মহত্যা করতে যায়, না সংসার করতে যায়? নূপুর গান করে, ভাল গান করে, ওর বর তা পছন্দ করে কিন্তু শাশুড়ির তা সহ্য হয় না। বাড়ির বউ গলা ছেড়ে গান করবে আর পাড়ার লোক তাই শুনে হাসাহাসি করবে, এ তিনি সহ্য করবেন না। নূপুর রেডিয়ো-টিভি-তে প্রোগ্রাম পায়, তিনি যেতে দেবেন না।

দুনিয়াসুদ্ধ লোক বাড়ির বউয়ের গা দেখবে, গলা দেখবে, তাঁদের অভিজাত বংশে এ-ঘটনা কখনও বরদাস্ত করা হয়নি। নূপুরের জন্যে কোনও ব্যতিক্রম কেন হবে সে-সংসারে?

"হয় তোমার মা, নয় আমি"—এই শেষ কথা স্বামীকে বলে নূপুর চলে এসেছিল। ওর বর যৌথ পরিবার ছেড়ে যেতে রাজি ছিল না। তেমন মনের জোর ছিল না তার। স্ত্রীকে ভালবাসত কিন্তু স্ত্রৈণ দুর্নাম কিনতে প্রস্তুত ছিল না সে। অথবা, প্রাধান্যের প্রতিযোগিতায় ও স্ত্রীর কাছে হার মানল না। হতেই পারে।

ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। নূপুর নীচের তলায় পশ্চিম দিকের ঘরখানা দখল করেছে। আর কারও সঙ্গে ও ঘর বাঁধবে না।

সুশান্তর বিশ্বাস, নিরাপদ নিরুপদ্রব আশ্রয়ের আশ্বাস না থাকলে নূপুর বিয়ে ভাঙত না। এখানে চলে এলে একখানা ঘর ও পাবে, তা জানত। ওর মা সে প্রশ্রয় ওকে দিয়েছে। বলেছে, "ধরে নাও নূপুরের বিয়ে হয়নি। ধরে নাও, নূপুর মেয়ে না, ও তোমার আর এক ছেলে।"

মানুষ তো পশু নয়। অশিক্ষিত মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা যায়। স্নেহ ভালবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায়। কর্তব্য সচেতন না হয়ে শুধু অধিকার সচেতন হলে জীবন চলে না। নূপুরের মধ্যে সহিষ্ণুতা নেই, ক্ষমা নেই। সুশান্তর ধারণা, গান ওর চরিত্রকে উন্নত করেনি। একদিকে ওর একরোখা জেদ, অপরদিকে আশ্রয়ের আশ্বাস—এই দোটানায় ওর সংসার ছিঁড়ে গেল। হয়তো গানকে ও প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, গানের জন্যে সবকিছু ছেড়ে দিতে ওর বাধেনি।

সব কিছুই ছেড়েছে বটে। স্বামী, সংসার ছেড়েছে। চার বছর বয়সের মেয়ে ছিল ওর, তাকেও রেখে এসেছে শ্বশুরবাড়িতে। ওরা মানুষ করুক ওদের মতো করে। বাপের বাড়িতে ভার বাড়াই কেন?

এই কথা শোহিনীকে ও বলেছিল। পাথর, সুশান্ত ভাবেন, নূপুরের মনটা পাথর দিয়ে তৈরি।

শোহিনীকে বলেছিলেন, "তোমার মেয়ে যাকে বলে নিষ্ঠুর। হৃদয়হীন।"

শোহিনী বলেছিল, "তুমি ওর দুঃখটা বুঝছ না। একখানা ঘর ছাড়তে হচ্ছে বলে তোমাব গায়ে ফোসকা পড়ছে।"

সেদিন নতুন করে আবার ব্যথা পেয়েছিলেন সুশান্ত। শোহিনী তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে আস্তে আস্তে, সন্তানদের দলে গিয়ে ভিড়ছে, এ-সত্য তখনও আবিষ্কার করতে পারেননি।

নীচের তলার পশ্চিম দিকের ঘরে স্বামী পরিত্যাগী এক মেয়ে। স্বাধীন, ভারমুক্ত। পুবদিকের ঘরে বছরের পর বছর জন্মশাসন চলছে। স্বার্থপর এক দম্পতি বোঝা বাড়াতে চাইছে না। এতবড় একটা বাড়ি, একটা বাচ্চা নেই। ভাঙা খেলনা নেই। শিশুকণ্ঠের কান্না শোনা যায় না। নূপুরের মেয়েটা কখনও-সখনও আসে। দু'-এক ঘণ্টা থেকে চলে যায়। নূপুর ওকে গান শেখাবার চেষ্টা করে, গান করে শোনায়। ওর কিছুতেই আগ্রহ নেই যেন। এসেই পালাই পালাই করে মেয়েটা। সুশান্ত ওর জন্যে উপহার কিনে রাখেন, ও নিতে চায় না। বলে, "ঠামা রাগ করবে।" দেখতে দেখতে আট বছর বয়স হল মেয়েটার। মামার বাড়ি, মায়ের বাড়িকে ও অনাত্মীয় মনে করতে শিখেছে।

একদিন এই সবকিছুর জন্যে ও নূপুরকে দায়ী করবে, সুশান্তর স্থির বিশ্বাস। ও যদি বড় হয়ে জিজ্ঞেস করে, "মা, তুমি আমাকে ছেড়ে এলে, কিন্তু লকার থেকে তোমার গয়নাগুলো নিয়ে আসতে ভুললে না, এ কেমন কথা?" তখন কী উত্তর দেবে নূপুর?

শোহিনী বলে, "বেশ করেছে। ওর জিনিস ও ফেলে আসবে কেন?"

হয়তো ঠিকই বলে। সুশান্ত বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। ছেলেমেয়েদের বুঝে উঠতে পারছেন না। একটা ব্যাপার স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যদিও, যে, সেতারের তারগুলো আর টান করে বাঁধা নেই। আলগা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

সবচেয়ে বেশি যা তাঁকে জ্বালায়, তা হল ছোট ছেলে সৌরভের প্রতি শোহিনীর আদেখলেপনা। সাতাশ বছর বয়স ছেলেটার, অথচ শোহিনী এমন ব্যবহার করে যেন ও এখনও স্কুলের ছাত্র।

দোতলায় তাঁদের বেডরুমের পাশে সৌরভের ঘর। বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে অগোছালো ঘর ওটা। আলমারি আছে, আলনা আছে, তবু ওর প্যান্ট-শার্ট, পাজামা খাটের ছতরির ওপর ঝোলে। ঘরের মেজে ভরতি সিগারেটের ছাই। ফাঁক পেলেই শোহিনী ওর ঘর গুছোয়। নিজের হাতে ওর জামা কেচে ইস্ত্রি

করে। রুমাল ভাঁজ করে রেখে দেয়। রোজ সকালে সৌরভের টিফিন নিয়ে সবচেয়ে বেশি অশান্তি।

একদিন দেখেন কী, খালি-গায়ে বিছানায় বসে আছে ছোঁড়া, আর শোহিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর পিঠে কী মালিশ করছে।

"কী করছ?"

"দেখো না, রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে ছেলেটার পিঠ একেবারে পটলভাজা, একটু ক্রিম মালিশ করে দিচ্ছি।"

ইন্‌সেসচুয়াস! সুশান্তর ইচ্ছে হয়েছিল তখনই চিৎকার করে ওঠেন, "এসব ন্যাকামি বন্ধ করো। সবকিছুর একটা সীমা আছে। বুড়ো ধাড়ি, ওর নিজের কাজ নিজে করতে পারে না? তোমার প্রশ্রয়ে ওর জীবনে কিছু হল না। তুমিই ওকে স্পয়েল করেছ।"

কিন্তু বলতে পারলেন না। কী করে বলবেন? বি কম পাশ করতে পারেনি কিন্তু নিজের চেষ্টায় ও যে ভাল চাকরি জুটিয়ে নিতে পেরেছে। ঢ্যাঙা চেহারা, ফিটফাট সাজপোশাক আর ইংরেজি থ্রিলার থেকে চোখা বুলি কপচিয়ে ও কাবু করে রেখেছে মনিবকে। ও-যে কোনও কর্মের নয়, বাপ হয়ে সুশান্তর চেয়ে বেশি কেউ তা জানে না। অথচ আপিসে ওর নাকি দারুণ কদর। আজকাল গুণের কদর কি একেবারে উঠে গেছে দেশ থেকে? সুশান্ত যখন অবসর নিয়েছিলেন, তখন তাঁর মাইনে ছিল তিন হাজার টাকা। সৌরভ নাকি এখনই আড়াই হাজার টাকা মাইনে পায়।

অথচ সংসারে টাকা দেবার বেলায় কৃপণ। মাকে বলে, "আমি টাকা জমাচ্ছি, সামনের বছর আমেরিকায় বেড়াতে যাব। ইয়োরোপে যাব। দু'মাসের ছুটি নিয়ে যতগুলো দেশ দেখা যায়, দেখব।"

প্রায়ই সন্ধেবেলা সাজগোজ করে বেরিয়ে যায় সৌরভ। মাকে হুকুম করে যায়, "টেলিফোন এলে মেসেজ নিয়ে রেখো।"

কেন, শোহিনী কি ওর সেক্রেটারি? না, বাড়িটা ওর আপিস?

একদিন রাত্রে সুশান্ত শোনেন, পাশের ঘরে সৌরভ মায়ের ওপর চোটপাট করছে।

শোহিনী কাঁদো কাঁদো গলায় কৈফিয়ত দিচ্ছে, "বলছি তো ভুলে গেছি বলতে। আর কী করব?"

রাত্রে শোহিনী শুতে এলে পর সুশান্ত জিজ্ঞেস করেন, "ব্যাপার কী? এত চেঁচামেচি কীসের?"

"কিছু না।"

"কিছু না আবার কী? বাড়িতে হল্লা হচ্ছে। আমার বাড়ি। আমি জানতে চাই কেন হল্লা হচ্ছে?"

"বলছি তো তোমার জানার দরকার নেই। এ আমার আর ওর মধ্যে ব্যাপার?"

সুশান্ত জিজ্ঞেস করলেন, "সৌরভ ড্রিঙ্ক করে?"

"কেন?"

"গলার স্বর শুনে মনে হল। স্বাভাবিক না।"

"তুমিও তো করো। বড় চাকরিতে একটু-আধটু ওসব করতে হয়।"

কিছুক্ষণ গুম মেরে শুয়ে রইলেন সুশান্ত। তারপর বললেন, "ওকে অন্য কোথাও বাসা ভাড়া করে উঠে যেতে বোলো। আমার বাড়িতে থাকলে আমার পছন্দ মতো থাকতে হবে। এটা হোটেল না।"

ওই অবধি। তাঁর কথায় আর কাজ হয় কই। একদিন প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরছেন, কী মনে হল, 'মৌচাকে'র সামনে যন্ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে ওজন নিলেন। এ কী? পাঁচ কেজি ওজন কমে গেছে! পঁয়ষট্টি থেকে ষাট! তাই এত দুর্বল লাগে আজকাল। আশ্চর্য, বাড়ির লোক কেউ এটা লক্ষ করেনি! বাড়িতে এতগুলো মানুষ অন্ধ!

মাংসওলার কথা মনে পড়ে তাঁর। ও বলেছিল, "কয়েদ হয়ে গেলে জানোয়ারের ওজন কমে যায় বাবু। রোজ দুশো গ্রাম করে ওজন কমে। মন খারাপ থাকে তো। ঠিকমতো খায় না, ঘুমোয় না জানোয়ার।" সুশান্তর মনে হয়, মাংসওলা দার্শনিকের মতো কথা বলেছে। চুপি চুপি ডাক্তারের কাছে গেলেন একদিন। মন দিয়ে সব শুনল ডাক্তার। বুক-পেট পরীক্ষা করল। তারপর হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, "এজ?"

"সিক্সটি টু।"

"হুঁ। একটা কথা বলব স্যার? মন তুলে নিন।"

"মন তুলে নেব মানে?"

"এই পৃথিবীতে দুশো-আড়াইশো কোটি লোকের বাস। তাদের এইট্টি পার্সেন্ট কি নাইনটি পার্সেন্ট আপনার চেয়ে বয়সে ছোট। বয়ঃকনিষ্ঠ। তাদের ওপর রাগ করে কী হবে। তারা সংখ্যাগুরু।"

সুশান্ত বলেন, "তার মানে, চেয়ে চেয়ে এইসব অনাচার দেখব?"

"কেন। কিছুদিন কোথাও ঘুরে আসুন না। তীর্থটির্থ। গিন্নিকে নিয়ে ঘুরে আসুন। আর, একটু ভিটামিন খান। শরীরের যন্ত্রপাতির ক্ষয় হয়েছে তো, শুধু পথ্য দিয়ে এ-বয়েসে তার পূরণ হয় না। ভিটামিন 'এ' আর 'ই' লিখে দিচ্ছি, কিছুদিন খান। শরীর সতেজ হবে।"

তাই এই শীতে সুশান্ত কাশী গিয়েছিলেন। শোহিনীকে নিয়ে যাননি। একাই গিয়েছিলেন। প্রায় দু'মাস কাটিয়ে এলেন। ভারী সুন্দর জায়গা। বিশাল গঙ্গা, বিস্তীর্ণ গঙ্গার ঘাট। মহেশ্বরের জায়গা বলে হয়তো কাশীর আবহাওয়ায় পরিব্যাপ্ত অনাসক্তি। কলকাতার সঙ্গে আর একটা লক্ষণীয় পার্থক্য, কাশীর আনাজ-সবজি সব কিছুই বড় মাপের। মুলো, বেগুন, ফুলকপি, পেয়ারা, লাউ, কড়াইশুঁটি—সাইজ দেখলে মন ভরে যায়। ময়রার দোকানে প্রকাণ্ড মাপের মানুষ প্রকাণ্ড দুধের কড়ার সামনে বসে আছে, রাবড়ির সর তুলছে, প্রকাণ্ড থালায় পুরু দুধের সর জমিয়ে মালাই তৈরি হয়েছে। প্রকাণ্ড ঝুড়িতে ফেলছে অতিকায় সব হিঙের কচুরি। এইসব খাদ্যের স্বাদ নিলে, যাদের মন কুঁকড়ে আছে সে মন বড় হয়ে যায়। দরাজ হয়ে যায়। না হলে ওখানে এত ভিখিরি বেঁচে আছে কেমনভাবে! এত ধর্মশালা, দানসত্র ছড়িয়ে আছে কাশীতে যে মনে হয়, এখানে অনাহারে কেউ মরে না।

যা পেয়েছেন, পেট ভরে খেয়েছেন সুশান্ত, হজম করেছেন। গঙ্গাস্নান করেছেন নিয়মিত, কই সর্দিকাশি তো হয়নি। এবং ভিটামিন বড়ি দুটি একদিনের জন্যেও বাদ দেননি। তার ফলেই বুঝি মনে ফুর্তি এসেছে ধীরে ধীরে, চোখের দৃষ্টি স্পষ্ট হয়েছে। স্মরণশক্তির উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট। গঙ্গার ঘাটে বসেছিলেন এক বিকেলে, চোখ বুজে কীর্তন শুনছিলেন—হঠাৎ তাঁর বাল্যকালের সব কথা মনে পড়ে গেল। ছবির মতো ভেসে উঠল হাতেখড়ির দিন। সরস্বতী পুজোর সকাল, স্লেট বগলে বাবার হাত ধরে করুণা মাস্টারের বাড়ি চলেছেন সুশান্ত। গায়ে নীল কোট, পেতলের বোতাম দেওয়া, পায়ে মোজা-জুতো, হুবহু যেন দেখতে পেলেন মনশ্চক্ষে। ভোলা নামের স্কুলের বন্ধুকে মনে পড়ল। বোসেদের ছোট মেয়ে রাণুকে মনে পড়ল—যে প্রায় দুপুরে পাঁচিল টপকে এসে সুশান্তকে করমচা এনে দিত। ছোটবেলায় সুশান্ত মাকে হারিয়েছেন, কিন্তু সেদিন কীর্তন শুনতে শুনতে মায়ের রোগা ফরসা চেহারা স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে।

কুড়ি পয়সার ডাকটিকিটে যে-স্তন্যদায়িনীর ছবি থাকে, তাকে একদিন স্বপ্নে দেখলেন। যেন রেলগাড়ি চেপে তাঁরা দু'জন চলেছেন কোথাও। তিনি যেন ইশারায় ওকে বলছেন, "আঃ, আঁচল দিয়ে ঢাকো না, কামরাসুদ্ধ লোক যে দেখছে!"

একদিন শোহিনীকেও স্বপ্নে দেখলেন। এখনকার শোহিনী না। যৌবনকালের সঙ্গিনী শোহিনী। প্রথম সন্তান ওর গর্ভে। শোহিনী যেন বলছে, "এই শোনো, আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে। যদি মরে যাই।"

সুশান্ত আশ্বাস দিচ্ছেন, "কী যে বলো! তুমি মরে গেলে আমিও বাঁচব না।"

তখন সে রকমই মনে হত।

বাড়ি ফিরে এলেন তারপর। মন তুলে নিয়েছিলেন, কিন্তু তুলে রাখতে পারলেন না বেশিদিন। আসলে, বৈরাগ্য তাঁর স্বভাবে নেই। দূর থেকে বাড়ির গায়ে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে, দেখলেন—"সুরসাগর"।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই হইচই উঠল ঘরে ঘরে। নীচের তলায় পশ্চিম দিকের ঘর থেকে নূপুর চেঁচিয়ে উঠল, "এই ভানু, শিগগির যা, বাবা এসেছে।"

পুব দিকের ঘর থেকে লুঙ্গি-পরা অবস্থায় বেরিয়ে এল উজ্জ্বল। ট্যাক্সি থেকে বাকস নামাল, বেডিং নামাল নিজ হাতে।

কতদিন পর নিজের বাড়িতে আবার ফিরে এলেন বাড়ির কর্তা—সুশান্ত স্বয়ং। প্রণাম করল ছেলেমেয়েরা। হাসতে হাসতে উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়। সত্যি, মনে হচ্ছে, বয়স যেন দশ বছর কমে গেছে। কিন্তু ওই সুরসাগরটা কী ব্যাপার? নূপুরের গানের ইস্কুল হয়েছে নাকি?

নিজের ঘরে ঢুকেই তাঁর চক্ষুস্থির!

একী, ডবল বেড কোথায় গেল? আমাদের ডবল বেড?

শোহিনী আলমারি খুলে কিছু রাখছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, "আগে জিরোও একটু, হাত-মুখ ধোও। সব জানতে পারবে। কিছু খোয়া যায়নি তোমার।"

তারপর দরোজাটা ঠেলে দিয়ে সুশান্তর কাছে সরে এসে দাঁড়ায়। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সুশান্তর বুকের ওপর মাথা রাখে। মৃদু একটা পারমিউমের গন্ধ পান সুশান্ত।

শোহিনী বলে, "দেখালে বটে! সেই একটা পৌঁছোনো খবর দিয়েছিলে, ব্যস, তারপর আর পাত্তাই নেই! শরীর ভাল আছে তো?"

"দেখে কী মনে হচ্ছে?"

"মনে হচ্ছে, তুমি আমার চেয়েও বয়সে ছোট হয়ে গেছ। এবার আর আমি তোমার সঙ্গে পেরে উঠব না।"

তিনতলার চিলেকোঠায় একখানা ঘর করেছিলেন সুশান্ত। ঠাকুরঘর হবার মতো, কিন্তু সেটা এতকাল জাংকরুম হিসেবে পড়ে থেকেছে। গিয়ে দেখেন, ঘরটা পরিষ্কার করা হয়েছে। রং করা হয়েছে। মাথার ওপব পাখা বসেছে একটা। দেয়ালে লাগানো শৌখিন শেড-দেওয়া বাতি। একপাশে একটা খাট—সেই ডবল বেডের আধখানা, অন্যপাশে একটা টেবিল। কোণে আরামচেয়ার। ঘরের বাইরে একখানা খোলা ছাদ, যেখান থেকে খুব বড় একটা আকাশ দেখা যায়।

শোহিনী বলে, "এই নাও। এবার শান্তি হয়েছে তো।"

"এই জাংকরুমে—"

"সবচেয়ে ভাল ঘর এটা। সংসার তোমাকে বড় জ্বালায়, তাই এই ব্যবস্থা। সংসারে আছ অথচ সংসারের ঝামেলায় নেই।"

দেখলেন, শোহিনীই শেষপর্যন্ত জিতল। তবু একবার শেষ চেষ্টা করেন সুশান্ত। বলেন, "এটা আমার বাড়ি, আর আমাকেই কিনা—"

কথা শেষ করতে দেয় না শোহিনী। বলে, "এটা আমার বাড়ি।"

তাই তো! স্ত্রীর নামেই তো বাড়িটা করেছিলেন সুশান্ত। তখন ভেবেছিলেন, জ্ঞাতিগুষ্টি না হলে সম্পত্তির ভাগ চাইবে। আগে কখনও বলেনি—এতদিন পর শোহিনী আজ সেই সুযোগ গ্রহণ করল। ব্রহ্মাস্ত্রখানা ছাড়ল।

গভীর দুঃখের মধ্যেও মর্মাহত সুশান্ত হেসে ফেললেন। বললেন, "মরে গেলে আমার বডি সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেবে তো? না, ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে নামাবে তোমরা?"

শোহিনী গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে, "যাঃ, অলুক্ষণে কথা বলতে নেই।"

১৯৮৭

গাণ্ডীব

ঠিকে ঝি মহামায়া দুপুরে খাবার দিতে এসে দেখে, বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি। কী আবার হল? গরিব মানুষ, পুলিশ দেখলে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। হঠাৎ মাথার কাপড় তুলে দিয়ে ও হনহন করে হাঁটতে থাকে। ছোট গেট দিয়ে ঢুকে খিড়কি দরজার দিকে এগিয়ে যায়। গিয়ে দেখে, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। আবার ঘুরে সামনের বড় গেট দিয়ে বাড়িতে ঢুকল মহামায়া।

বসার ঘরে ছোট সোফাটায় বসে আছেন রণবীর। মাথাটা একটু নামানো। ভর দুপুরেও ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে। তার আলো প্রতিফলিত হয়ে চকচক করছে রণবীরের ছোট টাক। টাকের

তিনপাশের চুল যত্ন করে আঁচড়ানো। চোখে চশমা। সোফাটার হাতলে একখানা কাগজ রেখে কিছু একটা লিখছেন। গায়ে গেঞ্জি, পরনে পাজামা, আর সব বয়স্ক ভদ্রলোকের মতো। তবে ঠোঁট আর আঙুলের ডগায় এক পোঁচ করে শ্বেতীর দাগ রণবীরকে আলাদা করে চেনায়।

বড় সোফাটায় বসে আছে উর্দি-পরা দু'জন পুলিশ অফিসার। সেন্টার টেবিলে উপুড় করে রাখা ওদের দুটো টুপি। অন্য ছোট সোফায় শঙ্কর ডাক্তার, বয়েস চল্লিশের মতো, নাকের নীচে মুখের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি কেয়ারি করা মোটা গোঁফ ওর অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বের প্রতীকী চিহ্ন। ওর পায়ের কাছে রাখা ব্রিফকেস।

মহামায়াকে ঢুকতে দেখে শঙ্কর ডাক্তার বলে ওঠে, "এই তো ফিমেল একজন পাওয়া গেছে, একে নিয়ে আমি ও-ঘরে যাই।"

যান।

রণবীর মহামায়ার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'বউদিকে দেখবেন ডাক্তারবাবু, তুমি সঙ্গে যাও।'

বউদি, অর্থাৎ রুবির কী হয়েছে, কেন ডাক্তার, কেন ওর জন্য অপেক্ষা কিছুই বোঝে না মহামায়া। হতভম্ব হয়ে খসে-যাওয়া আঁচলটা আবার মাথার ওপর তুলে ঘোমটা দেয়। ওর বুক টিপটিপ করতে থাকে। কাজ করতে এসে পুলিশ আর ডাক্তারের সামনে এভাবে পড়তে হবে জানলে, ও আজ আসত না। বউদি নিজে খাবার গরম করে শ্বশুরকে খাওয়াত, নিজে খেত। সব রান্না শেষ করে দাদাবাবুকে খাইয়ে, খাবার ঢাকা দিয়ে, ও দশটার সময় এ-বাড়ি থেকে গেছে। এখন একটা কি দেড়টা বাজবে। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে, কী এমন ঘটল যে, সবাই তটস্থ।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে গিয়ে মহামায়া টের পায়, বাথরুমের কল দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু বড় শোওয়ার ঘরের পরদা সরিয়ে দরজা ঠেলে ঢোকার পর ও দেখতে পায়, রুবি ওয়াক ওয়াক করে বমি তুলছে বিছানায় শুয়ে। আর কাঁদছে। কিছুই না জেনে মহামায়া স্বাভাবিক সহানুভূতিবশত রুবির কাছে ছুটে যায়।

সাধারণ অসুস্থতা নয়, এটা একটা রেপ কেস, বুঝতে মহামায়ার সময় লেগেছে। ভদ্রলোকের পাড়ায়, সল্ট লেকের মতো জায়গায় এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে, অনুমান করা ওর সাধ্য ছিল না।

সেদিন রাহুল আপিসের জন্য তৈরি হতে দেরি করে ফেলেছিল। বি. ই. সেক্টর থেকে একজনকে তুলে আপিসের গাড়ি আসে ন'টা চল্লিশে। সে-দিনও এসেছিল। হর্ন দিচ্ছিল বারবার। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছে রাহুল। যাওয়ার সময় নীচের দরজা টেনে দিয়ে যায়নি। ভুলে গেছে।

রুবিও খেয়াল করেনি। মহামায়া কাজ সেরে বেরিয়ে গেছে খিড়কি দিয়ে, যথারীতি। সে-ও লক্ষ করেনি, লক্ষ করার কথা নয়, যে বাইরের ঘরের দরজা খোলা। ওটা বিপজ্জনক। সল্ট লেকের মতো শুনশান পল্লিতে একটা-না-একটা চুরিচামারি লেগেই আছে। আগে আরও বেশি ছিল, মুখ্যমন্ত্রী এ-পাড়ায় এসে বসবাস শুরু করার পর কমেছে কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়নি। এ কি ছোটখাটো পল্লি— হিন্দুস্থান পার্ক, কি গলফ গ্রিন? সেক্টরে সেক্টরে ভাগ করা এ এক বিশাল টাউনশিপ। উত্তর-দক্ষিণে কোন না দশ মাইল? ফাঁকায় ফাঁকায় একটা করে দোতলা, তিনতলা বাড়ি। চোরেদের স্বর্গ।

বাবুরা আপিসে আর বাচ্চারা ইস্কুলে-কলেজে চলে যাওয়ার পর সারাটা দিন খাঁ খাঁ করে সল্ট লেক। মেন রাস্তা দিয়ে বাস যায়, মিনি যায়, ওদিকটায় দোকানপাট চলে। বাজারের কাছেও লোক চলাচল থাকে খানিকটা। রিকশা, মোটরগাড়ি যাতায়াত করে খেপে খেপে। কিন্তু ভেতরের দিকের পাড়াগুলো একেবারে নির্জন। বিকেল চারটে অবধি বৃদ্ধ, অসুস্থ আর গৃহবধূর দল লুকিয়ে থাকে বড় বড় বাড়িগুলোর খোপে। আর, নতুন বাড়ি উঠছে যেখানে, সেখানটায় কাজ করে মিস্ত্রিরা। ওদের খুটখাট দুমদাম শব্দ শোনা যায়, দুপুরবেলা। এই তো কোণের প্লটটায় এক মাস আগেও কাজ হচ্ছিল। বর্ষা পড়তে কাজ বন্ধ।

রণবীর চান সেরে পুজো করতে বসেছিলেন।

একটু আগে রুবি ধূপদানিতে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ওই চন্দনপোড়া গন্ধটা পেলে রণবীর পুজোর ঘরের দিকে অগ্রসর হন। পেতলের থালায় চারটি গাঁদা ফুল আর দোপাটি রাখা নিয়ম মতো। এই পুজোর ঘর তৈরি করা হয়েছিল নন্দিতার ইচ্ছায়। নিজেদের বাড়ি হচ্ছে যখন, একটা পুজোর ঘর থাকবে না? ওর রাধামাধবকে রাখবে কোথায়? শুধু রাধামাধব না, শ্যামা মা আছেন, সন্তোষী মা আছেন।

সকলের জন্য জায়গা চাই। শুধু মানুষ দিয়ে কি সংসার ভরে? নন্দিতা এ-বাড়ির মা। সব সংসারেই যেমন একজন করে মা থাকে। নন্দিতা মারা যাওয়ার পর এ-বাড়ি মাতৃহীন।

ঠাকুরদেবতায় ভক্তি ছিল ওর বরাবর। নিভৃতে ছিল তার প্রকাশ। আগের ভাড়াবাড়িতে ওর আলমারির ওপর-তাকে ছিল তাঁদের নিবাস। এখানে প্রশস্ত জায়গা পেয়ে দেবদেবীরা বেঁচেছেন। হাত-পা ছড়িয়ে আছেন। আসলে ওর ডায়াবেটিসের ক্ষয় থেকে মৃত্যুভয়, তারপর স্বামীর শরীরে শ্বেতী দেখা দিল যখন, তখন থেকে নন্দিতার মনোরোগ গভীর হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে যার নিরাময় নেই, ভগবানই তার ভরসা। রণবীর আপত্তি করেননি। নতুন বাড়িতে উঠে আসার পর নন্দিতার শ্যামামায়ের চোখ, জিভ, সোনা দিয়ে বাঁধানো হল। নাকে সোনার নোলক উঠল। ফ্রেমে বাঁধানো ফটো, তার উপর গয়না গেঁথে কাচ দিয়ে ঢাকা হল ছবি। নিজের জন্য কখনও গয়নাগাঁটি চায়নি ও, ঠাকুরের জন্য এইটুকু মানত, দেওয়ার ক্ষমতা যখন আছে, কেন দেবেন না? কতদিনই বা ও ভোগ করবে?

পাঁচ বছর পার হওয়ার আগেই মারা গেল নন্দিতা। ছেলের বিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছে। নাতির মুখ দেখে যেতে পারেনি। তারপর থেকে রণবীর ঠাকুরঘরের চার্জে। দেয়ালে একটা ফটো বাড়ল। ঠাকুরদেবতার চেয়ে একটু নীচে ঝোলানো হল নন্দিতার ছবি। কাচের উপর বড় করে তেল-সিঁদুরের ছোপ—ভাগ্যবতী; সধবা অবস্থায় স্বর্গে গেছে। রণবীরের কাছে শ্যামা মা, সন্তোষী মা'র চেয়ে অনেক প্রিয় ওই নীচের ছবিটা, ওই হাসি, ওই চোখের অভিমান কত দিনরাত্রি তাঁকে সঙ্গ দিয়েছে। বাড়ি করে কিছু টাকা বেঁচেছিল, সুদে খাটছিল নন্দিতার নামে, সেই টাকা ভাঙিয়ে তিনি ওই ছবিখানার ফ্রেম সোনার পাত দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছিলেন। যার সম্পত্তি, তার কাছেই থাক। এই রকম ভাবটা।

তারপর? পুলিশ অফিসার জানতে চায়।

পুজো করতে বসেছিলাম। ওদিকের ঘরে গান বাজছিল, শুনতে শুনতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেছি। খালি-গা আমার, পরনে চেলি—যেটা পরে রোজ পুজো করি। হঠাৎ পিঠের ওপর ঠান্ডা একটা কিছুর ছোঁয়া পেলাম। হাত দিয়ে তাড়াতে গিয়ে দেখি লোহা। মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। দেখলাম, একজন দাড়িওলা লোক আমার পিঠে স্টেনগানটা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল, চাবি দাও।

স্টেনগান আপনি আগে দেখেছেন?

না। তা হলে রাইফেল। মানে রিভলভার নয়। বেশ বড়সড়। ভয় পাওয়ার মতো।

আপনি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন?

না। বললাম, চাবি দিয়ে কী হবে? টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি থাকলে কেউ বাড়িতে ওসব জিনিস রাখে আজকাল? লকারে রাখে। আলমারিতে হয়তো মাসের খরচটা আছে। তো ও বলল, ওঠো তাড়াতাড়ি। আলমারি সব খুলে দেখাও। শব্দ করেছ কী—বলে বন্দুকটা আমার কপালে ঠেকাল। আমি তখন উঠে বউমার ঘরের দিকে গেলাম। ওইখানেই দুটো লোহার আলমারি থাকে।

আপনার নিজের শোবার ঘরে কোনও আলমারি বা বাকস নেই?

রণবীর বললেন, আছে একটা। সেটা দেয়ালে গাঁথা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তেমন কিছু নেই ওর মধ্যে। তবু সিকিউরিটি হিসেবে—

তারপর?

একজন পুলিশ অফিসার এজাহার নিচ্ছিল, অপরজন নোট করছিল খাতায়।

তারপর? পুলিশ অফিসার জানতে চায়।

এরপর ওরা দোতলায় গিয়ে ঘটনাস্থল তদন্ত করবে।

রণবীর বললেন, পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকেছি, দেখি, বিছানায় বউমা ছটফট করছে আর ওর ওপর জুলুম করছে জিনস পরা একটা লোক। গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে।

কী নাম? আপনার বউমার নাম কী?

রুবি। রুবি সরকার।

ওর স্বামীর নাম?

রাহুল সরকার।

কতদিন বিয়ে হয়েছে?

ছ' বছর। সাড়ে ছ'বছর।

বাচ্চাকাচ্চা?

হয়নি।

বয়েস?

একটু ভেবে নিয়ে রণবীর বললেন 'উনত্রিশ। আঠাশ।'

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ, তারপর জিনস-পরা একটা লোক ওর ওপর চড়াও হয়ে আছে। দেখলেন। রুবিদেবীর গায়ে কাপড় ছিল?'

কাপড়? হ্যাঁ ছিল বোধহয়। অত মনে করতে পারছি না। তখন কি আমার মাথার ঠিক আছে?

তা নয়। আমি জানতে চাইছি, আপনি কি ওঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখলেন? মনে করে বলুন।

লোকটার বডি আড়াল করে ছিল বিছানায়। আমি ওর ছটফট করা দেখেছি। আর হ্যাঁ ওর পা দেখেছি। নড়ছিল। আমি ছুটে যেতেই লোকটা লাফিয়ে বিছানা থেকে নামল। তারপর গুলি করল। ওর হাতে রিভলভার ছিল। গুলি আমার গায়ে লাগেনি। বাথরুমের দরজায় লেগেছে।

তখনও চিৎকার করেননি আপনি?

না। গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেছিল ভয়ে। গুলির শব্দ শুনে ভেবেছিলাম, মরেই গেছি। জীবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি তো আমার। দুটো উটকো লোক বাড়ির মধ্যে, ডাকাতি করতে ঢুকেছে। তাদের হাতে অস্ত্র, এ-অবস্থায় কাণ্ডজ্ঞান বজায় রাখা যায় না। আমি যতটুকু দেখেছি, বললাম তো। তারপর এক মিনিটের মধ্যে ওরা উধাও হয়ে গেল।

কিছু নিয়েছে ওরা? নিতে পেরেছে?

থানায় টেলিফোন করলাম, বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে, এখুনি আসুন। তখন জানি না। ছেলের আপিসে ফোন করলাম, এখুনি চলে আসতে বললাম। ও সিটে ছিল না, ওর কলিগ মেসেজ নিয়েছে। তারপর ডাক্তারকে ফোন করলাম। বুঝতে পারছিলাম না, ফোন করা ছাড়া আমার আর কী করা উচিত। বউমা বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আমি কাঁপছি তখন। এ-ঘর ও-ঘর হানটান করছি। হঠাৎ চোখে পড়ল, ঠাকুরঘরে দেয়ালে দুটো ছবি নেই। মনে হয়, দাড়িওলা ডাকাতটা নিয়ে গেছে।

অন্য লোকটার দাড়ি ছিল না?

না। ফরসা। রোগা দেখতে। নীল রঙের জিনস।

পুলিশ অফিসার হঠাৎ বলল, অদ্ভুত পাড়া তো এটা, এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, কেউ খোঁজ নিতে এল না? আপনাদের সঙ্গে সদ্ভাব নেই নাকি?

রণবীর বললেন, অসদ্ভাবও নেই। সি কে সেক্টরটা এই রকম।

প্রত্যেকে নিজের নিজের সম্পত্তি আগলাচ্ছে। নিজের নিজের জীবন উপভোগ করছে। তাই না? দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার জিঘাংসু হাসি হাসে।

বলতে বলতে শংকর ডাক্তার দোতলার কাজ সেরে এসে পৌঁছোল। ব্রিফকেসটা সেন্টার টেবলের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। নিজে নিজেই বলল, খুব আপসেট। ন্যাচারালি। ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে এলাম। এক্সটারনাল অ্যাবারেশনস আছে। ক্লিন করে দিয়েছি। সোয়াব নিয়ে গেলাম। দেখা যাক।

ডাক্তার নিজেই মনে হল যথেষ্ট আপসেট।

বেরোতে যাবে, পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করে, রিপোর্টটা?

কাল। কাল সকালে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন?

রণবীর বললেন, 'রাহুল যাবে। ও-ই না হয় দিয়ে আসবে। এখুনি এসে পড়বে ও। এখনও এল না কেন? ভয়ের কিছু নেই তো? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

দরজার আড়াল থেকে মহামায়ার কান্নাভেজা কণ্ঠস্বর শোনা যায়: বাবু, বউদির কী হবে?

আমাদেরও সেই একই জিজ্ঞাসা: বউদির কী হবে?

সেদিন রাহুল যখন বাড়ি ফিরল তখন তিনটে বেজে গেছে। বেরিয়েছিল। ফিরে এসেই মেসেজ

পেয়েছে: বাড়িতে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছে বাড়িতে। রণবীর টেলিফোনে বলেছেন, ডাকাতি। পুলিশ এসেছিল। বিশেষ কিছু চুরি যায়নি। ওরা গুলি করেছিল, কিন্তু সৌভাগ্য, কেউ আহত হয়নি। রুবি খুব আপসেট। ডাক্তার শংকর চৌধুরী এসে দেখে গেছেন। ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন রুবিকে, ও ঘুমোচ্ছে।

যথেষ্ট সিরিয়াস ব্যাপার। রাহুল আপিসের গাড়ির খোঁজ করেছিল, সব গাড়ি ডিউটিতে। পাঁচটার আগে কেউ ফিরবে না। অগত্যা, বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সি চড়েই ফিরল। এত দূর পার্ক স্ট্রিট থেকে সল্ট লেকের সি কে সেক্টর, এত জমা জল, এত জ্যাম, অকারণ মোড়ে মোড়ে দাঁড়ানো সারবন্দি গাড়ি, ট্রাক, টেম্পো, বিকল অ্যামব্যাসাডর,—বর্ষার বিকেল যেন সমস্ত কলকাতা শহরটাকে পঙ্গু করে ফেলেছে। পেছনের সিটে প্রায় উবু হয়ে বসে উদ্বিগ্ন মানুষটা বাড়ি পৌঁছোল। দুর্যোগের দিনে সব কিছুতেই দুর্যোগ।

এসেই ছুটে উঠে গিয়েছে দোতলায়। নিজের চোখে দেখে এল, রুবি ঘুমোচ্ছে। ঘুম ভাঙলে ওর সঙ্গে কথা হবে। বাথরুমের কল থেকে জল পড়ে যাচ্ছিল, ও গিয়ে বন্ধ করে এল। নামতে গিয়ে দেখল, মহামায়া রান্নাঘরের মুখে পা ছড়িয়ে বসে আছে।

তুমি কী করছ এখানে? কখন এসেছ?

মহামায়া বলল, বাবুর খাওয়া হয়নি। বউদির খাওয়া হয়নি। বাড়িতে ডাকাত এসেছিল।

শুনেছি।

বউদিকে বেইজ্জত করে গেছে।

সে কী? কে বলল তোমায়?

নিজের চোখে দেখলুম তো। এরম এরম আঁচড়ের দাগ।

আজেবাজে কথা রটিয়ো না। এখন বাড়ি যাও।

মহামায়া রাহুলের রাগের অর্থ বুঝতে না পেরে আহত হয়। একটু আগেই ওকে নেমন্তন্ন করে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল শোবার ঘরে। আর এখন বলা হচ্ছে, আজেবাজে কথা রটিয়ো না। এ-সব কি রটাবার জিনিস। ক্ষুব্ধ হয়ে ও ভাবে, ভদ্দরলোকেরা ওই রকম। কাউকে বিশ্বাস করে না।

নীচের ঘরে বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাহুলের মনে হয়, না, পুলিশকে খবর দেওয়া ভুল হয়নি। শংকর ডাক্তার অনেক দিনের পরিচিত। মায়ের অসুখের সময় বার বার এসেছেন, শেষ সময়ে কাছে ছিলেন, তাঁকে ডাকাও উচিত কাজই হয়েছে বাবার।

কিন্তু রুবি ধর্ষিত হয়েছে, ডাকাতরা লুট করতে এসে ধর্ষণ করতেও ছাড়েনি, এই ব্যাপার ও কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। ও ঘুমোচ্ছে এখন ঘুমোক, কিন্তু জেগে উঠলে পর কী করবে কী বলবে কে জানে। তার আগে ডাক্তারের বাড়িতে যাওয়া দরকার। টেলিফোনে হবে না। যাবার আগে বলল, বাবা, তুমি কিছু খেয়ে নাও।

যা হবার, তা হয়েছে। এখন কীভাবে সব দিক সামলানো যায়, তা ভাবতে হবে।

গিয়ে শুনল, শংকর চৌধুরী একটু আগে বাড়ি ফিরেছেন। বাড়ির নীচের তলার ঘরে ওঁর চেম্বার। রাহুল খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। এখন অসময়। তবু রাহুল এসেছে শুনে নামবেন নিশ্চয়।

রুবি সংক্রান্ত বিশদ খবর ও শংকর ডাক্তারের কাছে শুনল।

সোয়াব টেস্টের রিপোর্ট ওর হাতে।

ডাক্তার বলল, রেপ কেস, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। থাই আর ব্রেস্ট এরিয়ায় অ্যাবারেশনস তো আছেই। ইন্টারনাল অ্যাবারেশনও আছে। ভেতরে স্পার্ম পাওয়া যায়নি, তবে ভ্যাজাইনার বাইরে স্পার্মের ট্রেস পাওয়া গেছে।

পুলিশকে এত কথা বলার কী দরকার?

পুলিশ তো সব কিছুই চোখে দেখে গেছে। যেটুকু দেখেনি, সেটা আমার কাছে জানবে বলে দেখেনি। আমি কী করে সত্য চাপা দেব? আর তাতে লাভই বা কী?

লাভ, আমাদের পরিবারের মর্যাদা। রাহুল কাঁদো কাঁদো স্বরে ডাক্তার শংকর চৌধুরীকে বলেছিল সেদিন। কাগজে এই খবর বেরোবে। চারদিকে টি টি পড়ে যাবে না? রুবি তো পাগল হয়ে যাবে।

ডাক্তার বলেছিল, যদি ঘটনায় পাগল না হয়, তা হলে রটনাতেও হবে না। ওর ক্ষতি যা হবার, তা তো হয়েছেই। কেউ তো রক্ষা করতে পারোনি তোমরা। এখন শুধু পরিবারের মর্যাদার কথা ভেবে খবর

চাপতে চাইছ? তাই না? কোনটা বড়? ব্যক্তি, না পরিবার? ধরো আজ বাদে কাল যদি কালপ্রিট ধরা পড়ে যায়, ওর বিরুদ্ধে রেপচার্জ আনবে না?

আগে ধরা তো পড়ুক। রাহুল বলেছিল, ক'টা ডাকাত ধরা পড়ে বলুন। ফ্ল্যাটের মধ্যে খুন, ডাকাতি হলে পুরনো ঝি-চাকরের পেছনে ধাওয়া করে পুলিশ। তারা ধরা পড়লে কেস হয়, শাস্তি হয়। কিন্তু এটা তো বাইরের লোকের কাজ। দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে। পাড়ায় ঘুরঘুর করছিলই, একটা চান্স পেয়ে, যা পেয়েছে, নিয়ে গেছে। এর পেছনে কোনও মোটিভ ছিল না ওদের, তা তো আপনি মানবেন? রুবির কাছেও চাবি চেয়েছিল লোকটা। ও দেয়নি। ধস্তাধস্তি হয়েছে। একজন যুবতি মহিলার সঙ্গে ধস্তাধস্তি হলে হঠাৎ মনে কুবুদ্ধি জাগতে পারে। তখন তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় চাবির কথা ভুলে গিয়ে লোকটা রুবিকেই নিয়ে পড়েছে। ওর গায়ে আর কতটুকু জোর। এই নিয়ে কি স্ক্যান্ডাল হওয়া উচিত? আমাদের দাম্পত্য জীবন, সারা জীবন, পড়ে আছে সামনে, রুইন্ড হয়ে যাক আপনি তাই চান?

তুমি কী চাও?

আমি চাই, আপনি বলুন, ডাকাতকে বাধা দিতে গিয়ে ও আহত হয়েছে। ও রুবিকে লক্ষ করে গুলি করেছিল। গুলি লাগেনি। এ থেকে যে মামলা দাঁড়ায়, দাঁড়াবে।

ডাক্তার শংকর চৌধুরী সেদিন কোনও উত্তর দেয়নি। বলেছিল, আমি তোমার ওয়াইফের সঙ্গে কথা বলব। তারপর রিপোর্ট ফাইনালাইজ করব।

বয়সে সে রাহুলের চেয়ে খানিকটা বড়। খুব বড় নয়। কিন্তু পদগৌরবে, গাম্ভীর্যে ওকে অনেক অভিজ্ঞ মনে হয়। রাহুলের যুক্তি ও মানতে পারছিল না। নীতির সঙ্গে মানবিকতার একটা দ্বন্দ্ব কোথাও ঘটছে, বুঝতে পারে, রাহুল অন্য কোনও দ্বন্দ্বে জড়িত সন্দেহ করে, খোদ ভিকটিমকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে করেছিল ডাক্তার চৌধুরী। সত্যকে যদি বিকৃত করতেই হয় তবে কোনও বৃহত্তর স্বার্থে তা করা উচিত। এক্ষেত্রে রুবির ব্যক্তিগত স্বার্থই বৃহত্তর স্বার্থ। সে লাঞ্ছিত হয়েছে। সমাজ তাকে রক্ষা করতে পারেনি।

বিয়ের আগে রুবি দক্ষিণ কলকাতার এক শিশু বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত। কাজ তেমন কিছু না, শিশুদের সামলানো। মূলত তাদের বাপ-মা'র অনুপস্থিতিতে নিরাপদে রাখা, কিছু সহবত শেখানো। ওকে হাজার টাকা মাইনে দিত ওর এম এ ডিগ্রির জন্যে নয়, ওর সপ্রতিভ সৌন্দর্যের কারণে। বাচ্চারা দেখতে ভাল যুবতীদের সঙ্গ পছন্দ করে, তাই সেই স্কুলে সবাই ছিল শিক্ষিকা, সবাই সুন্দর ও সুবেশ। পুরুষ বলতে একজন, যিনি আপিসের কাজ দেখতেন, ব্যাঙ্কে যেতেন, টিফিন কেনার ব্যবস্থা করতেন। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ।

ওই টাকায় ওর সাজগোজের খরচ চলে যেত। চুলের প্রসাধন, মুখের প্রসাধন, শরীরকে নীরোগ রাখা, পায়ের পরিচর্যা—এ-সবে অনেক খরচ আজকাল, যারা বিউটি পার্লারে যায় তারা জানে। হাজার টাকা সেই তুলনায় কিছুই না। বিয়ের পরেও চাকরিটা ছিল কিছুদিন। সল্ট লেকে আসার সময় ছাড়তে হয়েছে। সল্ট লেক থেকে ঠেঙিয়ে দশ মাইল পথ গিয়ে শখের চাকরি করার মানে হয় না। বলেছিল নন্দিতা—ওর শাশুড়ি। ওই সময়টায় সংসার করো। সংসার করা একটা ফুল-টাইম কাজ। তোমাকে রান্না করতে হবে না। বাসন মাজতে হবে না। তা ছাড়াও হাজারটা কাজ আছে। মন দিলেই দেখতে পাবে। তারপর ছেলেপুলে হলে তো কথাই নেই।

বস্তুত, ছেলেপুলে হওয়ার জন্যই বিয়ে। শাশুড়ি সেই কথাই চেয়েছিলেন বোঝাতে। কিন্তু রুবি সে-কথায় সায় দেয়নি। দেহকষ্ট কার? তারই হবে। শাশুড়ির ছেলের তো হবে না। সুতরাং জীবনটা কয়েক বছর এনজয় করে নিক আগে। তারপর—সন্তান পালন করা যে কী ঝক্কি তা ও স্কুলে কাজ করতে গিয়ে টের পেয়েছে। ও জিনিস সাধ করে কেউ ডেকে আনে?

নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে দ্বারকার যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, দেহত্যাগের আগে তিনি যদুবংশের ধ্বংস দেখে যান। খবর পেয়ে অর্জুন ছুটে আসেন হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকায়। মৃতদের সৎকার করার পর তাঁর কাজ হল যাদব রমণীদের নিরাপদ আশ্রয় হস্তিনাপুরে নিয়ে আসা। সে এক নাটকীয় দৃশ্য। একদল নারীকে পাহারা দিতে দিতে অর্জুন সসৈন্য চলেছেন। দ্বারকার সীমানা অতিক্রম করার পরেই আহির দস্যুরা এসে হানা দিল। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল শিবিরে শিবিরে। অর্জুন গাণ্ডীব তুলে আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করলেন, পারলেন না। দস্যুরা

যুবতীদের হরণ করে নিয়ে গেল। যারা অবশিষ্ট রইল, তাদের নিয়ে বয়স্ক, অশক্ত অর্জুন রাজধানীতে পৌঁছোন। মহাভারতের এই কাহিনীর এক ইঙ্গিতপূর্ণ করোলারি আছে যে, হরণটা ছিল একটা সাজানো ব্যাপার। যদুবংশের পুরুষরাই শুধু অনাচারী ছিল না, নারীরাও ক্রমে ব্যভিচারী হয়ে পড়ে। স্থানীয় আহিরদের সঙ্গে তাদের গোপন প্রণয় ছিল, মনে করা হয়। যাত্রার আগে ওরা ঠিক করে নেয়, দস্যু সেজে প্রেমিকের দল প্রেমিকাদের ধরে নিয়ে যাবে। প্রেমিকারা ধরা দেবে স্বেচ্ছায়। বাধা দেবে না। না হলে এত সহজে অর্জুনের পরাজয় ভাবা যায় না। আর, এ-কথাও বিবেচ্য যে, একজন যুবতীর পক্ষে কোন জীবন—হস্তিনাপুরে শরণার্থীর, না দ্বারকার বাইরে, স্বদেশে, প্রণয়িনীর, বাঞ্ছনীয়? নিশ্চয় শরণার্থীর জীবন নয়। আর সেখানেও তাদের কোনও-না-কোনও অন্তঃপুরে স্থান হত। কী দরকার? মহাভারত বলছে, 'কোনও কোনও কামিনী ইচ্ছাপূর্বক তাহাদিগের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিল।' এই 'ইচ্ছাপূর্বক' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ বোধহয় কনসেন্ট, যা কিনা পেনাল কোডের ৩৭৫ ধারায় স্তম্ভ বিশেষ।

সরকার বাড়িতে ডাকাতি হবার পর আড়াই মাস কেটে গেছে।

কাগজে খবর বেরিয়েছিল এই ঘটনার। তাতে এই পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়নি। 'ডাকাতেরা কিছু স্বর্ণালংকার নিয়ে চম্পট দেয়,' এবং 'পরিবারের একজন মহিলা আহত হন'—এই অবধি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিবেশীরা কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে খোঁজ নিতে এসেছিল, তাদের অল্পকথায় বিদেয় করেছেন রণবীর। আত্মীয়দের উদ্বেগ নিরসন করেছেন বাথরুমের দরজার ছিদ্র দেখিয়ে। ভাগ্যিস গুলি লাগেনি গায়ে। সোনা বাঁধানো ছবিদুটো চুরি গেল, সে-ও বিরাট ক্ষতি, বিশেষ করে নন্দিতার ফটোটা। তবে, ক্ষতি আরও কত গুরুতর হতে পারত, ভাবলে মনে হয়, কিছুই হয়নি। রণবীর বলেছেন, নার্ভাস শক তো, বউমা আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠবে। সময় লাগবে। ওষুধ খাচ্ছে।

রাহুল গম্ভীর হয়ে ছিল। রণবীর বুঝেছেন, ও ভাবছে, বাবা যথেষ্ট সাহস দেখায়নি। ও বাড়িতে থাকলে ডাকাতদের শায়েস্তা করে দিত। এই রকম কিছু। কার্যক্ষেত্রে হয়তো ও খুন হত, কি আহত হয় পড়ে থেকে স্ত্রীর ওপর পাশবিক অত্যাচার হচ্ছে, নিজের চোখে চেয়ে চেয়ে দেখত। বন্দুকের সামনে এগিয়ে যেত না। সংকটে না পড়লে মানুষের স্বরূপ প্রকাশ পায় না, তিনি জানেন। তবু এক-একবার মনে হয়, গুলিটা তাঁর গায়ে লাগলেই ছিল ভাল। অন্তত, একটা প্রমাণ থাকত যে, তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। পুত্রবধূকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন, পারেননি। একেবারে অক্ষত থাকা ওঁকে শোভা দিচ্ছে না।

রুবির বাবা-মা ঘটনাটা আন্দাজ করেছেন কিন্তু বুঝতে দেননি। বাপের বাড়ি এসে দিন কয়েক কাটিয়ে গেলে উপকার হতে পারে, এইভাবে মৃদু প্রস্তাবনা রেখেছেন ওর মা। রুবি রাজি না হওয়ায় আর পেড়াপিড়ি করেননি। এখানকার ডাক্তার যখন দেখছেন, তখন তার চিকিৎসাতেই থাকুক। দরকার হলে একজন নিউরলজিস্টকে কনসাল্ট করা যায়।

যখন বিদ্যুৎ ছিল না, রাস্তাঘাট হয়নি, গ্রাম-দেশে তখন জমিদারবাড়িতে নোটিশ দিয়ে ডাকাতি হত। মশাল হাতে আক্রমণ করত ডাকাতের দল, লুট করে নিয়ে যেত ধনদৌলত। আগুন দিয়ে যেত ধানের গোলায়। কত গল্প আছে সেই সব ডাকাতদের নিয়ে। কিন্তু কোথাও বলা নেই, ডাকাতির পাশাপাশি জমিদার মেয়েদের ধর্ষিত হওয়ার কথা। কী করা হত সে ক্ষেত্রে? ত্যাগ করা হত? বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হত? কন্যা হলে খুন করে ফেলা হত? বংশের কলঙ্ককে জিইয়ে রেখেছে কোন বাপ? এইসব গোপন খবর চিরকাল জমিদারবাড়ির পুরু দেয়ালের আড়ালে থেকে গেছে। অপরাধের ওপর আরও অপরাধ বহন করে দাঁড়িয়ে থেকেছে সেই সব অট্টালিকা। আজ সেগুলি হয়তো এক-একটি স্কুলবাড়ি। কি, জবরদখল জনপল্লি।

একদিন রাত্রে রুবি তার স্বামীকে ফিসফিস করে বলে, এই শুনছ?

আর বোধহয় আটক রাখা গেল না।

কী গো?

তুমি। তুমি বোধহয় এবার আমার পেটে এসেছ। বুঝতে পারছি না। কালকে একবার শংকর ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে?

যাব। কাল নয়। শনিবার। আচ্ছা, কালই। যাওয়ার কী দরকার? ওঁকে একটা কল দিই। বাড়িতে এসে দেখুন।

বাড়িতে এলে আবার ডবল ফি। তাই বলছিলাম।

হোক ডবল ফি। ...কী করে বুঝলে?

কী করে আবার? রুবি ওর বুকের ওপর মুখ গুঁজে হাসে, সবাই যে ভাবে বোঝে। এ মাসেও পিরিয়ড হল না।

পিল খাও না? রাহুল বউয়ের চোখের দিকে তাকায়।

কতদিন হল তো ছেড়ে দিয়েছি। তুমি যেন জানো না।

আগের মাসেও হয়নি?

না।

তার আগের মাসে?

হয়েছে।

তো এতদিন চুপ করে রয়েছ? বলোনি কেন?

ভাবছিলাম, এই হবে, এই হবে। আজকে বমি হল।

রাহুল পাশ ফিরে শোয়।

বলে, হবে তো হবে। এ নিয়ে চিন্তার কী আছে? তুমি একটু সাবধানে থেকো। কাল সন্ধেবেলা ডাক্তারকে আসতে বলি। উনি দেখে যদি কনফার্ম করেন তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

কী ব্যবস্থা?

কী আবার? তা হলে একজন গাইনির কাছে নিয়ে যাব। এখন থেকে নিয়মিত চেকআপ করাতে হবে না? কত রকম উপসর্গ হয়। তোমার এই প্রথম। বেশি করে সাবধান হওয়া দরকার।

রুবি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। রাহুল সারারাত ঘুমোল না। নানা রকম চিন্তা ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

মানিকতলায় বিখ্যাত গাইনি সুবীর নন্দীর চেম্বার। তাঁর নিজের নার্সিংহোমও আছে। শংকর ডাক্তার একদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেয়। রাহুল আর রুবি সময়মতো সেখানে উপস্থিত। সল্ট লেক থেকে খুব একটা দূরে নয়।

পরীক্ষা শেষ হলে পর রুবি ফিরে এসে চেয়ারে বসল। কাগজপত্র যা ছিল সঙ্গে, ডাক্তারের টেবিলে রাখল রাহুল। তারপর বলল, কেসটার একটা হিস্ট্রি আছে। আপনার জানা দরকার।

ডাক্তার নন্দী বললেন, আমি সব জানি। ডক্টর চৌধুরী টেলিফোনে সব বলেছেন।

রাহুল: এই প্রেগন্যান্সি টারমিনেট করে দিলে আমি খুশি হব।

রুবি: কী বলছ তুমি? আমাদের প্রথম সন্তান, নষ্ট করবে কেন?

রাহুল: আমাদের কিনা আমি নিশ্চিত নই। একজন তৃতীয় ব্যক্তি মাঝখানে আছে। তুমি জানো রুবি। আমি ডক্টর নন্দীর পরামর্শ চাইছি।

রুবি: কেউ নেই মাঝখানে। ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। আমি যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করেছি। পরিবারের কেউ আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি। তুমি ছিলে না। কী কারণে আমি একটা নিষ্পাপ শিশুর প্রাণ নষ্ট করব? কেন? শুধু তোমার খেয়াল চরিতার্থ করতে?

ডাক্তার নন্দী: আমি নিজেও অ্যাবরশনের পক্ষপাতী নই। আপনাদের প্রথম সন্তান। মেডিকাল রিপোর্টে এমন কিছু নেই যাতে সন্দেহ হতে পারে, এই প্রেগনেন্সির সঙ্গে সেই দুর্ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে। তবু একটা কথা আমাদের জানা দরকার। মেয়েদের শরীরের গঠন যে রকম, তাতে অজ্ঞানে, অনিচ্ছায়, অপ্রস্তুত অবস্থায় পেটে বাচ্চা এসে যায়। যে-কারণে মেয়েরাই রেপড হয়। পুরুষরা হয় না। যে-কারণে মেয়েরাই বেশ্যাবৃত্তিতে আসে। পুরুষরা আসে না। মেয়েদের সেক্স অর্গান একটা রিসেপটেকল মাত্র। কখনও অর্গাজম হয়নি, অথচ একাধিক সন্তানের মা, এমন অনেক মহিলাকে

দেখেছি আমি। প্রকৃতির এই ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের প্রতিবাদ করা বৃথা।

রুবি: আমি নির্দোষ। আমার ওপর জোর করা হলে ও-বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

রাহুল: জোর করার প্রশ্নই উঠছে না। কেন তুমি উত্তেজিত হচ্ছ অকারণ?

ডাক্তার নন্দী: লোকে তো অনাথাশ্রম থেকে এনেও বাচ্চা পালন করে। নিজের সন্তানের সঙ্গে পার্থক্য করে না। মিস্টার সরকার, আপনি সন্দেহ পুষে রাখবেন না। আসল কথা হল, বেবির হেলথ। তার মায়ের হেলথ। মিসেস সরকারের ওপর দিয়ে যে ঝড় গেছে, তারপর যে উনি নার্ভ ঠিক রাখতে পেরেছেন, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। দেখি না, বাচ্চা কী রকম ভাবে বাড়ে। এখন তো সবে ন'সপ্তাহ।

মুখ ভার করে বাড়ি ফিরল দু'জন। ট্যাক্সিতে রুবি একটাও কথা বলেনি। রাহুল হঠাৎ গর্ভপাতের প্রস্তাব দেবে, ও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। কী নির্দয় ও! এতদিন ধরে মনে মনে ভেবে রেখেছে, রুবি ব্যভিচারিণী। সে কি ডাকাতদের ডেকে এনেছিল? ডাকাতের সঙ্গে প্রেম করেছে? সে-দিন ওই বিপদের মধ্যে কেউ যখন ওর পাশে ছিল না, তখন রুবি ছুটে গিয়ে স্নান করে আসতে তো ভোলেনি। বার বার বমি করেছে। বার বার স্নান করেছে। শরীর থেকে কলঙ্ক ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়েছে। এই তার প্রতিদান?

জিনস-পরা ফরসা রোগা লোকটা বলেছিল, মাখনের মতন নরম তোমার গা, একটু আদর করি না, এসো। ধুয়ে মেজে পরিষ্কাব করে রেখেছ, তুমি কি জানতে, আমি আসব? কতদিন আমি এমন বডি দেখি না। ঘেন্নায় রুবি ওর মুখে থুতু দিয়েছে। কিন্তু গায়ের জোরে ওর সঙ্গে পেরে ওঠেনি। ওর হাত দুটো বালিশের ওপর চেপে ধরে লোকটা বলাৎকার করতে চেয়েছে। রুবি পা ছুড়ে প্রতিবাদ করেছে। চিৎকার করেছে, কিন্তু মুখে ওর কাপড় ঢোকানো ছিল, গলার স্বর বেরোয়নি। রাহুলকে যদি কেউ ও বকম নির্যাতন করত, ও বাঁচত না। দম বন্ধ হয়ে মরে যেত।

এক মুহূর্তের জন্যে কি নিস্পন্দ হয়েছিল? যতই ভাবে এ-কথা, বুক থেকে কান্না ঠেলে ওঠে। না, না। শুয়ে শুয়ে কেবল বালিশ ভেজায় রুবি। না, না! একদিন শ্বশুরকে ও মনেব কথা বলল।

রণবীব বললেন, মন খারাপ কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে কারুরই মাথার ঠিক নেই। নীচ, স্বার্থপর ছেলে রাহুল নয়। ওর সংস্কারে আঘাত লেগেছে। আত্মধিক্কারের জ্বালায় সে-ও মরমে মরে আছে। আমারও লজ্জার শেষ নেই। সে-দিন বন্দুকের গুলিতে আমি মরে গেলেই ভাল হত।

বাড়ি ছেড়ে চলে যাব বলেছিল রুবি।

রাহুল বলেছিল, কোথায় যাবে?

বাপের বাড়ি। সেখানেও যদি আমার জায়গা না হয়, তো রেডলাইট এরিয়ায় গিয়ে ঘর নেব। ভদ্র সমাজের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। তোমরা চাও তাই।

এরই মধ্যে একদিন মুচিপাড়া থানা থেকে টেলিফোন আসে।

বণবীর টেলিফোন ধরলেন।

মিস্টার রণবীর সরকার?

হ্যাঁ।

আপনার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে?

হ্যাঁ। সে তো অনেকদিন আগে। দু'মাস-আড়াইমাস হয়ে গেছে। আপনারা কালপ্রিটদের ধরতে পারলেন না। আপনাদের নাকের ওপর দিয়ে ওরা যা খুশি করে যাচ্ছে। নিরপরাধ নাগরিকদের অত্যাচার করছে, অথচ পুলিশের কোনও কনসার্ন নেই। আপনারা কী রকম কাজ করেন, অ্যাঁ?

আচ্ছা শুনুন।

ওপারের টেলিফোন যা বলল, তার মর্মার্থ: গতকাল মধ্যরাত্রে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের নিষিদ্ধ পল্লিতে হানা দিয়ে ওরা দু'জন সমাজ বিরোধীকে ধরেছে। তাদের চেহারার সঙ্গে সল্ট লেকের ঘটনায় জড়িত ডাকাতদের চেহারার মিল আছে মনে হয়। মিষ্টার সরকার আর তাঁর পরিবারের যে-মহিলা আহত হয়েছিলেন, এই দু'জন মুচিপাড়া থানায় এসে যদি সমাজ বিরোধীদের শনাক্ত করেন, তবে তাঁদের কেসটা নিয়ে এগোনো যায়। পুলিশ এ-ব্যাপারে সব রকম সহায়তা করতে প্রস্তুত।

রণবীর বললেন, 'আমি যাব। বউমা যাবে না। আমি একাই গিয়ে আইডেন্টিফাই করতে পারব। আশা করি, পারব। তবে এতদিন পর ওদের চেহারা আমার ঠিক মনে নেই। হারানো জিনিস কিছু উদ্ধার হয়েছে?'

কী হারিয়েছিল?

দু'খানা ছবি। একটা মা কালীর ছবি। অন্যটা আমার স্ত্রীর। দুটোই সোনা দিয়ে বাঁধানো। পালাবার সময় দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে গেছে।

আগে চিনুন, তারপর সেগুলোও খুঁজে বার করব আমরা। যদি এখনও রেখে থাকে।

রণবীর গিয়েছিলেন। কিন্তু চিনতে পারেননি। ওরা চিনেছে।

হঠাৎ ওদের একজন বলে ওঠে, এই যে, মুখে শ্বেতীর দাগ, তোমার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তুমি বেঁচে আছ এখনও? সে-দিন গুলি ছুড়লাম, মরোনি?

তারপর কিছু খিস্তিখেউড় করতে শুরু করে। পুলিশের প্রহার খেয়ে চুপ করে যায়। প্রহার আগেও খেয়েছে। দু'জনেরই চোখ-মুখ ফোলা দেখে এসেছেন রণবীর। একেবারে ছোটলোক। কী বিচ্ছিরি মুখের ভাষা।

রুবি জিজ্ঞেস করে, কোথা থেকে ধরেছে ওদের?

ওই যে বলল, নিষিদ্ধ পল্লি। ওই দিকেই তো যত বেশ্যাপাড়া। মাঝরাত্তিরে হানা দিয়ে ধরে এনেছে দু'জনকে। আমার জিনিস বেচে সেই টাকায় ফুর্তি করতে গেছিল, বুঝলে না? কমসেকম পাঁচ ভরি সোনা তো ছিল! পনেরো-কুড়ি হাজার টাকা। ওদের কাছে ছবির কোনও দাম নেই।

ওদের কাছে শরীরেরও কোনও দাম নেই। কীসের দাম আছে তা হলে? ভাবতে গিয়ে রুবির পেটের মধ্যে কিছু একটা নড়ে উঠল, টের পায়।

সেই দিনই সন্ধেবেলা রাহুল আপিস থেকে ফিরলে পর রুবি বলল, এই শোনো, একবার ডক্টর নন্দীকে ফোন করবে?

কেন? কী হল আবার? শরীর খারাপ নাকি?

না। ওঁকে বলতে হবে যে, আমি রাজি। উনি একটা ডেট ঠিক করে দিন। আমি অ্যাবরশন করাব।

এই খবর একে একে সবাই জানল। উদ্বিগ্ন পৃথিবী এই খবরে নিশ্চিন্ত হয়।

ঠিকে ঝি মহামায়া সেই দিন থেকে আর কথা বলেনি। এতদিন পর যেন মুখের তালা খুলল ওর। বলল, বউদি, এই ঠিক হয়েছে। গাছ থাকলে আবার ফল হবে।

১৯৯২

❀ দুরন্ত দুপুর

আজ নিয়ে তৃতীয়বার ধরা পড়ল পুলক।

স্বাহার হাতে দু'খানা প্লাস্টিকের প্যাকেট। একটা কালো চামড়ার হাতব্যাগ। কালো রঙের ব্লাউজ জায়গায় জায়গায় ঘামে ভেজা। চোখের চশমা ঈষৎ খ্যাঁদা নাকের উপর ঝুলে পড়েছে।

"কতবার বললেন, আসবেন, কই এলেন না তো পুলকদা।"

"রোজই ভাবি যাব যাব, নানা ঝঞ্ঝাটে আর হয়ে ওঠে না। বিশ্বাস করো।" পুলক তার টাইয়ের বাঁধন ঠিক করতে করতে বলে।

আপিসে এক ঘণ্টা জলখাবারের বিরতি। বাবুদের গা গরম হতে হতে আরও আধ ঘণ্টা। নূপুরের দেওয়া দু'জোড়া স্যান্ডউইচ আর আপিসের দেওয়া এক কাপ চা খেতে দশ মিনিটও লাগে না। বাবুরা কাগজ পড়ে, আড্ডা মারে, ক্যারম খেলে এই অবসরে। পুলক কাচের ঘরের অধিবাসী বলে তার সে সুযোগ নেই। সে একলা। প্রথম প্রথম ও এই সময়টাতেও কাজ করত। জটিল ফাইল ঘেঁটে নোট নিয়ে রাখত, যাতে স্টেনোগ্রাফারের সময় নষ্ট না হয়। কাজের চাপ যখন তাতেও কমল না, বরং বাড়তে

লাগল, তখন ঠিক করল, এই সময়টাতে ও আপিসেই থাকবে না। ওপরওলা লাঞ্চ খেতে বেরিয়ে যায়, সে-ও যাবে।

কিন্তু যাবেটা কোথায়? আগের আপিসের কাছাকাছি কফি হাউস ছিল। অল্প খরচে সময় কাটাবার মতো সুন্দর জায়গা। চৌরঙ্গী অঞ্চলে উপভোগের ব্যবস্থাই বেশি, বিশ্রাম করার যায়গা কই! তা ছাড়া, সবকিছুই বেশ আক্রা। তবে আজকাল উঁচু বাড়িগুলোর মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর বিপণি হয়েছে। ঘুরে ঘুরে তাই দেখে বেড়ায় পুলক। একটু হাঁটাও হয় তাতে। গায়ে রোদ লাগে না।

"এখুনি চলুন।"

"আরে! অদ্ভুত ছেলেমানুষ তো! আপিসে ফিরতে হবে না? এখন কি বেড়াতে যাওয়ার সময়?" পুলক ঘড়ি উলটে দেখে, দেড়টা।

"ফ্রায়েড রাইস দিয়ে চিংড়ি মাছ খাওয়াব। সকালেই রেঁধেছি—। আসুন না বাবা। কতটুকু পথ।" মেয়েটা একেবারে নাছোড়।

এমন করে বলল স্বাহা যে, পুলক আর 'না' করতে পারল না। আসলে, সামনের এক ঘণ্টা সময় ওরও তো কিছু করার নেই।

"কোথায় যেন—"

"মিড্‌লটন স্ট্রিট। এই তো পিছনে। পাঁচ মিনিটের পথ।"

যেতে যেতে পুলক বলে, "ভাতটাত আমি খাব না কিন্তু। তোমাকে কম্পানি দেব ডাইনিং টেবিলে, কেমন? তোমার বর কখন ফেরে?"

"ছ'টা, সাড়ে ছ'টা। বেলঘরিয়া থেকে আসতেই ঘণ্টা কাবার হয়ে যায়। মোটরগাড়ি বলে জ্যাম থেকে তো বেহাই নেই।"

স্বাহা কথা বলছে। তাব পাশে চুপ করে হেঁটে যাচ্ছে পুলক।

ক্যামাক স্ট্রিট দিয়ে একটু হেঁটে ওরা ডান দিকে বাঁক নিল।

পুলক জিজ্ঞেস করল, "সূর্য এখন কোথায়?"

"দিল্লিতেই। হোমরাচোমরা আমলা এখন। লোদি রোডে বড়দার বিশাল বাংলো। কী একখানা লন বাড়ির সামনে। গত বছরে গেছিলাম, দেখে এলাম।"

এই সূর্য একদিন ছোট বোনের হৃদয়ঘটিত সমস্যা নিয়ে ওর কাছে এসেছিল সাহায্য চাইতে, মনে পড়ে পুলকের। তখন গর্ভপাত এত সহজসাধ্য ছিল না। সে-সব কতদিনের কথা। কিছুই লেগে থাকে না জীবনে। মানুষ সব ভুলে যায়।

"বড়দাকে মনে আছে আপনার? ওঃ, এখন দেখলে চিনতেই পারবেন না। কী রাশভারী চেহারা! চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা যায় না।"

লিফট দিয়ে ওরা ওপরে উঠল। হাতব্যাগ থেকে চাবির গোছা বার করে দরজা খুলল স্বাহা, আলো জ্বালল। পুলক তাকিয়ে দেখল, বাঃ, সুন্দর ছিমছাম সাজানো ফ্ল্যাট। সোফা, কার্পেট, পরদা, রং-করা দেয়াল—সবকিছুই এই পাড়ার মান অনুযায়ী, ঠিকঠাক। কোণের দিকে একটু দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে একজন বয়স্কা মহিলা ঢুলছে।

"খাবার দিয়ে দাও মাসি। আর, এক কাপ কফি করে দেবে।" স্বাহা বলল, "অদ্ভুত এই পাড়াটা। মনে হয় না, কলকাতায় আছি।"

স্বাহাই অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল।

বাথরুম থেকে বলল, "প্রতিবেশীরা অদ্ভুত। এমন অচেনা মুখ করে তাকায়। এমন সাবধানে দরজা খোলে আর দরজা বন্ধ করে যে মনে হয়, ফ্ল্যাটের মধ্যে কোনও লুকোনো কারবার আছে। বা, বহুমূল্য কিছু আগলাচ্ছে বুক দিয়ে। না, না, সবাই অবাঙালি নয়।"

শাড়ি উড়িয়ে চলে গেল শোওয়ার ঘরের দিকে। লোহার আলমারি খোলার শব্দ হল। কাঠের চেয়ার টানার শব্দ হল। ওখান থেকেই স্বাহা বলল, "কোম্পানির ফ্ল্যাট, কোম্পানির আসবাব। আমার কেমন গা ছমছম করে। মনে হয়, যে-কোনও সময় দূর করে দিলে আমাদের রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।"

ছাড়া ছাড়া কথা কিন্তু তার মধ্যে অনেক দিনের ভাবনা আছে, বোঝা যায়।

খাওয়ার টেবিলে বসে বলল, "নজর দেবেন না পুলকদা। আমি একটু খেতে ভালবাসি। খাওয়াতেও

ভালবাসি। অনেকে খাওয়া ব্যাপারটাকে নিচু কাজ মনে করে, আমি মনে করি না।"

পুলক এতক্ষণে অস্বস্তি কাটিয়ে উঠেছে। একটু হেসে বলল, "নিচু কাজ কী? খাওয়ার জন্যই তো প্রাণান্তকর পরিশ্রম। আগে অন্ন চিন্তা, পরে অন্য চিন্তা।"

"আমার বর কী বলে জানেন?"

"কী?"

"বোরডম থেকে মানুষ বেশি খায়, বার বার খায়। আর বেশি খেলেই মানুষ মোটা হয়।"

"তুমি তো এমন কিছু মোটা নও। তোমার ফিগার তো বেশ ভালই আছে।" আশ্বাস দেয় পুলক।

"আরও ভাল ছিল। আপনাকে দেখাব।"

পুলক মন দিয়ে ওর খাওয়া দেখছিল। এমন কিছু দৃষ্টিকটু নয় সে-দৃশ্য। একসঙ্গে অনেকখানি ভাত বা তরকারি প্লেটে নেয়নি। চামচে করে বারে বারে নিচ্ছিল। আস্তে আস্তে স্বাহার মুখখানা কেমন তৃপ্তিতে ভরে উঠল, দেখে ভাল লাগল পুলকের। ওর নিজের বাড়িতে দৃশ্যটা উলটো রকম। নূপুর দায়সারা করে রাঁধে। না খেলে চলে না বলে খায়। ওদের একমাত্র ছেলে স্কুলের ছাত্র, সে আলুভাতে-ভাত কিংবা শুধু ডাল-ভাত, ডিমসেদ্ধ খেয়ে স্কুলে যায়। ফিরে এসে খানিকটা চিঁড়ের মণ্ড পেলেই সে সন্তুষ্ট।

"তোমাদের ছেলেপুলে নেই?" একসময় জানতে চায় পুলক।

"আছে। কার্শিয়াঙে পড়ে। অনেক টাকা খরচ। রোজগার তো একজনের।"

বলব বলব ভাবছিল, এবার সুযোগ পেয়ে পুলক বলল, "তুমি একটা কিছু কাজ করলেই তো পারো। আজকাল মেয়েদের কত রকম ওপনিং হয়েছে। রোজগার হয়, সময়ও কাটে।"

"ও দেবে না। ও বলে, উপার্জনের জায়গায় টেনশন থাকবেই। তুমি সে-টেনশন সহ্য করতে পারবে না। আচ্ছা, বলুন তো, এ-কথার কোনও মানে হয়? কত লোক দুটো-তিনটে হার্ট অ্যাটাক নিয়ে কাজ করছে। আর আমি একটু ইসকিমিয়ায় মরে যাব?"

"ও বাবা! তোমার ইসকিমিয়া আছে?" পুলক চেষ্টা করে হাসে, "ও তো খুব বড়লোক বউদের হয় বলে শুনেছি। তা হলে, তারা যা করে, তুমিও তাই করো না কেন?"

"কী?"

"সমাজসেবা।"

"সর্বনাশ! ও-কথা বলবেন না পুলকদা। একবার গিয়ে দেখে এসেছি। রোগা হাড় জিবজিরে মানুষগুলো শুয়ে আছে, ফ্যাকাশে হলদে মুখ। আর বিছানার পাশে টুলে বসে ঢাকাই শাড়িপরা মহিলারা চামচে করে ভাত খাইয়ে দিচ্ছে। ওঃ, সে যে কী বীভৎস দৃশ্য! তার চেয়ে এই ঢের ভাল। আছি বেশ। চান করে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে যাই, সারা সকাল নিউ মার্কেট, পার্ক স্ট্রিট, ময়দানের প্রদর্শনী, কোথায় সেল দিচ্ছে—টং টং করে ঘুরে বেড়াই। খাই। বিকেল অবধি ঘুমোই। সন্ধেবেলা ও কারখানা থেকে ফিরলেই বোরডম সেরে যায়। আসুন, এ-ঘরে আসুন পুলকদা। বলছিলাম, আপনাকে দেখাব—"

পুলক ইতস্তত করে।

"এবার আমি উঠি।"

"আর একটু থাকুন না বাবা। খাওয়ার পর একটু শুতে না পারলে আমার পিঠ ব্যথা করে। টাইটা খুলুন তো। এই নিন, শার্টটা এই হ্যাঙারে টাঙিয়ে দিন। জুতো থেকে বন্দি পা দুটোকে মুক্তি দিন। এবার আরাম করে বিছানায় বসুন। বালিশে ঠেস দিন। এই তো।"

এবার মজা লেগে গেছে পুলকের। আচ্ছা পাগলি মেয়েটা। বড়দার বন্ধু হলেও পুলক তো ওর বড়দা নয়। পুরুষমানুষ। জ্যান্ত একটা পুরুষকে কেউ এভাবে বিছানায় ডাকে? বিছানায় বসায়?

"আপনাকে আমাদের অ্যালবাম দেখাব।"

বুকের নীচে বালিশ রেখে উপুড় হয়ে শুল স্বাহা। তারপর বিশাল অ্যালবাম খুলে একটার পর একটা ছবি দেখাতে লাগল। এই দেখুন, বারো বছর আগে আমি এই রকম রোগা ছিলাম। এইটে বিয়ের পর হনিমুনে—আমি আর পবিত্র। পুরীতে তোলা। এই তো, আমরা দু'জন আর বুকুন। ওর দেড় বছর বয়স। কী মোটা ছিল! এইটা, আপনি চিনবেন, খাজুরাহো। এই দুটো কোনারক। কী ইরোটিক!"

পাতা ওলটাতে গিয়ে বার বার ওর মাথা নড়ছিল। চুল দুলছিল। নাকের ওপর ঝুলে পড়ছিল চশমা।

পুলক অন্যমনস্ক হয়ে দেখছিল, ওর নাগালের মধ্যেই একখানা হাত; কাঁধ থেকে আঙুল পর্যন্ত, ফরসা মসৃণ, একটু মোটা কিন্তু সুন্দর। স্বাভাবিক। ঠোঁটে রং নেই, নখে রং নেই। আটপৌরে একখানা যুবতীর হাত। পরিচ্ছন্ন, কনুইয়ের জায়গাটা নিষ্কলুষ।

ছবির পর ছবি। সাদা-কালো, রঙিন। ছোট-বড়, হরেক রকম।

দেখতে দেখতে আচমকা পুলক বলল, "তুমি পারফিউম ব্যবহার করো না, স্বাহা?"

"খুব কম।"

"আশ্চর্য!"

"পারফিউম দিয়ে কিছু ঢাকার দরকার নেই আমার। কাউকে কাছে টানবারও দরকার নেই।"

পুলক বলল, "নূপুরকে আমি কী দেখে পছন্দ করেছিলাম জানো? কনুই আর গোড়ালি দেখে। পরিচ্ছন্নতার টানও কিছু কম নয়।"

"ধোপার বাড়ি থেকে আসা কাপড়ের গন্ধের মতো। তাই না?"

পুলক লক্ষ করে, ওর কানের মাকড়িতে বসে একটা মাছি দোল খাচ্ছে। একসময় চশমাটা চোখ থেকে খুলে বিছানায় রাখল স্বাহা। হঠাৎ অ্যালবামটা বন্ধ করে দিল।

"পবিত্রকে আমি ভালবাসি," বলতে গিয়েও বলল না স্বাহা। কেন বলল না? এখনও কি ওর প্রথম প্রেমের ঘা শুকোয়নি? কিছুই বুঝতে পারে না পুলক।

পুলক ওর মাথায় বাঁ হাতখানা রাখল। মনের মধ্যে একটু আবেগ তৈরি হয়েছে, মনে হল। আঙুল দিয়ে ওর চুলে বিলি কাটতে লাগল। কারুর মুখেই তখন কথা নেই। বেশ লাগছে। এক বিছানায় দু'জন সম্পর্কহীন নারী-পুরুষ। একজন বুকে বালিশ গুঁজে উপুড় হয়ে শোয়া। তার দু'খানা স্বচ্ছ হাত, বুকের খানিকটা, অনেকটা পিঠ আর পায়ের কাপড় খানিক সরে যাওয়ার ফলে জঙ্ঘা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত দু'খানা শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন পা দেখা যাচ্ছে। অন্যজন—তার গেঞ্জির ভেতর থেকে বুকের চুল ও স্বাস্থ্য নিয়ে অপেক্ষা করছে যেন। ফুঁ না দিলে সে নিববে না, এই রকম ভাবটা।

"আমার না, সংসারের জন্য অনেক কিছু করতে ইচ্ছে করে। ও কিছু করতে দেবে না। মাঝে মধ্যে রান্না কবি, তা-ও ওর পছন্দ নয়। বুকুন কাছে থাকলে ভাবনা ছিল না। কিন্তু ওর ভবিষ্যৎ তো ভাবতে হবে! আচ্ছা, বলুন তো পুলকদা—আপনি ভাবছেন, আমি—" ঘোরের মধ্য থেকে স্বাহা যেন কথাগুলো বলল।

"তুমি একটা পাগলি।"

কেউ ফুঁ দেয়নি। এই সময় দরজায় বেল বাজল। পর পর তিনবার।

"ডাক পিয়োন। এতবার বেল দেওয়ার কী হয়েছে? কতবার বলেছি, অকারণ বিরক্ত করবে না—" বেজার মুখে উঠে বসে স্বাহা। একটা নেশা জমতে-না-জমতে কেটে গেল যেন।

রান্নাঘরের বাইরে চাদর পেতে মাসি ঘুমোচ্ছে। স্বাহা নিজেই এসে দরজা খুলল।

"আরে ছোড়দা! হঠাৎ কোথা থেকে? তোমার যা কাণ্ড না—"

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন লোক, গায়ে একটা জহরকোট, হাতে ঝোলানো খাকি রঙের ব্যাগ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল—ভেতরে ঢুকল কথা বলতে বলতে। খাট থেকে ঝুঁকে দেখল পুলক, কিন্তু জায়গা থেকে নড়ল না।

"দারুণ খিদে পেয়েছে। কী আছে শিগ্‌গির বেড়ে দে। সেই সকাল পাঁচটায় বেরিয়েছি। আবার চারটের সময় মিটিং।"

লোকটা গড়গড় করে কথা বলেই যাচ্ছে। প্রায় চেঁচাচ্ছে। বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যেস আছে বলে মনে হল পুলকের।

বাড়িটা চনমন করে ওঠে হঠাৎ।

"মাঝপথে একখানা লরি দেখি উলটে পড়ে আছে। ওভারলোড। কিংবা ড্রাইভার ব্যাটা চুর ছিল। না, না, সে মরেনি। ঠিক সময়ে লাফিয়ে পালিয়েছে। জাতে মাতাল এইসব ট্রাক ড্রাইভার, বুঝলি, কিন্তু তালে ঠিক।"

রান্নাঘর থেকে স্বাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "তুমি চান করে নাও ছোড়দা। আমি তোমার ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি বড় গ্যাসে। চিংড়ি মাছ একটু টেস্ট করবে তো বলো—"

ছোড়দা নামের লোকটা এদিকে আসছে মনে হয়। আসতে আসতে বলল, "আমার সঙ্গে ইয়ারকি হচ্ছে, না?"

"তোয়ালে বার করে দেব?"

"না না। দরকার নেই। ভাতে একটু ঘি দিবি। আছে তো?"

ওপাশে বাসনপত্র নাড়ানাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাসির গলা শুনে বোঝা গেল, সে বেচারি এই হল্লার চোটে উঠে পড়েছে। পুলক উঠে দাঁড়াবার কথা চিন্তা করে। স্বাহা এখন এদিকে আসতে পারছে না যে-কোনও কারণেই হোক।

লোকটা ঘরে ঢুকেই পুলককে দেখে চমকে যায়।

"আরে! এ-আবার কে? স্যান্ডো গেঞ্জি পরে বিছানায় ঠেস দিয়ে বসে আছে। কলির কেষ্ট নাকি?"

প্রথমটা পুলক একটু ভড়কে যায়। বলে, "আমি ওর দাদার বন্ধু।"

"দাদার বন্ধু। তা নির্জন ফ্ল্যাটে, ভর দুপুরবেলা এসে একেবারে বিছানায় উঠে বসেছ? মতলবটা কী?"

"আমি নিজে থেকে আসিনি।"

"তা কেন আসবে? তোমাকে ও গলায় চেন বেঁধে টেনে এনেছে, তাই না? দেখে তো ভদ্দরলোকের মতোই মনে হচ্ছে। সরল মেয়েটাকে ফোসলাচ্ছিলে?

"মুখ সামলে কথা বলুন।"

"মুখ আবার কী সামলাব? পুরুষমানুষের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দাদার বন্ধু সেজে ঘরে ঢুকে পড়েছ, তোমাকে পুলিশে দেব লম্পট কোথাকার!"

"আবার বলছি, আপনি যে-ই হোন, মুখ সামলে কথা বলুন। নইলে—"

"চোপ। বেরিয়ে যাও এখান থেকে। বেরিয়ে যাও বলছি। এক্ষুনি বেরোও। আমাকে চেনো না তুমি।"

অদ্ভুত অসভ্য লোকটা গায়ের জহরকোট খুলে বিছানায় ছুড়ে দেয়।

রান্নাঘর থেকে কিছু একটা ভাজার গন্ধ আসছে। স্বাহার গলার স্বরও শোনা যাচ্ছে। অথচ ও এ-ঘরে আসছে না কেন? পুলকের রাগ হয় ভীষণ। অপমানে জ্বলতে থাকে ভেতরটা। ঘড়িতে সময় দেখে, তিনটে। ইস! খুব দেরি হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে হ্যাঙার থেকে জামাটা পাড়ল পুলক। আস্তে আস্তে টাই পরল। মোজা-পরা পাদুটো গলিয়ে দিল জুতোর মধ্যে। খুব জব্দ হয়েছে আজ। ততক্ষণে লোকটা বাথরুমে ঢুকে গেছে।

যেতে যেতে রান্নাঘবের সামনে দাঁড়ায় একবার, দেখে, খুন্তি নেড়ে কী যেন রাঁধছে স্বাহা, পুলক জিজ্ঞেস করে—"কে ও?"

"ছোড়দা, আমার ছোড়দা।"

"তোমার ভাই? নিজের ভাই?"

"না, না, আমরা এক পাড়ায় থাকতাম। পবিত্রর চেনা। কোলিয়ারি না কোথায় গ্রাম-অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন করে। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতে হয়।"

"এমন ভাব দেখাল, যেন মায়ের পেটের ভাই। অন্য কোথাও হলে—"

"ওই ওর ধরন পুলকদা," হাসতে হাসতে স্বাহা বলে, "এসেই হইচই বাধিয়ে দেয়। দু'মিনিটের মধ্যে বাড়িটা অধিকার করে নেয়।"

"তুমি সহ্য করো কী করে? একটা ছোটলোক।"

"সবাই-কি এক রকম হয়? তবে ও কোনও ক্ষতি করে না আমার।"

"যখন-তখন হামলা করা কি ক্ষতি করা নয়?"

"ব্যাপারটা তা নয়।"

"ব্যাপারটা কী তা হলে?

"আমার বাথরুমে ও চান করবে। আমার সাবান মাখবে। আমার তোয়ালে দিয়ে গা মুছবে। আমার হাতের নিরামিষ রান্না খাবে গরম গরম। তারপর চলে যাবে। ওই ওর পারভার্শন।" স্বাহা বলল।

পুলক একটু অবাক হয় এবার। ওর ইচ্ছে হয় স্বাহাকে একটু আঘাত করতে।

বলে, "তোমার প্রশ্রয় আছে তার মানে।"

"তা খানিকটা আছে বই কী। অস্বীকার করলে মিথ্যে বলা হবে। ছোড়দা আমার মন খারাপের ওষুধ। দেখছেন না, কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ও চলে গেলেও মনটা যে ভাল হয়ে যায়, অনেকদিন তার রেশ থাকে। মনে মনে ভাবি, আবার কবে আসবে। কবে এসে উৎপাত করবে এই রকম অবুঝের মতো।"

বুঝেও বোঝে না পুলক। অপমানটা ওকে জ্বালাচ্ছে। অথচ তেমন জোরালো একটা কথা আর খুঁজে পাচ্ছে না।

হঠাৎ কী মনে হতে ও বলল, "একবার ও-ঘরে গেলে পারতে তুমি। আমি তো ওকে চিনি না। খামোকা আমাকে অকথ্য ভাষায় অপমান করল। আমাকে সইতে হল।"

"কেন সহ্য করলেন আপনি পুলকদা? ছি-ছি!" স্বাহার গলার স্বর এবার একটু তীক্ষ্ণ শোনাল যেন, "আপনিও ওকে অকথ্য ভাষায় অপমান করতে পারতেন। আপনাদের মধ্যে হাতাহাতি হলেও আমি কিছু মনে করতাম না। দু'জন পুরুষের মধ্যেকার হিংসের লড়াই, আমি তার মধ্যে ঢুকি কী করে?"

তা তো বটেই। তুমি তফাতে থেকে মজা দেখবে। কথাটা মনে হয় পুলকের। বলে না।

তিনটে বেজে গেছে। পুলক নব ঘুরিয়ে দরজা খোলে আস্তে আস্তে। তারপর বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেয়।

পেছন থেকে শোনে, স্বাহা বলছে, "আবার আসবেন পুলকদা। এখন তো বাড়িটা চিনে গেলেন।"

আর কোনওদিন আসবে না সে! পুলক সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবল। আবার ভাবল, এখনই মনস্থির করে ফেলার কী দরকার? দেখাই যাক না।

১৯৮৯

ইচ্ছাপুরম

কথায় কথায় ফিগারের কথা উঠল।

রাজা রাও বলে, 'আপনার ফিগার কিন্তু বয়সের তুলনায় অত্যন্ত ভাল আছে। রাখতে হয়।'

রূপা একবার অলকার দিকে তাকায়। তারপর সমুদ্রের দিকে।

সেই একই সমুদ্র। দিঘা আর পুরীতে গিয়ে বহুবার যা প্রত্যক্ষ করেছে—সেই বঙ্গোপসাগর। কিন্তু এখানে সমুদ্রের হু-হু দীর্ঘশ্বাসটা কম, তার বদলে সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউ তীরবর্তী কালো পাহাড়খণ্ডের উপর আছড়ে পড়ার একটা অন্য শব্দ আছে। এরা এগুলোকে বলে বোলডার। এত সুন্দর পরিচ্ছন্ন বিচ ওয়ালটেয়ারে, অথচ স্নান করার উপায় নেই। ঘোড়েল বিদেশি পর্যটক কি স্থানীয় লোক কেউ কেউ ঝুঁকি নেয় না তা নয়, তবে আনাড়ি বাঙালি নাইয়ে-বাবু ও বিবিদের পক্ষে ওয়ালটেয়ারে সে-গুড়ে বালি। পাহাড়কাটা পাথর, তার পরেই সমুদ্র। বলতে গেলে, সমুদ্রের উপর থেকেই পূর্বঘাট পর্বতশিরার এই অংশ উঠে গেছে সটান। পাহাড় কেটেই এই শহরের রাস্তাঘাট, পাহাড় কেটেই তৈরি হয়েছে বিশাল বিশাখাপত্তম বন্দর। ওই দূরে, যেখানে সমুদ্রের উপর অথচ অনেক উঁচুতে টিমটিম করে এক রহস্যময় লাইটহাউস, এরা আদর করে নাম দিয়েছে 'ডলফিনস নোজ' বা শুশুকের নাক—আসলে একটি অন্তরীপ। ওদিকে নাকি গ্রাম আছে। পাহাড় ডিঙিয়ে সে গ্রামের লোক বন্দরে কাজ করতে আসে রোজ।

স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে পুরীতেই এসেছিল রূপা। দু'মাসের লম্বা ছুটি সমুদ্র দেখেই কাটিয়ে দেবে, এই ছিল ওদের মতলব। কলকাতার হট্টগোল থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম। এক সপ্তাহ কাটতে-না-কাটতে পুরী অসহ্য হয়ে উঠল। প্রতিদিন পিলপিল করে লোক আসে—মেয়ে-পুরুষ, বুড়ো-বুড়ি, অ্যাভাবাচ্চা—আর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই মাত্র এক কিলোমিটার লম্বা বিচের গায়ে। আজকাল আবার বিকেল হতে-না-হতে

পথের ধারে বসে যায় হাজার রকম খাবারের দোকান। হ্যাজাক জ্বলে রাত অবধি। কুচোকাচার জ্বালায় আর রিকশার উৎপাতে বিরক্ত হয়ে ওরা বেরোনোই বন্ধ করে দিয়েছিল। হোটেলের বারান্দায় বসে বসে ওবা হ্যাংলা মানুষদের ছুটোপুটি দেখত আর শুনত সমুদ্রের নির্জনতা-হারানো হাহুতাশ।

একদিন রূপা বলল, 'চলো, আমরা অন্য কোনও হোটেলে উঠে যাই। এই জায়গাটা বড় ঘিঞ্জি।'

পার্থ বলে, 'ওদিকটায় আরও ভিড়। যত হলিডে হোম, সব ওই দিকে। তা ছাড়া মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা। ট্যুরিস্ট বেড়েছে কিন্তু জায়গাটার উন্নতি হয়নি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

"তা হলে কেটে পড়ি, চলো।"

"কলকাতায়?'

'অগত্যা—। কালীকে আবার ছুটি দিয়ে এলাম।' রূপা গজগজ করতে থাকে, বাড়িতে বসে থাকলে সারাদিন তুমি খিটখিট করবে। এ-ছুটির কোনও মানে হয়? আমারও তো বোরডম থেকে মুক্তি দরকার।'

স্ত্রীকে বোঝার চেষ্টা করে পার্থ। বিয়ের ষোলো বছর পর সকলেরই এই হাল হয় কিনা, ও জানে না। যারা কাচ্চাবাচ্চা, বুড়োবুড়ি নিয়ে তিতিবিরক্ত, তারা অন্তত বোরডম থেকে মুক্ত। নিজেরা ঝাড়া হাত-পা থাকবে, যেমন খুশি ঘুরে বেড়াবে, এই ছিল ওদের বাসনা। টাকাপয়সাব তেমন কিছু অভাব নেই। কোনও পিছুটান নেই। তা হলে? এ-উৎপাত এল কোত্থেকে? বোরডম?

হোটেলেব ম্যানেজার সব শুনে বলেছিল, 'ওয়ালটেয়ার চলে যান।'

'ওয়ালটেয়ার? সে কী রকম জায়গা?'

'তা জানি না। এখান থেকে অনেকে যায়।'

নামটা শুনতে সুন্দর। বিদেশ-বিদেশ গন্ধ আছে। কিন্তু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পবিচিত কেউ কখনও ওয়ালটেয়ার বেড়াতে গেছে বলে রূপা শোনেনি। পার্থ ম্যাপ নিয়ে বসে। জায়গাটা খুঁজে বার কবতে চেষ্টা করে। না, ওড়িশায় নয়, আরও নীচে, অন্ধ্রপ্রদেশে বোধহয়।

'সমুদ্র? না হিলস্টেশন?' রূপা জিজ্ঞেস করে ম্যানেজারকে।

পাশে-বসা এক টাক-মাথা ভদ্রলোক কলকাতার কাগজ পড়ছিলেন, বললেন, 'ওয়ালটেয়াব? ওয়ালটেয়ার সি-রিসোর্ট ঠিক নয় মনে হয়। হাই অলটিচুডে হওয়াই স্বাভাবিক।'

পার্থ ম্যাপ দেখতে দেখতে বলেছিল, 'কাছাকাছি কিন্তু সমুদ্র আছে। কী কবে হয়?' একই সঙ্গে সমুদ্র আর পাহাড় দুই?

কেউই ঠিক জানে না আসলে। কিন্তু রূপার চিন্তা হল, শীতের জামাকাপড় কিছুই তো আনেনি। এখন ঠান্ডা জায়গা হলে অন্তত একটা করে উলের জামা তো দরকার। পুরীতে এপ্রিল মাসে উলের জামা কি পাওয়া যাবে? এখানে তো কখনওই শীত পড়ে না।

পার্থর চিন্তা হল, গিয়ে যদি থাকার জায়গা না পায়! লোকে আগে থেকে ব্যবস্থা না করে কোথাও যায় না আজকাল। তা ছাড়া, ট্রেনের টিকিট? স্টেশনে গিয়ে খোঁজখবর নিতে খানিকটা আশ্বস্ত হয় অবশ্য। তিরুপতি এক্সপ্রেস পুরী থেকে ছাড়ে সকালবেলা, সন্ধেবেলা ওয়ালটেয়ার। ভিড় হয় না তেমন। অনেক হোটেল আছে ওখানে, জায়গা একটা পেয়ে যাবেই। রেল-আপিস থেকেই পার্থ জানতে পারে, ওয়ালটেয়ার আর ভাইজ্যাগ আসলে একটাই শহর। দুটো নাম। বন্দরের দিকটা ভাইজ্যাগ, নতুন নগর। বানিজ্যকেন্দ্র, শিল্পনগরী। তেলের রিফাইনারি আছে বিশাল। পুরনো শহরের পাশ দিয়ে যে সমুদ্র অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে আছে, তা শান্ত না হলেও নির্জন। ট্যুরিস্ট যায় কিন্তু তেমন নয়। জানতে পারে, পাহাড়ি জায়গা হলেও হিলস্টেশন নয় ওয়ালটেয়ার। ভদ্রলোকের নাম মূর্তি, ওদিককারই লোক। সুতরাং তার কথার ওপর নির্ভর করা যায়।

মূর্তি বলেছিল, 'গো অ্যাহেড। ইউ উইল লাইক দ্য প্লেস। ইউ গেট সুইটওয়াটার ফিস দেয়ার। অ্যান্ড দ্য মিশন।'

বায়ু পরিবর্তনের জন্যে মানুষ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়। সেখানকার জলবায়ু, পরিবেশ, দৃশ্য আর দিন যাপনের অভিনবত্ব তাদের মুগ্ধ করে, মুক্তির আনন্দ দেয়। অভ্যস্ত জীবন থেকে মুক্তি। জীবিকার দুর্গন্ধমুক্ত। মানুষ যে আসলে বাঁচবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে, টাকা রোজগারের জন্য নয়, টাকা রোজগার করা বাঁচার কারণেই জরুরি। নয়তো নয়, উপার্জনকর্মে লিপ্ত থাকা আর জীবনযাপন দুটো পৃথক ব্যাপার—মানুষ এই সহজ সত্য ভুলে যায়। ষোলো বছর ধরে বিবাহিত দম্পতি—

পার্থ আর রূপা—ট্রেনে যেতে যেতে আবিষ্কার করল যে, শুধু ছুটি নয়, শুধু অন্য জায়গা নয়, এই যে সারাদিন ধরে যাওয়া, যেতে থাকা, এইটেই সবচেয়ে তৃপ্তিকর। প্রায় সারাদিন ধরেই, নানা দিক থেকে বিশাল ব্যাপ্ত চিল্কাহ্রদ পরিক্রমণ করল ওদের তিরুপতি এক্সপ্রেস। গায়ে লাগল কখনও গরম, কখনও ঠান্ডা বাতাস। সমতল জোলো জমি থেকে ক্রমে ক্রমে বাদামি রুক্ষ পাহাড়ি অঞ্চল—দেখতে দেখতে ওরা ওড়িশা ছাড়িয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে ঢুকল—তখন বিকেল।

স্টেশনের নাম দেখে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠেছিল রূপা।

'ইচ্ছাপুরম'।

'কী সুন্দর নাম না? ইচ্ছাপুরম।'

লাল কাঁকর বিছানো ছোট প্ল্যাটফর্ম। অন্য রকম সব মানুষ। চৌকো মুখ, কালো গর্তে ঢোকা চোখ দেখতে সুন্দর না। ঘাগরার ওপর জামা-পরা কিশোরী মেয়েরা। নাকের দু'দিকে নাকছাবি পরা মায়েদের হাত ধরে চলেছে। 'মাজা' 'মাজা' ডাকতে ডাকতে ফিরি করছে বাদাম রঙের পানীয়—সম্ভবত ঘোল। আর ঝুড়িতে করে তালশাঁস। ঝালবড়া।

'এই—তালশাঁস খাব।'

পার্থ অবাক হয়ে বউয়ের দিকে তাকায়। সাঁইত্রিশ বছর বয়সের কোনও মহিলা রেলস্টেশনে তালশাঁস খায়? তবু আপত্তি করে না। খাওয়া যাক দু'-একটা তালশাঁস। কী আর হবে? নাম যখন ইচ্ছাপুরম, তখন বিশ্বাস করা যাক, বিপত্তি কিছু হবে না।

সিগারেট খেতে খেতে পার্থ বউয়ের তালশাঁস খাওয়া দেখে। এই দেখো ঝকমারি! কপালের চুল উড়ে পড়েছে মুখের ওপর। তালশাঁসের ভেতরকার জল থুতনি বেয়ে ঝরছে ব্লাউজের ওপর। চেনা মানুষটাকে যেন নতুন করে দেখল পার্থ সেদিন। যে-যাই বলুক, রূপার ফিগার কিন্তু খাসা আছে এখনও। আর একবার বিয়ে দেওয়া যায়।

মূর্তি বলেছিল, মিষ্টিজলের মাছ আর মিশন। সি-পার্ল হোটেল থেকে দুটোই কাছে। সমুদ্রও কাছে। সমুদ্র, যাকে বলে, বেশ জাগ্রত। বিশাল, তার শেষ দেখা যায় না। পুরী বা দিঘার চেয়ে এ-সমুদ্র অনেক বড়, অনেক গভীর। হোটেলে ঘরের জানালা থেকে ওরা দেখে, মোটরবোটে মাছ ধরছে জেলেরা। দূরে, সারাদিন ধরে একটার পর একটা জাহাজ চলেছে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। প্রথমে ভেসে ওঠে একটা মাস্তুল, তারপর ক্রমে স্পষ্ট হয় জাহাজের পুরো শরীর।

'কোথায় যাচ্ছে গো?'

'সম্ভবত মাদ্রাজ থেকে হলদিয়া। কি, কলম্বো থেকে চিটাগং।'

'কী যায় ওই সব জাহাজে?'

'কারগো। তেল। পাট। টিউটিকোরিন থেকে জাহাজ ভরতি করে নুন আসে শুনেছি। ইউরোপ থেকে যন্ত্রপাতি আসে।' পার্থ উত্তর দেয়।

'মানুষ যায় না?'

'না, মানুষ আজকাল আর জাহাজে চড়ে না। এখন প্লেন হয়েছে।' পার্থ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'এখন মানুষ সবকিছু চটপট করতে চায়। সময় বাঁচায়।'

পুরীতে যারা হোটেল চালায়, তারা জানে, বাঙালি যাত্রী সমুদ্রের মাছ খাবে না। তাদের জন্যে রুই-কাতলা কি মাগুর মাছ রেঁধে দিতে হবে। তাই পেয়েছে ওরা। এখানে এসে মাছ নিয়ে মুশকিল বাধল। সি-পার্ল হোটেলে মিষ্টি জলের মাছের কোনও আলাদা ব্যবস্থা নেই। ম্যানেজার বলে, 'কিনে দাও, রেঁধে দেব।' খুঁজতে খুঁজতে দোকান একটা পাওয়া গেল শহরের মধ্যে। স্টেটবাস টার্মিনাসের উলটো দিকে। মূর্তি মিথ্যে কথা বলেনি। পার্থ ঘোষণা করল, 'আমি পোনা মাছের মধ্যে নেই। টাইগার প্রন ছেড়ে এ জিনিস কেউ খায়? কলকাতায় এর দাম একশো কুড়ি টাকা কিলো।'

খাওয়া, ঘুম আর সমুদ্র—এই নিয়ে দিন সাতেক বেশ কেটে যায়। সকালে উঠে আপিস যাওয়ার তাড়া নেই, বাজার করা নেই, হেঁশেল ঠেলতে হচ্ছে না, ঝিয়ের পেছনে টিকটিক করা থেকে নিষ্কৃতি। আর কী চাই? রূপা বলে, 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই। বেশ মজা।'

সুর করে পার্থ বলে, 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।'

কাজের সঙ্গে বাঁধা যে-জীবন, তাতে মানুষ অভ্যস্ত। তার একটা নিজস্ব নিয়ম আছে। বছর শেষে

দিনপনেরো ছুটি পেয়ে খানিকটা ঝটিকা সফর করে ফিরে আসা সে নিয়মেরই অন্তর্গত। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন অবসর উপভোগ—সে একটা আর্ট, তার জন্য পৃথক প্রস্তুতি প্রয়োজন। পার্থ বা রূপা কেউই সে-আর্টের চর্চা করেনি জীবনে।

অতএব, যা অবধারিত, তাই ঘটল। পার্থ অসুস্থ হয়ে পড়ল একদিন।

হোটেলের ডাক্তার রুগি দেখলেন। খবরাখবর নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন এমন হল?'

রুগি নিজেই উত্তর দেয়, 'আইডলিং, ওভারইটিং অ্যান্ড বোরডম।'

অগত্যা আরও দশ-বারো দিন থেকে যেতে হবে। কিছু ওষুধ, আর পথ্য হিসেবে গোয়েন্দা উপন্যাসের নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার রেড্ডি।

তখনই রূপার মনে পড়ে যায়, মূর্তি বলেছিল, মিশন।

একটু খুঁজতেই পেয়েও যায়। কাছেই। সুন্দর মন্দির। নির্জন, পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের সামনে খানিকটা খোলা জায়গা তারপর রাস্তা—ওয়ালটেয়ারের মেরিন ড্রাইভ, তারপর সমুদ্র। এত কাছে ছিল জায়গাটা, এতদিন মনেও পড়েনি, আশ্চর্য!

আর এখানেই একদিন দেখা হয়ে গেল অলকার সঙ্গে। ও তখন পুজো দেওয়ার জন্য পাথরের উপর নারকোল ভাঙছিল।

কী বুড়ি হয়ে গেছে অলকা! এখনও চল্লিশ হয়নি, মনে হয় পঞ্চাশ। ওর খয়েরি চোখের তারা আর গজদাঁত দুটো না দেখলে শনাক্ত করতে পারত না রূপা। আশুতোষ কলেজের সেই ফক্কড় মেয়ে। ছোঁড়াদের যা টালাত।

"তুমি কিন্তু একটুও বদলাওনি," অলকা বলে, "একা কেন?"

"কর্তা অসুস্থ। আর ছেলেপুলে জন্মায়নি।"

"কোথায় উঠেছ?"

"সি পার্ল।"

"চলো আমার বাড়ি।" ধরে নিয়ে যায় অলকা।

সেই থেকে যাওয়া-আসা।

রূপা দেখে, অলকা সংসার নিয়ে মজে আছে। ওর চার-চারটি সন্তান। বড়টি মায়া—বয়স পনেরো। ছোটটি আপ্পা—বয়স তিন। মাঝখানে আরও দু'জন। ও নিজ হাতে সংসারের সব কাজ করে। রাজা রাও—ওর স্বামী, জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার। বছরে ন'মাস বাইরে থাকে, দেশ-বিদেশে জাহাজ নিয়ে যায়, তিন মাস দেশে। তখন একেবারে ছুটি। এখন ওর ছুটি চলছে।

কাটা পাহাড়ের উপরে বাড়ি ওদের। বাড়ির সামনে ছোট বাগান, ঝাউ গাছ, বাদাম গাছ, লন। সেখান থেকেও সমুদ্র দেখা যায়। সমুদ্রের হাওয়ায় নুন আছে, লক্ষ করে রূপা। দেয়ালের রং, জানলা, দরজা, কাঠের ফার্নিচার সর্বত্র নুনের ক্ষতচিহ্ন। অলকার শরীরেও বোধহয় নোনা লেগেছে, ওর মনে হয়, কলকাতার মেয়ে গঙ্গার হাওয়া খেয়ে মানুষ। বেচারা!

রাজা রাও বলে, 'না। অলকা তো অসুস্থ না। ওর চার্মটা চলে গেছে। তার জন্য দায়ী ওই বাচ্চাগুলো। আর খানিকটা হয়তো আমি, আমার পেশা। অলকার জীবনে কিন্তু বোরডম নেই। শি হ্যাজ নো টাইম টু থিংক।'

ব্যবহারে খুব ভদ্র, দেখতেও সুপুরুষ, কিন্তু কেন কে জানে, রূপার মনে হয়, ওই তেলেগু মানুষটা নিষ্ঠুর। এই যে, সব ছেড়েছুড়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো আর মাঝে মাঝে এসে স্ত্রীকে গর্ভবতী করে চলে যাওয়া—এর মধ্যে এক ধরনের হৃদয়হীনতা যেন আছে। এই যে ও ছুটিতে আছে এখন, কই, সংসারের কোনও কাজে তো এগিয়ে আসে না। সারাদিন ধরে অল্প অল্প ড্রিঙ্ক করে আর গান বাজায়। রূপার ধারণা, ওই কামুক লোকটা ইচ্ছে করে বউকে ব্যভিচারের অযোগ্য করে রেখেছে। মদ খেলে মানুষ পশু হয়ে যায়।

রাজা রাও হাসতে হাসতে বলে, 'ওই হল বোরডমের ওষুধ। দিনের-পর-দিন যখন সমুদ্রের উপর দিয়ে যাই—শুধু জল আর জল—দিগন্তে কোথাও মাটি নেই, গাছপালা নেই, একটা পাখি অবধি ওড়ে না আকাশে। তেমন কাজও নেই হাতে, কী করা? গান আর গান। এক এক সময় অলকাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে তখন।'

উপস্থিত থাকলে অলকা তার খয়েরি চোখের তারাদুটো উপরে তুলে ঠাট্টা করে, 'আ-হা! কত প্রেম। কোথায় কী করে বেড়াও কে জানে!'

'বিশ্বাস করো।' বলতে বলতে হাসে রাজা রাও। সে-হাসি কৃষ্ণের হাসির মতো কুটিল দেখায়।

সেদিন সন্ধের দিকে রাজা রাও রূপার ফিগারের প্রশংসা করেছিল। তারপর কিছুক্ষণ থমথমে নিস্তব্ধতা। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রাজা রাও বলেছিল, 'হাওয়াটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, ঝড় আসছে।' রূপা বলেছিল, 'আমি যাই।' অলকা যেতে দেয়নি। ঝড় এল। এক ঘণ্টা তোলপাড় করে ঝড় থামল রাত ন'টার পর। অলকা বলল, 'খেয়ে যাও আজ। ও তোমায় পৌঁছে দেবে। কী গো, ড্রাইভ করতে পারবে তো?'

গাড়িতে বসে ভয় করছিল রূপার। মানুষটাকে ও বিশ্বাস করতে পারছিল না। রাজা রাওয়ের বিরুদ্ধে ওর স্পষ্ট কোনও নালিশ নেই যদিও।

ঝড় থেমে গিয়ে সমুদ্র শান্ত হয়ে গেছে। জল সরে গেছে বেশ দূরে। কিন্তু ভিজে রাস্তা দেখে বোঝা যায়, এই অবধি ঢেউ আছড়েছে একটু আগে। ভাগ্যিস বের হয়নি তখন।

যেতে যেতে একসময় রাজা রাও বলল, 'আর একবার ভারতবর্ষে জন্মালে আমি আবার বাঙালি মেয়েকেই বিয়ে করব।'

রূপার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল তখন। ওর মনে কী মতলব আছে, কে জানে! অন্ধকার না হলেও রাস্তাটা একদম ফাঁকা। গাড়ির মধ্যে রাজা রাওয়ের নিশ্বাসে অ্যালকোহলেব গন্ধ।

একবার হঠাৎ ও গাড়ি থামিয়ে দিল। রাস্তার উপর একটা বাদাম গাছ উপড়ে পড়ে আছে। অনেক সাদা ঝিনুকও যেন ছড়িয়ে আছে পিচের রাস্তায়। কতকগুলো ঝিনুক কুড়িয়ে এনে রূপার হাতে ঢেলে দিল লোকটা।

রূপা বলল, 'আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট করলেন।'

বাজা রাও উত্তর দিল না। আবার স্টার্ট করল গাড়ি।

হোটেল সি-পার্লের গেটে পৌঁছে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রূপা। পার্থ অপেক্ষা করে আছে। হয়তো ভাবছে, কোনও অঘটন ঘটল নাকি!

না, কোনও অঘটন ঘটেনি। শুধু মুখটা তেতো লাগছে। মদ খেলে মানুষ পশু হয়ে যায়, এই ধারণা কি একেবারে ভুল?...রাজা রাও মানুষটা খুব যে এক ধোওয়া তুলসীপাতা ওর মনে হয় না।...আবার অহংকার করে বলে, আরেকবার জন্মালে বাঙালি মেয়েকেই বিয়ে করবে। কত শখ! রূপার ফিগারের প্রশংসা করেছিল সন্ধেবেলা। কেন? খুশি করতে? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রূপা ভাবে একটু অঘটন ঘটলে কী আর ক্ষতি হত? বোরডমের ওষুধ কী, ও নাকি তা জানে! রূপার মনে হয়, সব বাজে কথা। লোকটাব চরিত্রে নোনা লেগেছে।

১৯৮৭

❀ আতর

ভাবনাটা মাঝে মাঝেই ওর মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছে। কী লাভ এই অনিচ্ছুকভাবে বেঁচে থেকে।

জীবনকে লোকে একটা গাড়ির সঙ্গে তুলনা করে। গোরুর গাড়ি। চাকা লাগানো। তাতেই গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। সামনে একটা বলদ থাকে, সে-ব্যাটা টানে গাড়িটাকে। কোনও কর্তব্যবোধ থেকে টানে না, কোনও লক্ষ্যে পৌঁছোবার তাড়া নেই তার। তার তাড়না হল গাড়োয়ানের পাচনবাড়ির গুঁতো। প্রভঞ্জন ছোটবেলায় বলদকে এই গুঁতো খেতে দেখেছে। কোথায় না মারে গাড়োয়ান? পেটে, পিঠে, দু'পায়ের ফাঁকে যেখানে বিচি ছিল সেই জায়গাটায়। লেজ মলে জিলিপির প্যাঁচ করে দেয়। কখনও

একটু এগিয়ে গিয়ে চোখেও মারে পাচনবাড়ি।

বলদের গায়ে তো ঘোড়ার মতো জোর নেই। ঘোড়ার তুলনায় সে একটা প্যাংলা জানোয়ার। ছোটার অভ্যেসও নেই তার সাতপুরুষে। সে গোবংশজাত এক প্রাণী, অলস প্রাণী। এদের মেয়েরা দুধ দেয়। দুধ বন্ধ হলেই ওদের গাভীন করা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। বাছুর বিয়োলে আবার দুধ দিতে শুরু করে গোরু। দুধের ফ্লো থাকে বলে ওদের আর কোনও কাজ করতে হয় না। সেক্সলাইফ নেই বলে গোরুদের কোনও দুঃখ আছে, মনে হয় না।

হিন্দুপ্রধান এই ভারতবর্ষে পুরুষ গোজাতির বড় বেশি দুর্ভোগ। ওদের মাংসের চাহিদা কম। দু'-একটা ধর্মের ষাঁড়, তারা ভাগ্যবান। শিবঠাকুরের সেবক। বাকি সবাই বলদ হয়ে সারাজীবন লেবার খাটে। ককুদের ওপর লম্বালম্বি পাতা একটা মোটা হাল, সেটা ঘষে ঘষে ঘা হয়ে যায় ঘাড়ে। একসময় সেই ঘা শুকিয়ে গেলে জায়গাটায় ঘাঁটা পড়ে যায়। তখন আর সাড় থাকে না ওই জায়গাটায়। লাঙল বলো, গাড়ি বলো, টানার পরিশ্রম কি তাতে কমে? ঘোড়ার ককুদ নেই। তাই তাকে কতরকম ড্রেস পরিয়ে বাঁধতে হয়। ঘোড়ার সেটা প্রাপ্য, কেননা তার হর্স পাওয়ার আছে, তার পরিশ্রম করার শক্তি বলদের চেয়ে ঢের বেশি। তা ছাড়া কাজ অপছন্দ হলে ঘোড়া লাথি ছোড়ে পিছন দিকে। চিঁহি চিঁহি করে চেঁচায়। বলদ এ সব কিছুই পারে না। অতিষ্ঠ হলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হাঁপায়। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোয় তার। তাতে মার খায় আরও বেশি। ও কেন ঘোড়ার মতো দৌড়োবে না? সেটাই হল প্রশ্ন।

পৃথিবীতে কিছু কিছু লোক আছে, মার খেলে যারা প্রতিবাদ করে না। দুর্বলতাবশত বা ভদ্রতাবশত। তারা বেশি মার খায়, যদি না অন্যভাবে ক্ষতি করার, প্রতিশোধ নেওয়ার কূটবুদ্ধি তাদের থাকে। বলদের কোনও কাণ্ডজ্ঞানই নেই তো কূটবুদ্ধি!

আপিসে তো এত লোক কাজ করে, কেবল প্রভঞ্জনেরই বেলায় দাস সাহেব মুখ ঝামটে কথা বলে কেন? অনেক সময় ও ভেবেছে। ওকে দেখলেই দাস সাহেবের মুখ ঝামটানি পায়। আচার দেখলে বালকের জিভে যেমন জল আসে। এর জন্য কোনও কারণের প্রয়োজন হয় না। এই সেদিন যেমন ঘরে ডাকল।

প্রভঞ্জন ঢুকেই বলল, গুড মর্নিং স্যার।

দাস সাহেব খিঁচিয়ে উঠল, গুড মর্নিং স্যার। কোমরে বেল্ট নেই কেন?

কণ্ঠস্বর শুনে ও তো হকচকিয়ে গিয়েছিল। যেন, কোমরে প্যান্ট নেই। তারপর নামানো মুখটা তুলে বলেছিল, বেল্ট? ওর দরকার হয় না।

দরকার নেই তো লুপগুলো রয়েছে কী করতে? অ্যাঁ? ফুঁ দিতে?

কী কথার ছিরি! আপিসে আসতে হয় বলে প্যান্ট পরে প্রভঞ্জন। বাড়িতে লুঙ্গি পরে থাকে। তার উপর আবার বেল্ট চাই। লাগাম চাই। আর একদিন জুতোয় পালিশ নেই বলে খিঁচিয়েছিল এমনি।

অথচ তখুনি ওর ঘরে ঢুকেছিল করবাবু। টাইপিস্ট। একটা কাগজ ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে দাস সাহেব বলল, বেশ নরম অভিমানের সুরে বলল, একটা পাতায় এতগুলো ভুল। রি-টাইপ করে নিয়ে আসুন।

ব্যস! ওইটুকুই। করবাবুর গায়ের পাঞ্জাবি কেন ময়লা, কেন ঘাড়ের কাছে পেরেকে ঝোলানোর দাগটা উঁচু হয়ে আছে, পকেটে কেন কালির দাগ, এসব নিয়ে একটি বাক্যও উচ্চারণ করল না।

অভ্যেস হয়ে গেছে আসলে। বকতে বকতে বকুনি দেওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে দাস সাহেবের। এখন ওকে দেখলে কাজের কথা মনে হওয়ার আগে, দাঁত খিঁচিয়ে একটু আচমন করে নেয়। তাতে মজা পায় ও। প্রভঞ্জনের ভারসংস্থান বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে পর, তখন দাস সাহেব কাজের কথা পাড়ে। ওর ওপর টাস্ক চাপায়, দায়িত্ব চাপায়। তার একটাও ফিরিয়ে দিতে পারে না প্রভঞ্জন। আত্মপক্ষ ধারণের শক্তি তখন তো হারিয়ে গেছে ওর।

এইটা হল বলদের স্বভাব। ঘোড়ার স্বভাব না। প্রথম দিনেই যদি ও পিছন দিকে পা ছুড়ে চিঁহিহি চিঁহিহি করে ডেকে উঠত, তা হলে আজ ওর এ-অবস্থা হত না।

বাড়িতেও ওর অবস্থান একই রকম। মায়ের ন্যাওটা দুই ধাড়ি মেয়ে বাপকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয় না, অথচ সংসারের বেশিরভাগ ঝক্কি প্রভঞ্জনই সামলায়। ওরা ধরেই নিয়েছে, একটা বাবা আছে, সব ঝামেলা তার। যেন গুরুজন না, ও হল গিয়ে বাড়ির গোমস্তা।

এক-এক সময় নিজেকে ওর কচ্ছপ বলে মনে হয়। কচ্ছপ। পিঠে এক বিশাল বোঝা। সরু গলার

ডগায় ছোট একটা মাথা। মাঝে মাঝে মাথাটা খোল থেকে বার করে জগৎ সংসার দেখে নিচ্ছে, আবার ঢুকিয়ে নিচ্ছে খোলের মধ্যে। পা টেনে টেনে হাঁটছে। 'আমার বোঝা কমিয়ে দাও, আমি আর পারছি না', কচ্ছপ কি কখনও এ-কথা বলে মুখ ফুটে? শুধু সহ্য করে যায়। যত সহ্য করে, ততই আয়ু বেড়ে যায় কচ্ছপের। প্রভঞ্জন বইতে পড়েছে, কচ্ছপের নাকি দাঁত নেই। ডাঙার কচ্ছপ নাকি একশো পঞ্চাশ বছর অবধি বাঁচে। ওর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

কিন্তু এইভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। যদি উপভোগই না করা গেল, তো জীবন দিয়ে কী হবে?

বছর দুয়েক হল শুভা, ওর বউ, প্রভঞ্জনকে শোওয়ার ঘর থেকে বার করে দিয়েছে। অপরাধ খানিকটা মদের, যদিও মাসে তিন দিন কি চার দিন ও মদ খায়। তা-ও নিজের পয়সা খরচ করে খায় না। আপিসের সাপ্লায়ারদের কেউ যখন নেমন্তন্ন করে, তখন। ও যদি ঘুষ নিতে পারত, তা হলে মদটা হয়তো খেতে হত না ওকে। কিন্তু সে-সাহস ওর নেই। টাকা খেয়ে কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে ওর ভয় করে। সাধ্যমতো নিজের ডিউটি ও করে যায়, করে যাচ্ছে আজ পনেরো বছর ধরে, তাতেও তো দাস সাহেবের মুখ ঝামটার শেষ নেই। এক-আধদিন মদ খেতে ভালই লাগে ওর।

সেলস ডিপার্টমেন্টের ভক্তি, ভক্তিপ্রসাদ গুহ, অনেকদিন আগেই ওকে বলেছিল, সাহেবের এটা একটা ট্রিক। আপনাকে ডিমরালাইজ করে রাখতে চায় যাতে নিজের কদর আপনি ভুলে থাকেন, বুঝলেন কিনা। যাতে উপর দিকে আপনি হাত বাড়াতে না পারেন। উপর দিক মানে উপরি, ঘুষ, ক্ষমতার প্রয়োগ, দাপট—যা ওর পদে একজন অবাঙালি থাকলে অবশ্যই দেখাত; আর উঁচু পদের জন্য লোভ। যাতে, যতদূর অবধি পৌঁছেছেন, সেখানেই বাকি জীবন আপনাকে আটকে রাখতে পারে। ফোঁটা ফোঁটা ইনক্রিমেন্ট দিয়ে জিইয়ে রাখতে পারে আপনাকে। একসময় যখন আপনার নিজেকে মনে হবে অপদার্থ, গুড ফর নাথিং, চাকরি চলে গেলে খেতে পাবেন না, এই বুঝি দাস সাহেব নিজের ঘরে ডেকে এনে আপনাকে স্বেচ্ছা-অবসর নেওয়াব প্রস্তাব দিল, তখন, তখন ও আপনার ইনক্রিমেন্টটা বন্ধ করে দেবে। বলবে, আপনার গ্রেড এইখানে শেষ। উপরের গ্রেডে তুলব কী করে, সে- মুখ তো আপনি রাখেননি।

একান্ন বছর বয়সে প্রভঞ্জন সেই অবস্থায় পৌঁছে গেছে। সাপ্লায়াররা যা খাওয়াবার ভেতরে ভেতরে দাস সাহেবকে খাওয়ায়, প্রভঞ্জন কেবল হুকুম তামিল করে। ভুল হলে বকুনি খায়। তখন দৌড়ঝাঁপ, চোটপাট, মুখখারাপ যা করার ওকেই করতে হয়। উকিলের চিঠি, দরকার হলে মামলা—এ-সব তো প্রভঞ্জনের দায়িত্ব। দাস সাহেব তার সুইং চেয়ারে বসে দোল খায়।

ভক্তিপ্রসাদ গুহ চলে গেছে। এখন ও অন্য এক জায়গায় সেলস ম্যানেজার। তিনগুণ মাইনে পায় ও। সাফারি স্যুট পরে ঘোরে। নতুন কোম্পানি ওকে কন্টেসা গাড়ি দিয়েছে। দাড়িওলা মুসলমান ড্রাইভার, সেই গাড়ি চালায়।

হোটেলের পানশালায় এক-এক দিন ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় প্রভঞ্জনের। ভক্তি হাত নাড়ে দূর থেকে। প্রত্যেকবারই প্রভঞ্জনের মনে হয়, ও যেন আগের বারের চেয়ে এবারে একটু বেশি দূর থেকে হাত নাড়ছে। শ্বেতপাথরের টেবিলে ঘিরে-থাকা লোকগুলোর মধ্যে তন্দুরি চিকেন চর্বণরত অবস্থায় প্রভঞ্জনকে রেখে ও মিলিয়ে যাবে ক্রমশ। যেভাবে শুভা মিলিয়ে গেল।

মেয়েরা বুঝতে পারত না, ওদের মা বুঝিয়ে দিয়েছে, যে দেখো, আজ বাবা মদ খেয়ে এসেছে। কী, আজ বাবা মদ খেয়ে আসবে। ফিরতে দেরি হবে। তোমরা শুয়ে পড়ো। মদ খাওয়া খারাপ। মদ খেলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। যে মদ খায়, সে আরও অনেক অন্যায় কাজ করতে পারে। বাবা সে রকম কোনও অন্যায় কাজ করবে না, করছে না, হয়তো, কিন্তু খারাপ লোকের পাল্লায় পড়লে করতেও পারে। এইভাবে জমি প্রস্তুত হয়ে গেলে পর একদিন স্বামীকে বলল, তোমার নাক ডাকার জ্বালায় আমি রাত্তিতে ঘুমোতে পারি না। তোমার শোওয়ার খাট কোণের ঘরে সরিয়ে দিয়েছি। হাসতে হাসতে বলল। ভাবটা যেন, কাল তোমার বিয়ে।

সব বুঝেও চুপ করে মেনে নিয়েছে প্রভঞ্জন। বড় মেয়ে ঝুমুর বলেছে, বাবা, আমি তোমার বিছানা করে দেব, মশারি খাটিয়ে দেব। তোমার টেবিলে ওষুধ, জলের গ্লাস রেখে দেব ঠিক করে। কোনও অসুবিধে হবে না। ওর বয়স উনিশ, অসুবিধে বলতে কী বোঝায় ও নিশ্চয় জানে, তবু শুভা ওই

মেয়েটার মুখ দিয়ে কথাগুলো বলায়। ছোট মেয়ে চুমকি, তার বয়স তেরো, জ্ঞান হয়েছে কিন্তু গম্ভীর হতে শেখেনি, সে মুচকি মুচকি হাসে। ট্রামে-বাসে ঘুরছে আজকাল, কনুইয়ের গুঁতো খাচ্ছে। সে-ও সব বোঝে। বলে, দরজা খোলা রাখছি বাবা, রাত্তিরে দরকার হলে ডেকো। লাল টর্চটা খাটের পাশে রাখলাম। মনে মনে ওরা জানে, বাবার হাত থেকে মা-কে ওরা মুক্তি দিয়েছে।

প্রভঞ্জন কিছু বলেনি, বলতে পারেনি, যেমন আপিসেও বলতে পারে না। ওর মনে হয়, এ-জীবন বলদের, কচ্ছপের, এইভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

কিন্তু বেঁচে থাকার উলটোটা কী? মৃত্যু? ও কি মৃত্যু চায়? না, না, একেবারেই না। মৃত্যু মানে তো নিভে যাওয়া। যতই কষ্ট থাক জীবনে, শুধু বেঁচে থাকারই তো একটা আনন্দ আছে। না হলে কচ্ছপ তার শক্ত খোল থেকে সরু গলা বার করে, দাঁতহীন মুখখানা উঁচু করে ঘুরে ঘুরে জগৎ সংসার দেখতে চায় কেন?

মৃত্যু যদি মহান হয়, বীরের মতো হয়, তবে তাকে আহ্বান করা যায় যে-কোনও সময়ে। তাতে তো গ্লানি নেই।

খুব ছোটবেলায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু দেখেছে। বিশেষ কিছুই তেমন মনে নেই। শুধু মনে আছে কলকাতার রাস্তা জুড়ে এক প্রবহমান জনতার দৃশ্যটা। আর ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই স্তূপাকাব ফুল। ভবানীপুরে মামার বাড়ির ছাদ থেকে দেখেছিল। লোকে বলেছিল, দেশেব জন্য শ্যামাবাবু শহীদ হলেন। শহীদও বীরপুরুষ বীরাঙ্গনারাই হয়।

পরে, আবও বড় হয়ে, দেখেছিল বিধান রায়ের অন্তিম যাত্রা। সে-ও কী বিপুল জনস্রোত। কী বিশাল ফুলের পাহাড়। মনে হয়েছিল, এরপর কলকাতায়, পশ্চিমবাংলায়, মানুষের জীবন বুঝি স্তব্ধ হয়ে যাবে।

তখন ওরা দু'জন স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। কলেজ ছুটি। ওরা ছুটল ওয়েলিংটন স্কোয়ারেব দিকে। সেখান থেকে মরদেহ বেরুবে। বৌবাজার অবধি এসে ওবা আর ঢুকতে পারেনি। ভিড়ে আটকে গেল।

প্রভঞ্জন, তখন ওর গালে নরম দাড়ি, বলেছিল, চলো আর কোথাও যাই।

শুভা বলেছিল, অত বড় মানুষটার ছবিই দেখেছি। আজকে তাঁকে স্বচক্ষে দেখাব সুযোগ ছিল। অন্তত মুখখানা।

সত্যি করে বলো তো, আজকের আগে কোনওদিন বিধান রায়কে দেখার জন্য এত ব্যাকুল হয়েছ? যদি হতে, তা হলে ব্যাপারটা খুব শক্ত ছিল না।

শক্ত ছিল না! কেন? উনি কি যাকে তাকে দর্শন দিতেন?

এইভাবেই তখন কথা বলত শুভা।

দর্শন আবার কী! উনি সপ্তাহে একদিন করে বিনা পয়সার রুগি দেখতেন। রুগি সেজে গেলে দেখা তো পেতেই, আর তোমার শরীরে যদি কোনও অসুখ থাকে, তা-ও সারিয়ে আনতে পারতে। প্রভঞ্জন বলেছিল, আমাদের এক আত্মীয়—বয়স্ক ভদ্রলোক, তার মুখের ভিতরে ঘা, জিভে ঘা, কিছু খেতে পারত না। অনেক ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথি করেও সুফল হয়নি। তখন বিধান রায়ের কাছে চলে গেল একদিন। আমি গল্প শুনেছি, সব রুগিকে কোমরের উপর পর্য্যন্ত খুলে ওঁর চেম্বারে ঢুকতে হত। দেয়াল ঘেঁষে একটা টুল, তার ওপর বসতে হত। তো আমার সেই আত্মীয় খালি-গায়ে সেখানে বসেছে। বিধান রায় ওকে দূর থেকে দেখলেন। ছুঁলেন না অবধি। প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন; রোজ দশ ফোঁটা করে আয়োডিন খেতে হবে। এক মাস। তাতেই অসুখ সেরে গেল। চিফ মিনিস্টারের চেয়ে ডাক্তার বিধান রায়ের সুনাম অনেক বেশি। কিন্তু আজকের এই ভিড় রাজনৈতিক কারণে।

তুমি ওঁকে দেখেছ কখনও?

দু'বার। চিফ মিনিস্টারের গাড়িতে। দুপুরবেলা। একা। চলন্ত গাড়ির মধ্যে বসে আপিসের ফাইল পড়ছেন। এত বড় মাপের মানুষ—ফিজিক্যালি—

লিটারালি—

একই কথা। যে, তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি কখনও।

শুভা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেছে। তারপর হাত দুটো জোড়া করে কপালে ঠেকিয়েছে। বলেছে, চলো, কোথাও গিয়ে বসি।

নিরিবিলি কোথাও গিয়ে বসা তখনও খুব সহজ ছিল না কলকাতায়। শুভা আর প্রভঞ্জন যখন স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ে, তখনকার কথা বলছি। মাইলের-পর-মাইল ওরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করেছে। হেদোয় কি কলেজ স্কোয়ারে পাশাপাশি বসে বাদাম ভেঙে খেয়েছে। নিরিবিলি সেখানেও ছিল না। তবে কফি হাউসের চেয়ে ভাল। সিনেমা হলে সবচেয়ে পেছনের সিটে বসলে ঘেঁষাঘেঁষি হওয়া যেত। কথা বলা যেত না।

এখন ভাবলে হাসি পায়, তখন রোজ সন্ধেবেলা বাড়ি যাওয়ার সময় শুভা করত কী, ওর বইখাতার ব্যাগ হাঁটকে একটা বন্ধ খাম বার করে প্রভঞ্জনকে দিয়ে বলত, দরকারি চিঠি, বাড়ি গিয়ে পোড়ো।

সে-সব চিঠি প্রভঞ্জন রেখে দেয়নি। কেন রেখে দেয়নি? কেউ পড়ে ফেলতে পারে সেই ভয়ে। সত্যি, ভয়ে ওর বুক দুরদুর করত। শুভার কোনও ভয় ছিল না। সাবলীল গদ্যে ও চিঠির পর চিঠি লিখে গেছে। জানো, কাছের মানুষ কাছে থাকলে কী রকম অভিভূত হয়ে যাই, একটাও দরকারি কথা মনে পড়ে না। খালি আজেবাজে গল্প করে সময় কেটে যায়। বাড়িতে পড়তে বসে বইয়ের পাতার ওপর তোমার মুখটা ভেসে উঠছে। তুমি এমনভাবে চেয়ে থাকো যেন কিছু বুঝতে পারো না। আমি তোমায় বুঝিয়ে বলতে চাই। কথাগুলো গলা অবধি উঠে এসেছে, এখনই না লিখে ফেললে নিষ্কৃতি পাব না।

শুভা লিখত, চিঠিটা বড় হয়ে গেল, কিছু মনে কোরো না। এবার মনটা শান্ত হয়েছে। খামে ভরে আঠা দিয়ে বন্ধ করে দিলাম, যাতে সকালবেলা উঠে আবার পড়তে গিয়ে কথাগুলো বোকা বোকা না মনে হয়। আমি তো বোকাই। এবার খেয়েদেয়ে ঘুমোতে যাব। আর তোমাকে স্বপ্নে দেখব। একটা জিনিস লক্ষ করেছি জানো, তুমি স্বপ্নে বেশ প্রেমিকের মতো কথা বলো, আমার মন গলে যায়। অথচ দেখা হলে বলো না কেন? চিঠি লেখো না কেন? একদিন তো বলবে? না, চিরজীবন আমি একাই কথা বলে যাব? বানিয়ে না, সহজ সুন্দর করে নিজেকে প্রকাশ করতে পারত শুভা।

সেই সময়, সেই কুড়ি-একুশ বছর বয়সে শুভা লিখেছে, আমাদের আরও দশ বছর আগে বন্ধুত্ব হওয়া উচিত ছিল। তা হলে তোমার বড় হয়ে ওঠা আমি দেখতে পেতাম। তুমি আমার গ্রেগরি পেক, একদিনে তো পেকে ওঠোনি। কতদিন আর বাঁচব আমরা। খুব জোর আশি বছর। তার থেকে দশ বছর কাটা গেল তো। আর একটা কথা। তুমি আউটসাইডার বইটা পড়তে চেয়েছ। আমি পড়াব তোমাকে। খবরদার, নিজে কিনবে না। আর সেই সঙ্গে তোমাকে উপহার দেব রূপসী বাংলা। বইটা আমার আছে। তোমার কাছেও থাকা দরকার। লোকে যেখানে শ্রীশ্রীগীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী রাখে, সেইখানে রাখবার মতো বই। একসময় ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে। যাক। তখন একটা বই কাউকে দিয়ে দিলেই হবে।

ওদের একুশ বছর বয়সের প্রেম একত্রিশ বছর বয়সে পরিণতি পেয়েছে বিবাহে। মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে এ এক স্বাভাবিক ব্যাপার।

প্রভঞ্জনের মনে পড়ে, সেই সময় ওর মা বলেছিল, বিয়ে যদি করতেই হয়, তোমরা আর দেরি কোরো না। কিন্তু বাবা, আমার মন বলছে, সমান বয়সের ছেলেমেয়ের বিয়ে হওয়া ঠিক না। তোমার বাবা আমার চেয়ে আট বছরের বড় ছিলেন। বয়সের এই পার্থক্য থাকলে সংসার সুখের হয়।

মা-বাবার দাম্পত্যজীবন কতটা সুখের ছিল, প্রভঞ্জন বলতে পারবে না। ওটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। অমৃত আর বিষে মেশানো নারী-পুরুষের সম্পর্ক। সমান সমান আবার কোথাও দু'জন সমান সমান নয়। মা একটু ছোট। বাবা একটু বড়। রূপ-গুণের বিচারে প্রভঞ্জনের মা তার বাবার চেয়ে শ্রেয় ছিল। বিষয়বুদ্ধিতে, সংসার পরিচালনার দক্ষতায়, আত্মীয়স্বজনের প্রতি কর্তব্যপালনে—সর্বত্র মায়ের সিদ্ধান্ত ছিল শেষ কথা। বাবা তাতে বাধা দিত না, কেননা বাবার সঙ্গে পরামর্শ না করে মা কোনও কাজ করেনি। সবচেয়ে বড় কথা, শেষ দিন পর্যন্ত প্রভঞ্জনের মা তার বাবার পাশে এক বিছানায় শুয়েছে। বাবাকে অন্য ঘরে সরিয়ে দেয়নি। ঘুমের মধ্যে শেষ রাত্রে যেদিন বাবা মারা যায়, সেদিন বাবার ডান হাতখানা মাকে ছুঁয়ে ছিল। তাতেই তো মায়ের বেশি আপশোস, মুখে একটু জল দিতে পারলাম না, কী কালঘুমে পেয়েছিল আমায়!

প্রভঞ্জন কোনদিন কাঠ হয়ে মরে পড়ে থাকবে, কেউ টেরও পাবে না। মেয়েরা আটটার আগে কেউ বিছানা ছাড়ে না। শুভা ঘুমের ওষুধ খেয়ে শোয়, সে-ও দেরি করে ওঠে। একদিন ওরা সকালে উঠে

দেখবে, বাবার আধখোলা চোখের ওপর পিঁপড়ে থিকথিক করছে। একটা হাত, মায়ের দিকে না, জলের গ্লাসের দিকে বাড়ানো।

ও যে দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে, এ-কথা প্রথম প্রথম বুঝতে দেয়নি শুভা। নিশ্চয় লজ্জা করেছে ওর। আশি বছর অবধি যুগল জীবনের প্রতিশ্রুতি ছিল ওদের। পঞ্চাশ বছরে পৌঁছোতে-না-পৌঁছোতে পাতা হলুদ হয়ে গেল যে! লজ্জা করবে না! তাই নানা রকম অছিলায় এড়িয়ে যেত স্বামীর আদর। কোনওদিন দেরি করে শুতে এসেছে, যাতে প্রভঞ্জন ঘুমিয়ে পড়ে। কোনওদিনও মেয়েদের ঘরে বসে রেকর্ড চালিয়ে গান শুনেছে তিনজন। কোনওদিন শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছে। 'ইচ্ছে করছে না' বলতে পারত, বলেনি। তার বদলে, স্বামীর একাগ্রতা টের পেলে বলত, পাশের ঘরে ঝুমুর এখনও জেগে আছে, কী ভাববে বলো তো? আমাদের এখন সংযম অভ্যেস করা উচিত। রামকৃষ্ণদেব কী বলেছেন জানো না? ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য ভাই-বোনের মতো জীবনযাপন করা। তারপর খিলখিল করে নিজেই হাসত। আঃ, ছাড়ো ছাড়ো, কাতুকুতু লাগছে, ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে গায়ে। আলিঙ্গনের মধ্যে যে মেয়ে সশব্দে হাসে, তার সঙ্গে সঙ্গম করা যায় না। শেষে রাগারাগি হয়ে যেত।

শুভা বলত, ও-সবে আমার ঘেন্না করে।

গোরুদের সেক্সলাইফ নেই। ওদের কাজ কেবল গাভীন হওয়া আর তারপর দুগ্ধ বিতরণ করা। প্রভঞ্জনের বাড়ির কাছে একটা খাটাল আছে। আট-দশটা নির্বান্ধব গোরু পাশাপাশি শুয়ে-বসে থাকে সেখানে। দুধ দোয়াবার সময় উঠে দাঁড়ায়। ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় ছুঁচের মুখে চামড়া থিরথির করে কাঁপছে, একদিন আচমকা দেখে ফেলেছে প্রভঞ্জন। বাইরে বৃষ্টি পড়লে গোরুরা আপনি উঠে দাঁড়ায়, তা-ও দেখেছে ও, কিন্তু কেন দাঁড়ায় ও জানে না। ভোরবেলা ওর একলা খাটে শুয়ে শুয়ে ও শুনতে পায় গোরুদের হাম্বারব। একটা সময় গোরুরা দুধের তাড়সে চেঁচায়। গোয়ালার খক খক কাশিও শোনা যায় তখন। প্রভঞ্জন ভাবে, এতগুলো সধবা গোরু, স্বামীর কথা কাউকে ভাবতে হয় না। সে-সব ওই গোয়ালা ভাবে।

বলদেরও সেক্সলাইফ নেই। জন্মের পরেই তার মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়। ছাগলের বেলা মাংসের স্বার্থে আর গোজাতির বেলা শ্রম নিষ্কাশনের স্বার্থে মানুষ এই কাণ্ড করে দেয়। যাতে এই দুই পশু—খাসি আর বলদ, জীবনে কোনও দিনও পাশবিক অত্যাচার করতে না পারে। কী সাঙ্ঘাতিক না! পশুপালক মনুষ্যজাতির চরিত্রে নৃশংসতার উদাহরণ খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এমন হীন নির্দয়তার কোনও তুলনা নেই।

তবে, প্রভঞ্জনের মনে হয়েছে, যৌনবোধ না থাকা একদিক থেকে হয়তো ভাল। শুভা যখন বলত, ও-সবে আমার ঘেন্না করে, ও বলত, আমার করে না, আমার দরকার তুমি মেটাচ্ছ না, আমার ওপর তুমি অবিচার করছ। সন্নাসীর জীবন যদি কাটাতে হয়, তবে আশ্রমে থাকব। সংসার সাজিয়ে বসে থেকে লাভ কী? লোকের চোখে ধুলো দেওয়া।

শুভা বলে, আমার বয়সে সব মেয়েই লোকের চোখে ধুলো দেয়। ওদের সাজগোজ দেখে, খোপা দেখে, নেকলেসের নীচের বাঁধাই দেখে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। স্বামীরা এতে গর্ববোধ করে। লোকেরা হিংসে করছে, দেখো, দেখো কী জুটি, যেন মেড ফর ইচ-আদার। তুমিই কেবল ঘ্যানঘ্যান করো। যদি অতই শখ, তো আর একটা বিয়ে করো না! ঘাড়ের উপর দু'-দুটো মেয়ে, কোথায় তাদের কথা ভাববে, তা না, আমার সুখ আমার আনন্দ। স্বার্থপর। আগে তো এমন ছিলে না? বলতে বলতে শুভার গলা ধরে যায়। তারপর থেকে প্রভঞ্জন চুপ করে গেছে।

এক শনিবার ছুটির মুখে চন্দন সরকার ফোন করল। ঠিকেদার।

কী করছেন ছুটির পর?

কী আর করব? বাড়ি যাব।

আরে, বাড়ি তো আমিও যাব। তার আগে কোথাও একটু বসলে হয় না? ঠান্ডায়। বাইরে যা গরম। অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।

প্রভঞ্জন রাজি হয়ে যায়।

চন্দন সরকার লোকটা খারাপ না। বন্ধুর মতো ব্যবহার করে। কখনও মুখ ফুটে চায় না কোনও

অনুগ্রহ। নানান দিকে ওর ব্যবসার শাখাপ্রশাখা ছড়ানো। প্রভঞ্জনের মতো মানুষকে খুশি করার ওর তেমন কোনও দরকারও নেই। কেবল সম্পর্কটা একটু গাঢ় করে রাখা। যারা কাজে লাগে, তাদের মন ভিজিয়ে রাখার জন্যে মাঝে মাঝে এই রকম ডাকে। ঘন্টা দুয়েক নিরিবিলিতে বসে একটু গল্পগুজব করে চলে যায়। এটা ওর পি আর প্রোগ্রামের অন্তর্গত। অন্য সময় ওর কর্মচারীরা আছে। ওর ম্যানেজার আছে, তারাই যোগাযোগ করে।

দুটো কি তিনটে করে জিন বা ভোদ্‌কা, খানিকটা কাবাব আর চিংড়িমাছ ভাজা—এতেই চারশো টাকার বিল উঠে যাচ্ছে আজকাল। প্রভঞ্জনের গা করকর করে। চন্দন সরকারের কাছে চার-পাঁচশো টাকা হাতের ময়লা। সে ময়লাও ও ঘাঁটে না। পকেট থেকে ক্রেডিট কার্ড বার করে দেয়।

সেদিন কী হল, কথায় কথায় চন্দন বলল, বেশিদিন আর বাঁচব না দাদা।

কেন, কী হল আবার?

ওর বুকে পেসমেকার আছে প্রভঞ্জন জানত। সুতরাং হার্ট নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। এসব লোকের আর কী সমস্যা থাকতে পারে?

চন্দন সরকারের গায়ে দামি ডোরাকাটা হাফশার্ট। তার কলারটা ধবধবে সাদা। সেই সাদা কলার সরিয়ে, গেঞ্জির ভাঁজ তুলে একটা আব দেখাল। ডান কাঁধের ওপর, গলার একটু নীচে। ওর ফরসা চামড়ার উপর শাঁকালুর মতো দেখাচ্ছে।

একটুখানি দেখিয়েই আবার তুলে দিল শার্টের কলার।

এ তো আব। টিউমার। অনেকেরই থাকে। আমার কোমরের নীচে দুটো আছে লজেন্সের মতো। আট-দশ বছর। ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, ওরা বলল, লেট দি স্লিপিং ডগ লাই।

প্রভঞ্জন ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দেওয়ার চেষ্টা করছে। বলল, আমার বউয়ের ওভারিতে ছিল এক থোকা। আঙুরের মতো। গাইনি বলেছিল চকোলেট টিউমার। থাক না নিজের মনে। মেনোপস্‌ হলেই আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। গেল তো।

এইসব পারিবারিক গোপন কথা ঠিকেদারকে কেউ বলে না। প্রভঞ্জন বলল। মন খুলে বলল। ঠান্ডা ঘরে মাংস ভাজার গন্ধ ভাসছে। জিভে একটা টক-মিষ্টি স্বাদ। মাথার ভেতরে টান টান স্নায়ুর বান্ডিল অ্যালকোহল পেয়ে নেতিয়ে আছে। এই সময় মুখের আড় থাকে না। তা ছাড়া চন্দন সরকার, সফলতার গৌরবে উদ্ভাসিত এই চরিত্রকে হঠাৎ অসহায় দেখে করুণা জেগেছে প্রভঞ্জনের মনে।

চন্দন বলল, কোনদিন কাগজে চওড়া চারকোনা বিজ্ঞাপন দেখবেন—হেভেনলি অ্যাবোড না কী যেন বলে, আমি সেখানে চলে গেছি।

যাঃ, কী যে বলো ব্রাদার। এত ভেঙে পড়ার কী হয়েছে? বললাম না—

আপনাদের টিউমার আর আমার টিউমার এক জিনিস নয় দাদা। এই সেদিনও শালা এইটুকু ছিল। ক্রমশ বাড়ছে। ভিতরে ভিতরে আমায় কুরে খাচ্ছে, টের পাই। ও শালা হল গিয়ে টিপ অফ দি আইসবার্গ।

ডাক্তার কী বলে?

বায়প্সি করবে। আমি দিন পিছিয়ে যাচ্ছি। জানি, ধরা পড়লেই শুইয়ে দেবে। তারপর ছেঁকা দিয়ে আমায় মেরে ফেলবে। আমি ক্যান্সার পেশেন্ট দেখেছি—দাদা। মাথার চুল সব পড়ে যায় মরবার আগে। উঃ কী বিচ্ছিরি।

বলতে বলতে চন্দন সরকার আবেগে অভিভূত হয়ে যায়। ঢক ঢক করে গ্লাস খালি করতে গিয়ে ওর চোখ ভরে ওঠে জলে।

আপনি জানেন না দাদা, আমার কমার্শিয়াল আর্টের ডিপ্লোমা ছিল। প্যাকেজ ডিজাইনে সুনাম ছিল আমার। রাইট ট্র্যাকে থাকলে চাই কী একদিন সত্যজিৎ রায়ের মতো নাম করতে পারতাম। না, না, হাসবেন না, আমার সে ক্যালিবার ছিল। ক্যালিবার না থাকলে আজ এত বড় বিজনেস খাড়া করলাম কী করে? দেড়শোটা ট্রাক আমার, চারশো সত্তর জন স্টাফ। বছরে পাঁচ কোটি টার্নওভার। অথচ মরে গেলে একটা অবিচুয়ারি বেরোবে না। চার লাইনও লিখবে না কেউ। কেন? না আমি রং ট্র্যাকে চলে গেছি। বিজ্ঞাপন দিয়ে লোককে জানাতে হবে, কবে জন্মদিন, কবে তিরোধান দিবস, কারা কারা আমার জন্য শোক জানাচ্ছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা গলে যাবে, তাতে কী? বিজনেস এক্সপেন্ডিচার। কিন্তু চার

লাইন অবিচুয়ারি। বলুন, আমি কি তার যোগ্য নই? যোগ্য ছিলাম না?

বলতে বলতে চোখ মুছল চন্দন সরকার। বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না, প্রভঞ্জনের মনে হয়েছে অনেকবার, নীরবে নিভে যাওয়ার কথাই ভেবে এসেছে। একটা চার লাইন অবিচুয়ারির জন্য কোনও কোটিপতি ব্যবসায়ী কাতর হয়ে কাঁদতে পারে, ও কল্পনা করেনি।

আমার কোনও বন্ধু নেই, জানেন দাদা, আবার শুরু করল চন্দন, আছে ফ্যামিলি, স্টাফ আর ক্লায়েন্টস। এরা কেউ আমার কষ্ট বোঝে না। আপনিও বুঝবেন না হয়তো।

না, আমি বুঝতে পারছি ব্রাদার। কিন্তু কী বলে তোমাকে সান্ত্বনা দেব ভেবে পাচ্ছি না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—

ধুর। ভগবান কী করবে। সে খালি চেয়ে চেয়ে দ্যাখে আমাদের ভুলগুলো। আর মিটিমিটি হাসে। প্রার্থনা যদি করতে হয়, রমলার কাছে গিয়ে করব। যাবেন দাদা, আমার সঙ্গে একটু যাবেন? খুব ভাল মেয়ে রমলা। কাছেই থাকে। একটা ফোন করে দেখি না!

হ্যাঁ বা না, কিছুই বলতে পারে না প্রভঞ্জন। আমার কোনও বন্ধু নেই—এই কথাটা ওর মাথার মধ্যে, আরও ছোট হয়ে, কেবল 'বন্ধু' নেই, 'বন্ধু' নেই শব্দে ঢং ঢং করে বাজতে থাকে।

গাড়িটা ওখানেই পড়ে রইল। ওরা হাঁটতে হাঁটতে এ-গলি ও-গলি ঘুরে একটা পুরনো বাড়ির সামনে পৌঁছোয়। নীচের তলায় একটা দোকান। সেখান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট আর কী একটা জিনিস কিনল চন্দন সরকার। তারপর হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করল।

একটা ঝরঝরে পুরনো লিফ্‌ট পড়ল সামনে। লিফ্‌টম্যান ওকে সেলাম করল। তারপর টলতে টলতে লিফ্‌টটা ওদের তুলে নিয়ে গেল চার তলায়। দরজায় বেল টিপতেই এক পরিচারিকার মুখ দেখা গেল।

সে বলল, আসুন। দিদিকে খবর দিচ্ছি।

জীবনে কোনওদিন গণিকালয়ে যায়নি প্রভঞ্জন। অনেক রকম গল্প শুনেছে গণিকাপল্লির। পত্রপত্রিকায় বিবরণ পড়েছে তাদের দুর্বিষহ জীবনের। আবার আগেকার কালের বাইজিদের নৃত্যগীতময় করুণ জীবনযাপন—তা নিয়ে ঢের গল্প উপন্যাসও ওর পড়া। কিছুর সঙ্গেই এই জায়গাটা মিলল না। কিন্তু বসার ঘরের আসবাব, দেয়ালের রং, পরদা, মেঝের উপর ছেঁড়া কার্পেট আর এক বিচিত্র ধূপের গন্ধ ওকে নির্ভুলভাবে জানিয়ে দিল, এই ফ্ল্যাটটা আসলে একটি গণিকালয়। এটি কারুর বাসগৃহ হতে পারে না।

আপনারা বাইরে বসে কেন, ভেতরে আসুন।

ওই রমলা। বলল, আমার টেলিফোন খারাপ। কেউ লাইন পাচ্ছে না।

শুভার চেয়ে দেখতে অনেক ভাল। হয়তো কম বয়স বলে ও রকম মনে হচ্ছে। এই রকম একজন মেয়ে সঙ্গী পেলে আর একবার নতুন করে সংসার পাতা যায়। ভালবাসা যায় জীবনকে। হঠাৎ প্রভঞ্জনের মনে হল। এই প্রথম মৃত্যুর এক বিকল্প ধারণা খেলে গেল ওর মাথার মধ্যে।

চন্দনের ক্যান্সার হয়েছে। রমলা ছাড়া আর কোনও বন্ধু নেই। একটু আগে ও বলছিল। এখন রমলা এগিয়ে আসছে দেখে উঠে দাঁড়াল ও। বলল, আমি এসেছি। তোমার কোনও অসুবিধে হল না তো?

না, না। ভিতরে এসে বসো। তোমার সঙ্গে যিনি এসেছেন তাঁকে তো আগে দেখিনি।

আমার ফ্রেন্ড। খুব ভাল লোক। এ রকম সৎ মানুষ তুমি আজকাল দেখতে পাবে না। অনেক বছর ধরে তো দাদাকে আমি দেখছি। আজ তোমার সঙ্গে পরিচয় করাতে নিয়ে এলাম।

আমার কিন্তু একটু দুষ্টু লোকই বেশি পছন্দ, রমলা হাসতে হাসতে বলল। যেমন তুমি। সেই যে গেলে, তারপর আর দেখাই নেই। বলেছিলে সামনের বুধবার আসব, রমলা তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, সে-কথা আর কাউকে বলা যায় না। ওমা, তারপর কত বুধবার এল আবার চলে গেল। বাবুর আর পাত্তা নেই। আমি মনে করি, দরকার বোধহয় ফুরিয়ে গেছে।

রমলার খোঁপায় জড়ানো সোনালি জরির ফিতে। কানের ঝুমকো কথা বলার সময় দুলছে। খোঁপায় গোঁজা একটা সোনার মতো কাঁটা দূর থেকেও দেখা যায়। প্রভঞ্জন ওর মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখছে না। হঠাৎ ও লক্ষ করে, রমলার নাকে একটা নাকছাবিও আছে। বাঁ দিকে। লাল পাথর দেওয়া। আশ্চর্য, ঝুমুর, ওর বড় মেয়ে ঝুমুরও তো ওই রকম নাকছাবি পরে। ওটা আগেকার ফ্যাশান, আজকাল আবার উঠেছে। নাকছাবি পরলে মেয়েদের ভালই দেখায়। অথচ শুভা, ওর বউ, গায়ে কোনও গয়না পরবে

না। আগে তবু গলায় হার, কানে ফুল পরত। এখন সব ছেড়ে দিয়েছে। হেডমিস্ট্রেস হলে নাকি অলংকার পরতে নেই। মেয়েরা হাসে। যত সব বাজে কথা। তোমার স্কুলে তুমি হেডমিস্ট্রেস হও না গিয়ে। বাড়িতে তো তুমি কারুর মা, কারুর বউ, এটা ভুলে যাও কেন?

চন্দন উঠে গিয়ে রমলার হাত ধরল।

বলল, চলো, দরকারি কথাটা আগে সেরে নিই।

রমলা বলল, ভেতরে যাও, আমি আসছি।

বলতে-না-বলতে হলুদ পরদার ভিতরে ঢুকে গেল চন্দন। প্রভঞ্জন রয়েছে, সেটা যেন ওর মনে নেই।

রমলা এবার প্রভঞ্জনের আর একটু কাছে এগিয়ে আসে।

এসব আপনার ভাল লাগবে না, আমি বুঝতে পারি।

না, তা নয়। আমার সবকিছু কেমন অদ্ভুত লাগছে। আপনার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। প্রভঞ্জন বলেই ফেলল।

আমার জন্য আপনার কষ্ট হচ্ছে। ওমা, তাই নাকি।

এ তো ভাল লক্ষণ না।

ঘরের মধ্যে একটা কষ্টের গন্ধ।

রমলা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর খোঁপা থেকে সোনার কাঁটাটা বার করে এনে বলে, ডান হাতটা বাড়ান তো।

প্রভঞ্জন ডান হাত বাড়িয়ে দেয়। কিছু একটা নেওয়ার জন্য হাতের পাতা চিত করে দেয়।

না, না, ওভাবে নয়। হাতটা উপুড় করুন।

তারপর ওর উপুড়-করা হাতের চামড়ার ওপর কাঁটাটা বুলিয়ে দেয়। কাঁটার ডগায় এক টুকরো তুলো।

এবার দেখুন তো, কষ্টের গন্ধটা চলে গেছে কিনা।

হাতের উলটোপিঠ নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকল প্রভঞ্জন। আতর। এই গন্ধটাই তো পাচ্ছিল এতক্ষণ ক্ষীণভাবে। এখন বেশ উগ্র।

ঘরটার বাঁ দিকে বসানো টেপ ডেকের পাশে ডাঁই করা অডিও ক্যাসেট। রমলা একটা ক্যাসেট বেছে নিয়ে ঢুকিয়ে দেয় ক্যাসেট প্লেয়ারের মুখের মধ্যে।

বিসমিল্লা দিলাম। এবার আপনার মন ভাল হয়ে যাবে। আমি যাই?

প্রভঞ্জনের মাথার মধ্যে নেশার রেশ এখনও রয়েছে বেশ। ও ভেবেছিল নেশাটা কাটিয়ে বাড়ি ফিরবে। হাতঘড়ি উলটে দেখল সাড়ে পাঁচটা। চোখ বুজে চুপ করে বসে ও সানাই শুনতে লাগল। খারাপ মন ভাল হবার আগেই ও ঘুমিয়ে পড়ল। কোলের ওপর হাতদুটো রাখা, মাথাটা ঝুঁকে রয়েছে বুকের ওপর। আর অল্প অল্প নাক ডাকছে প্রভঞ্জনের।

কতটুকুই বা সময়। আধ ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তার মধ্যে অনেকগুলো বিয়েবাড়ির স্বপ্ন দেখে ফেলে প্রভঞ্জন। স্বপ্নের উপর মানুষের কোনও হাত থাকে না। না হলে ও বার বার রমলাকে দেখল কেন? কনে সেজে বসে রয়েছে রমলা। পরনে লাল রঙের বেনারসি শাড়ি। মাথায় ঘোমটা। রমলার আঁচলে গাঁটছড়া বাঁধা। পিছনে দাঁড়িয়ে একটা লোক। তার মাথায় সাদা টোপর। তার মুখটা ফেরানো অন্য দিকে। অনেক চেষ্টা করেও লোকটাকে ও শনাক্ত করতে পারল না।

স্বপ্নে দেখল, চন্দন সরকারের সঙ্গে ঝুমুরের বিয়ে হচ্ছে। মেয়েরা ওদের ঘিরে উলু দিচ্ছে। ঝুমুর কাঁদছে। বাড়ি-ভরতি লোক সেজেগুজে এসে জড়ো হয়েছে। সকলের মুখে উৎসবের আনন্দ। কেবল প্রভঞ্জন একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে রাগে—না, এ-বিয়ে হতে পারে না। এ-বিয়ে হতে দেওয়া যায় না। ঝুমুরকে ও বলছে, কাঁদিস না মা, আমি তো রয়েছি, তোর কোনও ভয় নেই। যত বড়লোকই হোক চন্দন, ওর ক্যান্সার আছে। ওর সিল্কের চাদর ঢাকা বুকের ওপরে একটা ম্যালিগনান্ট আব আছে, প্রভঞ্জন জানে। স্বচক্ষে দেখেছে ও। ওই টিউমারের জড় ভেতরে সেঁধিয়ে গেছে অনেক দূর অবধি। ফুসফুস, হার্ট, পাকস্থলী, কণ্ঠনালী সর্বত্র কালো সুতোয় জড়ানো। চন্দন লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে টিউমারটা। তাতে কী। বাপ হয়ে প্রভঞ্জন কী করে চুপ করে দেখতে পারে এই দৃশ্য?

স্বপ্নের মধ্যে ও শুভাকে খুঁজে বেড়ায়। কোথাও ওকে খুঁজে পায় না। যেদিকেই যায়, দেখে, ওর

ছোটমেয়ে চুমকি অনভ্যাসের শাড়ি নিয়ে লটপট করছে।

মা কোথায়? মা কোথায়?

চুমকি বলে, মা তো এখনও ফেরেনি।

ফেরেনি কী? ঝুমুরের বিয়েতেও শুভা অনুপস্থিত, তা কি হয়। কীসের এত কাজ? ছুটি নেয়নি কেন? স্বপ্নের মধ্যেই ওর প্রচণ্ড রাগ হয়ে যায় স্ত্রীর ওপর। তারপর হঠাৎ জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, অন্য এক বাড়িতে ম্যারাপ বাঁধা। একটা মালায় জড়ানো অ্যামবাসাডার গাড়ি থামল বাড়িটার সামনে। তার মধ্যে শুভা বসে রয়েছে। একা একলা ওই গাড়ির মধ্যে বসে কী করছে শুভা?

সবকিছু যেন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, প্রভঞ্জনের মনে হল কোনওদিন কি ও রুখে দাঁড়াতে পারবে না? নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না? রুখে দাঁড়াবার কথা মনে হতেই দেখে, সামনে দাস সাহেব দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্বপ্নের মধ্যে প্রভঞ্জন আবার সিঁটিয়ে যায়। দাস সাহেবের পাশে ওটা কে? করবাবু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

চটকা ভাঙতে ওর কানে এল, কে যেন বলছে, বাবু, রাত হয়ে যাচ্ছে, আপনি বাড়ি যান। ও উঠে দাঁড়ায়। পরিচারিকা দরজা খুলে দিতেই ও বেরিয়ে আসে দৌড়ে। তারপর এ-গলি ও-গলি পার হয়ে হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে একসময় দেখে, সামনে চৌরঙ্গি রোড। হাতঘড়িতে সাড়ে আটটা। হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামাল প্রভঞ্জন।

সেদিন রাত্তির এগারোটা বাজিয়ে বাড়ি ফিরেছিল শুভা। মেজাজটা খিঁচড়ে ছিল, কেননা, সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে ওর এতটা রাত হয়ে যায়। সল্ট লেক থেকে ওই সময় একা কেউ ফেরে না। একজনের সঙ্গে গাড়ি ছিল। টালিগঞ্জ যাওয়ার পথে ওকে নামিয়ে দিয়ে গেল। কথা ছিল, প্রভঞ্জন তিনটের মধ্যে ফিরে আসবে। তারপর আত্মীয় বাড়ির নেমন্তন্ন রক্ষা করতে দু'জনেই যাবে। ছ'টায় মিনিবাস ধরলে সাড়ে সাতটায় করুণাময়ী। ওখান থেকে ন'টার মিনি পেলে সাড়ে দশটার মধ্যে বাড়ি। তা হল না।

প্রভঞ্জন ফেরেনি কথামতো। সাতটা অবধি দেখে ও একাই বেরিয়ে গিয়ে স্টেট বাস ধরে। না গেলেই পাবত। অতটা দূর। তা ছাড়া মেয়েরা বাড়িতে থাকবে। একটা টেলিফোন করে দিলে চুকে যেত—ভাই, ও এখনও ফেরেনি, আমার শরীরটাও ভাল নেই। আর একদিন আসব। ভাইয়ের বউ কিছু মনে করত না।

কিন্তু প্রস্তুত হয়ে এক ঘণ্টা হাঁ করে স্বামীর ফেরার পথ চেয়ে অপেক্ষা করার পর শুভার মনে হয়েছিল, ও কি এতই পরনির্ভর? প্রভঞ্জন সঙ্গে না থাকলে ও কি সল্ট লেকে যেতে পারে না? ও তো পরদানশিন মহিলা নয়। তাই একাই চলে গেল। ফিরে এসে শুনবে মা চলে গেছে। তখন প্রভঞ্জনের লজ্জা হবে।

লজ্জিত ক্ষমাপ্রার্থী লোকটাকে ফিরে এসে দেখতে পাবে, এই আশায় বাড়ি ঢুকেছিল শুভা। তার বদলে শুনল, 'আজ বাবা দেবাশিসদাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে।' ছোট মেয়ে চুমকি রিপোর্ট দিল।

কখন ফিরেছে বাবা?

চুমকি একটু বাড়িয়ে বলেছিল, সাড়ে ন'টার পর।

তুই কী করছিলি তখন?

এই ঘরে বসে পড়াশোনা করছিলাম। (আসলে ও তখন বসে বসে টিভি দেখছিল। বাইবের ঘরে।)

আসলে শুভা বেরিয়ে যাওয়ার পর ঝুমুর দেবাশিসকে ফোন করে। কলেজে এক বছরের সিনিয়র ছেলেটা কাছেই থাকে। এ-বাড়িতে একেবারে অপরিচিত নয়। দেবাশিস আসার পর ঝুমুর ওর সঙ্গে বসে নিজেদের ঘরে গল্প করতে থাকে। একবার গুপী গাইনের ক্যাসেটটাও চালিয়েছিল। চুমকিও শুনেছে। খুব মজা হয়েছে তখন। বাড়িতে বাবা-মা কেউ না থাকলে কেমন ফ্রি লাগে না। আর দেবাশিসদা এত মজার মজার গল্প জানে। ও এলে আড্ডা জমে যায়।

ঝুমুর বসে ছিল মুখ ভার করে। মায়ের সঙ্গে ও কথা বলছিল না। হয়তো কেঁদেওছে খানিকটা।

দেবাশিসের অপমান ওর বুকেও বেজেছে। ও-ই তো বাড়িতে আসতে বলেছিল। তখন কি জানত, বাবা হঠাৎ অ্যাপিয়ার করে মারমূর্তি ধরবে।

চুমকি বলে, না, ওদের ঘরের দরজা বন্ধ ছিল না। ভেজানো ছিল। টিভি-র শব্দ আসছিল বলে ওরা ঘরের দরজা ভেজিয়ে দেয়। পড়াশোনায় ব্যাঘাত হচ্ছিল তো। এই যাঃ! টিভি-র কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ ফসকে।

কিন্তু অত মন দিয়ে শুভা সবকিছু শুনছিল না। ও জানতে চাইছিল সংবাদের সারাংশ। চুমকির রিপোর্ট ক্রমশ নিজস্ব সংযোজনের চেহারা নিচ্ছে দেখে ও বড় মেয়েকে বলে, তুই বল না, কী হয়েছে। ন্যাকামো করছিস কেন?

ঝুমুরের প্রতিবেদন সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।

বাবা এসে ভেজানো দরজা ফাঁক করে খুলল। তারপর ওকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী? কী পড়ো? কোন ইয়ারে? কীসে অনার্স? তোমাকে আগে দেখেছি বোধহয়। আমার ধারণা ছিল তুমি ওর ক্লাসমেট। আর ক্লাসমেট হলেই বা কী? আমি জানতে চাই, তোমার এখানে কী দরকার?

বলতে বলতে বাবা রেগে ওঠে।

তুমি ওর টিউটর নও। তোমার বিষয় আলাদা। তোমার রেজাল্টও এমন কিছু ব্রিলিয়ান্ট নয় যে, ঝুমুরকে তুমি গাইড করবে। কেমন? তা ছাড়া বিনা স্বার্থে, শুধু পরোপকার করার উৎসাহে কেউ অপরের বাড়ি যায় না। ওসব ভাঁওতার কথা ছাড়ো। তুমি অন্য কোনও টানে এখানে আসো, কেমন? না, না, তোমাকে ডাকলেই বা তুমি আসবে কেন? তোমার নিজের কাজকর্ম নেই? এটা কি বাড়ি, না আড্ডাখানা? দরজা ভেজিয়ে ঘরে বসে দু'জনে গুজগুজ ফুসফুস করছ, আমি তো স্বচক্ষে দেখলাম। এসব আমি বরদাস্ত করব না। আমার মেয়েকে, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই শাসন করব। কিন্তু তুমি, কী নাম বললে যেন, দেবাশিস, তুমি আর এ-বাড়িতে আসবে না। কেমন? তোমার বইখাতা ক্যাসেট ম্যাসেট যা আছে সব তুলে নিয়ে চলে যাও।

তারপর?

তারপর দেবাশিসদা মুখ নিচু করে চলে গেল। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, খাবার দেব? বাবা বলল, খেয়ে এসেছি। এক গ্লাস জল দে। তারপর জল খেয়ে শুয়ে পড়েছে। আমরা খেয়ে নিয়েছি।

ঠিক আছে। যাও, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো তোমরা।

শুভার নিজেরও খানিকটা অপরাধবোধ জাগে।

একলা বাড়িতে থাকে দুটো মেয়ে। সন্ধের পর ওদের বাবা বাড়ি ফেরে। ও নিজেও রোজ স্কুলের পরই বাড়ি আসতে পারে না। কিছু-না-কিছু কাজ থাকেই। কাজের অছিলা থাকে। বাড়িটা নিরানন্দ, সেখানে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। স্কুল থেকে বেরিয়ে একা-একা রাস্তায় ঘোরে শুভা,—নন্দন, রবীন্দ্রসদনে ঢুকে সময় কাটিয়ে যায়। উঠতি বয়সের মেয়ে, ওদের চোখে চোখে রাখা তো বাপ-মায়ের কর্তব্য। সেই কর্তব্যে ত্রুটি হচ্ছে। আজ প্রথম দিন নিশ্চয় দেবাশিস আসেনি। এর আগেও এসেছে। শুভার অনুপস্থিতিতে ও আসে। ওকে দেখে অবশ্য খারাপ ছেলে বলে মনে হয় না। ঝুমুরের বন্ধু। প্রায় সহপাঠীই। ওর মনে হয়, ঝুমুরের বয়সে আমিও একজন মনের মতো পুরুষ বন্ধুর জন্যে ব্যাকুল হয়েছি। এটা কিছু অস্বাভাবিক না। তবে হ্যাঁ, এই বয়েসের ছেলেমেয়েকে চোখে চোখে রাখা দরকার। কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে এরা কখন কী করে বসবে তার ঠিক নেই। আর একটু বয়স হোক, নিজের সম্পর্কে দায়িত্ববোধ জাগুক, তখন ছেড়ে দেওয়া যায়। চুমকিটা তো আরও ছোট। দিদির দেখাদেখি সে-ও পেকে যাচ্ছে অকালে। না হলে, দু'জনকে নিভৃতে রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে ও? সুযোগ করে দেয়? কী সাংঘাতিক।

তবু শুভার মনে হয়, আলটপকা দেবাশিসকে অপমান করা প্রভঞ্জনের উচিত হয়নি। ওর অপছন্দের কথা শুভাকে বলতে পারত। শুভা মা, সে দেখত এ-ব্যাপারে কী করা উচিত। মিষ্টি করেও তো মানুষকে বিদেয় করা যায়, সাবধান করা যায়, তাই না? সংসারের খুঁটিনাটিতে তোমাকে নাক গলাতে কে বলেছে? আর, বেশি দোষ তো তোমার মেয়ের, তাকে কিছু বললে না, একটা নিরপরাধ ছেলেকে দূর করে দিলে? মাথার ঠিক ছিল তো? নাকি নেশা করে এসেছে আজ?

প্রথমে ভেবেছিল, রাতটা কাটুক, কাল সকালে এর মোকাবিলা করা যাবে। নিজের ঘরে শুয়ে

ঘুমোচ্ছে মানুষটা, ঘুমোক। কাল রবিবার। কথা বলার অঢেল সময়।

কিন্তু একটা কথা মনে হলে তার নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত স্থির থাকতে পারে না শুভা। ওর ধৈর্যশক্তি কমে গেছে আজকাল। সারারাত ও ঘুমোতে পারবে না এই ঘটনা শোনার পর। সত্যি, যদি বেশি মদ খেয়ে এসে, মদের ঝোঁকে আবোলতাবোল বকবক করে থাকে, তা হলে ওই দেবাশিস ছেলেটার কাছে ওর লজ্জার শেষ থাকবে না। সে-ই ফোন করে বলবে, ঝুমুর, তোমার বাবার মাতলামি কাল দেখলাম, আমি তো স্তম্ভিত। স্বাভাবিক অবস্থায় ভদ্রলোক কী নিরীহ, কী ভালমানুষ!

কতদিক সামলাবে শুভা? কতজনের মুখ চাপা দেবে? কতজনের চোখে ধুলো দেবে? এই সংসারে কিছুই কি ঠিকমতো চলবে না? আর কিছু না, একটু শান্তি চায় শুভা, তা-ও পাওয়ার জো নেই। যত ঝকমারি এই বাড়িটাতে এসে জোটে। ভাবতে ভাবতে, এতক্ষণ পর ওর কান্না পায়।

মেয়েরা শুয়ে পড়ার পর ও নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। কাপড় ছাড়ে। সাবান দিয়ে ভাল করে হাত-মুখ ধোয়। থপ থপ করে খানিকটা জল থাবড়ায় মাথার চাঁদিতে। কী গরম আজ! ঘামে-ভেজা ব্লাউজটা খুলে কাচতে দিল। ব্রেসিয়ারটা বুকের ওপর এঁটে বসেছে, পিছন দিকে হাত ঘুরিয়ে হুক খুলতেই খুব আরাম বোধ করে শুভা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতে গিয়ে ও নিজেকে একবার ভাল করে দেখল এখন। না, ফিগারটা খুব খারাপ না এখনও। মাথার চুলগুলো পেকে যাচ্ছে কী তাড়াতাড়ি! লোকে তো ওইটাই দেখতে পায়। দেখে ভাবে, ওই যে বুড়ি চলল! লোকে তো ফিগারটা দেখতে পায় না!

যে দেখত, তাকে আলাদা করে দিয়েছে শুভা। কেননা কষ্ট হয়। ডাক্তার একবার বলেছিল এই কথা; স্বামীর সঙ্গে শুতে কষ্ট হয়? হ্যাঁ, কষ্ট হয়। কিন্তু উনি এত জোর করেন! ডাক্তার বলেছিল, ন্যাচারালি। অর্থাৎ উনি তো জোর করবেনই। আব, আপনারও কষ্ট হবেই। নিজেদের মধ্যে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিন। এই ঘরে ছিল দু'খানা খাট, তার একখানা সরিয়ে দিল ও ছোট ঘবটায়। ছোট হলে কী হবে, দক্ষিণ দিক খোলা। ঘরটায় হাওয়া খেলে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে মেয়েদের ঘরটাই সবচেয়ে খারাপ। একদম হাওয়া ঢোকে না। শীতকালে হিম ঠান্ডা। সেখানে আজ এসেছিল দেবাশিস। ঝুমুরের সঙ্গে ওর ভাব। ভাব ঠিক জমেনি এখনও মনে হয়, তবে ওর প্রেম করার খুব ইচ্ছে। ঝুমুরকে ওর খুব পছন্দ। ছেলেটা বাচ্চা মতন, কুড়ি-একুশ বছরের ছেলে কী আর হবে! কী করলে ঝুমুর খুশি হবে, কী বললে চুমকি হাসবে, কী রকম ব্যবহার করলে মাসিমা আপত্তি করবে না, তাই চেষ্টা করে ও। এক এক সময়ে বোকামিও হয়ে যায়। প্রভঞ্জনও তো এই রকমই ভিতু ছিল ওই বয়েসে। আজ হম্বিতম্বি করলে কী হবে?

বেশি রাত্রে শুভা পা টিপে টিপে স্বামীর ঘরটার দিকে এগিয়ে যায়। মেয়েদের ঘরখানা ছাড়িয়ে ডাইনিং টেবিল ঘুরে ওই ঘরখানা। বোধহয় বারান্দা ছিল আগে। তাই এত খোলামেলা। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপল। অন্ধকার জায়গাটা ভরে গেল আলোয়।

চোখ খুলে শুয়ে আছে প্রভঞ্জন। খাটের ওপর গিয়ে বসল শুভা।

শরীর ভাল আছে তো?

হুঁ।

আজ শনিবার, প্রভঞ্জনের হাফ-ছুটির দিন। কথা ছিল, ও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে, ফেরেনি। কথা ছিল, তারপর সন্ধেবেলা ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে যাবে সল্ট লেকের নেমন্তন্নে। সেখানে একা শুভাকে যেতে হল। ঢের ঝক্কি তো পোহাতে হলই যা প্রভঞ্জন সঙ্গে থাকলে গায়ে লাগত না। উপরন্তু নেমন্তন্ন বাড়িতে নানা কথা শুনতে হয়েছে ওকে। কেন ও একা, কেন স্বামী সঙ্গে নেই, আত্মীয়স্বজনের এইসব প্রশ্নের পিছনে কূট কৌতূহল থাকে, মেয়েরা তা সহজে বুঝে ফেলে এবং আরও সহজে একটা বানানো উত্তর দিতে ওদের অসুবিধে হয় না। তবু এই অপ্রস্তুত অবস্থা তো এড়ানো যেত।

এরপর প্রশ্ন হচ্ছে, সত্যি সত্যি কেন ও এল না? বেমালুম ভুলে গেল? তেমন লোক নয় কিন্তু প্রভঞ্জন। কথা দিলে ও কথা রাখে। অসুবিধেয় পড়লে বাড়িতে টেলিফোন করে দেয়। এ-ক্ষেত্রে তা করেনি। কী কাজে হঠাৎ জড়িয়ে পড়েছিল ও, যে একটা খবর পর্যন্ত দিতে পারেনি। বা, দিতে চায়নি, তাও হতে পারে। সে-ক্ষেত্রে বুঝতে হবে ওর মনের মধ্যে কোনও অসন্তোষ, কোনও ক্ষোভ, কোনও বিদ্বেষ ধোঁয়াচ্ছে। কী সেটা, জানা দরকার। তারপর জানা দরকার, কোথায় গিয়েছিল? কে-কে ছিল

সঙ্গে? সেখানে সবাই পুরুষ, না দু'-একজন মহিলাও ছিল। তারা কারা? তাদের সঙ্গে প্রভঞ্জনের সম্পর্ক কী রকম? তারা ওকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কিনা।

এবং শেষমেষ, ও বাড়ি ফিরে এসেই আলটপকা বাইরের ছেলেটাকে অপমান করল কেন? এ-কাজটাও ওর স্বভাববিরুদ্ধ। দেবাশিস চলে গেলে পর বাড়িতে ও রাগারাগি করতে পারত। ওর অপছন্দের কথা বুঝিয়ে বলতে পারত ঝুমুরকে। সাবধান করে দিতে পারত নিশ্চয়ই। তা-ও শুভার সঙ্গে পরামর্শ করার পর ওর মুখ খোলা ছিল সংগত। হঠাৎ রাগ প্রকাশ করল কেন?

এতগুলো অভিযোগ মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে। সেই সঙ্গে একটা অহেতুক আশঙ্কা মাঝে মাঝে আবজিয়ে উঠছে।

প্রভঞ্জন একটা ঘুম দিয়ে উঠেছে। জেগে শুয়ে আছে নিজের বিছানায়। মধ্যরাত। পা টিপে টিপে ওর স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকেছে। বাতি জ্বালিয়েছে। বিছানার ওপর এসে বসেছে চুপি চুপি। গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, শরীর ভাল আছে কিনা। শরীরের খবর নিয়েছে শুভা।

বহু প্রত্যাশিত একটি প্রেমের দৃশ্যের সূচনা হতে পারত এটা। বয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর অনিয়মিত প্রণয়, তার প্রস্তুতি এ ছাড়া আর কী ভাবে হবে? এই রকম এক-আধদিনের ঘনিষ্ঠতা থেকে আবার কিছুকালের মতো নিরাপদ দাম্পত্যজীবন অর্জন করা হয়। দেহ থেকেই প্রেমের উদ্‌গম, দেহেই তার বিরতি। দেহাতীত সম্পর্কে প্রেমের যে ছিবড়েটা সুখী দম্পতিরা চুষে চুষে প্রতিদিন দেখায়, তাতে স্মৃতি থাকে, শূন্যতা থাকে, অপূর্ণ প্রত্যাশা, অভিমান থাকে। রস থাকে না। বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে একে অপরের প্রতি কতখানি নির্ভরশীল, কতখানি সহানুভূতিপরায়ণ। মানুষই পারে, পশুরা এ রকম অভিনয় করতে অপারগ। বিবাহ নামক যুগ্ম জীবনের রীতি মানুষই তো আবিষ্কার করেছে কারণ তার রিরংসা ঋতুনির্ভর নয় পশুদের মতো। যৌবনকালে বারোমাস, তিরিশদিন সে কামনায় জর্জরিত হয়। নিত্যসঙ্গী একজন হাতের কাছে থাকলে তার কামনার নিরসন হয়, তাই বিবাহ। না থাকলে সে নীরবে হাহুতাশ করে। অথবা দেশোদ্ধারে নেমে যায়। এ-দেশের মহাপুরুষেরা অধিকাংশ চিরকুমার বা বিপত্নীক, তার পিছনে কি প্রতিহত যৌন জীবনের যোগ নেই?

শরীর ভাল আছে তো, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রভঞ্জন বলল হুঁ। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমিও প্রস্তুত।

আসামির বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ। কোন অভিযোগটা আগে তুলবে, কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল শুভা। তারপর জিজ্ঞেস করল, বাড়িতে ঢুকেই এমন একটা সিন করলে কেন?

তুমি এতদিন চুপ করে দেখে যাচ্ছিলে কেন?

ঝুমুর আর দেবাশিসের মেলামেশায় আমি কোনও দোষ দেখি না।

কেন আসে ও?

পড়াশোনা করতে। ঝুমুরকে সাহায্য করতে।

ব্যস, তাই? আর কোনও উদ্দেশ্য নেই?

বন্ধুত্ব। প্রায় সমবয়সি ওরা।

বন্ধুত্ব থেকে ঘনিষ্ঠতা, ঘনিষ্ঠতা থেকে প্রেম, প্রেম থেকে বিয়ে।

কী যা-তা বলছ! আজকাল ছেলেমেয়ের মেলামেশা অনেক সহজ হয়ে গেছে। বন্ধুত্ব থেকে প্রেম ধরে নেওয়া ভুল।

আজকাল গর্ভপাতও অনেক সহজ হয়ে গেছে।

তুমি কী বলতে চাও?

বলতে চাই, ওদের যা বয়স তাতে দু'জনে নিভৃতে ঘরের দরজা ভেজিয়ে খাটের ওপর বসুক, গায়ে গা লাগিয়ে অধ্যয়ন করুক, এ-ব্যাপারে ঝুমুরের বাবা হিসাবে আমার সমর্থন নেই। মাইনের টাকা জমিয়ে মেয়েদের জন্য গয়না গড়াচ্ছ, তা কি এই রকম নাবালক বাউন্ডুলে পাত্রের হাতে দেবে বলে? না, আরও যোগ্য, আরও ম্যাচিয়োর জামাই পাবে বলে? সে ওকে ভরণপোষণ করতে পারবে, সে সংসার চালানোর দায়িত্ব নিতে পারবে? একটা আনএমপ্লয়েড ছোঁড়ার হাতে মেয়ে দেবে তুমি?

একেবারে জামাই অবধি ভেবে ফেলেছ? শুভা চেষ্টা করে হাসল।

হ্যাঁ। আমি চাই না আমার মেয়েরা সংসার জীবনে আমাদের মতো অসুখী হোক।

শুভা বয়সের ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে। কিন্তু অসুখী হওয়ার জন্য শুধু কি ওদের সমবয়সই দায়ী? আর

কিছু দায়ী নয়? প্রভঞ্জন, ওর প্রথম জীবনের গ্রেগরি পেক মানুষ হিসেবে কোথায় গিয়ে পৌঁছোতে পারল? একে কি সফলতা বলে? ওর যৌবনের একমাত্র হিরো—তার ব্যর্থতা কি শুভার ভেতরটা শুকিয়ে দেয়নি? কে ভেবেছিল ও শেষ অবধি একজন ভিতু, উদ্যোগহীন, আনস্মার্ট, কামুক পুরুষে পরিণত হবে! হারতে হারতে কোণঠাসা হয়ে যাবে! একটা মাংসপিণ্ড। লোকেদের মেয়েরা নাচ শেখে, সাঁতার শেখে, গাড়ি চেপে ইস্কুলে যায়। লোকেরা সল্ট লেকে বাড়ি করে উঠে যাচ্ছে। আর ওরা সারা জীবন এই ভাড়াটে একতলায় পচবে। পনেরো-কুড়ি ভরি সোনা দিয়ে কী হয় আজকাল? প্রভঞ্জনের শোবার খাট সরিয়ে দেওয়ার মধ্যে শুভার অনেক দিনের জমা হতাশা, চাপা, না-বলা বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে।

ভুল হয়েছে?

শুভা স্বামীর মাথায় হাত বোলাতে লাগল। ওর জন্য কষ্টও হয়।

ও জানে না, প্রভঞ্জন একসময় আত্মহত্যা করার সংকল্প করেছিল। এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না, এই বোধ দ্বারা তাড়িত হয়েছিল বলা উচিত। কিন্তু আত্মহত্যারও তো পদ্ধতি আছে। শরীর সে কষ্ট পেতে চায় না।

ও জানে না প্রভঞ্জন গলায় দড়ি দেওয়ার কথা ভেবেছে। সবচেয়ে বেশি প্রচলিত পদ্ধতি ওটা। কিন্তু কী বীভৎস! ও কেরোসিনে স্নান করে গায়ে আগুন দেওয়ার কথা ভেবেছে। কিন্তু সাহস করেনি। যদি আধপোড়া অবস্থায় বেঁচে থাকতে হয়। বহুতল বাড়ির ছাদ থেকে লাফাতে গিয়ে পিছু হটে এসেছে পা সুড়সুড় করছিল বলে। ও ঘুরে ঘুরে ঘুমের ওষুধ সংগ্রহ করেছিল পঞ্চাশটা। শুভা যে-ওষুধ রোজ একটা করে খায় রাত্রে, তার চেয়ে চারগুণ তেজি বড়ি পঞ্চাশটা ওর সংগ্রহে ছিল এই সেদিন পর্যন্ত।

একদিন কাগজে খবর বেরুল, এক বিখ্যাত নাট্যকার ঘুমের বড়ি খেয়ে মরণাপন্ন। তাঁর শুভার্থীদের সঙ্গে দলে ভিড়ে প্রভঞ্জন গিয়েছিল হাসপাতালে। প্রথম দিন গিয়ে দেখা পায়নি। দ্বিতীয় দিন গিয়ে দেখে, তিনি কোমায় আচ্ছন্ন রয়েছেন। নাকে নল পরানো। হাতের শিরা দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গ্লুকোজ দেওয়া হচ্ছে। নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না। ভেবেছিল, এইভাবে একদিন সেই বিখ্যাত নাট্যকার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবেন। কাগজে ছবি বেরোবে। শোকসভা হবে। তাঁর নামে রাস্তা হবে কলকাতায়। কোথায় কী! দেড় মাস অচেতন থেকে ভদ্রলোক একদিন জ্ঞান ফিরে পেলেন। তারপর সেরে উঠে বাড়ি চলে গেলেন। কেন তুমি ঘুমের বড়ি খেয়ে মরতে গিয়েছিলে, কেউ তাঁকে এ-প্রশ্ন করেনি। ভাগ্যিস তিনি চিঠিফিঠি লিখে রেখে যাননি। কী লজ্জায় পড়তেন তা হলে? মরতে গিয়ে না-মরার চেয়ে আর লজ্জার কী থাকতে পারে? কেন আপনি বেঁচে আছেন, কোনও সাংবাদিক তাঁকে এখন যদি এই প্রশ্ন করে, কী উত্তর দেবেন নাট্যকার? জীবনে ঢের সংলাপ লিখে বিখ্যাত হয়েও এই সংলাপ উচ্চারণ করা দুরূহ। বেঁচে আছি মরতে পারলাম না বলে—এ কি বলা যায়! আমি মরতে চাই, ঠাকুর যে কেন নেন না, এ রকম কথা বুড়িরা বলে। তাদের মুখে শোভা পায়। কাশীতে এ রকম হাজার হাজার বুড়ি আছে। প্রভঞ্জন ওদের মতো না।

একদিন খুব ভোরে ওর ঘুম ভেঙে যায়। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়িটা প্রদক্ষিণ করে। দেখে, দুই পাশাপাশি ঘরে স্ত্রী-কন্যারা ঘুমোচ্ছে। এরা কে ওর? এরা কি ওর আপনার লোক? ওর মনে হয়, কী রকম আপনার? তারপর চুপি চুপি ছিটকিনি খুলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সেদিন ৮ বি বাসে চড়ে কালাকার স্ট্রিট পার হয়ে গিয়েছিল মল্লিকঘাট। রাস্তা থেকে উঠে গেছে ওভারব্রিজ। রেললাইন পার করে নেমেছে ঘাটের কিনারে। ডান দিকে মন্দির। ঘণ্টা বাজছে, রাধেশ্যামের গান হচ্ছে। ঢুকেই খানিকটা খোলা চত্বর। এক পাশে বটগাছ। ওই সকালে কেউ দানা ছিটিয়ে গেছে, এক ঝাঁক পায়রা মনের আনন্দে পুণ্যার্থীর দেওয়া দানা খুঁটে খাচ্ছে; গাছের নীচে ছায়া, সেখানে মস্ত এক কুস্তির আখড়া। গায়ে গুঁড়ো মাটি মেখে ল্যাঙট-পরা দু'জন জোয়ান কুস্তি লড়ছে। গঙ্গার দিকে মুখ ফেরাতেই হাওড়া ব্রিজ দেখা গেল। ওপর দিয়ে বাস যাচ্ছে পোকার মতো।

মল্লিকঘাটের ওপারে হাওড়া স্টেশনের লাল বাড়ি। মাঝখানে জলস্রোত। ঘাটের কাছে জলের গভীরতা কম। লোকেদের গলা ডুবছে না। তবু তার মধ্যে কেউ সাঁতার কাটছে ও দেখল। কেউ সূর্য প্রণাম করছে ভক্তিভরে। মেয়েরা লজ্জা বাঁচিয়ে ডুব দিচ্ছে। কাছেই জিলিপি-কচুরির দোকান এবং সুলভ শৌচালয়। ভাতের হোটেলে প্রস্তুতি চলছে মধ্যাহ্নভোজ রান্নার। মা ডেকচিতে ভাত চাপিয়েছে।

মেয়ে লঙ্কা বাটছে শিলে। হিন্দুস্থানি বাবা তরকারি কুটতে কুটতে সামনে-বসা বালক পুত্রকে পড়া মুখস্থ করাচ্ছে।

মন্দিরের বাইরে একদল ভিখিরিকেও দেখেছিল প্রভঞ্জন সেদিন। নানা জাতের, নানা বয়সের পুরুষ ও মেয়ে। ওরা মারোয়াড়ির বিলোনো পুণ্য মুড়ি চিবোচ্ছিল আর দুটো কুকুরের ঢলাঢলি দেখে হাসাহাসি করছিল—ওইটা, খালি শুঁকছে কিছু করছে না।

হাওড়া থেকে কোনও একটা ট্রেন ধরে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, এই রকম মতলব নিয়ে বেরিয়েছিল। মাঝপথে মল্লিকঘাটে নেমে যায়। সেখানে সর্বসন্তাপহারিণী ভাগীরথীকে বয়ে যেতে দেখল। কিন্তু প্রভঞ্জন জলে ডুবে মরার সাহসও দেখাতে পারেনি।

অনেকদিন পর স্ত্রীর আদর পেয়ে আস্তে আস্তে প্রভঞ্জনের মনটা নরম হয়ে যায়। কড়া কথাগুলো বলা হয়ে গেছে। চিত হয়ে শুয়ে ও শুভার শুকনো হাড়-বারকরা মুখখানা দেখতে পায়। মাস্টারি করে করে ওর শরীর থেকে লাবণ্য ঝরে গেছে। কী মনে হয়, হঠাৎ ডান হাতখানা বাড়িয়ে ও শুভার বুকের ওপর চেপে ধরে। জায়গাটা তলতল করছে। একটু ঝুলে আছে বুঝি। অনেকদিন পর নিজের স্ত্রীর বুকের ওপর হাত রাখল প্রভঞ্জন।

আর তখনই আতরের গন্ধটা নাকে লাগল শুভার। এ কী? এ কীসের গন্ধ? এ-গন্ধ তুমি কোথায় পেলে? সম্পূর্ণ অচেনা একটা উগ্র সুগন্ধ ওকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। ঠেলে সরিয়ে দেয় স্বামীর ডান হাত।

বলো তুমি কোথায় গিয়েছিলে? কোন চুলোয় মরতে গিয়েছিলে? বলো, তোমায় বলতেই হবে।

আস্তে। চেঁচাচ্ছ কেন? মেয়েরা জেগে উঠবে যে!

জাগুক। ওরাও শুনুক ওদের বাবার কীর্তিকাহিনী।

এতে কীর্তিকাহিনীর কী আছে গো! তুমিই তো বলেছ আর একটা বিয়ে করো। তোমার ঘেন্না করে এসব। তো, বিয়ে করে বাড়িতে এনে তুলিনি কাউকে। কারুর অমর্যাদা করিনি। আপিসের বন্ধুর সঙ্গে একটি যুবতী মেয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওর পরিচিত। সে হাতে লাগিয়ে দিল।

খারাপ মেয়ে?

আঃ, খারাপ, ভাল, আমি বুঝব কী করে? আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে। হেসে কথা বলেছে। কোনও অসভ্যতা করেনি।

ন্যাকামি কোরো না। আমার ধৈর্যের সীমা আছে—বলতে বলতে শুভার গলা ভেঙে যায়, বলো, সে-মেয়ে কি বেশ্যা? তুমি কি বেশ্যাবাড়ি গেছিলে আজ? সোজাসুজি জানতে চাইছি, তোমায় বলতে হবে।

আজকাল ছেলেমেয়ের মেলামেশা আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেছে, একটু আগে বললে না? যেখানে গিয়ে পড়েছিলাম, সেটা নোংরা না, সহজ মেলামেশার একটা জায়গা। আমার সতীত্ব সেখানে নষ্ট হয়নি, এটুকু বিশ্বাস করতে পারো।

আজ প্রথম, না আগেও গেছ?

আজ প্রথম। তবে আজই শেষ কিনা, তা বলতে পারছি না। হয়তো আবার একবার যাব তার কাছে। একা।

ধীরে ধীরে, স্পষ্টভাবে কথাগুলো যে উচ্চারণ করল, সে যেন আগের প্রভঞ্জন নয়। অন্য এক মানুষ।

পা টিপে টিপে যে-ঘরে ঢুকেছিল শুভা, সে-ঘর থেকে এবার ও ছুটে বেরিয়ে যায়। ডাইনিং টেবিলে হোঁচট খায়। শব্দ শুনে প্রভঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। না, পড়েটড়ে যায়নি। নিজের ঘরে ঢুকে শুভা সশব্দে দরজা বন্ধ করল।

পাঠক, আপনি ঢের ব্যভিচার আর বিবাহ বিচ্ছেদের কাহিনী পড়েছেন। আমি আর একটা সেই রকম কাহিনী শোনাতে বসিনি। আমি নারী জাগরণের ধুয়ো তুলে আপনাদের চেতনায় সুড়সুড়ি দিতে চাই না। বেশিরভাগ মানুষ—সে পুরুষ হোক আর স্ত্রীলোক—দুর্বল, ভিতু। স্থিতিস্থাপকতায় স্বস্তি পায়। তাদের জীবনে সবচেয়ে শক্ত কাজ সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সেই সিদ্ধান্তে অচল থাকা। তাই মানুষের সংসারে এত অশান্তি। তাই ওদের সুখ এত ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং আমাদের আলোচ্য এই দু'জন নায়ক-নায়িকা যে

অবস্থায় এসে পড়েছে, তাতে কী করতে পারে?

প্রভঞ্জন স্ত্রীর সঙ্গে, মেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিল। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, ইংরেজি ক্রাইম নভেল পড়ে আর কাজের লোককে হুকুম দেয়। তার কর্তব্যে ক্রুটিবিচ্যুতি ঘটলে তুলকালাম বাধায়। যাতে সংসারের আর তিনজন মেয়ে সদস্য সব সময় তটস্থ থাকে।

বাবার কী হয়েছে বলো তো, এমন ব্যবহার করছে কেন?

আমি কী করে জানব? বাবাকেই জিজ্ঞেস করো না কেন?

আমাদের বয়ে গেছে।

এখন মেয়েরা মাকে দুষছে। বাবাকে সামলানো তোমার কাজ। সংসারে অশান্তির জন্য তুমি দায়ী। কাজ থেকে ছুটি নিয়ে কিছুদিন বাড়িতে থাকতে পারো না? না, ছুটি নেবে না শুভা। স্কুলে তবু নিশ্বাস নেওয়ার জায়গা পায়। বাড়ির আবহাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। তা ছাড়া, আর কিছুদিন পর বড় ছুটি। আশ্চর্য লাগে—দায়িত্ব কম না, রোজগার কম না, তবু শুভার চাকরিটাকে বাড়ির কেউ তেমন পাত্তাই দেয় না কখনও! বাবার চাকরিটা আসল। বাবার পরিশ্রম হয়। বাবার বিশ্রাম দরকার। বাবা আপিস থেকে ফেরার আগে তুমি বাড়ি চলে আসবে। মেয়েরাই বলছে।

আতর কেন্দ্র করে যে-ঘটনা ঘটেছে, তারপর শুভার মনে হয়েছিল, ও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। পারস্পরিক বিশ্বাসের যে বন্ধন বিবাহিত জীবনকে নিশ্চিন্ত করে, তা ছিঁড়ে গেছে। এখন এখানে থাকার কোনও অর্থ হয় না। মেয়েদের নিয়ে তুমি থাকো, আমি চললাম—বলে যদি বাপের বাড়ি চলে যাওয়া যেত। কিন্তু এখন আর তার উপায় নেই। ওদিকের ঘর পুড়ে গেছে অনেক বছর হল। আর কোথায় যাবে! সবাই তো যে-যার নিজের সংসার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। অতিথি দু'দিনের পর তিনদিন হাজির হলেই তার সঙ্গে ঠান্ডা ব্যবহার শুরু করে দেয়। সল্ট লেকের যে-বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে এল সেদিন একলা, সেখানে আরও দু'দিন গেল শুভা, উদ্দেশ্য পরামর্শ করা। প্রথম দিন ওরা চা খাওয়াল শুধু। দ্বিতীয় দিন এক গ্লাস জল। পরামর্শ করা হল না।

ভেবেছিল, মেয়েদের কাছে পুবো ব্যাপারটা ভেঙে বললে কী হয়। প্রভঞ্জনের মুখোশ খুলে যায় মেয়েদের কাছে। তারপর ভাবল, মুখোশ কী? বিপদে পড়ে প্রভঞ্জন যদি খোলাখুলি মেয়েদের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বেরিয়ে আসে, এখন তার সে সাহস হয়েছে, তা হলে সমূহ কেলেঙ্কারি! না, না, এটা নিতান্ত ব্যক্তিগত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপার, এখানে সন্তানদের টানা উচিত হবে না। কতটুকু বুদ্ধি ওদের, শুধু শুধু কান্নাকাটি করবে। ভাববে, একটা বিপর্যয় বুঝি নেমে এল ওদের জীবনে।

ভেবেচিন্তে এক সহকর্মীকে আতরের ঘটনার কথা বলল একদিন স্টাফরুমে। একটুখানি শুনেই সে মহিলা হেসে ওঠে: না, না, ওভাবে কখনও না। আগে হাতে দস্তানা পরে তবে স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে নামবে। যাতে চোট লাগে কিন্তু নখের আঁচড় না লাগে তার গায়ে। ভুল করে আমি অনেক ভুগেছি। কষ্ট কবো। পুরুষমানুষকে বুড়ো হতে দাও। তারপর সে-ই তোমার শাড়ির পাড়ে লটপট করবে। আর ক'টা বছর। সহ্য করো।

আমরা সমবয়সি। এক কলেজে পড়তাম। খুব ভাব ছিল তখন।

ও। তা হলে আর একটু বেশি কষ্ট হবে। সংসার ভাঙলে মেয়েদের দু'রকম অবস্থা হয়, জানো। যদি তার বডি ফিট থাকে, তবে তাকে কুড়িয়ে নিতে অনেকগুলো রোমশ হাত এগিয়ে আসবে। চশমা-পরা মুখগুলো অনেক মিষ্টি মিষ্টি সমবেদনা শোনাবে। তারপর তুলে নিয়ে যাবে পার্মানেন্ট চাকরি থেকে পার্মানেন্টলি টেম্পোরারি চাকরিতে। আর যদি বডি ফিট না থাকে, তা হলে যত গুণীই হও না কেন, পিঁপড়ের মতো একা একা খোঁড়াবে। কাঁদবে। পিঁপড়ের ঢিবির ওপর দিয়ে সাইকেল চলে যাওয়া দেখেছ কখনও? সহকর্মী মহিলা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছিল, নিঃসঙ্গ জীবনে অনেক বেশি যন্ত্রণা।

রমলার ফ্ল্যাটের দরজায় পেতলের ট্যাবলেটখানা কারুর চোখে পড়ে না। রাত্রে সিঁড়িতে আলোও থাকে কম। খেয়াল করলে লোকে দেখত, সেখানে ইংরেজিতে ওর নাম লেখা, তার নীচে হেলানো অক্ষরে লেখা 'বিউটিশিয়ান'।

পরিচারিকা একদিন সকালবেলা ওই 'বিউটিশিয়ান' শব্দটা ঘষে ঘষে মাজছিল, এমন সময় দু'জন অতিথি এসে উপস্থিত। ওদের একজন আবার মহিলা। সচরাচর কোনও মহিলা এখানে পা দেয় না, অতর্কিতে এরা কে আবার। ভেবে সে চোখ কুঁচকে ওদের দিকে তাকায়। তারপর আগন্তুকদের সাফ

সাফ জানিয়ে দেয়, দিদির সঙ্গে দেখা হবে না, দিদির শরীর খারাপ।

আগন্তুক দু'জনও নাছোড়বান্দা। দেখা না করে তারা যাবে না। তাই নিয়ে বচসা।

ভিতর থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে আসে, কার সঙ্গে কথা বলছিস, এই রুক্মিণী, কে এসেছে? টেলিফোনের মিস্তিরি, এই রুক্মিণী?

রুক্মিণী খোলা দরজা ঠেলে বন্ধ করে ভিতরে চলে গেল। আগন্তুক দু'জন দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

শুভা বলল, এইসব জায়গায় কোনও ভদ্রলোক আসে?

প্রভঞ্জন বলল, আসে।

প্রভঞ্জন সিগারেট ধরাল। দুটো টান দিয়ে ফেলে দিল। জুতো দিয়ে চেপে দিল জ্বলন্ত সিগারেট।

হাতব্যাগ থেকে রুমাল বার করে নিজের নাকের উপর চেপে ধরল শুভা। অকারণ। আবহমান অতীত ছাড়া আর কিছুর গন্ধ ছিল না সিঁড়ির মুখে। আর দৃশ্য বলতে এই নেমপ্লেট, মেঝের ওপর থ্যাঁৎলানো মরা পাঁচটা সিগারেটের টুকরো। তার একটা প্রভঞ্জনের, সেটা দিয়ে অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

একটু পবে ফের যখন দরজা খুলল, ওরা দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক অপরূপ নারীমূর্তি। সদ্য স্নান করে আসা—শুদ্ধ, নিষ্কলুষ। অঙ্গে কোনও প্রসাধন নেই। ভিজে চুল পিঠের উপর ছড়ানো।

ও আপনি! সেদিন কখন চলে গেলেন জানতেই পারিনি। ভাবলাম খুব রাগ করেছেন। আর কোনওদিন আসবেন না!

রমলা হাসতে হাসতে বলল।

আসতে হল।

শুভা তীক্ষ্ণ চোখে রমলাকে দেখছিল। ওর মনে হচ্ছিল, মেয়েটা অভিনয় করছে। অভিনয় করাই ওর পেশা।

ওরা ভিতবে গিয়ে বসে।

এবার বমলা ঠিক উলটো কথা বলল। গম্ভীর হয়ে বলল, আমি জানতাম আপনি আবার আসবেন। আমি যে হাতে আতর দিয়ে দিয়েছি। তবে স্বপ্নেও ভাবিনি যে, আপনার সঙ্গে উকিল থাকবে।

উকিল? না, না উকিল না। উনি আমার স্ত্রী। উনি বললেন—

হেস্তনেস্ত? রমলা আবার হাসল। এবার শুভার দিকে তাকিয়ে, হেস্তনেস্ত করতে চাও বউ? সে তো ভাল কথা। তোমার গা'টি তো বেশ পরিপাটি, তা মুখখানা অমন কনকনে ঠান্ডা কেন? চুলে ফাঁপ নেই, রং নেই। গায়ের যত্ন করো না, তাই তো?

আপনি সম্বোধন না করে তুমি বলায় শুভা একটু রাগল। রেগেই তো আছে। আবার ভাবল, এই ধরনের মেয়েব কাছে ভব্যতা আশা করাই ভুল।

ও বলল, আমি পড়াশোনার কাজ কবি। আমার সাজগোজের সময় কোথায়?

ও মা, তা বললে কি হয়? যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না? কথায় বলে, মেয়েদের যৌবন হল পিদ্দিমের আগুন। ফিরে ফিরে তেল না দাও তো নিভে যাবে। এখন বিজলি বাতি হয়েছে, আমরা পিদ্দিমের কথা ভুলে গেছি। একবার সুইচ টিপলাম, বাতি জ্বলে উঠল। তারপর জ্বলতেই থাকল। যতক্ষণ আবার না সুইচ টেপো ততক্ষণ জ্বলবে। ওটা মেশিন। জীবন কি মেশিনের নিয়ম মানে, বলো?

আপনি ওর হাতে আতর বুলিয়ে দিয়েছিলেন কেন? শুভা ইচ্ছে করে আপনি সম্বোধন করল। যাতে ভদ্রঘরের মহিলার সঙ্গে রমলার তফাত বোঝা যায়।

যাতে বাড়ি গিয়ে ধরা পড়ে যান। বাড়িতে আপনার লোক কেউ থাকলে ঠিক ধরে ফেলবে। অশান্তি করবে। তখন আবার ছুটে আমার কাছে আসবেন উনি। আর যদি ধরা না পড়েন তো বুঝব বাড়িতে আপনার লোক কেউ নেই যে আটকাবে। তখনও আমার কাছে আসতে হবে। দু'দিক থেকেই আমার লাভ। আমার লিস্টিতে আর একজন লোক বাড়ল, তাই।

বলে রমলা আবার হাসল।

একটা চান্স দেওয়া উচিত কিনা বলো। একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আগে বাড়ির লোককে ভাবতে দিই, পুরুষমানুষটাকে সুখী করার কোনও পথ খোলা আছে কি নেই। গেরস্থ বাড়ির ভিতরের কথা আমার চেয়ে তুমি ভাল জানবে। তবে অনেক লোকের সঙ্গে কারবার তো, আমি এইটুকু বুঝেছি, সেখানে স্বামী হল গিয়ে টাকা রোজগারের যন্তর আর বউ হল গিয়ে ঘুমের ওষুধ। যন্তরের সঙ্গে ওষুধের

ভালবাসা হয়? হয় না। খালি অসুখ বেড়ে যায়।

বলে ও হাঁক পাড়ল, রুক্মিণী! এ রুক্মিণী।

একটু শরবত দিতে বলি?

না, না, আমরা শরবত খেতে এখানে আসিনি। শুভা বলল, আমি জানতে এসেছি, আমার স্বামী সেদিন এখানে—

উচ্চারণ করতে পারল না মুখ ফুটে। তার আগেই রমলা বলল, একজনের কথা আর একজনকে বলব কেন? ডাক্তার কি একটা রুগির কথা পাঁচজনকে বলে বেড়ায়? আচ্ছা, শরবত না খাবে তো পান খাও। যা, মিঠা পান নিয়ে আয়।

রমলা বলে, তোমার উপর আমার রাগ হচ্ছে না দিদি। তুমি রাগ করে আছ, বুঝতে পারি। তাতে কোনও লাভ হবে না। বলছিলাম না, অসুখ বেড়ে যায়। স্বামী আর বউয়ের ভালবাসা যদি মজবুত হত, তা হলে আমরা থাকতাম না। তুমি বললে বিশ্বাস করবে? আমার কাছে যারা আসে, মুখে বলে ফুর্তি করতে আসছে, মদটদ খায়, সব শালা দুঃখী, অনাথ। সব শালা বউ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদে। কারুর হার্টের অসুখ, কারুর পেটে আলসার, কারুর বুকে ক্যানসার। আমি ওদের বিষটা শুষে নিই। ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে আরাম দিই। তার বদলে টাকা নিই। অনেক টাকা নিই।

এই রকম জীবন কাটাতে আপনার ঘেন্না করে না?

প্রথম প্রথম ঘেন্না করত। এখন করে না। এখন মনে হয়, বড়লোক বউরা যেমন অ্যাসোসিয়েশন করে সোস্যাল ওয়ার্ক করে, আমিও তেমনই সোস্যাল ওয়ার্ক করছি। আপনাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমায় প্রাইজ দেওয়া উচিত। কত সুইসাইড আমি রুখে দিয়েছি আপনি জানেন না। ভগবান জানেন।

এতক্ষণ চুপ করে ছিল, আত্মহত্যার প্রসঙ্গ উঠতেই প্রভঞ্জন সচকিত হয়ে ওঠে।

কথা ঘুরিয়ে দিয়ে ও বলে, কাগজে পড়ি, মেয়েরাই বেশি সুইসাইড করে।

ওদের তো রমলা নেই।

বলেই একটা পান মুখে পুবে নিল। তারপর আস্তে আস্তে বলল,

না। কথাটা ঠিক বললাম না।

রমলা বোঝায়, মেয়েদের একলা থাকার অধিকার সমাজ দেয় না। হয় বাপের বাড়ি, নয়তো শ্বশুরবাড়ি। এক জেলখানা থেকে আর এক জেলখানায় ট্রান্সফার হয়ে মেয়েদের জীবন কাটে। বয়স হয়ে গেলে ছেলের বাড়ি নয়তো জামাইয়ের বাড়ি। সে-ও তো জেলখানা। কেন? না, তা না হলে মেয়েদের ইজ্জত থাকবে না। আরে, কাজ করে নিজের পেট চালাবার ব্যবস্থা থাকলে একটা অপশন থাকত। আমি তো আমার মতো করে একলা থাকি, কাউকে কেয়ার করি না। যে-কেউ আমার ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারে না, আমি মানুষ দেখে আগে বুঝে নিই। পছন্দ না হলে বার করে দিই।

আপনারা ভাবছেন, কী করে তা সম্ভব? রমলা আর রুক্মিণী—এই দুই প্রাণী কেমন করে ঝামেলা সামলায়? আমার বডিগার্ড আছে, পুলিশ আমার দেখভাল করে। নইলে এই চৌরঙ্গি পাড়ায় টিঁকতে পারতাম? তবে, বেশিদিন আর এখানে থাকব না। বড্ড খরচ।

কলকাতা ছেড়ে চলে যাবেন? শুভা আশান্বিত হয়ে জানতে চায়।

না, না। সাউথ ক্যালকাটায় আমার একটা ফ্ল্যাট আছে। সেখানে উঠে যাব। দরজায় আমার নেমপ্লেট দেখোনি? বিউটিশিয়ান। বিউটিশিয়ানের কাজ করব। মাইনে দিয়ে ডাক্তার রাখব। ম্যাসাজ করার লোক রাখব। তোমার মতো মেয়েরা, যারা পিরিয়ড বন্ধ হলেই ভাবে, জীবন শেষ হয়ে গেল—তাদের ট্রেনিং দেব। শেখাব, এত সহজে জীবন শেষ হয়ে যায় না। পুরুষমানুষকে আটকে রাখার অনেক তরিকা আছে। ওরা তো বুদ্ধু।

শেখাব, দু'জন-তিনজন পুরুষমানুষকে ভালবাসার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। এই গা নিয়েই তো যত ভাবনা। গায়ের মধ্যে আছেটা কী? গায়ে কি পাপ লেগে থাকে? চান করে নিলেই গা শুদ্ধ। আসল কথা হল মন। মনের মধ্যে আনন্দ।

রমলা বলছিল, আমি তো অনেক রকম মানুষ দেখলাম। নিজেকেও আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে, ঠাকুরের ছবির সামনে বসিয়ে, নানাভাবে দেখেছি। আপন দুঃখকষ্টের চিন্তায় মনকে ভারী করে রাখলে

আনন্দ আসে না। অন্যের দিকেও তাকাতে হয়। জানো দিদি, সব মানুষের মধ্যে একটা করে পশু থাকে। মেয়েদের মধ্যে থাকে বেড়ালের স্বভাব। লক্ষ করে দেখেছ? বেড়াল খাওয়ার সময় মনিবের কাছে ঘুরঘুর করে। পেট ভরলেই চলে যায় বাড়ি ছেড়ে। বেড়াল কখনও পোষ মানে না। বেড়াল কাত হয়ে একা শুয়ে থাকে টিনের চালে। দিনের মধ্যে কুড়ি ঘন্টা ঘুমোয়। ঘুমোয় না, আসলে নিজের কথা ভাবে। বেড়ালের কোনও বন্ধু নেই। বেড়ালের কোনও ফ্যামিলি নেই। রেপ থেকে ওদের পেটে বাচ্চা আসে। বাচ্চা হলে কিছুদিন আগলে রাখে, পুরুষ বেড়ালের আক্রোশ থেকে বাঁচায়। তারপর ভুলে যায়। বেড়ালের জীবনে আনন্দ নেই।

আর পুরুষের মধ্যে বাঘ-সিংহ ওসব কিছু না, থাকে কুকুরের স্বভাব। মনিবের বাড়িকে ভাবে নিজের বাড়ি। আমরা একটা নতুন ফ্যাক্টরি করছি ম্যাড্রাসে, আমরা নতুন ব্রাঞ্চ খুলছি নাগপুরে, আমাদের কাবখানায় লেবার ট্রাবল চলছে—এইসব আমায় হামেশা শুনতে হয়। তো আমি বলি, তুমি তো চাকরি করছ। তোমার কী? আমার হাসি পায় ওদের প্রভুভক্তি দেখে। তার খানিকটা যদি নিজের সংসারের দিকে থাকে তো অশান্তির হাত থেকে বাঁচে। সেখানে কেবল ঘেউ ঘেউ, আমাব এই চাই, সেই চাই। না পেলে অন্য জায়গায় গিয়ে কুঁই কুঁই করবে। মদ খেয়ে ভাববে আমি বাঘ, আমি সিংহ। আমি সকলের চেয়ে বড়। কিন্তু ওরা বন্ধুহীন নয়। ওদের জীবনে আনন্দ খোঁজার চেষ্টা আছে। সেই চেষ্টার অনেকটাই যদিও বোকামি।

রমলা প্লেট থেকে আর একখিলি পান তুলে নিয়ে মুখে পুরল।

তোমরা ভাবছ, রমলা একটা প্রসটিট্যুট, বড় বড় বক্তৃতা দিচ্ছে। তাই না?

অনেক জ্বালা আর ঘেন্না নিয়ে এসেছিল শুভা। প্রভঞ্জনকে ধরে এনেছিল একটা হেস্তনেস্ত করবে বলে। এতক্ষণ মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে, ওর কথা শুনে ওর মনের ভার নেমে গেছে। মেয়েতে মেয়েতে মুখ দেখাদেখি হল।

শুভা জিজ্ঞেস করে, আপনার নিজের জীবনের কথা তো কিছু বললেন না। মানে, আপনার ছোটবেলা, বাবা-মা, এই পথ বেছে নিলেন কেন?

ও-সব আমি ভুলতে চাই। অতীত জীবন নিয়ে আমি ভাবি না। ভাবতে চাই না। তা ছাড়া, তোমাদের ঘরসংসারের কথাও তো আমি জানতে চাইনি। তোমাদের নামও আমি জানি না। জানার দরকার নেই।

এমন সময় দরজায় বেল বাজল।

রমলা ডাক দিল, রুক্মিণী, এই রুক্মিণী, দেখ তো কে এল? টেলিফোনের মেকানিক এল কি?

শুভা বলল, আপনার টেলিফোন নম্বরটা আমায় দেবেন?

কেন?

বিউটিশিয়ানের কাছে আসব। মুখটা, চুলটা যদি ঠিক করা যায়।

তাই?

এবার খিলখিল করে হেসে উঠল রমলা। কী কাণ্ড বলো তো। হাতে আতরের ছোঁয়া দিলাম একজনকে, আর একজন হয়ে গেল আমার কাস্টমার। বলতে বলতে ওর চোখদুটো জলে ভরে ওঠে।

প্রভঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল, যাও বাবু, এ-বাড়িতে তোমার আর জায়গা হবে না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের প্রবলেম আমি সামলাতে পারব না বাপু। তবে দিদি, তোমাকে বলি, টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে যেন আসবে না। যে সময়ে বলব, ঠিক সেই সময়ে আসবে। যে ভাবে ডাক্তারের চেম্বারে যাও। দেখো, দু'মাসে তোমাকে সুন্দর করে দেব।

গণিকালয় ছেড়ে ওরা হাঁটতে হাঁটতে চৌরঙ্গি রোডে যখন এসে পড়ল, তখন এগারোটা। প্রভঞ্জন বলল, চলো না, কোথাও একটু বসি। একটু কফি খাই।

ঢের হয়েছে। আর জ্বালিয়ো না তো!

তা হলে এক কাজ করা যাক। কাছেই ফ্লুরি। চলো, একটা বড় দেখে কেক কিনে নিয়ে যাই।

কেক কেন?

আমার বেড়ালদের জন্য।

১৯৯২

❀ মিসেস মার্টিন

সি লায়ন লজে আমাদের থাকার কথা নয়। আর সেখানে না থাকলে মিসেস মার্টিনকে জানা হত না। আমরা হাজার হাজার ভোঁদা টুরিস্টের মতো পুরী থেকে সমুদ্রে স্নান করে, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ খেয়ে, জুতোর মধ্যে করকরে বালি নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসতাম। আমরা মানে তিন বন্ধু। আমি কামাল, প্রীতম আর ব্রহ্ম। প্রীতমের শুধু বিয়ে হয়েছে। আমি আর ব্রহ্ম দুই চ্যাংড়া ব্যাচেলর।

পুরীতে এই প্রথম না। এলেই ভাল লাগে। সাতটা-আটটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায়। এবার তিন দিনেই আমরা অতিষ্ঠ। এত ভিড় আর এত নোংরা বিচ যে সমুদ্র অবধি চাপা পড়ে যায়। আমরা কখনও আগে থেকে সবকিছু ব্যবস্থা করে বেরোই না এল টি সি বাবুদের মতো। হঠাৎ ঠিক করলাম পুরী যাব তো চলে এলাম, এই রকম। এবারে থাকার জায়গাটা তেমন জুতসই হল না। হোটেলটা সমুদ্র থেকে একটু দূরে, ভেতরে। ঘরের জানলা খুললে গোয়ালঘর।

ব্রহ্ম বলল, চল, এখান থেকে কেটে পড়ি।

প্রীতম বলল, কলকাতায় ফিরব না ছুটি না ফুরোলে।

তখন আমি বললাম, ভাইজাগ যাওয়া যায়।

ভাইজাগ যে বন্দর, তা আমি জানতাম। ওখানে জাহাজের কারখানা আছে। ম্যাপ অনুযায়ী তীর ধবে ধবে গেলে পুবী থেকে খুব দূরেও নয়। যা জানতাম না, তা হল, ভাইজাগ আর ওয়ালটেয়ার একই শহরের এপিঠ-ওপিঠ। পাহাড়, সমুদ্র, দুই-ই আছে সেখানে, কিন্তু বিচ নেই। আর তীর ধরে ধরে না, যেতে হলে তিরুপতি এক্সপ্রেস ধরতে হবে। তাই ধরলাম। প্রীতম বলল, আমাদের এক ছোট মাপের নিরুদ্দেশ যাত্রা।

কোথায় গিয়ে উঠব, তার ঠিক নেই। প্রীতমের এক মামাশ্বশুর শিপইয়ার্ডে কাজ করে। বউয়ের কাছে শুনেছে, ওর নাম ধনামামা। ধনামামাকে যদি খুঁজে বার করা যায়, জামাই আদরে থাকা যাবে। এই উদ্ভট প্রস্তাবের উত্তরে ব্রহ্ম বলল, ধুর।

ওয়ালটেয়ারে নেমে আমরা প্রথমে একটা ট্যাক্সি ধরলাম। তখন সন্ধে নেমে গেছে। ব্রহ্ম বলল, এখানকার সবচেয়ে বড় যে হোটেল, সেখানে নিয়ে চলো। নিয়ে গেল। 'ভিক্রম' না 'ডলফিন'—কী যেন নাম হোটেলের। ওরা বলল, দু'খানা ঘর নিতে হবে তিনজনের জন্য। রুমচার্জ নন-এসি দৈনিক সাড়ে তিনশো।

তখন ব্রহ্ম ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজারকে সব বুঝিয়ে বলে। আমাদের পুরীর অভিজ্ঞতাও বলে। আমরা ক'দিন ছুটি কাটাতে এসেছি নিজের পয়সায়। আপিসের টাকায় নয়। একটা শান্তিমতো জায়গা—প্রেফারেবলি সমুদ্রের ধারে, কম টাকায়, চাই। তবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। দিন পাঁচেক থাকব। প্রথমে এখানে এলাম, কেননা, স্থানীয় লোক, তুমি সব খবর রাখবে। তোমার লাকসারি হোটেলে থাকতে আমরা আসিনি।

লোকটা বুঝল। নিজের জায়গায় বসে পর পর ফোন করল কয়েকটা। কোথাও ঘর খালি নেই। শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, তোমরা এক কাজ করো।

নিজের ভিজিটিং কার্ড বার করে তার উলটোপিঠে খস খস করে লিখল 'সি লায়ন লজ—মিসেস মার্টিন।' ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ডেকে বুঝিয়ে দিল জায়গাটা। বলল, নিরিবিলি, পরিচ্ছন্ন, তোমরা যেমনটি খুঁজছ। পাহাড়ের উপর থেকে সমুদ্র দেখতে পাবে।

এইটিই সবচেয়ে বড় লাভ। পাহাড়ের উপর থেকে সমুদ্র দেখা। পুরীতে এ-জিনিস সম্ভব ছিল না। অবশ্য পাহাড় বলতে উত্তুঙ্গ কিছু নয়। সমুদ্র থেকে দু'-তিনশো ফুট পাথর। পাথর মুড়িয়ে ঘরবাড়ি, রাস্তা। সমুদ্রতীরেও পাথরের বিশাল বোলডার। ওয়ালটেয়ারে কেউ নাইতে আসে না।

একটা সিঙ্গল বেড, একটা ডবল বেড—এই দু'খানা পাশাপাশি ঘর নিলাম আমরা। মিসেস মার্টিন জিজ্ঞেস করেছিল, তোমাদের সঙ্গে কোনও লেডি নেই?

কত বয়েস হবে মহিলার—পঞ্চাশ, কি তার কিছু বেশি। ঠিক বুড়ি না। গায়েব রং কালো, পোশাকআশাক মেমসাহেবদেব মতো। বব করা চুল। গালের ওপরে হনুতে গোলাপি রং, ঠোঁটে লিপস্টিক।

ব্রহ্মটা ফাজিল। বলে, তুমি তো আছ। ভাগ্যিস বাংলা বোঝে না মিসেস মার্টিন। প্রীতম বলে, এ-সব জায়গায় লোকে ফ্যামিলি নিয়ে আসে। হানিমুন করতে আসে। আমাদের মতো উড়নচণ্ডী আর ক'টা?

মিসেস মার্টিন বলে, তোমরা খুব লাকি। এই ঘরদুটো অক্যুপায়েড ছিল সকাল অবধি। একদিন আগে এলে পেতে না। একবার যে এই লজে এসে থেকে যায়, সে পরে আর কোথাও ওঠে না। দেখো না, এই ভিজিটর্স বুক। কত নামকরা লোকেরা এখানে থেকে গেছে। অবশ্য, গণপতি তোমাদের পাঠিয়েছে, আমি তোমাদের ফেরাতাম না। ওপরতলায় জায়গা করে দিতাম আমাদের সঙ্গে। গণপতি ইজ এ গুড বয়।

ঘরভাড়া একশো টাকা মাত্র। পরিষ্কার সাদা চাদরপাতা বিছানা। পাশেই বাথরুম। শাওয়ার। এক জোড়া করে কাচা তোয়ালে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর একখানা বাইবেল, জলের বোতল, গ্লাস। মহিলা জানলা খুলে দিল। রাতের অন্ধকারেও আমরা সমুদ্রের উপস্থিতি টের পেলাম। খুব হাওয়া।

তোমাদের খুব খিদে পেয়েছে নিশ্চয়। মিসেস মার্টিন সেদিন বলেছিল, কী খাবে ডিনারে?

প্রীতম বলে, আজকের দিনটা স্যান্ডউইচ আর কফি হলেই চলবে।

ব্রহ্ম বলে; কাল লাঞ্চে চিকেন কারি, রাইস, কেমন?

মিসেস মার্টিন ডাকে, সুব্বা রাও—সুব্বা রাও। কোথায় যে যায়।

ডাক শুনে একটা ধাড়ি কুকুর লোম দোলাতে দোলাতে এসে হাজির। ওরা দু'জন বাথরুমে ঢুকেছে। আমি লাউঞ্জে এসে বসেছি। কুকুরটা আমার জুতো শুঁকতে এগিয়ে আসে।

আমি বলি—কামড়াবে না তো?

অমনি মহিলা বকুনি দেয়। জর্জ, গেস্টকে বিরক্ত করতে বারণ করেছি কতদিন! চলে এসো।

তারপর নিজেই উঠে পড়ে। বলে, চলো, সুব্বা রাওকে ডেকে নিয়ে আসি। কোথায় যে যায়!

লাউঞ্জের একপাশে সোফা। ওদিকটায় ডাইনিং টেবিল। দেয়ালে যিশুর ছবি।

খানিক পর ঘরে গিয়ে দেখি, দুই বাবু চানটান সেরে চ্যাপটা শিশি খুলে বসেছে। ব্রহ্ম বলল, কাল সুব্বা রাওকে দিয়ে সোডা আনাতে হবে!

আমি বলি, এটা প্রাইভেট লজ। হোটেল না। ওপরে মিসেস মার্টিনের ফ্যামিলি থাকে। বেশি হুজ্জত করিস না।

রাত ন'টা নাগাদ আমাদের দরজায় টোকা পড়ল। ছিটকিনি তুলে আমরা মৌজ করে আড্ডা দিচ্ছিলাম।

দরজা খুলে দেখি, স্বয়ং মিসেস মার্টিন। হাতে ট্রে, তার ওপর দুটো প্লেট, একটা প্লেটে গোটা দশেক স্যান্ডউইচ, অন্যটায় পিঁয়াজের পকোড়া। পাশে দু' রকম সস। হাঁ-হাঁ করে উঠল প্রীতম। ছুটে গিয়ে ট্রে-টা নিয়ে নিল। বলল, সুব্বা রাওকে দিয়ে পাঠালেই হত। নিজে কেন কষ্ট করলেন আপনি!

আর বোলো না। রান্না ছাড়া আর একটা কাজ যদি ওকে দিয়ে করানো যায়। এগুলো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল, তাই নিয়ে এলাম। ওকে দিয়ে আর চলবে না। যত না বুড়ো হয়েছে, তার চেয়ে বেশি বুড়ো সাজে। ভিক্রম হোটেলের শেফ ছিল ও। আমি নিয়ে এসেছি। তা বলে কি আমার মাথা কিনে নিয়েছে?

খাবারগুলো সত্যি উপাদেয়। বোঝা যায়, ওস্তাদের হাত আছে এর পেছনে।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব, ঠিক হয়েছে। পথে কোথাও লাঞ্চ খেয়ে নেব। রাত্রে চিকেন কারি, রাইস। মিসেস মার্টিনকে বলে দিলাম।

তোমরা তো বাঙালি। ইচ্ছে করলে ফিশকারিও খেতে পারো। সমুদ্রের মাছ নয়। সুব্বা রাও শহর থেকে সুইট ওয়াটার ফিশ নিয়ে আসবে।

ব্রহ্ম বলে, আর কয়েকটা সোডা যদি বলে দেন।

ও কে-ও কে. বলতে বলতে মিসেস মার্টিন হাসে।

চমৎকার ঘুম হল রাত্তিরে। সমুদ্রের গর্জনে ঘুম ভাঙল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনি, মিসেস মার্টিনের কণ্ঠস্বর।

জর্জ, যাও তো, সুব্বা রাওকে বলো, কফি আর দুধ যেন গরম থাকে। ডিমের ফ্রাই যেন শক্ত না হয়ে যায়। সুব্বা রাও, টোস্ট বানাবে কড়া করে। যেন পুড়ে না যায়। আমি গেস্টদের ডাকছি ডাইনিং টেবিলে। ওঁরা এখুনি বেরোবেন। তোমার জন্য তো দেরি করবেন না?

বেরিয়ে দেখি—সত্যি, সব রেডি। ডাইনিং টেবিলের এক প্রান্তে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছে মিসেস

মার্টিন। তার পাশে, কার্পেটের ওপর বসে আছে জর্জ নামের কুকুরটা।

ব্রহ্ম জিজ্ঞেস করল, আর কোনও গেস্ট নেই?

আছে। ওই দিকের দু'খানা ঘরে দুই ফ্যামিলি। কোন সকালে বেরিয়ে পড়েছে ওরা। সিংহাচলম গেছে। দেখার মতো মন্দির। হিন্দুদের তীর্থস্থান। আরও এক পার্টি আজ আসার কথা। কিন্তু আমার তো আর জায়গা নেই। কী যে করি।

একটু পরে মহিলা ভিতরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দেয়, সুব্বা রাও। আর এক পট কফি দাও। দুধ আছে।

বলতে বলতে জর্জ উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। মিসেস মার্টিন বলে, না, তোমাকে দিয়ে হবে না। ওর ভরসায় থাকলে এঁদের আর বেরোনো হবে না আজ। বলে নিজেই উঠে যায়। আড়ালে শোনা যায়, ও সুব্বা রাওকে তার কুঁড়েমির জন্যে বকাবকি করছে।

ব্রহ্ম বলে, জবরদস্ত মহিলা।

প্রীতম বলে, এ রকম না হলে হোটেল চালানো যায় না।

অবশ্য হোটেলে আমরা কতটুকুই বা থেকেছি। সারাদিন টো-টো করে ঘুরেছি তিনজন। ভেঙ্কটমন্দির, ডলফিনস নোজ, লাইট হাউস। শহরের মাঝখানে দূরপাল্লার বাস স্টেশন। তার চারপাশে দোকানপাট, বাজার। যেখানেই যাই, ওই বাস স্টেশনে এসে আমাদের সেদিনেব মতো যাত্রা শেষ। সেখান থেকে একটা অটো ধরে সি লায়ন লজ—ছ'টাকা ভাড়া।

সেখানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দুপুরে দেখি, একটু ভিতর দিকে মাছ বিক্রি হচ্ছে। ইয়া বড় বড় কাতলা মাছ চপার দিয়ে টুকবো টুকরো করছে। কুড়ি টাকা কিলো। কলকাতায় ষাট টাকা।

এখন বোঝা গেল, সুব্বা রাও এখান থেকে মাছ কিনে নিয়ে যায়।

প্রীতমের কথার পিঠে ব্রহ্ম বলে, মিসেস মার্টিন সস্তায় কিস্তি মারছে আমাদের মাছ খাইয়ে। কী ধড়িবাজ!

আমি বলি, ও ঠকাবে না ব্রহ্ম। কম দামে কিনলে কম টাকা চার্জ করবে আমাদের।

আর একদিন হল কী, আমরা একটা দোকানে ঢুকে হুইস্কি কিনছি। এমন সময় পিছন থেকে কে একজন পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, প্রীতম না?

হাসি হাসি মুখ। একই ধান্দায় এসেছেন ধনামামা। ভাগনিজামাইকে ঠিক চিনেছেন। বললেন, ওয়ালটেয়ার এলে অথচ আমায় একটা খবর দিলে না?

কাঁচুমাচু মুখে প্রীতম বলে, আমরা তিন বন্ধু এসেছি। পরের বার মিনুকে নিয়ে আসব। তখন আপনার বাড়িতে উঠব। কোথায় থাকেন? ঠিকানাও তো নিয়ে আসিনি।

শিপইয়ার্ড কমপ্লেক্স। তোমরা উঠেছ কোথায়?

ব্রহ্ম বলল, হোটেল সি লায়ন।

হোটেল, না লজ? ওই রামকৃষ্ণ বিচের কাছে রকের উপরে দোতলা বাড়িটা তো? ওটা তো ভূতের বাড়ি!

ভূতের বাড়ি? আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করি। একবারও তো মনে হয়নি।

মনে মনে ভাবি, নিরিবিলি শুনশান বলে ওই রকম রটেছে। তিন-চারদিন আছি। খাচ্ছিদাচ্ছি আরামে। মিসেস মার্টিন যত্নআত্তি করছে। আর, প্রাণী বলতে ওই কুকুরটা। কোনটা ভূত? যত সব বাজে কথা।

ব্রহ্ম বলল, সুব্বা রাও নয় তো? ওকে আমরা কেউ দেখিনি এখনও।

ধনামামাকে কাটিয়ে দিয়ে আমরা তো আস্তানায় ফিরলাম। ফিরে দেখি, দুই ঘরের বাথরুমে গরম জল রাখা আছে বালতিতে। মিসেস মার্টিন আমাদের হাসিমুখে গ্রিট করল। তারপর হাঁক পাড়ল, সুব্বা রাও। ফ্রিজ থেকে সোডাগুলো এনে রাখো এ-ঘরে। আমাদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা সসেজ খাও তো? একটু ভেজে দিতে বলি? ড্রিংকের সঙ্গে ভাল লাগবে।

তারপর ভেতরে গিয়ে নিজেই নিয়ে এল সোডার বোতলগুলো। আধঘণ্টা পর এক প্লেট গরম ককটেল সসেজ, সঙ্গে মাস্টার্ড। মুখে গজগজ করে, আজকাল কারুর ওপর নির্ভর করার উপায় নেই। সামান্য একটু খাবার, তা-ও আমাকে নিয়ে আসতে হবে ঘরে। উনি আসতে পারবেন না। উর্দি না পরে উনি গেস্টদের সামনে বেরোন না।

ওর কথায় কর্ণপাত না করে আমরা যথাকর্মে মন দিই। এই ভাবেই পাঁচটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল।

ফেরার দিন রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল, সুব্বা রাওকে টাকা দশেক বকশিশ দেওয়া উচিত। এই ক'দিন নানা রকম সুখাদ্য রেঁধে খাইয়েছে। এটা ওর পাওনা। বন্ধুদের বললাম, তোরা একটু দাঁড়া। আমি এখুনি আসছি।

সামনের দরজা বন্ধ। বাগান পার হয়ে বাড়ির পিছন দিকটায় পৌঁছোলাম।

একটা ছোট উঠোন। উঠোনের কোণে গার্বেজ বিন। দেখি, জর্জ পা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হাড়গোড় তুলে খাচ্ছে। আমাকে দেখে খাওয়া থামিয়ে দিল।

গ্রাহ্য না করে আমি কিচেনের দিকে অগ্রসর হই। শুনতে পাই, মিসেস মার্টিন বকবক করছে—এতগুলো প্লেট, ডেকচি এখন আমাকে মাজতে হবে। তা হলে লোক রেখে কী লাভ? সুব্বা রাও, তুমি কি পড়ে পড়ে ঘুমোবে, না উঠে এসে একটু সাহায্য করবে? তোমার কি চোখের চামড়াও নেই?

হঠাৎ আমার সামনে পড়ে গিয়ে হকচকিয়ে যায় মিসেস মার্টিন।—কী ব্যাপার? কিছু ফেলে গেছ?

আমি বললাম, সুব্বা রাওকে ডেকে দিন।

কেন?

টিপস দেব।

আমাকে দাও। আমি দিয়ে দেব। ও এখন—

কোথায়? আমি দেখতে চাই।

এইভাবে ওব সামনে দাঁড়িয়ে কেউ বোধহয় চ্যালেঞ্জ করেনি এর আগে। মিসেস মার্টিন তার ভেজা হাত কোমরের অ্যাপ্রনে আস্তে আস্তে মুছল।

তারপর আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল। মুখে হাসি নেই। চোখদুটো ছলছল করছে।

হি ডাস্‌নট এক্সিস্ট। ফিসফিস করে বলল মিসেস মার্টিন।

সে কী? তুমি কি আমাদের সামনে অভিনয় করছিলে তা হলে?

ঠিক তা নয়। আমি নিজেও অনেক সময় ভুলে যাই যে, সুব্বা রাও একটা ইলিউশন। জর্জেরও ভুল হয়।

কিন্তু কেন?

দেখো ইয়ং ম্যান, মিসেস মার্টিন এবার কেঁদেই ফেলল। নিঃসঙ্গতা কী কষ্টকর তুমি বুঝবে না। ওকে ইনভেন্ট না করলে আমি বাঁচতে পারতাম না। মিস্টার মার্টিন মারা যাওয়ার পর, এত বড় বাড়িতে একা, কী সাংঘাতিক সেসব দিন, আমি জানি আর আমার লর্ড জানেন। পৃথিবীতে কোথাও আমার যাওয়ার জায়গা নেই। কোনও আত্মীয়-বন্ধু নেই। খাব কী? তখন ঠিক করলাম এই লজ আমি চালিয়ে যাব। সুব্বা রাওকে তৈরি করলাম কল্পনা দিয়ে। আর জর্জকে নিয়ে এলাম কিনে। যতদিন শরীরে জোর আছে বাঁচব।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি খানিকক্ষণ! তারপর বলি, তা হলে এই টিপসের টাকা?

ওটা আমাকেই দাও। কাজে লাগবে। কালকে আবার ক'জন গেস্ট আসছে, তাদের জন্য বাজার করে রাখতে হবে তো!

এটাও ইলিউশন, এখন আমি বুঝতে পারি।

১৯৯৪

অডিকোলনের গন্ধ

সকালবেলার মেন রোড ফাঁকা। যানবাহনের ভিড় নেই। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরছে কেউ, কেউ-বা থলি-হাতে হাঁটছে বাজারের দিকে। রাস্তার দু'ধারের বাড়িগুলোর খোপে খোপে মানুষ ঘুম ভেঙে জাগছে। কারও তাড়া নেই তেমন।

শুধু খবরের কাগজের হকাররা ছাড়া। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লীলাময় ছুটে এসেছে যাদবপুর অবধি। কলার দেওয়া গেঞ্জিটা ভিজেছে অল্প, তাতে ঠান্ডা বাতাস লাগছে। স্পিডের মাথায় সাইকেল ঘোরাতে গিয়ে একজনের হাতে-ধরা দুধের বোতলটি ভাঙছিল আর একটু হলে। কোনও রকমে বাঁচিয়ে আবার প্যাডেলে চাপ দিল লীলাময়। ও হাঁপাচ্ছে।

পরিচিত বাড়িটার সামনে সাইকেল থামিয়ে না নেমে চটা-ওঠা পাথরের উপর এক পা ঠেকিয়ে ও মাথাটা তুলে ধরল উপর দিকে। ডাকল, 'তুষ্টিদা।'

দোতলায় পথের গায়েই যে জানলা, তার পাল্লা খুলে, খাটের এই কোণটা ঘেঁষে উবু হয়ে বসে এই সময় সাধারণত পরিতোষ কাগজ পড়ে। উলঢুল বিছানার উপরেই চায়ের কাপ রেখে যায় মিলি। পরিতোষ সিপ সিপ করে চা খায় আর কাগজের পাতা ওলটায়। অভ্যেস। আজ এখন অবশ্য ও সেখানে ছিল না। ভিতরে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় বসে কথা বলছিল মামির সঙ্গে। বাজার যেতে হবে কিনা, কী আনতে হবে, ইত্যাদি।

লীলাময় দ্বিতীয়বার ডাকল 'তুষ্টিদা।' এবার একটু জোরে।

পরিতোষ উঠে এল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল লীলাময়কে। অবাক হল একটু। জিজ্ঞেস করল, 'নীলু যে, কী ব্যাপার?'

নীলু তার ভাঙা মুখখানা তুলে বলল, 'ছোড়দি আর নেই।'

'নেই মানে?' পরিতোষ বোকার মতো প্রশ্ন করল। তারপর বলল, 'দাঁড়াও আসছি।'

চটি ছাড়াই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল পরিতোষ। দরজা খুলে রাস্তায় নামল। দেখল, নীলু বাচ্চা ছেলের মতো হাতের তালুতে চোখের জল মুছছে।

নীলু বলল, 'একটু আগে ছোড়দি মারা গেছে। খবরটা দিতে এলাম। মা বলেছে, পারলে একবার এসো।'

আর কিছু বলল না নীলু। ভেজা হাতটা ব্রাউন টেরিকটে মোড়া উরুতে মুছে সাইকেল ঘোরাল। একটু ঝুঁকে চাপ দিল বাঁ দিকের প্যাডেলে। চলে গেল।

একটু আগে পর্যন্ত মিলি বেঁচে ছিল। এখন বেঁচে নেই। কেন বেঁচে নেই? কী হয়েছিল? আত্মহত্যা? রাস্তায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছে, পরিতোষের মনে হল, সামনের বাড়ির সুধীর মিত্র বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের কথাবার্তা শুনেছে, আরও জানতে চায়। সামনাসামনি জানলার প্রতিবেশী লোকটা অনেক কিছুই দেখেছে। শুনেছে। অন্ধকার রাত্তিরে সিগারেটের জ্বলন্ত আগুনের মতো ওর চোখ অনেক ঘটনার সাক্ষী। তবু ওর কৌতূহলের শেষ নেই।

সরে এল পরিতোষ। উঠে এল উপরে। ওর মনে হল, বাপের বাড়িতে না, মিলি এখন এখানে ওই ছোট ফ্ল্যাটেই কোথাও মৃত শুয়ে আছে। পরিতোষ যদি আগ্রহ নিয়ে খোঁজে তবে ও জানান দেবে। একটা চোখে অশুভ আশঙ্কা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মামি, পরিতোষ ওকে খবরটা শোনাল। মামি কাঁদল; দুটো চোখ দিয়েই কাঁদল। তারপর বলল, 'জানতাম। এই রকম কিছু একটা হবে, আমি জানতাম।'

টালিগঞ্জের বাসার নীচের তলায় খাটে শোয়ানো গলা পর্যন্ত সাদা চাদর-ঢাকা মিলির মোটাসোটা শরীর, ভরাট গোল মুখ আর স্তিমিত সিঁদুরচিহ্ন দেখতে দেখতে পরিতোষও এই কথা বলল।

'এই রকম কিছু একটা হবে, আমি জানতাম।'

যার হার্ট খারাপ, অ্যানিমিয়া, তাকে অপারেশন টেবিলে কেন পাঠানো হয়েছিল, কেন পরিতোষকে আগে খবর দেওয়া হয়নি—যতই মাইনর ব্যাপার হোক, এসব প্রশ্ন ও করল না। বড়লোক শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও বলল না। কারণ, সবাই জানে মিলি কী একরোখা জেদি মেয়ে। যা হয়েছে ওর একার ইচ্ছেয় হয়েছে। বড়লোক শ্বশুর শুধু দেখে গেছেন নিঃশব্দে, টাকা দিয়ে গেছেন আর সম্ভবত নিভৃতে স্ত্রীর কাছে

ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দুঃখ জানিয়েছেন সন্তানের কষ্টে। স্বনির্বাচিত প্রণয় থেকে মেয়েকে নিরস্ত করতে পারেননি ওঁরা, পারেননি স্বামীর কাছ থেকে চলে আসা থেকেও। শেষপর্যন্ত তার এই স্বনির্বাচিত মৃত্যু চেয়ে চেয়ে দেখলেন।

ট্যাক্সি করে আসার সময় একবার চোখের জল উপচে উঠেছিল, একবারই। এই আকস্মিকতার গ্লানি ও তার পিছনে তিন-চার বছরের তিক্ততা ছাপিয়ে হঠাৎ মিলির একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল ওর। বিয়ের পরে-পরেই যখন ওরা উন্মাদের মতো প্রণয়ে লিপ্ত, সেই সময়ে একদিন দুপুরে ক্লান্ত, শোওয়া পরিতোষের ভেজা পিঠের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে মিলি বলেছিল 'তোমার খুব কষ্ট হয়, না?'

স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরে এলে পর পরিতোষ জানতে চেয়েছিল, কেন এমনটা ওর মনে হয়েছে। মিলি বলেছিল 'দেখি তো। আমার বুকের উপর শুয়ে কী ছটফট করো! কাটা জন্তুর মতো।'

'জন্তু' শব্দটার মধ্যে স্নেহ ছিল তখন। রুমালে চোখ মুছতে মুছতে পরিতোষ মনে করার চেষ্টা করেছে, কী করে ক্রমশ দিন যেতে যেতে মিলির কাছে এই মানুষটা জন্তু থেকে পশু, পশু থেকে জানোয়ার, তারপর ইতর, স্বার্থপর, অপদার্থ, স্কাউন্ড্রেলে পরিণত হয়েছে। সম্বোধনগুলো মনোভাবের প্রতীক। আসলে ব্যাপারটা দুটি মানুষের মধ্যেকার ব্রিজ ধ্বসে পড়ার ধারাবাহিক ইতিহাস। পরিতোষ, মিলির এক সময়ের প্রিয় তুষ্টিদা সাধারণ মানুষ, ক্রমশ তা প্রমাণিত হয়েছে। সে প্রতিভাবান নয়, তার গাওয়া গানের সুরে সারা দেশ কোনও দিনই আলোড়িত হবে না, সে গানের টিচারই থেকে যাবে। এমন তো হয়। কিন্তু একসময় যে তার চেহারায় চটক ছিল, কণ্ঠে প্রতিশ্রুতি ছিল—তাই দিয়ে সে মিলিকে ভুলিয়েছে। এখন সবাই জানে, মিলির মতো মেয়ের যোগ্য পুরুষ সে নয়, যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছে মিলি, তার যোগ্য নয় সে।

তবু মিলি বোকা। ও টাকা চিনত। ও দেহ চিনত। ওর ধারণা হয়েছিল জরায়ুর মধ্যেকার একটি ছোট্ট বিপত্তি উৎখাত হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। না হলে অপারেশন টেবিলে আত্মসমর্পণ করবে কেন? বোকা ওর ছোট বোন লিলিও, এই শোকার্ত পরিবারবর্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে পরিতোষের দিকে বার বার ঘৃণা ছুড়ে দিচ্ছে। যে বলেছে, ভালবাসাটাসা বুঝি না, বড়লোকের ছেলে, যে আমায় আরামে রাখতে পারবে, তাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না। এখনও, আঠাশ বছর বয়স অবধি, সে অপেক্ষা করছে। পরিতোষ কামনা করে, একদিন রাজার দুলাল এসে ওকে নিয়ে যাক।

নার্সিংহোম থেকে ডেথ সার্টিফিকেট আর বাজার থেকে কিছু ফুল নিয়ে নীলু ফিরল। জানাল, সৎকার সমিতির কাচ-ঘেরা গাড়িটাও এসে যাবে এবার। প্রতিবেশী কয়েকটি ছেলে তৎপর হয়ে উঠল। ওদের হাত থেকে কয়েকটা ফুল নিয়ে পরিতোষ হাঁটু মুড়ে বসল মিলির মাথার কাছে। একটু ঝুঁকে ফুলগুলো গুঁজে দিতে গিয়ে ভক করে একটা দুর্গন্ধ উঠে আসে পরিতোষের নাকে। পচন শুরু হয়েছে দেহটার। এবার নিয়ে যাওয়া উচিত।

কারও কাঁধে চড়ে যাবে না, উন্মুক্ত চিতায় পুড়বে না ওর শরীর—মিলি জানিয়ে গেছে। সেই রকমই ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু গাড়িতে ওঠাবার আগে এক শিশি অডিকোলন এনে ঢেলে দিল নীলু, ছড়িয়ে দিল খাটটার ওপর সর্বত্র। মৃদু পচা গন্ধ, অডিকোলন আর স্বজনদের শোক সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ি থেকেও বেরিয়ে গেল মিলি।

বাড়িতে আশ্রিত এই মহিলা—ভালবাসা না পেয়েও সে কিন্তু জীবনকে ভালবেসেছে। পরিতোষ তাই নিয়ে ওকে খোঁটা দেয়।

'আচ্ছা বদলিমামি, তুমি নকুলমামার ঘর করেছ তিরিশ বছর। তবু তোমায় নেয়নি বলতে চাও?'

'আমি আবার কী বলব,' বদলিমামি এই বুড়ো বয়সেও লজ্জা পায়, 'এ কি বলার কথা? সবাই জানে।'

পিঁড়ির উপর বসে সিপ সিপ করে চা খেতে খেতে পরিতোষ বলে, 'নকুলমামা একটি আস্ত পাষণ্ড ছিল—যা-ই বলো বাপু।'

'ও কথা বলতে নেই। তাঁর কী দোষ?'

'তোমারই বা কী দোষ?'

'আমার কাকার দোষ। নিজের মেয়েকে দেখিয়ে আমার সঙ্গে বিয়ে দিল। আমি কুচ্ছিত, আমার মুখ-ভরতি মায়ের দয়ার গর্ত, এক চোখ কানা, দেখলে কি পছন্দ করতেন? যখন জানতে পারলেন, তখন

বিয়ে শেষ। ফেললেন না। ঘরে এনে তুললেন। শ্বশুরবাড়িতে এসে পৌঁছোতে-না-পৌঁছোতে কী কান্নার রোল—আমার এখনও মনে আছে।'

মেঝেতে পাতা খবরের কাগজের পাতা উলটোতে উলটোতে পরিতোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আবার দুষ্টুমিটা মাথা চাড়া দেয়। জিজ্ঞেস করে, 'তুমি তো মেয়েমানুষ, চেষ্টা করোনি মন ফেরাতে?'

বদলিমামি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। একটু পরে বলে, 'উচ্ছে এনো। বরবটি, বেগুন। সুক্ত রাঁধব।'

'আনব।' পরিতোষ মিটিমিটি হাসে। বলে, 'আমার কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ মামি।'

'প্রথম প্রথম তো শাশুড়ি কাছেই ঘেঁষতে দিত না। গালাগাল করত সব সময়। ছেলেমেয়েরা ঠাট্টা করে ডাকত—বদলি মা।'

'ছেলেমেয়ে মানে তো আগের পক্ষের—'

'সবই এক। তাঁর সন্তান আমারও সন্তান। তা যখন সেবাযত্ন করে সকলের মন তুষ্ট করলাম তখন তাঁরও সেবা করার অধিকার পেয়েছি।'

'তারপর?'

'একদিন ঘর মুছতে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত ঠেকে গেছে। আমি তো ভয়ে আড়ষ্ট। তিনি বললেন, কিছু মনে কোরো না, আমি বাকি জীবনটা ব্রহ্মচারী থাকতে চাই। আমি বললাম, মনে আবার কী করব? তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। এই আর কী!'

পরিতোষ কাগজ গুটিয়ে রেখে উঠে পড়ে। উত্তেজিত স্বরে বলে, 'তিরিশ বছর তোমার সেবাযত্ন ভোগ করে ওরা তাড়িয়ে দিল তো? সারাজীবন তুমি কতকগুলো ভূত আর পেতনির চাকরি করে এসেছ!'

বদলিমামি অবিচল। বলে, 'দুনিয়ায় কে কাকে তাড়ায়? এই তো আমি খারাপ আছি কিছু? আপনজন কি কারুর গায়ে লেখা থাকে?'

পরিতোষ বলে, 'তুমি ভগবান মানো না?'

'ভগবান কে না মানে?'

'আমি মানি না।' পরিতোষ বাজারের দিকে এগোয়।

বাপের বাড়ি চলে গেলেও মিলি যত দিন বেঁচে ছিল, তত দিন এ-বাড়িতে পরিতোষের চৈতন্যের মধ্যে তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়নি। হওয়ার কথা নয়। মিলিও চায়নি, হোক। না হলে জামাকাপড়, টুকিটাকি ব্যবহারের জিনিস, তোলা গয়না রেখে যেত না। আর সকলের স্ত্রীদের মতো ও যে সাধারণ একজন মেয়ে নয়, পরিতোষ বুঝুক। যে গ্লানি ওর প্রাপ্য—হীনতার সেই গ্লানি ওর মাথা নিচু করে দিক যাতে ও স্ত্রীরত্নের কাছে করুণা ভিক্ষে করতে শেখে। পরিতোষ শেখেনি কিন্তু অস্বস্তি বোধ করেছে। যাকে অন্তর থেকে চাইছে না, সে আছে। ছেড়ে গেলেও সে চলে যায়নি। যে-কোনও সময়ে আবার দুমদাম করে এসে পড়তে পাবে মিলি, এই সম্ভাবনা পরিতোষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। এ-আতঙ্ক এক ধরনের বিরহ—ভেবে এক-এক সময় ওর হাসি পেয়েছে।

আজকাল অস্বস্তিবোধটা আর নেই। যে অবাঞ্ছিত, সে মৃত। তার সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন পরিতোষ ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে।

ওর আছে গানের ইস্কুল, দু'-একটি গানের ট্যুইশন আর নিজের মনে থাকা। একা। নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন এই একা থাকা। ইচ্ছে হলে বদলিমামির সঙ্গে হালকা গল্পসল্প করে, ইচ্ছে হলে বিছানার উপর হারমোনিয়াম রেখে গান। গান লেখে, গানে সুর দেয়। মামুলি সেই সব গান—চাঁদ, ফুল, চোখ, নদীর জল, রোমাঞ্চকর ছোঁয়াছুঁয়ি কিংবা বিরহ বিষয়ক।

বিরহ শব্দটা মনে করলে আজও হাসি পায় পরিতোষের।

অথচ একদিন হঠাৎ এই রকম বিরহের একটা গান ভাঁজতে ভাঁজতে ওর প্রচণ্ড যন্ত্রণা বোধ হল। বুকের ডান দিকটায় পঞ্চম পাঁজরের ঠিক নীচে, যেখানে সবচেয়ে বেশি সুড়সুড়ি, সেইখানে যেন কেউ একটি সরু দীর্ঘ সুচ বিঁধিয়ে দিয়েছে। গভীর এক দুর্বোধ্য অথচ মসৃণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল সে। অন্যমনস্কতার মধ্যে ও যেন দেখতে পায়, একজন-দু'জন করে অনেকগুলি যুবতী মেয়ে—যাদের কোথাও-না-কোথাও দেখেছে কখনও—বিজ্ঞাপনে, বাজারে, ছবির পরদায়, কিংবা কখনওই দেখেনি, তারা একে-একে এসে ওর চারপাশে জড়ো হচ্ছে। কিছুই বলছে না, কিন্তু ইঙ্গিত করছে তারা। লোভ

দেখাচ্ছে। ঠোঁট খুলে খুলে, হাত তুলে ওকে প্ররোচিত করছে। কী চিক্কণ ওদের শরীর।

হারমোনিয়াম পাশে সরিয়ে রেখে পরিতোষ শুয়ে পড়ে চোখ বুজে। উপুড় হয়ে বিছানায় মুখ ঘষে। শক্ত তোশকের ওপর নখ দিয়ে আঁচড়পাঁচড় কাটে। জ্বালা করতে করতে ওর চোখে জল ভরে আসে একসময়। যন্ত্রণার নিরসন হয় তখন। মিলি কাছে থাকলে ভাল হত—অবসন্ন পরিতোষের মনে হয় একবার—এইসব আকস্মিক আক্রমণ থেকে ও বাঁচত।

দেখতে দেখতে এই সুচ-বেঁধা ব্যাপারটা ওর প্রিয় খেলা হয়ে দাঁড়ায়। একটু অবসর পেলেই ও একা এবং অন্যমনস্ক হয়ে যায়, মনে করার চেষ্টা করে একটি নীরোম নরম মুখ ও শরীর, শরীরের গন্ধ—। আর তখনই অনুভব করে, একটা সরু দীর্ঘ সুচ ওর পাঁজরের মধ্যে প্রবেশ করছে। থামছে, এগোচ্ছে, থামছে, আবার এগোচ্ছে। আর ওর শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ু রক্তে ভরাট, টান টান, এই বুঝি ফেটে যায়।

কিছুক্ষণ পর আপনিই চলে যায় কষ্টটা। পরিতোষ ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করে। উঠে এক গ্লাস জল খায় হয়তো। চা হলে চা।

চর্চার ফলে এই কষ্ট নিয়ে খেলাও ওর অভ্যেস হয়ে গেছে ভেবেছিল, কিন্তু দেখল, হয়নি। একদিন সন্ধেবেলা ও অবাক হল এক গণিকাপল্লির সামনে নিজেকে আবিষ্কার করে।

'আইয়ে বাবু, হামরা সাথ আইয়ে।'

ধুতি ও শার্ট-পরা একজন রোগা অবাঙালি লোক ওকে বড় রাস্তা থেকে গলির ভিতর দিকে ডাকছে। ওর চোখে চোখ পড়তে লোকটা কুৎসিত ইশারা করল। পরিতোষ ভিতরে ভিতরে কাঁপছে অথচ জায়গাটার চারপাশ কেমন অস্বাভাবিক রকম শান্ত, উত্তেজনাহীন। যেন ফিসফাস একটা ষড়যন্ত্র চলছে ওদিকে—ওই অল্প-আলোকিত গলির মধ্যে, তার দু'পাশের খুপরিগুলোয়। পরিতোষ দেখল, কাছেই রাস্তাটার মুখে প্রকাণ্ড জঞ্জালের স্তূপ। তার পাশ দিয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে একজন ফরসা পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক দ্রুত গলিটার মধ্যে ঢুকছেন।

সমস্ত সুচ-বেঁধানো কষ্ট ছাপিয়ে বিষম ঘৃণা জেগে উঠল ওর। কী নোংরা, কী জঘন্য, কী অশ্লীল এই জায়গাটা।

গলির ভিতর থেকে খালি ট্যাক্সি বেরিয়ে আসতে দেখে ও টপ করে উঠে পড়ল।

কলিং বেলের শব্দ শুনে বাবলু দরজা খোলে। ডান হাতে আধ-খাওয়া টোস্ট, মুখের মধ্যে খাবার, মুখের বাইরে ইতস্তত চিনির টুকরো। আগন্তুককে চিনতে না পেরে খাদ্যজড়িত প্রশ্ন করে, 'কাকে চাই?'

আগন্তুক মৃদু হাসে। বুঝতে পারে, বাবলু ওকে চিনতে পারেনি। শেষ বার যখন এ-বাড়িতে এসেছিল, তখন ও ঢের ছোট ছিল। মনে থাকার কথা নয়। তবু সে প্রতি-প্রশ্ন করে, 'রঞ্জন আছে?'

'না। বাবা তো কাজ থেকে ফেরেননি এখনও।'

'সে কী! আজ রবিবার না? রবিবারেও কাজ?'

'বাবার বুধবার ছুটি।' আগন্তুককে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে বাবলু বলে, 'আপনার নাম বললে মাকে খবর দিতে পারি। মা আছেন।'

দশ বছরের ছেলেটির সপ্রতিভতা দেখে আগন্তুক খুশি হয়। আগে কী দুরন্ত প্রকৃতির ছিল, এখন কেমন শান্ত ও বুদ্ধিমান হয়েছে।সম্ভবত কোনও কনভেন্ট স্কুলে পড়ে, ওরা নাকি ম্যানার্স ট্যানার্সও শেখায়।

'বলো পরিতোষ ঘোষাল এসেছেন।'

চোখের উপর থেকে একটা ছায়া যেন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। টোস্ট ধরা ডান হাতটি পিছনে আড়াল করে বাবলু। তারপর দরজা ছেড়ে দাঁড়ায়। বলে 'ভিতরে আসুন। বসুন, আমি মাকে খবর দিচ্ছি।'

সীতা সবেমাত্র বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। ব্রেসিয়ার ও পেটিকোটের উপর শাড়িটা কোনও রকমে জড়ানো। ভিজে সাবান-ধোয়া মুখ, বাহু ও গলার নীচের অংশ। একটা নকশা-করা তোয়ালে দিয়ে কপালের ওপরের চুল মুছছিল। খবর শুনে ও হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠে।

বলে, 'তুষ্টিবাবু রে। গানটান করেন। তোর মনে নেই? সেই একবার এসে কত ছবি তুলে দিয়েছিলেন।'

অসংবৃত জামাকাপড়ে জড়ানো মায়ের উৎফুল্ল ভাব দেখে বাবলু অপ্রসন্ন। বলে, 'কে তুষ্টিবাবু, আমি চিনি না।'

সীতা বলে, 'বসতে বল। একটু গল্পসল্প কর লক্ষ্মীটি, আমি এখুনি আসছি।'

সীতা চটপট প্রসাধন সারে। চুল আঁচড়ায় এবং আলমারি থেকে বার করে একটি সবুজ সিল্কের শাড়ি। আয়নার সামনে এগিয়ে এসে সবুজ টিপ পরতে পরতে ও মনে মনে বলে, আমার সৌভাগ্যের রং সবুজ, তাই না? আপনিই বলেছিলেন। খানিক পর খুশিভাব সংবরণ করে ও বেরিয়ে আসে।

'হঠাৎ কী মনে করে এতদিন পরে?' রোগা হলেও এত সুন্দর ওকে দেখায় যে পরিতোষ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে. ওর চোখ জুড়িয়ে যায়।

'এ পাড়ায় এসেছিলাম, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। অনেককাল এদিকে আসা হয় না।'

'এখুনি ও এসে পড়বে, বসুন না।'

বলেই সীতার মনে পড়ে যায়, কথাটা ঠিক বলা হল না।

পরিতোষ বলে, 'বাবলু কী বড় হয়ে গেছে! প্রথমটা চিনতেই পারিনি। তারপর হিসেব করে মিলিয়ে নিলাম।'

'তা আর হবে না! ছেলেপুলে একবার জন্মালে হু-হু করে বেড়ে ওঠে। আর বাপ-মাকে বুড়ো করে দেয়।' জানলাব পাল্লা দুটো খুলতে খুলতে সীতা বলে।

'আপনাকে পারেনি কিন্তু,' পরিতোষ তার কান পর্যন্ত ঝোলানো চুল ঠিক করতে করতে বলে, 'আপনি ঠিক আগের মতো আছেন।'

'আপনার চোখের ভুল। হ্যাঁ, ভুল।' একটা দীর্ঘশ্বাস বোধহয় গিলে ফেলে সীতা।

চা আসে। চায়ের সঙ্গে দু'টুকরো কাটা কেক। একটা প্লেট ও এক কাপ চা পাশের ঘরে দিয়ে আসে চাকর। বাবলুর টিউটর এসেছেন। অস্পষ্ট দুটি কণ্ঠস্বর—একটি গম্ভীর, ভারী, আরেকটি বালকের—শোনা যাচ্ছে।

খেতে খেতে পরিতোষ জানতে চায়, সে গৃহকর্তার জলখাবারে ভাগ বসাচ্ছে কিনা। উত্তরে সীতা স্বাভাবিক মিষ্টি হেসে বলে, গৃহকর্তাব কাছে মিষ্টান্ন ইতরজনের খাদ্য। পরিতোষ অনুমান করে, রঞ্জন আর আগের মতো নেই।

তবু বলে, 'আপনাদের সংসাবটি ভারী ছিমছাম। দেখে হিংসে হয়।'

'তাই বুঝি?'

'স্বামী কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরবে, তাকে রিসিভ করার জন্য আজকালকার মেয়েরা সাজগোজ করে না, তাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। অথচ একটু সাজলে কী ভাল লাগে—'

'ওমা, আপনি এই বুঝলেন!' সীতা খুব জোরে হেসে ওঠে, শরীর থেকে ডান হাতখানা বার করে বিস্ময়ের মুদ্রায় মেলে দেয়, 'আমি কিনা আপনার জন্য সাজলুম। হাত দেখে বলেছিলেন, আমাব সৌভাগ্যের রং সবুজ, মনে নেই?'

সবুজ রেশমে মোড়া একটা নারীর শরীর পরিতোষ পর্যবেক্ষণ করে, শরীরের ভাঁজে ভাঁজে পাক খেয়ে যাওয়া নম্র রেশমের স্নেহ, ফরসা হাতখানি ঘিরে আট-দশ গাছা উজ্জ্বল চুড়ির সঙ্গে একটি শাঁখার শুভ্রতা, সব মিলিয়ে যার নানা রূপ।

'বলেছিলাম বুঝি?' পরিতোষ হাসে।—'তখন ব্যাচিলার ছিলাম।'

'সেই যেবার এসে সারাদিন ছিলেন। কত গান করলেন আপনি। ও খিচুড়ি আর মাংস রাঁধল। বলল, তুমি তো বারোমাস রাঁধো, আজ তোমার ছুটি। তারপর খেয়েদেয়ে ক্যারাম খেলা—কী হুল্লোড়! আপনি-আমি জুটি ছিলাম, ওর জুটি রুমা, আমার বোন, হোস্টেল থেকে এসেছিল সেদিন। আমরা জিতলাম। মনে নেই, সন্ধেবেলা ছাদে মাদুর পেতে, অন্ধকারে আপনি আবার কত গান শোনালেন, আমাদের তিনজনকেও গাইতে বাধ্য করলেন? আপনি-আমি একসঙ্গে গেয়েছিলুম। এই গানটা—মাঝে মাঝে তব দেখা পাই—'

শান্ত গলায় পরিতোষ বলে, 'মনে পড়ে অনেক ফটো তুলেছিলাম। আর মাঝে মাঝে মনে পড়ে, আপনি আমায় এক খিলি পান থেকে ছিঁড়ে আধখানা খেতে দিয়েছিলেন।'

'মোটেই না, কী মিথ্যুক! দাঁতে-ধরা পানটা আপনিই তো বাইরে থেকে ছিঁড়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওতেই চলবে।'

'ঠোঁট ছোঁওয়ার জন্য। পান খাওয়াটা ছল।'

'তা আর আমি বুঝিনি।'

কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ বাবলু এসে দাঁড়ায়। বলে, 'এত জোরে কথা বলছ মা। ও-ঘরে আমি পড়ছি, তোমার খেয়াল নেই?'

বলে ফিরে যায় সে।

রসভঙ্গ হওয়াতে সীতা ক্ষুণ্ণ হয়।। পরিতোষ অপ্রস্তুত। বলে, 'রঞ্জন এখনও এল না। আমি উঠি।'

'না, না, যাবেন না প্লিজ!' একা হয়ে যাওয়ার ভয়ে সীতা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। তারপর সংযত হয়ে বলে, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে, চলুন ছাদে গিয়ে গল্প করি।' একটু ভেবে আবার বলে, 'আপনার বন্ধুর ফিরতে রাত হবে।'

ছোট ছাদ। খুব একটা অন্ধকার নয়. দু'পাশের উঁচু বাড়ির আলো খণ্ড খণ্ড ভাবে পড়েছে। রাস্তার দিকটায় কোমর পর্যন্ত উঁচু আলসে, পিছনে জলের ট্যাঙ্ক, বালতি, কিছু আবর্জনা।

আলসেয় ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় সীতা। মুখে দুষ্টুমি ফুটিয়ে বলে, 'আপনাকে দেরি করিয়ে দিলুম কি? গিন্নি আবার রাগারাগি করবেন না তো?'

বেঁচে থাকলে করতেন।'

'ওমা সে কী? এতক্ষণ বলেননি কেন তুষ্টিবাবু?' সীতা ব্যথিত প্রশ্ন করে, 'কবে? কী হয়েছিল?'

মুখে তুচ্ছ ভাব এনে পরিতোষ বলে, 'মাস তিন-চার আগে। কী হয়েছিল ঠিক জানি না। আমরা একসঙ্গে থাকতাম না।'

সীতা চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। ঘুরে দাঁড়ায়। আলসের ওপর কনুই ভর করে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা রাস্তা দেখে। একটা সাদা বেড়াল লাফ দিয়ে পাশের বাড়িতে ঢোকে।

সীতা বলে, 'আমাদেরও মাঝে মাঝে ডির্ভোসের কথা হয় নিজেদের মধ্যে।'

'তারপর বিছানায় সব মিটমাট হয়ে যায় তাই না?' পরিতোষ লঘু মন্তব্য করে।

'মিটমাট ঠিক হয় না, জানেন তুষ্টিবাবু।'

যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে সীতা, মৃদু স্বরে বলতে থাকে, 'বাড়ির প্রতি টান ওর কমে গেছে। আমি সারাদিন সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকি যদিও এখন আমাদের কাজের লোক আছে। নিজেকে বিশেষ কিছু করতে হয় না। সন্ধেবেলা থেকে ভয়ংকর একা। তার ওপর বাবলু ওর বাবার প্রশ্রয়ে আমার উপর অভিভাবকত্ব করে। আমি যে একটা আলাদা মানুষ, স্বামী-পুত্রের মনোরঞ্জন করা ছাড়াও আমার জীবনেব যে কোনও নিজস্ব ব্যাপার থাকতে পারে, তা ওরা মানবে না।'

'কেন, সংসার চালিয়ে, স্বামী-পুত্রের—যাকে বলে 'সেবা করে'—মন ভরে না?' পরিতোষ জানতে চায়।

'না। ভরে না।'

'কেন? ভালবাসেন না ওদের?'

'ঠিক বুঝতে পারি না।' সীতার গলার স্বর বোধহয় ভিজে উঠল, 'ওটা ভালবাসা, না অভ্যেস। রঞ্জন বকাবকি করলে চুপ করে থাকি, উপহার এনে দিলে হাসিমুখে নিই, শোবার প্রস্তাব করলে রিফিউজ করি না।'

'প্রতিবাদ করলেই পারেন।'

'কোনও লাভ হয় না দেখেছি। বুঝে গেছি আমার শুধু রাজি হওয়ার ভূমিকা। এক এক সময় আত্মসম্মানে বড় লাগে যখন ভাবি কেন এই সব। মনে হয় কেন নিজেকে ছোট করছি।'

শুনতে শুনতে পরিতোষ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। অনেক দিন পর মিলিকে মনে পড়ছিল ওর। অনুভব করছিল বুকের ডান দিকটায় পঞ্চম পাঁজরের ঠিক নীচে যেখানে সবচেয়ে বেশি সুড়সুড়ি সেইখানে একটা সরু দীর্ঘ সুচ বিঁধছে আস্তে আস্তে।

হঠাৎ চমকে উঠে দেখল সীতা তার শাঁখা ও চুড়ি-পরা হাতটা দিয়ে ওর হাত ধরেছে। শুনল, ও বলছে, 'তুষ্টিবাবু আমায় গান শেখাবেন?'

এত কাছে দাঁড়িয়ে সীতা, পরিতোষের বুক কাঁপছিল। আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিল, একটু হেসে বলল, 'কত মাইনে দেবেন?'

সীতাও এবার হাসার চেষ্টা করল একটু। বলল, 'অনেক মাইনে দেব। যত চান। শেখাবেন, বলুন?'

তারপর ওর প্রসাধন-মাখা মুখটা পরিতোষের কানের কাছে ফিসফিস করে উঠতেই অডিকোলন মেশানো ডেডবডির মৃদু পচা গন্ধটা লাফিয়ে উঠল যেন, যে-গন্ধ শুধু ভালবাসা-ফুরিয়ে-যাওয়া মেয়েদের শরীর থেকেই পাওয়া যায়।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পরিতোষ বলল, 'না।'

১৯৭৫

কম্প্রেসর

খুব ঘটা করে পপাইয়ের উপনয়ন হয়ে গেল।

ভূপেশ চক্রবর্তী প্রথমে ভেবেছিলেন, কালীঘাটে গিয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডেকে নাপিত ডেকে উপনয়ন অনুষ্ঠানটি সেরে আসবেন। আজকাল আকছারই লোকে তাই করছে। এতে ঝক্কি ঝামেলা কম, খরচও কম। ব্রাহ্মণ সন্তান, উপযুক্ত বয়সে উপবীত ধারণ করা তার ধর্মীয় কর্তব্য; কিন্তু আগেকার মতো নিষ্ঠা যখন নেই তখন সমারোহের প্রয়োজন কী?'

ছোট ছেলে আর্য বলল, "না বাবা, শর্টকাট কোরো না। পপাই মনে দুঃখ পাবে। বউদি তো পাবেই। ভাববে—"

'ওর বাবা বেঁচে নেই বলে আমরা অবহেলা করছি।"

"ঠিক তা নয়—"

"ঠিক তাই।" স্পষ্ট কথার মানুষ ভূপেশ বললেন, "দেবু বেঁচে থাকলে সে-ও ছেলেকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে নমো নমো করে কাজ সারত।"

"দাদা নিজের ছেলের ব্যাপারে কী করত, আমরা জানি না। দাদার অবর্তমানে আমরা কী কবছি সেইটেই ধর্তব্য। তা ছাড়া আত্মীয়স্বজন রয়েছে, তাদের কথাও মনে রাখা উচিত।"

স্পষ্ট কথার মানুষ ভূপেশ তখন বলেছিলেন, 'মানলাম। তা হলে আমাব মত হল, অনুষ্ঠানটি যথাযথভাবে পালন করতে হবে।"

"তার মানে?"

"ব্রহ্মচারীর মাথা ন্যাড়া করতে হবে, কান বেঁধাতে হবে। তিনদিন একবস্ত্রে দণ্ডীঘরে থাকতে হবে। এক বছর নিরামিষ খেতে হবে, সন্ধ্যাহ্নিক করতে হবে দু'বেলা। এগুলো শাস্ত্রীয় নিয়ম, এ-সব নিয়ম তোমরা মেনেছ। পপাইও মানবে।"

আর্য হেসে ফেলে এবার। বলতে চায়, বাবা, একটা এগারো বছরের ছেলের ওপর এত অনুশাসন চাপিয়ো না। আজকাল কেউই এসব আচার মানে না। বাপ-মায়েরাই ছেলেকে মানতে দেয় না। সন্ধ্যাহ্নিক করার সময় কোথায় ওর। এক বছর মাছ-মাংস খেতে না পেলে ছেলে দুর্বল হয়ে পড়বে না? পপাইকে দিয়ে একাদশীর উপবাস করানো নৃশংসতা হবে না কি? বলতে চায়; আমাদের ছোটবেলায় রীতি মানাই ছিল রীতি, এখন জীবনের ধারা বদলে গেছে কত। আমি নিজেই পইতে ফেলে দিয়েছি কবে।

বলতে চায়, কিন্তু বলে না।

"সে দেখা যাবে।" বলে দোতলা থেকে নেমে এসেছিল আর্য।

ধার্মিক অনুষ্ঠান না। উপনয়ন হল এক পারিবারিক উৎসব। বালককে সামনে দাঁড় করিয়ে দু'-তিন দিন সকলে মিলে হইহই করা। কলকাতা শহরে এবং শহরতলিতে থেকেও যাদের সঙ্গে কচিৎ-কদাচিত দেখা হয়, তাদের একত্র করা, এরও একটা মূল্য আছে।

উত্তর কলকাতার ভাড়া-বাসা ছেড়ে নিজে বাড়ি করে উঠে এসেছেন ভূপেশ চক্রবর্তী, সপরিবারে, এই নাকতলায়, আজ পনেরো-ষোলো বছর হল। সেখানে দু'টো ঘর ছিল, এখানে ছোট-বড় মিলিয়ে খানচারেক ঘর। বাড়ির সামনে একটু বাগান, ফুলগাছ, একটা পেয়ারাগাছ। দোতলায় এক টুকরো ছাদ। ফাঁকা, খোলামেলা। কলকাতার মতো ঘিঞ্জি নয়। ভোর হতে-না-হতে ধোঁয়ায় ভরে যায় না পাড়া। একদিকে যেমন সুবিধে, আবার অন্য দিকে তেমনই শহর থেকে দূরে। গড়িয়ার বাসে আনন্দ আশ্রম অবধি এসো, নেমে রিকশা চেপে সাত-আট মিনিট। হাঁটলে মিনিট পনেরো। ইলেকট্রিক আলো আছে। বাহাত্তর এক্সচেঞ্জে টেলিফোন। সিলিন্ডার গ্যাস চাইলেই পাওয়া যায়। টিভি-তে স্পষ্ট বাংলাদেশ আসে। আর কী চাই। ষোলো বছর আগে জিনিসপত্রের দাম ছিল অনেক কম, তবু এই বাড়ি করতে গিয়ে দুই ছেলের কাছে টাকা চাইতে হয়েছিল ভূপেশকে।

পুরনো বাসায় থাকতে স্ত্রীকে হারিয়েছিলেন, তাই এ-বাড়িতে তাকে জড়িয়ে কোনও স্মৃতি নেই। নাকতলায় এসে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ভূপেশ। বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছেন তার পরে। পপাই জন্মেছে কলকাতার শিশুমঙ্গলে। নিউ আলিপুরে রত্নার শ্বশুরবাড়ি।

ফরসা, রোগা, লম্বাটে মুখ, বড় বড় দুটো চোখ-ভরা বিস্ময়—এই হল পপাই। দেবুও ছোটবেলায় ওই রকম ছিল। অথচ আর্য ওর চেয়ে দু'বছরের ছোট, বরাবর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী এবং উচ্চতায় দাদার চেয়ে চার আঙুল ঢ্যাঙা। সে কিছুতেই কাতর হয় না, অবাক হয় না। এক এক জন মানুষ থাকে, ছোটবেলায় মুখচোরা ও স্পর্শকাতর, শান্ত ও অনুগত। লোকে তার প্রশংসা করে। বড় হলে দেখা যায়, সে ক্রমশ পরামুখাপেক্ষী এবং সংগ্রামবিমুখ একজন ভিড়ের মানুষে পরিণত হয়েছে। প্রতিযোগ তার কাছে বিভীষিকা। জীবনে কোনও রকমে থিতু হয়ে বসতে পারলে সে নিশ্চিন্ত। পৃথিবী তার সামনে দিয়ে ছুটবে কিন্তু সে পৃথিবীর সঙ্গে ছুটবে না। সে একটি পাশে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে জীবনের ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড় আর মনে মনে গুনবে তার কাছ থেকে অবসর পাবাব দিন। দেবু ছিল তাই।

কোনওক্রমে বি এ ডিগ্রিটি হস্তগত করে বলেছিল, "আমি আর পড়ব না।"

ভূপেশ বলেছিলেন, "তা হলে একটা চাকরিবাকরির সন্ধান করো।"

"কী করে চাকরি খুঁজতে হয়, আমি জানি না।"

ভূপেশ রাগ করে বলেছিলেন, "বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করো। শুধু বি এ ডিগ্রি দেখিয়ে কিছু হবে না। হাজার হাজার বি এ পাশ রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাশাপাশি স্টেনোটাইপিং শিখে নাও। বাজারে স্টেনোগ্রাফারের ডিমান্ড আছে।"

"সে অনেক ঝামেলা।'

"ঝামেলা কেন। স্টেনোর কাজ সবচেয়ে সোজা। কখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয় না। ওপরঅলা যা বলবে, খাতায় টুকে নাও, তাই টাইপ করে দিয়ে দাও। সব দায়িত্ব তার।"

এটা আসলে বাবার বকুনি, বুঝেছিল দেবু। আর কিছু বলেনি। তারপর একদিন, যেভাবে সব কুমারী মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, সেইভাবে দেবুরও একটা চাকরি জুটে গিয়েছিল। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে কেরানির কাজ। প্রথমটা পছন্দ হয়নি ওর। তারপর যেভাবে মেয়েরা কালো, বেঁটে, মোটা, টেকো বা আখুটে বরকেও একসময় ভালবেসে ফেলে, দেবু সেভাবে তার চাকরিকে ভালবেসে ফেলেছিল। চাকরি নিয়ে গর্ববোধ করত। আপিসে ওর হাতের লেখার সুনাম হয়েছিল।

কলকাতায় পৈতৃক বাড়ি, পাকা চাকরি, সংসারে দায়দায়িত্ব নামমাত্র। একটু রোগা হলেও পাত্র রুগ্ণ নয়, ফরসা গায়ের রং তার। দেখতে-শুনতে খুব একটা চৌকশ নয়, নাই বা হল। হিরের আংটি সোজা না বাঁকা—কে খতিয়ে দেখে। সম্পন্ন বাড়ির মেয়ে নয়নের সঙ্গে দেবুর বিয়ে হয়ে গেল। মেয়ের বাপ নেই, বড় ভাই অভিভাবক। তবু যথেষ্ট খরচ করেছে। বলে, বাবা নয়নের বিয়ের জন্য টাকা রেখে গেছেন আলাদা করে, আমার ক্ষমতা কী এত খরচ করার। ভূপেশ মেয়ে পছন্দ করেছেন। দাবিদাওয়া তেমন কিছু করেননি বলতে গেলে। বলেছিলেন, আপনার বোনকে গয়নাগাঁটি যা দেবেন সে তো তারই থাকবে। ঘর-খরচ বলে নগদ আমি চাই না। যদি কিছু না মনে করেন, একটা ফ্রিজ দেবেন। বড়সড় একটা ফ্রিজ বাড়িতে থাকলে সংসারের অনেক সুরাহা হয়।

পপাইয়ের বয়স এগারো বছর, ফ্রিজটা ওর চেয়ে দেড় বছরের বড়। তার মানে ফ্রিজটার বয়স সাড়ে বারো। ধবধবে সাদা, শান্ত। ভেতরটা কনকনে ঠান্ডা। ওকে নিয়ে একদিনের জন্যেও কোনও নালিশ

ওঠেনি। নিঃশব্দে ও তার কর্তব্য করে গেছে। পপাইয়ের জন্ম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে এ-সংসারে, ওই ফ্রিজ তার নীরব সাক্ষী।

ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে স্কুটার কিনেছিল দেবু। সেই লোন শোধ হবার আগেই ও মারা গেল। কলকাতা শহরে যারা স্কুটার চালায় তাদের কেউই অক্ষত থাকে না, এমন রটনা আছে। রাস্তাঘাটের যা শোচনীয় অবস্থা এবং অন্যান্য যানবাহনের যা বেপরোয়া আচরণ, তাতে এ-রটনাকে আজগুবি বা কষ্টকল্পিত বলবে না কেউ।

সাড়ে ন'টায় বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিল দেবু সেদিন। সেটা ছিল সোমবার। তারাতলার এক কারখানায় ম্যানেজারি করে আর্য, সে-দিন যথারীতি সকাল আটটায় গাড়ি এসে ওকে তুলে নিয়ে গেছে। পপাই গেছে স্কুলে। সাড়ে এগারোটায় বাড়িতে টেলিফোন; গুরুতর আহত দেবপ্রিয় চক্রবর্তী শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভরতি হয়েছে। বাড়ির লোককে আসতে বলা হচ্ছে।

বাড়িতে তখন লোক বলতে ভূপেশ আর নয়ন ছাড়া আর কেউ নেই। ভূপেশ টেলিফোনে ছোট ছেলেকে খবর দিলেন, সোজা হাসপাতালে চলে আসতে বললেন। তারপর পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। গিয়ে যা দেখলেন, তা প্রত্যাশিত বললে ভুল বলা হবে, এসব ক্ষেত্রে তা অবধারিত। একটা কাটা-ছেঁড়া শরীর। সর্বাঙ্গে মোটা মোটা সেলাই আর ব্যান্ডেজ। একটা মৃত মুখ। ফরসা লম্বাটে মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন বলতে কিছু নেই, ক্লান্তি নেই, কেবল আভাস আছে নিস্পৃহতার।

তখন মনে হয়েছিল, আজও দেয়ালে টাঙানো ওর ছবিটার দিকে চোখ পড়লে নয়নের মনে হয়, দুর্ঘটনাটা হয়তো উপলক্ষ ছিল, দেবু আসলে বাঁচতে চায়নি। যে-ধরনের আবেগ ও কৌতূহল থাকলে মানুষেব বাঁচতে ইচ্ছে করে, তা ওর ছিল না। কতকগুলো যন্ত্রপাতিসহ একটা শরীরকে ও যেন কোনওক্রমে বহন করে চলছিল। মৃত্যু হওয়ায় ও যেন নিষ্কৃতি পেয়েছে। ওরই ছোট ভাই আর্য, তাকে কাছ থেকে দেখলে তফাতটা বোঝা যায়।

পঞ্চাশ বছর আগে এই ঘটনা ঘটলে, বিধবা নয়ন তার আট বছর বয়সের ছেলের হাত ধরে বাপের বাড়ি চলে যেত। বাবা নেই, বড় ভাই তো আছে। ভবানীপুরের বাড়ির এক কোণে একখানা ঘর আব দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জুটে যেত সেখানে। পপাই মানুষ হয়ে উঠত একদিন। নির্বাসন থেকে মুক্ত করত তার মাকে। যাকে নিয়ে সংসার সেই মানুষটা চলে যাওয়ার পর এই নাকতলার বাড়ি, শোবার ঘয, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ফ্রিজ, এই বাড়ির দু'জন মানুষ—শ্বশুর এবং দেওর—সব কিছুই এক মুহূর্তে কেমন অনাত্মীয় হয়ে গেল নয়নের কাছে। পপাইয়ের শরীরে তবু এই বংশের রক্ত আছে কিন্তু সে কে? সে কেন?

স্পষ্ট কথার মানুষ ভূপেশ চক্রবর্তী বাদ সাধলেন।

বললেন, 'বউমা তোমাকে ফিরিয়ে দেব বলে তো ঘরে আনিনি। তুমি যেমন ছিলে, তেমনই থাকবে। তুমি যদি কষ্ট পাও, তোমার ছেলে যদি কষ্ট পায়, তা হলে যে গেছে, তার আত্মা কষ্ট পাবে না?"

পপাই তার বড় বড় চোখদুটো তুলে মাকে জিজ্ঞেস করে, "মা, বাবার আত্মা কোথায় আছে?"

"স্বর্গে।"

"সেখান থেকে কি আমাদের বাড়িটা দেখা যায়?"

নয়ন বলে, "হ্যাঁ বাবা, সব দেখা যায়। এমনকী মনের ভেতরটাও দেখা যায়। তুমি যেন এমন কিছু কোরো না যাতে বাবার আত্মা কষ্ট পায়। কেমন?"

একদিন দেবুর একটা ছবি নয়নের ঘরে টাঙিয়ে দিয়ে গেলেন ভূপেশ। মানুষের স্মৃতি বড় তাড়াতাড়ি মুছে যায় ওই ছবি দেবুকে ভুলতে দেবে না।

নাকতলার বাড়িতে আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসে।

ভোরবেলা ভূপেশ নিয়মিত হাঁটতে যান। ফিরে এসে চা খান। নয়ন চা করে দেয়। আগে তিন কাপ চা হত, এখন দু'কাপ চা হয়। তারপর ভূপেশ দুধ আনতে যান, দুধ এবং খবরের কাগজ নিয়ে ফেরেন। এই কাজটা আগে দেবু করত। আর্য ঘুম থেকে ওঠে সাতটায়, কাজে যায় আটটায়। তখন চায়ের দ্বিতীয় পর্ব। ঠিকে ঝি আসে। ডবল গ্যাসে ভাত ফোটে, দুধ ফোটে। ফ্রিজ থেকে মাছ বেরোয়, তরিতরকারি বেরোয়। ঝোল-ভাত খেয়ে তৈরি হতে-না-হতে বাইরে মোটরের হর্ন শোনা যায়। সকালের জলখাবার সারা হতে সাড়ে ন'টা।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির একপাশে খাবার টেবিল। তিনদিকে তিনখানা চেয়ার। জায়গাটা অন্ধকার বলে মাথার ওপর একটা আলো জ্বলে সব সময়। আগে প্রত্যহ সকালে খেপে খেপে ওই টেবিলে থালা পড়ত—প্রথমে দেওরের, তারপর স্বামীর, তারপর পপাইয়ের। এখন আর দেবুকে খেতে দিতে হয় না। তার টিফিন তৈরি করতে হয় না। আর্য বেরোবার পর এবং পপাই স্কুলে যাবার আগে খানিক দম ফেলার সময় পায় নয়ন।

এগারোটার মধ্যে সারাদিনের রান্না শেষ। দুপুরের খাবার ঢাকা দিয়ে, রাতের খাবার ফ্রিজে রেখে রান্নাঘর ধুয়ে চলে যায় ঠিকে ঝি। সে কামাই করলে এখন হিমসিম খেতে হয়। আগে দেবু স্ত্রীকে সাহায্য করত যথাসাধ্য। আর্য বলত, আমায় কিছু দাও। সে ওর মুখের কথা। মুখের কথা না হলেও নয়ন কি ওকে ডাকতে পারত? ওই সাতসকালে? ডাকা যায়?

শিশুর মনে শোক দুঃখ অতি ক্ষণস্থায়ী। যে-কোনও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে, খুশি মনে মিশে যেতে তার জুড়ি নেই। বর্তমান নিয়ে যে বাস করে , সে সুখী।

সংসারে এমন কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না পপাইয়ের। নতুন ক্লাসে উঠে ওর কিছু নতুন বন্ধু হয়েছে। আজকাল বিকেলে ফুটবল খেলে পপাই। পপাই না, তুহিন, তুহিন চক্রবর্তী। হাফ ব্যাক। আর একটু বড় হলে ও স্কুল টিমে খেলবে। বাবা একজন ছিল, সে বেঁচে নেই। কী আর করা যাবে। অগত্যা সে দোতলায় দাদুর ঘরে পড়তে যায়। নীচের তলায় মায়ের কাছে শোয়। দাদু বুড়োমানুষ, কিন্তু কখনও বকে না। পড়তে পড়তে যদি ঘুম এসে যায়, তখন শুধু গম্ভীর গলায় ডাক দেয়, 'পপাই'। বাবা কি খুব বকত? কী জানি, স্পষ্ট মনে পড়ে না ওর। এক এক সময় মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ও। চুলে সিঁদুর নেই, কপালে টিপ নেই, কেমন সাদা ফ্যাকাশে লাগে মাকে। কিন্তু সে-কথা কখনও উচ্চারণ করে না । পাছে মা দুঃখ পায়। পাছে বাবার আত্মা কষ্ট পায়।

এর মধ্যে কিছুদিন অসুখে ভুগে সেরে উঠলেন ভূপেশ। ওষুধে ডাক্তারে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। তারপর আচমকা ঘোষণা করলেন, "এখন থেকে আমিও নিরামিষ খাব, বউমা। এ-বয়সে গুরুপাক জিনিস সহ্য হচ্ছে না।"

দিনকয়েক আগে বাংলা কাগজ কেনা বন্ধ হয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েও নয়ন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দরজার কাছ থেকে মুখ নিচু করে বলে, "একটা কথা বলব বাবা? কিছু মনে করবেন না?'

"কী?"

"আমি কাজ করতে চাই।"

"কাজ তো সারাদিনই করছ। আরও কী কাজ করতে চাও?"

"এ-কাজের কথা বলছি না। আমি চাকরি করতে চাই। টাকা রোজগার করতে চাই।"

"হঠাৎ? নিরামিষ খাওয়ার কথা বললাম বলে?"

ভূপেশ দুঃখ পেয়েছেন মনে হল।

দরজা থেকে সরে নয়ন ভূপেশের কাছে এসে দাঁড়ায়। অবুঝ মানুষকে বুঝিয়ে বলার মতো করে বলে, "প্রায় তিন বছর হতে চলল আমার কপাল পুড়েছে। আপনি বলেছিলেন, আগে যেমন ছিলাম, তেমনি থাকব। আপনি তো বলেননি সারাজীবন এ-সংসারের বোঝা হয়ে থাকতে। যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, তাতে একজনের রোজগারে চলে? এখনও চলছে, কিছুদিন পর আর চলবে না। আমাকে আমার কর্তব্য করতে দিন বাবা। এটা তো আমারও সংসার।"

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন ভূপেশ। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বেলা বাড়ছে। তাপ বাড়ছে। বাগানে পেয়ারা গাছটায় বসে একনাগাড়ে ডেকে চলেছে একটা কাক।

বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, "আমাদের বংশে মেয়েরা কখনও বাইরে গিয়ে চাকরি করেনি।"

নয়ন বলল, "এ রকম দুর্ঘটনাও কি আগে কখনও হয়েছে বাবা? এ রকম দিনকাল কি আগে ছিল? আপনি অমত করবেন না।"

মেনে নিতে গিয়েও একটা অকাট্য যুক্তি যেন মনে পড়ে গেছে ভূপেশের। একটু হেসে বললেন, "চাকরি করতে চাইলেই কি চাকরি পাওয়া যায় বউমা। কে তোমাকে চাকরি দেবে বলো?"

"চেষ্টা করলে ওর ব্যাঙ্কে একটা কাজ পাওয়া যেতে পারে।"

"কে বলল?'
'ছোড়দা।
"ও কী জানে?"
"সেই সময়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ছোড়দা তো অনেকবার ওখানে গিয়েছিল। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার নাকি তখনই বলেছিলেন, ও তাঁর কথায় আমল দেয়নি।
"এতদিন পর—"
"ছোড়দা দেখা করে এসেছে। কাগজপত্র নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে দেখা করতে বলেছেন ম্যানেজার।
এরপর আর কিছু বলেননি ভূপেশ। মনে মনে হিসেব করলেন, কত বয়স হল ছোট ছেলেটার। আটত্রিশ? না উনচল্লিশ? কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হয়নি। এখন কি মত বদলেছে আর্যর?

নয়নের চাকরি হয়ে গেল।
সংসারে একজন সব সময়ের মা, বাইরের জগত তাকে টেনে নিয়ে গেল। ব্যাপারটা পপাইয়ের একদম পছন্দ হয়নি। পছন্দ ভূপেশেরও হয়নি। টানাটানি শুরু হয়েছিল সংসারে, এ-কথা ঠিক। তাঁর জমানো টাকায় হাত পড়ছিল বার বার। ভাবছিলেন, আর কতদিনই বা বাঁচবেন। কিন্তু আয়ুর কথা কে বলতে পারে? যদি আরও দশ বছর বাঁচেন? পনেরো বছর? যদি পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকেন দীর্ঘদিন? হাত খালি করা উচিত হত না। তবু, ভূপেশ বিশ্বাস করেন যে, নারী হল সংসারের সুষুম্নাকেন্দ্র। তার নিজস্ব একটা টান আছে, সেই টানে সে সংসারের বিভিন্ন প্রকার চরিত্রকে একত্র করে ধরে রাখে। এখন বাড়িতে সেই টানটা নেই। এক ধরনের ঢিলে জোড়ছাড়া বিমর্ষতা বিরাজ করছে । একটি বালক ও একজন বৃদ্ধ বিভিন্নভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করার ফলে পরস্পরের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। প্রকৃতপক্ষে নীচের তলায় বসবাস তুলে দিল পপাই।
পুরুষমানুষের মতো নয়ন নিয়মিত আপিস যায়। একজন সর্বক্ষণের কাজের মেয়ে এসেছে, রান্নাঘর সেই সামলায়। বৃদ্ধ ও বালকের দেখাশোনা সেই করে। কাজ থেকে ফিরলে আর্যকে, নয়নকে জলখাবার দেয়। স্কুল থেকে ফিরলে পপাইকে তার পথ্য করে দেয়। দু'বেলার রান্না সকালে সেরে ফেলার রেওয়াজ উঠে গেছে মমতা আসার পর। রাত্রে গরম গরম মাছ-তরকারি দিয়ে রুটি খায় সবাই। ভূপেশ ভাত খান।
খাওয়া-পরা নিয়ে মমতার জন্য মাসে কত খরচ হয়? শ'তিনেক টাকা। এই তিনশো টাকা মূল্যেব কাজ এতদিন ধরে করে আসছিল নয়ন। বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে সে এখন তার সাতগুণ টাকা রোজগার করছে। কত রকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ হয়েছে ওর, যা হয়তো কোনওদিন হত না। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষ হিসেবে নয়ন তার আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে। উপার্জনের জগতে সে কারও মা নয়, কারও স্ত্রী নয়, কারও পুত্রবধূ নয়, কারও বউদি নয়, সে নয়ন চক্রবর্তী, জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট। তার নিখুঁত কাজ, তার পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন, তার সপ্রতিভ ও অমায়িক ব্যবহার অনেককে আকর্ষণ করে। উপার্জনের জগতে মেয়েদের লাবণ্য ও কণ্ঠস্বরের বিশেষ মর্যাদা আছে, নয়ন সে মর্যাদার সন্ধান পেয়েছে।
"তোমার জন্যেই বেঁচে থাকার মানে আমি খুঁজে পেয়েছি।" অনেকবার আর্যকে এই কথা কৃতজ্ঞভাবে বলেছে নয়ন।
"আমারও স্বার্থ ছিল।"
বলেই আর্য বুঝতে পারে, কথাটার অন্য রকম মানে করা যায়। তাই ঘুরিয়ে আবার বলে, "মানে, তখন ভেবেছিলাম, দাদার সংসার চিরদিন আমার ওপর নির্ভরশীল হলে আমি কোথায় যাব? একলা মানুষ আমি, নিজের মনে থাকি, অকারণ জড়িয়ে পড়ব কেন। চেয়েছিলাম, তুমি স্বাবলম্বী হও।"
এক বছর, দেড় বছর কেটে যাবার পর এখন আর আর্য সে-কথা বলে না।
নয়ন বলে, "আমার চাকরি আছে, একটা ছেলে আছে, আমি কীসের পরোয়া করি বলো, ছোড়দা।"
আর্য বলে, 'তোমার এই পরিবর্তন আমি লক্ষ করলাম। তোমার ব্যক্তিত্ব আর সেই সঙ্গে তোমার সুষমা সংসারের অন্ধকারে চাপা পড়েছিল, তাকে আলোয় আসতে দেখলাম। আমার সন্দেহ হল—"

"কী?"

"বললে তুমি কষ্ট পাবে না তো।"

"পেলামই বা—"

"তুমি দাদাকে কোনওদিন ভালবাসনি। মানে যে অর্থে একজন মেয়ে তার জীবনসঙ্গীকে ভালবাসে। শ্রদ্ধা করে।"

"জীবন তবু কেটে যেত। কত জোড়াতালি দেওয়া জীবন এভাবে কেটে যায়।"

"এখন পপাইয়ের কথা আমাদের ভাবতে হবে।"

মিন্টো পার্কের বেঞ্চিতে বসে ওরা দু'জন অ-তরুণ মেয়ে-পুরুষ কথা বলে। সামনে দিয়ে লোকজন হেঁটে যায়, ওদের লক্ষ করে না কেউ। সামনে বেলভিউ নার্সিংহোম। তার সারি সারি জানলায় নিরাময়ের আলো। নয়ন হঠাৎ বলে ওঠে, "পপাই কী বলছিল জানো? বলছিল, মা, তুমি সিল্কের শাড়ি পরো কেন? তুমি সেন্ট মাখো কেন? কেন তুমি অমন করে চুল কেটেছ? ও ভাবে, আমি নষ্ট হয়ে গেছি। ওর বাবার আত্মা এতে কষ্ট পাচ্ছে।"

ঠোঁটের সিগারেট ফেলে দিয়ে জুতো দিয়ে চাপতে চাপতে আর্য বলে, "সব বাজে কথা। ও ব্যাটা ভারী পিউরিটান। ওর মাথা থেকে আত্মার ভূতটা ছাড়াতে হবে।"

"আমার কোনও তাড়া নেই।" বলেই হেসে ফেলে নয়ন।

'তাড়া আছে নয়ন। যা স্বাভাবিক, তার মধ্যে অপরাধের গন্ধ কেন থাকতে দেব?"

উপনয়ন নামক যে পারিবারিক অনুষ্ঠানের কথা তুলে এই গল্প শুরু হয়েছিল এখন সেখানে ফেরা যাক।

স্পষ্ট কথার মানুষ ভূপেশ চক্রবর্তী বলেছিলেন, নমো নমো করে কালীঘাটে কাজটা সেরে ফেলা হোক। আর নয়তো অনুষ্ঠানটি যথাযথভাবে পালন করা হোক। শাস্ত্রীয় আচার সহ। তাঁর সে-কথা টেকেনি। আপস মীমাংসা হয়েছে। অনেক শারীরিক অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে পপাই।

আসল কথা, একটা পারিবারিক পুনর্মিলন হোক। দেবুর শ্রাদ্ধের সময় যারা এসেছিল, তারা আবার আসুক। তারা দেখে যাক, এই সংসার সেখানেই দাঁড়িয়ে নেই। মৃত্যুর কালো পরদা সরিয়ে দিয়ে সেখানে জীবনের পতাকা তোলার আয়োজন হয়েছে।

গড়পার থেকে প্রভাতী মাসি এলেন। নিউ আলিপুর থেকে রত্না আর শুভেন্দু এল তাদের ছেলেমেয়ে সহ। ভূপেশের দূর সম্পর্কের বোন-ভগ্নিপতি থাকেন ঢাকুরিয়ায়, তাঁরা এসে থেকে গেলেন দু'দিন। ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছিল, ত্রিপল খাটিয়ে। অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, কুটুম্ব, প্রতিবেশী, আর্য ও নয়নের সহকর্মীরা, পপাইয়ের বন্ধুবান্ধব—দল বেঁধে এসে ভোজ খেয়ে গেল অনুষ্ঠানের দিন, দুপুরে।

দণ্ডীঘরের এককোণে কম্বলের আসনে বসে ছিল পপাই ওরফে তুহিন চক্রবর্তী। তার সেদিন প্রাপ্তিযোগ। অতিথিরা একজন একজন করে তার ঘরে ঢুকছে। কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি হাতে দণ্ড নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে ব্রহ্মচারী—মুণ্ডিত মাথা, গেরুয়া বসন। দাঁড়িয়ে বলছে, "ভিক্ষাং দেহি।" ভিক্ষে পাওয়ার পর বলছে, "ওঁ স্বস্তি।" ছোট ছেলের মুখে পাকা পাকা কথা।

গুরুজনের কেউ কেউ ওকে প্রণাম করল। তাই দেখে সবাই হাসে। আর্য বলে, "পপাই আজকের হিরো। ওকে আর ছোট বলে হেনস্থা করা চলবে না।"

প্রভাতী মাসি বললেন, "আজ যদি দেবু বেঁচে থাকত, কত খুশি হত।"

সবই সম্পন্ন হল সুষ্ঠুভাবে। ব্রহ্মচারীর ঝুলি ঝেড়ে দেখা গেল, ঘড়ি আংটি কলম বেশ কয়েকটি জুটেছে। তা ছাড়া দু'শো নব্বই টাকা।

পপাই বলে, "এ-টাকা আমি কাউকে দেব না। নিজে খরচ করব।"

"কী কিনবি?"

"আইসক্রিম, চিকেন রোল।"

"চুপ চুপ।" নয়ন সামাল দেয়, "ব্রহ্মচারীকে ওসব খেতে নেই।"

পরদিন ভূপেশের দোতলার ঘরে অনেকে মিলে গল্পগুজব করছে। মেঘলা সকাল। মমতা চা দিয়ে গেল। নয়ন নীচে কচুরি ভাজছে, তার গন্ধে ম ম করছে গোটা বাড়িটা।

প্রভাতী মাসী একসময় বললেন, "আর্য, তুমি এবার একটা বিয়ে করে ফেলো।"

একটু হেসে আর্য উত্তর দেয়, "হ্যাঁ মাসিমা, আমরা শিগ্‌গিরই বিয়ে করব। আপনি আশীর্বাদ করুন, নয়ন যেন সুখী হয়।"

সব চুকেবুকে যাবার পর একদিন নজর পড়ে ফ্রিজটার দিকে।

মমতা বলে, "বউদি, এ যে ঠান্ডা হচ্ছে না।"

উৎসব বাড়িতে আসবাবপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কোন সময় চোট খেয়েছে ফ্রিজটা। পেছন দিকে খানিকটা চটা উঠে গেছে।

যন্ত্রটা পরীক্ষা করতে গিয়ে আর্য বুঝতে পারে, ওর কম্প্রেসর ঠিক মতো চলছে না। পেছন দিকের কালো কয়েলগুলো কোথাও গরম, কোথাও ঠান্ডা। ডিপ ফ্রিজে বরফ নেই, তার বদলে পাতলা ঘাম।

এই অবস্থা কী করে হল জানতে চাইলে মমতা বলে যে, অনেকদিন থেকেই ভাল করে বরফ জমছিল না, একদিনের বেশি মাছ রাখলে গন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ও ভেবেছিল, লোডশেডিংয়ের জন্যে এমন হচ্ছে। এখন কী হবে।

নয়ন বলে, "ওর আয়ু ফুরিয়েছে। পপাইয়ের চেয়ে দেড় বছরের বড় এই ফ্রিজ। যথেষ্ট সার্ভিস দিয়েছে। তবু দেখো মেরামত করা যায় কিনা কম্প্রেসর। আর সব তো ঠিকঠাকই আছে।"

মিস্ত্রি এল। তার ডাক্তারি যন্ত্রপাতি ঠেকিয়ে পরীক্ষা করল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ফ্রিজটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "এটা আর কোনও কাজে লাগবে না।"

"কম্প্রেসর বদলানো যায় না?"

"তাতেও খরচ পড়বে তিন হাজার টাকা। ভেতরের লাইনিং জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। গ্যাসকেট চেঞ্জ করতে হবে। বডি রং করতে হবে। সব মিলিয়ে চার হাজার ধরে রাখুন, তা-ও কোনও গ্যারান্টি নেই কতদিন চলবে। তার চেয়ে নতুন একটা ফ্রিজ কিনে নিন।"

নির্বিকারভাবে কথাটা বলতে পারল মিস্ত্রি। ওর মনে মায়া-মমতা নেই।

দেড় বছরের বড় হলেও ফ্রিজটার হাইট পপাইয়ের চেয়ে এখন দু'ইঞ্চি কম। আগে ফ্রিজটাই ওর চেয়ে বড় ছিল।

ও বলল, মা, ফ্রিজটা থাক। অন্য কাজে তো লাগতে পারে।"

মিস্ত্রি হো-হো করে হাসে।

"এই ডেড জিনিসটা কোন কাজে লাগবে খোকা? ওর মধ্যে যা-ই রাখো, তাতে দুর্গন্ধ হবে। ভেতরে তো হাওয়া খেলবে না। জায়গা জুড়ে থাকা ছাড়া এখন আর ওর কোনও ফাংশান নেই। কম্প্রেসরই হল ফ্রিজের হার্ট। হার্ট ফেল করলে কি মানুষ বেঁচে থাকে? সেই রকম।"

পপাই তার বড় বড় চোখ মেলে মায়ের মুখের দিকে চায়। বুঝতে পারে, এবার একদিন টানতে টানতে ওটাকে বার করে নিয়ে যাবে ওরা। ওই জায়গায় নতুন ফ্রিজ আসবে একটা।

ফ্রিজের কি কষ্ট হয়? ফ্রিজের কি আত্মা আছে? নিজের বুকে হাত দিয়ে পপাই অনুভব করে, তার কম্প্রেসরটা ধুক ধুক করে চলছে। ওই চলা বন্ধ হলেই সব শেষ। হাত-পা, চোখ-মুখ আর কোনও কাজ করবে না। তা হলে মানুষের কি আত্মা বলে কিছু নেই? মানুষের শরীর কি একটা ফ্রিজের বডির মতো?

অনেক ধন্দ অনেক প্রশ্ন জাগে ওর মনে। মাকে না, কাকাকে না, সে সব প্রশ্ন এদের কাউকে করা যাবে না। এরা বুঝবে না। এরা শুনে হয়তো হাসবে। একদিন দাদুকে জিজ্ঞেস করতে হবে। দাদু অনেক কিছু জানে। আবার ভাবে, থাকগে। এসব কথা শুনে দাদু হয়তো কষ্ট পাবে। আজকাল দাদু কেমন চুপচাপ। দাদুর মন ভাল নেই। দাদুর কম্প্রেসরটা যদি খারাপ হয়ে যায় হঠাৎ? পপাইয়ের চিন্তা হয়।

বড়দের জগত বড় জটিল। বড় নির্মম। পপাই কোনওদিন বড়দের মতো মিথ্যেবাদী হতে চায় না। নতুন ফ্রিজটা আসুক, ও তাকে একটুও ভালবাসবে না।

১৯৭৬

বিশ্বাস ভেঙেছিল অনেকদিন আগেই। এখন মূর্তি ভাঙার সময়। এই রকম দুটি কবিতার লাইন লিখেছিলাম বছর কুড়ি আগে। তারপর থেকেই মূর্তি ভাঙার কাজ চলছে। এখনও চলছে। আমার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লোকে মূর্তি ভাঙাভাঙির কাজে হাত লাগিয়েছে এমন কথা কখনওই বলব না।

আমরা, হিন্দু বাঙালিরা, একটু মূর্তিপুজক আছি। নিজেদের চেয়ে বড় মাপের কিছু কল্পনা করতে গেলে, শ্রদ্ধা, ভালবাসা , ভক্তি কোথাও নিবেদন করতে চাইলে, একটি ছবি দরকার হয়ে পড়ে। কত লোক একটা বেদির ওপর সাদা চাদর পেতে, তার সামনে বসে সর্বশক্তিমান পরম করুণাময় ভগবানকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। আকাশে বাতাসে চরাচরে অন্তরীক্ষে প্রকৃতি ও প্রাণীর মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে তারা সক্ষম। আমরা পারি না। আমাদের শরীরে আদিবাসী মানুষের রক্ত মিশে আছে বলে অথবা আমাদের কল্পনাশক্তি দুর্বল বলে, যে-কারণেই হোক, জিভ বার করা এক কালীঠাকুর বা চোখ-ছানাবড়া এক জগন্নাথ, বা নিদেনপক্ষে গৌরীক্ষেত্রে স্থাপিত এক শিবলিঙ্গ সামনে না দেখতে পেলে ভক্তিরস উৎসারিত হয় না। কল্পনা আর উপলব্ধিতে আমাদের তৃপ্তি নেই। আমরা হিন্দু বাঙালিরা প্রাণের ঠাকুরকে দেখতে চাই, ছুঁতে চাই। ঠাকুরদেবতা মানে না, এমন মার্কসিস্টকেও বলতে শুনেছি, শ্রমিক দিবসের সভা লেনিনের মূর্তির সামনে যেমন হবে, তেমনটি আর কোথাও হবে না। শিক্ষিতা মহিলা বয়স বাড়লে যখন একা হয়ে যান, তখন নিভৃতে বালগোপালের পুজো করেন আর রবীন্দ্রনাথের পূজার গানগুলি বালগোপালকে গেয়ে শোনান, এ-ঘটনা অনেকে স্বচক্ষে দেখেছে। তাতে মন হালকা হয়।

ঠাকুরদেবতার মূর্তির আদলে মহাপুরুষদের মূর্তি প্রতিষ্ঠাও এ-দেশে সুপ্রচলিত। স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র—এঁরা তো যত্রতত্র ছড়িয়ে আছেন—পথের মোড়ে এবং ক্যালেন্ডারের পাতায়—তা ছাড়া আরও অনেকে আছেন বিশেষ বিশেষ জায়গা অধিকার করে। আশুতোষ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি। হয় পূর্ণাঙ্গ নয়তো আবক্ষ। এঁদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তা বাড়ুক। আমাদের জাতীয় কর্তব্য তা বলে থেমে থাকবে না। আবার পাশাপাশি বিশ্বাস ভাঙার দল সুযোগ পেলেই এঁদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাইছে। ভাবমূর্তি নষ্ট হলে পাথরের মূর্তিও টিকবে না। উলঙ্গ কালীঠাকুর কি জাগ্রত জগন্নাথ হলেন প্রতীক, তাঁদের ভাবমূর্তি বিকৃত হবার নয়। মহাপুরুষগণ দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁদের বিদিত কীর্তির ওপর, যা নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলে। এমন সব তথ্য একসময় আবিষ্কৃত হয়ে যায় যা ভক্তকে বিড়ম্বিত করে। সম্প্রতি যেমন রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি নিয়ে আমরা মুশকিলে পড়েছি।

কিছুকাল আগে জানা গিয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার আগের বছর সুইডেনের রাজকুমার ভারত ভ্রমণে আসেন এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দিনকয়েক অবস্থান করেন। তিনি ফিরে যাবার পর থেকে এই বাঙালি কবিকে নিয়ে খোঁজাখুঁজি পড়ে যায়। তো কী হল? তাঁর অযোগ্যতা তো প্রমাণিত হল না। মানুষ তবু এই দুই ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র খোঁজে।

বউদিদি কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে কিশোর কবির সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘকাল গুজগুজ ফুসফুস চলেছিল। সবাই ঠারেঠোরে কথা বলে, কেউ আর ঝেড়ে কাশে না। স্বামীর প্রতি অভিমানবশত তিনি আত্মহত্যা করেন, না দেওরের প্রতি অনুরাগবশত, তা তিনি কাউকে বলে যাননি। বৃদ্ধবয়সে দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নাম্নী যুবতীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় কত গভীর স্তরে পৌঁছেছিল, তা নিয়ে কৌতূহল দীর্ঘকাল অমীমাংসিত থেকেছে। এখন জানা যাচ্ছে যে, নভেম্বর ১৯২৪-এর কোনও একদিন গুরুদেব ভদ্রমহিলার বুকে হাত রেখেছিলেন। বেশ করেছিলেন। এতেও তাঁর ভাবমূর্তির ক্ষতি হল না। এরপর আর কোনও পরিশ্রমী গবেষিকা যদি প্রমাণ করে দেন যে, এখানেই শেষ নয়, এই বিপত্নীক মানুষটি বোলপুরে, কলকাতায়, মংপুতে, কানাডায়, জাপানে, মস্কোয়—সর্বত্র কোনও-না-কোনও যুবতীর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন, তা হলেই বা কী হবে? আমরা রবীন্দ্রসংগীত শোনা বন্ধ করে দেব? রক্তকরবীর অভিনয় দেখব না? ভেঙে দেব রবীন্দ্রমূর্তি? না, তাঁকে নতুন করে ভালবাসব এইজন্য যে, তিনি মনের দিক থেকে কখনওই বুড়ো হয়ে যাননি। স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যদি কোনও কবির

দুর্বলতা বলে গণ্য হয়, তবে সে দুর্বলতা নিতান্ত মানবিক ও স্বাভাবিক। তাতে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের হানি হয় না। হিন্দু মানসিকতায় ব্রহ্মচর্যকে একটু বেশি খাতির করা হয়েছে এতকাল। অথচ প্রকৃতির ক্রিয়াকাণ্ডে সর্বত্র প্রেমেরই জয়গান।

বিনায়ক রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি আয়োজিত স্মরণসভায় উপস্থিত হয়ে এত কথা মনে হল। শুধু স্বাধীনতা-সংগ্রামী আখ্যা দিয়ে তাঁকে খাটো করা হয় না দেখছি। ফেস্টুনে তাঁকে 'বঙ্গগৌরব' বলা হয়েছে। উপরন্তু তিনি ছিলেন চিরকুমার।

স্কুলতলার মাঠে সভা। বিকেল পাঁচটায়। আকাশে মেঘ জমেছে দেখে একটু আগেই এসে পড়েছি। নিমন্ত্রণপত্রে আহ্বায়কদের নাম দেখেছিলাম। সকলেই হোমরাচোমরা প্রভাবশালী ব্যক্তি। বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য নেপালচন্দ্র মিত্র আছেন তাঁদের মধ্যে। আছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তপনকৃষ্ণ হালদার। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরঞ্জন মুস্তাফি এবং স্থানীয় ছাত্রনেতা ননী গায়েন। ননী গায়েনের শাগরেদরা এই বিশাল প্যান্ডেল বাঁধার ব্যবস্থা করেছে। পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক প্রবেশপথ। মূল অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর স্থানীয় ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আছে। তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নানা সাইজের স্বেচ্ছাসেবকেরা বুকে ব্যাজ বেঁধে ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে দেখলাম।

ইতিমধ্যে আমি জেনে নিয়েছি যে, এই দিনে প্রত্যেক বছর তাঁর জন্মস্থান, এই শহরের কোথাও-না-কোথাও বিনায়ক রায়ের স্মৃতিতে সভা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে, আজ সাত বছর, এই সভা হয়ে আসছে। স্মৃতিরক্ষা কমিটিই এই সভার আয়োজন করে। প্রয়াত দেশনেতার জীবন ও সাধনা নিয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা হয়। বছর-তিনেক আগে তাঁর একটি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গত বছর তাঁর অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ সুরঞ্জন মুস্তাফি মশায় সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন কমিটির তরফ থেকে। দলমত নির্বিশেষে দেশমাতৃকার সেবাই যে বিনায়ক রায়ের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, উক্ত গ্রন্থদুটি থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এবারকার বৈশিষ্ট্য হল তাঁর আবক্ষ মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান। আবরণ উন্মোচিত হলে আমরা দেখতে পাব, মূর্তির নীচে প্রয়াত নেতার জন্ম ও মৃত্যুদিন দুটি সাদা পাথরের ওপর কালো অক্ষরে উৎকীর্ণ করা আছে। তার নীচে রবীন্দ্রনাথের দুটি লাইন—'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ। মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।' লাইন দুটি বিনায়ক রায়ের কথা মনে করে কবি লেখেননি যদিও, তবু ওই অমর দুটি পংক্তি সকল মহাপ্রাণ মানুষের প্রতিই প্রযোজ্য। অন্তত কমিটির সদস্যবৃন্দ তাই মনে করেন। ঠিক এই সময়ে, বিনায়ক রায় কেমন দেখতে ছিলেন, তা প্রত্যক্ষ করার জন্য আমার ভারী কৌতূহলবোধ হল।

নামটাম শুনে থাকব। কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কী, বিনায়ক রায়কে আমি চিনতাম না। আমি এ-শহরের বাসিন্দাও নই। বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কিছুকাল আগে এসেছি। ইচ্ছে, চেপে গরম পড়াব আগে কলকাতায় ফিরে যাব। শব্দ আর ধোঁয়ার উৎপাত থেকে যতদিন পালিয়ে থাকা যায়। নিজের মনে ঘুরে বেড়াই। বইটই পড়ি আর ঘুমোই। এই ভাবেই দিন কাটছিল।

ননী গায়েনের দল একদিন আমায় আবিষ্কার করে ফেলল। মাঝেসাঝে খবরের কাগজে, পত্রপত্রিকায়, আমার নাম ছাপা হয়, সেই কারণে হোক, অথবা আমার মাথা-ভরতি পাকা চুল দেখে হোক, একদিন এসে বলল, 'আপনার মতো একজন বর্ষীয়ান সাহিত্যিক থাকতে আর কাকে প্রধান অতিথি হতে বলি? সর্বসম্মতিক্রমে স্মৃতিরক্ষা কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে যে, আপনি এবারেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন।'

ওরা তিনজন এসেছিল। তিনজনেরই জুলপি চাঁছা, ঘাড়ের ওপর এক থোকা চুল। তিনজনেরই ঠোঁট কালো। ওরা সমান্তরাল প্রশাসনের সদস্য হয়তো। আমি ওদের মুখের দিকে তাকাই।

ভাবটা : যদি অলংকৃত না করি?

ওদের চোখেমুখে মিনতি-মাখা সিদ্ধান্তের স্থিরতা।

ভাবটা : তা হলে পুঁতে ফেলব।

আমি বলেছিলাম, 'বিনায়ক রায়ের অবদান সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কী কথা বলব সভায়?'

নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে ওরা বই দু'খানা দিয়ে যায়। বলে যায় যে, ভাষণের মালমশলা আমি ওইখানেই পেয়ে যাব।

রাজনীতির ব্যাপারস্যাপার আমি ঠিক বুঝি না। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেবার অভ্যেস আমার নেই।

আমি অসুস্থ। ভেবেছিলাম, এইসব বলে পার পেয়ে যাব। তা হল না। আমি খুব একটা আপত্তি করিনি অবশ্য।

নিমন্ত্রণপত্রে আমার নাম যথাস্থানে ছাপা হয়েছে। লক্ষ করি। আমার নামের ওপরেই আর একজনের নাম দেখতে পাই—হারাধন বর্মন। তিনি অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন।

জিজ্ঞেস করি, 'ইনি কে?'

'বিনায়কজির বাল্যবন্ধু। বলতে গেলে, আপনার মতো এঁকেও আমরা আবিষ্কার করেছি।'

'তাই?'

"তখন মুস্তাফি স্যার বিনায়কজির অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ সংগ্রহ করছিলেন। হঠাৎ একখানা চিঠিতে দেখেন, মুনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে লিখছেন—"পত্রপাঠ হারাধন বর্মনকে নগদ এগারশো টাকা দিবার ব্যবস্থা করিবে। সে সন্ধ্যাজল গ্রামে থাকে, আমার বাল্যবন্ধু।"

সেই সূত্র ধরে এতদিন পর ননী গায়েনের শাগরেদরা হারাধন বর্মনকে খুঁজে বার করেছে। উনি আসতেই চাইছিলেন না। বলছিলেন, আমি সামান্য সাইকেল মিস্তিরি, রাজনীতির কী বুঝি? বিনায়কের সঙ্গে অনেকদিন আমার যোগাযোগ ছিল না। তারপর অনেক সাধাসাধি করায় রাজি হয়েছেন। কী ধরনের সাধাসাধি করা হয়েছে, আমি অনুমান করতে পারি।

ননী বলে, 'শুধু গলায় মালা পরাবেন। কিছু বলতে পারবেন না, এই শর্তে। আমি বলেছি, ও-কে। স্পিচ দেবার লোক অনেক আছে।'

জীবনীগ্রন্থে বিনায়ক রায়ের তিনখানা বেগুনি রঙের ছবি আমি দেখেছি। একটা—দুর্ভিক্ষপীড়িত একদল হাড় জিরজিরে পেটফোলা মেয়েপুরুষের মাঝখানে, ত্রাণরত। একহাতে প্রকাণ্ড বালতি অন্য হাতে একটি হাতা। আর একটা—গান্ধীজির সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে, ক্যামেরার দিকে মুখখানা ঘোরানো, দুটোই তাঁর যৌবনকালের ছবি। বেশ ঝাপসা। তৃতীয় ছবিতে তিনি বেশ মোটাসোটা, রাশভারী। মাথায় সাদা টুপি, গায়ে জহরকোট। স্বাধীনতা সংগ্রামের তেতো দাগগুলো তখন উঠে গেছে। কোন বয়সের বিনায়ক রায়কে আবক্ষ মর্মরমূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, দেখবার জন্যে আমার এই কৌতূহল। কতক্ষণে যে আবরণ উন্মোচিত হবে।

দেশ স্বাধীন হবার ঠিক আগের বছর, যখন অবিভক্ত বাংলাদেশ আর বিহার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত, তখনই নাকি বিনায়ক রায় দেশসেবায় সবচেয়ে বেশি মেতে উঠেছিলেন। জীবনীগ্রন্থ পড়ে জানলাম, গান্ধীজির সঙ্গে নোয়াখালি ও ত্রিপুরার উপদ্রুত অঞ্চল তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। হিংসার পথে না গিয়ে মানুষকে শান্ত হতে উপদেশ দিয়েছেন। হিন্দু ও মুসলমান যে পরস্পরের শত্রু নয়, প্রতিবেশী ভাইয়ের মতো—এই সত্য উপলব্ধি করতে বলেছেন জাতিকে। জানলাম, বিনায়ক রায়ের পরামর্শে গান্ধীজি নোয়াখালি উদ্ধারে সহসা ছেদ টেনে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন বিহারের জেহানাবাদে। সেখানকার দাঙ্গায় মুসলমান সম্প্রদায় বিপর্যস্ত হচ্ছিল এবং দেশব্যাপী সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলেছিল, গান্ধীজি ও তাঁর সহযাত্রীরা কেন শুধু হিন্দুদের ত্রাণেই মন দেবেন। কেন মুসলমানদের রক্ষা করবেন না। তাঁরা দৌলতপুর, নাগামা, রসুলপুর ঘুরে ঘুরে মুসলিম পরিবারদের মুক্ত করেছেন। কাকো রিলিজ ক্যাম্পে এনে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন সেই সময়।

আমি জানতাম না, ওই বই পড়ে জানলাম যে, 'সহজ বাংলা শিক্ষা' নামে একটি বই আর একটি বাংলা অভিধান ছিল গান্ধীজির নিত্যসঙ্গী। তিনি নাকি প্রতিদিন বিনায়ক রায়ের কাছে বাংলা শিখতেন একঘণ্টা ধরে। হবেও বা।

সভা আরম্ভ হবার আগে বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য নেপালচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে আলাপ হল। প্রয়াত দেশনেতা বিনায়ক রায়ের কর্মকাণ্ডের বিস্তর প্রশংসা করলেন তিনি। তাঁর মতো নিরলস কর্মী ও নির্লোভ মানুষ সচরাচর দেখা যায় না, তিনি বললেন। নেপালবাবুর কাছে জানলাম যে স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাতাবরণ স্থিতিশীল হতে পারছিল না। শরণার্থী সমস্যা এমন প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, একা রাজ্য সরকার তার মোকাবিলা করতে হিমসিম খাচ্ছিল। গান্ধীজি ও জওহরলাল নেহরু উভয়েই চেয়েছিলেন, বিনায়ক রায় মুখ্যমন্ত্রী হোন আর বিধানবাবু উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপালের পদটি নিন। তা বিধান রায় বেঁকে বসলেন। তখন বাধ্য হয়ে তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই রকম ঢের অন্তঃপুরের কাহিনী বিনায়ক রায়ের অন্তরঙ্গ

মহলে প্রচলিত। ইতিহাস তো এইসব কাহিনী লিপিবদ্ধ করে না।

সেই সময়ে, নেপালবাবুর আজও মনে আছে, বিনায়ক একটা খুব দামি কথা বলেছিলেন, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় আমার কানের পাশ দিয়ে গুলি চলে গেছে অনেকবার। গুলি লাগলে শহিদ হয়ে যেতাম। সেটাই অমরত্বের সবচেয়ে সোজা পথ। তা যখন হইনি তখন বুঝতে পেরেছি, ভারতমাতা আমার কাজ চান, আমার সেবা চান।"

তপনকৃষ্ণ হালদারের সঙ্গে পরিচয় হতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি গান্ধীনগরে গেছেন?'

'গান্ধীনগর? সেটা কোথায়?'

'খুব দূরে নয়। সন্ধ্যাজলের উত্তরে। আগে ওর নাম ছিল সুলতানগঞ্জ। নামেই সুলতান, আসলে খুব দরিদ্র পল্লি ছিল। এখন ছোটখাটো একটা শহর। বিনায়কদার নিজের হাতে গড়া। ন্যাশনাল হাইওয়ে, হাই টেনশন ইলেকট্রিক লাইন—সব গান্ধীনগরের ওপর দিয়ে গেছে। গেলে দেখবেন, সার সার রাইসমিল, কোলড স্টোরেজ, লোহা ঢালাই কারখানা। আপনাকে নিয়ে যাব।'

পাশাপাশি বসে আমাদের কথা হচ্ছিল। মাইক টেস্টিং, ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর, শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছি। টের পাইনি কখন সভামণ্ডপ ভরতি হয়ে গেছে। টিউবলাইটের আলোয় ঝলমল করছে সভাস্থল। নেপালবাবু ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন।

এমন সময় ভীষণ ভট ভট শব্দ করে একটা মোটরবাইক যেন বাইরে এসে থামল, মনে হল।

সুরঞ্জন মুস্তাফি আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'এসে গেছে।'

একটু পরে আমরা দেখলাম, ননী গায়েন একজন রোগা মতন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে হাত ধরে মণ্ডপের দিকে নিয়ে আসছে। ননীর পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর চুড়িদার পাজামা। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গায়ে নীল শার্ট, পরনে খাটো ধুতি। হাতে টর্চ। বুঝলাম এবার সভা আরম্ভ হবে। কিন্তু ভাগ্য অপ্রসন্ন।

সভাপতি হারাধন বর্মন বিনায়ক রায়ের আবক্ষ মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে যাবেন, এমন সময় প্রথম বোমাটা পড়ল। ভাগ্যিস সভার মধ্যে পড়েনি, তা হলে আর রক্ষে ছিল না। কয়েকটা মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হত নির্ঘাত।

ননী গায়েনের শাগরেদরা অপ্রস্তুত ছিল না মোটেই। দ্বিস্তর রক্ষীবাহিনী নিয়ে তাবাও প্রতিবাদ জানাল। একদল বাইরে, সশস্ত্র। অন্যদল ভেতরে, সভার মধ্যে, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ক্রমাগত সাহস দিচ্ছে—আপনারা ভয় পাবেন না, বসে পড়ুন। ওই গুন্ডাদের কী করে শায়েস্তা করতে হয়, আমরা জানি, এখুনি সভা আরম্ভ হবে। গমগম করছে মাইকে ননী গায়েনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

হারাধন বর্মন আমার পাশেই বসেছিলেন। বলতে লজ্জা নেই, অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গিয়ে আমি একটু বিচলিত বোধ করছি। তিনি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, অবিচল।

'এ রকম কিছু একটা ঘটবে, আমি জানতাম', আমার কানে ফিসফিস করে বললেন হারধন বর্মন, 'কী দরকার ছিল মূর্তি প্রতিষ্ঠার?'

বাইরে বোমার পর বোমা পড়ছে আর ভেতরে আর্ত মানুষের কোলাহল। বাচ্চারা, মেয়েরা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। সে এক মর্মভেদী দৃশ্য। হোমরাচোমরা নেতারা অদৃশ্য। মঞ্চে আমরা দু'জন বসে আছি—সভাপতি আর প্রধান অতিথি—এই যুদ্ধে আমাদের কোনও ভূমিকা নেই। সভা অলংকৃত করতে এসেছিলাম। বঙ্গগৌরব বিনায়ক রায়ের জীবন ও সাধনা বিষয়ে দু'-চার কথা বলতাম, তা বোধহয় আর বলা হয়ে উঠবে না। এই সময়টাই কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছে, অসহিষ্ণু, শ্রদ্ধাহীন, লক্ষ্যহীন, আমার মনে হল। কে বলবে, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও এ-দেশে গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল নেহরুর মতো মানুষ বেঁচে ছিলেন। তাঁরা জাতিকে গড়ে তোলার পথ দেখিয়ে গেছেন।

'চলুন, উঠি' বলতে বলতে সভার সব আলো একসঙ্গে নিভে গেল। কেউ মেইন সুইচ অফ করে দিয়েছে।

আমি হতভম্বের মতো আবার চেয়ারে বসতে যাচ্ছি—হারাধন আমার হাত ধরলেন। এবার আর ফিসফিস করে না, বেশ চিৎকার করে ডেকে আমায় বললেন 'আমার সঙ্গে আসুন। এক মিনিট দেরি করবেন না। টর্চ আছে।'

তারপর কী করে যে ভিড় ঠেলে, বেড়া ডিঙিয়ে, কাছাকোঁচা সামলে মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়োতে

দৌড়োতে আমরা দু'জন নিরাপদ বড় রাস্তায় এসে পড়লাম, তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। আমার মনে নেই। হারাধন বর্মন একটা সাইকেল রিকশায় উঠে বসলেন। আমিও তাঁর পেছন পেছন উঠলাম।

হারাধন বললেন, 'আজ রাত্তিরে আপনি আমার অতিথি।'

'সন্ধ্যাজল' নামটি যত সুন্দর, গ্রামটি তেমন সুন্দর না। আমি কলকাতার মানুষ, গ্রাম সম্বন্ধে আমার একটা কাল্পনিক ধারণা আছে। বার বার সে ধারণা ভেঙে যায়। এবারও ভাঙল। এবারও আমি যা দেখলাম, তাতে মনে হল, জনবসতির মধ্যে পিচের রাস্তা ঢুকে পড়লে আর বিদ্যুতের আলো ছড়িয়ে দিলে গ্রামের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। হয়তো এইটেই প্রগতি, কিন্তু শুধু এইটুকু দিয়েই প্রগতির থেমে থাকা উচিত হয়নি। মানুষকে একটা পরিপূর্ণ জীবনের নিশানা দিতে না পারলে বিদ্যুৎ দিয়ে কী হবে? কোথায় নিয়ে যাবে পিচের রাস্তা?

দু'পাশে ফাঁকা মাঠ। ঠান্ডা হাওয়া বইছিল। অন্ধকারে শুধু ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। অনেকদিন পর তারা-ফোটা অন্ধকার আকাশ দেখলাম। মিনিট কুড়ি চলার পর সাইকেল রিকশাটা গতি কমাল! রিকশায় বসেই হারাধন বাঁ দিকে টর্চ ফেললেন—'বর্মন সাইকেল রিপেয়ারিং'—সাদার ওপর কালো অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড।

বললেন,—'এই আমার দোকান। এখন ছেলে দেখে। কাছেই বাড়ি।'

রিকশাটা বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকেই ঘুরল। এবার কাঁচা রাস্তা। বেশ ঢালু পথ গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে গেছে। কাছেই ছাড়া ছাড়া এক-একটা বাড়ি। জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

টিউবওয়েলের জলে হাতমুখ ধুয়ে আমরা ভেতরে গিয়ে বসি। এতক্ষণ একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ছিলাম। এবার যেন পরস্পরের মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারছি। উত্তেজিত স্নায়ু স্বাভাবিক হতেই হারাধন বর্মনকে আমার খুব চেনা মনে হল। ওই মুখ অনেকবার দেখা।

পর মুহূর্তে আবিষ্কার করি, তাঁর মুখের আদলটি একেবারে শরৎচন্দ্র বসানো।

বলতেই হো-হো করে হেসে ওঠেন হারাধন।

ঘরের একপাশে বড়সড় তক্তাপোশ পাতলা তোশক দিয়ে ঢাকা। তার ওপর রঙিন ফুলকাটা চাদর। তক্তাপোশের নীচে একটা চামড়ার সুটকেস আর একটা জলের কুঁজো দেখা যাচ্ছে। অন্য দিকে দেয়ালে ঠেকানো একখানা ছোট টেবিল, সেটিও ফুলকাটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। একটিমাত্র কাঠের চেয়ার যেটার ওপর আমি বসেছি। লক্ষ করি, এই ঘর থেকে বাড়ির ভেতর দিকে যাবার কোনও দরজা নেই। তার বদলে দেয়ালের মাঝবরাবর একটা চারকোনা গর্ত; গর্তের মধ্যে একটি কালো রঙের রেডিয়ো ওদিকে ফেরানো।

হারাধন ওই ফোকরের মধ্য দিয়ে হাঁক দেন, 'এ-বেলা দু'জনের খাবার।'

তারপর তক্তাপোশের তলা থেকে গালার টুপি পরা একটা বোতল মুঠোয় ধরে নিয়ে আসেন। টেবিলের ওপর বোতলটি রেখে জিজ্ঞেস করেন 'চলে তো?'

আমি বলি 'অল্প বয়সে অনেক চলেছে। এখন আর সহ্য হয় না।'

"অল্প করে হোক। যা ঝক্কি গেল আমাদের ওপর দিয়ে, বলুন?"

শরৎচন্দ্রের মতো লম্বাটে মুখখানা উৎসাহে উদ্ভাসিত হয় স্বভাবত। হারাধন বলেন, 'মানুষ বুড়ো হলেই পরিবারের লোক তার ওপর সর্দারি করতে চায়। সে-পথ বন্ধ করে দিয়েছি।'

আমি জানতে চাই, 'ওই ফোকর দিয়েই যা কিছু যোগাযোগ, আদান-প্রদান?'

'হ্যাঁ। দরকার হলে বাইরে দিয়ে ঘুরে এসো, আমি বলি। আমি কাউকে কম্পানি দিতে বাধ্য নই।'

'এত কঠিন মনোভাব কি উচিত?'

বিশ্বাস করুন, এতে কাজ হয়। কাজি আছে জানলে মামলা গজিয়ে ওঠে। না থাকলে মানুষ মিলেমিশে থাকে বেশ। ঢের গলাগলি বন্ধুত্ব জীবনে করেছি। এখন একটু একলা থাকতে চাই।"

বন্ধুত্ব কথাটা কানে যেতে আমার মনে পড়ে যায়। আমি বলি, 'আপনি তো বিনায়ক রায়ের বাল্যবন্ধু, তাই না।'

'আমরা একসঙ্গে ম্যাট্রিক ফেল করেছি। একসঙ্গে স্বদেশি করেছি। জেল খেটেছি। দাঙ্গার সময় ত্রাণ-সেবা করেছি।'

'বইতে পড়ছিলাম, গান্ধীজির সঙ্গে নোয়াখালি, ত্রিপুরা, গয়া—'

'হুঁ। তারপর তো দেশ স্বাধীন হল। গান্ধীজি খুন হলেন। রিফিউজিরা পিলপিল করে আসতে লাগল। আমি বললাম, ঢের হয়েছে, বনের মোষ তাড়িয়ে আর লাভ নেই। এবার রোজগারের ধান্দা করা যাক। বিনায়ক বলল, 'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।'

'আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন।'

আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে হারাধন বললেন, 'বড় রাস্তাটা পাকা হতেই আমি ওই সাইকেল মেরামতের দোকানটা খুলে ফেললাম। আমি জানতাম, রাস্তা হলেই ট্রাফিক হবে। ট্রাফিক বাড়লে মেরামতের দরকার হবে। জনসংখ্যা বাড়ছে। তাই হল। দেখতে দেখতে জমে গেল ব্যবসা।'

'আর বিনায়ক?'

'একটু আগে বললেন না, আদর্শবাদী। বিনায়ক বলত, আদর্শ মানে আরশি। যাতে নিজের মুখ দেখা যায়। আবার বাইরেও আলো ফেলা যায়।'

হারাধন চুপ করেন। মনে হয়, কিছু একটা বলবেন কিনা ভাবছেন। মনস্থির করে শুরু করেন আবার।

'এখান থেকে মাইল দুয়েক, না আর একটু বেশি, সুলতানগঞ্জ নামে একটা গ্রাম ছিল। মুসলমানদের বাস। খুব গরিব। তারা অনেকেই পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। এখানেও জনমজুর খাটে, ওখানেও খাটবে। যে-ক'টা তখনও যায়নি তাদের তাড়িয়ে দিয়ে বিনায়ক গ্রামখানা দখল করে ফেলল। স্বেচ্ছাসেবক লাগিয়ে মাটির কুঁড়ে, খড়ের চাল, সব সমান করে দিল। বলল, এখানে শরণার্থী আবাসন হবে। সরকারি সাহায্য চাই।'

আমি বলি, 'শুনছিলাম, এখন যেটা গান্ধীনগর—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরই গড়া। বেছে বেছে কলকাতা থেকে শরণার্থী এনে ও তাদের জমি দিয়েছে, বাড়ি করে দিয়েছে। ওর জন্যেই এ অঞ্চলে ইলেকট্রিক এল। পেট্রোল পাম্প বসল। রাইস মিল, কোলড স্টোরেজ। সাইকেল টায়ারের কারখানা। কিন্তু শান্তি এল না। কী জানি কেন, গান্ধীনগরের লোকেরা ওর ওপর এমন খাপ্পা হয়ে উঠল একসময় যে, বিনায়ক সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে গেল কলকাতায়। গান্ধীনগরে ওর নিজের একটা বাড়ি ছিল, তিনতলা। সেটাও বেচে দেয়। এখন সেখানে ইস্কুল হয়েছে।'

আমি ভাবি, দেশের কাজ করতে গেলে সেখানেও বিঘ্ন ঘটে। না হলে যে মানুষ নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিল, গৃহহীনকে গৃহ দিল, লোকে তারই শত্রুতা করে।

বলি, 'এই জন্যেই বিদ্যাসাগর বলেছেন, মানুষের উপকার করতে নেই।'

হঠাৎ খেপে উঠলেন হারাধন বর্মন।

'আহা, এর মধ্যে বিদ্যাসাগর মশাইকে টেনে আনছেন কেন? তাঁর সঙ্গে বিনায়কের তুলনা হয়?' বলেই আবার নরম হয়ে গেলেন পরক্ষণেই। দু'পাত্র করে খাওয়া হয়ে গেছে তখন। আমি কম কম নিচ্ছিলাম তাতেই মাথা ঝিমঝিম করছে।

হারাধন বললেন, 'এবার খেতে দিতে বলি? আপনার ঘুম পাচ্ছে বোধহয়।'

ঘুম ঠিক পায়নি, তবে ক্লান্ত লাগছিল। মনে হচ্ছিল, বিনায়ক রায়ের জীবনকাহিনী খোলসা করে বলা হচ্ছে না। মনে হচ্ছিল, এই বাল্যবন্ধুটি প্রয়াত দেশনেতার মহৎ কর্মকাণ্ডে গর্বিত নন, কিন্তু অপরের কাছে বাল্যবন্ধুর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হোক, তাও চান না। যাক গে। প্রসঙ্গটা এখানেই চাপা পড়ুক। আজ বিকেল থেকে যে অপ্রিয় কাণ্ড শুরু হয়েছে, তা ভুলে যাওয়াই ভাল।

ফোকর দিয়ে দুটি কাঁসার থালায় করে খাবার এল। রেডিয়োটা নামিয়ে রাখা হয়েছে ওদিকে। একজোড়া শাঁখা-পরা হাত; শুধুই হাত, বার দুয়েক নাড়াচাড়া করতে দেখলাম। অল্প আলোয় বা অন্য কোনও কারণে বোঝা গেল না, সে-হাত পুত্রবধূর না শাশুড়ির। গরম ভাত, মাছ, হিং দেওয়া কীসের একটা তরকারি, বেগুনভাজা! সবশেষে বাটি করে গরম দুধ। বহুকাল এই রকম দুধ খেতে পাই না।

ওই তক্তাপোশে দু'জন পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোলাম। চমৎকার কাটল সেই রাত। কোথাকার কে হারাধন বর্মন—সন্ধ্যাজল গ্রামের সাইকেল মিস্তিরি—আর আমি, ভবানীপুর নিবাসী এক বয়স্ক ব্রাহ্মণ, এরা বলে বর্ষীয়ান সাহিত্যিক, একত্র হয়েছি। সভাপতি আর প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেছিলাম প্রায়। দু'পাত্র করে দিশি মদ খাওয়া হল। ভূরিভোজন সাঙ্গ হল। এক বিছানায় শুয়ে আছি আর বাইরে ঝিঁঝিপোকার শব্দ শুনছি। আমার হাসি পাচ্ছিল—সত্যি কোনও ভেদ নেই। মানুষে

মানুষে কোনও ভেদ নেই।
সকাল হতেই বিনায়ক রায়ের পোকাটা মাথার মধ্যে আবার কিলবিল করে উঠল।
হারাধন বললেন, 'আজকের দিনটা থেকে যান।'
আমি ইতস্তত করছি দেখে বললেন, "গান্ধীনগর দেখিয়ে আনব। ওখানে খুব ভাল হিন্দু হোটেল আছে, মাংস-ভাত খাব সেখানে।"
স্নানটান করে, পরোটা আর আলুচচ্চড়ি খেয়ে আমরা দু'জনে রওনা হই। শরৎচন্দ্রের মতো দেখতে ওই মানুষটাকে আমার বেশ পছন্দ হয়ে গেছে।
রওনা হবার আগে যথারীতি ফোকরের মধ্যে দিয়ে জানিয়ে দিলেন, 'এবেলা বাইরে খাওয়া।'
ইচ্ছে হল একবার জিজ্ঞেস করি, "ওই ফোকরের ওপারে কারা থাকে? স্ত্রী আছে? ক'টি ছেলে? সকলে বিবাহিত?"
আবার কী মনে হল, চেপে গেলাম। সংসারের প্রতি উদাসীন অথচ প্রতিপালক এই লোকটির ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে গিয়ে কাজ নেই।

বড় রাস্তা দিয়ে সাইকেল রিকশায় চেপে আমরা উত্তরমুখে চলেছি। লক্ষ করলাম, বেশ যানবাহন চলে এই পথ দিয়ে। ট্রাক, টেম্পো, দূরপাল্লার বাস। রিকশা তো আছেই। শুকনো ধানকাটা মাঠ, ধুলো উড়ছে।
হারাধন বর্মন একসময় আচমকা বললেন, 'যাকে গ্রেট ম্যান বলা হয়, বিনায়ক কিন্তু তা ছিল না।"
আমি চুপ করে থাকি।
'ও দেশের কাজ করার মধ্যে দিয়েই বড় হতে চেয়েছে। বড়লোক হয়েছে। কলকাতায় বাড়ি করেছে। রাজনীতি করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মানুষের উপকার করেছে। বিনায়ক খারাপ লোক ছিল না।"
'আমি কি তাই বলেছি?'
'না, না, আপনি কাল বিদ্যাসাগরের নাম করলেন না হঠাৎ? ওই লেভেলের মানুষ ছিল না সে। ছোট মাপের নেতা। এখন সবাই যে রকম। একটু লোভী।'
'লোভী?' এবার আমি হেসে ফেলি।
"ওই আর কী। কাগজে ছবি ছাপার লোভ। প্রার্থী পরিবৃত হয়ে থাকার লোভ। মানুষকে কৃতজ্ঞ করার লোভ। ক্ষমতার লোভ। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বেশ ভাবসাব ছিল ওর।'
আমি বলি, 'বঙ্গগৌরব হতে চাননি? কাল ওদের ফেস্টুনে যেন দেখলাম।'
'হুঁ। সেজন্যেই তো চিরকুমার। বেচারা।'
আমরা গান্ধীনগরে এসে পৌঁছেছি। বেশ জমজমাট জায়গা। কলোনির মধ্যে মাঝারি মাপের একতলা-দোতলা বাড়ি। গাছপালা আছে। খুব ঘিঞ্জি নয়। মধ্যবিত্ত মানুষের বাস। কে বলবে, এদের পূর্বসূরী কপর্দকশূন্য শরণার্থী ছিল? হয়তো তত দরিদ্র ছিল না তারা। বিনায়ক বেছে বেছে লোক এনে উপনিবেশ গড়েছিলেন।
ঘুরতে ঘুরতে আমরা স্কুলবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। বেশ বড়সড়—তিনতলা বাড়ি। অট্টালিকা বলা যায়। সামনে পাঁচিল-ঘেরা খেলার মাঠ।
আমি বলি, 'ঠিকেদারির টাকায় করা নাকি? এত বড় বাড়ি করতে তো কম টাকা লাগেনি?"
"তাই হবে। কলোনির বুকের ওপর এত বড় বাড়ি কেউ করে? লোকের চোখ টাটাবে না? মনে মনে ওর অহংকার ছিল, নাম যা-ই হোক, আসলে এটা বিনায়ক নগর।"
স্কুলের ঘণ্টা বাজল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, ক্লাস থেকে বেরিয়ে খেলতে লেগেছে। ওদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক দেখে মন প্রসন্ন হয়।
হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায় গেটে গাঁথা একটি শ্বেতফলকে। বাংলায় লেখা—'উৎসা'।
'উৎসা কি বাড়ির নাম? ভারী সুন্দর নাম তো। সৌভাগ্যের উৎস।'
হারাধন বর্মন এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন।
বললেন, "এতদিন পর এ প্রসঙ্গ হয়তো অবান্তর। তবে সেই সময় উৎসাই ছিল ওর সবচেয়ে বড় ভুল। উৎসা—নিচু জাতের ওই মেয়েটাকে এনে ও রাখল।"

আমি বলি, 'সে তো উদারতারই পরিচয়। গান্ধীজি আমাদের শিখিয়েছেন নিচু জাতকে সম্মান করতে। উনি বলতেন, হরিজন।'

"রাখল কিন্তু বিয়ে করল না। ওকে যে চিরকুমার হতে হবে। মেয়েটাও সহজে ছাড়েনি। ওই উৎসাকে নিয়ে ঢের কুৎসা রটেছে তখন। কিন্তু মানুষ এসব বেশিদিন মনে রাখত না যদি ননী না থাকত।"

'ননী? ননী গায়েন?' আমি চমকে উঠি, 'বিনায়ক রায়ের মানসপুত্র?'

'ওরা তাই বলে। ভাবে, লোকে ঘাস খায়। ওই ননীকে দেখিয়ে মাসের-পর-মাস, বছরের-পর-বছর, কত টাকা আদায় করেছে উৎসা—সে বিনায়ক জানে আর কিছু কিছু আমি জানি। একসময় বিরক্ত হয়ে আমি এই নোংরা ব্যাপার থেকে সরে গেলাম। তখন ওই নেপাল মিত্তির আর তপন হালদার ওই কাজের ভার নিল। ননী এখন নেতা হয়ে ওদের পুষছে।'

এবার সমস্ত ছবিটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

'কী দরকার ছিল মূর্তি প্রতিষ্ঠার?' সভায় বসে হারাধন গতকাল বলেছিলেন, মনে পড়ছে। আবার তিনি তার পুনরাবৃত্তি করলেন, 'কী দরকার ছিল মূর্তি প্রতিষ্ঠার?'

স্কুলতলার মাঠে, শহরের মাঝখানে, বঙ্গগৌরব বিনায়ক রায়ের আবক্ষ মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল। মূর্তি হয়ে যাওয়া মানেই স্থায়ী একটা পুজোর ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া। ওই মূর্তিকে কেন্দ্র করে ঘটবে ননী গায়েন ও সম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তার। যেতে-আসতে লোকে দেখবে। মাথা নোয়াবে। বাংলার সুসন্তান চিরকুমার এই দেশনেতার জীবন ও আদর্শ নিয়ে কত কাহিনী ঘুরবে মুখে মুখে, বংশপরম্পরায়। আমরা, মূর্তিপূজক বাঙালি, কালীঠাকুরের ছবির সামনে গড়িয়ে পড়ি ভক্তিরসে, গাছের তলায় মাটির তৈরি মনসা দেখে সিঁদুর লেপে দিয়ে আসি, ঢিল বেঁধে দিয়ে আসি গাছের ডালে। আর এ তো শক্তপোক্ত মর্মর মূর্তি।

বিনায়ক রায় খুব বড় মাপের মানুষ ছিলেন না। আজ তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পরে ননী গায়েনের দল এই সত্য চাপা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হল। কারণ বিশ্বাস ভেঙেছিল অনেকদিন আগেই। এখন মূর্তি ভাঙার সময়।

রিকশায় চেপে শহরে ফিরছি। একবার মনে হল, স্কুলতলার মাঠটা দেখে যাই। আবার ভাবলাম, থাক গে। যদি গিয়ে দেখি, গুন্ডারা প্যান্ডাল পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে গতকাল, আর সেই ভগ্নস্তূপের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বিনায়ক রায়, বেচারা বিনায়ক রায়, যে বলেছিল আদর্শ মানে আরশি, তা হলে আমার খুব কষ্ট হবে।

মানুষ তো এই রকম। একটু উদার, একটু প্রেমিক, একটু লোভী। অথচ সে মনের মধ্যে পোষে বিশাল এক বাসনা। বেঁচে থাকার বাসনা। মহাকালের চাকা এড়িয়ে একশো বছর, দু'শো বছর, তিনশো বছর। তাই নিয়েই যা কিছু বিভ্রাট।

১৯৮৮

শুধু শহিদদের জন্যে

ভূত বলবেন না, ওটা একটা ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ। এরা হল গিয়ে অতৃপ্ত আত্মা। সারাবছর অশরীরী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই তমলুক, মেদিনীপুর কাঁথি অঞ্চলের আকাশে, জলায়, জঙ্গলে। একটা দিন, বছরের এই একটা দিন মৃত্যুবার্ষিকীর দিনটা, কয়েক মিনিটের জন্যে শরীর ধারণ করতে পারে। সভায় আসে। দুটো আশার কথা শুনে যায়। আপনি ভয় পাবেন না। এদের অবজ্ঞা করবেন না প্লিজ।

আমার পাশে বসে কথা বলছিলেন বংশীধর জানা। ইনিই সভাপতি। আমি প্রধান অতিথি। বুড়োমানুষ না বলে এঁকে বর্ষীয়ান বলাই সঙ্গত, কেননা বুড়ো হল উপেক্ষাব্যঞ্জক শব্দ। সত্তরের ওপর বয়েস হবে। শীর্ণ দেহ, পরনে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। চোখে কালো চশমা।

কলকাতার কোনও সভায় আমার ডাক পড়ে না। সেখানে হোমরাচোমরা লোকের ছড়াছড়ি। কী দারুণ তাদের নামডাক, কী দারুণ তাদের চুলের বাহার। যাদের মাথায় চুল নেই, তাদেরও টাকের কী উজ্জ্বল জেল্লা। উপরন্তু, তাদের সকলেরই সিল্কের জামা আছে। আমার নেই। সভাপতি, প্রধান অতিথি হওয়া তাদেরই সাজে। তারা যখন বক্তৃতা দেয়, সভাস্থল গমগম করে। মাঝেমধ্যে দু'-একটা সভায় যাবার নিমন্ত্রণপত্র আমি পাই না যে তা নয়, তবে সেগুলো হল-ভরার আমন্ত্রণ। আমার মতো আরও অনেক লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী তো রয়েছে সংসারে, হু অলসো র‍্যান, আমরা গিয়ে প্রথম সারিতে সাহস হয় না, দ্বিতীয় সারিতে বসি। ঘাড় উঁচু করে থাকি ভিডিয়ো ছবি তোলার সময়।

তাই যখন বংশীধর জানার আমন্ত্রণপত্র এসেছিল, খামের মধ্যে দুটো একশো টাকার নোট, আমি আর প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। হোক না দূরস্থান, গোরস্থান তো নয়, আমি ভেবেছিলাম। শঙ্করতলা গ্রাম। খড়্গপুর থেকে হলদিয়া যাওয়ার পথে মানিকতলা স্টপে নামতে হবে। বাঁ দিকের পথ ধরে এক কি মি মাত্র পথ হেঁটে গেলে জনবসতি চোখে পড়বে। প্রথম পাকা বাড়িটা পুলিশ চৌকি। দ্বিতীয় পাকা বাড়ি রামচন্দ্র বেরা মেমোরিয়াল স্কুল। আগস্ট মাস, পথে জলকাদা থাকবে। আমি যেন ছাতা আর টর্চ সঙ্গে আনি। বংশীধরবাবুর চিঠিতে স্পষ্ট লেখা ছিল। আমার একটি ধারাবাহিক রচনা পড়ে উনি মুগ্ধ, ওঁর মনে হয়েছে আমি যথার্থ দেশপ্রেমী। আমিই যোগ্যতম।

১৯৪২ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলন মনে পড়ে। গান্ধীজি ডাক দিয়েছিলেন করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। ইংরেজদের বলেছিলেন, ভারত থেকে বেরিয়ে যাও। এদেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব এ-দেশবাসীর। শেষপর্যন্ত এই আন্দোলন অবশ্য অহিংস থাকেনি। সুবুদ্ধিপ্রণোদিত অসমসাহসী যুবকের দল টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেললাইন উপড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করে। সরকারি অফিসে, থানায়, কাছারিতে উঠে জাতীয় পতাকা পুঁতে দিয়ে আসে। আমরা জানি, স্বাধীনতা সংগ্রামে আর তার পরেও বিভিন্ন প্রকার আদর্শবাদী আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার অবদান কতখানি। বরাবর এই জেলার মানুষ সাড়া দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। স্বার্থত্যাগ করেছে বিনা প্রত্যাশায়। আর হয়তো আজও এই মেদিনীপুর জেলার ঋণ দেশ শোধ করতে পারেনি। সেই বিয়াল্লিশের জাতীয় আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার রেল চালু রাখার উদ্দেশ্যে পথের দু'পাশের গ্রামগুলোয় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছিল। গুলিবর্ষণে নিহতের সংখ্যা নশো চল্লিশ। আহত ষোলশো তিরিশ। এ-তথ্য ইতিহাসে বিধৃত।

তার পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি হতে চলেছে। কলকাতা হলে এই অনুষ্ঠানকে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব বলা হত। না, এঁরা মহার্ঘ অলংকারে বিশ্বাস করেন না। গৌরব প্রচার করা আমাদের লক্ষ্য নয়, বংশীধর জানা তাঁর চিঠিতে জানিয়েছিলেন, একটি বিশেষ দিনকে আমরা স্মরণ করব। ঐতিহাসিক সেই দিবস। শঙ্করতলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একত্রিশ জন স্বদেশি যুবক সামরিক বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল সেদিন। প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল বলাই সঙ্গত। তাদের আত্মত্যাগ যে ব্যর্থ হয়নি, এটুকু কেবল জানাতে চাই।

বাস স্টপে নেমে দেখি, কাছেই এক চালাঘরে চায়ের দোকান। তখন দুপুর দুটো চল্লিশ। উনোনের পাশে চৌকিতে শুয়ে আছে মধ্যবয়স্ক দোকানি। তাকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, ইস্কুল বাড়ি? উইদিকে পথ। সিধে চলে যান। এ-বছর কলকাতা থেকে আপনি আইছেন। ভাল। দিনে দিনে ফিরবেন যেন। পাঁচটায় খড়্গপুরের বাস আসে।

তখনও ব্যাপারটা বুঝিনি। গ্রামে ঢুকে দেখি, শুনশান। সরু পথের দু'পাশে চাষের জমি, জল থইথই করছে। মাথায় ডোঙা পরে ঝুঁকে কাজ করছে চাষি। পথ পেছল। তার মধ্যে একটু দূরে দেখি কাদামাখা ফুটবল নিয়ে খেলা করছে ছেলেদের একটি ছোট দল। জায়গাটা স্কুলের মাঠ হবে। কিন্তু ভেতরের সভা নিয়ে যেন তাদের কোনও উৎসাহ নেই।

স্কুলবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই কোথা থেকে এক ঝাঁক পাখি চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল। একটা কালো-সাদা রঙের কুকুর ভেতর থেকে বেরিয়ে মেঘলা আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর ল্যাজ নামিয়ে ছুট দিল মাঠ পেরিয়ে। আমি ঘাড় উঁচু করে বাড়িটার দেয়ালে খোদাই-করা রামচন্দ্র বেরা মেমোরিয়াল অবধি পড়েছি, এমন সময় ওই বুড়ো বর্ষীয়ান ভদ্রলোককে থামের পাশ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখলাম।—আসুন, আসুন, পথে খুব কষ্ট হয়নি তো?

নমস্কার বিনিময় হল আমাদের। উনি বললেন, আমিই বংশীধর জানা। এই স্কুলের সেক্রেটারি।

চোখের কালো চশমা তাঁর মুখের বিনয়-নম্র অভিব্যক্তি খানিকটা আবৃত করে থাকায় আমি ঠিক বুঝলাম না, আমি উপস্থিত হওয়ায় তিনি বিস্মিত হয়েছেন কিনা।

আমরা প্রস্তুত। কেবল আপনার আগমনের অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনছিলাম।

খুবই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। আমার মনে হল। পতাকা নেই, চাঁদোয়া নেই। মাইক পর্যন্ত নেই। না হলে আমাকে ডাকবে কেন। অন্তত গ্রামের লোকেরা, ছেলেপুলের দল এসে ভিড় করবে, আশা করেছিলাম আমি। তারা কোথায়? মাইকে গান না বাজলে তারা আকৃষ্ট হয় না আজকাল। আবার ভাবলাম, ভেতরে গিয়ে দেখি না। হয়তো সবাই আসন গ্রহণ করে আছে, আমার অপেক্ষায়।

সাদা চাদর-ঢাকা একটা টেবিল—হলঘরে ঢুকতেই আমার চোখে পড়ল। তার এ-পাশে দু'খানা হাতলওলা চেয়ার। আর সামনে, কিছুটা দূর থেকে সারি সারি খান পঞ্চাশেক ফোল্ডিং চেয়ার পাতা রয়েছে। আমরা স্বস্থানে উপবেশন করতেই একটি কিশোর বালক প্রায় লাফাতে লাফাতে এসে আমাদের দু'জনের গলায় দুটি মালা পরিয়ে দিয়ে আবার লাফাতে লাফাতে চলে গেল।—এবার তোমরা এসে বসো। আমরা সভা আরম্ভ করছি। ফাঁকা হলঘরে বসে বংশীধরবাবু হাঁক দিলেন।

দেখতে দেখতে হল ভরে গেল লোকে। বিকেলের পড়ন্ত রোদ পশ্চিম দিকের বড় বড় জানলা দিয়ে ভেতরে এসে পড়ছে এক-একবার, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সেই আলোয় আমি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে দেখতে পাচ্ছিলাম। একদল যুবক। পরনে ধুতি আর গায়ে ফতুয়া বা শার্ট। একজন বয়স্ক শ্রোতাও আছে। সবাই একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে সভাপতির দিকে।

সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করে সভাপতি আমার হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিলেন। বললেন, এটা নিহতদের নামের তালিকা। আপনার ভাষণে যেন এদের সকলের নাম উল্লেখ করবেন। না হলে খুব দুঃখিত হবে এরা। প্রধান অতিথির মুখে একবার নিজের নামটা শুনলে নিশ্চিন্ত হয়। ভাবে, দেশ ওদের ভোলেনি।

তখনও ব্যাপারটা আমি ভাল করে বুঝিনি। আসলে, আমার আসন্ন ভাষণের পয়েন্টগুলো সাজিয়ে নিচ্ছিলাম মনে মনে। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ নরেশচন্দ্র খাশনবিসের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর' গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়ে এসেছি আমি। কিছু নোটও সঙ্গে আছে। মাতঙ্গিনী হাজরার কথা আছে অনেকখানি জুড়ে। রামচন্দ্র বেরার নামের উল্লেখও আছে। ক্ষুদিরাম তো আছেই। আমি উঠে দাঁড়িয়ে 'সমবেত ভদ্রমণ্ডলী' বলে বক্তৃতা শুরু করি। তাতেই খটখট শব্দে হাততালি পড়ে। বিপ্লবীদের আমল থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে মেদিনীপুর জেলে সঙ্ঘটিত যুগান্তর ও অনুশীলন দলের সাময়িক ঐক্য প্রসঙ্গে যখন এলাম, মিনিট দশেক বক্তৃতা দিয়েছি, তখন দেখি, আমার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি দর্শককুল অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সভাপতি কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে বললেন, উনিশশো বিয়াল্লিশে চলে আসুন চটপট। এদের হাতে সময় কম।

তখনই আমি টের পেলাম, এই দর্শক বা শ্রোতার দলটি সবাই ভূত। না, ভূত বলা উচিত নয়, অশরীরী। তার প্রমাণ, এদের চোখের পলক পড়ছে না। বছরে এই একটি দিন, মৃত্যুবার্ষিকীর দিনটায় এরা কয়েক মিনিটের জন্য শরীর ধারণ করতে পারে। মৃত্যুকালে যার যত বয়েস ছিল, সে তত মিনিট। এই অতৃপ্ত আত্মারা সবাই ১০ আগস্ট থেকে ১২ আগস্টের মধ্যে সামরিক বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছিল। এদের বয়েস তখন ছিল কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর। কারও কারও তারও কম। বেশিরভাগ ছাত্র। সুতরাং মাত্র কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের শারীরিক অবস্থান ফুরিয়ে গেলে এরা আবার অদৃশ্য হয়ে যাবে।

টের পেয়ে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কেননা, এর আগে কখনও ভূতের সঙ্গে মিশিনি আমি। ভূতের গল্পও লিখিনি। বলতে গেলে, ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিনি কখনও। এখন একদল ভূতের মধ্যে বসে বসে ঘামতে লাগলাম। হলঘরে একটাও সিলিং পাখা দেখলাম না। অথচ বেশ গরম। কিন্তু, সামনে তাকিয়ে দেখি, কেউ অস্বস্তিবোধ করছে না। ভূতেরা আর মানুষবেশী দেবতারা যে ঘামে না, সে-কথা নলদময়ন্তী উপাখ্যানে বোধহয় পড়েছি।

আর কালবিলম্ব না করে আমি বক্তৃতা দ্রুত গুটিয়ে আনতে থাকি। শেষকালে বলতে হয়, এই অঞ্চলের যারা সেই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল, নির্ভয়ে বুক পেতে দিয়েছিল অত্যাচারী শাসকের বন্দুকের সামনে, ভারতমাতার মাটি ভিজিয়ে দিয়েছিল তাদের রক্তে, তারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আজ পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু দেশবাসী সেই সব তরুণ

বীরকে ভোলেনি। তারপর বর্ণানুক্রমে একত্রিশ জনের নাম পাঠ করলাম তালিকা দেখে দেখে। আমার গলা কাঁপছিল আবেগে কিংবা ত্রাসে। আমি তো আর প্রাণ বিসর্জন দিতে আসিনি এখানে। এসেছি প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করার বাসনায় বা লোভে। যে-লোভ কলকাতায় এতকাল অচরিতার্থ ছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে, আমার আত্মাও অতৃপ্ত, শুধু এইটুকু পার্থক্য যে, আমার শরীরে এখনও প্রাণস্পন্দন আছে। দেহটিকে সস্নেহে বহন করতে পারছি।

দেশবাসী তাদের ভোলেনি, এই মিথ্যে কথাটা বলার সময় গলা বেশি করে কেঁপে থাকবে, কারণ অবলীলায় মিথ্যে কথা আমি বলতে পারি না। আর, তখন ডাকঘরের অমর নায়িকা সুধার কথা মনে পড়ছিল, সে-ও তো অমলকে মিথ্যে কথাই বলেছে। সুধার জীবনবৃত্তান্ত তো রবীন্দ্রনাথ লিখে যাননি। লিখে গেলে আমরা হয়তো দেখতাম, কালক্রমে সে যুবতী হয়ে কোনও ষণ্ডামার্কা স্বামীর সংসার অলংকৃত করছে, তার ঔরসে চার-পাঁচটি সন্তানও হয়তো প্রসব করেছে সুধা। ওসব মধুর মিথ্যে তবু বলতে হয়। অমর হওয়া অসম্ভব বলেই মানুষের এত আকাঙ্ক্ষা অমরত্বের জন্যে। শঙ্করতলা গ্রামের প্রাক্তন অধিবাসীদের আমি দোষ দিতে পারি না।

বক্তৃতা শেষ করলাম। আবার খটখট শব্দে হাততালি পড়ল। দেখতে দেখতে সামনের চেয়ারগুলো ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। বস্তুত, উবে যেতে লাগল লোকগুলো। তাদের চোখের পলকহীন দৃষ্টি আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা আছে, বংশীধর জানা আমায় সেইদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় উক্ত বয়স্ক শরীরী আত্মা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। তার আবার একটা হাত নেই। জামার সেই দিকের হাতা পকেটে গোঁজা। দৃষ্টি তো স্থিরই, কপালের চামড়া কুঞ্চিত দেখে সন্দেহ হয়, সে অসন্তুষ্ট।

সরাসরি আমার কাছে এসে লোকটি বলল, আমার নাম প্রমথেশ পাত্র। আপনি আমার নাম তো ডাকলেন না?

নিহতদের তালিকায় তো আপনার নাম নেই।

আমি আহত হয়েছিলাম গোরা সৈন্যের গুলিতে। এই হাত দিয়ে জাতীয় পতাকা পুঁতেছিলাম মানিকতলা থানার ছাদে। ওরা বুকে গুলি না করে হাতটা উড়িয়ে দেয়। ১২ আগস্ট ১৯৪২ সকাল এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে আমি থানার ছাদ থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে যাই। তার ফলে কোমরের হাড় ভেঙে যায়। বাকি জীবন প্রায় পঙ্গু হয়ে থেকেছি। তবু কি ইতিহাসে আমার নাম থাকবে না?

এবার আমি বংশীধর জানার দিকে তাকাচ্ছি। কেননা, তিনিই আমায় নামের তালিকা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কালো চশমা সত্ত্বেও বংশীধরকে ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ তিনি রাগে ফেটে পড়লেন—দেখো প্রমথ, প্রত্যেক বছর তুমি এখানে এসে হুজ্জত বাধাও! বহুবার তোমাকে বলেছি, তুমি শহিদ নও, তুমি স্বাধীনতা সংগ্রামী মাত্র। এই সভা শুধু শহিদদের জন্যে। হাতের বদলে তুমি ভাতা পেয়েছ, বলো, পাওনি? কোমরের বদলে তুমি সেলাই মেশিন উপহার পেয়েছ! সেই সেলাই মেশিন চালিয়ে তুমি আজীবন অর্থ উপার্জন করে গেলে। এখনও তোমার ছেলে প্রসূন তোমার প্রতিষ্ঠিত 'ফ্রিডম টেলর্স' দর্জির দোকান চালিয়ে জীবিকানির্বাহ করছে। আর কী চাও? এই গরিব দেশ কত দেবে?

মুখ সামলে কথা বলবে বংশী। তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

প্রমথ এবার মুখ খুলল। বুঝলাম, ওর মনে অনেকদিনের জমানো রাগ আত্মার সঙ্গেও সেঁটে আছে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওঁকে নিয়ে পড়েছে, তাতে আমি আশ্বস্ত। যদিও ওর একটাই হাত, তা দিয়েও যদি আমার গলা টিপে ধরে, আমি বাঁচব না। না, সে রকম ভয়ের কারণ নেই। প্রমথ বলল,—তোমার তো কিছুই যায়নি বংশীধর। তুমি আহত হওনি, নিহতও হওনি। দেশের জন্যে তোমার কোনও ত্যাগস্বীকার করতে হয়নি। তুমি মাস্টার হয়ে কেবল ছাত্রদের উত্তেজিত করেছিলে, নিজে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে বরাবর। তোমার চোখের সামনে দেশ স্বাধীন হল। তেতাল্লিশ বছর ধরে তুমি এখানে মাতব্বরি করেছ। করোনি? কীসের জোরে? তোমার হাত দিয়ে সরকার বছরের-পর-বছর অনুদান বিতরণ করেছে, তুমি তা থেকে টাকা মারোনি? বড় রাস্তার মোড়ে, ওই যেখানে বাস দাঁড়ায়, সেখানে শহিদ বেদি গড়ার জন্যে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কী হল সে-টাকা? কোথায় সেই শহিদ বেদি? এক বর্ষায় কেন ধুয়ে গেল অত বড় স্মৃতিস্তম্ভ? বলো, জবাব দাও। চল্লিশ বছর আগে এক লক্ষ টাকা দিয়ে শ্বেতপাথরের মন্দির

গড়া যেত। তুমি সেই টাকা হাতিয়ে তেলকল খুলেছ তমলুকে। ঝাড়গ্রামে তোমার বিড়ির ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠেছে। তুমি শহিদদের ঠকিয়েছ, আমার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রত্যেকের সঙ্গে তঞ্চকতা করেছ সারাজীবন। কেবল বছরে একবার করে স্মৃতিসভা করে আমাদের চোখে ধুলো দিতে পারবে না। আমরা ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে লড়েছি, তোমার মতো পুঁটিমাছকে এই আঙুল দিয়ে টিপে মারতে পারতাম।

বলতে গিয়ে ওর পকেট থেকে শূন্য হাতাটা বেরিয়ে ঝুলতে লাগল। আত্মারা যত রাগ করুক, আসলে কিছু পারে না, তা প্রমাণিত হল।

বংশীধর এগিয়ে এসে সেই হাতা আবার ওর পকেটে গুঁজে দিলেন।

বললেন, এইসব মিথ্যে অপবাদ বাইরের লোকের সামনে রটিয়ে কী লাভ প্রমথ? এতে মেদিনীপুর জেলার সুনাম নষ্ট হয় না? ইনি লেখক মানুষ। কলকাতায় ফিরে গিয়ে, আমাদের তুচ্ছ গৃহবিবাদ নিয়ে কিছু লিখলে আমাদের মুখে চুনকালি পড়বে। তোমার ক্যালি ছিল না, আমার ক্যালি ছিল, এটুকু সত্য মেনে নিলেই তো হয়।

আমি বলি, আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর—

বলতে বলতে দেখি, প্রমথ উবে গেছে।

বংশীধর বললেন, যাক, বাঁচা গেল।

তারপর আমায় বড় রাস্তা অবধি এগিয়ে দিলেন।

তখনও পাঁচটা বাজতে বেশ কয়েক মিনিট দেরি আছে। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। আমি ছাতা খুললাম। উনি ছাতার বাইরে হাঁটতে লাগলেন।

চায়ের দোকানি উনোন জ্বালিয়ে বসে আছে। আমাদের দেখে 'রাম রাম' বলে উঠল। অমনি বংশীধব জানার চোখ থেকে খসে পড়ল কালো চশমা। চেয়ে দেখি, উনি বটগাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। আর এগোচ্ছেন না। তাঁর মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি। তাঁর স্থির চোখের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ। চোখের পাতা পড়ছে না।

দোকানি বলল, এই একটা দিন খালি ইস্কুলবাড়িতে আত্মারা সবাই জড়ো হন। বংশীবাবুই এতকাল সব মিটিং-সভার ব্যবস্থা করে এসেছেন। গেল বছর উনিও সগ্‌গে গেলেন। ভাবলুম, মিটিং বুঝি বন্ধ হবে এবার। কই, চালিয়ে তো যাচ্ছেন। জিয়ন্ত লোককে পরোয়া করে না, এ-তল্লাটে এ রকম ঘাঘু আত্মা খুব কম আছে। বাবু, চা খাবেন তো?

বটগাছের দিকে পেছন ফিরে চায়ের জন্য অপেক্ষা করছি। আর ভাবছি, এই ব্যক্তিকে আমার ঠিকানা কে দিল? কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু? এখান থেকে ফিরে গিয়ে? কে হতে পারে?

১৯৯৩

❀ বিপণন

ঔরঙ্গাবাদে থাকতে রোজ সকালে একঘন্টা করে বাগান কুপাত অভিষেক। উবু হয়ে বসে লনের আগাছা তুলত। বিশাল কাঁচির কানদুটো ধরে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে বাংলোর চৌহদ্দি-জোড়া কেয়ারি-করা ঝোপের মাথা ছাঁটত সমান করে। বেশ পরিশ্রম হত এই কাজে। ঘামে গেঞ্জি ভিজে গেলে হাত-পা ধুয়ে সাদা বেতের চেয়ারে এসে বসত বারান্দায়। বেয়ারা এনে দিত পট-ভরতি চা। আর ড্রাই টোস্ট। কোম্পানির মালি, কোম্পানির বেয়ারা, কোম্পানির মাইনে-করা কুক। কোম্পানির গাড়ি আর ড্রাইভার। একুশ বছর কেটে গেল কোথা দিয়ে। অবসর নিয়ে কলকাতায় নিজের নতুন ফ্ল্যাটে এসে দেখে, জিনিসপত্র রেখে আর নিজেদের চলাফেরার জায়গা নেই। নিজেরা বলতে মিয়া-বিবি। একমাত্র ছেলে বম্বে আই আই টি-তে পড়ছে। ছেলের জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানা বাদ দিলে এই পাঁচতলার ফ্ল্যাটে আর দুটো বেডরুম, ঔরঙ্গাবাদের তুলনায় দেশলাই বাকস। একটি ব্যালকনি, ঔরঙ্গাবাদের তুলনায় ফাইভ স্টার চকোলেট বার, রেলিঙে হাঁটু ঠেকে যায়। এরই দাম বারো লাখ। তার মধ্যে পাঁচ লাখ ক্যাশ।

অভিষেক ল্যান্সডাউন ধরে হাঁটতে হাঁটতে লেক অবধি আসে। তিনটে চক্কর মারে। তারপর বেঞ্চিতে বসে বিশ্রাম করতে করতে সামনের কচুরিপানা, কখনও পদ্মফুল দেখে। আবার সেই পথ দিয়ে ফিরে যায়। কোনও কোনও দিন গড়িয়াহাট ঘুরে একটু বাজার করে নেয়। রেডিয়োয় সাতটা চল্লিশের রবীন্দ্রসংগীতটা ও পারতপক্ষে মিস করে না। ঔরঙ্গাবাদের তুলনায় অনেক বেশি এই সুখ কলকাতা ওকে দিচ্ছে। শত অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও।

একদিন গোলপার্কের কাছে দুলাল ধরের সঙ্গে দেখা। দুধের লাইন থেকে দুলালই ডেকে উঠল, 'সেন সাহেব'।

ঘুরে দাঁড়িয়ে অভিষেক তো অবাক।

লোকটা একটুও বদলায়নি। আগের মতো খেরকুটে চেহারা। মাথায় কোঁকড়া চুল। একটু ওলটানো ঠোঁট দুটোর ফাঁকে সাজানো দাঁতের সারি। একসময় দুলাল ওর নিজস্ব স্টেনোগ্রাফার ছিল।

বেশি কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না। দুলাল নিজেই বলল, জাতীয়করণের পরে তেল কোম্পানির চাকরিতে আর মজা ছিল না। সাহেবদের হাত-পা একদম বাঁধা। অভিষেকের মতো কাজের লোক যে ক'জন ছিল, সবাই একে একে কেটে পড়েছে। চার বছর হল অবসর নিয়েছে দুলাল। পেনশন পাচ্ছে। ওই সুবিধেটা ছাঁটাই করেনি নতুন ম্যানেজমেন্ট। ইউনিয়নের চাপ ছিল। তবে, স্টেনোগ্রাফারের পেনশন আর কতটুকু। হিন্দুস্থান রোডে ভাগ্যিস একটা বাড়ি করে ফেলেছিল সময় থাকতে—তার তিনতলায় ও থাকে, দোতলা-একতলা ভাড়া, কোম্পানি লিজ, সেই ভাড়ার টাকায় কোনও রকমে চলে যাচ্ছে। দুলাল বলল, ওর বড় ছেলে সামনের বছর আমেরিকায় যাচ্ছে পি এইচ ডি করতে। ছোট ছেলে ডাক্তার হয়েছে, বিয়ে করেছে ডাক্তারনিকে, দু'জনেই ওর লায়াবিলিটি।

'আপনি তো বিশাল চাকরি নিয়ে ঔরঙ্গাবাদ না কোথায় যেন চলে গেলেন। বেঁচে গেলেন। তার পরই তো শুরু হল নকশালদের ঝামেলা। উঃ কী সব দিন গেছে না!'

অভিষেক একটু চুপসে গিয়েছিল। মনের ভাব বুঝতে না দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, রিটায়ার করে ফিরলাম।'

'বকুলবাগানে পুরনো বাড়িতেই আছেন?'

'না না। একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। কাছেই।'

প্রথমদিন এই অবধি কথাবার্তা। কিন্তু এরপর থেকে অভিষেকের মনের মধ্যে দুলাল ধরের তিনতলা বাড়িটা ভার হয়ে দাঁড়াল। তুমি ছিলে আমার স্টেনো। সেই ছেষট্টি সালে বিলেত ফেরত আমার মাইনে ছিল চব্বিশশো টাকা, তোমার সিনিয়রিটি সত্ত্বেও ন'শো টাকা। তোমার ওভারটাইম ছিল, আমার ছিল না, কেননা আমি ছিলাম ম্যানেজারিয়াল স্টাফ। তুমি বাকি জীবন ওখানেই ঘষটালে, আমি কলকাতা ত্যাগ করে, দুটো চাকরি বদলে জেনারেল ম্যানেজার হলাম। ফাঁটের ওপর চাকরি করলাম এতগুলো বছর। কী হল? শেষ অবধি কী হল তাতে? আমি ট্যাক্স দিয়ে গেলাম সারাজীবন আর তুমি তিনতলা বাড়ি হাঁকড়ালে। ওভারটাইমের টাকায়?

একটা চিন্তা নিয়ে দিনের-পর-দিন কচলালে অতীতের অনেক কথা মনে পড়ে যায়। অভিষেকের

মনে পড়ল বিদেশি তেল কোম্পানির জমকালো অফিসটার কথা। তখনকার দিনে পুরো দুটো ফ্লোর এয়ার কন্ডিশনড। ওপর তলায় একজিকিউটিভদের লাঞ্চরুম আর মেডিকেল সেন্টার। আই বি এম কম্পিউটার মেশিন। বজবজে বিশাল ডিপো। বম্বের রিফাইনারি থেকে জাহাজে করে তেল আসে সেখানে। পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন, ফার্নেস অয়েল, লুব্রিকান্ট। ইন্ডিয়ান অয়েল তখন সবেমাত্র মার্কেটিংয়ে নেমেছে। প্রতিযোগিতায় তাকে পর্যুদস্ত করার জন্যে কী উৎসাহ তখন। ওদের লোকবল নেই, নেটওয়ার্ক নেই। বারাউনি রিফাইনারির ছাঁকা তেলই বেচে উঠতে পারে না। একটি-দুটি করে পেট্রল পাম্প খুলছে ওরা, সেখানেও সব সময় সাপ্লাই নেই। নতুন সেলস ম্যানেজার দেশপাণ্ডে লাঞ্চরুমে হাসতে হাসতে বলত, আবার ফোন করেছে মেনন, ট্যাঙ্ক উপচে পড়ছে। আমায় বাঁচাও, বেশি কমিশন দেব। তো আমি বলে দিলাম, ষাট দিন ক্রেডিট চাই। হাঃ হাঃ।'

তখন কে জানত, পাঁচ বছর যেতে-না-যেতে বিদেশিরা সব পাততাড়ি গুটোবে। আর থেকে যাবে একা ইন্ডিয়ান অয়েল এবং তার সহযোগীবৃন্দ। একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য। আসলে দেশপাণ্ডের ভরসাস্থল ছিল তিনজন দুঁদে ডিলার। লাহোটি, শঙ্করলাল আর অবস্থি। সমস্ত পূর্বভারত ছিল এই তিনজন বেনিয়ার দখলে। তেলের আকাল ছিল না। হুকুম করো, কত মাল তুলতে হবে, একদিনের নোটিশে ওরা তুলে নিত। টাকা দেওয়ার সময় ভোগাত একটু কিন্তু সে তো দেশপাণ্ডের প্রবলেম না, সে মাথাব্যথা অভিষেক সেনের। অভিষেকের কেবল মনে হত, ওরা সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে, ওদের লোভে রাশ টানা দরকার, একদিন কোনও অঘটন ঘটবেই। নালিশ করত ওপরওয়ালার কাছে। যে নাকি দেশপাণ্ডেরও ওপরওয়ালা। ওরা দু'জন শলাপরামর্শ করত নিভৃতে, তারপর অভিষেককে ইন্টারকমে ফোন করে বলত, 'ভয় পেয়ো না। তিরিশ বছর ওরা কোম্পানির সঙ্গে আছে। দশ-বিশ লাখ টাকা ওদের কাছে কিছু না। যদি চেক না দিয়ে হুন্ডি দেয়, নিয়ে নিয়ো।' ওদের নজর ছিল শুধু বিক্রির দিকে, হেড অফিস দেখতে চায় ক্রমবর্ধমান সেল। ইন্ডিয়ান অয়েলের পরাজয়।

ওই অবস্থিই একদিন কোম্পানির লেজ মলে দিল। হঠাৎ সাড়ে ছ'লাখ টাকার হুন্ডি ফেরত এল ব্যাঙ্ক থেকে। দেড়মাস পর। অবস্থিকে মনে পড়ে। মোটাসোটা লোকটা। ফাইন ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরত। তেল চুকচুকে চুল, কপালে চন্দনের ফোঁটা। মুখ-ভরতি পান। একদিন অফিসে এসে বলল, 'কসুর মাফ কিজিয়ে সেনসাহাব। ম্যায় কুছ পরেশান হুঁ।'

আর মনে পড়ে সেই ওপরওয়ালাকে। সাদা সাহেব। কী যেন নাম ছিল ওর! ওর ঘরে মিটিংয়ের পর মিটিং হচ্ছে। দেশপাণ্ডে চেষ্টা করছে অভিষেকের ওপর দোষ চাপাতে, 'দুলাল ধর, ও-ই হল কালপ্রিট, তুমি ওর শর্টহ্যান্ড খাতাখানা নিতে ভুলে গেলে?' অভিষেক ঠান্ডা মাথায় গম্ভীর হয়ে বলছে, 'স্কেপগোট খোঁজার চেষ্টা কোরো না, মাই ফ্রেন্ড। বহুবার আমি তোমায় ওয়ার্ন করেছি। এখন কীভাবে টাকাটা উদ্ধার হয় তার চেষ্টা করো।' সাহেব একবার এর দিকে চায়, একবার ওর দিকে চায়। আর মাঝে মাঝে দেয়ালে টাঙানো একজোড়া যামিনী রায়ের ছবির দিকে তাকায়। ওর আর কী! কোম্পানির টাকা মারা গেলে এই দু'জনের একজন চাকরি খোয়াবে।

অত্যন্ত বিশ্বাসী স্টেনোগ্রাফার দুলাল ধর। শর্টহ্যান্ড খাতাখানা সে কি অবস্থিকে বিক্রি করে দিয়েছিল? কত টাকার বিনিময়ে? পঞ্চাশ হাজার? একলাখ? না, না, অত হবে না। তখন সে-কথা নিয়ে ওকে চেপে ধরা যায়নি। ধরলেই বলত, খাতাটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। কিংবা বলত, আপনার সামনে বসে একটা সেট মাত্র ছাপলাম। ছেপেই আপনাকে দিয়ে দিলাম। তারপর সেই সেট কত হাত ঘুরেছে কে জানে। নামেই কনফিডেনশিয়াল। সেখান থেকেও কপি পেতে পারে ও। তা ছাড়া অবস্থিকে আমি চিনিও না। যায়-আসে দেখি, এইমাত্র। আমার সঙ্গে ওর যোগাযোগ হবে কী করে? ওর খুব কাছের লোক কেউ ওকে মালমশলা জুগিয়েছে। বলত এইসব কথা। আর ইউনিয়ন ওকে সমর্থনও করত।

আত্মরক্ষার্থে অভিষেক দুলালকে ঘাঁটায়নি। বার বার বলেছে, এর সঙ্গে জড়িত অবস্থির কাছের লোক কেউ। দুলাল না। ওর এত সাহস হবে না। তা ছাড়া, মূল গলদ তো সেলস্ পলিসির মধ্যে।

ঘটনা পরম্পরা, যতদূর মনে পড়ে, ছিল এই রকম। সাড়ে ছ'লাখ টাকার হুন্ডি তো ফেরত এল ব্যাঙ্ক থেকে। ব্যাঙ্কে টেলিফোন করে অভিষেক জানতে চাইল, এতদিন ডকুমেন্ট ধরে রাখার কারণ কী? ম্যানেজার বলে, অবস্থির লোক রোজ এসে বলছে, আর দু'দিন, আর একদিন আটকান, আমি ক্যাশ টাকা

এনে দেব। সেই ভরসায় দেরি করেছে। তারপর যখন দেখল, ওদের মতলব ভাল না, তখন আর ধরে রাখেনি। খবর পেয়ে অবস্থি নিজে এসে ক্ষমা চায়। তবু অফিসের যা নিয়ম, অভিষেক রেজিস্ট্রি ডাকে সুদসহ সাড়ে ছ'লাখ টাকা দাবি করল। আর জানাল, ওকে ক্রেডিট দেওয়া এখন থেকে বন্ধ। কিন্তু ততদিনে আরও একমাস পার হয়ে গেছে। আড়াই মাসে ফার্নেস অয়েল, পেট্রল ডিজেল, এল ডি ও, কেরোসিন, মোবিল,—সব মিলিয়ে তেরো লাখ টাকার মাল তুলেছে অবস্থি। তুলে বলছে : ম্যায় কুছ পরেশান হুঁ।

ওপরওয়ালা বলল, 'কেস ঠুকে দাও। ক্রিমিনাল কেস।'

অভিষেক বলল, 'টিকবে না। মানি সুট করলে নিষ্পত্তি হতে পাঁচ বছর। ততদিনে ও বিষয়সম্পত্তি বেচে দেউলিয়া হয়ে যাবে।' এদিকে সেল পড়ে যাচ্ছে। ছটফট করছে দেশপাণ্ডে।

সেই সময় একদিন অবস্থির কাছ থেকে এসে পৌঁছোয় এক রেজিস্ট্রি চিঠি। ইয়া মোটা খাম। পনেরো পৃষ্ঠা ধরে ওর নানা রকম দাবির ফিরিস্তি। তার বেশির ভাগই অতিরিক্ত কমিশন সংক্রান্ত। অবস্থির বক্তব্য, খেপে খেপে পাঁচ পারসেন্ট, দশ পারসেন্ট ছাড় দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাল তুলিয়েছে সেলস ম্যানেজার। গত দু'বছর একটিও ক্রেডিট নোট ছাড়েনি। ওইসব দাবির মীমাংসা না হলে ও ঋণ শোধ করতে পারবে না। ব্যস, গলায় আটকে গেল হাড়।

তখনও দুলাল ধর পিকচারে আসেনি। অবস্থির সঙ্গে ম্যানেজারের ঘরে মিটিং চলছে রোজ। কোনওটাতে অভিষেককে ডাকা হয়, কোনওটাতে ডাকা হয় না। দেশপাণ্ডে কর্তাকে বোঝাচ্ছে, অবস্থির দাবি অংশত সঙ্গত।

একদিন দেশপাণ্ডে হন্তদন্ত হয়ে অভিষেকের ঘরে নিজেই হাজির। কী ব্যাপার? না, ওর দাবিদাওয়া নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হবে। কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে অবস্থি আসছে। 'শনিবার ছুটির দিন সকাল থেকে আমরা লাঞ্চরুমে বসব।' বলল দেশপাণ্ডে। 'তুমি আর তোমার স্টেনো থাকবে, আমি আর অবস্থি। আর কেউ না। আমার মেয়ে-সেক্রেটারি, তাকে দিয়ে একাজ হবে না। গোটা দিন বসে আমি সব সমস্যার সমাধান করে দেব। তুমি পাশে থাকলেই তা সম্ভব হবে। ফিগার ওয়র্কে আমি দুর্বল; তুমি তো জানো।'

মায়া হয়েছিল অভিষেকের। এইসব চালিয়াত লোক সুসময়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কাউকে গ্রাহ্য করে না। কাদায় পড়লে একেবারে কেঁচো। তবু কোম্পানির যাতে মঙ্গল হয়, তাই করা উচিত।

সেই শনিবার কাজ শেষ হল বিকেল চারটের পর। বহুত তর্কাতর্কির অবসান হল শেষপর্যন্ত। অনেক দাবিই মানতে বাধ্য হল দেশপাণ্ডে। অবস্থিকে নিয়ে দেশপাণ্ডে চলে গেল ক্লাবে। নিজের ঘরে টাইপ মেশিন এনে, দুলাল ধরকে বসিয়ে ওর শর্টহ্যান্ড খাতা থেকে অভিষেক সমস্ত জিনিসটা টাইপ করাল। মাত্র এক সেট। রাত্তির ন'টার সময় সেই সেট ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে ও বাড়ি যায়। সোমবার সকালে সেই সেটের প্রতি পৃষ্ঠায় সেলস ম্যানেজারের সই করিয়ে ওপরওয়ালার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে।

সাহেব জিজ্ঞেস করেছিল, 'কত টাকা ওর পাওনা হয়েছে?'

অভিষেক বলেছিল, 'এইট পয়েন্ট ফোর জিরো ল্যাকস।'

সাহেব বলেছিল, 'বুলশিট।'

বুলশিট না-মঞ্জুর হয়ে ফিরে যায় সেলস ম্যানেজারের টেবিলে। পরের সোমবার সলিসিটরের চিঠি এল কোম্পানির নামে। চিঠির সঙ্গে হুবহু সেই সেটের নকল। অন্য মেশিনে ছাপা। অবস্থি কোম্পানির বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের মামলা করছে।

এসব অনেক বছর আগের কথা।

তখনও জেরক্স মেশিন এ-দেশে চালু হয়নি। চালু হলে হয়তো নালিশের কাগজে দেশপাণ্ডের সইটাও দেখা যেত। না, তা দেখা যেত না। অবস্থি দেশপাণ্ডেকে জড়াত না সরাসরি। ওরা বহু দিনের বন্ধু। পরস্পরকে রক্ষা করে আসছে। কেবল, পদাধিকার বলে সে যা স্বীকার করেছে নিভৃত কক্ষে ওপরওয়ালা যেন সেটা মানতে বাধ্য হয়, ওই আট লাখ চল্লিশ হাজার টাকার ক্রেডিট নোট যাতে অবস্থি হাতে পায়, তার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিল ওর সলিসিটর। সেলস ম্যানেজারের ডিকটেট করা নোটের নকল জুড়ে দিয়েছিল সঙ্গে। ওপরে তারিখ, কারা কারা উপস্থিত ছিল আলোচনায়, সব লেখা।

তখনই প্রশ্ন উঠেছিল, এ-জিনিস ওর হাতে গেল কী করে? মাত্র এক কপি ছাপা হয়েছিল তো। তা

হলে কি দুলাল ধর তার শর্টহ্যান্ডের খাতাখানা অবস্থিকে দিয়ে দিয়েছে? বা, ওই খাতা নিয়ে গিয়ে সলিসিটরের অফিসে আবার টাইপ করেছে সবটা? খাতাটা কেন ওর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়নি? নাকি ভাবা গিয়েছিল, ওপরওয়ালা সাহেব ওই বিপুল পরিমাণ কমিশন আর ছাড়ের দাবি মঞ্জুর করে দেবেই? নিজের গলাটা বাড়িয়ে দেবে অডিটরের হাঁড়িকাঠে, এত কাঁচা ছেলে? রুখে উঠলেও অভিষেক অস্বস্তিতে পড়ে যায়। সত্যি তো, খাতাটা কেড়ে নিলে এই সন্দেহের অবকাশ থাকত না। কেন যে খেয়াল করল না।

সেই মামলা পরে অনেক দূর গড়ায়, মনে আছে অভিষেকের। কোর্ট থেকে যায় সালিশিতে। ব্যারিস্টার বনমালী দাশের চেম্বারে। সেসব তথ্য এই গল্পের জন্যে প্রয়োজন নেই। এই ঘটনার দু'-আড়াই বছর পর ওই তেল কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল অভিষেক সেন। নিজে থেকেই ছেড়ে দিয়েছিল। ওকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। দেশপাণ্ডে বদলি হয়ে চলে গিয়েছিল বম্বে অফিসে। আর একজন সাদা সাহেব এসেছিল হংকং থেকে। এত বড় প্রতিষ্ঠান, মাসে আড়াই-তিন কোটি টার্নওভার শুধু পূর্বাঞ্চলেই। সেখানে দশ-বারো লাখ টাকা আটকে যাওয়া কোনও সমস্যাই নয়। সালিশি চলছে সালিশির মনে। কোম্পানি খরচ দিয়ে যাচ্ছে। অডিটর সন্তুষ্ট হবে।

কিন্তু দুলাল ধরের ওপর সন্দেহটা থেকে গেছে। ও কি সত্যি সত্যি টাকা খেয়েছিল অবস্থির কাছ থেকে? খেলে, কত টাকা খেয়েছিল? নাকি খায়নি? এই প্রশ্ন তখন করা যায়নি।

এত বছর পরে অভিষেক কলকাতায় ফিবে এসেছে আবার। কাজ থেকে অবসর নিয়েছে। সততা বিষয়ে যে ধারণা, অভিমত্ত, ও একসময় পোষণ করত মনে, তার ঢের অদলবদল হয়েছে ওর একুশ বছরের চাকরিতে। মানুষের চেহারা বড় প্রতারক। অভিজ্ঞতা ওকে শিখিয়েছে, সুযোগের সামনে মানুষ অসহায়।

একবার যখন দেখা হয়ে গেছে, আবার দেখা হবে। খুব ছোট একটা বৃত্তের মধ্যে অভিষেক আব দুলাল আবার পড়ে গেছে। সম্পর্ক আজ আব কিছুই নেই। তবু একটা কৌতূহল যেন নিবেও নিবছে না।

রোজ ভোরবেলা ল্যান্সডাউন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লেক অবধি আসে ও। তিনটে চক্কর মারে। তারপর বেঞ্চিতে বসে বিশ্রাম করতে করতে সামনের কচুরিপানা, কখনও বা পদ্মফুলের শোভা দেখে। আবার সেই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। কোনও কোনও দিন গোলপার্ক, গড়িয়াহাট ঘুরে যায়। দুধের ডিপোর পাশ দিয়ে হেঁটে যায় হনহন করে। যেদিন আবার দুলাল ধরেব সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, ও ঠিক জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা দুলালবাবু, আপনার অবস্থিকে মনে পড়ে? ডিলার। মোটাসোটা। ফাইন ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরে আসত। তেল চুকচুকে চুল, কপালে চন্দনের ফোঁটা। মুখ-ভরতি পান। কে যেন সেলস ম্যানেজার ছিল তখন? দোশি না দেশপাণ্ডে? হঠাৎ তেরো লাখ টাকা আটকে দিল।

দেখবে, এই অবধি শুনে ওর মুখ শুকিয়ে যায় কিনা।

তারপর জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা দুলালবাবু একদিন, শনিবার ছিল বোধহয়, অনেকক্ষণ ধরে লাঞ্চরুমে আমাদের মিটিং হয়েছিল। আপনি শর্টহ্যান্ড নোটবুকে সেলস ম্যানেজারের সুপারিশগুলো টুকে নিয়েছিলেন। তারপর আমার চেম্বারে বসে অনেক রাত অবধি টাইপ করলেন। মনে পড়ে?

দেখবে, এই অবধি শুনে ওর মুখ আবও শুকিয়ে যায় কিনা। নিজে থেকে কিছু বলে ফেলে কিনা।

না বললে ও তখন জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা দুলালবাবু, আপনি কি শর্টহ্যান্ড নোটবুকখানা অবস্থিকে বিক্রি করেছিলেন? কত টাকায়? বলুন না। আজ তো আর কোনও ভয় নেই। এখন তো আমরা দু'জনেই রিটায়ার করেছি। বলুন না।

দেখবে, বিশ্বাসঘাতক দুলাল ধর সত্যি কথা বলে কিনা। সে-ও তো মানুষ। তারও তো মন আছে। বিবেকের দংশন থেকে সে-ও তো মুক্তি পেতে চায়। যদি বলে, হ্যাঁ, পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রি করেছিলাম, কেন করব না, সেই টাকা দিয়ে হিন্দুস্থান রোডে চার কাঠা জমি কিনি, আজ সেই জমির ওপর আমার তিনতলা বাড়ি উঠেছে, ব্যস, তা হলেই তো চুকে যায়। সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়।

অভিষেক, যার মনের মধ্যে একটা অতি পুরনো সততার গ্লানি চাপা ছিল, আবার দগদগ করে উঠেছে। কী করবে তখন? হাত বাড়িয়ে দেবে ওর দিকে, হ্যান্ড শেক করে বলবে, সাবাশ?

১৯৯২

অপসংহতি

অনেকদিন পর কলকাতায় এসে আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে। আগে প্রত্যেক বছর গরমের ছুটিতে আসতাম! পুরনো সম্পর্কগুলো ঝালিয়ে নিতাম কয়েকদিনে। দেখতাম, কিছুই বদলায়নি। সবকিছু ঠিকঠাক আছে আগের মতো, দেখে ভাল লাগত।

ক্রমে ক্রমে আমার আসাটাই কমে গেল। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। তাদের বায়না মেটাতে হয়। কোথাও যাবার কথা উঠলে তাদের মা সবচেয়ে আগে বলে ওঠে, এত জায়গা থাকতে কলকাতা? বাদ দাও তো।

মায়ের কাছ থেকে ছেলেমেয়েরাও কলকাতাকে ঘেন্না করতে শিখেছে।

এলে আমাদের পুরনো আড্ডা, অলিম্পিয়ায় সকলের সঙ্গে দেখা হয়। স্বপনদা বলে, চণ্ডী, তুই গৃহপালিত হয়ে গেলি। পর হয়ে গেলি!

আমার লজ্জা হয় কিন্তু কী-ই বা করতে পারি আমি। বলি, সংসার এমনই বন্ধন!

মায়ার বাঁধন, তাই না?—বলে হো-হো করে হেসে স্বপনদা বলে, যেন তোর একার আছে। আমাদের কারুর নেই। তাই না? আমরা কেউ বউকে ভালবাসি না, তুই একা বাসিস।

ককটেল সসেজ চিবোতে চিবোতে স্বপনদা বলে, তুই একটা কাওয়ার্ড। তোর গাট্‌স্ নেই। না হলে—

না হলে, কী বলবে, তা আমাদের সকলের জানা। মদের আড্ডায় একই গল্প, একই রসিকতা বার বার করা যায়। সকলে মন দিয়ে শোনে, হাসার জায়গায় ঠিক হেসে ওঠে। কফি হাউস হলে সেটা চলত না। কেউ-না-কেউ টুকে দিত, এই নিয়ে একশো সাতাশ বার।

স্বপনদার দুটো থিয়োরি আছে। স্ত্রী-জাতিকে তাঁবে রাখার দুটি মোক্ষম যুক্তি। এক হল, আমার বয়েস তোমার চেয়ে বেশি, আমার হাইট বেশি, ওজন বেশি, আমার গায়ের জোরও তোমার চেয়ে বেশিই হবে। সুতরাং আমিই কর্তৃত্ব করব। উপার্জনের কথা তুললে শুনতে খারাপ লাগে। বুদ্ধির তারতম্য নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে, সে কথাও তুলছি না। স্ত্রী-জাতি, যে ছোট আর দুর্বল—তার কথা লোকে শুনবে কেন?

দ্বিতীয় যুক্তি হল, এখন গণতন্ত্রের যুগ, মেনে নিচ্ছি। সকল সাবালকের ভোটাধিকার আছে। প্রত্যেকের একটা করে ভোট। সংসারও তো একটা প্রতিষ্ঠান, একজন নেতা বা পরিচালক সেখানে দরকার। তার একটা অতিরিক্ত কাস্টিং ভোট থাকবে। গণতন্ত্রে তাকেই সেই অধিকার দেওয়া হয় যে কিনা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মেয়েরা আবেগতাড়িত জীব, এক-এক সময় এক-এক দিকে ওদের মন টলে যায়। সুতরাং দায়িত্ব নিয়ে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা, তাদের পুরুষদের চেয়ে কম। মেয়েদের ওপর দেশ চালানোর দায়িত্ব দিলে তার কী ফল হয়, আমরা ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে তা দেখেছি। থ্যাচারের রাজত্বে দেখেছি। ইন্দিরা, থ্যাচারের মতো কলিও পরমত অসহিষ্ণু, তর্কে হেরে গেলে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে। সংসারে এমন লোকের জায়গা দু'নম্বরে।

কলি হল স্বপনদার বউ, কৃষ্ণকলি। কলিদির ভীমামূর্তি আমি কখনও দেখিনি। অরুণ, তপেন, ওরা একাধিকবার মধ্যরাত্রে স্বপনদাকে বকুল বাগানের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে, কলিদি কখনও বেরোয়নি। এক বুড়ো চাকর দরজা খোলে। সে-ই হাত ধরে স্বপনদাকে ভেতরে নিয়ে যায়। মাটির মানুষ কলিদির বিরুদ্ধে ওদের কোনও অভিযোগ নেই। অন্য জায়গায় রাত কাটিয়ে স্বপনদাই বরং বাড়ি ঢোকার সময় হম্বিতম্বি করে। আমরা কখনওই যা পারি না।

আমরা বলি, তুমি হলে পুরুষসিংহ। চালিয়ে গেলে বেশ।

এখন আমি যেখানে থাকি, সেটা একটা ছোট শহর। কলকাতার তুলনায়। অলিম্পিয়ার মতো বার সেখানে নেই। ক্লাব একটা আছে, সেটাও খুব জনপ্রিয় নয়। লোকে কাজের কথা বলতে ক্লাবে যায়। বউকে দেখিয়ে কেউ কেউ অর্ডার জোগাড় করে। কলকাতা সে রকম নয়। কলকাতার একটা আলাদা কালচার আছে। বাবুরা সন্ধেবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে হারিয়ে যাও। গভীর রাত্রে তেহাইয়ের বোলের মতো বাড়ি ফিরে এসো। দেখবে, ঢাকা খাবার সামনে রেখে বউ জেগে বসে আছে। কিন্তু বাড়ির মধ্যে

বন্ধুবান্ধব নিয়ে হুল্লোড় করা চলবে না। অথচ আমি যেখানে থাকি, সেখানে লোকে আড্ডা দিতে বাড়িতেই আসে। আমার স্থানীয় বন্ধু জয়দীপ, শেখর, অর্জন দাস, সহকর্মী সুদীপ্ত, এরা ছুটিছাটার দিনে ফোন করে। কারুর বাড়িতে গিয়ে সপরিবারে বসা হয়। পানাহার হয়। ভিডিয়ো দেখা হয়। রাত দশটার মধ্যে যে-যার গাড়ি চালিয়ে বাড়ি। আমার বউ ওখানে গিয়ে দারুণ কেতাদুরস্ত হয়ে গেছে। ও বলে, এটাই নাকি সভ্যতা। অথচ আমার মনটা এখনও কলকাতা আর অলিম্পিয়ার জন্যে আনচান করে। আমার মন বলে, আড্ডা হবে মুক্ত, প্রাণখোলা। স্ট্যাগ। বউফউ থাকলে আড্ডা জমে না। কেবল মন রেখে কথা বলতে হয়। কারুর দিকে একটু বেশি মনোযোগ দিলে অমনি হিংসে। আর, ঘুরে ফিরে সেই অফিসের কথা এসে পড়বেই। অফিস নিয়ে কখনও গপ্পো হয়? বাংলার কোনও জাত সাহিত্যিক অফিস নিয়ে গল্প লেখে না। স্বপনদা বলে, ওটা কাজের জায়গা। কাজ না করলে নয়, তাই করি। স্বপনদা বলে, জমিদারির ইনকাম থাকলে আমি কি চাকরি করতাম? খুব ঠিক কথা। আমিও কি যেতাম কলকাতা ছেড়ে ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে?

এবার অনেক দিন পর কলকাতায় এসে আমার খুব ভাল লাগছে।

প্রথম চার-পাঁচ দিন শ্বশুড়বাড়ির যত্নআত্তি ভোগ করলাম। ওদের নিয়ে আসিনি কেন, তার কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল শাশুড়িকে, এই ক'দিনে সেই ঘাটতি পুষিয়ে দিলাম সুদে আসলে। একদিন নন্দনে সিনেমা দেখা হল। ছোট ছোট শালীদের নিয়ে তাজ বেঙ্গলে ডিনার খাওয়া হল একদিন। শাশুড়ি বললেন, এত খরচ করার কোনও মানে হয়? আমি বলি, টাকা কি সঙ্গে যাবে? তারপর বুড়োবুড়ি, মাসিপিসি, খুড়োজ্যাঠা যে-ক'জন এখনও বেঁচে আছেন টিমটিম করে, তাঁদের বাড়ি বাড়ি ভিজিট করে এলাম। ছেলেমেয়েরা কত বড় হয়েছে, তাঁরা জানতে চাইলেন। আমি হাত উঁচু করে দেখালাম। মাকে না বাবাকে, কাকে বেশি ভালবাসে, জানতে চাইলে, বললাম, মাকে। শুনে কেউ খুশি হলেন, কেউ হলেন না।

তারপর ঘোষণা করলাম, বাকি ক'টা দিন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঘুরব। রাত হবে। শাশুড়ি আমায় বাইরের দরজার একটা চাবি দিয়ে দিলেন, যাতে কাউকে না জাগিয়ে ঢুকে পড়তে পারি চুপি চুপি। শুয়ে পড়তে পারি নিজের বিছানায়। বিচক্ষণ মহিলা, কলকাতার কালচারে অভ্যস্ত। কোনওদিন জিজ্ঞেস করেন না, কাল কখন ফিরলে?

রাস্তা থেকে একটা মাত্র সিঁড়ি উঠে দরজা ঠেলতেই—আঃ অলিম্পিয়া—সেই চেনা গন্ধ। ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাই। যেমন আগে তাকাতাম, বন্ধুরা কে কোন টেবিলে বসে আছে দেখার জন্যে। সব অচেনা লোক। হঠাৎ উর্দি পরা এক বেয়ারা কাছে এসে সেলাম করল। সুলেমান না?

কী করে, আশ্চর্য, মনে পড়ে গেল ওর নামটা। হ্যাঁ, সুলেমানই তো। বললাম, ওরা কেউ আসেনি। আসে না?

ও আমাকে একটা বসার জায়গা করে দিল। আমার পছন্দের পানীয় কী, ওর মনে আছে দেখে আরও অবাক হয়ে যাই। তারপর এক প্লেট ককটেল সসেজ আনতে বলি। এই জিনিসটা আর কোথাও পাওয়া যায় না। ফারপোয় পাওয়া যেত। সে তো কবে উঠে গেছে। সেখানে মার্কেট হয়েছে এখন। সামনের কাউন্টারে সাজানো বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবি, আর সব টেবিলে চারজন করে লোক, আমার টেবিলে আমি একা।

একটু পরে অরুণ ঢুকল ঘামতে ঘামতে। আরে চণ্ডী, কতদিন পর? তপেন এল। যথারীতি তার হাতে এক ঢাউস ব্রিফকেস। দেখতে দেখতে জমে গেল আড্ডা। এই হয়।

একসময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, স্বপনদা আসবে না?

স্বপনদা?

ওদের একজন কবজি উলটে ঘড়ি দেখল, বলল, এসে পড়বে। যে-কোনও মোমেন্টে এসে পড়বে। স্বপনদাকে মনে আছে তোমার?

অন্যজন বলল, এখন প্রমোশন হয়েছে। দায়িত্ব বেড়েছে স্বপনদার। আর সে স্বপনদা নেই।

আমি বলি, তাই নাকি?

এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। এখন আর নিজে গাড়ি চালায় না। কোম্পানি ড্রাইভার। আমি আরও খুশি হই। ভালই হয়েছে। বিপদের ঝুঁকি কেটে গেছে। আমার কথা শুনে ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসে।

পর পর তিন দিন গেলাম অলিম্পিয়ায়। একদিনও স্বপনদা এল না। আমার কী রকম সন্দেহ হল। সুলেমানকে আড়ালে ডেকে বললাম, স্বপনবাবু, ওই যে রোগা মতন, চোখে চশমা, আজকাল আসে না?

ও বলল, বাবু তো অফ হয়ে গেছে।

চাকরিতে উন্নতি হলে অনেকে বদলে যায়, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখে না। এ রকম লোক আমি জীবনে ঢের দেখেছি। কিন্তু স্বপনদাকে সেই দলে ফেলতে মন চায় না। ও বরাবরের বোহেমিয়ান। বেপরোয়া। আমরা যা হতে পারিনি, ও মূর্তিমান তাই।

ফেরার দিন এগিয়ে আসছে। একদিন চলে গেলাম বকুলবাগানে।

প্রথমটা আমি চিনতে পারিনি। স্বপনদা কিন্তু আমার ঠিক চিনল।

আরে চণ্ডী! কোথায় ছিলি এতদিন? আয়, আয়।

মনটা ভরে গেল আমার।

আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়ি নয়। পুরনো ধরনের বাড়ি। দরজা দিয়ে ঢুকে খানিকটা উঠোন। উঠোন পেরিয়ে রক। রকের পর একটু উঠে সার সার ঘর। উঠোনের মাঝখানটায় একটা কি দুটো লম্বা গাছ। অল্প আলোয় মনে হল, নারকেল গাছ। কলিং বেল টিপতে হল না। খোলা দরজা দিয়ে স্বপনদা আমাকে আসতে দেখেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার গোঁফ কোথায় গেল?

ফেলে দিয়েছি। এত তাড়াতাড়ি পেকে গেল।

চেনাই যাচ্ছে না। আরও রোগা হয়েছ। কী ব্যাপার?

স্বপনদা বলল, তুই একটু মুটিয়েছিস চণ্ডী। সুখে আছিস।

পরনে গেঞ্জি, লুঙ্গি। স্বপনদা হাসল। আমি দেখলাম, ওর নীচের পাটির দুটো দাঁত নেই।

স্বপনদা বলল, সুগার বেড়ে গিয়ে চুল পেকে যাচ্ছে, দাঁত পড়ে যাচ্ছে।

অফিসে কি খুব কাজের চাপ? টেনশন?

আরে না, না—স্বপনদা আগের মতো হাসতে হাসতে বলল, অফিসকে কবে আমি পাত্তা দিয়েছি? বয়েস হচ্ছে না? কবে এসেছিস কলকাতায়? কতদিন আছিস? একা, না সপরিবার?

আমি সব বললাম। তারপর জানতে চাইলাম, ঠিকমতো চিকিৎসা করাচ্ছ তো।

বলতে বলতে কলিদি, কৃষ্ণকলি, ঢুকল ঘরে। আগে কখনও দেখিনি। বেশ ভারিক্কি চেহারা। মেমসাহেবদের মতো ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল। গায়ে হাতকাটা জামা। স্বপনদা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, চণ্ডী। আমার অনেক দিনের বন্ধু। বন্ধু না বলে ভক্ত বলাই উচিত। কী বল।

অলিম্পিয়ার?

ওই আর কী।

কলিদির হাতে গরম পানীয়। কাপটা টেবিলের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে কমপ্লান দিই।

কমপ্লান। এবার আমারই হাসি পায়, সন্ধেবেলা কমপ্লান? তুমি কি—

হ্যাঁ মশায়। এ ছাড়া আর উপায় কী। ওটা চিনি ছাড়া। আপনাকে চিনি দিয়েই দিচ্ছি। খুব পুষ্টিকর। অলিম্পিয়ার ছাইপাঁশ খেয়ে আপনার দাদার নার্ভটা তো গেছে।

আমি স্বপনদার দিকে তাকাই।

একদিন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তখন ধরা পড়ল ডায়বিটিস। এত অনিয়ম করলে হবে না? নিজের শরীরের দিকে কখনও নজর দিয়েছেন? শুধু আড্ডা আর বন্ধুবান্ধব! আমি বলি, বন্ধুবান্ধব কি তোমায় চিরকাল দেখবে? তিন মাস বিছানায় শোওয়া। আলসার তো ছিলই, তা থেকে ভলভল করে রক্ত! আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। কাকে বলি, কোথায় যাই—

ভাগ্যিস আমার ছোটভাই পাশে থাকে—

কলিদি অমনি ফুঁসে উঠল, রাখো তোমার ছোটভাই। সে তো কিছুই বোঝে না। হাঁদা গঙ্গারাম! বলে, বউদি, ডাক্তার ঘোষকে খবর দিই? অ্যাম্বুলেন্স ডাকি? যদি রক্ত দিতে হয়, কোথায় পাব রক্ত। এইসব। আমি না থাকলে বেডপ্যান দেওয়া থেকে শুরু করে—

স্বপনদা বলে, সত্যি, কলি না থাকলে আমি মরে যেতাম।

এই অবধি শুনে, সন্তুষ্ট হয়ে, কলিদি ভেতরে চলে গেল। আমার জন্য এক কাপ গরম গরম কমপ্লান

নিয়ে এল। আর প্লেটে করে সন্দেশ। ফ্রিজ থেকে বার করা সন্দেশ, ঠান্ডা।

গরম কমপ্লান আর ঠান্ডা সন্দেশ খেতে খেতে আমি জিজ্ঞেস করি, এখন ভাল আছ তো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন একদম ফিট। সবকিছু আন্ডার কন্ট্রোল। নর্মাল ডায়েট।

কলিদির দিকে তাকিয়ে স্বপনদা বলে, এখন বিপদ কেটে গেছে।

কলিদি যোগ করে, সকালে চা বিস্কুট।

চা বিস্কুট।

আর একটু ফল।

ওই একটু ফল। যখন যা পাওয়া যায়।

সকালে মাছের ঝোল, ভাত খাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে দিই। রাত্তিরে দুখানা রুটি, স্টু।

স্বপনদা তোতাপাখির মতো পুনরুক্তি করে, একটু স্টু, মুরগির। কোনও মশলা না।

কলিদি বলে, গরমকালে ওঁকে দার্জিলিংয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওঃ যা ভিতু না—পাহাড়ে উঠতে—

খুব ভিতু হয়ে গেছি রে চণ্ডী। পাহাড়ে উঠতে খুব ভয় করে। মনে হয়, এই বুঝি পড়ে যাব। হাঁপ ধরে যায় একটুতেই।

খালি আমার হাত ধরে থাকবেন।

বলতে গিয়ে কলিদি হেসে ফেলল।

ওর হাত ধরে থাকি। কী করব।

কলিদি বলে, আমি বলি, যদি আগে মরি, তোমার যে কী হবে।

স্বপনদা বলে, সত্যি, তার চেয়ে আমিই আগে মরব।

এতদিন একা স্বপনদার সঙ্গে পরিচয় ছিল। সেটা অন্য রকম। বাড়িতে এসে ঘরোয়া আলাপ চলল অনেকক্ষণ। একসময় কলিদি বলে, আমায় একটু বেরোতে হবে। আপনারা গল্প করুন, কেমন। ড্রাইভারকে থাকতে বলেছ তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ। ও আছে। তুমি যাও না কোথায় যাবে।

চুল দুলিয়ে কলিদি চলে যাবার পর ঘরটা থমথমে হয়ে যায়। আমি স্বপনদার মুখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ।

তারপর বলি, ব্যাপারটা কী? মালফাল খাওয়া কি একেবারে বন্ধ?

স্বপনদা অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, না, না, একেবারে বন্ধ না। খাই, মাঝে মাঝে খাই। ওকে লুকিয়ে। অফিস থেকে ফেরার পথে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে এক পেগ-দু'পেগ মেরে আসি। তাতেও কি শান্তি আছে। সন্দেহ হলেই মুখ শোঁকে কলি।

বলতে বলতে করুণভাবে হাসে স্বপনদা। আবার সেই নীচের পাটির ফাঁকটা দেখা যায়।

অলিম্পিয়ায় গিয়েছিলি?

হ্যাঁ।

দেখা হল?

হল। ওরা কিন্তু তোমার কথা কিছু বলল না। স্বপনদা—

বলতে গিয়েও মুখ দিয়ে কথাটা বার করতে পারিনি। যে, তুমি আমাদের হিরো ছিলে। পুরুষসিংহ। এ তোমার কী হাল হয়েছে?

আমার মনের ভেতরকার ধন্দ বুঝতে পারল স্বপনদা।

বলল, দাম্পত্য জীবনের কিছু বুঝিস চণ্ডী? তুই তো বিয়েথা করেছিস, খুঁটিয়ে দেখেছিস কখনও, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কী? এই পৃথিবীতে আমরা দু'জন দু'জন করে ভূমিষ্ঠ হলাম, তাই তো বলবি? যেমন কাপ আর প্লেট। যেমন বোতল আর ছিপি। যেমন একজোড়া জুতো। মেড ফর ইচ আদার। বুলশিট। আমার কাছে জেনে যা চণ্ডী, এ এক নিরন্তর যুদ্ধ। দু'জন ঘনিষ্ঠতম মানুষের মধ্যে প্রাধান্য পাবার আজীবন লড়াই। এতদিন আমি ডমিনেট করে এসেছি, ও মাথা তুলতে পারেনি। যেই না আমি পড়ে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে ও, কৃষ্ণকলি, যে এতকাল তক্কে তক্কে ছিল, খপ করে ধরে ফেলেছে আমাকে। এখন ও বস্। আমার আর কিছু করার নেই।

তুমি তো ফোঁস করতে পারো। আমি পরামর্শ দেবার চেষ্টা করি, হাজার হোক, তোমার বয়েস বেশি,

তোমার ওজন বেশি, তুমি হাইটে কলিদির চেয়ে অন্তত দশ ইঞ্চি এগিয়ে আছ। তুমি উপার্জন করো। সে-কথা না হয় নাই তুললাম।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল স্বপনদা। বলল—

নাঃ, এখন আর চটানো ঠিক হবে না, চণ্ডী। তুই বুঝবি না। এখন আমায় বন্ধুত্ব করে চলতে হবে। আমি পাকে পড়েছি। ডায়াবিটিস, আলসার, নার্ভ। এর কোনওটাই সারবে না।... বিছানায় শুয়ে পড়লে বেডপ্যান দেবে কে? পক্ষাঘাত হলে কে উলটিয়ে পালটিয়ে মালিশ করবে রোজ? টাকা চাইবে না। ভালবেসে যে সেবা করবে, সে ওই বউ। তাকে গুড হিউমারে না রাখলে, তাকে পাওয়ার না দিলে, সে করবে কেন? নেলসন ম্যান্ডেলার মতো কলিও সাতাশ বছর জেল খেটেছে। এখন ও প্রেসিডেন্ট।

স্বপনদা বেশিদিন বাঁচবে না। এই দুঃখ নিয়ে ফিরে এলাম।

১৯৯৪

দুই সতিন

তপন আর তার বউ রীতা এবার এক ফন্দি এঁটেছে। ফন্দি বলা হয়তো ঠিক না। ওরা প্ল্যান করেছে, একদিন সুবিধেমতো দুই দিদিমাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনে খাওয়াবে। দুই দিদিমাই তপনের, তবে এ ব্যাপারে রীতার আগ্রহই বেশি। মেয়ে কিনা!

যোধপুর পার্কে থাকে রুনুমাসি। একদিন দুটিতে সেখানে গিয়ে হাজির। বলে, 'দিদাকে দেখছি না?'

রুনুমাসি বিধবা। পোস্ট অফিসে কাজ করে। একটি মেয়ে তার, অনেকদিন বিয়ে হয়ে গেছে। মাকে নিজের কাছে এনে রেখেছে স্থায়ীভাবে। এই বয়সে কোথায় জব্বলপুর, কোথায় ভদ্রাচলম, কোথায় মোদিনগর, ঘুরে ঘুরে মেয়েদের বাড়ি থাকা আর সম্ভব নয় নিভাননীর পক্ষে। তিরাশি বছর বয়সে যে হাত-পা চলছে—এই না কত ভাগ্য। আর, বছরে একবার কি দু'বছরে একবার মেয়েরা তো কলকাতায় আসেই, তখন মায়ের কাছে থেকে যায়। মায়ের নামে মানিঅর্ডার পাঠায় মাসে মাসে। যার যেমন সাধ্য।

রুণুমাসি বলে, 'বসো তোমরা। মা ঠাকুরঘরে। এবার বেরোবার সময় হয়েছে।'

অনেকদিন পরে যোধপুর পার্কের বাড়িতে এল তপন। আসা হয়ে ওঠে না। একটা-না-একটা ঝামেলা রোজ লেগেই থাকে। ওর মা, অর্থাৎ নিভাননীর বড় মেয়ে টুনু যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন মাকে নিয়ে সি আই টি রোড থেকে মাসে একবার অন্তত আসত। অন্য মাসিরা কলকাতায় এলে আরও ঘন ঘন আসত।

রুণুমাসি জিজ্ঞেস করে, 'তোদের খবর ভাল?'

'হ্যাঁ।'

'মা প্রায়ই গজগজ করে, তপুটা আজকাল আর আসে না। আবার বলে, না আসুক, যে যেখানে আছে ভাল থাকুক, আমি তাতেই খুশি।'

রীতা চুপ করে ছিল প্রথমটা। এবার বলল, 'দিদাকে একদিন আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। সারাদিন থাকবেন, বিকেলবেলা ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

'এত ধকল সইবে?' পুজোর ঘর থেকে বেরোলে পর রুণুমাসি জানতে চায়।

শিশুর মতো দন্তহীন মুখে হাসি ফোটে নিভাননীর। বলেন, 'ধকল কোথায়? গাড়ি করে যাওয়া, গাড়ি করে ফেরা। ট্রাম-বাসে তো চড়তে হচ্ছে না।'

'চোখে ভাল দেখতে পাও না, তাই বলছিলাম।'

রুণুমাসি দেখে, বুড়ির ইচ্ছে আছে খুব। নাতির বাড়ি যাবে যাক, তাতে বাধা দেবার কী আছে? দিনে দিনে ফিরে আসবে তো।

শুকনো ছোটখাটো শরীর নিভাননীর। কপালে, চোখের নীচে, গলায়, গভীর বলিরেখা। মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল, সব কিন্তু পাকেনি। একটাও দাঁত না থাকায় ঠোঁট দুটো মুখের ভেতরে ঢোকানো। যৌবনকালে দিদা কেমন দেখতে ছিল, এখনকার চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই, তবে গায়ের রং নেহাত ময়লা ছিল না।

'কবে যাওয়া?' নিভাননী জিজ্ঞেস করেন।

'সামনের রোববার, চোদ্দোই জুলাই। অসুবিধে নেই তো দিদা?'

নিভাননী শিশুর মতো ফোকলা মুখে হাসেন।

"বিছানায় শুয়ে না থাকি তো নিশ্চয় যাব। তা উপলক্ষটা কী? বাবাজির বিয়ের দিন নাকি?"

স্বামী-স্ত্রী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। না এখন বলা নয়। সেদিন নিয়ে গিয়ে অবাক করে দেবে। তা ছাড়া, সে-দিনই যে দাদুর একশোতম জন্মদিন, তপনের সে-অনুমান ভুলও হতে পারে। ওর ছোটবেলায় মায়ের কাছে শোনা একটা গল্প: আহিরিটোলায় মামার বাড়িতে সুরেন্দ্রলাল ঘোষ যে-দিন জন্মগ্রহণ করেন, সে-দিন কলকাতায় ভূমিকম্প হয়েছিল, ওর অনুমানের এই ভিত্তি যদি গালগল্প হয়!

বাবুলমামা থাকে স্কট লেনে। রুণুমাসির চেয়ে চার মাসের ছোট বাবুলমামা বেশ অবস্থাপন্ন। হাইকোর্টে ওকালতি করে। ছোটদিদা বাবুলমামার কাছে থাকে। ছোটদিদার প্রথম দুই মেয়ে মিতুমাসি আর গীতুমাসির শ্বশুরবাড়িও তপনের অন্য মাসিদের মতো কলকাতা থেকে দূরে। বাবুলমামার চেয়ে দশ বছরের ছোট আর এক মামা ছিল, তার নাম হাবুল। ছোটদিদার বেশি বয়সের সন্তান। সে টাইফয়েড রোগে মারা যায় ন'বছর বয়সে। তখন তো আজকালকার মতো অব্যর্থ ওষুধ বেরোয়নি।

নামেই ছোটদিদা। ননীবালার বয়স বিরাশি। তবু নিভাননীকে দিদি বলে ডাকেন। এক বছরের বড় হলেও বড়। তা ছাড়া, ননীবালা নিভাননীর তিন বছর পর শ্বশুরবাড়ি এসেছেন। খানিকটা নিজের স্বার্থে খানিকটা অরক্ষণীয়া কন্যাকে উদ্ধার করার জন্য সুরেন্দ্রলাল ননীবালাকে বধূরূপে যখন বরণ করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ, ননীবালার বয়স ষোলো।

পরনে পাটভাঙা ধবধবে সাদা থান। একমাথা ধবধবে সাদা চুল, বাঁধানো দাঁত, টকটকে ফরসা রং, ননীবালা পা ছড়িয়ে বসে নাতনিকে নামতা শেখাচ্ছিলেন। দেখে রীতা ফিসফিস করে তপনকে বলে, 'তোমার দাদুর নজর ছিল জহুরির মতো। একটি বউ থাকা সত্ত্বেও এই রকম সুন্দরী পাত্রী দেখে আর লোভ সামলাতে পারেননি। কন্যাদায় উদ্ধারের ব্যাপারটা গুল।'

তপন বলে, 'বড়লোকের মা। এই বয়সেও টসকায়নি।'

ননীবালা জিজ্ঞেস করেন, 'কোথায় থাকিস তুই তপু, সি আই টি রোড? সেটা আবার কোথায়? কলকাতার রাস্তাঘাট আমি কিছুই চিনি না বাপু।'

'তোমাকে চিনতে হবে না মা। বাবুলমামা বলে, 'ভেবে দেখো, সেদিন তোমার কোনও উপোসটুপোস নেই তো?'

ছোটদিদা ভেবে দেখছেন। তাঁর পাকা পেঁপের মতো সুন্দর মুখখানা একটু ওপরের দিকে তুলে। তপন বলল, 'যোধপুর পার্ক থেকে দিদা তো আসছে।'

'তাই তো। তা হলে আমি যাব। কতদিন দিদির সঙ্গে দেখা হয় না।' ননীবালা হাসতে হাসতে বললেন, 'শুধু দুই বুড়ির জন্যে এই নেমন্তন্ন? আর কেউ নেই?'

'না।' দাদুর একশোতম জন্মদিনের কথা বাবুলমামারও খেয়াল হয়নি, লক্ষ করে তপন।

অধিক অগ্রসর হওয়ার আগে একটু অতীত কাহিনী সংক্ষেপে ভেঁজে নেওয়া দরকার।

সুরেন্দ্রলাল ঘোষ কলকাতায় জন্মেছিলেন। কলকাতায় পড়াশোনা করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় অল্পবিস্তর মাতামাতি করার পর আইনবিদ্যা শিখে বর্ধমান রাজ এস্টেটে চাকরি পান। কিছুকাল চাকরি করার পর বর্ধমানেই ওকালতি শুরু করেন।

একুশ বছর বয়সে সুরেন্দ্রলালের বিবাহ হয় তেরো বছর বয়স্কা পাত্রীর সঙ্গে।

পাত্রীটি যথেষ্ট যৌতুক এবং চন্দ্রদ্বীপ গ্রাম থেকে দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া ব্যাধি বহন করে স্বামীর ঘর করতে আসে এবং দু'বছর যেতে-না-যেতে মারা যায়। প্রথম পত্নীর শোক ভুলতে সুরেন্দ্রলালের আড়াই

বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পত্নী যখন সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে একুশ বছর বয়সে সন্তানসহ স্বর্গ লাভ করে, তারপর এক বছরের মধ্যে মাতুলকুলের প্ররোচনায় তিনি তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। সেই পত্নী নিভাননী। নিভাননী তিন বছর দাম্পত্য জীবনের পরও সন্তান সম্ভাবনা প্রদর্শন করতে না পারায়, আবার মাতুলালয়ের প্ররোচনায়, তাঁকে বন্ধ্যা অনুমানে পিতৃগৃহে স্থানান্তরিত করা হয়। মরিচকাটা গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থকন্যা ননীবালার পাণি গ্রহণের সংবাদ পেয়ে ক্ষুব্ধ নিভাননীর পিতা কাঁকুড়হাটি থেকে সোজা গোরুর গাড়ি চেপে বর্ধমানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ঢের কান্নাকাটি, কলহ-বিবাদের পর কন্যাকে স্বামীগৃহে রেখে ফিরে যান। তখন থেকে নিভাননী ও ননীবালা একত্রে স্বামীসেবা করেছেন তিরিশ বছর। সম্ভবত ননীবালার আগমনের ফলে নিভাননীর গর্ভ উর্বর হয়েছিল। উভয়ে মিলে সুরেন্দ্রলালকে সাত কন্যা ও দুই পুত্র উপহার দেন, তার মধ্যে পাঁচ কন্যা নিভাননীর, দুই কন্যা দুই পুত্র ননীবালার। সর্বজ্যেষ্ঠা টুনু নিভাননীর কন্যা, তপনের মা। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে সুরেন্দ্রলাল ঘোষ যখন দেহরক্ষা করলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ কন্যাদায় মুক্ত, সর্বস্বান্ত। সে আজ পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। দাদুর মৃত্যুর সময় তপন ছিল মাতৃগর্ভে। কেউ কেউ বলে, দাদুই নাকি তপন হয়ে ফিরে এসেছেন।

তপনের এ-জন্মের বউ রীতা তপনের আগের জন্মের দুই বউয়ের জন্য সেই ভোরবেলা উঠে অনেক কিছু রান্না করল। বুড়ো মানুষ, গুরুপাক কিছু পরিবেশন করা চলবে না। আবার ট্যালটেলে ঝোলচচ্চড়ি খাওয়ালে মনে দুঃখ পাবেন, ভাববেন অচ্ছেদ্দা করছে। নিরামিষ রান্না, তায় বর্ষাকাল, অনেক তরিতরকারি এখন পাওয়া যায় না। প্রথম পাতে কুমড়ো ফুলের বড়া, মুসুর ডালের বড়ি দিয়ে মোচার ঘণ্ট। ছানার ডালনার পর চালতার অম্বল। শোনা যায়, লাল দইয়ের মধ্যে নানা রকম ভেজাল থাকে, তাই শেয়ালদা থেকে সাদা মিষ্টি দই নিয়ে এসেছে তপন। আর স্পঞ্জ রসগোল্লা। খাঁটি ঘি দিয়ে ঝরঝরে গোবিন্দভোগ চালের ভাত মেখে টিপে টিপে খুব তৃপ্তি করে মধ্যাহ্ন ভোজন সারলেন প্রায় সমবয়সি দুই বৃদ্ধা, দুই সতিন। তপন খেতে বসল ওঁদের সঙ্গে, রীতা পরিবেশন করল। আজ সকলেরই নিরামিষ আহার। নিরামিষ খাদ্য নিয়মিত খেলে শরীর থেকে হিংসে ঝরে যায়, প্রাণীহত্যা করে বেঁচে থাকার সত্যি কোনও মানে হয় না, তপনের মনে হল একবার। এই যে দুই দিদা আজ পঁয়ত্রিশ বছর নিরামিষ খাচ্ছেন, তাতে তাঁদের আয়ু বেড়েছে বই কমেনি।

তপন বলে, 'দাদু বেঁচে থাকলে আজ তাঁর একশো বছর বয়স হত।'

'তা হত। সে কি আজকের কথা।' নিভাননী চালতা চুষতে চুষতে বললেন, 'উনি চালতার অম্বল খুব ভালবাসতেন।'

'না দিদি। উনি ছানার ডালনা বেশি ভালবাসতেন।'

'দুটো দু'রকম জিনিস। উনি ছানার ডালনা আর চালতার অম্বল দুই-ই খুব তৃপ্তি করে খেতেন। মনে আছে একবার—'

কথা কেড়ে নিয়ে ননীবালা বলেন, 'তা যদি বলো দিদি, তা হলে বলি, আমার স্পষ্ট মনে আছে, একবার চালতার অম্বলের বাটিতে মুখ দিয়েই উনি থুথু করে ফেলে দিয়েছিলেন।'

নিভাননী আড়চোখে তাকালেন সতিনের দিকে। সতিন তখন চোখ বুজে রসগোল্লায় কামড় দিয়েছে।

বললেন, 'সেদিন বোধহয় তুমি রান্না করেছিলে। তোমার রান্না একদম মুখে তুলতে পারতেন না। বলতেন, বড়লোকের মেয়ে, বাপ-মা সহবত বলতে কিছু শেখায়নি।'

'আমাকে বলতেন, বড় বউ নিজের মনে আছে, থাক। দু'বেলা হেঁসেল ঠেলছে। তোমার সুখে তো ভাগ বসাচ্ছে না।'

'তা ঠিক, তোমার সুখে আমি ভাগ বসাইনি কোনওদিন। তুমি ছেলেপুলে ভালবাসতে, তাই নিয়ে থেকেছ। কাঁথাকানি ঘাঁটা আমার ধাতে সইত না।'

ননীবালা এবার দু'পাটি বাঁধানো দাঁত খুলে থালার ওপর রাখলেন। পাকা পেঁপের মতো সুন্দর মুখখানা সতিনের দিকে ঘুরিয়ে বললেন, 'তুমি সব ভুলে গেছ দিদি। বাবু খেতে বসলে আমি বরাবর পাখার বাতাস করেছি, মনে পড়ে?'

'পাখার বাতাস করেছ আর আমার নামে চুকলি কেটেছ। মনে নেই আবার! ছিঃ ছিঃ কী আদেখলেপনা! উনি সব বুঝতেন, কিছু বলতেন না।'

'আদেখলেপনা আমার না তোমার? শোবার ঘর থেকে 'ননী তামাক দিয়ে যাও' বলে ডাকলে তুমি ছুটে যেতে না? ননী মানে আমি, ননীবালা।'

'ননী মানে আমি, নিভাননী।'

'আমার ননী আগে, তোমার ননী শেষে। ননী ডাকলে ননীবালা বোঝায়, নিভাননী বোঝায় না। বিশ্বাস না হয়, তপুকে জিজ্ঞেস করো।'

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রীতা মিটিমিটি হাসছিল। তপন, পূর্বজন্মের পত্নী দুই বুড়ির দিকে একবার তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, 'দু'রকমই হয়। আমার মনে হয়, দাদু দু'জনকেই সমান ভালবাসতেন। এক ডাকে দু'জনকেই বোঝাত। যে এসে যায়। কারুর মনেই কষ্ট দিতে চাইতেন না।'

'তা অবশ্য ঠিক। দেবতুল্য মানুষ ছিলেন তোমাদের দাদু।'

নিভাননী এবার ঠান্ডা হবার চেষ্টা করেন।

'তবে—'

'তবে কী দিদা?'

'আমি বাপের বাড়ি গেছি। সেই ফাঁকে আর একটা বিয়ে করে ফেলা তাঁর উচিত হয়নি।

অভিমানে যে-কথা স্বামীকে বলতে পারেননি, এতদিন পর সেই কথা স্বামীর প্রতিনিধি তপনকে শুনিয়ে দিলেন।

মুখ ধুয়ে কুলকুচো সেরে আবার দু'পাটি দাঁত ততক্ষণে পরে ফেলেছেন ননীবালা। দিদির মন্তব্য শুনলেন।

ঢেকুর তুলে বললেন, 'যে-মানুষটা স্বর্গে গেছে, তার নামে কেচ্ছা রটিয়ো না দিদি। এরা আমাদের বংশধর। সত্যি ঘটনা কী, এদের জেনে রাখা দরকার।'

'কী সত্যি ঘটনা, তোমার কাছে শুনি ছোটদিদা।' পেছন থেকে রীতা বলে।

'মেয়েমানুষ, তুমি বুঝবে। তেরো বছর বয়সে দিদির বিয়ে হয়েছে, তখন তোমাদের দাদুর বয়স একতিরিশ। ভোগী পুরুষ ছিলেন তিনি। এদিকে স্বামীর সঙ্গে শুতে দিদির কষ্ট হয়। তখন ঠিক করলেন, বাপের বাড়ি গিয়ে দিদি বড় হয়ে আসুক। বছরের পর বছর কেটে যায়, বউ আর শ্বশুরবাড়ি আসে না, সমর্থ পুরুষমানুষ তখন কী করবেন? এখনকার মতো কড়া আইন তো তখন ছিল না। কী বলো দিদি, ঠিক বলিনি?

নিভাননী চুপ করে থাকেন।

ননীবালা বলেন, "আমি এসে এই খবর শুনে বললাম, ছি ছি। এ অন্যায়। দিদিকে নিয়ে এসো। আমরা দু'জনে মিলেমিশে সংসার করব।"

নিভাননী এবারও চুপ করে রইলেন। কেবল তাঁর মুখের ভেতর ঢোকানো ঠোঁট দুটো বলিরেখার ওপর কাঁপতে দেখল তপন। সম্ভবত ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে। যেভাবে চিরকাল ইতিহাস বিকৃত হয়ে থাকে। নিজের দিদার প্রতি সহানুভূতি বোধ করে সে। ভাবে ও যদি দাদু হত, তা হলে ননীবালার চেয়ে নিভাননীকে বেশি ভালবাসত। যদিও ননীবালা ঢের বেশি সুন্দরী।

দুপুরে জোড়াখাটের বিছানায় জম্পেশ করে বসে তাসখেলা চলছে। টোয়েন্টি নাইন। তপন আর রীতা একদিকে। দিদার খেড়ি ছোটদিদা। বহুকাল আগে বর্ধমানের বাড়িতে এই খেলা হত। খেলতে খেলতে কত ঝগড়া কথা কাটাকাটি হয়েছে, ক্রমে ক্রমে মনে পড়ে যায় দুই বুড়ির। মূলত মেয়েদের খেলা টোয়েন্টি নাইন, তবে উৎসাহী দেওর গোছের কেউ থাকলে যোগ দিতে পারত দুই বউদি আর দাদার সঙ্গে। আজ নাতি আছে একজন।

দিদারা জিতছে, একটা লাল ছক্কা বেরিয়ে গেছে ওদের। জমে উঠেছে খেলা। কে বলে, বুড়িদের চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ। এখন তো বেশ জ্বলজ্বল করছে। রীতা হঠাৎ লক্ষ করে, হাতের তাস সাজাতে সাজাতে ছোটদিদা জিভ কাটল। হরতন রং করল দিদা। তারপর দু'জনে মিলে সব পিট তুলে নিয়ে গেল। আর একবার হাতের তাস সাজাতে সাজাতে দিদা কান চুলকোয়। ছোটদিদা চিড়িতন রং করে টেক্কার পিটে গোলাম মারল।

'জোচ্চুরি হচ্ছে।' চেঁচিয়ে ওঠে তপন।

ধরা পড়ে গিয়ে হেসে ওঠে দুই বুড়ি। একজনের মুখে একটিও দাঁত নেই, আর একজনের মুখে বাঁধানো দাঁতের পাটি। একজনের মাথায় কদম ফুলের ছাঁট, অন্যজনের মাথা সাদা শনের নুড়ি।

নিভাননী বলেন, 'এতক্ষণ ধরতে পারিসনি, তোরা কী বোকা রে!'

ননীবালা বলেন, 'বলে দিলে কেন দিদি? দেখতাম কী করে জোচ্চুরি ধরে তপু।'

ননীবালা বলেন, 'মনে পড়ে দিদি, একবার দেশ থেকে তোমার ভাই এসেছিল বর্ধমানে। এই রকম তাস খেলা হচ্ছে বিছানায় বসে। আমরা দু'জন ছিলাম খেড়ি। শালা ভগ্নীপতিকে গোহারান হারালাম।'

'তখন রুণু আমার পেটে।'

'আমার পেটে বাবুল। কী ভীষণ অরুচি!'

'কী করে এমন হয়?' রীতা হঠাৎ বলে ওঠে।

ননীবালা বলেন, 'হয় হয়, ভালবাসা থাকলে অনেক কিছু হয়। তুমি আমাকে ঝাল ঝাল তেঁতুলের আচার বানিয়ে দিতে। নিজের তো হাঁসফাঁস অবস্থা, গ্রাহ্য নেই। মনে পড়ে?'

'একদিন আমাদের তাসের জোচ্চুরি ধরে ফেললেন। রেগেমেগে উঠে গেলেন। মনে পড়ে?'

কথায় কথায় বেলা পড়ে গেল। চায়ের সময় হয়েছে। রীতা উঠে গেল রান্নাঘরে।

ননীবালা ফিসফিস করে বললেন, 'তপুর গলার স্বর অনেকটা বাবুর মতো, তাই না?'

'আমি অবশ্য আগেই লক্ষ করেছি', নিভাননী বলেন, 'ওর বউয়ের সামনে বলতে লজ্জা করছিল। কী মনে করবে!'

তপন বলে, 'বেঁচে থাকলে আজ দাদুর বয়েস একশো বছর পূর্ণ হত।'

এই কথা শুনে দুই বুড়ি একসঙ্গে বলে ওঠে, 'তোর দাদু বেঁচে আছেন। এইখানেই আছেন।'

১৯৮৫

নন্দনতত্ত্ব

এক-এক সময় শর্মিলার মনে হয় গৃহবধূ কি চাকরিজীবী, গরিব কি বড়লোক, স্বাধীন কি পরাধীন, এগুলো খুব বড় ব্যাপার নয়। বাঙালি মেয়েরা অন্যভাবে দু'ভাগে বিভক্ত। এক, যাদের বাপের বাড়ি দক্ষিণ কলকাতায় আছে, আর দুই, যাদের বাপের বাড়ি দক্ষিণ কলকাতায় নেই। শর্মিলা প্রথম দলে।

বাপের বাড়িতে বসবাস করার জন্যে মেয়েরা জন্মায় না। ওটা হল বছর কয়েক হেসেখেলে কাটিয়ে দেবার জায়গা। তারপর কে কোথায় ছিটকে যায়, কেউ জানে না। স্কুলের বাসে, কলেজে ক্লাসে যারা ছিল প্রাণের বন্ধু, যাদের সঙ্গে ছিল অবিচ্ছেদ্য গলাগলি, গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাদের সঙ্গে মনের কথা বলা ফুরোতেই চাইত না, এক টুসকিতে তারা কেউ হাতিবাগানে, কেউ চা-বাগানে, কেউ টাটানগরে কেউ বাটানগরে, কেউ কানপুরে কেউ কানাডায় ক্যারামের ঘুঁটির মতো ছড়িয়ে গেল। সাদায়-কালোয় ছত্রখান।

বাপের বাড়ি হল ক্যারমের ওই লাল ঘুঁটিটার মতো। যে যেখানেই থাক, একবার-না-একবার এসে লাল ঘুঁটিটাকে ঘিরে দাঁড়াবে। দক্ষিণ কলকাতার পথে-ঘাটে, দোকানে-বাজারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে চৈতালি কি মঞ্জুলার সঙ্গে।

'আরে, তুই এখানে?'

'তোর সঙ্গে আবার কখনও দেখা হবে ভাবিনি। বিশ্বাস কর।'

'শুনেছিলাম, তোর ঔরঙ্গাবাদে বিয়ে হয়েছে। বর কী করে?'

'মোটা হয়েছিস। সুন্দর হয়েছিস। বালবাচ্চা ক'টি?'

প্রসঙ্গটা বর থেকে বালবাচ্চায় উপনীত হয়।

মনের কথা তখনও ফুরোতে চায় না। 'আমার বর টাইট গেঞ্জি একদম পরতে পারে না।'

'আমার বর এত জোরে গাড়ি চালায় না—আমার ভয় করে।'

'আমার বুবুন যা দুরন্ত, এক মিনিট যদি স্থির থাকতে দেবে!'

'আমার শাশুড়ি মা বলেন, তোমরা নিজেরা সুখে থাকো, তা হলেই হল, ওই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে গিয়ে আমার কাজ নেই।'

এই সব।

সবই এক পক্ষের কথা। অপর পক্ষের সে-কথা শোনার কোনও আগ্রহ নেই। তাই ক্লান্তি আসে একসময়। বোঝা যায়, সখ্যের সুতোটা ছিঁড়ে গেছে। সুতরাং সংলাপ গিয়ে এক জায়গায় শেষ হয়।

'বাপের বাড়ি এসেছি। পুজো অবধি থাকব। একদিন আসিস।'

অন্য এক কারণেও শর্মিলা নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে। প্রথমে ও মাকে সে-কথা বলেনি।

এমন একটা ভাব দেখিয়েছে, যেন কতদিন বিশ্রাম পায়নি, একটা গোটা সংসারের সব রকম ঝক্কি ওকে পোহাতে হয়েছে একা। এখন খানিক ঘুমিয়ে বাঁচছে। বীথিকাও ভেবেছেন, বিয়ের আগে কোনওদিন কুটোটাও নাড়েনি যে-মেয়ে, যাকে ভাতের ফ্যান গালতে কি রুটি বেলতে শেখানো হয়নি এ-বাড়িতে, যে মাছ কুটতে জানত না, সে কী করে সংসার—তা যত ছোটই হোক, সামলাবে। গোরকপুরে কাজের লোক নিশ্চয় পাওয়া যায়, আছেও; কিন্তু তাকে তো শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। তার কাজের তত্ত্বাবধান করতে হবে। জামাইয়ের অনুপস্থিতিতে নজর রাখতে হবে না সবদিকে!

শর্মিলা বরাবর পড়াশোনা নিয়ে থেকেছে, দিদির মতো সে তত চৌকশ না। পল-সায়েন্স পড়তে গিয়ে যা মুখস্থ করেছিল, তার কিছুই তো কাজে লাগল না।

একদিন ও ধরা পড়ে গেল।

'কী রে? লক্ষণ ভাল ঠেকছে না। আটকে গেছে নাকি?'

বীথিকা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর ওর গায়ের কাপড় তুলে দেখলেন। 'তা বলবি তো?'

শর্মিলা বলে, 'লজ্জা করছিল। বাবাকে কিছু বোলো না এখন। আমি চলে যাই।'

বীথিকা গজগজ করেন, 'কী ফ্যামিলি প্ল্যানিং করো তোমরা, বুঝি না। প্রথম পাঁচটা বছর সাবধানে থাকতে পারলে না?'

'ও এমন করে না! দেখে কষ্ট হয়।'

'আজকাল তো কত রকম বেরিয়েছে।'

বলতে গিয়ে কথা আটকে গেল গলায়। মা হয়ে প্রায় স্বাভাবিক অনুভূতির কথা আর কত বিশদ করে বলা যায় সন্তানকে। বস্তুত ওঁরা স্বামী-স্ত্রী চেয়েছিলেন যে মেয়েজামাই কিছুদিন নির্ঝঞ্ঝাট জীবন উপভোগ করুক। ফূর্তি করুক। এসব তো আছেই।

'তাপসটার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই', বীথিকা রাগ প্রকাশ করে বলেন, "তোমার বাবা যখন জানবে, ঠিক বলবে। বলেছিলাম না, ওর চেয়ে ভাল পাত্র আমি জোগাড় করতে পারতাম। আমার ছাত্রকে আমি চিনি। এখন বোঝো।' শর্মিলা বলে 'মা, ওকে বোকো না প্লিজ। ও খুব ভাল। ও বলেছে, আমি যদি না চাই তো ক্লিয়ার করিয়ে দেবে। ও খুব লজ্জিত এ-ব্যাপারে।'

ক্লিয়ার করিয়ে দেবে? এত বড় কথা বলেছে পাষণ্ডটা? বীথিকা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এটা কি পুরুষমানুষের মতো কথা হল? বীথিকার মনে হয়, ছোঁড়াটা বরাবরই ওই রকম সুবিধেবাদী। না হলে, কত বার কত রকমভাবে অপমানিত হয়েছে এ-বাড়িতে, তবু মেয়েটার সঙ্গ ছাড়েনি? তিন-তিনটে বছর জোঁকের মতো লেগে ছিল। দিস্তা দিস্তা চিঠিতে, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা টেলিফোন করে উত্ত্যক্ত করে মেরেছে। অরূপরতন বলতেন, 'তোমার ধারণা ছিল, তাপস পড়া বুঝতে আমার কাছে আসে। নোট জোগাড় করতে আসে। ভুল। পাতলা ঠোঁটের ছেলেদের আমি বিশ্বাস করি না। ওরা দুর্বলচরিত্র আর ফন্দিবাজ হয়। এখন দেখছ তো। এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই, প্রেম করছে!'

দেখলেন, কিছু করতে পারলেন না। এমন কান্নাকাটি শুরু করে দিল মেয়েটা!

খাওয়াদাওয়া অবধি বন্ধ করে দিল। ওদিকে রেল বিভাগের একটা একটা পরীক্ষা দিয়ে চাকরি একটা জুটিয়ে ফেলল তাপস। তখন কোনও দিক থেকেই আপত্তি আর টিঁকল না।

পাতলা-ঠোঁটের ছেলের হাতেই মেয়ে সম্প্রদান করলেন অরূপরতন। শর্মিলার তখন মাত্র একুশ বছর বয়েস। পলসায়েন্স নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সংকল্প শিকেয় তুলে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে, হাসতে হাসতে, ও চলে গেল গোরকপুর। ফাল্গুনে ফাল্গুনে এক বছর আর এখন আশ্বিন—এই দেড় বছরের মুখে এই কাণ্ড!

মেয়েটার টিস টিস ভাব দেখে মায়া হয় বীথিকার। পুজোর সময় কোথায় ফুর্তি করবে, সিনেমা-থিয়েটার দেখে বেড়াবে, তা না বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাই তোলে। যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়ে। কারুর বাড়ি বেড়াতে যায় না। তবু, বীথিকা বলেন, 'না। ভালবাসার সন্তান, নষ্ট করতে আমি দেব না। অ্যাকসিডেন্ট? বিয়ের আগে হলে না হয় ভেবে দেখতে হত। সেদিক থেকে তোমরা অন্তত বাপ-মায়ের মুখরক্ষা করেছ।"

শর্মিলা সাহস পেয়ে বলে, 'ও তো সেই কথাই বলছিল একদিন।'

'কী কথা?'

'যে, ভেবে দেখলে, আমরা প্রায় পাঁচ বছরই সংযম অভ্যেস করেছি। বিয়ের আগের তিন বছর যদি যোগ করো।'

'বেহায়া!'

একদিন শর্মিলা বলল, "মা, ওখানে রেলের হাসপাতাল খুব বড়। অফিসারদের জন্যে চমৎকার ব্যবস্থা সেখানে। তবু সময় হলে আমি এখানেই আসব। কী ভাগ্য এখান থেকে 'শিশু-প্রতিষ্ঠান' কত কাছে।'

'তোমার বাবা বলছিল, আজকাল কত নার্সিংহোম হয়েছে—'

'না মা, তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলবে, আমি যেখানে জন্মেছি, আমাব ছেলেও সেখানে জন্মাবে। নার্সিংহোমে নাম লেখালেই ওরা পেট কাটবে! আমি শুনেছি। মিসেস মিত্তিরের দুটো বাচ্চা ওখানে রেল হাসপাতালে জন্মেছে, নরমাল ডেলিভারি, তিনটের বেলা কলকাতায় নার্সিংহোমে, সিজেরিয়ান! ভাবতে পারো?'

'আচ্ছা বাবা, তথাস্তু। তোমাদের যেমন ইচ্ছে। তবে, ওই সময়ে তাপস যেন ছুটি নিয়ে আসে। আমরা তো বুড়ো হয়েছি।'

বীথিকা বলেন, 'তোমার বাবার ওপর সব ঝামেলা চাপিয়ে দিয়ে ও যেন দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা না করে।'

ঠিক হল, বোশেখ মাস পড়তেই ওকে কলকাতায় রেখে যাবে তাপস। টিকিট করিয়ে দেবে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে তাপস পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে আসবে। তিরিশে মে ডেট দিয়েছে ওরা।

মায়ের কোলের ওপর মাথা রেখে আদর কাড়ে শর্মিলা।

বলে, 'দিদিমা হয়েছ বলে তোমাকে যদি কেউ বুড়ি বলে, তা হলে আমি তার জিভ কেটে দেব, হ্যাঁ! এই তো সেদিন বিক্তার সঙ্গে দেখা হল দক্ষিণাপণে। তোমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোর দিদি? আমি বলি, না রে, বোকা, আমার মা, চিনতে পারলি না? তখন বলে কী, কী সুন্দর ফিগার রেখেছেন। একটা চুল পাকেনি! আচ্ছা, চুয়াল্লিশ বছর বয়েসে চুল পাকতে যাবে কোন দুঃখে? আসলে হিংসে, জানো মা, সব হিংসের কথা। নিজের মা বুড়ি থুত্থুড়ি, ছানি-কাটানো চোখে মোটা কাচের চশমা পরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে—'

বীথিকা বাধা দেন, 'আঃ থামবি!'

নিজের পেটের মেয়ে বলে বলতে পারলেন না, বাইরের ঘরে বসে যে পরীক্ষার খাতা দেখছে, খবরটা তাকে দিয়ে এসো। আমার মুখে শুনলে সে বিশ্বাস করবে না।

শর্মিলার বান্ধবী দুর থেকে কাপড়-জড়ানো আর প্রসাধনলিপ্ত মানুষটাকে দেখেছে, তা-ও ক্ষণকালের জন্যে। ও বলতে পারে। অরূপরতনের মনে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কোনও বিভ্রম নেই। পঁচিশ বছর হল তার সঙ্গে ঘর করছেন। তার পূর্ণ যৌবনকাল তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তার যৌবনের ক্রমঅপসরণও তাঁর লক্ষ এড়ায়নি।

কিছু লোক আছে, যারা কন্যা সন্তান বড় হয়ে উঠলেই বৃদ্ধ হয়ে যায়। অন্তত বৃদ্ধ হবার ভান করে।

চোখে সতীচ্ছদ পরে দুনিয়াটাকে দেখতে চায়। অরূপরতন তাদের মতো নন। তিনি যে-কোনও সুস্থ পুরুষমানুষের মতো খোলা চোখে দুই মেয়ের বড় হয়ে ওঠা দেখেছেন। গর্বিত বোধ করেছেন এই ভেবে যে, ওরা তাঁর সৃষ্টি, তাঁর দুটি অপরূপ শিল্পকর্ম। মেয়েদের বাঁকাচোখের দৃষ্টি, বাঁকাঠোঁটের অবজ্ঞা, মন-মাতানো হাসি আর সকলের মতো তিনিও উপভোগ করেছেন। অনেক সময় শ্রীতপাকে কি শর্মিলাকে স্পষ্টত বলেছেন, 'এত সাজগোজ করার কোনও দরকার ছিল না। এমনিতেই তুমি যথেষ্ট সুন্দর।' কখনও তাদের 'মা' বলে ডাকেননি ওই ভণ্ড লোকেদের মতো। রসিকতা করেছেন, 'আচ্ছা, তোমরা বলতে পারো, মেয়েদের রুমাল কেন ছোট হয়, মেয়েদের জামা কেন ছোট হয়, কলম ছোট হয়? তোমরা আপত্তি করো না এইসব আদুরে অশ্রদ্ধার বিরুদ্ধে? আমাদের কলেজে একজন হেড-অফ দি ডিপার্টমেন্ট মহিলা আছেন যাঁর মুখখানা তরমুজের মতো। তিনি যখন এইটুকু একটা রুমাল দিয়ে সেই মুখের ঘাম মোছার চেষ্টা করেন, তখন ইচ্ছে করে তাঁর মুখের ওপর একটা আস্ত তোয়ালে ছুড়ে দিই।'

শ্রীতপার বিয়ের পর ততটা নয়, শর্মিলার বিয়ের পর হঠাৎ যেন বাড়িতে অন্ধকার নেমে এসেছিল। পাহাড়ের ওপর যেমন ঝুপ করে রাত নামে। তখনই বীথিকার সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। অরূপরতন নিজের শোবার খাটখানা আলাদা করে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করতেই বীথিকা কান্নাকাটি শুরু করে দেন। এমন বুক-ধড়ফড় শুরু হয়ে যায় তাঁর যে, মনে হয়, এই বুঝি মরে যাবেন।

ডাক্তার বসুর কাছে নিয়ে গেলেন স্ত্রীকে। সে সবকিছু ভাল করে পরীক্ষা করে বললে, 'চিন্তার কোনও কাবণ নেই।'

একটা ঘুমের ওষুধ লিখে দিলেন।

অরূপরতনকে আড়ালে ডেকে ডাক্তার বসু বলেছিল, 'এই শুরু হল। এখন পাঁচ-ছ' বছর এই রকম চলবে যতদিন না ব্যাপারটা পুরোপুরি ওঁর ধাতস্থ হয়। মেয়েদের এই বয়েসটা খুব ক্রিটিকাল', ডাক্তারেরা যে রকম ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে কথা বলে সেভাবে ও বলেছিল, 'আপনার লাইফ মিজারেবল করে ছাড়বে যদি আপনি সতর্ক না হন।'

'সতর্ক মানে?'

'লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন। এখন থেকে আপনাকে স্ত্রীর প্রতি অনেক বেশি অ্যাটেনশন দিতে হবে। কোনওক্রমে তাকে অবহেলা করবেন না। বিছানা আলাদা করা তো একেবারেই চলবে না, বরং পারলে দিনে দু'বার তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবেন।'

'দিনে দু'বার?'

'একবার সন্ধের দিকে আর একবার শোবার সময়। সাহেবরা এই নিয়ম খুব মানে। দেখবেন তাতে ঘ্যানঘেনে ভাবটা কেটে যাবে।'

'যৌবন চলে যাচ্ছে, বার্ধক্য ইতস্তত করছে আসতে, এ হল সেই হেমন্তকাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটু মেয়েলি প্রকৃতির কবি ছিলেন তো? তাঁর অনেক কবিতায় এই বেদনার ভাব সুন্দর ফুটেছে। আপনি পড়ে দেখবেন।' এই ছিল ডাক্তারের পরামর্শ।

নিজেরও তো বয়েস হচ্ছে অরূপরতনের। এখন একটু একা থাকতে ইচ্ছে করে। পড়াশোনা নিয়ে ডুবে থাকতে ভাল লাগে। ফালতু আবেগকে প্রশ্রয় দিতে মন চায় না। তবু, বৃহত্তর স্বার্থে একটা আপস করতেই হয়। বিশেষ করে, মেয়েরা চলে যাবার পর, বীথিকা যখন একেবারেই একা হয়ে গেছে। সংসারে আর এত কাজ নেই যা ওকে সারাদিন ব্যাপৃত রাখতে পারে।

শর্মিলা এসে কিছুদিন থেকে গেল। এই ক'টা দিন বাড়ির মধ্যেকার স্তিমিত ভাবটা কেটে গিয়েছিল। তার অরুচির মুখে মুখরোচক খাদ্য জোগাতে কতবার করে বাজার গেছেন, তার কত বায়না মুখ বুজে সহ্য করেছেন, একটুও খারাপ লাগেনি। কেবল মনে হয়েছে, এতটুকু মেয়ে, সন্তান প্রসবের কষ্ট সহ্য করতে পারবে তো। বীথিকা তো সহ্য করেছিল, সে-কথা একবারও মনে পড়েনি।

বাইরের ঘরে বসে শুনেছেন, মেয়েটা বাথরুমে ওয়াক ওয়াক শব্দ করে বমি করার চেষ্টা করছে। আর তখন মনে হয়েছে, আঃ, মেয়েদেরই কেন এই কষ্ট সইতে হয়। তাপস কেন শেয়ার করবে না?

পেটে বাচ্চা এসে গেছে, ধরা পড়ে গিয়ে শর্মিলা বলেছিল, 'মা, এখন বাবাকে কিছু বোলো না। আমি চলে যাই—'

এত বড় খবর কি বাড়ির কর্তার কাছে চেপে রাখা যায়, না তা উচিত? বীথিকা পারেননি। সেদিনই রাত্রে খাওয়াদাওয়া সারা হলে, মেয়ের কাছে শুতে যাবার আগে জলের গ্লাস রেখে আসার ছুতোয় ফিসফিস করে গোপন খবরটি দিয়ে এসেছিলেন। অরূপরতন বলেছিলেন, 'ঠিক আছে।' পরদিন সকালে ঠিকে ঝি মানুর মা বাড়িতে ঢুকতেই বীথিকা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। খুব গম্ভীর মুখে চায়ের কাপ-প্লেট মাজতে লাগলেন।

মানুর মা ঢুকেই অবাক হয়ে যায়। তারপর বলে, 'আপনি ছেড়ে দিন মা, আমি ধুয়ে দিচ্ছি।'

'তুমি তো রোজ ধোও। কিন্তু কানায় সাবান লেগে থাকে, ছাই লেগে থাকে। কতবার বলেছি, কাচের বাসন ধুয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে রাখবে। ওই ময়লা পেটে গেলে অসুখ করে।'

'আমি তো গরম জল দিয়ে ধুয়ে তারপর চা করি।'

'আহা, সামান্য কথায় রাগ করছ কেন?' বীথিকা বলেন, 'এখন দিদি এসেছে। ওর শরীর ভাল না, বাচ্চা হবে। তাই বলছিলাম, বাসনপত্র থেকে পেটে ময়লা না যায়।'

একটু ভূমিকা করে খবরটা জানানো হয়ে গেল। এই কাজের মেয়েরা এত অসহিষ্ণু, চুপ করে সবটা শুনবে, তা না। আর একটু হলে কথাটা ঘুরে যাচ্ছিল আর কী।

'ওমা, তাই নাকি? মানুর মা এবার শ্রমিক সত্তা ছেড়ে নারী সত্তায় ফিরে আসে, 'আহা, দিদির একটি ছেলে হোক।'

এটা একটা নতুন পয়েন্ট। সবাই বলে, মেয়ে না হয়ে ছেলে হোক। তাতে কোনও ফল হয় কি? হয় না। তা ছাড়া, বীথিকা ভাবেন, শিক্ষিত প্রগতিপন্থী এবং আলোকপ্রাপ্ত যারা, তারা আজকাল ছেলে আর মেয়েতে কোনও তফাত করে না। একটা কিছু হলেই হল। এইটেই ফ্যাশন।

মানুর মা আলোকপ্রাপ্ত নয়। তাই তাকে বলতে হল, 'আমাদের কাছে ছেলে আর মেয়ে দুই-ই সমান। আমবা তোমাদের মতো আলাদা করে দেখি না।

কথাটা বলাব ফলে বীথিকার দিক থেকে মানবিকতার ব্যাপারটা যেমন স্পষ্ট করে প্রকাশ করা গেল, তেমনই মানুব মাকে জানিয়ে দেওয়া গেল যে, সংস্কৃতিগতভাবে ও অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত। এটা কম লাভ নয়।

সামনের বাড়ির উকিলগিন্নিকে পরে জানালেও চলে। একদিন তো জানতে পারবেই, এত কাছের প্রতিবেশী যখন। তবু, কী মনে হল, বীথিকা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। বারান্দায় বেলিং ধবে দাঁড়ালেন। একেবারে খালি-হাতে দাঁড়িয়ে থাকলে বোকা দেখায়, তাই একখানা ভিজে ঝাড়ন দিয়ে বেলিংয়ের মাথা ঘষে ঘষে মুছতে লাগলেন। একটু পরেই চোখাচোখি হল।

'এত নোংরা করে পাখিতে, জীবন একেবারে অতিষ্ঠ—'

'আর ধুলো? কোথা থেকে এত ধুলো যে আসে—'

'কলকাতায় আর বসবাস করা যাবে না। শান্তিনিকেতন শুনছি—'

'সব সমান। তবু তো আপনার বাড়িতে ছোট বাচ্চাকাচ্চা নেই, এ যে কী উৎপাত।' উকিলগিন্নির উক্তি।

নিজের পায়ে বল পড়তেই বীথিকা আর সুযোগ ছাড়লেন না। বাঁ পায়ে জোরালো ভলিতে গোল করলেন যেন, 'আর ক'টা দিন। দেখতে দেখতে—'

'কী ব্যাপার?'

'মেয়ে এসেছে। ছোট মেয়ে।' লিপ দিয়ে বললেন, 'প্রেগন্যান্ট।'

ও-বাড়ির গিন্নি কাপড় মেলতে মেলতে লিপ দিয়ে জানতে চাইলেন, ক' মাস?'

বীথিকা আঙুল দিয়ে দেখালেন তিন।

এটা হয়ে গেল। ওটা হয়ে গেল। এখন বাকি রইল রায়পুরে বড় মেয়েকে জানানো। একখানা ইনল্যান্ড পেড়ে এনে খসখস করে লিখে ফেললেন চিঠি। 'এ-বছর পুজোয় তুমি এলে পারতে। শর্মিলা এসেছিল, কয়েকটা দিন খুব হইহই করে কাটল। ও আবার বোশেখ মাসে আসবে।'

যেন এমন কিছু না। খবরটার কোনও গুরুত্ব নেই। সেইভাবে তারপর লিখলেন, 'চার-পাঁচ মাস থাকবে তখন, বাচ্চাকে একটু বড় করে নিয়ে যাবে। ওর খুব ইচ্ছে, শিশু প্রতিষ্ঠানে ওর টিকিট করানো হোক। তোমরা দু'জন তো ওখানেই হয়েছ। তখন অবশ্য দিনকাল ছিল অন্য রকম। তোমার বাবার কথা

ভেবে আমার ভয় করছে একটু। এখন তো বয়েস হয়েছে ওর। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করো, প্রথম পোয়াতির কোনও বিপত্তি যেন না ঘটে।' দশ দিনের মধ্যে চিঠির উত্তর এসে যায়: কী মজা। কী মজা।। আমিও ওই সময় আসছি মা। ঝুম্পার বেলায় যে-ভুল করেছি, সে-ভুল আর জীবনে কখনও করব না। আমার ছেলেও ওই শিশু প্রতিষ্ঠানেই হবে। ডেট দিয়েছে সতেরোই জুন।

দিন যায়। একটি একটি করে মাস খসে পড়ে। পৃথিবীর যুবতী জরায়ু থেকে কাঁদতে কাঁদতে নেমে যায় একটি একটি করে নিঃসঙ্গ ডিম্বকোষ। পৃথিবীর ঋতুচক্রে তারা কেবল সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল। জীবন তাদের গ্রহণ করল না।

আবার, কোথাও খসে পড়ার আগেই গর্বিত গর্ভাশয় তার তোরণ বন্ধ করে দেয় সশব্দে। ফলক ঝুলিয়ে দেয় 'প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ'। নারী শরীরের মধ্যে দ্রুত শুরু হয়ে যায় রূপান্তর। প্রকৃত জননীর প্রস্তুতি। সে ভারী সুখের সময়। নারী শরীর চারশোটি ডিম্বকোষের পুঁজি নিয়ে এই সময়ের জন্যে অপেক্ষা করে মাসের-পর-মাস। বছরের-পর-বছর। ত্রিশ বছর।

অরূপরতন চোখে আধখানা চশমা এঁটে একখানি মোটা বই দাগ দিয়ে দিয়ে পড়ছিলেন। বীথিকা কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। খুব ইচ্ছে করছিল স্বামীর চোখ টিপে ধরেন, গৌরী যেভাবে শিবের চোখ দুটি চেপে ধরেছিলেন একবার। অমনি সমস্ত বিশ্ব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। প্রাণীরা যায় যায়। তখনই হঠাৎ শিবের তৃতীয় নয়নটি ফুটে ওঠে, তার তাপে হিমালয় পর্বত পুড়ে খাক। কিন্তু পৃথিবী রক্ষা পায়। গল্পটা মনে পড়ায় আর চোখ টিপে ধরলেন না।

'এই, শুনছ' আস্তে করে ডাকলেন বীথিকা।

'কী।'

'আমি না—প্রেগন্যান্ট হয়েছি।'

অন্যমনস্কভাবে অরূপরতন বললেন, 'ঠিক আছে।'

'ঠিক আছে কী গো? এত বড় একটা দুর্ঘটনা; তুমি এর বিহিত করবে না?'

'আঃ। এমন ভাব দেখাচ্ছ, যেন জীবনে আর কখনও প্রেগন্যান্ট হওনি! কচি খুকি!' স্বামীর কথা শুনে কান্না পেয়ে যায় বীথিকার। পেয়ে যায় কেন, আস্তে আস্তে তিনি কান্নাটাকে ভেতর থেকে বার করে আনলেন, বললেন, 'আমার কেউ নেই। আমি মরে গেলে তুমি নিশ্চিন্ত হও।'

এবার টনক নড়ল অরূপরতনের। তাই তো, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশনের সময় নয় এখন। তাই তিনি সতর্ক ছিলেন না। এবার বই থেকে মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তাকালেন। বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশ জড়িয়ে ধরলেন সাদরে।

জিজ্ঞেস করলেন 'কী হয়েছে? এত কাঁদবার কী হয়েছে?'

'এখন কী হবে?'

'কীসের কী হবে?'

'প্রেগন্যান্ট—'

'আবার কে প্রেগন্যান্ট হল?'

'আমি। তোমাকে বললাম যে শুনতে পাওনি?'

'সর্বনাশ!' অরূপরতন মাথায় হাত দিয়ে বসলেন এবার, 'এটা তুমি কী করলে গো! আমার মাথা হেঁট করে দিলে!'

'আমি তোমার মাথা হেঁট করেছি, না তুমি আমার মাথা হেঁট করেছ? দু'দিন পরে মেয়েরা আসবে, তাদের সামনে মুখ দেখাব কী করে? কী করে বলব, তোরা চলে যা, আমি তোদের আঁতুড় সামলাতে পারব না? তোদের ভাই হবে! ছি-ছি এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল!

'না, না মরে যাওয়ার কথা উঠছে কেন', অরূপরতন আক্ষেপের সুরে বলেন। স্ত্রীর আঁচলের খুঁট দিয়ে স্ত্রীর চোখ মুছিয়ে দেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন 'তুমি ঠিক বলছ তো? তোমার ভুল হয়নি তো?'

গায়ের জামা তুলতে যাবেন, হাত দিয়ে নিরস্ত করেন অরূপরতন। বুঝতে পারেন ব্যাপারটা কেলো হয়ে গেছে। বাইশ বছর পর...বীথিকার এখন চুয়াল্লিশ বছর বয়সে...তাঁর নিজের ছাপ্পান্ন...বাচ্চা! এই বাচ্চাকে কি বাঁচানো যাবে? বাঁচানো গেলেও একে মানুষ করবে কে? লোকে বলবে কী?

এর জন্যে কে দায়ী? মনে মনে ভাবেন অরূপরতন।

নিজে তিনি মহাভারতের পাণ্ডুরাজা নন, বীথিকাও কুন্তী বা মাদ্রীর সঙ্গে তুলনীয় নয় যে, কাগায়-বগায় এসে গর্ভসঞ্চার করে দিয়ে গেল, মানুষ বিশ্বাস করবে। আপাতদৃষ্টিতে, স্ত্রীকে গর্ভবতী করার ব্যাপারে তাঁর নিজের দায়িত্বই সর্বাগ্রে গণ্য। কিন্তু সে-ই বা কেমন মেয়ে? এতকাল নীরবে সহযোগিতা করার পর, যখন সবকিছু নিরাপদ ভাবা গিয়েছিল, তখনই বিশ্বাসঘাতকতা করল?

অথচ বীথিকার অসহায় অবস্থা দেখে তাকে বিশ্বাসঘাতিকা বলে ভাবতে সায় দেয় না মন। ভাবতে ভাবতে ডাক্তার বসুর কথা মনে পড়ে যায়। সে-ই যত নষ্টের গোড়া। ক্রিটিকাল সময়ের কথা বলে সেই তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল। বিছানা পৃথক করার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে সে-ই বলেছিল, এখন লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন দেবার সময়। দিনে দু'বার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে বলেছিল ওই ডাক্তার। তার ফল ফলেছে। এখন সামলাও।

একদিন রিকশায় চেপে স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার বসুর চেম্বারে। বললেন, 'এখন আপনার কী পরামর্শ দেবার আছে, বলুন।'

'কেন, কী হয়েছে আর?'

'ইনি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছেন। আপনার কথা শুনে চলতে গিয়ে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী, হিংসুটে সহকর্মীরা—এদের সামনে আমার ইমেজ, আমার ভাবমূর্তি, চুপসে যাবার উপক্রম হয়েছে। আমি একজন সিনিয়র প্রোফেসর! অলরেডি একজন দৌহিত্রীর দাদু, শিগ্‌গির আরও দু'জনের দাদু হতে যাচ্ছি। এটা কি নতুন করে বাবা হবার সময়? আমাকে এসব মানায়?'

ডাক্তার বসু প্রথমটা একটু থতমত খেতে যায়। তারপর হাসিতে ফেটে পড়ে।

'আহ, আমি তো হালকাভাবে মধুর সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে বলেছিলাম। আপনি যে এত গভীরে চলে যাবেন, তা কী করে জানব?'

'এখন কী করি বলুন।'

ডাক্তার চাদর ফেলে পরীক্ষা করল বীথিকাকে। বীথিকা লজ্জায় মরে গেলেন। বলল 'সব ঠিক আছে। শুধু চক্ষুলজ্জার ভয়ে আপনারা এই ভ্রূণ নষ্ট করুন, আমি চাই না। আর, কী এমন বয়েস হয়েছে আপনার? বড় বড় লোকেদের জীবনী পড়ে দেখুন—টলস্টয়, পিকাসো, চার্লি চ্যাপলিন—প্রত্যেকে এঁরা দীর্ঘজীবী। এক বিন্দু জীবনীশক্তি কেউ অপচয় করেননি।'

চার সপ্তাহ পরে আর একবার আসতে বলল ডাক্তার বসু। বলল, 'মিসেসকে বুঝিয়ে বলুন, এ দুর্ঘটনা নয়, গর্ব করে বলে বেড়াবার মতো খবর।'

চার সপ্তাহ পরে আবার গেলেন দু'জন মিলে ডাক্তার বসুর চেম্বারে।

ডাক্তার আবার চাদর ফেলে পরীক্ষা করল বীথিকাকে। বীথিকা এবার আর লজ্জায় মরে গেলেন না।

ডাক্তার অরূপরতনকে ডেকে এনে স্ত্রীর পেটের ওপর কান রাখতে বলল। অরূপরতন অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন পেটের মধ্যে ধুক ধুক শব্দ। আবেগ জড়িত গলায় মেসেজ পাঠালেন, 'রাজু, রনি, বাবা আমার, আর ক'টা মাস কষ্ট করো, তারপরই পৃথিবীর আলোয় বেরিয়ে আসবে। তখন তুমি মুক্ত। তখন তোমাকে কে পায়!''

ডাক্তার জানতে চাইল, বিশেষ কোনও উপসর্গ আছে কিনা।

অরূপরতন বললেন, 'সাবান আর টুথপেস্টের খরচ খুব বেড়ে গেছে। না, না, কিনে দিতে আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। কী-বা দাম।'

বীথিকা ফোঁস করে ওঠেন, 'এটাও তুমি ডাক্তারবাবুকে রিপোর্ট করলে? আমি তো গায়ে-মাখা সাবান ছুঁই না। কাপড়-কাচা সাবান এক টুকরো করে খাই। আর টুথপেস্ট—'

'না না, সে-কথা নয় গো। খাও না, যত খুশি খাও। আমার চিন্তা পেটের পক্ষে ওগুলো উপকারী কি না। এখন তুমি যা খাচ্ছ, দু'জনের হয়ে খাচ্ছ, সেটা ভুললে চলবে না।'

ডাক্তার মৃদ মৃদু হাসে। জিজ্ঞেস করে, 'মেয়েরা কবে আসছে?'

'বোশেখ মাসে। আর এসে গেল।'

'জানিয়েছেন?'

'না। আসুক। নিজেরা স্বচক্ষে জননীকে দেখুক।'

'সেপ্টেম্বর মাস অবধি ওদের আটকে রাখবেন। বলবেন, পুজো কাটিয়ে তোমরা যাবে। ওদের দুধ দরকার হতে পারে।'

'দুধ?'

ডাক্তার বিরক্ত স্বরে বলে, 'কেন, ছোট ভাইকে একটু বুকের দুধ দিতে পারবে না দিদিরা? এ কেমন মায়ের পেটের বোন?'

বীথিকা কেমন আড়ষ্ট বোধ করেন। মুখ ফুটে বলতে পারেন না কিছু।

বেরিয়ে আসার সময় ডাক্তার বসু আবার অরূপরতনকে একপাশে ডেকে নিয়ে যায়। বলে, 'প্রেগন্যান্টদের সঙ্গে নিয়ে একটু করে হাঁটবেন রোজ। ওটা দরকার। বাইশ বছর আগেও হেঁটেছেন, এখন বোধহয় মনে নেই। আর ক'টা মাস কষ্ট করুন। তারপর তো আপনি মুক্ত পুরুষ। আরাম করে আলাদা ঘরে শুয়ে ঘুমোন। সারারাত আলো জ্বালিয়ে গবেষণা করুন। আপনার লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন কারুর প্রয়োজন হবে না।'

প্রিয় পাঠিকা, বোশেখ মাসের পর আপনি যদি কখনও বিকেলের দিকে দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি যান, দেখবেন একজন সৌম্যকান্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ছড়ি-হাতে চলেছেন দুলতে দুলতে আর তাঁর সঙ্গে তিনজন গর্ভবতী রমণী। দূর থেকে মনে হবে, ভদ্রলোক বুঝি তাঁর তিন প্রণয়িনীকে নিয়ে টহল দিচ্ছেন পাড়া। না, তা নয়। ওদের একজন তাঁর ধর্মপত্নী, আর দু'জন তাঁর কন্যা। তিবিশে মে, সতেরোই জুন আর একুশে আগস্ট ওদের ডেট পড়েছে শিশু প্রতিষ্ঠানে।

ছেলে আর মেয়ে দুই-ই সমান। তবে, শর্মিলার এটি প্রথম সন্তান। ছেলে হলেই ভাল।

শ্রীতপার তো মেয়ে হয়েছে, দ্বিতীয়টি সম্ভবত ছেলে হবে। ওদের দিদার কোলে এতদিন পর মামা আসুক।

১৯৮৮

জৈব

কল্যাণীদি বলেছিলেন, 'লোকের কথা রাখো। তারা উপদেশ দিয়ে খালাস। অনেক কিছুই তো করলে, লাভ হল? হল না। তার চেয়ে আমার পরামর্শ শোনো স্বপ্না।'

পরামর্শটা মনে ধরেছিল স্বপ্নার। সকলের পরামর্শই ওর মনে ধরে। তখন ওর যা মনের অবস্থা, তাতে কোনটা করলে ফল হবে আর কোনটা নেহাতই ভুজুং, বিচার করে বোঝার সাধ্য ছিল না। যত রকম ডাক্তারি পরীক্ষা আছে সব হয়েছে। স্বপ্নার হয়েছে, বিষ্ণুর হয়েছে।

ডাক্তার চৌধুরী দু'জনকে ডেকে সামনাসামনি বসিয়ে খুব স্পষ্টভাবে এবং বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আলোচনা করেছিলেন। না, স্বপ্নার ভ্রূণকোষ, জরায়ু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সাদা বাংলায় যাকে নাড়ীর দোষ বলে, সে রকম কোনও দোষ পরীক্ষায় ধরা পড়েনি। একটু-আধটু অনিয়মিত পিরিয়ড আকছার মেয়েদের হচ্ছে, বিশেষত যে-মেয়েরা শারীরিক পরিশ্রম তেমন করে না। তাতে চিন্তার কিছু নেই। স্বপ্নার চেয়ে ঢের ভারী ফিগারের মেয়েরা হরদম নার্সিংহোমে আসছে।

তবে কি বাচ্চা না হওয়ার ব্যাপারে বিষ্ণুর কোনও দায়িত্ব আছে? না, তাও নেই। ডাক্তার চৌধুরি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আপনার স্বামী একজন স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান যুবক। বাংলায় ঔরস বলে একটা শব্দ আছে না? কী যেন তার মানে? রামায়ণ-মহাভারতে খুব পাওয়া যায় শব্দটা। সেই ঔরসে মানে আপনার স্বামীর ঔরসে এক বছরে তিনশো পঁয়ষট্টিটি সন্তান উৎপাদন সম্ভব। তা হলেই বুঝতে পারছেন, অন্য কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সেটা খুঁজে বার করুন।'

শরীরে নয়, ফাঁকটা হয়তো মনে।

বাচ্চাকাচ্চা মানেই ন্যানজারি। কাঁথাকানি নিয়ে বিড়ম্বনা। তার ওপর রেডিয়োয় সিনেমায় টিভি-তে হরদম 'এখনই নয়, এখনই নয়' বলে শাসিয়ে যাচ্ছে, বলছে, জীবনটা উপভোগ করুন। কী সুখী প্রেমে ভরা দাম্পত্যজীবন। সন্তানহীন দাম্পত্যজীবন!

বিয়ের পর প্রথম পাঁচ বছর—পাঁচ বছর কী, প্রায় সাত বছর ওরা সন্তান কামনা করেনি। কখনও পিল খেয়ে স্বপ্না, কখনও প্রায় স্বাভাবিক অনুভূতির ওপর নির্ভর করে বিষ্ণু আসতে দেয়নি অবাঞ্ছিত শিশুকে।

সত্যি, কী দ্রুত কেটে গেল সেই পাঁচ বছর। পাঁচ না সাত?

বিষ্ণুর চাকরি কলেজে—তার মানে বছরে চার মাস ছুটি। টিউশন করে উপরি রোজগার কবে। গানের ডিগ্রি আছে স্বপ্নার, তাই ভাঙিয়ে ঘরে বসে ওর পাঁচ-সাতশো টাকা আয়। সেই টাকা জমিয়ে বাড়ি সাজিয়েছে আর টই টই করে ঘুরে বেড়িয়েছে হিল্লিদিল্লি। কুলু মানালি থেকে আরম্ভ করে কোথায় সেতুবন্ধ রামেশ্বর—ওদিকে অজন্তা-এলোরা থেকে আরম্ভ করে ওয়ালটেয়ার পর্যন্ত—কিছু বাকি নেই। পাহাড়—তার কত রকম চরিত্র, কত রকম রং। কালিম্পংয়ের সঙ্গে পহলগাঁওয়ের মিল নেই। সমুদ্র—গোয়ায় এক রকম পুরিতে অন্য। এত বড় বিরাট দেশ, কত বিচিত্র মানুষের বসবাস, কত বিচিত্র তাদের ভাষা, বেশভূষা, আচাব-আচরণ। তেমনই বৈচিত্র্যময় নানা জায়গাব রান্না-করা খাবারের স্বাদ, কাঁচা সবজির গন্ধ। সবকিছু দেখা, উপভোগ করা, এক জীবনে শেষ হয় না।

এমন কিছু বড়লোক ওরা নয়। তবু হিসেবি বলে আর স্বামী-স্ত্রীর নিপুণ সহযোগিতা থাকার দরুন এবই মধ্যে একখানা নিজস্ব বাড়ি বানিয়ে ফেলতে পেরেছে। শ্বশুরের কাছে ঋণ নিয়েই হোক আর এল. আই. সি-তে বন্ধক দিয়েই হোক বিষ্ণু, যার বয়স এখনও চল্লিশ ছোঁয়নি, কলকাতা শহরের মতো জায়গায় একখানা মাথা গোঁজার আস্তানা জোটাতে পেরেছে—এ তো কম কথা নয়।

তেমনই অভিরাম রুচি স্বপ্নার।

ওদের বাড়িতে গেলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিষ্ণু আর স্বপ্না যেন দুটো পাখি, যেখান থেকে যা পেরেছে খুঁটে খুঁটে এনে ঘর সাজিয়েছে। খাট-বিছানা-পরদা সোফা—এমনকী পাপোশ পর্যন্ত সুশ্রী সুন্দর। ছোট একটি ফ্রিজ, টিভি সেটটা কি স্টিরিয়োর যন্ত্রগুলো কী চমৎকার ভাবে লুকোনো। রান্নাঘরটি ঝকঝক করছে। ঐশ্বর্য প্রদর্শনে নয়, ঐশ্বর্য গোপনে সত্যিকারের শিক্ষা ও রুচির পরিচয়, এ-কথা ওদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে গেলেই বোঝা যায়। ওরা জানে, কমলহিরে নয় কমলহিরের আলোটা হল কালচার।

যা ওরা সবাইকে দেখায়, দেখাতে ভালবাসে, তা হল ওই রাজ্যের জিনিস ঠাসা এক কিউরিয়ো ক্যাবিনেট আব ছবির অ্যালবাম। দেশ বেড়ানোর স্মৃতি। ঘোড়ায় চড়ে, গায়ে ওভারকোট,—গুলমার্গ। বালির ওপর শোয়া, চোখে সানগ্লাস—পানাজি। বিশাল শীর্ণকায় বুদ্ধমূর্তির সামনে—সারনাথ। আর, আলমারির মধ্যে আখরোট কাঠের ছোট্ট চিনার পাতার পাশে পুঁচকে তাজমহল। তার পেছনে একটু আড়ালে বাদামি রঙের শাঁখ, এলিফ্যান্টা থেকে কেনা। ওর বৈশিষ্ট্য হল, বাঁ দিকে মুখ। এই সব। একটা সুপুরি কুরে কুরে বানানো সিঁদুরকৌটো পর্যন্ত।

বিষ্ণু বোঝে, স্বপ্না সব সময় বোঝে না, ওদের দেশভ্রমণের সুখস্মৃতি-চিহ্নগুলি দেখার আগ্রহ সকলের থাকার কথা না। বরং দেশ বেড়ানোর গল্প রসিয়ে বলতে পারলে লোকে শুনবে।

কিন্তু বাধা দেয় না ও। ওইগুলোই তো ওর সম্বল। স্বপ্নার আর কী-ই বা দেখাবার আছে। কাকেই বা দেখাবে। কাঠমান্ডুতে কেনা একটা ছোট সাদা বুদ্ধমূর্তি আছে কিউরিয়ো ক্যাবিনেটের মাঝখানে। সম্ভবত মার্বেল পাথরের তৈরি, ভেতরটা ফাঁপা। মূর্তিটার মধ্যে বাল্ব লাগানো। বাইরে থেকে সুইচ টিপলে বুদ্ধমূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, আলোকিত হয় আলমারির ভেতরটা। ওর কিউরিয়োর প্রশংসা করলে স্বপ্নার মুখখানাও তেমনই উদ্ভাসিত হয় আনন্দে।

শাশুড়ি বলতেন, 'বিমুখ হলে কিছু পাওয়া যায় না। তোমরা ভাবছ, যখন ইচ্ছে দরজা খুলে দাঁড়ালেই সে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তা হয় না।'

পুরনো দিনের মানুষ। লেখাপড়া শেখেননি, কিন্তু রক্ত-মাংস দিয়ে জীবনটা তো যাপন করেছেন। তাঁর কথাই ফলল হয়তো।

শাশুড়ি বলতেন, 'আকুলতা থাকা চাই। ভগবান আসেন সন্তানের ছদ্মবেশে। দেখেন, কতখানি তুমি দিতে শিখেছ। মা হবার যোগ্যতা তোমার হয়েছে কিনা।'

তখন গ্রাহ্য করেনি স্বপ্না। বিষ্ণুও করেনি। মা যা বলছে, তাই যদি হত, তবে এ-দেশে দরিদ্রের সংসারে গন্ডায় গন্ডায় শিশু জন্মাত না। রোগে ও অপুষ্টিতে নষ্ট হত না হাজারে হাজারে নিরপরাধ প্রাণ। জৈবিক নিয়মে মানুষ জন্মায়, জৈবিক নিয়মে যথাসময়ে ওদের সংসারেও শিশু জন্মাবে।

'আদরিণী'তে ভুরু প্লাক করাতে গিয়ে তিস্তার সঙ্গে দেখা। সমবয়সি। কি দু'-এক বছরের ছোটই হবে। কী চেহারা হয়েছে ওর! দেখলে চেনা যায় না। রোগা, ফ্যাকাশে, চোখের কোণে কালি। হবে না?

তিনটে বাচ্চা ওর। প্রথম দুটো মেয়ে। তারপর ছেলে। ছেলের সাধ মিটে যাওয়ার পর অপারেশন করিয়ে নিয়েছে তিস্তা।

'সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দিয়েছি ভাই।' তিস্তা বলেছিল, 'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।'

হালকা পিঙ্ক রঙের কোটা পরেছিল তিস্তা, সাদা রুবিয়া ভয়েলের স্লিভলেস ব্লাউজ। স্বপ্নার স্পষ্ট মনে আছে ছবিটা।

সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে দেবার পর তিস্তার ঢের পরিবর্তন হয়েছে, লক্ষ করে স্বপ্না। চুল কেটে ছোট করে ফেলেছে। ডায়নাকাট এখনকার ফ্যাশান, থাকে-থাকে ফোলানো চুল ঘাড়ের ওপর দোলে, আছড়ায়। ওখানে শ্যাম্পু করাতে আসে প্রায়ই। আশ্চর্য, এতদিন দেখা হয়নি। বোধহয় ফেশিয়ালও করায়, কিন্তু ভাঙল না সেটা।

'তুমি একদম তেমনি আছ। একটুও বদলাওনি।' স্বপ্নাকে বলেছিল তিস্তা।

কথাটা নিছক প্রশংসা না তাতে খোঁচা আছে, বোঝার চেষ্টা করেছিল স্বপ্না। মেয়েদের বয়স অনেককাল এক জায়গায় থেমে থাকে। পরিচর্যা করলে কুড়ি থেকে চল্লিশ বছর অবধি। ছেলেপুলে হলে টসকায়। কারও শরীর ভরা-ঘটের মতো টইটম্বুর হয়ে ওঠে। পরিপূর্ণ যৌবনের ওপব পড়ে ঠান্ডা চন্দনের প্রলেপ। আবার কারও শরীর একটু একটু করে ভাঙে দেয়াল থেকে চুন খসার মতো। এত বছর পর স্বপ্নার একদম তেমনি থাকার কথা ছিল না, একটু বদলাবার কথা ছিল, দরকার ছিল।

'ওমা, তাই নাকি?' গালে হাত দিয়ে অবাক হবার মতো করে তাকিয়েছিল তিস্তা, 'এখনও ছেলেপুলে হয়নি? খুব ফ্যামিলি প্ল্যানিং চালাচ্ছ বুঝি?'

বলতে গিয়ে খরখরে শাড়ির আঁচল উঠে এসেছিল তিস্তার হাতে। স্বপ্না আড়চোখে দেখেছিল তিস্তাব উন্মুক্ত নাভি, শিথিল পেটের চামড়া। নাভির নীচে তিলকের মতো সমান্তরাল ফাটা চামড়াব দাগ। মনে হয়েছিল, রোগা ফ্যাকাশে শরীরটাকে চাপা দিয়েও পেটের কোঁচকানো চামড়ার জায়গাটা ও দেখাচ্ছে। স্বপ্নাকে দেখিয়ে আনন্দ পাচ্ছে। স্বপ্না মুচকে হেসেছিল মাত্র।

তিস্তার কথা আর শেষ হয় না। এদিকে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়-হয়।

কথা সব ছেলেপুলে বিষয়ক। রুণু কী করে, ঝুনু কী করে, বাবাই কী দামাল—এইসব গল্প সাতকাহন। তিনটে সন্তান যেন উনুনের তিনটে ঝিক; তার ওপর বসে খলখল করছে তিস্তা।

'আর পারি না ভাই, কোনদিকে যে সামাল দিই। এক-একদিন ইচ্ছে করে, সব ছেড়েছুড়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাই।' তিস্তা বলছিল। ওর গলার স্বর থেকে সুখ ঝরছিল টপ টপ করে।

স্বপ্না শুধু শুনেই যাচ্ছে। কথা বলার অবসর পাচ্ছে না।

'বরের কোনও দোষ নেই তো?' হঠাৎ তিস্তা এই প্রশ্নটা করায় চমকে ওঠে স্বপ্না। আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

'না, না। ডাক্তার বলেছে আমাদের দু'জনেরই সব ঠিকঠাক আছে। এখন দৈবের দয়া হলেই হয়।'

প্রতিপক্ষ পরাজয় স্বীকার করলে মেয়েরা আর অস্ত্র ছোড়ে না। যদি সেই প্রতিপক্ষ আরেকজন মেয়ে হয়। তিস্তা বান্ধবীর জন্যে কষ্টবোধ করেছিল। ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, 'একটা পরামর্শ শুনবে?'

'কী?'

'বাড়িতে একটা 'পেট' রাখো তোমরা। কুকুর কিংবা খরগোশ। কোলেপিঠে করে ঘাঁটতে পারবে যাকে। শুনেছি, ওতে কাজ হয়।'

এ আর এমন কী দুরূহ কাজ।

কলকাতা তোলপাড় করে কুকুরের বাচ্চা খুঁজেছে ওরা। 'আলোয়া' থেকে ঠিকানা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে কোথায় কোথায়। মুসলমান পাড়ার নোংরা স্যাঁতসেঁতে বস্তিতে, ট্যাঁশ পাড়ার ভাঙা করিডরে, নিউমার্কেটের আশেপাশে। বিলিতি কুকুর পুষে, ঠিকমতো বাচ্চা প্রসব করিয়ে সেই কুকুরছানা বিক্রি

করে কত লোক পেট চালাচ্ছে। এ-ও এক লাভজনক ব্যবসা, ওরা অনুমান করতে পারেনি আগে। আর ব্যবসা যখন, তখন জাল-জোচ্চুরিও চলে। ককার স্প্যানিয়েল বলে একটা পুড্‌ল দিল হয়তো, দু'মাস যেতে-না-যেতে তার লোমফোম গেল ঝরে, নিজমূর্তি ধরলেন এক নেড়িকুত্তা। এ রকম হামেশাই হচ্ছে।

শেষপর্যন্ত এক বুড়ি মেমসাহেবের কাছে ওরা সিস্‌মিকে পায়। বুড়ি বলেছিল, ও খাঁটি পমেরেনিয়ান। ওর মাকে দেখো, ওর বাবাকে দেখো। একঘর কুকুরের মধ্যে বসে বুড়ি প্রত্যেকটাকে আলাদা করে আদর করল, তাদের নাম ধরে ডাকল। কুকুর পোষা বুড়ির পেশা শুধু নয়, নেশাও। ও-ই ওর জীবন।

দশদিন বয়সে সিস্‌মি এ-বাড়িতে আসে। কুকুরছানা তো নয়, একমুঠো উলের বল। ধবধবে সাদা লোম, নরম তুলতুল করছে। সেই লোমের জঙ্গলে কোথায় যে ওর চোখ দুটো পিটপিট করত, দেখা যেত না।

একেবারে একরকম দেখতে কুকুরছানা দুটো ছিল বুড়ির। দু'হাতে দুটোকে তুলে দোলাতে দোলাতে বলেছিল, 'এর নাম সিস্‌মি আর ওর নাম কিস্‌মি। তোমরা কোনটা নেবে বলো। আমি বলি কী, দুটোই নাও, দাম একটু কমিয়ে দেব। ওরা দুটিতে এক বাড়িতে বড় হোক আমি চাই।'

স্বপ্না মেয়েটাকে বেছে নেয়।

বুড়ি বলেছিল, 'এ ভারী অভিমানী কুকুর। একে বিছানায় নিয়ে শোবে। একে চামচে করে খাইয়ে দেবে। একে অন্য কুকুরের সঙ্গে মিশতে দেবে না। একে সব সময় পরিষ্কার রাখবে, বুঝলে? বেশ করে পাউডার ছড়িয়ে এর চুল আঁচড়ে দেবে সকালে-বিকেলে দু'বার। খুব বুদ্ধি মাথায়, যা শেখাবে, চটপট শিখে নেবে, দেখো।'

একটা কথাও বুড়ি মিথ্যে বলেনি।

ছ'মাস যেতে-না-যেতে সিস্‌মিকে নিয়ে স্বপ্নার কোল ভরে উঠেছিল।

সারাদিন ওকে নিয়ে ব্যস্ত। সিস্‌মির চান, সিস্‌মির খাওয়া, সিস্‌মির সাজুগুজু। আক্ষরিক অর্থে মাটিতে পা পড়ে না সিস্‌মির। হয় কোলে নয় তো সোফায়। না হলে বিছানায়। বড় হয়ে আরও সুন্দর হয়েছে ও। মেয়ে তো, নানা রকম ঢং করতে শিখেছে নিজে নিজেই। খাবার সময় দু'বার-তিনবার মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারপর আদর করে সাধলে তবে চামচের খাবার মুখে তুলবে। ঘুমোবার সময় একবার এপাশ একবার ওপাশ করবে, চোখ বুজে থাকতে থাকতে লেজ নাড়তে শুরু করবে। তখন লেজের ওপর হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াও। কত আবদার! মানুষের বাচ্চাকে হার মানায়।

সকালবেলা একটুখানি সিস্‌মিকে নিয়ে বেরোতে হয়। কাছেই পার্ক। স্বপ্নার হাতে-ধরা সিস্‌মি, আর পেছন পেছন বিষ্ণু। প্রথম প্রথম বিষ্ণুর হাসি পেত। এত সহজে মেয়েরা ভুলে থাকতে পারে।

স্বপ্না ছোটবেলায় পুতুল খেলত। এখনও সেই পুতুল খেলার অভ্যেস। পুতুল একটা ধরিয়ে দিলেই হল।

পার্ক থেকে ফেরার পথে একদিন তিস্তার সঙ্গে দেখা। সিস্‌মিকে কোলে নিয়ে হাঁটছিল স্বপ্না। ফেরার সময় সিস্‌মি ক্লান্ত হয়ে পড়ে কিনা, তাই।

তিস্তা ওকে দেখে খুশিতে টলটল করে ওঠে।

'ওমা, কোলে ওটি কে গো?"

'আমার মেয়ে, সিস্‌মি।'

'কই, সুন্দরীর মুখখানা দেখি।'

সিস্‌মির মুখ তখন স্বপ্নার বুকের মধ্যে গোঁজা। কিছুতে মুখ তুলবে না। দুষ্টুমি করছে বোঝা যায় লেজ নাড়া দেখে।

'মেয়ে আমার রাস্তায়ঘাটে মুখ দেখায় না,' স্বপ্না ওকে আদর করতে করতে বলে, 'একদিন বাড়িতে এসো। আন্টিকে বলে দে, বাড়িতে না এলে তোমার সঙ্গে কথা বলব না। তোমার কোলে উঠব না। তোমার সঙ্গে আড়ি।'

সিস্‌মি চিরিক চিরিক করে লেজ নাড়ে। আর কুতকুতে চোখে তাকায় স্বপ্নার আঁচলের ফাঁক থেকে। এমন ছটফট করে এক এক সময় যে, বুকের ওপর কাপড় রাখা যায় না।

তিস্তা বলে, 'যাব, একদিন যাব।'

কিন্তু তিস্তা যেদিন এল সেদিন সিস্‌মি আর নেই।

তিস্তাকে ঢুকতে দেখে হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছে স্বপ্না।

'এত দেরি করে এলে কেন ভাই!...আমি যে মেয়েটাকে রাখতে পারলাম না...সিস্‌মি আমাদের ছেড়ে চলে গেল...ওকে যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না ভাই।'

এই হল মায়া। মানুষ নয়, তবু একটা প্রাণী তো। আদরে সাড়া দেয়। মনের ভাব প্রকাশ করতে পাবে। জড়িয়ে ধরলে রক্তের উষ্ণতা অনুভব করা যায়। বুকের ধুকপুক শব্দ ওরও ছিল মানুষের মতো।

'কী হয়েছিল?'

কাঁদতে কাঁদতে স্বপ্না বলে, 'প্রথমে জ্বর হল, মুখে অরুচি। দিনরাত ঝিম মেরে পড়ে থাকে। মানুষ নয় যে মুখ ফুটে বলতে পারবে কোথায় ব্যথা। আমি খালি হাতড়াই ওর সারা অঙ্গ, বল কোথায় কষ্ট, কোথায় লাগছে। ডাক্তার দেখালাম, বলল, হেপাটাইটিস, রাস্তা থেকে ছোঁয়াচ লেগেছে। ওইটুকু মেয়ে তার হেপাটাইটিস, ভাবতে পারো?'

নিজেকে অপরাধী মনে হয় তিস্তার। বেশ ছিল ওরা স্বামী-স্ত্রীতে, নিজের মনে। ভাল করতে গিয়ে কী হল? শোকের ছায়া পড়ল সংসারে। তবে পশুপাখি পুষলে এ-দুঃখ পেতে হবেই। কতদিন আর বাঁচে ওরা। এই কুকুবটা অসুখে না মরলে আরও বছব-ছয়েক বাঁচত। তারপর?

স্বপ্নার মনের যখন এই রকম অবস্থা, কিছুই ভাল লাগে না, অর্থহীন মনে হয় জীবন—এই বাড়িঘর, এই সংসার; এই আসবাবপত্র, অ্যালবাম—সেই সময় সৌভাগ্যবশত কল্যাণীদির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। একই দিনে দু'জনের রেকর্ডিং ছিল। রেকর্ডিং শেষ করে আকাশবাণীর আপিস ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। নানা কথা হতে হতে সিস্‌মির প্রসঙ্গ ওঠে। ওর অকালমৃত্যুজনিত শোক ও দুঃখের কথা।

বিচক্ষণ মানুষ। কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন, শুনছিলেন।

একসময় বললেন, 'লোকের কথা রাখো। অনেক কিছুই তো করলে। তার চেয়ে আমার পরামর্শ শোনো।'

কল্যাণীদি বলেছিলেন, 'একটি মানুষ-শিশু পালন করো। গর্ভ না হলে কি মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবে? শিশুটিকে বড় করো নিজের সন্তানের মতো স্নেহে, ভালবাসায়। এ-কাজে তৃপ্তি আছে, পুণ্য আছে!'

এ হল আজ থেকে ছ'বছর আগের কথা।

এবার আর হন্যে হয়ে খোঁজা নয়। কল্যাণীদির সঙ্গে স্বপ্না গিয়েছিল এক অনাথাশ্রমে। ক্রিশ্চান নানদের দ্বারা পরিচালিত এই আশ্রমে শুধু শিশুরাই থাকে। পিতৃমাতৃহীন বা পরিত্যক্ত অভাগা শিশুব দল এই আশ্রমে সন্ন্যাসিনীদের কোলে বড় হয়। ঈশ্বরকে মঙ্গলময় ভাবতে শেখে। সকাল-সন্ধ্যা প্রার্থনা করতে শেখে, যেন বড় হয়ে ওরা ঈশ্বরের অভীষ্ট জীবনযাপন করতে পারে, কলুষমুক্ত করতে পারে মানুষের সমাজ। ওদের দুর্ভাগ্যের জন্যে শিশুরা কাউকে দায়ী করে না।

স্বপ্না পুতুলকে আবিষ্কার করেছিল ওই আশ্রমে।

কতটুকু বয়স? দু' বছর কি আড়াই। ফুটফুটে ফরসা রং, মোটাসোটা। কান পর্যন্ত ঢাকা বব-করা চুল, মায়ামাখানো দুটো বড় বড় চোখ, লাল রঙের একটা জাঙিয়া পরে খালি গায়ে মেয়েটা খেলে বেড়াচ্ছিল বাগানে। গ্রীষ্মকালের সকাল। বেল, জুঁই, গন্ধরাজ আর গ্লোবলিলির উৎসবে যেন আর একটা চলন্ত গ্লোবলিলি। কে সে নির্বোধ, এমন দেবশিশুকে ফেলে দিয়েছে?

ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিয়েছিল স্বপ্না। মেয়েটা খিলখিল করে হাসে। কচি ভুট্টার দানার মতো তিনটে করে দাঁত ওপরে-নীচে, বাকি মুখটা ফোকলা। কোলে তুলে নিতে পুতুল স্বপ্নার গলা জড়িয়ে ধরেছিল।

'একে ছেড়ে আমি যাই কী করে বলো তো?'

দৃশ্য দেখে বিষ্ণুর চোখে জল এসে গিয়েছিল সেদিন।

'ছেড়ে যেতে হবে কেন? নিয়ে যাই চলো। ও-ই তো তোমাকে দেখে চিনেছে।'

কল্যাণীদি খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'মন ভরেছে তো এবার? আমি বলেছিলাম কিনা!'

পুতুল আসার পর বাড়িটা আলোকিত হয়ে উঠেছে।

সত্যি কথা বলতে কী, স্বপ্না একটু বাড়াবাড়ি করেছে প্রথম প্রথম। ওইটুকু মেয়ে, তার জন্যে এক বাকস জামাকাপড়! পাঁচজোড়া জুতো! কখনও ফ্রক পরায় ওকে, কখনও শাড়ি পরায়, আবার কখনও শার্টপ্যান্ট পরিয়ে ছেলে সাজায়। কিছুতে আর আশ মেটে না স্বপ্নার।

বিষ্ণু বলে, 'একটু রয়ে-সয়ে। মেয়েকে মানুষ করতে হবে না?'

'মানুষ ও এমনিতেই হবে। আমার হাতেই হবে। সে সময় আসুক। তোমার মেয়েকে আমি বখিয়ে দেব না।'

পাঁচ বছর বয়স অবধি পুতুল বাবা-মা'র মাঝখানে শুয়েছে। দুটি মানুষের মাঝখানে এক লিলিপুট। মায়ের দিকে পাশ ফিরলে বলেছে 'আমার দিকে ফিরে শোও।' বাবার দিকে পাশ ফিরলে ছোট ছোট হাত দিয়ে ঠেলেছে, 'বাপি, আমার দিকে ফিরে শোও।'

ওর দিকে ফিরে শুতে হবে, পিঠ ফিরিয়ে শুলে চলবে না।

ডাইনিং টেবিলের পাশে চেয়ারের ওপর মোড়ায় বসিয়ে স্বপ্না ওকে খাইয়ে দেয়। ভাত টিপে টিপে, দুধ মেখে খুব নরম করে তবে ওর মুখে দেয়। একটি করে মাছের কাঁটা বেছে টিপে টিপে দেখে, আর কাঁটা রইল কিনা। পুতুল খাবে বলে রান্নায় ঝাল দেওয়া উঠে গেল।

বিষ্ণু বলে, 'নিজের হাতে খেতে শেখাও। চিরকাল কি তুমি খাইয়ে দেবে?'

'হবে হবে।' স্বপ্না গ্রাহ্য করে না।

বিষ্ণু রাগ করে না। এমনকী, যখন ওর বিছানা পাশের ঘরে সরিয়ে দিল, তখনও রাগ করেনি।

'মেয়ে নিয়ে আমার অনেক কাজ, সব সময় তুমি ঘুরঘুর করলে বিরক্ত লাগে। তোমারই পড়ার ঘর, এক পাশে খাট পেতে দিয়েছি; সুবিধেই তো হয়েছে।'

যাঃ বাবা! আমে দুধে মিশে গেল, আঁটি গেল গড়াগড়ি! অনেক কাজ তো বটেই। মেয়েকে সাজানো এক ঘণ্টা ধরে। তারপর এখন বড় হয়েছে মেয়ে, ভোরবেলা হারমোনিয়াম পেতে বিছানায় গলা সাধছে মায়ের সঙ্গে। তারপর স্কুল আছে। হাতের লেখা প্র্যাকটিস করতে হয়। এখন থেকে না দেখলে লেখার ছাঁদ আর পরে ঠিক হবে না।

স্কুলের বাস থাকলেও স্বপ্না ভরসা করতে পারেনি। আজকাল যে-হারে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিখোঁজ হচ্ছে! কতটুকুই বা পথ। রিকশা করে একবার দিয়ে আসা আর বারোটার সময় একবার নিয়ে আসা। কাজটা ও নিজেই করে।

ছবি আঁকতে জানে না স্বপ্না, তাই ফি রবিবার পুতুলকে আঁকার স্কুলে নিয়ে যায়। এক ঘণ্টা বসে থেকে ক্লাস শেষ হলে তুলে নিয়ে আসে। এক বছরও হয়নি, কী সুন্দর ছবি আঁকতে শিখেছে মেয়ে। আকাশে সূর্য, মেঘ, একেবারে ঠিকঠাক। কুটির, নারকেল গাছ, বৃষ্টিপাত, গ্রামের নদী—কী করে যে এইসব ও কল্পনা করতে পারে, ভাবলে অবাক হতে হয়।

'শীতকাল আসুক, পুতুলকে 'বসে-আঁকো' প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাব। একটা প্রাইজ ও পাবেই।' গর্ব করে বলেছিল স্বপ্না।

অর্থাৎ, ততদিন বিষ্ণু, তুমি নিজের মনে পাশের ঘরে থাকো। পড়াশোনা করো। মাঝে মাঝে দেখা হবে। পুতুল ঘুমিয়ে পড়লে, তার আগে নয়।

রাত্রে পুতুল ঘুমিয়ে পড়লে পর একদিন স্বপ্না ফিসফিস করে বিষ্ণুর কানে কানে একটা ভয়ের কথা বলল।

বিষ্ণু কিছুতেই ঘাবড়ায় না।

বলল,'তুমি যা ভাবছ, তা হয়তো নয়। আর যদি হয় তো ভালই।

'আমি যদি মরে যাই?'

'আজকাল মরে না কেউ। তুমি একটা পাগলি। এতদিন তো এই-ই চেয়েছিলে।'

'যা চেয়েছিলাম তা তো পেয়েই গেছি। এতদিন পর কেন নতুন করে হ্যাঙ্গাম! আমি মরে গেলে পুতুলকে কে দেখবে গো।'

ডাক্তার চৌধুরী বিষ্ণুকে কংগ্রাচুলেট করলেন, 'রবার্ট দ্য ব্রুস।' তারপর যথাসময়ে স্বপ্না একটি কন্যাসন্তান প্রসব করল।

পুতুলের মতো নিখুঁত সুন্দর নয়। নাকটা খ্যাঁদা, রংটা একটু ময়লা হবে মনে হয়। কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট।

একটু বড় হতে দেখা গেল, স্নান করিয়ে চুল আঁচড়ে দিলে, পাউডার লাগিয়ে কাজল পরিয়ে দিলে ওকে সুন্দর দেখায়। মুখখানা বাপের মতো হবে। পিতৃমুখী কন্যা সুখী—কথায় আছে না?

কোথা থেকে খবর পেয়ে একদিন তিস্তা এসে উপস্থিত।

মিষ্টি খাওয়াও ভাই। আমার কথা ফলে গেছে। বলেছিলাম না, একটা 'পেট' রাখো, অনেক সময় ওতে কাজ হয়।'

ভর দুপুরবেলা। বাড়িতে কেউ নেই। কাপড়চোপড় এলিয়ে বেসামাল অবস্থায় বিছানায় বসে ছিল স্বপ্না। বাচ্চা একঘুম দিয়ে উঠেছে। কাঁথা ভিজিয়েছে। ওর ন্যাপি বদলাচ্ছিল।

ডাকল, 'পুতুল, একটু শুনে যা।'

পুতুল আসতে বলল, 'একটা চেয়ার এনে দে না, মা। আন্টিকে বসতে দে।' সাত বছরের মেয়ে টানতে টানতে একটা চেয়ার নিয়ে এল বসার ঘর থেকে। একটু পরে আবার ডাকল, 'পুতুল, দেখ তো মা, ফ্রিজে কৌটোর মধ্যে সন্দেশ আছে। এনে দে।'

পুতুল সন্দেশ রাখার প্লাস্টিকের কৌটোটা এনে দিল।

'কৌটোসুদ্ধ খাব নাকি?' তিস্তা খেঁকিয়ে ওঠে, 'একটা প্লেটে করে আনতে হয়, তাও জানিস না?'

পুতুল রান্নাঘর থেকে প্লেট এনে দেয়। বুদ্ধি করে এক গ্লাস জল এনে দেয় এবার।

এই আন্টির কথাবার্তা যেন কী রকম! ওর ভাল লাগে না।

আসলে, অনেকদিন থেকেই পুতুলের মন ভাল নেই।

মায়ের অসুখ। ওর গান বন্ধ। ওর ছবি আঁকা বন্ধ। ও নিজে নিজে রিকশা করে স্কুলে যায়। নিজে নিজে স্কুলের পড়া তৈরি করে।

ভেবেছিল, একদিন যখন মায়ের অসুখ সেরে যাবে, তখন আবার আগের মতো মাকে পাবে পুতুল। কিন্তু বোনটি আসার পর ও দেখেছে, মায়ের সব মনোযোগ তার দিকে। বাবার মনোযোগও তার দিকে।

পুতুল হঠাৎ এ-বাড়িতে একা হয়ে গেছে। পর হয়ে গেছে।

ছোট ভাই-বোন জন্মালে বড়জনের মনের অবস্থা এই রকমই হয়। খুব স্বাভাবিক। কিন্তু পুতুলের ভাগ্যে আরও কিছু পাওনা ছিল।

একদিন পুতুলকে পাহারায় রেখে স্বপ্না বাথরুমে গেছে। হঠাৎ বাচ্চাটা ককিয়ে কেঁদে উঠল।

কী হল, কী হল! শাড়িটা কোনও রকমে গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এল স্বপ্না।

এসে দেখে, বাচ্চাটাকে থাবড়াচ্ছে পুতুল। ওর মুখখানা ভয়ে পাংশুবর্ণ।

বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে কান্না থামাতে চেষ্টা করে স্বপ্না। আর তখনই চোখে পড়ে, ওর কচি বাহুর ওপর গোলমতো কামড়ের দাগ। দাঁত বসে গিয়ে এক জায়গায় একটু রক্তও বেরিয়েছে।

'বোনটিকে কামড়ে দিয়েছ?'

'ও কেন আমার আঙুল কামড়ে দিল?'

'ওর কি জ্ঞান আছে না চৈতন্য আছে? অ্যাঁ? তা বলে ধাড়ি মেয়ে তুমি ওর মাংস ছিঁড়ে নেবে? অ্যাঁ? কোনদিন তুমি বোনটিকে মেরে ফেলবে গলা টিপে! কী সাংঘাতিক মেয়ে!'

বকতে বকতে স্বপ্নার সংযম হারিয়ে যায়। বাচ্চাটিকে বিছানায় ফেলে দিয়ে কান ধরে দাঁড় করায় পুতুলকে। ঠাস ঠাস করে চড় মারে দু'গালে।

চিৎকার করে বলে, 'দুধকলা দিয়ে বাড়িতে কালসাপ পুষছি। হায় হায়। রাস্তায় পড়েছিলি, তোকে কুড়িয়ে আনলাম, তখন কি জানতাম, তোর গায়ে খুনির রক্ত। যা, বেরিয়ে যা ঘর থেকে, আর কোনওদিন আমার ঘরে ঢুকবি না।'

এক মুহূর্তের জন্য আঁতকে উঠেছিল, কিন্তু পুতুল কাঁদেনি। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কলেজ থেকে বিষ্ণু ফিরলে পর স্বপ্নার মুখে সব শুনল। শুনে গম্ভীর হয়ে রইল। পুতুল ভেবেছিল, আর একবার বাবার কাছে মার খাবে।

না, মার খায়নি।

সেদিন থেকে বসার ঘরে শতরঞ্চি পেতে ওর শোওয়ার ব্যবস্থা হল।

একদিনের ঘটনায় পুতুলের বয়স সাত থেকে বেড়ে সতেরো বছর হয়ে গেছে।

এরপর ওকে আর কখনও কড়া কথা বলতে হয়নি। উপরন্তু পুতুল স্বপ্নার অত্যন্ত অনুগত হয়ে উঠেছে। ছোটখাটো ঘরের কাজ স্বপ্নার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পুতুল করে দেয়। বোনটির দুধ গরম করে দেয়। বোতল ধুয়ে দেয়। কাঁথাকানি কেচে মেলে দেয় বারান্দায়। শুকিয়ে গেলে ভাঁজ করে রাখে।

বাচ্চার জন্যে একটা সুন্দর লাল রঙের প্র্যাম কিনে এনেছে বিষ্ণু। একজন ঠিকে আয়া রাখার কথা

উঠেছিল, স্বপ্না বলেছে, 'কী দরকার, পুতুল তো আছে।'

শীত পড়েছে। এই দু'-একটা মাস ঝকঝক করে কলকাতার আকাশ।

আকাশি নীল রঙের উলের টুপি, উলের মোজা পরিয়ে বাচ্চাকে ওরা নিয়ে যায় বিকেলবেলা। স্বপ্নার সঙ্গে পুতুলও যায় পার্কে। পুতুল প্র্যাম ঠেলে। আস্তে আস্তে খানা-খন্দ বাঁচিয়ে। বাচ্চার মুখের ওপর মাছি বসলে তাড়িয়ে দেয়।

একদিন কল্যাণীদির সঙ্গে দেখা। মাথার চুল একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

বাচ্চার গাল টিপে আদর করলেন। পুতুলকে বললেন, 'বোনটিকে ভালবাসো তো?'

পুতুল ঘাড় নাড়ল। বাসে। ওর কানের মাকড়ি দুটো দুলে উঠল। বাসে।

স্বপ্নাকে বললেন, 'যেমন ছিলে ঝাড়া হাত-পা, এখন তেমনি জড়িয়ে পড়েছ। ভালই। সংসার করতে তো তুমি ভালবাসো। আজকালকার মেয়েরা অন্য রকম।'

স্বপ্না বলল, 'আর পেরে উঠছি না দিদি। বড় ঝামেলা।'

'পুতুলকে কোনও ভাল হস্টেল দেখে ভরতি করে দাও। ভাল থাকবে।'

স্বপ্না বলল, 'পারব না দিদি। মেয়ের মতন কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি, একে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

কেন কে জানে, সেই সময় প্রায় নির্জন পার্কে একটা ছাতিম গাছের মধ্য থেকে নাম-না-জানা পাখি মিথ্যে কথা শুনে হঠাৎ ডেকে উঠল, পি পিহু, পি পিহু, পিহু পিহু পিহু। ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল দূরে।

১৯৮৪

ও ক্যালকাটা!

ক্যান্টিনের এক কোণে দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে তিনজন। সিকিউরিটির লোটন মুনশি, টাইপিং পুলের দেবু রক্ষিত আর পারচেসের নির্মল সাধুখাঁ। ওদের মাঝখানে চটা-ওঠা সানমাইকার টেবিল।

শীতকালের বিকেল। চারটে বাজে প্রায়। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বড় জানলাটা হাট করে খোলা। সেই জানলা দিয়ে ওই টেবিলের সাইজের একটা চৌকো হলুদ রঙের রোদের টুকরো ঢুকে আটকে আছে ক্যান্টিনের দেয়ালে। পুবদিকের ময়লা দেয়ালটায়। এই তিনজনের মুখের লম্বাটে আর বাঁকাচোরা ছায়া ওই চৌকো রোদ্দুরের নীচের দিকটায় অল্প অল্প নড়ছে, খুব ঘনিষ্ঠ তিন মুখের সিলুয়েট। যেন ষড়যন্ত্র চলছে এখানে।

ক্যান্টিন এখন ফাঁকা। একটার চা বিলি করে মালগাড়ি ফিরে এসেছে। মালগাড়ি মানে ট্রলি। জাম্বো চেহারার দু'-দুটো কেটলি আর তেমনই একখানা ঢাউস বিস্কুট-ভরতি বয়াম যে-যন্ত্রের ঘাড়ে চেপে কারখানা পরিক্রমা করে, তাকে মালগাড়ি বলবে না তো কী বলবে। উপরন্তু, তার দুলে দুলে চলা, সেই দোলায় কাপের চা চলকে ওঠে। মাল টানে যে।

ওই তো ক্যান্টিনের সর্দার—গোমেজ, অ্যাপ্রন ট্যাপ্রন ছেড়ে রেডি। ভোঁ বাজলেই দৌড় দেবে। কিচেনের বাইরে লম্বা বেঞ্চিটায় বসে বসে ওর নোটবুক খুলে কী সব হিসেব করছে গোমেজ। কাজের ফাঁকে অবসর পেলেই ও হিসেব নিয়ে বসে। খাওয়ায় তো চা আর বিস্কুট। কখনও বিস্কুটের বদলে নোনতা কিছু। তার হিসেবের ঠেলায় অন্ধকার। ব্রাউন টুইডের কোট-পরা গোলগাল মানুষটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল সিকিউরিটির লোটন মুনশি। নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করল, তারপর হাঁক দিল, 'গোমেজদা, একটু গরম জল হবে নাকি?'

'এখন সব শেষ। তালা পড়ে গেছে। আপনারা এখানে কী করছেন, অবেলায়?'

'হেড অপিস থেকে অনিল হালদার আসবে। তার জন্যে অপেক্ষা করছি।' টাইপিং পুলের দেবু রক্ষিত বলল।

'তা এখানে কেন? এটা তো টিফিন খাবার জায়গা। নিজের নিজের সিটে বসে অপেক্ষা করুন। আমি এবার সব বন্ধছন্দ করব। সাতটার জোগাড় দিয়ে বাড়ি যাব।'

'সিটে বসে কি সব কাজ হয় গোমেজদা! আমাদের দরকারি মিটিং আছে।'

'মিটিং! উরেব্বাস! ও তো হেড অপিসে বড় সাহেবের ঘরে হয়।' আবার নিজের হিসেবে মন দেয় গোমেজ। বাবুদের ব্যাপার ওর জানতে বাকি নেই। ওয়ার্কারদের মতো শিফটে কাজ করতে হয় না। দশটায় আসেন, পাঁচটায় চলে যান। এক-একটি ফাঁকিবাজ সব। ওই যে লোটন—এমনিতে ওর কোনও কাজ নেই, কিন্তু কারখানার নিরাপত্তা, কারখানার জিনিসপত্রের নিরাপত্তা, রক্ষা করা ওর দায়িত্ব। দুটোর সময় প্রথম শিফটের শেষ ভোঁ বাজে। ওয়ার্কাররা দলে দলে বেরিয়ে আসে। কার্ড পাঞ্চ করে, চলে যায়। তখন ওর উচিত গেটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা। কোনওদিন থাকে না। সন্দেহজনক মনে হলে ওর উচিত ওয়ার্কারদের সার্চ করা। পকেটে করে একমুঠো স্ক্রু নিয়ে গেলেও তো কোম্পানির লোকসান। এ রকম ঘটনা যে আগে ঘটেনি, তা তো নয়। কোমরে বেল্ট বেঁধে ঘুরে বেড়ালেই ডিউটি দেওয়া হয়ে গেল? মালিকের পেয়ারের লোক। কাউকে গ্রাহ্য করে না লোটন।

নির্মল ছেলেটা নতুন ঢুকেছে। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়েস হবে ছোকরার। রোগা, ফরসা। মাথার লম্বা চুল কান ঢেকে ঘাড় অবধি নেমে গেছে। ঠোঁটের দু'পাশে ঝোলানো গোঁফ। শোনা যায়, খুব চালাক চতুর ছেলে। টাইপিং পুলের দেবু, ওর চেয়ে অন্তত পাঁচ বছর বয়েসে বড়, এখন ওর ল্যাংবোট। যেখানে নির্মল, সেখানে দেবু! দেবুর ওই চাকামতো মুখ আর সিঁথিকাটা টেরি দেখে বোঝা যায়, ওর কোনও ব্যক্তিত্ব নেই। টাইপ মেশিনের সামনে বসে কাজ করে করে, অবিরাম ঠকঠক ঠকঠক শব্দ শুনে ওর বুদ্ধিটা ভোঁতা হয়ে গেছে আস্তে আস্তে। আগে, যখন ওর বিয়েথা হয়নি, তখন এ রকম ছিল না ও। ক্রমশ গেঁজে গেছে। অন্তত, গোমেজ তাই মনে করে।

ওই যে, ছুটতে ছুটতে অনিল হালদার ঢুকছে। হাতে একটা চামড়ার পোর্টফোলিও। গায়ে খাকি রঙের সোয়েটার। গলায় মাফলার জড়ানো। ছোট লম্বাটে মুখ। সামনের দাঁতগুলো মুখের তুলনায় বড়। ক্যান্টিনের দরজা থেকে চাপা গলায় বলার চেষ্টা করল, 'সরি, নির্মলদা। দেরি হয়ে গেল।'

ছুটে এসেছে নিশ্চয়। অনিল হাঁপাচ্ছে আর দাঁত বার করে ক্ষমা চাইছে। চশমার ওপর থেকে আড়চোখে চেয়ে দেখল গোমেজ, দেবুর পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসেছে অনিল। বলছে, 'শেষ মুহূর্তে বড়সাহেব একটা চিঠি ধরিয়ে দিল। আজকেই দিয়ে আসতে হবে! কোথায় লর্ড সিনহা আর কোথায় ব্রেবোর্ন রোড। ককটেলের নেমন্তন্ন—ও তো ফেলে রাখা যায় না।'

তারপর ওরা চাপাস্বরে কথা বলতে থাকে।

'মাল পেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'ক'টা?'

'আজকে একটা প্যাড দিল। আর দুটো কাল দেবে। বলে, এখন কাজ চালিয়ে নাও ভাই।'

'চিঠি সই হয়েছে?'

'হয়েছে।'

অনিল পোর্টফোলিওর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ঘাঁটতে থাকে কাগজপত্র। কিছুতেই হাতে ঠেকছে না দরকারি খামটা। শেষকালে ব্যাগ উপুড় করে ঢালল টেবিলের ওপর। কত জঞ্জাল যে ওর মধ্যে আছে। ওর কাগজ ঘাঁটার উত্তেজনা দেখে অনুমান করা যায় যে, একটা কাজের কাজ ও করে এসেছে, সে জন্যে ও গর্বিত। আবার কাজটা করার পর বেশ ভয়ও পেয়েছে।

কাগজের স্তূপ থেকে টপ করে একটা খাম তুলে নেয় নির্মল সাধুখাঁ।

'এই তো।'

তারপর চারজন মিলে ঝুঁকে পড়ে খামটার ওপর।

খোলা খাম। তার মধ্যে একখানা এক পাতার চিঠি। চিঠির ওপর ছাপার অক্ষরে নতুন ইউনিয়নের

নাম। চিঠির তলায় টাইপ অক্ষরে ইংরেজি ‘প্রেসিডেন্ট’ শব্দটার ওপরে একটা হিজিবিজি সই।

‘নামটা পড়া যাচ্ছে না।’ লোটন মুনশি মন্তব্য করে।

‘মাত্র একটা কপি? দুটো কার্বন কপি থাকা উচিত ছিল, তাই না নির্মলদা?’ দেবু বলল।

অনিল অপরাধীর মতো হাসে।

নির্মল বলে, ‘লেটার হেডটাই আসল। ওতেই কাজ হবে। আর চাই সাহস।’

বলতে বলতে উঠে পড়ে নির্মল। চিঠিখানা ওর পকেটে।

তারপর হন হন করে বেরিয়ে যায় ক্যান্টিন থেকে।

বিপিকো এন্টারপ্রাইজ একটি মাঝারি মাপের বাঙালি শিল্প প্রতিষ্ঠান। তারাতলা থেকে একটু এগিয়ে ডায়মন্ডহারবার রোডের গায়ে তাদের কারখানা। আড়াইশো লোক কাজ করে সেই কারখানায়। বায়ু নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা এদের কাজ। সোজা বাংলায়—নানা প্রকার বিদ্যুৎচালিত পাখা তৈরি করে ওরা। গৃহস্থের প্রয়োজনীয় সিলিং ও টেবিলপাখা। ধোঁয়া ও দুর্গন্ধ নিবারক এক্সস্ট পাখা। পেডেস্টাল পাখা। রেল কামরায় ব্যবহার্য বিশেষ ধরনের তার-ঘেরা পাখা। এক সময় ছিল, যখন এই পণ্য ছিল বিদেশি সংস্থাগুলির একচেটিয়া অধিকারে। শীতের দেশে বসে ওরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী এইসব পাখা তৈরি করেছে, যেমন তৈরি করত ম্যানচেস্টারের ধুতি-শাড়ি। আর, এ-দেশ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে নিয়ে গেছে। অবশ্য, বিদ্যুৎচালিত পাখার হাওয়া খাওয়ার মতো সংগতি অল্প দেশবাসীরই ছিল সেই সময়। তবে, ব্রিটিশ আমল তো, সাহেবরা নিজেদের ও আমলাদের আরামের জন্যে ফ্যান চালিয়েছে। বড়লোকের বৈঠকখানায় ফ্যান চলত। যেখানে বিদ্যুৎ ছিল, সেখানে ফ্যানও ছিল।

দেশ স্বাধীন হবার পর ক্রমে ক্রমে অনেক শিল্পজাত পণ্যের আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন তো খাদ্যদ্রব্য আমদানি করতে গিয়ে আমাদের বিদেশি-মুদ্রার ভাঁড়ার ফাঁক হয়ে যেত। কাঁচা কৃষিজ আর খনিজ পণ্য ছাড়া আর কিছুই আমরা বিদেশের বাজারে বিক্রি করতে শিখিনি। শিল্পজাত পণ্য আমদানি বন্ধ না করলে দেশের লোক কী করে সেগুলি বানাতে শিখবে? অন্তত, যেগুলোর মধ্যে জটিলতা কম। যাতে বিশাল বিশাল মেশিন লাগাতে হয় না।

অবস্থার মোকাবিলা করতে বিদেশি সংস্থাগুলিই এ-দেশে কারখানা স্থাপনে রাজি হয়। মানতে বাধ্য হয় বিভিন্ন শর্ত। যেমন, উচ্চ পদে ভারতীয় নাগরিকদের চাকরি দিতে হবে। যেমন, সংস্থার মালিকানার একাংশ ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। বা, এ-দেশে পাওয়া যায় এমন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশই কারখানার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে। সস্তা হলেও বিদেশ থেকে কিনতে দেওয়া হবে না। ইত্যাদি।

এইসব কড়াকড়ি আস্তে আস্তে চাপানো হয়েছে ওদের ওপর, যাতে ওরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলেও না যায়, আবার আগের মতো দোর্দণ্ড প্রতাপে বিরাজ করতেও না পারে। তারাও জাত-বণিক, সরকারি নিয়ন্ত্রণের চাপ ও বিড়ম্বনা যতখানি পর্যন্ত সহনীয় মনে হয়েছে, সহ্য করেছে। না হলে, ব্যবসা গুটিয়ে বা বিক্রি করে চলে গেছে ভারত ত্যাগ করে।

পঞ্চাশ দশকে কলকাতা ও হাওড়ার শিল্পাঞ্চল ছিল ভারতের প্রধানতম বাণিজ্যকেন্দ্র। কালক্রমে দেশের অন্যান্য রাজ্যেও বহু শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার দু'বছর আগে যুদ্ধ শেষ হয়েছে।

যুদ্ধের সময় ঠিকাদারি ছিল এক ফলাও ব্যবসা। সামান্য মূলধন সম্বল করে যারাই নেমেছিল ঠিকাদারি ব্যবসায়, তারাই ভাগ্য ফিরিয়েছে যুদ্ধের ছয় বছরে। কত মধ্যবিত্ত ঘরের উদ্যোগী ছেলে হয়ে গেছে লক্ষপতি। কলকাতার নিউ আলিপুর পল্লি তো গড়ে উঠল যুদ্ধের টাকায়। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ থেকে উনিশশো পঞ্চাশ—মাত্র এই পাঁচ বছর সময়ে দু'হাজার অট্টালিকা নিয়ে জেগে উঠল নিউ আলিপুর। পুরনো আলিপুরের মতো অভিজাত নয়। নিউ আলিপুর কলকাতার ভুঁইফোঁড় ধনী পল্লি। চওড়া সব পিচঢালা রাস্তা। ঢোকার মুখে লোহার গেট, লন ও বাগান। মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। বাড়িতে বাড়িতে আদুরে কুকুরের দল। সাধারণ পথচারী ওদিক মাড়াত না পারতপক্ষে।

সোমেশ মল্লিক এদের একজন। সি ব্লকে তাঁর তিনতলা বাড়ি এবং সেই বাড়ির নীচের গ্যারাজে চকোলেট রঙের শেভ্রলে গাড়ি একদিন হঠাৎ গর্জে উঠল। তখনও তাঁর হাতে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত টাকা অথচ

ঠিকাদারি ব্যবসায় মন্দার আভাস। সোমেশ মল্লিকের বয়স তখন একচল্লিশ। দশ বছর বয়সের একটি পুত্র, স্ত্রীর কোলে একটি সদ্যোজাত কন্যা। যুদ্ধকালীন এলোমেলো উড়নচণ্ডে জীবন থেকে সরে এসে থিতু হতে চান। সংসারে শান্তি আনতে চান। নিজের পেটের পাকস্থলীর নীচটায় একটি কচি আলসার পাপড়ি মেলতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে রক্ত ঝরায়। তাকে ঠান্ডা দুধ খাইয়ে শান্ত রাখেন। মনে মনে ভাবেন, নিরন্তর টাকা রোজগারের উদ্বেগ থেকে মুক্তি চাই।

এক আর্মি অফিসারের মধ্যস্থতায় সোমেশ মল্লিক এই বিপিকো এন্টারপ্রাইজ নামের পুরনো কারখানাটি কিনে ফেললেন। রবার্ট পারকিন্স নামে এক বুড়ো সাহেব তখন ছিল তার মালিক। নিজে সে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। স্বাধীন ভারতে বসবাস করা তার পক্ষে ছিল কষ্টকর। তার প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল, আর দেরি করলে এ দেশ থেকে হয়তো টাকাকড়ি নিয়ে যেতে দেবে না। তখন ওকে বাকি জীবনটা, ওর বুড়ির বাকি জীবনটাও, হঠাৎ ক্ষমতা পেয়ে-যাওয়া নেটিভদের মন জুগিয়ে চলতে হবে।

ছ'বিঘে জমি পেয়েছিলেন সোমেশ মল্লিক। কারখানাটা অবশ্য ছিল খুবই ছোট। বাইশজন মাত্র ওয়ার্কার ছিল কারখানায়। আপিসের স্টাফ বলতে তিনজন। যা তৈরি হত, তার বেশিরভাগ আমদানি করা অংশ, এখানে নাট-বল্টু লাগিয়ে জোড়া দেওয়া। পাখার ব্লেডগুলো অবধি বুড়ো নিজের কারখানায় বানাত না, হাওড়া থেকে করিয়ে আনত। নিজ হাতে পরীক্ষা করত প্রত্যেকটি ব্লেড। সামান্যতম খুঁত থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরত। নিজের ছিল এক অতি আধুনিক পেন্টশপ। আর সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট।

বব পারকিন্স বলত, পাখা তো চলবেই। চললে হাওয়াও দেবে। আসল কাজ হল ফিনিশিং, জিনিসটার খোলতাই। লোকে দেখলে বলবে, হ্যাঁ, একটা আসবাব বটে। ওই কাজ আমি কারওর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। আর, বিক্রির পর আমার জিনিসের দেখাশোনা, মেরামত—এ তো আমাকেই করতে হবে। বিপিকোর পাখা কখনও বিগড়োয় না। আর যদি বিগড়োয় তবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আবার চালু হয়ে যাবে। বিপিকো তোমার সারাজীবনের সঙ্গী—এজেন্টদের বোঝাত বব—মোর ফেইথফুল দ্যান ইয়োর ওয়াইফ, সামটাইমস।

রোলস রয়েস গাড়ি নিয়ে বব পারকিন্সের একটা প্রিয় গল্প ছিল। অনেককে বলত। গল্পটা এই রকম:

কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এক অভিজাত দম্পতি ইউরোপে বেড়াতে বেরিয়েছে। রোলস রয়েস গাড়ির মধ্যে তাদের খাবারদাবার, যাবতীয় ভ্রমণের সরঞ্জাম। সারাদিন ওরা ড্রাইভ করে। স্বামী দু'ঘণ্টা, তারপর স্ত্রী দু'ঘণ্টা আবার স্বামী দু'ঘণ্টা এইভাবে ফেরাফেরি করে। দু'জনের কেউই ক্লান্ত হয় না তেমন। সন্ধের আগে—সেদিনের মতো যাত্রা শেষ করে দেয়। কাছাকাছি একটা মোটেলে ঢুকে সবাই ডিনার আর রাত্রিবাস সারে। আবার পরের দিন সকালে স্নান করে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে, কোক আর এক কাঁদি স্যান্ডউইচ নিয়ে রওনা হয়। পেট্রোল পাম্পের কাছেই থাকে ছোট ছোট মোটেল। অল্পসল্প মেরামতের কাজ পাম্পেই হয়ে যায়। আল্পসের আশেপাশে পার্বত্য অঞ্চল গ্রীষ্মকালে বেড়াবার পক্ষে আদর্শ জায়গা। গতানুগতিক জীবন থেকে সত্যিকারের মুক্তি যাকে বলে।

একদিন সকালে সুইজারল্যান্ডের বুর্গ-সঁ পিয়ের নামে এক গ্রামের মধ্য দিয়ে ইটালির দিকে যাবার সময় হঠাৎ রোলস রয়েসের ক্র্যাংক শ্যাফট গেল ভেঙে। ইউরোপের গ্রামাঞ্চল যত উন্নতই হোক, রোলস রয়েসের স্পেয়ার পার্টস সর্বত্র পাওয়া যায় না। অগত্যা ওরা লন্ডনে টেলিফোন করে জানাল দুর্ঘটনার কথা। খোদ রোলস রয়েসের দপ্তরে। কত শখের ভ্রমণ, মাঝপথে ভন্ডুল হয়ে যাবে?

'তারপর কী হল জানো? বব পারকিন্স হাসতে হাসতে বলত, 'ছুটে এল রোলস রয়েসের মিস্ত্রি। লন্ডন থেকে জেনিভা, প্লেনে। তারপর জেনিভা থেকে ট্যাক্সি ধরে ওই পার্বত্য গ্রামে। লাঞ্চ টাইম নাগাদ নতুন ক্র্যাংক শ্যাফট পরে রোলস রয়েস প্রস্তুত।'

এই অবধি বলে বব পারকিন্স মিটমিট করে হাসত চুপ করে। অর্থাৎ গল্পটা এখনও শেষ হয়নি। গল্পের মজা আরও পরে।

'দেশে ফিরে গিয়ে সেই ব্রিটিশ দম্পতি প্রথমেই রোলস রয়েস কোম্পানির সার্ভিস ম্যানেজারকে টেলিফোন করল। ধন্যবাদ জানাল তৎপরতার জন্য। আর জানতে চাইল, কত খরচ পড়েছে। সার্ভিস ম্যানেজার কী বলল জানো? বলল, আপনি ভুল করছেন স্যার। রোলস রয়েসের ক্র্যাংক শ্যাফট কখনও ভাঙে না। আপনি বোধহয় স্বপ্নটপ্ন দেখে থাকবেন।'

একেই বলে সার্ভিস।

বহুদিন হল রবার্ট পারকিন্স চলে গেছে। ওর প্রাপ্য টাকা কিছুটা নগদে, বাকিটা দশ বছরের কিস্তিতে মিটিয়ে দিয়েছেন সোমেশ মল্লিক। বিদেশি মুদ্রায় টাকা পাঠাবার যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি নিজে করে দিয়েছিলেন। তখন এত কড়াকড়ি ছিল না। পাউন্ডের দাম ছিল তেরো টাকা।

সেই দশ বছর বুড়ো চিঠিপত্র লিখেছে মাঝে মাঝে। কারখানার খোঁজখবর করেছে। সোমেশের কাছে জানতে চেয়েছে ওর সবচেয়ে অনুগত ও বিশ্বস্ত কর্মী ভুবন চৌধুরীর কথা। সে আছে? না, মরে গেছে? যতদিন পারবে, ভুবনকে রেখো। তোমার নিজের ছেলে বিট্রে করতে পারে সোমেশ। তাকে তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো না, কিন্তু ভুবন? নেভার। বড় বড় অক্ষরে হাতে লেখা সেইসব চিঠি সোমেশ রেখে দিয়েছেন।

সোমেশও উত্তর দিতেন হাতে লিখে। তারক হাজরা, তাঁর পি এ। ব্যক্তিগত সমস্ত ব্যাপার তার জিম্মায়। একটি কথাও সে ফাঁস করে না। তাঁর কত গোপনীয় কাণ্ডকারখানা সে জানে, কত মারাত্মক দলিল তার আয়ত্তে। মিসেস ঘোষের পুত্রবধূ এক নার্সারি স্কুল চালায়। তার নাম মিসেস মুখার্জি। ওরা মাঝে মাঝে সোমেশের অফিসে আসে। কিন্তু মিসেস ঘোষের পুত্রবধূ কী করে মিসেস মুখার্জি হয়, সে-রহস্য, সে-জট খুলতে পারে একা তারক হাজরা। কে শাশুড়ি আর কে পুত্রবধূ—এখন আর দূর থেকে বলা যাবে না।

তারকের টাইপ মেশিন বিদ্যুৎচালিত। ছাপার অক্ষরের মতো সুন্দর সাজানো লাইন বেরিয়ে আসে ওই মেশিন থেকে। তবু বব পারকিন্সের চিঠি সোমেশ হাতেই লিখতেন। হাতে লেখার অভ্যাস নেই। সময় লাগত। একটা গোটা সকাল হয়তো লেগে গেল দু'পাতা চিঠি লিখতে। তা হোক। বাড়ি থেকে সেদিন মনস্থির করে আসেন। চেম্বারে ঢুকে লাল আলোর বোতাম টিপে দেন, যার মানে, প্রবেশ নিষেধ। বলে দেন, কোনও কল যেন তাঁকে দেওয়া না হয়।

এইটুকু সৌজন্য রবার্টের প্রাপ্য।

বড়দিনের এক মাস আগে প্রত্যেক বছর একটি মাঝারি মাপের প্যাকেট সোমেশ মল্লিকের কাছ থেকে মিস্টার ও মিসেস পারকিন্সের নামে উপহার যেত। দার্জিলিঙের সবচেয়ে দামি সুগন্ধ চা-পাতা কলকাতা থেকে যেত ইয়র্কশায়ারে। গ্রামের নাম, ইস্কলে, বাড়ির নাম, দি রিট্রিট।

দশ বছরের মাথায় যখন ওর সঙ্গে বিপিকো এন্টারপ্রাইজের সম্পর্ক চুকে যাবার মুখে, সেই সময় পারকিন্স কলকাতায় এসেছিল। শেষবারের মতো। একা। প্রথম যৌবনের স্বপ্ন দিয়ে গড়া এই কারখানা দেখতে এসেছিল। এর প্রত্যেকটি মেশিন ওর চেনা। প্রত্যেকটি ঘর, প্রত্যেকটি সিঁড়ি, ওর নিজের চেম্বার, তার কোলে পেতলের রেলিং-ঘেরা ব্যালকনি—সর্বত্র ওর নিশ্বাস লেগে আছে। তখন তো সময় এত দ্রুত বইত না।

ও ক্যালকাটা!

ওর প্রিয় ক্লাব, ওর বহু পরিচিত ফার্পো, ফার্পোর কার্পেট-মোড়া হলঘর, সাদা চাদর-পাতা গোল গোল টেবিল, উঁচু পিঠের কালো মেহগনি কাঠের চেয়ার—মায় ফার্পোর ককটেল সসেজের স্বাদ অবধি ওর মনে আছে। ওর চোখে, জিভে, আঙুলের স্পর্শে, কামনায়, লেগে আছে। প্রথম যৌবনে প্রভুত্ব করতে এসেছিল। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর প্রভুত্ব করেছে। উপভোগ করেছে। এত সহজে সে সব কি ভোলা যায়।

কলকাতায় এসে সাতদিন ছিল বুড়ো। চোখে ভাল দেখতে পায় না তখন।

সোমেশ নিজের খরচে ওকে গ্র্যান্ড হোটেলে তুললেন।

যেখানে যেখানে ওর যাওয়ার সাধ, নিজে সঙ্গে করে ওকে নিয়ে গেলেন সেখানে। এমনকী, ওর শনিবার বিকেলের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা—রেস কোর্স পর্যন্ত।

সোমেশ জানতেন না, কলকাতা শহরে রবার্ট পারকিন্সের এক প্রেমিকা ছিল। তার নাম বারবারা। বারবারা হিউজ। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। একদিন বব তার ঠিকানা দিয়ে বলে, 'দেখো তো, এর খোঁজ পাও কিনা। একদিন মিট করতে চাই।'

না, বারবারাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। রয়েড স্ট্রিটের সেই ঠিকানায় এখন পারসিরা থাকে। তারা বলল, সে তো কবে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। পৃথিবীর এক প্রান্তে ইংল্যান্ড আর অন্য প্রান্তে অস্ট্রেলিয়া। ও ক্যালকাটা।

সেদিন বিকেলে ওর পুরনো ক্লাবের প্রশস্ত লনে সাদা বেতের চেয়ারে বসে পারকিন্স বিয়ার খাচ্ছিল। মেরুন সোয়েটার-ঢাকা পিঠের ওপর শীতের নিস্তেজ রোদ পড়ছিল। উজ্জ্বল পুঁতির মতো ঝকঝক করছিল কাচের মাগে ছোট ছোট বুদবুদ। সোমেশ বসেছিলেন ওর উলটো দিকের চেয়ারে। চা সহযোগে ওকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। বারবারা হিউজের কোনও সন্ধান দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সোমেশ খানিকটা হতাশ।

হঠাৎ পারকিন্স প্রশ্ন করে, 'তোমার ছেলে কী করছে সোমেশ? কত বয়েস হল তার?'

'পঁচিশ।'

'ও, এত বড় হয়ে গেছে। তা তো হবেই। টাইম ফ্লাইস।'

পারকিন্স জিজ্ঞেস করে, 'তোমার বিজনেসে ওকে নিয়েছ? না, ওর অন্য কিছু করার ইচ্ছে?'

সোমেশ বলেন, ও তো আমার মতো নিধিরাম নয়। কোয়ালিফায়েড ইঞ্জিনিয়ার। একটা কোনও বড় ফার্মে চাকরি নিয়ে নিশ্চিন্তে জীবন উপভোগ করার মতলব ছিল ওর। এখনকার জেনেরেশান যেমন। আমি ওকে টেনে নিয়ে এসেছি।'

সোমেশ বলেছিলেন, 'একেবারে শপ ফ্লোর থেকে শুরু করেছি। এখন ও টুলরুম সুপারভাইজার।'

'গুড।'

এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হবার কথা। কিন্তু, যেন বলতে হবেই, বব পারকিন্স বলল, 'ছেলের কোনও বিকল্প নেই, বুঝলে। মুশকিল এই যে, ওরা বাপকে একদিন বিট্রে করবেই।'

সেই শেভ্রলে গাড়ি এখন আর নেই। তার বদলে এখন সাদা নেটিভ গাড়ি—অ্যামবাসাডর। এয়ারপোর্ট যাবার পথে কলকাতা শহরের পরিবর্তন দেখতে দেখতে বুড়োর বলিরেখাময় ফরসা মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। সবকিছু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। পুরনো জিনিসের আর কদর থাকছে না।

অমনই অনিচ্ছায় বুড়ো সাহেব প্রায় বলে ফেলেছিল যে, সব প্রগতিই কাম্য নয়। ঠিক সেভাবে বলেনি। ব্রিটিশ জাত আয়রনি ভালবাসে। বিষয়ের ওপর বাঁকাভাবে শব্দ ফেলে। কারখানার উপমা দিয়ে বুড়ো বলেছিল, 'মেশিনের আচরণ তুমি আগে থেকে বলে দিতে পারো। দুটো মিলিং মেশিন একরকম ব্যবহার করবে। কিন্তু, মানুষ প্রত্যেকে আলাদা। নামে ওয়ার্কফোর্স। আসলে, এক-একটা ওয়ার্কার এক-একটা ইউনিক প্রবলেম।'

কথাটা ঠিক।

কত রকম মানুষ। কত রকম যে ওদের সমস্যা। বছরের পর বছর সোমেশ তো দেখছেন।

একটা বড় পরিবারের কর্তা সোমেশ মল্লিক চেষ্টা করেন ওদের অসুবিধের খবর রাখতে। ওঁর চেম্বারের দরজা সকলের জন্যে খোলা। জনে জনে ওরা বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের খবর দেয়। কখনও উপদেশ দেন। কখনও কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেন সোমেশ।

এরপর আরও সাত বছর কেটে গেছে।

বিপিকোর হেড অফিস সরে এসেছে অন্যত্র। হেড অফিস সরিয়ে আনার পর একটু দম ফেলার অবকাশ পেয়েছেন সোমেশ। কারখানা থেকে লর্ড সিনহা রোড খুব দূরে নয়। টেলিফোন আছে। দু'বেলা পিয়োন মেল নিয়ে যাতায়াত করে।

প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কারখানায় একবার ঢুঁ না মেরে তিনি হেড অফিসে আসেন না। বুড়ো পারকিন্সের ঘরখানা এখন বাতানুকূল। মেঝেয় কার্পেট। ঢাউস মাপের চেয়ার-টেবিল বদলে দোহারা চেহারার ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। সেখানে ডিপার্টমেন্টাল মিটিং হয়।

তিনি বেরিয়ে গেলে তালা পড়ে যায় সেই ঘরে।

তক্কে তক্কে ছিল নির্মল সাধুখাঁ। বেঞ্চিতে বসে লিফটম্যানের সঙ্গে গল্প করছিল। ঠিক ছ'টা পঁচিশে বড়সাহেব নামলেন। পেছনে পেছনে তাঁর খাস-বেয়ারা বিষ্টু ব্যাগ বয়ে নিয়ে গেল। ড্রাইভার সাদা গাড়িখানা ব্যাক করে সিঁড়ির মুখটায় এনেছে। কোনও দিকে না তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন বড়সাহেব। ফিরে গেল বিষ্টু।

আরও দশ মিনিট। পনেরো মিনিট।

এবার একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায় নির্মল। একসময় তারক হাজরাও বেরিয়ে গেল।

এবার সে উপরে উঠে যায়। গিয়ে দেখে, অফিসের দরজা ভেজানো। বিষ্টু পার্টিশনের কাচ মাজামাজি করছে। গায়ে গেঞ্জি, পরনে খাকি প্যান্ট। পশমের ইউনিফর্ম ছেড়ে সাফাই নিয়ে লেগেছে।

নির্মলকে দেখে বিষ্টু কাজ থামিয়ে দাঁড়ায়।

'কাকে চাই?'

'আমি ফ্যাক্টরি থেকে আসছি। বড়সাহেব বেরিয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওঃ হো, একটা দরকারি চিঠি ছিল যে!'

'চিঠি? তো কাল সকালে বড়সাহেবকে ওখানেই দেবেন।'

'খুব আরজেন্ট। আজই সাহেবের কাছে পৌঁছোনো দরকার।'

'তা আগে এলেন না কেন? ছটার পর সাহেব নেমেছেন।'

'রাস্তায় যা জ্যাম—'

'এখন আমি কী করব? নীচের লেটারবক্সে ফেলে দিয়ে যান।'

একটা চেয়ার টেনে বসল নির্মল। খানিকটা চিন্তা করল। তারপর বলল, 'তা হয় না বিষ্টু। ভাই, তুমি তো ওদিকেই যাবে। খামটা সাহেবকে বাড়িতে দিয়ে যেতে পারবে না? একদিন দেরিতে পৌঁছোলে উনি আবার রাগারাগি করবেন।'

বাড়িতে? বিষ্টু চিন্তায় পড়ে যায়। বেহালায় থাকে ও, নিউ আলিপুর থেকে একেবারেই দূরে নয় বেহালা। চিঠিটা রাখবে কি রাখবে না, ও বুঝে উঠতে পারে না। তারকদা নেই যে জিজ্ঞেস করবে। সাহেব যদি জানতেন, চিঠিটা আসবে, তা হলে নিশ্চয় বলে যেতেন ওকে। কিছু বলেননি। আবার, না নিলে যদি রাগ করেন?

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ও নির্মলের মুখের দিকে তাকায়।

'আপনার নাম কী? কোন ডিপার্ট?'

'আমাকে চিনবেন না সাহেব। পারচেসে কাজ করি। এফ. এম. বললেন, শিগ্‌গির দিয়ে এসো সাহেবের হাতে। তো, পৌঁছোতেই লেগে গেল এক ঘণ্টা।'

বিষ্টুর বুক ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করে। ও যেন একটা অমঙ্গলের গন্ধ পায় চিঠিটার মধ্যে। আবার, না নেবার কোনও যুক্তি খুঁজে পায় না।

'তো, এফ. এম. সাহেব ছোটসাহেবকে দিলেন না কেন?'

'ছোট সাহেব আজ দেরিতে বাড়ি ফিরবেন বললেন। নইলে তাঁর হাতেই দিয়ে দিতেন। তুমি বড্ড জেরা করছ বিষ্টু, নির্মল সাধুখাঁ এবার বিরক্তি প্রদর্শন করে, 'না নাও তো ফেরত নিয়ে যাচ্ছি। কোম্পানির কাজ—এত কীসের?'

বিষ্টুর প্রতিরোধ এতে ধসে যায়। তবু ও শেষ চেষ্টা করল।

'আমারও দেরি হবে। ন'টার আগে খামটা পৌঁছোবে না কিন্তু। সাহেব যদি শুয়ে পড়েন তো আমি জানি না।'

'ঠিক আছে। তাই দিয়ো ভাই।'

ওপরে একটা বড় সাদা রঙের খাম। মুখ বন্ধ। তাতে শুধু এক লাইন টাইপ করা। মিস্টার এস, মল্লিক। ভেতরের আরেকটা ছোট খাম। তার মধ্যে নবজাত ইউনিয়নের সুসংবাদ।

চিঠিটা ধরিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। বিষ্টু ওকে ডাকল।

'আপনার নামটা বলে যান। হ্যাঁ, আপনার নাম আমি জানতে চাই।'

একটু চুপ করে থেকে নির্মল তার বিনয়ের মুখোশখানা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার নাম নির্মল সাধুখাঁ। মনে থাকবে তো?'

তারপর কী মনে করে হাত বাড়িয়ে বিষ্টুর করমর্দন করে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

পরের দিন সকালে কারখানায় না গিয়ে সোজা হেড আপিসে চলে এলেন সোমেশ মল্লিক। তখন ন'টা বেজে দশ মিনিট। বিষ্ণুচরণ তার নীল পশমের ইউনিফর্ম পরে টুলে বসে আছে।

যথারীতি ও উঠে দাঁড়িয়ে সালাম করল।

'তারকবাবু এসেছে?'

'না স্যার।'

চুপচাপ নিজের চেম্বারে গিয়ে ঢুকলেন সোমেশ মল্লিক।

বিষ্টু তাঁর কোটখানা হ্যাঙারে টাঙিয়ে দিয়ে চলে গেল। সকালবেলা ড্রাইভার ব্যাগ নিয়ে আসে। সে-ও ঘরে ঢুকে ব্যাগটি যথাস্থানে রেখে চলে যায়।

বেশ বড় ঘরখানা। কমলা রঙের ভারী পরদা দিয়ে ঘেরা। সবুজ লনের মতো কার্পেট দিয়ে ঢাকা মেঝে। এক কোণে তাঁর বসার টেবিল। হাতলওলা ঘুরন-চেয়ার। একটু দূরে বড় গোল টেবিল। টেবিল ঘিরে আটখানা হাতলছাড়া গদি মোড়া চেয়ার। ওটা মিটিঙের জায়গা।

সোমেশ মল্লিক ঝোলানো কোটের বুকপকেট থেকে খামখানা তুলে আনলেন। বসে বসে বার কয়েক পড়লেন চিঠিটা।

বিপিকো এন্টারপ্রাইস এমপ্লয়িস ইউনিয়ন! লিখছে, আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, উপরে নামাঙ্কিত ইউনিয়নটি নথিভুক্ত হয়েছে। শীঘ্রই আমাদের চার্টার অব ডিমান্ডস ম্যানেজমেন্টের কাছে পেশ করা হবে। ইতি—প্রেসিডেন্ট।

কী আস্পর্ধা।

গতকাল রাত থেকে এই দুটো শব্দই মনে আসছে তাঁর। বিপিকো এন্টারপ্রাইসের হর্তাকর্তা বলতে একজনকেই বোঝায়। এটা কে? এই লোকটা কোথা থেকে জুটল? সই দেখে নাম পড়া যাচ্ছে না। তামাশা!

মাঝে মাঝে উড়ো চিঠি আসে তাঁর কাছে। কত আজেবাজে কথা থাকে তার মধ্যে। হিংসুটে লোকেদের নালিশ থাকে গোপন খবরের অছিলায়। নিজেদের নাম জানাতে ভয় পায় তারা। গ্রাহ্য করেন না সোমেশ মল্লিক। টেবিলের নীচে ঝুড়িতে ফেলে দেন। তারপর ভুলে যান।

একবার ভাবলেন, এটাকেও ছিঁড়ে বাস্কেটে ফেলে দেবেন।

সাধুখাঁ বলে একজন হাতে করে পৌঁছে দিয়ে গেছে। সাধুখাঁ নামটা মনের মধ্যে খচখচ করছে কাল রাত্তির থেকে। ভেবেছিলেন, ছেলেকে জিজ্ঞেস করবেন, কে এই ছোকরা? এই চিঠি হাতে করে আপিসে দিয়ে গেছে, এত সাহস তার হল কী করে? কিন্তু ব্যাপারটা এখনই কেউ জানুক তা তিনি চান না। তুচ্ছ একটা চিঠি, একে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত হবে না। অগ্রাহ্য করাই ভাল।

স্টেনো আসতেই ডেকে পাঠালেন।

বললেন, 'সাধুখাঁ নামের এক ভদ্রলোক অনেকদিন আগে আমাকে চিঠি লিখেছিল। মনে পড়ে? দু'-তিন বছর আগে। দেখাও করেছিল বোধহয়। ফ্রিডম ফাইটার। খুব গরিব। দেখো তো, চিঠিটা খুঁজে পাও কিনা। ফাইলে থাকবে।'

আধঘণ্টা পর তারক ফাইলখানা নিয়ে আসে।

এই তো সেই চিঠি।

কমলকুমার সাধুখাঁ। এই তো আন্ডারলাইন করা রয়েছে জায়গাটা—'দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে কী পেলাম? দারিদ্র্য আর হতাশা! পাঁচজনের সংসার। মেয়েদের বিয়ে দিতে পারিনি। স্ত্রী দীর্ঘদিন অসুস্থ শয্যাশায়ী। ছেলেটি সবে বি কম পাশ করেছে। ওকে একটা কাজ দিন আপনার কারখানায়। আপনি একজন মহানুভব শিল্পপতি। বাঙালির গৌরব। আপনার দয়া ভিক্ষা করছি।

পাশের মার্জিনে তাঁর নিজের হাতের লেখা—এফ, এম। অ্যাকশন। ফাইল।

তারক বলল, 'স্যার, পারচেসের নির্মল সাধুখাঁ তো এঁরই ছেলে।'

'ওকে ডেকে পাঠাও।'

সেদিন বিকেলে ক্যান্টিনের কোণের টেবিলে আবার মিনিসভা বসল। পরামর্শ করল তিনজনে।

'বড়সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে।'

'তাতে কী? তুই বলবি, আমি একা নই স্যার। আমার সঙ্গে কারখানার সমস্ত ওয়ার্কার, স্টাফ আছে। বলবি, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তো কোনও অপরাধ নয়।'

সিকিউরিটির লোটন মুনশির সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেবু রক্ষিত বলল, 'আমরা আছি। তোর ভয় কীসের? সুধীরদা আছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট। এত বড় লিডার। দেখিস, পা যেন না কাঁপে।'

ওদের কাছ থেকে ভরসা পেয়েও নির্মলের বুক দুরদুর করতে থাকে। আবার, একটা বিশাল কর্মযজ্ঞে শামিল হতে পারছে ভেবে ও গর্ববোধ করে। আজ তার অভিজ্ঞতা নেই। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে লড়াই করেনি কখনও। সুধীরদা বলেছেন, 'করতে করতে শিখবে। একদিন তুমিও লিডার হবে।'

নির্মল বলল, আপনারাও আমার সঙ্গে আসুন। এ তো আমার একার ব্যাপার নয়। সকলের ব্যাপার। বড়সাহেবের সামনে তিনজন দাঁড়ালে জোর হবে।'

'না।' লোটন মুনশি বলল, 'আমরা সঙ্ঘবদ্ধ, এই ছবিটা স্পষ্টভাবে এখনই দেখানো ঠিক হবে না। চার্টার অব ডিমান্ডস পড়লেই বুঝতে পারবে। তার আগে ভাবুক না তুই একা। তুই লোক খেপাচ্ছিস। কী করবে ম্যানেজমেন্ট? ওয়ার্নিং দেবে প্রথমে। দিকগে।'

'যদি কাজ ছাড়িয়ে দেয়?'

'অত সোজা। আগুন জ্বলবে নির্মল, তা হলে কারখানায় আগুন জ্বলবে। বলে দিলাম।'

এতক্ষণ নিচু গলায় কথা হচ্ছিল। এবার দেবু রক্ষিতের উচ্চকণ্ঠ ক্যান্টিন সর্দারের কানে যায়।

গোমেজ খানিকক্ষণ ওদের টেবিলটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তারপর চিৎকার করে বলে ওঠে, 'বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যান আপনারা এখান থেকে। এখুনি বেরোন। এটা আড্ডা মারার জায়গা নয়। আমি ক্যান্টিন বন্ধ করব।'

—'ঘাবড়াচ্ছ কেন গোমেজদা?' দেবু বলে ওঠে, 'তোমার ক্যান্টিনে আগুন ধরাচ্ছে না কেউ। ও তুমি নিজেই ধরাবে।'

প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে ওদের মিনিসভা শেষ হয়। পেছনে গজগজ করতে থাকে গোমেজ। না, ব্যাপারটা হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ছোটসাহেবকে খবরটা দেওয়া দরকার, ও ভাবল। আবার ভাবল, আজ থাক। আরও দু'-একদিন দেখি।

মাথা নিচু করে ওয়ার্নিং খেয়ে ফিরে এল নির্মল সাধুখাঁ। বড়সাহেব আগাপাশতলা ঝেড়েছে। বাবার চিঠি পড়ে শুনিয়েছে। বলেছে, তুমি একটি কুলাঙ্গার। অমন আদর্শবাদী বাবার কী করে এমন বখাটে ছেলে হয়। নির্মল বলতে চেয়েছিল, সে-ও আদর্শবাদী। বাবা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এখন দেশ স্বাধীন। সে শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নেমেছে। সে দেশকে শোষণমুক্ত দেখতে চায়। শ্রেণীহীন সমাজ গড়তে চায়। তা কি অপরাধ? কিন্তু এত কথা বলার সাহস তার হয়নি। এ-কথা তো ঠিক যে, বাবা আদর্শ রাখতে গিয়ে আজ চরম দারিদ্র্য বরণ করেছেন। সে কি ততদূর অবধি বাবার পথে চলবে? না। আপাতত, এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ওকে আত্মসম্মান নিয়ে টিকে থাকতে হবে।

একসময় আদর্শবাদীরা নির্ভয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। সে প্রাণ বিসর্জনের নীতি সমর্থন করে না। সকলের সচ্ছলতা আসুক, মানুষ পেট ভরে খেতে পাক, ভদ্র জীবন যাপন করার মতো সুযোগসুবিধে পাক, শ্রমের মূল্য বাড়ুক, তাই তারা চাইছে। না, 'শোষণ' শব্দটা সে উচ্চারণ করতে না পারায় কিছুই বলতে পারেনি।

এদিকে একদিন নিউ আলিপুরের বাড়িতে ব্রেকফাস্ট টেবিলে পিতাপুত্রের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল।

সোমেশ মল্লিক চামচ দিয়ে কুরে পাকা পেঁপে খাচ্ছিলেন। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলেন, "কারখানায় কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, কিছু খবর রাখিস?'

'এ-মাসে প্রোডাকশন কিছু কম। ব্যাঙ্ক মাল বার করতে দেয়নি পাঁচ দিন,' কফি খেতে খেতে প্রকাশ বলল, 'মাসের শেষাশেষি ঠিক হয়ে যাবে। এফ, এম-এর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।'

'আর কোনও কথা হয়নি?'

'কী বিষয়ে?'

'কতকগুলো উটকো লোক মিলে দল পাকাচ্ছে, সেই বিষয়ে?'

প্রকাশ বলল, 'ইউনিয়ন করছে শুনছি। করুক।'

'করুক মানে? কীসের ইউনিয়ন? কার ইউনিয়ন? আমার হাতে-গড়া এই কারখানা। প্রত্যেকটি ওয়ার্কারকে, স্টাফকে আমি চাকরি দিয়েছি। তারা এইখানে কাজ শিখেছে। কতকগুলো বাইরের গুন্ডা এসে ওদের উসকানি দেবে, আমি সহ্য করব না।'

'কলকাতায় ইউনিয়ন করতে কোনও উসকানি লাগে বাবা? এতদিন যে হয়নি, আমাদের ভাগ্য।'

'ভাগ্য নয়। এতদিন আমি কারখানায় বসতাম। এসব নষ্টামি হতে দিইনি। যেই সরে এসেছি, তোমাদের ওপর নির্ভর করেছি, অমনি—'

'আমি জানি কারা কারা এর মধ্যে আছে।'

'সাধুখাঁ।' সোমেশ মল্লিক পেঁপের খোসা নামিয়ে রেখে বললেন, 'সেই ছোঁড়া, যাকে কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে চাকরি দিয়েছিলাম। এখনও দু'বছর হয়নি। রিং লিডার সে—'

'না বাবা,' প্রকাশ বলল, 'সে রিং লিডার নয়। রিং লিডার যদি বলো, সে হচ্ছে একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। প্রেসিডেন্ট। চিফ মিনিস্টারের কাছের লোক।'

'ওরা চার্টার অব ডিমান্ডস দেবে বলে হুমকি দিয়েছে। সই জোগাড় করে বেড়াচ্ছে শপ ফ্লোরে। এখনই বাধা দাও। কুঁড়ি থাকতে মটকে দাও। পরে সামলাতে পারবে না।'

এইবার সোমেশ ধূর্ত চোখে ছেলের দিকে তাকালেন।

'কীরে, ভয় পাচ্ছিস?'

'কীভাবে বাধা দিতে চাও তুমি?'

'ফাঁদ পেতে ধরো রিং লিডারদের। স্যাক করো। কাজে গাফিলতি করছে দেখলেই চিঠি ধরিয়ে দাও। চাকরি চলে যাচ্ছে দেখলে অন্যরা ভয়ে আর ভিড়বে না।'

'ভয় পাচ্ছি না। শুধু জানতে চাই, তুমি সরকারের নীতির বিরুদ্ধে যেতে চাও?'

'কারখানা কার? সরকারের না আমার? লোকশান হলে সরকার আমাকে দেখবে?' সোমেশ টেবিলে ঘুঁষি মেরে বললেন, 'আমার সম্পত্তি আমি আগলাব, এতে নীতির বিরুদ্ধতা কোথায়?'

প্রকাশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

বাবা যা বলছে, তার একটা কথাও মিথ্যে নয়। আসলে, প্রথম থেকে ফ্যাক্টরি ম্যানেজার ওকে বুঝিয়ে আসছে যে, ইউনিয়ন জিনিসটা সব কারখানায় এক স্বাভাবিক ব্যাপার। সে আগে যেখানে কাজ করত, সেখানে তিন দলের আলাদা আলাদা ইউনিয়ন ছিল। জমিদারি প্রথায় কারখানা চালানোর দিন চলে গেছে। ডিলার, সাপ্লায়ার, ব্যাঙ্ক—এদের সঙ্গে যেমন মিলেমিশে কাজ করতে হয়, এই লেবার শ্রমিকদের সংগঠন, এদের সঙ্গেও একসময় সেই রকম মিলেমিশে কাজ করতে হবে। এরা এক-একজন পৃথক মানুষ। এক-একজন উপকৃত কর্মচারী, কৃতজ্ঞ ভৃত্য, ভাবলে ভুল হবে। এরা সব মিলিয়ে একটা লেবার ফোর্স। এরা কারখানায় শ্রম সরবরাহ করে। শ্রমের মূল্য আর অন্যান্য শর্ত নিয়ে দরাদরি করার রাইট এদের আছে। এফ. এম. একজন অভিজ্ঞ লোক। এইসব বিষয়ে পড়াশোনা করেছে সে।

এফ. এম. বলে, দরে না পোষালে চলে যাও, শ্রমিকদের বেলা ওই নীতিটি শুধু খাটে না। তখন দেশের বৃহত্তর মানবিকতার প্রশ্ন এসে পড়ে। রাজ্য সরকার সালিশি করতে এগিয়ে আসে।

এইসব শুনে প্রকাশের মনে হয়েছিল, আয়ত্তের বাইরে চলে না গেলেই হল। ক্যান্টিন সর্দার গোমেজ ওকে নিয়মিত খবরাখবর দিয়ে যাচ্ছে। দেখা যাক না, কতদূর গড়ায়।

এখন বাবার কথা শুনে মনে হচ্ছে, সবটা এত সরল অঙ্ক না-ও হতে পারে। শুধু কারখানা কেন, সমস্ত ব্যবসাটাই তো মল্লিক পরিবারের সম্পত্তি। লাভ হচ্ছে, চলছে। লোকসান হলে তো কেউ ঘাড় পেতে তার দায়িত্ব নেবে না। ওই চার্টার অব ডিমান্ডস মূলত লাভের গুড়ে ভাগ বসাবার একটা ফন্দি।

'ঠিক আছে।' প্রকাশ বাবাকে বলল, 'তুমি এখনই এ নিয়ে মাথা গরম কোরো না। আমি দেখছি।'

যেদিন চার্টার অব ডিমান্ডস-এর ফিরিস্তিসুদ্ধ মোটা খামখানা আর সব খামের সঙ্গে বড়সাহেবের টেবিলের ওপর চুপি চুপি রেখে আসে অনিল হালদার, তার পরদিন নির্মল সাধুখাঁ বরখাস্ত হল।

অপরাধ, টিফিন টাইমের পর থেকে তাকে আপিসে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এক সাপ্লায়ারের কাছে মালের তাগাদায় যাবার কথা, সেখানেও যায়নি সে। বিকেল পাঁচটার পর ক্যান্টিনে সে উচ্চস্বরে তর্ক করেছে কয়েকজন ওয়ার্কারের সঙ্গে।

এফ. এম. বলেছিল, 'সাসপেন্ড করি। এনকোয়ারি হোক। তারপর ডিসমিস করা যাবে।'

প্রকাশ, কিউ সি অর্থাৎ কোয়ালিটি কনট্রোলার, কিন্তু মনিবের ছেলে। সে বলেছিল, 'না। ওর সুপারভাইজারের কাছ থেকে একটা লিখিত রিপোর্ট নিয়ে রাখুন। বরখাস্ত করে দিন। একটা দৃষ্টান্ত থাকুক। সকলে জেনে যাক, কোনও রকম বেয়াদবি সহ্য করা হবে না এ-কারখানায়।'

সন্ধেবেলা মিটিং ডাকলেন সোমেশ মল্লিক।

কারখানার জনা ছয়েক অফিসার আর প্রকাশ, তিনখানা গাড়িতে চড়ে হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হয় লর্ড সিনহা রোডের হেড অফিসে। ঘরের বাইরে লাল আলো জ্বালিয়ে দেড় ঘণ্টা ধরে চলল সেই মিটিং।

বড়সাহেবের স্টেনো তারক হাজরা বাইরের ঘরে টাইপ মেশিনের সামনে বসা। বিষ্ণুচরণ একবার কফি দিয়ে এসেছে ভেতরে।

পিয়োন অনিল হালদার তার বড় বড় দাঁত বার করে হাসে।

জিজ্ঞেস করে, 'কী দেখলে? বিষ্টু, সাহেবরা খুব খেপে আছে?'

বিষ্টু জবাব দেয় না। গোঁজ হয়ে নিজের টুলে বসে থাকে। আর ঘণ্টি বাজার জন্যে অপেক্ষা করে। মাঝে মাঝে লাল আলোটার দিকে তাকায়।

অনিল আবার খোঁচা মারল ওকে।

'বেচারা সাধুখাঁ। অমন আরামের চাকরি এক কথায় কুচ। বড় করে মায়ের পুজোর ব্যবস্থা হচ্ছে। মা আবার বলি ছাড়া পুজো নেন না। তাই না বিষ্টু?'

বিষ্টু গর্জে ওঠে, 'লম্বা লম্বা কথা বোলো না অনিল। এক ঘুঁষিতে তোমার দাঁত দুটো ভেঙে দেব। পিয়োন, পিয়োনের মতন থাকবে।

কাচের এপাশে তারক হাজরা সব খবর জেনেও চুপ। শুধু শুনে যাচ্ছে ওদের কথাবার্তা। শত প্ররোচনায় ওর মুখ থেকে একটি কথাও বেরোবে না।

অনিল হালদার যে ইউনিয়নের চর, সে-কথা ও জানে। একদিন ওরও নির্মলের দশা হবে। ঘুঁটে পুড়ছে আর গোবর হাসছে, ও মনে মনে ভাবল। আর, জানলা দিয়ে বাইরের শিরিষ গাছটার দিকে চেয়ে রইল। কী প্রকাণ্ড গাছ অথচ কী ছোট ছোট ফুল! ও ক্যালকাটা।

এক দিক থেকে ভাবলে বিচ্ছিন্ন, আবার অন্য দিক থেকে দেখলে, ঠিক ততটা বিচ্ছিন্ন নয়, এরপর একটার-পর-একটা ঘটনা দ্রুত ঘটতে লাগল। কয়েকটা ছবি দেওয়া যাক।

বড়সাহেবের বাড়ির বেয়ারা বসন্ত সাউ। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। কুড়ি-বাইশ বছর এ-বাড়িতে কাজ করছে। খুব বিশ্বাসী লোক। গ্যারাজের পাশে একখানা ঘরে থাকে। দেশে ওর বউ-বাচ্চা আছে। বছরে একবার ছুটি নিয়ে তাদের দেখে আসে। প্রতি মাসে টাকা পাঠায়।

বাড়ির বেয়ারা হলেও বসন্ত সাউ কারখানা থেকে মাইনে পায়। পেন্টশপে হেলপার হিসেবে ওর নাম লেখানো আছে। তার ফলে, সাধারণ গৃহভৃত্যের তুলনায় ওর রোজগার বেশি। প্রভিডেন্ট ফান্ড জমে। বোনাস পায়। অবসর নেবার সময় গ্র্যাচুয়িটি পাবে।

সোমেশ মল্লিকের স্ত্রী মনোরমা ওপর তলায় নিরিবিলি একটি ঘরে থাকেন। পাদুটি বছর দুয়েক হল অচল। বহু রকম চিকিৎসা হয়েছে, পায়ের অসাড়তা সারেনি। সংসারের সঙ্গে তাঁর সংস্রব ক্ষীণ, তবে বড়সাহেবের গৃহিণী যখন, পদমর্যাদার কারণে সবাই সমীহ করে তাঁকে। একটি দাসী তাঁর দেখাশোনা করে সর্বক্ষণ।

একদিন বসন্ত এসে ডাকল, 'বড়মা।'

'কীরে, কিছু বলবি?'

বসন্ত এসে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়ায়।

বলে, 'ভারী মুশকিলে পড়েছি, মা।'

মাইনে নিতে যাবার দিন কারখানার কয়েকজন ওকে ধরেছিল। বলে, বাড়ির লোক হও আর যাই হও, কারখানায় যখন নাম লিখিয়েছ, তখন ফর্মে সই করতে হবে। মাসে দশ টাকা করে ইউনিয়নে চাঁদা দিতে হবে। মিটিঙে আসতে হবে। মালিকের কাছে নাকি অনেক কিছু দাবি রেখেছে ওরা, সেসব দাবি আদায় করতে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম করবে বলছে। বাড়ির বেয়ারা বলে রেহাই নেই।

এত খবর মনোরমা জানতেন না। অন্য সব কারখানাটারখানায় এসব হয় বলে শুনেছেন। স্বামী ও পুত্রের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা হয়। এখন দিনকাল খারাপ। ছোটলোকের হাতে ভদ্রলোকেরা মারধর খাচ্ছে

চারদিকে। কারখানায় তো এসব উপসর্গ কোনওদিন ছিল না।

মনোরমা বলেন, 'তুই আর কারখানায় যাসনি বসন্ত। আমি সাহেবের সঙ্গে কথা বলব।'

দমদমে লোটন মুনশির বাসাবাড়ি। দু'খানা ঘর। সিমেন্টের মেঝে, ইটের দেয়াল। কেবল চালটা টিনের। গরমকালে বড্ড তেতে যায়। তবু দেড়শো টাকা ভাড়ায় এমন বাসা এখন দুর্লভ।

বাড়িতে থাকে ওর বউ আর তিন মেয়ে। বড়টা মাধ্যমিক পাশ করেছে। অন্য দুটোকে বেশিদূর লেখাপড়া শেখানো যায়নি। কী লাভ। ছেলে হলে না হয় কথা ছিল। ভালয় ভালয় ওদের পার করে দিতে পারলে লোটন নিশ্চিন্ত হয়। ওর বউ ব্রত করে নিয়মিত। মেয়েদের দিয়ে ব্রত করায়। এদিকে ও ব্যাঙ্কে টাকা জমাচ্ছে। কিন্তু যতটা জমানো দরকার তা পারছে না।

পুজোর সময় বোনাসের একটা থোক টাকা হাতে পায়। তাই দিয়ে বছরের কাপড়চোপড় কিনতে হয়। তার ওপর মেয়েদের বায়না আছে। সেই বায়না মেটাতে প্রতি বছর একটা করে শখের জিনিস আসছে বাড়তি—এইভাবে দুটো সিলিংফ্যান এসেছে। একটা সেলাই মেশিন এসেছে। আগের বছর ক্যাসেট প্লেয়ার এল। গত বছর কিস্তিতে টিভি এসে যেত কিন্তু মেজো মেয়েটার জন্ডিসের চিকিৎসা করাতেই পাঁচশো টাকা বেরিয়ে যায়। আশা আছে, এ-বছর সব ঠিকঠাক চললে টিভি-র ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কোনওভাবে হঠাৎ হাজার পাঁচেক টাকা হাতে এসে গেলে একটু দম ফেলতে পারে লোটন মুনশি। কিন্তু তার সম্ভাবনা কোথায়? তবু মাসে একটা-দুটো করে লটারির টিকিট কিনে যাচ্ছে ও। ভাগ্য কখন ফেরে, কেউ বলতে পারে না। পথটা পরিষ্কার করে রাখা দরকার সব সময়। যাতে কপাল ফেরার পথে তার কোনও বাধা না থাকে।

একদিন রাত্তিরে মেয়েরা পাড়ায় টিভি দেখতে গিয়েছিল, ফিরে এসে শুনল মা-বাবার কথা হচ্ছে!

লোটন বলছে, 'মাইনে বাড়বে। ডি-এ বাড়বে, পেনশন চালু হবে, ভাবছ কী? বিধবারাও পেনশন পাবে। চার্টার অব ডিমান্ডস ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে মালিককে। ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ধৈর্য চাই, কষ্ট করার ক্ষমতা চাই।'

লোটন বলেছে, টিফিনে শুকনো রুটি আর নিয়ে যাবে না। ক্যানটিনে মাছ-ভাত, মাংস-ভাত দেওয়া চালু হল বলে।

'কবে থেকে বাবা?'

লোটন বলে, 'দাঁড়া না। সবুর কর, এগ্রিমেন্ট সই হোক।'

'বাবা, তখন আমরা রোজ মাছ খাব?' মেজো মেয়েটা জানতে চায়।

লোটন বলে, 'দেখি। যা দাম। তোরা এতগুলো মুখ। না হলে এক টুকরো করে মাছ দিতে কী?'

মেয়েরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। বুঝতে চায় বোধহয়, কোন মুখটা অতিরিক্ত। কে না জন্মালেও চলত।

লোটনের বউ বলে, 'থামো। আগে মাইনে বাড়ুক।'

এদিকে হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে কারখানায়।

ম্যানেজমেন্ট আলোচনায় বসছে না। বড়সাহেব নাকি চার্টার অব ডিমান্ডসের চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। অনিল হালদারের খবর।

'ছিঁড়ে ফেলেছে? তুই ঠিক জানিস?'

অনিল আমতা আমতা করে। স্বচক্ষে ছিঁড়ে ফেলতে দেখেনি, তবে একদিন বিষ্টু ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা যখন খালি করছে, মনে হল, ওর মধ্যে কতকগুলো চেনা কাগজ। ইউনিয়ন লেটারহেডের টুকরো।

নির্মল সাধুখাঁর বরখাস্তের প্রবল প্রতিবাদ করে ইউনিয়ন চিঠি দিয়েছে ম্যানেজমেন্টকে। লেবার কমিশনারের অফিসে কপি পাঠিয়েছে। কাজটা সম্পূর্ণ অবৈধ। বিনা এনকোয়ারিতে একজন স্থায়ী কর্মীর

চাকরি যায় কী করে? ইউনিয়ন দাবি করেছে, ওকে এক্ষুনি ফিরিয়ে নেওয়া হোক। না হলে ভয়াবহ পরিণামের জন্য ম্যানেজমেন্ট যেন প্রস্তুত থাকে। 'ডায়ার কনসেকোয়েন্সেস' শব্দদুটো ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট সুধীর খাস্তগীর নিজে লিখে দিয়েছেন।

একদিন অফিস অর্ডার বেরুল, অনিল হালদার হেড অফিস থেকে কারখানায় বদলি হচ্ছে। হেড অফিসে পিয়োনের দরকার নেই। এর প্রতিবাদ করা যায় না। কিন্তু দেবু রক্ষিত আর লোটন মুনশি রাগে গরগর করতে থাকে। প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে নালিশ জানায়—একটা কিছু বিহিত করুন দাদা। অরাজকতা শুরু হয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'সাইকেলটা কেড়ে নেয়নি তো? তা হলেই হল।'

'ফাঁদ পেতে ওকে ধরতে চায়। ধরলেই বরখাস্ত করবে।'

'করুক না। আগে থেকে ভয় পাচ্ছ কেন তোমরা? ম্যানেজমেন্টের স্পাই কেউ আছে তোমাদের মধ্যে। তাকে খুঁজে বার করো।'

ক্যান্টিন সর্দার গোমেজ থাকে পার্ক সার্কাসে। সেখান থেকে মোটরবাইক হাঁকিয়ে আসে-যায়। তার বোয়াব কী। বাইক না, যেন ঘোড়া। কী তার শব্দ! ওই গাড়ি কেনাব টাকা বড়সাহেব মঞ্জুর করেছিলেন। প্রথম থেকে ও ইউনিয়নের ওপব খাপ্পা।

একদিন সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার পথে, ওর বাসার কাছেই গলিটার মুখে, একদল ছেলে ওর গাড়ি আটকায়। অচেনা একদল ছোকবা। কাউকে ধাক্কা দেয়নি, ভুল ওভারটেক করেনি, তবু ওরা চোটপাট কবতে থাকে। টায়ার ফাটিয়ে দেবে, বলে।

গোমেজ রেগেমেগে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কে তোমরা? আমার গাড়ি আটকাচ্ছ কেন?'

অমনি পেছন থেকে ডান্ডা পড়ে ওর মাথায়। মোটরবাইকের ওপব মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ও। অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে ও শুনতে পায়, কেউ হিংস্রস্বরে বলছে, 'চামচা! ওটাকে শেষ করে ফ্যাল।'

বড়সাহেব হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়ে জানলেন, আঘাত খুব গুরুতর নয়। চারটে স্টিচ দিতে হয়েছে। মাথার ভেতরটা জখম হয়নি। ওর কপাল ভাল।

এফ এম. মানে ফ্যাক্টরি ম্যানেজার। সে কারখানার কর্তা। উৎপাদনের দায়িত্ব তার ওপর। কারখানা ঠিকভাবে চালু আছে, লোকে ঠিকভাবে ডিউটি দিচ্ছে, যন্ত্রপাতি ঠিকমতো মেরামত হচ্ছে—এইসব ব্যাপারে কারখানার মালিককে নিশ্চিন্ত বাখা তার প্রধান কাজ। মাল প্যাক হয়ে গেলে তার কাজ শেষ। এবাব বেচতে হলে বেচো। ফেলে দিতে চাও, ফেলে দাও। শুধু দেখবে, আমার দু'শিফটের ওয়ার্কাররা মাসের শেষদিনে যেন মাইনে পায়। আমার মেশিনগুলো কাজের অভাবে যেন উপোস না করে।

বিপিকো এন্টারপ্রাইজের যে এফ. এম. তার নাম চিদাম্বরম। দক্ষিণ ভারতের লোক। বয়েস পঁয়তাল্লিশ হবে। ছোটখাটো মানুষ কিন্তু ব্যক্তিত্ববান। সহজে মাথা গরম করে না। আর অনর্গল বাংলা বলতে পারে। শপফ্লোরে ওটা খুব জরুরি। টুলরুমের কাজে ওর সুনাম শুনে সোমেশ মল্লিক উষা কোম্পানি থেকে ডেকে এনেছিলেন।

কারখানা অফিসের তিনতলায় ওর বাসস্থান। টেলিফোন। স্বামী-স্ত্রীর ছোট সংসার। সারাদিন লোকটা কারখানাতেই পড়ে থাকে। দু'শিফটের কাজ দেখে একাই। ওর বউ সারাদুপুর ধুপ ধুপ কবে মশলা কোটে।

একদিন সে চাকরিতে ইস্তফা দিল।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন সোমেশ মল্লিক। দুর্গ কি ভেঙে পড়ছে? লোকটা কি ভয় পেল? নাকি, প্রকাশ ক্রমশ ক্ষমতাবান হয়ে উঠছে দেখে, মানে মানে সরে পড়তে চায়? মালিকের ছেলে যে একদিন মালিক হবে, এ তো জানা কথা। প্রকাশকে তো সেই জন্যই ওর কাছে কাজ শেখানো।

ছেলের নামে একটা নোট পাঠিয়ে চিদাম্বরমের চার্জ বুঝে নিতে নির্দেশ দিলেন সোমেশ মল্লিক। হেড অফিসে ডেকে পাঠিয়ে ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। দুপুরে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে লাঞ্চ খাওয়ালেন। তারপর, যাকে বলে সোনালি করমর্দন, তাই করে বিদায় দিলেন চিদাম্বরমকে।

এখন মাঝখানে আর কেউ রইল না।

বব পারকিন্সের কাছ থেকে কারখানা কিনে নেওয়ার সময় সোমেশ মল্লিক একাই ছিলেন সর্বেসর্বা। এতদিন পর আবার সেই ক্ষমতায় ফিরে এলেন তিনি। ছেলে তাঁর সহায়ক মাত্র।

মৃত্যুভয় আর অসহায়তা থেকে যেভাবে মহামারি ছড়ায়, সেইভাবে অশান্তি আর উত্তেজনার মধ্যে ইউনিয়নের সংগ্রাম অগ্রসর হতে লাগল। এখন স্পষ্ট দুই প্রতিপক্ষ। ক্রমশ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। একপক্ষে পিতাপুত্র আর পনেবো-কুড়িজন তাদের সমর্থক। তাদের অর্থবল আছে। অন্যদিকে দু'শো জনের অধিক শ্রমিক কর্মচারী। ওয়ার্কারের বাহুবল ম্যানেজমেন্টের দশগুণ। কারখানার চাকা যে-কোনও সময়ে ওরা বন্ধ করে দিতে পারে।

কারখানার উত্তরদিকে এক গলির মধ্যে ইয়ং স্পোর্টিংয়ের ছোট মাঠ, ক্লাবঘর। পাড়ার ছেলেরা ওখানে ব্যাডমিন্টন, টেবিলটেনিস খেলে। আড্ডা দেয়। রাজনীতি নিয়ে তর্কাতর্কি করে। নেশার আখড়াও একটা আছে বলে শোনা যায়। কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেননা, ওই ছেলেবাই তো পাড়াটা আগলায়।

আপাতত ইউনিয়ন ওখানে আশ্রয় নিয়েছে। যতদিন পর্যন্ত না নিজস্ব একটা অফিসঘর আদায় করা যাচ্ছে, ততদিন এই ব্যবস্থা চলুক। ইউনিয়নের প্রতি পাড়ার ছেলেদের সহানুভূতি আছে। বস্তুত, পাড়াসুবাদে বেশ কয়েকজন কর্মী কারখানায় চাকরি পেয়েছে।

সেদিন সন্ধেবেলা ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট, বিখ্যাত শ্রমিকনেতা সুধীর খাস্তগীর ওই ঘরে মিটিং কবল। দেবু গিয়ে ট্যাক্সি করে নিয়ে এল তাকে। একখানা মাত্র টেবিল—তার ওপর বসেই ওদের সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা হল। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে দেবু রক্ষিত, অনিল হালদার, লোটন মুনসি আর নির্মল সাধুখাঁ তো ছিলই। ফ্লোরের চার-পাঁচজন ওয়ার্কার এসেছিল। বিয়াল্লিশজন ওয়ার্কাব আর হেড আপিসের দু'জন স্টাফ সেদিন অবধি ইউনিয়নেব সদস্য হয়নি বলে ওরা সকলে চিন্তিত।

'একটার-পব-একটা জুলুম চলছে। আমবা কি চুপ করে কেবল মার খেয়ে যাব?' জিজ্ঞেস করল লোটন মুনশি।

'আমাব কথা শুনতে না চাও তো যা খুশি করো তোমরা। এ-লড়াইযে প্রথম প্রথম মাব খেয়ে যেতে হয়। ম্যানেজমেন্ট ক্ষমতার নেশায় তখন একটার-পর-একটা ভুল করতে শুরু করে। জেনে রাখো, ওবা যত বেশি ভুল করবে, শেষপর্যন্ত তোমাদের তত বেশি ফায়দা।'

নির্মল সাধুখাঁ বলল, 'এদিকে আমি বেকার হয়ে বসে আছি। আমার কী হবে?'

সুধীর খাস্তগীর রেগে গিয়ে বলল, 'সেকী? ইউনিয়ন তোমায় দেখছে না? কে ইউনিয়নের সেক্রেটারি?'

সবাই লোটন মুনশির দিকে তাকায়।

লোটন বলে, 'সেদিন তো তোমায় একশো টাকা দিলাম নির্মল। এর মধ্যে খরচ করে ফেললে? একটু হাত টেনে চলো।'

প্রকাশ মল্লিক এখন এফ, এম। কিউ সি-র ঘর ছিল দোতলায়, এখন শপ ফ্লোরের একপাশে ওর কাচঘেরা আপিস। টেবিল, চেয়ার আর দুটো ফাইলিং ক্যাবিনেট। ঘরের কোণে একটা টাইপ মেসিন। দবকার হলে টাইপিং পুল থেকে কেউ এসে কাজ করে দিয়ে যায়। কাচের ভেতর থেকে কারখানার অনেকখানি দৃশ্যমান।

একদিন শিফট ছুটির মুখে প্রকাশ দেখল, মেশিন শপের পাশে শিফট সুপারভাইজারের সঙ্গে জনাকয়েক ওয়ার্কারের বচসা হচ্ছে। হাত-পা নেড়ে ওয়ার্কাররাই কথা বলছে বেশি। সুপারভাইজার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে আর কপালের ঘাম মুছছে।

কী হল আবার?

প্রকাশ মেশিন শপের দিকে এগিয়ে যায়। ওকে দেখে তর্কাতর্কির ঝাঁঝ নেমে যায় খানিকটা।

তিনজন ওয়ার্কার ওভারটাইম করবে না বলছে। পরের শিফটের তিনজন কামাই। ওরা ওভারটাইম

না করলে মেশিন শপ অচল। অথচ ঢের কাজ জমে আছে।

'কেন ওভারটাইম করবে না তোমরা?'

'আটঘণ্টা খাটনির পর আর শরীরে কুলোচ্ছে না স্যার।'

'এতদিন তো করেছ।'

'তখন স্বাস্থ্য ভাল ছিল,' একজন হাসতে হাসতে বলল, 'মন ভাল ছিল। এখন মন ভাল নেই।'

'ঠিক আছে।'

মেশিন শপ এক শিফট বন্ধ রাখতে হুকুম দিল প্রকাশ। যা হয় হবে।

পরের দিন সকালে পেন্টশপের একজনও কাজে আসেনি। দশটার সময় কারখানায় এসে রিপোর্ট পেল প্রকাশ। কারখানার বাইরে কিছু লেবার রোজ ভোরে এসে বসে থাকে কাজের আশায়। প্রায়ই তাদের কয়েকজনকে ঢুকিয়ে নেওয়া হয় বদলি হিসেবে। আজ কী হল?

জানল, ওরা তিরিশ টাকা রোজ চেয়েছে। এতদিন আঠারো টাকায় কাজ করত। ওরা নাকি বলেছে, লেবার রেট ওদের বেলা আর খাটবে না। মিস্তিরির রেট চাই। সব ডিপার্টমেন্টের কাজ ওরা এখন শিখে গেছে। আর নয়তো ওদের কার্ড পাঞ্চ করতে দেওয়া হোক।

স্থায়ী চাকরি চায়? না, এ-ও ইউনিয়নের কারসাজি? রাগে গজরাতে থাকে প্রকাশ। মুখে কিছু বলে না।

কিছুদিন এইভাবে চলছে।

সোমেশ মল্লিক লক্ষ করেন, প্রকাশ খাবার টেবিলে বসে বিশেষ কথবার্তা বলে না। আপিসেও তাঁর সঙ্গে যেটুকু কথা হয়, খুব ভাসা ভাসা। কারখানার বিস্তারিত রিপোর্ট তিনি পাচ্ছেন না ওর কাছ থেকে। এদিকে চর বলছে, কারখানার হাওয়া গরম। ছোটসাহেবের কামরায় রোজ খিটিমিটি লেগেই রয়েছে।

চর আর কেউ নয়, বসন্ত সাউ।

সোমেশ মল্লিকের গিন্নি মনোরমা বলেছিলেন, তুই আর কারখানায় যাস না বসন্ত। ওরা যখন তোর ওপর জুলুম করছে, তখন কাজ ছেড়ে দে তুই। বাড়িতেই থাক আগের মতন। না হলে, বাড়ি চলে যা।

বড়সাহেব শুনে বলেছিলেন, 'না, না। আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুই ওদের ফর্মে সই কর। চাঁদা দে। ওরা যা-যা করতে বলবে, করবি। অমন বাঁধা চাকরি কেউ ছাড়ে? কেবল, কোথায় কী ঘটছে, একটু লক্ষ রাখিস। আমায় খবর দিস, কেমন?'

রাত্রে খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে যাবার পর কোনও কোনও দিন বড়সাহেব বসন্ত সাউকে ডেকে পাঠান। বিরক্তিকর আলসারটা আছেই, মাঝে মধ্যে বিছানায় শুইয়ে দেয়। তার ওপর, পিঠে একটা ব্যথা হচ্ছে কিছুদিন ধরে। ঘাড় থেকে পিঠের মাঝখানটা পর্যন্ত। একটু টিপে দিতে বলেন। বসন্ত ওই কাজটা ভাল পারে। সাহেবেরও আরাম হয়।

রাত্রের ওই আধঘণ্টা সময়ে সোমেশ মল্লিকের যা প্রয়োজন, তা সংগৃহীত হয়ে যায়।

সেদিন বসন্ত সাউয়ের কাছে জানা গেল, প্রকাশ বাড়ি ছেড়ে কারখানার কোয়ার্টারে গিয়ে থাকতে চাইছে। বউদি ওকে যেতে দিচ্ছে না। বেশি রাত্তিরে প্রায়ই বেসামাল হয়ে ঘরে ফেরে দাদাবাবু। বউদির সঙ্গে ঝগড়া করে। বসন্ত বলে, দাদাবাবুর দোষ নেই। কারখানার লোকগুলো রোজ একটা-না-একটা গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। প্ল্যান করে কামাই দিচ্ছে। এক ঘণ্টার কাজ তিন ঘণ্টা ধরে করছে। ওভারটাইম নিচ্ছে না।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে শান্তভাবে কথাটা পাড়লেন সোমেশ।

'তোর কি শরীর খারাপ?'

'কেন? কিছু না।'

'বউমা, ওর কি রাত্তিরে ঘুমের ব্যাঘাত হয়? চোখ ফোলা কেন?'

বউমা বলল, 'কাজের চাপ। আমি বলছি, ক'দিন ছুটি নাও—তো শুনছে না।'

'এখন কি ছুটি নেওয়ার সময়?' প্রকাশ স্ত্রীর দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়। তারপর সোমেশকে বলে, "কী করবে তুমি, কিছু ঠিক করেছ?'

'কীসের কী?'
'ওই চার্টার অব ডিমান্ডস—'
'ওতে করার কী আছে? ও আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।'
'ছিঁড়ে ফেললেই কি সমস্যা মিটে যায়? তুমি চাও না তা হলে যে, ম্যানেজমেন্ট আলোচনায় বসুক। একটা সন্ধি হোক।'
সোমেশ উত্তর দেন না।
একটু পরে বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ বউমা। খোকার ওপর বেশি চাপ পড়ে যাচ্ছে। বিশ্রাম দরকার। তোমরা মাসখানেক বরং কোথাও ঘুরে এসো। মিলুরা তো এখন ভাইজাগে, ওকে ফোন করে দাও। একটা হোটেলে ঘর নিয়ে রাখবে। শহরে না, সমুদ্রের ওপর।'
প্রকাশ মুখ তুলে বাপেব দিকে তাকায়। বলে, 'আর কারখানা?'
'সে আমি চালিয়ে নেব। ক'টাই বা দিন।'
খানিকটা হতাশা, খানিকটা স্বস্তি থেকে প্রকাশ ছুটি নিতে রাজি হয়। মনে মনে ভাবে, এবার নিজে একা ঠেলা সামলাও। দেখি, তুমি কতদূর জিততে পারো।
আবার আগের মতো ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়।
সোমেশ মল্লিক সকালে ন'টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কারখানায় আসেন। সুপারভাইজাবদের কাছ থেকে দিনের রিপোর্ট নেন। নালিশ শোনেন। ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে হেড অফিসে চলে যান। উৎপাদন ক্রমশ কমে যাচ্ছে, উনি গ্রাহ্য করছেন না।
একদিন সিকিউরিটিব লোটন মুনশি কারখানায় ওঁর সঙ্গে দেখা করল। ওর বুকে গোলাপি রঙের ব্যাজ। তাতে ইউনিয়নের দাবিদাওয়ার কথা লেখা আছে।
'স্যার, কিছু একটা বিহিত করুন। ওয়ার্কারদের আর সামলানো যাচ্ছে না।'
সোমেশ হেসে বললেন, 'তোমার হাতে সিকিউরিটি। আর তুমিই হলে ওদের নেতা। সেক্রেটারি। তুমি ওদের খেপিয়ে তুলছ। আর আমাকে বলছ সামলাতে? এ কেমন কথা?'
'আমাদের দাবি যে ন্যায্য, তা তো আপনি জানেন স্যার। আপনি কলকাতার অন্য সব কারখানার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।'
সোমেশ মিলিয়ে দেখলেন। চুপচাপ স্বভাবের মানুষ ছিল এই লোকটি। বাধ্য ছিল। এখন মুখে কথা ফুটেছে।
'আমার তো নতুন নতুন মেশিন নেই। টেকনোলজি পুরনো। অন্য কারখানাব সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে গেলে আমার কারখানা উঠে যাবে। তাই চাও তুমি?'
'অন্তত, আলোচনায় বসুন। আমি ওদের যাতে বলতে পারি, ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন নিচ্ছে।'
সোমেশ বললেন, 'সবকিছু খতিয়ে দেখতে হবে। অ্যাকশন নেবার আগে সবকিছু ভাল করে খতিয়ে দেখতে হবে না?'
এর তিনদিন পর দুই শিফটের মাঝখানে ওরা গেট-মিটিং করল। বেশিরভাগ ওয়ার্কার তাতে শামিল হয়েছে। গেট-মিটিংয়ে বক্তব্য রাখল লোটন মুনশি, দেবু রক্ষিত আর সবশেষে ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট সুধীর খাস্তগীর।
ওদের প্রধান বক্তব্য ছিল, আলোচনায় না বসলে ম্যানেজমেন্টকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। চার্টার অব ডিমান্ডস নিয়ে ছেলেখেলা করা চলবে না। এই কারখানা একা মালিকের খামখেয়ালে চলতে পারবে না। শোষণ বন্ধ করতে কর্মীরা ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হও।
ঠিক হল, গেট-মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটা সতর্কবার্তা লিখে ফেলা হবে। সেই সতর্কবার্তা নিয়ে পরের দিন বিকেলে মিছিল যাবে হেড আপিসে।

প্রাক্তন লেবার কমিশনার এম. কে. রায় সোমেশ মল্লিকের পরিচিত। অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস। একসময় রাজ্য সরকারেব শিল্পবাণিজ্য দপ্তরে ছিলেন। প্রবীণ ব্যক্তি। একদিন রাত্রে তাঁর মার্লিন পার্কের ফ্ল্যাটে দেখা করলেন সোমেশ মল্লিক। হাতে সেই সতর্কবার্তা।

এম. কে. রায় প্রথমেই জানতে চাইলেন, 'ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট কে?'

সোমেশ বললেন, 'সুধীর খাস্তগীর নামের একজন। একদিন টেলিফোন করেছিল। দেখা করতে চায়।'

এম. কে. রায় ঠোঁটের কোণে হাসলেন। বললেন, 'ঝানু লোক। বিশ বছর ধরে ট্রেড ইউনিয়ন করছে।'

সোমেশ বললেন, 'আমি এ-জুলুম সহ্য করব না। নিজের হাতে এক-একটা ইট গেঁথে আমি এই কারখানা গড়ে তুলেছি। ইংরেজ সাহেবের আমলে ছিল বাইশজন ওয়ার্কার। পাঁচটা মাত্র মেশিন। শুধু অ্যাসেমব্লি হত। এখন আড়াইশো ওয়ার্কার। নব্বইটা মেশিন। দু'শিফটে কাজ হয়। পুরনো স্টাফ কেউ এখন আর নেই। এখন যারা পে-রোলে আছে, এদের প্রত্যেককে আমি নিজে দেখেশুনে কাজে নিয়েছি। ভাল ছেলে সব। বাইরে থেকে উসকানি দিয়ে এদের মাথা খাওয়া হচ্ছে।'

'উসকানি, হ্যাঁ। তবে সময়ও বদলেছে মিস্টার মল্লিক।' এম কে রায় বললেন, 'এই জেনারেশন ধৈর্যহীন। আর অত্যন্ত অধিকার সচেতন। ফ্রি ইন্ডিয়ায় জন্মেছে এরা। কর্তব্যের চেয়ে অধিকারটা বোঝে বেশি।'

'আমি নাকি এতদিন শোষণ চালিয়ে এসেছি। এটা বলতে পারল?'

'আহা! 'শোষণ' একটা জার্গন। এর অর্থও আপেক্ষিক। আমাদের মতো স্বাধীন গণতন্ত্র যে-দেশে চালু আছে, সে-দেশে শোষণ বলতে যা বোঝায় তা অসম্ভব। শোষণ থাকতে পারে না, কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার তো আছে। শ্রেণীবদ্ধ সমাজ যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন শোষণ শব্দটা অভিধান থেকে তুলে নেওয়া যাবে না! এ ব্যাপারে আবেগপ্রবণ হয়ে লাভ নেই।'

এরপর এম. কে. রায় বুঝিয়ে বললেন।

'দেখুন, দু'ভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। এক, বিরোধ পাকিয়ে উঠতে না দেওয়া। কাঁচা অবস্থায় সন্ধি করে ফেলা। তা হলে, আত্মাভিমান পরিত্যাগ করে আপনাকে আলোচনায় বসতে হবে। ওদের সঙ্গে দরাদরি করতে হবে দাবিগুলি নিয়ে। বেশ কিছু দাবি মেনেও নিতে হবে। তিন বছর বা পাঁচ বছরের শান্তি কিনবেন। তবে বড় ক্ষতি এড়িয়ে যাবেন।

আর দুই, শেষ অবধি আপোস না করে দেখুন। যত অস্ত্র আছে আপনার স্টকে, সব ব্যবহার করুন। শক্তির পরীক্ষা হোক, ধৈর্যের পরীক্ষা হোক! তাতে ওরা হয়তো একদিন হাঁটু ভেঙে বসে যাবে। অব্যবহারে ক্যাপিটালের কিছু ক্ষতি হয় না, শ্রম তো ক্ষয় হয়ে যায়। তবে তাতে আপনারও অন্য ধরনের শাস্তি হবে, কেননা, আগের কারখানা আর ফিরে পাবেন না। দুই বিশ্বযুদ্ধে হেরে-যাওয়া জার্মানির কথা ভাবুন।'

সোমেশ মল্লিক হঠাৎ ঘোষণা করলেন, এপ্রিল মাসের মাইনের সঙ্গে প্রত্যেক কর্মী অতিরিক্ত পাঁচশো টাকা করে এক্সগ্রেসিয়া পাবে। শুধু এক শর্তে: ইউনিয়ন আন্দোলন তুলে নিতে হবে তাদের। কারখানার বেতন কাঠামো তিনি ব্যক্তিগতভাবে খতিয়ে দেখবেন তারপর এবং দরকারমতো তার সংশোধন করে দেবেন। তবে কোনও দাবির ভিত্তিতে নয়।

এই ঘোষণার ফলে আবহাওয়া আরও খারাপ দিকে বাঁক নিল। প্রথমত, কয়েকজন নিরীহ লোক গাঁইগুঁই করে বলল, কী হবে, সাহেব যা বলেছেন, মেনে নাও। এই বা কে দেয়। দেবু রক্ষিত ফুঁসে উঠল তাতে। বকশিশ দিচ্ছে? আমাদের প্রাপ্য আমরা চাইছি। বকশিশ চাইছি না। বড়সাহেব এখনও ভাবছে, সে মনিব, আমরা তার চাকর। ভুলটা আগে ভাঙো।

একদিন রাত্তিরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরল বসন্ত সাউ। বড়মা'র ঘরে গিয়ে কেঁদে পড়ল। কী হয়েছে? না, গেটের বাইরে চার-পাঁচজন ওয়ার্কার ওকে লোহার রড দিয়ে হাঁটুতে মেরেছে। অন্ধকারে ওদের কাউকে সে চিনতে পারেনি। তবে ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল দেবু রক্ষিত। গলার স্বর শুনে বুঝতে পেরেছে ও। বড়সাহেবের নামে খারাপ ভাষায় গালাগাল দিচ্ছিল।

পরের দিন পুলিশের গাড়ি এসে দেবু রক্ষিত সহ চারজন ওয়ার্কারকে ধরে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় স্তব্ধতা নেমে আসে। হতচকিত লোকজন এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। গুরুতর বিপদ

সংকেত টের পায় ওরা। ক্যান্টিনে নেতাদের মিটিং বসে। অনিল হালদার সাইকেল নিয়ে ছুটে যায় প্রেসিডেন্টের কাছে।

দুপুর দুটোয় প্রথম শিফট শেষ হবার পর, দ্বিতীয় শিফট শুরু হবার আগে আবার গেট-মিটিং। প্রেসিডেন্ট তার বক্তৃতায় অগ্নিবর্ষণ করে। বলে, 'আমরা সহ্যের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছি। এখন ধর্মঘট ছাড়া আর পথ নেই। বন্ধুগণ, আমি ভেবেছিলাম, ম্যানেজমেন্টের মনে সুবুদ্ধির উদয় হবে। তা যখন হল না, তখন কারখানার চাকা বন্ধ করে দাও।'

অমনি কারখানার মেন সুইচ কেউ গিয়ে অফ করে দিয়ে এল। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে বুঝতে পেরে সুপারভাইজার আর ইউনিয়ন বহির্ভূত সব স্টাফ কারখানা থেকে পালায়। ওদের একটা ছোট দল গিয়ে পৌঁছোয় সোমেশ মল্লিকের হেড আপিসে।

কারখানার প্রকাণ্ড গেটের মুখে বিশাল পতাকা টাঙিয়ে ওয়ার্কাররা বসে পড়ে। চিৎকার করে স্লোগান দিতে থাকে। কারখানার দেয়াল পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ হয়ে যায়।

ও ক্যালকাটা।

বুধবার কারখানার সাপ্তাহিক ছুটির দিন।

মঙ্গলবার রাত তিনটের সময় একটি পুলিশ অফিসার পাঁচজন কনস্টেবল গাড়ি থেকে নামে। ধর্মঘটীদের দু'জন শতরঞ্চির ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। তাদের তুলে নিয়ে চলে যায়। সমস্ত পাড়া তখন নিঝুম।

ওরা চলে গেলে পর দু'খানা গাড়িতে চড়ে ছ'-সাত জন প্যান্ট-শার্ট পরা লোক সেখানে এসে নামে। টর্চ জ্বালিয়ে তারা অন্ধকার কারখানায় ঢুকে যায় এক এক করে। দু'জন বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। প্রায় আধঘণ্টা পর তারা পুনরায় টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে আসে।

গেটের পেছনে টাইম অফিস। যাবার আগে টাইম অফিসের শাটার নামিয়ে গেট-জোড়ায় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে যায় ওরা। পোস্টারের মতো একটা কাগজ সাঁটিয়ে দেয় দেয়ালে।

এরা ভাড়াটে সিকিউরিটি। সোমেশ মল্লিকের নির্দেশে কারখানায় লক আউট নোটিশ জারি করে দিয়ে গেল। ওই নোটিশ সকালে বাংলা এবং ইংরেজি কাগজে প্রকাশিত হবে।

এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে সোমেশ মল্লিকের গাড়ি লর্ড সিনহা রোডে দাঁড়াল। চৌরঙ্গি পাড়া তখনও ভাল করে জাগেনি।

তিনতলায় বিপিকো এন্টারপ্রাইজের আপিসে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। লিফট বন্ধ কিন্তু সিঁড়িতে আলো রয়েছে। সোমেশ মল্লিক সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলেন।

বিষ্টু দরজা খুলল। তারক হাজরা বেরিয়ে এল চোখ মুছতে মুছতে।

'সব ঠিক আছে।' সোমেশ মল্লিক বললেন, 'যতদিন পারবে, এই অফিস খোলা রাখবে। পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেছি। আর, যখন যা দরকার, অ্যাসোসিয়েশনের মিস্টার ছেত্রীকে বলবে। আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। ভয় পেয়ো না। আমি কিছুদিনের মধ্যে ফিরে আসব। আর তারক, তুমি ভুলবে না, প্রতিদিন তুমি একটা করে রিপোর্ট লিখে বন্ধ খামে মিস্টার ছেত্রীকে দিয়ে আসবে, কেমন? কিছু লুকোবে না। তোমাদের মাইনেপত্র, হেড আপিসের খরচের টাকা উনি দিয়ে যাবেন।'

বড়সাহেবের পিছু পিছু ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামল।

বিষ্টু উঁকি মেরে দেখে, ড্রাইভারের সিটে একজন অপরিচিত লোক বসে আছে।

এরপর দেখতে দেখতে সাতটা মাস কেটে গেল।

প্রকাশ মল্লিকের অনুপস্থিতিতে তার বাবা কারখানা লক আউট করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। নিউ আলিপুরের বাড়িও তালাবন্ধ। সেখানেও গেটে পুলিশ পাহারা।

ওয়ালটেয়ারের পামবিচ হোটেলে বসে একদিন বাবার ট্রাংককল পেল প্রকাশ। সমস্ত খবর জানল।

ফোনেই বলল, 'এ তুমি কী করলে বাবা? কতদিন আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়াব? একটা মীমাংসা কি করা যেত না?'

'না।'

'তুমি ওদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছিলে?'

'ও একদিন ফোন করে। দেখা করতে চায়। আমি দেখা করিনি। কে সে? কারখানা আমার, না তার?'

'বাবা, কত বড় বড় কোম্পানি ইউনিয়নের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছে। তুমি তো জানো। তারা কি স্টুপিড?'

'তারা স্টুপিড কিনা জানি না। আমি এটুকু জানি, পশ্চিমবাংলায় এতগুলো কারখানা আজ সিক, রুগ্ণ, তা ওই ম্যানেজমেন্টের দুর্বলতার জন্যে। সাধ্যের অতিরিক্ত দিয়ে শেষে দেউলিয়া হয়ে গেছে।'

'তুমি আমাকে একটা চান্স দেবে বাবা? আমি চেষ্টা করে দেখতে চাই। না পারলে ছেড়ে দেব। মারোয়াড়িকে কারখানা বেচে দেব।'

সোমেশ বললেন, 'তোমরা কালকের ফ্লাইটে ব্যাঙ্গালোরে চলে এসো। এখানে এলে কথা হবে।'

ব্যাঙ্গালোর শহরের একপ্রান্তে শান্তিনগর। সেখানে একটা বাড়ি ভাড়া করেছেন সোমেশ মল্লিক। স্থানীয় ডিলার বাড়িটা ফার্নিশ করে দিয়েছে।

সোমেশ মল্লিক ছেলেকে বললেন, 'কিছুদিন বায়ুদূষণ থেকে বাঁচা যাক। এখন ছ'মাস চুপটি করে এখানে বসে থাকো সবাই। এই ফাঁকে তোমার মায়ের পায়ের চিকিৎসা হয়ে যাক।'

আসলে, কেবল মায়ের চিকিৎসার জন্যে প্রকাশের বাবা এখানে আসেননি। অনেকদিন ধরে কর্ণাটক সরকারের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলছিল। ওরা শহরের বাইরে জমিও দিয়েছে। এখানে শ্রমিক সমস্যা আর বিদ্যুৎ বিভ্রাট নেই বললেই চলে। ওরা চায়, সোমেশ মল্লিক একটা কোলড স্টোরেজ গড়ে তুলুন। সরকার ঋণের ব্যবস্থা করে দেবে। কুড়ি শতাংশ অনুদান দেবে। স্থানীয় ডিলারটিকে সামনে রেখে সোমেশ এই লাভজনক ব্যবসায় নামছেন। প্রথম দিকে প্রকাশ সাহায্য করতে পারবে। ছ'মাসে কোলড স্টোরেজ চালু করা খুব শক্ত কাজ নয়।

ছ'মাস পার হয়ে সাত মাসে পড়তে একদিন কলকাতা থেকে ট্রাংককল এল ছেত্রীর। কারখানায় আগুন লেগেছিল গতকাল। সাবোটাজ হতে পারে। বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি বলে মনে হচ্ছে।

সোমেশ বললেন, 'এবার সময় হয়েছে। আমি এদিকটা দেখছি, তুমি যাও। কতখানি ক্ষতি হয়েছে সার্ভে করিয়ে ইন্সিয়োরেন্স ক্লেম করবে। সামনে পুজো। ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করে কারখানা খুলতে পারলে খুলবে।'

সোমেশ মল্লিক ছেলেকে সমস্ত অধিকারই দিয়ে দিলেন। শুধু বললেন, 'মনে রেখো, আমাদের লাইনে প্রোডাকশনের ষোলো শতাংশ হল মজুরির উর্ধ্বসীমা। আমি তার বেশি কিছুতেই উঠব না।'

কলকাতায় ফিরে প্রকাশ বাড়িতে উঠল না।

ভাবল, কিছুদিন হোটেল থেকে অপারেট করা যাক। বউকে তার বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসে নিজে একটা মাঝারি হোটেলে উঠল। একটা গাড়ি ভাড়া করে ঘুরতে লাগল।

দিনকয়েক পর একদিন মিস্টার ছেত্রীর কাছে জানল যে, ইউনিয়ন-প্রেসিডেন্ট সুধীর খাস্তগীর তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

সকাল দশটা নাগাদ লোকটি এসে হাজির হয়। প্রথমেই হেসে নমস্কার করে প্রকাশকে।

পরনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি। চোখে কালো চশমা। মাথায় উসকোখুসকো চুল। ধুলোমাখা পায়ে হাওয়াই চপ্পল। দেখলে ভক্তি চটে যায়।

লোকটা বলল, 'চলুন, আমরা বাইরে কোথাও গিয়ে কথা বলি। এমন জায়গা, যেখানে কেউ আমাদের সন্ধান পাবে না। কর্মীদের মানসিক অবস্থা তো অনুমান করতে পারেন।'

প্রকাশ বলল, 'আমার অফিসও যথেষ্ট নিরিবিলি।'

'অফিসেই তো অফিসের কথা হওয়া উচিত,' সুধীর খাস্তগীর চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে বলে, 'কিন্তু এক্ষেত্রে আমি তা চাইছি না। আমার অনুরোধ, আপনি আমার বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিন। দুপুরে খেতে খেতে কথা বলব। আমাদের সম্পর্ক তেতো হয়ে গেছে খানিকটা—মানে, ম্যানেজমেন্ট আর ইউনিয়নের সম্পর্ক—বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করতে পারলে কাজ এগোবে।'

প্রকাশ একবার ভাবল এটা ওর ফাঁদ কিনা। অজানা জায়গায় কোণঠাসা করে ফেলবে কিনা সুধীর খাস্তগীর। বিষ্টুকে সঙ্গে নেবে?

সুধীর ওকে ইতস্তত করতে দেখে হাসল। ওর নীচের পাটির চারটে দাঁত নেই, হাসলে পর বুঝতে পারা যায়। বলল, 'দেখুন, আমরা কেউ কারুর জাতশত্রু নই। সংঘর্ষটা স্বার্থের। যুদ্ধ তো অনেক হল। এবার সন্ধির কথা ভাবা যাক। আমি ইউনিয়নের তরফ থেকে একটা অনারেবল অ্যান্ড রিজনেবল সেটলমেন্ট চাই।'

'চার্টার অব ডিমান্ডসে যে ফিরিস্তি আছে—'

'তার অনেকগুলোই বাজে। দিতে হয় বলে দেওয়া—'

ওরা দু'জন নীচে নামল। ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়াল।

সুধীর খাস্তগীর বলল, 'আমার গাড়ি আছে। তাতেই যাওয়া যাক। কিছু মনে করবেন না, আমি পারতপক্ষে ম্যানেজমেন্টের গাড়ি চড়ি না।'

'কেন? চড়লে কী হয়?'

'দুর্নাম হয়। কেউকেটা নই আমি। তবে অনেকে এই কুচ্ছিত মুখটা চেনে তো। লেবার লিডারকে চট করে লোকে সন্দেহ করে ফেলে। আমাদেব যাবার পথে হয়তো বিপিকোর ওয়ার্কার কেউ থাকবে। দেখবে। আশ্বস্ত হবে। আপনি আমার গাডিতে যখন উঠেছেন, তখন নিশ্চয় আমায় বিশ্বাস করেছেন। এই আর কী!'

সবুজ রঙের ফিয়াট গাড়ি। পুরনো। রংচটা। ভেতরটা তত খারাপ না। ছোকবা ড্রাইভার সার্কুলাব রোড ধরল।

সুধীর খাস্তগীর বলল, 'আমার বাড়ি।'

প্রকাশ: কোন দিকে?'

সুধীর: 'গড়িয়া ছাড়িয়ে। রায়পুর। আমি থাকি আর একটা মেয়েমানুষ। বউ ঠিক নয়, বউয়ের মতো। আপনি হেমাঙ্গিনীর নাম শুনেছেন?

প্রকাশ: 'হেমাঙ্গিনী?'

সুধীর: 'একসময় থিয়েটার করত। স্টারে, মিনার্ভায়। এই যে সিটটায় আমবা বসে আছি, এইখানে আমি প্রথম ওর, কী বলব, লজ্জাহরণ করি। উপায় কী? সুন্দরী মেয়ে। আমাব সাহায্য চাইছে। একটু মাশুল দেবে না?'

গুরুসদয় রোড দিয়ে গাড়ি দক্ষিণমুখো ছুটছে। অফিসের দিন। সকালবেলা। উলটোমুখী ট্রাফিক প্রায় ফাঁকা।

সুধীর: 'ওব স্বামীর ছিল টি বি। তখন তো এত ওষুধ বেরোয়নি। ভুগছিল। ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল। মাইনে না পেলে খাবে কী? চিকিৎসা করাবে কোথা থেকে? কারখানার মালিক বলে, সরকারি ব্যবস্থায় যাও, ই. এস. আই. আছে। আমি তখন ম্যানেজমেন্টকে গিয়ে ধরলাম। বললাম, একজন লয়্যাল ওয়ার্কার কারখানাব জন্যে জান দিয়ে খেটেছে এত বছর। আর, যেই শুয়ে পড়েছে, অমনি তাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছ? এ অন্যায়। তো, ওরা আর ছ'মাস সবেতন ছুটি মঞ্জুর করে দিল। স্পেশ্যাল কেস, বুঝলেন কিনা। তো, সেই লোকটাও ছিল বিবেচক। মাস চারেকের বেশি বাঁচেনি। ওর বউ যে আমার কাছে আসা-যাওয়া করত, তা নিয়ে একটি কথাও বলেনি। কিন্তু মরার আগে ওর টি বি আমায় দিয়ে গেল।'

প্রকাশ খানিক শুনছিল খানিক শুনছিল না। জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল। লোকটাকে খুব পছন্দ করতে পারছে না। হঠাৎ শেষ বাক্যটি শুনে ও চমকে ওঠে।

'ওর অসুখের ছোঁয়াচ আপনার?'

'কেন, হেমাঙ্গিনী। সে ছিল বাহক। এক-একটা প্রাণী থাকে না, যারা রোগ নেয় না। রোগ ছড়ায়। যেমন, কাক। যেমন, মাছি। কাকের কখনও কলেরা হয়েছে শুনেছেন?'

প্রকাশ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, সুধীর তার ভাঙা দাঁত বার করে হাসছে।

'তো, হেমা সেবা শুশ্রুষা করে আমায় সারিয়ে তুলল। সেই থেকে ওকে আর ছাড়িনি। একা, বিধবা মানুষ, কোথায় যাবে? আর, তা ছাড়া, আমি টো-টো করে ঘুরি। লোক খেপিয়ে বেড়াই। বাড়ি ফিরে এসে চানের জলটা, গরম ভাতটা পেতে ভালই লাগে। ওর হাতের রান্না আজ খেয়ে দেখবেন।'

অদ্ভুত ছোটলোক তো। প্রকাশ ভাবল, একেবারে অমানুষ। এদিকে শ্রমিকদের মুক্তি আন্দোলন, আর অন্যদিকে একটা মানুষকে কীভাবে চুষছে। দয়ামায়া বলে এর মধ্যে কিছু নেই।

ঠিক বুঝতে পারে সুধীর খাস্তগীর। গাড়ি যখন ঢাকুরিয়া ছাড়িয়ে গেছে, যোধপুর পৌঁছোয়নি, এমন সময় ও বলল, 'আমার কথা আপনার পছন্দ হচ্ছে না, তাই না? হেঁ-হেঁ, আমরা হলাম লেবার ক্লাস। গুছিয়ে কথা বলতে শিখিনি।'

প্রকাশ বলল, 'গুছিয়েই তো কথা বলছেন। একটা কথাও তো বেফাঁস বলেননি। আমি শুধু ভাবছি, আপনার এই শ্রমিক সংগঠনের কাজ—আপনি মানুষের প্রতি দরদ থেকে করেন? না, এ আপনার পেশা?'

সুধীর খাস্তগীর এবার প্রকাশের উরুতে মৃদু চাপড় মারল। বলল, 'দরদ? হ্যাঁ, দরদ থেকে শুরু করেছিলাম। এখন পেশা। আপনি সালিম আলির নাম শুনেছেন মিস্টার মল্লিক?'

'পক্ষী বিশারদ?'

'পক্ষীপ্রেমিক। পাখির মাংস খেতে খুব ভালবাসতেন। বলতেন, মাংস না খেলে পাখির চরিত্র বোঝা যায় না।'

একটার-পর-একটা বাম্প গাড়িটাকে ঝাঁকাচ্ছে। ফিয়াট গাড়ির ছাদ নিচু, মাথা ছুঁয়ে যাচ্ছে উপরের কুশনে। সুধীর একবার ড্রাইভার ছোকরাকে আস্তে চালাতে বলল।

বাইরের আকাশ বেশ মেঘলা। গাছপালা নিস্তব্ধ।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। একসময় মানুষের কথা তো ফুরিয়ে যায়। প্রকাশ মনে মনে ভাবছে, আজ কিছু একটা নিষ্পত্তি যদি হয়ে যায়, তবে সন্ধেবেলা বাবাকে ট্রাংককল করবে। সোমেশ মল্লিক কখনও এই সুধীর খাস্তগীরের খাস্তা গাড়ি চড়ে রায়পুর যেতেন না। সাত মাস কারখানা বন্ধ থাকার ফলে মল্লিক পরিবারের যথেষ্ট অর্থক্ষয় তো হয়েছেই। তার ওপর নতুন প্রোজেক্টে মূলধন ঢালতে হচ্ছে এখন। এইসব ভার বহনের ক্ষমতা সোমেশ মল্লিকের আছে। কিন্তু এতদিন ওয়ার্কাররা মাইনে পায়নি। ওদের চলেছে কী করে? ইউনিয়ন কি এতদিন খাইয়ে এসেছে ওদের? এই আড়াইশো জনকে?

সুধীর খাস্তগীর বলল, 'কেউ কেউ এদিক-ওদিক কাজে লেগেছে মনে হয়। কিন্তু তারা ক'জন! যারা দক্ষ কারিগর, পেট চালাবার মতো কাজ তারা জুটিয়ে নেয়। যারা তা পারেনি, তারা কারখানার সামনে ছোট ছোট দোকান করেছে। তেলেভাজা মুড়ি বেচছে। কারুর সংসার তো চুপ করে থাকবে না। বলবে, খেতে দাও, পরতে দাও। কারখানা বন্ধ তো কী? কুলিগিরি করো। ভিক্ষে করো। উচিত শিক্ষা হয়েছে এদের।'

প্রকাশের মনে হয়, বাবার মতো গোঁ ধরে বসে থাকাটা বিবেচকের কাজ নয়। খোলাখুলি যুদ্ধ একালে প্রায় অচল। এখন বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার যুগ। তাতে টেনশন আছে, তবে অকারণ শক্তিক্ষয় হয় না। ক্ষমতার লড়াই আজকাল আলোচনার টেবিলে পৌঁছে গেছে। কার ধৈর্য বেশি, তার পরীক্ষা।

হঠাৎ শুনল, সুধীর খাস্তগীর বলছে, 'লোটন মুনশিকে মনে পড়ে মিস্টার মল্লিক? সিকিউরিটি স্টাফ লোটন মুনশি? মাঝবয়সি। এক চোখ ট্যারা। একসময় ম্যানেজমেন্টের পেয়ারের লোক ছিল। চোর ধরত। সুইসাইড করেছে। বিপিকোর পাখায় গামছা বেঁধে ঝুলে পড়েছে। আর বলবেন না, তার বউ নিত্য এসে জ্বালায়: বলে, বিধবাদের পেনশন হবে বলেছিল, তার কী হল? আরে বাবা, আমি কি পেনশন দেবার মালিক? তিন তিনটে আইবুড়ো মেয়ে। লেখাপড়া শেখায়নি। একে একে ওরা বেশ্যা হয়ে যাবে।'

ছোট ছোট ডোবা-পুকুরের পাশ দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে চলতে চলতে গাড়ি দাঁড়ায় যথাস্থানে। একঘণ্টা লাগল আসতে এতটা পথ।

একতলা ছোট বাড়ি।

সামনে টানা রোয়াক। তার ওপর লাল টালির চাল। খানিকটা খোলা জায়গা আছে, বাগান হতে পারত, হয়নি। জঙ্গল গজিয়েছে বর্ষাকালে। রাস্তা থেকে বাড়ি পর্যন্ত পাতা-ইটের পথ।

খোলা ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকল দু'জন।

অদ্ভুত সে-ঘরের আসবাব। তিন দেয়াল ঘেঁষে বেঞ্চি পাতা। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড টেবিল। এক কোণে খানদুয়েক হাতলওলা বেতের চেয়ার। চারটে খোলা জানলা। কোনও জানলার পরদা নেই। আলো হাওয়া ধুলো হু হু করে বইছে ঘরের মধ্যে।

'এই আমার অফিস', বলে সুধীর খাস্তগীর ডাকল, 'হেমা, ও হেমা। কোথায় গেলে গো। সাহেবকে নেমন্তন্ন করে আনলাম। একটু খাতিরযত্ন করো।'

অমনি কোণের বেঞ্চি থেকে একটা লোক উঠে দাঁড়ায়।

'আমি খবর দিচ্ছি।' বলে লোকটা ভেতরে যাবার চেষ্টা করে।

লোকটা ওখানে বসে আছে, কেউ লক্ষ করেনি আগে। এখানে কারুরই বসে থাকার কথা নয় আজ।

'কে তুমি? এখানে কী করছ?' চেঁচিয়ে ওঠে সুধীর।

'কাঁচা বাজার দিতে এসেছিলাম।'

'তো, দিয়েই চলে যাওনি কেন? অ্যাঁ। যাও, বেরিয়ে যাও। নচ্ছার কোথাকার।'

লোকটার চোখ ছলছল করে। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েই থাকে ওদের সামনে। বলে, 'বাবা বলল—'

'তোমার বাবা কী বলে দিয়েছে, জানার দরকার নেই আমার। বলছি, দূর হও এখান থেকে। এক্ষুনি দূর হও।'

লোকটাকে চেনা চেনা মনে হল প্রকাশের। কারখানার কেউ? জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'আজ্ঞে, আমার নাম নির্মল, নির্মল সাধুখাঁ।'

সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছেলে! কী চেহারা হয়েছে। চোখদুটো বসা। ময়লা পাঞ্জাবি-পাজামা পরনে! কণ্ঠাব হাড় দেখা যাচ্ছে।

পায়ের ওপর ঝুঁকে প্রণাম করে নির্মল সাধুখাঁ। সুধীরকে প্রণাম করতে গেলে সে মুখের ওপর হাওয়াই চপ্পল নেড়ে দেয়।

'ন্যাকামি হচ্ছে? যাবে? না, গলাধাক্কা দেব?'

লোকটা ছুটে পালায় ঘর থেকে।

রাস্তায় বেরিয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে ছুটতে থাকে। বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এবার প্রকাশ দেখল, একজন সুশ্রী মহিলা কখন দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। অলংকারশূন্য হাতদুটি জোড়া করে সে নমস্কার করল। বলল, 'এই ঘরে আসুন।'

ভেতরের ঘরটি একেবারে আলাদাভাবে সাজানো।

সেখানে পুরু সোফাসেট। শেলফে মোটা মোটা বই। একপাশে ঢাকা-দেওয়া ছোট টেবিল, গদিমোড়া চেয়ার। টেবিলে কাগজপত্রের একটি ছোট স্তূপ। ঘরের কোণে টেলিফোন। ঘরের জানলাগুলোয় হলুদ পরদা ভেদ করে রোদ্দুর আসছে।

'এই হেমাঙ্গিনী। আপনাকে যার কথা বলছিলাম!'

'আমার সব কথা বলা হয়ে গেছে এর মধ্যে?' হেমাঙ্গিনী প্রকাশের দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞস্বরে বলে, 'উনি বলেন কী জানেন? উনি বলেন, হেমা, তুমি আমার অ্যাটাচড বাথ।'

'সত্যিই তাই। উপমাটা লেবার ক্লাস হলেও আন্তরিক। ওর মধ্যেই আমার বেসিন, আমার কমোড। আমার শাওয়ার। আমার আয়না। আমার জলের ট্যাপ—হট অ্যান্ড কোল্ড।'

হেমা বলে, শুনতে আমার মজা লাগে। এর মধ্যে অপমান আছে কিনা, আমি বুঝতে পারি না। আসুন, হাত-মুখ ধুয়ে নিন।'

প্রকাশের মনের ভেতর খচখচ করতে থাকে।

সালিম আলি। পক্ষীপ্রেমিক। পাখির মাংস খেতে ভালবাসতেন। সব পাখির? যে-পাখি সুন্দর? যে-পাখি গান গায়? না, বোধহয়।

সুধীর বলল, 'হেমা, তুমি ড্রাইভারকে খেয়ে আসতে বলো। ঠিক তিনটের সময় আমরা বেরোব।'

ভেতরের বারান্দায় কার্পেটের আসনে বসে খাওয়াদাওয়া সাঙ্গ হল। কতদিন পর কাঁসার বগি থালা, ফুলকাঁসার বাটি, গেলাস, দেখল প্রকাশ। কাচের প্লেট হয়ে এসব বাসন এখন উঠেই গেছে।

এই ঘরে ফিরে এসে সুধীর একটা বিড়ি ধরায়। পান চিবোতে চিবোতে খানিকক্ষণ দাঁত খোঁটে।

ভেতরের ঠুনঠান শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।

'আসুন, এবার আমরা চার্টার অব ডিমান্ডস নিয়ে বসি।'

সুধীর বিড়ি ফেলে দিয়ে ঘোষণা করে।

'প্রথমেই বলে রাখি মিস্টার মল্লিক, আমি ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। বড়সাহেব, আপনার

বাবা, এই কারখানা—কী যেন নাম, বিপিকো—নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন। ইংরেজ সাহেবদের আমলে ওখানে জনবসতিই ছিল না। একটা শেড ছিল কেবল। পনেরো-কুড়িজন লোক কাজ করত। আজ সেখানে আড়াইশো ওয়ার্কার মানে পাঁচশোটা হাত। পাঁচশো হাত একসঙ্গে কাজ করলে সোনা ফলে। সোনা ফলেছে। আবার মনে রাখতে হবে, এক-একটা ওয়ার্কারের পেছনে চারটি-পাঁচটি করে মুখ। এ দেশের এমন দস্তুর।

'মানুষকে কাজ করতে হয়। মনের আহ্লাদে খুব কম লোকই কাজ করে। তাই না? মানুষের কাছে কাজ আদায় করে নিতে হয়। তাই তো ম্যানেজমেন্ট এসেছে। একসময় পিটিয়ে কাজ করানো হত। চা-বাগানে, নীলচাষে কোনও নিয়মকানুন ছিল না। ক্রমশ সচেতন হয়েছে মানুষ। তাব অভিজ্ঞতা বেড়েছে। সে বুঝেছে যে, না, বিশ্রামও মানুষের দরকার। পিটিয়ে না, ভালবেসে, ভাল ব্যবহার কবে বেশি কাজ পাওয়া যায়। আপনার বাবা এই সময়ের মানুষ। সার্থক ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট তিনি।

'কিন্তু ভালবাসায় একটা প্রত্যাশার আবেগ এসে যায়। তাই না? আমি তোমায় ভালবাসি, তো তুমিও আমায় ভালবাসবে। যদি না বাসো তো আমার অভিমানে চোট লাগবে। কী! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? এখন কিন্তু এইভাবে আর মানুষকে চালানো যাচ্ছে না। এখন শ্রমজীবী মানুষ দেখছে যে, তার সমাজ শ্রেণীবিভক্ত। আপনাবা আব শ্রমিকরা ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মানুষ। আপনাবা তার কাজের গ্রাহক। একা দুর্বল বলে ওরা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে।'

প্রকাশ বলে, 'কাজেব কথায় আসা যাক।'

সুধীর খাস্তগীর একটা লম্বা কাগজ মেলে ধরল সামনে। তাতে প্রত্যেকটি দাবি ছক কেটে বিশ্লেষণ কবা আছে।

বলল, 'প্রথমেই ধবা যাক পে-স্কেল। এখন কোনও স্কেল বা ধাপ নেই। ওরা একটা ওপরে ওঠার সিঁড়ি দেখতে চাইছে। পনেরো বছর, কুড়ি বছর কাজ করার পর কে কোথায় পৌঁছোবে। দেখতে দিন। এই দায়িত্ব নিজের মধ্যে না রেখে খোলাখুলি বলে দিন। মাইনে বাড়িয়ে আপনি কাউকে পুরস্কার তো দিচ্ছেন না, তাব পরিণতির মূল্য স্বীকার কবছেন। তাই না? আমি এইভাবে প্রত্যেক পদের জন্যে একটা ছক করে দিয়েছি।

'ওবা ডি-এ বাড়াতে চায়। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে জুড়ে দিতে চায় ডি.এব হার। তাই তো সঙ্গত। তবু ওটাতে পরে আসছি।

'ওরা রাহা খরচ চেয়েছে কাজে আসার আর বাড়ি ফিরে যাওয়ার। আপনি দেবেন না। ওরা বোনাস চেয়েছে সর্বোচ্চ হারে। আপনি বোনাস আইন মেনে যা নির্ধারিত হয় তাই দেবেন। ওরা বছরে আরও পাঁচদিন কবে ছুটি বাড়াতে বলছে। আপনি মঞ্জুর করবেন না। ওরা পেনশন চেয়েছে। না, অবসর নিয়ে চলে যাওয়ার পরও কোনও ওয়ার্কারেব দায়িত্ব বহন করার সামর্থ্য এখনই আপনার নেই। পরে দেখা যেতে পারে। তবে, ওই লোটন মুনশি, যাব বউ কেবল জানতে চাইছে, বিধবাদের পেনশনের কী হল—তার একটা মেয়েকে চাকরি দিন।'

প্রকাশ বলল, 'আপনি যে বললেন, লেখাপড়া শেখেনি। কী কাজ করবে?'

'শেখেনি মানে মাধ্যমিক অবধি। আপনি শুধু নীতিগতভাবে রাজি হোন। কোথায় নেওয়া যায়, পরে দেখব আমরা।'

এইভাবে কথা অগ্রসর হতে থাকে। দেখতে দেখতে অতবড় ফিরিস্তি চারভাগের তিনভাগ খারিজ হয়ে গেল। এই জিনিসটাকে এত আপত্তিকর মনে হয়েছে কেন এতদিন, প্রকাশ বুঝতে পারে না।

কেবল ডি. এ. আর ক্যান্টিনের দাবি নিয়ে সুধীর খাস্তগীর তর্ক করে যায়।

'ওরা দু'শো আশি টাকা চেয়েছে। আপনি আশি টাকা দিন। এখনই নয়। বলুন, এ-বছর পঁচিশ। আগামী বছর পঁচিশ। পরের বছর ত্রিশ। আপনার গায়েই লাগবে না। ভেবে দেখবেন, আমি অন্যায় আবদার করছি না।

'ওরা ফ্রি-টিফিন চেয়েছে। পেটের খাদ্য। কত দূর দূর থেকে ওরা আসে জানেন তো। ছটায় হাজিরা দিতে অনেককে ভোর চারটেয় বাড়ি থেকে বেরোতে হয়। আলুভাতে-ভাত খেয়ে বেরোয়। আঃ, সে ভাতের রূপ আপনি দেখেননি। সঙ্গে কৌটোয় ভরে নিয়ে আসে শুকনো রুটি। একটু তরকারি। এগারোটার সময় সেটা জল দিয়ে গেলে। না, না, আমি বাড়িয়ে বলছি না, মিস্টার মল্লিক, প্রথম শিফটের

এই হল বাস্তব ছবি। দ্বিতীয় শিফটে তফাত হল এই যে, তারা শেষরাত্রে বাড়ি থেকে বেরোয় না, মধ্যরাত্রে বাড়ি ফেরে।

'ওই খাদ্য খেয়ে কর্মক্ষমতা বজায় রাখা যায় না। এত খাটাখাটুনি করে মানুষ। কেন? পেটভরে খাবে। পরিবারের লোকেদের খিদে মেটাবে। তাই তো? পরিবার চুলোয় যাক, আপনি ওকে একটু টাটকা আর পুষ্টিকর খাদ্য পেতে দিন। তবে বিনামূল্যে নয়। আমি বিনামূল্যে কোনও কিছুতেই বিশ্বাস করি না। তাতে অপচয় বাড়ে। আপনি ভরতুকি দিন। মিল পিছু দু' টাকা করে আদায় করুন।

'আমি খতিয়ে দেখেছি সবটা।' শেষকালে বলে সুধীর খাস্তগীর, 'মাথাপিছু আপনার খরচ বাড়বে মাসে একশো টাকা। আপনার লাভের দশ শতাংশের ওপর হাত পড়বে না। প্রোডাকশন কস্ট ধরে দেখলে—মোট মজুরির হার এখনও পনেরো শতাংশের মধ্যে রইল।

'আর একটা কথা। লক আউটের আগে বড়সাহেব সকল কর্মীকে একটা থোক টাকা কবুল করেছিলেন। সামনে পুজো আসছে। ওইটুকু ঋণ হিসেবে ওদের দিন। মাইনে থেকে আস্তে আস্তে কেটে নেবেন।

'তিন বছরের চুক্তি হোক। যারা ছাঁটাই হয়েছিল, দোষী না নির্দোষ, এখন আর বিবেচনা করার অবকাশ নেই। ওই যে বললাম, রিজনেবল অ্যান্ড অনারেবল সেটলমেন্ট। এই উদারতার প্রতিদান আপনি পাবেন। কারখানা আবার চালু হয়ে যাক, দেখবেন, এতগুলো মাসের উদ্বেগ আর কষ্ট একদিন সবাই ভুলে যাবে। দু'পক্ষের জেদ থেকে সকলের যে কষ্টভোগ হল, তার অভিজ্ঞতা দবকার ছিল হয়তো। ভালই হয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন আনতে কিছু মূল্য তো দিতে হয়। এ যাত্রায় লোটন মুনশিকে শহিদ হতে হল, সেটাই দুঃখেব।'

প্রকাশ বলে, 'রাত্রে ট্রাংককলে বাবাব সঙ্গে কথা বলি। উনি রাজি হলে হয়।'

'কর্তাকে এবার রেহাই দিন।' সুধীর খাস্তগীর এতক্ষণ পর আর একটা বিড়ি ধরায়। 'তবে চুক্তির দিন উনি যেন উপস্থিত থেকে ইউনিয়ন আব ম্যানেজমেন্ট দুই পক্ষকে আশীর্বাদ করেন। এটা আমাদের সর্বশেষ দাবি। তারপর, যোগ্য পুত্র আপনি কারখানার দায়িত্বে চলে আসুন। আমি আপনার পেছনে থাকব, কথা দিচ্ছি। কোনওরকম অশান্তি হতে দেব না।'

'আপনার ফি কে দেবে?'

'ম্যানেজমেন্ট না। আমি ট্রেড ইউনিয়নের সর্বক্ষণের চাকর। ওরা আমাব সমস্ত খরচ পুষিয়ে দেয়।'

প্রকাশ বলল, 'ভেবে দেখলে, এ-যাত্রায় একা লোটন মুনশি নয়, আপনারা দু'জনকে শহিদ করলেন।"

সুধীর খাস্তগীর এবার মুখব্যাদান করে হাসে। ওর একসারি অনুপস্থিত দাঁত যেন নিভৃতে উঁকি দিয়ে যায়।

কথায় কথায় তিনটে বেজে গেছে। ড্রাইভার ছোকরা কখন এসে হর্ন দিয়েছে গাড়ির।

সুধীর হাঁক দেয়, 'হেমা, এবার আমরা উঠব। এক কাপ করে চা দিয়ে দাও।'

একসময় প্রকাশ হাসতে হাসতে বলে, সুধীরবাবু, আপনার সামনের দাঁতক'টা এবার বাঁধিয়ে ফেলুন। খবচটা না হয় আমিই দিয়ে দেব। তা হলে মুখখানা স্বাভাবিক দেখাবে।'

'সর্বনাশ, ও-কথা বলবেন না, মিস্টার মল্লিক।' সুধীর খাস্তগীর যেন ভয়ে আঁতকে ওঠে, 'ওইটে আমার ভাবমূর্তির বিজ্ঞাপন। খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ের হাওয়াই চপ্পল যা পারেনি, ওই চারটে নীচের পাটির দাঁত কলকাতা পুলিশের অনুগ্রহে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল অনেকদিন আগে। ওরা আমার নখদন্তহীন ভাবমূর্তির প্রভূত উন্নতি করেছে। এ-শহরে ইউনিয়ন লিডার একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি, এই রকম একটা ধারণা প্রচলিত। আমার সঙ্গে তো আলাপ হল। বলুন, সে ধারণা অমূলক কিনা।'

ও ক্যালকাটা।

১৯৯০

সাধারণত মাসের ঠিক দু'তারিখে আমি পেনশন নিতে যাই। দু'তারিখ ছুটির দিন, কি রবিবার পড়লে তিন তারিখ। আসলে এক তারিখে গেলেই হয়। প্রতি মাসের পয়লা তারিখই আমার এবং আমার মতো দু'-আড়াইশো জনের পেনশন পাওয়ার দিন। সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর সোয়া একটার মধ্যে গিয়ে পৌঁছোতে হয়। তারপরই এল.আই.সি বাবুদের টিফিন টাইম।

তো সেবার ষোলো তারিখ হয়ে গেল।

আপনারা তো জানেন, আমি কলকাতায় ফিরলামই বারো তারিখে। এক মাসের ওপর বিদেশে ছিলাম। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছি। গিয়ে পড়লে কেউ আর ছাড়তে চায় না। উইক-এন্ড কাটিয়ে তবে যাও, জিদ ধরে বসে। ওই দুটো কি তিনটে সন্ধে, দুটোই—কেননা রবিবার তো বেশি রাত অবধি আড্ডা দেওয়া যায় না, পরের দিন আটটা বাজতে-না-বাজতেই সকলের আপিস যাওয়ার তাড়া। দুটো মাত্র সন্ধে, একটু গানবাজনা, কবিতা পড়া, আমার মতো অতিথি এসে পড়লে তাকে জায়গাটা ঘুরে দেখানো। পুরনো দিনের গল্প নিয়ে নাড়াচাড়া করা। দেখতে দেখতে রাত কাবার হয়ে যায়। চেঁচিয়ে বাংলা কথা বলতে এত ভাল লাগে না। কারুর মেমবউ থাকলে তার অবাক লাগে, কী রে বাবা, এরা এত জোরে, কথার পিঠে কথা বলে কেন? একজনকে শেষ করতেও দেয় না! হ্যাঁ, ওই আমাদের রীতি। এককালে ওইভাবে রকে বসে আড্ডা দিয়েছি, কলেজের কমন রুমে, কফি হাউসে, মনে পড়ে? ওঃ, কী সব দিন ছিল। ওই আমাদের ঐতিহ্য। যখনই কোনও কথা মনে পড়বে, তখনই সেটা বলে ফেলতে হবে। তোমাদের মতো এখানে কলা খেয়ে ওইখানে গিয়ে খোসা ফেলার ভব্যতা আমরা শিখিনি। আমাদের প্রাণে স্ফূর্তি অনেক বেশি। তাই উপচে পড়ে।

বারো তাবিখে ফিবে তিন দিন ধরে জেটল্যাগ চলল। কী ঘুম, কী ঘুম! সকাল নেই, দুপুর নেই, যখন-তখন ঘুমে জড়িয়ে আসে চোখ। ডাক্তারকে ফোন করতে, ও বলল, ভাববেন না, এর নাম জেট ল্যাগ। কোনও ওষুধ খেতে হবে না, ইউরিয়া ফিউরিয়া চেক করাবার দরকার নেই। ও আপনিই সেরে যাবে। তাতেই ষোলো তারিখ।

ভদ্রলোকের নাম অনুরাগ ঘোষ। আমি মিস্টার ঘোষ বলেই ডাকি। ওকে বুঝতে দিই না যে, অনুরাগ নামটার প্রতি আমার একটা আলাদা প্রীতি আছে। এর আগের লোকটির নাম ছিল চিন্ময়, চিন্ময় দত্ত। বড়সড় চেহারা, লম্বা। চেয়ারে বসেই হাত বাড়িয়ে লোহার আলমারির হাতল ঘোরাতে পারত। চেকের বান্ডিল বার করে আনত। আমার মনে হত, নিশ্চয় তার যৌবনকালে চিন্ময় ফুটবল খেলেছে। ওই লম্বা হাত কেবল গোলকিপারকেই মানায়। তবে, সে-কথা আমি কখনও জানতে চাইনি। ওর আপ্যায়নটি আমাব ভাল লাগত।

তখন একদিন পেনশন নিতে গেছি, ও বলল, পবের বার দু'দিন আগে আসবেন, কেমন? মানে তিরিশ তারিখে। আমি চেক রেডি করে রাখব।

কী ব্যাপার?

আমার চাকরির শেষ দিন। পয়লা থেকে অন্য কেউ আমার জায়গায় আসবে। কে আসবে, আমি জানি না। আমার কী? ওপরওলাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাব। আপনার মতো কয়েকজনকে বলে রাখছি, পাছে এক তারিখ কি দু'তারিখে এসে অব্যবস্থার মধ্যে পড়ে যান।

ওপরওলাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাব।

চিন্ময় দত্ত চেক দিতে দিতে বলেছিল। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। হাসিটা লেগে আছে মুখে। ওটা আমাদের মতো বুড়ো মানুষদের জন্য। ভেতরে ভেতরে ভদ্রলোক বেশ ক্ষুব্ধ। তিরিশ-বত্রিশ বছর এক নাগাড়ে চাকরি করার পর আসন্ন অবসরের মুখে তার দিকে কেউ ফিরেও চাইছে না—মানে কর্তৃপক্ষ—কেউ একটা লোক দিয়ে বলছে না, তোমার কাগজপত্র, পেন্ডিং ম্যাটার একে বুঝিয়ে দাও, তারপর ছাড়া পাবে, কারুর গ্রাহ্য নেই। ক্ষোভ হওয়া খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেকেই নিজের কাজ নিয়ে গর্ববোধ করে, মনে করে, আমি আছি বলে আপিস চলছে, না হলে চলত না। হোক না মিথ্যে ভ্রম এই ধারণা, তবু এটা থাকে বলে মানুষ চাকরিকে চাকরের কাজ মনে করে না। তিরিশ তারিখের বিকেলবেলা

টেবিলের ওপর কাগজের স্তূপ আর আলমারি-ভরতি ফিতে-বাঁধা ফাইলের সঙ্গে নিজের গর্ববোধ, জলের গেলাস, পেপারওয়েট পেছনে ফেলে রেখে, পাশের সহকর্মীকে চাবি দিয়ে চিন্ময় দত্ত হেঁটে বেরিয়ে যাবে, এই ভাবনা বাস্তবিক দুঃসহ। ছোটখাটো প্রতিষ্ঠানে এ রকমটা ঘটে না। এল.আই.সি এক বিরাট কর্মকাণ্ড, সেখানে হয়তো রোজই কেউ-না-কেউ রিটায়ার করছে, পাওনাগন্ডা যথাস্থানে গিয়ে বুঝে নিচ্ছে, পরদিন থেকে আর আসছে না। কর্তৃপক্ষের টনক নড়লে একটা ব্যবস্থা হতেও দেরি হবে না। সেখানে লোকের তো অভাব নেই। নির্দিষ্ট তিরিশ তারিখে গিয়ে আমার পেনশনের চেক নিয়ে এসেছিলাম, মনে আছে। সাহেবি কায়দায় একবার হ্যান্ডশেকও করেছিলাম, গুড বাই। বলেছিলাম, ভাল থাকবেন, কোনও একটা কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবেন, না হলে শরীর টিকবে না। চিন্ময় বলেছিল, চন্দননগরে ওর নিজের ব্যবসা আছে।

তারপর থেকে এই অনুরাগ ঘোষ সেই টেবিলে বসছে। এর বয়েস অনেক কম, চল্লিশ টল্লিশ হবে। এ-ও খুব অমায়িক ভদ্রলোক। ছোটখাটো চেহারা। শিবপুরে থাকে, কিন্তু ঠিক দশটার সময় আপিসে পৌঁছে যায়। এল.আই.সি-তে এ রকম সময়নিষ্ঠ কর্মী খুব বেশি নেই। আমি অবশ্য মাসে একদিন এদের দেখি। তবু, মনে হয়, এই চিন্ময় (যার মানে শুদ্ধচিত্ত) আর অনুরাগ (যার মানে আদর, প্রীতি) নামের কর্মীদের বেছে বেছে এল. আই. সি কর্তৃপক্ষ পেনশন বিভাগে পাঠায়। বুড়ো মানুষদের নিয়ে কাজ, যারা কাজের জগৎ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, অকর্মণ্য প্রমাণিত হয়েছে সংসারে, যারা দিন গুনছে মৃত্যুর, তাদেব হাতে কিছু কিছু খোরাকি ধরিয়ে দেওয়া। অভিজিৎ বা জয়ন্ত বা কামাল নামের লোককে দিয়ে এই কাজ হয়তো হত না। আমার এমনও মনে হয়েছে, ভুল হতে পারে, যে, যোগ্যতা নয়, সিনিয়রিটি নয়, উপযুক্ত নামের খোঁজ কবতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ চিন্ময়ের পরিবর্ত দিতে দেরি করে ফেলেছিল।

তো, ষোলো তারিখে আমাকে দেখেই অনুরাগ ঘোষ একটু চমকে উঠল। অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। তা ছাড়া ষোলো তারিখ তো, পেনশনের দিন নয়। তারপর আস্তে আস্তে ওর মুখময় ছড়িয়ে পড়ল এক করুণাময় হাসি, গৌতম বুদ্ধের মুখে যে-হাসি আমরা সচরাচর দেখি। প্রসন্ন, অনুচ্চারিত।

বলল, কী ব্যাপার? দু'তারিখে এলেন না?

বিনয় করে বললাম, কলকাতার বাইরে ছিলাম। আপনি কি ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার ব্যাঙ্কে?

না, না। ডাকের চেক আলাদাভাবে যায়। আপনার চেক ধরে রেখেছি। ভাবনা হচ্ছিল।

'ভাবনা হচ্ছিল' কথাটা খুব নরম করে বলা। দুর্ভাবনা কি দুশ্চিন্তা এইখানে উপযুক্ত শব্দ। যারা প্রতি মাসে পয়লা বা দু'তারিখে এসে হাজির হয়, বুড়ো মানুষের দল, তাদের কেউ একজন হঠাৎ কোনও মাসে না এলে ভাবনা হওয়ার কথা। আগের বার পেনশন নেবার সময় মিস্টার ঘোষকে জানিয়ে যেতে পারতাম যে, পরের বার আমার কয়েকদিন দেরি হবে, কলকাতার বাইরে যাচ্ছি, কি বিদেশে যাচ্ছি। তাতে ও খুশিই হত। এই ভুলেব জন্য ক্ষমা চাইলাম। তারপর একটা সিগারেট লাইটার উপহার দিলাম ওকে।

কোথাকার?

আমি বললাম, জার্মানিতে কেনা। হয়তো হংকংয়ের তৈরি।

জিনিসটা নিতে নিতে ও বলল, ভাবনা হচ্ছিল, আবার ভাবছিলাম, আপনার কিছু একটা হলে কাগজে খবর বেরোত। ছোট করে হলেও একটা অবিচুয়ারি। তা যখন বেরোয়নি, তখন আপনি ভালই আছেন। বা, জ্বরটর হয়েছে। সবাই তো আপনার মতো হয় না। তাই ভাবনা হয়।

কমপ্লিমেন্টটা গিলে ফেলি। সেদিন আর কথা বাড়াই না। পরের মাসের দু'তারিখে কথাটা পাড়লাম। ইচ্ছে করে, একটু দেরি করে গেছি। এই পৌনে একটা নাগাদ। আপিসযাত্রীর ভিড় ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর ভাতটাত খেয়ে, একটু জিরিয়ে নিয়ে এল-নাইন ধরলাম। চিত্তরঞ্জন আর গণেশ অ্যাভেন্যুর মোড়ে নামলাম। রিটায়ার করার পর ওসব পাড়ায় যাওয়া আমার উঠেই গেছে। যেদিন যাই, হাতে আরও দু'-একটা কাজ নিয়ে যাই। সেদিনের কাজগুলো সব বিকেলের দিকের। মনের ইচ্ছে, পেনশনের চেকটা নেব, তারপর একটু পেছিয়ে এসে নবাবদের কফিহাউসে ঢুকে এক কাপ কফি খাব। সেখানে চেনাশোনা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে জানা যাবে, এ-মাসের বেস্ট সেলার কোন বই, এ সপ্তাহের মহাকবি কে। ততক্ষণে টিফিন টাইম উতরে যাবে। তারপর গলিপথ ধরে বিবাদী বাগের কাজ সেরে চারটের মধ্যে ফেরার মিনি ধরতে পারি, তা হলে বসে আসা যাবে। আজকাল ভিড়ের বাসে দাঁড়িয়ে আসতে কষ্ট হয়।

মনে পড়ে যায় আপিসের গাড়ি হাঁকিয়ে চলাফেরা করার দিনগুলির কথা। তাতে কষ্ট আরও বাড়ে।

এইখানে বলে রাখি, আমি বা আমরা, যারা এল. আই. সি থেকে মাসে মাসে পেনশন তুলি, সবাই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে এসেছি। মনিবের স্বার্থরক্ষা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনও লক্ষ্য ছিল না। দশটা-পাঁচটা কাজ করে বাড়ি ফিরে আসা আমাদের কর্মজীবনে কখনও ঘটেনি। এই পেনশন বা খোরাকি তারই বকশিশ। একটা বিশেষ টাকার অঙ্কে তা নির্ধারিত হয় বিদায় নেওয়ার সময়। সেইটেই চলে। সরকারি পেনশনভোগীদের মতো আমাদের প্রাপ্য অর্থ ক্রমবর্ধমান নয়। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। একটা থোক টাকা দিয়ে এল. আই. সি-র কাছ থেকে আমাদের মনিব এই মাসোহারা ব্যবস্থাটা কিনেছে। আয়কর থেকে ছাড় পাওয়া গিয়েছে তখন।

শুধু এক জায়গায় এর মিল। তা হল, যতদিন বেঁচে থাকব, টাকাটা পেয়ে যাব। কাজ করতে হবে না। এটা বেঁচে থাকার মজুরি বলা যায়। মরে গেলেই টাকাটা বন্ধ হয়ে যাবে। এর জন্যে বছরে একবার করে আমাদের নিকট আত্মীয়দের লিখিত বিবৃতি দিতে হয়: যে, বিগত এক তারিখ পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি। ব্যস।

সকলে যতদিন পর্যন্ত পারে, চাকরিটা টেনে যায়। তাতে পেনশনের অঙ্ক বৃদ্ধি পায়। আয়ু দিয়ে আয়টা বাড়িয়ে নেওয়া। পরিণত বয়সে দায়িত্ব বেশি থাকলে চাকরিতে ঝুঁকি তেমন থাকে না। বড় সাহেব, মেজ সাহেব এক-একটি বিগ্রহের মতো স্থিতিশীল। কোথাও আটান্ন, কোথাও ষাট, কোথাও বা ঠেলতে ঠেলতে পঁয়ষট্টি। পরের প্রজন্ম অ্যান্টিচেম্বারে বসে অপেক্ষা করে, কখনও গুঁতোয় না স্যারকে। কেবল আড়চোখে দেখে যায় তাঁর মেডিকেল রিইমবার্সমেন্টের বিলটা কী রেটে বাড়ছে।

ছিচকে অসুখবিসুখ চিকিৎসার খরচ মনিব আমাকেও দিয়ে দিত। কাঁচা শরীর, খরচ হত যৎসামান্য। পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে দেখলাম, এটা বাড়তে বাড়তে বছরে এক মাসের মাইনের কাছাকাছি গিয়ে ঠেকেছে। আর, যে-ব্যারামগুলো উঁকি মারছে, তার একটাও সারবার নয়। তখনই টনক নড়েছিল আমার। মনিবের ধনবৃদ্ধি করার নেশায় নিজেকে ক্ষইয়ে দেওয়ার আর কোনও অর্থ হয় না। তখনই সুযোগমতো একটা ছুতো খুঁজে নিয়ে যাকে বলে স্বেচ্ছা-অবসর, তাই নিয়ে নিলাম। লোকে বলল, কী বোকা, এই তো টাকা জমাবার সময়, এখন কেউ কাজ ছাড়ে? কেউ বলল, ছাড়েনি, ছাড়িয়ে দিয়েছে। আসলে আমারই দোষ। মনের সঙ্গে যোগ নেই, এমন কাজকে আমি ভালবাসিনি। না-বেসেও এতদিন করে গেলাম। বউকে ভাল না বেসে লোকে যেমন সংসার করে যায়।

পৌনে একটা। অনুরাগ ঘোষের সামনে তখন আরও দু'জন বসা। তাদের বয়স পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরের মধ্যে।

একজনের পরনে শার্ট-প্যান্ট, পায়ে স্ট্র্যাপ-দেওয়া চপ্পল, কাঁধে শান্তিনিকেতনের ঝোলা। রিটায়ার্ড লোকেদের ওইটেই প্রধান জার্সি। সারা জীবন কোট-প্যান্ট, টাই, বেল্ট, সাফারি স্যুট পরে পরে ক্লান্ত, এখন তাই ঝাড়াঝাপটা পোশাক। ট্রামে-বাসে চলাফেরা করার উপযুক্ত। চোখে চশমা দেখলাম, তার একটা কাচ ঘষা। ছানি কাটিয়েছে।

অপরজনের পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। মাথার চুল সাদা। গালে একদিনের বাসি দাড়ি। দু'জনই আমার মুখচেনা। বহুবার এখানে দেখেছি হাস্য-বিনিময় হয়েছে। আমি এক পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। ভাবটা, আমার দান এদের পর। এক-এক করে ওরা চেক নিল। ভাউচারে সই করল। আমি লক্ষ করলাম, সই করতে গিয়ে দ্বিতীয় জনের হাত কাঁপল। গৌতম বুদ্ধের মতো হাসিমুখে মিস্টার ঘোষ ক্রমজরায়ণের এই দৃশ্য মাসের-পর-মাস দেখে যায়।

সেদিন যখন চেক নিতে এসেছিলাম, আমি আস্তে আস্তে কথাটা পাড়ি, আপনি বললেন, ভাবনা হচ্ছিল। কথাটা সেই থেকে আমার মনে খচখচ করছে।

মিস্টার ঘোষ চেক খুঁজতে খুঁজতে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। কাগজের তাড়ার মাঝখানে একটা আঙুল গুঁজে রেখে বলল, ভাবনা হয়। মাসের-পর-মাস একই দিনে দেখা হয় তো। মায়া পড়ে যায়।

এতগুলো লোক।

দুশো চব্বিশ জন, হ্যান্ড ডেলিভারি। এঁদের প্রত্যেকের নাম আমার মুখস্থ। কে কোন কোম্পানির, কার কত টাকার চেক, আমার জানা। কে কতদিন ধরে আসছে, একটা ছবির অ্যালবাম ধরুন না, দেখতে

দেখতে মুখগুলো মনে গেঁথে যায় না। দুশো চব্বিশটা চেক খালাস হয়ে গেলে স্বস্তি পাই। এই আর কী।

কেউ না এলে ভয় হয়, টেঁশে গেল বুঝি?

অসুখবিসুখও করে। বুড়ো মানুষ তো সব। এক মাস-দু'মাস চেক ধরে রাখি, তারপর হঠাৎ একদিন দেখি এসে হাজির। সেরে উঠেছেন। সবক'টা চেক তুলে নিয়ে যান। বেশি পুরনো হয়ে গেলে চেক রিভ্যালিডেট করে দিই।

না এলে?

মিস্টার ঘোষ বলল, তিন মাস না এলে বাড়িতে চিঠি দেবার নিয়ম আছে। আমি আরও কিছুদিন দেখি। তারপর চিঠি দিতেই হয়—মশাই, আপনার চেক পড়ে আছে, এসে নিয়ে যান। নয়তো জানান, আপনার ব্যাঙ্কে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দেব। না, আর কারুর হাতে চেক দেবার নিয়ম নেই।

তখনই উত্তর আসে ভদ্রলোক জীবিত, না মৃত।

তারপর আত্মীয়স্বজনের ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। ক'টা চেক? কত টাকা? আমরা তো কিছুই জানতাম না। এখন কী করতে হবে বলে দিন। অনেক সময় একাধিক দাবিদার এসে উপস্থিত হয়। উকিলের চিঠি দেয়। সে-সব অনেক প্যারাফার্নেলিয়া।

বুঝেছিলাম, ভদ্রলোক আমার অতিরিক্ত কৌতূহল পছন্দ করছে না। তা ছাড়া, টিফিন টাইম হয়ে গেছে। এখন ও বোধহয় বাইরে গিয়ে কোথাও খেয়ে আসবে। আপিসের মধ্যেও খাবাবদাবার বিলি হচ্ছিল। আমি ছাড়া বাইরের লোক তখন আর কেউ নেই।

আমি জানতাম, সরকারি মতে একজন ভারতীয় নাগরিকের গড় আয়ু সাতষট্টি বছর। আগে আবও কম ছিল। শিশুমৃত্যু আর প্রসবকালে প্রসূতিমৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাওয়ায় এই গড় অঙ্কের উন্নতি হয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে। এল. আই. সি কিন্তু পেনশনেব পরিমাণ হিসেব করার সময় আনুমানিক আয়ু বাহাত্তর বছর ধরে নেয়। সাতষট্টির বদলে বাহাত্তর হয়তো এই কারণে যে, পেনশনধারীরা অপেক্ষাকৃত সচ্ছলতর, তারা কেউ অপুষ্টিতে ভোগে না। মিস্টার ঘোষ কিন্তু বলল, পাঁচ বছর, দশ বছরেব বেশি পেনশন টেনেছে, এমন লোক খুব কম। ববং রিটায়াবমেন্টের দু'-তিন বছবেব মধ্যেই মরে যায় চব্বিশ শতাংশ পেনশনার। ব্যস্ততা আব পদগৌববে অভ্যস্ত মানুষগুলো হঠাৎ অখণ্ড বিশ্রাম পেয়ে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। আয় কমে যাওয়ার বেদনা সঞ্চয় থেকে খানিকটা মেটে কিন্তু সংসারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওযার বেদনা দুঃসহ।

আমাকে খবর সংগ্রহে দৃঢ়সংকল্প দেখে ভদ্রলোক ড্রয়ার থেকে তার টিফিন কৌটোটি বার কবে। আমি বলি, আড়াইটার সময় এক জায়গায় যাব, তাই একটু বসছি। আপনি খান। আমি বাড়ি থেকে লাঞ্চ খেয়ে বেরিয়েছি। বাইরে যা রোদ্দুর।

দয়া হল বোধহয়। না হলে কৌটো থেকে লুচি আর আলুভাজা খেতে খেতে ভদ্রলোক হঠাৎ কেন বলে উঠবে, আপনি মশাই একটা একসেপশন। বলে হেসে উঠবে।

কেন?

কত বছর হল পেনশন নিচ্ছেন? দশ?

নয়।

আরও কুড়ি বছর নেবেন মনে হয়। চেহারা একটুও টসকায়নি।

ভেতরে ভেতরে বুড়ো হচ্ছি।

রোজ মর্নিং ওয়াক করেন?

করি। মাঝে মাঝে ফাঁক যায়।

কী খান?

সকালে চা। তারপর ফল আর ছানা। দুপুরে তিনমুঠো ভাত, তরিতরকারি, এক টুকরো মাছ আর দই। রাত্রে দু'খানা রুটি।

অসুখবিসুখ?

আগেরগুলো সেরে গেছে। এখন দিনে দুটো ট্যাবলেট। তবে, ভুলো রোগে ধরেছে, অনেক কিছু ভুলে যাই আজকাল। স্মৃতিশক্তি নিয়ে আগে আমার গর্ব ছিল, এখন চেনা লোকের নাম বলতে পারি না। আর—

আর কী?

মাঝে মাঝে হাত থেকে জিনিস পড়ে যায়। গ্রিপটা চলে যাচ্ছে।

কলমের ওপরেও?

জানি না। এবার আমি হাসি, সে-কথা পাঠক বলবে। তবে, আপনি ঘাবড়াবেন না, আপনাদের ব্যবসার ক্ষতি করব না আমি। আমাদের বংশে পঁয়ষট্টি বছরের বেশি বাঁচেনি কেউ। আর ছ'বছর। ম্যাকসিমাম।

টিফিন খাওয়া শেষ হল। ড্রয়ার থেকে প্লাস্টিকের বোতল বের করে স্কুলবালকের মতো চুষে চুষে জল খেল অনুরাগ ঘোষ। ও দেখি আমার চেয়েও সাবধানী। তারপর সব গুছিয়ে রেখে পকেট থেকে বার করল লাল-সাদা সিগারেটের প্যাকেট। আমার দিকে বাড়িয়ে দিল একটা। আমার উপহার দেওয়া লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল সিগারেটটা।

তারপর বলল, আমার একটা উপকার করতে পারবেন?

কিছু কিছু লোক আছে যারা অকারণে হাসে। কারুর মুখোমুখি হলেই মুখব্যাদান করে হাসে। কথা বলতে বলতে হাসে। চলে যাবার আগে হাসে। তাদের আমি এড়িয়ে চলি। যেমন, দাঁড়ান, নামটা মনে করে বলছি। পলাশ নামের একটি ছেলে। আমাদের বিলডিংয়ে থাকে। ন' তলার ভঞ্জবাবু আজ ভোর ছটায় মারা গেছেন, আমরা ডেডবডি আনতে যাচ্ছি।—হাসতে হাসতে এই খবর গত বছর শীতকালে ও দিয়েছিল আমায়। সে-দৃশ্য আজও ভুলিনি। এ-বছর সে এম. টেক পাস করেছে। হাসতে হাসতেই পাশ করে গেল। ভাল ছেলে, কিন্তু এই রকম পাত্রের সঙ্গে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব না। এরা বিপজ্জনক হতে পারে।

অনুরাগের হাসি, বলছিলাম, গৌতম বুদ্ধের মতো। মুখে লেগে থাকে। হাসি না বলে একে প্রসন্নতা বলা উচিত। উপকারের কথাটা বলার পর ওর মুখের প্রসন্নতা কৃষ্ণের হাসিতে রূপান্তরিত হল। একটু চমকে উঠলাম আমি।

ও একটা টাস্ক দিল আমায়।

নিরুপম চৌধুরী নামে এক পেনশনার। তাঁকে আমি দেখেছি। দেখিনি? সাধারণত মাসের পয়লা তারিখেই আসতেন। কখনও কখনও দু'তারিখে। ফরসা চেহারা, মাথায় অল্প কাঁচাপাকা চুল। পাকানো গোঁফ। পরনে পুরোদস্তুর স্যুট-টাই। জামার কলার সাদা, কাফ সাদা। পায়ে চকচকে পালিশ-করা জুতো। বলতেন, আয়কর আইনে পেনশনকে বেতনের সম-শ্রেণীভুক্ত করা হয়। সুতরাং বেতন নেবার দিন মনিবের সামনে ফিটফাট সেজে আসাই কর্তব্য। বলতেন, খবরদার, আমার চেক কখনও ডাকে পাঠাবেন না। আমি ঠিক এসে নিয়ে যাব।

সেই নিরুপম চৌধুরী, যিনি জর্জ মার্শাল কোম্পানির স্টাফ ম্যানেজার হিসেবে রিটায়ার করেছিলেন উনিশশো সত্তর সালে, আজ কুড়ি বছরের ওপর পেনশন ড্র করছেন, তিনি নাকি পাঁচ মাস হল আসছেন না। চিঠি দেওয়া হয়েছে, তারও কোনও উত্তর নেই। কী হল, আমি যদি একটু খোঁজ নিই। নিজের আপিসের কাউকে দিয়ে কাজটা করাতে চাইছে না মিস্টার ঘোষ। কী বলতে কী বলে বসবে। কনিষ্ঠতম পেনশনার হিসেবে আমি যদি জ্যেষ্ঠজনের অনুসন্ধান করে খবরটা এনে দিই। যতই প্রবল ব্যক্তিত্ব থাক তাঁর, তিনি তো আমার মতো গণ্যমান্য ব্যক্তি নন। খবরের কাগজে কবেকার এক স্টাফ ম্যানেজারের অবিচুয়ারি কি বেরোবে?

এই কমপ্লিমেন্টটাও গিললাম। জেনে নিলাম ভদ্রলোকের ঠিকানা—১৭/২ ঝাউতলা রোড। নিজের বাড়ি। পাশাপাশি কয়েকটা নতুন বহুতল অট্টালিকা নাকি উঠেছে। আন্দাজে বুঝলাম, বাড়িটা পুরনোই হবে। ঝাউতলায় কোনও একটা মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর ছিল, ছোটবেলায় ছাপার অক্ষরে নামটা দেখেছি বলে স্মরণ হচ্ছে। কল্পনায় ভেসে উঠল দুটো মোটা মোটা থাম, একটার ওপর সাদা মার্বেল ফলকে কালো ইংরেজি অক্ষরে লেখা 'চৌধুরী', কি 'এন. চৌধুরী', ভেতরে পাম গাছ, টালি দেওয়া বাংলো, পোর্টিকো। পাঁচিলের গায়ে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার।

আমি বললাম, এনে দেব।

কল্পনায় যেমন ভেবেছিলাম, একসময় তা-ই ছিল বোধহয়, এখন একেবারে অন্য রকম। পাঁচিল-ঘেরা চত্বরের মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটা একতলা বাড়ি। দাঁত বার করা দেয়াল। যতটুকু খোলা জায়গা, সেখানে তারের ওপর কাপড় শুকোচ্ছে। একটা টিউবওয়েল চালিয়ে বালতিতে জল ভরছে ফ্রক-পরা মেয়ে। একটুখানি পায়ে-চলা পথ। টিউবওয়েলের জলধারা গড়িয়ে গড়িয়ে কালো শ্যাওলা হয়ে থেমেছে ওই পথটার পাশে।

আমার পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে টি-শার্ট। পায়ে কেডস। একদিন হাঁটতে হাঁটতে ওই জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছোই। আশপাশ তাকিয়ে দেখি। আছে, পাম গাছ একটা আছে এখনও, যদিও তার অবস্থা জরাজীর্ণ। টিউবওয়েলটার ওপর হেলে রয়েছে। রোদ উঠলে ওখানটায় ছায়া হবে। তাই হয়তো গাছটাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে ঝাউতলার অধিবাসীরা। এরা কি রিফিউজি? না, নিরুপম চৌধুরীর শরিক। আমি বুঝতে পারি না। তবে এটা বুঝি যে, কলকাতার লোকসংখ্যা আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়েছে, তার একটা অংশ এসে জুটেছে এখানেও। একজন লুঙ্গি-পরা লোক আমাকে বাড়িটা চিনিয়ে দেয়। সেই পুরনো বাংলো। তবে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই কাঠের পার্টিশন। আমি বাঁ দিকটায় ঢুকে পড়ি। জায়গাটা থমথম করছে। দেয়ালের গোল ঘড়িতে সাতটা পাঁচ। কাচের দরজার ওপারে একটা বেসিন দেখা যাচ্ছে। তার পাশে মানুষের ছায়া। আমি বলি,

নিরুপম চৌধুরী আছেন?

তিনি তো কোমায়।

এমন নিস্পৃহভাবে ছেলেটি আমার কথার উত্তর দিল যে, আমার মনে হল, তিনি কলকাতার বাইরে কোথাও বেড়াতে গেছেন।

তাই বোকার মতো জানতে চাই, কবে ফিরবেন?

কবে ফিরবেন? ছেলেটি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। এবার ওকে আমি ভাল করে দেখতে পাই। বছর কুড়ি বয়েস। গালে ফিকে দাড়ি। মুখের মধ্যে টুথব্রাশ। টুথপেস্টের ফেনায় গোঁফদাড়িসুদ্ধ মুখের মাঝখানটা সাদা। ওর চোখদুটোয় ফুটে-ওঠা কৌতুক দেখে আমার যোগেশ মাইম মনে পড়ল। পলাশের ঠিক উলটো, কিন্তু সমান বিপজ্জনক।

কোমা থেকে কেউ ফেরে?

টুথব্রাশটা মুখ থেকে বার করায় এবার পরিষ্কার শোনা গেল। আমি বললাম, এল. আই. সি থেকে আসছি। অনেকদিন পেনশন নিতে যান না, তাই খোঁজ করতে এলাম। কতদিন এই অবস্থা হয়েছে? কী করে হল? কোথায় আছেন? ডাক্তার কী বলছে?

এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করে ফেলার পর আমি চুপ করে যাই। ছেলেটি বলল, বসুন, বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।

ওর ঢিলেঢালা চলার ভঙ্গি আমি পেছন থেকেও লক্ষ করি। দেখি, ওর গায়ে সবুজ সোয়েটার। পিঠের কাছে ফুটো।

আধো অন্ধকার ঘরে একলা বসে বসে আমি কোমা নিয়ে চিন্তা করি। কোমা থেকে কেউ ফেরে না, ছেলেটা বলতে চাইল। তা হলে কোমা থেকে মৃত্যু কতদূর? অচেতনের কোন স্তর পর্যন্ত গেলে আবার চেতনায় ফিরে আসা সম্ভব, কোন স্তর অতিক্রম করলে পর ড্রিপ বা রেসপিরেটর তুলে নেবে নার্স? ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে বসবে ডাক্তার? নিরুপম চৌধুরী এখন কোন স্তরে আছেন? এই সব খবর আমার জানা জরুরি, কেননা তাঁর জীবিত থাকা-না-থাকার ওপর নির্ভর করছে এল. আই. সি-র পেনশন। আমাকে তো রিপোর্ট দিতে হবে।

আমরা সাধারণ মানুষ জানতাম, মানুষ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আবার হার্ট ফেল করলেও মানুষ মারা যায়। অর্থাৎ, হৃদযন্ত্র আর ফুসফুসের কাজ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে মৃত্যুর যোগ আছে। আমাদের বাপ-ঠাকুরদা এইভাবেই লোকান্তরিত হয়েছেন। এখন যান্ত্রিক উপায়ে এই হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুসকে চাগিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা দেখেছি, মানুষ নানা রকম শারীরিক বিপর্যয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। আবার ওষুধ দিয়েও তাকে অজ্ঞান করে রাখা হয় অস্ত্রোপচারের সময়,

কি যন্ত্রণা উপশম করার উদ্দেশ্যে। আবার একসময় তার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি নিজে দশ বছর বয়সে ম্যানেনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে আঠাশ দিন অচেতন ছিলাম, ঢের প্রলাপ বকেছি সেই সময়। ওটা ছিল জ্বরমোহে মস্তিষ্কবৈকল্য। তা থেকেও মৃত্যু হতে পারত। কিন্তু এগুলোর কোনওটাই কোমা নয়। এখন মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তাকে কোমা বলা হয়। শিরদাঁড়া আর মাথার মধ্যেকার যে স্নায়ুকেন্দ্র, তার কাজ যখন বন্ধ হয়ে যায়, অথচ শরীরের অন্যান্য ক্রিয়া কোনও রকমে সচল থাকে, তখনই কোমা, তার এক ইঞ্চি দূরত্বে অপেক্ষা করে মৃত্যু। আমি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জানি, যিনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে একচল্লিশ দিন কোমায় ছিলেন। তারপর ফিরে এসেছেন। এখন আবার আগেকার মতো নিজ কাজে ব্যাপৃত। আমি শুনেছি, কেউ কেউ আট-দশ মাস কোমায় থেকেও সেরে ওঠে যদি চিকিৎসার সুব্যবস্থা পায়। নিরুপম চৌধুরীর কি ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছে?

বাবা বলতে যে-লোকটি সামনে এসে দাঁড়ায়, দেখে মনে হল, সে আমার সমবয়সি। হাবভাবে বাঙালিয়ানা কম। আমার সাজপোশাক দেখে সে চোখ কুঁচকে তাকাল। নাম বলল ভিক্রম। নিরুপমবাবুর ভাতিজা।

আমি বললাম, হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, ভাবলাম, খবরটা নিয়ে আসি। যা শুনলাম আপনার ছেলের মুখে, তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। এখন কেমন আছেন নিরুপমবাবু? কী হয়েছিল?

আর বলবেন না! আমার ছুট্টি ফুরিয়ে গেছে, দু'-দুবার টিকিট ক্যানসেল করতে হল। ছেলেটার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে বেঁচে থাকার মানে হয়?

তারপর সব কথাই খুলে বলল লোকটি।

ওর জেঠামশায়ের বয়েস বিরাশি। জেঠিমা ছিলেন, মারা গেছেন। তারপর থেকে ওঁর মাথাটা বিগড়ে গেছে। বরাবর আলসারের রুগি। মাঝে মাঝে ব্লিডিং হয়। কখনও ডাক্তার দেখাতেন না। নিজের চিকিৎসা নিজেই করতেন। একটা চাকর আছে, সে-ই খাটাল থেকে গোরুর দুধ এনে দিত। রান্নাবান্না করত। সে-ই ওঁর দেখাশোনা করে। ওঁর ধারণা, একশো বছর অবধি বাঁচবেন, কেননা, জীবনে কোনও অন্যায় কাজ করেননি। মদ খাননি, বিড়ি-সিগারেট খাননি, উম্যানাইজ করেননি। যদিও সবকিছুরই সুযোগ ছিল। বলতেন, যার আত্মসংযম করার ক্ষমতা আছে, যার মনে অতীত কীর্তির জন্য অনুশোচনা থাকে না, সে দীর্ঘায়ু হবে না কেন? বলতেন, আমি সোসাইটির বার্ডেন নই, নিজের আপকিপ নিজে রোজগার করি। বন্ধু নেই, শত্রুও নেই, তাই নীরদ সি চৌধুরী ওঁর আইডিয়াল। আচ্ছা, একে পাগলামি ছাড়া কী বলবেন, বলুন! এদিকে রোজ আজমির থেকে ট্রাংককল আসছে, ভিক্রম সাব, আর কতদিন?

ছেলেকে দেখতে এসেছিল ভিক্রম, সে এখানে থেকে বি কম পড়ে। তখনই জেঠামশায়ের আলসারের উপসর্গ দেখা দেয়। জবরদস্তি করে ডাক্তার ডাকা হয়। এনডোস্কপি এবং আরও অনেক রকম টেস্ট হয়, সোনোগ্রাফ হয়। অর্ধেক কোলনে ফাটল। ডাক্তার বলে, অপারেশন না করলে বেশিদিন বাঁচবেন না নিরুপম চৌধুরী সাহেব—যতই পুণ্যবান হোন আপনি। অসুখটা জট পাকিয়ে গেছে। গাঁইগুঁই করে রাজি হয়েছিলেন। রোগমুক্ত হলে বাকি অর্ধেক কোলন নিয়ে তো একশো বছর বাঁচা যায়। কিন্তু অপারেশন টেবিলে কোমা হয়ে গেল। আজ একশো সাতাশ দিন।

কোথায় আছেন?

লিন্ডসে নার্সিং হোমে। জলের মতন টাকা খরচ হচ্ছে। বলুন তো এর কোনও মানে হয়?

চিকিৎসাবিভ্রাট?

অপারেশনই তো হয়নি। টেবিলে শুইয়ে অজ্ঞান করতে গিয়ে এমন অজ্ঞান হয়ে গেলেন যে, নিশ্বাসই বন্ধ হয়ে গেল, পাল্‌স বিট গেল থেমে। অ্যানেসথেসিয়ার গোলমাল হয়ে থাকলেও ওরা তো তা স্বীকার করবে না। এখন ইনটেনসিভ কেয়ারে। ওরা বলছে স্টেজ থ্রি। এনকেফালোগ্রামে ফ্ল্যাট লাইন এসে পড়ছে।

শুনতে শুনতে লক্ষ করেছিলাম, ভদ্রলোকের সংলাপে বার বার অতীতকাল এসে পড়ছে। জেঠামশায়ের শেষকৃত্য সেরে বিষয়সম্পত্তি বুঝে নিয়ে আজমির ফেরার জন্য খুবই ব্যগ্র। তাই দেখে একটু রসিকতা করার ইচ্ছা হল আমার। আজকাল আর আগেকার মতো পারি না। অনুরাগ ঘোষকে বলেছিলাম, গ্রিপটা চলে যাচ্ছে। বলিনি, হনুমানের হাত থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করছি আগলে রাখতে আমার বাগান। ওরা ভারী বেরসিক। ভিক্রমকে বললাম, ওঁর যা জেদ, হয়তো বাকি আঠারো বছর

কোমাতেই কাটিয়ে দেবেন। সেঞ্চুরি না করে যাবেন না। আমরা পস্তাব। এল. আই. সি-কে পেনশন দিয়ে যেতে হবে।

ভিক্রম বলল, কিচ্ছু ভরোসা নেই। নার্সিংহোমে ভরতি হয়েই কী করেছিলেন জানেন? এক লাখ টাকার চেক জমা দিয়ে বলেছিলেন, এটা রাখো। হিসেবনিকেশ পরে হবে। এতে যদি না কুলোয়, ব্যাঙ্কে অথারিটি লেটার দেওয়া রইল। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি যেন না হয়। মাত্র বিরাশি বছর বয়েসে মরার কথা নয় আমার। নীরদ-সি. চৌধুরীর নাম শুনেছ? নাইনটিনথ সেঞ্চুরিতে জন্ম, জনি ওয়াকার—অ্যান আইলেট অফ সেনসিবিলিটি। আমার গুরু।

এই হতভাগা দেশে গন্ডায় গন্ডায় লোক রোজ অপঘাতে মরছে, যারা মরছে না, তারাও ভয়ে অর্ধমৃত। এমতাবস্থায় নীরদ. সি. চৌধুরীর শিষ্য হ্যাপি ম্যান এই নিরুপম চৌধুরীকে একবার চোখের দেখা দেখবার বাসনা হল। অসুবিধে আছে, তবু তাঁর ভাতিজা কথা দিল, দেখা করিয়ে দেবে। না, দেখা নয়, দর্শন করিয়ে দেবে। আমি এল. আই. সি-র লোক, আমার রাইট আছে তো।

প্রথমদিন ফিরিয়ে দিল ওরা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আবার আরেকদিন গেলাম। সূর্যের মতো মৃত্যুর দিকেও সরাসরি তাকিয়ে থাকা যায় না। আমি একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

পুরনো চিনেমাটির ফুলদানির মতো ময়লাটে সাদা একটা মুখ। বোজা চোখ। চাদর-ঢাকা গা। অনেক যন্ত্রপাতির মাঝখান থেকে সরু একটু হাত দেখা গেল। পচে যাওয়ার আগে পাকা কলার খোসায় যেমন ছিট ছিট দাগ ধরে যায়, তেমনই দাগ ফরসা হাতময়। একটুও লোম নেই।

মুখ ফিবিয়ে চোখ পড়ল শিয়রের কাছে স্থাপিত দুটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কাচে। তিরতির করে আলোরেখা বহে চলেছে। সেই আলোরেখায় মৃদু ঢেউ। এই তা হলে কোমা।

লিন্ডসে নার্সিংহোমের কর্তাব্যক্তি একজন আমাদের সঙ্গে এসেছিল। সে হয়তো ডাক্তার নয়। তাকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, বেঁচে থাকার এই অস্বাভাবিক কষ্ট থেকে এঁকে মুক্তি দেবার কথা কি ভাবছেন আপনারা?

ভেজিটেবল হয়ে বেঁচে থাকার কোনও সার্থকতা আছে? সে আমায় প্রতিপ্রশ্ন করল।

না, সত্যি কোনও সার্থকতা নেই। তবু, মানুষটা তো একভাবে বেঁচে রয়েছে। মরে যায়নি। এই রকম কেসে ইংরেজিতে একটা কথা সুপ্রচলিত—ইররিভার্সিবল। অনিবর্তনীয়। নিরুপম চৌধুরীর শারীরিক মানসিক এই জড়াবস্থা কী প্রকার? যদি অনিবর্তনীয় হয়, তা হলে যন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করায় কোনও বাধা নেই। কিন্তু অনিবর্তনীয় কিনা, কে সিদ্ধান্ত নেবে? ঘটনা হচ্ছে এই যে, একশো সাতাশ দিন এই জড়াবস্থা অনিবর্তিত আছে। যদি হঠাৎ আলোরেখার ঢেউ দুলে ওঠে? তখন? তাঁর ভাতিজাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, এক্ষুনি সংযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হোক। তার কারণ, সে আজমিরে ফিরে যেতে চায়, তার ছুট্টি ফুরিয়ে গেছে। ঘন ঘন ট্রাঙ্ককল আসছে সেখান থেকে। তার কারণ, ওর ছেলের পড়ার ক্ষতি হচ্ছে। টাকা খরচ হচ্ছে জলের মতো তোড়ে। দুনিয়ার কাজ একজনের জন্য আটকে থাকে?

এদিকে রুগির স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, চিকিৎসার কোনও ত্রুটি যেন না হয়। শেষ বিন্দু পর্যন্ত আয়ু তিনি দাবি করে, তবে শুয়েছেন। এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখানকার চিকিৎসকদের ওপর। বিশেষত, যখন অপারেশন টেবিলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং সকলেই দ্বিধাগ্রস্ত।

এল. আই. সি-র প্রতিনিধি হিসেবে আমি নিজেই রুগিকে প্রশ্ন করার অনুমতি চাইলাম। একটু হেসে ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকাল। তার মানে, বৃথা, তবে চেষ্টা করে দেখো। নিশ্চয় চেষ্টা করে দেখব। তখন আমার এক মুহূর্তের জন্যে চাসনালা খনি দুর্ঘটনার স্মৃতি ভেসে উঠেছিল। গভীর খাদে নিমজ্জিত জলমগ্ন শ্রমিকদের মৃত ভাবা হয়েছিল যখন, তখনই কেউ একজন ওপর থেকে চেঁচিয়ে জানতে চায়, তোমাদের কিছু চাই? একটা ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল খাদের গভীর অন্ধকার থেকে : বিড়ি।

হ্যাঁ, বিড়ি। আলো না, খাদ্য না, বস্ত্র না, ওষুধ না—বিড়ি চেয়েছিল গহ্বরের ম্রিয়মাণ মানুষ। বিজ্ঞানীরা একে বলে স্টিমুলাস। প্রণোদনা। কীসে কার প্রণোদনা ঘটে, আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। এ-ক্ষেত্রেও তাই দেখলাম।

প্রথমে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এতদিন ধরে আপনার এত কষ্ট আমরা আর দেখতে পারছি না নিরুপমবাবু। এর শান্তি করে দিই?

যন্ত্রের কাচে মৃদু আলোতরঙ্গ যেমন প্রবাহিত হচ্ছিল, তেমনই প্রবাহিত হতে থাকল। কোনও

উত্থানপতন ঘটল না। আমরা প্রত্যাশাও করিনি।

একে সম্মতি বলে ধরা যায় ভেবেও কী মনে করে আমি হঠাৎ আমার টাস্ক, আমার কাজের কথা পেড়ে বসলাম।

বললাম, মিস্টার চৌধুরী, আমি এল. আই. সি থেকে এসেছি। অনেকদিন আপনি পেনশন নিতে আসেন না। আমরা চিন্তিত। চেকগুলো অকারণ পড়ে রয়েছে।

বলতেই কাচের ওপর আলোরেখা একটু কেঁপে উঠল। ছোট ছোট মন্দিরের আউটলাইন দেখিয়ে আবার আগের মতো নেমে এল মৃদু তরঙ্গ।

আমি উৎসাহিত হয়ে বলি, চেকগুলো ডাকে পাঠিয়ে দিই? আপনার ব্যাঙ্কে? না হলে পরে ভাঙাতে অসুবিধে হবে।

এবার আলোতরঙ্গ আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে। কাচের স্ক্রিনে হিজিবিজি দাগ দেখে নার্সিংহোমের অধিকর্তা বলে, পেশেন্ট উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ওঁকে আর কোনও প্রশ্ন করবেন না।

আলবাত করব।

এবার আমার জেদ চেপে যায়। আমি কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলি, কী, বলুন নিরুপমবাবু, পাঠাব না? ধরে রাখব আমরা? যতদিন আপনি নিজে গিয়ে সব চেক না নিয়ে আসছেন, ততদিন পুরনো ব্যবস্থাই চলুক? কী বলেন?

এবার কাচের ওপর আলোরেখা ধীর গতিতে অর্ধবৃত্তাকারে ফুলে ওঠা নামা করতে থাকে। সমুদ্রের ঢেউয়েব মতো। আমরা সবাই চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম সেই অসামান্য প্রশান্তি।

অধিকর্তা ছুটে ইউনিট থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। সম্ভবত ডাক্তারের সন্ধানে। এখুনি সবকিছু চেকআপ করা দরকার। মেডিকাল বোর্ডের পরামর্শ চাই। রোগীর মধ্যে আলোড়ন এসেছে। এখন আর নিষ্ক্রিয় থাকার অবকাশ নেই। অপারেশন করা সম্ভব হলে, কবে করা যায়, তা-ও তো স্থির করতে হবে।

আমিও বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। একটু দাঁড়িয়ে গেলাম। পকেটে যে-কাগজটা ছিল, তার উপর সই করিয়ে নিলাম উপস্থিত দু'জনের। আমার কাজ শেষ। যে জন্যে আসা—নিরুপম চৌধুরী জীবিত না মৃত, তার উত্তর আমি পেয়ে গেছি। চেকগুলো নিয়ে কী করতে হবে, আমার জানা হয়ে গেছে।

পরের মাসের দু'তারিখ আসতে তখনও দশ দিন বাকি। আমি আর কালবিলম্ব করিনি। সেই বাইশে নভেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় নিজে গিয়ে এল. আই. সি অফিসার অনুরাগ ঘোষকে জানিয়ে এসেছিলাম, আরও কিছুকাল সবুর করুন, দোলযাত্রার আগেই উনি আসবেন। আমায় কথা দিয়েছেন। ততদিনে শীত যদি কমে যায়, গরম স্যুট না পরে টেরিকটের স্যুট, মেরুন রঙের টাই পরে আসবেন। চিনতে ভুল হবে না আপনার। এই নিন বেঁচে থাকার সার্টিফিকেট। খবরের কাগজে অবিচুয়ারি খোঁজারও দরকার নেই। নিউজ খুঁজতে পারেন।

কী হয়েছে? ও জিজ্ঞেস করল হাসিমুখে।

'কোমা' না বলে আমি বলেছিলাম, সেমিকোলন।

১৯৯৩

শাশুড়ি বলেছিলেন, শনির সাত মঙ্গলের তিন। এ-বৃষ্টি এক হপ্তার আগে থামবে না। তাঁর কথা ফলতে চলেছে।

গেল শনিবার বিকেলের ফ্লাইটে শিতিকণ্ঠ দিল্লি গেল। সেই রাত থেকে শুরু হয়েছে ঝুপ ঝুপ অবিরাম বর্ষণ। ঝড় নেই, কড়কড়ে বিদ্যুৎ-গর্জন নেই। যাকে বলে হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু, কোথায় সেই তাণ্ডব? বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা নয়, এ-আষাঢ় যেন অশ্রুভরা বেদনা। দিকে দিকে জাগে। রাত্তিরের বাংলা খবরের পর টিভি-তে একখানা চুনকালি-মাখা ছবি দেখাল। ভারতবর্ষের আউট লাইন ম্যাপের ডান দিক ঘেঁষে কেউ যেন খানিকটা কালি ঢেলে দিয়েছে।

শাশুড়ি বললেন, বাছা আমার ভালয় ভালয় পৌঁছোলে হয়। আকাশে যা দুর্যোগ।

নূপুর বলল, ওদের প্লেন আগেই টপকে বেরিয়ে গেছে। আর দিল্লি এখন খটখটে শুকনো, গরম। ওখানে বর্ষা নামবে আষাঢ়ের শেষে।

শাশুড়ি বললেন, গরম, না? তা হলে তো লু চলছে ওদিকে। ওর কোটের পকেটে দুটো পিঁয়াজ দিয়ে দিলে হত।

পিঁয়াজ! পিঁয়াজে কী হয় মা?

লু শুষে নেয়। জানো না?

না, জানে না নূপুর। তবে এটুকু বোঝে যে, ফাইভ স্টার হোটেল থেকে স্যুট পরে বেরোচ্ছে শিতিকণ্ঠ, গায়ে মিহি ডোরাকাটা শার্ট, গলায় মেরুন রঙের টাই, বুকপকেটে টাইয়ের সঙ্গে ম্যাচ-করা সিল্কের রুমাল, পায়ে সরু-নাকের জুতো কচি বেগুনের মতো চকচক করছে, হাতে ঝোলানো ব্রিফকেস, তার কোটের পকেটে হালকা, স্প্রিং দেওয়া সোনালি সিগারেট কেস, রনসন লাইটার, হিপ পকেটে ছাগলের চামড়ার ওয়ালেট, সেই সঙ্গে মাতৃস্নেহের প্রতীক দুটি গোটা পিঁয়াজ মোটেই মানাত না। এমনিতেই শিতিকণ্ঠর ডান হাতে দুষ্টগ্রহনিবারক গোমেদ আর প্রবালের আংটি ওর আত্মবিশ্বাসী ভাবমূর্তির ক্ষতি করে। ওই আঙুলে লোকে হিরে পরে সাধারণত, কেননা হিরেই হল সফলতাকারী রত্ন। কিন্তু শাশুড়ি তাতে বাধা দিয়েছেন। বলেছেন, শিতুর হিরে সইবে না। গোমেদ আর পলা ওকে রক্ষা করবে। তাই করুক। আবার পিঁয়াজের কী দরকার।

তর্ক করেনি নূপুর।

অনেকদিন পর শিতিকণ্ঠ ট্যুরে বেরোল। দিল্লির সরকারি আপিসগুলোয় বছরখানেক ধরে নাকি কোনও কাজ হচ্ছিল না। আমলারা হাত গুটিয়ে বসে ছিল। কেন্দ্রে কোনও নির্দিষ্ট শিল্পনীতি নেই, একটা স্থায়ী সরকার নেই যে ঝুঁকি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। উদ্যোগভবনে, শাস্ত্রীভবনে ঘরে ঘরে ডাঁই জমেছিল ফাইলের পাহাড়। কেউ সই করছে না। খারিজও করতে ভয় পাচ্ছে। সেই অচলাবস্থা এতদ্দিন পর বোধহয় কাটল। ব্রাঞ্চ অফিস থেকে টেলেক্স এল, ফাইল নড়তে শুরু করেছে। একবার আসুন স্যার।

ও নিজেও হাঁপিয়ে উঠেছিল। বেরোতে পেরে যেন বাঁচল।

সেদিন সারারাত ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়েছে। একটা অদ্ভুত একঘেয়ে শব্দ, দূর থেকে কান্নার মতো, না ঠিক কান্নার মতো না, কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়া শিশুর মৃদু ফোঁপানির মতো, ভেসে আসছিল কানে। ওই রকম একঘেয়ে জল পড়ার শব্দে মানুষের ঘুম এসে যায়। মন কেমন করে। অন্য দিন হলে নূপুর ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়েও পড়ত, কিন্তু সেদিন একলা ঘরের নির্জনতায়, স্বাচ্ছন্দ্যে, স্বাধীনতায় ওর ঘুম আসেনি অনেকক্ষণ। শাশুড়ি আর দুই ননদ যে-যার ঘরে ঢুকে পড়ার পর ও নিজের ঘরের দরোজা বন্ধ করে দেয়। ছিটকিনি তুলে দিয়ে প্রথমেই অত বড় ডবল বেডের ওপর গড়াগড়ি খায় খানিকক্ষণ। তারপর আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে বিছানার ওপর।

আজ আর কাউকে ভয় নেই, খুব গোপনে মনে হয় ওর। পাশের মানুষটা আলটপকা তার লোম-ঢাকা হাত ওর দিকে বাড়াবে না। তার আংটি-পরা আঙুলগুলো বুকের ওপর খামচে বসবে না। সুতরাং নাইটি পরার কী দরকার! ওই খশখশে জিনিসটা খোলার জন্যেই তো পরা। উন্মোচনের জন্যে আবরণ, না হলে পুরুষমানুষের সুখ হয় না। অবরেসবরে হলে না হয় সহ্য করা যায়। তা নয়, যখন-তখন। ওর খেয়ালখুশি

মতো। না গো, আজ থাক। আজ আমার একদম ইচ্ছে করছে না, তুমি টায়ার্ড, ঘুমিয়ে পড়ো—এই রকম ভাবে কতদিন স্বামীকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছে নূপুর, তাতে ফল হয়েছে উলটো। ওর জেদ বেড়ে গেছে। দেখি দেখি কী হয়েছে তোমার, জ্বর হয়েছে? শীত লাগছে? আহা, একটু হাত বুলিয়ে দিই। বলতে বলতে ও জাপটে ধরেছে বউকে। ওকে প্রস্তুত করার কোনও রকম চেষ্টা না করে নিজের কাজ হাসিল করে নিয়েছে। তারপর তুমি বোঝো। আমি পাশ ফিরে শুলাম।

রেপ। নূপুব মনে মনে ভাবে। আপিসের কাজে সারাদিন বিব্রত আর ব্যস্ত লোকটা এখনও স্ত্রীকে ভালবাসতে শিখল না। ওর সময় কই! সতেরো বছর ওদের বিয়ে হয়েছে। এই সতেরো বছর ধরে শিতিকণ্ঠ নূপুরকে রেপ করে গেছে। আইনে এর বিরুদ্ধে নালিশ চলে না। এটা ওর কনজুগাল রাইট। ডাইনিং টেবিলে যেমন গরম গরম খাবার, বিছানায় তেমনই গবম গরম বউ, সকালে দাড়ি কামাবার সময় গবম জল, স্নানের পর পাটভাঙা পোশাক—সবকিছু ওই কনজুগাল রাইটের মধ্যে পড়ে। কারণ ও এই সংসারেব পরিচালক। কেবল ককটেল পার্টি থেকে বেশি রাত করে ফিরলে সেদিন নূপুরের ছুটি। মানে, ওব শরীবের ছুটি। কখনও ও সঙ্গে থাকে, কখনও থাকে না। যাই হোক, বাড়ি ফিরে জুতো-মোজা খোলা থেকে শুরু করে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়া পর্যন্ত আধ ঘণ্টা শিতিকণ্ঠ বকবক করবে, অর্ধেক কথা তার বোঝা যাবে না, নূপুব কেবল হুঁ দিয়ে যাবে। তারপর পাশবালিশ জড়িয়ে সে অজ্ঞান। নূপুরের শরীবের পরিত্রাণ।

তবু, পাশে-শোওয়া মানুষটার অস্তিত্ব তো অস্বীকার করা যায় না। ঘুমিয়ে থাকলেও সে আছে। অত বড় একটা শবীরের ভাব ফোমেব গদিতে ডুবে আছে। বালিশের ওপর একটা প্রকাণ্ড মাথা, পুরুষের মাথা, কবকবে গাল, নাক ডাকছে, তুলনায় নূপুর একটা বেড়ালছানা। ওর নিজেকে ততটাই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। এই সতেবো বছবেব বিবাহিত জীবনে কুঁকড়োতে কুঁকডোতে ও এতটাই ছোট হয়ে গেছে। বযেসে আট বছবের ছোট, হাইটে আট ইঞ্চি খাটো, ওজনে কুড়ি কেজি কম, একসময় স্কুল মাস্টারি করে অর্থ উপার্জন করত, গান গাইত, এখন কিছুই করে না, কেবল গৃহবধূ, কীসের জোরে ও স্বামীর সমকক্ষ হওয়ার কথা ভাববে? ও সমকক্ষ নয়, কিন্তু সহধর্মিণী।

উঠে গিয়ে জানলার পবদা সরিয়ে দিল নূপুব। একটা পাল্লা খুলে দিল ঠেলে। বাতাস না, একটা ঠান্ডা ছোঁয়া যেন গড়িয়ে গেল মুখের ওপর দিয়ে। বাইরেটাও অন্ধকার। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। বাইরে হাত বাড়িয়ে জলেব ছিটে নেওয়ার চেষ্টা করল একবাব। হাতের পাতায় পেল দু'-চার ফোঁটা জল। একেবারে আকাশ থেকে ঝরা বিশুদ্ধ বৃষ্টিব জল। কী ঠান্ডা! হাতটা ঢুকিয়ে এনে মুখে মাখল। কেমন একটা গন্ধ। মেঘের গন্ধ কি? নূপুরেব ভাবনা চিন্তা ক্রমে ওর আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। মেঘের কি কোনও বিশেষ গন্ধ আছে? আকাশের গন্ধ আছে? আছে বোধহয়। মুক্তির গন্ধ? না না, যে বন্দি নয়, সে মুক্তির স্বাদ কী করে জানবে? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় যে ভবঘুরে, সে কি নিজেকে মুক্ত মনে করে? সে কি এই রকম বৃষ্টির সময় একটা ছাউনির নীচে এসে দাঁড়ায় না? না, না, ধু ধু শূন্যতা আর মুক্তি এক জিনিস নয়। মুক্তি বা পরিত্রাণ হল বশীভূত মানুষের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা মাত্র। বস্তুত অলীক।

তবে, গেল শনিবার রাত্রে ওর নিজেকে মুক্ত মনে হয়েছিল। স্বাধীন। কিছুতেই ওর ঘুম আসছিল না। দিল্লির হোটেলে বাতানুকূল আরামে শিতিকণ্ঠ এখন কী করছে? সহকর্মীদের সঙ্গে বসে ড্রিংক করছে? করুক গে। ওখানে কি দরকার মতো শয্যাসঙ্গিনী পাওয়া যায়? যদি যায়, তবে ও সে সুযোগ ছাড়বে না। 'ঘরকি মুরগি দাল বরাবর'—এই আপ্তবাক্য একাধিকবার ওর মুখে শুনেছে নূপুর। শুনেছে, ওদের আড্ডায় নাকি কথা হয়, মেয়েরা হল চায়ের ভাঁড়ের মতো। চা খাওয়া হয়ে গেলে ভাঁড়টা রাস্তায় ফেলে দাও। কী জঘন্য, অপমানজনক এই রসিকতা। তাই যদি হয়, তো এই ভাঁড়টাকেও ফেলে দাও না কেন? কেন পুষছ? কেন বার বার একই ভাঁড়ে চা খেতে চাও? আর কোনও উপায় নেই বলে। নাকি মনে মনে তুমি জানো, এ মাটির ভাঁড় মাত্র নয়, এ একজন মানুষ। উপভোগের বাইরেও এ মানুষটার অস্তিত্ব আছে। এ তোমায় ভালবাসে। তোমার মঙ্গল কামনা করে। তোমাকে নিশ্চিন্ত রাখার জন্য, সুখী করার জন্য সারাক্ষণ সে উদ্বিগ্ন। এক-এক সময় তার উদ্বেগ হয়তো গোপন থাকে না, মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, হাবভাবে, ব্যবহারে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাতে তুমি বিরক্ত হও। তোমার হয়তো মনে হয়, একজন উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত মানুষের সঙ্গে প্রেম করা যায় না। নর্ম সহচরী হিসেবে সে ব্যর্থ। তা হলে তাই। বরাবর সে তো এমনটা ছিল না। আস্তে আস্তে তার এ-দশা হয়েছে। ক্রমাগত তোমার দাপট সহ্য করতে করতে

সে কুঁকড়ে গেছে। সিঁটিয়ে গেছে তার স্বাদ। তার ব্যক্তিত্ব। এর জন্য তুমিই দায়ী।

রাস্তা দিয়ে ছরছর শব্দ করে একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। তার মানে, রাস্তায় বেশ জল জমে গেছে। তা তো জমবেই। তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা একনাগাড়ে বৃষ্টি হলে কলকাতার কোন পাড়ায় জল জমে না? এদিকটা তবু একটু উঁচু। কচ্ছপের পিঠের মতো। জল সাধারণত দাঁড়ায় না এ-পাড়ায়। কিন্তু ড্রেনের মধ্যে যদি ছাই আর ইটের টুকরো আর ডাবের খোলা জমতেই থাকে, তোলা না হয়, তা হলে জলের কী দোষ?

শিতিকণ্ঠকে নিয়ে যে ভাবনা চলছিল মনে, ক্রমে সেটা সরে যায়। জানলার বাইরে একটা ইউক্যালিপটাস গাছ। তার পাতায় চিকচিক করছে আলো। জ্বলছে আর নিবছে। জোনাকি নাকি? মিশমিশে কালো অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেদ করে নূপুর অনেকক্ষণ চেয়ে রইল গাছটার দিকে। জোনাকি হলে তো আশেপাশেও উড়ত, কেবল পাতায় পাতায় চিকচিক করত না। তা হলে ওগুলো অন্য কিছু। হয়তো দূরের লাইটপোস্ট থেকে ক্ষীণ আলো এসে জলের ফোঁটার ওপর পড়ছে। গাছের ওপর আলো নেই, কেবল ভিজে পাতার ওপর স্থগিত জলবিন্দুতেই ওই আলো প্রতিফলিত। দেখো, দেখো, কী অদ্ভুত!

এবার ওর নিষ্ক্রিয় মনের ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় এক-একটা গানের কলি এসে ধাক্কা মারতে লাগল। আমায় কেন বসিয়ে রাখো একা দ্বাবের পাশে। না। আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার, যায় না। উঁহু। কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী আজি ভরা বাদরে। বন্ধু রহো রহো সাথে। স্মৃতিবেদনার মালা একেলা গাঁথি। নাঃ, একটাও সুরে লাগছে না। নূপুরের মনে হয়, মেঘদূতের কিংবা বৈষ্ণবকাব্যের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সব বর্ষার গানে কেবল নিঃসঙ্গতার কষ্ট। বিরহের ব্যথা। যেন পৃথিবীতে মানুষ দু'জন দু'জন করে জন্মেছে। একলা হয়ে বর্ষায় ভেসে যাওয়ার আনন্দ, সঙ্গবিমুখ অন্তর্মুখিতার আবেগ তাঁর গানে নেই। কেন নেই? তিনি নিজে তো আত্মমগ্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে বোটে চড়ে ভেসে বেড়াতেন। নাকি, সেই একাকিত্বেব সার্থকতা নিয়ে লিখে গেছেন পূজাব গানগুলো? যেমন, চোখেব আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে। তার পরের লাইনটা যেন কী?

নূপুর আপন মনে ওই গানটাই গুনগুন করতে করতে সেই রাত্রে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল ছোট ননদ আঁখির ডাকে। দরোজায় ধাক্কা দিচ্ছে, ও বউদি, দরজা খোলো। আর কতক্ষণ ঘুমোবে। এদিকে যে সব ভেসে গেল!

২

ভেসে গেল?

বেরিয়ে এসে দোতলার বারান্দা থেকে তাকিয়ে দেখে নূপুর। খানিকটা দেখা যায়। বেশিদূর দেখা যায় না। সার-সার বাড়ি সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে। তার ফাঁকে ফাঁকে একটু করে আকাশ, নীচের দিকে একটু করে রাস্তার টুকরো। থমথম করছে। বৃষ্টি ধরেছে আপাতত। আকাশ ময়লা। বাতাস বন্ধ। ছাতা-মাথায় গৃহস্থ মেয়ে-পুরুষ, কাজের লোক, ছপছপ করে জল ভেঙে হাঁটছে। জোরে জোরে কথা কইছে। ওদের গলার স্বরে বিরক্তি আর রাগ। কেন বৃষ্টি পড়বে, কেন জল জমে যাবে, কাদা হবে রাস্তায়। প্রতিদিন কেন একরকম নিরুপদ্রবে কাটবে না।

নীচের তলা থেকে প্রফুল্ল এসে জানাল, দুধের গাড়ি আসেনি। বাজারে মাছ নেই। আলু, পিঁয়াজ আর ডিম কিনে এনেছে।

নূপুর বলল, আজ তা হলে খিচুড়ি হোক। মসুর ডালেব খিচুড়ি আর ডিমভাজা। বাড়িতে আচার আছে তো।

আঁখি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এই প্রস্তাবে। অনেকদিন পর একটা পিকনিক হবে বাড়িতে।

শাশুড়ি গজগজ করতে থাকেন, আর ওবেলা ডিমের ডালনা দিয়ে রুটি। কী পিকনিকের ছিরি! বড়দি উঠে চেঁচামেচি করবে। একটু মাংস আনলে পারত প্রফুল্ল। দাদাবাবু নেই বলে গরজ করলে না।

কথাটা হয়তো একদম ভুল নয়। বাড়ির কর্তাব্যক্তি যে, একমাত্র পুরুষমানুষ, সে-ই যখন অনুপস্থিত, তখন জল ভেঙে ঘুরে ঘুরে কোথা থেকে মাংস আনবে ও? কার জন্যে আনবে? অন্যান্য রবিবার

সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে শ'য়ে শ'য়ে ব্রয়লার আসে বাজারে। রবিবার বাবুদের মাংস খাওয়ার দিন। আজ একটাও সাইকেল আসেনি। শহরতলি ভেসে গেছে জলে। জল ভেঙে কি সাইকেল চালানো যায়। ও স্বচক্ষে দেখে এসেছে, সমস্ত মুরগির খাঁচা খালি। বিশ্বাস না হয়, দিদি নিজে গিয়ে দেখে এসো।

একটু পাঁঠার মাংস আনতে পারতে তো। নাকি ছাগল কাটাও বন্ধ!

নূপুর হাসতে হাসতে বলে, খাসিদের আজ রেনি ডে। ওদের বুঝি একদিন ছুটি পেতে নেই। আপনি কিচ্ছু বোঝেন না, মা।

দিনেরবেলা ঘরে ঘরে লাইট জ্বলছিল। আঁখি এ-ঘর ও-ঘর পাক দিয়ে ঘুরছিল কেবল। আর বারান্দায় এসে দাঁড়াচ্ছিল বার বার। নিশ্বাসে ভারী জলের গন্ধ। যে-কোনও সময়ে আবার ঝেঁপে বৃষ্টি আসতে পারে।

মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, আমার নাচের ক্লাস পণ্ড হল আজ। এই রকম চললে কাল কলেজ যাওয়াও চলবে না। দেখো তো বউদি, কাগজে কী লিখছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস কী রকম।

রবিবারের বাংলা-ইংরেজি দু'খানা খবরের কাগজ আধভেজা অবস্থায় পড়ে ছিল সোফার ওপর। কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। শিতিকণ্ঠ থাকলে এতক্ষণ সাময়িকীর প্রবন্ধগুলো পর্যন্ত পড়ে ফেলত। অন্য দিন হেডলাইনগুলোয় কোনও রকমে চোখ বুলিয়ে উঠে যায়। ছুটির দিন হলে বিছানায় বসে চা খেতে খেতে পুরো কাগজটা তারিয়ে তারিয়ে পড়ে। ওর কাছ থেকে ছাড়া না পাওয়া অবধি বোনেরা কাগজ পায় না। এই নিয়ে দিউয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধে।

দিউ বলে, দুটো কাগজ তো একসঙ্গে পড়ছ না। বাংলাটা অন্তত দাও! একটা হাঁটুর নীচে চেপে রেখে আর-একটা খুলে মেলে পড়ার অভ্যেস খুব খারাপ।

শিতিকণ্ঠ, দাদা, চশমার ফাঁক দিয়ে বড় বোনের দিকে আড়চোখে তাকায়। ওব স্পর্ধা মাপার চেষ্টা করে। তারপর বাংলা কাগজ থেকে সাময়িকীর পাতাটা টেনে বার কবে দিয়ে দেয় ওকে।

কাগজ পড়া মানে তো গপ্পো পড়া। এই নে।

তাই নিয়ে আবার তিনতলায় উঠে যায় দিউ। নিজের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে দীর্ঘ উপন্যাসের কিস্তি শেষ করে। সত্যি, খবর পড়ার দিকে কারুর আগ্রহ নেই। আগের দিন রাত্তিরে তো সব খবর জানা হয়ে গেছে। তা ছাড়া, রবিবার দিন সকাল থেকে টিভি-তে এত প্রোগ্রাম থাকে যে, ওই একবার ছাড়া দিউ নীচে নামেই না। সকালটা শুয়ে-বসে কাটায়।

স্পর্ধার কথা বলা হল, তার বিশেষ একটা কারণ আছে।

বিয়ের আগে নূপুর স্কুলে কাজ করত। বিয়ের পর সেই চাকরি ছেড়ে দেয়। বা, ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কেননা, কলকাতায় সংসার করে কৃষ্ণনগরে চাকরি করা যায় না। তা বলে কৃষ্ণনগর কি রানাঘাট থেকে কি কেউ কলকাতায় চাকরি করতে আসে না। আসে। কলকাতা-বর্ধমান, কলকাতা-কল্যাণী লোকে হামেশাই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছে। তাদের দরকার আছে। শিতিকণ্ঠর বউকে সে রকম না করলেও চলবে। এই ছিল যুক্তি। একজনের রোজগারে সংসার যদি চলে যায়, তা হলে দু'জনে রোজগার করবে কেন। চাকরি—সে যে রকমই হোক, আসলে তো চাকরের কাজ চাকরানির কাজ তাকে যে-নামেই ডাকো। কারুর অধীনে থাকতে হয়। অপমান সইতে হয়। আদেশ মানতে হয়। চার টাকার কাজ করে দিলে লোকে দু'টাকা মাইনে দেয়। শিতিকণ্ঠর বউ এসব পরিশ্রম আর অবমাননার মধ্যে যাবে কেন। সংসার ছাড়া, সংসারের বাইরেও নূপুরের একটা সঙ্গিনী-ভূমিকা থাকবে। সে-ভূমিকা স্বামীর আপিসের সঙ্গে জড়িত। আর সব মেয়ের সঙ্গে ওর তুলনা করলে চলবে না। ওর স্বামী শিক্ষক নয়, কেরানিও নয়। সে একজন বড়দরের আমলা। একজন ম্যানেজার। নূপুর, ইচ্ছে হলে সমাজসেবা, শিশুকল্যাণ, আর্তত্রাণ—এইসব ধরনের কোনও একটা কাজ নিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখুক। এর জন্যে কত ভাল ভাল ক্লাব আছে। তাতে আভিজাত্য বজায় থাকে কুলীন গৃহিণীদের। নিতান্ত শ্রমজীবী হয়ে জীবন কাটালে মেয়েদের লাবণ্য ঝরে যায়। পুরুষদের সঙ্গে বিদ্যে-বাহাদুরির ঘোড়দৌড়ে যোগ দিলে, শিতিকণ্ঠ বলেছে, মেয়েদের দেহলতা জীর্ণ, মেরুদণ্ড নত আর হরিণচক্ষু চশমাচ্ছন্ন হয়ে যায়, তাতে সমাজেরই ক্ষতি। সন্তানধারণ, প্রতিপালন থেকে মন সরে যায় ওদের। আমার কথা না, এ তোমাদের রবীন্দ্রনাথের বাণী।

পুরোপুরি সংসারী হল বটে, কিন্তু নূপুরের সন্তান হল কই। কেবল স্বামীকে প্রতিপালন করার মধ্যে

ওর জীবন আবর্তিত হয়ে চলেছে। শাশুড়িও সেটা বেশ পছন্দ করছেন। অথচ নিজের মেয়ের বেলা এ-নিয়ম খাটল না। সে স্বাধীন, বেপরোয়া।

বয়েসে বারো বছরের বড়, দাদার বন্ধুকে বিয়ে করেছিল দিউ। তার নাম পলাশ দত্ত। উচ্চাশী যুবক। কোনও একটা চাকরিতে পাঁচ বছরের বেশি লেগে থাকে না। বিয়ের পরেই স্ত্রী-ভাগ্যে একটা ফাইভ-স্টার চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল পলাশ। পুণায় পোস্টিং। কোম্পানির গাড়ি, বাংলো, চারজন খাটনি। কারখানার খাতায় নাম লেখানো ড্রাইভার, বাবুর্চি, খানসামা আর মালী। শিল্পবাণিজ্যের যা কিছু উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, ওদিকেই। কলকাতায় কেবল লেবার ট্রাবল আর বসে বসে পচা। এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে না।

প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে দিউ গিয়েছিল পুণায়। ভেবেছিল, আশা মিটিয়ে বাড়ি সাজাবে। মেমসাব হয়ে দাপিয়ে বেড়াবে। বরের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিদেশে যাবে। পলাশ বলেছিল, দাঁড়াও না, একটু অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে নিই, তারপর আমেরিকায় পাড়ি দেব আমরা। একটাই জীবন, চুটিয়ে উপভোগ করব না?

কী পরিমাণ ওর উপভোগের নেশা, আগে বুঝতে পারেনি দিউ। দাদাও বলেনি কিছু ওকে। নিজেরা দেখেশুনে কোর্টশিপ করেছ, বিয়ে করছ, আমার কী বলার আছে, এই রকম মনের ভাবখানা। এক বছর পূর্ণ হল না, দিউ ফিরে এল বাপের বাড়িতে। একজন অপরিক্লান্ত ভোগী পুরুষের সঙ্গে বসবাস করা ওর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। পলাশ দত্ত যে কেন এতদিন বিয়ে করেনি, ও ক্রমে ক্রমে বুঝেছে। ও কোনও প্রকার বন্ধনে বিশ্বাস করে না। বিয়ে করে ও শিতিকণ্ঠর মতো কয়েদ হতে চায়নি। চেয়েছিল একজন বিশ্বস্ত প্রহরী তথা সেবিকা। টাকা দিয়ে যা পাওয়া যায় না। বিয়ে করেই পেতে হয়। কিন্তু দিউয়ের বিশ্বাস, বিয়ে মানে দু'জন মেয়ে-পুরুষের মিলন। আধখানা হয়ে দু'জন মানুষের একজন হয়ে যাওয়া। বাকি আধখানা যার যার মায়ের কোলে পড়ে থেকে শুকোয়।

তো, ছিঁড়ে গেল। কাঁচা একটা সরকারি চাকরি ছিল ওর, ছেড়ে দিয়ে যায়নি ভাগ্যিস। ও সেইখানেই এসে যোগ দিল আবার। শাশুড়ি বললেন, মেয়ের ঠিকুজিতে ভৌমদোষ লেখা আছে। এ রকম ঘটবে আমি জানতাম।

তারপর তিনতলায় নিজের ঘরখানা মনের মতন করে সাজিয়ে নিয়েছে দিউ। একক মহিলার উপযুক্ত সব ব্যবস্থা। ছোট্ট কোমর-উঁচু ফ্রিজ, এগারো ইঞ্চি স্ক্রিনের কালো-সাদা টিভি, ঘরের কোণে দেয়ালে-গাঁথা আয়না, ইলেকট্রিক হিটার। একটা মাঝারি ক্যাসেট প্লেয়ার। জলের ট্যাঙ্কের পাশে হালফ্যাশানের দরোজা-দেওয়া ছোট্ট বাথরুম বানিয়ে নিয়েছে, প্লেনে যেমন থাকে। দুই বোনের পক্ষে উপযোগী। আঁখির ঘরখানা ওর তুলনায় বেশ ছোট, খানিকটা ভাঁড়ারঘরের মতো। তাতে বড় একখানা জানলা ফুটিয়ে নিয়েছে। আলো-হাওয়া আসে। যৌথ পরিবারের মধ্যে একটু স্বাধীনভাবে থাকা আর কী। ছোট বোনটা তো আর চিরদিন থাকবে না এখানে, বিয়ে হয়ে যাবে ওর। তবু বাপের বাড়িতে ওর জন্যে নির্দিষ্ট একখানা ঘর থাকুক। মাকে নিয়ে দাদার সংসার, দোতলায়, একতলায়, সেইটাই আসল কেন্দ্রস্থল। তিনতলাটা হস্টেল। স্থায়ীভাবে এক অস্থায়ী বন্দোবস্ত।

চোখের জল মুছে দিউ বলেছিল, আমি তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না দাদা। তাই—

তবে কি পেয়িং গেস্ট?

ছি-ছি। ওভাবে দেখছ কেন? তোমার আশ্রয়েই ছিলাম, তোমার আশ্রয়েই থাকব। ছোটবেলা থেকে তুমিই তো আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছ। বাবাকে আমরা কতটুকু পেয়েছি বলো। এখনও তাই করবে।

শিতিকণ্ঠ হঠাৎ বলে উঠেছিল, কোমরে হাত দিয়ে কথা বলবি না। হাত নামা।

অসম্মানটা গায়ে মাখেনি দিউ।

একবার ঢোঁক গিলে বলেছিল, একটু আড়ালে থাকি। তাতে তোমাদের অস্বস্তি কমবে। আর কোথাও যাবার তো জায়গা নেই আমার! পুণায় আমি ফিরে যাব না।

শিতিকণ্ঠ বলেছিল, একটা বাচ্চা থাকলে এই জেদ দেখাতে পারতিস?

না। তাই তো পালিয়ে এলাম। মনস্থির করতে দেরি করলে কখনওই আসা হত না। কিন্তু ভুল আমি করিনি।

শিতিকণ্ঠ ভেবেছিল, দাম্পত্যকলহ, কিছুদিন পর মিটে যাবে। পলাশ ট্রাঙ্ককল করেছে বহুবার। কলকাতায় এসে ক্ষমা চেয়েছে। কাকুতিমিনতি করেছে দিউকে ফিরে যাওয়ার জন্যে। নিভৃত কক্ষে বসে

ওদের কান্নাকাটিও হয়েছিল ঢের। কিন্তু দিউ টলেনি। বাবার বাড়িতে একখানা ঘর আর একটা চাকরি—ছোট চাকরি, তারই জোরে ও ঐচ্ছিক সৌভাগ্যের দূত পলাশ দত্তকে প্রত্যাখ্যান করল।

নিশ্চয় ওদের সম্পর্কের খুব নরম গভীর জায়গায় চোট লেগে থাকবে, যাতে নতুন সংসারটা ভেঙে গেল। শিতিকণ্ঠ নিজের বোনকে চেনে, নূপুরের মতো মানিয়ে চলার ক্ষমতা ওর চরিত্রে নেই। এই রকম মানুষ, ওর বিশ্বাস, জীবনে সুখী হয় না।

দেখতে দেখতে তাও তো চার বছর হয়ে গেল।

পলাশ বিয়ে করেছে আবার।

দূরে থাকে ও। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে। এলে একবার শিতিকণ্ঠর আপিসে ফোন করে খবর নেয়। পুরনো বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায়, তা আর এখন নেই। বলতে কী, পলাশকে নিয়ে বিশেষ কোনও আগ্রহও বোধ করে না শিতিকণ্ঠ। চর্চা না থাকলে সবকিছুই যেমন শিথিল হয়ে যায়, বন্ধুত্বও তাই। তবু পলাশই ফোন করে। সে-ই কথা বলতে চায়।

জীবনে আমি শান্তি পেয়েছি ভাই, বিশ্বাস কর। কী অমানুষিক পরিশ্রম করি, অনিয়ম করি, কিন্তু বাড়িতে ফিরে এলে আমার গায়ে কোনও ময়লা লেগে থাকে না। এইটুকুই চেয়েছিলাম।

আহা! যেন কিশোরকুমারের গলা! কথাটাতে ঠেস ছিল কি? ও কি বলতে চেয়েছিল, ওব এইটুকু প্রত্যাশা শিতিকণ্ঠর বোন মেটাতে পারেনি? সে অল্পেই এত অধৈর্য হয়ে পড়েছিল কেন? না বোধহয়। সত্যি তো, সব মানুষই স্ত্রীর কাছে ওইটুকুই চায়। পৃথিবীতে প্রায় সবকিছু টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় আজকাল, ওই একটুকু শান্তি বাদে। তার জন্যে একজন সহকর্মী সঙ্গী দরকার হয়। শিতিকণ্ঠর নিজের কি সে চাহিদা নেই?

এইসব ভাবলে মনটা তেতো হয়ে যায় হঠাৎ। তেতোভাবটা অনেকক্ষণ কাটে না।

মা বলে, কথায় কথায় বোনেদের নিয়ে লাগিস কেন বল তো? ওরা নিজের মনে থাকে। সংসারের কোনও ব্যাপারে মাথা গলায় না। বউয়ের কাছে কী শুনলি, অমনি রাগ হয়ে গেল? আমার হয়েছে যত জ্বালা!

না, লাগানি ভাঙানি করা নূপুরের স্বভাব না। বরং তার উলটো। তিনতলার ঘরে দিউ কেমন নির্ঝঞ্ঝাট, কেমন স্বাধীন, কারুর মন রাখতে হয় না ওকে, ওর প্রশংসাই করে নূপুর। বলে, দিউয়ের সঙ্গে দু'দণ্ড বসলে, গল্প করলে, মন চাঙ্গা হয়ে যায়। বাইরের জগতে কত কিছু ঘটছে। আমাকে বলার যোগ্য মনে করো না তুমি।

ওই কারণেই তো রাগ! নূপুরকে দিউ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখায়। যেন ডিভোর্সি মেয়েরাই সবচেয়ে সুখী। যেন স্বার্থপবের মতো একলা থাকাতেই জীবনের পরাকাষ্ঠা। একদিন বুঝবে, কত ধানে কত চাল। একটা বাচ্চা থাকলে—আবার সেই কথাই মনে হয় শিতিকণ্ঠর, মেয়েদের জীবন সম্পূর্ণ হয়। আমাদের মাকে দেখো না। চুয়াল্লিশ বছর বয়েস থেকে বিধবা। সমস্ত মনোযোগ, নির্ভরতা, উৎকণ্ঠা ছেলেমেয়েদের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে। মুখ দেখে মনে হয় কি, মায়ের জীবনটা ব্যর্থ? তাই যদি হবে, তা হলে এই স্যাঁতসেঁতে বর্ষায় পাখা চালিয়ে গেঞ্জিটা, পাঞ্জাবিটা, মেয়েদের ব্লাউজ, ভেতরের জামা সারাদিন ধরে শুকোয় কেন? শুঁকে শুঁকে কী করে বোঝে, কোনটা কার? টান। ওকে বলে নাড়ির টান। গ্রাম্য শোনালেও কথাটা সত্যি। তোমাদের মধ্যে এই নাড়ির টান তৈরি হয়নি।

৩

রবিবারটা যেমন তেমন করে কাটল। সোমবার থেকে শুরু হল আসল সমস্যা।

বৃষ্টির বিরাম নেই। একটুক্ষণ থামছে। ঘোলাটে অন্ধকার ঘষা কাচের মতো একটু ফিকে হয়ে উঠছে বা। কিন্তু নীল কই? রোদ্দুর কই? বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নূপুর দেখে, দক্ষিণ দিক থেকে একপাল কালো মোষের মতো গোঁ-গোঁ শব্দ করতে করতে মেঘ এদিকেই এগিয়ে আসছে। একসময় আকাশটা ছেয়ে ফেলল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল স্থির হয়ে। প্রকাণ্ড ছাতার মতো। বিদ্যুৎ চমকাল কি চমকাল না, হুড়হুড় করে আবার নামল বৃষ্টি। আবার রাস্তায় ছপছপ জল। মানুষের দুর্ভোগ। গুটনো প্যান্টে, পেটিকোটে কাদার ছিটে।

প্রফুল্ল খানিকটা পুঁইশাক আর পাকা কুমড়ো জোগাড় করে এনেছে। চুনোমাছ এসেছিল বাজারে, ও আনেনি। কেউ খেতে চায় না। বাছাবাছির পরিশ্রম সার। চালানি রুইমাছ একখণ্ড কাটিয়ে এনেছে। লাউয়ের মতো সাদা।

শাশুড়ি বললেন, পেটটা একেবারে খ্যালখেলে, পাতলা। ডিম ছিল। এ-মাছে স্বাদ হবে না।

দিউ বলল, আমায় একটু আলু ভেজে দেবে প্রফুল্ল? মাখন দিয়ে ভাত মেখে খেয়ে যাব। দেরি হয় হোক।

আঁখি বলল, মা, আমাব গলা ব্যথা করছে। একটু গার্গলের জল করে দিয়ো। কলেজ যাব না।

এইসব কথাবার্তা অন্যমনস্কভাবে শোনে নূপুর। ওকে কিছু করতে হবে না। ওর কোনও তাড়াও নেই। ওর চোখদুটো বাইবে বাদলাব আকাশ আর গাছপালার দিকে চেয়ে আছে। ওর মনে হচ্ছে, প্রকৃতি সবকিছুই তৈরি করে কেমন গোল গোল, বৃত্তাকার। মানুষের ঝোঁক কেবল চারকোনার দিকে। আকাশের গায়ে চারকোনা বাড়িগুলো কেমন বেখাপ্পা। মানুষ সুন্দর করে কিছু গড়তে শেখেনি। তাই এত অশান্তি।

মনখারাপ নিয়ে ওর সারাটা দিন কেটে যায়। একনাগাড়ে বৃষ্টি ক্রমশ সকলের মনের মধ্যে ঢুকে বাড়ির আবহাওয়া বিমর্ষ কবে দিচ্ছে। এ-ও তো প্রকৃতির কাজ। মানুষ তাকে সইতে পারে না, শাসন করতেও পারে না!

মঙ্গলবার সন্ধেবেলা আবিব এল আনন্দের প্রতিমূর্তি হয়ে। এক হাতে ছাতা আর অন্য হাতে একটি দেড কিলো ওজনেব ইলিশমাছ।

ছাতাটা, মাছটা নীচের তলায় প্রফুল্লর হাতে জিম্মা করে দিয়ে ও ওপরে উঠে আসে। এসেই আবদার কবে, মাসিমা, আইজ বেদম ভিজছি। এট্টু আদা দিয়া চা না পাইলে বাঁচুম না।

আবির এ-বাড়িতে নতুন না। একসময় শিতিকণ্ঠর আপিসে টাইপিস্ট ছিল। অতিবিক্ত কামাই কবাব দোষে চাকরি যায়। অনেকবার ওয়ার্নিং পেয়েছে কিন্তু নিজেকে শোধবাতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে সেদিন ও কিছুতেই কাজে আসতে পারে না। মাঠে ওকে যেতেই হবে। কালীঘাটে পুজো দিয়ে প্রসাদী জবাফুল রাখবে ওর পকেটে, তবে না ওব দল খেলায় জিতবে।

সেই সময়ে ওপরওলাকে ধরাধরি করতে এ-বাড়িতে ওর আসা-যাওয়া। সকালবেলা এসে চুপ করে বসে থাকত। যদি সাহেব ওর কেসটা পুনর্বিবেচনা করেন। শেষপর্যন্ত এই ছেলেমানুষ ছোঁড়ার প্রতি করুণাবশত শিতিকণ্ঠ ওকে বাইরে একটা কাজ জুটিয়ে দেয়। আউটডোব ডিউটি, হাজিরার কড়াকড়ি নেই সেখানে। কাজ তুলে দিলেই হল। ছেলেটা কুঁড়ে না। ইস্টবেঙ্গলেব খেলা দেখা ওব নেশাব মতো। এই ট্রাভেল এজেন্সির কাজে সেটা বজায় আছে, তাই ও কৃতজ্ঞ। বলতে গেলে, কৃতজ্ঞতার সূত্রে এ-বাড়ির মানুষদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা। শিতিকণ্ঠকে বাদ দিলে আব সবাই মহিলা, তারা ওকে স্নেহ করে। টুকটাক বেগারও খাটিয়ে নেয়। ও কিছু মনে করে না। কাজের সূত্রে ও মানুযের মন রেখে চলতে শিখেছে।

সেদিন অবশ্য আবির স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইলিশমাছটি এনেছিল। প্রধান পুরুষের অনুপস্থিতিতে এই পরিবারকে একটু সাহায্য করা ওব উদ্দেশ্য হয়ে থাকতে পারে।

মাসিমা বললেন, রাত্তিরে খেয়ে যেয়ো, আবির।

দোতলাটা সাজানোগোছানো হলেও কেমন যেন চাপা। স্যাঁতসেঁতে। আসবাবে ঠাসা। প্লাস্টিক পেইন্ট করা। চকচকে রঙিন দেয়ালগুলো আর্দ্রতা শোষে না। তার চেয়ে তিনতলার চুনকাম-করা দেয়াল অনেক ভাল। আবির তিনতলায় গিয়ে হাজির হয়। তখন টিভি চলছে। হাউসকোটের ওপর একখানা বেডকভার জড়িয়ে কোণে বসে আছে দিউ। আঁখি দিদিব বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাশছে। আর নূপুর বলছে, দুর্যোগ না কাটলে কী করে ফিববে ও? দু'-দুটো টিউবলাইটের আলোয় ঘরটাকে মনে হচ্ছে স্টুডিয়ো।

আবিরকে দেখে সবাই পুলকিত হয়ে উঠল। নূপুর অবধি দুর্যোগের প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে বলল, হঠাৎ কী মনে করে আবিরবাবু?

আইজ ইস্টবেঙ্গল জিতছে, তাই ভাবলাম সুখবরটা দিয়া আসি।

খালি হাতে?

কথার উত্তর না দিয়ে আবির বলল, দাদা তো পরশু ফিরবেন। আমি টিকেট কনফার্ম কইরা দিছি। ততদিনে বৃষ্টি ধরব গিয়া।

আঁখি ক্রমাগত কাশছে। আবির বলল, আদা দিয়া চা খাও গরম গরম। আরাম পাইবা

বলতে বলতে প্রফুল্ল চা আর ইলিশমাছ ভাজা নিয়ে আসে প্লেটে করে।

একী? ইলিশ? তুমি আনলে?

দিউয়ের কথা কেড়ে নিয়ে আঁখি বলল, বাব্বা! মুখ বদলানো যাবে।

নূপুর বলল, আমি বললাম, কথার কথা। তা বলে এতগুলো টাকা নষ্ট করতে হয়! ইলিশমাছের কী দাম!

বেডকভারের ওড়না গা থেকে ঝরিয়ে সোজা হয়ে বসল দিউ। কপালের চুল সরিয়ে মনিবের মতো অসন্তুষ্ট মুখ করে বলল, বড় বাজে খরচ করো তুমি। সত্যি!

ওর চোখের দিকে তাকাল আবির। করুণ মুখ করে শুদ্ধ বাংলায় বলল, ভালবেসে একটা মাছ আনলাম, বলছ বাজে খরচ! ভাবলাম, দাদা নেই, সন্ধেটা আনন্দে কাটবে। তা হবার নয়। আমি যাই।

আচ্ছা থাকো, থাকো—দিউ তার গাম্ভীর্য একটানে খুলে ফেলে হেসে ওঠে—বাবুর একটুতেই অভিমান হয়ে যায়।

নূপুর আর আঁখি নিঃশব্দে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। দিউ যে এই ছেলেটাকে টালায়, টালিয়ে হাতে রাখে, ওবা জানে।

সেদিন অনেক রাত্রে আবির বাড়ি গেল।

টিভি বন্ধ করে তিনতলার ঘবে জমে গিয়েছিল চারজনের আড্ডা। কতদিন পর নূপুর গলা খুলে গান গাইল—এসো নীপবনে ছায়া বীথি তলে/এসো করো স্নান নবধাবা জলে।

আবির জানতে চেয়েছিল, 'নীপ' মানে কী বউদি?

কদম। কদম ফুলের গাছ। কদম বন।

তাই? বাঃ, কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অনুষঙ্গ আছে এই নীপবনের মধ্যে, তাই না? ভারী সুইট! এসো করো স্নান নবধারা জলে। কী আনন্দ! ভালবাসা যখন সব বাধা অতিক্রম করার জোর পায়, তখনই নির্ভয়ে এই গান গাওয়া যায়। না হলে বলো, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকার যে-প্রেম, তা তো একদিক থেকে দেখলে ব্যভিচার। অ্যাডালটারি। তার জলজ্যান্ত একজন স্বামী ছিল।

সে প্রেমিক না। দিউ বলেছিল, যে স্বামী শুধুই স্বামী, প্রেমিক নয়, তাকে বিট্রে করার মধ্যে কোনও দোষ নেই। অন্তত আমি তাই মনে করি।

কোথাও নবম তারে ঘা লেগেছে বুঝতে পেরে আবির কথা ফিরিয়ে নিয়েছিল তড়িঘড়ি। বলেছিল, তা তো বটেই; প্রেমই হল মূল কথা। প্রেমকে স্থায়ী করার জন্যে বিয়ের বন্ধন। না হলে বিয়ে তো একটা ফার্স।

নূপুর বলেছিল, তুমি একটি জ্ঞানপাপী। আবির বলেছিল, না, আমি মূর্খ।

অবিরাম ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় গাড়ি চলার শব্দ স্তিমিত হয়ে গেছে কখন। নিস্তেজ, ঝিঁঝিঁপোকার মতো একঘেয়ে জলের শব্দ বাইরে। ভেতরে খটখটে শুকনো ঘরে পাখা চলছে।

ভেতরে, দোতলার ডাইনিং টেবিলে বসে সেই রাত্রে বেশ জম্পেশ করে ইলিশমাছের ঝোল দিয়ে গরম গরম ভাত খাওয়া হল। পুঁইশাক আর কুমড়ো ছিল বাড়িতে। ইলিশমাছের মাথা দিয়ে বেশ ঝাল ঝাল ছ্যাঁচড়া রেঁধেছিল প্রফুল্ল। তৃপ্তি করে খেল সবাই। আবির পেল একটু বিশেষ মনোযোগ।

খাবার সময় মাসিমা বললেন, পরশু কি তুমি এয়ারপোর্টে যেতে পারবে বাবা? রাত্রের ফ্লাইট। আবহাওয়ার তো এই অবস্থা!

যাব মাসিমা। আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয় যাব। এখান থেকে গাড়ি যাবে তো। আমার আর অসুবিধে কী!

প্রথম প্রথম নূপুর যেত স্বামীকে সি-অফ করতে। স্বামীকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে আসত। অনেক সময় বোনেরাও এসেছে। এয়াবপোর্টে আসা তখন একটা ছোটখাটো আউটিং ছিল তো বটে। আপিসের গাড়ি যখন যাচ্ছেই। ক্রমে এই অভ্যেসে ভাটা পড়েছে। এখন শুধু গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার যায়। শিতিকণ্ঠ ট্যুরে থাকলে আপিসের গাড়ি আর বাড়ি আসে না। তার ফলে, স্বামীর আপিসের গাড়ি চড়ে একা ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেসও হয়নি নূপুরের। হাতখরচের টাকা পড়ে পড়ে পচে।

এবার আবির গেল ড্রাইভারের সঙ্গে। মাসিমা বললেন বলে।

আর, গেল বলেই রাত সাড়ে এগারোটায় বাড়িতে ফোন করে জানাতে পারল, ফ্লাইট দেরিতে আসবে।

কতক্ষণ দেরি হবে, এয়ারলাইন্সের কেউ বলতে পারছে না। হয়তো আবহাওয়াই তার কারণ। আবির বলল, আমি এখানে অপেক্ষা করছি। যখনই আসুক, দাদাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরব।

এ রকম আগেও হয়েছে। রাত দশটা পঁয়ত্রিশে অ্যারাইভাল, ফ্লাইট দুশো চৌষট্টি এসেছে সাড়ে বারোটায়। শিতিকণ্ঠ বাড়ি পৌঁছেছে দেড়টায়। পরদিন আপিস গেছে ঠিক সময়ে। নূপুর বহুবার বলেছে, তুমি চারশো এক-এ আসো না কেন। তাতে নাকি একটা কাজের দিন নষ্ট হয়। আপিসের জন্যে যা দরদ ওর, তার এক শতাংশও যদি স্ত্রীর জন্যে থাকত, তা হলে কৃতার্থ হয়ে যেত নূপুর।

কিছুক্ষণ উদ্বেগে কাটল। তারপর এক-এক করে শুতে গেল সবাই। শাশুড়িকে নিশ্চিন্ত করে নূপুর ঢুকল নিজের শোবার ঘরে। আবির তো রয়েছে এয়ারপোর্টে, মা, আমরা অকারণ ভেবে কী করব! আপনি শুয়ে পড়ুন।

আজ আর সারা বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে আলুথালু বেশে ও নিজে শুতে পারল না। খাটের একপাশটিতে গুটিয়ে রাখল নিজেকে। একটা ঘুমের বড়ি খেতে গিয়েও খেল না। শিতিকণ্ঠ কখন এসে পড়ে, ঠিক নেই।

সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। প্লেন-ক্র্যাশের স্বপ্ন দেখে হুড়মুড় করে উঠে বসল যখন, দেখে, পরদার ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকেছে ঘরে।

এদিকে তিনতলার ঘরে তখন ফিসফিস স্বরে জল্পনাকল্পনা চলছে। বউদিকে, মাকে কী বলে বোঝাবে, ওরা ভেবে পাচ্ছে না। ফ্লাইট এল শেষপর্যন্ত, কিন্তু শিতিকণ্ঠ নামেনি।

যদি শেষ মুহূর্তে টিকিট ক্যানসেল করে থাকে? দিউ।

প্যাসেঞ্জার লিস্টে দাদার নাম ছিল, আমি দেখে এসেছি। একশো বারো নম্বর। আবির।

মাঝখান থেকে তো উধাও হয়ে যেতে পারে না মানুষটা! দিউ।

একজন প্যাসেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছিল? প্লেন দেরিতে এল কেন। সে বলল, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল টেক-অফের পরেই। আবির।

তারপর? দিউ।

কেউ কোনও কথার উত্তরই দেয় না। আবির।

টিকিট ক্যানসেল করলে দাদা কিন্তু ট্রাঙ্ককল করে জানাত, পরের দিন আসছি। আঁখি।

জানাতে চেয়েছে হয়তো। পারেনি। সমস্ত টেলিকমিউনিকেশন ডাউন। আমি তো বোর্ডিং লিস্ট চেক করতে চেয়েছিলাম। বলল, কম্পিউটার চলছে না। আবির।

পাঁচদিন একনাগাড়ে বৃষ্টিতে সব যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিঁড়ে গেছে। এ-দেশের কিচ্ছু হবে না। দিউ।

নিশ্চয়ই কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমার মনে হয়, ওরা ভাঙছে না। আঁখির চোখ জলে ভরে ওঠে, কী হবে তা হলে?

এখনই কেঁদো না। যতক্ষণ কিছু জানা না যাচ্ছে। আবির।

কখন জানা যাবে? কী করে জানবে? তুমি কিছু একটা করো আবির। দিউ এবার ফুঁপিয়ে উঠল।

আবির ওর হাত ধরে বলল, এখন কান্নাকাটি করার সময় নয়। তোমরা মন শক্ত করো প্লিজ। আমি আবার এয়ারপোর্ট যাচ্ছি। দাদার আপিসের বড়সাহেব থাকে আলিপুরে। ওর বাড়ি আমি চিনি। যাবার সময় ওকে খবর দিয়ে যাব। মাসিমাকে, বউকে তোমরা সামলাও।

আবির গাড়িতে উঠছে, দোতলার বারান্দা থেকে দেখল নূপুর। গাড়িটা হুস করে বেরিয়ে গেল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, তিনতলা থেকে নেমে এ-দিকেই আসছে দুই ননদ। ওদের চোখে অশুভ অশ্রুর ভার।

কতদিন পর মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। এখন ছ'টা বাজেনি, চারদিক আলোয় আলোকিত। শহরময় কাক ডেকে উঠেছে প্রবল উৎসাহে। ছাদে, কার্নিশে, গাছের ডালে ঘুরে ঘুরে ওরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে, ওরে প্রলয় হয়নি। এ-যাত্রায় প্রলয় হল না। বেরিয়ে আয়, কে কোথায় আছিস!

নূপুর হাহাকার করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল দিউর বুকের ওপর। চিৎকার করে উঠল, আগে বলো, ও কোথায়? আবির কী বলে গেল?

সামলাতে এসে ওরাও একসঙ্গে কেঁদে উঠল, বউদি, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। ও মা গো, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।

এক ঝটকায় দিউকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় নূপুর। ওর চোখদুটো জ্বলছে। চুলের ঝাড় মুখের ওপর আছড়ে পড়েছে। এক মুহূর্ত। তারপরই ও ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে ছিটকিনি বন্ধ করে দিল।

বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়েই ও সেই পরিচিত গন্ধটা পায়। ঘাম আর অডিকোলন মেশানো উগ্র গন্ধ। ওর স্বামীর গায়ের গন্ধ। নূপুর, অপ্রকৃতিস্থ দুর্বল মার-খাওয়া এক জীর্ণ নারী, চোখ বুজে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন। ওঃ, আমি তো কোনও দোষ করিনি। আমি মরে যেতে চাই।

ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা বাড়ির কারুর ছিল না।

গল্পের এখানেই শেষ। কিন্তু জীবন তো কোনও ভাবারোহবিন্দুতে উঠে থেমে থাকতে পারে না। জীবনকে নামতেই হয়।

পরদিন দুপুরবেলা স্যুটকেস হাতে করে শিতিকণ্ঠ ট্যাক্সি থেকে নামবে বাড়ির দরোজায়। হতভম্ব প্রফুল্লকে বলবে, এটা ভেতরে নিয়ে যা। তারপর গট গট করে উঠে আসবে দোতলায়।

এবং বিহ্বল আর মুহ্যমান চারজন নারীকে উজ্জীবিত করার জন্যে, যেন কিছুই হয়নি সুরে বর্ণনা করবে সেই প্লেন দুর্ঘটনার কথা।

বলব কী খানিক উঠেই প্লেনটা দারুণ বাম্প করতে লাগল। হোস্টেসদের মুখ শুকিয়ে গেছে। আমরা তো কোমবে সিটবেল্ট বেঁধে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছি। আমার পাশে-বসা লোকটা গলগল করে ঘামছে। ককপিট থেকে ক্যাপ্টেন-ব্যাটা বকবক করে কী বলে যাচ্ছে, কারুর কানে ঢুকছে না। হঠাৎ, বুঝলে কিনা, ধপ করে প্লেনটা মাটি ছুঁয়ে দৌড়োতে থাকল। চোখবুজে ছিলাম, তাকিয়ে দেখি, আরে, বেঁচে আছি।

ওরা বলল, অন্য একটা প্লেনে সবাইকে উঠতে হবে। দেবি আছে। এখন তোমরা লাউঞ্জে বিশ্রাম করো। ডিনার খেয়ে নাও রেস্তোরাঁয় গিয়ে।

আমি ভাবলাম, ধুর! স্যুটকেসটা কবজা করে বেরিয়ে এলাম।

একটা ফাঁড়া কেটে গেল ভেবে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে আরাম করে রাত্তিরে ঘুমোলাম। তারপর চানটান করে পরের দিন রেল-ক্যান্টিনে মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে বিকেলবেলা ধরলাম রাজধানী এক্সপ্রেস। ও হো, তোমাদের যে একটা খবর দেব, সে-কথা মনেই হয়নি।

কেন মনে হয়নি, এই প্রশ্ন প্রত্যেকের ঠোঁটের ডগায় এসে থমকে যাবে। না সব প্রশ্ন দাদাকে করা যায় না। স্বামীকে একা পেলে নূপুর কিন্তু এই প্রশ্ন করবে আজ।

যে-প্রশ্ন কোনওদিন করতে পারবে না, সেটা হল, দু'-এক রাত্রির জন্য মুক্তির স্বাদ দিয়ে কেন আমায় ঠকালে তুমি?

১৯৯২

❀ লকার

ব্যাঙ্কে ঢুকতেই বর্ষার গা ছমছম করে উঠল।

কেমন অপরিচিত পরিবেশ। গলা অবধি উঁচু টানা পার্টিশন তিনদিকে, পার্টিশনেব ওপাশে কতকগুলো মানুষ—মেয়েও দেখছি—সারবন্দি বসে আছে, ওদের মুন্ডুগুলো শুধু দেখা যাচ্ছে। কয়েকজন আবার কাচ-ঘেরা খাঁচায় একা। এয়ারকন্ডিশনের শীতটা প্রথমে ওর খোলা বাহুর ওপর ছ্যাঁক করে লেগেছিল কিন্তু গা ছমছম করে উঠল এই কথা ভেবে যে, ওরা হয়তো ওত পেতে আছে, বর্ষার হাতব্যাগ থেকে সব টাকা আর গিফট-চেক ওরা ছিনিয়ে নেবে।

বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে লম্বা টানা সোফা। পুরনো পত্রপত্রিকা ইতস্তত ছড়ানো। নানা বয়সের কয়েকজন সুসজ্জিত মহিলা ও পুরুষ সোফায় বসে আছে। খানিকটা তফাতে বর্ষাও গিয়ে বসল।

রাহুল ওদিকটায় ফর্ম আনতে গেছে। বর্ষার অবাক লাগে, ব্যাঙ্কের এই রহস্যময় দুর্গের মতো পরিবেশে ও কেমন স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন এটা ওর নিজের অফিস, যেন এখানে সবাই ওর চেনা। ওর বন্ধু বা সহকর্মী। কোনও কিছুতেই রাহুল ঘাবড়ায় না। বিয়ের পর এই এগারো দিনের মধ্যেই বরের আত্মবিশ্বাস দেখে বর্ষা মুগ্ধ। আগে চিনতই না, এখন একটু একটু ভালবাসতে শুরু করেছে ওকে।

একগাদা ছাপানো কাগজ হাতে নিয়ে রাহুল ওর সামনে এসে দাঁড়ায়।

বর্ষা বলল, 'এই শোনো।'

'কী।'

'আমার না ভয় ভয় করছে। আমার সই না, কোনওদিন মিলবে না। আমার হাতের লেখা খুব খারাপ।'

'সে দেখা যাবে। আগে চলো তো। ভেতরে আমাদের ডাকছে।'

ম্যানেজার না, ম্যানেজারের সহকারী, সি.এন. রক্ষিত। টেবিলের একপাশে তাঁর নাম লেখা ট্যাবলেট। চোখে মোটা চৌকো চশমা। গলায় চওড়া ডোরাকাটা টাই। গা দিয়ে ভুরভুর করে ওডিকোলনের গন্ধ বেরোচ্ছে। নাকি ওটা এয়ারকন্ডিশনের গন্ধ? ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো ঠান্ডা, নির্মল।

সি.এন. রক্ষিত মন দিয়ে ওদের কথা শুনলেন। বললেন, 'একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলুন। দু'জনের যে-কেউ টাকা বা চেক জমা দিতে পারবেন, দু'জনের যে-কেউ টাকা তুলতে পারবেন।'

ততক্ষণে তাঁর টেবিলের ওপর হ্যান্ডব্যাগখানা উপুড় করে ফেলেছে বর্ষা। একগাদা দোমড়ানো মোচড়ানো গিফট চেকের রঙিন খাম, পঞ্চাশ টাকা ও একশো টাকার নোট, গ্রিটিং টেলিগ্রাম, চিঠি— সব বেরিয়ে পড়েছে। মায় একটা ছোট্ট চৌকো আয়না, লিপস্টিকের ডাঁটা, কিছু রবারব্যান্ড এবং একটা চাবির রিং। বয়স্ক ভারী চেহারার মানুষ, তিনি খানিকটা স্নেহ ও খানিকটা কৌতুক সহকারে নববিবাহিত মেয়েটিকে দেখছিলেন।

মাথার পেছনে ঢিলে খোঁপা। সিঁথির সিঁদুর কপাল থেকে উঠে ওই খোঁপা অবধি গিয়ে ঠেকেছে। কপালে লাল টিপ। চোখদুটো একটু কটা। মুখের গোল আদলের মাঝখানটায় নাকটা একটু খ্যাঁদা, নাকের বাঁয়ে নাকছাবি চিকচিক করছে। গায়ের রং ফরসাও না, আবার কালোও না, মেরি বিস্কিটের মতো। অনভিজ্ঞ ঠোঁট দুটো একটু হাঁ হয়ে খুলে থাকায় বর্ষার সাজানো দাঁতের পাটি কচি ভুট্টার দানার মতো দেখাচ্ছিল। মেয়েটি অকারণে তার হ্যান্ডব্যাগ খুলছে আর বন্ধ করছে। নববিবাহিত ছেলেটিকে দেখে তাঁর বেশ চালাক চতুর বলেই মনে হচ্ছিল, তবে একটা গোটা বউকে কী করে সামলাবে, আপাতত সেটা বুঝে উঠতে পারছে না।

সি.এন. রক্ষিত বললেন, 'অত সব কিছু আমাদের লাগবে না।'

রাহুল বলল, 'এই শুনছ, তুমি ওই টাকা আর গিফট চেকগুলো আমাকে দাও, সাজিয়ে ফেলি।'

সি.এন. রক্ষিত বললেন, 'আর বাকি সব নিজের কাছে রেখে দিন।'

গিফট চেক কিছু বর্ষার নামে, কিছু রাহুলের নামে, কিছু আবার ওদের যুগ্ম নামে। রাহুল অ্যান্ড বর্ষা মজুমদার। সর্বসাকুল্যে তিন হাজার একশো পাঁচ টাকা।

সি.এন. রক্ষিত বললেন, 'নট ব্যাড। হানিমুনের খরচ উঠে আসবে।'

হানিমুনের নাম শুনে বর্ষা রাহুলের দিকে আড়চোখে তাকায়। রাহুল কিছু বলতে গিয়ে আর বলল না। সব কথা ব্যাঙ্কের লোককে বলার কী দরকার।

সি.এন. রক্ষিত নিজেই ছাপা ফর্মে যেখানে যা ভরার তা ভরে দিলেন। কিন্তু সই তো তিনি করে দিতে পারেন না।

বর্ষা এবার তাঁকেই জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা আমার সই যদি না মেলে?'

'কেন? সই মিলবে না কেন? আপনি যেভাবে নিজের নাম লেখেন স্বাভাবিকভাবে তেমনি সই করুন। চেক কাটার সময় সেটা ভুলবেন না।'

'আমার হাতের লেখা কিন্তু খুব খারাপ।'

'তাতে কী', সি.এন. রক্ষিত এবার অনভিজ্ঞ মেয়েটির প্রতি একটু বিরক্ত হয়েছেন, বললেন, 'ভাল হোক, খারাপ হোক, সই এক রকমের হলেই হল।'

বললে কী হয়, নাম সই করতে গিয়েই ভুলটা করল বর্ষা। মজুমদার লিখতে গিয়ে মিত্র লিখে বসল। স্বাভাবিকভাবে সই করতে গিয়ে আবাল্য অভ্যেস মিত্রর খানিকটা বেরিয়ে যেতেই ওর খেয়াল হয়েছে, 'এম'-এর পরে 'এ' হওয়ার কথা, 'আই' নয়।

'এই যাঃ। এখন কী হবে। কেটে ঠিক করে লিখে দিই?'

রাহুল বউয়ের ভীত ও লজ্জিত মুখখানা দেখে হেসে ফেলল। ঠাট্টা করে বলল, 'বিয়ের পর তোমার পদবি বদলে গেছে, মনে নেই বুঝি? নাকি বিয়ে হয়েছে তাই ভুলে গেছ?'

এর উত্তরে বর্ষা বলতে পারত, তোমার পদবি বদলালে তোমারও এ রকম ভুল হত মশাই। বাড়ি হলে, শাশুড়ি বা ননদ কাছাকাছি না থাকলে বলতও। কিন্তু এখানে, এই ভুরভুরে ঠান্ডা পরিবেশে বরের রসিকতা ও উপভোগ করল না। সি.এন. রক্ষিত ওদের আর একখানা ফর্ম ভরে দিলেন তারপর বেয়ারা ডেকে কাগজপত্র তার হাতে দিয়ে বললেন, 'এগুলো জমা দিয়ে দাও। আর চেকবই, পাশবই করিয়ে নিয়ে এসো। এঁরা অপেক্ষা করছেন।'

এতগুলো টাকা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরে বর্ষা বেশ হালকা বোধ করছে। এতক্ষণ পরে ও লক্ষ করছে কোথায় কী করে লোকে টাকা জমা দেয়, কোথায় কী করে টাকা তোলে। এতদিন ওর জীবন অন্য চাকায় ঘুরেছে । কলেজ, গানের ক্লাস আর বাড়ি। খুব জোর, বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা কি রেস্তোরাঁ। টাকাপয়সার দরকার হলে মায়ের কাছে চেয়ে নিয়েছে। ব্যাঙ্ক বলো, কী অফিস বলো—ওসব জায়গায় ও ঢোকেইনি। আজ প্রথম। এরপর অভ্যেস হয়ে যাবে। চেকে সই করে টাকা তোলা, কি ডিপোজিট ফর্ম ভরে টাকা জমা দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। সব গিন্নিবান্নিরাই আজকাল করছে তো। গোলমাল হলে ওর বর তো আছে, সে এসে উদ্ধার করবে বিপদ থেকে। এখানে তো ওদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হল। ব্যাঙ্কের কাজ রাহুলের কাছে জলভাত। অফিস পাড়ায় একাধিক ব্যাঙ্কে ওর নিত্য যাওয়া-আসা। বস্তুত, এইটি ওদেরই এক ব্যাঙ্কের গৃহস্থ পাড়ার ব্রাঞ্চ। তাই তো এত খাতির করছেন সহকারী ম্যানেজার।

তবু রাহুল ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানায়।

'একেবারে হাতে হাতে সব করে দিলেন,' রাহুল বলে, 'আপনাদের সার্ভিস অন্য ব্যাঙ্কের চেয়ে ভাল।'

'আমাদের লকার আছে, ইচ্ছে করলে—'

লকার শুনে বর্ষার মনে পড়ে যায়, ওর দিদি একবার বলেছিল যে, অনেক কষ্টে একটা লকার পেয়েছে। দিনকাল যা পড়েছে, গয়নাগাঁটি আর বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয়। দিদিদের পাড়ায় সব রকম সুবিধে একেবারে নাগালের মধ্যে। নেমন্তন্ন বা পার্টিতে যেতে হলে সেদিন দুপুরে দোকানে চুল বেঁধে আসে, লকার থেকে দরকার মতো গয়না তুলে নিয়ে এসে পরে। আবার পরের দিন রেখে আসে লকারে। তা ছাড়া, চোখের সামনে ওগুলো থাকলে নিত্য খোলাপরা হয়, লোকেদের চোখ টাটায়। এই তো সেদিন বর্ষার ছোট ননদ মিঠু গয়নার বাকস দেখতে দেখতে একজোড়া মুক্তোর ইয়ারটপ দেখিয়ে বলেই ফেলল, 'বউদি, এটা তো তোমার ডুপ্লিকেট, জন্মদিনে আমায় উপহার দিতে পারো।' একখানা সিল্কের শাড়ি তো নিয়েই নিল আবদার করে। কী না, 'সবুজ রং তোমাকে মানাবে না, এটা আমি পরব বউদি?' এসব খবর অবশ্য রাহুল জানে না।

'একটা লকার নিলে হয়।' বর্ষা মৃদুস্বরে বলল।

'এখুনি লকারের কী দরকার?'

'গয়নাগুলো রাখব।'

'বাড়িতে দু'-দুটো স্টিলের আলমারি আছে, তাতে আঁটছে না?'

'বাড়ি থেকে চুরি হতে পারে তো।'

রাহুল অবাক চোখে বউয়ের দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, 'বাড়িতে কে তোমার গয়না চুরি করবে?'

'কোনদিন চোরে এসে গ্রাস করবে। তালা ভেঙে করবে। কত লোক তো লকার নেয়, তাদের বাড়িতে কি স্টিলের আলমারি থাকে না? ব্যাঙ্কের কাছে থাকলে নিরাপদ। ওগুলো একবার গেলে তো আর হবে না।'

'ওসব সম্ভাবনা আমাদের বাড়িতে নেই। তুমি অকারণ ভয় পাচ্ছ।'

রাহুল নিচু স্বরে কিন্তু বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো বলে।

টেবিলের উলটোদিকে বসা সহকারী ম্যানেজার চৌকো মোটা চশমার পেছন থেকে ওদের দেখছিলেন। নিচুস্বরে তর্কাতর্কি শুনতে না পেলেও বুঝতে পারছিলেন লকার নেওয়ার ব্যাপারে এই নতুন দম্পতি একমত নয়। অভিজ্ঞ মানুষ, তিনি জীবনে অনেক জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলিয়েছেন, অনেক জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ভাঙতে সাহায্য করেছেন।

হঠাৎ বর্ষা তাঁর দিকে ফিরে জানতে চায়, 'আচ্ছা, লকারে শাড়ি রাখা যায়?'

'না, না।' হেসে উঠলেন তিনি। দুটো হাত ফাঁক করে লকারের আয়তন বোঝাবার চেষ্টা করে বললেন, 'এইটুকু জায়গা। আপনার জুয়েলারি ভ্যালুয়েবলস, মিস্টার মজুমদারের লাইফ ইনসিয়োরেন্স পলিসি ডিপোজিট রিসিট—এইসব রাখা যাবে। এর বেশি কিছু না।'

'থাক গে। পরে দেখা যাবে।'

বিয়ের পরে সকলেই হানিমুনে যায়। বর্ষার দিদি আর সুবোধদা ওয়ালটেয়ার গিয়েছিলেন। সেখানে সমুদ্রের ওপরে, তিনদিক খোলা পামবিচ হোটেলের নাকি তুলনা হয় না। এখনও দিদি তাদের হানিমুনের গল্প করে। এই এগারো দিন শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করে বর্ষা একটা নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে। সেখানে রাহুল তো আছেই, আর যারা আছে, তারাও ওকে খুব আদরযত্ন করছে। শাশুড়ি তো বউমা বলতে অজ্ঞান।

বর্ষা আর একা নয়। এখন ওরা দু'জন। এক-এক সময় ওর মনে হয়, এই পৃথিবীতে মানুষ দু'জন-দু'জন করে জন্মায়। যথাসময়ে তাদের মিলন ঘটে। ওদের শোবার ঘর, সেখানে দু'জনের একটাই বিছানা। সংসার থেকে আলাদা ওদের দু'জনের জন্যে পৃথক বাথরুম। সেখানে সবকিছুই ওদের দু'জনের জন্যে রাখা, তোয়ালে, সাবান, শ্যাম্পু, কেবল টুথব্রাশ ছাড়া। আজ দু'জনের একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হল। এরপর দু'জনের একটি বাচ্চা হবে। না, না, এত তাড়াতাড়ি নয়।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরোবার সময় সি.এন. রক্ষিতের কথাটা মনে পড়ল বর্ষার। তিন হাজার একশো পাঁচ টাকা। নট ব্যাড। হানিমুনের খরচ উঠে আসবে। না, হানিমুন হবে না, ওর বরের ছুটি নেই। আসলে, গুরুজনদের মত নেই। ওঁদের ইচ্ছে, বউমা প্রথম থেকে বুঝুক, বিয়েটা শুধু রাহুলের সঙ্গে হয়নি, বর্ষার বিয়ে হয়েছে গোটা মজুমদার পরিবারের সঙ্গে। এখন ও মজুমদার পরিবারের একজন। কারুর বউমা, কারুর বউদি, কারুর বউ।

তাই হয়তো ঠিক। তবু বর্ষার মনে হল, হানিমুন থেকে ফিরে ওরা যদি ব্যাঙ্কে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে আসত, তবে ওই ছাপা ফর্মে ভুল করে ও বর্ষা মিত্র সইটা করতে পারত না। কিছুতেই পারত না। রাহুল মজুমদারের নীচে গড়গড় করে ও সই করে দিত বর্ষা মজুমদার। সে সই পরে মিলুক আর না মিলুক।

বিয়ের পরে মেয়েরা নতুন পদবি ধারণ করে পুরনো পদবিটা ছেড়ে দেয়। আসলে ওটা নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা পরিত্যাগ করে অপরের সত্তায় নিমজ্জিত হওয়ার প্রতীক। এক অর্থে আত্মবিলোপ। বর্ষার মনে হয় যা হবার তা এগারো দিন আগেই হয়ে গেছে। ওর মিত্র পদবি আর ফিরবে না। অথচ ভাল করে মজুমদার হতে গিয়ে মনের মধ্যে খচ খচ করছে কেন? হানিমুনে গেলে রাহুল ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে মজুমদার করে ছাড়ত ঠিক।

১৯৯২

শহিদ

এক

শুভজিৎ চক্রবর্তীকে আপনি ভুলে গিয়েছিলেন। আমি বেট ফেলে বলতে পারি, গত এক বছরে একবারও তার নাম আপনার মনে পড়েনি। মনে না পড়াই স্বাভাবিক। আপনার বয়স বাড়ছে। বেঁচে থাকলে আজ তার বয়সও ষাটের কাছাকাছি হত।

আজ সকালে সংবাদপত্রের ব্যক্তিগত কলমে তার নাম দেখে আপনি চমকে উঠেছিলেন প্রথমটা। জন্ম, মৃত্যু, স্মরণ—ওপর থেকে নীচে পর পর সাজানো গুটিকয়েক করে বিজ্ঞাপন, তিন লাইন, খুব জোর চার লাইনের এক-একটি। তার নীচে একগুচ্ছ যথার্থ ব্যক্তিগত সংবাদ, যা সাধারণ পাঠক অত্যন্ত আগ্রহ ও কৌতূহলসহকারে পড়ে। প্রেমিক-প্রেমিকা সন্ধাভাষায় কথা বলে ওই কলমে: "মি, তুমি যেখানেই থাকো, ভাল থেকো। র।" কিংবা: "ভা, নতুন সংসারে তুমি সুখী হও, আমি চাই, তবু আমাদের বিয়ের দিনটি অনেক অনেক কথা মনে করিয়ে দেয়। সি।" এই রকম। ওই একটি কি দুটি বাক্যের পেছনে কত গভীর বেদনামাখা কাহিনী লুকোনো থাকে, কেউ জানতে পারে না। ওরা কারা, কোথায় থাকে, কত বয়স ওদের, একটি বিশেষ দিনকে বছরের পর বছর কেন স্মরণ করে যাওয়া, এ সবকিছুই গোপনীয়। দূরবর্তী মানুষটির উদ্দেশে এই বাৎসরিক বিজ্ঞাপনের খবর হয়তো অতি ঘনিষ্ঠজনও জানতে পারে না। পাঠক শুধু অনুমান করে, পৃথিবীর কোণে কোথাও একটি ব্যর্থ জীবন টিমটিম করে জ্বলছে। কিছু না জেনেই পাঠক বিজ্ঞাপনদাতা সম্পর্কে হয়তো একটা অকরুণ ধারণা তৈরি করে বসে: লোকটা অপদার্থ; বিয়েলিটিকে স্বীকার করে নেওয়ার মতো মনের জোর নেই। স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চায়।

এ ছাড়া, অপেক্ষাকৃত কম ব্যক্তিগত সংবাদও ছাপা হয় ওই কলমে। যেমন, ডাক্তারদের বিদেশযাত্রা—পেশেন্টদের জানানো, কতদিন চেম্বার বন্ধ থাকবে; পুরনো আসবাবপত্র কেনাবেচা, নাচগানের ক্লাস, স্কুল-কলেজে পুরনো ছাত্রছাত্রীদেব সমাবেশ—অমুক টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করো।

নামটা চেনা চেনা। আবার কোন শুভজিৎ চক্রবর্তী মারা গেল রে বাবা, আপনি ভেবেছিলেন। তারপর পাখার হাওয়া থেকে সরে গিয়ে, কাগজটা ঠিকমতো ভাঁজ করে পড়তে গিয়ে দেখলেন, না, ওটা মৃত্যু সংবাদ নয়, স্মরণ সংবাদ। "আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এই দিনটিতে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছ অমরলোকে।" পরিবারবর্গ এর পরে আর একটি বাক্য জুড়ে জানাতে পারত, "তোমাকে আমরা ভুলে যাইনি।" হয়তো আগের বছরগুলিতে জানিয়েছে, আপনি ভুলে গেছেন বা লক্ষ করেননি। এবারে বিজ্ঞাপনে জানিয়েছে, "তোমার সাহস আমাদের সর্বক্ষণের প্রেরণা।"

আপনার আর সন্দেহ রইল না, এ সেই শুভজিৎ। কলকাতা আর্মড পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, এস চক্রবর্তী, দুর্বৃত্তদের হাতে যে খুন হয়েছিল। আজ পাঁচ বছর পর সেই দুর্ঘটনার অনুপুঙ্খ আর আপনার মনে পড়ে না। আবছাভাবে স্মরণ হয় যে, সেই দুর্ঘটনার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এস চক্রবর্তী এবং তার পরিবার সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছিল। বড় হরফ থেকে ক্রমশ ছোট হরফে, কিন্তু প্রথম পাতায়। তার পরও পাঁচের পাতায় কিছুদিন থেকেছে। আর একটি বড় ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় ওরা মিলিয়ে যায়। তবু, মাঝে মাঝে ছোট শিরোনামে চার-পাঁচ লাইনের সংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছিল অসম সাহসী আপনার সেই বন্ধুটির কথা, তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে নানা প্রকার আশ্বাস ও সাহায্যদানের কথা, অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি পাওয়ার খবর।

নৃশংস হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার অপরাধে বেশ কিছু দাগি সমাজবিরোধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কারও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়নি। ঘটনার পেছনে চক্রান্ত একটা ছিল, খবর পড়ে প্রায়ই মনে হয়েছে আপনার। অবশেষে বাইশ মাস পরেও যখন খুনিকে সংশয়াতীতভাবে শনাক্ত করা গেল না, সুতরাং কারও ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল না, উপরন্তু আপনি দেখলেন, গুন্ডামি ও শান্তি ভঙ্গের অপরাধে তিনজন না চারজন অপরাধী অল্পবিস্তর দণ্ডাজ্ঞা লাভ করে নিষ্কৃতি পেয়েছে, তখন আপনি হতাশ হয়েছিলেন। আপনার মনে হয়েছিল, ছি-ছি, শুভজিতের সাহসিকতা কি হঠকারিতার নামান্তর

ছিল না? জীবনের ঝুঁকি কতদূর পর্যন্ত নেওয়া সঙ্গত? কর্তব্যের আহ্বানে কত গভীর বিপদের মধ্যে প্রবেশ করা উচিত? জেনে শুনে মৃত্যুর মুখে ঢুকে গিয়ে কী লাভ? কার লাভ?

কার লাভ, সে বিষয়ে না হয় পরে আলোচনা করা যাবে। মৃত্যুর মুখে ঢুকে গেলে একমাত্র প্রাপ্তি মৃত্যু, সে তো আপনি দেখেছিলেন। শুভজিতের মৃত্যু ছিল অস্বাভাবিক এবং নৃশংস যদিও সে নিরস্ত্র ছিল না। লোকে অবশ্য বলে, সব মৃত্যুরই একটা যন্ত্রণা আছে। কেউ অল্পক্ষণ সে যন্ত্রণা ভোগ করে, কেউ দীর্ঘকাল। অল্পক্ষণের মৃত্যু যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্র। তীব্র, কেননা তার আকস্মিকতা মানুষকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে না। দীর্ঘকালের রোগভোগ মানুষকে, মানুষের মনকে জীবন থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে জীবনের প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা তখন এক আনুষ্ঠানিক ঘটনা মাত্র। আত্মীয়স্বজন অবধি প্রস্তুত থাকে, অপেক্ষা করে। লোকে বলে, যে গেল, সে তো চলে গিয়ে বাঁচল, যাদের অনাথ করে রেখে গেল, তাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখো। সেটা কথাব কথা।

এ-ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল বাস্তবিক শোচনীয়।

শুভজিতের স্ত্রী নয়নতারার বয়স তখন ছেচল্লিশ। তাই না? ফরসা, রোগা-পাতলা মানুষ। জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের স্ত্রী, সুতরাং নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু গড়ে ওঠেনি তার। স্বামী যেভাবে চালিয়েছে, নয়নতারা সেভাবে চলেছে। ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, চল্লিশ ইঞ্চি ছাতির একজন পুরুষমানুষের সামনে সে ছিল একটা অসহায় পাখি। তার স্বামীর দুই বাহু ছিল দুই বিশাল ডানার মতো। সেই ডানার আড়ালে, সেই ডানার ছায়ায় নয়নতারার সংসার ছিল নীড়ের মতোই নিবিড়। মাঝখান থেকে হঠাৎ সেই মানুষটাই উবে গেল একদিন।

দিনটা ছিল সাতাশে জুলাই। মনে পড়ে?

আর্মড পুলিশের নায়ক এস চক্রবর্তীর পোস্টিং তখন সেই বিচিত্র বন্দর এলাকায়। হেড কোয়ার্টার্স থেকে তাকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সমাজবিরোধী দমনের। জায়গাটা বরাববই গোলমেলে। চোরাচালানকারীদের ঘাঁটি। একটা গোটা বাজারই রয়েছে বিদেশি পণ্যের—শুল্ক ফাঁকি দেওয়া যাবতীয় ভোগ্যপণ্য সেখানে উজ্জ্বল আলোর নীচে হেঁকে বিক্রি হয়। ইলেকট্রনিক ঘড়ি, স্টিরিয়ো, টেপবেকর্ডার, এমনকী রঙিন টিভি পর্যন্ত। বিদেশি পোশাক, পারফিউম, লাগেজ, মদ, সিগারেট—কী নেই। এইসব তো প্রকাশ্যে দেওয়া নেওয়া চলে, পুলিশের চোখের সামনে। তা ছাড়া গোপনে চলে বিবিধ মাদকদ্রব্য, নিষিদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্র ও নারীদেহের বাণিজ্য। অবাধ টাকার খেলা থেকে স্বাভাবিকভাবে এসেছে অপরাধ প্রবণতা, নিত্য খুনজখম, বোমাবাজি। অপরাধীদের পারস্পরিক ক্ষমতার লড়াই। ওই অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সন্ধের পরে বাইরে বেরোনো বিপজ্জনক হয়েছে কেননা স্থানীয় গুন্ডা-মস্তানরা বেপরোয়া, তারা প্রশাসনকে গ্রাহ্য করে না। তারা মনে করে, টাকা দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু কিনে ফেলা যায়। তারা জঙ্গলের আইনকানুন সেখানে চালু করতে চাইছিল তখন।

মুখ্যমন্ত্রী বারংবার অকর্মণ্যতার নিন্দা করছিলেন। ওই চোরাচালানের গোপন ও অনিয়ন্ত্রিত সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে যদি বিদেশ থেকে মারণাস্ত্র আসতেই থাকে, সে-পথ বন্ধ করা না যায়, তবে এ-রাজ্যে আবাব সন্ত্রাস শুরু হয়ে যাবে, মুখ্যমন্ত্রী সাবধান করে দিচ্ছিলেন. এ-আপদ অবিলম্বে নির্মূল করা চাই।

কলকাতা পুলিশ কমিশনার পরপর দু'দিন মিটিং করলেন। হীন ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজন অফিসার স্থানান্তরিত হলেন কিন্তু পরিবর্তে দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা এলেন, তাঁরাও অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারলেন না। এসবের পেছনে দুর্বৃত্তরা একা নয়, রাজনৈতিক কোনও কোনও নেতার পরোক্ষ সমর্থন বা উসকানি থাকতে পারে বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করলেন। এমন কোনও তথ্য-প্রমাণ তাঁরা হস্তগত করতে পারেননি অবশ্য, যার জোরে সে অসহ্য অবস্থার মোকাবিলা করা যায়।

এমতাবস্থায় শুভজিৎ চক্রবর্তীর ওপর বিশেষ দায়িত্ব পড়ল স্থানীয় পুলিশকে সাহায্য করার। প্রতিদিন দুটি-একটি করে গুম খুন হচ্ছে রহস্যজনকভাবে। মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে ড্রেনের মধ্যে, পুকুরের জলে, আবর্জনা স্তূপের ওপর পুঁটুলি-বাঁধা অবস্থায়। বিকৃত, বিচ্ছিন্ন সব মৃতদেহ শনাক্ত করা অসাধ্য। তার সঙ্গে দেওয়া হল নিজস্ব সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। যে-কোনও সময়ে যে-কোনও ঘরবাড়ি আস্তানা সার্চ করার অধিকার, বিচারসাপেক্ষ গ্রেপ্তার করার বিশেষ ক্ষমতা। ক্রিমিনালদের শায়েস্তা করতেই হবে।

প্রতিপক্ষ কি নিজেদের মধ্যে মিটিং করেনি? অবশ্যই করেছে। আসল যে চাঁই অর্থাৎ চোরাচালান থেকে মোটা মুনাফা যে লোটে; সে একজন অদৃশ্য ব্যক্তি। ঈশ্বরের মতো অন্তর্যামী। খোঁজ করলে দেখা

যাবে, সে একজন ধর্মভীরু, নিরামিষাশী বয়স্ক মানুষ। মদ খায় না, সিগারেট খায় না। স্ত্রীর অনুগত। তার একমাত্র লক্ষ, টাকা লগ্নি করে টাকা উপার্জন করা। সোজা পথে এক হাজার টাকা খাটালে বছরে একশো থেকে দেড়শো টাকা আয় হয়। ব্যবসা করলে হয়তো আর একটু বেশি। তার চাহিদা আরও অনেক বেশি। আরও অনেক বেশি তার মূলধন। সে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। ঝুঁকির মাত্রা বৃদ্ধি পেলে উপার্জনের হার সমপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতি—কোনও বোধই তার নেই। নেই মানে এ-সব দুর্বলতা সে কাটিয়ে উঠেছে। এখন কোনও একটা অপারেশনে দশ লাখ টাকা রোজগার হলে তার নাড়ির স্পন্দন আশি থেকে হয়তো পঁচাশিতে উঠে যায়। দশ লাখ টাকা ডুবে গেলে পেটের আলসার থেকে দশ ফোঁটা রক্ত পড়ে হয়তো। ব্যস, এইমাত্র। অপারেশনের পর অপারেশন চলতে থাকে।

অপারেশন চক্রবর্তী যারা পরিচালনা করেছিল, যারা কার্যকর করেছিল, তারা ওই অন্তর্যামীর ঠিকেদার বা ঠিকেদারের ভৃত্য। একটি সুশৃঙ্খল, কর্মদক্ষ, দাগি অপরাধীর দল। কোনও কর্মই তাদের কাছে দুরূহ নয়। ডাকাতি, লুঠ, খুন, শিশুহরণ বা নারীধর্ষণ—সবকিছু অবলীলায়, বিবেকদংশন ছাড়া ঘটাতে পারে। এক-একটা কাজ এক-একটা টাস্ক। যেমন যেমন টাস্ক, তেমন তেমন অপারেটর। একটা সুগঠিত দল, কিন্তু দলের অনেকেই হয়তো পরস্পরকে চেনে না। চিনলেও বিশ্বাস করে না। অথচ বিশ্বাসই অপরাধ জগতের মেরুদণ্ড। বিশ্বাসভঙ্গের দণ্ড মৃত্যু।"

কাগজে বেরিয়েছিল, সেই দুর্ঘটনার আগে একদিন একজন হালকা নীল সাফারি স্যুট-পরা ভদ্রলোক শুভজিতের আপিসে এসে দেখা করে। কথায় কথায় শুভজিৎকে সরে দাঁড়াবার পরামর্শ দেয় সে। মনে পড়ে?

শুভজিৎ বলেছিল, "আপনার কী স্বার্থ?"

"কিছু না। আপনার শুভার্থী হিসেবে বললাম।"

শুভজিৎ বলেছিল, "ওই ভিমরুলের চাক আমি ভাঙবই।"

"কিছু লোক করে খাচ্ছে, ভেঙে আপনার কী লাভ?"

"আমার কর্তব্য। লোকে নানাভাবে করে খায়। সবগুলোকে জীবিকা বা বৃত্তি বলা যায় কি?"

"এত বড় কলকাতা শহরকে আপনি ক্রাইম-ফ্রি করতে পারবেন? কেউ পারবে? পারবে না। কেন শুধু শুধু ঢিল মেরে, আপনি যাদের ভিমরুল বলছেন, তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া? ওদের হিংস্র করে তোলা?"

শুভজিৎ বলেছিল, "আমি ওদের শায়েস্তা করে ছাড়ব।"

হালকা নীল সাফারি স্যুট-পরা লোকটি যাবার সময় করমর্দন করেছিল শুভজিতের সঙ্গে।

"আপনার সাহসের ও সততার তারিফ করি," ও বলেছিল, "উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।"

আর একদিন রাত্রে টেলিফোনে নেশাজড়িত এক মহিলাকণ্ঠ ভিমরুলের চাক নয়, অন্য এক উপমা প্রয়োগ করে শুভজিৎকে সাবধান করতে চায়।

"আপনি সাপের গর্তে পা দিতে চলেছেন মিস্টার। ভাল চান তো এখনও সরে দাঁড়ান। ছাপোষা সংসারী মানুষ, কেন বালবাচ্চাকে বিপদে ফেলবেন।"

গোয়েন্দা গল্পে এই রকম ঘটনার উল্লেখ থাকে আকছার। সত্যসন্ধানী কেউ এইসব সাবধানবাণীর তোয়াক্কা করে না। তাতে গল্পের রোমাঞ্চ বাড়ে। আসন্ন যুদ্ধের ইঙ্গিত পেয়ে পাঠকের উৎকণ্ঠা কণ্ঠা-অবধি উঠে আসে। এরা চক্রের কেউ না। ছোটমাপের এক-একটি চর। ঘাঁটির নির্দেশমতো কাজটুকু করে এদের দায়িত্ব শেষ। দুষ্টচক্রের বিপদ যত ঘনিয়ে আসে গোয়েন্দা গল্পের সূত্র অনুযায়ী, তত ঘন ঘন দুষ্টচক্র থেকে ওয়ার্নিং যায়। শেষপর্যন্ত গোয়েন্দাগল্পে অবশ্য ধর্মেরই জয়, যা শুভজিতের ভাগ্যে ঘটেনি। তার নিয়তি তার নামকে ব্যঙ্গ করে পার পেয়ে গেল।

ঘটনার তারিখ সাতাশে জুলাই। তার আগের দিন অর্থাৎ ছাব্বিশে জুলাই শুভজিৎ নাকি বাড়ি ফিরেছিল রাত সাড়ে ন'টায়। হেড কোয়ার্টার্সে মিটিং ছিল। খানাপিনাও ছিল হয়তো, কেননা রাত্রে ও খাবার খায়নি। একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে দুটি একটি কথা যা হয়েছিল তা নাকি এই রকম।

"জালটা আমি প্রায় গুটিয়ে এনেছি, জানো। দু'-একটা রাঘব বোয়াল উঠতে পারে।"

"আর কতদিন এই টেনশন চলবে?" নয়নতারা জিজ্ঞেস করেছিল, "এবার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলো।"

"কবব, করব। সব জিনিসের একটা নিজস্ব লগ্ন থাকে, সেই লগ্ন আসতে আর দেরি নেই।"

"ভয়ের কিছু নেই তো, হ্যাঁগো? তুমি বডিগার্ড ছাড়া কোথাও বেরোও না তো? দেখো, খুব সাবধান।" নয়নতারা তাব স্ত্রীসুলভ উদ্বেগ জানায়।

হো হো করে হেসে উড়িয়ে দেয় শুভজিৎ।

পরে এক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিনিধিকে নাকি নয়নতারা বলেছিল, "আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, হাসতে গিয়ে ওঁর গলা একটু কাঁপল। ভয় পাবার মানুষ তিনি ছিলেন না কোনওদিন, অথচ কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। একবার জিজ্ঞেস করলেন, মিতা, মানে আমাদের মেয়ে কি শুয়ে পড়েছে, আমি বললাম, না, পড়ছে ও-ঘরে। জানতে চাইলেন, সোমেশ, আমাদের ছোট ছেলে—কানপুরে আই.আই.টি-তে পড়ে—তার চিঠি পেয়েছি কিনা। তো আমি বললাম, আজই পেয়েছি, ভাল আছে। আর কোনও কথা হয়নি।"

এতক্ষণে আশা করি, সাতাশে জুলাইয়ের ঘটনার কথা আপনার মনে পড়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সেই কাহিনীর একটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য আকৃতি আপনার স্মরণে থাকার কথা। অন্তত এতক্ষণে মনে পড়ে যাওয়ার কথা। যাক গে, অল্পকথায় জানিয়ে দিচ্ছি।

আগের দিন বেশি রাত্রে বৃষ্টি হযেছিল। ভোর নাগাদ আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়, বর্ষাকালে যতখানি পরিষ্কাব হওয়া সম্ভব আর কী। ওই দিন শেষবাত্রে এক কুখ্যাত বস্তিতে পুলিশবাহিনী হানা দেয়। ওই হল হানা দেবার প্রকৃষ্ট সময় কারণ যত বড় দুর্বৃত্তই হোক, শয়তানই হোক, তার রাতের কুকীর্তি ও ফুর্তি সেরে ওই সময়টা ক্লান্ত হয়ে ঘুমোয়। কেউ বেশ্যাবাড়িতে শুয়ে ঘুমোয়, কেউ চোলাই মদের আখড়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে, কেউ বা তার চোরাই মালের গুদামে ফার্মাকল পেতে নিদ্রা দেয়। এই হানার পরিকল্পনা স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের কেউ জানত না আগে, সুতরাং খবর পাচার হতে পারেনি।

পুলিশভ্যান ভরতি করে বহুমূল্য সব বিদেশি দ্রব্য সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেপ্তার করে তোলা হয় জনা পনেরো সন্দেহজনক ব্যক্তিকে। ভোরবেলা যখন আকাশে আলো দেখা দিল, তখন রাস্তার ও গলির মোড়ে মোড়ে, চায়ের দোকানের সামনে জটলা। নিচুস্বরে কথাবার্তা হচ্ছে। পাড়ায় ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে পুলিশের গাড়ি। মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে কালো ভ্যান।

পুলিশের গাড়ি লক্ষ করে প্রথম বোমা পড়ল পশ্চিম দিক থেকে—তখন বেলা প্রায় দশটা। রবিবার বলে রাস্তায় আপিসযাত্রীর ভিড় ছিল না। উত্তর দিক থেকে বোমা ও পটকা পড়া শুরু হল তার আধঘণ্টা পরে। পুলিশ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আক্রমণের মোকাবিলা করে। খণ্ডযুদ্ধ চলতেই থাকে কিছুক্ষণ পর পর। তাড়া করলে গলির মধ্যে ঢুকে হারিয়ে যায় দুর্বৃত্তের দল। আবার খানিক পর রাস্তায় এসে উঁকি দেয়। সোডার বোতল ছোড়ে। এই ওদের কৌশল।

নিজস্ব বাহিনী ও দেহরক্ষীসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হল শুভজিৎ চক্রবর্তী—তখন সোয়া এগারোটা। টিয়ার গ্যাস ফাটল এন্তার। সমস্ত অঞ্চল উত্তেজনায় থমথম করছে। দুর্বৃত্তদের বন্দুকের গুলিতে একজন পুলিশ গুরুতর আহত হবার পর ফায়ার করার হুকুম দেয় চক্রবর্তী এবং নিজেও রিভলভার তুলে এগিয়ে যায়। পৌনে বারোটার সময় তাকে আর ঘটনাস্থলে দেখা যায় না। আসলে রক্ষীদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ও একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, একজনের কোমর লক্ষ করে গুলিও করেছিল, তারপর হঠাৎ বস্তির মধ্যে ওত পেতে লুকিয়ে থাকা একটা দল ওকে পেছন থেকে ধরে ফেলে। ওর রক্ষীকেও ধরে ফেলে। এভাবে একটা ফাঁদ পাতা থাকতে পারে গলিটার মধ্যে মুহূর্তের উত্তেজনায় চক্রবর্তী তা ভুলে যায়।

সারাদিন ধরে চিরুনি অভিযান চালাবার পর সন্ধে নাগাদ শুভজিৎ চক্রবর্তীর বিকৃত, ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ বস্তির মধ্যেকার একটা মজা পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, মনে পড়ে আপনার? চোখদুটো ওপড়ানো। না, কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে গেলে-দেওয়া নয়, নিপুণভাবে যেন চামচ দিয়ে তুলে নেওয়া। পুরুষাঙ্গ বিচ্ছিন্ন। হাতের দশটা আঙুলের মধ্যে ডানহাতের সবক'টা আর বাঁ হাতের তিনটে কুপিয়ে কাটা। পুলিশের সন্দেহ, পেশাদার কসাইকে দিয়ে এই কাজ করানো হয়েছে একটি একটি করে। অষ্টম আঙুলটি ছেদনের পর সম্ভবত শুভজিৎ আর বেঁচে থাকতে পারেনি, তাই ওরা সেখানেই কাজ বন্ধ

করেছে। যে বীভৎস নৃশংসতা দুর্বৃত্তদের অভীষ্ট ছিল, তা সিদ্ধ হতেই ওরা মৃতদেহটিকে জলে ফেলে পালিয়েছে। ওর দেহরক্ষী শিউপ্রসাদ—সে-ও রক্ষা পায়নি, তবে পুলিশের অনুমান, তাকে পীড়ন করা হয়নি। কণ্ঠনালির ওপর এক ছুরির টানে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। ওরা বলে, হালাল।

আজ পাঁচ বছর পর যে-জায়গাটায় দুঃসাহসী বীর শুভজিৎ চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়েছিল বা, আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, যেখান থেকে তার ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়, সেখানে কোনও স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। করার কথাও নয়। এই বিস্তীর্ণ ঘিঞ্জি শ্রমজীবী এলাকার জীবনযাত্রা আগে যেমন চলত, এখন পাঁচ বছর পর তেমনই চলছে। নিরীহ, সাধারণ খেটে-খাওয়া শ্রমিকদের সঙ্গে বসবাস করছে গুন্ডা, বদমায়েশ দুর্বৃত্তদের দল। চোরাচালান অপ্রতিহত। স্থানীয় পুলিশ নির্বিকার। শহিদ শুভজিতের মৃত্যুর ফলে শুভবুদ্ধির জয় হয়নি। সুতরাং সামান্য একটা স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করে কী হবে সেখানে। গোরু বা ছাগল বাঁধার খুঁটি হিসেবে স্তম্ভটাকে ব্যবহার করবে ওরা।

তবে কি শুভজিতের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ব্যর্থ হয়েছে? এই প্রশ্ন আপনার মনে জেগেছে। সংশয় নিরসনের জন্য আপনাকে প্রথমেই বলে রাখি, না, ব্যর্থ হয়নি।

দুই

মিসেস চক্রবর্তী অর্থাৎ নয়নতারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুলিশ কমিশনার গভীর শোক প্রকাশ কবেছিলেন। বলেছিলেন, "চক্রবর্তীব কর্তব্যনিষ্ঠা ও অসমসাহসিকতা চিরকাল আমাদের আদর্শ হয়ে থাকবে। ও আমাদের গর্ব। এ মৃত্যু যথার্থ বীরের মৃত্যু।" তার মৃত্যুর ফলে তার পরিবারের যে শোচনীয় ক্ষতি হল, তা হয়তো পুরণ করা যাবে না, তবে চক্রবর্তীর অবর্তমানে তার স্ত্রী-পুত্রকন্যা যাতে কোনওপ্রকার আর্থিক সংকটে না পড়ে, তিনি দেখবেন। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এসে সমবেদনা জ্ঞাপন কবেছিলেন। আমরা সে-সব ছবি ও সংবাদ পত্রপত্রিকায় দেখেছি, মনে পড়ে? দিল্লির এক বিখ্যাত ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকার তরফ থেকে বিশেষ প্রতিনিধি এবং ফোটোগ্রাফার কলকাতায় এসে সাতদিন পার্ক হোটেলে থেকে সেই ঘটনার যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছিল। শুধু সংগ্রহ নয়, অনেক নতুন তথ্য তাবা আবিষ্কার করে। চক্রবর্তী হত্যার গোপন ষড়যন্ত্রের খবর তারাই প্রকাশ করে প্রথম। তাদের পত্রিকার কভার স্টোরির সঙ্গে প্রথম প্রকাশিত হয় শুভজিতের ছিন্নভিন্ন নগ্ন শবদেহের অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী রঙিন ছবি। বীভৎস সে ছবি দেখে দেশের জনসাধারণ হাহাকার করেছিল। তিন টাকা দামের পত্রিকার সেই সংখ্যাটি দশ টাকায় বিক্রি হয়েছিল বাজারে। আবেগ ও অনুশোচনা থেকে করুণার উদ্রেক হয়। করুণা জাগ্রত হলে মানুষ উদার হতে পারে।

প্রশাসন ও জনসাধারণের উদারতা দেখে, ক্ষতিপূরণের চেষ্টা ও আন্তরিকতা দেখে শোকাতুর নয়নতারা এবং সদ্য পিতৃহারা তার তিন সন্তান হতভম্ব। প্রতিদিন সত্তর-আশিটি করে চিঠি। সকাল থেকে সন্ধে অবধি আত্মীয়বন্ধু, প্রতিবেশী ও শুভজিতের সহকর্মীদের ভিড়। তারা সান্ত্বনা দিতে আসে, শোক ভোলাতে আসে। তারা সর্বক্ষণ প্রয়াত শুভজিৎ চক্রবর্তীর সততা ও সাহসিকতার স্মৃতিচারণ করে। বাল্যকাল থেকে নাকি সে ছিল বেপরোয়া। সে কখনও কোনও প্রকার অন্যায় সহ্য করত না। একদা স্কুলের সহপাঠী জনৈক অমূল্যভূষণ প্রামাণিক একদিন একটি অশ্রুতপূর্ব কাহিনী বর্ণনা করলেন।

মিত্র ইনস্টিটিউশনে ক্লাস এইটে পড়ার সময় একদিন বাংলার পণ্ডিতমশাই নাকি প্রশ্ন করেছিলেন ছাত্রদের, "আচ্ছা, বলো তো, যার বাবা মারা গেছে, তাকে এককথায় কী বলবে?"

কেউ কিছু বলছে না দেখে শুভজিৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, "নির্বাপিত।"

পণ্ডিতমশাই খেপে উঠেছিলেন রাগে।

"নির্বাপিত মানে তাই? ওইভাবে সন্ধি হয়?"

শুভজিৎ নাকি বলেছিল, "কেন, হবে না স্যার?" যদি 'বাপান্ত' শব্দ বাংলায় শুদ্ধ হয়, তবে 'নির্বাপিত' হবে না কেন?"

সদুত্তর দিতে না পেরে পণ্ডিতমশাই ওকে বেত মেরেছিলেন। শুভজিৎ মার খেতে খেতে বলেছে, "আমি ভুল বলিনি স্যার আমি ঠিক বলেছি।" এই রকম ছিল তার জিদ।

অমূল্যভূষণকথিত এই কাহিনী মিতা, সোমেশ বা তাদের দাদা প্রাণেশ—কেউ ইতিপূর্বে শোনেনি। খুব একটা গৌরবজ্ঞাপক কাহিনীও এটা নয়। সদ্য শোকাহত পুত্রকন্যাদের সামনে বলার উপযুক্ত তো নয়ই। কাহিনীটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও ওদের কল্পনায় একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। বাবা মার খাচ্ছে আর বলে যাচ্ছে, সে যা করেছে তা ঠিক। গুন্ডারা যখন কসাইয়ের ছুরি দিয়ে বাবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটা একটা করে কুপিয়ে কেটেছে আর কদর্য হাসি হেসে জিজ্ঞেস করেছে, কী সাহেব, এখন কেমন লাগছে তখনও বাবা হয়তো এই কথাই বলে গেছে বার বার। আমি যা করেছি তা ঠিক, তা ন্যায়সঙ্গত। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত অবধি বলে গেছে। উঃ, কী ভীষণ সে-দৃশ্য। গল্প শুনে মিতা হাউহাউ করে কেঁদেই ফেলল।

কোনও-না-কোনও পত্রিকার সংবাদদাতা বাইরের ঘরে বসেই থাকে সারাদিন। কয়েকদিন পর অমূল্যভূষণের এই কাহিনী ও শুভজিতের সন্তানদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া সংবাদরূপে প্রকাশিত হয়। একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় সরকারি সিদ্ধান্তের ঘোষণা যে, আগামী সাত বছর অর্থাৎ শুভজিৎ চক্রবর্তী বেঁচে থাকলে যতদিন পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থাকত, ততদিন পুলিশ বিভাগ তার বেতন তার স্ত্রীকে দিয়ে যাবে। স্ত্রী অবর্তমানে তাব তিন পুত্রকন্যা সমানভাগে সেই টাকা পাবার অধিকারী থাকবে। তার মানে, বেঁচে থাকলে সে যেদিন অবসর গ্রহণ করত, সেদিন অবধি তাকে ডিউটিতে বহাল আছে ধরে নেওয়া হবে। যুগপৎ বেদনা ও কৃতজ্ঞতা—এই দুই আবেগের সংঘর্ষে নয়নতারা অভিভূত হয়ে পড়বে, তাতে আর আশ্চর্য কী। তার মনে পড়ে, অনেকদিন আগে চাসনালা খনি-দুর্ঘটনার সময়ে এই রকম এক সরকারি ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল। গভীর কয়লাখনির মধ্যে অন্ধকারে জলমগ্ন শ্রমিকদেব কারও গলিত মৃতদেহ যতদিন পর্যন্ত না ওপরে তুলে এনে শনাক্ত করা গেছে ততদিন পর্যন্ত ধরে নেওয়া হয় সে ডিউটিতে বহাল আছে। ডিউটি শব্দের অর্থ এত নির্মম হয়।

আসলে তো ডিউটিতে সে থাকে না। তার শূন্যস্থান পূবণ করতে নতুন লোক আসে। একজন সিনিয়ার ও সি থার্ড ব্যাটেলিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনাব পদে উন্নীত হয়েছিল যথানিয়মে। তাকে কোয়ার্টার দিতে হবে। তা হলে নিহত চক্রবর্তীর পরিবার যাবে কোথায়? সংবাদপত্রে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হবার পূর্বমুহূর্তে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, আলিপুর আবাসনে একটি তিন কামরার ফ্ল্যাট নিহত চক্রবর্তীর স্ত্রী ও পরিবারকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি থেকে ফিরলেই এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফ্ল্যাটের দলিলপত্র শ্রীমতী নয়নতারা চক্রবর্তীকে সমর্পণ কবা হবে। জনসাধারণ ধন্য ধন্য করতে লাগল। এই না হলে গণতন্ত্র। পূর্তমন্ত্রী যে-রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, সেই দলের ভাবমূর্তি রাতারাতি আলোকিত হয়ে গেল এই সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত মুখ্যমন্ত্রীব সৌম্যমূর্তির পাশে দাঁড়ানো বিধবা নয়নতারার বিষণ্ণ অথচ লাবণ্যমণ্ডিত মূর্তিটি আমরা সমস্ত দৈনিকপত্রে দেখেছিলাম, মনে পড়ে? কোথাও প্রথম পৃষ্ঠায় কোথাও পঞ্চম পৃষ্ঠায়। কোথাও তিন কলম চওড়া, কোথাও দুই কলম। এই সংবাদটি, দুর্ঘটনার দেড়মাস পরে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ অগ্রাহ্য করতে পারেনি।

নয়নতারার বাপেব বাড়ির তরফে এক বড় ভাই ছাড়া আব কেউ জীবিত ছিলেন না। তিনি এলাহাবাদ প্রবাসী এবং অশক্ত। সুতরাং সংকটের দিনগুলিতে তিনি ছোট বোনের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেননি। শুভজিতের মৃত্যুর খবর কাগজে পড়ে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই বিপদে তিনি উপস্থিত থাকতে না পেরে শান্তি পাচ্ছিলেন না। নয়নকে তিনি যেমন চেনেন, তার চেয়ে বেশি কে চিনবে? সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি ওর ক্লাস টেনের মেয়ের চেয়ে অধিক প্রখর নয়। জীবনসংগ্রাম বলতে কী বোঝায় সে জানে না। প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে মানসিক ভারসাম্য যে হারাতে নেই, কে শেখাবে ওকে? উপর্যুপরি চিঠি এবং টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তিনি নয়নকে সংকট কাটিয়ে ওঠার সাহস জোগাচ্ছিলেন। ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। প্রাণেশ ও সোমেশ—দেখতে হয়তো সাবালক, কিন্তু ওদের কোনও কাণ্ডজ্ঞান কি তৈরি হয়েছে? হয়নি। চিরকাল ওরা বাপের মুখাপেক্ষী। বাবা অধ্যাপনা করতে বলেছে, তাই বড়জন অধ্যাপনা করে টাকি কলেজে। বাবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পরামর্শ দিয়েছে তাই ছোটজন কানপুরে ভরতি হল। মিতার বয়স মাত্র পনেরো, তাকে তখন দেখে কে তার ঠিক নেই। মৃত স্বামীর জন্য শোকে আত্মহারা না হয়ে, শোক ঝেড়ে ফেলে, নয়নকেই উঠে দাঁড়াতে হবে। ও তো মা।

আলিপুর আবাসনে উঠে যাবার দিন পনেরো পর ভদ্রলোক আর থাকতে না পেরে চলে এলেন

কলকাতায়। অশক্ত শরীর নিয়েই বোনকে দেখতে এলেন। আর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারছিলেন না বীরেশ্বর।

নয়নতারা প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বীরেশ্বর সশব্দে কেঁদে উঠলেন। বললেন, "তোকে এই বেশ কে পরাল হারামজাদি?"

নয়নতারা বলে, "আমার ভাগ্য।"

ছড়ি-ধরা বীরেশ্বরের ডান হাতখানা থরথর করে কাঁপছিল। চশমার আড়ালে তাঁর প্রকাণ্ড বড় ছানি কাটানো চোখদুটো ভেসে যাচ্ছিল জলে। এই অবস্থা দেখে সোমেশ ছুটে গিয়ে একখানা চেয়ার এনে তাঁকে বসিয়ে দেয়। আর একটু হলে পড়ে যেতেন।

"আমি কি মরে গেছি? কী ভেবেছিস তুই, আমিও কি মবে গেছি? তুই যা খুশি তাই করবি?"

প্রাণেশ তাঁর কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, "আমরা অনেকবার মাকে বলেছি, ও-সব পুরনো রীতি, পুরনো সংস্কার, আজকাল কেউ মানে না। কোনওক্রমেই মাকে বোঝানো গেল না।"

এ-কথায় কর্ণপাত করেননি বীরেশ্বব।

বলেছিলেন, "আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। দূর হ পোড়াবমুখি।"

ছড়ি ঠুকে বলেছিলেন, "আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ব না। আমাব কথা যদি না শুনিস, তবে এইখানে হত্যা দিয়ে আমি মরে যাব। জলস্পর্শ করব না তোর বাড়িতে।"

সেদিন সারাদিন নয়নতারা বিছানায় শুয়ে কেঁদেছে। বালিশ ভিজিয়েছে চোখের জলে। আর জেদি বৃদ্ধ বীরেশ্বর ঠায় বসে থেকেছেন বাইরের ঘরের চেয়ারটায়। ছেলেমেযেরা এই দৃশ্য দেখতে পারেনি। সবে গেছে। চলে গেছে অন্যত্র। ভেবেছে, বড়মামা যখন এসে পড়েছেন, হেস্তনেস্ত একটা হবেই।

সন্ধের পর ওরা বাড়ি ফিবে দেখে, খাবার টেবিলে বড়মামার পাশে মা। মায়ের পরনে সবুজপাড় শাড়ি, মাথায় ঘোমটা নেই। আর বড়মামা নিজের পাত থেকে তুলে মাকে মাছ দিয়ে মেখে ভাত খাওয়াচ্ছে। পাথরের মতো বসে আছে নয়নতারা, ঝরঝর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে তার ফরসা শুকনো দুটি গাল বেয়ে অনর্গল। মোছার চেষ্টা করছে না। সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ।

যতই অশক্ত হোন, বীরেশ্বরের ব্যক্তিত্ব প্রবল। তিনি আসার ফলে বাড়ির আবহাওয়া খানিকটা স্বাভাবিক হতে পারল।

এদিকে শিক্ষাদপ্তর থেকে একজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি এসে জানিয়ে গেছেন যে, রাজ্যসরকার প্রাণেশকে কলকাতায় বদলি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন এবং এখন থেকে মিতার পড়াশোনার কোনও খরচ লাগবে না। সোমেশ ফিরে গেছে কানপুবে। দীর্ঘদিন কলেজ কামাই হয়েছে ওর তবে ক্লাস প্রমোশন পেতে অসুবিধে হবে না। আর, দু'বছর পর ওর ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেলে ও যাতে সরাসরি সরকারি ওয়র্কশপে চাকরি পায়, তার প্রতিশ্রুতি পৌঁছেছে নয়নতারার কাছে। ওর দিক থেকে অবশ্য কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না। ইচ্ছে কবলে অন্য কোথাও কাজ করতে পারে। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আগাম প্রস্তাবটি এক উদার জেশচাব বলা যায়।

নিহত চক্রবর্তী ও তার দেহরক্ষী শিউপ্রসাদের পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে একটি অর্থভাণ্ডার খুলেছিল স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা। ত্রাণের সমস্ত দায়িত্ব রাজ্যসরকারের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এমনকী পুলিশ বিভাগকেও দায়ী করা অনুচিত। এমন কিছু নজির প্রশাসনের দিক থেকে সৃষ্টি করা ভুল হবে, যা অনুরূপ কোনও পরবর্তী ঘটনার বেলায় মানা যাবে না। অবশ্য এইরূপ দুর্ঘটনা সচরাচর তো ঘটে না। এ তো শুধু দু'জন পুলিশকর্মীর মৃত্যু নয়, এই ঘটনা এক বীভৎস জঘন্য হত্যাকাণ্ড, পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এর পেছনে ছিল, ছিল কিছু স্বার্থান্বেষী আমলার যোগসাজস। একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নির্ভীক বীর শুভজিৎ চক্রবর্তী নিহত হয়েছে। অপরাধীর যথোপযুক্ত শাস্তি দেবে বিচারালয়। মূল কথা হল বৃহত্তর সমাজ আপন দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসুক।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অর্থসাহায্য আসছিল সেই ভাণ্ডারে, আপনার মনে পড়ে? সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দূর-দূর থেকে সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিল। প্রতিদিন সংবাদপত্রে একটি করে তালিকা প্রকাশ করা হত, সেই তালিকায় থাকত দাতার নাম, সংক্ষিপ্ত ঠিকানা, দানের পরিমাণ এবং সব শেষে, সেইদিন পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট অর্থের পরিমাণ। প্রথমদিকের তালিকা দীর্ঘ ছিল, অর্থের পরিমাণ ছিল বেশি, মনে পড়ে? সহানুভূতির বাষ্প-সংবাদের ইন্ধন অভাবে ক্রমশ শুকিয়ে যায়, তাই ধীরে ধীরে তালিকা

ছোট হতে লাগল, দানের পরিমাণ এল কমে। মাস তিনেক কাটতে-না-কাটতেই স্রোত ক্ষীণ হতে হতে গেল শুকিয়ে। কেবল ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখতে আগ্রহী ব্যক্তিরা যখন দু'টাকা-এক টাকা করে পাঠাতে শুরু করল, তখন ভাণ্ডার বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবু অর্থ কিছু কম জমেনি।

নভেম্বর মাস। অল্প অল্প শীত পড়ছে। এই সময় কলকাতায় বিদ্যুৎ বিপর্যয় বড় একটা থাকে না। আলিপুর পাড়া কলকাতার অন্যান্য পল্লির তুলনায় জনবিরল, পরিচ্ছন্ন। রাস্তার দু'পাশের গাছগুলির পাতা ঝরতে শুরু করেছে।

শীতের দিন ছোট। ছ'টার মধ্যে অন্ধকার নেমে আসে আলিপুর আবাসনে। গৃহস্থেরা ঘরে ফিরে আসে তাড়াতাড়ি। ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে জ্বলে ওঠে উজ্জ্বল আলো। বেজেও ওঠে স্টিরিয়োর গান, টিভি-র সংবাদ। পাড়াটা গম গম করতে থাকে।

সেদিন সন্ধেবেলা নয়নতারা সোফায় বসে উল বুনছে। ছোট সোফায় মিতা। মিতার হাতে একটা ইংরেজি নভেল। বীবেশ্ববের পিঠে ব্যথা, তিনি সোফায় বসেন না। বেতের চেয়ারে টান হয়ে সিগারেট পাকাচ্ছেন। সামনে টিভি চলছে মৃদুশব্দে।

কেউ মন দিয়ে শুনছে না অথচ বন্ধও করছে না। নিজেদের মধ্যে যখন কোনও কথা থাকে না, টিভি তখন সঙ্গ দেয়।

নিজেব ঘব থেকে বেরিয়ে প্রাণেশ বসার ঘবে এসে দাঁড়াল। ডাকল, "মা।"

নয়নতাবা চোখ তুলে ছেলের দিকে তাকায়।

"তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, কাল সকাল সাড়ে ন'টায় খবরেব কাগজের এক সম্পাদক তোমাব সঙ্গে দেখা করতে আসবে। সঙ্গে ফোটোগ্রাফাব ও কিছু লোকজন থাকতে পারে।"

"আবাব কাগজের লোক কেন। কী জানতে চায় ওবা?"

"তোমাকে চেক দেবে। বিলিফ ফান্ডের টাকা। তৈবি থেকো।"

চেক দেওয়ার ছবিটায় নয়নতারাকে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছিল। মানে, মুখ্যমন্ত্রীব পাশে ওর যে ছবি বেবিয়েছিল কয়েকমাস আগে, তার চেয়ে ঢের পরিষ্কার, শান্ত, সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল ওকে। মনে পড়ে? কাগজের সম্পাদক বেঁটেমতো ভদ্রলোক, মাথায় টাক কিন্তু পরনে স্যুট। একটু ঝুঁকে চেকটা হাতে করে এগিয়ে দিচ্ছে। নয়নতারার পরনে ডুরে শাড়ি, মাথায় ঘোমটা, আঁচলটা সামনের দিকে বুকেব কাছে ধবে আছে। মুখে বিষণ্ণ ও উদাসীন হাসি। ছবিব পেছনে দেয়াল। দেযালে টাঙানো একটা ছবি। ছবিটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

বাহাত্তব হাজার টাকার চেক পেয়েছিল নয়নতারা। দেশেব সাধারণ মানুষের অল্প অল্প দান সংগ্রহ করে এই সামান্য ক্ষতিপূরণ। সেই দিনই সম্পাদক মহাশয় নিহত দেহরক্ষীর স্ত্রীর হাতেও একটি চেক তুলে দিয়েছিল। সেই চেকের পরিমাণ ছিল আঠারো হাজার টাকাব কিছু বেশি। ছবির নীচে এইসব সংবাদ ছিল সেদিন। দেহরক্ষীর স্ত্রীর কোনও ছবি অবশ্য কাগজে বেরোয়নি। সে তো ছবি হবাব মতো সম্ভ্রান্ত নয়।

খবর পড়ে, ছবি দেখে আপনার মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা কী। সেই জুলাই মাসের দুর্ঘটনার জের নভেম্বর মাসেও চলছে। এ কি মানুষের সামগ্রিক অপরাধবোধ, না সমষ্টিগত মর্ষকামের প্রকাশ? তখনও আপনি জানেন না সামনের প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রয়াত পুলিশ অফিসার শুভজিৎ চক্রবর্তীর নামে একটি মরণোত্তর মহাবীর পদক ঘোষিত হতে চলেছে।

আজ সকালে সংবাদপত্রেব ব্যক্তিগত কলমে তার নাম দেখে আপনি চমকে উঠেছিলেন। একটু একটু করে স্মরণ করিয়ে দিলাম অতীত ঘটনার অনুপুঙ্খ, এখন একটু মন খারাপ লাগছে না আপনার বন্ধুর কথা ভেবে? বেঁচে থাকলে আজ তার বয়স ষাটের কাছাকাছি হত।

বেঁচে থাকলে এতদিনে সে অবসর নিত চাকরি থেকে। সঞ্চয়ের অর্থ আর কিছু ঋণটিন নিয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে একটা বাড়ি করত সম্ভবত। তবে সেই বাড়িতে বসে প্রাতর্ভ্রমণ করে আর বাগান কুপিয়ে অবসর বিনোদন করার মতো স্থবির মানসিকতা শুভজিতের থাকার কথা না। সে অন্য কোনও কাজ খুঁজে নিত ঠিক। বস্তুত কাজই ওকে খুঁজে নিত। কলকারখানায় শৃঙ্খলা, সিকিউরিটি, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ দেখার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে আজকাল। ওই রকম কোনও প্রতিষ্ঠান শুভজিতের মতো লোক পেলে লুফে নিত নিঃসন্দেহে। তা ছাড়া, উপার্জনের প্রয়োজন তো

থেকেই যায়। জীবনযাত্রার মান একবার উঠে গেলে তা কি এককথায় নামানো সম্ভব? শুধু পেনশনের টাকায় অত বড় সংসারের দায়িত্ব কি বহন করা যায়? যা দুর্মূল্যের বাজার।

আজ বন্ধু বেঁচে নেই কিন্তু ওর সংসার তো আছে। কেমন আছে ওরা? নয়নতারা, ছেলেমেয়েরা? কয়েকটা বছর কী দ্রুত কেটে গেল, তাই না। একবার যাবেন নাকি দেখতে? ওই আলিপুর আবাসনে? তিনতলায় পুব-দক্ষিণ খোলা ওদের ফ্ল্যাট। আলিপুর রোড থেকে বেরিয়েছে বাজা সন্তোষ রোড, তার একটু পরেই আর একটা সরু শাখা—স্থানীয় লোককে বি এস সি বোড বললে চিনিয়ে দেবে। ওই রাস্তার শেষ বাড়িটা আলিপুর আবাসন। নতুন পল্লি। বিকেলবেলা গেলে খানিকক্ষণ গল্পসল্প করে আসতে পারবেন। আজকেব দিনে ওদের বাবার কোনও পুরনো বন্ধু দেখা করতে এসেছে দেখলে খুশিই হবে ওরা। পুরনো দিনের কথা হবে। স্মৃতিচারণ হবে।

মনে কোনও সংশয় জাগছে আপনার? কোনও দ্বিধা? ধরুন:

আপনি বেল টিপলেন, পরিচারক দরজা খুলে দিল।

জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই?"

আপনি বললেন, "নয়নতারা চক্রবর্তী—ওই পেতলের ফলকে যাঁব নাম লেখা—তিনি আছেন?"

"বড়ি মেমসাব বেরিয়েছেন। ছোটি মেমসাব আছেন।"

"প্রাণেশ কি সোমেশ, কেউ নেই?"

"না। ওদের ফিরতে রাত হবে।"

ভেবেছিলেন, ছোটি মেমসাব মানে মিতা। এ অন্য একটি মেয়ে। একটু ইতস্তত করে আপনাকে বসতে বলল। আপনি জুতো খুলে এসে সোফায় বসলেন ভয়ে ভয়ে। যা কাদা, কার্পেট না নষ্ট হয়ে যায়। আপনি সুন্দব করে সাজানো বসাব ঘরটি দেখে মুগ্ধ হলেন। টিভি স্টিবিয়ো, শেলফে অল্প কয়েকটি বই। ঘরেব কোণে উজ্জ্বল ফ্লাওয়ার ভাস, কিউরিয়ো ক্যাবিনেটের মধ্যে ছোট ছোট পুতুল। সিলিং থেকে ঝুলছে পিংক রঙের ভারী পরদা। ছবি? হ্যাঁ, দেয়ালে বেশ বড়সড় একটি তেলরঙের ছবি—লম্ফমান ঘোড়া। সামনের পা দুটো আর তার উদ্বিগ্ন হিংস্র মুখ। উডন্ত কেশর। পাশে একটি নিষ্পাপ মেয়ে আধশোয়া অবস্থায়। অর্ধনগ্ন, নির্বিকার। কার আঁকা? আপনি অন্য কোনও ছবি খুঁজছেন বুঝতে পেবে মেয়েটি বলবে, "বাবার ছবি ও-ঘরে।"

ও প্রাণেশেব বউ। ওর নাম বুলবুল। ওর একটি ছোট্ট বেবি হয়েছে, তাকে নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত। নাওয়া-খাওয়ার সময় পায় না। ভা-রী দুরন্ত। সাবাবাত জেগে থাকে। মাথায় একদম চুল নেই সে-কাবণে বুলবুলেব মনে কষ্ট।

মিতা? ও তো বিদেশে থাকে। পড়তে গেছে। বছর দুয়েক হল। বুলবুল এ-বাড়িতে আসার চাব মাস পবে মিতা চলে গেল কানাডায়। খুব শিগগির ফিরবে না বোধহয়। বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল বুলবুলের সঙ্গে। যদি কখনও না ফেরে, যদি ওখানেই কাউকে বিয়েটিয়ে কবে সেটল কবে, তা হলে বুলবুলেব কান্না পাবে। ও একেবারে একা। কেন, সোমেশ? সে নাকি বিয়ে করবে না জিদ ধরেছে। ওর খুব ইচ্ছে জার্মানি যায়। মাকে বলেছে, হাজাব পঁচিশেক টাকা ধার দাও, ফিরে এসে শোধ কবে দেব। এমন ছেলেমানুষ না।

নয়নতারার সঙ্গে দেখা হল না। কাকে যেন সি-অফ কবতে এয়ারপোর্ট গেছে। আজকাল প্লেন যা লেট হয়। মামাবাবু? না না, উনি তো কবেই চলে গেছেন। এলাহাবাদ ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারেন? তা ছাড়া, এখানেও জায়গা হচ্ছিল না। ছোট ফ্ল্যাট, মাত্র তিনখানা বেডরুম।

ছবির লম্ফমান ঘোড়াটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে আপনার হয়তো চিৎকাব করতে ইচ্ছে হবে; শুভজিৎ। শুভজিৎ চক্রবর্তী। তুমি কোথায়?

তা কি করা যায়? আপনি চিৎকার করার আগে পাশের ঘরে ঘুমন্ত বেবি হয়তো জেগে উঠে চিৎকার করবে। ওর দুধ চাই, ওর শুকনো বিছানা চাই। বুলবুলকে ছুটে চলে যেতে হবে বেবির কাছে। আপনাকে বেবিয়ে আসতে হবে আলিপুর আবাসন থেকে। বেরিয়ে আসার সময় আপনার মনে হতে পারে, ক্ষতিপূরণ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে কি মানুষ ক্ষতিকে আর মনে রাখে না?

রাস্তায় নেমে দেখবেন, তখনও সন্ধে হয়নি। আকাশে লাল আভা। এই পল্লিটা নতুন, বাড়িগুলো খুব সুন্দর। সামনে একটু করে বাগান। এখন বর্ষাকাল, গাছের পাতা সব চকচক করছে। একটু তফাতে

তফাতে লাইটপোস্ট—বোধহয় সম্প্রতি অ্যালুমিনিয়াম পেইন্ট করা হয়েছে। সরু হলেও রাস্তাটায় কোথাও খানাখন্দ নেই, খুব পুরু পিচ।

আলিপুর রোডে পড়ার আগেই আপনার চোখে পড়বে, একটা লাইটপোস্টের গায়ে এনামেলের ফলক। নীলের ওপর সাদা নাম লেখা—"বীর শুভজিৎ চক্রবর্তী রোড।" একেই স্থানীয় লোক, রিকশাওয়ালা বলে বি এস সি রোড।

তবে? কে বলেছে শুভজিৎ বেঁচে নেই? শুভজিতের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ব্যর্থ হয়েছে? ওই তো, এনামেলের ফলকে শহিদ শুভজিৎ অমর হয়ে আছে, দেখছেন না?

১৯৯২

ভোজালি ও নয়নতারা

গল্প লিখতে হলে প্রথম কাজ হল একটা প্লট ধরা। মাথায় একটা প্লট আসে মানে, গল্পের ছাঁচ। কবিতায় যেমন প্রথম লাইনটা প্রায়শ স্বপ্নে পাওয়া যায়। পাঠক্রম অনুসারে, প্লট হল, দুটি ঘটনার মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ। রাজা বীরভদ্র দেহত্যাগ করলেন। তারপর রানি রত্নমালা দেহত্যাগ করলেন। এটা প্লট হল না। যদি বলা হয়, রাজা বীরভদ্র দেহত্যাগ করলেন, তারপর তাঁর শোকাতুর দুয়োরানি রত্নমালা একদিন দেহত্যাগ করলেন। তখনই দুই ঘটনার মধ্যে এক সম্বন্ধসূত্র নিক্ষেপ করা হল। কী গভীর শোক যে প্রাণ চলে যায়। আর, রাজার প্রিয়তমা যে সুয়োরানি, তিনি রইলেন বেঁচে। মারা গেলেন কিনা নিগৃহীতা দুয়োরানি। ব্যাপার কী? এই হল প্লট। এবার গল্পটা বোনো। বিচক্ষণ লেখক কৌতূহল উসকে দিয়ে গল্প শুরু করে। কৌতূহল টান টান রেখে এগিয়ে যায় গল্পের চরম মুহূর্তের দিকে। অভিন অথচ বিশ্বাসযোগ্য সব সম্বন্ধ সূত্র আবিষ্কার করায় তার দক্ষতা, তার উদ্ভাবন শক্তি আছে। ভাষাকে চাকরের মতো খাটাবার ক্ষমতা আছে। তাই দিয়ে সে রহস্যের বাতাবরণ তৈরি করে, অরক্ষিত চরিত্রদের দিয়ে বিচিত্র আচরণ করায়। উদ্দেশ্য, শেষকালে একটা কিছু উদ্ঘাটন করা। অর্থাৎ, এমন কিছু যা আজগুবি নয়, যা হতে পারত কিন্তু ভাবা হয়নি। পাঠক এই অভিজ্ঞতা থেকে তৃপ্তি পায়।

পাঠক্রম অনুসারে, গল্প লেখা হয়ে গেলে পর তার একটা উপযুক্ত নাম দিতে হয়। এমন নাম যা যথাযথ, কিন্তু গল্পের গোপন কথা ফাঁস করে দেবে না। হ্যাঁ, কী করে গল্প লিখতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এখন তা শেখানো হচ্ছে। এ-দেশেও। দিকপাল সব গল্পকারদের রচনা অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করে সিলেবাস তৈরি হয়েছে।

অথচ, কোথাও কোনও প্লট নেই, কেবল এই নামটা 'ভোজালি ও নয়নতারা' আজ ছ'মাস হল আমার মাথায় ঢুকে বসে আছে। মাঝে মাঝে ভুলে যাই। নিজেকে বলি, না হে, ওভাবে গল্প হয় না। প্লট কই? অন্য কিছু ভাবো। এই ভাবেই চলছে।

হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে কি শেষরাত্রের দিকে দরজায় বেল পড়ে। আমি আঁতকে উঠি। আবার কোনও মাতাল পড়ল বুঝি। অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে বেরিয়ে আসি। চৌকাঠে, দেরাজে ঠোক্কর লাগে। তবু ছিটকিনি নামিয়ে দরোজার পাল্লা ফাঁক করে দেখতে চাই, কে এল। না, মাতাল কেউ না। দুটি অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা বলে, "আমরা ভোজালি ও নয়নতারা।"

"কী দরকার?"

"না, জানতে এলাম, কাজ কিছু এগিয়েছে?" কাজ এগোয়নি, বলতে ভরসা পাই না। লেখককে কখনও ও-কথা বলতে নেই।

জিজ্ঞেস করি, "তোমরা কি আজকাল একসঙ্গে থাকো? এক বাড়িতে।"

"না, আমার বাড়িতে ও থাকে। আমি ওকে রেখেছি।"

এই কথার অনেক রকম মানে হয়, নয়নতারা সেটা বুঝতে পেরে আমায় বোঝাবার চেষ্টা করে।

"একটা খালি দোতলা বাড়িতে একা থাকতাম, বুঝলেন কিনা। একজন যুবতী মেয়ে একা থাকে, বাবা নেই, মা নেই, ভাই নেই, বর নেই, বাচ্চা নেই, লোকে ভাবতে পারে না। যত রাজ্যের উটকো লোক নিত্য হামলা করত। বেকার ছোকরা থেকে আরম্ভ করে মধ্যবয়সি সংসারী লোক অবধি। পাট-ভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, সেন্ট মেখে, আমার খোঁজখবর নিতে আসত। এসে এদ্দিক-ওদ্দিক তাকাত। উপহার দেবার চেষ্টা করত। জানে যে, একবার বডি ছুঁতে দিলে একটা মেয়ের সব দুর্গ আলগা হয়ে যায়।"

আমি বলি, "আরে! তো ভোজালিও উটকো লোক। ওকে কী ভরসায় রেখেছ?"

"না, মেয়েদের সম্বন্ধে ওর কোনও স্পৃহা নেই। ও বলেছে আমায়, কলকাতা শহরে ওর একটা থাকার জায়গা দরকার। ওর কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। মাঝে মাঝে কথা বলার একজন লোক দরকার ওর। ও বলেছে আমায়। তাই ওকে রাখলাম।"

আমার অস্বস্তি তবু যায় না।

আমি জিজ্ঞেস করি, "ওর ব্যাকগ্রাউন্ড, মানে, ওর বংশপরিচয়, পড়াশোনা, ওর স্বভাবচরিত্র, উপার্জন, এইসব যাচাই করে নিয়েছ তো? নাকি, ভোজালি নাম শুনেই গলে গেলে?"

"সব ব্যাকগ্রাউন্ড তো বডিতে এসে মেশে, তাই না?" নয়নতারা বলে, "আমি সব রকম মেডিকাল চেকআপ করিয়ে নিয়েছি ওর। ওর সবক'টা অঙ্গ যেগুলো দুটো করে থাকার দরকার, একটা স্ট্যান্ডবাই সহ, দুটো করেই আছে। কোনওটা কম নেই। ওর প্রত্যেকটা কলকবজা ঠিক ঠিক চলে, একেবারে ঘড়ির মতো। না, ঘড়ির চেয়ে একটু আলাদা। বডির ঘড়িতে বাহাত্তর সেকেন্ডে এক মিনিট। ওর কোনও অসুখ নেই।"

বলতেই ভোজালি বাধা দিয়ে বলল, "একটা ছাড়া।"

"সেটা কী?"

"আমি চড়া রোদ, কি মুখের ওপর আলো সইতে পারি না। মাথা ঝাঁঝাঁ করে। মাথা ধরে ওঠে। তাই তো ফিল্মের কাজ ছেড়ে দিলাম। পলিটিকস ছেড়ে দিলাম।"

নয়নতাবা বলে "যখন ওর মাথা ধরে না, ওঃ, সে একেবারে দেখার মতো। ঘর অন্ধকার করে চোখ বুজে পড়ে থাকে। কিছু খায় না, খালি খালি বমি করে। আর অপেক্ষা করে। এক নাগাড়ে দু'দিন, তিনদিন। তারপর একসময় মাথা ধরাটা চলে যায়। নিজে নিজে। অদ্ভুত না!"

বলতে গিয়ে নয়নতারার গলা ভিজে ওঠে। আমি বলি, "তখন ওর মাথাটা একটু টিপে দিলে তো পারো। একটু আরাম হয়। কষ্টের সময় একজন আর-একজনকে না দেখলে—"

"নার্সিং? না ঠাকুর, ও-কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। ওর ঘরে একটা ঠান্ডা মেশিন বসিয়ে দিয়েছি। তাতেই যথেষ্ট আরাম হয় ওর।"

নয়নতারা বলে, "আমি ওর অসুখের জন্য দায়ী নই। যে দায়ী, সে এসে ওর সেবা করুক।"

"কে সে?"

'ওর মা।"

ভোজালি বলে, "এই দেখো, আবার গল্প ফেঁদে বসলে! চলো, চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে না?"

"আরেকদিন আসব, কেমন?" বলতে বলতে ভোজালি আর নয়নতারা সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

জর্জ বার্নার্ড শ' এক জায়গায় বলেছেন, যে পারে, সে করে দেখায়। আর যে পারে না, সে শেখায়।

আমার উদ্ভাবনী শক্তি নেই। যাকে কল্পনা প্রতিভা বলে, তা একেবারে জিরো। তাই তো গল্প লেখার ক্লাস নিই। ধাড়ি ছেলেমেয়েদের বলি কী করে সাসপেন্স তৈরি করতে হয়। চরম মুহূর্তে পৌঁছোবার আগে অবধি পাঠকের কৌতূহল জিইয়ে রাখা কত জরুরি। মপাসাঁর গল্পের নির্যাস তুলে ধরি ওদের সামনে। সমারসেট মম, হেমিংওয়ে থেকে অংশবিশেষ পড়ে শোনাই।

'ভোজালি ও নয়নতারা' নামটা আলটপকা পেয়ে গিয়েছিলাম। মাসের-পর-মাস ওই নামটাকে টক-মিষ্টি লজেন্সের মতো মুখের মধ্যে নেড়েছি।

যতটুকু খবর জোগাড় করা গেল, তাই টুকে রাখলাম। আবার যদি কখনও আসে ওরা তখন বাকিটা জেনে নেওয়া যাবে।

নয়নতারার কেউ নেই। ভোজালির অন্তত একজন তো আছে। এর বেশি কিছু জানা গেল না।

আমি রোজ ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠি। বাড়ির লোক কেউ সাতটার আগে ওঠে না। ওই দু'ঘণ্টা সময় আমার নিজেকে নিয়ে কাটে। আমার একসময়ের মনিব বলত, "ভোরবেলা, যখন অন্ধকার মুছে মুছে একটু করে আলো ফোটে, আকাশ স্পষ্ট হয়, তখন আমি তাঁর অস্তিত্ব টের পাই। তিনি যেন বলেন, না দিলেও পারতাম, তবু তোকে আর একটা দিন দেখতে দিলাম" ও বলত 'সেই সুযোগে আমি তার সঙ্গে আমার আগের দিনের হিসেবনিকেশ বোঝাপড়া করে নিই।"

আমার কোনও ভগবান নেই। সেদিন ভোরবেলা সাদা লংক্লথের আন্ডারওয়ের পরে বাইরের ঘরে লম্ফঝম্ফ করছি, বেল পড়ল। দিনের প্রথম বেল দেয় কাগজের হকার। তার আসার সময় হয়নি। তা হলে কে? ভোজালি আর নয়নতারা নয় তো? লুঙ্গি চড়াতে ভুলে গিয়ে ওই অবস্থাতেই দরজা খুললাম।

"ভোজালি। কী ব্যাপার? তুমি একা? নয়নতারা কোথায়?"

"হসপিটালে আছে। কাঁঠাল গাছ থেকে পড়ে গিয়ে বাঁ পায়ে ফ্র্যাকচার।"

আমি হাঁপাচ্ছিলাম। ভোজালিও হাঁপাচ্ছিল। একটু দম নিয়ে বললাম, "কাঁঠাল গাছ?"

"আর বলবেন না। আমরা রাজপুর গিয়েছিলাম বেড়াতে। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে একটা বাগানবাড়িতে ঢুকে পড়ি। একটা কাঁঠাল গাছ দেখে নয়ন দাঁড়িয়ে পড়ে। খুব উঁচু গাছ নয়। মাঝারি মাপের। তার সারা গায়ে বড় বড় কাঁঠাল ফলেছে। ঝুলছে। গাছটা নুয়ে গেছে কাঁঠালের ভারে, বুঝলেন কিনা। তো, নয়ন বলল, আমি এই গাছে চড়ব। আমি একে বুঝতে চাই।"

"তুমি বারণ করলে না।"

'ও কারুর বারণ শোনে? তো হল কী, কাঁঠালগুলো টাঙিয়ে নিয়ে গাছটা কুঁজো হয়ে গেছে, তবু একরকম ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়িয়ে ছিল কোনও রকমে। আর এক কিলো ওজনও ওর বইবার ক্ষমতা নেই। নয়ন দোতলা মতন উঠেছে, অমনি মট মট করে ভেঙে পড়ল ডাল। আমি ধরতে গিয়েও ধরলাম না।"

"কেন?"

"বডি। ও বলে, কেউ আমার বডি টাচ করবে না। মানুষের হাত নোংরা। আচ্ছা বলুন, এর কোনও মানে হয়? তুমি পড়ে পড়ে কাতরাবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? আমি শুনিনি। বুঝলেন কিনা। আমি ওকে জোর করে পাঁজাকোলে তুলেছি। খুব বকেছি ওকে। মেয়েমানুষের আবার গাছে চড়ার শখ!"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তেজনা নামিয়ে নিল ভোজালি। তারপর বলল, "নয়নতারা আমায় পাঠাল আপনার কাছে। বলল, যাও, লেখককে এই খবরটা দিয়ে এসো।"

আমি কিছুই শুনছিলাম না। ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

গল্পটা আটকে আছে অন্য জায়গায়।

এই যে ভোজালি, গাট্টাগোট্টা চেহারা, চৌকোপানা মুখ, মাথায় কদমছাঁট, এর মেডিকাল চেকআপ হয়েছে। এর শরীরের কলকবজা সব দুটি দুটি করে ঠিকঠাক সাজানো। এর কোনও অসুখ নেই। শুধু একটা ছাড়া। ওই অদ্ভুত মাথা ধরার অসুখ। তার জন্যে ওর মা দায়ী। আগের দিন তো সেই কথাই বলে গেল।

আমি বললাম, "গালগল্প থাক। তোমার মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী, তাই আগে বুঝিয়ে বলো।"

ও বলল। আমি মন দিয়ে শুনলাম। ওর জন্মের মুহূর্তের কথা সব এখনও মনে আছে।

"আমি অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি" ও বলল, "পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তবু জানি, পথ একটা আছে। সেটা খুলতে দেরি হচ্ছে। আমার দুমড়োনো শরীর আস্তে আস্তে সোজা হচ্ছে। আমার হাতে-পায়ে জড়ানো দড়িদড়া। মাথা দিয়ে ঢুঁ মারছি এদিক-ওদিক। আলো কী জিনিস আমি জানি না, তবু আলোর গন্ধ পাচ্ছি। আমি বেরোবই বেরোব। জিদ চেপে গেছে। এদিকে অন্ধকারের আরাম আমায় পেছনে টানছে। আর একটু ঘুমোও, লুকিয়ে থাকো। বলছে, মায়ের মধ্যে বসে আছ, তোমার ভাবনা কীসের?

"হঠাৎ কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল। চোখের ওপর বিকট আলো এসে পড়ল। আমি কুঁকড়ে গেলাম কষ্টে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা ছিল আমার, তার বদলে ওরা আমায় মায়ের পেট থেকে তুলে নিল। আমি যেন জালে ধরা পড়ে মাছের মতো উঠে এলাম। অপমানিত শিশু, আমি অনেকক্ষণ কাঁদতে পারিনি। সেই থেকে আমার মাথার কষ্ট শুরু। তীব্র আলো সইতে পারি না। বার বার আমায় অন্ধকার ঘরে ফিরে যেতে হয়।

"মাকে আমি কোনওদিন ক্ষমা করিনি, বুঝলেন কিনা," ভোজালি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে, "আর একটু কষ্ট সহ্য করতে পারল না? আমি তো আসছিলাম নিজে নিজেই। আমায় অমন অবলীলায় টেনে তোলার কী দরকার ছিল? আমি মায়ের স্তন দেখিনি, মায়ের দুধ পাইনি, জানেন? ওরা আমায় প্রথম দিন থেকে হাবিজাবি খাইয়েছে। তাই আমার এত রাগ।"

কাঁচা ঘুম ভেঙে দিয়ে ওকে আনা হয়েছে, তাই ওর এত রাগ। ওর যুদ্ধটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তাই ও যুদ্ধ করাই ছেড়ে দিয়েছে। নয়নতারার আশ্রিত হয়ে বসবাস করছে কলকাতায়, তাতে ওব লজ্জা করে না। এতদিনে আমি ওর ভোজালি নামের নিহিতার্থ হৃদয়ঙ্গম করি। স্পৃহা নেই, নয়নতারা বলেছিল, না থাকাই তো স্বাভাবিক। ভোজালির মাকে আমি চিনি না কিন্তু তার মতো স্বার্থপর, কৃপণ মহিলা আমি জীবনে একাধিক দেখেছি। তারা প্রকৃতিকে লঙ্ঘন কবতে চায়। তারা অধিকার বোঝে, দায়িত্বের ধার ধারে না। এই দেখো, আমার স্বামী, আমার বর, ওর গেঞ্জির মাপ আটত্রিশ, ওই যে আমার সন্তান, হ্যাঁ একাই একশো—এইসব কথা বলে নিজের উর্বরতা ঘোষণা করে। প্রতিযোগিনীদের ধিক্কার দেয়। কিন্তু খোঁজ করে দেখো, ওইসব স্বামীরা সুখী না, অতৃপ্ত। ওইসব সন্তান জন্মেব পর মায়ের দুধ পায়নি। পাছে স্তনের ডৌল নষ্ট হয়ে যায়। বোঁটায় খয়ের মাখিয়ে বাচ্চার মুখে ধরেছে। ওইসব মায়ের নিষ্ঠুরতার কোনও তুলনা হয়? কোনও কুকুর-মা, কোনও ছাগল-মা এ-কাজ কবে না। ভোজালিটা অভাগা।

এ কী, আমি যে ওর পক্ষে কথা বলছি। পাঠক্রম স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তুমি লেখক, কোনও চরিত্রের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত দেখাবে না। কোনও চরিত্রের সঙ্গে ভাবাবেগে জড়িয়ে পড়বে না।· সাবধান। তা হলে ফেঁসে যাবে গল্প। তোমার ভূমিকা নিরপেক্ষ দর্শকের। তুমি স্রষ্টা, ঈশ্বর। চরিত্রদের খেলতে দাও। এইসব কথা পাঠক্রম বলছে বার বার, কিন্তু কখনও কখনও চরিত্র যে লেখককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে, তাব নিয়ন্ত্রণ একদম মানবে না, সে-কথা তো বলছে না। তা হলে কি আমারই অক্ষমতা? একদিন হাসপাতালে চলে গেলাম। ঠ্যাং ভেঙে পড়ে আছে মেয়েটা, কেমন আছে, দেখে আসা আমার কর্তব্য।

বিকেল। তখনও চারটে বাজতে কয়েক মিনিট দেরি আছে। আমি বাইরের বেঞ্চিতে বসলাম।

চোখে সানগ্লাস পরা থাকলে কী হবে, ভোজালি ঠিক আমায় দেখতে পেয়েছে। একেবারে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল "আরে। আপনি!" আমি বললাম "নিজের স্বার্থে। নয়নতারা এখন কেমন আছে?"

"অনেক ভাল" একমুখ হেসে ভোজালি বলল, 'এখন আর বেডপ্যান দিতে হয় না।"

"কবে ছাড়বে?"

"এখনও এক মাস তো থাকতে হবেই। গায়ে জোর পাওয়া দরকার। একদম খিদে নেই।"

ভাবলাম, জিজ্ঞেস করি, খিদে কোনওদিন ওর ছিল? খিদে কী, ও জানে? চেপে গেলাম। ছেলেটাকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া হবে। এমনিতেই হিমশিম খাচ্ছে বেচারা।

কেবিনে প্রবেশ করে চোখ জুড়িয়ে গেল। কে ওটা? নয়নতারা, না মালঞ্চি কইন্যা? ফরসা, সরুমতন একখানা মুখ। খোলা কপাল। বালিশের ওপর দিয়ে চুলের বেণী নেমে গিয়ে ঝুলছে। গলা অবধি কম্বলে ঢাকা। চল্লিশ কেজির একটা পাতলা শরীর। মানুষ না, যেন বোতল একটা। কেবল বড় বড় দুটো চোখ, যামিনী রায়ের ছবির মতো, মুখ থেকে উপচে পড়ছে। কেন জানি না, দাঁড়ানো শরীরের তুলনায় মেয়েদের শোওয়া শরীর দেখতে আমার বেশি ভাল লাগে। এটা হয়তো সংস্কার।

অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখ ফেরাল নয়নতারা।

একমুখ হেসে বলল, "কাজ কিছু এগিয়েছে?"

আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

তার বদলে জিজ্ঞেস করলাম "কাঁঠাল গাছের কাছে কী শিক্ষা পেলে, নয়ন?"

"কৃপণের মতো দুঃখী কেউ নেই" কী সপ্রতিভ গলায় বলতে পারল ও। যেন আগে থেকে কথাটা ভাবা ছিল।

আমি বললাম "তা হলে এবার তুমি তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। বেশি করে খাবে। মোটা হবে, কেমন?"

বালিশে-গাঁথা মাথাটা এমন বাধ্য মেয়ের মতো নাড়ল, যেন ও নয়নতারা নয়, আমার গল্পের একটা চরিত্র মাত্র নয়, আমার বাচ্চা। যেন আমি ওকে বুনেছি। যেন আমার গাছের একটা ক্ষীরসাপাতি আম।

আমি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। কোনও চরিত্রের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা হওয়া উচিত নয়। তাতে লেখকের নিরাসক্ত মনোভাব নষ্ট হয়। পাঠক্রম সেই কথাই বলেছে।

মালমশলা যেমন যেমন জড়ো হচ্ছে, তেমন তেমন কাজ এগোচ্ছে। কিন্তু সে অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। লেখককে তো কিছু কিছু ব্যাপার উদ্ভাবন করতে হবে। যা ঘটছে, তার সঙ্গে আর যা ঘটতে পারত, তা জুড়ে দিতে হবে না? কিন্তু ওই যে বললাম, কল্পনা প্রতিভা বলতে কিছু আমার মধ্যে নেই। যে পারে, সে তো করে দেখায়। যে পারে না, সে শেখায়। জর্জ বার্নার্ড শ' একথা বলে গেছেন। কী করে গল্প লিখতে হয়, ছেলেমেয়েদের শেখাই আমি আজকাল। নয়নতারাকে যখন যেমন দেখছি, তেমন আঁকছি।

পাঠক্রমে বাস্তবতা নিয়ে একগাদা কথা বলা আছে। রিয়ালিজম আর রিয়ালিটির দ্বন্দ্ব। আমি ভাল বুঝি না। তবু, পড়াতে হয়, পড়াই। লোকে যেমন ইতিহাস পড়ায়। ভূগোল পড়ায়। আমার ছাত্র-ছাত্রীর কেউ যদি ভবিষ্যতে নামকরা লেখক হয়ে ওঠে, সে তার নিজের গুণে হবে। আমার পড়ানো কোনও সাহায্য করছে না। আমি জানি। বইতে লেখা আছে, বাহ্যিক আর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে অনুকরণ করতে চায় বাস্তবমুখী শিল্প। ওরা বলে, জীবনের ওপর আয়না মেলে ধরো। সে কি গতানুগতিক জীবন? তার বাইরে কিছু না? জীবনে কখনও যা দেখেনি, যা কখনও অনুভব করেনি, তার স্বাদ যে পেতে চায় সাহিত্যের পাঠক। তাই তো সে গল্প-উপন্যাস পড়ে ভাবে, দেখি তো, ওই চরিত্র কী রকম ব্যবহার করল। মুশকিলে পড়লে মানুষ কী রকম বেঁকে যায়, দেখি। এই তার কৌতূহল। সে গাঁজাখুরি গল্প খোঁজে না কিন্তু। বালজ্যাক, গোগল, তুর্গেনিভ, এঁরা সারাজীবন ধরে এইসব ব্যাপার নিয়ে কাজ করে গেছেন।

লেখাটা অনেক দিন থেমে ছিল। কেননা, কোনও খবর নেই ওদের। আমিও আর গা করিনি। ছিটগ্রস্ত দুটো ছেলেমেয়েকে ধাওয়া করে কোনও লাভ নেই।

একদিন রাস্তায় ঠিক মালঞ্চী কইন্যার গলা শুনলাম। 'মাধব, মাধব 'না বলে' লেখক, লেখক' বলে ডাকছে।

বারান্দায় দাঁড়াতেই দেখি, নয়নতারা।

সালোয়ার-কামিজ পরা।

আমি বলি, "রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন। ওপরে এসো।"

ও বলে "না। অনেক কাজ। শুধু একটা খবর দিতে এলাম।"

"ভাল হয়ে গেছ?"

"আরও খবর।"

"মোটা হয়েছ?"

"আরও খবর।"

"কী?"

"ওকে রাজি করিয়েছি। ভোজালিকে।" মালঞ্চীর মতো গলা উঁচু করে তারস্বরে নয়নতারা বলতে থাকে, "বলেছি, তুমি আমার মধ্যে এসো। তুমি আর একবার আমার মধ্য দিয়ে জন্মাও। হ্যাঁ কথা দিচ্ছি, আমি শর্টকাট করব না। তোমায় প্রসব করব। ফসল পাকা অবধি মাঠ যেমন চুপ করে অপেক্ষা করে; উথলে ওঠার আগে দুধ যেমন স্থির হয়ে যায়, থমথম করে। হ্যাঁ আমি তেমনই দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করব সব কষ্ট। ওর পাওনা ওকে মিটিয়ে দেব, কথা দিয়েছি। না হলে, এই বডি থেকে কী লাভ? বলুন। কৃপণের মতো দুঃখী কেউ নেই কাঁঠাল গাছ আমায় শিখিয়েছে।"

ওড়না উড়িয়ে নয়নতারা চলে যায়। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। বুঝতে পারি না, গল্পটা এখানে শেষ হল, না এর পরেও চলবে।

১৯৯১

বেনে বউ

শান্তিনিকেতনে বাড়ি করেছেন অনির্বাণ মহাপাত্র। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে এসে থাকেন। প্রকৃতির শোভা দেখেন। ঋতু বদলের খেলা দেখেন। ওখানে কত রকমের পাখি ডাকে সারাদিন ধরে, তাদের ডাক শোনেন মুগ্ধ হয়ে। কোকিল ছাড়া আর কোনও পাখির নাম জানেন না অবশ্য, তাতে কী এসে যায়। ওরা বলে ডাহুক আছে, বেনে বউ আছে। ঘুঘু আর বুলবুলি তো আছেই। ওঁর বাগানে সাদা জবার একটা গাছ আছে। খুব রেয়ার। সেই গাছে এসে বসে একটা কালো রঙের চড়ুই পাখি, ন্যাজটা লাল। অনির্বাণ ধরে নিয়েছেন, ওইটেই বেনে বউ।

বেশ আনন্দেই কেটে যায় কয়েকটি দিন, যখন উনি থাকেন শান্তিনিকেতনে। ভদ্দরলোকেদের জায়গা। বস্তিফস্তি নেই। যন্ত্রযানের উৎপাত নেই। শুধু তাঁর বাড়ির কাছ দিয়ে দিনে দু'-চারটে ট্রেন যায়। ঝিক্-ঝিক্ ঝিক্-ঝিক্ শব্দ হয়। সেই শব্দ খুব রোমান্টিক। শুনেছেন, এখানে কী একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, মনুমেন্ট আছে। সেখানে বহু লোক নিত্য আসা-যাওয়া করে। যেতে-আসতে নিজের চোখে দেখেওছেন। চিনে, জাপানি, আমেরিকান মেয়েরা শাড়ি পরে সাইকেল চড়ে ঘুরে বেড়ায়। দাড়িওলা সাহেব সাইকেল চড়ে শ্রীনিকেতনের দিক থেকে আসে। জায়গাটায় বেশ একটা ফরেন ফরেন ভাব আছে।

শুধু মুশকিল হল, ওখানে খুচবো পয়সা একদম পাওয়া যায় না। একশো টাকার নোট তো দুরের কথা, দশ টাকাব নোটের ভাঙানি অবধি দেয় না কোনও দোকানি কি রিকশাওয়ালা।

যখন বাড়ি করার কথা ভাবেন, বছর তিনেক আগে, তখন নানা লোকে নানা পরামর্শ দিয়েছিল। কেউ বলেছিল, পুবনো বাড়ি কিনে রিনোভেট করে নাও। কেউ বলেছিল, একগাদা টাকা ইনভেস্ট না করে, একটা রেডিমেড বাড়ি ভাড়া নিয়ে নাও। এখানে অনেক নামকরা বাড়ি আছে। পুরনো মালিক মরে ভূত। তাদের বংশধব দিল্লিতে কি আমেরিকায় সেট্‌ল কবেছে। বছরে একবার আসে কি আসে না। এলেও হোটেলে থাকে। পুরনো স্মৃতি বেচবে না, ভাড়া দেবে। মাসে হাজার দুয়েক টাকা ভাড়া। কিনতে হলে পাঁচ লাখ। নতুন তৈরি করতে হলে এখন দশ লাখের এক পয়সা কম নয়। তা, ওদের কথায় নেচে তখন কযেকটা বাড়ি দেখেছেন অনির্বাণ মহাপাত্র। দুর, দুর। ঘুপচি ঘুপচি কয়েকখানা ঘর। ছোট ছোট জানলা। ঘবেব মধ্যে সিমেন্ট-বাঁধানো সব বসার জায়গা। নিচু ছাদ। বাড়ির চারদিকে জঙ্গল। শেষ অবধি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে দু'-বিঘে জায়গা কিনে নিয়েছেন একটা টিবির ওপর। মূল শান্তিনিকেতনের একটু বাইরে।

ব্যবসায়ী অনির্বাণ জানেন, কিনে ফেলার একটা আলাদা মজা আছে। জিনিসটা নিজেব হয়ে যায়। চিবকালের মতো। মনের মতো একটা নাম দেওয়া যায় তার। জমিটা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলা হল। উঁচু গেট তৈরি হল। অত উঁচু গেট সে তল্লাটে আর কারুর বাড়িতে নেই। তখনই কথা উঠল, বাড়িটার নাম কী হবে। অনির্বাণ মহাপাত্রর বউ উচ্চশিক্ষিত। বাংলায় এম এ। সে বলল, আমি রবি ঠাকুরের কথা দিয়ে নাম ঠিক করব। অনির্বাণ বললেন, কবো, কিন্তু নাম যেন ইউনিক হয়। একবার সেই বউ এসে সমস্ত জায়গাটা সার্ভে করে যায়। পূর্বপল্লি, রতনপল্লি থেকে ওদিকে ডিয়ার পার্ক, শ্যামবাটি, ভুবনডাঙা, কোপাই অবধি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বাড়ির নাম নোট করে নিয়ে যায়। কলকাতায় ফিরে সঞ্চয়িতা আর গীতবিতান খুলে কম্পেয়ার করতে গিয়ে দেখে, সব ভাল ভাল নাম নেওয়া হয়ে গেছে। ফুলের নাম, গাছের নাম, ঋতুর নাম, কবিতার বইয়ের নাম—কিছু বাদ নেই। তখন ও বলেছিল, গুলি মারো, চিরকাল যা হয়ে এসেছে, তাই করো। তোমার বাবার নামে নাম দাও। গোবিন্দালয়। নয়তো একটা জোরালো ইংরিজি নাম। যেমন ধরো. 'ইভ্যাকুয়েশন'। লোকেদের তাক লেগে যাবে।

ধুৎ! তা কি হয় নাকি? এ একটা সাংস্কৃতিক জায়গা। শান্তিনিকেতন বলে কথা। মুম্বাই কি ব্যাঙ্গালোর হলে ওই নাম জুতসই হত। এখানে ওসব চলবে না। অনেক চিন্তাভাবনা করে অনির্বাণ নাম ঠিক করলেন, বাড়ির নাম হবে 'গল্পগুচ্ছ'। এই নামে রবি ঠাকুরের একটা বই আছে বলে শুনেছেন। অথচ এই নামে কারুর ছেলেপুলে বা ঘরবাড়ি নেই।

সেই বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। বাড়ির পাশে বাগান। নার্সারির লোকেরা এসে বানিয়ে দিয়ে গেছে।

বাছা বাছা ফুলগাছ, ফলের গাছ। সব ইউনিক। বাগানের মাঝখানে ঝরনা হয়েছে। সুইমিং পুল হয়েছে। কড়মড়ে মোরাম দেওয়া হাঁটার জায়গা হয়েছে গেট থেকে বাড়ি অবধি। পেছন দিকে চাকরবাকরদের ঘর। শান্তিনিকেতনে মশা বড় বেশি। তাই সমস্ত ঘর কাচ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন অনির্বাণ। ঠান্ডা মেশিন কিনে বসিয়েছেন। সেখানে আবার প্রায়ই পাওয়ার কাট হয়। তাই নিজের জেনারেটর লাগিয়ে নিয়েছেন। ঘরের ভেতর দিয়ে দোতলায় যাবার সিঁড়ি। ওপরের ঘরে কাচের সিলিং। তার মধ্য দিয়ে রাতের আকাশ দেখা যায়।

আর কী চাই। টাকা ছড়ালে দুনিয়ায় কী না পাওয়া যায়? বন্ধু? হ্যাঁ, তা-ও দু'-চারজন জোগাড় করে নিয়েছেন। বেছে বেছে। খুব বুড়ো না, আবার খুব জোয়ানও না। টেলিফোন করলে চলে আসে। আড্ডা হয়। লোকাল কালচারের গানটান বাজানো হয়। তারপর এক সময় তারা টলতে টলতে বাড়ি চলে যায়।

মাঝে মাঝে এসে থাকেন। যা চান, হুকুম করলেই পেয়ে যান। কেবল খুচরো পয়সা পাওয়া ভাবী মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতা থেকে কত জিনিস নিয়ে আসতে হয় সেখানে, তাব ওপব থলি ভরতি করে কয়েন আনা কি সম্ভব?

এবারে এসেই তাই কাণ্ডটা ঘটল।

রিকশা থেকে নেমেছেন। ঢাকার মতো শান্তিনিকেতনেও একমাত্র ট্রান্সপোর্ট হল সাইকেল রিকশা। আট টাকা ভাড়া দিতে হবে। একটা দশ টাকাব নোট বার করলেন অনির্বাণ মহাপাত্র। দু'টাকা ফেবত দাও।

রিকশাওয়ালা বলল, খুচরো পয়সা তো নেই বাবু।

তা হলে কী হবে?

লোকটা মুখ নিচু করে নিজের সিটের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে আছে দেখে তাঁব বাগ চড়ে যায়।

বললেন, তা হলে যাও, পরে নিয়ে যেয়ো ভাড়া।

সে বলল, নোটটা দ্যান। দু'টাকা পরে দিয়ে দোব। আপনাব কাছে দু'টাকা তো হাতেব ময়লা।

হাতের ময়লা। রোজগার করতে হয় না বুঝি? এমনিই তিনি গরিব লোককে দু'চক্ষে দেখতে পাবেন না। তার ওপর যদি সে বেয়াদব হয়, তো কথাই নেই।

অনির্বাণ বললেন, রোজ রোজ ভাড়া নিয়ে ঝঞ্ঝাট। নাঃ, রিকশাটা আমি কিনে নেব। কত দাম দিতে হবে বলো।

লোকটা এবাব তার সিট থেকে নেমে দাঁড়াল। বলল, তা হলি তো ভালই হয়। কিনে ন্যান। পাঁচ হাজার টাকা পেলে ছেড়ে দেব গাড়িটা।

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশটা একশো টাকার নোট গুনে গুনে তাব হাতে দিয়ে দিলেন অনির্বাণ। স্বস্তি পেয়ে বাঁচলেন।

গল্পগুচ্ছ-র গেট থেকে মোরামের রাস্তা ধরে কড়মড় শব্দ করতে করতে লোকটা চলে যাচ্ছে দেখে তাঁর খেয়াল হল, আরে। শুধু রিকশাটা নিয়ে কী করব আমি? চালাবে কে?

চেঁচিয়ে ডাকলেন লোকটাকে। শোনো, শোনো। রিকশওয়ালা ফিরে এল।

তোমার নাম কী?

আজ্ঞে সদানন্দ।

সদানন্দ কী? পদবি কী?

আজ্ঞে দলুই।

এস.সি.? এস.টি.? না ও.বি.সি.?

তা তো জানি না। আমি রিকশা চালাই।

কতদিন ধরে চালাচ্ছ?

আজ্ঞে, তা দশ বছর-বারো বছর হবে।

তোমার বয়স কত?

তা তিরিশ-চল্লিশ হবে। ঠিক জানি না।

অনির্বাণ একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন,

তোমার বোজ কত মজুরি হয়? রোজগার কত?

রিকশাওয়ালা বলল, তিরিশ টাকাও হয়। আবার মেলা-পার্বণ থাকলে দুশো টাকাও হয়। সারা বছর বাজার তো সমান থাকে না।

অনির্বাণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার স্বরে বললেন, শোনো। আমি তোমাকেও কিনে নিতে চাই। নইলে এই রিকশা চালাবে কে? রোজ রোজ খুচরো পয়সা নিয়ে ঝঞ্ঝাট আমি চাই না। আমি চাই আমার নিজের রিকশা। নিজের পার্মানেন্ট রিকশাওলা। বুঝতে পেবেছ?

সদানন্দ এর আগে অনেক রকম কলকাতার বাবু দেখেছে। রোগা, মোটা। চকচকে মুখ। ঝকঝকে টাক। উদার, কৃপণ। কিন্তু একদম উদোম পাগল বাবু এব আগে দেখেনি। ওর একটু মজাই লাগল, অনির্বাণের কথাটা শুনে মনে হল, বাবুর কাছে বিককিবি হয়ে গেলে ওর সুবিধেই হবে। সারা জীবনের মতো একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

কত দাম দেবেন? সে জানতে চাইল।

তুমিই বলো। তোমার জিনিস। মানে, তুমিই জিনিস।

একটু ভেবে বলছি।

সদানন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। ট্রেনে কাটা পড়লে লোকে দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পায়, ও শুনেছে। ওর দাম তার চেয়ে বেশি কি হবে? হবে না। কিন্তু টাকাটা তো নেবে ওর বউ। তাই তো বেওয়াজ। ট্রেনে কাটা-পড়া লোকেব দাম তো তার বউ পায়। কিন্তু সব টাকাটা বউকে দিয়ে দিলে ওব নিজেব থাকবে কী? রিকশাটা বেচে অন্তত এক হাজাব টাকা লাভ হয়েছে ওর। মালিককে চার হাজার দিলেই সে খুশি হবে। কিন্তু ওর মালিক কি ওব বউ? বউ কি ওকে বেচে দিতে পারে? ওর নিজের বলতে কি কিছু নেই? এই যে ওর গা, ওব পা দুটো, ওর হাত, মুখ, এব তো একটা আলাদা দাম আছে। বেঁচে থাকার তো একটা দাম আছে। মরার দামের চেয়ে একটু বেশি।

এইসব সাতপাঁচ ভেবে সদানন্দ বলে, পঁচিশ হাজার টাকা।

শুনেই লাফিয়ে উঠলেন অনির্বাণ মহাপাত্র। পঁচিশ হাজার? বলো কী? পঁচিশ হাজারে এক জোড়া ঘোড়া পাওয়া যায়, জানো? পাঁচ জোড়া বলদ হয়। লজ্জা পেয়ে সদানন্দ বলল—আজ্ঞে, বেশি বলে ফেলেছি? তা হলে কুড়ি হাজারই দেবেন।

না, দশ হাজাব।

অনির্বাণ সদানন্দর হাতখানা টিপে টিপে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। পেটে ঘুঁসি মেরে চেক করেন লিভাব ঠিক আছে কিনা। সদানন্দ হাঁ করলে দেখলেন ক'টা দাঁত নেই। চারটে। জিভ ময়লা। চোখ দুটোও কোটবে বসা। তবে বছর পাঁচেক টিকলে দাম উঠে আসবে।

দাম চুকিয়ে দিয়ে ঘরে তুললেন সদানন্দকে। গল্পগুচ্ছ বাড়ির চাকরদের মহলে ওর জায়গা হল। খুচবো পয়সা নিয়ে আর সমস্যা থাকল না।

কিন্তু ঝামেলা বাধল তার পরের দিন।

ভোরবেলা শান্তিনিকেতনে কোকিল ডাকছে। ফুরফুর করে বইছে ঠান্ডা হাওয়া। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। গল্পগুচ্ছ বাড়ির একান্ত গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ছোটখাটো একটা ঘোমটা-পরা বউ।

কলকাতা থেকে আনা প্যান্ট-পরা বেয়ারা গিয়ে খবর দিল ভেতরে। অনির্বাণ বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, গেটের বাইরে দাঁড়ানো লাল শাড়ি-পরা বউটা কাঁদছে। আর গেটের ভেতরে তাঁর সদ্য-কেনা সদানন্দ দলুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুক্ত পুরুষের মতো হাসছে।

বউটা তাঁকে দেখে বলে উঠল, বাবু, এ আপনি কী করলেন? আমি ওকে ছেড়ে কী করে থাকব? আপনি আমাকেও কিনে ন্যান। আর নয়তো আমার সদানন্দকে বেচে দ্যান। ওই মিনশের স্বভাব ভাল না। আমার কাছে টিট থাকে।

বেচার প্রশ্নই ওঠে না। অনির্বাণ বউটির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন কী কী কাজে ওকে ব্যবহার করা যায়। ওর ন্যায্য মূল্য কত হতে পারে। ওই বেনে বউটার?

১৯৯৫

দ্যাখ ভূষণ, এই যে আমরা বাবলির কটেজে এসে এই ক'দিন আছি, ঠিক কত দিন আছি খেয়াল নেই, মনে হচ্ছে জীবনের বাকি ক'টা দিনও এখানেই কাটিয়ে দিই। কী হবে কলকাতায় ফিরে গিয়ে? কলকাতা একটা মহানগর। সেখানে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে লোকে থাকে, টাকা কামাবার জন্যে ছুটে বেড়ায় সারাদিন, রাত্তিরে শুতে বাড়ি আসে। বাড়ির দরকার শুধু শোয়ার জন্যে। কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম, তারপর আবার দৌড়। ওই বিশ্রামের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এক চুমুক প্রেম, এক স্লাইস আদর। তা-ও ভয়ে-ভয়ে। হজম হয় না। মাত্রা বেশি হয়ে গেলে ঝালঝাল ঢেকুর ওঠে।

কেন বল তো? রাইট। মনে শান্তি নেই। কারুর মনে শান্তি নেই। সব সময় বিরক্তি। আর ত্রাস। এই বুঝি অপমান করল কেউ। এই ছাতার খোঁচা লাগল। আর একটু হলে চোখটা যেত। এই কাদা ছিটোল চাকা থেকে। ট্যাক্সি থেকে নামতে গিয়ে দামি জামায় লেগে গেল তেলকালি। ও আর উঠবে না। বাড়িব লোক বেরিয়ে গেলে না-ফেরা অবধি উদ্বেগ। গাড়ি-চাপা পড়ল না তো? কেউ তুলে নিয়ে গেল নাকি মিছিলফিছিলে ঢুকে পুলিশের গুলি লাগল? বাড়িতে বসে বসে কেবল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকা। কোনও মানে হয়?

আর, কাজ বলতে তো আমাদের আর কিছু বাকি নেই। জীবনের কর্তব্য বলতে যা-কিছু, সব শেষ হয়ে গেছে। এখন ঝাড়া হাত-পা। সঞ্চয় যা আছে, ওই স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাঙ্কে গচ্ছিত, আমাদেব বুড়ো-বুড়ির বাকি জীবন চলে যাবে। ওদের বললে মাসে মাসে সুদের টাকা এই বাবলির ঠিকানায়— পোস্ট আপিস অ্যান্ড ভিলেজ দ্বারোন্দা, ভায়া ইলামবাজার, জেলা বীরভূম, পিন সাত লক্ষ একত্রিশ হাজাব দুশো ছত্রিশ—ওরা পাঠিয়ে দেবে।

কীরে ভূষণ, চুপ করে আছিস কেন? মন সায় দিচ্ছে না? অসুখবিসুখের কথা ভাবছিস? দ্যাখ, আমাদের এই বুড়ো বয়সে আধিব্যাধি একটু থাকবে। এখানে হাতের কাছে অত ডাক্তার নেই, ঠিক কথা। দাঁত ব্যথা করছে—ডেনটিস্ট; বুক কনকন করছে—হার্ট স্পেশালিস্ট, পা মচকে গেল—অমনি ফিজিয়োথেরাপি, এসব এখানে পাবি না। তবে দরকারও হবে না রোজ রোজ। শরীর খাবাপ লাগলে ভৈরব মালকে বল, সে ওই জঙ্গল থেকে শেকড়বাকড় তুলে এনে দেবে, সহদেবের লোক বেটে দেবে শিলে, খাও বা লাগাও, সেরে যাবে। আরে, বেশির ভাগ অসুখ তো মনের, মনটাই যদি তুলে নিস ব্যস্ততা থেকে, অসুখও থাকবে না। তোর বউ, কী যেন নাম, সুমি, ওর নাকি খুব মাথা ধরে, বমি হয়, কই এই ক'দিনে এত অত্যাচার হল, ও তো কাহিল হয়নি। কাল দুপুরে ও গাছে চড়ে বসে ছিল।

আমি বলি, সুমি, করছ কী?

ও বলে, পেয়ারা খাচ্ছি।

আমি বলি, অসময়ে পেয়ারা খেলে অম্বল হবে না? ফলমূল তো সকালবেলা খাবার জিনিস। আর, কী রোদ।

ও বলে, আমি তো খেতে আসিনি। আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম কুমড়ো তুলতে। পেয়ারা আমায় ডাকল, ও দিদি, পেকে বসে আছি যে, তুমি না খেয়ে চলে যাচ্ছ?

আমি বলি, খুব চালাক হয়েছ দেখছি। পেয়ারা তোমায় দিদি বলে ডাকে? বয়েস কমছে, না? বালিগঞ্জে দোকানিরা তোমায় মাসিমা বলত, আমি জানি না বুঝি!

তুই বিশ্বাস কর ভূষণ, শুধু তোর বউ না, আমার বউ মিতা, সে-ও যাকে বলে বুড়ি, তাই হয়েছে। আজ না, অনেক দিনই বুড়ি হয়েছে সে। ওপর থেকে মোটাসোটা দেখায়, ভেতরে একেবারে শুকনো। পেটের চামড়া লুচ লুচ করছে। আজ পনেরো বছর আমাদের সেক্সলাইফ বলতে কিছু নেই। কাল রাত্তিরে ওই কটেজের বিছানায় সেই মিতা আমাকে ডেকে নিল। আগের মতো হল না, তবু গা ঘষাঘষি হল তো আমাদের। কতদিন পর আমি ওর মুখে টুথপেস্টের গন্ধ পেলাম।

তুই হাসছিস। ভাবছিস, এখানকার খাবার খেয়ে, হাওয়া পেয়ে আমাদের যৌবন ফিরে এসেছে, এই কথা আমি বলতে চাইছি। না। যে যৌবন গেছে, সে আর ফিরবে না। তবে একথা তো মানবি যে, এখানে এসে অবধি খিদে হচ্ছে খুব। টাটকা সবজির স্বাদই আলাদা। তুই কি জানিস, বাবলির এই চল্লিশ বিঘে

জায়গা একসময় চৌপাহাড়ি বনভূমির অন্তর্গত ছিল? সেই বন কেটে কেটে লোকে ফাঁক করে দিয়েছিল? তার ফলে এখানকার মাটি ধুয়ে যায় বছরের-পর-বছর বর্ষায়? ফসল ফলে না? সেই কাঁকরের ওপর আবার গাছ গজিয়েছে। মাটি আবার ফিরে পেয়েছে তার প্রাণ। তুই কি জানিস, এখানকার ফল-সবজি বোলপুরের বাজারে বিক্রি হয়? এখানকার দুধ সাইকেলে করে যায় শান্তিনিকেতনের পাড়ায় পাড়ায়? খাঁটি দুধ। আরও অনেক কিছু। আমরা, অর্থাৎ এই বাবলির স্বেচ্ছাসেবক পনেরো-কুড়িজন মানুষ আর চারজন অতিথি তো সব উৎপাদন খেয়ে শেষ করতে পারব না।

মনে পড়ছে, আমরা যেদিন আসি, সেদিন শামু জিপসি গাড়িটা নিয়ে বোলপুর স্টেশনে এসেছিল। শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস থেকে আমরা নামলাম। তখন দুপুর একটা। শামুকে বললাম, এখানে কিছু খেয়ে নিই। ও বলল, না, না বাবলিতে গিয়ে খাবেন। ওখানে দাদা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে শহরের মধ্যে খানিক দূর গিয়ে ও গাড়িটা দাঁড় করাল। হর্ন দিল। মুহূর্তের মধ্যে একজন লোক এসে কিছু মালপত্র নামিয়ে আবার কিছু মালপত্র তুলে দিয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করি, কী এসব?

শামু বলে, আঠারোটা লাউ আর দশ কেজি পেয়ারা দিয়ে গেলাম। আর তুললাম কুড়ি কেজি সরষের তেল।

এখান থেকে তেল কেনো বুঝি? কী দর? আমি জানতে চাই। ও বলে, না, না, আমাদের সরষে। সাতচল্লিশ কেজি সাদা সরষে দিয়ে গিয়েছিলাম, তা থেকে পেলাম কুড়ি কেজি তেল। আর সাতাশ কেজি খোল।—কী হয় খোল দিয়ে? না, গোরুতে খায়, সার হয়, মাছের খাবারে লাগে। ওই সরষের তেল দিয়ে বাবলিতে রান্না হয়। ভূষণ, তুই বলেছিলি, এই বয়েসে সরষের তেল খাওয়া কি উচিত? আমরা সূর্যমুখী বীজের তেল খাই। পরে আমরা তো দেখলাম, বাজারের তেলের সঙ্গে তার কত তফাত। বং ফিকে হলুদ। একটুও ঝাঁঝ নেই। জিজ্ঞেস করায় সহদেব বলল না, ঝাঁঝ করতে বাজারে অ্যাসিড না কী যেন মেশায়। খাঁটি সরষের তেল এই রকমই। সূর্যমুখী তেলের চেয়েও স্বাস্থ্যকর।

আজ, এই ভোরবেলা, এই টিলার ওপর ছাউনির নীচে বসে আছি আমরা দু'জন। আকাশে আটকে আছে থকথকে সাদা মেঘ। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। বর্ষার শেষে একটু শীত শীত লাগছে, তাই না? আমি তো গায়ের চাদর নিয়ে বেরোলাম। তুই হেঁটে এসেছিস খানিকটা, তাই ঘামছিস। ওই দ্যাখ, দূরে কলাখেতের পাশ দিয়ে দু'জন হেঁটে যাচ্ছে। হাতে দড়ি-বালতি। ওই বোধহয় শক্তিপদ আর তার ছোট ভাই। পেছন পেছন একটা কুকুর। দুধ দুইতে চলল। যাবি ভূষণ? চল না। আমরা দুধ দোয়া দেখি। ছোটবেলায় কত দেখেছি। প্রথমটা চ্যাং-চোং করে শব্দ হয় খালি বালতির গায়ে। তারপর ফরর-ফরর, ফুলে ওঠে দুধের ফেনা। সেই ফেনার ক্রিম বাব বার বাঁটে লাগিয়ে দুধ টানে ওরা। দুধ দোয়ার মধ্যে একটা জৈব আনন্দ পাওয়া যায়। আমি চেষ্টা করে দেখেছি। আর, কী নরম না ওই গোরুর বাঁট। তুলতুলে নরম। হালকা গোলাপি রং। এই এতবড় বলের মতো পালান। হাত দিয়ে ঘাঁটতে গিয়ে, কী বলব ভাই, আমার তো ইরেকশন হয়ে গেল।

সেদিন মিতা এক কাণ্ড করেছে, জানিস। ওই কাউ শেডে গিয়ে ঘুরে ঘুরে গুনল, তেরোটা গোরু পাঁচটা বাছুর। একপাশে, বেড়ার আড়ালে, একটা ষাঁড়। বোকার মতো জিজ্ঞেস করল, ষাঁড় কেন?

তো শক্তিপদ বলল, ব্রিডিংয়ের জন্য কাজে লাগে। কাছেপিঠে তো আর কোনও ফার্ম নেই। গ্রামের লোকেরাও তাদের গোরু নিয়ে এখানে পাল ধরাতে নিয়ে আসে।

ওব কথা শুনে কী বুঝল মিতা জানি না, পরে ব্রেকফাস্টের সময় ও বিক্রমকে সরাসরি চার্জ করল, তেরোটা গোরুর জন্যে একটা ষাঁড় কেন?

বিক্রম হাসতে হাসতে বলে, আপনি কি তেরোটা ষাঁড় রাখতে বলেন? আপনি কি পলিগ্যামির বিরোধী?

মিতা বলে, গোরুগুলো বাচ্চা ক্যারি করবে, প্রসব করবে, দুধ দেবে, আর উনি শুধু মজা লুটবেন?

ও আজকাল বেশ নারীবাদী হয়ে উঠেছে। আমি তাই ঠেস দিয়ে বললাম, ওদের সমাজও পুরুষপ্রধান।

বিক্রম বলে, না, না, ব্রিডিংয়ের এই নিয়ম। অন্য জায়গায় তো ষাঁড়ও লাগে না, কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চা করা হয়। এখানে তো সরকারি কেন্দ্র নেই। ইলামবাজারে আছে। ওই ব্যবস্থাই করব ভাবছি।

কেন?

ষাঁড়টা বড্ড বেশি খায়। আর, ছাড়া পেলেই লোককে গুঁতোয়। বদরাগি। ওকে বিদেয় করে দেব অবশ্য সে কারণে নয়। প্রজননগত সমস্যা হচ্ছে। একটাই পুরুষ—মা, মেয়ে, নাতনি, সবাইকে নিচ্ছে। ঠিক না।

মিতা বলল, ইম্‌মরাল।

আমরা সবাই খুব হাসাহাসি করলাম সেদিন। আসলে সব বনভূমি, কৃষিভূমি, পশুপালন কেন্দ্র হল প্রজনন কেন্দ্রিক। প্রকৃতির প্রধান কাজ তো ওটাই। জন্ম দেওয়া, ফলানো, বংশবৃদ্ধি করা। যে মজার কথা মিতা বলল, সেটা প্রকৃতিই দিয়েছে প্রাণীর মধ্যে। না হলে স্ত্রী-পুরুষ কাছেই ঘেঁষত না।

এখানে আমরা সেই প্রকৃতির কোলের ওপরে বাস করছি। সভ্য জগতের সফিস্টিকেশন এখানে নেই, তাই টেনশনও নেই। আচ্ছা, ভূষণ, সফিস্টিকেশন শব্দটার ঠিক মানে কী বল তো। না, পরিশীলন না, ওর মানে হল দূষণ। প্রকৃতিকে, প্রবৃত্তিকে, ভেজাল দিয়ে পালিশ করা। এ হল মানব সভ্যতার অবদান। আমাদের কষ্টের একটা বড় কাবণ।

ওই দ্যাখ, এক পাল ছাগল শেড থেকে পিলপিল করে বেবোচ্ছে মাঠের দিকে। কালো, সাদা, হলদে—কত রকম রং। আলোছায়া। আততায়ীর চোখে ধুলো দেবার জন্যে প্রকৃতিই প্রাণীর চামড়ায় ওই রকম বাহার করে দেয়। ছাগলকে দেয়, বাঘকেও দেয়। জঙ্গলের নিয়মে কারুর জীবনই নিরাপদ নয়। এখানে অবশ্য ওদের সে-ভয় নেই। তবে পোষবার জন্যে তো ওদেব বাখা হয় না। একটু বড় হলেই মাংস হয়ে যায় ওরা। থাকে ওই প্রেগন্যান্ট মাদিগুলো। বছরে দু'বার বাচ্চা দেয়। দ্যাখ, দ্যাখ, ভাবী শরীর নিয়ে ওই কালো দুটো প্রেগন্যান্ট মাদি কীভাবে হাঁটছে। ওই সরু সরু পা, ভাবসাম্য বজায় রাখতে বেচাবাবা একেবারে নাকাল।

একটা সময় ছিল, মনে পড়ে ভূষণ, যখন আমাদের বউরা প্রেগন্যান্ট হয়ে ঘুরে বেড়াত সবাই। নাইটিন সিক্সটি সেভন, সিক্সটি এইট, সিক্সটি নাইন। সেভেনটি। তোর বউ, আমার বউ। বিপুল রক্ষিতের কালোপানা বউটা, মনে পড়ে? রমেনের বউ বাসবী—পিকনিকে লুকিয়ে লুকিয়ে উনুনের ছাই খেতে গিয়ে যে মুখ পুড়িয়ে ফেলল? কী লজ্জা। আঁচল দিয়ে যত ঢাকে, ততই পেট বেরিয়ে যায়। ভারী সুন্দব সময় ছিল সেটা, না রে?

যৌবনের হুটোপাটি থামিয়ে হঠাৎ আমরা সবাই এক এক কবে বিয়ে করে ফেললাম। তুই আবার একটু যাকে বলে রোমান্টিক প্রকৃতির ছিলি। মনস্থিব করতে পারছিলি না। শেষকালে সুমিকে তোর মনে ধবল। তখন আমাদের প্রথম ছেলে বাবুয়া এসে গেছে। চার বছর পর আমাদের দ্বিতীয়টি, আর তোদের বড়টি একসঙ্গে। একই নার্সিংহোমে। দুটোই মেয়ে। আমরা পরামর্শ করে নাম রাখলাম, বীণা, তৃণা। তারপর তুই বদলি হয়ে গেলি। আমার প্রমোশন হল। উঃ কী মধুর ছিল সে-সব দিন। ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। কাঁথা, বালিশ, তোয়ালে, বেবিফুড—তখন কী আকাল বেবিফুডের—, রাত্তিরে ঘুমোতে দেয় না বাচ্চা। দাঁত উঠছে, ঝিনুক-বাটি, বোতল, ঝুমঝুমি। ভালবাসার সোঁদা গন্ধের মধ্যে ডুবে থাকা। দুধে-ভেজা, মুতে-ভেজা বিছানা, কাপড়চোপড়।

বাবুয়া এখন চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক। কোয়ার্টার পেয়েছে। বিয়ে দিয়ে দিলাম। ওর বউও চাকরি পেয়ে গেছে একটা। ওসব জায়গায় চাকরির তো অভাব নেই। তো, মিতা বলে দিয়েছে, দেখো বাপু, তোমরা সাত তাড়াতাড়ি যেন বাচ্চা কোরো না। কয়েকটা বছর নিজেদের মতো জীবন উপভোগ করো। সংসার বেড়ে গেলে আর তা সম্ভব হবে না। আরে, বাচ্চা করাটাও যে ভোগের মধ্যে পড়ে, সে-কথা কে ওকে বোঝাবে আজ?

তোর মেয়ে তৃণা—সে তো এখন আমেরিকায়—তাই না? পি এইচ ডি করতে গেছে। করুক। তারপর ওখানেই কাউকে পছন্দ করে বিয়ে করবে। আমাদের রীণার তো ডিভোর্স হয়ে গেল।

পরে তোদের একটি ছেলে হয়েছিল না? হয়নি? তা হলে রমেনের সঙ্গে ভুল করছি। নাকি বিপুল রক্ষিতের সঙ্গে। ছেলেটা আমাদের আপিসে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল। বেশ চালাক চতুর। ওর বায়োডাটায় দেখি বাপের নাম—আমার চেনা। আমার এককালের বন্ধু। চাকরিটা হয়নি অবশ্য। তারপর আমি তো রিটায়ার করলাম। কিন্তু শুনেছিলাম আমি, তোদের আর একটি—ও, মিস ক্যারেজ! তাই বল। সত্যি, কী তাড়াতাড়ি জীবনটা কেটে গেল ভূষণ, তাই না রে? এখন শুধু মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা।

তাই বলছিলাম, শেষ কয়েকটা বছর এই বাবলির মতন এক বনভূমিতে, কোনও একটা কটেজে বাস করে, ঘাস, ফুল, সবজির মধ্যে কাটিয়ে দিই। তোর আঙুলে ওটা কীসের আংটি রে, ভূষণ? গোমেদ, না পলা? ওতে কী হয়? আয়ু বাড়ে? জীবন বিপদমুক্ত হয়? স্বাস্থ্য ভাল থাকে? আমি ওসব কোনওদিন বুঝলাম না। তাই নিরন্তর সংশয়ে ভুগি। একটা বিশ্বাস নিয়ে থাকা ভাল। সে যদি অন্ধ বিশ্বাসও হয়।

ভূষণ, তুই ওই পাথরের আংটি পরে গ্রহনক্ষত্রের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করছিস। আমি এই কাজটা বুদ্ধি দিয়ে করে এসেছি বরাবর। জীবনে অন্যায় কাজ করেছি অনেক। কই, তার জন্যে তো শাস্তি পাইনি। শাস্তি এড়িয়ে গেছি কায়দা করে। আমার ব্যবহারে অবাক হয়েছে, কষ্ট পেয়েছে যারা, তারা হয়তো জীবনে আমাকে ক্ষমা করবে না। তো কী হল? আমার কী ক্ষতি হল বল। ক্ষমতায় থাকলে মানুষ ও রকম দুর্ব্যবহার করে। আত্মরক্ষার জন্যে করে। দুর্বলের ওপর সবল তো জোর খাটাবেই। তার যা প্রাপ্য, তার চেয়ে চাহিদা বেশি। কেড়েকুড়ে নেওয়া ছাড়া উপায় কী। এ-ও পশুধর্ম। সভ্যতার মধ্যেই এই পশুধর্ম লুকোনো রয়েছে। আর সেই পাপ ঢাকতে, শক্তিমান যারা, তারা ধর্মের বাণী প্রচার করে। অহিংস হও। সহ্য করো। মানুষকে ভালবাসো। একগালে চড় খেলে আরেক গাল বাড়িয়ে দাও শত্রুর দিকে। এসব কাকে শেখানো হচ্ছে বল দেখি। ওই দুর্বলদের। যেন ওরা শান্ত থাকে। যেন ওরা রুখে না ওঠে। ভগবান আছেন, এই কথা যদি সত্যি হত, তা হলে আমার মতো লোকের ফাঁসি হয়ে যেত কবে। অন্তত, এখানে সাপে কামড়াত। প্রচুর সাপ আছে এই মাটির নীচে। এরা মারে না। আমি যে তোর ওপরও অন্যায় করেছি, ভূষণ। সে-কথা ভুলিনি। মিতাকে তুই ভালবাসতিস। আমি ধাপ্পা দিয়ে ওকে ছিনিয়ে এনেছি তোর কবল থেকে। তখন ভেবেছিলাম, খুব জিতে গেছি।

মিতা আমাকে বলে, পশু। আজ উনত্রিশ বছর ধরে বলে আসছে। প্রথম প্রথম ভাবতাম, ওটা মেয়েদের ভালবাসার ডাক। পশুর মতন না চটকালে মেয়েদের শরীরের তৃপ্তি হয় না। পরে মনে হয়েছে, ওই ডাকের মধ্যে ঘেন্নাও আছে। কারুর সঙ্গে তুলনা করে ও আমাকে ঘেন্না করে। আমি মাইন্ড করি না। ছেড়ে তো যায়নি। ভোগ করতে দিয়েছে তো। যতদিন পেরেছে। আমাদের মেয়ে রীণা যাকে বিয়ে করল, তার সঙ্গে সাত বছরের প্রেম। কলেজবেলা থেকে। বিয়ের পর একটা বছর গেল না, ও চলে এল। ঘেন্নায় ওর মুখ তখন কুঁচকে গেছে। আমি জানতে চাইলাম, কী হয়েছে। ও একটা শব্দই উচ্চারণ করল, পশু। এখানে আসার পর আমার আর পশু শব্দ নিয়ে কোনও গ্লানি নেই। ওপরের চাকনচিকন ধুয়ে ফেললে সব প্রাণীর মধ্যে পশুই থাকে। আমরা মানুষেরা নিজেদের আর সব প্রাণীদের থেকে আলাদা করে দেখতে চাই। যেন আমরা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

ভূষণ, তুই তো স্বীকার করবি, ব্রহ্মাণ্ডের অকিঞ্চিৎকর এক ছায়াপথ—তার সাধারণ একটা তারা—তাব তুচ্ছ একটা গ্রহের জীব আমরা। কল্পনা কর। স্যাটেলাইট থেকে দেখছিস। কী দেখবি? খানিকটা জল আর খানিকটা সবুজ; মেঘের আড়ালে চিকচিক করছে। সেখান থেকে উইটিবিও যা, মহাকরণও তাই। জ্যোতিবাবু আর ভৈরব মালে কোনও তফাত নেই।

সেই জন্যেই কে-কার সন্তান, সে-প্রশ্নও অবান্তর মনে হয়। ভূষণ। ওই দ্যাখ। টম্যাটো আর শসাখেতের মাঝখান দিয়ে চলেছে তিনজন। সামনে নমিতা হালদার, মুরগিঘরের মেট্রন, আর তার পেছনে হাত ধরাধরি করে আমাদের দুই গিন্নি। কখন ঘুম থেকে উঠল, বেরুল, দেখতে পেলাম না। কেমন দুলে দুলে হাঁটছে দ্যাখ। যেন দুটি কলেজ গার্ল। ওদিকটায় কাদা, আবার পা পিছলে পড়ে না যায়। একজন তো চোখেও ভাল দেখে না। একী? দাঁড়িয়ে পড়ল! ঝুঁকে কী দেখছে? সাপ নাকি? না। শশা তুলছে। টম্যাটো ছিঁড়ছে গাছ থেকে। কাঁচা টম্যাটো। খাচ্ছে রে! না ধুয়েই। ইস্, কত মাটি, কত নোংরা। পোকামাকড়। পেটের অসুখ না করে। ওদের সাহস বেড়ে গেছে বড্ড! এই টিলার ওপর থেকে দূরে ওদের মনে হচ্ছে যমজ দুটি বোন। দুটো শালিকপাখি। দুটো কাঠবিড়ালি। তুই নিবি? মিতাকে নিবি, ভূষণ? নিয়ে নে। আমি কিছু মনে করব না। ওরও হয়তো ভাল লাগবে। সেদিন দেখলাম, আখখেতের ওদিকটায় ও তোর হাত ধরে টানছে। পাগলি আছে মেয়েটা। এখন মনে হচ্ছে, বাবুয়া, আমাদের ছেলেটা, যে চণ্ডীগড়ে চাকরি করছে, সে তো তোরও ছেলে হতে পারত। মানে, তোর ঔরসে আর মিতার গর্ভে। এইভাবেই তো বলে। তফাত হত কিছু? আমার বীজে এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে। যা তোর বীজে নেই? আমার সঙ্গে ওর কোনও মিল নেই, জানিস। ও হল, এই প্রজন্ম। ওর মূল্যবোধ আলাদা। কথায় কথায় আমায় বলে, বাবা, তুমি ভুল করছ। তোকেও বলত,

বাবা, তুমি ভুল করছ। বাবুয়ার ভূষণ-বাবা, বাবুয়ার মিতা-মা। ভারী মজা হত।

তোরা যে এখানে আছিস, আমি জানতাম না। কোথা থেকে এই বাবলির সন্ধান পেলি, ভূষণ? তবু, এখানে এসেছিস বলে আমাদের আবার দেখা হল। কতদিন পর। এখন আর তোকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে, আমরা সবাই একসঙ্গে এখানে, এই বনভূমিতে জড়াজড়ি করে থেকে যাই। তারপর মরে গেলে এখানকার মাটিতে মিশে মাটি হয়ে যাব। আমাদের বুকের ওপর কাগজি লেবুর গাছ উঠবে।

চল ভূষণ, আজ দুপুরে, আমরা মাছ ধরি চল। এদের তিন-তিনটে পুকুর। গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়। এখন জলে টলটল করছে। বিক্রম বলেছে, ওদের ছিপ আছে দুটো। মাছ উঠলে সহদেবকে দিয়ে দেব। ও রান্না করবে সরষেবাটা দিয়ে, সরষের তেল দিয়ে। আমরা কাগজি লেবুর রস দিয়ে ভাত মেখে খাব। অনেকটা ভাত খাব। ভাত—যা আসলে ঘাসের বীজ।

১৯৯৫

ঝিনুক

আমাদের এই গল্পে শিখা আর ব্রততী দুটি প্রায় সমান্তরাল চরিত্র। এদের দু'জনেরই বয়েস তেইশ-চব্বিশ, স্নাতক হওয়ার পর কয়েকমাস বেকার থেকেছে। তারপর একটা করে কাজ জুটিয়ে নিয়েছে এরা। প্রথমত মেয়ে বলে, দ্বিতীয়ত সুশ্রী ও যুবতী আর খানিকটা সপ্রতিভ বলেও, তবে তৃতীয়ত এদের দু'জনের জন্যেই বলে দেবার লোক ছিল বলেই এই বেকারি-অধ্যুষিত কলকাতা শহরে শিখা আর ব্রততী আত্মসম্মান বাঁচিয়ে জীবিকা উপার্জন করতে পারছে, থাকতে পারছে আধা-সরকারি এক আবাসনে যেখানে ওদের ঘোরাফেরা, আসা-যাওয়ার ওপর কারও নজরদারি নেই। এককথায় ওরা স্বাধীন, স্বনির্ভর।

পৃথিবীকে কোনও দু'জন মানুষ এক রকম হয় না। এরাও সেই অর্থে এক রকম নয়। তবে কাজের জায়গা ছাড়া অন্যত্র এদের একসঙ্গে ঘুরতে দেখা যায়। কে কোনজন। আপনি যদি শনাক্ত করতে চান, তা হলে বলে দিই, শিখার পরনে দেখবেন সব সময় সালোয়ার-কামিজ, ওর চুল মেমসাহেবের মতো কানের তলা অবধি ছাঁটা, মাথাটি খাড়া। ব্রততী আর সব বাঙালি মেয়ের মতো শাড়ি পরে, বেণী করে চুল বাঁধে। ওর মাথা একটু নোয়ানো, নম্র, ওর কপালে টিপ।

জৈব কারণে, মেয়ে প্রাণীর আশেপাশে ঘুরঘুর করে পুরুষ। পণ্ডিত কেনেথ ওয়াকার তাঁর রচিত জননাঙ্গের আকৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন যে, জীব সৃষ্টির প্রাথমিক স্তরে মেয়ে-পুরুষের মিলন অনিবার্য ছিল না। মাছ থেকে মানুষে আসতে গিয়ে প্রকৃতি বার বার তাঁর কৌশল বদলিয়েছেন যাতে ডিম-নিষেকের প্রয়োজনে অপচয় বন্ধ হয়। যাতে নিশ্চিত করা যায় শাবকের জন্ম। প্রাণীদেহের ক্রমবিকাশ যখন মানুষের কাছাকাছি এসে পৌঁছোল, তখন দেখা গেল স্ত্রীযোনির ভেতরে আমন্ত্রিত হওয়ার মতো করে পুরুষাঙ্গ প্রস্তুত হয়েছে, পুরুষাঙ্গের গঠন ও ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মস্তিষ্ক মধ্যের স্নায়ুকেন্দ্র যাতে বংশবৃদ্ধির প্রেরণায় আনন্দ থাকে। যুবতীকে খুঁজে বেড়ায় যুবক।

পণ্ডিত কেনেথ ওয়াকার নারী শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকৃতি প্রকৃতি ও তাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সভ্য জগতের পুরুষ সঙ্গম কাজটি সমাধা হলেই দায়মুক্ত, কেননা, পরিবারের বাইরে তার আরও অনেক দায়িত্ব আছে। অথচ প্রয়োজনীয় বস্তুটি পুরুষের কাছ থেকে আদায় করার পর থেকেই নারীর জননী-কাজ শুরু হবে, মা হওয়ার জন্যই যে তার জন্ম।

এসব জৈবতত্ত্বের কথা। কিন্তু ওই যে স্নায়ুকেন্দ্রের কথা উঠল, কালক্রমে সেখানে আরও ঢের জটিল

প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করল। একটা করে সমস্যার মীমাংসা হয় তো দশটা নতুন সমস্যা চাগিয়ে ওঠে। মানুষ প্রকৃতিকে পরাস্ত করতে চায়। মানুষ বলতে চায়, বংশবৃদ্ধির তত্ত্বকে অমান্য করো, জন্মশাসন করো, না হলে সকলের খাদ্য জুটবে না। লেমিংদের মতো গণ-আত্মহননের পথ নিতে হবে মানুষকেও। পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে নারীকে দাগ দিয়ে রাখার সোনালি বা রক্তিম সামাজিক রীতিও এখন মানুষ মানতে চাইছে না, তাকে সমান অধিকার দিয়ে বাইরে টেনে আনছে। ইজরায়েলের উপপ্রধানমন্ত্রী সেদিন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে গেলেন, পুরুষপ্রধান সমাজ দুনিয়াকে ছারখার করে দিচ্ছে, এখন মেয়েদের হাতে দুনিয়ার পরিচালনভার ছেড়ে দিতে হবে।

আমরা শিখা আর ব্রততীর কথা শুরু করেছিলাম।

স্কুল-কলেজের শিক্ষা শেষ হওয়ার আগে থেকেই ওদের আশেপাশে ঘুরঘুর করেছে ছেলেরা। একলা পায়নি বলে কেউ একজন অগ্রসর হতে পারেনি। অগ্রসর হলেও এই জুটিকে ভাঙতে পারেনি কেউ। একজন রক্ষা করেছে অপরজনকে। আজ, তাদের এই তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে জৈবতত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করেছে ওরা। পেয়েছে স্বাধীনতার স্বাদ। আর মনের জোর। আড়াই মিনিটের পুলকের প্রতি ওদের ব্যাকুলতা কম।

শিখার উপার্জন মাসে পনেরোশো টাকা। ব্রততীর আর একটু কম। তা হোক। হস্টেলের খরচ জুগিয়ে কিছু টাকা হাতে থেকেই যায়। একটু একটু করে জমতে থাকে। আত্মবিশ্বাস বাড়ে। উৎসুক পুরুষের সান্নিধ্য মন্দ লাগার কথা নয়, সেটা উপভোগ করার ক্ষমতা ওরা হারায়নি। কিন্তু প্রকৃতির যে কৌশলের কথা বলা হচ্ছিল, তার স্বরূপ ওরা জেনে ফেলেছে। সুতরাং একটা সীমার পরে আর কাউকে হাত বাড়াতে দেয় না। পুরুষজাত বড় অধীর। তার লক্ষ্য বড় স্পষ্ট। কোনও ছলনাই সে দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারে না। একসময় নিজেকে এক জায়গা থেকে গুটিয়ে নিয়ে অন্যত্র আবার আনন্দ খুঁজে বেড়ায়, এই তার স্বভাব। অন্তত শিখা আর ব্রততীর কাছাকাছি যারা এসেছিল, তাদের প্যাটার্ন ছিল এই রকম। বন্ধুবেশে এসে বন্দি করার ফন্দি। জৈবসুখের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই দুটি মেয়ে ধরা দেয়নি। এখনও, কতদিন, যখন ওরা আপিস শেষে পার্ক স্ট্রিট কি রাসেল স্ট্রিট দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যায়, শনিবার দুপুরে ফ্লুরিতে গিয়ে বসে পেস্ট্রির প্লেট নিয়ে, তখন চোখাচোখি হয় কারুর কারুর সঙ্গে। হয়তো শুভেচ্ছা বিনিময়ও। সে-সব সৌজন্য মাত্র। ইতিমধ্যে যাদের বিয়ে হয়ে গেছে, তারা আর চিনতে পারে না। বা চিনতে চায় না, পাছে প্রাক বিবাহের ভার্জিনিটি বা ভার্জিন ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাঙালির মেয়ের মতো বাঙালি ছেলেকেও বিয়ের সময় অলিখিত এ্যাফিডেভিট দিতে হয় এই মর্মে যে, তোমার আগে আমি আর কোনও নারী/পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিনি। সে হলফনামা সত্যি হোক আব মিথ্যে হোক। গার্হস্থ্যের আগে ব্রহ্মচর্য এই হিন্দু সংস্কার সামাজিক প্রত্যাশায় এখনও বহাল আছে। বহু বিবাহ প্রথা উঠে যাওয়ার পবেও আরও দৃঢ় হয়েছে বলা যায়।

শিখার আপিসের একটি মেয়ে টুম্পা, বছর খানেক মোটরবাইকের পেছনে চক্কর দেওয়ার পর এক দাড়িওলা সেলসম্যানকে বিয়ে করেছিল। জীবনটাকে উপভোগ করতে গিয়ে দেখে, সেখানে আর এক অংশীদার আছে। সে আর কারুর বউ। সেই বউটির স্বামী প্রায়ই কলকাতার বাইরে ট্যুরে যায়। আর সেই অবকাশে দাড়িওলা সেলসম্যান তার কোম্পানি-ফ্ল্যাটে গিয়ে রাত কাটায়। টুম্পা কান্নাকাটি করেছিল ঢের। অন্য মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে নিরস্ত হতেও বলে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। বরং স্বামীর সঙ্গে টুম্পার সম্পর্কের অবনতি ঘটে যায়। একজন পুরুষ কেন একই সঙ্গে দু'জন মহিলাকে ভালবাসতে পারবে না, নীতিগত এবং জৈব এ-প্রশ্নের উত্তর দেয়নি টুম্পা, যদিও সে জানত, ওই অন্য নারী তার সংসার ভাঙতে আসবে না কোনওদিন। সে তার নিজের নিরাপদ সচ্ছলতার মধ্যে বসে অমনোযোগী স্বামীকে প্রতারণা করবে, যতদিন সম্ভব, তারপর একদিন এই সেলসম্যানকে টুসকি দিয়ে বাইরে বার করে দেবে হয়তো। ওর আঘাত লেগেছিল ধনতান্ত্রিক আত্মমর্যাদায়। শরীর নয় শুধু, মন। তোমার পুরো মন কেন পাব না, আমার মন যখন একাগ্র। "একাগ্রতা মানে একঘেয়েমি তুমিই তো সেদিন কার যেন লেখা পড়ে শোনালে" টুম্পাকে বলেছিল ওর বর। কোন এক বিখ্যাত মহিলা বিয়ের

দিন যে বরকে বলেছিল, আমরা যেন পরস্পরের প্রেমে অভ্যস্ত না হই, আমরা যেন পরস্পরের বিরহেও অভ্যস্ত না হয়ে পড়ি। অথচ, যৌনজীবনকে ডালভাত খাওয়ার মতো অভ্যাসে নিয়ে আসাই বিবাহ-প্রথার প্রধান উদ্দেশ্য।

টুম্পার বিয়ে ভেঙে গেছে। সে আপিসে আসে, কাজ করে আগেরই মতো। কেবল ফেরার সময় গড়িয়ার মিনিবাস না ধরে বেহালার মিনিবাস ধরে। ওর দিকে কেউ তাকায় না। ডিভোর্সি মেয়েকে উপভোগ করার বাসনা এক ধবনেব উচ্ছৃলতা। তাকে প্রেম নিবেদন করার প্রবৃত্তিও যুবকদের থাকে না। মানুষ কি কুকুর যে উচ্ছিষ্ট খেয়ে পেট ভরাবে? বাঙালি সমাজে যোগ্য মেয়ের অভাব কই?

ব্রততীর সহকর্মী উর্মিও ফিরে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। তবে তার কারণ আলাদা। ব্রততী ওর সুন্দর চিবুকে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেখেছিল। কীসের ছ্যাঁকা উর্মি বলত না। মিথ্যে কথা বলত। মাছ ভাজতে গিয়ে তেল ছিটকেছে। তখনও লকার থেকে গয়নাগুলো বার করতে পারেনি ও। লকারের চাবি থাকত শুভঙ্কব, ওব বরের কাছে। আপিসের চাবির সঙ্গে। তখন উর্মির সহ্য পর্ব চলছে।

শোনা গল্প।

একদিন, সন্ধেবেলা আপিসের ককটেল পার্টি। সকালে, শুভঙ্কর বেরিয়ে যাওয়ার এক ঘণ্টা পরে, ও ফোন করল। কী ব্যাপার? ব্যস্ততার মধ্যে জানতে চায় শুভঙ্কর। তার আগের সাত-সাতটা রাত ও সেই হিংস্র জন্তুর সমস্ত নির্যাতন সহ্য করেছে। মুখ বুজে নয়, হাসিমুখে শুভঙ্করকে ওরাল সেক্সের আনন্দ দিয়েছে। উর্মি আদুরে গলায় বলেছিল, আজ তোমার আনা জামদানির সঙ্গে মুক্তোর মালাটা পবব। লকারের চাবিটা ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও না গো। কাজের মধ্যে মন, এক মুহূর্তের অসাবধানতা, চাবিটা তাব হাতছাড়া হয়ে যায়। সেই দিনই লকার খালি করে বাপের বাড়ি চলে আসে উর্মি। ওর পাঞ্জাবি মারোয়াড়ি কলিগের দল, যারা সুযোগ পেলেই বলত, ওথেলো, তুমি এই ডেসডিমোনাকে কোথা থেকে জোগাড় করলে, তারা সেদিনের পার্টিতে কাউকেই দেখতে পেল না। ফাঁকা ফ্ল্যাটে একলা বসে বসে সেই রাত্রে একটা গোটা বোতল শিভাস রিগাল শেষ করেছিল ওই হৃদয়হীন মানুষটা। বিরহের বেদনায় নয়, ঠকে যাওয়ার অপমানে, বার বার আওড়েছিল একটাই লাইন "আই দ্যাট অ্যাম ক্রুয়েল অ্যাম য়েট মার্সিফুল"। ডেসডিমোনাকে ও খুন করতে পারেনি।

খুন করার কোনও কারণও ছিল না এক্ষেত্রে। উর্মির রুমাল তো খোয়া যায়নি। ওর দোষ ছিল একটাই। বাবা যখন এই পাত্রটিকে নির্বাচন করেন, সব দিক থেকে উজ্জ্বল, মেধাবী, উচ্চপদস্থ, চরিত্রবান, কিন্তু কুৎসিত, অস্বাভাবিক কালো রং, মুখে বসন্তের দাগ, নাকটা ব্যাঁকা, চোখের ওপর ভ্রূ নেই, তখন উর্মি বলেছিল, ওকে বিয়ে করবে না। ওদের কোনও দাবিদাওয়া নেই, নববধূর সমস্ত আভরণ অলংকার ওরাই গড়িয়ে দেবে, তবু বেঁকে বসেছিল উর্মি। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, বাবা, ওকে আমি কোনওদিন যে ভালবাসতে পারব না, ওর চোখ দুটো জন্তুব মতো, ওকে বিয়ে করতে বোলো না আমায়। আমি তো তোমার গলগ্রহ নই। আমি তো টাকা রোজগার করি।

আমি মরে গেলে তোকে কে দেখবে? উর্মির বিপত্নীক পিতৃদেব মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, তুই এত সুন্দর, তোকে রক্ষা করবে কে? আমার ওই একটাই চিন্তা।

ভেতরের কথা, যুবতীকে রক্ষা করতে প্রহরী দরকার।

কিন্তু জোর খাটাননি তিনি। জোর খাটাল পাত্র নিজে এসে। তার পরনে দামি স্যুট, গলায় টাই। গা গিয়ে পৌরুষের কোলন-সৌরভ নির্গত হচ্ছিল।

অদ্ভুত করুণ গলায় শুভংকর সেদিন কথা বলেছিল উর্মির সঙ্গে। সে-দৃশ্য আজও ও ভুলতে পারে

না। এই গল্প বলতে গিয়ে প্রথম প্রথম ও কাঁদত। আজকাল বিজয় গৌরব অনুভব করে উর্মি।

ওদের বাইরের ঘরে, এখন সোফা হয়েছে, তখন ছিল দু'খানা হাতলওলা বেতের চেয়ার আর একটা তোশক-মোড়া তক্তাপোশ। তার ওপর চাদরের ঢাকনা। উর্মি পা ঝুলিয়ে বসে ছিল তার ওপর। চেয়ারে-বসা শুভংকরের কুৎসিত মুখটা ছিল উঁচু-করা, উর্মির মুখের অনুভূমিক না হওয়ায় ওকে মুখ তুলে কথা বলতে হচ্ছিল। প্রায় প্রার্থীর ভঙ্গিতে।

আসলে প্রার্থীই ছিল সে। ঘরে আর কেউ ছিল না। শুভংকর বলেছিল, জীবনে সে কোনও মহিলার ভালবাসা পায়নি, সবাই তাকে ঘৃণা করেছে শুধু চেহারাব কারণে। এর জন্য ও দায়ী নয়। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন, আর তাঁর সঙ্গে যদি কখনও ওর দেখা হয়, তবে তাঁকে একটি প্রশ্নই ও করবে, আমায় এত কুরূপ করে গড়েছিলেন কেন? বলেছিল, যখন উর্মির সঙ্গে ওর বিয়ের কথা প্রায় পাকা, তখন থেকে শুভংকর স্বপ্ন দেখছে এক আনন্দময় যুগল জীবনের। যেখানে কোনও গ্লানি নেই, হীনমন্যতা নেই, যেখানে তার পৌরুষ নারীর কাছে সমাদৃত হবে। উর্মি যেন ওকে প্রত্যাখ্যান না করে। উর্মি যেন ওকে ক্রোধের জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করে। ওর সমস্ত ত্রুটি ভালবাসা দিয়ে পূরণ করে দেবে, কথা দিয়েছিল শুভঙ্কর। না হলে ও নষ্ট করে ফেলবে নিজের জীবন।

কী সংলাপ। প্রায় নাটকের মতো।

চোখ নিচু করে ছিল উর্মি। তখনই হ্যাঁ বা না, কিছুই বলতে পারছিল না। আবেগে ওর গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। এমন কবে ওর কাছে কেউ পাণিপ্রার্থনা করেনি আগে। ওকে চুপ কবে থাকতে দেখে শুভংকর ধীবে ধীরে ভেজা গলায় উচ্চারণ করেছিল, লেট মি সি ইয়োর আইজ, লুক ইন মাই ফেস। দয়া করো।

স্কুলে পড়ার সময় একটা সিনেমা দেখেছিল উর্মি। 'হাঞ্চব্যাক অফ নোত্রদাম'। খুব পুরনো ছবি। তাতে একটা কুঁজো কুৎসিত লোককে সবাই ঘেন্না করত। সে-ও ভগবানের কাছে সুন্দর চেহারা পাবার জন্য প্রার্থনা করত। না, শুভংকরের চেহারা তত বিশ্রী নয়, তত ভয়ংকর নয়। উর্মির মনে হয়েছিল, সব মেয়েই তো মনে মনে চায়, একজন কন্দর্পকান্তি পুরুষের সঙ্গে তার বিয়ে হোক। যাকে দেখে অন্য মেয়েরা হিংসে করবে। ক'জন পায়? শেষপর্যন্ত সাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন, মাঝারি মাপের বরকে নিয়েই মেয়েরা সন্তুষ্ট থাকে। গর্ব করে। তার গেঞ্জি কাচে। তার গুণের কথা বলে বেড়ায়। আসল কথা হল ভালবাসা। কাউকে ভালবাসলে তার দোষক্রটি আর চোখে পড়ে না। দক্ষরাজার কন্যা উমা যাঁকে পাবার জন্য তপস্যা করেছিল, সেই শিব। শিবঠাকুর কি বর হিসেবে খুব সুপাত্র ছিলেন? লোকে তাঁর নামে কত নিন্দে করেছে। সে গাঁজাখোর, শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়, ভূতপেতনি তার সহচর। শেষকালে স্বামীর নিন্দে শুনতে না পেরে পার্বতী আত্মহত্যাই করলেন। এই কাহিনী কি লৌকিক? সতীত্ব প্রচারের জন্য বানানো গল্প? সারবস্তুর ছিটেফোঁটাও নেই?

শুভংকরের সংলাপ কিন্তু লক্ষ্যভেদ করে।

ওর জন্যে একজনের জীবন নষ্ট হয়ে যাক, উর্মি চায়নি। তাই রাজি হয়েছিল শেষপর্যন্ত। ওর বাবা খুশি হয়েছিলেন। শুভংকরের বাড়ির লোকেরাও নিশ্চিন্ত হয়েছিল; যাক, একটা হিল্লে হল ছেলেটার। এবার ওরা সুখী হবে। হিরের আংটি সোজা না বাঁকা, কেউ দেখে চেয়ে?

হয়তো সুখী হত। যদি ব্যাংকোয়েট হলের রিসেপশনে ওর চিরকালের শত্রু রাঘবন টলতে টলতে এসে না বলত, এই এঞ্জেলকে তুমি কোথায় পেলে শুভ? প্রোভার্বিয়াল বিউটি অ্যান্ড দি বিস্ট। একে ধরে রাখতে পারবে তো? অ্যাঁ, পারবে? পারবে? পারবে?

নেমন্তন্ন খেতে এসে কেউ এ রকম নির্দয় উক্তি করে না। উর্মির অপরূপ সৌন্দর্যের খবর আগেই আপিসে রটে গিয়ে থাকবে। কলিগদের মধ্যে আড়ালে আবডালে কৌতুকপ্রদ মন্তব্য চালাচালি হয়েও থাকবে। সত্যিই তো, নজর কাড়ার মতো ঘটনা ছিল এটা। কেউ কেউ হয়তো অনুমান করেছিল, ওই

মেয়ে ফিলম লাইনের কোনও পতিতা, ভদ্রসমাজে স্বীকৃতি পাবার জন্যে শুভংকরের মতো হাইফাই ব্যাচেলরকে তক্তা হিসেবে বেছে নিয়েছে। একসময় সুবিধেমতো আবার লাফ দেবে। না হলে, ধরে রাখতে পারার কথা ওঠে কেন? রাঘবন এই কথাগুলো বলবে বলেই তার টিপসি নাকছাবি পরা বউকে নিয়ে আসেনি। অথচ একটা জড়োয়ার নেকলেস উপহার এনেছিল। খুব নম্রভাবে কথা বলেছিল প্রথম দিকে। তারপর তফাতে গিয়ে খানিকটা হুইস্কি পেটে জমিয়ে সাহস সঞ্চয় করেছিল। ও যখন হে-হে করে হাসছে, সামনে থেকে নড়ছে না, অন্য লোকেরা অপ্রতিভ হয়ে সরে গেছে, তখন শুভংকর ওকে জিজ্ঞেস করে, আর ইউ জেলাস? জেলাসি ইজ এ ফেমিনিন ভাইস, তোমাকে সাজে না।

কিন্তু এ ছিল কথার কথা। রাঘবনের শত্রুতা ওর বহুদিনের গা-সওয়া। কেবল ওর মুখ-নিঃসৃত মোক্ষম কয়েকটা ইংরেজি শব্দ এক জনতার উচ্চকিত হাহাকারের মতো বেজেছিল ওর কানে বিউটি অ্যান্ড দি বিস্ট! উর্মি যদি বিউটি হয়, ও নিজে তবে বিস্ট। পশু, জানোয়ার, নরখাদক। ওই জিঘাংসার বীজ ওর মনের মধ্যে উপ্ত হয়েছিল আগেই। উর্মি প্রত্যাখ্যান করেছে, এই খবর যখন প্রথম পায়, পাত্রীর ছেলে পছন্দ হয়নি। তাই নাকি?

তখনই ও মনস্থির করে, যেমন করে হোক, ওই সুন্দরীকে পেতেই হবে। দরকার হলে তাব পায়ে ধরে করুণাভিক্ষা করবে। জীবনে একটা জায়গায় ও হেরেছিল, সেইখান থেকে শুভংকর ট্রাযো তুলবে। তারপব তো ওর হাতে তাস।

এর পরের ঘটনা এক দীর্ঘায়িত হৃদয়বিদারক কাহিনী। যার বিশদ বিবরণ দিতে গেলে বীভৎস রসেরই চর্চা করা হবে। তুমি রূপসি, তুমি আমায় ঘেন্না করো। তোমার অহংকার আমি ঘুচিয়ে দেব। স্বামিত্বের অধিকার থেকে শুভংকর প্রায়ই এই শব্দগুলো উচ্চারণ করত। উত্তেজিত করত উর্মিকে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে উর্মি প্রথমে কান্নাকাটি করত। তাতে কোনও সুরাহা হয়নি। তখন ও প্রতিবাদ করতে শুরু করে, শুভংকরের সঙ্গে ঝগড়া বেধে যায় কথায় কথায়। তাতে নির্যাতন বাড়তে থাকে, কেননা উর্মি ছিল স্বভাবত দুর্বল ও আবেগপ্রবণ। আত্মরক্ষা করতে না পেরে সে সংসারের ভঙ্গুর জিনিসপত্রের ওপর রাগ ঝাড়তে শুরু করে। কাপ-প্লেট ভাঙতে থাকে। সেই ঝনঝন শব্দে ওর ক্রোধ প্রকাশ পায় যা ভাষায় প্রকাশ করা ছিল ওর সাধ্যের বাইবে।

তাতেই সুযোগ তৈরি হয়।

তখন শুভংকর ওকে নানা অভিনব উপায়ে শাস্তি দিতে শুরু করেছিল। অন্যায় করলে শাস্তি পেতে হবেই। এখানে প্রতিপক্ষ ও বিচারক তো একজনই। জেলখানায় যে-সব শাস্তির বিধান আছে, দুর্বিনীত কয়েদিকে শায়েস্তা করতে যে-সব কঠিন পানিশমেন্ট সেখানে প্রচলিত, একটি একটি করে উর্মির ওপর তার প্রয়োগ হতে থাকে। অর্বাচীন বালকের সামনে বাগানের শোভা অসহ্য, সে ফুল ছিঁড়বেই। তার রাগ ফুলের সুন্দর শোভার ওপর যতটা, তার চেয়ে বেশি প্রকৃতির বৈষম্যের বিরুদ্ধে। তার অভিযোগ, ফুল কেন ফুটবে। আর্বাচীন বালকের মুখে মাতৃস্তনের স্বাদ নেই, সে তো ধ্বংস করতে চাইবেই।

ঠোঁটের নীচে সিগারেটের ছ্যাঁকা একটা উদাহরণ মাত্র।

একদিন উর্মি বলেছিল, তুমি আমায় মেরে ফেলো। তাতে যদি তোমার তৃপ্তি হয়।

শুভংকর হো-হো করে হেসে উঠেছিল এই কথা শুনে। বলেছিল, সে তো যে-কোনও সময়েই পারি। নরম ননির মতো তনু তব, বলতে বলতে ওর ডান হাতখানা পাশ ফিরে শোয়া স্ত্রীর গলার চারপাশে ঘুরঘুর করতে থাকে। নখের আঁচড় লাগে ঘাড়ের কাছে। কী খরখরে ওর হাত।

তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকো, এইখানটা টিপে ধরলে, কিছুক্ষণ ধরে থাকলে, কাজ হাসিল হয়ে যায়। তুমি জানতেও পারবে না। হয়তো একবার চোখ খুলে দেখবে, তারপর চোখ বন্ধ করবে শেষবারের মতো। কিন্তু তাতে আমার কী লাভ? আমি চাই, তুমি আস্তে আস্তে একদিন আমার মতো কুৎসিত হয়ে যাও। আমরা সমান হয়ে যাই। তখন কেউ তোমাকে বিউটি আর আমাকে বিস্ট বলবে না। আমরা দু'জনেই বিস্ট হয়ে যাব। একেই তো রাজযোটক বলে জ্যোতিষীরা তাই না?

পাশ ফিরে শোয়া উর্মি সেই রাত্রে মৃত্যুর শিহরন অনুভব করে। আর তখনই ওর মনে মুক্তির বাসনা জাগে।

উর্মি মুক্তি চেয়েছিল, মুক্তি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাসে কুমু মুক্তি পেতে পেতে পেল না, কেননা, সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে, আর সন্তানের স্বার্থে স্বামী-স্ত্রী সমস্ত বিরোধ ভুলে যায়। বিয়ে নামক সামাজিক প্রথা মানুষই আবিষ্কার করেছে স্ত্রী-পুরুষকে যুক্ত রাখার জন্যে, যাতে বংশরক্ষা হয়, সন্ততির প্রতিপালন নিরাপদ হয়। পণ্ডিত কেনেথ ওয়াকার কথিত জৈব প্রেরণা এখন আর একমাত্র সত্য নয়। প্রেম ওই জৈব প্রেরণার ওপর এক সুদৃশ্য প্রলেপ তা-ও আবিষ্কার করেছে মানুষ এই কথা বোঝাতে যে, তার আবেগ সর্বত্র দেহসর্বস্ব নয়। শরীর থেকে শুরু হলেও শরীর ছাড়িয়ে যায় সম্পর্কের বিস্তার। তাই দাম্পত্যকে আজীবন স্থায়ী করতে প্রচার যন্ত্রের কত সুব্যবস্থা। কত রকম কৌশল করে বলা হয়, শরীবেব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও প্রেম ফুরোয় না।

আবার সঙ্গে সঙ্গে ওই কথাটাও যে মনে পড়ে যায়: আমরা যেন মিলনে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ি, আমরা যেন পরস্পরের বিরহে অভ্যস্ত হয়ে না যাই। এ-যুগের দম্পতি এই একটাই প্রার্থনা করে সব সময়, যেহেতু অনিবার সন্তান উৎপাদন এখন আর কাম্য নয়। সন্তানের প্রয়োজন মিটে গেলে যখন মুখোমুখি হয় দুই আত্মসচেতন নরনারী, হাতে উপভোগের ছিলকা, পরস্পরের সান্নিধ্যে অভ্যস্ত, পুনরাবৃত্ত জীবন, তখনই হয় সংকটের সূচনা। প্রশ্ন ওঠে, কে কতটা দেবে? কে কতটা পাবে? সুদৃশ্য প্রলেপটি ততদিনে মুছে গেছে। তবু যে ঘরে ঘরে বিবাহ বিচ্ছেদ দেখি না আমরা, সুখী দম্পতিদের দেখে এসে বাড়িতে নিজেদেব মধ্যে ঝগড়া করি, কেন আমরা ওদের মতো নই, এর একটাই কারণ। তা হল অন্য দিক থেকে একের ওপর অন্যের নির্ভরতা, দীর্ঘকালের সান্নিধ্য থেকে গজিয়ে ওঠা বন্ধুত্ব ঠিক নয়, এক ধরনের মমত্ববোধ। যা বাড়িতে পোষা কুকুর-বেড়ালের ওপবেও অর্শায়। খুব দুর্বল এর কবজা। উন্নত সমাজে এই অবস্থান অত্যন্ত ভঙ্গুর। তাই নারীবাদীরা, যারা অধিকাংশ বিবাহবিচ্ছিন্ন, এই জায়গায় বার বার ঘা দেয়।

বার্নার্ড শ' বলেছিলেন, স্বর্গীয় মিলনের মাহাত্ম্য হারিয়ে বিবাহ নামক এই সোশ্যাল কনট্রাইভান্স বা সামাজিক ফন্দি যখন আইনসম্মত চুক্তিতে পর্যবসিত হল, তখনই সংসার হারাল তার সুষমা। বলেছিলেন, দশটি সমস্যাপীড়িত বৈধ সন্তানের চেয়ে একজন সুস্থ সবল অবৈধ সন্তান অনেক বেশি কাম্য। মেয়ে-পুরুষ যথেচ্ছ মিলিত হোক, যতদিন পারে ততদিন পরস্পরকে ভালবাসুক, তারপর যে-যার নিজস্ব পথে চলে যাক। শিশুদের অবোধ ভাবার কোনও কারণ নেই, যতই ঢেকেঢুকে রাখার চেষ্টা করা হোক, বাবা-মায়ের মধ্যেকার সংঘর্ষ তারা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারে। যাক, এর চেয়ে অন্যত্র সামাজিক নিরাপত্তা পেলে, মনোযোগ পেলে, তারা খোলামনে বড় হতে পারবে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তাদের অসীম।

বার্নার্ড শ'য়ের থিয়োরি আমাদের এই গরিব দেশে খাটবে না। এখানে মেয়েরা বিয়ে করে না। মেয়েদের বিয়ে হয়। এখানে আকছার চলচ্চিত্রে দেখা যায়, কী করে একটি মেয়ের বিয়ে হতে পারল শেষপর্যন্ত, তারই রোমহর্ষক কাহিনী। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আর গল্প নেই। তখন পুরুষ নির্বিকার আর বহির্মুখী, নারী তার শিশু সন্তানকে নিয়ে নিয়ত উদ্বিগ্ন।

আমরা শিখা আর ব্রততীর কথা শুরু করেছিলাম।

এখনও অবধি যা দেখছি, তাতে ওদের বিয়ে হওয়া নিয়ে কোনও গল্প ফাঁদা যাচ্ছে না। ওরা স্বনির্ভর। পরস্পরের বন্ধু। একক জীবনের নিঃসঙ্গতা এখনও ওদের স্পর্শ করেনি। অবসর সময়ে ওরা বই পড়ে, গান করে, হাত ধরাধরি করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কলকাতা শহর এখনও মেয়েদের চলাফেরার

পক্ষে বিপজ্জনক নয়। রাত ন'টার মধ্যে হস্টেলে ফিরে এলেই হল। লেক, পার্ক, গঙ্গার ধার, নন্দন-চত্বরেব সংস্কৃতি মঞ্চগুলিতে ঘুরে বেড়ালে সময় কেটে যায়। না হলে বাড়ি ফেরার টিকিট কেটে পাতাল রেলের কোনও একটা স্টেশনে, ঠান্ডায়, থামে ঠেস দিয়ে বসে টিভি দেখো। লোকজন দেখো। নিজেদেব আপিসের গল্প করো। দুই মেয়ে একত্র হলে গল্পের কি আর শেষ আছে।

একদিন শিখা ব্রততীকে বলল, আজ দারুণ একটা খবর আছে। আমাদের মেডিকাল সেন্টারের মিসেস জেমসকে দেখেছিস কখনও?

ফরসা মতন? নাক থ্যাবড়া?

না বে। এ হল সেই কেলে বুড়ি। নার্স। যার কাছে তোকে একবার নিয়ে গেছিলাম। তোর পিরিয়ড হচ্ছিল না। মনে পড়ে?

ও জিজ্ঞেস করল, প্রটেকশন নাওনি বুঝি? আমি তো লজ্জায় মরে যাই। না-না, সেসব কিছু না।

ও হাসতে লাগল। একটা দাঁত ভাঙা। মনে পড়ছে? বলল, এতে লজ্জার কী আছে? অ্যাট্রাকটিভ মেয়ে তুমি, মাঝে মাঝে এ রকম দুর্ভাবনা হতেই পারে। এখন সব সহজ হয়ে গেছে।

আমি বলেছিলাম, আমাদের সমাজে এসব হয় না। আর যদি কারুর সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে হয়ে যায়, চট কবে তাকে বিয়ে করে ফেলে।

যেমন তোব ছোটপিসি। শিখা স্মরণ করিয়ে দেয়। কত বড় হল ওদের ছেলে?

ব্রততী বলে, ছ'বছর তো হবেই। সেদিন দেখি, ছেলের হাত ধরে স্কুলে যাচ্ছে। টিপসি হয়ে গেছে পিসি।

ভালবাসা আর ভালবাসার সন্তান! হি-হি করে হাসে শিখা। তাবপর বলে, গল্পটাই বলতে দিচ্ছিস না।

বল, বল। কী হয়েছে তোদেব মিসেস জেমসের?

হঠাৎ একটা উকিলের চিঠি পেয়েছে। উকিল ঠিক নয়, সলিসিটর। ওকে আপিসে গিযে দেখা করতে লিখেছে। বেচারি তো ভয়েই মবে। একে-ওকে চিঠিটা দেখায়। তিন কুলে কেউ নেই ওর। কোনও প্রপার্টি নেই। রয়েড স্ট্রিটে একখানা ঘর ভাড়া করে থাকে। ভয় পাবে না? তো, আমাদের পার্সোনেল ম্যানেজাব একজন অ্যাসিস্ট্যান্টকে ওর সঙ্গে যেতে বলল। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট ও জীবনে দেখেনি। গিয়ে শোনে—

কী?

কে এক ববার্ট ম্যাকলাউড। ব্যাঙ্গালোরে থাকত। পঁচাত্তর বছর বয়েসে মারা গেছে। তার যথাসর্বস্ব দিযে গেছে চার্চকে। আব মিসেস জেমসকে এক লাখ টাকা। বুড়ি মনেই করতে পাবছে না কে ওই ববার্ট ম্যাকলাউড।

এক লাখ! ব্রততীর কপালেব টিপখানা পড়ে যায় আর কী!

শিখা আস্তে আস্তে বলে, ভেবে দ্যাখ। জানা নেই, শোনা নেই, একটা বুড়ো কোথায় মরল, আব ফোকটসে ও পেয়ে গেল এক লাখ টাকা। কোনওদিন ভাবতে পেরেছিল? বুড়ি মাঝে মাঝে প্রাইভেট নার্সের কাজ করত। নাইট ডিউটি। সে-ও বহুকাল আগে। যখন ওর ডিভোর্স হয়, সেই সময়। দু'-এক বছর করেছে। সেই সময়কার কোনও পেশেন্ট হতে পারে। বুড়ি এখন বলছে। কিন্তু কাউকে মনে করতে পাবছে না। সলিসিটরকে বলে ব্যাঙ্গালোর থেকে রবার্ট ম্যাকলাউডের একটা ছবি আনিয়েছে। ছবি দেখেও কিছু মনে পড়ছে না। কিন্তু টাকাটা তো জ্যান্ত। বল?

আমাদের যদি কেউ এই রকম টাকা দিয়ে যেত। কিছু না চেয়ে, কোনও প্রতিদান আশা না করে। ওই রকম পঁচাত্তব বছর কি একানব্বই বছর বয়সের কোনও বড়লোক বুড়ো, নির্বংশ, প্রচুর টাকার মালিক। সারা জীবন ধরে সঞ্চয় করে রাখা ধন। প্রাণে ধরে কাউকে দিতে পারেনি বেঁচে থাকতে। যাতে বিপদেআপদে নিজের কাজে লাগে। তারপর একদিন ঘুমের মধ্যে মরে গেল। চাকরবাকর, পাড়ার লোক টেনে নিয়ে গিয়ে মড়া পোড়াল। কল্পনা কর না।

কল্পনা কর না, ব্রততী বলে, কী আছে না আছে, খোঁজ করতে করতে পাড়ার লোক, কি প্রতিবেশী, কি পুলিশ না, না, পুলিশ না অন্য কেউ, এসে মেঝে ধরল একটা উইল। কি ট্রাস্ট ডিড। যে, আমার স্থাবব অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি, টাকাকড়ি আমার অবর্তমানে পাবে ওয়ার্কিং উইমেন্স হস্টেলের পনেরো নম্বর ঘরের বাসিন্দা ব্রততী বসু।

ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে না?

দিচ্ছে।

শুধু আমি কেন, তুইও পেতে পারিস। কল্পনার টাকা তো। আমরা দু'জনে ভাগ করে পেতে পারি। এক রাত্তিরে মজুর থেকে মিলিওনেয়ার। রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা। এমন কেন সত্যি হয় না আহা।

ওদের যুগল হাসির শব্দে সব সম্ভাবনা উড়ে যায়।

শীতকালের বিকেল। ওরা পার্ক স্ট্রিট ধরে পশ্চিম দিকে হাঁটছিল। ময়দানের ওপর আকাশে সূর্যটা লাল হয়ে আসছে। একটু পরে রাস্তা থেকেই সূর্যাস্ত দেখা যাবে। দেখতে দেখতে হ্যালোজেনের আলোয় রঙিন হয়ে যাবে চৌরঙ্গি। বিজ্ঞাপনের লেখাগুলো অন্ধকার আকাশের গায়ে গড়াতে থাকবে। সারি সারি গাড়ি ছুটবে উলটো দিকে ওয়ান ওয়ে পথ ধরে। ঝলমল করে উঠবে দোকানগুলো। বার আর রেস্তোরাঁর মধ্যে টুকটুক করে খদ্দের ঢুকবে। তাদের পকেট-ভরতি টাকা। তাদেব মনে ফুর্তি।

কাছাকাছি সস্তার চায়ের দোকান নেই।

কোথাও গিয়ে বসি চল। ওই পেসট্রির দোকানটাতে যাওয়া যাক। ছ'টা অবধি খোলা থাকে। একটা কোণ দেখে বসি।

ব্রততী বলল, আমার কাছে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে। আমি খাওয়াব। চল। এত ভাল একটা স্বপ্ন দিলি।

এবপর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে ওরা টুকে টুকে চকোলেট পেস্ট্রি খায়। ক্রিম আর চকোলেটের স্বাদে স্বপ্ন গাঢ় হয়ে ওঠে। সত্যি, হঠাৎ অনেক টাকা হাতে পেয়ে গেলে কী করবে? মারুতি গাড়ি কিনবে? ওরা নতুন কী একটা মডেল যেন বাজারে ছাড়ছে। মারুতি জেন। তিন লাখ টাকা দাম। পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে বুক করা যাবে। তারপর গাড়িটা যখন পাওয়া যাবে ওরা বলছে, এক বছরের মধ্যেই, ততদিনে কেউ যদি মবে গিয়ে তিন লাখ টাকা দিয়ে যায়। যদি দশ লাখ টাকা দিয়ে যায়, তা হলে আগে একটা ফ্ল্যাট কিনবে শিখা। না, আগেই ফ্ল্যাটটা কিনবে না। কিছুদিন টাকাটা জমিয়ে রেখে সুদে খাটাবে। দশ লাখ টাকায় এক বছরে এক লাখ টাকা সুদ তো হবেই। তাই দিয়ে একটা মুক্তোর সেট কিনবে। উর্মির গল্প শোনার পর থেকে মুক্তোর মালা ওর মাথার মধ্যে গেঁথে আছে। শুধু মালা না, পুরো সেটই ওর চাই। ব্রততী তার আগে একবার ওয়ার্ল্ড ট্যুর করে আসতে চায়। কত আর খরচ। প্লেনভাড়া পঞ্চাশ হাজার। ঘোরাঘুরি, একমাসের হোটেল খরচ রোজ যদি এক হাজার টাকাই ধরা হয় না। এক হাজার টাকায় কিছু হবে না, একশো ডলার মানে তিন হাজার টাকা আচ্ছা, সব মিলিয়ে দু'লাখ। যদি কেউ মরে গিয়ে ওকে দশ লাখ টাকা দিয়ে যায়, প্রতিদানে কিছু না চেয়ে, নিঃস্বার্থভাবে, একেবারে অপরিচিত কেউ মিসেস জেমসকে যেমন দিয়ে গেছে রবার্ট ম্যাকলাউড, তা হলে তা থেকে দু'লাখ টাকা স্বচ্ছন্দে খরচ করা যায়। জীবনে তো কোনও শখ-আহ্লাদ মেটেনি। একটু একটু করে সেগুলো মিটিয়ে নিতে হবে তো। পৃথিবীতে কত আনন্দ, কত সুখ ছড়ানো আছে ইতস্তত। যারা পারছে, তারা লুটেপুটে খাচ্ছে। ওদের বেলা কেন জুটবে না? শিখা আর ব্রততী কি আপিস আর হস্টেল করে কাটাবে সারাটা জীবন? ফোঁটা ফোঁটা করে টাকা জমিয়ে, পাশ বুকে পাতার-পর-পাতা ভরাবার পর জুটবে বুড়ো বয়েসের খোরাকি?

শিখা নিজের কালো চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ কোলের কাছে এনে খুলল। হাত ঢুকিয়ে বার করল নীল রঙের পাসবুক। খোলা পাতার দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

ব্রততী খেতে খেতে বলে, কত আছে?

সাত হাজার পাঁচশো বাহান্ন টাকা একুশ পয়সা।

আমার আট হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

কী করে হয়?

আমি তো তোর মতো সব টাকা পাসবুকে রাখি না। একটু জমে গেলেই ফিক্সড ডিপজিট করে দিই। তাতে সুদ বেশি।

কিসান বিকাশ পত্র কিনলেই পারিস। পাঁচ বছরে টাকা ডবল।

না, না। পাঁচ বছর কে অপেক্ষা করে থাকবে? পাঁচ বছরে জীবনে কত কিছু ঘটে যেতে পারে বল। আমাদের জীবনে এমনি এমনি কিছু ঘটবে না। ঘটিয়ে তুলতে হবে জোর করে। না হলে মফস্সলের

বাড়িতে ফিরে গিয়ে বাবাকে বলতে হবে, পাত্র-পাত্রী কলমে বিজ্ঞাপন দাও শিক্ষিতা, সুন্দরী, চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং, গৃহকর্মনিপুণা আরও যা-যা বলা যায়, তার জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। প্রবাসী, ডিভোর্সিতে আপত্তি নাই।

গৃহকর্ম মানে তো রান্না করা? শিখা তার ববচুল ঝাঁকিয়ে বলে, আই হেইট কুকিং।

তারপর বলল, চল, ওঠা যাক। এক জায়গায় যাব, কাছেই।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে ওরা। সামনে পশ্চিম দিকের আকাশ সূর্যাস্তের পর তখনও লাল হয়ে আছে। শিরশির করে হাওয়া বইছে, তবে শীত লাগছে না। ইলেকট্রিকের আলো আর লোকজনে জায়গাটা সরগরম। ওপাশ থেকে সার বেঁধে মোটরগাড়ি, ট্যাক্সি, মোটরবাইক ছুটে আসছে। পুরো পার্ক স্ট্রিট এখন একমুখো। এই পথ দিয়ে বাস-মিনিবাস চলে না বলে শব্দটা কিছু কম, জ্যামও নেই।

ওরা ধীরে ধীরে হাঁটছিল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। হঠাৎ একটা মোটরবাইক ফুটপাথ ঘেঁষে ওদের পাশে এসে থামে। হেলমেট-পরা দু'জন আরোহী। ওদের একজন উৎসাহের স্বরে ডেকে উঠল, হাই হানি!

হানি দু'জন ভ্রূক্ষেপ করল না। এই রকম ডাক ওরা বহুবার শুনেছে। এদের নিয়ে ভয় পাওয়ারও কোনও কাবণ নেই। দিনের শেষে ফুর্তি করার ইচ্ছে। মেয়ে সঙ্গী খুঁজছে। পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে, চৌরঙ্গিতে, কেন কলকাতার প্রায় সর্বত্র, এমনকী, গোল পার্ক অবধি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে রোগা রোগা পণ্য মেয়েরা। কখনও একা, কখনও দু'জন-দু'জন করে। শাড়ি আর চুলের বাহাব দেখে বোঝার উপায় নেই, এরা ভদ্রঘরের গৃহস্থ মেয়ে কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে, না কল গার্ল—ডাক পেলে গাড়িতে উঠে বসবে। যারা ঝানু শিকারি, তারা মুখের দিকে না তাকিয়ে পায়ের চপ্পলের দিকে তাকায়, হাতে-ঝোলানো থলেটার ওপর চোখ বুলোয়। ওইখানেই ধরা পড়ে যায় সস্তা দরের মেয়েরা।

সেভাবে হিসেব করলে শিখা আর ব্রততীকে দেখে ওদের দাঁড়াবার কথা নয়। তবু একবার চেষ্টা করে দেখল। বলা তো যায় না। আজকাল কত ছাত্রী, আপিসকর্মী জীবনের বোরডম কাটাতে সন্ধের দিকে শহরে চরতে বেরোয়। এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টার ফান খোঁজে।

এরা সে রকম নয় বুঝতে পেরে সামনে-বসা লোকটা বুট-পরা ডান পা দিয়ে একটা ঝাঁকি দিল। শব্দ করে চলে গেল মোটরবাইক।

শিখা বলল, এদের দেখলে মায়া হয়।

ব্রততী বলল, আমার কিন্তু ভয় করে বাপু।

সত্যরাম দাসের জুয়েলার সাইনবোর্ড আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ে শিখা।

দরোজার মুখে সশস্ত্র প্রহরী। কাচের শার্সি দেওয়া বিশাল বিশাল দুটো পাল্লা, ঝকঝকে পেতলেব হাতল। তার ওপর ঝোলানো একটা লাল রঙের প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা: শপ ওপন। দরোজার পাশে আলোকিত শোকেস। তার মধ্যে থরে থরে সাজানো অলংকার।

আমি ক'দিন ধরেই ওটা দেখছি।

শিখা আঙুল দিয়ে একটা মুক্তোর সেট দেখাল। ডবল-ছড়ার নেকলেস। হালকা পিংক রঙের মুক্তোর মালা। খোলা ভেলভেটের বাকসে সাজিয়ে রাখা। একজোড়া ইয়ার টপ। আর রিস্টলেট। কোণ থেকে বাকসোটার ওপর আলো ঝলকাচ্ছে। শোকেসের মধ্যে দুটো কালো মেয়ে-মূর্তি দাঁড় করানো। তাদের নগ্ন গায়েও অলংকার পরানো। এই দৃশ্যের সামনে এসে দাঁড়ালে পৃথিবীতে কোথাও দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, মনে থাকে না।

শিখা বলল, ওইটা কিনব। কত দাম হবে বল তো।

ব্রততী খানিকটা হতভম্বই হয়ে গেছে। শিখা যে ওকে এখানে নিয়ে আসবে, ও ভাবেনি। আন্দাজ করেছিল, কোনও শাড়িটাড়ির দোকানে ঢুকবে। বাঁ দিকে একটু ঢুকলেই তো রাসেল স্ট্রিট। সেখানে বহুমূল্য বসনালয় আছে একটা। শাড়ি ছাড়া সালোয়ার-কামিজ, কুর্তা-পাজামা, ম্যাক্সি, শৌখিন চপ্পল অনেক কিছুই রাখে ওরা। একবার সাতশো টাকা দিয়ে সুতির ছাপা শাড়ি কিনতে গিয়েও কেনেনি। দোকানি বলেছিল, এই ছাপ, পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না। আমাদের নিজস্ব আর্টিস্ট আছে। এ-সব তাদের করা ডিজাইন। কলকাতায় এলেই ডিম্পল কাপাডিয়া আমাদের শাড়ি নিয়ে যান।

জুয়েলারের শোকেস দেখতে দেখতে খানিকটা নিরাসক্ত ভাবে ব্রততী বলল, অন্তত পাঁচ হাজার টাকা।

পাঁচ হাজার? অত কেন?

মুক্তো তো। অতগুলো মুক্তো। এক-একটা মুক্তো গড়তে ঝিনুকের কত কষ্ট।

এক-একটা চন্দ্রমল্লিকা ফোটাতে গাছেরও কি কম কষ্ট হয়? বল? কিনতে গেলে দশ টাকায় ছ'টা।

তা অবশ্য ঠিক।

আমার ব্যাঙ্কে তো সাড়ে সাত হাজার টাকা আছে। চল না, ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস কবি।

যদি দিয়ে দেয়।

ভেতবে দাঁড়ানো সশস্ত্র প্রহবী কাচের দরোজা একটুখানি টেনে ফাঁক করল। ওরা ঢুকে পড়ল দোকানের মধ্যে। বিশাল হল। পুরু কার্পেট-মোড়া মেজে। খানিকটা হেঁটে ভেতরে গেলে কাউন্টার। সেখানে স্যুট-পরা তিনজন বসে আছে। ওরা ঢুকতেই একজন উঠে দাঁড়ায়।

অলংকার কিনতে গেলে দামের কথা প্রথমে ওঠেই না। প্রথমে পছন্দ। শিখা মুক্তোর সেটখানা এনে দেখাতে বলল।

লোকটা বলল, আপনাকে এটা খুব মানাবে।

একটু পরে দেখতে পাবি?

অফ কোর্স।

ওকে কাউন্টারের ভেতরে নিয়ে যায়। সেখানে তিন দিকে আয়না-দেওয়া ড্রেসিং রুম আছে। ড্রেসিং রুমে একজন বয়স্ক মহিলা তখন ঘুরে ঘুরে নিজের রূপ দেখছিল। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল এক মধ্যবয়সি পুরুষ। ওদেব অপেক্ষা করতে হল।

দোকানে আবও চার-পাঁচ জন খরিদ্দার ছিল তখন। ব্রততী তাদের লক্ষ করতে থাকে। গয়না দেখার চেয়ে গয়না যারা কেনে, তাদের দেখতে বেশি মজা।

মোটামতো এক মাবোয়াড়ি মহিলা তাব বাজুবন্ধ ডেলিভাবি নিতে এসেছে। ইয়া লম্বা-চওড়া সেই বাজুবন্ধ লাল বেশমি সুতোর গুছি দিয়ে বাঁধা। ফাঁস বাঁধতে গিয়ে তার বাহুতে ব্যথা লাগছে। ফাঁস ঢিলে কবলে ঢলঢল করছে। সোনার পাতের ওপর নানা রঙের রত্নখচিত সেই গুরুভার অলংকার সে নেবে না। এক দিকে তার স্বামী, অন্য দিকে স্যুট-পরা আর এক দোকানি আর একজন মিস্তিরি ওকে সন্তুষ্ট করাব চেষ্টা করছে আপ্রাণ। তার মূল সমস্যা যে বেঢপ শরীর এবং ঝুলে-পড়া মেদ, সেখানেই আসল খোঁচা, এ অপ্রিয় সত্য বলার সাহস কারুর নেই।

অলংকার যারা পরে, তাদের অনেকেরই অলংকার পরার মতো ফিগার থাকে না, প্রকৃতির এই এক নির্মম পবিহাস। আর, যখন ফিগার থাকে আকর্ষণীয়, বয়স থাকে অল্প, তখন থাকে না সংগতি।

দেয়ালের গা ঘেঁষে একটা লম্বা সোফা। তার সামনে কাচের নিচু টেবিল। দু'জন ভদ্রলোক ওখানে নিচুস্বরে কথা বলছিল। একজন বৃদ্ধ। অতিবৃদ্ধ। তার সঙ্গীটি সম্ভবত কর্মচারী। বৃদ্ধটির সহচর একখানা সুদৃশ্য ছড়ি, তার গা-টা কালো, মাথাটা বাঁকানো এবং সাদা, দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা। কাচের টেবিলের ওপর একটা ব্রাউন রঙের ব্রিফকেস।

কাউন্টারের ওপাশ থেকে চশমা-পরা টাক-মাথা এক প্রবীণ দোকানিকে বেরিয়ে আসতে দেখল ব্রততী। তার পরণে স্যুট না, ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি। পায়ে জরিদার নাগরা। হয়তো সে-ই সত্যরাম দাস। বা, তার বংশধর। তার হাঁটায় আভিজাত্যের ছাপ ছিল।

ব্রততী অনুমান করে, এরা পরস্পরের পূর্ব পরিচিত। সৌজন্য বিনিময়ের ধরন দেখে তাই মনে হল ওর। দূরে দাঁড়িয়ে ও দেখল, খানিক পরেই সেই বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ভদ্রলোক, ব্রিফকেস খুলে উপুড় করে দিচ্ছে কাচের টেবিলের ওপর। আর ঝনঝন ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। তার সঙ্গী কর্মচারীটি সোনালি রঙের টাকার মতো জিনিসগুলো পাঁচটা পাঁচটা করে সাজিয়ে থাক করছে। ওগুলি কি গিনি? না মোহর? ব্রততী গিনি বা মোহর, কোনও রকম স্বর্ণমুদ্রা জীবনে দেখেনি। কৌতূহলবশত ও একটু এগিয়ে যায়।

প্রবীণ দোকানি বলেন, ছাব্বিশটা। সবগুলোই ভিক্টোরিয়ান। এই কি সব? অতিবৃদ্ধ বলে, আপাতত। স্পষ্ট বাংলা ভাষা।

নেব। এর উপযুক্ত মূল্য আপনি পাবেন।

বলতে বলতে সে একটি একটি করে সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো একটা বটুয়ায় ঢোকাতে থাকে।

ঠিক এমনি সময় শিখা ব্রততীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। টের পাওয়ার আগেই এসে দাঁড়িয়েছিল হয়তো। হয়তো, ওদের মোহর গোনা দেখছিল, ব্রততী টের পায়নি। টের পেল যখন শিখার কণ্ঠস্বর শুনল, দেখ তো, কেমন মানিয়েছে?

নীল রঙের সালোয়ার। তার সঙ্গে মানানসই পুরোহাতা পাঞ্জাবি। শুধু ওড়নাটা বুকের ওপর নেই। তার বদলে সেখানে দুলছে ডবল-ছড়ি মুক্তোর মালা। কানে মুক্তোর টপ। পাঞ্জাবির হাতার নীচে মুক্তোর রিস্টলেট।

শিখা মিটমিট করে হাসছে।

ব্রততী বলল, রানির মতন দেখাচ্ছে তোকে। সত্যি বলছি। বিশ্বাস কর। একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

দোকানিকে পেছনে রেখে এবার সত্যিই রানির মতো মৃদুপায়ে কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে শিখা ওই অতিবৃদ্ধ লোকটির সামনে গিয়ে উপস্থিত হল।

ভদ্রলোক খালি ব্রিফকেস বন্ধ করতে করতে শিখার দিকে চোখ তুলে তাকায়।

দেখুন তো, আমায় কেমন মানিয়েছে। এই সেটটার দাম এক লাখ পনেরো হাজার টাকা। ট্যাক্স ফ্যাক্স সব নিয়ে। কেনা যায়?

ছড়িখানা হাত বাড়িয়ে টেনে আনে বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সাদা, সম্ভবত হাতির দাঁতের হাতলখানা চিবুকেব নীচে ঠেকিয়ে অবাক-করা হাসি হাসে। ওর আইভরি রঙের বাঁধানো দাঁত দু'পাটি নিখুঁতভাবে সাজানো। হারমোনিয়াম রিডের মতো।

তাব ছানি-কাটা চোখ দিয়ে এই প্রথম শিখাকে সরস্বতী ঠাকুরের মতো দেখাল। ওর গ্রীবার দু'পাশ দিয়ে নেমে এসেছে মুক্তোর মালা, প্রত্যেকটি মুক্তোর মধ্যে কষ্ট, বুকের কাছে এসে সেই মালাব ঘনিষ্ঠ অবরোহণ, বৃদ্ধ—সেই অতিবৃদ্ধ স্বর্ণমুদ্রা বিক্রেতার মনে হল, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মতো হিমালয়কে মহীয়ান করেছে। কী সুগঠিত সুদৃঢ় স্তন মেয়েটির! বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখের সাদা-কালো চপলতা, তাদেরই প্রতিবেশী দুই অন্ধ কর্ণভূষণ শিখার মুখাবয়বকে তাৎক্ষণিকভাবে হলেও করে তুলেছে স্ববিরোধে উজ্জ্বল। কেন, তাকে কেন এই প্রশ্ন, এসব জাগতিক কূট ভাবনায় তার মন যেতে চাইল না।

কেনা যায়? বলে শিখা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ টিপে হাসছে।

যায়। অবশ্যই যায়। এ-জিনিস তো তোমার অঙ্গের শোভা বাড়াবার জন্যেই তৈরি হয়েছে। বৃদ্ধ বলল।

কিনে দিন। তা হলে আপনি এটা কিনে আমার উপহার দিন না। আপনার তো অনেক টাকা।

একটুও ইতস্তত না করে ভদ্রলোক বলল, দেব। এই অলংকার আমি তোমায় উপহার দেব, দিতে পারি, দেওয়ার সামর্থ্য আর উদারতা আমার আছে। তবে এক শর্তে। আমার বাকি জীবন তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। তোমার নাম কী আমি জানি না, মনে হয় সুষমা তোমার নাম। আমি অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী।

আমার হাতটা ধরো তো। হিসেব নিকেশ চুকিয়ে ফেলি এখানকার। তারপর বাড়ি যাব আমরা।

বলতে বলতে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়াল সোফা থেকে। শিখা নির্বিকার। ব্রততী এক মুহূর্ত লোকটির জরাজীর্ণ শরীরের সঙ্গে বেমানান—তার কালো জুতো জোড়ার অতি উজ্জ্বল—পালিশ লক্ষ করল। তারপর বলল—

আমি যাই। পরে কথা হবে।

দুই

পরে ওদের আর দেখা হয়নি।

সেদিন খানিকটা হতভম্ব, খানিকটা বিরক্ত হয়ে ব্রততী বেরিয়ে এসেছিল সত্যরাম দাসের দোকান থেকে। পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে নেমে মেট্রো ধরে এসেছিল রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনে। সেখান থেকে অটো ধরে দেড় টাকায় হস্টেল।

নিজের ঘরের তালা খুলে সোজা বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ব্রততী। শিখাটা কীভাবে চলে গেল।

একবার ফিরে তাকিয়ে দেখল না। কোথায় যাচ্ছে, একবার ভেবে দেখল না মেয়েটা। যদি কোনও গুন্ডা স্মাগলারের আখড়ায় গিয়ে পড়ে, যদি গণধর্ষণের শিকার হয়, কে ওকে বাঁচাবে? চোখের সামনে ঘটে-যাওয়া ঘটনাটা ওর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল সেই মুহূর্তে।

কিছুক্ষণ কেঁদে হালকা হওয়ার পর বিছানায় উঠে বসেছিল অনেকক্ষণ। অন্যদিন হিটার জ্বালিয়ে চা করে খায় দু'জনে, সেদিন একলা, চা করতে ইচ্ছেই করল না। রাত্তিরেও জেগে রইল এগারোটা অবধি। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল, হঠাৎ শিখা এসে কড়া নাড়বে। রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনাতে বসবে।

শিখা হস্টেলে ফেরেনি। ওর ঘরখানা তালা দেওয়া রয়েছে। কে তালা ভাঙতে যাবে? ব্রততী বলেছিল, কয়েক মাস ঘরটা রাখুন, আমি ভাড়া দিয়ে দেব, হঠাৎ ফিরে এলে কোথায় আশ্রয় পাবে বলুন তো? কলকাতা শহরে সিঙ্গল মেয়েদের জায়গা আছে? কথাটা সত্যি। অথচ, ওই হস্টেলে ঘর পাওয়ার জন্য দরখাস্ত পড়ে আছে অন্তত পনেরোটা। একটি-দুটি করে খালি হয়, মেয়েদের কারুর বিয়ে হয়ে গেলে, কেউ ট্রান্সফার হলে। ওয়ার্ডেন বলে, এইভাবে জায়গা আটকে রাখার কোনও মানে হয় না।

দেখতে দেখতে সাড়ে তিন বছর কেটে গেল। সেই দিনটা ছিল সতেরোই জানুয়ারি। আর আজ সতেরোই জুলাই। তিন বছর ছ'মাস পূর্ণ হল, শিখা হস্টেলে নেই। কিন্তু আজ আর শিখার জন্য উদ্বেগ বোধ করছে না ব্রততী। ইতিমধ্যে খেপে খেপে তিনখানা চিঠি পেয়েছে ও। দীর্ঘ সে-সব চিঠি ও জমিয়ে রেখেছে হাতবাকসে। আজকের চার নম্বর চিঠিটা সংক্ষিপ্ত।

কোনও সাহিত্যিকের হাতে এই চিঠিগুলো পড়লে সে এগুলোর ওপর কল্পনার রং চড়িয়ে হয়তো একটা উপন্যাসই লিখে ফেলবে। তার আগে বাস্তবকে অবিকৃত রাখার স্বার্থে চিঠিগুলো পর পর ছাপিয়ে ফেলাই ভাল।

ব্রততীকে লেখা শিখার প্রথম চিঠি
তারিখ: ৩ মার্চ, ১৯৯০

ভাবছিস, আমি বোধহয় মরেই গেছি। না, সে-ভয় নেই। আমি বেঁচে আছি। বহাল তবিয়তে।

সেদিন মুক্তোর সেটটা পরার পর আয়নায় যখন নিজের চেহারা দেখলাম, একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আপিসে ইস্কুলে কাজ করে মেয়েরা নিজেদের শ্রমিক পরিচিতি আর শ্রমমূল্য আদায় করছে, এটা খুবই গর্বের কথা। কিন্তু সেখানে আমরা পুরুষদের নীচে জায়গা পাই। অথচ প্রকৃতি আমাদের পুরুষের চেয়ে সুন্দর করে গড়েছেন, গায়ের চামড়ার মসৃণতা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সেটটার দাম পাঁচ হাজার হবে। যদি দশ হাজারও হয়, তোর কাছ থেকে কিছু ধার করব। কিন্তু জিনিসটা আমি নেবই। তারপর দোকানিকে জিজ্ঞেস করায় ও বলল, এক লাখ পনেরো হাজার টাকা। এর কোনও মানে হয়, বল? তখনই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, ওই বুড়ো, অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী একগাদা মোহর বেচতে এসেছে। অনেক টাকা দাম পাবে নিশ্চয়। তাই তাকেই গিয়ে বেমক্কা চেপে ধরলাম। কিচ্ছু না ভেবে।

ও রাজি হয়ে গেল। আমার জয় হল। তাই ওর শর্তে কিছু না ভেবে আমিও রাজি হয়ে গেলাম। বাকি জীবন ওর সঙ্গে থাকতে হবে। বুড়ো থুরথুরো একটা বড়লোক, ওর জীবন আর কতদিন। ওর ক্ষমতা আর কতটুকু!

ওই মিস্টার চক্রবর্তী এখন আমার মনিব। ওর বয়েস উনআশি। আমার চেয়ে পঞ্চান্ন বছরের বড়। সলিসিটর। নিজের বিশাল ফার্ম। তিন পুরুষের সলিসিটর এরা। চোদ্দো বছর আগে রিটায়ার করেছে। ফার্ম থেকে এক কাঁড়ি টাকা গুডউইল আদায় করেছে বুড়ো। কেননা, ওর কোনও বংশধর নেই যাকে বসিয়ে আসতে পারত। এখন দশটা মালটি ন্যাশনাল কোম্পানির ডিরেক্টর। পৃথিবীতে আপনজন বলতে ওর কেউ নেই।

ওর শরীরে সাতটা অসুখ আছে। তিনবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। লোকটা ব্যাচেলর, সঙ্গী বলতেও ওর কেউ নেই। এক বুকের মধ্যে পেসমেকার ছাড়া। আর অগুনতি চাকরবাকর। কলকাতা, বম্বে, দিল্লি আর পুনায় সব মিলিয়ে ন'টা বাড়ি আছে মিস্টার চক্রবর্তীর। একটায় আমরা থাকি। অন্যগুলো খালি

পড়ে আছে। ভাড়া দেবে না। ভাড়া দিলেই তো ট্যাক্স দিতে হবে। তা ছাড়া, মাসে একবার-দুবার ওইসব জায়গায় যেতে হয় মিটিং করতে। তখন দু'দিন-একদিন করে নিজের বাড়িতে থেকে আসে। সেখানেও দারোয়ান, মালী, বাবুর্চি, গাড়ি, ড্রাইভার—টিপটপ ব্যবস্থা। কোম্পানিগুলো খরচ জোগায়। তার বিনিময়ে মিস্টার চক্রবর্তী ওদের কুপরামর্শ দেয়। ওর বিবেক বলে কোনও বস্তু নেই। অন্তঃকরণ নেই।

বাকি জীবন কাটাতে হবে শুনে ভেবেছিলাম, বুড়োর সঙ্গে শুতে হবে। ওর সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে। বুড়োদের নানা রকম পারভার্শন থাকে। সহ্য করতে হবে আমায়। এক লাখ পনেরো হাজার টাকা দিয়ে ও আমায় কিনে নিল। ভুল ভেবেছিলাম। এখানে, এই বাড়িতে, আমাদের সব আলাদা ব্যবস্থা। দোতলাটা আমার কোয়ার্টার। নীচের তলায় ওর বৈঠকখানা, আপিসঘর, বেডরুম। আমি ওর সর্বক্ষণের সেক্রেটারি। সকাল ন'টায় ব্রেকফাস্ট খেয়ে নীচে নামি। একটা অবধি কাজ করতে হয়। আলাদা স্টেনো আছে, ক্লার্ক আছে, বেয়ারা আছে। কাউকে ও বিশ্বাস করে না। আমাকেও হয়তো বিশ্বাস করে না। করার কোনও কারণ নেই।

দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে ও আরামচেয়ারে হেলান দিয়ে দু'ঘণ্টা ঘুমোয়। তারপর আমরা একসঙ্গে চা খাই, বাগানে হাঁটতে যাই। কী গাড়ি চড়ে হাওয়া খেতে বেরোই। তখন কথা হয়। বিকেলে আর কাজের কথা নয়। গল্পসল্প। ওর কথাই বেশি। কী বকবকই করতে পারে লোকটা। কিন্তু, শুধু ওই সময়টায়। আমি ম্যাগাজিন পড়ে শোনাই। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, কোয়ার্টার ছাড়াও আমি একটা মাইনে পাব। আপাতত চার হাজার টাকা, পাঁচ বছরের কনট্র্যাক্ট, ছ'হাজার পাঁচশোয় শেষ। আমার জন্যে একটা আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে, ড্রাইভার সহ, যদি কোথাও যেতেটেতে ইচ্ছে হয়, শপিং করতে ইচ্ছে হয়। তবে, বুড়োর ইচ্ছে, আমি যেন তাড়াতাড়ি গাড়ি চালানো শিখে নিই। ওটা খুব জরুরি। কিন্তু আমার ভয় করছে। কাউকে যদি চাপা দিয়ে দিই। যদি অ্যাকসিডেন্ট হয়, গাড়ির ড্যামেজ হয়, তখন কথা শোনাবে তো।

এমনিতে চুপচাপ, মুখে একটা বাড়তি কথা সরে না। এত বড় একটা ঘটনা ঘটল—বাড়িতে একজন নতুন মানুষ এসে বসবাস করছে, কাজ করছে, নানা ব্যাপারে আস্তে আস্তে তার ওপর দায়িত্ব চাপানো হচ্ছে, তা নিয়ে মুখে দুটো মিষ্টি কথা নেই। টেকন ফর গ্রান্টেড। অথচ রাগ আছে বুড়োর। সেদিন এমন চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ: এইসব উইমেন, আই হেইট দেম। আমাকে না। আর একজন। আমি তো সকালে-বিকেলে দু'বেলা যা ডাক আসে, সব খুলি। খুলে আজেবাজে মেইল ফেলে দিই। বাকিগুলো ফাইলের মধ্যে যার যার জায়গায় ঢুকিয়ে টেবিলে রাখি। উটকো চিঠি হলে আগে পড়ে ফেলি, তারপর চিঠির সারমর্ম ওকে শোনাই। শুনে যেমন যেমন হুকুম দেয়, তেমন তেমন অ্যাকশন নিই। তো, সেদিন হয়েছে কী, কে এক মিসেস মিত্রর পুত্রবধূ মিসেস হালদার (কী করে হয় রে!) ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন কি?

অমনি বুড়ো বলে উঠল, আজকে আমায় মনে পড়েছে। এতদিন কোথায় ছিলেন? এখন কী দরকার?

পাঁচ মিনিট সময় চেয়েছেন। একজন মহিলা—

এইটুকু বলেছি মাত্র, অমনি বুড়ো খেপে উঠে ওই কথা বলল। ও যে উইমেন হেটার, তা আমি এই ক'দিনেই আন্দাজ করতে পেরেছি। তা হলে আমি এখানে কেন? আমিও তো মেয়ে। একদিন হয়তো রাগ করে আমাকেও তাড়িয়ে দেবে। এইসব টেনশন নিয়ে দিন কাটছে। একদিন হয়তো সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাব।

ভাই ব্রততী, আমার ঘরখানা আছে তো? দেখিস, ওটা যেন হাতছাড়া না হয়। তুই কেমন আছিস? আর লিখতে পারছি না। মাথাটা টিপটিপ করছে। ইতি, শিখা।

ব্রততীকে লেখা শিখার দ্বিতীয় চিঠি
তারিখ: ১ জানুয়ারি, ১৯৯১

অনেক দিন আগে তোকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। পেয়েছিস আশা করি। উত্তর দিসনি। বুঝতে পারছি, তুই আমার ওপর রাগ করে আছিস। আমারই দোষ। ক্ষমা করে দে, ভাই। একবার ভেবে দ্যাখ, তোর

বন্ধু, তোর সমবয়সি আর একজন মেয়ে, পঁচিশ বছর বয়েসে (আমার জন্মদিন গেল ১৯ নভেম্বর, উঃ সে এক কাণ্ড।) আশি বছর বয়েসের একজন প্রবীণ মানুষের সঙ্গে ঘর করছে। আমাদের কি স্বপ্ন ছিল না, একজন যোগ্য প্রেমিক, যুবক, এসে হাত ধরবে? তার ডানার নীচে জায়গা করে দেবে? তার বদলে এ কী জীবন!

এখন ভাবি, ওসব স্বপ্ন আকাশকুসুম। অনেক যুবক তো দেখেছি, দূর থেকে, কাছ থেকে, তাদের মনোবাসনা কী, বুঝতে দেরি হয়নি। তাদের ডানা থাকে না। থাকলেও সে-ডানা ওড়ার জন্যে উসখুস করে। গাছের ছায়ার মতো ঘন আর বড়, ঠান্ডা আর গাঢ়, আর একজনকে জিরোতে দেওয়ার মতো প্রসারিত ডানা ওদের থাকে না। যেমনটি আছে এই ভদ্রলোকের, যাঁর নাম অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী। একেবারে নারকোল। ওপরটা শক্ত, ছোবড়া, ছাড়িয়ে ফেললে কাঠ, কিন্তু যদি একবার ঘা মেরে ফাটানো যায়, দেখবি, শুধু নরম শাঁস আর মিষ্টি জল। সাদা ধবধবে, যাকে বলে পবিত্র। না, ঘা মেরে ফাটাতে আমি এখনও পারিনি। তবে ছোবড়া ছাড়িয়েছি খানিকটা। ভেতরে জলের শব্দ পাই। উনি প্রথম দিন থেকেই আমাকে 'সুষমা' নামে ডাকেন। আমি মিস্টার চক্রবর্তী, স্যার, মনিবকে যে ভাবে অ্যাড্রেস করা দরকার, যে রকম রীতি, তা ছাড়া বয়েসে কত বড়, বলতাম। একদিন উনি বললেন, ওসব ছাড়ো তো। তার আগে বলো, আমার বাড়িতে তোমার মন বসেছে কিনা।

আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে অবাক হয়ে আছি, সে-ঘোর এখনও কাটেনি।

কাটবে, কাটবে। আমরা আর একটু কাছাকাছি এলে কাটবে। আগে পরস্পরেব প্রতি বিশ্বাসটা প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। আমার মনে হয়েছে, এতদিনে সেখানে আর মেঘ নেই।

উনি হাসতে হাসতে বললেন।

আমবা আলাদা ঘরে শুই। উনি নীচের তলায়। আমি দোতলায়। উনি বৃদ্ধ। তার ওপর খুব সুস্থ নন। আমি বলে কয়ে ওঁর ঘর থেকে আমার ঘরে একটা কলিং বেল লাগিয়ে নিয়েছি। যদি মাঝরাত্তিরে বুকে ব্যথা হয়, বা দম বন্ধ হয়ে আসে। কাকে ডাকবেন? চাকরবাকর যে-যাব কোয়ার্টারে। একজন কেবল বৈঠকখানায় শোয়। সে যদি শুনতে না পায়! কলিং বেল টিপলে আমি জেগে উঠব। ছুটে যাব। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট। বুঝলি কিনা। আমার ইচ্ছেতেই লাগানো হল।

তো, উনি তাতে ভারী মজা পেয়ে গেলেন।

হঠাৎ হঠাৎ এক-একদিন বেল টিপে দেন। পড়িমরি করে আমি ছুটে নেমে যাই। কী হল আবার? গিয়ে দেখি, উনি হয়তো বিছানায় বসে আছেন। বললেন, ট্রায়াল দিলাম। সত্যি যখন বিপদ আসবে, তখন তুমি কী করো দেখবার জন্যে। আমার রাগ হয়ে যায়। বলি, রোজ রোজ পালে বাঘ পড়েছে ডাক দিলে যেদিন বাঘ পড়বে সেদিন কেউ আসবে না।

একদিন বললেন, একটা কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, সকালে উঠে যদি ভুলে যাই। এখনই বরং ডেকে বলে দিই।

কী কথা?

তুমি এখন থেকে আমায় 'বন্ধু' বলে ডাকবে। 'আপনি' সম্বোধনটা বজায় থাক। আমি গুরুজন তো। ওই মিস্টার চক্রবর্তী, স্যার, ওই ডাক আর পছন্দ হচ্ছিল না বুঝলে। কাকাবাবু, মামাবাবু—ও রকম আত্মীয়তাও আমার পছন্দ নয়। সত্যি কথা বলতে কী, আমি তোমায় একজন পরিপূর্ণ নারী, মহিলা, সেই চোখেই দেখে আসছি প্রথম দিন থেকে। আমাদের মধ্যে জেনারেশন গ্যাপ তৈরি হোক, চাইনি। 'বন্ধু' ডাকটা তো সুন্দর। ঘনিষ্ঠ অথচ অনাত্মীয়। যেমন বউ। না, না, বউ একটু বেশি কাছাকাছি। বড় গায়ে-পড়া। বন্ধুই ভাল।

একবার ভেবে দ্যাখ দৃশ্যটা ব্রততী, তখন রাত দেড়টা, আমি মিস্টার চক্রবর্তীর বেডরুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পরনে একটা নাইটি ছাড়া কিছু নেই, তার ওপর গায়ে একখানা টেবিলক্লথ জড়ানো। ওটা আসার সময় তাড়াহুড়োয় টেনে এনেছিলাম। তবু শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি। ওঁর ঘরে এ সি মেশিনের ভুরভুরে ঠান্ডা আমার গলায়, বুকের বোঁটায়। তলপেটে এসে কাঁপুনি ধরাচ্ছে। আর উনি ডোরাকাটা জামা পরে, কম্বলের ভেতর পা ঢুকিয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বন্ধু আমার। ভাগ্যিস নীলচে আলোয় সবকিছু অস্পষ্ট দেখায়।

তারপর থেকে আমি দুই ঘরের মধ্যে একটা ইন্টারকমও বসিয়ে নিয়েছি। আর লজ্জার মাথা খেয়ে

কথায় কথায় সামনে দাঁড়াতে হয় না। গুড নাইট বলে উঠে এসে নিজের কাজকর্ম থাকে কত, সেগুলো সারতে হয়। সকালে সেই যে নেমে যাই, তারপর তো দম ফেলার টাইম পাই না, তুই নিশ্চয় বিশ্বাস করবি। জামা খুললে বুঝতে পারি কী দুর্গন্ধ জমেছে। বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরোলে আরাম। লো ভলুমে মিউজিক চালিয়ে একটা বই কি ম্যাগাজিন নিয়ে শুই। একসময় আপনিই ঘুম এসে যায়। ওঁর মতো আমাকে ঘুমের বড়ি খেতে হয় না।

তার মধ্যে এক-একদিন ইন্টাবকম বেজে ওঠে। কী, ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। আমি বলি, না, না, বলুন। তারপর আধ ঘণ্টা ধরে নানা কথা। একটাও কাজের কথা না। ওঁর কী মনে হচ্ছে। দিনেরবেলা কাকে বকুনি দিয়েছিলেন, এখন অনুশোচনা হচ্ছে। পরশু বম্বে যাওয়ার টিকিট কনফার্ম হয়ে আছে কিন্তু ওঁর যেতে ইচ্ছে করছে না। আজকাল আর ট্যুরে যেতে ভাল লাগে না। আচ্ছা, আমি ওঁর সঙ্গে যেতে পারি কিনা ওই ফ্লাইটে। কে একজন বলেছে, দুটো পমেরেনিয়ান কুকুরের বাচ্চা উপহার দেবে। দুটোই সাদা, মাদিটার কপালে একটু কালো লোম। আমরা নেব কিনা। আমি বলি, আবার ঝামেলা বাড়াচ্ছেন কেন? ঝামেলা কোথায়, দুটো বেবি কুকুর নিজেদের মধ্যে খেলা করবে। বাড়িতে এতগুলো লোক। কেউ ওদের দেখাশোনা করতে পারবে না? বড় বড় লোমওলা নরম কুকুর। আদর করব।

আসলে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। আমাকে শুধু শুধু বকানো। সেই কুকুর এল। ওদের কী নাম দেওয়া হবে। তাই নিয়ে ইন্টারকমে একঘণ্টা ডিসকাশন। পিঙ্কি আর ব্ল্যাকি? না লালু আর শুঁটি? না, সিসমি আব কিসমি? কত রকমের যে উদ্ভট চিন্তা ওব মাথায় আসে? পছন্দ হচ্ছে না একটাও? তা হলে, তুমিই নাম ঠিক করো সুষমা। এখনই না। ভেবে রাখো। কাল সকালে বোলো না হয়।

তার মানে, টেলিফোন নামিয়ে রাখার পর আমার ঘুমোনো চলবে না। কুকুরের নাম ভাবতে হবে। বুঝতে পারছিস। কী রকম জুলুম। আমিও তেমনি। সামনে একটা বই পড়েছিল, শের-শায়েবি। বুঝতে তো দেরি হয়নি যে, বাড়িতে দুটো কুকুরছানা আসছে-ই, তাই বন্ধুর মন রাখতে নাম দিলাম শেব আর শায়রি।

মন রাখতে বললাম, না? তাই তো। উনি আশি বছরের বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক। নিঃসঙ্গ। কর্মক্ষম। কিছুটা অসুস্থ। ব্লাডপ্রেশার আছে উঁচুর দিকে, সুগার আছে, আলসার আছে, চোখ খারাপ আর হার্ট। কেবল জীবনীশক্তির জোরে বেঁচে আছেন। চিরকাল স্ত্রীজাতিকে ঘেন্না করে এসেছেন। নিশ্চয় জীবনে চোট খেয়েছেন কোথাও। গুটিয়ে গিয়েছিলেন নিজের মধ্যে। টাকাপয়সা উপার্জনে ডুবে ছিলেন। শেষকালে টাকাপয়সাও একদিন ভার বলে মনে হয়েছিল। তাই সেদিন জমানো মোহর, যক্ষের মতো আগলে রাখা ধন, বেচে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে এসেছিলেন জুয়েলারেব দোকানে। যেখানে আমার সঙ্গে ওঁর দেখা।

এখন মনে হয়, প্রত্যেক মানুষের মনে আবেগের একটা বড় জায়গা থাকে। বোকা লোকেরা কথায় কথায় আবেগ প্রকাশ করতে পারে। শান্তি পায়। বুদ্ধিমান মানুষ চেপে রাখে। হালকা হতে পাবে না। আমাকে পেয়ে উনি আস্তে আস্তে ওঁর অবরুদ্ধ আবেগ ছাড়তে শিখলেন। তো, আমি সেটা বুঝব না? আমি কি বাধা দেব? মন রাখার চেষ্টা আমায় করতেই হবে। বিশেষ করে, যখন উনি আমার দিকটাও ভাবেন দেখছি। আমার সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে চিন্তা করেন। কিন্তু সব সময় খেয়াল থাকে না। আপন-পর বোধ ভুল হয়ে যায়।

আমার জন্মদিনের কথা বলছিলাম। ১৯ নভেম্বর। মিস্টার চক্রবর্তী, তখন আমার কাছে তিনি তাই, হঠাৎ দু'দিন আগে আমাকে জানালেন, পরশু সন্ধেবেলা আমাদের বাড়ির লনে একটা পার্টির ব্যবস্থা করেছি। ককটেল। আর বুফে ডিনার। অনেক নামকরা লোক আসবে। তাদের অ্যাকমপ্লিশড বউরা আসবে। আমার ইচ্ছে, তুমি সেদিন সেই মুক্তোর সেটটা পরে আমাদের সঙ্গে জয়েন করো। পরশু, ১৯ নভেম্বর, তোমার জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। ওটা সেলিব্রেট করার মতো ঘটনা।

আমি তো আকাশ থেকে পড়েছি শুনে। আমাকে নিয়ে পার্টি? কেন? আমি কে? কিন্তু সে-কথা তো জিজ্ঞেস করা যায় না। শুধু বললাম, সব প্রস্তুতি সারা, আর আমি জানতেই পারলাম না?

আগেভাগে বললে পাছে তুমি বাধা দাও। সেই ভয়ে বলিনি। চুপচাপ জগদীশের সঙ্গে বসে সব ফাইনালাইজ করে ফেলেছি। এখন তুমি কি আমার মুখ রাখবে না?

আচ্ছা বল, সে-কথা কি ওঠে? প্রস্তুতি বলতে শুধু কি পার্টি? আমার জন্যে একটি পিংক-রুপোলি

বুটি দেওয়া বেনারসি শাড়ি কিনে, একগুচ্ছ ফুলসহ ওপরে পাঠিয়ে দিলেন। তার মধ্যে জন্মদিনের শুভেচ্ছা কার্ড। দোকানের লোক এসে দিয়ে গেল সকাল আটটায়। সাধারণত আমি সালোয়ার-কামিজ পরি। একবার ভেবে দেখলেন না, ম্যাচ-করা ব্লাউজ আমার আছে কিনা। শাড়ির সঙ্গে জামার পিস ছিল, কিন্তু বানাতে সময় লাগে তো?

কে কার কথা শোনে!

আচ্ছা, আমি একটা বুড়োমানুষ, একেবারে এ-সব ব্যাপারে অনভ্যস্ত, তুমি জানো। অতশত খেয়াল রাখতে পারি? জগদীশ তো বলবে?

খামোকা জগদীশবাবু, ওঁর স্টেনোগ্রাফার, বকুনি খেল। দোকানি বকুনি খেল টেলিফোনে। গাড়ি নিয়ে আমি ছুটলাম খিদিরপুর। সেখানে বসে থেকে ব্লাউজ করিয়ে আনলাম। পার্টিতে আমায় সকলেব সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন: সুষমা, মাই বস।

সেদিন সকলের নজর ছিল আমার দিকে। পার্লার থেকে সেজে এসেছি, আমাকে প্রিনসেস বলেও চালানো যেত। তবে পুতুল সেজে বসে থাকিনি। হাসি-গল্পে যোগ দিয়েছি। উনি গ্রে রঙের স্যুট পবেছিলেন। কলারে লাল গোলাপ। হাতে তাঁর প্রিয় হাতির দাঁতের বাঁধানো ছড়ি। ওঁর সঙ্গে আমিও সার্কুলেট করেছি যথাসাধ্য। লোকে কী ভাবল, জানি না। একজন হ্যানসাম যুবক, কোনও ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের ছেলে হবে, সবাই ওকে 'রাজ' বলে ডাকছিল। আমার সম্পর্কে তার অসীম কৌতূহল। ঘুবে ফিবে আমার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছিল। আমার রূপের প্রশংসা করছিল। বার বার বলছিল, আমার মতো লেডি একজন উঠতি শিল্পপতির পক্ষে আদর্শ প্রেরণা।

সেই হল কাল।

পার্টি শেষ হওয়ার পর সবাই যে-যার আস্তানায় ফিরে গেছে। আমিও শুয়ে পড়েছি। উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না। পাশেব ঘরে গিয়ে ভেলভেটের ঢাকনা সরিয়ে শের-শায়রিকে আদর করছিলাম। এমন সময় ইন্টাবকম বেজে ওঠে। তখন রাত পৌনে বারোটা হবে।

সুষমা।

কী হল? ঘুম আসছে না?

একটু নীচে আসবে?

গেলাম। গিয়ে দেখি, স্লিপিং স্যুট পরা অবস্থায় শোবার ঘরের সোফায় বসে আছেন। হাতে ড্রিংকের গ্লাস।

বললেন, বোসো।

তাবপর খানিকক্ষণ চুপচাপ রইলেন। বুঝলাম, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। কিছু একটা বলার জন্যে ফুঁসছেন। কিন্তু কীভাবে বলবেন, ঠিক করে উঠতে পারছেন না। শেষপর্যন্ত বলে ফেললেন।

বাজকে তোমার পছন্দ হয়েছে?

কিছু না বুঝে আমি বললাম, কে রাজ? ও। বেশ চালাকচতুর ছেলে। আমেরিকা থেকে ম্যানেজমেন্ট শিখে এসেছে, বলল। অনেক নতুন আইডিয়া ওর মাথায়। বাবার ব্যবসা ঢেলে সাজাতে চায়।

ইনস্পিরেশন খুঁজছে?

হ্যাঁ। তবে ও নিজেই তো প্রেরণার প্রতিমূর্তি।

তুমি কি ওকে প্রেরণা দিতে চাও?

এই কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই।

আমাব কিন্তু ভয় করছে। মিস্টার চক্রবর্তী উদাস স্বরে বললেন, ভাবছি, পার্টি ডেকে ভুল করলাম কিনা।

তাই আপনি তখন থেকে বসে ড্রিংক করে যাচ্ছেন? কী কাণ্ড? এ অন্যায়।

বলতে গিয়ে আমার চোখে জল এসে গেছে। কী ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি এই ভদ্রলোকের। কত টাকাপয়সা আর সম্পত্তি, তার হদিশ মেলা শক্ত। অথচ কী অসহায়। আমাকে যৌবনের মুখোমুখি হতে দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন। যুদ্ধ লাগলে হেরে যাবেন, সেই ভয়।

সেই প্রথম আমি ওঁর মাথায় হাত রাখলাম। খুব বেশি চুল আর অবশিষ্ট নেই, স্পষ্ট করে টের পাই। শিরা দপদপ করছে। বললাম,

আমি যাব না। আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না বন্ধু। আমায় বিশ্বাস করুন। যান, এবার শুতে যান তো। অকারণ নিজেকে এত কষ্ট দেয় কেউ? ছি ছি।

টলছিলেন। আমি ধরে ধরে বিছানা অবধি বন্ধুকে নিয়ে গেলাম। শুইয়ে দিয়ে গায়ে কম্বল চাপা দিলাম। তারপর, কী মনে হল, ওঁর কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে চুমু খেলাম।

বল, ভুল করেছি? ইতি শিখা।

পুঃ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।

ব্রততীকে লেখা শিখার তৃতীয় চিঠি
তারিখ: ২৭ এপ্রিল, ১৯৯২

কতদিন পর তোকে চিঠি লিখছি। কীভাবে যে আমার দিন কাটছে, তা আমি জানি আর ভগবান জানেন।

তোকে জগদীশবাবুর কথা লিখেছিলাম। আমাদের স্টেনো। হঠাৎ মারা গেলেন। কতই বা বয়েস হয়েছিল। পঞ্চাশও না। দু'-এক বছর কম। আগের দিন সাড়ে সাতটা অবধি ছিলেন। বন্ধুর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বেঙ্গল ক্লাবে। কে এক জার্মান কোলাবোরেশনের দল এসেছে ড্রেসডেন থেকে। তাদের সঙ্গে মিটিং চলল দিনের-পর-দিন। তুই তো জানিস ড্রেসডেন পূর্ব জার্মানির এক শিল্পশহর। এখন যুক্ত জার্মানির মধ্যে। ওদের সব কলকারখানা মর্ডানাইজ করা হচ্ছে, রাশিয়ান আমলের যন্ত্রপাতি ফেলে দিচ্ছে ওরা। অথচ আমাদের অনুন্নত দেশে ওই পুরনো মডেলও দুর্লভ। তো, এরা অপটিকাল ইনস্ট্রুমেন্টসের অনেক দামি মেশিন রিকন্ডিশন করে আমাদের দিতে চায়। জলের দরে, বলতে গেলে। এইসব কাজে অনেক আইনের প্যাঁচ থাকে। সেই প্যাঁচ খুলতে ডাক পড়ে বন্ধুর।

তো সেদিন সন্ধে সাড়ে সাতটায় এগ্রিমেন্ট না কী সব ড্রাফট করে ছেপে দিয়ে জগদীশবাবু বাড়ি যান। আর ইনি যান ক্লাবে। সাড়ে ন'টার মধ্যে ইনি ফিরে এলেন বাড়ি। হাসতে হাসতে। আমরা একসঙ্গে ডিনার টেবিলে বসলাম। আমাদের বন্ধু একটু ফ্রুটস্যালাড ছাড়া আর কিছু খেলেন না। সেই সময়, ওই ডিনার টেবিলে, উনি আমায় একটা কলম উপহার দিলেন। ইয়া মোটা, বাঁশের কলম যেন। বললেন, এটা মো ব্লাঁ, খুব দামি জিনিস। জার্মান পার্টি এই কলম দিয়ে চুক্তি সই করেছে। সই হবার পর কলমটা লিগাল অ্যাডভাইজারকে প্রেজেন্ট করল। এখন আমি তোমায় প্রেজেন্ট করছি।

কে জানবে, সেই রাত্তিরে ওদিকে জগদীশবাবু মারা যাবে। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে ছিল ভদ্রলোক। মাঝরাত্রে বুকের যন্ত্রণায় জেগে যায়। বাথরুমে যাওয়ার চেষ্টা করে। তার আগেই পড়ে গিয়ে সব শেষ। বাড়ির লোক, ওর স্ত্রী আছে, এক মেয়ে আছে, কেউ ওর মুখে এক ফোঁটা জল দিতে পারল না। ডাক্তার ডাকার সময় পেল না। জলজ্যান্ত লোকটা মরে গেল। সকালে টেলিফোনে খবর পেয়ে আমি গাড়ি নিয়ে ছুটে যাই।

কোনও কাজই কারুর জন্যে পড়ে থাকে না।

জগদীশবাবু চলে গেলে, পুরনো আপিস থেকে আর একজন স্টেনো আনিয়ে নিয়েছিল। সে তো নতুন লোক। তাকে কাজ বুঝিয়ে দিতে আমায় নামতে হল। সেই সময় আমি অমূল্যভূষণ চক্রবর্তীর মেডিক্যাল ফাইলটা হস্তগত করি। আর দেখতে পাই ওঁর নিজস্ব ব্যালান্স শিট। ইনকাম ট্যাক্সের কাগজপত্র।

তাতে দেখলাম, গত দু'বছরে বাবুর রক্তচাপ অনেকখানি শুধরেছে, সুগার নেমেছে। ই.সি.জি. রিপোর্টে লাল কালির দাগ নেই। কী যে আনন্দ হল না!

ওঁর সঙ্গে কাজ করে করে ক্লায়েন্টদের ব্যালান্স শিট পড়তে শিখে গেছি। প্রোজেক্ট রিপোর্ট বিশ্লেষণ করতে পারি। ব্রততী, তুই ভাবছিস, আমি চাল মারছি। না রে, আমার জায়গায় তুই হলেও পারতিস। কিন্তু নিজের ব্যালান্স শিট আর মেডিক্যাল ফাইল উনি কখনও আমাকে দেখাননি। কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম, এই দু'বছরে যেমন তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে খানিকটা, তেমনই আমার জন্যে খরচ বেড়েছে বেশ। সেই অনুপাতে আয় বাড়েনি। তার ফলে পুণার বাড়িটি উনি বিক্রি করে দিয়েছেন। কিছু দামি শেয়ার ছেড়ে দিয়েছেন হাত থেকে।

একদিন বললেন, সুষমা, দেখলে তো, জগদীশ কীভাবে চলে গেল। এবার আমিও কোন দিন চলে যাব। আমার ভেতর থেকে মন বলছে, তোমার সময় হয়ে এল। এবার যাত্রার জন্যে তৈরি হও।

তখন আমি বলি, চালাকি ছাড়ুন তো। আমি আপনার মেডিকাল রিপোর্ট দেখেছি। তাতে তো একথা

বলছে না।

এই কথা শুনে দুষ্টু হাসি হাসলেন।

আমি জানতে চাই, সম্পত্তি বিক্রি করতে হল, আয় কমেছে। আমার জন্যে। আমি এসে আপনার লায়বিলিটি হয়ে পড়েছি, তাই না।

তা খানিকটা হয়েছে। তবে, আসল কথা, আমি কাজে ফাঁকি দিচ্ছি আজকাল। আর রোজগার করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু একেবারে ছাড়তে পাবছি কই? এখানে থাকলে এরা রেহাই দেবে?

নীচে আপিশ ঘরে এইসব কথা হল।

রাত্রে ইন্টারকমে বললেন, সুষমা, তুমি আমার আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছ। এখন খুব বাঁচতে ইচ্ছে করে। একটা কাজ কববে?

কী?

চলো, আমরা একবার বিদেশ ঘুরে আসি। আমি অনেক বার গেছি। তুমি তো যাওনি।

অনেক খরচের ব্যাপার। থাক না।আমি বললাম, নাকি সব ব্যবস্থা পাকা করে তারপর আমাকে বলছেন?

না, না। হাসতে লাগলেন বন্ধু। তুমি আজকাল খুব টিস করছ আমায়। ভালই লাগে। সত্যি বলছি, কিছু ঠিক করিনি। কেবল মনে হচ্ছে, একবাব ইয়োরোপ যাই আবার। আমেরিকা না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে? এখন আগস্ট মাস, সময়টা খারাপ না। মাসখানেক ঘুরে আসি চলো। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যাই।

যেমন কথা, তেমনি কাজ।

আমবা কলকাতা থেকে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট গেলাম প্রথমে। তাবপব সেখান থেকে ট্রেনে, মোটরে ঘুরে বেড়ালাম জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন আর ইংলন্ড। সব দেশের রাজধানীগুলোর একই রকম চেহারা। মাদ্রিদ একটু আলাদা। ভেতরে ঢুকলে আসল তফাতটা বোঝা যায়। ভাযাব তফাত তো আছেই। কালচারের পার্থক্য আছে। সামাজিক মূল্যবোধ এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের এক রকম নয়। সব মিলিয়ে অন্তত এইটুকু চোখ বুজে বলা যায় যে, আমরা অগ্রসব পৃথিবীর একটা অংশ দেখে এলাম।

তোর কাছে বলতে লজ্জা নেই, ওদেশের কত রকম হোটেলে থেকেছি—খুব ছোট থেকে খুব বড়—সব জায়গাতেই আমরা একখানা ঘর নিতাম। দু'ঘরে দু'জন থাকা খুব খরচসাপেক্ষ। আর ওখানে দু'জনের মধ্যে কী সম্পর্ক, কেউ প্রশ্ন করে না। বন্ধু, সঙ্গী বললেই যথেষ্ট। আমবা তো বন্ধুই। যদিও ওঁর সঙ্গে আমার বয়েসের তফাত পঞ্চান্ন বছর।

আমি আসার পর ওঁর আয়ু বেড়ে গেছে। ওঁর খুব বাঁচতে ইচ্ছে করছে। একাশি বছর বয়েসে ওঁর নিশ্চয় ইচ্ছে কবছে আবাব একত্রিশ বছর বয়েসে ফিবে যেতে। ফিরে গিয়ে আমাব হাত ধবতে। তা তো আর সম্ভব না। বল। তবু আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি। এক এক সময় আমার মনে হয়, না জেনে আমি হয়তো পুণ্য করছি।

ওদেশে আমি ওঁর এমন অনেক ব্যক্তিগত শুশ্রূষা করেছি যা কারুর স্ত্রীর করার কথা। বা নার্সের করার কথা। ওসব জায়গায় তো কাজের লোক পাওয়া যায় না। সব নিজেদের করতে হয়। আমি মাঝে মাঝে ওঁকে চান করিয়ে দিতাম। গা মুছিয়ে দিতাম। কী তুলতুলে গায়ের চামড়া। ওঁর ঝুঁকতে কষ্ট হয়, আমি মোজা পরিয়ে দিয়েছি রোজ। মোজা কেচে দিতাম। বুড়ো মানুষ—এই সামান্য মনোযোগ পেয়ে তৃপ্ত হতেন। ওঁর জুতোয় চকচকে পালিশ চাই। তাই নাও। আমি কে, আমি কেন, এসব কথা একদিনও মনে হয়নি আমার।

একদিন প্যারিসে থাকতে হল কী, আমরা পঁপিদু সেন্টারে বেড়াতে গেছি। সে এক বিশাল সংস্কৃতিকেন্দ্র। এক-এক জায়গায় এক-একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে রোজই। ভাষা তো বুঝি না, ভিসুয়াল দেখি। ঘণ্টা দুয়েক সেই সব দেখে আমরা বেরিয়ে এলাম। কাছেই এক কাফেতে গিয়ে বসলাম। উনি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অতিরিক্ত উৎসাহে আমি একটু বেশি ছোটাছুটি করেছি তো। তাল রাখতে ওঁর কষ্ট হয়েছে। খিদেও পেয়েছে। আমি হ্যামবার্গার নিলাম। ওঁর চিবোতে কষ্ট হয়, যদিও সবক'টা দাঁতই বাঁধানো। একটা স্প্যাগেটি ডিশ নিলেন। আর কফি। কেক। সারা প্যাবিসে রাস্তায় কফি আর কেকের গন্ধ। অথচ ওখানে জলের ভারী অভাব।

কাছেই অন্য টেবিলে এক বুড়ো আর এক বুড়ি এসে বসল।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলো তো, ওই বুড়ো না আমি, কে বয়েসে বড়।

আমি শুধু হাসলাম।

তারপর বললেন, ওর একটা বুড়ি আছে। ওরা দু'জন পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে একসঙ্গে থাকতে থাকতে একসঙ্গে বড় হয়েছে। কেমন সুন্দর না। আমার কোনও বুড়ি নেই। শুনে আমি হেসে উঠি।

এ-কথার কী জবাব দেব। তবু বললাম, আপনি তো নারী বিদ্বেষী।

ছিলাম। এখন আর নই।

তারপর বললেন, আচ্ছা, সুষমা, আমি মরে গেলে তুমি কী করবে?

এরও কোনও উত্তর হয় না। আহা, অমন অলক্ষুণে কথা বলছেন কেন, বলা যেত। কিন্তু কেমন খটকা লাগল। সত্যি তো, এটা ভাববার কথা। আমি বললাম, আবার হস্টেলে ফিরে যাব।

কিছুক্ষণ চুপ কবে শূন্যে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, না, না, তা হয় না।

ইংলন্ডে বন্ধুর এক সাহেব মক্কেল আমাদের খুব দেখাশোনা করেছে। ওর গাড়িতে করে সাদামটন, ব্রাইটন, ইয়র্কশায়ার, এডিনবরা, অক্সফোর্ড—খুব ঘুরে বেড়িয়েছি। ছোট দেশ তো। এক লন্ডন শহরেই কত কিছু দেখার আছে। ওঁর অনেকবার দেখা। বলতেন, তুমি যাও। আমি বরং হোটেলের লাউঞ্জে বসে লোকজন দেখি। লাঞ্চের সময় দেখা হবে।

এইভাবে কোথা দিয়ে যে একটা মাস কেটে গেল, বুঝতেই পারলাম না। আমার সঙ্গে ওঁর মেডিকাল ফাইলটা ছিল। সাহেব মক্কেলকে বলেছিলাম, এডিনবরা তো ডাক্তারদের তীর্থস্থান। এই পেশেন্টকে কোনও রকম বুস্টার দেওয়া যায় কিনা খোঁজ করবেন? অন্তত, একটা ভাল রকম চেকআপ যদি হয়ে যায়। আমরা নিশ্চিন্ত হই।

সেটা হয়েছে। কী একটা ইঞ্জেকশন দিল ওঁকে। ছ'টা অ্যাম্পুল সঙ্গে নিয়ে যেতে বলল। বছরে একবার করে নিতে হবে। তাতে শরীরে তাজাভাব ফিরে আসবে কিছুটা। কিন্তু এই বয়েসে কিছুই তো দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কথা নয়। জরার সঙ্গে যুদ্ধ করা কি নশ্বর মানুষের কাজ?

ব্রততী, কিছু মনে করিস না। সারাক্ষণ নিজের কথা নিয়ে বকবক করলাম। আমিও খুব একা। তবে একটা ঘোরের মধ্যে আছি। মাঝে মাঝে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। আশা করি, তুই এখনও হস্টেলে আছিস। হস্টেল ছাড়লে, বা বিয়েটিয়ে করলে যেন আমাকে একটা খবর দিস। পুরনো বন্ধুকে ভুলিস না। ইতি, শিখা।

ব্রততীকে লেখা শিখার চতুর্থ চিঠি
তারিখ: ১৭ জুলাই, ১৯৯৩

ভাই ব্রততী,

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, আমরা বিয়ে করব। লাভ-লোকশান কিছু ভেবে দেখছি না। শুধু মনে হচ্ছে, অমূল্যভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে গেছে। ভালবাসা কাকে বলে, একটু একটু করে যেন আমি শিখলাম। তার কাছে। সে-ও আমাব কাছে শিখেছে। না হলে, কেন আমরা পরস্পরকে এমন করে চাইছি?

এই এখনটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়। হয়তো পরে এর জন্য দুঃখ পেতে হবে। সে দুঃখও হাত পেতে নেব। অর্থহীন জীবনের চেয়ে দুঃখময় জীবন অনেক বড়। আমার মন তাই বলে।

ঠিক সময় তোর কাছে কার্ড যাবে। আমাদের বিয়েতে তোকে আসতেই হবে। আমার একটা চিঠিরও উত্তর দিসনি। আমি মনে রেখেছি। বিয়েতে না এলে তোকে কোনওদিন ক্ষমা করব না। ইতি, শিখা।

* * *

এই চিঠি পেয়ে ব্রততী দু'বার পড়ল। তারপর একটাই শব্দ উচ্চারণ ক

যা বলল না, তা হল, মন আর মন, তোমার শরীর নাই সুষমা?

১৯৯৩

❀ মিৎসুপিসির সঙ্গে দেশভ্রমণ

অনেকদিন পর সেদিন সকাল ছ'টায় টেলিফোন বাজল। অত সকালে কেউ কাউকে টেলিফোন করে না সাধারণত। অনেকে তো ঘুম থেকে ওঠেই না। উঠলেও সকালে মানুষের কত রকমের ব্যক্তিগত কাজ থাকে। কেউ ব্যায়াম করে, কেউ ঠাকুর-দেবতার নাম জপ করে, প্রার্থনা করে। নির্জন জায়গায় বেরিয়ে হাঁটে কেউ আর সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাস নেয়। যার তা-ও করার নেই, সে বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে আসে। দরজার চৌকাঠের ওপর কিংবা বাইরের সিঁড়িতে বসে, কি রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সকাল হওয়া দেখে। পাখিরা ভয় কাটিয়ে উঠে আবার 'কী খাই, কী খাই' শব্দে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে কেমন। কাল সন্ধেবেলা ভেবেছিল, এই রাত বুঝি আর কোনওদিন কাটবে না। একটি-দুটি করে জাগছে মানুষ। রাস্তায় নামছে যানবাহন। বাড়ছে শব্দ। আর ওপরে উঠতে উঠতে এইসব কাণ্ডকারখানা যত দেখছেন, তত রেগে গরম হয়ে উঠছেন আকাশের রাজামশায়। মানুষও তো অমনই। উন্নতি হলে ডাঁট বেড়ে যায়।

আমি তখনও বিছানা ছেড়ে উঠিনি সেদিন। একটা ভাল স্বপ্ন বারবার ছিঁড়ে যাচ্ছিল, সেটাকে ধরার চেষ্টা করছিলাম। মাথার বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকলে ছেঁড়া স্বপ্ন ধরা যায়।

টেলিফোন বেজেই চলেছে একনাগাড়ে। ভাবলাম, ভুল নম্বর অবশ্যই। বাজতে বাজতে একসময় থেমে যাবে। অকারণ ধরে কী করব। হয়তো শুনব, ওপাশ থেকে কেউ বলছে, "সাহাবাবু হ্যায়?" কিংবা, তিনো ট্রাক ভেজ দেউন্ছে।" কারবারি লোকেদের ওই হল ধরন। কথা পেলেই কথা বলতে হবে। সময়-অসময়ের জ্ঞান নেই। তখন আমাকে "রং নাম্বার" বলে টেলিফোন নামিয়ে রাখতে হবে। তবু একসময় আমায় উঠতেই হল। ভাল স্বপ্নটা সরসর কবে মিলিয়ে গেল আলোয়।

"কে, দুলাল?" ওপাশে এক মহিলার গলা।

আমার নাম দেবব্রত। দেবব্রত সিংহ। আমার বয়স পঞ্চান্ন বছর। আমার স্ত্রী বীথিকা, তার বয়স সাতচল্লিশ। একমাত্র পুত্র রাহুল, সাতাশ, তার বউ শ্রীতপা, বাইশ। তাদের প্রথম সন্তান, মেয়ে, আমি নাম দিয়েছি মিঠাই। ভাল নাম পরে ভেবেচিন্তে দেওয়া যাবে। দু'বছর বয়স হোক। স্কুলে ভরতি করার সময় হোক। আমি ভাবতবর্ষ স্বাধীন হওয়া দেখেছি। গান্ধীজির বক্তৃতা শুনেছি। তিরিশ বছর কাজ করার পর চাকবি থেকে অবসর নিয়েছি গত বছর। তখন আমার পদ ছিল চিফ স্টোরকিপার—আমার অধীনে সাতজন লোক কাজ করত। পৃথিবীর শতকরা আশিভাগ না হোক, শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষ আমার চেয়ে বয়সে ছোট। ধারে-কাছে আমাকে 'দুলাল' নামে ডাকতে পারে, এমন কোনও গুরুজন কেউ বেঁচে আছে বলে আমি জানি না। যদিও দুলালই আমার ডাকনাম।

আবার সেই মহিলাব গলা, 'কে রে? দুলাল?"

"আপনি কে বলছেন? মানে...আপনি ঠিক কাকে চান?"

"আমি তোকেই চাই। ভারী তালেবর হয়ে গেছিস দেখছি।"

"না, না, তালেবর কেন হব," আমি আমতা আমতা করি, "ওই নামে আমাকে তো ডাকে না কেউ। তাই ভাবছি, আপনি ভুল করে আর কাউকে..."

"দেবব্রতবাবু বলে ডাকব, তুই তাই চাস? তা তো বটেই, গণ্যমান্য লোক হয়েছ তুমি, কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনেছ, গাড়ি হয়েছে। রিটায়ার করে কোন-না দু'লাখ টাকার মালিক। তার ওপর দাদু হয়েছ, ছেলের ঘরে নাতনি হয়েছে তোমার।"

"আহা, লজ্জা দিচ্ছেন কেন?" আমি বলতে চাই।

মহিলা কিন্তু বলেই চলেছেন, "কোলে শুইয়ে সেবা করে যে তোমার ভাঙা হাত মেরামত করিয়ে দিয়েছিল, এই তো সেদিন, সেই পিসিকে এখন বলতে হবে, দেবব্রতবাবু, নমস্কার! দামুদা বেঁচে থাকলে এই বেয়াদবি সহ্য করত না, কিছুতেই সহ্য করত না।"

এবার আমি চিনতে পারি।

"ও মা, তুমি মিৎসুপিসি! রাগ কোরো না, রাগ কোরো না, প্লিজ। তোমার পায়ে পড়ি। বিশ্বাস করো, তোমায় চিনতেই পারিনি প্রথমটা। গলা শুনে বোঝা উচিত ছিল। কতকাল দেখাসাক্ষাৎ নেই। কেমন আছ তুমি?"

“কেমন আছ তুমি! কত্ত দরদ!” মিৎসুপিসি এবার টেলিফোনে ভ্যাংচায়, “কোনওদিন খবর নিয়েছ, পিসি বেঁচে আছে না মরে গেছে?”

তা সত্যি। দিনকাল এমন পড়েছে, নিজের সংসার নিয়েই মানুষ ব্যতিব্যস্ত। আত্মীয়স্বজনের খবর নেওয়া হয়েই ওঠে না। কাছেপিঠে থাকলে না হয় কথা ছিল। পিসি থাকে সেই উত্তরপ্রান্তে, বাগবাজারে। কোথায় ঢাকুরিয়া আর কোথায় বাগবাজার। তবু পিসির মন ভেজাবার চেষ্টা করি আমি।

“ছি ছি, মরতে যাবে কোন দুঃখে গো! তুমি একশো বছর বাঁচবে। আমাদের মিৎসুপিসির মতো মেয়ে লাখে একটা জন্মায় না এ-দেশে। তুমি কি কারও ধার ধারো, না কারও পরোয়া করো? আজকাল যারা নারীজাগরণ না কীসব নিয়ে মেতেছে, তাদের সব সময় বলি, বিশ্বাস করো যে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাও, পুরুষপ্রধান সমাজ থেকে মুক্তি চাও, তো আমাদের মিৎসুপিসির পায়ের ধুলো খাও। জ্যান্ত মাতঙ্গিনী হাজরা!”

খোশামোদে এবার মন ভিজেছে মনে হল। যা বললাম, সব সত্যি নয়। পিসিও বুঝেছে সেটা। তবু, খোশামোদ এমন একটা জিনিস যে, মিথ্যে বুঝতে পারলেও খুশি না হয়ে পারা যায় না। পৃথিবীতে এমন কেউ কখনও জন্মায়নি যে, চাটুকারকে মুখের ওপর বলতে পেরেছে, শাট আপ, ইউ লায়ার!

পিসি বলল, “তোর খবর কী?”

“এই চলছে। রিটায়ার করে বাড়িতে বসা।”

“কী করিস সারাদিন?”

“এই ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল, গ্যাসের অর্ডার, কলের মিস্ত্রি, দরজি, ইস্ত্রি—এইসব করে দিন কেটে যায়।”

“এখন তো একা আছিস বাড়িতে? ওরা সব কোথায় গেছে?”

আমি অবাক হই।

“তুমি কী করে জানলে? নাতনির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বাড়ির সবাই ক'দিন বেয়াইবাড়িতে গেছে।”

“তুই একটা অপদার্থ, দুলাল। ঘানি টানার বলদ।”

শুনে মনে খুব কষ্ট হল। সত্যি, কী ছিলাম, আর কী হয়েছি। বলতে বাধ্য হই, “ঠিকই বলেছ পিসি। বুড়ো হয়ে গেলাম।”

“আমাকে বলছিস, বুড়ো হয়ে গেলাম! বেকুব কোথাকার!” হঠাৎ রেগে উঠল পিসি। আবার তেমনই হঠাৎ রাগ নিবিয়ে দিয়ে বলল, “একদিন আয়। তোর সঙ্গে দরকারি কথা আছে। কবে আসবি? কাল?”

“কালই? ঠিক আছে।” আমি রাজি হয়ে যাই, “বিকেল পাঁচটা।”

মিৎসুপিসির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার।

ওই যে বলল, দামুদা বেঁচে থাকলে এই বেয়াদবি সহ্য করত না, ওই দামুদা মানে আমার বাবা। দামোদরপ্রসাদ সিংহ। আলিপুরে মোক্তার ছিলেন। খুব রাশভারী লোক। বেঁচে থাকলে আজ তাঁর বয়স একশো এক হত। এ-দেশে অত দীর্ঘায়ু কেউ হয় না। আমাদের বংশে কেউই সত্তর-বাহাত্তর বছরের বেশি বাঁচেনি। শুনেছি, যারা মাছ খায়, তারা স্বল্পায়ু হয়। মাছেদের সমাজে যেমন সর্বক্ষণ খেয়োখেয়ি, বড়মাছ মেজোমাছকে খেয়ে ফেলছে, মেজোমাছ ছোটমাছকে গিলে খাচ্ছে, কারও জীবনে শান্তি নেই। মাছখেকোদের জীবনেও প্রায় সেই রকম। আর জীবনে শান্তি না থাকলে মানুষ দীর্ঘজীবী হবে কী করে। কাজাকিস্তানের লোকেরা একশো বাইশ বছর অবধিও বাঁচে শুনেছি। উন্মুক্ত পাহাড়ি পরিবেশ, পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া, খাদ্য পায় সুপুষ্ট পশুমাংস, হবেই তো। বিশাল আকাশ, বিস্তৃত পর্বতমালা চোখের সামনে দিনরাত টাঙানো থাকলে মনটাও বড় হয়ে যায়। ছোট করে কোনও জীবন ওরা ভাবতেই পারে না হয়তো।

মিৎসুপিসি আমার বাবার ছোটবোন। বাবার চেয়ে চব্বিশ বছরের ছোট, হিসেব করে দেখলে ওর বয়স সাতাত্তর। আমরা অনুমান করেছিলাম, পিসি আর ইহজগতে নেই। এখন দেখছি, আমার পূর্ববর্তী প্রজন্মের ও-ই একমাত্র পিদ্দিম এখনও টিমটিম করে জ্বলছে। টিমটিম করে, না দাউদাউ করে জ্বলছে, ঠিক জানি না।

পিসির বর মানে আমাদের পিসেমশাই ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক। খুব শান্তশিষ্ট মানুষ ছিলেন। পড়াশোনা নিয়ে থাকতেন। ওই বাগবাজারের বিশাল বাড়ি ছিল জ্ঞাতিগুষ্টির এক গোয়ালঘর। যুদ্ধের আগে, যখন টাকায় পনেরো সের চাল ছিল, একপয়সা জোড়া ডিম, দু'টাকায় একশো ল্যাংড়া আম পাওয়া যেত, তখন ওই বাড়িতে দূর-সম্পর্কের পরিচয় নিয়ে কেউ একবার ঢুকে পড়লে তাকে আর কেউ বের করে দিত না। শুয়ে-বসে, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত, ডাল-তরকারি খেয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে সে চাকরি খুঁজতে পারত সকলের অলক্ষে। তারপর একসময় নিজের সুবিধেমতো সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে চলে যেত। পড়াশোনা করতে এসে কত ছাত্র যে আই এ, বি এ পাশ করে গেছে এই বাড়িতে থেকে, তার হিসেব কেউ রাখেনি। যারা উপকৃত হয়েছে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে তারা কৃতজ্ঞ থাকতে চায়নি। কে আর সারাজীবন কৃতজ্ঞতার বোঝা বয়ে বেড়াতে চায়। ভুলে যাওয়াই তো ভাল।

যেমন আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

ওই ভাঙা হাত মেরামতের কথা। পিসি বলল বটে, এই তো সেদিন, তা সে হবে পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা।

এখন মনে করিয়ে দেবার পর মনে পড়ছে, সেটা ছিল পুজোর ছুটি। বাগবাজারের বাড়িতে পুজো হত। এখনকার মতো তখন ট্রাকে চাপিয়ে কুমোরটুলি থেকে তৈরি দুর্গাঠাকুর নিয়ে আসা হত না। ঠাকুরদালানে বসে কুমোর একমাস ধরে প্রতিমা গড়ত। খড়-জড়ানো কাঠামো থেকে কী দুর্বোধ প্রক্রিয়ায় এক-একটি প্রতিমা—লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, সিংহ, অসুর আর দুর্গায় পরিণত হয়ে উঠত, আমরা ছোটরা অবাক চোখে তা প্রত্যক্ষ করতাম।

আর মনে পড়ে আমাদের যৌথ ডিনারের কথা। আমরা দশ-বারোজন ছেলেমেয়ে গোল হয়ে বসেছি, মাঝখানে প্রকাণ্ড এক কাঁসার থালা, তাতে ভাত ডাল তরকারি মাছ বড়ি বেগুন কুমড়ো পটল—এর সব একসঙ্গে মাখা হয়েছে, আর গিন্নি সেই বৃত্তের একপ্রান্ত থেকে ঘড়ির কাঁটা যেভাবে ঘোরে সেইভাবে, এক-একজনের ঘাড় ধরে এক গ্রাস করে সেই মণ্ড মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। আঃ, কী তার স্বাদ।

পিসেমশাইয়ের মাকে পিসেমশাইয়ের বাবা গিন্নি বলে ডাকতেন। আমরাও তাই গিন্নি বলে ডাকতাম। চওড়া কপাল, সিঁথিতে মোটা করে পরা সিঁদুর, এত বড় সিঁদুরের টিপ, পরনে লালপাড় শাড়ি, একটু মোটাসোটা টানা টানা চোখ—গিন্নিকে দেখতে অনেকটা মা দুর্গার মতো ছিল। পিঠে সব সময় ঝুলত আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা। সব স্নেহ-মমতা, করুণা-বাৎসল্য ছাপিয়ে ওই চাবির গোছা ছিল তাঁর ক্ষমতার প্রতীক। গায়ে জামা নেই তাতে কী, গিন্নি ছিলেন আমাদের সকলের গিন্নি।

একদিন পেয়ারা পাড়তে গিয়ে আমি গাছ থেকে পড়ে গেলাম। বাড়ির পেছন দিকটায় ছিল জঙ্গল মতন। কাজের লোকেদের জন্যে কুয়ো। কলা গাছের ঝোপ। বাতাবিলেবুর গাছ, চালতা গাছ। আর দু'-দুটো পেয়ারা গাছ।

এখন মনে পড়ছে, আমি লোভ করে পেয়ারা পাড়তে যাইনি। কুটুমবাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি, এমন কিছু যেন না করি যাতে মায়ের নিন্দে হয়—এই সাবধানবাণী আমার মনে ছিল, যদিও বয়স দশ বছরের বেশি নয়। কিন্তু ন্যাড়ামাথা একটা মেয়ে, কানে মাকড়ি পরা, আঃ, নামটা কিছুতে মনে পড়ছে না, আমায় প্ররোচিত করল। বলল, "ওই পেয়ারাটা পেড়ে দিবি? নাঃ, থাকগে, তুই আবার যা ভিতু!"

একেবারে মগডালে ঝুলছিল একটিমাত্র ডাঁশা পেয়ারা। পাতার আড়ালে লুকিয়ে ছিল, তাই কেউ লক্ষ করেনি আগে। আমি জানতাম, পেয়ারা গাছ চট করে ভাঙে না, খুব শক্ত হয়। গুলতি তৈরি হয় পেয়ারাকাঠ দিয়ে। তবু ভয় করছিল। কিন্তু আমায় ভিতু বলাতে ভয়টাকে অগ্রাহ্য করলাম। উঠেও গেলাম ওপরে। একেবারে শেষ ধাপে হাত বাড়িয়ে পেয়ারাটাকে ধরতে গিয়ে, পা ফসকে গিয়েছিল, না পিঁপড়ে কামড়েছিল হাতে, আজ আর তা মনে নেই—ধুপ করে পড়ে গেলাম ইটের ওপর। হাত ভাঙল।

আমি যেহেতু পিসির বাপের বাড়ির কুটুমের ছেলে, আমার চিকিৎসা-শুশ্রূষার দায়িত্ব পড়ল তারই ওপর। কোলে শুয়েছি কিনা জানি না, কিন্তু কী করে অস্বীকার করি যে, সেই সময় পিসিরই অকাতর সেবায় আমার ভাঙা হাত জোড়া লেগেছিল। প্লাস্টারের ওপর গরম পুঁটলির সেঁক পিসিই দিত রাত্রে ঘুমোবার আগে, রোজ।

আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনের এইসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করার যোগ্য নয়। মিৎসুপিসির প্রসঙ্গ এল বলে এখন মনে পড়ছে, মা বলেছিল, "যা জাঁহাবাজ ননদ আমার, দেখা হলে এককাহন কথা শোনাবে। মুখ

তো নয়, মিছরির ছুরি।" কুটুমবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তাদের বিব্রত করেছিলাম যে। তাতে মায়ের মাথা নিচু হয়েছিল।

আগেই বলেছি, পিসেমশাই ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক। বড় হয়ে শুনেছি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি আমেরিকায় বড় চাকরি পেয়েছিলেন। পিসিরা অনেক বছর আমেরিকায় ছিল। তারপর জাপানে। জাপানে থাকার সময় একদিন হঠাৎ ওই শান্তশিষ্ট মানুষ আমার পিসেমশাই মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। আমাদের পরিবারের লোকেরা সন্দেহ করে, তিনি মোটর দুর্ঘটনায় মারা যাবার লোক ছিলেন না, তিনি আসলে আত্মহত্যা করেছিলেন। এর অবশ্য কোনও প্রমাণ নেই।

পিসির ডাকনাম ছিল মিছরি। জাপান থেকে ফিরে হল মিৎসু। মিৎসুপিসি এখন বিধবা, নিঃসন্তান। কিন্তু অকূল পাথারে পড়েনি। বিদেশ থেকে মোটা টাকা পেনশন পায়। অন্তত তিরিশ বছর ধরে পাচ্ছে। আজীবন পাবে।

৩

বুড়ো মানুষেরা যখন ডেকে পাঠায়, তখন মনের মধ্যে কেমন ভয় ভয় করে, বুঝি বা সেবা-শুশ্রূষার কাজে লাগিয়ে দেবে। মিৎসুপিসি একা মানুষ, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, হাতের কাছে কমবয়সি একজন ছেলের দরকার হতেই পারে তার। কিন্তু আমি তার কী কাজে লাগব। আমাকে কে দেখে তার ঠিক নেই।

তবু গেলাম। শ্যামবাজার অবধি মিনিবাসে গিয়ে সেখান থেকে একটা রিকশা ধরলাম। লোকটা এগলি-ওগলি ঘোরাল খানিক, তারপর ঠিক জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাল। বাড়িটা খুঁজতে একটুও বেগ পেতে হল না, কারণ রিকশা থেকে নেমে দেখি, 'মিটার লজ' লেখা শ্বেতফলক থেকে শুরু করে জং-ধরা লোহার গেট, লাল সিমেন্টের লম্বা রক, প্লাস্টার-খসা ঘেয়ো দেয়াল, মায় চাকলা উঠে যাওয়া পাঁচিল—সব আগেকার মতনই আছে। দুটো লম্বা পাম গাছ ছিল বাগানের মাঝখানে—পাশাপাশি ভাইবোনেব মতো, যতদূর মনে পড়ছে, তাদের একটা নেই। এই যা পরিবর্তন। আর কার্নিসের কোণে গজিয়েছে পাতলামতো এক বটচারা, যা ধ্বংসের ইঙ্গিত।

কোথা থেকে বন্দুকধারী এক দারোয়ান এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "দুলালবাবু?"

তারপর বাগানের ইট-পাতা পথ দিয়ে আমায় বাড়ির পেছন দিকটায় নিয়ে গেল। শীতকাল। বিকেল পাঁচটায় জায়গাটা আলোআঁধারি হয়ে ছিল, ও পটাপট সুইচ টিপে অনেকগুলো আলো জ্বেলে দিল। বলল, "চলে যান, ম্যাডাম দোতলায় আপনার জন্যে ওয়েট করছেন।"

ম্যাডামকে দেখে তো আমি অবাক। এই আমাদের মিৎসুপিসি!

একটা বড়সড় হলঘর। পুরো মেজেটা সরষের রঙের কার্পেটে ঢাকা। দেয়ালে কাঠের প্যানেল, বড় বড় পেইন্টিং টাঙানো। জানলায় ভারী পরদা ঝুলছে। ঘরের মাঝখানে একটা ঝোলানো আলোর নীচে বসে আছে মিৎসুপিসি। চোখে আধখানা কাচের চশমা। ধবধবে সাদা মাথার চুল বয়কাট করা। গায়ে ব্রোকেডের ড্রেসিংগাউন। একেবারে মেমসাহেব। সামনে একটা নিচু কাচ-দেওয়া টেবিল, তার ওপর কিছু কাগজপত্র। সাদা আর সবুজ রঙের দুটো টেলিফোন।

"আয় দুলাল", মিৎসুপিসি আমায় ভেতরে ডাকল।

জীবনে অনেক বসার ঘর দেখেছি আমি। আগে শুধু বড়লোকেদের বাড়ির বসার ঘরে সোফাসেট থাকত। এখন মধ্যবিত্ত পরিবারেও আলাদা বসার ঘর বা বসার ব্যবস্থা থাকলে সোফাসেট থাকে। পুরু গদিমোড়া চেয়ার। ওই চেয়ারের চেহারা দেখলে বাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থা অনুমান করা যায়। গৃহস্থ কেমন অতিথিবৎসল, লক্ষ করলে তাও অনুমান করা যায়। যেমন, হেলানো-পিঠ, কোলে-হাতলে গদিমোড়া সোফা দেখলে মনে হয়, গৃহস্থ বলছেন, আসুন আসুন, তারপর কেমন আছেন বলুন। আবার হাতল-ছাড়া, খাড়া চকচকে একরকম সোফা আছে, তাতে বসলেই মনে হয়, কেউ বলছে, কাজ সারো, চলে যাও, সময় নষ্ট কোরো না। এই সোফা তোমার শোবার খাট নয়।

মিৎসুপিসির সোফাসেট খুব দামি আর গাঢ় নীল রঙের হলেও ওই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

পিসি বলল, "কী চেহারা হয়েছে তোর, অ্যাঁ? হার্টের অসুখ? না, চিনি?"

উত্তর না দিয়ে আমি বলি, "বাইরে থেকে বুঝতে পারিনি, বাড়িটার ভোল পালটে দিয়েছ একেবারে।"

"দেয়ালগুলো ভেঙে দিয়েছি," পিসি বলল, "বড় ঘরে থাকলে মন সংকীর্ণ হয় না। চোখের সামনে অনেকটা জমি দেখা যায়।"

আমি বলি, "শুধু তাই না। কী সুন্দর করে সাজিয়েছ।"

পিসি বলে, "যতদিন বেঁচে আছি, ভোগ করি। বৈভব রাস্তার লোককে দেখানোব মধ্যে কোনও আভিজাত্য নেই। তা ছাড়া ভাবলাম, রায়বাহাদুর শ্বশুরমশাইয়ের স্মৃতি—কী মানী লোক ছিলেন—বাইরেটা ওই রকমই থাক। চা খাবি, না কফি? কফিই খা।"

তারপর আমার মতামতের তোয়াক্কা না করে সবুজ টেলিফোন তুলে বলল, "দুটো কফি আব নাস্তা দিয়ে যাও আবদুল।"

আমি বুঝলাম, ওটা ইন্টারকম। আবদুল বোধহয় বাবুর্চি। কিন্তু মিৎসুপিসি তো বিধবা, ওর তো রান্নাব লোক থাকার কথা নয়। সে-কথা তো খোলাখুলি জিজ্ঞেস করা যায় না। তাই আন্দাজে ঢিল ছুড়লাম।

"আবার নাস্তা কেন? শুধু কফি হলেই তো হত।"

"একটু সসেজ ভাজতে বলেছি," পিসি আমায় আশ্বস্ত করে, "এমন আহামরি কিছু না। নিরিমিষ্যি আমার দু'চক্ষের বিষ।"

আমি আর কথা বাড়ালাম না। একটু পরে খাবার এল, কফি এল। কাগজপত্র নাড়তে নাড়তে আধখানা কাচের ওপর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ পিসি বলে ওঠে, "তোব মুখখানা একেবারে দামুদা বসানো। আহা, দামুদা আজ বেঁচে থাকলে..."

"একশো এক বছর বয়েস হত।"

"না, না, অতদিন কেউ বাঁচে না। ভারী ভালমানুষ ছিল। তা, মারা গিয়ে একরকম রেহাই পেয়েছে দাদা। তোর মা ছিল ভারী কটকটি; বাব্বা। দামুদাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাত। স্ত্রীলোকের কথায় যে-পুরুষমানুষ চলে, তার দুর্ভোগ হবে না, বল?"

গবম গরম সসেজ মার্স্টাডে ডুবিয়ে খেতে বেশ মুখরোচক। খেতে খেতে লক্ষ করি, মিৎসুপিসির দু'পাটি দাঁত একেবারে ঝকঝক করছে। নিশ্চয় বাঁধানো। আজকাল ডাক্তারেরা বলে, ষাট বছর বয়েস হওয়ার আগে সব দাঁত ফেলে দাও। দাঁতের গোড়া হল রোগের ডিপো। পিসির শরীরে কোনও অসুখ আছে বলে মনে হয় না। তবু ওর মুখে আমার মায়ের নিন্দে শুনে মনে কষ্ট হল। লোকে মায়ের কটকটির দিকটাই দেখেছে, কষ্টের দিকটা দেখেনি।

কথা ঘোবাতে যাব, পিসি নিজেই বলল, "তোকে সংসার থেকে কিছুদিনের ছুটি নিতে হবে, দুলাল। আমার সঙ্গে যাবি।"

"কোথায়?"

"এখনও আইটিনেরারি পাকা করিনি। আপাতত বেনারস। সামনের শুক্কুরবার। দুপুর একটায় ফ্লাইট। তুই আগের দিন সন্ধেবেলা একটা সুটকেসে যা আঁটে তাই নিয়ে এখানে চলে আসবি, কেমন? তারপর থেকে আমার দায়িত্ব।"

ভাবটা, পঞ্চান্ন না, আমার বয়েস যেন এখনও সেই দশ।

"কিন্তু বাড়ির চাবির গোছা যে আমার কাছে। ওরা ফিরে এলে..."

পিসি অধৈর্য হয়ে বলে, "চাবির গোছা ব্যাঙ্কের লকারে ঢুকিয়ে দে। তারপর লকারের চাবিটা রেজিস্ট্রি করে বউকে পাঠিয়ে দে। লিখে দে, একমাস আমার খোঁজ নিয়ো না। পিসির সঙ্গে আছি। বুড়ো ধাড়িকে এটাও শিখিয়ে দিতে হবে?"

কেমন ভয় ভয় করতে লাগল আমার। আবার পিসির প্রস্তাব শুনে রোমাঞ্চও লাগল। ভ্রমণের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থাকলে রোমাঞ্চ হয় না?

বারাণসীর ফ্লাইট আই. সি ২৮১ ছাড়ার কথা দুপুর একটা পাঁচে। আমরা দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম বারোটার মধ্যে। গিয়ে শুনি প্লেন আধঘণ্টা লেট।

ফিশফ্রাই আর চিকেনের হালকা ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে আমরা বেরিয়েছি। সুতরাং সারাদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। ডিসেম্বর মাস, বলা তো যায় না, ওখানে চেপে শীত পড়তে পারে, এই ভেবে আমার সবেধন-নীলমণি গরম সুটখানা সঙ্গে নিয়েছি। আর একটা মাফলার। আমাদের সঙ্গে দুটো সুটকেস, দুটো ব্রিফকেস আর পিসির হাতব্যাগখানা। আমার সুটকেসটা পুরনো ধরনের, চামড়ার—চারকোণে তাপ্পি মারা। বাকি সব যাকে বলে মোল্ডেড লাগেজ। তিনটেই টকটকে লাল। শক্ত। বড়টার তলায় আবার চাকা লাগানো, কানে বকলস আঁটা। কুকুরের মতো টেনে নিয়ে যাওয়া যায়।

ট্যাক্সিতে আসতে আসতে পিসি বলছিল, "বিবেক আর পেট—এই দুটো সব সময় পরিষ্কার রাখবি। তা হলে যে-কোনও অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবি সহজেই।"

আমি বলি, "কোথায় উঠছি আমরা?"

"আমার গুরুভাই থাকে গণেশ মহল্লায়। অনেক মিনতি করে লিখেছিল ওর বাড়িতে উঠতে। এবারে আমি রাজি হইনি। অচেনা লোকের বাড়ি, তোর আড়ষ্ট লাগবে, ভেবে ঠিক করেছি হোটেলেই উঠব।"

"কোনও বিপদআপদের ঝুঁকি আছে?" আমি জানতে চাই।

"কেন?" মিৎসুপিসি একটু চমকেই আবার স্বাভাবিকভাবে হাসল, "তীর্থে যাচ্ছি, আমাদের বিপদ কীসের। তবে, বিদেশ বিভুঁই বলে কথা—মনটাকে তৈরি রাখা দরকার। একবার আদ্দিস আবাবা যাচ্ছি, আমার এই হাতব্যাগটাই হারিয়ে গেল। এর মধ্যে পাসপোর্ট, ট্র্যাভেলার্স চেক, আমাব ডায়রি—সব।"

"কী করে ফিরে পেলে আবার?"

পিসি কালো হাতব্যাগটার চেন খুলে একটা ছোটমতন ছবি বার করে দেখায়। জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসীর ছবি। ছবিটা কপালে ঠেকিয়ে বলে, "সবই গুরুদেবের কৃপা।"

সুটকেস দুটো ভেতরে চালান করে দিয়ে বোর্ডিং পাস আর ব্যাগেজ টিকিট জোগাড় করে নিয়েছি। এয়ারপোর্টের মধ্যে বিশাল লাউঞ্জে দু'খানি শক্ত চেয়ার দখল করে বসে আছি। ডাক পড়লে উঠব।

একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ফরসা ভদ্রলোক মিৎসুপিসির পাশে এসে দাঁড়াল। বছর তিরিশ বয়েস হবে।

"এই তো ভৌমিক। তুমিও এই ফ্লাইটে? ভাল।"

ভৌমিক ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, "গোমেজ আসেনি?"

"না। আলাপ করো, এ হল দুলাল, আমার ভাইপো। খুব চালাক-চতুর ছেলে।"

নমো নমো করে নমস্কার সারল ভৌমিক, সেটা আমার পছন্দ হল না। আসলে আমার মতো একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিকে তাচ্ছিল্য করে 'চালাক-চতুর ছেলে' বলাতেই আমি বিরক্ত হয়েছি।

ভৌমিক আবার ফিসফিস করে বলল, "রেইড হয়েছে। কিছু পায়নি।"

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম। ওদের কথাবার্তা শোনার জন্যে কোনও আগ্রহ আমার ছিল না। তবু কাটা কাটা কতকগুলো শব্দ আমার কানে এল: 'অন্য হোটেল'। 'নতুন মুখ'। 'ইনফর্মার'। 'ইনটারোগেট'। 'কাটমাণ্ডু'। 'নাইজেরিয়ান'। 'সাহার এয়ারপোর্ট'। 'পাঁচ কেজি'। 'দশরথ চৌবে'। 'গাজিপুর'।

আমি আড়চোখে মিৎসুপিসির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, বেশ গম্ভীর। ফরসা, কোঁচকানো গালের চামড়া লাল হয়ে উঠেছে। চামড়ার হাতব্যাগটা একবার চেন টেনে খুলছে, ভেতরের কাগজপত্র ঘাঁটছে, আবার চেন টেনে বন্ধ করছে। এমনি বার বার। অথচ আধখানা কাচের পেছনে চোখ দুটোয় কোনও উদ্বেগ নেই। চোখের মণি দুটো ডাইনে-বাঁয়ে নাচানাচি করছে ক্রমাগত।

বুঝতে পারছি কিছু একটা গোলমালে পড়েছে পিসি। সাদা গরদের থান আর সাদা কার্ডিগান পরে সাতাত্তর বছর বয়েসের যে-মহিলা তীর্থ করতে কাশী যাচ্ছেন, তিনি খুব একটা সাদাসিধে মানুষ নন। এক-একজন লোক থাকে না, বিপদ যত ঘনিয়ে আসে ততই তার কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়, বুদ্ধি খুলতে থাকে, চ্যালেঞ্জের মুখে না পড়লে যার প্রতিভার বিকাশ হয় না, মিৎসুপিসিকে দেখে সেই রকম একটি চরিত্র মনে হল আমার। চালাক-চতুর ছেলে বলে আমার পরিচয় দিয়েছে ওই ছোকরার কাছে। ঠিক

আছে। আমি ন্যাকা সেজে থাকব। জানতে দেব না, আমি কিছু বুঝতে পেরেছি। গুরুদেব, গুরুভাই, তীর্থ—এর বাইরে আমি কিছু জানি না।

হঠাৎ শুনতে পাই পিসি বলছে, "আমরা তাজ গ্যাঞ্জেসে উঠছি না। আই. টি. ডি. সি'তে খবর কোরো। চমৎকার জায়গা। ওদের চিকেন আ-লা-কিয়েভের জবাব নেই।"

নাম শুনেছি কিন্তু চিকেন আ-লা-কিয়েভ আমি কখনও খাইনি। পিসির দৌলতে ভালমন্দ খাওয়াটা জুটবে। আর, আমার ইচ্ছে আছে, কালীতলার গলিতে ঢুকে পানিফলের জিলিপি খাব। এখনও পাওয়া যায় কিনা জানি না, ছোটবেলায় এসে খেয়েছি।

ভৌমিক চলে যাবার মিনিট চারেক পরে মাইকে ডাক শোনা গেল, প্যাসেঞ্জার্স—যারা ফ্লাইট আই. সি. ২৮১-তে বারাণসী যাবে, তারা সিকিউরিটি চেক করাতে এগোও।

পিসি চকাম চকাম করে চিউয়িংগাম খেতে খেতে বলল, "চল"। তারপর দুটো লাল রঙের ব্রিফকেসের একটা আমায় ধরিয়ে দিল। অন্যটা নিজে তুলে নিয়ে গট গট করে এগিয়ে চলল সিকিউরিটি গেটের দিকে। পৌঁছে দেখি, এর মধ্যে মাঝারি গোছের একটা কিউ লেগে গেছে। পুরুষদের আর মেয়েদের আলাদা লাইন।

আস্তে আস্তে এগোচ্ছি, কোথা থেকে সেই ভৌমিক লোকটা আমার পাশে উদয় হল হঠাৎ। ফিসফিস করে বলে কী, "মাসিমার দিকে লক্ষ রাখবেন। ওঁকে আটকে দিলে আপনিও লাইন থেকে বেরিয়ে আসবেন, কেমন?" বলেই ও চলে গেল কোথায়।

না, মিৎসুপিসিকে ওরা আটকায়নি। ব্রিফকেস খুলতে হয়েছে। আমারটার মধ্যে গুরুদেবের ফোটো, নামাবলী আর শ্রীশ্রীগীতা দেখে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেনি।

একটু পরে আমরা যখন প্লেনে ওঠার জন্যে এগোচ্ছি, তখন দেখি, হন্তদন্ত হয়ে ভৌমিক সিকিউরিটি চেকের সামনে পৌঁছেছে। ভীষণ হাঁপাচ্ছে। তখন আর সময় নেই। ওর হাতে ছিল দড়িবাঁধা একটা শতরঞ্চির পুঁটলি। ভেতরে কী আছে না দেখেই ওকে ছেড়ে দিল পুলিশ। না হলে প্লেন ধরতে পারত না।

৫

সমুদ্রের ধারে যেসব নামকরা বেড়াবার জায়গা আছে, সেখানে বড় বড় হোটেলগুলো সমুদ্রকে সামনে রেখে তৈরি হয়। থাকা-খাওয়ার সুখ ও আরামের পাশাপাশি সমুদ্র দেখার মজাটা উপরি পাওনা। যেমন পুরী কি গোপালপুর, কি গোয়ার পানাজি। বোম্বাই আর ভাইজাগ আবার বন্দর, বাণিজ্যের কারণে বেশি বিখ্যাত, সেখানে শহরের মধ্যেই ভাল ভাল হোটেল। সমুদ্রে চান করার রেওয়াজ নেই বললেই হয়।

বারাণসীর খ্যাতি মূলত তার উত্তরবাহিনী গঙ্গার কারণে। সারি সারি বাঁধানো সব ঘাট কোলে নিয়ে শহরটা গড়ে উঠেছিল একসময়। খুব পুরনো শহর। প্রচুর বাঙালির বাস। সকাল-বিকেল গঙ্গাকে একবার ছুঁয়ে না এলে মানুষের মন ভরে না। অথচ সেখানে গঙ্গার ধারে একটাও হোটেল ছিল না এই সেদিন অবধি। সবক'টাই শহরের মাঝখানে, ঘাটগুলো থেকে দূরে। কাশীর রাজবাড়ি নদেশ্বর প্যালেস গঙ্গার ওপারে। ওই রাজবাড়ির গায়ে, রাজারই উৎসাহে, এখন এক প্রকাণ্ড হোটেল খুলেছে বোম্বাইয়ের তাজ। বিদেশি যাত্রীদের সুখ-সুবিধার কথা মনে রেখে সেখানকার সব ব্যবস্থা। কথা ছিল, আমি আর মিৎসুপিসি ওখানেই উঠব।

কী এক অজ্ঞাত কারণে আমাদের ওখানে ওঠা হল না। তার বদলে আমরা গিয়ে হাজির হলাম হোটেল বারাণসীতে। সে-ও এলাহি ব্যাপার। পুরোটা বাতানুকূল। দুটো বিছানা আর লাগোয়া এক পেল্লাই বাথরুমসহ এক-একখানা ঘরের দৈনিক ভাড়া সাতশো টাকা। খাওয়ার খরচ আলাদা।

ভেবেছিলাম, পিসি একটা ঘর নেবে। আমরা দু'জন বনিবনা করে থাকব। বুড়ো মানুষটা মাঝরাত্তিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে দেখবে কে? আমাকে সঙ্গে আনাই বা কেন? ফ্রন্ট অফিসের সুন্দর মেয়েটাও সেই কথা বলল।

পিসি বললে, "হরগিজ নেহি। যেমন করে হোক, দুটো ঘর ব্যবস্থা করে দাও। আমি তোমাদের

পুরনো ক্লায়েন্ট। পুরুষমানুষের সঙ্গে এক ঘরে আমি শুতে পারব না। ওদের ভীষণ নাক ডাকে।"

আমি যত বলি, "আমার নাক ডাকে বলে শুনিনি কখনও, বিশ্বাস করো, আমি নীরব ঘুমানিয়া", পিসি কান দিল না।

"সবাই ওই কথা বলে। নিজের নাক ডাকা কেউ শুনতে পায় নাকি? তোর পিসেমশাইও বলত। উঃ, আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়েছে একেবারে। একদিন এমন নাক ডাকতে লাগল ওর যে কী বলব। ঠেললে জাগে না, ডাকলে জাগে না। শুধু গাঁও-গাঁও করে নাক ডাকে আর সেই শব্দে ঘর কাঁপে থরথর করে। জাপানে তো পলকা সব বাড়ি, আমাদের দেশের মতো শক্তপোক্ত নয়। শেষে আমি আর থাকতে না পেরে ওর নাক টিপে ধরলাম।"

বলতে গিয়ে চোখে জল এসে যায় মিৎসুপিসির।

"তারপর?" আমি জানতে চাই।

"অত বড় মানুষটার হার্ট ফেল করে গেল। আমি কেঁদে বাঁচি না। তাড়াতাড়ি পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে নাকে বালিশ চাপা দিই। খুনের দায়ে ধরা পড়ব নাকি। ডাক্তার এসে বলল, সাফোকেশনই মৃত্যুর কারণ। সেইসব দিনেব কথা ভাবলে মনটা হু-হু কবে ওঠে।"

এই কাহিনী শোনার পর আমি আর কথা বাড়াই না। পিসেমশাই তা হলে আত্মহত্যা করেনি। লোকে মিথ্যে গুজব রটায়। পিসেমশাইয়ের মুখটা এতদিন পর আমার পরিষ্কার মনে পড়ে না, তবু এই অতীত কাহিনী শোনার পর মনটা সমবেদনায় ভরে ওঠে। সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পিসির হাতখানা ধরতে গিয়ে দেখি, ও আমার নাকের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে।

৩১২ আর ৪২৭—এই দু'খানা ঘর আমরা পেলাম। একই রকম ঘর, তবু শেষ অক্ষর ৭ বলে পিসি ৪২৭ নম্বর ঘরটাই নিল। আমি গেলাম ৩১২-এ। ৭ নাকি ওর লাকি সংখ্যা।

আমার যখন বয়েস কম ছিল, প্রথম প্রথম কাজে ঢুকেছি, তখন ভাবতাম এক-একটা হোটেলে, সে যত বড়ই হোক না, এতগুলো ঘর কী করে আঁটায়। অত বড় কলকাতা হাইকোর্ট, সেখানেও পঞ্চাশখানার বেশি ঘর নেই। মহাকরণে কি রাজভবনে ক'খানা করে ঘর আছে আমি জানি না, তবে আমার অনুমান, একশোর বেশি হবে না। পরে জেনেছি, এদের অঙ্কটা আলাদা। নম্বরের প্রথম সংখ্যা থেকে কোন তলা বোঝা যাবে, আর পরের দুটি সংখ্যা হল সেই তলার ঘরের নম্বর। অর্থাৎ পিসি চাবতলায় সাতাশ নম্বর ঘরে ঢুকল। আমি তিনতলায় বারো নম্বর ঘরে।

পিসি বলল, "ক্লান্ত আছিস, চানটান করে বিশ্রাম কর দুলাল, ঠিক আটটার সময় আমরা ডাইনিং রুমে মিট করব।"

ভেবেছিলাম, এই শীতে কে আর রাত্তিরে চান করে।

ঘরখানা পরিদর্শন করে আমি তো ট্যারা। সিলিং থেকে মেজে অবধি দামি পরদা ঝুলছে। পায়ের তলায় পুরু কার্পেট। পাশাপাশি অথচ আলাদা দু'খানা বিছানা ঘরের মাঝখানটায় রাখা, তার ওপর ছ'ইঞ্চি পুরু ফোমের গদি, ভেলভেটের বেডকভার। বেডকভারের নীচে ধবধবে সাদা চাদর, বালিশ—যাকে বলে দুগ্ধফেননিভ শয্যা, পায়ের কাছে চাদর-মোড়া কম্বল।

বাথরুমে মার্বেলের মেজে। প্রকাণ্ড আয়না দেয়ালজোড়া। চান করার টব। গরম-ঠান্ডা দু'রকম জলের ট্যাপ, ইচ্ছে মতন মিশিয়ে নাও। মাথার ওপর ফোয়ারা। ওদিকে ফরসা দু'জোড়া তোয়ালে ঝুলছে।

দুটো বিছানাতেই একটু একটু করে শুয়ে নিলাম প্রথমে। তারপর আচ্ছা করে গরম জলে চান করলাম। চান করতে করতে গান পেয়ে গেল, গান করলাম খানিকক্ষণ। খিদেটা চনমন করে উঠতে নীচে নেমে যাই। তখন আটটা বাজতে দশ। দেখি, মিৎসুপিসি আগেই এসে গেছে।

প্রথমে একটু স্যুপ খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিই আমরা। তারপর আসে বহু-প্রত্যাশিত চিকেন আ-লা-কিয়েভ। আঃ, কী জিনিস।

এই খাবার কিয়েভে কতটা জনপ্রিয়, তা এখান থেকে বলা যাবে না। কিয়েভ সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি। সোভিয়েট রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে ইউক্রেন, পার্বত্য অঞ্চল, কিয়েভ তার রাজধানী। খুব পুরনো শহর, গ্রিক ও রোমানদের সময়ে এর পত্তন হয়েছিল বলে শোনা যায়। জারের আমলে এখানকার মানুষ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ করেছে। মার খেয়েছে জার্মানদের হাতে প্রথম ও দ্বিতীয় দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। জাতি হিসেবে ইউক্রেনের লোকেরা একটু স্বতন্ত্র, লাল ফৌজ

ওদের বেশি ঘাঁটায়নি। ১৯৪৫-এ শহরটা অর্ধেক চুরমার হয়ে যায়। যুদ্ধের পর আবার সব নতুন করে গড়ে উঠেছে।

তবে শীত সেখানে নাকি প্রচণ্ড। বছরের অর্ধেক সময়ে বরফ পড়ে। ওই ঠান্ডায় এই সুখাদ্য আসল পথ্য। মাখন দিয়ে রান্না করা মুরগি। মুরগির বুকের নরম অংশটুকু ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে মাখন পুরে ভাজা। প্লেটের ওপর অল্প একটু সাদা ভাতের বিছানায় শোয়ানো। ছুরি দিয়ে কাটলে পুচ পুচ করে গরম গলা-মাখন বেরিয়ে প্লেট ভাসিয়ে দেয়।

খেতে খেতে আমি বলি, "তোমার কল্যাণে এই বয়েসে ভালমন্দ খাচ্ছি। আমার বউ জানতে পারলে কান্নাকাটি শুরু করে দেবে।"

"কেন?"

"ক্রিম, মাখন খাওয়া আমাব মানা। ডাক্তারের হুকুম, কেবল ফ্যাট-ফ্রি ডায়েট। বউকে বলেছে নজর বাখতে।"

এমন সময়ে ওয়েটার এসে বলল, ম্যাডামকে টেলিফোনে কেউ ডাকছে। চটপট ন্যাপকিনে মুখ মুছে উঠে গেল পিসি। একটু পরে ফিরে এসে বলল, "চল, ওঠা যাক। ঘর বদল করতে হবে।"

৬

বাত্তিরে কম্বলমুড়ি দিয়ে আরামসে ঘুমোচ্ছি, এমন সময়ে দরজায় ঠকঠক শব্দ।

কে আবাব এই অসময়ে বিরক্ত কবে? মিৎসুপিসি নয় তো? আমার মনে পড়ে যায়, এটা ৪২৭ নম্বর ঘব, পিসির ঘর আসলে, ডিনারের পর আমরা বদলাবদলি করেছি। পিসি গেছে ৩১২-এ। যাবার সময় বলে গেছে, কাউকে যেন তার সন্ধান না দিই। দুষ্টু লোক তাকে ধাওয়া কবছে। তবে ভৌমিক যদি আসে, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই যেন ৩১২-এ।

আমাব তো একটা মাত্র বাকস। টানতে টানতে তিনতলা থেকে চারতলায় তুলেছি। পিসির সেই চাকাওলা সুটকেস, বেশ ভারী, নামাতে বেগ পেতে হয়েছে। তার ওপর দু'-দুটো লাল ব্রিফকেস—একবকম দেখতে। একটার খুব ওজন, অন্যটা হালকা। পিসি বলেছিল, লিফট কি বেল-বয় ডাকার দরকার নেই। আমরা নিজেরাই পারব। নিজেরা বলতে আমি। একা আমি এই পঞ্চান্ন বছর বয়েসে ওই ভারী বাকসগুলো টানাটানি করে হাঁপিয়ে গেছি। বুড়ি যা উত্তেজিত ছিল, ওকে দিলে হয়তো হার্টফেল কবত। খাওয়াব পর এত পরিশ্রম পোষায়!

মনে পড়ে যায়, ওয়ার্ডরোব খুলে প্যান্ট টাঙাতে গিয়ে দেখেছিলাম, কতকগুলো বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট নীচের তাকে রাখা রয়েছে। আটটা। আমি সিগারেট খাই না। তবু চকচকে লাল আর সোনালি বঙের প্যাকেট দেখে খুলতে ইচ্ছে হল। ফুল ফুটে থাকতে দেখলে যেমন ছিঁড়তে ইচ্ছে করে, তেমনই আর কী।

খুলে দেখি, সিগারেট না, প্যাকেটের মধ্যে অন্য কিছু ঠাসা আছে। রাংতা দিয়ে মোড়া। বেশ শক্ত। শুঁকে দেখি, উগ্র করকরে গন্ধ। বুনো গন্ধ। কী জিনিস বুঝতে না পেরে প্যাকেটগুলো যথাস্থানে রেখে দিই। হয়তো পিসির নয়। অন্য কোনও যাত্রী ফেলে গেছে।

শুয়ে পড়েও ঘুম আসছিল না। ক্রমশ সন্দেহ হচ্ছিল, এ-জিনিস হয়তো পিসির বাকস থেকে বেরিয়েছে। যাবাব সময় নিতে ভুলে গেছে তাড়াহুড়োয়। সকাল হলেই হাউসকিপিংয়ের মেয়েরা তুলে নিয়ে যাবে। তারপর যদি একটা কেলেঙ্কারি বাধে! সাতপাঁচ ভেবে প্যাকেটগুলো আমার বাকসে ঢুকিয়ে রাখি।

আবার ঠক ঠক শব্দ হল দরজায়। বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বার করে দেখি একটা পঁচিশ।

দরজায় একটা গোল কাচ গাঁথা আছে। তার মধ্য দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। দেখলাম দুটো লোক—একটা টেকো আর অন্যটা জুলফিওলা—জুলফিওলার মাথায় টুপি, টেকো চোখ গোল করে ওকে কিছু বোঝাচ্ছে। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেই মনে হয়। তবু, সাবধানের মার নেই, দরজার ল্যাচ এঁটে দিলাম যাতে পুরো দরজা না খুলে ওদের সঙ্গে কথা বলা যায়।

ধরেই নিয়েছিলাম যে, এরা দুষ্টু লোক। এরাই পিসিকে ধাওয়া করেছে। চোখে-মুখে বিরক্তি, রাগ আর সাহস জমিয়ে দরজা খুলি।

"ইয়েস? কাকে চাই?"

টেকো লোকটা কিছু না বুঝেই বলে, "ম্যাডাম মিটার?"

"এ-ঘরে কোনও ম্যাডাম মিটার থাকে না," আমি রাগ দেখিয়ে বলি, যদিও বুঝতে পারি ওই নাম পিসির।

টাক তুলে লোকটা ঘরের নম্বর দেখল। চারশো সাতাশ। বলল, "খবর আছে, এই ঘরেই ম্যাডাম উঠেছেন। ফানি!"

"হোয়াট ইজ সো ফানি অ্যাবাউট ইট?" আমি ঝেঁঝে উঠলাম আবার, "এটা কি কোনও ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করার সময়? যাও, অন্য হোটেলে খোঁজ করো।"

জুলফিওয়ালাটা এবার কথা বলল।

"আমরা দুঃখিত আপনাকে ঘুম থেকে তুললাম। আমরা যাঁর কথা বলছি তিনি একজন ওল্ড লেডি, আমাদের সঙ্গে তাঁর বিজনেস ডিলিং আছে। এই সময়েই তিনি সাপ্লায়ারদের সঙ্গে দেখা করেন।"

"কীসের বিজনেস?"

এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর টেকো লোকটা বলল, "মেডিসিন। মেডিসিন। লাইফ সেভিং ড্রাগ। ফর এক্সপোর্ট।"

"ও কে। থ্যাঙ্ক ইউ।" বলে ওরা চলে যায় মর্মাহত হয়ে। আমি এতক্ষণ দেখিনি, ওরা সিঁড়ির দিকে চলে যাওয়ার সময় চোখে পড়ল, টেকো লোকটার হাতে ধরা আছে একটা ব্রিফকেস—টকটকে লাল ব্রিফকেস। এমনই দুটো ব্রিফকেস পিসির আছে।

ভেবেছিলাম, পিসির সঙ্গে তীর্থে আসছি। এখানে ওর গুরুদেব আছেন, তাঁর জটাজুটধারী চেহারার ছবিও দেখেছি। পিসির গুরুভাই আছে কেউ, গণেশ মহল্লায় যার বাড়ি, যেখানে ওঠার কথা ছিল, কিন্তু আমি সঙ্গে আসছি বলে পিসি হোটেলে উঠেছে। ভেবেছিলাম, পিসি বুড়োমানুষ, তার ওপরে একেবারে একা, নিঃসন্তান বিধবা, কলকাতার বাড়িতে শুয়ে-বসে দিন কাটে না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আমি কিছুদিন সঙ্গ দিলে ওর ভাল লাগবে। ও মা, এ যে দেখি একেবারে উলটো ব্যাপার! লাইফ-সেভিং ড্রাগের ফলাও ব্যবসা খুলে বসেছে। তার মধ্যে আবার পদে পদে লুকোচুরি, দুষ্টু লোকের উৎপাত। মিৎসুপিসি একজন পুরোদস্তুর অপারেটার! পঞ্চান্ন বছর বয়সে আমি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে ভাবছি, কবে মানে মানে দুর্গা দুর্গা বলে এ-জগতের পাততাড়ি গুটোব, আর সাতাত্তর বছর বয়সের এই বিধবা-বুড়ি, তিনকাল গিয়ে যার এককালে ঠেকেছে—সে কিনা লাইফ-সেভিং ড্রাগের ডানায় চড়ে সাত রাজ্যের মানুষকে ভেলকি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে!

সকালবেলা ভৌমিক এল। পরনে সেই ধুতি-পাঞ্জাবি, গায়ে জড়ানো সাদা শাল। জামাইবাবুর মতো দেখাচ্ছে। তখন ন'টা বাজে।

এসেই জিজ্ঞেস করল, "খবর সব ভাল তো?"

ইতিমধ্যে আমি ওই আটটা সিগারেটের প্যাকেট একটা খবরের কাগজের ঠোঙায় পুরে বিছানার নীচে লুকিয়ে রেখেছি। পিসির ঘরে যখন যাব, তখন নিয়ে যাব। ওকে বললাম, "একটু বসুন।"

সকালের কৃত্য সব সারা হয়ে গেছে। চান করে চুল আঁচড়াচ্ছি। প্যান্ট-শার্টের ওপর একটা হাতকাটা সোয়েটার পরলাম। আঙুলে করে একটু কোল্ড ক্রিম নাকে আর ঠোঁটে লাগাতে লাগাতে বললাম, "এখন আমি রেডি ফর দি ডে।"

মেজাজটা বেশ ফুরফুরে। বাতানুকূল পরিবেশে হালকা চকোলেটের গন্ধ।

৩১২-র দরজায় টোকা দিয়েই ঢুকে পড়লাম।

ঢুকে দেখি, বিছানার ওপর তিনখানা খোলা বাকসের সামনে মিৎসুপিসি বসে আছে। ড্রেসিং টেবিলের পাশে চেয়ারে-বসা একটা লোক, তাকে চিনি না। তার মুখটা বিশাল গোল। ঘড়ির কাঁটার মতো লম্বা-সরু পাকানো গোঁফ মুখের দু'দিকে টানা। ডান দিকের গোঁফটা যেটা আমার দিক থেকে বাঁ দিকে—একটু ছোট। ওর নির্বিকার মুখটাকে দেয়ালঘড়ি ভাবলে সময় এখন সওয়া ন'টা। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, একটা ব্রিফকেসের মধ্যে থাক-থাক সাজানো একশো টাকার নোটের বান্ডিল। একেবারে নতুন সব নোট।

"আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে," বলে পিসি ঝপ করে ব্রিফকেসের ডালা নামিয়ে দিল।

পিসির সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে। বাইরের লোকের সামনে সে-কথা বলা যাবে কি না বুঝতে পারছি না।

ঘরে ঢুকেই পিসির মুখে যে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল, বুড়ো মানুষটা বুঝি এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। মাথার চুল উসকোখুসকো, মুখে প্রসাধন নেই। গলা থেকে পা পর্যন্ত ঝোলানো একটা পশমের হাউসকোট পরা। চোখের নীচেটা ফোলা, রক্তচাপ হঠাৎ বেড়ে গেলে যা হয়। আয়নার সামনে পিসির নিত্যসঙ্গী চশমাখানা এমন অযত্নে মুড়ে রাখা আছে যে, মনে হচ্ছে, ওটা পা তুলে যোগব্যায়াম করছে।

এক মুহূর্তে পিসির মুখের ভাব বদলে যায়।

একমুখ হেসে বলে, "আয়, আয়। ভৌমিক এসো। ওই চেয়ারটায় বোসো। তুই বিছানাতেই বোস।"

আমি বলি, "ব্রেকফাস্ট খেতে নামবে না? তোমার সঙ্গে কথা ছিল।"

আমার কথার উত্তর না দিয়ে পিসি বলল, "দশরথ, এ হল দুলাল। ভাল নাম দেবব্রত সিংহ।"

নির্বিকার মুখে দশরথ বলে, "গোমেজের বদলি?"

"না, না। আমার ভাইপো। ধর্মকর্মে খুব নিষ্ঠা আছে। আমি কাশীতে আসছি শুনে বলে, আমি তোমার সঙ্গে যাব। বিশ্বনাথ দর্শন করব। তোমার আশ্রম দেখব। আমি বললাম, চল, দশরথ থাকতে তোর কোনও অসুবিধে হবে না। দশরথ চৌবে এখানকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি।"

ডাহা মিথ্যে কথা। এসব কথা আমি কোনওদিন পিসিকে বলিনি। পিসিই তো জোর করে আমায় এখানে টেনে আনল। আমি অবাক হয়ে ভাবি, কী অবলীলায় ও গল্প বানাতে পারে! ধর্মকর্মে মতি আমার কোনওদিন নেই, ছিল না। আমার বউয়ের আছে। সে ঠাকুরঘরে ঢুকে রোজ দু'বেলা পুজোআর্চা করে, আমি সে-ঘরে কোনওদিন ঢুকি না। তবে ধূপ-ধুনো, ফুল-মালার একটা মিশ্র সুগন্ধ পাই বাইরে থেকে, আরতির ঘণ্টি টিংটিং করে বাজে, তার শব্দ কানে আসে। মনটা নরম হয়, এই যা।

ঘড়ির কাঁটার মতো গোঁফওলা লোকটা জিজ্ঞেস করল আমি গোমেজের বদলি কিনা, তাতে আমার রাগ হয়েছে। কে গোমেজ? কোথায় থাকে, আমি তো কিছুই জানি না। আমি তার বদলি হতে যাব কোন দুঃখে? আমি...আমি, দেবব্রত সিংহ, পৃথিবীতে নিজের এলেমে এসেছি, কারও বদলি হয়ে আসিনি।

রাগ হওয়ার কারণে আমি বলে ফেললাম, "কাল রাত্তিরে দু'জন লোক এসেছিল। তখন দেড়টা। তোমার খোঁজ করছিল।"

"কী রকম দেখতে?"

"একজনের মাথায় টাক, একজনের লম্বা জুলপি, মাথায় টুপি।"

এই অবধি শুনে ভৌমিক, দশরথ আর পিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। মনে হল ওদের চেনা।

"তুই কী বললি?"

"বললাম, এইখানে ম্যাডাম মিটার নামে কেউ থাকে না। ওরা যেন অন্য হোটেলে খোঁজ করে। আর বললাম, রাত দেড়টা কোনও ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করার সময় নয়।"

"আঃ, ওটা আবার বলতে গেলি কেন?" এবার পিসি একটু বিরক্তি প্রকাশ করল, "দুলাল যা ছেলেমানুষ!"

ঠিক করেছি আমি এখানেই থামব না। সব বলব।

বললাম, "ওরা বলল তোমাদের সঙ্গে ওদের বিজনেস ডিলিং আছে। লাইফ-সেভিং ড্রাগের বিজনেস। এক্সপোর্ট। মাঝরাত্তিরেই নাকি..."

"হামবাগ!" চোখ দুটো কপালে তুলে চেঁচিয়ে উঠল পিসি। যাতে আমি থেমে যাই। তারপর হাতব্যাগ খুলে একটা চিকলেট বার করে চিবোতে লাগল। আর দু'জনের মুখে কথা নেই।

একটু পরে, যেন খানিকটা ভাবনাচিন্তা করার পর বুড়ি মুখ খুলল আবার।

"শুনে রাখো দশরথ, ওই খাসিয়ারা, তোমার বন্ধু ইব্রাহিম কী বলেছে, ওর সঙ্গে আমার লাইফ-সেভিং ড্রাগের বিজনেস! এক পয়সা ও পাবে না। জালি মাল, ওর দু'কেজি ওকে ফেরত দিয়ে দিয়ো।"

বলেই আবার পিসির চেহারা বদলে যায়। হাহুতাশ করতে থাকে, "আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। এই বাকসের মধ্যে ছিল, গেল কোথায়!"

ভৌমিক চেয়ার থেকে উঠে বিছানার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। খোলা বড় সুটকেসটার কোণে হাত ঢুকিয়ে খাবলাতে খাবলাতে বলে, "এই, এই, এইখানটায় আমি নিজে রেখেছিলাম মাসিমা। উড়ে তো যেতে পারে না।"

দশরথও চিন্তায় পড়েছে, তা ওর গোঁফ চোমরানো দেখে বুঝলাম। টানতে টানতে গোঁফের শলা দুটো ন'টা পনেরো থেকে ঝুলে আটটা কুড়িতে নেমে এসেছে।

"বেহাতে চলে গেলে ঝামেলা হবে!" নিজের মনেই গজগজ করতে থাকে ও। "এত দুশমন চারদিকে..."

এবার আমি হাতের ঠোঙাটা পিসির কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বললাম, "দ্যাখো, তো, এগুলো কিনা।"

ঠোঙার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেটগুলোয় হাত পড়তেই বুড়ির চোখ দুটো সোনার মেডেলের মতো চকচক করতে থাকে। ওর মনে পড়ে যায় সব।

"ওয়াড্রোবে রেখেছিলাম, তাই না? তাই তো বলি, যাবে কোথায়? উড়ে তো যেতে পারে না!"

আবার মিথ্যে কথা। বেমালুম ভুলে গিয়েছিল পিসি। জিনিসগুলো ফিরে পেতে-না-পেতে অস্বীকার করছে। ভুলো লোকেদের এই এক বদ স্বভাব! আমি মনে মনে হাসি। বলতে চাই, এইসব গোলমেলে কাণ্ডকারখানায় জড়াতে কে বলেছে তোমায়? ঝানু বদমাশরা হাব্বাতাব্বা খায়, আর তুমি এক থুত্থুরে বুড়ি কেটে বেরিয়ে যাবে, তা কি হয়।

"কী আছে এর মধ্যে?" আমি জানতে চাই। "সিগারেট যে নেই, তা আমি জানি। কী আছে?"

আমার গলার স্বর নিজের কানেই বেশ কর্কশ শোনাল। আমি পিসির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। পিসি নার্ভাস হয়ে পড়েছে, চকাস চকাস করে চিকলেট চিবোচ্ছে।

দেয়ালঘড়ির মতো চাকাপানা মুখ থেকে পটপট শব্দ বেরোল, "হাশিশ্। ক্যানাবিস ইনডিকা।"

৮

আজ দু'দিন হল আমি হোটেলে একা আছি।

নিজের মনে ঘুরছি, ফিরছি, বেড়াচ্ছি। কোনও ঝামেলা নেই। মিৎসুপিসি দরকাবি কাজে শহরেব বাইরে গেছে, সুতরাং তার সঙ্গে যাদের বিজনেস ডিলিং, তারাও বেপাত্তা। মাঝরাত্তিরে কেউ জাগায় না। কথায় কথায় পুলিশের রেইড হবার ভয় নেই। সারাজীবন স্টোর কিপারের কাজ করেছি আমি। কোম্পানির ভাঁড়ার সামলেছি। যেখানকার যা, ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখতাম, হিসেবের গরমিল হয়নি কোনওদিন। সাপ্লায়াররা কম লোভ দেখিয়েছে! সার, চালানটা সই করে দিন, আমাদের আধাআধি শেয়ার। তার মানে, মাল কী দিল না দিল, দেখব না, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকব। তার জন্য ওরা আমায় টাকা দেবে, ঘুষ দেবে। তারপর একদিন অকেজো যা কিছু, তা বাতিল করে দিলেই হবে। কে আর অত খোঁজ রাখছে। ওরা বোঝে না যে, সবচেয়ে বেশি ভয় তো নিজের কাছে নিজের, যার নাম বিবেকদংশন। তা থেকে বাঁচাবে কে?

আসলে আমি একজন সামান্য অকিঞ্চিৎকর মানুষ। কর্মজীবনে বা সংসারে বরাবর যে সৎ থাকতে চেয়েছি, কখনও কারও সঙ্গে তঞ্চকতা করিনি, তার পেছনে যাকে বলে চরিত্রের দৃঢ়তা, তা ছিল না, ছিল ঝুঁকি নেবার সাহসের অভাব। আমি ভিতু মানুষ। আইন ভাঙতে ভয় পাই, অন্যায়ের প্রতিকার করতে ভয় পাই। কর্তব্যে গাফিলতি হলে ভয় পাই। কাউকে আঘাত করতে ভয় পাই। এইসব কারণে লোকে আমায় ভালমানুষ বলে। আমার বউ বলে, তুমি অপদার্থ, লোকে কত টাকা রোজগার করছে, বিলাসিতা করছে, তুমি কিছুই পারলে না। অথচ, কিছুই যে পারিনি তা নয়, সাধ্যমতো আমার একটা মাথা গোঁজার জায়গা হয়েছে কলকাতা শহরে। খাওয়া-পরার অভাব হয়নি কোনওদিন। আমার একমাত্র সন্তান রাহুল, তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছি। চাকরির মাইনে থেকে টাকা বাঁচিয়ে সে মোটরগাড়ি কিনেছে। আর কী চাই? আর কী চাইবার ছিল?

লোকে ভোগ আর বিলাসিতার কথা বলে। পিসিও বলে, "যতদিন বেঁচে আছি; ভোগ করে যাই।" আসলে ভোগ আর কতটুকু, সবটাই তো বিলাসিতা—লোককে ঐশ্বর্য দেখানো। ওটা যে বুড়োমানুষদের অভ্যেস, তা কে না জানে!

ছোটবেলায় যখন আধখানা ডিমের ডালনা দিয়ে আমরা ভাইবোনেরা একথালা করে ভাত খেতাম, মায়ের হাতে মাখা আলুভাতে থাকলে তো কথাই নেই, তখন এক-এক সময় মনে হত, বড় হয়ে বড়লোক হয়ে রোজ পোলাও মাংস খাব, রাবড়ি খাব, রাজভোগ খাব। মা বলত, একা খাবি? বউকে দিবি না? উত্তরে আমার ছোটভাই বলত, ও বিয়েই করবে না, পাছে ভাগ দিতে হয়।

পরিণত বয়সেও সেই কৌতূহল আমার নিবৃত্ত হয়নি। বড়লোকেরা কী খায়, জানার কৌতুহল এই সেদিন অবধি ছিল। যারা ইচ্ছে করলেই যা খুশি কিনতে পারে, তারা সাধ মিটিয়ে খাবে না কেন?

বড়লোক বলতে আমি হেঁজিপেঁজি ভুঁইফোঁড় লাখপতিদের কথা বলছি না। বলছি সত্যিকারের কোটিপতি শিল্পব্যবসায়ী যারা, তাদের কথা। দু'-পাঁচ লাখ টাকা হরদম যাদের এপাশ-ওপাশ দিয়ে গলে যায় সেই রকম একজন ধনী আর ক্ষমতাবান ছিলেন আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যান মিস্টার গোয়েঙ্কা। মারোয়াড়ি হলে কী হবে, চালচলনে পুরোদস্তুর সাহেব। বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। দুই ছেলে মিলে তাঁরা এগারোটা কোম্পানি চালান, তিনি সবক'টার চেয়ারম্যান। হাল ধরে আছেন। অপছন্দের কাজ কবলে ছেলেদের বকেন সকলের সামনে।

একদিন হেডঅফিসের বেয়ারা নাবসিং এসে বলল, "বড়সাহেব আজ ছোটসাহেবকে খুব বকলেন মিটিংয়ের মাঝখানে। চা সার্ভ করতে গিয়ে শুনলাম।"

"কী ব্যাপার?" আমি জানতে চাই। বোর্ড মিটিংয়ে ঢোকবার সৌভাগ্য তো আমার জীবনে হবে না। সেই অজানা, রহস্যময় জগতের গোপন খবর জানতে চাই আমি।

ও বলল, "ছোটসাহেব খুব কাশছিল। হঠাৎ বড়সাহেব বলে উঠলেন, কতবার মানা করেছি এত সিগারেট খাস না, কানে যায় না? এমন আচমকা বললেন না কথাটা যে, সবাই চমকে উঠল। ছোটসাহেব. বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। হাজার হোক বাপ তো!"

অফিসের গল্প করছি বলে তোমরা যেন হেসো না। আমার পরিচিত বাইরের জগৎ বলতে তো ওই অফিস বই আর কিছু ছিল না। ওইখানে বসে পৃথিবীর সভ্যতার যা-কিছু জ্যান্ত সংবাদ সংগ্রহ করতাম, তাই ছিল আমার জি কে-র স্টক। একটানা একত্রিশ বছর।

একদিন সেই বড়সাহেব মানে চেয়ারম্যান গোয়েঙ্কার বাড়িতে আমার ডিনারের নেমন্তন্ন হল। অবসর নেবার মুখে। প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী কর্মী হিসেবে আমার সুনাম ছিল, সে-খবর তাঁর কানে গেছে বোধহয়। মনে মনে খুশি হয়েছি এই ভেবে যে, আমার সততার একটা স্বীকৃতি তা হলে মিলল শেষপর্যন্ত। তার চেয়েও খুশি হলাম, বড়লোকেরা কী খায়, স্বচক্ষে তাই দেখতে পাব বলে।

আসবাবের বহর, সাজসজ্জা তার আর কী বর্ণনা দেব! যাকে সাদা বাংলায় বলে, যারপরনাই। বারোজন বসার মতো খাবার টেবিল। হেড-অব-দি-টেবল-এ বসেছেন হরিপ্রসাদ গোয়েঙ্কা স্বয়ং, পরনে গাঢ় নীল রঙের সাফারি সুট, পায়ে চকচকে কালো জুতো। তাঁর ডান পাশে আমি। আমার ঘর-সংসারের খবর নিচ্ছেন। কাছাকাছি নয়, একটু দূরে, কোথাও রান্নাঘর আছে, সেখান থেকে গাওয়া ঘিয়ে রান্নার গন্ধ আসছে মৃদু মৃদু।

যথাসময়ে টেবিলে প্লেট পড়ল। ধবধবে সাদা বোন-চায়নার প্লেট আর বোল। এত মিহি আর হালকা সেই বাসন যে, জলতরঙ্গ বাজানো যায়। নানা রকমের খাবার রান্না হয়েছে। আমি মাছভক্ত বাঙালি বলে দু'-তিন রকম মাছ—চিংড়ি, ইলিশ আর চিতল। পুরি আর পোলাও। ছানার ডালনা। শেষপাতে মালপোয়া আর বাদামের বরফি।

আমি দেখি সাদা বোন-চায়নার বাটিতে চাল-ধোয়া জলের মতো মটরশুঁটির সুপ এল গৃহস্বামীর জন্যে। চামচে তুলে তাই খেলেন গল্প করতে করতে। তারপর একটা শুকনো রুটি আর একগাদা শিম, বরবটি, পটল, কাঁচকলা সেদ্ধ। পোলাও না, কালিয়া না, রসমালাই না, রাবড়ি না, মটন না, চিকেন না, হ্যাম না, বেকন না, চিজ আইসক্রিম না, ঘি না, মাখন না। তাঁর কোলের ওপর ধোপদুরস্ত ন্যাপকিন, তাই দিয়ে মাঝে মাঝে মুখ মুছছেন। আর ধীরে ধীরে কথা বলছেন। জলের গ্লাসের পাশে একটা ছোট প্লেটে চারটে লাল, সবুজ, হলুদ, বাদামি ওষুধের ক্যাপসুল। এত সুন্দর ক্যাপসুলগুলো দেখতে যে, আমার মনে

হল, ওগুলো দিয়ে গয়না গড়ানো যায়।

আগেও ছিল না, কোটিপতি শিল্পপতির ডিনারের ছিরি দেখে বড়লোক হবার বাসনা আমার চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে। টাকার পেছনে ছুটে কী হয়?

এই প্রশ্ন মিংসুপিসিকে করাতে সে বলেছিল, "হাঁদাগঙ্গারাম, তুই কী বুঝবি! টাকার টান ভগবানের টানের চেয়েও বেশি।"

৯

হোটেল থেকে বোঝা যায় না, সাইকল-রিকশা চেপে চওক, গোধূলিয়া, দশাশ্বমেধ ঘাটের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেও বোঝা যায় না, এই শহরটা এক অদ্ভুত জায়গা। তিনশো বছরের কলকাতাকে নিয়ে আমরা অহংকার করি অথচ কাশীর বয়স দু'হাজার সাতশো বছর। সপ্তম খ্রিস্টাব্দে চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারত ভ্রমণ করতে এসে দীর্ঘদিন কাশীতে বাস করেছিলেন। তিনি লিখে গেছেন, এখানে দলে দলে হিন্দুরা শিবের পুজো করতে আসে, আবার পাশাপাশি সারনাথে দেড় হাজার ভিক্ষু মিলে বৌদ্ধধর্মের চর্চা করছে। এগারো শতকে আল বেরুনি কাশী ভ্রমণ করে লিখেছেন, শহরময় হিন্দু সাধুরা লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় দিনের-পর-দিন, তারপর এখানেই থেকে যায়।

নৌকোয় চড়ে কাশীর গঙ্গায় বিকেলবেলা বেড়ালে, একটার-পর-একটা গঙ্গার ঘাট আর মানুষের চলাফেরা দেখলে ওই পুরনো শহরটার সোঁদা গন্ধ নাকে আসে। একটা-দুটো নয়, চুয়াত্তরটা ঘাট—বরুণা থেকে অসি, অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো যেন, থাক-থাক সিঁড়ি, পাথরের স্তম্ভ, শিবমন্দিরের চূড়া, ত্রিশূল, নিঃসংশয় নারী-পুরুষ যে-যার মতো বিচরণ করছে, স্নান করছে, কীর্তন গাইছে, কীর্তন শুনছে—নৌকো থেকে এই দৃশ্য দেখলে মনে হয়, মানুষের তৈরি কোনও প্রশাসন না, স্বয়ং মহাদেব এখানে ত্রিশূল হাতে এইসব নিয়ন্ত্রণ করছেন। ভ্রূক্ষেপ না করে এইখানেই সসম্মানে বাঁচা যায়। যতদিন কোল দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাবে, ততদিন এখানে দুর্ভিক্ষ হবে না। ভূমিকম্প হবে না।

আমার সঙ্গী শশাঙ্কবাবু আবেগশূন্য কণ্ঠে বললেন, "ভক্তিও একরকম নেশা। যুক্তি, বুদ্ধি যাতে আচ্ছন্ন হয়, তাকে নেশা ছাড়া আর কী বলব?"

আমরা নৌকোটি শেয়ার করেছিলাম। সবগুলো ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে কাশীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি ঘুরব শুনে নৌকোওলা চল্লিশ টাকা চাইল। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম, সিল্কের পাঞ্জাবির ওপর জহরকোট পরা এক ফরসামতো ভদ্রলোক সিঁড়ির ওপর বসে আছেন আর হাত মুঠো করে ফুক ফুক সিগারেট টানছেন। মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। হাওয়া লেগে একটু একটু উড়ছে। সন্দেহ হল, বাঙালি হলেও হতে পারেন। চল্লিশটা টাকা একা কেন গুনাগার দিই, দেখি না, ওঁকে সঙ্গে টানা যায় কিনা। আমি ভাবলাম। ভদ্রলোক এককথায় রাজি হয়ে গেলেন।

শশাঙ্ক ধরমসি ওঁর নাম। বোধহয় গুজরাতি। বহুদিন হল কাশীতে আছেন, বাঙালি হয়ে গেছেন।

আমাদের কাছাকাছি আরও অনেকে নৌকোয় চড়ে বেড়াচ্ছে। বেশিরভাগ যাত্রী সপরিবার। বউ-ছেলেপুলে, আর হয়তো একটি-দুটি বুড়ো-বুড়ি। তাদের কথাবার্তার কলকল শব্দ জলের ওপর দিয়ে ভেসে কানে আসছে। আমাদের মতো ডিঙিনৌকো ছাড়া বড় বড় বজরাও ভাসতে দেখলাম। নৌকোর ওপর একতলা ঘর। ঘরের মাথায় রেলিং-ঘেরা ছাদ। ছাদের ওপর গুলতানি করছে যাত্রীরা। বিকেল হতে-না-হতে রোদ্দুর সরে যায় শহরের দিকে। তাই ঘাটগুলো ছায়াঢাকা। ঠান্ডা পড়ার আগে এই সময়টায় সবচেয়ে বেশি ভিড়।

একটা বজরার ওপর জনাকয়েক মোটাসোটা লোককে দেখলাম, খুব ব্যস্ত। নিচু থেকে ওদের ফতুয়া-পরা স্বাস্থ্যবান শরীর আর টিকিওলা ন্যাড়া মাথাগুলো দেখা যাচ্ছিল।

"কী করছে ওরা?" আমি জানতে চাই।

শশাঙ্কবাবু বললেন, "ভাং পিষছে। ভাঙের শরবত খাবে সন্ধেবেলা, দুধ খাবে। ফার্স্টক্লাস নেশা হয় ভাংয়ে।"

মণিকর্ণিকা ঘাটে মড়া পুড়ছিল। কাশীতে যারা মরতে আসে, মণিকর্ণিকা ঘাটে তাদের সৎকার হলে, তাদের আত্মা সোজা স্বর্গে চলে যায়। তাদের আর জন্ম হয় না। শ্মশানের ধারে-কাছে দেখলাম, কাঠের

গুঁড়ি জ্বালিয়ে সাধুরা 'হরহর মহাদেব'-এর গুণগান গাইছে। আর ছিলিম টানছে। এবার আর জিজ্ঞেস করতে হল না, আমি নিজেই বুঝলাম, ওরা গাঁজা খাচ্ছে।

শশাঙ্কবাবু খবর দিলেন, "কাছেই গাজিপুর নামে এক ছোট শহর আছে। সেখানে আফিংয়ের কারখানা আছে বিরাট। সরকারি।"

শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল, সবই বাবা বিশ্বনাথের কৃপা। নিজে তিনি নেশাখোর। দু'হাজার সাতশো বছর ধরে এই শহরটাকেও নেশায় বুঁদ করে রেখেছেন। দূরদেশ থেকে কত লোক এখানে ছুটে আসে শোক-তাপ, জীবনের জ্বালা জুড়োতে, বাবা বিশ্বনাথের পায়ে নিজেদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। যুক্তি আর বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত মানুষ শান্তি পায় না জীবনে, কারণ মানুষজীবন বড় জটিল এক যাত্রা, বিপদসংকুল, তাই মানুষের অসহায়তা তাকে ভক্তিমার্গে ঠেলে দেয়। দশাশ্বমেধ ঘাটে দেখলাম, প্রকাণ্ড বাঁশের ছাতার নীচে দাঁড়িয়ে ভক্তপরিবৃত বৈষ্ণব মহা উল্লাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন করছেন খোল-করতাল সহকারে।

শশাঙ্ক ধরমসি আবার ঠান্ডা গলায় বললেন, "সবই ঘুমের ওষুধ, ঘুম ছাড়া মানুষ কি বাঁচতে পারে?" তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথায় থাকেন?"

"কলকাতায়। এখানে বেড়াতে এসেছি।"

"কোথায় উঠেছেন?"

আমি হোটেলের নাম বলি। বলেই ভাবি, সম্পূর্ণ অপরিচিত এই লোকটি আমায় যদি মালদার পার্টি ভেবে বসে, যা আমি নই, আর পরদেশি ভেবে বন্ধুত্ব করতে চায়। এখানকার একটা লোকাল রেফারেন্স দিয়ে রাখা ভাল।

বললাম, "আমার পিসিমার এক গুরুভাই এখানে থাকেন। তিনিই দেখাশোনা করছেন। তাঁর আশ্রমেই ওঠার কথা ছিল আমার।"

"কী নাম?"

"দশরথ চৌবে।"

"ওরে বাব্বা, সে তো নামকরা স্মাগলার। ইয়া লম্বা মোচ।" বলেই কথা ঘুরিয়ে নিলেন ভদ্রলোক। বললেন, "তবে ভাল কাজও করে লোকটা। সমাজের সেবা করে। অনেক গরিব-দুঃখীর দেখভাল করে দশরথ। যেমন রোজগার করে দু'হাতে, তেমনই খরচ করে চার হাতে। দিলদার মানুষ।"

"কীসের স্মাগলার?" আমি শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি।

আবার ন্যাকা সেজে জিজ্ঞেস করলাম, "পুলিশ? পুলিশ কিছু বলে না?"

শশাঙ্ক হাসেন যেভাবে আর সব হতাশ মানুষ হাসে। কিন্তু, আমি লক্ষ করি, তিনি এই স্মাগলিং ব্যাপারটাকে খুব একটা অন্যায় বলে মনে করছেন না।

বললেন, "চোখ বুজে থাকে। বিশাল কারবার। কোটি কোটি টাকা খেলে এই কারবারে। পুলিশ, কাস্টমস, বর্ডার সিকিউরিটি সবাই শামিল আছে। কত গরিব লোকের এমপ্লয়মেন্ট হয় এই বিজনেসে, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।"

ধরমসির কথা শুনে কিছু কিছু ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। তখনও জানি না, এইসব রূঢ় বাস্তবকথা, আলোকিত জগতের অন্তরালে সমান সক্রিয়। এই সমান্তরাল ছায়াচ্ছন্ন কর্মকাণ্ড আসলে মুদ্রার একপিঠ মাত্র। মুদ্রার অন্যপিঠের খবর আমি কিছুই জানি না।

গঙ্গার বাতাস লেগে একটু একটু শীত করছে।

কেদারঘাটের কাছে নৌকো আসতে শশাঙ্ক ধরমসি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

"আমি এইখানে নেমে যাব। এই, নাও ভিড়াও, নাও ভিড়াও য়হাঁপর।"

নামতে নামতে ভদ্রলোক বললেন, "বন্ধুভাবে আপনার সঙ্গে কথা বললাম। দশরথকে যেন বলতে যাবেন না। ওকে আমি ভয় করি।"

হোটেলে ফিরে এসে দেখি, আমার চাবির খোপে একটুকরো কাগজ রাখা আছে। রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোনও মেসেজ?"

যান্ত্রিক হাসি হেসে কাগজটা আমার হাতে দিল সে।

দয়ারাম চৌবে, দশরথের ভাতিজা অর্থাৎ ভাইপো, কাল সকালে এসে আমায় আশ্রমে নিয়ে যাবে। আমি যেন দশটার মধ্যে তৈরি থাকি।

এই রকমই কথা ছিল। দশরথ আর ভৌমিককে নিয়ে মিৎসুপিসি দিনকয়েকের জন্য বাইরে যাবে দরকারি কাজে। আমাকে আর জড়াবে না কোনও ঝামেলায়, আমি যখন এত স্পর্শকাতর।

আমি বলেছিলাম, "স্পর্শকাতর আমি নই, পিসি। যা অন্যায়, যা বেআইনি, তাতে আমার সায় নেই এই অবধি।"

পিসি বলেছিল, "আইন তো মানুষ তৈরি করে, মানুষ বদলায়। আজ যে দেশদ্রোহী কাল সে স্বাধীনতাসংগ্রামী, বিপ্লবী। ন্যায়-অন্যায় বোধ বিবেক থেকে আসে। দুটো এক জিনিস না।"

"তোমরা এমন একটা জিনিস নিয়ে ব্যবসা করছ, যা মানুষের সর্বনাশ করে। তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।"

আমার ভাল লাগল না, আমি উঠে চলে গেলাম।

আমি সকাল সকাল চানটান সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। নস্যি রঙের একটা গরম পাঞ্জাবি আছে আমার, সেটা বার করলাম। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, ঘাড়ে একখানা কাশ্মীরি সাদা শাল চড়িয়ে নিলাম। আয়নার সামনে নিজের চেহারা দেখে নিজেই আমি পুলকিত। প্রধান অতিথির মতো দেখাচ্ছে। নীচে গিয়ে বসা যাক, আমি ভাবলাম। ওখানে সোফাগুলোর চরিত্রে একটা 'আসুন, বসুন' ভাব আছে।

নীচের তলায় লাউঞ্জে বসে আছি। 'আজ' নামে একটা হিন্দি দৈনিক বেরোয় বেনারস থেকে, সেটার পাতা ওলটাচ্ছি। অল্পস্বল্প হিন্দি পড়তে পারি, সেই বিদ্যের জোরে চেষ্টা করছি, কলকাতার খবর খুঁজে বার করতে। না, একটাও নেই। তা হলে, কলকাতায় কি কিছু ঘটছে না? সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি দিল্লিতে আর উত্তরপ্রদেশে ঘটছে আজকাল? প্রথমে অবাক হই, তারপর বুঝতে পারি যে ঘটনার মতো ঘটনা ন'মাসে-ছ'মাসে এক-আধটা ঘটে। বাকি সব সংবাদ না, বিসংবাদ—যে-যার কাগজে মানুষের মন ভোলাবার জন্যে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছাপায়। কলকাতায় কী ঘটছে, কাশীর লোক তা নিয়ে চিন্তিত নয়, তাই সে-খবর 'আজ' পত্রিকায় ছাপা হয় না। ওদের কাছে বেরিলি কি এলাহাবাদ কি গোরখপুরের খবর অনেক বেশি জরুরি। আর দিল্লির খবর। সেটা যে রাজধানী।

তাকিয়ে দেখি, একটা টাঙ্গা ঢুকছে হোটেলের গেট দিয়ে।

সিঁড়ির কাছটায় এসে দাঁড়াতেই একজন যুবক লাফিয়ে টাঙ্গা থেকে নামল। চুড়িদার-পাজামা পরা, গায়ে গলাবন্ধ গরম কোট, মাথায় জরির কাজ-করা গোল টুপি। বেশ অভিজাত চেহারা।

সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে তাকে উঠে আসতে দেখলাম। পায়ে শুঁড়-তোলা নাগরা জুতো।

রিসেপশনের দিকে এগোচ্ছে দেখে, কী মনে হল, আমি নিজেই লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়াই।

"দয়ারাম চৌবে?"

"জি হুজৌর। আপ, দুলালবাবু?"

আবার দুলালবাবু! আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "ওই নামে ম্যাডাম আমায় ডাকেন। আমার ভাল নাম, দেবব্রত সিনহা।"

"নমস্তে সিনাসাব। গাড়ি আ গিয়া।"

"চলিয়ে। আই অ্যাম রেডি।"

আমরা দু'জনে টাঙ্গার পেছন দিকটায় উঠি। টাঙ্গাওলা নড়েচড়ে বসে গাড়িটার ব্যালান্স ঠিক করে।

জিজ্ঞেস করি, "আশ্রম কতদূর?"

দয়ারাম বলল, "লোহতা। ঘণ্টাভর কা মামলা।"

কাশী শহরের বাইরের বেরোলেই উত্তর প্রদেশকে শনাক্ত করা যায়। রাস্তার দু'পাশে নিচু একতলা-দোতলা বাড়ি সব, খাপরার চাল। ছোট ছোট কাঠের জানলা। বাইরের দেয়ালে তরোয়াল-হাতে রাজপুতের ছবি। মানুষপ্রমাণ মাপের ছবি, মাথায় পাগড়ি, পায়ে নাগরা। কোথাও ঘোড়সওয়ার। গ্রীষ্মকালে এখানে প্রচণ্ড গরম, শুকনো 'লু' বয় মধ্যরাত্রি অবধি, আবার শীতকালে খুব শীত। তাই বাতাস চলাচলের পথগুলো ছোট। দোতলার চেয়ে একতলায় বেশি আবাম। উঠোনে দড়ির খাটিয়া। চাষের জমি ভরে উঠেছে ফুলকপি, বাঁধাকপি আর মুলো গাছে। আর বেগুন। কী মস্ত তাদের চেহারা। এইসব দেখতে দেখতে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই।

পাঁচিল-ঘেরা আশ্রমের চৌহদ্দি। দয়ারাম বলল, "যুদ্ধের সময় এখানে মিলিটারি ব্যারাক ছিল।"

গেরুয়া রঙের লোহার গেট দিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। একজন সিপাহি ঠেলে গেটের পাল্লা খুলে দিল। ভেতরে দরোয়ানের ঘর। ঘরের বাইরে একটা টেলিফোন।

"টেলিফোন অবধি আছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

দয়াবাম বলে, "আপিস তো অনেক ভেতরে। কেউ এলে দবোয়ান টেলিফোনে জানিয়ে দেয়। হামেশা কত রকম লোক আসে আশ্রম দেখতে।"

শুধু খবর দেওয়াব জন্যে নয়, আমার মনে হল, এটা নিরাপত্তাবও ব্যবস্থা।

একটু গিয়েই বাগান-ঘেরা একটা মন্দিব দেখে নামলাম। দয়ারাম মন্দিরেব মধ্যে নিয়ে গেল আমায়। রাম-সীতার মন্দির। শ্বেতপাথরের দুটি দাঁড়ানো মূর্তি। মাথায় রাজমুকুট, গায়ে অলংকার।

ভেতবের লাল সুবকি দেওয়া মসৃণ পথ দিয়ে আমরা হাঁটতে থাকি। আশ্রমের নিজস্ব টাঙ্গাটা একটা গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। টাঙ্গাওলা ঘোড়াটাকে জোয়ালমুক্ত করে দিলে সে ঘাস খেতে থাকে।

দূর থেকে দেখতে পাই, বড় বড় আম-জাম-তেঁতুল গাছের আড়ালে এক-একটা বাড়ি। কোনওটা পাকা, কোনওটা টালি-ছাওয়া। কোনওটার মাটির দেয়াল। বেশ পরিচ্ছন্ন আশ্রমের আবহাওয়াটি। একটু পবে আমরা লাল সিমেন্ট-বাঁধানো একটা চাতালের ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম।

অমনি কোথা থেকে একদল মেয়ে-পুরুষ অদ্ভুত বাজনা বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে এল আমাদের সামনে। তারপর ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল।

বাজনার সুরটা কী করে বোঝাই। মনে করাব চেষ্টা করছি। ঝমঝম ঝমঝম গোছের একঘেয়ে সুর। কিন্তু ছন্দ আছে। কথা বসালে প্রায় এই রকম দাঁড়ায়:

ঝিনতাল ঝিনতাল ঝিনতাল ঝিনতাল
ডুমুডুমু ডুমুডুমু
ডুমুডুমু ডুমুডুমু
ঝিনতাল ঝিনতাল
তাণ্ডব গেছে লেগে গাণ্ডীব ধরবে কে
ছুটে আয় রুমুঝুমু
ডুমুডুমু ডুমুডুমু
ঝিনতাল ঝিনতাল ॥
ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত মেলে রাখি দিনরাত
কোথা আছ দয়াময়
খাও চুমু খাও চুমু
ডুমুডুমু ডুমুডুমু
ঝিনতাল ঝিনতাল ॥

"কুষ্ঠরোগীদের জাতীয় সংগীত," দয়ারাম বলল।

আমি লক্ষ করি, যারা নাচছে, বাজনা বাজাচ্ছে, তাদের অনেকেরই হাত-পায়ের আঙুল দেখতে

পাওয়া যাচ্ছে না। নীল রঙের ঢোলা জামা আর ঢোলা পাজামা পরে আছে সবাই, গায়ে সাদা সোয়েটার। ইউনিফর্মটা সুন্দর। কিন্তু বেচারা মানুষগুলো প্রতিবন্ধী।

"এখন এদের আর রোগ নেই, আমরা চিকিৎসা করে সারিয়ে দিয়েছি।" দয়ারাম বলল, "এরা সবাই নেগেটিভ।"

চুপ করে আমি ওদের বাজনা শুনতে থাকি। মনে পড়ে, পুরীতে, ভুবনেশ্বরে, ওয়ালটেয়ারে আমি যখনই গেছি, মন্দির প্রাঙ্গণে দেখেছি কুষ্ঠরোগীরা সার বেঁধে বসে ভিক্ষে করছে। সব তীর্থস্থানেই তারা থাকে। নানা জায়গা থেকে আসে ওরা। জানে, তীর্থক্ষেত্রে মানুষের মন উদার হয়ে যায়, সকলেই কিছু-না-কিছু দান করে দেবদর্শন করতে গিয়ে। তাতে ওদের পেট চলে যায় কোনও রকমে। কুষ্ঠরোগ সেরে গিয়ে মানুষ যে আবার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারে আমার ধারণা ছিল না। আমি কেবল রোগীই দেখেছি—হাতে-পায়ে ঘা, ব্যান্ডেজ বাঁধা।

মনে পড়ে, কলকাতায় আমি কুষ্ঠরোগীদের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করতে দেখেছি। ওরাও একরকম বাজনা বাজায়। সভ্য সমাজকে ওরা কী চোখে দেখে, ভাবতে চেষ্টা করি। ওরা নিশ্চয় মেনে নিয়েছে যে, জাতি, ধর্ম, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে পৃথিবীর মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত—এক, যারা কখনও কুষ্ঠরোগে ভুগেছে, আর দুই, যারা কুষ্ঠমুক্ত, অবিকৃত সুন্দর।

"এদের কাজে লাগাই আমরা," দয়ারাম বলল, "যে-যা পারে, সে তাই করে। কত রকমের কাজ আছে দুনিয়ায়। চলুন আপনাকে দেখাব।"

আপনারা একা আর কতটুকু পারবেন, বলতে গিয়েও কথাটা আটকে গেল গলায়। এরা একা নয়। শশাঙ্ক ধরমসি বলেছেন, এদের বিশাল কারবার। সারা পৃথিবী জুড়ে এদের রপ্তানি ব্যবসা। এরা হয়তো সমান্তরাল প্রশাসন চালাতে পারে। চালাচ্ছে।

১২

আশ্রমে ঘুরতে ঘুরতে কেশবের সঙ্গে আলাপ হল। হাতে হাত মিলিয়ে ও আমায় অভ্যর্থনা জানায়। দয়ারাম বলল, "নাস্তার সময় ফির মিলেঙ্গে।"

কেশব মধ্যপ্রদেশের লোক। অন্ধ। বছর চল্লিশ বয়েস হবে। খুব মার্জিত চেহারা। সাদা খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি, তার ওপর ধূসর রঙের জহরকোট পরায় ওকে স্বদেশি আমলের দেশসেবকের মতো দেখাচ্ছিল। ও চোখে দেখতে না পেলেও এই আশ্রমের শিল্প বিভাগটি দেখাশোনা করে। কোথাও সুতো কাটা হচ্ছে, কোথাও তাঁত বোনা হচ্ছে, কোথাও সার সার মেয়ে-পুরুষ কুলো কোলে করে বসে বিড়ি বাঁধছে। একটা বিরাট ঘরে বালতি মাপের গোটা কুড়ি হামানদিস্তা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কর্মীরা হলুদ, লঙ্কা, শুকনো আদা, রসুন গুঁড়ো করছে। মসলার উগ্র গন্ধে সেখানে টেকা দায়।

সত্যি, যাকে বলে কর্মকাণ্ড! তার চেয়ে বড় কথা, যারা এখানে কাজ করে, তারা সবাই অন্ধা-লুলা-গুঙ্গা-বহিরা। অর্থাৎ অন্ধ, খোঁড়া, বোবা, কালা মানুষ। কেশব বলে "পাগলও আছে, কিন্তু এখানে থাকতে থাকতে অনেকের মাথার অসুখ সেরে যায়।"

"বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল কাজ, আপনি মানেন?" কেশব আমাকে জিজ্ঞেস করে একসময়।

"মানে শারীরিক পরিশ্রম বোঝাচ্ছ, না মনকে ব্যাপৃত রাখা?"

"দুই-ই।"

"অনেকে শুধু মাথার কাজ করে।"

"তারা অন্য সময় ব্যায়াম করে। যেমন আমি রোজ দুশো করে ডন-বৈঠক লাগাই। শরীর তো একটা যন্ত্র, তাই না? বলুন, ভুল বলেছি? চালু না রাখলে জং ধরে যায়।"

আমরা হাঁটতে থাকি। একটা ছড়ি ডাইনে-বাঁয়ে নাড়াতে নাড়াতে অন্ধ কেশব আগে আগে যায়।

একটু দূরে দেবদারু গাছের নীচে একটা ফতুয়া-পরা লোক দুরমুশ পিটিয়ে মাটি সমান করছিল। ধুপ ধুপ করে শব্দ আসছিল দুরমুশের। অন্ধ কেশব, টিয়াপাখি যেভাবে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শব্দ সন্ধানের চেষ্টা করে, সেইভাবে তার তেল-চুকচুকে মাথাটা এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে থামল। তারপর

ডাকল, "সন্‌কা..."

"সরকার—।" ওপাশ থেকে উত্তর আসে।

হিন্দিতে বলল, "এখনও শেষ হল না তোর কাজ? আর কতদিন লাগাবি?"

সন্‌কা, যার মানে পাগলা, আশ্বাস দেয়, আজই শেষ হয়ে যাবে। তারপর দাঁত বার করে হাসে।

কেশব বলে, "আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, না?"

আমি অবাক হয়ে ওর দুটো বন্ধ চোখের দিকে তাকাই। মনে হয়, যেন সেলাই-কবা চামড়ার মধ্যে জ্যান্ত দুটো চোখ আছে ওর। ও দেখতে পায়।

কেশব বলে, "ও পাগল ছিল। একেবারে বদ্ধ পাগল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত সারাদিন। লোকে ঢিল ছুড়ত ওকে দেখলে। দশরথজি ওকে আশ্রমে তুলে নিয়ে আসেন। একটু খামখেয়ালি। ভালবাসা পেলে গলে যায়। মানুষ তো ভালবাসারই কাঙাল, তাই না?"

আমি জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা কেশব, তোমাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব?"

"জানি কী বলবেন। বলুন।"

আমবা যেখান দিযে যাচ্ছিলাম, তাব পাশে মোষের খাটাল। চারদিকে নিচু পাঁচিল-ঘেরা। মাথার ওপব টিনের ছাউনি।

"চোখে কিচ্ছু দেখতে পাও না, তবে এত দায়িত্বের কাজ কী করে সামলাও?"

"আমি সব দেখতে পাই।" কেশব বলল, "যাদের চোখ আছে, তারা আধা অন্ধা, আমি দেখেছি। চোখ থাকলে নাক, কান, জিভ, স্পর্শ, মাথার মধ্যেকার স্নায়ুকেন্দ্র সব ভোঁতা হয়ে যায়। মানুষ ভাবে সব তো দেখছি, আর জানবার কী আছে?"

"তুমি পডাশোনা কিছু করতে পেরেছ?"

"তুলসীদাসের সমস্ত রামায়ণ আমার মুখস্থ। ওর মধ্যে দুনিয়ার সব হালচাল ব্যাখ্যা করা আছে।" কেশব হাসতে হাসতে বলে, "আমাকে তো অক্ষর শিখে বই পড়তে হয় না।"

কেশবেব সামনে পৃথিবী একটা শব্দ-গন্ধময় অন্ধকার জায়গা। চোখ ছাড়া আর সব ইন্দ্রিয় ওর অত্যন্ত প্রখর। আমি বুঝতে চেষ্টা কবি। ওব কল্পনাশক্তি কোথাও ঘা খায় না। একটা ছোট ছড়ি ডাইনে-বাঁয়ে নাড়াতে নাড়াতে ও চলেছে, কিন্তু ছড়িটার ওপর ও নির্ভর করছে না। আশ্রমের অলিগলি ওর চেনা। শুধু পরিচিত চিহ্নগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে সাবধান হবার জন্যে, আরশোলা যেভাবে শুঁড় দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোয় খাদ্যসন্ধানে। আসলে রান্নাঘরের নাড়িনক্ষত্র তার শুঁড়ের ডগায়।

খাটালের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কেশব একটু থামল। গোপাল নামে একটা লোককে ডেকে খুব বকল, "সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে, এখনও মোষেদের চান করানো হয়নি কেন?"

আমি বলি, "কেশব, ওই গোপাল লোকটি খুবই গোবেচারা, তাই দোষ স্বীকার করল। ও যদি বলত, চান করানো হয়ে গেছে, তুমি ধরতে কী করে?"

ও আবার হাসে, "বললেই হল? এতগুলো মোষ চান করার পর বাতাসে জলের গন্ধ থাকবে না? ভঁইসির ভিজে গায়ের মিঠে গন্ধ থাকবে না। শীতগ্রীষ্ম বারো মাস এই জানোয়ার দুপুরে গা ভেজাতে চায়, গা ভিজলে তৃপ্তিতে গরগর করে। আমি দূর থেকেও শুনতে পাই।

"আশ্রমে কেউ আমাকে ঠকাতে পারবে না," কেশব গর্ব করে বলল, "আশ্রমের বাইরে গেলেই মুশকিল হয়ে যায়। আগে যখন জেলে যেতাম, ওঃ, সে এক আনজানা দুনিয়া।"

"জেলে যেতে?"

"হ্যাঁ। তখন হরদম রেইড হত, পুলিশের হামলা হত।"

"কেন?"

"আশ্রমের তৈরি প্রোডাক্টের প্যাকেটে যদি অন্য কিছু পাওয়া যায়, তা হলে ওরা কী করে চুপ করে থাকে, বলুন? ওদের ডিউটি ওরা করেছে। আমি সারেন্ডার করেছি, ফাইন দিয়েছি। জেল খেটেছি। আশ্রমের ক্ষতি হতে দিইনি।"

এতক্ষণ আশ্রমের কর্মকাণ্ড দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, দুস্থ, নিপীড়িত মানুষদের নিয়ে, তাদের একত্র করে, এই যে কর্মযজ্ঞ, এর তুলনা বোধহয় একমাত্র মাদার টেরিজা। সমাজের সেবা তো বটেই, এ এক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধর্মাচরণ, তাতে সন্দেহ নেই। এই ধর্মাচরণের আদর্শ রাম,

অযোধ্যার রাজা রাম, যার মন্দির আশ্রমে ঢুকতেই দেখে এসেছি।

এখন বোঝা যাচ্ছে, এইসব জনহিতকর কাজকর্মের পেছনে লুকিয়েচুরিয়ে যা চলে, তা এক ধরনের গোপন ব্যবসা। এক্সপোর্ট। এই আশ্রম দশরথ চৌবের এক ঘাঁটি। নৌকোয় বসে শশাঙ্ক ধরমসি মিথ্যে কথা বলেননি।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অন্ধ কেশব অস্বস্তি বোধ করছিল। একসময় ও বলেই ফেলল, "ধর্মাচরণের মধ্যে একটু-আধটু অপরাধ থাকলে মন খারাপ করতে নেই। রামায়ণ পড়ে দেখবেন, প্রজারঞ্জন করতে চেয়ে রামজি দু'-একটা অন্যায় কাজও করেছিলেন। রামরাজ্য অপরাধমুক্ত ছিল না। দোষ না করলে মানুষ ভগবানকে ডাকবে কেন?"

কেশব আবার হাত ধরে আমার। বলে, "আপনাকে প্রথমবার ছুঁয়েই বুঝেছি আপনি রহিস লোক। আপনার চামড়া নরম। আপনি মেহমান, আপনার মনে কষ্ট দিতে আমি চাই না। তবু বলি, আমাদের দেশে প্রতি বছর বহু-বেটির জেবর গড়াতে কত সোনা লাগে জানেন? একশো টন। মানে, এক লাখ কেজি সোনা। প্রায় সবটাই বিদেশ থেকে আসে, যদিও সোনা আমদানি করা বারণ। হাঁ। তার বদলে আমাদের চাওঅল-গেহুঁ, তেল-চিনি, কাপড়া-জুতা বেচতে হয় না।"

আমি ভাবি, এককালে বিদেশিরা আমাদের দেশ থেকে বহু ধনরত্ন লুটেপুটে নিয়ে গেছে। তার কিছুটা ফেরত আসছে। মন্দ কী। আবার পুরো ব্যাপারটায় মন সায় দেয় না। কেশবের মতো বা মিৎসুপিসির মতো আমার বিবেক অত পরিষ্কার নয়।

কেশব বলে, "একবার আমেরিকা থেকে এক সাহেব এসেছিল আশ্রমে। সে ছিল ডাক্তার। আমাকে দেখে বললে, কেশব, তোমার চামড়ার মধ্যে জ্যান্ত চোখ আছে। আমি অপারেশন করে তোমায় ভাল করে দেব। আমি বলি, রাম, রাম, এই বেশ আছি। দুনিয়া সুন্দর, মনে মনে সুন্দরের ছবি আঁকা আছে আমার। চোখ ফুটে গেলে কী দেখব কে জানে। আমার দরকার নেই।"

আমরা নাস্তাঘরে ঢুকেই দেখি, বাবু দয়ারাম বসে আছে। ও কেশবকে ডেকে বলল, "আক্রাম্মাকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা। মিঠাই খিলাও।"

১৩

হোটেলে ডিনার খেতে খেতে ভাবছিলাম নানা কথা। মানুষ নিজের স্বার্থে সবকিছু কী জটিল করে তুলতে পারে। অথচ জীবনে মূলত কোনও জটিলতা নেই। গঙ্গা যেমন ছলছল করে বয়ে যাচ্ছে দেখলাম, উচ্ছল আবার নির্বিকার, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত হয় প্রকৃতির নিয়মে, প্রতিদিন নতুন তার উদ্যম, জীবনও সেই রকম এক যাত্রা হওয়ার কথা। কিন্তু অতৃপ্ত মানুষ, লোভী মানুষ সবকিছুর মধ্যে জট পাকিয়ে দিতে না পারলে খুশি হয় না। আশ্চর্য।

আমরা নাস্তাঘরে পুরি, আলুপোস্ত, ভাজি, অড়হরের ডাল আর উত্তম স্বাদের পেঁড়া খেয়েছি। দয়ারাম কথায় কথায় বলল, "যা খাচ্ছেন সবই আশ্রমের প্রোডাক্ট। একটাও বাইরে থেকে কেনা নয়। আক্রাম্মা সেইমাত্র ফিরেছে, না হলে ওর হাতের দহিবড়া খাওয়া যেত।"

আশ্রমের বাগানে পপিফুলেরও চাষ হয় তা হলে।

বলতে বলতে আক্রাম্মা নিজেই এসে হাজির। গড় হয়ে দয়ারামকে প্রণাম করল।

দয়ারাম জিজ্ঞেস করল, "কী রে, খুব তকলিফ দিয়েছে?"

ও বলল, "না, না। তবে এখানকার মতো আরাম তো জেলখানায় পাব না। গরমের সময় গিয়েছিলাম, শীত না ফুরোতে ছাড়া পেয়েছি। দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে গেল। জেলরসাহেব দশরথজিকে প্রণাম জানিয়েছে। মাতাজিকে ভি।"

আমি বুঝতে পারি, আজকাল কেশবের বদলে তার বউ জেল খাটছে। অন্ধ বলে হয়তো ওর অপরাধের লঘু শাস্তি হয়। সবই চলছে, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা যে মরে যায়নি, তার প্রমাণ হল আক্রাম্মা মসলার প্যাকেটে একটা গোলমেলে জিনিস ঢুকিয়ে দেওয়ার অপরাধ স্বীকার করেছে এবং তার জন্য জেল খেটে এসেছে। বেচারা অন্ধ, চোখে তো দেখতে পায় না, কী ধরতে কী ধরেছে। তবু, অপরাধ

যখন, শাস্তি ওকে পেতেই হয়। আমাদের সভ্যতার এইটেই সবচেয়ে মজার দিক। কৌটোর ভেতরে কৌটো। তার ভেতরে কৌটো। তার ভেতরেও কৌটো। সন্দেশ কোথাও নেই। ভিক্ষুক যেমন দাতাকে চিনে রাখে, তাকে ঘেন্না করে, আবার তার কাছেই হাত পাতে, আর কারও সামনে পাতে না, শাসকমহলের সঙ্গে আশ্রমের সম্পর্ক অনেকটা সেই রকম। দাতা হল সমাজের কলঙ্ক, কিন্তু ভিক্ষুক যতদিন থাকবে, দাতা সে পেয়ে যাবেই।

সমাজের শৃঙ্খলা যে ভাঙে আর সমাজের শৃঙ্খলা যাব রক্ষা করার কথা, দুইয়ের মধ্যে অলিখিত সহাবস্থানের চুক্তি কী করে সম্ভব হয় আমি ভেবে পাই না। শুনেছি, প্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যে কিছু সংখ্যক সৎলোক সব সময়েই থাকে। তারা কী করে সায় দেয় এই গোলমেলে বাণিজ্যে?

দয়ারামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ইকোয়েশনটা কেমন?"

ও বলেছিল, "আপনি রামসীতার মন্দিরে ঢুকতেই একটা মার্বেল ফলক দেখেননি?"

"না তো।"

"ওই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এই আশ্রম প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদধন্য।"

"তিনি তো সবকিছুর খবর রাখেন না।" আমি বলেছিলাম।

"রাখার কথা নয়। কিন্তু এব একটা প্রভাব কাজ করে। তা ছাড়া..."

"তা ছাড়া?"

"প্রতি বছব মুখ্যমন্ত্রী আসেন বৃক্ষরোপণ উৎসবের সময়। জনসাধারণকে এই আশ্রমের জন্য মুক্তহস্তে অর্থদান করতে বলেন তাঁব বক্তৃতায়। এখানে অর্থদান কবলে মানুষের পুণ্য হয়। দুস্থকে স্পর্শ না করে যদি দুস্থের সেবা করা যায়, কে না তা চাইবে বলুন। উপরন্তু ওই দান-করা অর্থ যদি ব্যবসাব খবচ বলে স্বীকৃত হয়। চ্যাবিটেবল ইনস্টিটিউশন হিসেবে আমরা অর্থমন্ত্রক থেকে এই সুবিধে আদায় করেছি।"

দয়ারাম বলেছিল, "শৃঙ্খলা রক্ষা কবা যাদের কর্তব্য, তাদের চাকরিও তো রাখতে হবে। তাই আশ্রম থেকে আমরা বছবে একবার-দু'বার লোক ধরিয়ে দিই। তারা জেল খেটে আসে। রেকর্ড ঠিক থাকে।"

"কেউ আপত্তি করে না?" আমি জানতে চেয়েছি, "জেলখাটা তো খুব সুখের কাজ নয়। সেখানে মারধর কবে বলে শুনেছি।"

হেসেছিল দয়ারাম। ছোট ছেলে বোকার মতো প্রশ্ন করলে বড় মানুষেরা যে রকম অস্থিরচের মতো মুখ কবে নিঃশব্দে হাসে, সেই রকম ছিল ওর হাসিটা।

বলেছিল, "সিনহাসাব, এখানকার প্রত্যেক কর্মী গুরুদেবের কাছে দীক্ষিত। গুরুদেবের মন্ত্রশিষ্য। পাপপুণ্যের বোঝা সব গুরুদেবের পায়ে রেখে এরা জীবন কাটায় নিশ্চিন্তে।"

"তুমিও?"

"হ্যাঁ। আমিও কমিটেড। তাঁর কৃপায় আমরা বেঁচে আছি। ওদের সঙ্গে আমিও রোজ ভোরে আর সন্ধেবেলায় প্রার্থনা করি। গুরুদেবের শেখানো গান গাই। তাতে মন শুদ্ধ হয়। উগ্রতা চলে যায় মন থেকে। এখন তো প্রার্থনা মন্দির বন্ধ, না হলে আপনাকে দর্শন করাতাম।"

আমি বলি, কাশীতে বাবা বিশ্বনাথ আছেন। তাঁর কাছে হাজার হাজার লোক রোজ পুজো দিতে যায়। তাঁর মন্দিরে মাথা কোটে। তোমাদের নিজস্ব রামসীতার মন্দির আছে। এর ওপর আবার একজন গুরুদেব দরকার হয়?"

"জি।" দয়ারাম বলে, "ওঁরা তো দেওতা। গুরুদেব হলেন অবতার। মনুষ্যরূপে বিরাজ করছেন দেওতার দূত। গুরুর হাত ধরে না গেলে মানুষ ভগবানের সন্ধান পায় না, এ-কথা অনেক বড় বড় লোক বলে গেছেন।"

"তিনি কি এখানে থাকেন? দেখা দেন না?"

"তাঁর কত কাজ। এক জায়গায় বসে থাকলে চলে? আমেরিকায়, জার্মানিতে, সুইডেনে ওঁর আশ্রম আছে। টোকিও শহরে বিরাট আশ্রম, সঙ্গে ধ্যান শেখাবার কলেজ। সবকিছু পেয়েও রাশিয়ার লোকের মনে শান্তি নেই, ওরা গুরুদেবকে ডাকছে জীবাত্মা আর পরমাত্মা বিষয়ে লেকচার দেবার

জন্যে। নেক্সট ইয়ার যেতে পারেন। এখন উনি হংকংয়ে আছেন। আমরা আশা করছি, হোলির সময় এখানে আসবেন। তখন একবার আসবেন বেনারসে। বাবার দর্শন হয়ে যাবে।

আমার মনে পড়েছিল, পিসির হাতব্যাগে জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসীর ছবি দেখেছি। চোখ দুটি দিয়ে যেন আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে।

১৪

ডিনার সেরে নীচে গেলাম। খানিকটা পায়চারি করলাম। লাউঞ্জে দিল্লির খবরের কাগজ পেয়ে গেলাম। ইতস্তত পাতা উলটে কলকাতার তেমন কোনও খবর পেলাম না। শহরতলিতে কোথায় একটা কারখানায় লকআউট হয়েছে। দু'হাজার লোক হঠাৎ বেকার হয়ে পড়েছে, এই নিয়ে একটা ছোট্ট খবর ভেতরের পাতায়। এককালের রাজধানী আমাদের কলকাতা এখন দুয়োরানি।

ঘরে ফিরে এসে শোবার জন্যে তোড়জোড় করছি। কলকাতার বাড়িতে একটা চিঠি লিখলাম হোটেলের ছাপা প্যাডে। জানিয়ে দিলাম, মিৎসুপিসির সঙ্গে দেশ বেড়াচ্ছি, আমার জন্যে ওরা যেন দুশ্চিন্তা না করে। যখনই পাক, চিঠি একটা দেওয়া থাকল।

হঠাৎ টেলিফোন বাজল। তুলতেই অপারেটর বলল, "ধরুন, কাঠমান্ডু থেকে আপনার ট্রাঙ্ককল আসছে।"

'আমার কাছে ট্রাঙ্ককল? কাঠমান্ডু থেকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মিস্টার সিনহা। কথা বলুন।"

অপারেটর সরে যেতেই মিৎসুপিসির অননুকরণীয় কণ্ঠস্বর কানে এল, "কে, দুলাল? কেমন আছিস?"

"ভাল আছি পিসি। তোমার খবর কী? সেই যে গাজিপুর না কোথায় যাবে বলে নিখোঁজ হলে, তারপর আর পাত্তাই নেই তোমার!"

"সব ঘুরে ঘুরে দেখেছিস?"

"দেখেছি মোটামুটি।"

"সারনাথ? ভারতমাতার মন্দির? দশাশ্বমেধ ঘাট? বাবা বিশ্বনাথ? ইউনিভার্সিটি?"

যেন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে। আমি উত্তর দিলাম না।

"বউয়ের জন্যে, বউমার জন্যে, বেনারসি শাড়ি কিনেছিস তো? নাতনির পুতুল?"

এবার আমি বিরক্ত হই।

জিজ্ঞেস করি, "এত রাত্তিরে তুমি এইসব খবর জানবার জন্যে ফোন করছ?"

"না, না। রাত্তির দশটার পর ট্রাঙ্ককলে অর্ধেক খরচ, তাই একটু প্রাণের কথা কইছি। অনেক ঘুরলাম। বম্বে, দিল্লি হয়ে এখানে। বম্বে থেকে সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে প্রায় দুশো কিলোমিটার রাস্তা, আঃ, কী মজার না! তুই যদি দেখতিস। তারপর 'ধাউ' নামের একরকম নৌকোয় চড়ে সমুদ্রে ঘোরা। শুনে আঁতকে উঠিস না। ও তোর কাশীর বজরা নয়। ওর মধ্যে পাঁচশো অশ্বশক্তির ইঞ্জিন থাকে, রেডার থাকে, স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। আরব সাগর পার হবার ক্ষমতা রাখে ওই ধাউ।"

"কবে বেনারসে ফিরছ?" আমি জানতে চাই, "একা একা এখানে আমার ভাল লাগছে না। বোর হয়ে গেলাম। কাছাকাছি মিৎসুপিসি না থাকলে জীবনে কোনও উত্তেজনা থাকে না।"

"বলছিস? পিসিকে তা হলে মনে ধরেছে এতদিনে। এতদিন ভাবতিস বুড়ি, মাটির কলসির মতো গড়াগড়ি খাবার যোগ্য..."

"মাটির কেন হবে? সোনার কলসি..."

"চুপ, চুপ, ওসব উচ্চারণ করিস না দুলাল। বিপদ আছে। কে কোথায় শুনে ফেলবে।"

আমি থতমত খেয়ে যাই।

পিসি বলে, "আমার আর বেনারসে ফেরা হবে না রে এ-যাত্রা। কালোবাবুরা বড় জ্বালাচ্ছে। ওরা তোর হোটেলেও যাবে শুনছি।"

"সর্বনাশ।" আমি বুঝি, কালোবাবু মানে পুলিশ। একা একা পুলিশের খপ্পরে পড়ব এই বয়েসে।

"কাল সকালের ফ্লাইটে তুই কাঠমান্ডু চলে আয়। কাল কী বার? শুক্রবার। আই সি ২৫২। দশটা পঁয়তাল্লিশে ছাড়ে।

"তারপর?"

"সোজা হোটেল দে-লা-অন্নপূর্ণা। 'দে-লা'টা মনে রাখতে হবে না। শুধু 'অন্নপূর্ণা' নামটা মনে রাখবি, কেমন? ত্রিভুবন এয়ারপোর্টে নেমে—বেরোবার আগে—কিছু ভারতীয় টাকা বদলে নেপালি টাকা করে নিবি। না হলে ট্যাক্সিওলা ঠকাতে পারে। ওরা নেপালি টাকা বোঝে। আর শোন, জাপানি টয়োটা গাড়ি দেখে ঘাবড়াস না যেন। এখানে সব গাড়িই টয়োটা, ট্যাক্সি টয়োটা।"

ওখানে গিয়ে পড়লে কী করতে হবে, তারই ফিরিস্তি দিচ্ছে পিসি। বুঝছে না, আমি এখান থেকে বেরোব কী করে। হাতখরচ বাবদ শ' পাঁচেক টাকা আমার সঙ্গে এনেছি। কিন্তু কয়েকদিনের হোটেলভাড়া, রাজার হালে চিকেন আ-লা-কিয়েভ, চিকেন আ-লা-কিং, ফ্রুটজুস, মুলিঘাটানি সুপ আর ক্যারামেল কাস্টার্ড পুডিং আর ব্রেকফাস্টে প্রভাতের সূর্যের মতো দুটি করে ফ্রায়েড এগ, সঙ্গে রামধনু রঙের বেকনফালি, এইসব খাওয়ার খরচ মিলিয়ে অন্তত চার হাজার টাকার বিল আমার জন্যে নীচে অপেক্ষা করছে। ওই বিল আমি কী করে মেটাব? না মেটাতে পারলে এমনিতেই পুলিশে ধরিয়ে দেবে এরা। এরপর আবাব কাঠমান্ডু যাবার প্লেনভাড়া কোথা থেকে জোটাব এসব, সেদিকে পিসির খেয়াল নেই।

"আব শোন দুলাল। তুই যে ভারতীয় তার একটা প্রমাণপত্র লাগবে। নেপালে আসতে ভারতীয়দের পাসপোর্ট লাগে না কিন্তু ওই একটা প্রমাণ লাগে। তোর তো পাসপোর্ট নেই। রেশনকার্ডও দেখাতে পাববি না। তা হলে?"

আমি বলি, "আমার পুবনো অফিসের আইডেনটিটি কার্ডটা সঙ্গে আছে বোধহয়। তাতে ছবিও সাঁটা আছে। চলবে?"

"বাব্বা, বাঁচালি। ভাবছিলাম দয়াবামকে আবার ফোন করতে হবে কিনা?"

আমায় এবার বলতেই হল যে, "দয়ারামকে অন্য কারণে দরকার। আমার সঙ্গে টাকাপয়সা নেই। কী করে যাব?"

শুনে হো হো করে হাসছে পিসি, আমি এদিক থেকে শুনতে পেলাম।

পিসি বলল, "এই ব্যাপার।" দয়ারাম এমনিতেই কাল নাকি সকাল ন'টায় আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে। আর সঙ্গে একটা ছোট শিবঠাকুরের মূর্তি দেবে, সেটা যেন সঙ্গে আনি। পিসির এক বন্ধুর জন্যে উপহার।

"আবার মূর্তি!" আমি দোনামনা করে বলেই ফেললাম।

"ওর মধ্যে কোনও ওষুধবিষুধ নেই তো?"

"শিব নিজে নীলকণ্ঠ। মানুষের সাধ্য কী, তাঁর ভেতরে আবার ওষুধ পোরে! মনেপ্রাণে শিবের ধ্যান করলে বিনা ওষুধে যে-কোনও রোগ সেরে যায়, তুই জানিস? আমরা পাপী, তাই এসব বিশ্বাস করি না।

শেষকালে একটা কথা বলে পিসি রীতিমতো চমকে দিল আমায়।

বলল, "অন্নপূর্ণা হোটেলে মাতা সর্বংসহার খোঁজ করবি দুলাল। দুশো সাতাত্তর নম্বর ঘর। আমি এখানে ওই নামে পরিচিত। ঠিক আছে? কাল তা হলে তোর সঙ্গে দেখা হচ্ছে লাঞ্চের আগেই। আমরা আর্নিকো রুমে চাইনিজ খাবার খাব। হাক্কা।"

১৫

মনে মনে আমি কাঠমান্ডু যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বেরোইনি। শীতের পোশাক যা দু'-একটা সঙ্গে আছে, ভাবছিলাম, তাতে কুলোবে কিনা। কাঠমান্ডু তো পাহাড়ে জায়গা। খুব শীত হতে পারে। আজকাল উইন্ড চিটার নামে একরকম পাতলা জামা বেরিয়েছে। অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা খুব পরে। তাতে নাকি বেশ শীত আটকায়। তেমন বুঝলে ওই জিনিস একটা কিনতে হবে। মনে মনে এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

ঘরের কাছে হলে হবে কী, নেপাল তো আসলে বিদেশ। প্লেনে কলকাতা থেকে দিল্লি দু'ঘণ্টার পথ,

কাঠমান্ডু এক ঘণ্টার। কলকাতা থেকেও এক ঘণ্টা, বেনারস থেকেও এক ঘণ্টা। ওই এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা তিরিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে হিমালয় ডিঙিয়ে গেলাম। তখন জানলাম, ত্রিভুবন এয়ারপোর্ট পর্বতশৃঙ্গে না, উপত্যকায় অবস্থিত। কাঠমান্ডু শহরও সমতল জমির ওপর। চারদিকে অবশ্য পাহাড়শ্রেণী আছে।

এবার মনে পড়ল আমার, পাহাড়চূড়ায় তো বিমানবন্দর থাকার কথা নয়। বিশেষ করে এখানকার যা সব পেল্লাই মাপের প্লেন, থামাতে গেলে অনেকখানি রানওয়ে লাগে। দার্জিলিং গেছি, প্লেনে বাগডোগরা পর্যন্ত, তারপর গাড়ি বা টয়ট্রেন। শিলং গেছি গুয়াহাটি হয়ে। শ্রীনগর—সে-ও উপত্যকায়, তবে কাঠমান্ডুর চেয়ে শীত বেশি সেখানে।

ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আমার পরিচয়পত্র—ওই পুরনো অফিসের ছবি দেওয়া আইডেনটিটি কার্ডখানা পকেটেই ছিল। কেউ দেখতে চাইল না। ত্রিভুবন এয়ারপোর্টে শুল্ক বিভাগের অফিসাররা দু'জন মেমসাহেবকে নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, আমাকে একটা বাকসও খুলতে হল না।

বেরিয়ে দেখি, আবার কে? আমাদের দশরথ চৌবে। আমাকে রিসিভ করতে এসেছে। মুখে উৎসাহ ঝলকাচ্ছে ওর, তার ফলে গোঁফজোড়া ঘড়ির কাঁটায় দশটা দশ হয়ে রয়েছে।

আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল দশরথ। জিজ্ঞেস করল, "পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো দুলালবাবু?"

কোনও জবাব না দিয়ে আমি বলি, "হোটেল অন্নপূর্ণা, ওখানেই তো ম্যাডাম, মানে মাতা-সর্বংসহা আছে। তাই না? একটা ট্যাক্সি ধরা যাক।"

"গাড়ি আছে।" বলে ও আমার সুটকেসটা তুলে নেয়। বলে, "মহাদেবের মূর্তিটা কি এর মধ্যে?"

"না। ওটা আমার হাতব্যাগে।"

"দিন তো।"

বার করে দিতেই ও মূর্তিটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিল। আমি ভাবলাম, কোথায় ঠোক্কর লেগে ভেঙেটেঙে যাবে, তাই নিরাপদ জায়গায় রাখল দশরথ। একটু পরে লাঞ্চ টেবিলে যা দেখলাম, তাতে বুঝলাম, আমার ধারণা ঠিক ছিল না।

আর্নিকো রুমে কোণের দিকে একটা টেবিল দখল করলাম আমরা। চিনা কায়দায় সাজানো। টকটকে লাল পরদা, জিভ-বার-করা ড্রাগন, চিনা লণ্ঠনের ঝুমকো—সব যথারীতি আছে। নেপালি ওয়েটাররা একটু যেন ফরসা, কুতকুতে মিষ্টি চোখের ভঙ্গি, আর্নিকো রুমে মানানসই। ঘর থেকে স্নান সেরে প্যান্ট, শার্ট আর সোয়েটার পরে নীচে নেমেছি। সেখানে দশরথ অপেক্ষাই করছিল লাউঞ্জে। আমরা দু'জন গিয়ে আগেভাগে জায়গা দখল করে বসেছি। তখনও দেড়টা বাজেনি।

ঠিক দেড়টায় দেখি, মিৎসুপিসি, থুড়ি, মাতা-সর্বংসহা, একজন সুটপরা বিদেশি ভদ্রলোকের সঙ্গে ঢুকছে। লোকটি রোগা, বেঁটে, চোখে চশমা। বয়স তিরিশ থেকে পঞ্চাশ, যা-কিছু হতে পারে। সর্বংসহা পরেছে গেরুয়া রঙের সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে গেরুয়া রঙেরই পুরোহাতা শার্ট। তার ওপর সাদা পশমের চাদর। মাথায় গেরুয়া রঙের চওড়া রিবন ফাঁস দিয়ে বাঁধা। এই রকম পোশাক বিদেশি ফ্যাশন শো'র ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়। কাছে আসতে দেখলাম সর্বংসহার গলায় বেশ লম্বা একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলছে।

আলাপ হল। ভদ্রলোকের নাম লাও ঝিয়াও। আমরা পরস্পরকে অভিবাদন করলাম ভারতীয় কায়দায়।

কথায় কথায় জানা গেল, লাও ঝিয়াও ম্যানিলায় থাকেন। নেপালের সঙ্গে তাঁর বাণিজ্যিক সম্পর্ক অনেকদিনের। আসলে তিনি মহাচিনের লোক। উচ্চশিক্ষিত এবং শৌখিন প্রকৃতির। মাতৃভূমিতে আজকাল, এই সাম্যবাদী আমলে, কায়িক শ্রমের কদর এত বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বুদ্ধির কদর এত কমেছে যে, অভিজাত স্বভাবের মানুষ আর সেখানে বাস করতে পারছে না। চলে যাচ্ছে দেশ ছেড়ে। লাও ঝিয়াওয়ের এই অভিমতে সায় দেওয়া যায় না। তবু চুপ করে থাকি সৌজন্যের কারণে।

আমরা তিনজন কাঁটাচামচ চালাচ্ছি। লাও ঝিয়াও অবলীলায় কাঠি দিয়ে চাও-চাও আর ফু-ইয়াং তুলে খেলেন খুব দ্রুত।

খেতে খেতে নানা কথা হচ্ছে। বহুবার নেপালে এসেছেন, অথচ একবারও ভারতে যাননি, বললেন লাও ঝিয়াও।

"কেন?"

"এত অসঙ্গতি ভারতের সমাজব্যবস্থায়।" বলেই শুধরে নিলেন, "চিয়াং কাই-শেক ভারতের বন্ধু ছিলেন, আপনি জানেন?"

"তাই?"

'১৯৪৬ সালে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু রুজভেল্টকে বলেছিলেন, ইন্ডিয়ার এই অসহ্য অবস্থা আর কতদিন চলবে? চার্চিলের ওপর চাপ দিন। আমেরিকা গোপনে চাপ সৃষ্টি না করলে ব্রিটেন অত তাড়াতাড়ি ভারতকে স্বাধীনতা দিত না। একটা অত বড় কলোনি হাতছাড়া হয়ে যাওয়া কি মুখের কথা। রুজভেল্ট নাকি বলেছিলেন, হাতছাড়া হবে না। আমাদেরই থাকবে।"

ভয়ানক কথা, তবু এই কথাও আমার মনে ধরল না। যে সময়ের কথা বলছেন, তখন চার্চিল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রিত্বে নেই। প্রতিবাদ করতে যাব, মাতা-সর্বংসহা টেবিলের নীচে আমার হাঁটুতে এক লাথি কষাল।

মৃদু হেসে বলল, 'ইউ আর রাইট। ভেরি রাইট।"

এতক্ষণ দশরথ চৌবে কেবল মাথা নেড়েছে। বিশেষ কথাবার্তা বলেনি। খাওয়া শেষ হবার মুখে সে পকেট থেকে শিবের মূর্তিটা বার করে লাও ঝিয়াওয়েব সামনে রাখল। "এ স্মল গিফট ফর ইউ লাও।"

মূর্তিটি দেখে ওর মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত।

তারপর দু'-একবার হাতে নিয়ে নাড়ল। হঠাৎ ঘাড়টা মটকে দিল মূর্তিটার। তারপর নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকল। আমি দেখি মূর্তিটা আসলে একটা কৌটো।

লাও ঝিয়াও বললেন, "ভেরি গুড কোয়ালিটি। ভেরি পিয়োর, ইট সিমস।"

মাতা-সর্বংসহা হাত তুলে আশীর্বাদেব ভঙ্গি করে তখন।

১৬

কলকাতায় থাকতে নিত্য প্রাতর্ভ্রমণ করি। খুব ভোরে উঠতে পারি না। তবু, যখনই ঘুম ভাঙে, চটপট একটা পাতলুন আর জামা পরে, কেডসে পা গলিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ঘণ্টাখানেক চক্কর দিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। চা খাই।

এখন বয়েস হয়েছে। শরীরের গ্রন্থিগুলোয় জং ধরছে। রক্ত চলাচল হতে চাইছে স্তিমিত। একটুতে হাঁফ ধবে। ভোরের দিকে এক ঘণ্টা হাঁটলে শরীরটা সবদিক থেকে চাঙ্গা হয়। মনে হয়, একটা দিনের আয়ু অন্তত অর্জন করলাম।

অন্নপূর্ণা হোটেলের সামনে প্রশস্ত বাগান, ফোয়ারা। রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা পথ ভেতরে গেলে হোটেলের বাড়িটা। কী মনে হল, সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লাম সেদিন। দরবার মার্গ ছাড়িয়ে ধর্মপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম রত্না পার্ক। বিশাল পার্ক সেটাও, আমাদের বিবাদি বাগের চেয়েও বড়। চারদিকে চওড়া রাস্তা শহরের নানা দিকে ছুটে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গার নাম বাগবাজার দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এখানেও বাগবাজার। তবে ঢের খোলামেলা। আর, ট্রামের বদলে এখানে ট্রলিবাস চলে।

শীতকাল তো। তখনও বেশ কুয়াশা রাস্তায়। আর কুয়াশা বলেই কাঁপুনিটা কম। রোদ উঠলে পর এই কুয়াশা মিলিয়ে যাবে। তখন ঠান্ডা হাওয়া চলবে।

মাফলার দিয়ে আমার দু'কান ঢাকা ছিল বলে প্রথমটা শুনতে পাইনি। কাছে আসতে শুনতে পেলাম, একটা লোক ডাকছে, "দুলালবাবু, দুলালবাবু।"

আমি ঘুরে দাঁড়াই। দেখি, ভৌমিক।

"আপনি এখানে আছেন?" ভৌমিক জিজ্ঞেস করে।

"অবশ্যই।"

"কাল বিকেলে মাতাজির সভায় দেখলাম না?"

আমি বললাম, "আমার একটু অন্য কাজ ছিল, যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কেমন লোক হয়েছিল?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভৌমিক বলে, "তার মানে, হোটেল সোলটিতে গেছলেন। ক্যাসিনোয়।"

সত্যি বলতে কী, ওখানেই গিয়েছিলাম। দিল্লিতে যেমন কুতবমিনার, বম্বেতে যেমন গেটওয়ে-অব-ইন্ডিয়া, কাশীতে যেমন বিশ্বনাথের মন্দির, কাঠমান্ডুর সেই রকম অবশ্য গন্তব্যস্থল হল ক্যাসিনো। ক্যাসিনো মানে নাচ-গানের আসর।

বিশাল হলঘর। একটা দিকে শুধু তাসেব খেলা। যারা ঘুঘু লোক, তারা ওইখানেই বসে থাকে সারাদিন। বুদ্ধি খাটিয়ে টাকা জেতে বা টাকা হারে। আর আছে 'রাশিয়ান রুলেট'—নামটা জমকালো। আসলে এই রকম বাজিখেলা ছোট মাপে ইন্ডিয়ার মেলায়-হাটেও দেখতে পাই। ঘড়ির মতো গোল একটা বৃত্ত। তার দশখানা ভাগ। যার যেখানে খুশি পয়সা রাখো। কাঁটা ঘুরিয়ে নেবার পর—যে-ঘরে এসে কাঁটা থামবে, সেই ঘরের দাবিদার চারগুণ কি পাঁচগুণ পয়সা জিতবে। এখানে চাকা আর বল দিয়ে খেলা।

সবচেয়ে সহজ আর সবচেয়ে মজার হল এখানকার ভিডিয়ো মেশিনে খেলা। নাম দিয়েছে জ্যাক পট। তাসে পোকার খেলায় নিজের হাত না দেখিয়ে পয়সা দিতে দিতে যে বাজি জমে ওঠে, তাকে বলে জ্যাক পট। কারও মুখ দেখে বোঝা যায় না, তার হাতে কী তাস আছে। ওই মুখকে বলে 'পোকার ফেস'—নির্বিকার। এখানে অবশ্য হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে যাও, চান্স লাগলে ঝুবঝুর করে টাকা পড়তেই থাকবে। বাটিব পর বাটি। না লাগলে, যেটা ফেলেছ, সেটা গেল। নিজে আমি ঘুরে ঘুরে একশো পঁচিশ টাকা হারলাম। এবং তখনই আমার মনে হল, দিনের শেষে যখন অনেকের জেতা, অনেকের হারা নিয়ে হিসেব হয়, তখন সবচেয়ে যে বেশি টাকা জেতে সে হল এই হোটেল সোলটির কর্তৃপক্ষ। এই এলাহি বন্দোবস্ত তা না হলে চালাত কী করে। সুতরাং এ-খেলা হারুবাবুদের, যেমন ঘোড়াব রেস। সাধাবণত নিষিদ্ধ বলে এর আলাদা একটা মজা আছে।

ভৌমিকের কাছে আমি এসব কথা ভাঙলাম না।

বোকার মতো মুখ করে জিজ্ঞেস করলাম, "ক্যাসিনো? সেটা আবাব কোথায়?"

বাজাবের মধ্যে আমরা একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে বসি। ভৌমিক আমাব কাছে মাতা-সর্বংসহাব জনসভার বিশদ বিবরণ দেয়। দশ হাজার মতো লোক হয়েছিল রত্না পার্কে। মাতাজি ছিল প্রধান অতিথি। নেশার বিরুদ্ধে তীব্র ও তীক্ষ্ণ ভাষায় ভাষণ দিয়েছে।

"কী তাদের কষ্ট, আমি জানতে চাই।" মাতাজি বলেছেন, "আমি তাদেব বিশ্বাসের ভূমিতে ফিবিয়ে দেব। আমার কাছে গুরুদেবের মন্ত্র আছে। একটা গোটা নেশনের ইয়ুথফোর্স..."

বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় একজন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক মাতাজিকে একটা কারুকার্য করা ছড়ি আর একটা কমণ্ডলু উপহার দিলেন। ভৌমিক বলে, "মাতা-সর্বংসহাকে তখন স্বামী বিবেকানন্দের মতো দেখাচ্ছিল।"

আমি বলি, "স্বামীজিব হাতে কখনও কমণ্ডলু ছিল বলে শুনিনি।"

"ওই হল আর কী। আমি ব্যক্তিত্বের কথা বলছিলাম। সভা শেষ হবার আগে এক কাণ্ড হয়েছে।"

"কী কাণ্ড?"

"পনেরো-ষোলো বছর বয়সের এক ছোকরা ছুটে এসে মাতাজির পায়ে পড়ল। বলল, "মুঝে ত্রাণ কিজিয়ে, ম্যয় মর জাউঙ্গা।"

ভৌমিক বলে, "মাতাজি এদিক-ওদিক চাইছেন, বুঝলাম, আমাকেই খুঁজছেন। আমি যেতেই বললেন, সকলের সামনে বললেন, একে নিয়ে যাও। আজ থেকে এ-বেটা আমার আশ্রিত। আমার সন্তান। আর ফিসফিস করে বললেন, একে পুষব।"

"কী নাম সন্তানের?"

"হিরালাল। হিরালাল ওঝা। মাথায় ইয়া টিকি, গলায় পইতে।"

"কোথায় রাখলেন তাকে?"

"আমার সঙ্গে। হোটেল রত্নায়।"

এবার আমার যেন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। ভৌমিককে জিজ্ঞেস করলাম, "বড় হয়ে এ কি গোমেজের বদলি হবে?"

"গোমেজ?" ভৌমিক খানিক চুপ করে থেকে বলে, "আহা, ওর কথা আর বলবেন না।"

আমাদের ছেলেবয়সে আমরা মানুষের একরঙা চেহারা দেখেছি। একরঙা চেহারার মানুষের কথা গল্প-উপন্যাসে পড়েছি। স্কুলে হেডমাস্টারমশাই ছিলেন সতীশবাবু—অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির লোক। গম্ভীর, রাশভারী, মনে হত সব সময় রেগে আছেন। আমরা তাঁকে ভয় পেতাম, আবার শ্রদ্ধাও করতাম। কখনও তাঁর মুখে হাসি দেখিনি। আবার ইংরেজি পড়াতেন নুরবাবু—ভারী উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। শুধু উদার নন, তাঁর মনটাই ছিল আনন্দের খনি। জোরে হাসতেন। দুষ্টুমি করলে শাস্তি দিতেন, কিন্তু খুব অল্পমাত্রায়। খুব তাড়াতাড়ি ক্ষমা করে দিতেন আমাদের দোষত্রুটি। শুনেছি, সুপ্রকাশ নামেব একটি ছেলেব খাতায় একশোর মধ্যে একশো দুই নম্বর দিয়েছিলেন একবার। ক্লাস টেনের ইংরেজি ব্যাকরণ আর রচনার পেপারে। হেডমাস্টারমশাই খাতা দেখে অবাক। এ কী! করেছেন কী?"

নুরবাবু নাকি বলেছিলেন, "হি ডিসার্ভস ইট।"

"একশোর মধ্যে একশো দুই?"

"হ্যাঁ। কারণ, ব্যাকরণের সব উত্তর ঠিক। নম্বর কাটার কোনও উপায় নেই। আর রচনার খাতায় যেসব ছাত্রকে আমি চল্লিশে তিরিশ-বত্রিশ দিয়েছি তাদের চেয়ে এত বেশি ভাল ওর লেখা, এত ম্যাচিয়োর ওর চিন্তা যে, প্রত্যাশা পূরণ করেও তার দাবি থাকে বোনাস নম্বরের জন্যে। আমি দু'নম্বর বোনাস দিয়েছি ওকে। ওকে যদি পাঁচ নম্বর কম দিতে হয়, তা হলে সব ছাত্রের খাতায় পাঁচ নম্বর করে কাটতে হবে, না হলে সুবিচার করা হবে না। আর সেক্ষেত্রে এগারোজন ক্লাস প্রমোশন পাবে না।"

নুরবাবু নাকি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি তাই চান, সার?" কীভাবে এর মীমাংসা হয়েছিল আমি জানি না।

হিটলার, মুসোলিনিকে আমাদের তেমন পছন্দ নয়। মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন আমাদের চোখে নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষ। 'পথের দাবি'র মাস্টারদাকে আদর্শ দেশপ্রেমিক বলে জেনেছি। আকবর ছিলেন মহান সম্রাট, কিন্তু ঔরঙ্গজেব ভারী কুচক্রী ও শয়তান প্রকৃতির।

আমাদেব দেশে ব্রিটিশ শাসকদের চেহারাও মোটামুটি একরঙা ছিল বরাবর। তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছে, দুশো বছর ধরে শোষণ করেছে এই দেশটাকে। অবশেষে দেশটাকে ভেঙে দিয়ে চলে গেছে। বাইরের টিম খেলায় হেরে গেলে যেমন গোলপোস্ট ভেঙে দিয়ে চলে যায়।

না, ঠিক চলে তো যায়নি। ফিরে এসেছে আবার। অন্য শাগরেদদের সঙ্গে নিয়ে বন্ধুভাবে ফিরে এসেছে। ফেরাফেরি করে সাহায্য আর শোষণ দুই-ই চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখন আর রুখে দাঁড়াবার জোর নেই কারণ শত্রুর চেহারা আর একরঙা নেই। সে একদিকে ত্রাতা, অন্যদিকে শয়তান। দরিদ্র দেশগুলির সামনে দাঁড়িয়ে ধনী রাষ্ট্র দম্ভভরে বলে, এই হাত থেকে নাও খাদ্যশস্য আর এই হাত থেকে নাও বন্দুক। বন্দুক না নিলে খাদ্য পাবে না। বন্দুক কেন? যাতে সবাই ভাগ করে না নিয়ে কয়েকজনে ভোগ করে? বৈষম্য বাড়ে? নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু হয়? এই তো সেদিন পিসিই বলল, সুইডেনের মতো দেশ, যে কখনও কোনও বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি, সর্বদা নিরপেক্ষ থেকেছে, সে কিনা পৃথিবীর সমস্ত দেশকে মারণাস্ত্র বিক্রি করে এত বড়লোক আজ। দেখে যাই, আদর্শবাদী লোকগুলি বিদায় নিচ্ছে একে-একে, তার বদলে সমাজে জাঁকিয়ে বসছে দক্ষ সেয়ানা মানুষেরা। বিজ্ঞান বোধহয় মুনশিয়ানার ভক্ত, ভাবাবেগের নয়।

এই যে মাতা সর্বংসহা ওরফে মিৎসুপিসির চক্রে আমি ক্রমে ক্রমে ঢুকে পড়লাম, দেখছি, জনসেবা আর চোরাই চালান—এই দুই কাজেই এরা সমান পটু। চোরাই চালানের টাকায় এরা আর্তের সেবা করে, আবার ওই উপকৃত আর্ত মানুষেরা এদের চোরাই চালানে সাহায্য করে। বিবেকের খবরদারি করেন গুরুদেব। প্রশাসন বা পুলিশকে এরা গ্রাহ্য করে না, কেননা তারা এদেরই মুখাপেক্ষী। সেখানেও তো মানুষই বসে আছে। ডিউটি করে, মানুষ যা মাইনে পায়, তাতে খিদে মেটে কিন্তু খাঁই মেটে না। একটু-আধটু ডিউটিতে অবহেলা করলে এই জনসেবক-কাম-চোরাইচালানকারী দল খাঁইটা মিটিয়ে দেয়।

ভৌমিক বলল, "দেখুন, তা সত্ত্বেও খুনের দায়ে ধরা পড়েছে গোমেজ। হয়তো ওর ফাঁসি হয়ে যাবে শেষপর্যন্ত।"

গোমেজ আসলে ভারতের পশ্চিম উপকূলের ছেলে। শ্রীবর্ধনে ওর বাড়ি। নৌকোয় করে জাহাজ

থেকে সোনা আনতে গিয়ে ওর বাবা রাত্রের অন্ধকারে পুলিশের গুলিতে মারা যায়। তার বডি জলে ভেসে গেছে সুতরাং গুলিতে না মরলেও পরে জলে ডুবে মরেছে। সেই সময় মাতা-সর্বংসহা ওখানে ছিল, সে-ই ষোলো বছরের ছেলেটিকে নিয়ে আসে।

ভৌমিকের বিবরণ অনুসারে, অল্পকালের মধ্যে খুব ভাল কাজ শিখে যায় গোমেজ। ম্যাজিশিয়ানের মতো অবলীলায় ও হাতের জিনিস লোপাট করে দিতে পারত। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেত। মাতাজি বলতেন, "গোমেজ আমার সেরা ছেলে। যেমন বাধ্য, তেমনি করিৎকর্মা।"

"কাজে খুশি হয়ে মাতাজি ওকে একটা দামি কুকরি উপহার দিয়েছিলেন," ভৌমিক বলল। "বিপদে পড়লে আত্মরক্ষা করতে পারবি। তোর বাপের মতো বেঘোরে প্রাণটা জলে দিবি না। ওই কুকরি দিয়ে গোমেজ একজন ঘুমন্ত লোকের গলা কাটে।"

"সে কী!" আমি আঁতকে উঠলাম শুনে। "কেন?"

"ট্রেনে ওর পাশের বার্থে শুয়ে ছিল লোকটা। কাঁধ থেকে পা অবধি ওভারকোট দিয়ে ঢাকা, মাথায় উলের টুপি নাক পর্যন্ত নামানো।" ভৌমিক নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িসুদ্ধ গলাটা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "লম্বা একটা গলা শুধু খোলা ছিল, অ্যাডামস অ্যাপল—মানে কণ্ঠা যাকে বলে, সেটা উঠছিল-নামছিল নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। গোমেজ ওটাকে দু'ফাঁক করে দেয়।"

"কিন্তু কেন?" আমি অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার ওপর রাগ করবেন না দাদা। এসব কিছুই আমি জানতাম না। এখানে এসে যেমন শুনেছি, তেমনই বলছি।"

নানাভাবে পুলিশ গোমেজকে জেরা করেছে। এখনও করছে। থার্ড ডিগ্রি করেও পুলিশ মার্ডারের কোনও মোটিভ বাব করতে পারেনি। মারের চোটে ওর কোমর নাকি ভেঙে গেছে, তবু ও বলছে, 'ফর দি জয় অব দি নাইফ'—কুকরিকে খুশি করতে ও খুন করেছে। ঘুমন্ত সহযাত্রীর খোলা গলা দেখার পর থেকেই নাকি ও অনুভব করে, কোমরে বাঁধা কুকরিটা বলছে, আমায় রক্ত দে, আমি তোকে মুক্তি দেব, আমায় রক্ত দে, আমায় রক্ত দে।"

আশ্রম থেকে বড় উকিল লাগানো হয়েছে গোমেজের মামলায়। তিনি বলছেন, খুন যে ও করেছে, আব কেউ করেনি, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। তার সাক্ষী আছে, গোমেজের নিজের স্বীকারোক্তি অবধি আছে, যা নির্ভুল। এখন একটা মোটিভ খাড়া করতে পারলে শাস্তিটা হালকা হয়। না হলে, কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার, ভারী ঝঞ্ঝাট!

হাজতে গিয়ে তিনি গোমেজের সঙ্গে দেখা করেছেন। একাধিকবার। জিজ্ঞেস করেছেন, লোকটাকে পুলিশের গুপ্তচর বলে সন্দেহ হয়েছিল কিনা। লোকটাকে চোর মনে হয়েছিল কিনা। লোকটার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল কিনা এবং ঝগড়ার সময় ও গোমেজকে গালাগাল দিয়েছিল কিনা। লোকটার সঙ্গে আগে হয়তো ওর পরিচয় ছিল, তখন কোনও অপ্রিয় ঘটনা ঘটে থাকবে। সেটা গোমেজ স্মরণ করার চেষ্টা করুক।

ও নাকি কেবল মাথা নাড়ে। আর বিড়বিড় করে, "ফর দি জয় অফ দি নাইফ। এমন সুযোগ আমি আর পেতাম না", ও উকিলকে বলেছে। "উত্তেজিত হয়ে কিংবা আত্মরক্ষা করতে গিয়ে য'রা অস্ত্র ব্যবহার করে, তারা অস্ত্রেব অসম্মান করে। অস্ত্র তোমার ভৃত্য নয়। তাকে ছবি আঁকার তুলির মতো ব্যবহার করতে চেয়েছি আমি। কোনও অপরাধ করিনি।"

উকিল বলছেন, "ওকে ফাঁসিতেই যেতে হবে।"

মাতা-সর্বংসহা বলছে, "একটা মানুষের নিশ্চিন্ত ঘুমিয়ে থাকার ঔদ্ধত্য সব সময় ক্ষমা করা যায় না। আপনি ব্যাপাবটা এইদিক থেকে ভাবুন।"

এইসব শুনে আমার সমস্ত শরীর শিরশির করে ওঠে। এরা আমাকে গোমেজের বদলি ভেবেছিল! না, আমি গোমেজ নই, আমি এদের কেউ নই। এদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। মিৎসুপিসির সাদর আমন্ত্রণে দিন কয়েকের জন্যে দেশ বেড়াতে এসেছি, এই মাত্র। এই পঞ্চান্ন বছর বয়েসে আমার এত টেনশন পোষাবে না। শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি, বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে চাই।

যারা গোলমেলে জিনিস পাচার করছে, করুক। যারা বাইরের সোনা এনে দেশকে ধনী করছে, করুক। যারা আর্তের সেবা করছে করুক। আমার কিছুতে কাজ নেই। ভৌমিককে বললাম, "আপনারা হিরালাল ওঝাকে চটপট শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে নিন।"

এক হোটেলে আছি, অথচ পিসির সঙ্গে প্রায় দেখাই হয় না। সে সব সময় ব্যস্ত। মাতা-সর্বংসহাকে দর্শন করে ধন্য হতে খেপে খেপে লোক আসে সারাদিন। তা ছাড়া তার নিজস্ব প্রার্থনা, মিটিং, কনফারেন্স রয়েছে। নানা পোশাকে বিদেশিরা তাকে ঘিরে থাকে। সর্বংসহা তাদের অশান্ত মনে শান্তি আনতে কী দাওয়াই বাতলায় জানি না। তবে বুঝতে পাবি, ওরা সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নিচ্ছে। দূর থেকে আমি এইসব ক্রিয়াকাণ্ড দেখি আর মনে মনে হাসি।

বলতে ভুলে গেছি, ওই দুটো লোক—একজন টাকমাথা আর একজন জুলফিওলা—যারা মধ্যরাত্রে হোটেলে বারাণসীর চারশো সাতাশ নম্বর ঘরে ম্যাডাম মিটারের খোঁজে হানা দিয়েছিল, তারা এখানেও এসেছে। ওই জুলপিওলা লোকটার নাম ইব্রাহিম। ভৌমিকের কাছে জেনেছি, টাকমাথা লোকটার নাম মণ্ডল। ওদের সঙ্গে ম্যাডামের একটা বিজনেস ডিসপিউট চলছে যা আদালতে নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সওয়া কেজি সোনা নিয়ে মনান্তর।

কাঠমাণ্ডুতে দুটি উল্লেখযোগ্য মন্দির দেখলাম। পশুপতিনাথ আর স্বয়ম্ভুনাথ। পশুপতি হলেন শিব, তাঁর মন্দিরের প্রবেশপথে সোনার পাতে মোড়া তোরণ। ভেতরে ঢুকলে সামনেই বিশাল এক ষাঁড়—শিবেব বাহন। সেও বেশ ঝকঝকে, তবে সোনা দিয়ে মোড়া কিনা জানি না। মন্দিরের চুড়োটি সোনায় মোড়া অবশ্য। স্বয়ম্ভুনাথ হলেন বুদ্ধ। পাহাড়ের ওপরে তাঁর মন্দির। প্রায় শ'খানেক সিঁড়ি উঠে তাঁর মন্দিবে পৌঁছোতে হয়। কাচের বাকসে ঢাকা প্রশান্ত বুদ্ধমূর্তি। মন্দিরের চূড়ার দিকে দেয়ালে দুটি বড় বড চোখ আঁকা আছে। ওই চোখদুটি দিয়ে স্বয়ম্ভুনাথ দুনিয়ার সব কাণ্ডকারখানা দেখতে পান।

কাশীতেও দেখেছি, শিব এবং বুদ্ধমন্দিবের পাশাপাশি অবস্থান। ভাবতে ভাল লাগে, একসময় অর্থাৎ আজ থেকে এক হাজাব বছর আগে অবধি উত্তব ভারতীয় আর্যাবর্তের মানুষ শিব ও বুদ্ধকে সমান শ্রদ্ধায় পুজো করে এসেছে। শিব তো ভগবান, কিন্তু বুদ্ধ ছিলেন আমাদের মতো মানুষ। তিনিই প্রথম পৃথিবীর মানুষকে সাম্যেব বাণী শুনিয়েছেন। দেবদেবী অধ্যুষিত হিন্দু ধর্মাচরণে বুদ্ধকে সহ্য করা মুশকিল ছিল নিশ্চয়, তাই তাঁর উল্লেখ হিন্দুদের কোনও ধর্মগ্রন্থে নেই। তবে শেষপর্যন্ত আমরা তাঁকে একাদশ অবতার হিসেবে গণ্য করে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছি। খ্রিস্টাব্দ এক হাজার সাল থেকে অবশ্য অন্যদের দৌরাত্ম্য শুরু হয়ে যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশ থেকে প্রবেশ করে তারা হিন্দু-বৌদ্ধ উভয ধর্মকেই নানাভাবে নির্যাতন করেছে, মন্দির, গ্রন্থশালা, ছাত্রনিবাস ভেঙে চুরমার করেছে। লুঠ করে নিযে গেছে অমূল্য সব ধনরত্ন। তারপর যখন তারা ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করেছে, তখন শোষণের চেহাবা আবও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। তাদের হাত থেকে শোষণভার গিয়ে পড়ল ইংরেজদের হাতে, আঠাবো শতকের মাঝামাঝি। ভাবতে অবাক লাগে, এ-দেশের মানুষ প্রায় কখনও প্রজাতন্ত্র বা স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। তাই, এখন, দেশ স্বাধীন হবার পর তার মর্যাদা রাখতে শিখল না।

একদিন ওই পশুপতিনাথের মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। দলে দলে লোক যাওয়া-আসা করছে। জুতো পরে ঢোকা নিষেধ। ক্যামেরা নেওয়া বারণ। তাই নিয়ে অকাবণ বচসা চলছে। আমি খ্রিস্টানদের চার্চে ঢুকেছি এর আগে, মুসলমানদের মসজিদে ঢুকেছি। বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, জৈন, পারসি—সকলের দেবালয় কেমন হয়, তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কোথাও হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরের মতো, যাকে বলে প্যান্ডিমোনিয়ম, তা দেখিনি। কলকাতার কালীঘাট, কাছেই তারকেশ্বর, পুরীর জগন্নাথ, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ, কাশীর বিশ্বনাথের তো কথাই নেই—সর্বত্র একই দৃশ্য। ঠেলাঠেলি, মারামারি, হল্লা। মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে স্বর্গচ্যুত দানবদের বৃহৎ সভাকক্ষের নাম প্যান্ডিমোনিয়ম। হিন্দু তীর্থযাত্রীরা বউ-বাচ্চা হাঁড়ি-কলসি নিয়ে মন্দিরে ঢোকার সময় কীসের ছোঁয়াচ লেগে হঠাৎ এক-একজন স্বর্গচ্যুত দানব হয়ে যায়!

সোনায় মোড়া তোবণখানার খাঁজে খাঁজে ধুলো জমে ময়লা দেখাচ্ছে। আমি ভাবছি, কত কেজি সোনা আছে এর মধ্যে। তিন লাখ টাকা কেজি দরে কত টাকা দাম হতে পারে তোরণটার। ভাবছি, লোভী দুর্বৃত্তের দল এই জিনিস ছাড়িয়ে নিয়ে যায়নি কেন। এমন সময় একজন লোক এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

জিজ্ঞেস করল, "আপনি বাঙালি?"

অন্যমনস্কভাবে আমি বলি, "হ্যাঁ।"

"আপনাকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছি বলুন তো?"

এই কথা শুনে আমায় তাকিয়ে দেখতেই হয়। সেই টেকো লোকটা। যার নাম মণ্ডল।

"কলকাতায় থাকি। যেতে-আসতে দেখে থাকবেন।" আমি বলি।

"না, না। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কখনও। কোথায়, কোথায়, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।" বলে লোকটা তার টাক চুলকোতে থাকে।

লোকটার ফিচলেমি দেখে আমার রাগ হয়। বলি, "আপনি বোধহয় কারও সঙ্গে আমায় গুলিয়ে ফেলছেন। এক বিখ্যাত মানুষের মুখের সঙ্গে আমার মুখের নাকি মিল আছে, কেউ কেউ বলে।"

কথা না বাড়িয়ে লোকটা ভিড়ে মিলিয়ে গেছে সেদিন।

আর একদিন পুরনো পল্লির দিকে গেছি একটা কাজে। জায়গাটার নাম পাটন। ঘিঞ্জি জনবসতি। ছোট ছোট জানলা-দরজাওলা নিচু বাড়িগুলো বামনের মতো দাঁড়িয়ে আছে। নতুন শহর কাঠমাণ্ডুর সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। কিন্তু ওই পাটনেই বাস করে সব ওস্তাদ কারিগরের দল। সোনারুপোর কাজ, কাঠের কাজ, বাসন তৈরি, সাজপোশাক—সবকিছুতে এদের দারুণ সুনাম। খুব চটপটে ওরা। ফরমাশ করো, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডেলিভারি দিয়ে দেবে। দরকার হলে দিনের-পর-দিন সারা রাত ধরে কাজ করে। বিদেশিরা এদের দিয়ে অনেক কাজ করায়। কাজ ভাল, মজুরি কম, কেন করাবে না? নেপালের সাধারণ মানুষ তো খুব গরিব।

মিৎসুপিসির একটা ফরমাশ নিয়ে পাটনে গিয়েছিলাম। এমন কিছু বড় কাজ নয়। কারুকার্য-করা ছড়ি আর কমণ্ডলু, যে দুটো ওই রত্না পার্কের জনসভায় উপহার পেয়েছিল মাতা-সর্বংসহা, তার ডুপ্লিকেট বানানো। কাজ কতদূর এগোল খোঁজ নিয়ে বেরিয়েছি, পুরনো মন্দিরের কাছ থেকে একজন ডাকল, "মিস্টার সিনহা, মিস্টার সিনহা।"

তাকিয়ে দেখি, ইব্রাহিম। ওর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে মণ্ডল, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। আমার কাছে ছুটে এল লোকটা। কোনও রকম ভূমিকা না করে বলল, "মাতাজিকে বলবেন, আমাদের মামলাটা মিটিয়ে নিতে। অকারণ হয়রানি হচ্ছে। সওয়া কেজি না দিতে চান, এক কেজি দিন।"

আমি অবাক হওয়ার ভান করি, "কীসের সওয়া কেজি?"

"সে আপনি বুঝবেন না। মাতাজি সব জানেন। বলবেন, আমরা স্নো লায়ন হোটেলে আছি। খবর দিলে দেখা করব।"

বলেই প্যাগোডার ধাঁচে তৈরি মন্দিরটার মধ্যে মিলিয়ে গেল লোকটা।

১৯

আমি ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করেছি।

মিৎসুপিসি মুখ ভেংচে বলল, "ঘেঁচু দেবে। তোকে ছেলেমানুষ পেয়ে টালিয়েছে।"

ওর কথায় আমি আর রাগ করি না। দশ দিক সামলে চলতে হয় ওকে, কোথায় একটা বেফাঁস কথা বলল আমাকে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তো হাজার হোক, আমি কিছু মনে করি না।

একদিন আর্চরুম কন্টিনেন্টাল রেস্তরাঁয় বসে নিরিবিলিতে লাঞ্চ করছি আমরা। আমরা মানে আমি, মাতা-সর্বংসহা, দশরথ চৌবে আর বাইরের লোক বলতে কিষন শ্রেষ্ঠা।

মাতা-সর্বংসহা কিষনকে নৈঃশব্দ্যের প্রকৃত রূপ কী তা বোঝাচ্ছিল। যখন সবকিছু নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, প্রাণীগণ ঘুমে আচ্ছন্ন, গাছের পাতা নড়ছে না, পৃথিবীময় রাত্রির আচ্ছাদন, তখনই আদিম নীরবতাকে স্পর্শ করা যায় ধ্যানে। তখনই শুনতে পাওয়া যায় মৃদু ওঁ-ধ্বনি—একঘেয়ে সুর ওঁ-ওঁ-ওঁ, যা কিনা, সর্বংসহা বলল, আসলে পৃথিবী ঘোরার শব্দ। লাট্টুর মতো পৃথিবী তো নিজের চারদিকে ঘুরছে নিরন্তর, তার শব্দ মানুষের কানে যাবার কথা নয়, কিন্তু ওই একসময় শুনতে পাওয়া যায়। তখন মনে হয়, পৃথিবীর লোকসংখ্যা তিনশো কোটি না, এক। আমি আছি আর সে আছে আর আমাদের মাথার ওপর তিনি আছেন।

"জীবনে দু'-একবারই সেই পরম মুহূর্ত আসে।" মাতাজি বলল। ভাষণ শুনে কিষন শ্রেষ্ঠা বেশ কাবু

হয়েছে মনে হল। গদগদ স্বরে বলল, "মাতাজি, আপনি একবার ধুলিখেলে আসুন। আমার শৈলাবাসে পায়ের ধুলো দিন। আপনার বিশ্রাম হবে। আর, যে-স্তব্ধতার কথা বলছেন, তা ওখানে মিলবে।"

তারপর জায়গাটার বর্ণনা দিল ও। কাঠমান্ডু থেকে পুবদিকে চৌত্রিশ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের ওপর নির্জনে কয়েকটি নেপালি কটেজ ও তৈরি করেছে বিদেশি পর্যটকদের জন্যে। খড়ের চাল, কিন্তু সব রকম আধুনিক সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা আছে। সব সময় গরম জল, হিমঠান্ডা পানীয়, ডাইনিং হল, বার। অথচ ইলেকট্রিসিটি নেই।

"তা কী করে সম্ভব?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"কেন? কেরাসিনের লণ্ঠন, কেরাসিনের ফ্রিজ। সিলিন্ডার গ্যাসে রান্না। সোলার এনার্জিতে জল গরম হয়। ঘরে ঘরে মোমবাতি। ভিড় হয়ে গেলে জেনারেটর চালিয়ে ডাইনিং হল আলোকিত করা হয়। তবে বেশিক্ষণ জেনারেটর চালানো হয় না শব্দের কারণে।"

কিষন বলছিল, "ভোরবেলা হিমালয়ের অনেকগুলো শৃঙ্গ দেখা যায় কটেজ থেকে। গৌরীশঙ্কর, চো-ওয়ু, লোৎসে, নাপসে, মাকালু, কারয়োলাং। সন্ধের পর হঠাৎ একটা কালো জানোয়ার ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন। গায়ে তার নক্ষত্রের বুটি। সারারাত ফোঁস ফোঁস করে। নীচে ভ্রমরকোট নামে এক গ্রাম আছে। টিমটিম আলোয় ঝিমোয়।"

"ভ্রমরকোট?" মাতাজি চমকে ওঠে, "ভারী চমৎকার নাম তো। ভ্রমরকৌটোর সঙ্গে মিল আছে। সেই গল্প আছে না, রাক্ষুসিরা রাজপুত্রের প্রাণভোমরা কৌটোর মধ্যে পুরে রাখত। ভোমরাকে মেরে ফেললে রাজপুত্রও মরে যেত। ওঃ, ধুলিখেল যেতে পারলে দারুণ হয়।"

"কিন্তু আমাব যে একেবারে সময় নেই, কিষন। একবার তাতোপানি যাওয়া দরকার।"

"তাতোপানি বর্ডার? বেশ তো," কিষন উৎসাহিত হয়, "একই রাস্তা মাতাজি। কাল সকাল ছ'টায় এখান থেকে রওনা হন, একশো কিলোমিটারের কিছু বেশি—চাইনিজ বর্ডার। বড়াবিসে অবধি বাস যায়, রাস্তা ভাল। তারপর তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা একটু ভাঙা আছে। আমার নতুন টয়োটা দেব। কাজ সেরে আপনি বিকেল চারটের মধ্যে ধুলিখেল ফিরে এসে বিশ্রাম করবেন। রাতটা ওখানে থাকবেন। ইচ্ছে হলে আরও একদিন।"

"তাতোপানিতে খাবার পাওয়া যাবে?" আমি জানতে চাই। চাইনিজ বর্ডার যখন, বলা যায় না, চিনে খাবার পাওয়া যেতেও পারে। কী, টিবেটান ডিশ। মোমো।"

কিষন মাথা নাড়ে। ও জায়গা একদম সুনসান। ভোরেকোসি নদীর এপারে নেপাল, ওপারে টিবেট। তাতোপানিতে একটা ব্রিজ আছে, তার নাম ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ। ব্রিজের দু'পাশে দুই দেশের চেকপোস্ট। চিনাদের কড়া পাহারা।

"তবু লোকজন তো যাতায়াত করে, নাকি করে না?"

"পাসপোর্ট, ভিসা থাকলে যাতায়াত করে বই কী। তবে, যাকে বলে টুরিস্ট ট্রাফিক, তা নেই।"

মাতা-সর্বংসহা বলে, "সে জন্যে ভাবি না। আমার জানা একজন লোক আছে। ফুলপিংয়ের বাসিন্দা। তার যেতে-আসতে কোনও বাধা নেই। আমরা এখান থেকে প্যাকড লাঞ্চ নিয়ে যাব। তুমি শুধু এক বাকস সফট ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা রেখো। খুব শীত হবে না তো?"

"এখানকার চেয়ে একটু বেশি। নদীর ধারে বর্ডার, বুঝলেন না, কত আর অলটিচ্যুড হবে। লোকে ফিশিং, বার্ড ওয়াচিং করতে যায়। এখন না, ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। ট্রেকিং করে, নদীতে দারুণ স্রোত—র‍্যাফটিংও বেশ পপুলার। আপনার এসবে ইন্টারেস্ট থাকলে আর একবার আসুন। আপনারা ক'জন?"

মিৎসুপিসি তৎক্ষণাৎ বলল, "তিনজন।"

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করি। কোন তিনজন। আমাকে নেবে তো? এতদূর এসে যদি চাইনিজ বর্ডার দেখা না হয়, তা হলে জীবনটাই বৃথা। আমি কখনও বিদেশে যাইনি। বাংলাদেশ বর্ডার দেখেছি, কিন্তু সে তো আমাদেরই মতো দেশ। কৃত্রিমভাবে আলাদা করা হয়েছে। নেপাল অবশ্য বিদেশ কিন্তু চিন কি তিব্বতের মতো নয়। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে, ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ ক্রস করে ওপারের মাটি ছুঁয়ে আসব একবার। বাড়িতে গিয়ে বলতে পারব, নেপাল থেকে তিব্বতে গিয়েছিলাম।

পিসি একটু ভেবে বলল, "দশরথ, দুলাল আর আমি। গাড়িতে ধরবে তো?"

"আলবাত ধরবে।" কিষন বলল, "ঠিক আছে। কাল ছ'টায় রেডি থাকবেন।"

এবার 'দুলাল' বলায় আমার রাগ হয়নি। ভালবেসেই বলেছে। তবু মৃদুভাবে বলি, "ভৌমিককে নিলে হত সঙ্গে..."

অমনি মাতাজি বলে, "না না। ওর অনেক কাজ। হিরালাল ওর কাছে ট্রেনিং নিচ্ছে।"

২০

নেপাল-তিব্বত সীমান্ত ভেবে আমার মনের মধ্যে যে রোমাঞ্চ জেগেছিল, যে গা-ছমছম ভাব, ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে, সত্যি কথা বলতে কী, আমি তা অনুভব করিনি।

ব্রিজটা সুন্দর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খুব একটা যাত্রী চলাচল নেই। তলা দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা। এত নির্মল তার জল যে, নীচের পাথরখণ্ড অবধি ওপর থেকে দেখা যাচ্ছিল। চেকপোস্ট পার হয়ে গাড়ি রেখে আমরা একটু হাঁটলাম। আট-দশটা ঝুপড়ি মতন ঘর। তারপর ব্রিজ। ব্রিজের ওপারেই প্যাগোডা ধরনের একটা ছোট্ট বাড়ি, ওদের চেকপোস্ট। ব্রিজের ওপরে অলিভ রঙের পোশাক পরা সশস্ত্র সীমান্ত-পুলিশ, সম্ভবত চিনে, পায়চারি করছিল। আমরা ছাড়া আরও আট-দশটি গাড়ি এসেছিল। ওদের লোকেরা টুকটাক ছবি তুলছিল।

ওপারে ব্রিজটার গা বেয়ে পাহাড়ি পথ উঠে গেছে। হয়তো মোটর চলার পথও আছে একটা। পাহাড়ের পেছনে হয়তো গ্রাম আছে। সেই গ্রামের লোকেরা নেপালি নয়, হয়তো তিব্বতি। আরও দূরে চলে গেলে হয়তো বৌদ্ধ লামাদের সঙ্ঘ দেখতে পাওয়া যাবে। ভাঙা এরোপ্লেন, অতিকায় ইয়েতি, টিনটিন যেমন দেখেছিল।

আসলে ভূমণ্ডল যখন গড়ে উঠেছে, তখন তো সৃষ্টিকর্তা কোনও সীমান্ত নির্ধারণ করেননি। নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, হ্রদ-সমুদ্রসহ একটা জগৎ ছিল, আস্তে আস্তে মানুষ সেই জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তাকে ভালবেসেছে। তারপর তাই নিয়ে শুরু করেছে খেয়োখেয়ি। একসময় সেই হিংসুটের দল বলেছে, "আচ্ছা, এই লাইন অবধি আমার, ওখান থেকে তোর জমি, কেমন?" এই ভোরেকোসি নদীটা সেই রকম এক প্রাকৃতিক বিভাজন-রেখা। ওপারে এক রহস্যময় পার্বত্য দেশ যার নাম তিব্বত।

গাড়ি থেকে নামতেই একজন বেঁটেমতন লোক মাতা-সর্বংসহাকে সেলাম করল। তারপর পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করল। মাতাজি তার কালো টুপিতে হাত রেখে আশীর্বাদ করল। বলল, "ভাল আছিস, থাপা?"

গদগদভাবে থাপা বলল, "জি। আপকি কৃপা, মাতাজি।"

তারপর দশরথের হাত থেকে লাল রঙের ব্রিফকেসটা ও নিয়ে নিল। আমি দেখলাম, দূর থেকে শৌখিন ফোটোগ্রাফারের দল মাতাজির ছবি নিচ্ছে।

সময় নষ্ট না করে আমি ব্রিজে উঠে মাঝবরাবর গিয়ে একজন সীমান্তরক্ষীর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করি। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, একবার ওপারে গিয়ে মাটিতে পা ছোঁয়ানো। সে-লোকটার মুখে বাঁধানো হাসি, কিন্তু ইংরেজি, হিন্দি, কোনও ভাষাই সে বোঝে না। যখন অনেক কষ্টে আমার মতলবটা ওকে বোঝানো গেল, অমনি সে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, তা হয় না। আমাকে নম্রভাবে জেদাজেদি করতে দেখে আর একজন রক্ষী সেখানে এসে হাজির। এমন সময় পেছন থেকে ডাক শুনলাম, "দুলাল, চলে আয়। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোকে গুলি করবে।"

মনখারাপ হয়ে গেল। আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না, তবু একটু যেতে দিল না ওরা। অথচ, লাল ব্রিফকেস হাতে কেমন নির্ভয়ে থাপা আসা-যাওয়া করছে, কথা বলছে, কেউ ওকে আটকাচ্ছে না। বুঝলাম, সব চেনাশোনার ব্যাপার। এই দুনিয়ায় চেনাশোনা না থাকলে আজকাল আর কিছু হয় না।

আমরা আধঘণ্টা মতন সময় ওখানে ছিলাম। একটু পরে ফিরে এল থাপা। লাল ব্রিফকেসটা দশরথের হাতে ফেরত দিয়ে আবার সেলাম করল। আমার কেমন সন্দেহ হল, যে বাকসটা ও হাতে করে নিয়ে গিয়েছিল, এটা সেটা নয়। কোনও এক ফাঁকে বাকস বদল হয়েছে।

ফেরার সময় একটা ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে থাপা নেপালি এক বুড়ির সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলতে লাগল। মাতাজি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আর দশরথ ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি, নোংরা

কাপড়চোপড়ের আবরণ থেকে বেরোচ্ছে বড় বড় চিনা টর্চ, চিনা থার্মোস, সিল্কের কাপড়। নেপালি টাকা দিয়ে দশরথ একটা এক হাত লম্বা টর্চ কিনল। আর একটা থার্মোস।

গাড়িতে উঠে বসেছি, তখন সাড়ে এগারোটা। থাপাকেও সঙ্গে নেওয়া হল। আমরা ফুলপিং অবধি একসঙ্গে এলাম। রাস্তা থেকে একটু নেমে পাহাড়ের ছায়ায় গাড়ি রেখে আমরা লাঞ্চ খেলাম। চিকেন, চিজ আর ভেজিটেবল—এই তিন রকমের স্যান্ডউইচ ছিল একগোছা করে। ছ'টা ডিমসেদ্ধ। আপেল। তা ছাড়া এক ক্রেট, বারো বোতল খাঁটি সফট ড্রিঙ্ক। মাতা সর্বংসহা থাপাকে তো খাবারের ভাগ দিলই, ড্রাইভারকেও বঞ্চিত করল না। আর এক রাউন্ড সেলাম এবং প্রণাম সেরে বিদায় নিল থাপা। লক্ষ করলাম, মাতাজি একগোছা সবুজ রঙের কারেন্সি নোট গুঁজে দিল থাপার হাতে। সেগুলো নেপালি টাকা নয়। সম্ভবত ইউ এস. ডলার।

তাতোপানি থেকে ফিরে আমরা যখন ধুলিখেল পৌঁছোলাম, তখন বেলা সাড়ে তিনটে। কিষন শ্রেষ্ঠার কটেজ কমপ্লেক্স বেশ গমগম করছে। দেশি-বিদেশি মিলিয়ে অন্তত কুড়ি-বাইশজন মেয়েপুরুষ ঘুবে বেড়াচ্ছে বাগানে। দূর থেকে কটেজগুলো গ্যালারির মতো দেখাচ্ছিল। রাস্তা থেকে উঠে প্রথম স্তরে ডাইনিং হল আর তিনজোড়া ঘর। তার ওপরে দ্বিতীয় স্তরে দুটি। তৃতীয় স্তরে আবার দু'জোড়া। চতুর্থ স্তরে চারটি ঘর। ডাইনিং হলে খোঁজ করে জানলাম, আমাদের জন্য প্রথম স্তরে ১০৩, ১০৪ আব ১০৫—এই তিনখানা ঘর সংরক্ষিত আছে। পাছে ওপরে উঠতে মাতাজির কষ্ট হয়, তাই এই ব্যবস্থা। কিষন ছিল না, ওর লায়েক ছেলে এখানকার ম্যানেজার। আমেরিকা থেকে টুরিজমের ডিপ্লোমা নিয়ে এসেছে। ছেলেটি বলল, "আপনারা ওয়াশ সেরে ডিনার খেয়ে নিন অন্ধকার হবার আগে।"

মাতাজি বলল, "আমি ঘরে ডিনার খাব।"

চারপাশে অপরিচিত লোকের দল মাতাজির দিকে এমন প্যাট প্যাট করে তাকাচ্ছিল, যেন বুড়ি সন্ন্যাসী কেউ জীবনে দেখেনি।

আমি আর দশরথ খানিক টালবাহানা করে সাড়ে পাঁচটায় ডিনারে বসলাম। কিছু লোক বাইরে চাঁদোয়া খাটিয়ে আউটডোরে ডিনার খাচ্ছে। কালো প্যান্ট, সাদা শার্ট, কলারে হাতায় লাল পাড়—চটপটে সব ওয়েটারের দল মোমবাতির আলোয় খাবার পরিবেশন করছে। দৃশ্যটা প্রায় অলৌকিক, কারণ আমাদের চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছেন বিশাল বিস্তৃত হিমালয় পর্বতশ্রেণী। নির্জন, গম্ভীর, স্তব্ধ আর নির্বিকার। ইচ্ছে করলেই আমাদের খেলাঘর ভন্ডুল করে দিতে পারেন, দিচ্ছেন না। দিচ্ছেন না হয়তো এই কারণে যে, যে-জায়গাটায় বসে আমরা আড্ডা দিচ্ছি, তার নেপালি নাম 'খাওয়া'। এর নীচে ভ্রমরকোট।

তখনও জানি না, পরের দিন ভোররাত্রে দশরথকে আক্রমণ করতে এসে গুন্ডাদের একজন খাওয়া থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে ভ্রমরকোটে পড়বে।

২১

ওরা ছিল তিনজন।

ডাইনিং হলের পেছনদিকটায় জায়গাটা নিরিবিলি। তখনও কেউ জাগেনি। একজন পাহারাদার কেবল টহল দিচ্ছে চত্বরটায়। সূর্যোদয় হতে অন্তত আধঘণ্টা দেরি কিন্তু আকাশ কিছুটা ফরসা হয়েছে।

দশরথ তার নিত্য অভ্যাসমতো ল্যাঙট পরে খালি-গায়ে ব্যায়াম করছিল। এমন সময় পেছন থেকে দু'জন হঠাৎ এসে দু' হাত চেপে ধরে ওর। আর একজন সামনে এসে ছোরা দোলাতে থাকে। দশরথের কথামতো, ওরা ইব্রাহিমদের চর। রাত্রে চারশো তিন আর চারশো চার নম্বর ঘরে ঘাপটি মেরে ছিল। অনেক রাত্রি অবধি ওই ঘর দুটোয় নাকি মোম জ্বলতে দেখা গেছে।

ওদের একটাই কথা, লাল ব্রিফকেসটা দাও নইলে গলা কেটে এখান থেকে নীচে ফেলে দেব। দশরথ ওদের মুখে মদের উগ্র গন্ধ পেয়েছে আর তাতেই বুঝেছে, বাহুবলে ওরা পেরে উঠবে না।

"ঘরে চলো, দিচ্ছি", বলে পাহাড়ের প্রান্ত ঘেঁষে ও হাঁটতে শুরু করে। গোঁফজোড়া আটটা কুড়িতে নামিয়ে এনে এমন ভাব দেখায়, যেন খুব ভড়কে গেছে। এত সহজে কার্যসিদ্ধি হবে, ওরা ভাবেনি। দশরথের হাত ছেড়ে দিয়ে ওরা যখন নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে কথা বলছে, তখনই

আচমকা দশরথ এক ধাক্কায় ছোরাধারী লোকটাকে নীচে ফেলে দেয়। দশরথের ভাষায়: ওই শকটা দরকার ছিল। তার আর্তনাদ শুনে বাকি দু'জন একেবারে দে-দৌড়।

পাহারাদার ছুটে এসে দেখে, দশরথ তখনও ডন মারছে।

"ক্যা হুয়া সাব?"

"কুছ নেহি। তুম আপনা কাম করো।"

একটু পরে গাড়ি স্টার্ট দেবাব শব্দ হয় নীচে। বোঝা যায়, ওরা বন্ধুকে অতল গহ্বরে ফেলে রেখে চম্পট দিচ্ছে। যাক।

মাতা-সর্বংসহা সব শুনে বলল, "পাঁচ কান করে লাভ নেই। কিষনের ছেলেকে গিয়ে বলো আমরা আটটায় চেকআউট করব। আজ দুপুবেই কলকাতার ফ্লাইট ধরতে হবে।"

দশরথ বলে, "আমি সঙ্গে আছি। ওখান থেকে ট্রেনে বেনারস ফিরব।"

"লোকটা বাঁচবে বলে মনে হয়?"

"জঙ্গলে পড়লে বেঁচে যেতে পারে। পাথরে পড়লে বাঁচবে না।" দশরথ গোঁফ পাকাতে পাকাতে বলে, "অন্ধকার খাড্ডায় এত বড় জাম্প, পড়ার আগেই হার্টফেল করতে পারে।"

সর্বংসহা খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল কাচের জানলার বাইবে। পাহাড়ের শিঙে শিঙে তখন মেঘ জমতে শুরু করেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কার কখন সময় আসে, কেউ বলতে পারে না। অথচ বেঁচে থাকতে মানুষেব এত লোভ। এত হিংসে। এত মারামারি, কাড়াকাড়ি।"

হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল মাতা-সর্বংসহাব মধ্যেকার মিৎসুপিসিটা। ওর ঝকঝকে বাঁধানো দাঁতগুলো মুখেব কোঁচকানো ফবসা চামড়ার ভেতর থেকে যেন মৃত্যুকে ব্যঙ্গ করছে। মৃত্যুকে অস্বীকার করছে। বলল, "হ্যাঁ রে, একটা জলজ্যান্ত লোককে তুই মেরে ফেললি। টুসকি দিয়ে ফেলে দিলি, হাঃ হাঃ হাঃ, দশরথ, ও ড্রাঙ্ক ছিল বললি না? ড্রাঙ্ক ছিল। ...না না, তুই মারিসনি। তুই মারবি কেন? ...ও সুইসাইড করেছে। ...বেচারা!"

এদের কথাবার্তা শুনে আমার বুক টিপটিপ করছিল। আমার মনে হচ্ছিল, এখানেই শেষ নয়। এই ঘটনার জের অনেকদূর গড়াবে। ওরা প্রতিশোধ নেবে। ওই ইব্রাহিম আব মণ্ডল এত সহজে আমাদের ছেড়ে দেবে না।

কপাল ভাল, আই সি ২৪৮-এ পাঁচখানা সিট পাওয়া গেল। মালপত্র জড়ো করে আমরা হোটেল রত্না থেকে ভৌমিক আর হিরালালকে তুলে নিলাম। কোথায় গেল হিরালালেব টিকি আর পইতে! ক্রিম রঙের সাফারি সুট পরে ফরসা ছেলেটাকে বেশ চালাক চতুর দেখাচ্ছিল। মুখে বাংলা বুলি ফুটেছে। জবরদস্ত ভৌমিকের ট্রেনিং। আর জবরদস্ত কাঠমাণ্ডুর দর্জিদের হাতযশ। পিসি ওকে পুষবে। ভাবলাম, ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলি, গোমেজের বদলি, বেটা, তাড়াতাড়ি কাজ শিখে নিয়ো। এই বয়সে মাতাজি আর কতদিক সামলাবে।

মাতা-সর্বংসহার পরনে লাল সিল্কের আলখাল্লা। গায়ে টকটকে লাল কাশ্মীরি শাল। মাথায় লাল উলের টুপি। এক হাতে কারুকাজ-করা দণ্ড। অন্য হাতে কমণ্ডলু। খালি-পা। হিরালালের হাতে লাল রঙের ব্রিফকেস। বাকি জিনিসপত্র আমাদের দু'জনের বাকসে গাদাগাদি করে ঢোকানো হয়েছে। ভৌমিকের সম্বল পোঁটলাটি ওর কাঁধে।

অন্নপূর্ণা হোটেল থেকে বেরোবার সময় মাতাজি ঘোষণা করল, "এখন থেকে আমি মৌনী। ভৌমিক আমার ইন্টারপ্রিটার। দশরথ, দুলাল, তোমরা আলাদা যাত্রী। আমাদের সঙ্গে তোমাদের কোনও সম্পর্ক নেই, বুঝতে পেরেছ?"

দশরথ বলল, "জি।"

আমি কিছুই না বুঝে মাথা নাড়লাম।

ত্রিভুবন এয়ারপোর্টে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছি। তবু দেখলাম, একজন মোটামতন লোক ছুটতে ছুটতে এসে মাতাজির গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে গেল। তার সঙ্গে কীসব কথা হল মাতাজির, আমরা জানি না। আসলে, কথা বলছিল সেই মোটা লোকটাই, মাতাজি কেবল মাথা নাড়ছিল, দেখলাম। আর চিউয়িংগাম চিবোচ্ছিল।

সারা পথে কোনও কথা নেই। এক ঘণ্টা সময় কোথায় দিয়ে কেটে গেল বুঝলাম না।

দমদমে নেমে আমি আর দশরথ তো আটকে গেছি। আমাদের ব্যাগেজ আছে। মিংসুপিসির চাকা-লাগানো সুটকেসটা এখন দশরথের জিম্মায়। ওরা তিনজন ঝাড়া হাত-পা, আগেভাগে এগিয়ে গেছে।

সচরাচর যা হয় না, এবার তা হতে দেখলাম।

জনাচারেক কাস্টমস অফিসার মাতা-সর্বংসহাকে দেখে তার দিকে এগিয়ে এল। হাতের লাঠিখানা ঠুকে ঠুকে দেখতে লাগল, কমণ্ডলুখানা নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল। মনে হল মাতাজির বডি সার্চ করা হবে। কাঠমান্ডু থেকে নিশ্চয় কোনও ইঙ্গিত এসেছে ওদের কাছে। তা না হলে সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি দমদম কাস্টমসের ছেলেরা এত অশ্রদ্ধা দেখায় না।

মাতাজি তো মৌনী। একটি কথা বলছে না। ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে। ভৌমিক আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওদের বোঝাতে যে, এই সাধু-মা যে-সে লোক নন। সারা ভারতবর্ষে এঁর হাজার হাজার ফলোয়ার আছে। এঁর আশ্রমে দরিদ্র-নিপীড়িতের সেবা হয়। ইনি ভারতমাতার একজন অগ্রগণ্য সন্তান। দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। এমন একজন মহান ধর্মনেত্রীকে অকারণ হ্যারাস করার মানে হয় না।

এদিকে অন্যসব যাত্রীরা বেরোতে পারছে না। গেটের মুখে ধীরে ধীরে একটা জ্যাম তৈরি হচ্ছে। অসহিষ্ণু যাত্রীর দল বিমানবন্দর থেকে বেরোবার জন্যে ছটফট করছে। তাদের মধ্যে অনেকেই বিদেশি, সাদা চামড়ার লোক।

অফিসারদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাবটা, আজ ওবা এক ঐতিহাসিক চোরাচালানকারীকে হাতেনাতে ধরেছে বা ধরতে যাচ্ছে। একজন ইন্টারন্যাশনাল অপারেটরকে বমালসহ ধরলে ওরা মোটা টাকা পুরস্কার পাবে।

আমি আর দশরথ মালপত্র টানতে টানতে যখন গেটের মুখে পৌঁছোলাম, তখন সেখানকার আবহাওয়া বেশ গরম। হিরালাল বেচারা মাতাজির দেওয়া লাল ব্রিফকেসটা বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

হঠাৎ দেখি, মৌনব্রত ভেঙে মাতাজি—সাতাত্তর বছরের ওই বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী—পরনে লাল সিল্কের আলখাল্লা, গায়ে টকটকে লাল কাশ্মিরি শাল, মাথায় লাল উলের টুপি, খালি-পা, গলায় ফুলের মালা—হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, "বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম।" যেন সাক্ষাৎ-ভারতমাতা।

তারপর সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে শুরু করল। আমরা দেখলাম, এক এক করে গলার মালা ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে মাতাজি, হাতের লাঠিগাছাটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে। পায়ে মাড়িয়ে চ্যাপটা করে দিচ্ছে হাতের কমণ্ডলু। মাথার টুপিখানা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বলছে, "কত সোনা আছে এর মধ্যে তোমরা দেখে নাও। আমাকে ধরো। আমায় জেলে পুরে দাও। সবাই দেখুক এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মানুষের ওপর কী জুলুম চলছে। ছি ছি, এইসব অপদার্থ লোক রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র পরিচালনা করছে বলে আজ দেশের এই দশা। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও এদেশের চল্লিশ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে শুয়ে শুয়ে ধুঁকছে। ছি-ছি।"

অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে একজন প্রবীণ অফিসার আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। বাকস-প্যাঁটরা না খুলেই সকলের টিকিটে সই করে আমাদের ওখান থেকে চলে যেতে বললেন। আমি আর দশরথ ব্যাজার মুখ করে বেরিয়ে এলাম।

দশরথ বলল, "শিগগির একটা ট্যাক্সি ধরুন মিস্টার সিনহা।"

"ওদের কী হল, দেখব না?"

"না। মাতাজি একাই একশো।"

মাতাজির উদ্দীপনাময় ভাষণ তখনও থামেনি। শুল্ক বিভাগের বেড়ার বাইরেও লোকের ভিড় জমে উঠেছে। ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ উত্তেজিত মন্তব্য করছে সরকারের বিরুদ্ধে। আবার কেউ কেউ সমবেত স্বরে স্লোগান দিচ্ছে, "বন্দেমাতরম।" উর্দি-পরা অফিসাররা একটু যেন হতভম্ব। নিজেদের মধ্যে কী সব পরার্শ করছে ওরা। তা হলে কাঠমান্ডু থেকে যে 'টিপ-অফ' এসেছিল, সেটা ভুয়ো।"

আমরা দ্রুত এয়ারপোর্ট ত্যাগ করি এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ট্যাক্সি ধরে ভি আই পি রোডের নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে যাই।

২২

পরের দিন সকালে মিৎসুপিসির বাগবাজারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। বন্দুকধারী দারোয়ান আমাকে দেখেও দেখল না।

সরষে রঙের কার্পেট ঢাকা হলঘরের মাঝখানে পিসি বসে আছে। শান্ত সমাহিত। চোখে আধখানা কাচের চশমা। ধবধবে সাদা মাথার চুল বয়কাট করা। পরনে নীলরঙের জিন্‌স, গায়ে সাদা ফতুয়া। সামনে একটা নিচু কাচ দেওয়া টেবিল, তার ওপর কিছু কাগজপত্র। পাশে সেই টেলিফোন দুটো।

"আয় দুলাল।" আদর করে আমায় ভেতরে ডাকল পিসি। "কাল তুমি খুব বিপদে পড়েছিলে," আমি ভয়ে ভয়ে বলি, "আমি ভাবলাম, শেষকালে..."

পিসি আমার দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন আমি গতকালের না, আকবরের আমলের কোনও কাহিনীর কথা বলছি।

একটু পরে বলল, আমাদের এসবের মধ্যে দিয়েই কাজ করে যেতে হয়। তবে সামান্য পাঁচ কেজি সোনা আর পনেবো হাজার ডলার আনতে এবার একটু বেশি বেগ পেতে হল তোদের।

মনে মনে বলি, স্ত্রীলোকের কথায় যে পুরুষমানুষ চলে, তার দুর্ভোগ তো হবেই। পরমুহূর্তে আবার মনে মনে অঙ্ক কষি, পাঁচ কেজি সোনা মানে পনেরো লাখ টাকা আর পনেরো হাজার ডলার মানে আরও দু লাখ—সতেরো লাখ টাকার জিনিস স্মাগল করেছে। মানে আমরা সবাই মিলে আনলাম।

"তোব ডুপ্লিকেট ছড়ি আর কমণ্ডলু খুব কাজ দিয়েছে।" পিসি বলল, "শেষকালে থার্মোস আর টর্চেব মধ্যে পুরে অতগুলো বিস্কিট আনতে হল। তোরা বেশ বাকস দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে এলি না? আমি তো দেখলাম। হিরালালেব লাল বাকস খুলে ওরা যখন কতগুলো গামছা আর জাঙিয়া পেল, তখনই মজাটা জমেছিল।"

তারপর তাতোপানি থেকে সংগ্রহ করা ওই দুটো জিনিস আমায় দিয়ে বলল, "নিয়ে যা, তোদের কাজে লাগবে। এখন কিছুদিন আমার ছুটি।" হাসতে হাসতে আমি বলি, "পিসি, এ-গল্প কাউকে বলতে পারব না। ক্রাইম স্টোরিতে শেষ অবধি অপরাধীর সাজা হয়। তুমি তো বন্দেমাতরম বলে পার পেয়ে গেলে! এ কেমন কথা।"

মিৎসুপিসিও হাসতে হাসতে বলল, "এই হল বাস্তব। ওনলি রংডুয়ার্স প্রসপার। এখন যারা বড় হচ্ছে, তারাই এই অসঙ্গতির মীমাংসা করতে পারবে যদি তাদের মধ্যে যথার্থ শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়, যদি তারা দেশকে, মানুষকে ভালবাসতে শেখে। আমাদের দিয়ে কিছু হবে না।"

১৯৮৮

টান

পাটানওয়ালার সঙ্গে এগ্রিমেন্ট সই হয়েছে বেলা সাড়ে বারোটায়। তারপর তাজমহল হোটেলে লাঞ্চ—সে আর শেষ হতে চায় না। গুজরাটি পারসি মিলিয়ে ওরা চার-পাঁচজন, জয়ন্তর মতো ওদের কলকাতায় ফেরার তাড়া নেই। ওদের মধ্যে যারা আবার স্বগৃহে নিরামিষাশী, শুভকাজের উদ্বোধনে তাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা সবচেয়ে বেশি। পাটানওয়ালা নিজে বয়স্ক, স্থিরবুদ্ধি, কিন্তু এই সেলিব্রেশনে ও প্রশ্রয় দিচ্ছিল। একসময় বলল, 'জয়, কেন তাড়া করছ? ধীরে-সুস্থে কাল যেয়ো, রবিবার সিট পেয়ে যাবেই। ছ'দিনের পর আর একটা দিন তোমার অনুপস্থিতি সুইটহার্ট সহ্য করতে পারবে। পেটমোটা দেশাই এক কাঠি

সরেস, সে বলে, 'বেশিদিন মেয়েদের নজর-ছাড়া করা উচিত নয় কিন্তু।'

জে. বি. ইলেকট্রনিকসের তরুণ মালিক জয়ন্ত ব্যানার্জির ব্রিফকেসে এক লাখ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট। মহারাষ্ট্র রাজ্যে চারজন নতুন নিযুক্ত ডিলার এই টাকা স্বেচ্ছায় জমা দিল। আমানত হিসেবে থাক। মাসে অন্তত একশোটা টিভি সেট যেন ওদের জন্যে বরাদ্দ থাকে, এই শর্ত। জে. বি. টিভি-র নাম হয়েছে বাজারে। ক্যাবিনেট সুন্দর এবং স্মার্ট। স্পষ্ট ছবি আসে। অথচ কলকাতায় তেমন বিক্রি নেই। লোকে বলে, এখানকার প্রোগ্রাম তেমন টানে না। আসলে, যাদের হাতে টাকা তাদের ক'জন বাংলা প্রোগ্রাম দেখতে চায়। চায় না। আর মধ্যবিত্ত ক্লাস—শহরে বা ছড়ানো-ছিটোনো শিল্পাঞ্চলে—এখনও টিভি জিনিসটাকে স্টেটাস-সিম্বল হিসেবে নিতে শেখেনি। শিখবে। আর, আর একটু রবরবা হলে এদিকে ঝুঁকতে বাধ্য হবে। কিন্তু ততদিন তো জয়ন্ত বসে বসে আঙুল চুষতে পারে না। ব্যাঙ্কের সুদ গুনতে হয়। ঠিক সময়ে কাজের লোকদের মাইনে দিতে হয়। পাঁচ-ছ'টা বছরের অভিজ্ঞতায় ওর বুঝতে বাকি নেই যে ব্যবসা ব্যাপারটা কখনও স্থির থেমে থাকে না। হয় চড়চড় করে বাড়ে, নয় ধসে যায়। ঠিক সময় ঠিক সুযোগ তাই হারাতে নেই। বিনা সুদে এক লাখ টাকা এখন হাতে এসেছে, এবার ঠিকে জোগানদারদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ উৎপাদন নিজের আয়ত্তে আনবে জয়ন্ত। উৎপাদন বাড়াবে।

সর্বক্ষণের ভাড়া-গাড়িটা ছুটছিল এয়ারপোর্টের দিকে। দু'পাশে কংক্রিটের তৈরি গাছ-ফুল-আঁকা মস্ত রঙিন ললিপপগুলো শট শট করে সরে যাচ্ছিল, জয়ন্তর ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর ব্রিফকেসে এক লাখ টাকার জ্যান্ত ব্যাঙ্ক ড্রাফট। ওর চোখে একটু নেশা, মনের মধ্যে গুরগুর করছে সফলতার গৌরব। বয়স চল্লিশের নীচে এখনও, তাই ঈষৎ টাকের আভাস যেন ভাগ্যের কপালকে বিস্তৃত করেছে।

চান্স-টিকিটে জায়গা পেয়ে গেল জয়ন্ত। সামনের দিকে, ধূমপান নিষিদ্ধ এলাকায়, জানলার পাশে। কলকাতামুখো যাত্রীর সংখ্যা কম বলে পেয়ে গেল বোধহয়। আসার সময় দমদমে যে রকম হুড়োহুড়ি ও দেখেছিল, তাতে পনেবো মিনিট আগে এসে জায়গা পাওয়ার কথাই ওঠে না। দমদমের কথা মনে পড়তেই আচমকা রুবাই আর টোনটুর মুখ দুটো ভেসে ওঠে। ওরা সি-অফ করতে এসেছিল। স্মিতাব টিপ-পবা কপালটা যেন দেখতে পায় জানলার বাইরে, ভরা বিকেলে। ওর তাড়া ছিল, আসতে পারেনি। সত্যি, সাত দিন না, যেন এক মাস-দু'মাস বাইবে কাটিয়ে বাড়ি ফিরছে জয়ন্ত।

'ইয়োর অটোগ্রাফ প্লিজ'—মেয়েলি কণ্ঠ কানে আসতে জয়ন্ত চমকে ওঠে। অন্দবের দিকে মুখ ফিরিয়ে আনে। না, ওর কাছে আসেনি, একটি ছোট কিশোরী মেয়ে ওর সামনের সারিতে, ঠিক সামনে, জানলা ঘেঁষেই বসা ভদ্রলোকটির কাছে বাড়িয়ে দিয়েছে হাত।

ভদ্রলোক হাসলেন। চোখ তুলে মেয়েটিকে দেখলেন। সই দিলেন। বোঝা গেল, সই দেবার অভ্যেস আছে। মেয়েটি চলে গেল। জয়ন্ত লক্ষ করল, ফিসফাস করছে আশপাশের লোক, কিন্তু অতি-পরিচিত চিত্রতারকার মুখে কোনও বিকার নেই। পার্শ্ববর্তিনী তরুণী—সম্ভবত সঙ্গিনী, বা তৃতীয়-চতুর্থ পক্ষর স্ত্রী—গলা জড়িয়ে বলল কিছু, একটু হাসল বুঝি, তিনি ডান কানটা একটু এগিয়ে নিয়ে গেলেন, শুনলেন, ফিরে এলেন। ঘাড় অবধি ঝোলানো মেয়েটির বাদামি চুল, তার সঙ্গে ম্যাচ-করা ব্রাউন চোখের মণি জয়ন্ত পাশ থেকে দেখল। অনুমান করল, বিখ্যাত চিত্র অভিনেতা মেয়েটিকে তেমন পাত্তা দিচ্ছেন না। পেছনের সিট থেকে যতটুকু দেখা যায়—তাঁর সুন্দর অতরুণ মুখাবয়ব, সাজানো কাঁচা-পাকা চুল, একটু কোঁচকানো বিশাল কান—ও দেখল। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ভদ্রলোক মাঝে মাঝে চুল ঠিক করছিলেন, জয়ন্ত দেখল ওঁর হাতের সুদীর্ঘ ভাগ্যরেখা, প্রত্যেক আঙুলে চার-পাঁচটি ঘাট।

অসাধারণ মানুষ, জয়ন্ত ভাবল, চেহারাও তাই সাধারণ মানুষের মতো নয়। নিজের হাতখানা উরুর উপর চিত করে ফেলে লক্ষ করল নিজের ভাগ্যরেখাটি, কবজি থেকে একটু উঠে কেমন যেন ভেঙে গেছে। ও জানে, দেখেছে আগেও, কিন্তু দমেনি। সৌভাগ্য নিয়ে কেউ কেউ জন্মান, ঠিক, আবার কেউ কেউ নিজের সৌভাগ্য রচনাও করে নিতে পারে। করেছে। পুরুষকার না কী যেন বলে তাকে।

দমদমে পৌঁছে দেখল জামাল দাঁড়িয়ে। খুশি খুশি মুখ। আশা করেছিল, বাচ্চা দুটো অন্তত আসবে রিসিভ করতে, রাত তো বেশি হয়নি তেমন, না দেখে বিমর্ষ হল।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "সবাই ভাল আছে?"

পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে জামাল। বলল, "ভাল আছে সব। টিভি ছেড়ে কিছুতে এল না।"

গাড়িতে উঠে একটা সিগারেট ধরাল জয়ন্ত। মনে পড়ল, শনিবার আজ। শনিবার বিশেষ প্রোগ্রাম থাকে।

"বউদি কলকাতায়?" একটু পরে ও আবার জিজ্ঞেস করে।

"কাল ফিরবেন। জামশেদপুর গেছেন।"

"ভালও লাগে। বিড়বিড় করে জয়ন্ত।" আজ দুর্গাপুর, কাল চিত্তরঞ্জন, পরশু জামশেদপুর—এই টো-টো করে ঘোরা মিঠুর ভালও লাগে। ঘরের খেয়ে এই বনের মোষ তাড়ানো—বিরক্তি আসে না ওর। ক্লান্তি?

পরক্ষণেই ওর মনে হল, খামোকা ছুটতে ছুটতে প্রাণ হাতে করে আসার কোনও দরকার ছিল না। একদিন আগে ফিরলাম। অর্থাৎ একটা দিন বাঁচল। কোথা থেকে বাঁচল? একটা দিন বেশি কাজ করতে পারব? না, একদিন বেশি ছুটি পাব জীবনে? আয়ু কি একদিন বাড়ল? তা তো বাড়ল না। তা হলে কী হল লাভ একদিন আগে পৌঁছে। হয়েছে, নিশ্চয় লাভ হয়েছে কোথাও, ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত অনুমান করে, যে-বুড়িটা ছোঁবার জন্যে ও বদ্ধপরিকর, দৃঢ়সংকল্প, সে-বুড়িটা ও একদিন আগে ছোঁবে।

জয়ন্তর ঠাকুরদা ছিলেন উকিল। যথেষ্ট পয়সা রোজগার করেছেন জীবনে। পাঁচ কন্যাকে পাত্রস্থ করেছেন। দশ কাঠা জমির ওপর ভবানীপুরে এই বাড়িখানি তৈরি করেছেন। একমাত্র পুত্রের ওপর বর্তেছে সেটি।

জয়ন্তর বাবা শ্রীনাথ ব্যানার্জী এনট্রান্স অবধি পড়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। উপার্জনের কোনও তাগিদ তাঁর ছিল না, উপার্জনের প্রয়োজনও ছিল না হয়তো, তবু পাছে স্বদেশি হাঙ্গামায় মেতে গোল্লায় যান, সেই ভয়ে এক মক্কেলের আপিসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। ত্রিশ বছর দাম্পত্যজীবন যাপন করে এখন তিনি বিপত্নীক হয়েছেন। ছত্রিশ বছর একই পদে চাকরি করার পর অবসর নিয়েছেন এখন।

একতলায় চারখানা, দোতলায় চারখানা—আটখানা ঘর। সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। একটা টগব গাছ, অযত্নে বেড়ে-ওঠা কয়েকটা ফুলের চারা, একটু জঙ্গল—এদের ঘিরে চার ফুট উঁচু পাঁচিল।

শ্রীনাথ ব্যানার্জী এখন একাই থাকেন দোতলায়। দক্ষিণ-পশ্চিমের কোণের ঘরে। পাশের ঘরে ছোট ছেলে শংকর। বয়েস পঁচিশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। বাপের মতো সে-ও উদ্যোগহীন। উপার্জনের একটা ব্যবস্থা কেউ করে দিলে ও হাজরি দিয়ে যেতে পারত। দেয়নি কেউ। দাদা জয়ন্তও না। একটু ভুল বলা হল। জয়ন্ত তার ছোট কারখানায় দেখাশোনার ভার দিতে চেয়েছিল একসময়। অন্তত কেনাকাটার দিকটা—যেখানে চুরি-চামারি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শংকর নেয়নি; প্রথমত, ইনটিরিয়র ডেকোরেশন, ফারনিশিং ইত্যাদি ব্যাপারে, শৌখিন শিল্পে, ওর আগ্রহ ছিল না, দ্বিতীয়ত, দাদার কর্মচারী-পদে কাজ করতে ওর আত্মসম্মানে আঘাত লাগত। সম্প্রতি সে বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়েছে, এবং কী প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ কাঠামোটা ঢেলে সাজা যায়, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সেই পরিকল্পনায় ব্যাপৃত। উঠতি শিল্পপতি দাদাকে ও গোপনে ঘৃণা করছে আজকাল। মাঝে মাঝে বৃদ্ধ বাপের খবরাখবর অবশ্য সে নেয়।

দোতলার বাকি ঘরদুটি জয়ন্ত ও তার পরিবারের জন্যে নির্দিষ্ট। একটিতে দশ বছরের মেয়ে রুবাই, সাত বছরের ছেলে টোনটু ও তাদের দেখাশোনা করার জন্যে ভদ্র ও দুঃস্থ পরিবারের একজন বয়স্কা মহিলা—রজনী।

বহুকাল সংস্কার হয়নি, তার উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে চুন ফেরানো হত, খসে-যাওয়া প্লাসটারের ওপর তালি মারা হত ইতস্তত—তার বেশি কিছু না।

কিছুকাল হল সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে জয়ন্ত। বাইরে থেকে বাড়িটাকে আর তত পুরনো মনে হয় না। ভাঙা ফাটা অংশগুলি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বাথরুমে আধুনিক টালি ও সরঞ্জাম বসেছে। নীচের তলায় দুটি ঘর—একটি কাজের, অপরটি বিশ্রামের জন্যে—নিজস্ব, ব্যক্তিগত বিশ্রামের জন্যে ঠিকঠাক করে নিয়েছে জয়ন্ত। অবশিষ্ট অংশ প্রায় বিচ্ছিন্ন বলা যেতে পারে। উপকরণগতভাবে তো বটেই। পশ্চিম দিকের দুটি ঘরের মধ্যে বড়টি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে স্মিতাকে, তার রিহার্সাল, মহড়া, আলোচনা তর্কাতর্কির জন্যে নির্দিষ্ট। দলের সাজসরঞ্জাম কিছু কিছু—কস্টিউম, স্টেজ-সেট, বেহালা, তবলা—এই ঘরের কোণে গাদা করা থাকে। অন্যের প্রবেশ নিষেধ। শেষ যে-ঘরটির কোনও বিবরণ দেওয়া হল না

সেটি তালাবন্ধ। একেবারে অপ্রয়োজনীয় বাতিল, ভাঙা, ঘুণধরা জিনিসপত্র, তিনপুরুষের স্মৃতিমণ্ডিত ধুলোবিজড়িত জঞ্জাল, শোনা যায়, যদি কাজে লাগে ভেবে ওই ঘরে ঠাসা আছে। জয়ন্ত ফেলে দিতে চেয়েছিল, শ্রীনাথ কিছুতেই নষ্ট হতে দেননি সেগুলি।

রবিবারে, যারা ভাগ্যবান, তাদের ছুটি। যারা চাকুরেবাবু, তারা এই দিনটা আড্ডা দিয়ে, ঘুমিয়ে, সিনেমা দেখে, ঢেকুর তুলে কাটায়। জয়ন্তর মতো যারা, তাদের ভেতরকার পোকা সর্বক্ষণ টালায়।

কারখানাটা একবার না দেখে স্বস্তি পাচ্ছিল না। তাই রবিবার সকালে ছুটল তারাতলা। একবার গিয়ে পড়লে, ব্যস! কিছুই উচিতমতো হয়নি। কেন হয়নি? না, এটা বিগড়েছে, ওটা ফুরিয়েছে, অমুকে আসেনি, তমুক দিল না—এইসব সহস্র অজুহাত। অজুহাত ছাড়া কী? প্রতিজ্ঞা থাকলে এমন কিছু কি আছে যা মানুষের অসাধ্য? আসল কথা, মাথা খাটায় না। যাদের ওপর দায়িত্ব, তারা যথেষ্ট সজাগ নয়। দূরদর্শিতা আর সাধারণ জ্ঞানের অভাব অনেক সহস্র সমস্যাকে গুরুতর করে দেখায়, জয়ন্তর ধারণা।

ইচ্ছে ছিল বিকেলটা অন্তত বাচ্চাদের সঙ্গে কাটাবে, তা-ও হল না। কারখানা দেখে ফিরল সন্ধের পর।

স্নান সেরে নিজের ঘরের নিভৃতে এক কাপ কফি নিয়ে বসেছিল জয়ন্ত। একটা দরকারি চিঠি মকশো করছিল, এমন সময় পরদা ঠেলে ঢুকল—আর কে—রুবাই। রোগা, ফরসা। লম্বাটে মুখ। সামনের দাঁতদুটি অপেক্ষাকৃত বড়।

জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি হাওড়ায় যাবে বাবি?"

"হাওড়ায়?" মেয়ের ঠান্ডা কচি হাতটা ধরে টেনে আনল, কাছে বসাল জয়ন্ত, "কী আছে হাওড়ায়?"

রুবাইয়ের বড়-বড় চোখদুটো দেখেই ওর মনে পড়ে গেছে।—"ও-হো, তাই তো, মিঠু-মা আসছে, তাই না? কখন ট্রেন তুমি জানো?"

"টেলিফোন করে জেনে নাও না।"

একটু কী চিন্তা করল জয়ন্ত। তারপর বলল, "জামাল গাড়ি নিয়ে যাক না। সঙ্গে তো আরও লোক থাকবে।"

বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। কিন্তু গেল না রুবাই।

বলল, "তুমি চলো না। তা হলে আমরাও যাই। মাকে নিয়ে আসি।"

স্বচ্ছ, ভাবাবেগবর্জিত মন নিয়ে ভাবল জয়ন্ত। দুটো বাচ্চাকে নিয়ে রাত ন'টার সময় হাওড়া স্টেশনে ছোটা যুক্তিযুক্ত কিনা। ওদের ঘুমোতে দেরি হয়ে যাবে। ট্রেন লেট থাকলে সকলে মিলে অকারণ অপেক্ষা করা। স্টেশনটা অত্যন্ত নোংরা, দুর্গন্ধে ভরতি। তা ছাড়া, স্মিতার সঙ্গে নাটকের গোটা দলটা তো ফিরছে। ওরাই কেউ বাড়ি অবধি ছেড়ে, দু'-একটা ট্রাঙ্ক, বাকস নামিয়ে যাবে হয়তো। স্মিতাই বিরক্ত হবে ওদের দেখলে।

সিদ্ধান্ত নেবার আগেই অবশ্য ঘরে ঢুকলেন শ্রীনাথ। টৌনটু টানতে টানতে নিয়ে এসেছে বুড়ো মানুষটাকে দোতলা থেকে।

"দাদু, তুমি বলো, তা হলে বাবি যাবে।"

লম্বাটে মাথার প্রায় সবটাই টাক। তিনদিকে অল্প চুলের ঘের। ছোট করে ছাঁটা সাদা চুল, সাদা ভুরু, সাদা গোঁফ। ধুতির ওপর একটি ফতুয়া পরা। শিশুদুটির সখা তিনি, দু'চোখে বিচ্ছুরিত স্নেহ দেখলে ধরা পড়ে।

শ্রীনাথ বললেন, "সবাই মিলে যাও, মিঠু-মাকে নিয়ে এসো। একদিন নিয়মের ব্যতিক্রম হলে কিছু হবে না।"

গলা নামিয়ে বললেন, "এরা হাঁফিয়ে উঠেছে, বেচারি।"

গড়িমসি করতে গিয়ে দেরি। ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে জয়ন্ত যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছোয়, তখন ট্রেন এসে গেছে। নেমেছে লোকজন। যাদের মালপত্র বেশি নেই, তারা চলতেও শুরু করেছে।

স্মিতা ওরফে মিঠু-মা'র এমনই চেহারা এবং চরিত্র যে ওকে লক্ষ না করে উপায় নেই। হাজার মানুষের ভিড়ে মিশে থাকার মতো, হারিয়ে যাবার মতো মানুষ সে নয়। প্রতিমার মতো গোল ফরসা ওর মুখখানা, সামান্য চাপা থুতনি, ছড়ানো বড় ঠোঁটদুটো আর চঞ্চল দুটো চোখের তারা একজোট হয়ে প্রথমেই আপনার নজর কেড়ে নেবে। তারপর আপনার দৃষ্টি আটকে রাখবে কপালের টিপটা। বড় টিপ

পরা ওর প্রিয় একটি শখ। দু'চোখের চাঞ্চল্যের মাঝখানে একখণ্ড স্থিরতা।

উপরন্তু, ওর কথা। অপরের কথা শোনার চেয়ে নিজের কথা বলতে ওর বেশি ভাল লাগে। হয়তো সব মেয়েদেরই বৈশিষ্ট্য এটা, কিন্তু স্মিতা পারে। গুছিয়ে মজা করে, উপযুক্ত ভঙ্গি দিয়ে ওর কথা ও বলতে পারে, তাই অন্যেরা শোনে, শুনতে বাধ্য হয়। নাটক ওর রক্তে ঢুকে গেছে।

পাঁচ-ছ'জন পুরুষ, স্মিতা ছাড়া আর একজন মহিলা—এই ছোট একটা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাঙ্ক, সুটকেস, হোল্‌ডল একটার-পর-একটা নামাচ্ছে কুলিরা। রোগামতন একটি ছেলে কামরা থেকে তদারক করছে।

"আমাদের এগারোটা জিনিস, সুধীর, তোমাকে বাদ দিয়ে আমাদের এগারোটা জিনিস, মনে রেখো।" দূর থেকে স্মিতার গলা শোনা যাচ্ছে।

রুবাই, টোনটু তো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। হাতব্যাগ সামলে ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিল, আবার নামিয়ে দিল স্মিতা। পাকা আম যেভাবে দু'পাশ থেকে টেপে, সেভাবে রুবাইয়ের গাল দুটো টিপে স্মিতা জানতে চায়, ওর মুখ শুকনো কেন, ওর অসুখবিসুখ করেছে কিনা।

ওর হয়ে জয়ন্ত উত্তর দেয়, "মন কেমন করেছে মিঠু-মা'র জন্যে। আমাদের সকলেরই মন কেমন করেছে।"

"ইস, কত না মন একজনের।" স্মিতা একবাব জয়ন্তব দিকে একবার দলপতি অপবেশদার দিকে চেয়ে কথাগুলো বলল।

ঢ্যাঙা, অকৃতদার এই বয়স্ক মানুষটির সঙ্গে জয়ন্তর পরিচয় আছে। সৌম্য, শান্ত অভিনয়শিল্পে সমর্পিত প্রাণ এই ভদ্রলোক তার যথাসর্বস্ব দিয়ে দলটি গডে তুলেছে শুধু নয়, বেঁধে বেখেছে স্নেহ ও যত্ন দিয়ে।

পাবিবারিক পুনর্মিলনের দৃশ্যটি উপভোগ কবছিল অপরেশ। স্মিতার মন্তব্যে সে সাড়া দিল না। বলল, "তোমরা এগোও স্মিতা, এগিয়ে পড়ো। ওই ট্রাঙ্কদুটো সঙ্গে নিয়ে যেয়ো যেন।" তারপব, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে যেন, "ভুলো না, কাল থেকে বিহার্সাল। শনিবার শো।"

"ওমা, তাই তো! আমি আর পারি না অপরেশদা," স্মিতা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

বলে, "দু'দিন শুধু ঘুমোতে চাই। আমার একটা আলাদা ঘর চাই। ওদের বলেছিলাম, কারও সঙ্গে শুতে পারি না। সে ব্যবস্থা ওরা করেনি।"

অপরেশ এবার একটু হাসল। দুটো হাত জোড়া করে বলল,—"ওদের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি।"

"তুমি কেন ক্ষমা চাইবে? আসলে, তুমি না থাকলে আমি কবেই চলে আসতাম।"

জিনিসপত্র নামানো হয়ে গেছে। গোনা হয়ে গেছে। সুধীর দু'জন কুলিকে নিয়ে এগিয়ে গেছে জয়ন্তর গাড়িটার দিকে।

গাড়িতে ওঠার আগে জয়ন্ত পেছন ফিরে তাকায়। দেখতে পায়, অপরেশের দু'পাশে ওর দলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, হাত নাড়ছে, আর অপরেশ তার পাজামা ও পাঞ্জাবির ভেতর থেকে ক্ষমাসুন্দর মুখখানি বাব করে চেয়ে আছে ওদের দিকে। একটা কুৎসিত গালাগাল জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল। গিলে ফেলল জয়ন্ত।

অথচ, বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যে-উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তার ফলে একা জয়ন্ত নয়, সবাই—স্মিতা, বাচ্চাদুটো, শংকরকাকা, বৃদ্ধ শ্রীনাথ সকলেই কিছুক্ষণের জন্যে তাদের নিজস্ব সূক্ষ্ম বেদনা-অভিমানের বোধ ভুলে যায়।

বাড়িতে ঢোকাব দরজার মুখেই ঠিক নয়, একটু দূরে টগর গাছটার কাছে থেমে থেমে শ্বাস পড়ার শব্দ। জিনিসপত্র নামাতে এসেছিল বংশী, সে-ই টের পায় প্রথম। আলো একটা জ্বলছে নিচু পাওয়ারের, তবু বাড়ির সামনে ছোট খোলা জায়গাটা অন্ধকারই। অন্তত, খানিক দূরের জঙ্গল, ভাঙা ইট-খসা প্লাস্টারের ঢিবি—সবই অস্পষ্ট।

নিয়ে এসেছে। কোথায় সাপ, ঠিক না জানার ফলে গাড়ি থেকে কাউকে নামতে দেওয়া হয় না। জয়ন্ত বংশীর সঙ্গে টর্চ হাতে আস্তে আস্তে এগোয় শব্দটার দিকে। হাতে একটা খোলা ছুরি নিয়ে এসে দাঁড়ায় শংকর। আলোর ঠিক নীচেই দাঁড়ায় বলে ওর ছুরি ও চোখ চকচক করতে থাকে। শংকর চিৎকার করে, "মারো , মারো।"

আরও দু'পা এগিয়ে এসেছেন শ্রীনাথ। হাতে ছড়ি। ভৃত্যকে বলছেন, "এগিয়ে যা, ছুটে গিয়ে মার, নইলে পালাবে।" পুত্রকে বলছেন, "টর্চটা বংশীকে দিয়ে দে, ও দেখতে পাচ্ছে না। তুই চলে আয়, আর বাহাদুরি করতে হবে না।"

সাপই। বেশ বড়। প্রায় এক মিটার লম্বা। এইমাত্র গাড়ির চাকায় থেঁতলে গেছে। মাথার দিকে খানিকটা অংশ জ্যান্ত। তাই কোনওক্রমে সাপটা তার যন্ত্রণা ও আক্রোশ প্রকাশ করছে।

ছোট লাঠিটা তুলে তাক করছে বংশী। ক্ষিপ্র হাতে আঘাত করল। ততোধিক ক্ষিপ্রভাবে সাপটা মাথা সরিয়ে নেয়। কারুকার্য-করা মাথা দোলায়। ফোঁস ফোঁস করে রাগ ঝাড়ে। বিস্ফারিত দুটো চোখ দিয়ে, জয়ন্তর মনে হল, ও যেন বলছে—দিস ইজ নট ফেয়ার। চিরিক চিরিক করে জিভ বার করে সাপটা যেন বলছে—আমি নির্দোষ।

মবা সাপটাকে লাঠিব ডগায় ঝুলিয়ে একসময় আলোর নীচে আনে বংশী। হাঁপাচ্ছে। গাড়ির ভেতর থেকে নেমে আসে বন্দিবা। শংকর তার ছুরির ফলা সাপটার মাথায় বসিয়ে দেয়।

শ্রীনাথ হুকুম দেন, "পুড়িয়ে ফেল এক্ষুনি। হাওয়া লাগলে বেঁচে উঠতে পারে আবার।" "নাঃ, এটা আব বাঁচবে না।" সাপ বিশারদ বংশী বলে। "তবে এর জোড়াটি আছেন এই ভিটের মধ্যে। আমাকে পেলে তিনি ছাড়বেন না, বাবু।"

"বটে! তা হলে ক'দিন তুই ওপরে শো।" শ্রীনাথ সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, "কলকাতা শহরে সাপ আসে কোত্থেকে? আশ্চর্য।"

ওপরে শোবার ইচ্ছে জয়ন্তরও হয়েছে। সম্পূর্ণ অন্য কারণে অবশ্য। কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড ফাঁক থেকে যাচ্ছে, ও অনুভব করে। কয়েকদিন রাত্রে ওর ভাল ঘুম হয় না। ঝাপসা ক্লান্তি যেন সেঁটে থাকে মাথার মধ্যে। কারখানা থেকে ফিরলেই চেপে ধরে ওটা।

সন্ধেবেলা স্মিতা বাড়িতে থাকে না। হয় রিহার্সাল, না হয় শো। বাংলা কাগজে ওর অভিনয়ের প্রশংসা বেরোয়, ওর ছবি বেরোয়। বাংলা মঞ্চের ইতিহাসে স্মিতা ব্যানার্জির নাম নাকি সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে—ছাপার অক্ষরে এইসব কথা লেখা থাকছে আজকাল। জয়ন্তর ধারণা, ওই অপরেশ লোকটা এ-সবের পেছনে কলকাঠি নাড়ছে। স্মিতার প্রতিভা নেই এমন কথা অবশ্য জয়ন্ত মনে করে না। আমরা কেউ অন্যের প্রিয় কাজে বাধা দেব না, বিয়ের আগে ওদের মধ্যে এই কথা তো হয়ে গেছে। তবু, সন্দেহ হয়, স্মিতাকে ধরে রাখার জন্যে, ওকে হারাবার ভয়ে, অপরেশ অমরত্ব-জাতীয় একটা মোহ ওর সামনে ঝুলিয়ে রাখছে। যার ফলে সংসারে ওর মন নেই।

নাকি মোহটা সফলতার? স্বীকৃতির? সে তো জয়ন্তরও আছে। উত্তরোত্তর বেশি করে দর্শকের হাততালি পাচ্ছে স্মিতা। উত্তরোত্তর বেশি সংখ্যায় বিক্রি হচ্ছে জে-বি টিভি। দুই-ই তো সফলতার স্বীকৃতি।

এদিকে অনেক কথা জমে যাচ্ছে। নিভৃতে বলার মতো অনেক কথা বলা হয়ে উঠছে না। মিঠু, তুমি যদি সামান্য, সাধারণ একটি মেয়ে হতে, স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কিছু না, তা হলে কী ভাল হত।

একদিন সকালে চায়ের টেবিলে কথাটা পাড়ল জয়ন্ত।

"মিঠু, আমাকে একটা ডেইট দাও।"

প্রথমে বুঝতে পারেনি স্মিতা। ভেবেছে, ডিম বা টোস্ট, বা নুন-মরিচ কিছু চাইছে।

জয়ন্ত আবার বলল, "এই শোনো, আমাকে একটা ডেইট দেবে?"

"তার মানে?" অবাক হয় স্মিতা।

"ডেইট মানে ডেইট। একটা দিন, একটা সম্পূর্ণ রাত আমার সঙ্গে কাটাও, চাইছি। অনেককাল আমাদের দেখা হয় না।"

একটু চুপ করে থেকে স্মিতা বলল, "তোমার সময় হবে? এতটা সময় নষ্ট করলে ক্ষতি হবে না?"

"না।"

"কবে বলো।"

"যে-দিন তোমার সুবিধে।"

আচমকা গলা ধরে আসছিল স্মিতার। সামলে নিয়েছে। মুখে কৌতুক ফুটিয়ে ঠোঁটদুটি ছড়িয়ে পাকা অভিনেত্রীর মতো হাসল।

বলল, "আজ তো হবে না। কাল নাঃ। তারপর দুটো দিন তো বাইরে শো, কথাই ওঠে না। ফিরে এসে বিশ্রাম চাই একদিন। আচ্ছা, আজ বৃহস্পতিবার, পরের বৃহস্পতিবার তোমার স্যুট করবে? রবিবারটা ইচ্ছে করে অ্যাভয়েড করছি।"

কিছুই না ভেবে জয়ন্ত বলল, "ঠিক আছে।"

ব্যাপারটা নিতান্তই ব্যক্তিগত, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবু বিশেষ এক বৃহস্পতিবারে, ভবানীপুরের বিশেষ একটি পরিবারে, স্বস্তি যেন শিরিষ ফুলের গন্ধের মতো ছড়িয়ে থাকে। ব্যস্ত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ শ্রীনাথ। সকাল থেকে বাগান সাফাই কাজে লেগে যান বংশীকে নিয়ে। যেখানে যত চুন-সুরকির চাঙড়, ঢিল, ইট-পাটকেল জমা ছিল, সব খালাস করেন। মুমূর্ষু দোপাটির চারাগুলো সতেজ করে তোলার জন্যে মাটি ঢিলে করে দেন। বংশী জল ঢালে। পাঁচিলের ফাটলে অ্যাসিড ঢালে। টগর গাছ ছাড়িয়ে ডান দিকে পাঁচিলের গায়ে টিনের শেড। তার নীচে ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা নীল রঙের গাড়িটা শুধু একা ঝিমোয় চুপচাপ। জামাল আজ আসবে না, ওকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

বাচ্চাদের ঘরে একটা খাটেব ওপব বসে জয়ন্ত দোতলা থেকে এইসব দেখছিল। আর সিগারেট টানছিল। ঘরটার মধ্যে কেমন ভ্যাপসা গন্ধ। দেয়ালে ছোপ, পেনসিলের আঁকিবুকি খাটের নীচে ছড়ানো ছিটোনো ভাঙা খেলনা, ছেঁড়া বই। বাচ্চাদুটো একবার কাকার ঘর একবার নিজেদের ঘর—ছুটোছুটি করছে।

সবুজ একটা শাড়ি পবে দাঁড়িয়ে ছিল স্মিতা। আলনায় বাচ্চাদের জামাকাপড় পাট করে টাঙাচ্ছিল।

জয়ন্ত বলল "টোনটুটা একেবারে দিদির ল্যাংবোট হয়েছে দেখেছ?"

"হুঁ।"

"আচ্ছা, রুবাইকে বড্ড রোগা লাগছে না? পেট ভরে খায় না? রজনী কী করে সারাদিন?"

"পেটের অসুখটা সারছে না, ও বলছিল। বড় ডাক্তার দেখানো দরকার। একদিন খুব বাড়াবাড়ি গেছে নাকি। তুমি তখন ছিলে না।"

জয়ন্তর বলতে ইচ্ছে হল, ওদেব দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। বলল না। স্মিতাও কি বোঝে না, দরকার? বোঝে। কিন্তু কে দেবে, কখন দেবে?

জয়ন্ত বলে, "জানো, এবার বম্বের ট্রিপটা খুব সাকসেসফুল হয়েছে। কী বিরাট মার্কেট ওদিকে, তুমি ধারণা করতে পারবে না। কম্পিটিশন আছে তেমনি। তবে আমার সেটের দাম কম রেখেছি, আমার লেবারচার্জ কম, আমার ওভারহেড কম। আমার ল্যামিনেটেড ক্যাবিনেট—তার ডিজাইন, ফিনিশের সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারবে না। হাজার হোক, একসময় তো আর্টিস্ট ছিলাম। বিউটি কী জিনিস, আমি বুঝি।"

স্মিতা বলতে যাচ্ছিল তা হলে এবার বম্বেতে গিয়ে বসে থাকো, তার আগেই জয়ন্ত বলে, "আরেকবার শিগ্‌গির যাওয়া দরকার, ঠিকমতো সার্ভিসিংয়ের ব্যবস্থা চালু করে আসতে হবে।"

আলনা থেকে সরে এসে বিছানার কাছে দাঁড়ায় স্মিতা।

"তুমি বিউটির কথা বললে। অপরেশদা কী বলে জানো? সুন্দর যে, তার সামনে দাঁড়ালে পুরুষদের মন দু'ভাবে রিঅ্যাকট করতে পারে। হয় সে সুন্দরকে পুজো করবে, না হয় নষ্ট করবে।"

"আর মেয়েদের মন?"

স্মিতা এবার জয়ন্তর দুটো কাঁধে হাত দিয়ে বলে, "অপরেশদা বলে, সুন্দর দেখার চোখ মেয়েদের দেননি ঈশ্বর। যারা দেখতে চায়, তারা আয়না ফেলে দেখে।"

"তুমি মানো?"

"নাঃ। আমার মনে হয় সুন্দর বলে অ্যাবসলুট কিছু নেই। যা মন টানে, তাই সুন্দর।"

জয়ন্ত স্ত্রীর গোল ফরসা মুখটার দিকে তাকায়, তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বিশাল সবুজ টিপটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, যেভাবে লোকে চন্দ্রগ্রহণ দেখে সেইভাবে।

ওর বলতে ইচ্ছে করে তোমার অপরেশদা কী টাইপের পুরুষ? পুজো পুজো টাইপ, না নষ্ট টাইপ।
বলে, "আচ্ছা, আমি কী রকম প্রকৃতির লোক বলে তোমার ধারণা? পুজো না নষ্ট?
"নষ্ট।"
খাটে বসেই দু'হাত বাড়িয়ে স্মিতার খোলা কোমর জড়িয়ে ধরে জয়ন্ত। নাভিব ওপব চুমো খায়। নাভির একটু নীচে ফাটাফাটা চামড়ায় ও আলতো কবে দাঁত বসিয়ে দেয়। বলে, "এসো, তোমার ছিড়েখুঁড়ে নষ্ট করি সুন্দর।"
হাত দিয়ে মুখখানা ঠেলে সরিয়ে দেয় স্মিতা। বলে, "এখন নয়।"
সকালে অনেকক্ষণ ছেলেমেয়েব সঙ্গে ক্যারম খেলে জয়ন্ত। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সকলে একত্র শুয়ে ঘুম দিল। অকারণ সময় নষ্ট করছে, ওর মনে হল না। বিকেলে সাজগোজ করে বেড়াতে গেল ওরা। শংকরকাকা আইসক্রিম খাওয়াল। বেলুন কিনে দিল। ময়দানে খোলা আকাশের নীচে, জ্যোৎস্না-ঝরা ফুরফুরে বাতাসে গুনগুন করে গান গাইল স্মিতা।
বাড়ি ফিরে এসে শোনে, আর একটা সাপ মেরেছে বংশী।
"সেদিন থেকে তক্কে তক্কে আছি। যাবেন কোথায়। ওটাকে যেখানে পুড়িয়েছিলাম, সেখানটায়, পোড়া ঘাসগুলোর ওপর ঘুরঘুর করছিলেন ইনি। চলে যাচ্ছিলেন, আবার ফিরে ফিরে আসছিলেন।" বংশী ফলাও করে ওর বুদ্ধির গল্প শোনায়।
আগেরটার চেয়ে এটা যেন একটু ছোট। কিন্তু তেমনই সুন্দর। ভিটেব মধ্যে বিষধর সাপ পুষে রাখাব সত্যি কোনও মানে হয় না, জয়ন্ত স্বীকার করে মনে মনে, তবু সাপটার জন্যে ওর কষ্ট হয়। ওর গায়ে হাত বুলোতে ইচ্ছে কবে।
বংশীর দিকে চেয়ে বলে, "এটা বোধহয় মাদি।"
সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। নীচে নেমে গেছে বংশী। দোতলার এ-ঘরেও পুরোদমে পাখা চলছে। তবু ওদের ঘুম আসছিল না। অনেক কথা জমে গেছে দু'জনের, যে-কথা আর কাউকে বলা যায় না। যে-কথা রাত্রে শুয়ে দু'জন প্রণয়ী নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। অর্থহীন, এলোমেলো, আবোলতাবোল চিন্তাভাবনা অভিমানের কথা সেসব। ভাল্লাগেনাপনা। এসব কথা শুনিয়ে হাততালি পাওয়া যাবে না একটাও, বিক্রি হবে না একটিও টিভি সেট।
স্মিতা বলছিল, "ট্রুপ নিয়ে আমাদের বিদেশে যাবার কথা হচ্ছে। আমেরিকায়, ক্যানাডায়। প্রায় দু'মাস বাইবে থাকতে হবে। সেই সময় বাচ্চা দুটোকে একটু দেখো, বুঝলে।"
জয়ন্ত বলে , "তোমার ওই অপরেশদার সঙ্গে জুটি বেঁধে নাটক করা ছেড়ে দেওয়া যায় না?"
"তুমি পারো সব ছেড়েছুড়ে বাড়িতে বসে থাকতে?"
"ওটা আমাব জীবিকা।"
"ওটা তোমার আনন্দও বটে, যেমন অভিনয় করায় আমার আনন্দ। ছেড়ে দিলে আমার কাছে বেঁচে থাকার কোনও মানে নেই।" বলতে গিয়ে স্মিতার গলা ভেঙে যায়।
একটু চুপ করে থেকে জয়ন্ত বলে, "সাপ হয়ে জন্মালে হয়তো পারতে, মিঠু।" ধীরে ধীরে স্ত্রীর খোলা পিঠে, কোমরে হাত বোলায়।
"পারতাম। তুমিও পারতে। কিন্তু আমরা যে সভ্য মানুষ হয়ে পড়েছি। আমরা আর জোড়া সাপ হতে পারব না কোনওদিন।"

১৯৮২

মুড়ি

প্রথমে কথা ছিল, সিউড়ি থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে আমরা আসব। সেই গাড়িতেই মাসানজোরের আশেপাশে যা কিছু দেখার, দেখব ঘুরে। রাত্রে পাহাড়ের ওপর ময়ুরাক্ষী নদীর ধারে এই টুরিস্ট লজে বিশ্রাম। অর্থাৎ বিশাল প্রকৃতি-পরিবৃত নিস্তব্ধতা উপভোগ, খাওয়াদাওয়া ও ঘুম। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট মানে চা-জলখাবার খেয়ে সেই গাড়িতেই রওনা।

সরকারি পান্থনিবাসে থাকার ব্যবস্থা সুমনদা আগে থেকে করে রেখেছে। স্থানীয় লোক, অধ্যাপক, তা ছাড়া সাহিত্যটাহিত্য করে বলে সিউড়িতে ও একজন সম্মানিত ব্যক্তি। এসব সামান্য কাজ কলেজ থেকে একটা টেলিফোন করে দিলেই হয়ে যায়। মুশকিল হল গাড়ি নিয়ে। ওর যে-বন্ধুর গাড়িটা শুধুমাত্র পেট্রোলের দামের বিনিময়ে আমাদের আহমেদপুর স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছিল, সেটা গেল বিগড়ে। স্প্রিং ভেঙেছে বা ইঞ্জিনে ধুলো ঢুকে গেছে—এই রকম একটা কিছু। মোট কথা, গাড়িটা পাওয়া যাবে না, জানা গেল।

দিদি আর জামাইদার সঙ্গে আমিও বেড়াতে বেরিয়েছি। জামাইদা, সুমনদার বন্ধু, ছুটিছাটা বিশেষ পায় না। বা, নেয় না। হঠাৎ খেয়াল চাপল, তিন-চার দিন কলকাতার বাইরে কোথাও ঘুরে আসা দরকার, ওর দম আটকে আসছে। হাতের কাছে সিউড়ি, বন্ধুর নিজের বাড়ি। স্থান বা আতিথ্য—কোনওটারই অভাব হবে না। এবং সম্ভব হলে মাসানজোরটাও যদি সেরে আসা যায়। খানিকটা খোলা আকাশ, খোলা বাতাস। জায়গাটা অপূর্ব সুন্দর—অনেকেই বলে।

আমি ফাঁকতালে এই দলে ঢুকে পড়েছি। মাঝে মাঝে দুপুরের দিকে দিদির বাসায় ঢুঁ মারি আমি। মাংসটাংস রান্না হলে, খেয়ে যাই, পাঁচ-দশ টাকা ধার নিয়ে যাই। ধার ঠিক নয়, স্নেহের দান। দিদির একটা গুণ হল, এই ব্যাপারটা ও কাউকে বলে না। না জামাইদাকে, না বাবা-মাকে। ও তো বুঝতে পারে, আমার চাকরিবাকরি নেই, আর বাবার পেনশন থেকে আমার হাতখরচ জোগানো সম্ভব নয়। খানিকটা সহানুভূতি, খানিকটা কর্তব্যবোধ থেকে হয়তো পাঁচ-দশ টাকা আমায় জুগিয়ে যায় দিদি চুপচাপ। অনেক সময় না চাইতেই। একবার ভেবেওছিলাম, আমার স্নেহময়ী দিদির কাছে সত্যিকারের ধার হিসেবে হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে একটা ঠান্ডা খাবারের দোকান করব। ছাড়ানো মুরগি, হ্যাম, মাখন, চিজ, আইসক্রিম—এমনকী আভাজা চপটপ বেশ বিক্রি হয় আজকাল। কিন্তু হাতখরচটা বিনা পরিশ্রমে জুটে যাওয়ায় আর মুখ ফুটে কথাটা বলা হয়নি। অনেকদিন বেকার থাকলে উদ্যোগ কমে যায়।

সেদিন দিদি হঠাৎ বলল, "বকু আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবি?" আমি অবাক হলাম একটু।

"বেড়াতে? কোথায় কাশ্মীরটাশ্মির—"

"না, না, কাছেই। সিউড়ি। মাসানজোর ড্যাম দেখে আসব। তিন-চার দিনের ব্যাপার। চল না।"

আজকাল আমি একটু আলসে হয়ে গেছি। কোনও ব্যাপারেই তেমন উৎসাহ বোধ করি না। তা ছাড়া কলকাতায় থেকে, কাজ করে ক্লান্ত হয়ে যারা হাওয়াবদল বা বিশ্রামের জন্যে বাইরে বেরিয়ে যায় মাঝে মাঝে, আমি তো তাদের একজন নই। আমার কাজ নেই, ক্লান্তিও নেই।

আমি বললাম, "দুর, কী হবে—"

তবু এসেছি শেষপর্যন্ত। আর, স্বীকার করছি, এসে আমার খারাপ লাগছে না। ভ্রমণের ছোটখাটো উত্তেজনা তো আছেই, নতুন লোকজনের সঙ্গে মেশা, অন্য পরিবেশ, রুটিন ছাড়া একধরনের জীবন। মন ভাল করে। উপরন্তু, প্রায় আট-দশ বছর পর কাছাকাছি পেয়ে দিদিটাকে আবার নতুন করে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে।

গতকাল সকালে তাই যখন সুমনদা মুখটি কাঁচুমাচু করে এসে জানাল, গাড়িটা পাওয়া যাবে না, আমি দেখলাম, দিদির জ্বলজ্বলে মুখটাও কেমন নিবে গেল হঠাৎ। দেয়ালে ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দিদি ভিজে চুল আঁচড়াচ্ছিল। ঘরের কোণটায় আমি বসে ছিলাম মোড়ার ওপর। আয়নার মধ্যে দিদির তিনকোনা রোগাটে মুখটা দেখে কষ্ট হল আমার।

শূন্য চায়ের কাপ সামনে রেখে জামাইদা চুরুট টানছিল তখন। সাধারণত চুরুট খায় না, নতুন জায়গা বলে নতুন রকম। গায়ে গেঞ্জি, পাশ ফেরা, হাতের তেলোর উপর মাথাটা উঁচু করে রাখা। আমরা

দুপুরের খাওয়ার মেনু নিয়ে কথা বলছিলাম।

"কী হবে তা হলে?" আয়না থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জামাইদার উদ্দেশে দিদি বলল।

জামাইদা বলল, "এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না?

সুমনদা বলল, "যায়, তবে সব সময় না। আর ভাড়াও বেশি।"

"বাস?"

"বাস তো যায়ই। তবে জার্নিটা তোমাদের পক্ষে কষ্টকর হবে তা হলে।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "একটা রিকশা করে স্ট্যান্ডে গিয়ে বরং খবর নিয়ে আসি। কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।"

ঘরটা ছাড়িয়েই চওড়া বারান্দা। খাবার টেবিল। টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসে শুভ, সুমনদাদের ছেলে, একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছিল। ও বলল, "আমিও যাব।"

স্বপ্নাদি রান্নাঘরে লুচি ভাজছিল। সেখান থেকেই বলে উঠল, "খাবার খেয়ে যাবে।"

শেষপর্যন্ত আমরা বাসেই এসেছি। বসতে জায়গা পেয়েছি। একজন সাঁওতাল বুড়ির পাশে বসে দিদির অস্বস্তি হচ্ছিল প্রথমে। স্বপ্নাদির দিকে তেরছা হয়ে মুখ ফিরিয়ে ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে পশ্চার রাখতে পাবেনি। আসাটা যে হল, তাতেই ওর বিশেষ আনন্দ। আসার পথে কাল বেশ মজা হয়েছে।

প্রায় এক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে বাসটা দাঁড়াল। বাসের বনেট খুলে দিতেই হু-হু করে বাষ্প বেরোতে লাগল। শুভ তাই দেখে মন্তব্য করল, "বাস তো না, ঘোড়া।"

জায়গাটার নাম রানিশ্বর। খুব সুন্দর নাম না?

আমি আর শুভ তো আগেই নেমেছি, জামাইদাও নামল আমাদের পিছু পিছু। বলল, "দেখি চা-টা পাওয়া যায় কিনা।"

চারদিকে খোলা মাঠের মাঝখানে একটা ছোট বসতি এই রানিশ্বর। লাগোয়া একটা গ্রামও থাকতে পারে। এখানে আপ-ডাউন সব দূরের বাস এসে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেয়।

মন্থর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা খাবারের দোকানগুলো দেখছিলাম। চা, শিঙাড়া, তেলেভাজা, ফুলুরি। আর মুড়ি। জামাইদা তো মুড়ি দেখে লাফিয়ে উঠল। কলকাতা থেকে বেরিয়ে অবধি ওর মুড়ি খাবাব শখ চেপেছে। অথচ সুমনদাদের বাড়িতে কিছুতেই মুড়ি দেয়নি। লুচি, বেগুনভাজা, ওমলেট কিংবা ডিমসেদ্ধ, টোস্ট, বিস্কিট—জলখাবার বলতে এইসব।

সুমনদা স্বপ্নাদি দু'জনেই বলেছে, "সে কী, দু'দিনের জন্যে এসেছ তোমরা, মুড়ি খাবে কীসের দুঃখে? অভ্যেস নেই, চিবোতে চিবোতে রগ ব্যথা করবে, মাথা ধরবে।" সুমনদা আবার বন্ধুর সঙ্গে তার অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা তুলে একটু খোঁচাও দিয়েছে।

আমি ছুটে গিয়ে দিদিদের জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা চা খাবে কেউ? তেলেভাজা, মুড়ি?"

দিদি তার প্রবালের আংটি-পরা হাতটা তুলে লবল, "না বাপু। কোথাকার তেল, কোথাকার জল। আব যা ধুলো।"

স্বপ্নাদি বলল, "একটু চা খেতে পারি। মাথাটা ধরি-ধরি করছে।" ওপাশে বসা সুমনদাও সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

আমি ফিরে গিয়ে চায়ের ফরমাশ দিতে যাচ্ছি, দেখি, জামাইদা এক ঠোঙা মুড়ি-ফুলুরি হাতে, মুড়ি চিবোতে চিবোতে এই দিকেই আসছে, পাশাপাশি শুভ, তার হাতে আর একটা ঠোঙা। আমি আসতে বলল, "ছ'টা চা বলে এসেছি, বাসে সার্ভ করবে। এই নাও, গরম গরম। খুব ঝাল কিন্তু।"

কুখাদ্যের পাহাড় দেখে দিদি তো আঁতকে উঠেছিল। স্বপ্নাদি হাসছিল মৃদু মৃদু। তারপর এক মুহূর্তের মধ্যে জামাইদার ফুর্তি আর আমাদের উৎসাহ বাসে-বসা তিনজনের মধ্যে এমন সংক্রামিত হয়ে গেল যে চা পৌঁছোনোর আগে ঠোঙা খালি। দিদির ঝাল-লাগা ভেজা চোখদুটো দেখে আমার বেশ মজা লাগল। স্বপ্নাদি চুপচাপ মানুষ, শুভকে "আর খাসনি, আর খাসনি" বলতে বলতে নিজেই চার-পাঁচটা ফুলুরি খেয়ে ফেলল।

মাসানজোর, যা মশানজোড় বা জোড়া-শ্মশান নামের বিকৃত রূপ, জায়গাটার একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য আছে। তিন দিক ঘেরা পাহাড়, একদিকে ময়ূরাক্ষীর বাঁক। মেঘ আর নীল মেশা অনেকখানি আকাশ। জলে ও পাহাড়ের গায়ে এক-একবার মেঘের ছায়া পড়ে রং বদলিয়ে দিচ্ছে। আবার সরে যাচ্ছে মেঘ।

হঠাৎ কোনও দিকে হয়তো ঝাপসা হয়ে গেল পাহাড়ের দৃশ্য, তার মানে বৃষ্টি নেমেছে। পাহাড়ের ওপরে এই পান্থনিবাসটির খোলা বারান্দা থেকে প্রায় সমান লেভেলে বৃষ্টির ক্রমশ এগিয়ে আসা, সরে সরে যাওয়া, স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতায় আমরা মাথার ওপরে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামা দেখি, আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরা দেখতে পাই না। জায়গাটা সব দিক থেকেই ভাল—নির্জন, সুন্দর। শুধু ময়ূরাক্ষীর সরল চঞ্চল প্রবাহের ওপর একটা খাঁড়ার মতো বসে-যাওয়া বাঁধটা দেখলে দুঃখ হয়।

দোতলার বারান্দায় সাদা রং-করা বেতের টেবিলটার চারপাশে কতকগুলো সাদা বেতের চেয়ার। ওরা চারজন বসে ঝিমোচ্ছে এখন। আজও দুপুরে মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খাওয়া হল। একটু বেশিই খাওয়া হয়েছে সকলের । সারাক্ষণ, সেই সকাল থেকে, ট্যাং ট্যাং করে ঘুরে বেড়ালে খিদে পাবে না? শুভটা ধারেকাছে নেই । হয়তো নীচের লাউঞ্জে বসে ডিটেকটিভ বই পড়ছে। বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আমি বাইরের দৃশ্য দেখছি।

দেখছি আর ভাবছি, গত চব্বিশ ঘণ্টা সময় কী ভালই না কাটল। একা আমার না, সকলের। ওই যে ওরা এখন ক্লান্তি আর তৃপ্তির পূর্ণঘট হয়ে বসে আছে, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার বৈচিত্র্য পেয়েই তো ওরা ধন্য। এটা কি খুব বেশি কিছু পাওয়া? তা তো নয়। তবু অনেকেই পায় না, সচ্ছলতা থাকলেও পায় না। 'চাই চাই' বলে চিৎকার করতে করতে ছুটে বেড়ায় মানুষ, একবার ভেবে দেখে না, না চাইতেই কত কিছু পেয়ে বসে আছে।

কবিত্ব হয়ে যাচ্ছে, থাক।

ওদিকে চেয়ার টানার শব্দ হল। দিদির পায়ের ওপর রোদ এসে পড়ায় তন্দ্রা ছুটেছে। চেয়ার সরিয়ে পা তুলে বসল। জামাইদা নিবন্ত চুরুটটা ধরাবার চেষ্টা করছে।

বলল, "ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে নাও না।"

বন্ধ চোখটা একবার খুলে আড়চোখে চেয়ে দিদি বলল, "হয়েছে। কত দরদ!"

সুমনদা আর স্বপ্নাদি সামনাসামনি চেয়ারে পা ছড়িয়ে রয়েছে। মাথা চেয়ারের পিঠে হেলানো। চটি ছেড়ে সুমনদার পা দুটো স্বপ্নাদির শাড়ির আড়ালে ঢাকা পায়ের পাতার ওপর রাখা। এইভাবে ওবা পরস্পরকে ছুঁয়ে রয়েছে। চেয়ার সরানোর শব্দেও ওদের ঘুম ভাঙল না দেখছি। চেয়ারে-বসা দুটি দম্পতি কাল রাত্রে খুব প্রেম করেছে, বোঝাই যায়।

কাল সারা দুপুর ছবি তুলেছে জামাইদা। শুধু নিসর্গের ছবি ফ্ল্যাট হয়ে যায় বলে মানুষদের সঙ্গে মিশিয়ে তুলেছে। কোথাও হাফপ্যান্ট-পরা শুভ লাফিয়ে গাছের ডাল ধরছে, কোথাও দিদি-স্বপ্নাদি— মাথায় ঘোমটা। সুমনদাকে অনিচ্ছুক দেখে, জোর করে সস্ত্রীক হাতে-হাত, দিদির আর আমার একটা জোড়া ছবি। এই রকম অনেক।

স্বপ্নাদি প্রকাণ্ড হাতব্যাগের মধ্যে এনেছিল বিস্কিট, জেলি আর আপেল। একটা ছুরি। চুপচাপ মানুষ কিন্তু বেশ বুদ্ধিমতী। কাল বিকেলে তাই খাওয়া হল দল বেঁধে। ছুরিতে করে তোলা জেলি জামাইদার হাঁ-করা মুখে ফেলতে গিয়ে পড়ে গেল নাকের ওপর, তাই নিয়ে স্বপ্নাদির কী লজ্জা। অথচ জামাইদা বলেই চলেছে, 'তুমি ইচ্ছে করে নাকে ফেলেছ, না হলে আমার জলহস্তীর মতো হাঁ-মুখে একটা জেলির টুকরো এইম করা যায় না!' তাই নিয়ে হাসাহাসি, এমনকী, ওইটুকু ছেলে শুভ, সে-ও মায়ের পেছনে লাগল। সন্ধেবেলা গান হল ঢের। জামাইদার খেয়াল— প্রত্যেককে গান গাইতে হবে। হেঁড়ে গলায় নিজেই গান ধরল প্রথমে; সংকোচ কাটিয়ে দিল। অনেকদিন পর দিদির গলায় 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' শুনলাম।

রোদটা নামতে নামতে ওদের মুখের ওপর পড়েছে এবার। আর চোখ বুজে থাকা যায় না। হাতদুটো ছড়িয়ে সুমনদা আড়মোড়া ভাঙছে, দিদি হাই তুলল। বলল, "চা হলে হয়।"

এবার আমি কথা বললাম, "কিচেনে বলে আসব?"

জামাইদা বলল, "আমি যাচ্ছি।"

সাড়ে চারটের বাসে ফেরা । নামতে লাগবে পনেরো-কুড়ি মিনিট, সুতরাং আর এক ঘণ্টার মধ্যে এখানকার পাট চুকিয়ে উঠে পড়তে হবে, জামাইদা যেতে যেতে বলে গেল।

চা খেতে খেতে স্বপ্নাদি বলল, "বেশ কাটল একটা দিন।"

দিদি পেছন দিকে হাত ঘুরিয়ে খোঁপা জড়াচ্ছিল, বলল, "আবার সেই একঘেয়ে জীবন।" তারপর

একটু থেমে, স্বপ্নাদিকে, "আচ্ছা, সিউড়িতে ভিখিরি বিশেষ নেই, না?"

আচমকা প্রশ্নে সবাই একটু আশ্চর্য হলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হঠাৎ ভিখিরির কথা তোমার মনে হল?"

দিদি বলল, "সত্যি, কলকাতার কথা ভাবলেই ভিখিরিদের মুখ, গোঙানো চিৎকার মনে পড়ে যায়। গা শিউরে ওঠে।"

"ঠিক হয়তো খেতে বসেছ, অমনি—'মাগো, দুটো ভাত দেবে, মা কিছু খেতে দাও'—এই ডাক দিয়ে হেঁটে যাবে। ওই ডাক শুনতে শুনতে খাওয়া একটা অত্যাচার, নার্ভের ওপর অত্যাচার।" জামাইদা মুখ বিকৃত করল।

স্বপ্নাদি ছোট করে বলল, "নেই কি আর? আছে। তবে, তুমি যে রকম বললে, তেমন বীভৎস কিছু নয়। সাধারণ গরিব ভিক্ষুক যেমন হয় আর কী।"

"তার কারণ," সুমনদা যোগ দিল, "আজকাল সমস্ত গ্রাম মফস্‌সল থেকে দুঃস্থ অনাহারী লোক দলে দলে ভিড়েছে গিয়ে কলকাতায়। যারা পেরেছে, তারাই। ওদের ধারণা, কলকাতায় গিয়ে পৌঁছোতে পারলেই খাবার কষ্ট থাকবে না।"

"তাই হবে।" জামাইদা বলল। "তারপর ইট-পাথরের শহরটায় মাথা কুটেও যখন রোজকার খিদে মেটে না, তখন নানান রকম ট্রিক চালায়। গায়ে রং দিয়ে ঘা আঁকে, রোগা ছেলেকে কোলে নিয়ে গাড়ির জানলায় হাত পাতে, নাকি সুরে কাঁদে—দেখোনি এসব দৃশ্য?"

আমার মনে পড়ল, কিছুদিন আগে বাংলা কাগজে একটা চিঠি বেবিয়েছিল। তাতে বলেছে, ভিক্ষে দিয়ে মনুষ্যত্বেব অপমান না করে আমাদের উচিত, এইসব দরিদ্র লোককে দিয়ে কাজ করানো, কাজের বিনিময়ে মজুবি দেওয়া। কাজেব তো শেষ নেই। কলকাতায় জঞ্জাল সাফ করাই তো একটা প্রকাণ্ড কাজ। ভিক্ষে পাওয়ার অভ্যেস হয়ে গেলে আর কাজ করতে চাইবে কে? খুব ঠিক কথা। নিজেকে দিয়েই তো দেখছি। কথাটা মনে করে হাসি পেল।

স্বপ্নাদি জানতে চাইল, "ভিক্ষে দাও তুমি?"

"দিই মাঝে মাঝে। কাঁহাতক আর—"

"পুণ্যের লোভে, না দিয়ে উপায় আছে?" জামাইদা ঠাট্টা করে।

দিদি রেগে গেল হঠাৎ। প্রবালের আংটি-পরা হাতটা প্রশ্নের মুদ্রায় চিত করে ঘুরিয়ে বলল, "আমি কি মানুষ না? দুপুরে-রাত্তিরে অনবরত ওই মড়াকান্না শুনলে পাথরও ফেটে যাবে একদিন, আমি তো মেয়েমানুষ। তুমি পারো চুপ করে থাকতে! জানো," স্বপ্নাদির দিকে তাকিয়ে বলল, "ও একদিন তাড়া করেছিল লাঠি নিয়ে। আট-ন' বছরের একটা মেয়ে—ছুটে পালায় অবিশ্যি। কিন্তু যদি সত্যি একটা ঘা লাগত কী হত বলো তো?"

"কী আর হত? একটা ভিখিরি কমত—"

"আরে লোকেরা থুতু দিত তোমার গায়। নিজেরা চারবেলা পেট পুরে খাচ্ছ, বেশি দাম দিয়েও রুটিটা মাখনটা কেনার ক্ষমতা আছে—একদিন উপোস করতে হয় না। কী বুঝবে ওদের কষ্ট। শুধু রাগতে পারো, আর কিছু পারো না।" জামাইদাকে একচোট বকে দিদি থামল। তারপর একটু ভেবে বলল,—"তবে আমি পারতপক্ষে বাড়ির দরোজায় ভিক্ষে দিই না। তা হলে জোঁক হয়ে লেগে থাকবে। ডাক শুনলে দূরে রাস্তার মুখটায় পাঠিয়ে দিই যাতে জানতে না পারে কোথা থেকে আসছে।"

বকুনি খেয়ে জামাইদা থমকে গিয়েছিল একটু। সামলে নিয়েছে। মুখে অল্প হাসি ফুটিয়ে বলল এবার, "মিনু , তুমি ভাল করেই জানো, ওটা আট-ন' বছর বয়েসের মেয়ে ছিল না, তার চেয়ে বড়। রেলিং ডিঙিয়ে বারান্দায় ঘাপটি মেরে শুয়ে ছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠতেই উঠে দাঁড়াল, মনে নেই, কাপড়টা বুকের ওপর তুলে? ওকে ডেকে ভেতরে নিয়ে এলে, রাত্তিরে আমাদের ঘরে শুতে দিলে, তুমি কি খুশি হতে?"

সুমনদা চুপ করে ছিল এতক্ষণ। এবার উসখুস করে ওঠে। কাছেই রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো শুভর দিকে চায়, একবার পাশে-বসা আমার দিকে। তারপর বলে, "বাদ দাও এসব প্রসঙ্গ। আনন্দের দিনে খামোকা মন খারাপ করা।"

জামাইদা বলল, "এবার ওঠা যাক।"

স্বপ্নের মধ্যে প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আমরা নামলাম। ভাল বাংলায় 'অবতরণ' না বলে 'পতন' বললে আমাদের মনের ভাব খানিকটা বোঝানো যায়।

সাড়ে চারটের বাস তখনও এসে পৌঁছোয়নি। আমরা স্ট্যান্ডের আশেপাশে ঘুরতে লাগলাম। পাশে একটা ছোট মতন হাট বসেছে, সেখান থেকে জামাইদা একটা গামছা কিনে আনল—মাসানজোরের স্মৃতি। অন্য সময় হলে দিদি রাগারাগি করত, পয়সা নষ্ট। কারণ ওরা গামছা ব্যবহার করে না। কিংবা জামাইদা তাই নিয়ে দুটো ফুট কাটত। কিছুই হল না।

সুমনদারা তিনজন চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চিতে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। আমি আড়ালে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট খাচ্ছি দেখে জামাইদা শুধু বলে উঠল, "এই বকু, বেশ তো ফ্রি হয়েছিলে, ধরায় অবতীর্ণ হয়ে পুরনো অভ্যেসটা আবার চাড়া দিয়েছে?"

দূর থেকে বাসের ভেঁপু শুনে আমরা সবাই স্ট্যান্ডে গিয়ে জুটলাম। বেশ ভিড়। পরের বাস এক ঘণ্টা পরে আসবে জেনে আমরা এটাতেই ওঠা স্থির করলাম।

যাত্রীরা সবাই গ্রামের লোক। মেয়ে-পুরুষ কারোরই গায়ে বিশেষ আচ্ছাদন নেই। গরিব। বেশ কয়েকটি সাঁওতাল মেয়ে ও শিশু পরস্পরকে ধরে বাসের মেজেতে বসা। আমরা উঠতে কনডাক্টর একটু তৎপর হয়ে উঠল। সাঁওতালদের পুঁটলিপোঁটলা এদিক-ওদিক সরিয়ে পথ করে দিল। লেডিস সিট থেকে দু'জনকে নামিয়ে ভদ্রমহিলা দু'জনের জায়গা করে দিল, কেউ আপত্তি করল না। আমরা বাকি সবাই রড ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হু-হু করে ছুটছে বাস। ভেতরে গ্রাম্য যাত্রীদের শরীরের গরম, বোটকা গন্ধ মাঝে মাঝে এক ঝলক মেঠো বাতাস এসে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। যাত্রীরা নিজেদের ভাষায় কথা বলছে অনর্গল, বকাবকি করছে, ভাড়ার পয়সা নিয়ে কনডাক্টরের সঙ্গে তর্ক। আমরা চুপচাপ।

প্রায় সাড়ে ছ'টা নাগাদ আমাদের বাস যেখানে এসে দাঁড়াল, সেটা রানিশ্বর। কয়েকজন যাত্রী নেমে যাওয়ায় আমাদের তিনজনের বসার জায়গা হয়ে গেল। ফেরার সময়ে, দশ-পনেরো মিনিট থামবে জেনেও, আমরা এবার আর নামলাম না। আসার সময় যে-উৎসাহ ও ফুর্তিভাব ছিল, ফেরার সময় স্পষ্টতই তা নেই। স্বপ্নাদির বোধহয় মাথা ধরেছে।

বাইরেটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। দোকানগুলোয় টিমটিম করছে কেরোসিনেব আলো। সেই তুলনায় বাসের ভেতবের আলোর তেজ ঢের বেশি। ভেতরটা প্রায় নিঃশব্দ, বাইরে লোকেরা কথা বলছে।

বাসটা আবার কখন স্টার্ট নেবে, অপেক্ষা করছি, এমন সময় আমাদের চুপচাপ ভেঙে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "এই যে, আমি এসে গেছি, আপনারা পাঁচ পয়সা-দশ পয়সা সাহায্য করুন।"

চেয়ে দেখি, লাঠিতে ভর করে একটা লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। উঠে রড ধরে দাঁড়াল। লোকটা রোগা, তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস হবে, মুখটা একেবারে তোবড়ানো অথচ চোখদুটো জ্বলছে। স্বাস্থ্যহীন হলে যা হয় আর কী, কিন্তু জেদি টাইপ। পাগলও হতে পারে, আমি ভাবলাম।

এবং লোকটা খোঁড়া। একটা পা শুকিয়ে হাতির শুঁড়ের মতো ঝুলছে। লোকটা লাঠি হাতে, রড ধরে ধরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখলাম।

"এক্ষুনি বাস ছেড়ে দেবে, যার যা দেবার দিয়ে দিন। পাঁচ পয়সা-দশ পয়সা। ব্রাদার্স অ্যান্ড সিসটার্স, অন্তত মুড়ি খাবার পয়সাটা সাহায্য করুন।" লোকটা লাঠি উঁচু করে আমাদের উদ্দেশে বলল।

পাশে-বসা জামাইদার দিকে তাকালাম। জামাইদা ওর চোখে চোখ রেখে চেয়ে আছে। ভেতরে ভেতরে রাগছে বোধহয়। আমি ফিরে চাইলে পর খুব ধীরে বলল, "বদ্ধ পাগল, নয়তো বদমাশ।"

একটু দূরে সুমনদা এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়িয়ে যাবার জন্যে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। আমরা কেউ ভিক্ষে দেবার আগ্রহ দেখাচ্ছি না।

এবার খোঁড়া লোকটা লেডিস সিটে দিদিদের দিকে লাঠিটা উঁচিয়ে ধরল। আমাদেরই একমাত্র ভদ্রলোক ঠাউরেছে।

বলে উঠল, "দিদিরা, দেখছেন না, আমি ইনভ্যালিড। মুড়ি খাবার পয়সাটা অন্তত সাহায্য করুন। আপনাদের ক্ষমতা আছে, দেবেন না?"

দিদির সঙ্গে জামাইদার চোখাচোখি হল একবার। জামাইদাকে নির্বিকার দেখে দিদি যেন অস্বস্তিতে পড়েছে। স্বপ্নাদি দুটো আঙুল দিয়ে রগ টিপে রয়েছে, মুখ নিচু।

লোকটা আবার বলল, "কই দিন, আমি এক্ষুনি নেমে যাব। যার যা দেবার, চটপট দিয়ে দিন। আর সময় নেই।"

এক পায়ে দাঁড়িয়ে, এক হাতে বাসের রড ধরে, অন্য হাতের ছোট লাঠিটা একবার আমাদের দিকে, একবার লেডিস সিটের দিকে বাড়িয়ে, শুকনো খোঁড়া পা-টা দুলিয়ে দুলিয়ে ভিখিরিটা বারে বারেই বলতে লাগল, "আর সময় নেই। যার যা দেবার, দিয়ে দিন।"

আমরা কাঠ হয়ে বসে আছি, আমাদের হাত মুঠো করা, বন্ধ।

লোকটা আর একটু পরেই নেমে যেত, কিন্তু দিদি হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল। আমাদের সবাইকার নীরব চুক্তি ভেঙে, হাতব্যাগ খুলে, লোকটাকে একটা দশ পয়সার চাকতি দিয়ে ফেলল।

শেষপর্যন্ত জিত হল ভিখিরিটার।

দেখাদেখি স্বপ্নাদিও ব্যাগ খুলল, পয়সা দিল। আর একজন ফতুয়া-পরা যাত্রী—দেখে মোটেই সম্পন্ন মনে হয়নি—দিল দশ পয়সা। লোকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে, আমাদের সামনে দিয়ে ঠক ঠক শব্দ কবতে কবতে, পিছনের দরজা দিয়ে নেমে গেল।

আর তখনই স্টার্ট দিল বাস।

সিউড়িতে নেমে জামাইদা সর্বপ্রথম দিদিকে জিজ্ঞেস করল, "কেন ভিক্ষে দিলে লোকটাকে?"

দিদি বলল, "কী করব? যেভাবে চাইছিল, যেন না দিলে কেড়ে নেবে!"

"বেআদব। আমি আর একটু হলেই মারতাম।"

পাছে দিদি-জামাইদার ঝগড়াটা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে, সেই ভয়ে আমি দিদিকে বললাম, "ঠিক করোনি, ভিক্ষে দিয়ে তুমি কেড়ে নেওয়ার ঘটনাটা একদিন পিছিয়ে দিলে, জানো।"

১৯৭৪

❀ সভাপতি

ছেলেটি চলে গেল।

ছুটির দুপুরে নিভৃত বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত ঘটল, তবু কিছু মনে করেননি শুভপ্রসাদ। রাজি হয়ে গেলেন। আরও একটি ছুটির দুপুর এইভাবে নষ্ট হবে জেনেও। পঞ্চাশ বছর বয়সি দীর্ঘ শরীরটিকে ঈষৎ দোলাতে দোলাতে পুনরায় নিয়ে গেলেন শোবাব ঘরে, কিন্তু শয্যাগ্রহণ করলেন না আর। কোণে-রাখা পড়াশোনার টেবিল-সংলগ্ন চেয়ারটি টেনে তরুণী স্ত্রীর মুখোমুখি এসে বসলেন। খুব যত্ন করে, সময় নিয়ে, সিগারেটের প্যাকেট খুললেন, সিগারেট নিলেন, দেশলাই জ্বাললেন, ধরালেন, একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। শায়িত স্ত্রীর নধর মুখখানি বিরক্তি ও কৌতূহলে যথেষ্ট উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখে বললেন, "প্রধান অতিথি।"

"আবার!" তরুণী স্ত্রী, দোলন, ভুরু কুঁচকিয়ে বলে উঠল। তারপর তার হৃষ্টপুষ্ট শরীবটি নিয়ে উঠে বসল বিছানায়, বলল, "এরা জ্বালিয়ে খেল! রবীন্দ্র জন্মোৎসব কি অঘ্রাণ মাস অবধি চলবে?"

শুভপ্রসাদ উত্তর দিলেন না। সিগারেট-ধরা হাতটি ঈষৎ ঘুরিয়ে জানালেন, অগত্যা।

"এটা কোথায়? কবে?"

"রাধানগর পাঠাগার। পরের রবিবার।"

মাঝে মাঝে সভাসমিতির উৎপাতে বিরক্ত হলেও যশস্বী এই স্বামীটির জন্যে দোলন বেশ গর্ববোধ করে। তাঁর সাহিত্যকীর্তির অনেকটাই ওর বোধগম্য নয়, কিন্তু সাধারণ মানবিক দুর্বলতাময় এই মানুষটিকে দোলন যে আষ্টেপৃষ্ঠে চেনে, যিনি একদিকে যেমন বয়স্ক, গম্ভীর, সকলের শ্রদ্ধাভাজন, অন্য

দিকে আবার অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। এবং ছেলেমানুষ কখনও কখনও। কৌতুক বোধ করে দোলন।

প্রশ্ন করে, "তুমি না বলেছিলে, সভাটভা এবার কিছুদিন বন্ধ রাখবে? ঢের বক্তৃতা দেওয়া হয়ে গেছে এ-বছর?"

যেন কৈফিয়ত দিচ্ছেন, শুভপ্রসাদ বললেন, "বক্তৃতা দিতে পারব না, বলে দিয়েছি।" তারপর হেসে ফেললেন।

"বলে কী জানো? তা হলে রবীন্দ্রনাথের ওপর একটা স্বরচিত কবিতা। বললাম, কারুর ওপর আমি কবিতা লিখতে পারি না। যারা পারে, তাদের কাউকে গিয়ে ধরো। নাছোড়বান্দা। বেশ, তা হলে যে-কোনও কবিতা। আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে। সাহিত্যিক স্বরূপ ঘোষ বলে দিয়েছেন, যেমন করেই হোক, আপনাকে যেন রাজি করাই।"

"স্বরূপ ঘোষ?" দোলন প্রায় আঁতকে ওঠে নাম শুনে।

"সভাপতি।"

"উনি নাকি সভাটভায় যান না? তুমিই তো বলেছিলে?"

শুভপ্রসাদ বললেন, "হয়তো আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসছে।"

দোলন ঠাট্টা করল, "পুরনো বন্ধু।" তারপরই স্বামীর কাঁচাপাকা চুল-বেষ্টিত মুখের দিকে চেয়ে দেখল একবার। আহত হলেন না তো?

আহত হতে পারতেন শুভপ্রসাদ, কিন্তু হলেন না। একটা বয়েস পার হয়ে গেলে ক্রোধ, অভিমান, ঘৃণা—এইসব আবেগতাড়িত অনুভূতি কেমন মিইয়ে আসে। মানুষকে ক্ষমা করতে ইচ্ছে হয়। মনে হয়, কী অসহায় জীব এই মানুষ একটা অমূল্য জীবন কত রকম ভুল করে নষ্ট করে, অপচয় করে অর্থহীন কাজে। আবার এক-এক সময় এ-ও মনে হয়, এই যে ক্ষমা করার ইচ্ছে, উগ্র আবেগ এড়িয়ে চলার প্রবণতা বেশি বয়সে আসে, অন্তত তাঁর এসেছে, এটা মনের বার্ধক্যবশত নয়তো?

হোক বার্ধক্য, তবু স্বরূপের সঙ্গে দীর্ঘকাল পরে দেখা হবে, ভেবে ভাল লাগছে। পুবনো বন্ধু তো বটেই। যৌবনের যে-ক'টা বছর খ্যাতিহীন স্বরূপ ও শুভপ্রসাদ প্রায় একসঙ্গে, একই ছাদেব নীচে কাটিয়েছেন, তার স্মৃতি তো মুছে যায়নি। যশ, জনপ্রিয়তা ও অর্থ হঠাৎ সেই গরিব স্বরূপকে উদ্ভ্রান্ত কবে দিয়েছিল। বেপরোয়া। নিজের আগুনে নিজে সে পুড়েছে, সেই সঙ্গে কাছাকাছি মানুষদেরও পুড়িয়েছে। পুড়িয়েছে ঠিক নয়, ছ্যাঁকা দিয়েছে—শুভপ্রসাদ মনে করেন। তা ছাড়া, সুমিত্রাকে যে ধবে রাখতে পারেননি, তার জন্য নিজের মনে কোনও গ্লানি নেই শুভপ্রসাদের। সে কবি বা অধ্যাপকের স্ত্রী হয়ে থাকতে চায়নি। সে যা চেয়েছে, তাই পেয়েছে। আর স্বরূপ যদি সুখী হয়ে থাকে লোভী সুমিত্রাকে নিয়ে, তবে পৃথিবীতে অসুখী মানুষের সংখ্যা একজন কমেছে নিশ্চিত। যদিও সেই অর্থে সুখ কোনও শিল্পীর কাছে আসে না।

নিজের কথা ভাবেন শুভপ্রসাদ। যা গ্রহণ করে, তার নাম গৃহ। সেই গৃহ তিনি আবাব রচনা করেছেন, নারীর ভালবাসা তিনি আবার পেয়েছেন অযাচিতভাবে। কোনও দিক থেকেই তাঁর জীবন তো অপরিপূর্ণ থাকেনি শেষ পর্যন্ত।

বছর দুয়েক আগে হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য পথে দেখা হয়ে গিয়েছিল। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে স্বরূপ বলেছিল, "তোমার লেখা দেখি প্রায়ই কিন্তু কবিতা জিনিসটা কোনওদিন বুঝলাম না।" ওর হাসিতে কবিতা না-বোঝার লজ্জা ছিল না। ওর গাড়িতে একজন মহিলা ছিলেন যাঁর বয়স সুমিত্রার চেয়ে কম। ওর মাথা-ভরতি ছিল সেই আগের মতো নির্ভেজাল কালো চুল।

শুভপ্রসাদ ভেবেছিলেন বলবেন, "স্বরূপ, আমি তোমায় ক্ষমা করেছি, কিন্তু তার বদলে বলেছিলেন, "খুব দাপিয়ে লিখছ। আমি তোমার লেখা পেলেই পড়ি।"

প্রথমে ট্যাক্সি, তারপর ট্রেন, তারপর প্রাইভেট গাড়ি। কবি শুভপ্রসাদ সরকারকে নিয়ে দুটি ছটফটে তরুণ যুবক যখন রাধানগরে পৌঁছোল, তখন বিকেল পাঁচটা। দূর থেকে মাইকে রবীন্দ্রসংগীত শোনা যাচ্ছে। সন্ধে হয়নি, তবু সভামণ্ডপের আলো জ্বালানো। নীল-সাদা কাপড় দিয়ে ঘেরা, ত্রিপল-ঢাকা মণ্ডপ। বাইরে ইতস্তত ছড়ানো জনতা, সভা আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ওরা ভেতরে ঢুকবে না। উৎসবে আকৃষ্ট কিছু বালক-বালিকা খোলা মাঠে হুটোপুটি করছে। অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য। কলকাতার বাইরে যে-কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এই একই রকম চেহারা।

গাড়ি থামতেই একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। দৈর্ঘ্য অনুপাতে একটু বেশি মোটা শরীর। গরদের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম, নিশ্চিত কণ্ঠদেশের ওপর বসানো একটি প্রকাণ্ড মসৃণ গোল মুখ ও মাথা।

ভদ্রলোক দু'-হাত জোড়া করে নমস্কার করলেন। স্মিত হেসে বললেন, "আসুন, আসুন। আমাদের কী সৌভাগ্য।"

নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন মঞ্চে। নিচু তক্তপোশের ওপর সাদা চাদর পাতা। একপাশে হারমোনিয়ম ও তবলা। সামনে একটি দাঁড়ের ওপর লাগানো মাইকের মাউথপিস।

শুভপ্রসাদ জুতো খুলে আসরের কেন্দ্রে পা মুড়ে বসলেন। ভদ্রলোক বসলেন তাঁর পাশেই। জিজ্ঞেস করলেন, "পথে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

একটু অন্যমনস্ক শুভপ্রসাদ বললেন, "না।"

রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত বাজানো বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরের জনতা জড়ো হয়েছে ভেতরে।

আগের দিন যে-ছেলেটি নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিল, সে হঠাৎ মঞ্চে উঠে ঘোষণা করল, "আমাদের সভা এবার আরম্ভ হচ্ছে। যাঁরা বাইরে আছেন, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।"

শুভপ্রসাদ একবার ভাবলেন, তা হলে কি স্বরূপ শেষপর্যন্ত এল না? কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, কিন্তু প্রকাশ করলেন না।

একটু পরে সেই ছেলেটিই আবার মঞ্চে এসে ঘোষণা করল, "আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি বিখ্যাত কবি শুভপ্রসাদ সরকারকে। সভাপতিত্ব করবেন সাহিত্যিক স্বরূপ ঘোষ।"

বলতে-না-বলতেই একটি ছোট মেয়ে এসে শুভপ্রসাদকে মালা পরিয়ে দিল, আর একটি রজনীগন্ধার গোড়ে মালা পাশে-বসা বেঁটে ও মোটা লোকটির গলায়।

শুভপ্রসাদ স্বচক্ষে দেখলেন, লোকটা অম্লানমুখে হাঁড়ির মতো বিশাল মাথাটা একটু নামিয়ে সাহিত্যিক স্বরূপ ঘোষের মালাটা নিল। তারপর মেয়েটির গাল টিপে আদর করল।

জাল, জাল, এ জালিয়াতি। ইচ্ছে হল, সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠে, মাইকের মাউথপিসটা মুঠোয় ধরে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, এই লোকটা জালিয়াত, জোচ্চোর, আপনারা ভুলবেন না, আসল স্বরূপ ঘোষকে আমি চিনি, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্বরূপ ঘোষ আমার বন্ধু, এই লোকটা নাম ভাঁড়িয়ে সভাপতি সেজেছে।"

কিন্তু পারলেন না। ফুলের গন্ধের মতো সেই ক্ষমা কবার ইচ্ছেটা মাথার ভেতর ঢুকে সব গোলমাল কবে দিল। কেমন মজা লাগল তাঁর। দেখাই যাক না, লোকটা কীভাবে ব্যাপারটা চালিয়ে যায়। জনতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানটার দিকে ভাল করে তাকালেন আর একবার। গম্ভীর মুখ। সামনে অনুষ্ঠানসূচি লেখা একখানা কাগজ। একজন মাউথপিসটা মুখের কাছে এগিয়ে দিচ্ছে।

গান হল, আবৃত্তি হল, হে-কবিগুরু ধরনের স্বরচিত ছন্দ-ভুল কবিতাপাঠ, এমনকী চিত্রাঙ্গদা থেকে একফালি নাচ। শুভপ্রসাদ কিছুই দেখছিলেন না, শুনছিলেন না, ভাবছিলেন, কলকাতা থেকে এত কাছে একটা জায়গায় আর একজনও নেই যে আসল লোকটাকে চেনে! আশ্চর্য।

বলেছিলেন, বক্তৃতা করবেন না; ভেবেওছিলেন নিজের একটি ছোট কবিতা পড়ে উঠে আসবেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত ভাষণ একটা দিলেন শুভপ্রসাদ। রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা ভেবে নয় কিংবা উপস্থিত জনতাকে একটু শিক্ষিত করার জন্যেও নয়। ভাষণের শেষে বললেন, "আজকের অনুষ্ঠানে এসে সাহিত্যিক শ্রীস্বরূপ ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড় আনন্দ পেয়েছি। এই নামের অন্য একজন সাহিত্যিক আছেন, প্রসঙ্গত তিনিও আমার পরিচিত। দু'জন স্বরূপ ঘোষকে পেয়ে বাংলা সাহিত্য অবশ্যই দ্রুত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করবে।"

জনতার মধ্যে একটু চাপা হাসি শোনা গেল। আসন গ্রহণ করার পর কানের কাছে শুনলেন, লোকটা ফিসফিস করে বলছে, "ধন্যবাদ।"

এবং দেখলেন সভাপতির ভাষণে বেশ গড়গড় করে লোকটা অম্লানমুখে কিছু পরিষ্কার বাংলা বলে গেল, যা তিনি আশা করেননি। শুভপ্রসাদ পরে চিন্তা করে দেখলেন, এ-ই তো স্বাভাবিক। সভাপতির কাজগুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়েই তো সে এসেছে। দরকার হলে মুখস্থ করেছে কোনও বই থেকে।

অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একদল ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে ধরল : অটোগ্রাফ দিন, কিছু লিখে দিন, যা ইচ্ছে, আপনার কবিতার লাইন। খাতার ভিড় সামলে একটার-পর-একটা নাম সই করে গেলেন শুভপ্রসাদ সরকার।—"এত বড় নাম! সবাইকে সন্তুষ্ট করতে গেলে কিন্তু হাত ব্যথা হয়ে যাবে আমার।" একটি বেণী-দোলানো মেয়েকে বললেন। ব্যাপারটা অবশ্য অভ্যাস হয়ে গেছে। যে-কোনও সভাতেই সই-দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি নেই। আজকাল আবার ফ্যাশন হয়েছে: কিছু লিখে দিন, অর্থাৎ বিশেষ একটি, যা আর কারও থাকবে না। সেইটেই হয়েছে বড় মুশকিল। চট করে কোনও লাইন কি মনে আসে। এই অবস্থায়, কোলাহলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বহুপঠিত লাইনই মাথায় আসে না। এলেও, ভয় হয়, উদ্ধৃতি ভুল হলে আর রেহাই থাকবে না।

ক্লান্তিকর এই ব্যাপার আবার উপভোগও করেন শুভপ্রসাদ। কেউ তাঁর হাতের লেখা, নাম-সই, পেতে চাইছে, রেখে দেবে, বন্ধুবান্ধবকে গর্ব করে দেখাবে, বড় হয়ে অটোগ্রাফের খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে অনেক কথা, ঘটনা মনে পড়ে যাবে তার—এইসব ভাবতে মন্দ লাগে না। হয়তো চাপা আত্মপ্রসাদই বোধ হয়।

কী মনে হল, একবার গলাটা উঁচু করে পাশের দিকে চাইলেন। না, জাল স্বরূপ ঘোষ ওখানে নেই। সটকে পড়েছে। হয়তো অন্য কোথাও বসে সই দিয়ে যাচ্ছে—ভাবলেন শুভপ্রসাদ। ভেবে হাসি পেল।

"এইবার তোমরা ওঁকে ছেড়ে দাও," ভিড় সরিয়ে লোকটা একসময় এসে দাঁড়াল, "ওঁকে অনেক দূর ফিরতে হবে যে। রাত হয়ে যাবে।"

ছেলেমেয়েরা সরে দাঁড়াল। লোকটা বলল, "আসুন।"

যেতে যেতে লোকটা বলল, "একবার আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে হবে কিন্তু।" কী রকম অদ্ভুত মেয়েলি কণ্ঠস্বর লোকটার—এতক্ষণে লক্ষ করলেন শুভপ্রসাদ।

"আটটা বাজে। রাত হয়ে যাবে না?" বিনয় করে বললেন।

"একটু চা খাবেন। আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে দুটো কথা বলব। এই দুর্লভ সুযোগ যখন পেয়েছি।"

শুভপ্রসাদ আপত্তি করলেন না। লোকটাকে পছন্দ না করলেও সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

যে-গাড়িটায় চেপে স্টেশন থেকে এসেছিলেন, তাতেই দু'জন একটা দোতলা বাড়িতে এসে ঢুকলেন। বাড়িতে আর কেউ থাকে বলে মনে হল না।

বেশ বড়সড় ঘর। একদিকে এক সেট ছোট মাপের সোফা, লাল রেক্সিন, সেন্টার টেবিলে সবুজ ঢাকনা। অন্য দিকে একটা উঁচু টেবিল, একটা হাতল ছাড়া চেয়ার, টেবিলেও সবুজ ঢাকনা। তার ওপর কয়েকটা পত্রপত্রিকা গুছিয়ে রাখা। পুরু দেয়ালে গর্ত-করা শেলফ, তাতে কিছু বই। সোফায় বসে শুভপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

মোটা শরীর নিয়ে প্রায় হাঁসের মতো হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে লোকটি শেলফ থেকে একখানা বই পেড়ে আনল। মলাট খুলে সামনে মেলে দিয়ে বলল, "আমার জন্যে অটোগ্রাফ।"

আশ্চর্য হয়ে মধ্যবয়সি লোকটির মুখের দিকে চাইলেন, তারপর বইটা হাতে নিয়ে আরও আশ্চর্য হলেন শুভপ্রসাদ। তাঁর লেখা কবিতার বই। এ কবিতা পড়ে! আধুনিক কবিতাও পড়ে!

"আমি আপনার একজন ভক্ত পাঠক। আপনার সবক'টি বই-ই আমার আছে। আপনার লেখায় প্রবল কবিত্বের সঙ্গে তীব্র শ্লেষ এমন সুন্দরভাবে মিশে থাকে যে বার বার ফিরে ফিরে পড়তে হয়।"

নাম সই করতে গিয়ে বইটার পাতা ওলটাচ্ছিলেন, চোখে পড়ল মালিকের নাম: গোটা গোটা অক্ষরে শ্রীস্বরূপ ঘোষ। ভেতরে পাতায় পাতায় পঙ্ক্তির নীচে দাগ টানা। মার্জিনে বোকা বোকা মন্তব্য: অপূর্ব, তুলনাহীন, সাবাশ, নিষ্ঠুর—এইসব। বুঝলেন, এ জাল নয়, ডুপলিকেট।

আবার একটু ভয়ও পেয়ে গেলেন শুভপ্রসাদ। এই দ্বিতীয় স্বরূপ ঘোষ দীর্ঘদিন ধরে তাঁর পিছু নিয়েছে। একটার-পর-একটা কবিতার বই বেরিয়েছে আর কিনে ফেলেছে সঙ্গে সঙ্গে। পড়েছে খুঁটিয়ে। তাঁর পালাবদলগুলি লক্ষ করেছে। আর নোট করে গেছে পাতায় পাতায়।

"আমিই এদের বলেছিলাম, এ-বছর যেমন করেই হোক, কবি শুভপ্রসাদ সরকারকে আনতেই হবে।" দু'নম্বর স্বরূপ ঘোষ বলল।

এমন সাংঘাতিক পাঠকের সম্মুখীন কখনও হননি শুভপ্রসাদ। ভাবলেন, এবার যদি কোনও বিপজ্জনক প্রশ্ন করে? যদি খুন করে বসে হঠাৎ? কবিতা-পাগল যারা, তারা সবকিছু পারে, তিনি শুনেছেন।

ট্রে হাতে একজন সুদর্শন ভৃত্য প্রবেশ করে। দু'কাপ চা, একটি প্লেটে শিঙাড়া, সন্দেশ ও মিহিদানা। কাচের গ্লাসে জল। নামিয়ে রেখে চলে যায়।

সামনাসামনি সোফায় দু'জনে বসা। শুভপ্রসাদ বললেন, "আমি ভেবেছিলাম অন্যজন এই অনুষ্ঠানে সভাপতি।" বললেন না, এই রকম ব্যাপার জানলে আসতাম না।

"খুব নিরাশ হলেন, তাই না?"

"এখন মনে হচ্ছে, নিরাশ হইনি। আমার এমন নিবিড় পাঠক কোথাও আছেন, কল্পনা কবিনি।" বলে মনে হল, কথাটা না বললেই হত।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা বন্ধ থাকার পর শুভপ্রসাদ নিজেই আবার কথা পাড়লেন, "আপনিও লেখেন, অথচ আপনার লেখা আমার চোখে পড়েনি।"

"লিখতাম, এখন লিখি না," দু'নম্বর স্বরূপ ঘোষ ফিসফিস করে বলল, "যা লিখেছি, তার নিন্দে-প্রশংসা অন্যজন পেয়েছেন। তাঁরই তো বেশি নাম। একটা কবে বই লিখেছি, দু'-তিনটি এডিশন হয়ে গেছে, রয়্যালটি পেয়েছি। মনের আনন্দে লিখে গেছি। একদিন জানলাম, আমার প্রকাশক বইগুলো বিখ্যাত জনেব লেখা বলে চালাচ্ছে। সেদিন আমার চোখ খুলল।"

"কী কবে জানলেন?"

"একদিন লেখক নিজেই আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত। সঙ্গে একজন উকিল। খুব চোটপাট কবলেন। মামলা কববেন বলে ভয় দেখালেন। বললেন, জাল স্বরূপ ঘোষ তাঁর সুনাম নষ্ট করছে। আমি যত বলি, আমি জাল নই, জালিয়াতি আমার পেশা নয়, আমিও পিতৃদত্ত নামে লিখি, কে কার কথা শোনে! তারপর দেখলাম, একটা বইয়ে পাবলিককে সাবধান করে ভূমিকা লিখলেন। আমাকে এক কপি পাঠিয়ে দিলেন ডাকে। ভূমিকাটা পড়ে আমার নিজের ওপর কেমন ঘেন্না ধবে গেল। আমি চোর?"

দু'নম্বর স্বরূপ ঘোষের হাঁড়ির মতো মুখখানা কাঁদো কাঁদো। কুতকুতে চোখ দুটোয় জল চিকচিক করছে, শুভপ্রসাদ দেখলেন।

ধবা গলায় ও কথা বলতে লাগল।

"লেখা আমার জীবিকা নয়, জীবিকা ছিল না। একটা বই লিখে কতই বা টাকা পাওয়া যায় বলুন। আমার বাইস মিল আছে, দুটো পোলট্রি ফার্ম আছে, একা ব্যাচেলার মানুষ—দিন চলে যায়। লেখা আমাব আনন্দ।"

লোকটির প্রতি সহানুভূতি বোধ করতে শুরু করেছেন শুভপ্রসাদ। ওর কুৎসিত বেঁটে মোটা চেহাবাটা আর তত খারাপ লাগছে না। বললেন, "তা বলে লেখা ছেড়ে দিলেন একেবারে? নামটা একটু বদলে নিতেন না হয়। এই ধরুন স্বরূপচন্দ্র ঘোষ বা ওই রকম কিছু।"

চোখদুটি ভেজা, কিন্তু লোকটি হাসতে লাগল। বলল, "আমার প্রকাশক তা হলে ছাপবে কেন? বুঝলেন না, আসল জায়গাতেই তো ফাঁকি! সে-ই তো জালিয়াত, আমাকে ভাঙিয়ে খাচ্ছিল। লিখতে আমি পারিনি।"

পকেট থেকে নকশা-করা রুমাল বার করে লোকটি চোখ মুছল। বলল, "লিখতে না পারি, পড়তে তো কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি তখন এই লাইব্রেরিটা গড়ে তুললাম, জানেন। স্থানীয় ছেলেরা উদ্যোগী হয়ে ঘর বানাল, বই জোগাড় করল। আমি অনেক বই কিনে দিলাম। তাঁর বইও কিনেছি। লাইব্রেরিতে নিজের লেখা বইগুলো আর রাখিনি। তবু ওরা আমায় শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। আমারও অবসব সময় বইটই নিয়ে কেটে যায়।"

অস্বস্তিকর অবস্থা। পাঞ্জাবির হাতা উলটে ঘড়ি দেখলেন শুভপ্রসাদ। বেশ রাত হয়ে গেছে। বললেন, "এবার যাওয়া উচিত। অনেক দূর পথ।"

"তা বটে" লোকটিও উঠে দাঁড়াল চট করে, বলল, "তবে আপনি ভাববেন না, আমি নিজে আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দেব, ট্রেন ধরিয়ে তবে ফিরব। হেঁ হেঁ একটু সেন্টিমেন্টাল হয়ে গেছি, কিছু মনে করবেন না।"

শুভপ্রসাদ কিছু বললেন না। চুপচাপ ওর গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ড্রাইভারটা এখন নেই, দু'নম্বর স্বরূপ ঘোষ নিজেই চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল। পাশে শুভপ্রসাদ আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন। লোকটার মতলব কী, ঠিক বুঝতে পারছেন না। গা ছমছম করছে।

একটু পথ পার হবার পরে রাস্তাটা অন্ধকার। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে নিঃশব্দে, ঝিঁঝি ডাকছে বাইরে। শব্দ করে সামনের কাঁচে জল সরাচ্ছে একজোড়া ওয়াইপার। অন্ধকার নিস্তব্ধতার মধ্যে ওই খচখচ শব্দ।

গাড়ির গতি একটু কমিয়ে একসময় দু'নম্বর স্বরূপ ঘোষ তেমনই সুরেলা ফিসফিস স্বরে বলল, "আপনার সঙ্গে আমার যে দু'-একটা কথা ছিল, বলা হল না। শুধু নিজের কথাই বলে গেলাম।"

"বলুন, বলুন, কী কথা বলুন না। এখনই বলুন।" কথাগুলো দ্রুত বলে ফেললেন শুভপ্রসাদ।

"আপনার লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের," সামনের দিকে চোখ রেখে লোকটি বলতে লাগল, "তবে নিবিড় হয়েছে রাধানগর পাঠাগার গড়ে তোলার সূত্রে। অনেক বই ঘেঁটেছি, পড়েছি, পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু আপনার লেখা একসঙ্গে পেয়ে, পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে—এ-সব তো আমার কথা। যা বলতে চেয়েছি পারিনি, আমার হয়ে তা-ই আপনি বলে দিয়েছেন। আর বিশ্বাস করুন, আপনার এই দীর্ঘাকৃতি, পিছন দিকে নামানো চুল, বড় বড় চোখ—সব আমার কল্পনার ছবির সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। আপনি এই রকম হবেন, আমি জানতাম। তবে—"

"কী তবে?"

"মানে, আমার জানতে ইচ্ছে করছে," লোকটা থেমে থেমে বলল, "আজকাল আপনার লেখায়—মানে কবিতায়—সেই বিষ কই? সেই জ্বালা কেন পাচ্ছি না? আপনার এক-একটা লাইন বই থেকে লাফিয়ে উঠে আমার রগে ছোবল মেরেছে, অথচ আজকাল আপনার কবিতা কেমন মধুর মধুর। কেন এমন হচ্ছে—"

প্রশ্ন নয়, যেন কাতর মিনতির মতো শোনাচ্ছে কথাগুলো। শিউরে উঠলেন শুভপ্রসাদ। উত্তর দিলেন না। 'বিষ', 'জ্বালা', 'ছোবল'—এই শব্দগুলো বিঁধতে লাগল তাঁকে।

"উত্তর চাই না। ভক্তের কথাটা একটু ভেবে দেখবেন, কবি। বলে লোকটি তার বাঁ হাতটা স্টিয়ারিং থেকে সরিয়ে গদিতে রাখা শুভপ্রসাদের ডান হাতের ওপর রাখল। আবার শিউরে উঠলেন শুভপ্রসাদ।

সৌভাগ্য, তখনই স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোল গাড়িটা।

যখন বাসায় পৌছোলেন শুভপ্রসাদ, তখন রাত প্রায় এগারোটা। ট্রেন ঢিমেতালে এসেছে, হাওড়ায় ট্যাক্সি ছিল না। ঢুকে দেখলেন, দোলন না ঘুমিয়ে অপেক্ষা করছে। উদ্বেগে করুণ ওর কচি মুখখানি। দু'জনের খাবারই টেবিলে ঢাকা দেওয়া। লজ্জিত হাসি হেসে ক্ষমা চাইলেন।

তাঁর দীর্ঘ হাত দু'খানি দিয়ে স্ত্রীকে প্রায় বেঁধে, বুকের কাছে রেখে, রাত্রে অনেকক্ষণ শুয়ে রইলেন শুভপ্রসাদ। রাধানগর পাঠাগারের রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের গল্প বলতে লাগলেন। দু'নম্বর স্বরূপ ঘোষের কথা বললেন। শুধু বললেন না স্বরূপ ঘোষের সেই শেষ কথাগুলো—আজকাল আপনার কবিতা কেমন মধুর মধুর। কেন এমন হচ্ছে—সেই বিষ কই, সেই জ্বালা কেন পাচ্ছি না—তার বদলে বললেন, "দোলন, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো? বলো, আমি যেতে বললেও যাবে না?"

দোলন জিজ্ঞেস করে, "কেন এমন কথা মনে হচ্ছে তোমার?"

"আর একটা স্বরূপ আমার পিছু নিয়েছে জানো। আমার মনে হচ্ছে, ও আমায় সহজে ছাড়বে না। তুমি আমার সঙ্গে থেকো দোলন, না হলে আমি একা ওর সঙ্গে পারব না।"

কিছু বুঝতে না পেরে দোলন তার স্বামীর মুখের ওপর মুখটা চেপে ধরল। কথা বড় বাধা।

১৯৭৫

চেনা লোক

এক

এক-একদিন মাঝরাত্রে ধ্রুবর ঘুম ভেঙে যায়। ভেঙে গিয়ে আর আসে না। একবার এপাশ ফিরে শোয়, একবার ওপাশ ফিরে শোয়। পাশবালিশ আঁকড়ে পড়ে থাকে ঘাড় গুঁজে। একসময় বউকে জড়িয়ে পড়ে থাকত যেমন। স্নায়ুগুলো আজকাল আর আগেকার মতো শিথিল হতে পারে না। ভেতরে কুরকুরোয়। পতপত করে। মনে হয়, একটা ইঁদুর ঢুকেছে ঘরে। আগের জন্মের অর্ধভুক্ত লেপটাকে খুঁজছে। মাথার ভেতরটা ঘরের মতোই অন্ধকার।

পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ধ্রুব। অন্ধকাব হাতড়ে মশারির ছত্রি থেকে মাফলার টেনে গলায় জড়িয়ে নেয়। টেবিল থেকে তুলে নেয় টর্চটা।

ঘরে ঘরে মানুষ ঘুমে, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বন্ধ দরজাগুলোর ভেতর থেকে মৃদু ফোঁস ফোঁস শব্দ আসছে, ও টের পায়। ঘুমের কারখানা চলছে। ওরা কারা? ওরা কোথা থেকে এল? একদিন তো ওরা কেউই ছিল না, ওকে এমন করে ঘিরে রাখেনি। এক দুর্বল বালক পৃথিবীতে ছিল কেবল। শরীরের তুলনায় মাথাটা বড়, মাথায় উসকোখুসকো চুল। চ্যাপটা নাকের ওপর কালো ফ্রেমের চশমা ঝুলে পড়ত। চশমার কাচের পেছনে এক জোড়া মিনতি-মাখা চোখ। ফোলা ফোলা দুটো গাল, শীতকালে ফাটা খরখরে, তার ওপর ব্লু-ব্ল্যাক কালির ফিকে দাগ। কানের ভেতর ময়লা, ঘাড়ের পেছনে ময়লার ছোপ, হাঁটুতে স্থায়ী ক্ষত-ঘা। এই বালককে একজন কেউ অন্তত ভালবেসেছে, তার দু'খানা হাত দিয়ে, বুক দিয়ে, অন্তরের সমস্ত উদ্বেগ আব আশ্বাস দিয়ে আগলে রেখেছে। ওই অপটু বালককে অমনভাবে বেড়া দিয়ে না আগলালে ধ্রুবর মতো পলকা মানুষ কবে শক্ত মানুষদের জুতোর তলায় গেঁড়িগুগলির মতো পিষে যেত। ওই একজনই।

ছাদে এসে দাঁড়াতেই ধ্রুবর পায়েব নীচে সংসারটা উবে যায়। যেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে ও খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়েছে। আকাশে অনেক তারা, তারা ছাড়া আর কিছু নেই। ওরা যেন সর্বক্ষণ পরামর্শ করছে পরস্পরের সঙ্গে আর একজন একজন করে ফোঁটা ফোঁটা আলো ফেলছে ধ্রুবর চোখের ওপর। চশমাটা আনা হয়নি। আকাশের দিকে তোলা খোলা চোখদুটোয় যেন গোলাপজল দিচ্ছে কেউ, ধ্রুবর সেই রকম ভ্রম হল। ঠান্ডা, আবার একটু চিরচির করছে চোখের ভেতরটা। একটু পরে চোখের দু'পাশ দিয়ে দু'ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল। ওটা ভ্রম নয়।

মাফলার দিয়ে চোখের জল মুছল ধ্রুব। এদিক-ওদিক তাকাল একবার, যদিও ওর ধারেকাছে তখন কেউ নেই। নিজেই রয়েছে নিজের কাছে। নিজেকেই নিজে লজ্জা দিয়েছে কেঁদে। যাঃ বাবা, কথা নেই বার্তা নেই, ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম? হল কী?

ওই তারার দল, সংখ্যায় ওরা একলক্ষ তো হবেই, কতকাল ধরে আকাশে মিটমিট করে জ্বলছে। আরও কতকাল ধরে জ্বলবে। অথচ ওরা বলে, আকাশের দিকে তাকানো মানে অতীতের দিকে তাকানো। যা দেখছ, তার কিছুই এখন নেই, এক সময় ছিল। একসময় তো ওখানে অভাগীর স্বর্গও ছিল। ওই স্বর্গ থেকে দেবতারা মানুষের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। বীরের মতো কেউ মৃত্যু বরণ করলে, তাঁরা রথে চড়ে এসে তাকে তুলে নিয়ে যেতেন। যেমন রাবণের ব্যাটা ইন্দ্রজিৎকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যায় যুদ্ধে মরেছিল সে-বেচারা। পৃথিবীতে অন্যায়ের রাজত্ব তো এখনও চলছে, ধ্রুবর মনে হল, কিন্তু সর্বসন্তাপহরণ ভগবানকে আর তেমন করে অনুভব করা যায় কই।

ওরা বলে, মানুষের ইচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণতা না আসে ততদিন বেঁচে থাকা। অথচ তার শরীরের যন্ত্রপাতি তেমন মজবুত নয় যে, দুশো-তিনশো বছর সক্রিয় থাকবে। এখনও পর্যন্ত নয়, হয়তো একদিন হবে। এই অসম্পূর্ণ জীবনের দুঃখ হয়তো সবচেয়ে বড় বেদনার কারণ মানুষের। ফুটতে-না-ফুটতে কেন ঝরে যায়? সাধ মেটে না, তৃষ্ণা মেটে না, সময় পাওয়া যায় না প্রতিশোধ নেওয়ার। যে সফল হল, তার জয়যাত্রাও মধ্যপথে যায় থেমে। এত তোড়জোর করে তৈরি হওয়াটা অনেকটা বৃথা যায়।

ওরা বলে, ভগবান বলে কিছু নেই, কোনওদিন ছিল না। বা, ছিল, সেই একবার, তুমুল বিস্ফোরণের সময়। যা থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি। অমূর্ত এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ভগবান কেটে পড়েছেন। তারপর কোথায় কী হল, দেখার অবসর নেই তাঁর। উত্তাপ কমেছে একসময়, অনেক ক্ষয়, ধ্বংস আর অপচয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সৃষ্টিকাজ চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। কত কাল? কত বছর? ওরা বলে, পাঁচশো কোটি। ওরা বলে, তখন থেকেই, এলোমেলোভাবে নয়, এক নির্দিষ্ট নিয়মে, মহাবিশ্ব বেলুনের মতো ফুলে চলেছে। বেলুনের ফুটকির মতো এক সৌরজগৎ থেকে আর এক সৌরজগৎ দূরে সরে যাচ্ছে পরস্পরের থেকে, কিন্তু পালিয়ে যেতে পারছে না কেউ।

আমরাও আমাদের সৌরজগতে, আর সব গ্রহ-উপগ্রহ সহ এক নির্দিষ্ট টানে বাঁধা হয়ে আটকে আছি আর সঙ্গে সঙ্গে আপন আপন কক্ষ ধরে ঘুরছি। অদৃশ্য তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা যেন এক ট্রাপিজমণ্ডল। ওই এক লক্ষ তারার সঙ্গে ধ্রুব তার নিজের মাধ্যাকর্ষণ অনুভব করে। ওর পায়ের তলা শিরশির করে ওঠে।

একটু পরে ওর মনে হয়, পায়ের পাতার নীচে, গোড়ালি আর পাঁচ পাঁচ দশটা আঙুলের কেন্দ্রস্থল যেখানে, সেখানকার ছোট ছোট পেশিগুলো ক্রমাগত, ওর কোনও সচেতন চেষ্টা ছাড়াই, ছাদের জমি কামড়ে ধরছে। ওভাবে কামড়ে না ধরলে ধ্রুব দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। এ-ও তো মাধ্যাকর্ষণের শিক্ষা। খাঁচার মধ্যে টিয়াপাখি যেমন তার মুঠো দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকে দাঁড়টা, এ যেন তারই সূক্ষ্ম আর পরিমার্জিত রূপ। পরিমার্জিত বলে লুকোনো। মানুষ দেখায় যে, সে কত স্বনির্ভব। সে ইচ্ছে করলেই কত কিছু করতে পারে। আসলে সে আর সব প্রাণীর মতোই দুর্বল, স্বল্পজীবী, তুচ্ছ।

ছাদের দরোজা দিয়ে সিঁড়িতে ঢুকে ধ্রুব টর্চ জ্বালে। সঙ্গে সঙ্গে ওর সংসারখানা চারদিক থেকে ঘিরে ধরে ওকে।

"কোথায় গিয়েছিলে?"

"ছাদে।"

"এত রাত্তিরে?"

"ঘুম আসছিল না।"

"কাউকে ডাকলে পারতে। একা-একা—"

"সবাই তো ঘুমোচ্ছিলে তোমরা।"

"শরীর খারাপ লাগছে?"

"না।"

"একটা জেলুসিল খাও।"

"না।"

"কাম্পোজ?"

"না।"

"অদ্ভুত লোক তুমি। এই শীতের মধ্যে খালি-পায়ে কেউ ছাদে যায়?"

"কিছু হবে না।"

"হিম পড়ছে। ঠিক ঠান্ডা লাগাবে তুমি। জ্বর হবে। মা বলতেন, একটু ঠান্ডা লাগলেই তোমার জ্বর হয়। একটা ক্রোসিন খাও।"

"আগে জ্বর হোক। কথায় কথায় মরা মাকে টেনে আনো কেন?"

"যাও, বাথরুম থেকে ঘুরে এসো। জলটুকু খেয়ে নাও। আমাদের কথা শুনলে কোনও ক্ষতি হবে না। মাথার মধ্যে এক-এক সময় কী পোকা যে ঢোকে—"

"আকাশে তারা দেখছিলাম।"

"এইটা কি তারা দেখার সময়? কটা বাজে খেয়াল আছে?"

"দিনের বেলায় তো দেখা যায় না।"

"আর একটা বালিশ দেব?"

"না। মশারি গুঁজে দাও।"

"ঘুমিয়ে পড়ো, বুঝলে। এখনও চারঘণ্টা বাকি সকাল হবার। দরকার হলে ডাকবে। কাল আবার বাজার করার দিন। মাছ নেই আলু নেই।"

মাছ নেই, আলু নেই। আরও কত কিছুই হয়তো নেই। ছিল, ফুরিয়ে গেছে। আশ্চর্য, কী তাড়াতাড়ি সব জিনিস ফুরিয়ে যায়। কেন ফুরোয়? এই তো সেদিন দু'হাতে দুই ব্যাগ ভরতি করে আনাজ, তরিতরকারি, মাছ, মাংস, ফল, বিস্কুট, পাথরের মতো ভারী বড় বড় পাঞ্জাবের আলু, টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। নড়া খশে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। প্রতিবারই হয়। কিনতে কিনতে কেনার নেশা ধরে যায়। তখন আর খেয়াল থাকে না, বোঝাটা দুর্বহ হয়ে উঠছে। মনে হয়, কোনও রকমে একবার বাড়ির চৌকাঠ অবধি পৌঁছে গেলেই তো নিষ্কৃতি। ...সব ফুরিয়ে গেছে। রান্না করে খাওয়া হয়ে গেছে। ওগুলো খেয়ে ফেলার আগে মানুষগুলো যেমনটি ছিল, খেয়ে ফেলার পরেও ঠিক তেমনটিই আছে। একটু বদলায়নি। এক ইঞ্চি লম্বা হয়নি। এক কিলো মোটা হয়নি। কোথায় গেল এত ভিটামিন, প্রোটিন? এত গ্লুকোজ, এত কার্বোহাইড্রেট?

আধো-ঘুমের মধ্যে এইসব চিন্তা ধ্রুবর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। একটা প্রশ্নের লেজ থেকে আরেকটা প্রশ্নের মুড়ো গজিয়ে ওঠে। কোনওটারই উত্তর মেলে না। টেবিলের ওপরে রাখা টাইমপিস ঘড়িটা টক টক শব্দ করে। যেন চিন্তার সঙ্গে তবলার সংগত।

তবলার সংগত ক্ষীণ হয়ে আসতে-না-আসতে ও দেখে, সামনে একটা সার্কাসের দল। তাঁবুর খুঁটিগুলো টেনে টেনে তোলা হচ্ছে। মালপত্র বাঁধাছাঁদা করছে লোকেরা। বিশাল হট্টগোল। বেঁটেখাটো খাকি জামা পরা লোকগুলো ওর চেনা, অথচ ওর সঙ্গে কথাই বলছে না কেউ। সবাই খুব ব্যস্ত। সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না ধ্রুব। সে তাঁবুর পেছন দিকটায় চলে যায় এক মুহূর্তে। গিয়ে দেখে, একই রকম ব্যাপার চলছে সেখানেও। লোহার শিক লাগানো জন্তুজানোয়ারের গাড়িগুলোতে ঘোড়া জুতে দেওয়ার কাজ চলছে। কোন ঘোড়াটা কোন গাড়ির, এই নিয়ে বচসা, গালাগালি। ভাবটা, যেন ভাল্লুকের গাড়ির ঘোড়া গন্ডারের গাড়ি টানবে না। জেব্রার গাড়ির ঘোড়াকে বাঁদরের গাড়ি টানতে দিলে তার অসম্মান হবে। অদ্ভুত। জীবনে কিছুর সঙ্গে কিছু কি ম্যাচ করে? কোনওক্রমে কাজ চলে গেলেই তো হল। কে ওদের বোঝাবে।

চেনা লোকগুলো ওর সঙ্গে কথা বলছিল না, তাতে ভারী অস্বস্তি হচ্ছিল ধ্রুবর। ভাবছিল, একজনের গালে জোর থাপ্পড় মেরে বলে, কীরে, খুব রোয়াব নেওয়া হচ্ছে, না? কিন্তু সেই মুহূর্তেই কোথা থেকে ট্রাপিজের ফ্রক-পরা মেয়েটা বড় বড় বুক দুলিয়ে এসে হাজির। বলল, "আমরা চলে যাচ্ছি। ধ্রুবদা, আমরা চলে যাচ্ছি।"

"কোথায়? কেন?"

মেয়েটা লিপস্টিকরঙা ঠোঁট ফাঁক করে হাসে। মাথা দোলায়। আর বলে, "আমরা চলে যাচ্ছি।"

"আমি? আমি যাব না?"

"তুমি?"

"আমিও তো তোমাদেরই লোক।"

"বউ-ছেলেপুলে ছেড়ে তুমি আর কোথায় যাবে ধ্রুবদাদা?"

"আমার সংসার কী করে চলবে?" ধ্রুব কাতরভাবে জিজ্ঞেস করে।

"আমরা অন্য জোকার পেয়ে গেছি।"

জোকার? ধ্রুব ভাবতে চেষ্টা করে, সে কি জোকারের কাজ করেছে এতদিন? জোকার? যে নেচেকুঁদে, ডিগবাজি খেয়ে দর্শকদের হাসায়? না, না। সে তো অন্য কাজ করত। ট্রাপিজের খেলা দেখাত। সিংহের খেলা দেখাত হাতে চাবুক নিয়ে। নাকি, ও ভুলে যাচ্ছে? আসলে ও রিং-মাস্টার ছিল না? জোকারই ছিল? না জেনে এতকাল জোকারের কাজ করে এসেছে? আশ্চর্য।

একেবারে চুপসে গেছে ধ্রুব। ভয়ে, হতাশায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ও হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে, "তা হলে, এখন আমি কোথায় যাব স্যার?"

মুখ দিয়ে 'স্যার' শব্দটা বেরিয়ে যায় আচমকা। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ট্রাপিজের মেয়েটার জায়গায় হ্যাট-পরা সার্কাসের ম্যানেজার এসে দাঁড়ায়। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়।

"আমি এখন কোথায় যাব স্যার?"

"এখানে একটা দুর্গাবাড়ি আছে না?"

"হ্যাঁ।"

"সেখানে গিয়ে মায়ের নাম করো।"

"মায়ের নাম?"

"হ্যাঁ। তিনি তো বিপত্তারিণী। জগদম্বা।"

ওরা চলতে শুরু করে। সামনে হ্যাট-পরা ম্যানেজার, তার পাশে ট্রাপিজের মেয়েটা। ওরা হাত ধরাধরি করে হাঁটে। ওদের পেছনে হাতির দল, উট, জিরাফ। উঁচু উঁচু গলা। তার পেছনে জন্তুজানোয়ারের গাড়ি। সার সার। ঘোড়ায় টানা। ঘোড়াগুলো আস্তে আস্তে হাঁটছে।

ধ্রুবর মাথার মধ্যে তখন আর কোনও চিন্তা নেই। কেবল ভাবছে, মাছ নেই, আলু নেই। এখুনি বাজার যাওয়া দরকার। বাজারে সকলে ওকে চেনে। আজ কুড়ি বছর ধরে ও এখানে বাজার করছে। দু'হাতে খালি ব্যাগ নিয়ে হাজির হলেই ওরা হইহই শুরু করে দেয়। ব্যাগ ভরে দেয়।

কতদিনের চেনা লোক। চেনা লোক। টাকা না থাকলে বলে, "পরে দিয়ে যাবেন। আপনাকে দামের কথা বলেছি?"

দুই

গভীর উদ্বেগ নিয়ে চোখ খুলল ধ্রুব। চোখের সামনে নীল রঙের মশারির চাল। হলুদ মোটা খেশ দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা। টেবিলের ওপর টাইমপিস ঘড়িটা টক টক শব্দ করছে। নাঃ, সব ঠিক আছে। ওকে ছেড়ে দিয়ে সার্কাস পার্টির চলে যাওয়াটা তা হলে স্বপ্ন। সত্যি, কী নিষ্ঠুর ব্যবহার ওদের। কাদের? ঠিক মনে পড়ছে না এখন। ওরা অনেক লোকজন ছিল, অনেক জন্তুজানোয়ার, রাশি রাশি স্তূপীকৃত তাঁবু—আর ঘোড়ার গাড়ির সারি। আর কী? একটা ফাঁকা মাঠ, মাঠে জায়গায় জায়গায় গর্ত। গর্তগুলো স্পষ্ট চোখে ভাসছে। মানুষগুলো অস্পষ্ট, আবছা। অভদ্র।

পা দিয়ে খেশটা সরিয়ে দিল গা থেকে। একটু ঘেমেছে। গলার কাছটা ভিজে ভিজে। গায়ের গেঞ্জিটা ছেড়ে আর একটা গেঞ্জি পরতে হবে। ক'টা বাজল? সাতটা পাঁচ। আর শুয়ে থাকার মানে হয় না। অন্য ঘরেও মানুষ জাগার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাথরুমে খ্যাক খ্যাক করে কাশছে কেউ। কে আবার! ছোট ছেলেটা। সস্তার সিগারেট খায়। মর্নিং কাফ হবেই। পঁচিশ বছর বয়েস হয়ে গেল, একটা স্থায়ী কাজ নেই। তেমন চেষ্টাও নেই। এদিক-ওদিক দালালি করে বেড়ায়, বাড়িতে খোরাকি বাবদ কিছু টাকা ফেলে দেয়। ব্যস। দায়িত্ব শেষ। মুখে লম্বা লম্বা কথা। অমুক কোম্পানির এম ডি তমুক কোম্পানির জি এম সব কমল বলতে অজ্ঞান। কোথায় কী আটকে গেল, কমলকে বোলাও। এ সি ফার্স্ট ক্লাসের চারখানা টিকিট চাই, কালকের কালকা মেলে, কমলকে বোলাও। ওর কনট্যাক্ট আছে। এখন বাথরুমে ঢুকে খ্যাক খ্যাক করে কাশছে। কোনদিন চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে যাবে। লুকিয়ে লুকিয়ে যদি দুটো পয়সা জমায় তো ভাল।

ওদের মায়ের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? হাঁপানিটা বেড়েছে নাকি? নাঃ, ওই তো। কাপডিশের টুংটাং আওয়াজ আসছে ক্ষীণ। চা হচ্ছে। একটু পরেই কেউ-না-কেউ এক কাপ চা নিয়ে ঢুকবে ঘরে। ব্যাটারি চার্জ করতে ওই চা-টুকু দরকার। তারপর একছুটে বাজার।

বাজার করতে ওদের ঘেন্না করে। ধুলো, মাটি, কাদা। মাছের আঁশটে গন্ধ। কারে পড়লে করে, ভালবেসে ওরা কেউ বাজারে ঢোকে না। ধ্রুবর মনে হয়, কাল মধ্যরাত্রে ছাদে উঠে ও যে বিশাল একটা তারা-ভরা আকাশ দেখল, বাজার তারই এক খুদে সংস্করণ। মৃত নয়, জীবিত। মানুষ একটা বৈচিত্র্যহীন ছোট পরিধির মধ্যে ঘোরে। ওখানে কত বৈচিত্র্য, কত রং, কত রূপ ঠাসাঠাসি করে রাখা। না ছুঁলে তার প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যাবে কী করে। এক-একটা ফল, সবজি, ডাঁটা—প্রকৃতির কী অপরূপ কারুকাজ, তার মধ্যে, কেবল টাকাপয়সা ফেলে সেগুলো ব্যাগে ভরে ফেলা যায় বলে কি তাদের মূল্য কমে যায়?

বাজারে ঢুকতেই ফরিদাবিবির সঙ্গে চোখাচুখি হয় ধ্রুবর। মাথায় ঘোমটা। রোগা শুকনো মুখ। চোখে কাজল। ফরিদাবিবি মিসি-মাখা তরমুজের বিচির মতো কালো ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসে। অভ্যর্থনা

জানায় ধ্রুবকে। ওর সামনে একটা ঝুড়ির ওপর একরাশ ডিম।

"বাবু, ডিম নেন।"

"কত করে জোড়া?"

"এক টাকা আশি। আপনার জন্যি সত্তর।"

একটা ডিম তুলে নেয় হাতের ওপর। কী মসৃণ, নিটোল, আর সাদা। সবটা মার্বেলের মতো সাদা নয়। একটু একটু ময়লা শুকিয়ে আছে গায়ে। বসা-মুরগি যেখানে ডিম পাড়ে, সেখানেই হাগে। শরীর থেকে ফল আর মল বেরোবার পথদুটো খুব কাছাকাছি কিন্তু শরীরের মধ্যেকার কারখানা দুটো একদম আলাদা। শিল্পকর্ম আর গাদ একই জায়গায় গিয়ে পড়ে। মানুষ আসল বস্তুটি তুলে নেয়। এই ডিমের খোসা কী দিয়ে তৈরি? চুন। বেশ শক্ত আর পিলফার প্রুফ। তার মধ্যে কী অদ্ভুত নিরাপত্তায় রাখা আছে একটি প্রাণকুসুম। এই ডিমে মা যদি তা দিত, তো বাচ্চা হত। এখন আর হবে না। মানুষ ছুঁয়েছে, এখন এটা মানুষের খাদ্য। সিদ্ধ করে, ভেজে, বড়া বানিয়ে, যেভাবে খুশি খাও। অতীব সুস্বাদু। পুষ্টিকর। একটা বোকা মুরগি অবলীলায় একটাব-পর-একটা সম্পূর্ণ ডিম পেড়ে যায়, ধ্রুব ভাবে, কই মানুষ এই রকম একখানা পিস তার অভিজাত কলকারখানায় তৈরি করুক না দেখি। কত মুরোদ।

"এক টাকা ষাট হলে ছটা দাও", ধ্রুব দর কমাবার চেষ্টা করল। ফরিদাবিবি ঠোঙা বার করছে, তার মানে, দেবে। ধ্রুব একটি একটি করে ডিম বেছে, তুলে ঠোঙায় রাখল। হাতে ধরলেই বোঝা যায় কোনটা পচা। তবে ফরিদার কাছে সাধারণত পচা ডিম থাকে না। আর এখন শীতকাল, ডিম চট করে পচেও না। ডিম তুলতে তুলতে ওর মনে হল, এক-একটা আশি পয়সা মাত্র। মানুষের হাতে তৈরি এক-একটা মোড়া কি ত্যাড়াব্যাঁকা ঝুড়ি—তার দাম ছ'টাকা, সাত টাকা। সেই হিসেবে ডিমের দাম আটশো টাকা জোড়া হওয়া উচিত। এর যা ফিনিশিং।

নিতে গিয়ে মনে হল, আরে, আগেই ডিম নিল কেন। সব কেনাকাটা বাকি। যতক্ষণে শেষ হবে, ততক্ষণ এগুলো কি আস্ত থাকবে?

বলল, "তুমি রেখে দাও ঠোঙাটা। ফেরার পথে নিয়ে যাব।"

ফবিদা বলল, "দামটা দিয়ে যান বাবু। চারটাকা আশি। সরিয়ে রাখছি।"

হাসল ধ্রুব। বুড়ি ভয় পাচ্ছে, পাছে অন্য কারও কাছ থেকে ডিম কিনে অন্য গেট দিয়ে বেরিয়ে যাই। আরে, এত ভুলো মন এখনও হয়নি আমার!

পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, অমনি ফলের দোকানের মানিক ডাকে, "বাবু, আসুন।"

"কী দর কমলা?"

"এক ডজন দিই?" মানিক স্মার্ট হবার চেষ্টা করে। বলে, "আসল দার্জিলিং। একেবারে চিনি!"

বলে কমলালেবুর সাজানো স্তূপের দিকে হাত বাড়ায়। ধ্রুবর হাসি পায় ওকে দেখে। ছোকরা খুব সেয়ানা হয়েছে। বছর চারেক হল ও দোকানে বসছে, তার আগে ওর বাবা বসত, নিতাই। নিতাইয়ের সঙ্গেই ছিল ধ্রুবর আসল খাতির। এ-ব্যাটার লয়্যালটির ধারণা নেই। এ-যুগের ছেলে, সব খদ্দেরকে সমান চোখে দেখে, কারুর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না। হাতে ঘড়ি, নাকের তলায় একজোড়া কালো গোঁফ, ছোঁড়াটা বেশ ফরসা। বাংলা খবরের কাগজ পড়ে। বাপটা অকালে না পটল তুললে হয়তো এতদিনে কলেজে পড়ত।

"তোকে তুলতে বলেছি?"

"নেবেন তো।"

"জিজ্ঞেস করলাম, কী দর। এর জবাব না দিয়ে পাকামি করতে তোকে কে বলেছে, এ্যাঁ? দার্জিলিং কি নাগপুর, ওর চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছে।"

বকুনি খেয়ে ছোকরা হেঁ-হেঁ করে হাসে। বলে, "তিন টাকা জোড়া।"

"টাকা টাকা হয়, তো ছটাই দে।"

"মরে যাব কাকাবাবু।"

ধ্রুব একটা কমলালেবু ছুঁয়ে দেখে। আলতো করে গাল টিপে দেখে। নাগপুরের লেবুতে একটু সবুজের ছোপ থাকে, আরও টাইট হয়, নাভির জায়গাটা ড্যাবলা। এ হয়তো অন্য কোথাওকার। মহিশূর? আজকাল নানা রকম ব্রিড চাষ হচ্ছে তো। বোঝা মুশকিল। কার্বাইড মেরে সবুজ জিনিস হলুদ

করে দেয়। গাছপাকা বলে এখন আর কিছু নেই।

মানিক বলল, "দুশো ষাট টাকা ঝুড়ি কেনা। মাইরি বলছি।"

"থাক গে। মর্তমান কলা কী দর বল। জোড়া কলা আছে?'

"এই ছড়াটায় দুটো জোড়া আছে। দিয়ে দিই? পাঁচ টাকাই দেবেন। আর, কমলা নেবেন না কাকাবাবু?"

ঘন ঘন কাকাবাবু বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। শেষকালে পনেরো টাকায় রফা হল। পনেরো আর পাঁচে কুড়ি টাকা।

জোড়া কলা আসলে দুটোই কলা, যমজ। সিয়ামিজ টুইন যাকে বলে। অনেকে খায় না। খেলে নাকি মেয়েদের পেটে জোড়া বাচ্চা হয়, এই রকম। ঠাকুরদেবতার পুজোতেও জোড়া কলা অচল। মানুষের অন্ধ সংস্কার। সুতরাং বাজারে ওরা একটা কলার দামে দুটো দিয়ে দেয়। মানুষের কুসংস্কার ভাঙিয়ে এই ফায়দাটুকু উঠিয়ে নেয় ধ্রুব। কলার ছড়াটা রাখতে গিয়ে একটু টিপে দেখে, কাল তৈরি হবে। একটু শক্ত আছে বোঁটার কাছে।

দু'ধারে শাকপাতা, নারকোল, বড়ির দোকান ছাড়িয়ে এগোতে থাকে। ওরা ডাকে, ধ্রুব কান দেয় না। জায়গাটায় কাদা প্যাচপ্যাচ করছে। একটা নালার মুখ উপচে উঠেছে। চপ্পল বাঁচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। এই জন্যেই পেটের অসুখ হয়। আমাশা, আন্ত্রিক। এত বড় একটা মার্কেট, এর ময়লা জল নিষ্কাশনের কোনও সুব্যবস্থা নেই।

খোকনের স্টলটার সামনে পৌঁছে নিশ্চিন্ত বোধ করে ও। খোকন খোশামোদ করে না, কাকাবাবু, মেসোমশাই বলে খদ্দের ভজায় না বটে, তবু ওর স্টলে লোকে যায়, তার কারণ ওর স্টক ভাল। অনেক আইটেম রাখে আর বাছা বাছা সব জিনিস। বাজারের সেরা সবজি, সবচেয়ে যা টাটকা, পরিষ্কার—ওর দোকানে। একটু দাম বেশি হয়তো, তা হোক।

বেগুনের গা ঘেঁষে দাঁড়াতেই ওর দিকে ছোট চ্যাঙারি ছুড়ে দেয় খোকন। মুখে ওর বসন্তের দাগ। বাঁ হাতে একটা আঙুল বেশি। তাতে লজ্জা পায় না খোকন। খাটিয়ে ছেলে। টাকা ফেলে টাকা তোলে। ছোট ভাইটাকে সঙ্গে লাগিয়েছে। চাপা পাতলুন চড়িয়ে, জুলপি কামিয়ে ভাইটা বখে যেতে বসেছিল, ঠিক সময় ও ভাইয়ের লাগাম ধরেছে। একটা বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। ব্যস। বন্দি। এখন খাটো ধুতি আর গেঞ্জি পরে সে দাদাকে সাহায্য করে।

খোকনের উদ্যোগ আর সহিষ্ণুতার তারিফ করে ধ্রুব। নিজের ছেলে হলে ওকে একটা ভাল লাইন ধরিয়ে দিত। এরা মহাজন আর পাইকারদের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। এদের নিজস্ব মূলধন নেই। এরা ধারে মাল নেয়, মাল বিক্রি করে, ধার শোধ করে। খোকনের কথা ভেবে ধ্রুব একবার ব্যাঙ্ক থেকে এদের অর্থসাহায্য দেবার প্রস্তাব করেছিল। যাতে স্বনির্ভর হতে পারে এরা। সুবিধে হয়নি। দু'-চারশো টাকার দাদনে ব্যাঙ্কের আগ্রহ নেই আর এদেরও বন্ধক কি জামিন দেওয়ার মতো বিষয়সম্পত্তি থাকে না বড় একটা। যা রোজগার করে, খেয়ে ফেলে। মূলধনও খেয়ে ফেলে না বুঝে।

"আপনি সিকিউরিটি দেবেন?" ব্যাঙ্কের ম্যানেজার গ্রামভারি চালে জিজ্ঞেস করেছিল।

না, না, ও দেবে কেন। ও তো দেশ উদ্ধার করতে নামেনি। ধ্রুব ভেবেছিল, আজকাল কত রকম স্কিম নিয়ে গরিবদের সাহায্য করার চেষ্টা হচ্ছে। লোন মেলা হচ্ছে কৃষকদের জন্যে। শহরের মধ্যেখানে এই বাজার, বাজারে দু'-তিনশো স্টল, এই লোকগুলোর জন্যে কিছু করা যায় কিনা। এরা কেউ টাকা মেরে পালাবে বলে মনে হয় না। কোথায় পালাবে? দেখছ না, সারাটা দিন এরা ওই বাজারেই পড়ে থাকে। ওখানেই তোলা উনুনে রাঁধে, খায়, দুপুরে বস্তা পেতে ঘুম দেয় এক চুমুক। রাত্রে ঝাঁপ বন্ধ করে তবে বাড়ি ফেরে কোনও শহরতলিতে। এই তো এদের বাঁধাধরা জীবন। কী হিন্দু, কী মুসলমান, সব একরকম।

বেগুনের ওপর হাত রাখে ধ্রুব। নিটোল গোল কালো বেগুনই ওর বেশি পছন্দ। এরা বলে মুক্তকেশী। পোড়া খাও, ভাজা খাও, খুব মিষ্টি। বাইরেটা আঁটোসাঁটো। বোঁটার কাছে পাতাকাটা বাহার। একটা বেগুন বেছে নিয়ে দেখল, রংটা চকচক করছে। তেল মাখিয়ে এনেছে বুঝি। শূন্যে ছুড়ে দিয়ে একবার লুফে নিল—খপ্। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—নিগ্রেস। না কালো নয়, বেগুনের রং বেগুনি, গাঢ় বেগুনি। কোথা থেকে এই রং পায়? সূর্যের আলোয় সাত সাতটা রং, বেগুন কি তবে শুধু প্রথম রংটা

শুষে নিয়ে বাকি রংগুলো ফিরিয়ে দেয়। অথচ বেগুনগাছের পাতা সাধারণ সবুজ। কতটুকু সব গাছ, গাছ তো নয়, চারা। ও দেখেছে, দু'ফুটের চেয়ে উঁচু হয় না। আর সেই দুর্বল মা-গাছকে ধরে ঝোলে ইয়া ইয়া প্রকাণ্ড ফল। ওইটুকু মায়েব শরীব থেকে রস চুষে তাকে মেরে ফেলে প্রায়। মেরেই ফেলে। লাউও বড় কিন্তু লাউয়ের মা লতায়, তার একটা সাপোর্ট থাকে, সে পারে। কাঁঠালের মা—সে নিজেই এক বিশাল বৃক্ষ। চল্লিশটা ফল শবীরের থেকে ঝুললে ওব কিছু আসে-যায় না। মাধ্যাকর্ষণ উপেক্ষা করে সটান এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকাব ক্ষমতা সে রাখে। বছরের পর বছর। বেগুনগাছ এক বছরেই কাহিল।

এক কিলো বেগুন নিল, চারটে বড় মূলো, সিম আর খানিকটা এঁচোড়। খুব কচি। বলল, "খোকন, এটা কামিয়ে দাও।"

খোকন যখন এঁচোডেব ছাল ছাড়াচ্ছে, তখন ওর ছোটভাই এগিয়ে এসে বলে, "বাবু, ফুলকপি দিই এক জোড়া। আজ সস্তা।"

এবাব ধ্রুবব নজর পড়ে ফুলকপিব দিকে। বড় বড় পাতাব ফাঁক থেকে এদিকে আলো ফেলছে ওবা। ভাবটা, আমায় দেখলে না! শুধু নিগ্রেসকে চোখে পড়ল? একটু হেসে দুটো ফুলকপি নিয়ে নিল ধ্রুব। তাব সঙ্গে এক ফালি বামধনু বঙের কুমড়ো। মটরশুটি।

আলু নেই। মাছ নেই। এতক্ষণে মনে পড়ল ওর। আসল জিনিস কেনাই হয়নি। এদিকে ব্যাগদুটো ভাবী হয়ে উঠেছে। আব না। টাকা? আছে। এখনও একটা পঞ্চাশ টাকার নোট অক্ষত। আগে মাছ।

ইদ্রিস কাটা পোনা বেচে। একটা প্রকাণ্ড কাতলা মাছকে পাঁজাকোলা কবে ধবে বঁটিতে গাঁথছিল তখন। চাকাপানা মুখ। উত্তেজনায় জিভটা একটু বেরিয়ে আছে। সামনে খদ্দেবেব ভিড়। অন্তত আট-দশজন উৎসুক ক্রেতা কাতলাটার প্রতি আসক্ত। ধ্রুব পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল। ইদ্রিস ওকে দেখল না। দেখলে নিশ্চয় ডাকত। অন্য স্টলগুলো ডাকছে, "আসুন কাকাবাবু, মেসোমশায়, আসুন ডাক্তাববাবু, বউদি, কী জিনিস! আগ কা দরিয়া। কাটি পতং।" সব হিন্দি ছবির নাম।

কেউ থামছে, কেউ থামছে না। ধ্রুব এদেব অগ্রাহ্য কবে। না, আজ কাটা মাছ নেবে না ও। দেখা যাক, বুলু কী নিয়ে বসেছে আজ। ওই ছেলেটা ধ্রুবর ভক্ত। ও জানে, ধ্রুবদা, একশো কুড়ি টাকা দরে গলদা চিংড়ি কি সত্তব টাকা দবে কই মাছ কিনতে আসে না। তা বলে হেনস্থা কবে না ওকে। বরং ধ্রুবব সামনে অন্য কেউ যদি নির্লজ্জেব মতো ওব স্টল থেকে ওই সব দামি মাছ কুড়িয়ে নিয়ে যায়, বুলুই চোখ টিপে ফিসফিস কবে বলে, "কাঁচা টাকা, ধ্রুবদা। সব কাঁচা টাকার খেলা।"

পঁয়ত্রিশ টাকা দবে এক কিলো ওজনেব একটা রুইমাছ নিল। "গন্ধ হবে না তো?" বুলু বলে, "বনগাঁব মাছ। আমি নালা-জলাব মাছ বাখি?"

"তা হলেও, দাও, হাতে দাও একবাব।"

বুলু খিলখিল কবে হাসে।—"জ্বর দেখবে দাদা! মাছ ছুঁয়ে কী বোঝেন বলুন তো ধ্রুবদা?" আগেও জিজ্ঞেস করেছে। আজ আবাব জানতে চাইল।

"দেখি, আমাদের মধ্যে কারেন্ট পাস কবে কিনা। মাছটা আমার জন্যেই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে কিনা। ছুঁয়ে আমি বুঝতে পারি।"

ছোট ছোট পারশে মাছ ছিল। তা-ও নিল এক মুঠো। বেশি না। কুমড়োটুমড়ো দিয়ে বানানো যাবে। একটু আঁশগন্ধ হবে তরকারিতে।

মাছের বাজারে আঁশটে গন্ধে ও কাতর হয় না কোনওদিন। ও তো ঘাম-কামের গন্ধ। জীবনেরই গন্ধ। নদী আব সমুদ্রেব গভীর জলের গন্ধ। কিন্তু পিছলটা ওর ভাল লাগে না একদম। পা টিপে টিপে হাঁটতে হয়। দু'হাতে বোঝাটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। আর না। এবার ফেরা যাক।

বাজারের বাইরের দিকটায় উঠোনে চাষিরা আনাজ বেচছে। ভালমন্দ মেশানো জিনিস সব। একত্র ডাঁই করা। হোটেল, মেসবাড়ির লোকেরা এখান থেকে নেয়। দাম সস্তা। জিনিসও টাটকা, রংচং করা নয়। কিন্তু ওই কানা কুঁজো, কচি বুড়ো আলাদা করা থাকে না। সকালের দিকে স্টলওলারা এদের কাছ থেকে ভাল জিনিসটা তুলে নিয়ে যায়।

যেতে যেতে ও আলুর একটা দোকান দেখল। একটাই। মনে পড়ল, আলুটা বাদ পড়ে গেছে। ওটা নিতেই হবে। এখান থেকে নিলে আলু বাছতে হবে। বাজারের ভেতরে আর ফেরা যায় না। ক'টা বাজে? নাকের চশমা তুলে হাতঘড়ি দেখল ধ্রুব। আটটা বেজে দশ মিনিট।

ঠিক আটটা বেজে দশ মিনিটে ধ্রুব ভিড় ঠেলতে ঠেলতে আলুর দোকানটার দিকে অগ্রসর হয়। বড় বড় নতুন আলুর পাহাড়। গায়ে পাতলা ছাল আর বালি। আলুওলা ওকে চেনে। আসতে দেখে ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

তিন

উবু হয়ে বসে ছিল। দু'খানা বাজার-ভবতি ব্যাগ একপাশে দাঁড় করানো। বাঁ হাতে ধবা একটা বাঁশের চ্যাঙারি। ডান হাত দিয়ে পাহাড় থেকে একটা একটা কবে নিখুঁত, অক্ষত আলু তুলে চ্যাঙারিতে রাখছিল ধ্রুব। সকাল আটটা বেজে দশ মিনিট। বাজারময় প্রবল শোরগোল। যে-যার পশরা বিক্রি করতে উদগ্রীব। ফলে কারুব কণ্ঠস্বরই স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে না।

ধ্রুব অনুভব কবে, আস্তে আস্তে ওর পায়ের তলা থেকে মাধ্যাকর্ষণ সরে যাচ্ছে। যে প্রবল টান সমস্ত বিশ্বসংসারকে যাব-যাব নিজের জায়গায় ফিট করে রেখেছে। যার-যার নিজের অরবিটে ঘোরাচ্ছে ক্রমাগত, সেই টান ওর ওপরে আর থাকছে না। আলুওলা, ওর নাম কার্তিক, দেখল, বাবু আলু কুড়োতে কুড়োতে আলুর পাহাড়ের ওপর গড়িয়ে যাচ্ছেন। হাত পা মুখ মাথা বুক পেট শার্ট পাজামা ঘড়ি চশমা সমেত পুরো বাবুটি এলিয়ে গিয়ে আলুব ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছেন।

"বাবু, বাবু" কার্তিক চিৎকার করে ওঠে? "কী হল আপনার? ঘুমিয়ে পড়ছেন নাকি?"

ধ্রুব শুনতে পায় না। বাজাবের প্রবল শোরগোল পর্যন্ত ওর কানে ঢুকছে না এখন। মাধ্যাকর্ষণ সরে গেলে যা হয়। আবছা একটা ছবি ওর চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে: সৈনিকের পোশাক-পরা একটা লোক, মাথায় পাগড়ি, কোথা থেকে ঘোড়ায় চড়ে সামনে দাঁড়াল এসে, থামল কিছুক্ষণ, ঠান্ডা চোখে একবার ডান দিকে, যেন জীবনেব দিকে, তাকাল, একবার বাঁ দিকে, যেন মৃত্যুর দিকে, তাকাল, তারপর চলে গেল গট গট করে। কুয়াশা ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে। দার্জিলিংয়ের কাছে ঘুম—সেখানে চলে এসেছে যেন।

কার্তিকের পাশে থেবড়ে বসে ছিল এক বুড়ি। সামনে গামছাব ওপর গোটাচারেক মোচা, থোড আর কিছু কাঁচকলা নিয়ে। কোলের ওপব চশমাখানা লাফিয়ে পড়তে সে-বেটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

"ওরে আমার কী হবে গো। চোখের সামনে জীয়ন্ত লোকটা মরে গেল ধড়ফড়িয়ে! আমি কোথায় যাব গো।"

হতভম্ব অবস্থা কাটতেই কার্তিক তড়াক করে দাঁড়িয়ে ওঠে। দাঁড়িপাল্লা বাটখাবা ফেলে রেখে ধ্রুবব মাথাটা সোজা করে শুইয়ে, তাবপর বকে ওঠে, "হাত-পা ছড়িয়ে কানছো কেনে? ও পিসি, পা দু'খান ধরে সোজা করে দাও দিকি, অজ্ঞান হয়ে গেছে। মরতে যাবে কোন দুঃখে, অ্যাঁ?"

বহু লোক জড়ো হয়ে যায় এই দৃশ্যটি ঘিরে। একজন মানুষের আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত বেদনা থেকে যত না, তার চেয়ে বেশি একটা বিসদৃশ দৃশ্যের আকর্ষণে। সকল মানুষ যেখানে চলমান ও মুখর, সেখানে একজনকে নিস্পন্দ ও শায়িত দেখে ছুটে এসেছে। কী হল দেখি।

"আরে, এ যে চেনা লোক।"

"কী কাণ্ড! এইমাত্র ভদ্রলোক আমার দোকান থেকে মাছ নিল। খুব চেনা।"

"একে তো রোজ দেখি। কাছেই থাকে।"

"চেনা লোক। চেনা লোক।"

বুলু বলে উঠল, "এর নাম ধ্রুবদা। বিশ বচ্ছর আমার দোকানের খদ্দের। তোরা চুপ করে কী দেখছিস। তোল, তোল। ধ্রুবদাকে একটা সমান জায়গায় শোয়া। মুখে-চোখে জল দে। ডাক্তার ডাক। এই বাজারেই কত ডাক্তার আছে। ডাক। হাঁক দে। শানের ওপর চড়ে হাঁক দে কেউ। বাড়িতে খবর দে।

অন্যেরা বুলুর প্রতিধ্বনি করে।

বলতে বলতে অনেক সাহায্যের হাত এগিয়ে আসে। কিন্তু কোথায় সমান জায়গা। বাজারে এক ইঞ্চি জমি কি খালি পড়ে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে বুলুরই চোখ পড়ে যায় পাঁঠার মাংসের স্টলে। উঁচু লাল সিমেন্টের বাঁধানো চাতাল। অনেকখানি লম্বা। চারভাগের তিনভাগ জায়গা যদিও ভরতি, ডান দিক ঘেঁষে খানিকটা খালি জায়গা আছে। ধরাধরি করে সকলে মিলে ধ্রুবদাকে ওই চাতালের ওপর চিত করে শুইয়ে দেয়।

দাড়িওলা বুড়ো রহমত তার কাঁধের গামছাখানা বিছিয়ে দেয় নীচে। বলে, "আহা। এ বাবু হামার চিনহা। হর শনিচ্চর আধা কিলো কিমা নিত।"

বালতিতে ভরতি জল থাকে। সেটা এগিয়ে দেয়। অনেক হাত মিলে সেই জল ধ্রুবর চোখে-মুখে ছিটোয়।

মাংসের দোকানেরই এক লুঙ্গি পরা ছোকরা, কার্বাইড-মারা মুখ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চাতালে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, "কোই ডাগদারবাবু আছেন বাজারে তো হিঁয়া আইয়ে। এক ইনসান কো জান বাঁচাইয়ে।"

ওর ডাকটা স্লোগানের মতো শোনায়। তাই শুনে চলমান কিছু মানুষ এসে উঁকি মেরে আবার নিজের কাজে চলে যায়। এই ঘটনার ফলে বাজার তো বন্ধ হয়ে যায়নি। কিছুক্ষণের জন্যে বাজারের একটা অংশ থতমত অবস্থায় ছিল। এখন আবার স্বাভাবিক। ন'টা বেজে গেলে পর ভিড় একটু পাতলা হয়।

প্রায় একঘণ্টা সময় গোলমালের মধ্যে কেটে যাবার পর একজন ডাক্তার উপস্থিত হয় মাংসের স্টলে। সার সার ঝোলানো বিচ্ছিন্ন খাসির শরীর অতিক্রম করে সে ধ্রুবর শরীরের দিকে এগিয়ে আসে। ওর হাতে ব্রিফকেস। কেউ বাড়ি থেকে ডেকে এনেছে।

বুলু: "বেঁচে আছে। নিশ্বাস পড়ছে।"

খোকন: "একটু আগে আমার দোকান থেকে—"

মানিক: "মুখ দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল—কতদিন দেখছি বাবুকে।"

ফরিদাবিবি: "বাবুর কেনা ছ'টা ডিম আমার কাছে রাখা গো। এর মধ্যে কী হল।"

কার্তিক: "বসে বসে আলুর ওপর গড়িয়ে গেল। এমন কাণ্ড জীবনে দেখিনি।"

ডাক্তার: "সরো, সরো। ভিড় হটাও।"

নাড়ি টিপে, স্টেথো দিয়ে খুঁটে খুঁটে ভদ্রলোক ধ্রুবর শরীব পরীক্ষা করে।

তারপর জিজ্ঞেস করে, "এর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে?"

"বাড়ি? সেটা কোথায়, তা তো জানি না। তোরা জানিস কেউ? এই মানিক—"

"এখুনি হাসপাতালে ভবতি করা দরকার। বাজারেব আপিস থেকে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকো।"

ব্রিফকেস খুলে একটা ইঞ্জেকশন দিল ডাক্তার। ব্রিফকেসের ওপর কাগজ রেখে একটা প্রেসক্রিপশন লিখতে গিয়ে থেমে যায়। উত্তেজিত চোখগুলোর দিকে তাকায়।

"নাম?"

কেউ বলতে পারে না। খোকন বলে, "বুলুদা জানে।"

বুলু বলে, "ধ্রুবদা।"

"ধ্রুব কী? বাঁড়ুজ্জে, চাটুজ্জে না, বসু, মিত্র, চৌধুরী? ধ্রুবদা দিয়ে নাম হয়?"

সকলে লজ্জা পায়। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

ডাক্তার খেঁকিয়ে ওঠে। "এদিকে বলছ তোমাদের চেনা লোক। অনেকদিনের চেনা।"

"হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। মিছে কথা বলছি না। অন্তত বিশ বচ্ছর।"

"অথচ তার পুরো নাম জানো না কেউ। কোথায় থাকে জানো না। আশ্চর্য। কলকাতা শহরে চার হাজার ধ্রুব আছে। কোথায় খুঁজবে? পকেট হাতড়ে দেখো তো, কোনও হদিশ পাও কিনা।"

শার্টের বুকপকেটে হাতড়ে একটা পাঁচ টাকার নোট আর কিছু খুচরো বেরুল।

বুলু বুদ্ধিমান ছেলে। তাই ডাক্তারের ধিক্কার ওকে আহত করে। একদিক থেকে উনি যা বলছেন, তা ঠিক কথা, উচিত কথা। আবার অন্য দিক থেকে, সব চেনা লোককে কি অমনি করে চেনা হয় এখানে? সে কি সম্ভব? কীভাবে কথাটা বলবে ভেবে না পেয়ে ও বলে, "এটা তো বাজার। এখানকার চেনা এই রকম।"

ভদ্রলোক ধ্রুব নামটা রাখল প্রেসক্রিপশনে। তারপর লিখল, মেইল আনআইডেনটিফায়েড ইন দি মার্কেট প্লেস। বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ। তারপর, রোগিকে পরীক্ষা করে তার যা মনে হয়েছে, সংক্ষেপে লিখে দিল। এই কাগজটার জোরে হাসপাতাল রোগিকে ভরতি করবে এমার্জেন্সিতে।

আমরা কী করতে পারি? আর সব মহানগরের মতো কলকাতাও চেনা অথচ সম্পর্কহীন মানুষের শহর। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালে তুমি ভিড়ে মিশে গেলে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে

না। একটা ধ্রুবর জন্যে দুঃখ করা অর্থহীন।

একটু পরে অ্যাম্বুলেন্স আসবে। ওকে তুলে নেবে স্ট্রেচারে। একটি-দুটি লোক সঙ্গে যাবে। হাসপাতালে ভরতি করে দিয়ে চলে আসবে তারা। সেখান থেকে খবর পাবে পুলিশ—একজন অশনাক্ত পুরুষ, বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ, সকাল ন'টায় অমুক বাজারের ভেতর হঠাৎ জ্ঞান হারায়। তাকে অমুক হাসপাতালে রাখা হয়েছে। বাড়ির লোক বেশি বেলায় বাজারে গেলে ঠিক খবর দিতে পারবে না কেউ। সন্ধের দিকে থানায় থানায় খোঁজ করলে জানবে, নিরুদ্দেশ হয়নি, গাড়ি চাপা পড়েনি। অসুস্থ মানুষটার চিকিৎসা হচ্ছে কোথাও। যদি ততক্ষণ বেঁচে থাকে তো ভাল। না হলে মর্গ অবধি দৌড়োও।

দেশ নয়, ভাষা নয়, প্রেম নয়, শ্রদ্ধাভক্তি বাৎসল্য কিছুই নয়, জীবনের প্রধানতম টান হল মাধ্যাকর্ষণের। যার জোরে বিশ্বময় এই শৃঙ্খলা আর সুষমা। পায়ের নীচ থেকে সেই টান যদি কারুর সরে যায় তো আমরা কী করতে পারি। নিঃশব্দে কত তারা নিবে যায়।

১৯৮৯

কদর্য

কান্তিনাথ আর ছোটনকে নিয়ে এই গল্প।

এই বাড়িটা কান্তিনাথের। দু'কাঠা ট্যানডেম প্লটের ওপর ছোট বাড়ি। রাস্তা থেকে তিরিশ ফুট মতো সরু গলি পার হয়ে এ-বাড়ির সদর দরোজা। সামনের প্লটের বাড়িখানা বড়সড়। তিনটে সংসার থাকে সে বাড়িতে—বিস্তর লোকজন। নানা বয়সের মেয়েপুরুষ। গানবাজনা, হুল্লোড়, চ্যাঁচামেচি লেগেই আছে। ওই ভিড় আর হুল্লোড়ের ছায়ায় যেন শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে কান্তিনাথের বাড়িটা। একটা মাঝারি মাপের টগর গাছ আছে দুই বাড়ির মাঝখানে, তার ছায়াও খানিকটা পড়ে পুব দিকের ঘরে। দেখতে দেখতে গাছটার বয়স বারো বছর হল।

ছোটন যখন এ-বাড়িতে প্রথম আসে, ওর বয়সও বারোর বেশি ছিল না।

ইন্দ্রাণী তো দেখে অবাক। "এইটুকু মেয়ে, এ কি পারবে? নেই নেই করে কাজ তো কম নয়।"

ছোটনের মা বলেছিল, "পারবে বউদি। ঘরের সব কাজ তো ওই করে।"

ইন্দ্রাণী তবু জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রোগা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে, "এই, তুই ভাতের ফ্যান গালতে পারিস?"

"হুঁ।"

"বল তো, ডালে কী ফোড়ন লাগে—"

"কী ডাল?"

"ধর, মুগের ডাল। ভাজা মুগের ডাল।"

"জিরে আর শুকনো লংকা।"

"রুটি বেলতে পারিস?"

"পারি।"

"মাছ ভাজতে?"

এবারও মাথা নাড়ে মেয়েটা। মোটা কাজগুলো জানে। তবে মাছের চপ, ফ্রায়েড রাইস কি পুডিং বানাতে জানত না ছোটন। ছোটনের মা বলেছিল, "ওগুলো শিখিয়ে নেবেন। আমাদের ঘরে তো ওসব রান্না হয় না।"

আসল কথা ছিল মেয়েটাকে গছিয়ে যাওয়া। বড় হচ্ছে, ইসকুল যাবার বালাই নেই, একলা বাড়িতে

থাকলে কখন কোন বদ সঙ্গে পড়বে। কলকাতা শহর এখন সব আবরুর বাইরে।

সেদিক থেকে এ-বাড়ি যাকে বলে আদর্শ। দুর্গ।

ইন্দ্রাণী আর বিপ্লব—এই দুই স্বামী-স্ত্রী। আর ওদের কাকাবাবু। কান্তিনাথ। একলা মানুষ, নিজের মনে থাকেন।

ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করে। তরিবতের কথা যাই বলে থাকুক ইন্দ্রাণী, ছোটনের কাজ কিন্তু একটা সরল বৃত্তের মধ্যেই ঘুরতে লাগল। সকালে চা করা, দুধ আনা। ন'টার মধ্যে মাছের ঝোল, ভাত বা ডাল-ভাত একটা ভাজা রেঁধে দেওয়া। তারপর, ওরা বেরিয়ে গেলে পর, রয়েসয়ে একটা তরকারি, মাংস, রুটি। রান্না বলতে এই। ছুটিছাটার দিনে বিশেষ কিছু মেনু থাকলে ইন্দ্রাণী নিজেই হাত লাগায়। ফাইফরমাশ কিছু খাটতে হয় ছোটনকে, কিন্তু ওসব পবিশ্রম ওর গায়ে লাগে না। খেলতে খেলাতে করে আনে।

"আর, কাকাবাবুর দেখাশোনা করতে হবে", ইন্দ্রাণী তখনই বলে নিয়েছিল। উনি বুড়ো মানুষ, খুব সুস্থও নন। দিনরাতের লোক রাখছে খাওয়া-পরা দিয়ে—যেখানে ঠিকে লোক হলেই চলত—তা ওই কাকাবাবুব জন্যেই। উনি হলেন এ-বাড়ির কর্তা।

কর্তা হলেও কান্তিনাথ নির্বিরোধী মানুষ।

রেলে কাজ করতেন। বিয়েথা করেননি। বদলির চাকরিতে সারা দেশটা ঘুবে বেড়িয়েছেন। এখন রিটায়াব করে লোকোশেডে বসা।

লোকোশেডই বটে। এই নিঝুম ছায়াচ্ছন্ন বাড়িটায় কোথা দিয়ে দুপুর আসে, দুপুব গড়িয়ে বিকেল হয়, বোঝাই যায় না। দোতলায় একখানা ঘর, একপাশে চানের ঘর, অন্য পাশে ছোট ছাদটা—এই ওঁর আস্তানা। বাকি যা কিছু, নীচের তলায়। দিনে দু'-তিনবার নামেন বড় জোর। কথা বলতে ইচ্ছে করলে বসার ঘরে সোফায় গিয়ে বসেন।

না হলে ওপর থেকে হাঁক দেন, "ছোটন।"

ছোটন বলে, "যাই।"

ছোটন কফি করে এনে কাপটা তাঁর বিছানার পাশের টেবিলে নামিয়ে রাখে। দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কান্তিনাথ চুমুক দিলে পর জিজ্ঞেস করে, "ঠিক হয়েছে?"

কোনওদিন হয়তো হাঁক দিয়েই বলেন, আসতে হবে না। কেটলিতে গরম জল দিবি, চান করব।"

ছোটন ছুটতে ছুটতে গরম জল নিয়ে আসে।

কান্তিনাথ বলেন, "ছুটছিস কেন? গরম জল পায়ে পড়লে—"

কথা শেষ করার আগেই এক ছুটে ছোটন উধাও। এই ওর স্বভাব। সবতাতেই তাড়া। ধীরে সুস্থে কাজ কবার ধাত ওর নয়।

এইভাবে দিন যায়।

ও যখন প্রথম এ-বাড়িতে এসেছিল, রোগা চিমসে চেহারা। গায়ে একটা রং-ওঠা ছিটের ফ্রক। কালো কালো দুটো পা। মাথা-ভরতি রুক্ষ চুল। চোখের নীচে গালের হাড়দুটো বেরিয়ে আছে। চোখের রং হলদে। উঁচু কপাল। পেট ভরে খেতে পেত না। রান্নাঘরের পাশে রাখা ফ্রিজটা ছিল ওর চেয়ে লম্বা।

ইন্দ্রাণী বলত, চোর না হলেই হয়।

হাঘরের মেয়ে হঠাৎ সচ্ছল সংসারে ঢুকে পড়েছে। ভাঁড়ারের সবকিছু ওর নাগালের মধ্যে। চাল, ডাল, তেল, আলু, মশলাপাতি একটু একটু করে সরালে টের পাবার জো নেই। ফ্রিজের মধ্যে ডিম, আপেল, মাছের টুকরো তো গোনা থাকে না। রুটি থাকে, মাখন জ্যাম থাকে—লোভে পড়ে খেলেই হল।

যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে লক্ষ রাখতে, কিন্তু এ-ব্যাপারে কোনও প্রমাণ মেলেনি। মাঝে মাঝে কেবল দুধ কম পড়ে যায়, দুধ জোলো ঠেকে, ছানা কম হয়, ইন্দ্রাণীর সন্দেহ হয়, ছোটন বুঝি খেয়েছে।

বিপ্লব বলে, "খায় তো খাক। ছোট মেয়ে, সারাদিন ওইসব ঘাঁটছে"—

"কেন, আমরা কি পেটভরে খেতে দিই না? নিজেরা যা খাই, ছোটনও তাই খায়।"

"তা হলেও—"

"অন্য বাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখো, কাজের লোক শুধু ডাল-ভাত খেয়ে আছে। তারই খরচ কত জানো?"

"সব ঠিক", বিপ্লব স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করে, "তবে কী জানো, হোটেল-রেস্টোরেন্টে যারা কুকের কাজ করে, তাদের ডিউটিমিল দেওয়া রেওয়াজ। আর কেউ না, শুধু কুক। কেন বলো তো? কারণ ওরা মিল না দিলেও খাবে। সোজাসুজি খাক।"

চুরি করে খাক বা না-খাক, দেখতে দেখতে ছোটন বড় হয়ে উঠল। ইন্দ্রাণী মেয়ে, ওরই লক্ষ্য করা উচিত ছিল আগে, কিন্তু ও লক্ষ করেনি। লক্ষ করলেন কান্তিনাথ। কান্তিনাথ ওকে বেশিক্ষণ দেখেন।

দুপুরে খেতে বসেছেন একদিন। ছোটন খাবার গরম করে এনে বেড়ে দিচ্ছে। ওর ভিজে চুল খোঁপা করে জড়ানো। কান্তিনাথ দেখলেন, মেয়েটার গালে দুটো ব্রণ পেকে টসটস করছে। কান্তিনাথ দেখলেন, ছোটন যেন একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছে ওঁর সামনে। কোমরের কাছে ওর ফ্রক ঝলঝল করত আগে, আজ যেন কাপ হয়ে সেঁটে রয়েছে ওর গায়ে। ফ্রিজটা ছোটনের চেয়ে খাটো। ইন্দ্রাণী আপিস থেকে বাড়ি ফিরলে পব বললেন, "ওকে একজোড়া শাড়ি কিনে দিয়ো।"

আবার খরচের ধাক্কা। ইন্দ্রাণী গজগজ করে খানিকক্ষণ। মেয়ে পোষা না তো হাতি পোষা। কেন, ওর মাইনের টাকা থেকে কিনতে পারে না! কী করে অত টাকা! সব মাকে দিয়ে দেয়?

এবারও বিপ্লব ওর বিবেকের ভূমিকায়।

"খাওয়া-পরা দিয়ে রেখেছ, পরনের কাপড় দেবে না? রাস্তার ছোঁড়াগুলো ওর পেছনে লাগবে, তাতে তোমার সুনাম বাড়বে পাড়ায়?"

না, হৃদয়হীন নয় ইন্দ্রাণী। মাস কাবার হতেই হকার্স কর্নার থেকে দু'খানা ছাপা শাড়ি, একজোড়া লাল ব্লাউজ কিনে দিল ছোটনকে। ফুটপাথ থেকে দুটো সায়া। ফিসফিস করে কী সব কথা বলল ওর সঙ্গে রান্নাঘরে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার কথা বোধহয়।

এই হয়তো চেয়েছিল ছোটন। ওর সংকোচ গেল কেটে। আঁচল কোমরে বেঁধে ও সংসারের কাজ করে। হাতে কাজ না থাকলে আঁচল উড়িয়ে ও গলি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে যায়। অন্য বাড়ির যুবতী কাজের লোকদের সঙ্গে গল্প করে। কথায় কথায় হেসে লুটোয়। যাওয়া-আসার পথে হঠাৎ কান্তিনাথের মুখোমুখি হয়ে পড়লে গম্ভীর হয়ে যায়।

ওরা বলে—"যা, বাড়ি গিয়ে ঝাড় খাবি।"

ছোটন বলে, "না। বুড়োবাবু লোকটা ভালো। একটু যা পাগলা আছে।"

"পাগলা?"

"একদিন না—", বলতে বলতে হেসে গড়ায় ছোটন, "বুড়োবাবু ওপরতলা থেকে ডাকছে—ছোটন, ছোটন—গিয়ে দেখি কোলের ওপর একটা কোট, ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে আছে। ছুঁচে সুতো পরাতে পারছে না—হি-হি হি-হি।"

"ধ্যাৎ। বুড়ো তো খালি-গায়ে শুধু লুঙ্গি পরে থাকে। রাস্তায় বেরোলে একটা নীল জামা পরে, দেখি। কোট দিয়ে কী করবে?"

ছোটন বলে, "না রে, তোরা জানিস না। ব্যাঙ্কে যাবাব সময় বুড়োবাবু কোট-প্যান্ট পরে যায়। টাকা তোলার দিন।"

পরের বাড়ির খুঁটিনাটি খবর জানবার কৌতূহল সব মেয়েদেরই থাকে, পরের বাড়ির পরিচালিকাদেরও আছে। রাস্তায় একলা পেলে ছোটনকে ধরে, "এই।"

ছোটন ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে যায়।

"কোথায় গেছিলি?"

"দোকানে।"

থলের মধ্যে কী?"
"কী আবার!" ছোটন ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে থাকে।
"দেখা। দেখি কী কিনলি।"
অহেতুক কৌতূহল। তবু এই ভাবেই ওরা দেখতে পায়, ছোটন সোডার বোতল নিয়ে যাচ্ছে।
"সোডা কেন রে? বুড়োবাবু বুঝি মদ খায়?"
এটা বাড়ির গোপন ব্যাপার। এ নিয়ে হাসি মশকরা করবে না ছোটন। বুড়োবাবু গুরুজন, তাঁর নামে নিন্দে ও রটাবে না। বাড়ির লোক হয়ে সে-কাজ ওকে মানায় না।
ও বলে, "পেটে গ্যাস হয়, তাই সোডা দিয়ে ওষুধ খায় বাবু।"
ওরা ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে হাসে। বিশ্বাস করে না ছোটনের কথায়। উলটে ওকে সাবধান করে দেয়, দেখিস, একলা থাকিস তো, বুড়োবা কিন্তু বদ হয়।

বছর ঘুরে যায়। এক শীতের পর আর এক শীত আসে। টগর গাছটা ঝাঁক ঝাঁক সাদা ফুল ফেলে ছড়িয়ে শেষ করে নেড়া হয়ে যায় আবার। সামনের বাড়িতে ধুমধাম করে কারুর বিয়ে হয়। শাল গায়ে দিয়ে বড়লোকেরা নেমন্তন্ন খেতে আসে, নেমন্তন্ন খেয়ে চলে যায়। ও-বাড়ির ছাদে ত্রিপলের ঢাকনার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। রান্নার গন্ধ আসে এ-বাড়িতে। বিকেলবেলা ছাদে শুকনো কাপড় তুলতে তুলতে ছোটন দেখে এইসব। আর ভাবে, ওই যে, ঘরে আরামচেয়ারে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে মানুষটা—সে কি বদ? বদ মানে কী? ও তো বুড়ো মানুষ, ওর বাবার চেয়েও বয়সে বড়, অত বড় মানুষ বদ হতে পারে?

একদিন গ্রীষ্মকালের দুপুর। দাদাবাবু, বউদি আপিস চলে গেছে যথারীতি। নিঝুম বাড়ি। কান্তিনাথ কখন 'ছোটন' বলে ডাক দেন, দোকানে পাঠান, সেই সুযোগের অপেক্ষা করছে ও। হঠাৎ কী মনে হল, তড়বড় করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যায় ছোটন আর তখনই দেখতে পায়, দেখে ফেলে, কান্তিনাথ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আয়নার সামনে। ছোটনকে দেখে দড়াম করে দরোজা বন্ধ করে দিলেন।
এক ঝলক, এক মুহূর্ত, কাঁচা-পাকা চুলে ঢাকা একজন বড় পুরুষমানুষের সম্পূর্ণ শরীর—প্রায় ভাল্লুকের মতো—ছোটন আগে দেখেনি। এ-দৃশ্য সহ্য করা যায় না, যেন চোখের ওপর টর্চ পড়েছে, ও মুখখানা ফিরিয়ে নেয় আচমকা। দ্রুত নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে। ওর বুক দুরদুর করছে। ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে আর তারপর ভেতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে দেয়। মুখে হাত চাপা দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে অনেকক্ষণ। লজ্জা। যেন ও কান্তিনাথকে না, কান্তিনাথ ওকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলেছেন।
একসময় সেই ডাক আসে। ঠান্ডা, গম্ভীর কণ্ঠস্বর। যেন কিছুই হয়নি।
"ছোটন, খাবার দিয়ে দে।"

আমরা বলেছিলাম, কান্তিনাথ আর ছোটনকে নিয়ে এই গল্প। এ-গল্প হয় না। এ-গল্প অবাস্তব। আমরা ভাবতে চেষ্টা করছি, মানুষ কাপড় পরে কেন? তাতে কি মানুষে মানুষে সম্পর্ক সহজ হয়, স্বাভাবিক হয়? নাকি জটিল হয় সে-সম্পর্ক? অন্য কোনও প্রাণী তো কাপড় পরে না, তারা উলঙ্গ অবস্থায় অবাধে বিচরণ করে। তাদের আচরণ কি স্বাভাবিক নয়? লজ্জা ঢাকে বলে কি মানুষের কাছে লজ্জার এত মূল্য? মানুষ আসলে পশু? বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত? জানাতে চায়, সে পশু নয়? এসব অবশ্য তত্ত্বকথা।
কান্তিনাথ কিছুদিন গুম হয়ে রইলেন। ছোটনকে ডাকাডাকি করেন না। খেতে বসে চুপচাপ খেয়ে উঠে যান। ফরমাশ না করে নিজের টুকিটাকি দরকারি জিনিস নিজেই বেরিয়ে কিনে আনেন।
ছোটন ভেবেছিল, এবার ওর চাকরিটা বোধহয় যাবে। অত্যন্ত গর্হিত, অন্যায় কাজ ও করে ফেলেছে। কোনও কারণ না দেখিয়ে বউদি একদিন ওর মাইনেপত্র চুকিয়ে দিয়ে বলবে, তোকে আর রাখতে পারব না।

রান্নাঘরের এক কোণে ওর ছোট্ট সংসার। ভাঁড়ারের সার সার তাকগুলোর শেষে ওর নিজস্ব একটা

পাল্লা দেওয়া তাক। তার মধ্যে ওর আয়না, চিরুনি, সাবান। চুলে মাখার তেল। সেলাইয়ের বাকস। একটা লাল কৌটো—তার মধ্যে ওর জমানো টাকাপয়সা। নাকছাবি, দুটো মাকড়ি। চারগাছা কাচের চুড়ি। অবরেসবরে পরে। নির্জন দুপুরে ছোটন ওর সংসারের পাল্লাদুটো খুলে পা ছড়িয়ে বসে থাকে। আর আকাশপাতাল ভাবে। দিদির দেওয়া বত্রিশ মাপের বডিসটা প্যাকেটের মধ্যেই রাখা থাকে, ও পরে না। পরলে ঘাম হয়। গায়ে কাঁটা দেয়।

না, ওর চাকরি যায়নি। ক্রমে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

একদিন বিকেলে চায়ের টুংটাং শব্দ না পেয়ে কান্তিনাথ নীচে নামলেন। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখেন, কাত হয়ে শুয়ে আছে ছোটন। পা দুটো পেটের কাছে গোঁজা, দু'ভাঁজ শরীর। শুকনো রুক্ষ চুল চৌকাঠের ওপর এলানো।

"ছোটন। এই ছোটন।" কান্তিনাথ ডাকলেন, "কী হয়েছে তোর?"

উঁ করে একটু শব্দ করে, কিন্তু ছোটন ওঠে না।

"জ্বর হয়েছে?" কান্তিনাথ ওর কপালে হাত দিয়ে পরখ করেন।

"পেট ব্যথা করছে? কী রে, একটু তাকা।"

ছোটন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

"কোনখানটায় ব্যথা করছে বল।"

ছোটন চিত হয় এবার। একটু হাসতে চেষ্টা করে। তারপর ও ব্যথার জায়গাটা দেখায়।

কষ্ট বোধ করেন কান্তিনাথ। ছোটনের কচি মুখখানা দেখে বেশি কষ্ট বোধ করেন। এতটুকু মেয়ের এই কষ্ট পাওয়া উচিত না, মনে হয় তাঁর। কিছু একটা করা দরকার।

কান্তিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁরে, প্রত্যেক মাসে তোর এ রকম ব্যথা হয়?"

ক্ষীণ গলায় ছোটন উত্তর দেয়, "না, এই প্রথম।"

কান্তিনাথ দোতলায় নিজের ঘরে উঠে গেলেন। হোমিওপ্যাথির বাকস থেকে একটা ছোট শিশি নিয়ে নামলেন খানিক পর।

বললেন, "হাঁ কর। এই ওষুধটা খেলে ব্যথা কমে যাবে।"

পাখির মতো হাঁ করে ছোটন ওষুধ খায়। আবার পাশ ফিরে শোয়। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাড়িতে টিভি আছে। নীচের তলায়। কান্তিনাথ কদাচিৎ টিভি দেখেন। সন্ধেবেলার পর বাড়ির চরিত্র বদলে যায়। ইন্দ্রাণীরা আপিস থেকে ফেরে। ওদের দু'জনের সংসারে কলরব শুরু হয়। স্নান করার শব্দ, স্টিলের আলমারি খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ। বাসনপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ। ছোটনের ব্যস্ততা। বাড়িতে লোকজন আসে, তাদের হাসি ও কাশির শব্দ দোতলায় উঠে আসে। এর ওপর টিভি-র বিভিন্ন সুরেব শব্দ তো আছেই। কান্তিনাথের নিজের একটি ছোট ট্রানজিস্টার রেডিয়ো আছে, সন্ধের পর সেটি খুলে দেন। দরোজা বন্ধ করে রেডিয়ো শোনেন। হঠাৎ আলো নিবে গেলে অন্ধকারেই বসে বসে রেডিয়ো শোনেন।

আটটা নাগাদ ছোটন সোডা আর এক বোতল ঠান্ডা জল রেখে আসে ওপরে। আর একটা গ্লাস। নিভৃতে চুপচাপ বসে কান্তিনাথ মদ খান। ঘণ্টাখানেক পরে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েন। ছোটন বিছানা করে, এঁটো বাসন নিয়ে যায়।

সেদিন ওদের বিয়েবাড়ি নেমন্তন্ন ছিল। ফিরতে রাত হবে। কী ভেবে কান্তিনাথ নীচে নেমেছিলেন। দেখেছিলেন, মোড়ায় বসে ছোটন টিভি দেখছে। সোফায় বসছেন দেখে ছোটন সেখানে জলের বোতল. সোডা আর গ্লাস রেখে আবার টিভি দেখতে লাগল।

আর কী কী ঘটেছিল সে-দিন? মনে করার চেষ্টা করেন কান্তিনাথ। এমন কিছু তো ঘটেনি। পাশ থেকে ছোটনের মুখখানা দেখছিলেন, মনে পড়ে। শাড়ির নীচে ওর একটা পায়ের গোড়ালি। নিটোল, যেন মাটি দিয়ে লেপা। পায়ের নখে টুকটুকে লাল রং। ওর কী রকম অদ্ভুতভাবে, নিঃশব্দে বড় হয়ে

ওঠার ব্যাপারটা দেখে অবাক লাগছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল, সুন্দর অসুন্দর বলে পৃথিবীতে নির্দিষ্ট কিছু নেই। যা তরুণ, তা সুন্দর। যেখানে যৌবন, সেখানেই রূপ। যা বৃদ্ধ, তা কদর্য।

একবার যেন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "চুলে তেল দিস না, হাঁরে?"

মুখখানা টিভি স্ক্রিন থেকে একটু এদিকে ফিরিয়ে ছোটন বলেছিল, "শ্যাম্পু করেছি।"

একবার বোধহয় জিজ্ঞেস করেছিলেন, "টিপটা বাঁকা পরেছিস কেন? আয়না নেই তোর?"

আর তো কোনও কথা হয়নি।

না, না। কথা হয়েছিল। সাক্ষাৎকারের প্রোগ্রাম চলছিল যখন, তখন কথা হয়েছিল। নেশা করার কুফল নিয়ে একটা অনুষ্ঠান ছিল। কয়েকজন নেশাখোরের সঙ্গে দূরদর্শন সংবাদদাতার কথাবার্তা। জনশিক্ষামূলক অনুষ্ঠান। আপনি নেশা করেন কেন? জিজ্ঞেস করায় লোকটা কী যেন বলল। শুনতে পাননি কান্তিনাথ।

"কী বলল রে? ও নেশা করে কেন?"

ছোটন ফিক করে হাসে। মুখ না ফিরিয়েই বলে, "দুঃখ ভুলতে আর মজা করতে।"

হো হো করে হেসে ওঠেন কান্তিনাথ।

"বেশ বলেছে। আচ্ছা, আমি নেশা করি কেন বল তো? দুঃখ ভুলতে, না মজা করতে? বল না। এই, এদিকে তাকা, এদিকে তাকা একবার।"

এই অবধি মনে পড়ছে। তারপর কি ওর হাত ধরে টেনেছিলেন? না। ওকে জড়িয়ে ধরেছিলেন? কই না। শ্লীলতা হানি? কেন? কী উদ্দেশ্য? অমন সুন্দর আবছা আলোময় একটা সন্ধে, যখন ছোটনকে আর কাজের লোক মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল একটা কুমারী মাছ, নাকি পরি, নাকি একটা টগর গাছ। টিভি-তে সিনেমার গান হচ্ছে। নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে ঘিরে ঘুরছে, নাচছে, আর ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজনায় চমকে উঠছে ছোটন। তৈরি হচ্ছে ওর মন আর শরীর, ওইসব অভিজ্ঞতার প্রহার পাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। পঞ্চাশ বছর দূর থেকে বৃদ্ধ কান্তিনাথ ওর নাগাল পাবেন কী করে? অনুভূতি আছে, কারও সর্বনাশ করার ক্ষমতা কি তাঁর আছে?

এক সপ্তাহও গেল না।

ছোটনের মা একদিন এসে ওকে নিয়ে গেল। বলল, "বউদি, মেয়েকে এবার নিজের কাছে এনে রাখব। বিয়ে দিতে হবে না?"

তা তো বটেই। পরের বাড়ি কাজ করে কি ওর জীবন কাটবে? কাটবে না। তবু, যাবার সময় দোতলার ঘরে এসে ছোটন যখন কান্তিনাথের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, মনে হল, ও যেন মুখ টিপে টিপে হাসছে। কান্তিনাথ অপমানিত বোধ করলেন।

এ অপমান তাঁর প্রতি, না তাঁর বার্ধক্যের প্রতি, বোঝার আগেই ছোটন ঝুমঝুম ঝুমঝুম নূপুরের শব্দ করতে করতে নীচে নেমে গেল।

১৯৮৬

মহিলাটির কথাবার্তা শুনে দুলালের হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু হাসছিল না সে। বরং মুখখানা গম্ভীর করে পড়তে চেষ্টা করছিল দেয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের ওপর বিজ্ঞাপনটা। মেড ফর ইচ আদার। ব্রেসিয়ারের বিজ্ঞাপন। সার সার তারিখগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি উর্ধ্বাঙ্গ প্রায়-নগ্ন করে হাসছে, চোখের ইশারায় তার বিস্ফারিত স্বাস্থ্য দেখাচ্ছে, সে জানে না, দুলালের মতো লোক ওই ব্রেসিয়ার কোনওদিন কিনবে না। অত কারুকার্য-করা অন্তর্বাস বড়লোকের বয়স্ক স্ত্রীরা পরবে সম্ভবত, আর খারাপ মেয়েরা—যারা নাচে, গায়, থিয়েটার করে, মাতালদের সঙ্গে শোয়। দুলালের মতো লোক এইসব ছবি দেখে একটু কষ্ট কুড়িয়ে নেয়। খুব নির্জন মুহূর্তে সেই কষ্ট তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে।

এখন অবশ্য দুলালের মন ছবিটার দিকে নেই। অন্য মহিলাটির দিকে, দোকানের অন্য পাশটায় দাঁড়িয়ে যিনি বার বার তাঁর হাতব্যাগ খুলছেন আর বন্ধ করছেন। এবং অর্ধমনস্ক ভাবে কথা বলছেন লুজ চায়ের দোকানির সঙ্গে।

"ভাল হবে তো!"

"ঠিক করে মিলিয়ে দিচ্ছি আপনাকে ,খেয়ে দেখুন।"

"দেখুন বারো টাকা কিলোর চা নিচ্ছি। যদি গন্ধ না হয় লিকার না হয়..."

বিভিন্ন কৌটো থেকে হাতায় করে চা-পাতা তুলে একটা পাত্রে রাখতে ব্যস্ত দোকানি উত্তর দিল না। তার মুখে একদিনের বাসি দাড়ি কিন্তু চোখে বিশেষজ্ঞসুলভ আত্মবিশ্বাস।

"আগের মাসে এখান থেকেই তো নিয়েছিলাম। দু'-তিন দিন বেশ গন্ধ ছিল, তারপর কোথায় যে উবে গেল না! তলায় কালো কালো গুঁড়ো..."

পাত্রের চা-পাতা ঠোঙায় ঢেলে দোকানি নির্বিকার মুখে পাল্লায় চড়াল।

ভদ্রমহিলা আবার হাতব্যাগ খুললেন। ভেতর থেকে একটা ক্রিমের শিশি বার করলেন। প্যাঁচ ঘুরিয়ে মুখটা খুললেন, গন্ধ শুঁকলেন। নিজের মনে বললেন, "কেমন যেন ঠেকছে, জানি না, ভেজাল কিনা।"

ব্যাগটা বন্ধ করে এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। তারপর বলে উঠলেন, "ওটা প্যাক করে রাখুন, আমি এক্ষুনি আসছি।"

হঠাৎ পিছন ফিরে দোকান থেকে বেরোতে যাচ্ছেন, দোকানি বলল, "নিয়ে যান, হয়ে গেছে। তিনশো গ্রাম তিন টাকা ষাট।"

আবার ফিরলেন ভদ্রমহিলা। দুলালের সঙ্গে চোখাচোখি হল। একটু অস্বস্তি বোধ করলেন বোধহয়। কপালের দু'পাশে কিছু ঝুরো চুল সরিয়ে দিলেন পিছন দিকে।

"কোনও জিনিস কিনেই স্বস্তি নেই আজকাল। সবকিছুতে ভেজাল। তাই এত অসুখবিসুখ।"

দুলাল সামান্য ব্যক্তি। তবু মাথা নেড়ে ভদ্রমহিলার মন্তব্যে সমর্থন জানাল। তারপর ছবিঅলা ক্যালেন্ডার থেকে চোখ সরিয়ে সরাসরি মহিলার দিকে চেয়ে রইল।

ভদ্রমহিলা হাতব্যাগ খুললেন। ভাঁজ-করা একটা রঙিন ছোট রুমাল বার করে ঠোঁটের পাশ দুটো মুছলেন, রুমালটা ভেতরে রেখে দিলেন। পাঁচ টাকার নোট টেনে আনলেন ভেতর থেকে, চায়ের প্যাকেটটা চেপেচুপে ঢোকালেন ওর মধ্যে, খুচরো টাকাপয়সা হাত পেতে নিলেন, হাতব্যাগের একটা খাপে গুঁজে দিলেন, তারপর ক্রিমের শিশিটা টেনে বার করলেন আবার।

দুলাল দেখল, মহিলাটি মোটামুটি সুশ্রী। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হবে। শিক্ষিতা, সম্ভবত অবিবাহিতা, চাকরিজীবী। এবং দুলালের মতো ডেলিপ্যাসেঞ্জার। বেশিদিন পর্যন্ত বিয়েটিয়ে না হলে, দুলালের মনে হল, মেয়েরা এই রকম হয়ে যায়। সারাজীবন অ-নির্ভর, একা ও একাগ্র থেকে আত্মরক্ষা ও যুদ্ধ দুইই চালিয়ে যাবার ক্ষমতা মেয়েদের থাকে না। থাকার কথা নয়। কিন্তু কী করবে। মানুষের ইচ্ছেয় কি মানুষের জীবন চলে!

টুপ করে কী একটা পড়ল যেন ব্যাগ থেকে। মহিলাটি তখন গায়ের চাদর সামলাচ্ছেন, কপালের দু'পাশ থেকে নেমে-আসা চুল।

এক পা সরে এসে চপ্পল দিয়ে চেপে ধরল জিনিসটা। দোকানির দিকে ফিরে দুলাল বলল, "দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমায় ছেড়ে দিন এবার।"

ভদ্রমহিলা সবকিছু গুছিয়ে গাছিয়ে দোকান থেকে চলে গেলেন। দোকানি আবার বিশেষজ্ঞের মতো, বিজ্ঞানীর মতো লিকার ও ফ্লেবার মেশাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এবং সেই ফাঁকে পায়ের দুটো আঙুলে চেপে জিনিসটা তুলল দুলাল।

একটা ভাঁজ-করা দু'টাকার নোট।

সন্তর্পণে নোটটা শার্টের ঝোলানো পকেটে ফেলে দিল দুলাল। মনে মনে হিসাব করল, আরও সাত টাকা দরকার।

দিন সাতেক আগে ওকে দশ টাকা ঠকিয়েছে একজন। নিশ্চিত ঠকিয়েছে, দুলালের মনের ভুল নয়।

কাঁধে ঝোলানো কাপড়েব থলে। তার মধ্যে একটা টর্চ, একটা হাতকাটা সোয়েটার, একটা মাফলার এবং ওর নিত্যসঙ্গী নোটবুক। নোটবুকের ভাঁজে ভাঁজে ওর যথাসম্বল টাকাকড়ি রাখা থাকে।

এটর্নি আপিসের টাইপিস্ট দুলাল মাস গেলে মাইনে পায় দুশো দশ টাকা। টাকাটা পেয়ে সেদিন দশটা দশ টাকাব নোট বেখেছিল এক জায়গায়। ওটা দাদাব সংসারে ওর চাঁদা। শহরতলিতে দাদা বাড়ি করেছে, বউদি এবং দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠে গেছে সেখানে প্রায় তিন বছর হল। একতলা ছোটখাটো বাড়ি, দোতলাব ভিত কবা আছে, সিঁড়ি করা আছে। ছাদের ওপর সিঁড়ির পাশটায় একখানা ঘর তুলে দিয়েছে দাদা, অ্যাসবেসটসেব ছাদ, দুলালের জন্য।

"তুই একা মানুষ, মেস ফেসে না থেকে আমাদের সঙ্গে থাক না। নিজের মনে থাকবি, আমাদের সঙ্গে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খাবি, তোব চলে যাবে। শরীরটা ভাঙবে না।"

দাদার কথায় স্নেহ ছিল, বিষয়বুদ্ধির পবিচয়ও ছিল। দুলাল তো বিনি পয়সায় থাকবে না। বাড়ি করতে ধাব হয়েছে বিস্তর, মাসে মাসে শোধ দিতে হয়। সংসার খরচে টান পড়ে। দুলালের দেওয়া একশো টাকা এখন ফেলনা নয়।

"আমাবই বা ক্ষতি কী।' নিজেকে বুঝিয়েছে দুলাল। তফাতের মধ্যে—ডেলি প্যাসেঞ্জারি। মাসে সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সাব মান্থলি টিকিট, সেটাই অতিবিক্ত। কিন্তু তার বদলে একটা সংসারের মধ্যে থাকা। অসুখবিসুখ আছে। মেস-জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি।

দাদার সংসাবে থাকতে প্রথম প্রথম ও বেশ অস্বস্তি বোধ করত। ক্রমশ সয়ে গেছে। বউদি একটু রুক্ষ প্রকৃতিব, কিন্তু দুলালের প্রতি সে সহৃদয়। ছেলেমেয়ে দুটো স্থানীয় স্কুলে পড়ে, বড় হয়েছে, হাতখরচের পয়সা কাকার পকেট থেকে চুরি কবত। এখন আর সুযোগ পায় না। দুলালের নিত্যসঙ্গী নোটবুকেব মধ্যে ওর সর্বস্ব থাকে, ওরা নাগাল পায় না।

মাইনে পেয়ে বাকি এগারোটা দশ টাকার নোট ও বেখেছিল নোটবুকের অন্য ভাঁজে।

সেদিন শনিবার ছিল। ম্যাটিনি শো-য় টিকিট কাটতে এসে দেখে, এক টাকা নব্বুই পয়সার নীচে টিকিট নেই। কিছুক্ষণ ইতস্তত চিন্তা করে ও ছবিটা দেখাই মনস্থ করে। 'এ'-মার্কা ছবি—একটাকা নব্বুই খরচ করা যায়।

পরিষ্কাব মনে আছে, নোটবুক থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে ধরে, হাতটা কাউন্টারের খুপরির মধ্যে ঢুকিয়েছিল। বুকিং ক্লার্ক ভদ্রলোক মাথা ঈষৎ নামিয়ে, বাইফোকাল চশমার ওপরের কাচটা দিয়ে ওর দিকে চেয়েছিলেন, তারপর নোটটা হাত থেকে নিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ক'খানা?"

দুলাল বলেছিল, "একখানা, এক টাকা নব্বুই।"

তারপর টিকিটের বান্ডিল টেনে আনলেন তিনি, নীল রঙের পেনসিল দিয়ে সিট নম্বর লিখলেন বড় বড় অক্ষরে, ছিঁড়লেন, খুপরির দিকে এগিয়ে দিলেন টিকিটটা।

খুচরো ফেরত পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে দুলাল, লাইনে দাঁড়ানো পেছনের লোকেরা তাড়া দিচ্ছে—হাত চালান, হাত চালান মশাই। এমন সময় কাউন্টারের ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন, "কী ভাবছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, পয়সাটা দিন, অন্যদের দেরি করাচ্ছেন কেন?"

কী রকম বিভ্রমের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল দুলাল এক মুহূর্তের মধ্যে। দশ টাকার নোটটা দিইনি তা হলে—ওর মনে হয়েছিল। পেছনে অপেক্ষমান দর্শকদের কোলাহল বেড়ে যাচ্ছে, আরও যাবে—

আসলে ওরই ভুল, অন্যমনস্কতা—এইসব ভেবে ও নোটবুক থেকে আর একটা দশ টাকার নোট বার করে দিয়েছিল। দিতে দিতে বলেছিল, "টাকাটা দিইনি আপনাকে? দশ টাকার একটা নোট?"

"দিলে কি উড়ে যাবে এখান থেকে মশায়? আচ্ছা লোক তো আপনি। দিন দিন।'

ছবিটা ছিল ভাল। দেখতে দেখতে ও ভুলেই গিয়েছিল দশ টাকা ঠকে যাওয়ার শোক। বা, ভেবেছিল—মনের ভুল ওটা, মনেরই ভুল।

কিন্তু ছ'টা পঁচিশের ট্রেনে বাড়ি ফিরে, স্নান করে খেয়ে, শুতে যাবার আগে দুলাল আবার বসেছিল নোটবুক খুলে। সংসারের চাঁদা বাবদ দশটা দশ টাকার নোট এক জায়গায় ঠিক আছে। অন্য জায়গাটায় আরও দশটা নোট থাকাব কথা—এগারোটা থেকে একটাই তো খরচ করেছে ও—অথচ আছে ন'টা। অর্থাৎ একটা কম।

নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেরই ওপর বিরক্ত হয়েছিল দুলাল সেদিন।

"আমি তো কারও ক্ষতি করিনি কোনওদিন, তবে কেন আমায় ঠকালে। কেন আমার আঙুল ব্যথা করে রোজগার করা টাকা তুমি মেরে দিলে শয়তান?"

ব্যর্থ আক্রোশে বিড়বিড় করে বকছিল দুলাল। টাকাব শোক ক্রমশ ফুলতে ফুলতে এক প্রচণ্ড অপমানের চেহারা নিয়ে ওকে ঘিরে ধরেছিল সেদিন। অনেকক্ষণ ঘুমোতে দেয়নি।

তারপর শুয়ে শুয়ে একসময় ও প্রতিজ্ঞা করল, "এই টাকা আমি উশুল করে নেব। আমি ছাডব না।"

দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল দুলাল। ঘাড় ঘুরিয়ে স্টেশনের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল। ট্রেনের এখনও আধ ঘণ্টা দেরি। খিদে পেয়েছে।

এক টাকা কুড়ি পয়সা দিয়ে একটা মোগলাই পবোটা ও খানিকটা শশা-পিঁয়াজ খেযে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে দুলালের বিবেক-দংশন শুরু হল। কুড়িয়ে পাওয়া দু'টাকার নোটটা এইমাত্র ভাঙিয়েছে, খুচবো পয়সা রেখেছে পকেটে। তাই দিয়ে দাদার ছেলেমেয়ে দুটোর জন্যে কিছু খাবাব কিনে নিয়ে যাবে। ট্রেনেই কত কিছু বিক্রি কবে হকাররা। যা-ই নিয়ে যাক, খুশি হবে ওবা।

টাকাদুটো তো বাজে খরচ করেনি ও। অন্যমনস্ক ভদ্রমহিলাটি কীভাবে সদ্ব্যবহার করতেন? হয়তো, মোগলাই পরোটা বা চানাচুরের বদলে কিছু কলা বা কমলালেবু কিনে নিয়ে যেতেন। বেশি বয়সেব অবিবাহিত মেয়েবা পুষ্টিকর খাদ্য পছন্দ করে, দুলাল জানে। দেখেছে আপিস পাড়ায সর্বত্র। ওব নিজেব যে রকম স্বাস্থ্য, তাতে পুষ্টিকর খাদ্য, ফলমূল, ওরও খাওয়া উচিত, কিন্তু ঘাসপাতা খেতে ওব ভাল লাগে না। ভেজাল তেলে ভাজা হলেও মুখরোচক কিছু পেলে তাই খায়। পেটেব পুবনো অসুখটা এমনিও সারবে না যখন, আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী।

কিন্তু ওই পর্যন্ত।

এমন কোনও অনুচিত কাজ আমি করিনি, করি না—দুলাল ট্রেনের কামবায় বসে বসে ভাবতে লাগল—যাতে আর কারও অনিষ্ট হয়। আমার বয়েস এখন আটত্রিশ, একটা মেয়ের সঙ্গে শোওয়া তো দূরের কথা, ঘনিষ্ঠভাবে বসিনি, গায়ে হাত দিইনি জীবনে। আমি কাজে ফাঁকি দিই না, ওভারটাইম কামাবার জন্যে দিনেরবেলা টাইপ মেশিনের দিকে চেয়ে বসে থাকি না। আপিস থেকে পেনসিলটা, কাগজটা ইচ্ছে করলে সরাতে পারি, সবাই সরায়, আমি না। এমনকী ডায়েবি-ক্যালেন্ডার পর্যন্ত এলে পালিত সাহেবের জন্যে রেখে দিই।

আমার থার্ড ক্লাসের মাসিক টিকিট, কখনও ফার্স্ট ক্লাসে চেপে শিয়ালদা যাই না। ভিড় সহ্য করতে না পারি, ভিড় এড়িয়ে একটা ট্রেন আগে বা পরে যাব। কিন্তু যা ঠিক না, যা অন্যায়, যা বেআইনি, তেমন কাজ কেন করব। আমি করি না পারতপক্ষে।

পাশের অডিট আপিসের মদন ঠাট্টা করে। আমি কান দিই না। ও বলে, দুলালদা, পয়সা কামাবার দিকে তোমার নজর নেই, বিয়েথাও করলে না, এবার দুলালানন্দ স্বামী নাম নিয়ে গেরুয়া পরে বেরিয়ে পড়ো। সংসারে বড় জ্বালা। আবার কখনও শোনায়, অসৎ কাজ করতেও সাহস লাগে, বুদ্ধি লাগে। অনেক সময় ভিতু ও বোকা মানুষকে ভালমানুষ বলে মনে হয়।

এ-সব প্ররোচনা, আমি জানি। সাতে নেই, পাঁচে নেই—আমি নির্বিবাদী মানুষ। ভিতু তো ভিতু। বোকা তো বোকা।

কিন্তু এই যে দশ-দশটা টাকা আমার, আঙুল ব্যথা করে, সারাদিন ছাদ পিটিয়ে রোজগার করা

টাকা,—তুমি কাউন্টারের পেছনে বসে ভিজে বেড়ালের মতো মুখ করে ঠকিয়ে নিলে কেন? সত্যি আমি কিন্তু বোকা নই। হলে, এই তিন-চার দিনের মধ্যে কি তিনটে টাকা উশুল করতে পারতাম? পারতাম না। প্রথম একটা টাকা মাদুলি রিনিউ করার সময়—কেমন মুখ করে বললাম, আট আনা কি পরে নিয়ে যাব? আসলে, লোকটা আমায় তিনটে টাকা ফেরত দিয়েছিল, আমারই ওকে আট আনা ফিরিয়ে দেবার কথা। কী ভেবে সে কেমন দিয়ে দিল নিজেই। 'ইতি গজ'র মতো নিচু গলায় অবশ্য বলেছিলাম—আমি দুঃখিত। আর আজকের দুটো টাকা? না, আমি অন্যায় করিনি। সেই বিশেষ লোকটার পকেট থেকে কোনও দিনই আমি দশ টাকা উদ্ধার করতে পারতাম না। আমি অন্যভাবে তুলে নেব।...

দমদম ছাড়িয়ে ট্রেনটা এবার স্পিড নিয়েছে। ঠান্ডা হাওয়া লাগছে গায়ে। জানলার দিকে চেয়ে দেখল দুলাল বাইরেটা অন্ধকার ঘুটঘুটে। আকাশে তারা ফুটফুট করছে। পাশে-রাখা থলেটা থেকে সোয়েটার বার করল, শার্টের ওপর গলিয়ে নিল। তারপর মাফলারটা জড়িয়ে নিল গলায়। কামরার ভেতর চেয়ে দেখল, অনেকেই নেমে গেছে। চার-পাঁচ জন যারা বসে বসে ঢুলছে, তারা একটু দূরের যাত্রী, হাবড়া গোবরডাঙা পর্যন্ত যাবে, তাই নিশ্চিন্ত। একজনকে মনে হল ওর সঙ্গে এক স্টেশনে নামবে, তবে সে কলোনিব বাসিন্দা, ডান দিকেব রাস্তা ধববে। অর্থাৎ, স্টেশন থেকে আধ মাইল পথ ওকে একাই হাঁটতে হবে আজও। এই ট্রেনে ফিবলে সঙ্গী পাওয়া যায় না বড় একটা।

হঠাৎ চোখেব ওপর তীব্র টর্চের আলো পডতেই চমকে উঠল দুলাল। অন্ধকাব পিচের রাস্তা ধরে হাঁটছিল। নিজের চটির চটাস চটাস শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনছিল না। জায়গাটার দু'পাশে ফাঁকা শস্যহীন মাঠ। দূরে টিমটিম করে দুটো-একটা আলো জ্বলছে পল্লির। যারা এখন, এই রাত সাড়ে ন'টার সময়ে জেগে আছে। তা ছাড়া সমস্ত অঞ্চলটাই নিস্তব্ধ, নিঃঝুম।

বেশ ভয় পেয়ে গেছে দুলাল। চেঁচিয়ে উঠল, "কে?"

টর্চের আলো একটু এগিয়ে এল ওর দিকে। তারপব একজনের গলা শুনতে পেল, "আপনি কে?"

কিছু বলার আগেই আর-একজন বলে উঠল, "আরে, দুলালদা।"

টর্চটা নিবে গেল।

প্রথমজন বলল, "চালান, তাড়াতাড়ি পা চালান। এত রাত্তিবে"—

এবার অন্ধকারের মধ্যেও দুলাল পরিষ্কার দেখতে পেল দুটি ছেলেকে। খালি-গা, পরনে কালো প্যান্ট। একজনের হাতে প্রকাণ্ড টর্চ, অপব জনেব হাতে একটা খোলা ছুরি। ওদের পাশে আর ক'জন লোক একটা বন্ধ মোটরসাইকেলে বসা।

মানুষ দেখে মোটরসাইকেলে বসা লোকটি ককিয়ে কেঁদে উঠল। "বাঁচান, আমাকে বাঁচান, দাদা। এরা আমায় মেরে ফেলবে।"

দুলাল পা চালানো বন্ধ কবে লোকটিব দিকে এগিয়ে গেল।

মোটাসোটা চেহারা। চোখে চশমা। পুরো-হাতা সোয়েটার গায়ে, টেরিলিনের প্যান্ট। বাঁ হাতের কবজিতে চিকচিক করছে ঘড়ি।

ছেলে দুটির দিকে চেয়ে দুলাল জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপার কী? এই শীতে খালি-গায়ে এখানে কী করছ তোমবা?"

মুখচেনা। স্টেশনের ওপাবে কলোনির ছেলে ওরা। চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে দেখে প্রায়ই। বেকার।

প্রথমজন বলল, "একটা শিকার ধরেছি। ঘড়িটা আর সোয়েটারটা চাইছি, ব্যাটা কিছুতেই দেবে না। ওকে এই মাঠে পুঁতে ফেলব আজ।"

দুলাল কৌতুক বোধ করল। ওর আটত্রিশ বছর বয়সের জীবনে কেউ ওর কাছে প্রাণভিক্ষা করেনি। দুলালের মতো একজন অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তির সামনে হাত জোড় করে একটা মানুষ—এই রকম সুবেশ, হৃষ্টপুষ্ট, মোটরবাইক হাঁকানেওলা—'আমাকে বাঁচান' বলে অনুরোধ করবে কোনওদিন, ও স্বপ্নেও ভাবেনি।

"তোমরা থামো তো, আমি দেখছি।"

দুলাল লোকটির কাছে আর একটু এগিয়ে গেল। তার কাঁধের ওপর হাত রাখল আলতোভাবে।

তারপর বলল, "দিয়ে দিন না। এরা যখন চাইছে। প্রাণটা তো বাঁচবে। এত রাতে কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"সোদপুর। আমার শ্বশুরবাড়ি। ভেবেছিলাম, সন্ধে সন্ধে পৌঁছে যাব। স্টার্টারের গোলমাল, দেরি হয়ে গেল। আপনি এদের বলুন ছেড়ে দিতে, প্লিজ।"

ছেলে দুটির একজন চেঁচিয়ে উঠল, "ফের! দিল্লাগি হচ্ছে! এখনও বলছি, ভালয় ভালয়—নইলে—"

দুলাল শান্ত গলায় লোকটির উদ্দেশে কথা বলল আবার।

"দেখুন, রোজ তো আপনার মত পার্টি এমন সময় পাস করে না। আজ এই ছেলেদুটি আপনাকে পেয়েছে ওদের মধ্যে, আর ওদের মনের কথা বলারও সুযোগ পেয়েছে। আপনি অবশ্য যদি একটা ঝটাপটি চান তো আলাদা কথা, না হলে, আমার মনে হয়, মানে মানে—"

এত গুছিয়ে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলল দুলাল যে লোকটি খেপে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। বলল, "আপনাকে ভদ্রলোক ভেবেছিলাম, আসলে আপনিও এই গুন্ডাদের দলে—ছিঃ।"

"না, আমি স্থানীয় লোক। এদের চিনি।"

প্রথমজন কনুই নেড়ে এগিয়ে এল আবার। ডান হাত বাড়িয়ে, আঙুলগুলো ছড়িয়ে বলল, "দিন দিন, চটপট সোয়েটারটা দিন। শীতে মরে গেলাম।"

দ্বিতীয়জন বলল, "টায়ার দুটো ফাঁসিয়ে দিই দুলালদা?"

নেতাব ভূমিকা পেয়ে দুলাল গম্ভীর। অকিঞ্চিৎকব এই মানুষটার মধ্যে যেন আত্মবিশ্বাস জেগে উঠেছে হঠাৎ।

বলল, "দরকার হবে না। ভদ্রলোক এমনিই দেবেন।"

ফুটফুট করছে আকাশে তারা। পশ্চিম দিকেব আকাশে একটু আলোর আভা, ওদিকটায় কলকাতা। এখানে অন্ধকারের মধ্যে জোনাকি ঘুরছে এদিক-ওদিক। শিশির ঝবতে শুরু করেছে।

দুলাল নিজের টর্চটা জ্বালাল। দ্বিতীয়জন ছুরিটা বাগিয়ে ধরে আছে। ওরা পরবর্তী দৃশ্যের জন্য অপেক্ষা করছে।

লোকটি প্রথমে হাত থেকে ঘড়িটা খুলল। দুলালের হাতে দিল। তারপব মাথা গলিয়ে খুলে আনল পুরোহাতা সোয়েটার। সেটাও সমর্পণ করল দুলালেরই হাতে। যেন উপস্থিত তিনজনের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। দুলাল লক্ষ করল, লোকটির শার্টের পকেট থেকে মানিব্যগ উঁকি মারছে।

কাজ সারা হলে পর মোটরবাইক থেকে নেমে দাঁড়াল লোকটি। পা দিয়ে চেপে স্টার্ট দিতে যাচ্ছে, দুলাল বলল, "ব্যাগটা দেখি একবার।"

ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে, অথচ ভয়ও পেয়েছে। পকেট থেকে টেনে বার করে সেটাও দিয়ে দিল। বলল, "ওতে কিছু দরকারি কাগজপত্রও আছে।"

ব্যাগটা খুলল দুলাল। টর্চের আলোয় প্রথমেই একটি মেয়ের পাসপোর্ট সাইজের ছবি চোখে পড়ল ওর। বাঁকা সিঁথি, বেণীটা বুকেব ওপর ঝোলানো। বেশ মিষ্টি চেহারা।

"বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে, কে এটি?" দুলাল খোঁচা দিল।

"আমার স্ত্রী। বিয়ের আগের ছবি। এখন খুব অসুস্থ।"

একটা ভাঁজ-করা কাগজ। খুলে দেখল, কী সব হিজিবিজি লেখা। দুলাল প্রশ্ন করাব আগেই লোকটি বলল, "প্রেসক্রিপশন। কলকাতা থেকে ওষুধ কিনে নিয়ে যাচ্ছিলাম। ওগুলোও চাই?"

"না, লাগবে না।"

এরপর টাকাগুলোর দিকে চোখ পড়ল দুলালের। ছোট ছোট নোট। এক টাকা, দু'টাকা, পাঁচ টাকা করে এক গোছা। নোটগুলো তুলে নিজের পকেটে রাখল। তারপর ব্যাগটা মুড়ে ফিরিয়ে দিল।

বলল, "যান। শিগগির বাড়ি যান। আর একটুও দেরি করবেন না।"

মোটরবাইকে স্টার্ট দিল লোকটি। হেডলাইট জ্বলে উঠল। প্রচণ্ড শব্দে নির্জন জায়গাটা গমগম করে উঠল অনেকক্ষণ পরে।

একটু এগিয়ে গিয়ে লোকটি থামল একবার। পিছন ফিরে চেয়ে দুলাল ও অন্য ছেলে দু'টির উদ্দেশে কয়েকটা খিস্তি ছুড়ে দিয়ে চলে গেল। বাইকের পিছনে দুটি লাল রক্তবিন্দুর মতো আলো মিলিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত সেই দিকে চেয়ে রইল তিনজন।

দ্বিতীয়জন ছুরিখানা বাগানো অবস্থায় দুলালের কাছে এসে বলল, "ঘড়িটা আমার। লোকটাকে ধরেছি আমি।"

প্রথমজন বলল "সোয়েটারটা আমার। বেশ নরম আর পুরু। সত্তর-আশি টাকা দাম হবে, তাই না? শালা, প্রথম দিনে বিজনেস মন্দ হয়নি।"

হাত খালি করে দুলাল পকেট থেকে নোটগুলো টেনে বার করল। ভাঁজ খুলে একটি একটি করে গুনল। উনিশ টাকা।

সাতটা টাকা নিজের কাছে রাখল দুলাল। বাকি বারো টাকা সমান ভাগ করে দিল দু'জনকে। বলল, "আমার মজুরিটা কেটে নিলাম।"

প্রথমজন বলে উঠল, "সে কী দুলালদা, তুমি আরও নাও।"

দ্বিতীয়জন বলল, "লোকটা যা ভ্যানতাড়া মারছিল না, ঠিক খাপ পাচ্ছিলাম না মাইরি। দুলালদা এসে বেশ ম্যানেজ দিলে।"

গলার স্বরে কৃতজ্ঞতা, দু'জনে ওরা খুশিতে হাসছে। দুলাল ওদের দাঁত জ্বলে উঠতে দেখল। তারপর ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "না, এ উচিত নয়, এ অন্যায়। কাজটা তোমরা ঠিক করছ না।"

তারপর হনহন করে হাঁটা দিল। হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে হল, দুটি লাল রক্তবিন্দুর মতো আলো হঠাৎ অন্ধকাব থেকে উঠে যদি ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, জিজ্ঞেস কবে, দুলাল, এ তুমি কী করলে, তখন ও বলবে, বলতে পারবে বুক ফুলিয়ে, "যা করেছি আমি ঠিক কবেছি।"

১৯৭৪

অন্য রকম

এমন না যে অরণি ক্রিকেট বোঝে, ক্রিকেটের ব্যাকরণ জানে, বা বিশেষ বিশেষ মার কিংবা ডেলিভারি সার্থকভাবে ঘটতে দেখলে উত্তেজিত বোধ করে। বরং উলটোটাই। পাঁচ দিন ধরে এক নাগাড়ে এই ঠুকঠাক, ঠুকঠাক গড়ানো বিষম একঘেয়ে। বিশেষ করে, ওর মতো একজন ব্যস্ত মানুষের পক্ষে, পাঁচ পাঁচটা দিন কাজকর্ম শিকেয় তুলে মাঠে কাটিয়ে দেওয়া—একেবারে অভাবনীয়।

তবু পঞ্চান্ন টাকার টিকিটটা ও নিয়েছে। নিজে থেকে গরজ করে হয়তো কিনত না, কিন্তু মক্কেল একজন যখন বলল, 'পালিত সাহেব, থার্ড টেস্ট দেখবেন?'—তখন ও রাজি হয়ে গেল হঠাৎ। দিল্লির উদ্যোগভবনে যদি মক্কেলের ডাক না পড়ত, তা হলে এই ডিসেম্বরের শেষে অরণি আপিস কামাই করত না। যদিও, পঞ্চান্ন টাকার টিকিটটা নাড়তে নাড়তে দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারে ও দেখল, খেলার পাঁচ দিনের মধ্যে তিনটেই ছুটির দিন। শুক্র আর শনি—দুটো দিন, শনিবার তো হাফ। খেলার অফ-ডে সোমবার, সেদিন ও আপিসে আসবে।

অরণি, পঁয়তাল্লিশ, ছোটবেলায় অন্য ছেলেদের মতো ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছে। স্কুলের গণ্ডি পার হবার পর অবশ্য খেলাধুলোরও ইতি। কারও কারও খেলা দেখার আগ্রহ অনেক বেশি বয়েস অবধি থাকে। অরণির থাকেনি। অল্প বয়সে জীবনসংগ্রামে শামিল হয়ে যাওয়ার ফলে যেমন ওর মিছিলটিছিল বা প্রেম করা হয়নি। প্রথম বয়সের সংগ্রাম ব্যর্থতার সঙ্গে জীবনের, তারপর এক সময় থেকে, সফলতার সঙ্গে জীবনের।

অরণি পালিত একজন পেশাদার অডিটর। নিজের আপিস চৌরঙ্গি এলাকায়। দশ বছর—না, ঠিক দশ নয়, বছর আটেক হল, মাত্র এক টাকা বর্গফুট দরে প্রায় সাজানো এই পাঁচশো বর্গফুট জায়গা ও অধিকার করেছে। সেই সময় যখন মাড়োয়ারিরা আপিস, কারখানা,—সব তুলে নিয়ে যাচ্ছিল কলকাতা থেকে। সেই সময় যখন ফরিদাবাদ, পুণা, গাজিয়াবাদ—এইসব অঞ্চল দ্রুত শিল্পনগর হয়ে উঠছিল।

উঠে আসার আগে পর্যন্ত অরণি পালিত অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ছিল হেস্টিংস স্ট্রিটের

সেই লম্বা বাড়িটার এক খুপরিতে, যে বাড়িটার নীচের তলায় অতি পরিচিত দক্ষিণ ভারতীয় কাফে। একশো কুড়ি টাকা ভাড়া, ভাগাভাগির টেলিফোন। দুটো টেবিল, ছ'টা চেয়ার বাদে সেই ঘরের আর সব আসবাব—অর্থাৎ ময়লা দেয়াল, শেল্ফ, একটা লোহার আলমারি, মায় হেলমেটের মতো মাথাওলা সশব্দ পাখাটা অবধি ওই একশো কুড়ি টাকা ভাড়ার মধ্যে, কারণ ওগুলো, মূল ভাড়াটে যিনি, তাঁর সম্পত্তি। বেয়ারা ও টাইপিস্ট দু'জন—তারাও ভাগাভাগির ছিল অনেক কাল, উঠে আসার দেড়-দু'বছর আগে সম্পূর্ণভাবে অরণির আপিসে যোগ দেয়।

দিনে শিক্ষানবিশী, সন্ধ্যায় কলেজ—এই করে পরীক্ষায় পাশ করেছিল অরণি। চাকরি করবে না বলে যৎসামান্য পুঁজি সম্বল করে খুলেছিল ছোট্ট আপিসটা। তাও সম্ভব হয়েছিল এক প্রবীণ সলিসিটরের সৌজন্যে। না হলে হাইকোর্ট পাড়ায় টেবিল পাতার জায়গা পাওয়া কি মুখের কথা। প্রথম আট-দশ বছর যাকে বলে ব্যর্থতার সঙ্গে জীবনের অবিরাম সংগ্রাম এবং তার ওপর বাবার অসমাপ্ত দায়িত্ব পালন। তার মধ্যেই প্রজাপতির নির্বন্ধে বিয়ে, শুভ্রার সঙ্গে অরণির, কারণ বয়েস বহে যায়। তারপর থেকে শুরু হয় নিভৃতে উভয়ের পরীক্ষা। জন্মশাসনের স্নায়ুযুদ্ধ।

অরণির কাছে সবটাই জীবনসংগ্রামের অংশবিশেষ। ব্যবসায়ে পসার বাড়বে ক্রমশ, অপেক্ষা করো। সচ্ছলতা আসবে একদিন, অপেক্ষা করো। সবদিক থেকে প্রস্তুত না হয়ে নতুন শিশুকে ডেকে এনো না।

বিপদ হয়েছিল একবার। কোনওক্রমে সে-বিপদ কাটিয়ে উঠেছে শুভ্রা। তারপর মেনে নিয়েছে। নিরাপদ দাম্পত্যজীবন যাপনের কৌশলগুলি মেনে নিয়েছে স্বামীর কথামতো। পিছিয়ে দিয়েছে ওব শিশুদের আসার দিন।

অরণি পালিত অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, নামের এই প্রতিষ্ঠানটিতে আজ খোদ মালিক ছাড়া আরও দু'জন অংশীদার, উনিশজন কর্মচারী তাদের মধ্যে একজন মহিলা রিসেপশনিস্ট। তিনটি টেলিফোন লাইন। মাসিক খরচ দশ হাজাব টাকা। তিন অংশীদারের ঘবে কুলার বসানো—অবণিব ঘরটি অন্য দু'জনের চেয়ে যথেষ্ট বড়।

আজ সাত বছর হল অরণির নিজস্ব গাড়ি হয়েছে। পাঁচ বছর হল নিজস্ব বাড়ি করেছে দু'লাখ টাকা খরচ করে। ওদের দুটি সন্তান, মিষ্টু, ছেলে সবে দশ বছরে পা দিয়েছে, আব টাইনি, মেয়ে, পাঁচ। এই দু'জন ওর সফলতার মাইলস্টোন। শুভ্রা মোটা হয়েছে, আরও ফরসা হয়েছে এখন। ঢলঢল করে ওর সুখী ও অলস পঁয়তিরিশ বছর বয়সের শরীর। জুলপিতে পাক ধরেছে অরণির। মুখের ওপরের চামড়া একটু ঝুলে দাগ ফেলেছে নাকের দু'পাশে। ওর চশমায় দু' রকম শক্তির কাচ। ডাক্তার বলেন, রক্তের গাঢ়তা আয়ত্তের মধ্যে রাখা দরকার। পুরনো দিনের কথা অরণির মনে পড়ে এখনও, শুভ্রার পড়ে না।

নীচের তলায় ভাড়া। গ্যারেজটা অবশ্য নিজেদের। দোতলায় বসার ঘর, তা ছাড়া আরও তিনটে ঘব। একটায় ওরা দু'জন, একটায় দিদার সঙ্গে মিষ্টু আর টাইনি শোয়। আর একটায় বাচ্চাদের পড়াশুনো, খেলা। তিনতলায় একখানা ঘর, অরণির কাজকর্মের জন্যে রাখা। আপিসের মতো করেই সাজানো। ও বলে, অবসর নেবার পর ওই ঘরটা ঠাকুরঘর হবে।

বিভিন্ন বয়সের, অরণির মতো মানুষ লক্ষ করলেই দেখা যায়। এই রকম চরিত্রের মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নেই, তাই এদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখা হয় না।

বাঁধা ছকের মধ্যে চলতে চলতে অরণি একটু থমকে দাঁড়িয়েছে মাত্র। পাঁচ দিনের ক্রিকেট—এই পাঁচ দিন ও সব কাজকর্ম থেকে ছুটি নিয়েছে।

বিস্তর জাল টিকিট বিক্রি হয়েছে, কাগজে এ-খবর পড়ে গতকাল অরণি সকাল সকাল ইডেনে উপস্থিত হয়েছিল। জটিল গোলকধাঁধা অতিক্রম করে নিজের আসনটি চিনে নিতে ওর বিশেষ অসুবিধে হয়নি অবশ্য। ওর আসনের জন্যে আর কোনও দাবিদার ছিল না, এই যা সৌভাগ্য। না হলে, গ্যালারির এপাশে-ওপাশে যা প্যানডিমোনিয়ম সৃষ্টি হতে দেখল টেস্ট ম্যাচ শুরু হবার আগেই, তাতে মনে হয়েছিল, খেলাটা ভন্ডুল না হয়ে যায়! শেষপর্যন্ত হয়নি। আবার, মাঠে গিয়েই জানতে পারল, পর পর দুটো টেস্ট ম্যাচ হেরে ভারত তৃতীয়বার ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে মোকাবিলা করতে এসেছে ইডেনে। খেলাটা আদৌ পাঁচ দিন পর্যন্ত চলবে কিনা, নাকি তার আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের অসুরেরা পিটিয়ে আমাদের তক্তা করে দেবে, এই ছিল অধিকাংশ দর্শকের দুশ্চিন্তা।

যে যাই বলুক, খেলাটা, অর্থাৎ প্রথম দিনের টেস্ট ম্যাচ, উপভোগ করছে অরণি। খেলা দেখতে

দেখতে, আশপাশের মন্তব্য শুনতে শুনতে শিখে ফেলেছে কিছু ক্রিকেটের ব্যাকরণ, জেনেছে ক্রিকেট ইতিহাসের নানা স্মরণীয় সব ঘটনা, ইতিহাস। অন্য এক জগৎ, যার সঙ্গে অরণির পরিচয় ছিল না এতদিন। বা, ছিল অতি অল্প, বাইরের পরিচয়।

যেমন পতৌদি। নবাববাড়ির ছেলে, নিজেও নবাব। তার ছবি দেখেছে কাগজে, সাময়িকপত্রে—লম্বাটে মুখ, ঘাড় পর্যন্ত চুল, একটু বাঁকা খড়্গের মতো নাক। কিন্তু কাল স্বচক্ষে দেখল এই অভিজাত বংশের ছেলেটির খেলা। দেখল হোল্ডারের এক ওভারে এই সিংহশিশুটির যাকে বলে জ্বলে ওঠা। পতৌদি শুধু খেলোয়াড় নয়, সে অধিনায়ক, ভারতদলের নেতা। ভারত আগের দুটি ম্যাচে হেরেছে। অধিনায়কের চেয়ে কে বেশি জানবে, খেলার মোড় এখুনি না ঘোরাতে পারলে একটি ম্যাচও ভারত জিতবে না।

অথচ শুরুতেই বিপদ। তিনটে উইকেট পড়ে গেছে। রানসংখ্যা বত্রিশ মাত্র। পতৌদিব বিরুদ্ধে বল করল রবার্টস। শর্ট পিচ বল। দ্রুত গিয়ে লাগল পতৌদির চোয়ালে, যেন হাতবোমার মতো ফাটল বলটা। বায়নাকুলারের মধ্য থেকে ঘটনাটা দেখল অরণি। শুনল, সাবা মাঠ হাহাকার করে উঠল হঠাৎ, এ কী, এ অন্যায়, বাউন্সার দেওয়া চলবে না, বার করে দাও রবার্টসকে। দেখল, তখনকার মতো বিদায় নিচ্ছে পতৌদি।

সকলের দুশ্চিন্তা, আঘাত কি গুরুতব? নবাব কি আর খেলবে না? কে হবে অধিনায়ক? কে খেলবে পতৌদির বদলে? বিশ্বনাথের সঙ্গে জুটিটা বাঁধতে পারলে আশা ছিল একটু, তা-ও গেল বোধহয়।

চায়ের দশ মিনিট আগে পতৌদি আবার মাঠে। চোয়ালে তালি। জনতার সংবর্ধনা, সে গম্ভীব। হোলডারের হাতে বল। আবার বাউনসার।

জ্বলে উঠল পতৌদি। এক ওভারে চার-চারটে বাউন্ডারি এবং উনিশ রান আদায় করে শান্ত হল। অবণি শুনল গ্যালারির প্রতিবেশীরা বলছে—প্রতিশোধ, কেউ বলছে, চোট খাওয়া বাঘ বাবা। ইয়ারকি। আবার রঙ্গপ্রিয় কেউ—দেখিয়ে দাও, জামাই, তোমার ফর্মটা ওদের দেখিয়ে দাও, বলে আনন্দ প্রকাশ কবছে। এত স্বতঃপ্রণোদিত, স্বতঃস্ফূর্ত এ আনন্দ ও উত্তেজনা, যে ভেতরে ভেতরে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল অরণিও গতকাল। আরাম পাচ্ছিল ওর স্নায়ু।

বাড়ি ফিরে মিষ্টুকে আরও কিছু উত্তেজিত মুহূর্ত গল্প করে শুনিয়েছে। ঝোলা-গোঁফ লম্বা-চুল, চশমা-পরা অংশুমান তার জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচে কীভাবে ওর ছত্রিশটা রান আদায় করে নিয়েছে, লাঞ্চেব একটু পরে কীভাবে ফরোয়ার্ড খেলে, পিছনে ক্যাচ দিয়ে মারে-র হাতে আউট হল বেচারা। অফ স্টাম্পের যথেষ্ট বাইরে বল দিয়ে লোভ দেখানো সত্ত্বেও কীভাবে ইঞ্জিনিয়র নিল দু'-তিনটে বাউন্ডারি। দেখিয়েছে, কীভাবে বিশ্বনাথ কবজি মুচড়ে ঘুরিয়ে দেয় বল, কীভাবে গিবসের একটা বল কাট করে মারেকে ক্যাচ দিয়েছিল সে, কিন্তু মারে সে বল ধরতে পারেনি।

সংক্রামিত উত্তেজনায় আস্ফালন করছিল মিষ্টু আর দিদার কোলে বসে, চোখ বড় করে টাইনি উপভোগ করছিল ব্যাপারটা।

অংশুমান কী করে পুল মেরেছে, কী করে বিশ্বনাথ বল ছুটিয়েছে লেগ অঞ্চলে, পতৌদির কভার ড্রাইভ কী রকম—নিজের খেলার ব্যাট ঘুরিয়ে মিষ্টু সেই সব মারের কাল্পনিক দৃশ্য অভিনয় করছিল আর জিজ্ঞেস করছিল, এইভাবে, বাবা? এই রকম, বাবা? নাকি এমনি করে? কখনও সমর্থন করছিল, কখনও বা সংশোধন করে দিচ্ছিল অরণি।

ইঞ্জিনিয়রের বাউন্ডারি পাওয়া একটা কাট-মার দেখাতে গিয়ে চিনেমাটির ফুলদানিটা গেল পড়ে। ফুলদানির পেটে ব্যাট লাগায় ভেঙে তিন টুকরো, সাজানো চন্দ্রমল্লিকাগুলো ছত্রখান। জলে ভিজে গেল কার্পেটের খানিকটা অংশ। ঝনঝন শব্দ হল। এক মুহূর্তে সব নিস্তব্ধ, আর হতচকিত মিষ্টু বলে উঠল, এই যা!

টাইনি খিলখিল করে হাসছে। ওকে কোল থেকে নামিয়ে দিদা ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োতে শুরু করলেন। দরোজার পাশে দাঁড়ানো স্তম্ভিত বালক মিষ্টুকে এবং সোফায় বসা পাঁচ বছরের শিশুকন্যা টাইনিকে বললেন, সাবধান, এদিকে আসবে না কেউ। যেখানে আছ, সেখানেই থাকো। একবার পায়ে ফুটলে রক্ষে নেই।

অরণি শশব্যস্ত হয়ে বলল, আপনি ছেড়ে দিন মা। তারপর হাঁক পাড়ল, পঞ্চু।

পঞ্চু আসার আগেই শুভ্রা এসে দাঁড়িয়েছে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্তে বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটা। তারপর হঠাৎ, হঠাৎই ঠাস ঠাস করে দুটো চড় কষিয়ে দিল ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে থাকা হতভম্ব মিষ্টুর গালে। মিষ্টু গালে হাত চেপে কাঁদতে লাগল। হাসি থামিয়ে কাঁদতে শুরু করে টাইনিও।

ধীর গলায় অরণি বলল, মারলে কেন?

উঠে দাঁড়িয়ে আহত বালকের মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন সুষমা। আদরজড়ানো গলায় বললেন মেয়েকে, খামোকা মারলি ছেলেটাকে।

শুভ্রার দু'চোখে জ্বলছে উষ্মা। বলল, বেশ করেছি। বুড়ো বয়েসে যত আদিখ্যেতা।

লক্ষ অরণি, সুষমা বুঝেছেন। আর বুঝেছেন বলেই অস্বস্তি বোধ করলেন। বললেন, দিন দিন তোর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাচ্ছে।'

শুভ্রা ঝাঁঝিয়ে উঠল, তুমি চুপ করো তো মা। আদর দিয়ে আর আমার ছেলেদের স্পয়েল কোবো না। এই এক ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছে। বাড়িতে তিষ্ঠোনো দায়।'

আমি তোর ছেলেমেয়েকে নষ্ট করছি। সুষমা ক্ষুব্ধকণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন—এই কথা তুই বললি।'

তারপর বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মিষ্টু আর টাইনি তাঁর পিছু পিছু নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বাগী প্রকৃতির হলে সংসারে অশান্তি বাড়ে। আগে অবণি রাগটাগ করত। ব্যবস্থামতো কাজ না হলে, কোনও ব্যাপারে অবহেলা, অন্যমনস্কতা বা বিশৃঙ্খলা লক্ষ করলে ও রেগে যেত। প্রিয়-অপ্রিয় বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ ও উপলব্ধি কবেছে যে ক্রুদ্ধ হওয়া বা ক্রোধ প্রকাশ করা—ব্যাপারটাই এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা। কারণ এর উপলক্ষ হচ্ছে মানুষকে ভয় পাওয়ানো, ভয় দেখিয়ে নিজের পথে আনা। অথচ অস্ত্র হিসেবে ভয় অব্যর্থ নয় কারণ যে ভীত তাব মনে জমা হয় ফোঁটায় ফোঁটায় বিদ্বেষ ও ঘৃণার বিষ যা সে ফিবিয়ে দেয় একদিন। তাৎক্ষণিক ক্রোধেব কবলে পড়ে যায় তবু অসহিষ্ণু মানুষ এবং পরে অনুশোচনা প্রকাশ করে, করতে বাধ্য হয়। তার চেয়ে বিবেচনা, অগ্রপশ্চাৎ ভেবে আচরণ করা ঢেব বেশি বুদ্ধিমানের কাজ।

তা ছাড়া, শুভ্রাও বদমেজাজি হয়ে উঠেছে সম্প্রতি। টাইনির জন্মের সময় জেদ কবে ও অপাবেশনটা না করালে হয়তো এটা হত না, অরণির ধাবণা। সেই অপারেশনেব সময় অনেক কিছু যেন বাদ চলে গেছে, এক-এক সময় মনে হয় অরণির। মনে হলে স্ত্রীর জন্যে কষ্ট হয়। মনে পড়ে বরাহনগর বাসের দিনগুলো। অসচ্ছল টানাটানির সংসারে শুভ্রার নীরব আত্মত্যাগ।

তখনকার মতো ধামাচাপা দিয়ে অরণি কথাটা পাড়ল আবার রাত্রে। শোবার সময়।

শুভ্রা দু'আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে মুখে ক্রিম মাখছিল। ড্রেসিং টেবিলেব সামনে ছোট টুলে বসা। পেছন দিক থেকে এসে কাঁধে হাত রাখল অরণি। গালের ওপর আঙুল থেমে গেল শুভ্রার। কথা বলল না।

'একটা কথা বলব?' অরণি জিজ্ঞেস করে।

বলো।

আয়নার মধ্যে স্ত্রীব মুখের দিকে চেয়ে অরণি বলে, 'আচ্ছা বলো তো, সত্যি কি তোমাব ধাবণা, তোমার বাচ্চাদের জন্যে আর কারও কোনও মাথাব্যথা নেই? তুমি ছাড়া কেউ ওদের ভালবাসে না? ওরা কি আমারও বাচ্চা নয়?'

'আমি কি তা বলেছি?'

দুমদাম মারধর করছ যখন-তখন। এই সেদিন টাইনিকে বাথরুমে বন্ধ করে রেখেছিলে শুনলাম। এমনি করে শাস্তি দিলে কি ওরা মানুষ হবে ভেবেছ?'

'দোষ করলে শাস্তি পাবে, না কি মাথায় করে নাচতে হবে? মা বা তুমি যা করছ সব সময়?'

'দোষ আর ভুল কি এক জিনিস?—অরণি স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করে, এখন কী অন্যায় করেছিল মিষ্টু? ফুলদানিটা কি ইচ্ছে করে ও ভেঙেছে?'

সে আমি জানি না। ওর ব্যাট লেগে ভেঙেছে কি ভাঙেনি? ব্যস।'

'ব্যস? তা কি হয়? তুমি আর কিছু ভেবে দেখবে না? এমনি করে তুমি ওদের শেখাতে চাও ন্যায়-অন্যায় বোধ, কী উচিত কী অনুচিত, তাই না? অথচ, ইন দ্য প্রসেস, নিজের মায়ের সঙ্গে তুমি যে রকম ব্যবহার করছ, তা থেকেই ওরা যে শিক্ষা নেবার নিয়ে নিচ্ছে, জানবে।'

টুল থেকে উঠে দাঁড়াল শুভ্রা। কাঁধের ওপর থেকে অরণির হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার মায়ের

সঙ্গে আমি কী রকম ব্যবহার করব তা তোমায় শিখিয়ে না দিলেও চলবে। আমি এখন ঘুমোব, বেশি বকবক করতে ভাল লাগছে না।' বলে ও শুতে যাবার উপক্রম করল।

'ঠিক আছে, অরণি বলল, আমি ওকে হস্টেলে দেবার ব্যবস্থা করছি। কষ্টে থাকবে কিন্তু নিয়মিত তোমার অত্যাচার সইতে হবে না সেখানে।'

বলে লেপের মধ্যে ঢুকে গেল অরণি, দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুল।

বাচ্চাদুটো দিদার কাছে ভালই থাকে, শুয়ে শুয়ে ও ভাবল। ভদ্রমহিলা বিচক্ষণ, অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ এবং, এই ষাট বছর বয়সে, যথেষ্ট কর্মঠ। বলতে গেলে, বাড়িটি তিনিই আগলে রাখেন। বরাহনগরের যৌথ পরিবার থেকে চলে আসার সময় কন্যার নিজস্ব সংসারটি গুছিয়ে দেবার জন্যে সুষমা কিছুকালের মতো এসেছিলেন সানি পার্কের এই নতুন বাড়িতে। তারপর রয়ে গেছেন, ফিরে যেতে পারেননি আর বড় মেয়ের বাসায়। একটা-না-একটা বাধা তাঁকে ফিরতে দেয়নি প্রথমে, তারপর ক্রমশ এ-বাড়ির একজন হয়ে গেছেন।

নির্বচনীয় কোনও কাজ আর শুভ্রার নেই এখন। কিছু দিন মায়ের ওপর কাজ ও দায়িত্ব চাপিয়ে, আবাম করে নিতে চেয়েছিল। ক্রমশ সে আরাম বা বিশ্রামই একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল। শুভ্রা হয়তো স্বীকার করবে না—বিভিন্ন সময়ে তিনজনের স্কুলে আপিসে বেরোনো, বিভিন্ন সময়ে ওদের স্কুল-আপিস থেকে ফেরা, কারও চুল আঁচড়ানো কারও নখ কেটে দেওয়া, এইসব করতেই কেমন দিন কেটে যায়। ফাঁকে ফাঁকে একটু বিছানায় গড়িয়ে নেওয়া—একে যদি কেউ আলস্য বলে, তো সে নিন্দুক বা জেলাস। শুভ্রার মতে, যদি আলসেমিও হয়, তবে সে-সুখটুকু ওর প্রাপ্য। অরণি ভাবে, আলসেমি থেকে সুখ আসে না— স্ত্রীকে বলতে ইচ্ছে করে, পরিশ্রম করার মধ্যে কোনও গ্লানি নেই, শুধুই কুড়েমি করে করে তুমি এত খিটখিটে হয়ে গেছ, এত অল্পে রেগে যাও, অসহিষ্ণু।

বিছানায় মানুষ নড়চড়া করার শব্দ হয়। একটু পরে পিঠে আঙুলের মৃদু খোঁচা অনুভব করে অরণি, 'এই শুনছ। ঘুমিয়ে পড়লে?'

'না।'

'মিষ্টুকে হস্টেলে দেবে, সত্যি?' শুভ্রার কাতর প্রশ্ন শোনে।

অরণি এপাশ ফেরে। মৃদু নীল আলো মাখা স্ত্রীর মুখের দিকে চায়।

'ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না, এক দিনও পারব না, বলে দিচ্ছি।'

মাঠে থাকলে খিদে-তেষ্টা দুইই একটু বেশি পায়। খেলোয়াড় যারা, তাদের তো পাবেই, তারা খেলছে, পরিশ্রম করছে, ছোটাছুটি করছে। খেলা দেখছে যারা, তাদেরও পায়।

খেলোয়াড়দের লাঞ্চের মেনু কাগজে বেরিয়েছিল, পড়ে অরণি নিজের মনে হেসেছে গতকাল। চিকেন-ক্রিম সুপ, ব্রেড-বাটার, সেদ্ধ সবজি, সেঁকা ভেটকি মাছ, চিকেন রোস্ট, আইসক্রিম, কলা, লেবু আপেল—এত খাদ্য গলাধঃকরণের পর, অরণির মনে হয়েছে, ওরা বলের পেছনে ছুটবে কী করে! কখন একটা বল এদিকে আসবে তার অপেক্ষা করতে করতে ফিল্ডাররা ঢুলবে না তো!

কিন্তু নিজেই অনুভব করল কাল, চার পিস স্যান্ডুইচ আর ছোট ফ্লাসকে একটুখানি কফি কী দ্রুত হজম। লক্ষ করেছে, পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাঞ্চব্রেকের সময় কী ভূরি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ধ্বংস করছে অন্যেরা, যেন খাবার জন্যেই এখানে আসা, খেলা দেখাটা উপলক্ষ মাত্র।

তবু আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা দেখতে আসার আগে সে নিজে বাড়ি থেকে বড় এক ফ্লাসক কফি ভরে নিল। কিন্তু আর কিছু নিল না। মনমেজাজ ভাল নেই।

মাঠে যাবার পথে গাড়ি থামিয়ে দোকান থেকে কিছু খাবার তুলে নিল। কয়েকটা প্যাটি, সন্দেশ, কলা। সবুজ সিঙ্গাপুরী কলাগুলো দেখতে কাঁচা কিন্তু খেতে খুব মিষ্টি হয় এই সময়। চেন-দেওয়া ব্যাগটা এতেই ভরে যায়।

ইডেনে পৌঁছোল যখন, তখন দশটা বাজতে অল্প কয়েক মিনিট বাকি। শেষ মুহূর্তে এসে গাড়ি পার্ক করাও আর এক ঝঞ্ঝাট, জায়গা পাওয়া যায় না গেটের কাছাকাছি। তবু কোনওক্রমে গাড়িটা এক জায়গায় ঢুকিয়ে দিতে পারল অরণি। ঘড়ি দেখল। কাচের শার্সি তুলল। লক করল দরোজাগুলো। তারপর অভ্যাসমতো টেনে টেনে দেখল।

নির্ধারিত জায়গায় এসে দেখে, ওর চিহ্নিত আসনে বসে আছে—আর একজন।

'এ কী? এ তো আমার জায়গা।' বলল অরণি ছোকরাটিকে।

টকটকে লাল ফ্লানেলের গুরু পাঞ্জাবি গায়ে। পরনে তদ্রূপ কালো বেলবটস। বুকপকেটের ভেতর থেকে নিজের সিজিন টিকিটখানা টেনে বার করল সে। তারপর বাড়িয়ে দিল অরণির দিকে, সানগ্লাসের আড়াল থেকে বলল, 'এই যে, মিলিয়ে নিন।'

গলা শুনে অরণি বুঝল, ছেলে না, মেয়ে। ওকে দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা কান ঢাকা চুল তো আজকাল ছেলেরাই রাখে। এই বয়সে, তা ছাড়া অনেকের দাড়ি-গোঁফ গজায় না তেমন। বেঢপ সানগ্লাসে লম্বা মতো মুখ তো প্রায় সবটাই ঢাকা, আর, ঢোলা পাঞ্জাবির নীচে কী আছে-না-আছে, এক নজবে বোঝা অসম্ভব। বিদ্যুতের মতো এইসব চিন্তা দ্রুত মনের মধ্যে খেলে যাবার পর অরণি নিজের টিকিটখানা বার করে, মেলায় এবং আসল নম্বর হুবহু এক দেখে অবাক হয।

'এ তো ডুপ্লিকেট দেখছি।' অরণি বলে, 'তোমারটা জাল টিকিট।'

'আরে! জাল টিকিট হবে কেন? আমি তো টাকা দিয়ে কিনেছি।'

'কোথা থেকে কিনেছ?'

'কোথা থেকে কী করে বলব। আমি নিজে গিয়ে তো কিনে আনিনি। একজন এনে দিয়েছে।'

এনে দিয়েছে—শুনে অরণির খেয়াল হয়, ওব টিকিটটাও তো অন্য লোক এনে দিয়েছে। কাউন্টার থেকে না কিনে সে যদি কারও মারফত পেয়ে থাকে, তবে ওরটাও জাল হওয়া অসম্ভব নয়। আবাব খটকা লাগে, মেয়েটা কাল তো আসেনি।

জিজ্ঞেস করে, 'টিকিট কিনেছ, তো কাল আসোনি কেন?'

'কালকে আসিনি মানে কাল তো টিকিটই পাইনি। কী করে আসব।'

মেয়েটা এবার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ক্ষিপ্র হাতে চোখ থেকে নামায় সানগ্লাস। কাব কাছে সুবিচার প্রার্থনা করবে ভাবতে ভাবতে অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকায়। তারপব পেছনে-বসা একজন টাকমাথা প্রৌঢ়ের শরণাপন্ন হয়।

যদি মাঠ থেকে বার করে দেয়, সেই ভয়ে মেয়েটার গলা কাঁপছে।

'দেখুন তো, এই ভদ্রলোক আমায় উঠে যেতে বলছেন। এটা আমার সিট।'

'কী মুশকিল।' অরণি তার হাতের ব্যাগটা সিঁড়িব ওপর নামিয়ে রাখে, 'এঁবা সকলেই তো কাল দেখেছেন, আমি এখানে ছিলাম। আজ হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলে তুমি? আমার নম্ববের একখানা টিকিট হাতে নিয়ে? আগেভাগে জবরদখল করে বসে আছ, অ্যাঁ?'

পাশের লোকেরা হেসে উঠল।

খেলোয়াড়রা মাঠে নামছে। হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে সারা মাঠের দর্শক।

টাক-মাথা বললেন, 'আর ঝামেলা বাড়াবেন না মশাই। খেলা শুরু হচ্ছে। বুঝতেই তো পাবছেন কী হয়েছে, তা একে দোষ দিয়ে কী লাভ! বসে পড়ুন, ঠেসাঠেসি করে বসে পড়ুন মশাই।'

ধারের সিটটার ডানদিকে চলাফেরার পথ। লোকজন আসছে। মেয়েটা একটু বাঁ দিকে সরে বসল। এক ফুটখানেক জায়গায় কোনও রকমে নিজেকে আঁটিয়ে নিল অরণি।

ভারতের প্রথম ইনিংসে রান সংখ্যা দুশো তেত্রিশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল পনেরো মিনিট মাত্র ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছে গতকাল। তার মধ্যেই ফ্রেডরিকস আর গ্রীনিজ মিলে চোদ্দো রান তুলে নিয়েছে। দর্শকেরা সন্ত্রস্ত, এই রেটে রান তুললেই তো হয়েছে।

শুরুতেই ঘাউড়ির বলে ড্রাইভ করে গ্রীনিজ বাউন্ডারি করল,—চার। আবার চার। একটা করে বল মারছে গ্রীনিজ যেন বুকে গিয়ে লাগছে। খেলা আরম্ভ হতে না হতেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

আবার একটা বল মারল গ্রীনিজ। স্কোয়ার-লেগ-এ দাঁড়ানো ফিল্ডার—কে ওটা—ছুট দিয়েছে, কিন্তু বলের কাছাকাছি আসার আগেই রুমাল ওড়ে, আম্পায়ারের হাত ডাইনে-বাঁয়ে অর্ধবৃত্তাকার ঘুরতে থাকে।

ফ্রেডরিকসের ব্যাটিংয়ে কোনও নাটক নেই। খুটখাট রান তুলে যাচ্ছে, জানতে দিচ্ছে না।

'এ জুটি না ভাঙলে বিপদ। আরও কয়েকটা এই রকম ড্রাইভ হাঁকড়ালে আর টিঁকতে হবে না।' অরণি মন্তব্য করে।

পেছনের টাকমাথা বললেন, 'বোলার পালটাও।'

'ড্রাইভ না, আগের বলটা হুক মেরেছে গ্রীনিজ।' অরণির পাশে-বসা মেয়েটা সামনের দিকে চেয়ে কথাটা বলল। তারপর মুখ ফিরিয়ে ডান দিকে, 'বায়নাকুলারটা একটু দেখি।'

ভাবটা, যেন ওর সম্পত্তি। একটু দেবেন? বলতে পারত, না বলে 'একটু দেখি' বলার মধ্যে একটা ধৃষ্টতা আছে, রুক্ষতা আছে অরণি যা পছন্দ করল না। এতটুকু মেয়ে, এর কথাবার্তা এ বকম যে—

বায়নাকুলার দিতে গিয়ে মেয়েটাকে ভাল করে দেখল।

বছর কুড়ি-একুশ বয়স হবে। খুব কালো নয় কিন্তু ময়লা রং। ছোট গড়ন সবকিছুর, কিন্তু টলটলে। মুখের ডানদিকে যে অংশ দেখা যাচ্ছে, সেখানে দু'-তিনটে মৃত বা আহত ব্রণ, গ্রীবা পর্যন্ত নেমে এসেছে চূর্ণ চুলেব বেখা। প্রসাধনহীন দুটি শাঁস ভবতি ঠোঁট। নিটোল কবজি ও দু'হাতের আঙুলগুলো দিয়ে ধরা বায়নাকুলারের মধ্যে বড় বড় চোখ দুটো ঢুকিয়ে, ঘুবে ঘুরে মাঠের কেন্দ্রস্থলটি দেখছে।

গ্রীনিজের বাউন্ডারি সংখ্যা ততক্ষণে চারটি। নতুন বোলার নামছে।

'ওই তো, মদনলালের হাতে বল। মেয়েটা নিজের মনে বলে।

মদনলালেব বলে গ্রীনিজ শান্ত। সুইং বড় বিশ্বাসঘাতক, ও কি জানে না? রানলোভীর মারণাস্ত্র ওর গুড লেংথ বলগুলো ফুলকো লুচির মতো এসে লোভ দেখাচ্ছে, কিন্তু গ্রীনিজ খেলছে না, ঠুকঠাক সামাল দিয়ে যাচ্ছে। ফ্রেডরিকসও তাই। ফোঁটায় ফোঁটায় রান উঠছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের, একজনও পড়েনি। আবহাওয়া একঘেয়ে।

অবণি বাঁ দিক ফিবে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'শিখা। শিখা চক্রবর্তী।' মেয়েটা সানগ্লাস খুলে, কোলের ওপর বেখে, সোজা অরণির দিকে চায়।

'পড়ো?'

'হ্যাঁ।'

'কী পড়ো?'

'বি এ, পার্ট টু'।

'কী বিষয়?'

'ইতিহাস, ফিলসফি।'

'অনার্স?'

'নাঃ।'

'তুমি ক্রিকেট খেলো?'

'না তো!' শিখা এবাব ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে হাসল। আলোকিত হল মুখটা, আর অরণি দেখল ওপরের পাটিতে ওর দুটি দাঁত, দু'পাশে দু'টি, একটু উঁচু—যাকে বলে গজদন্ত। কেউ কেউ মনে করে, গজদন্তী মেয়ে সুলক্ষণা নয়, কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, ছোট মেয়েটিকে ওর মিষ্টি লাগল। বিশেষ করে যখন সব আড়ষ্টতা কাটিয়ে ও সহজভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

'তা হলে কী করে শিখলে কোনটা কোন মার?'

'কেন? কাগজ পড়ে, বই পড়ে। ক্রিকেটের সবকিছু খুব ইনটারেস্টিং, জানেন, খেলাটা যদিও স্লো। ওগুলো জানা থাকলে খেলা দেখতে মজা লাগে। আর, রেডিয়ো কমেন্টারি শুনে বোঝা যায়।'

ওরা শুনল, পেছনে-বসা টাকমাথা ভদ্রলোক কাউকে বলছেন, 'দূর, কী খেলছে এরা! ফ্র্যাঙ্ক ওরেলেব পায়ের যুগ্যি না। দেখেছিলাম ওর খেলা কানপুরে। সেটা হবে নাইনটিন—'

অরণি বলল, 'আমি কিন্তু খেলার কিচ্ছু জানি না।'

'তা হলে দেখতে এলেন কেন? মানে, যদি খেলা ভাল না বাসেন—'

'সত্যি কথা বলব? আমি রিলাক্স করতে এসেছি। কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে, বা কাজ থেকে পালিয়ে মাঠে কাটানো।'

'আপিস থেকে পালিয়ে এসেছেন? কাউকে না বলে? পালানো যায়?' অবাক হল শিখা।

অরণি বলল, 'কেন, তোমরা কলেজ থেকে পালাও না? ক্লাস ফাঁকি দাও না?' বলে কৌতুক চোখে হাসল।

'সে তো আলাদা। কিন্তু আপিসে তো দারোয়ান টারোয়ান, তালাবন্ধ গেটটেট থাকে—আমার ধারণা। তাই—'

'ঠিকই বলেছ। আপিসে ঢের কড়াকড়ি। ছুটি নিতে হয় ওপরওয়ালার কাছে, দরখাস্ত করতে হয়। ছুটি পাওনা না থাকলে মাইনে কাটা যায়। কিন্তু আমার হল নিজের আপিস, সেখানে কে আমায় ছুটি দেবে আর কার কাছেই বা দরখাস্ত করব বলো? তাই পালিয়ে এসেছি, পাঁচদিন সব কাজ থেকে দূরে থেকে যদি নার্ভগুলো একটু শান্ত হয়।'

'নার্ভগুলো শান্ত হয়' শুনে শিখা চোখ আরও বড় করে তাকাল অরণির দিকে।

গোল মুখ, একটু ভারিক্কি চেহারা। বুদ্ধিমাজা শান্ত চোখ। চোখের নীচে ছোট ছোট দুটো থলি। ভুরুদুটো চোখের বড় কাছে। একটু যেন ক্লান্ত, না না, ওর চোখের ভুল, ভদ্রলোকের নিশ্চয় অনেক দায়িত্বের ভার আছে তাই এ রকম মনে হয়েছিল। বাবার সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে ভদ্রলোকের, শিখার মনে হল, যদিও ইনি বাবার চেয়ে ঢের ছোট বয়সে। কথাটা মনে হতেই ভাবনাটাও মন থেকে তাড়িয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে, না না, বাবার মতো হতে যাবে কেন, বাবার সঙ্গে কোনও মিলই নেই। বাবা আরও ফরসা, আরও গম্ভীর, রাশভারী।

বলল, 'আপনি বুঝি খুব নার্ভাস টাইপ? আমিও না—'

এমন সময় হঠাৎ সারা মাঠ গর্জন করে উঠল, আউট, আউট!

চমকে উঠে অরণি মাঠের দিকে চাইল। দেখল, লম্বা সাদা কোট ও টুপি-পরা আম্পায়ার ডান হাতের তর্জনী তুলে স্থির দাঁড়ানো।

বায়নাকুলারটা আবার তুলে নিয়েছে শিখা। দাঁড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনায়। লাফাচ্ছে। 'গ্রীনিজ আউট। বেদি ক্যাচ ধরেছে। কুড়ি রান করেছে মাত্র। ওই তো মাঠে আসছে—কে ওটা?—কালীচরণ। শাবাশ বেদি, শাবাশ মদনলাল।'

লাল পাঞ্জাবির কোণা ধরে টান দিল অরণি। বসে পড়ল শিখা। বলতে লাগল, 'বাঘা উইকেট পড়েছে, এবার দেখবেন এক এক করে—'

সকলের মন আবার মাঠের দিকে নিবদ্ধ। কী হয় কী হয়। মদনলালেব ষষ্ঠ ওভারের দ্বিতীয় বলে গেল গ্রীনিজ। তৃতীয় বল, নো রান। চতুর্থ বল—ড্রাইভ করতে গেল কালীচবণ। গোল ক্যাচ, লাফিয়ে ধরল পতৌদি। আবার আউট। শূন্য রান করে কালীচরণের বিদায়।

আনন্দিত শব্দে, হাততালিতে ভেঙে পড়ছে ইডেন। কেউ লাফাচ্ছে, কেউ হাততালি দিচ্ছে, কেউ রুমাল, টুপি বা অন্য কিছু তুলে নাচছে। উদ্দীপনার জের এবার অরণিকেও স্পর্শ করল। শিখার পাশে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড হাততালি দিল সে-ও। দেখল, মেয়েটা চুল ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলছে, 'বলেছিলাম না, এবার ধসে যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ! কেমন ফলে গেল।'

ইচ্ছে করল ওর চুলগুলো মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দেয় হাত দিয়ে। নিশপিশ করছে হাত। কিন্তু সরাল না।

বলল, 'শান্ত হয়ে বোসো তো। এত লাফালাফি করছ কেন? বুক ধড়ফড় করবে না? নার্ভাস টাইপ—'

হঠাৎ চুপ করে যায় শিখা। মাথা নিচু করে একবার নিজের জামাটার দিকে তাকায়। তারপর, এই বয়েসের যে-কোনও মেয়ের মতো, ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি হানে অরণির প্রতি, ওর বাঁ হাতে কবজির চামড়ায় কুট করে চিমটি কেটে দিয়ে বলে, 'আপনি ভারী চালাক।' বলতে চায়, আপনি বেশ পাজি লোক তো!

অমনি খপ করে ওর হাতখানা ধরে ফেলে অরণি। মুঠোয় ধরে চাপ দেয় একটু। অনুভব করে, পুরুষের পোশাকের আড়ালে শিখা একটি স্বাভাবিক মেয়ে। কচি নরম ফোলা ফোলা ওর হাতটা তুলে ধরে একটু। অনামিকায় শাঁখের আংটি দেখে জিজ্ঞেস করে, 'এটা কী?'

'গয়না। শান্তভাবে বলে শিখা।

তারপর কড়ে আঙুলের ডগায় বেরিয়ে আসা লম্বা নখটি ছুঁয়ে একটু টিপে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এটা কী?'

'আঃ, ছাড়ুন তো।' হাত ছাড়িয়ে নেয় শিখা। দু'জনেই ফের মাঠের দিকে মন দেয়।

দুটো বড় উইকেট পর পর হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল একটু কাবু হয়ে পড়েছে মনে হয়। চিড় খেয়েছে আত্মবিশ্বাসে। ফ্রেডরিকস বাদে অবশ্য। এই লোকটা অদ্ভুত নিরাসক্ত, কোনও বিকার নেই।

এখন রিচার্ডস খেলছে। ব্যাটের ডগায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে কে ওটা? প্রসন্ন না? সাহস তো

বলিহারি। রিচার্ডস সরে যেতে বলল একবার, সাবধান করে দিল, প্রসন্ন শুনল না। উলটো দিকে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রেডরিকস।

ওপাশ থেকে কে একজন মন্তব্য করল, 'একটু সরে দাঁড়াও না বাবাজীবন। মুন্ডুখানা বাউন্ডারি পার করে দিলে মেয়েটা যে বিধবা হবে!'

এপাশে একজন জবাব দেয়, 'এত সহজ দাদা। বুকের পাটা না দেখেই কি আমাদের মেয়ে মালা দিয়েছে!'

ধানখেতে বাতাসের মতো মৃদু হাসি খেলে যায় গ্যালারিতে। পরবর্তী ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করে সবাই।

রিচার্ডসের পনেরো রানের মুখে সেই ঘটনা ঘটল।

ড্রাইভ মেরেছে রিচার্ডস। মেরেই ছুটে গেছে রান নিতে। আবার ফিরতে গিয়ে পিছলে পড়ল। মিড অন-এ দাঁড়ানো বেদি খপ করে বলটা ধরেই ছুড়ে দিল উইকেটের কাছে। বল ধরে প্রসন্ন ঝাঁপিয়ে পড়ল উইকেটে। রান আউট রিচার্ডস। আবার তুমুল হইচই।

'স্যাড।' মাথা নিচু করে রিচার্ডসকে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসতে দেখে শিখা বলল , 'একটুর জন্য পপিংক্রিজ মিস করল।'

বাঙালি পরিবারের জামাতা প্রসন্নর প্রতি দর্শকদের বিশেষ উচ্ছ্বাস।

শিখা গুমরে উঠল, 'সিলি!'

'কী সিলি?' অরণি জিজ্ঞেস করল।

'জামাই, জামাই বলে চেঁচাচ্ছে! বোকামি নয়।'

'গর্ব হয় তো। আমাদের টিমে একটাও বাঙালি খেলোয়াড় নেই। পতৌদি আর প্রসন্ন আমাদের প্রতিনিধি। মেয়ে তো, তুমি এদের সেন্টিমেন্ট বুঝবে না।'

তিন উইকেটে মাত্র চুরানব্বুই রান, এমন সময় লাঞ্চ ব্রেক।

গ্যালারিব ভিড় উঠে পড়েছে। লোকেদের চলাফেরা, ওঠা-নামা শুরু হয়ে গেছে। নেমে বাইরে যাচ্ছে অনেকে। কেউ কেউ নিজেদেব জায়গায় বসেই টিফিন কেরিয়ার, ব্যাগ, ফ্লাসক খুলে খেতে শুরু করে দিয়েছে। হাঁকতে শুরু করেছে ঠান্ডা পানীয় আর আইসক্রিমের ফেরিওলা। বাতাসে কমলালেবুর গন্ধ।

শিখা উঠে আড়মোড়া ভাঙল। কালো পাতলুনের পেছনে থাপ্পড় মেরে ধুলো ঝাড়ল। সিটে-রাখা হলুদ রঙের কাপড়ের ব্যাগটার দিকে আঙুল দেখিয়ে অবণিকে বলল, 'আপনি আছেন তো? ব্যাগটা দেখবেন।'

বলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে উদ্যত হয়।

হাঁ-হাঁ করে ওঠে অরণি।—শোনো শোনো, এই শিখা, শোনো না।'

'কী?'

'এদিকে এসো।' ও এলে পর বলল, 'ব্যাগটা তোলো কাঁধে। তোলো। ব্যস, চলো এবার...আমরা একসঙ্গে খাব। আমার কাছে অনেক খাবার আছে।'

বায়নাকুলার গলায়, এক হাতে ফ্লাসক, অন্য হাতে চেন-দেওয়া পোড়া-লাল রঙের ফোম ব্যাগটা তুলে যাবার উপক্রম করছে, শিখা বলে ওঠে, 'না, না, সে কী। আমি কেন আপনার খাবার খাব।'

'বেশি পাকামি কোরো না। চলো, একটু ফাঁকা দেখে বসি কোথাও।' এমন জোরের সঙ্গে কথাগুলো বলে অরণি যে শিখা আর কিছু বলার বা প্রতিবাদ করার অবকাশ পায় না।

এই ভিড়ে ফাঁকা জায়গা আর কোথায় পাবে। তবু, স্টেডিয়ামের পেছন দিকটায় একটু আড়াল দেখে ওরা বসে। পা ছড়িয়ে বসে মুখোমুখি যাতে ওদের নিজস্ব একটা বৃত্ত তৈরি হয়, মাঝখানে খাবার, বাসন প্রভৃতি রাখার জন্য নিজস্ব এলাকা। শিখা ওর লাল পাঞ্জাবিটা সামনের দিকে টেনে দিল, লক্ষ করে অরণি।

খেতে খেতে অরণি জানতে চায়, 'কোন দিকে থাকো?'

'নর্থে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট। এখনকার নাম বিধান সরণি।'

প্লাসটিকের গ্লাসে কফি ঢালল। একটা গ্লাস এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এখানকার কেনা খাবার খাওয়া নিরাপদ নয় বুঝলে। চারদিকে ধুলোবালি, কত রকমের জার্ম।'

কলা কামড়াতে কামড়াতে শিখা বলল, 'আমার কিছু হয় না। এসব খাবার তো হরদম খাই।'

'বাবা মা জানেন? কিছু বলেন না?'

'মা নেই। বাবা দুর্গাপুরে থাকে। আমি হস্টেলে। এখানে কে আমার জন্যে গরম গরম কফি ফ্লাসকে ভরে দেবে বলুন?'

বলল, কিন্তু জানতে চাইল না, অরণির পরিবারে কে-কে আছে, সে বিবাহিত কিনা, কোথায় থাকে, এমনকী, যার আনা কলা সন্দেশ প্যাটি ইত্যাদি খাবারে ভাগ বসাচ্ছে আজ, তার নামটা জানতেও ওর আগ্রহ নেই।

বিরতির পর দ্রুত রান তুলতে শুরু করল ফ্রেডরিকস। দেখতে দেখতে ওর নিজস্ব স্কোর একশো পূর্ণ হল। জনতা হাততালি দিয়ে উৎসাহ জানায়। বাস্তবিক, ভারতের খেলোয়াড়রা আজ যে অকল্পনীয় বোলিংয়ের কৃতিত্ব দেখাচ্ছে, তাতে সেঞ্চুরি করাই যে-কোনও দুর্ধর্ষ উইকেটের পক্ষে প্রশংসনীয়।

কিন্তু বিস্ময়ের পর বিস্ময় আজ দর্শকদের জন্যে অপেক্ষা করছে। বিশ্বনাথ ছিল স্লিপে। সতর্ক, সজাগ। মদনলালেব বল টুক করে ফ্রেডরিকসের ব্যাটে ঠেকতেই কুড়িয়ে নিল শূন্যে। ফসকে যেতে যেতে বেঁচে গেল। সেঞ্চুরির পর প্রথম বলে আউট।

এরপর আর কারও পক্ষে দম ধরে রাখা সম্ভব না। কয়েক মিনিট পরে এই বিশ্বনাথই আবার জুলিয়েনের মারা বল মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে ক্যাচ ধরল। লয়েডের মতো খেলোয়াড়, অধিনায়ক, সে-ও কট, ইঞ্জিনিয়র—উনিশ। মারে—রান আউট চব্বিশ।

তরুণ বোলার ঘাউরি—ঘাড় পর্যন্ত নামানো চুল, গোঁফ নেই—জীবনের প্রথম টেস্টম্যাচে নামছে। হাতের মধ্যে বল ঘামছিল কিনা কে জানে, ওর প্রথম ওভারের প্রথম বলে উইলেট আউট, তেরো। এইভাবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ইনিংস শেষ হল দুশো চল্লিশে। প্রথম ইংনিংসে ভারত দুশো তেত্রিশ। সুতরাং হেরে যাবার সম্ভাবনা কম। তৃতীয় টেস্ট যদি ড্র হয় তা হলে বলতে হবে কলকাতা ভারতেব মুখরক্ষা করল।

শীত শীত করছে। কাপড়েব ব্যাগ থেকে লাল রঙের একটা সোয়েটার বার করল শিখা। হাতদুটো ছড়িয়ে তুলে পরল ওটা। একটা একটা করে লাগিয়ে নিল সামনের বোতামগুলো। তারপর চিরুনি একটা বার করে খ্যাস খ্যাস করে চুল আঁচড়ায়। আয়না ছাড়াই। সবশেষে, দুপুরবেলার মতো প্যান্টের পেছন দিকটায় ফট ফট করে চাঁটি মেরে ধুলো ঝেড়ে বলে, 'চলুন।'

অরণি দেখছিল। কৌতুক বোধ করছিল খুব। একটা রুমাল অন্তত সঙ্গে থাকবে ওর ভেবেছিল সে। কাপড়ের ব্যাগটা দিয়ে শেষপর্যন্ত যখন তেলতেলে নরম মুখটা ও ঘষল বার বার, তখন আর না বলে পারল না, 'হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, কেউ তোমায় বিয়ে করবে না। ব্যাগ দিয়ে কেউ মুখ মোছে, এ্যাঁ?'

'সে আমি জানি।' গ্রাহ্য না করে শিখা বলে।

হাঁটতে হাঁটতে অরণি বলল, 'জানো তো, তবে, মেয়ে যখন, একটু মন দিলে তো পারো।'

'সাজগোজ? লা ফাম? ওসব আমার আসে না।'

'দেখো তো,' অরণি ছিটিয়ে যাওয়া ভিড়ের মেয়েদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এরা কেমন পরিপাটি, সুন্দর। তুমি এদের চেয়ে কম সুন্দর না।

'রাখুন তো ওসব কথা।' শিখা বলল, 'পারেন তো, আপিসের কাজটাজ শিখিয়ে দেবেন আমায়। কোনও ধারণাই নেই। আপনার তো নিজের আপিস বলছিলেন।

'দেব।'

নিজের গাড়ির কাছে এসে পড়ে অরণি। চাবি দিয়ে দরজা খোলে। বোঝাগুলো পেছনের সিটে ছুড়ে ফেলে দেয়। তারপর থমকে দাঁড়ায় একটু। পাশে মেয়েটা।

শিখাও থমকায়। সবুজ রঙের মোটরগাড়িটার অস্তিত্ব যেন ঝাঁকিয়ে দিল ওকে। ও যাবার জন্যে পা বাড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'কাল আসছেন তো?'

অরণি বলল, 'এসো, তোমার হস্টেলে পৌঁছে দিই।'

'কী দরকার। আমি ঠিক ট্রামে-বাসে চলে যেতে পারব। অভ্যেস আছে।' বলেও চলে গেল না শিখা।

বাস্তবিক, ভাবল অরণি। কোথায় সানি পার্ক আর কোথায় হেদো। দূরত্ব অনুমান করল, এক মুহূর্তে দূরত্বকে পেট্রোলের পরিমাণে এবং পেট্রোলের পরিমাণকে টাকাপয়সায় অনুবাদ করে ফেলল। তারপর বলল, 'ওঠো না। খানিকটা দূর এগিয়ে দিই অন্তত। এখন এসপ্ল্যানেড বা ডালহাউসি থেকে কিছুতেই

উঠতে পারবে না, সে তো জানো।'

এগিয়ে দিতে প্রায় কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত এসে পড়ল। মেয়েটা জেদ না করলে বাকি পথটাও চলে যেত অরণি। ভাল লাগছিল।

রাস্তায় নামার আগে শিখা বলল, 'আপনার গাড়ির ভরসায় কি ম্যাচ দেখতে এসেছিলাম, বলুন!'

'আর কথা বলো না। ভারী তো একটা জাল টিকিট।'

শিখা নামে। গাড়ির দরোজা বন্ধ হয়। অরণি হাত তোলে, 'কাল ঠিক দশটায়।'

তিন

ভেবেছিল হেদোর স্টপে নামবে, নামল না শিখা। অন্য কয়েকজনের সঙ্গে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে রইল।

ওদিকের ফুটপাথে পাপড়ি আর দুটো ছেলে। দু'জনেরই লম্বা জুলপি আর ঝোলানো গোঁফ। যে-জন চশমা পরা, তাকে চেনে শিখা,—চন্দন। হস্টেলের গেটের মুখে প্রায়ই দেখে ওকে। পাপড়ি বলে, আমার ফিঁয়াসে। অন্য ছেলেটাকে ও চেনে না, তবে নাম শুনেছে,—পার্থ। পার্থর মামা না কে যেন শ্যামবাজারে একটা সিনেমাহলের মালিক। সেই সুবাদে এনতার পাস পায়, তিনজন মিলে ছবি দেখে। ইলেকট্রিকের আবছা আলোয় শিখা দেখল, পাপড়ি দুলে দুলে হাসছে। একাই হাসছে আর এমন ভঙ্গি করছে যা মেয়েদের পক্ষে রুচিকর নয়। ছেলে-চাটা বলে নয়, ওর বেহায়াপনার জন্যে শিখা পছন্দ করে না পাপড়িকে, যদিও ওরা বন্ধু। বকাবকি করে, বোঝায়—নিজেকে এত চিপ করিস না। কে কার কথা শোনে।

গায়ে মাখে না পাপড়ি। শিখার চেয়ে ও দু'-তিন বছরের বড়, খামোকা জ্ঞান দিতে এলে শুনবে কেন? বলে, 'তুই ছেলেমানুষ চুপ করে থাক। মন দিয়ে পড়াশোনা কর।' মন মেজাজ ভাল থাকলে বলে, 'লাইফটা এনজয় করে নিচ্ছি, বুঝলি।'

এখন হস্টেলে ওর আর একজন বন্ধু রেবা। একেবারে উলটো প্রকৃতির মেয়ে। শান্ত, লাজুক, কম কথা বলে। নিজের মনে থাকে, কিন্তু মিশতেও চায়। মুখচোরা ফরসা, চোখে চশমা, গোল চাঁদের মতো বেবার মুখ সব সময়েই প্রসাধিত, সুগন্ধযুক্ত—দেখে শিখা। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে, 'রেবু, আমায় বিয়ে করবি? বেঁচে থাকতে আমি তোকে আর কারুর হাতে তুলে দিতে পারব না রে।'

বড়দিন উপলক্ষে কয়েকটা দিন কলেজ ছুটি। হস্টেল তাই প্রায় ফাঁকা। কাছাকাছি বাড়ি যাদের তারা বাড়ি চলে গেছে। কেউ কেউ কলকাতাতেই, অন্যত্র, চলে গেছে মুখ বদলাতে। রেবাও গিয়েছিল। ওর বাবার এক বন্ধু থাকেন পার্ক সার্কাসে, তিনি এসে নিয়ে গিয়েছিলেন। দিন তিনেক পরে ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন। ভূপাল যাওয়া সম্ভব ছিল না এই অল্প কয়েক দিনের ছুটিতে, তবে পাপড়ির সে কারণে কোনও দুঃখ আছে বলে মনে হয় না।

হস্টেলের বাইরের গেটে টুলের ওপর বসে ছিল মিসিরজি। পাশে ফুটপাথে বসা ভুজাওলার সঙ্গে গল্প করছে। হিন্দিভাষায় কথা বলছে, কিন্তু সে হিন্দি সহজবোধ্য নয়। তবে ভুজাওলার গলার স্বরে এমন একটা সমর্থনজ্ঞাপক সুর ছিল যে বোঝা যায় ও অধমর্ণ। পাঁচিল সংলগ্ন শান-বাঁধানো জায়গাটি সম্ভবত মিসিরজির দাক্ষিণ্যে ও ব্যবহার করছে, তাই কৃতজ্ঞ।

একটা খোপ-করা কাঠের বাকস। তার মধ্যে সদ্য-ভাজা ছোলা, বাদাম, চিঁড়ে, ভুট্টা সাজানো পর পর। পাশে একটা তোলা উনুন, তার ওপর কড়ায় চাপানো পোড়া বালি। ভুজাওলা খন্তি নেড়ে নেড়ে বাদাম ভাজছিল আর কথা বলছিল মিশিরজির সঙ্গে। পথচারী কেউ দাঁড়িয়ে পড়ছে দেখলে বাটখারা-পাল্লা নেড়ে সওদা করছিল।

ঢোকার আগে পনেরো পয়সার বাদাম কেনার জন্যে দাঁড়াল শিখা। ওকে দেখে মিসিরজি বলল, 'দিদি, আপনার চিঠি আছে। টেবুলে রেখে এসেছি।'

হস্টেলের ভৃত্য রতনদাকে অনুরোধ করে এক কেটলি গরম জল আনাল শিখা। দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালল। টেবিলের ওপর রাখা খামটা নেড়েচেড়ে দেখল কয়েকবার। খুলল না। তারপর গা থেকে সারাদিনের ধুলো-খাওয়া পাঞ্জাবি, সোয়েটার খুলে ফেলল। শব্দ করে ঝেড়ে ঝুলিয়ে দিল আলনায়। একটা শাড়ি আলনা থেকে পেড়ে জড়িয়ে নিল গায়ে। ঢুকে পড়ল বাথরুমে।

বেশ শীত। ওইটুকু গরম জলে স্নান করা সম্ভব না। তবু ভাল করে মুখ হাত পা ধুয়ে ও তৃপ্তি বোধ করে। খেলার মাঠে অতিবাহিত আজকের দিনটা ওর কেমন অবাস্তব মনে হয় এই সময়।

ড্রয়ার থেকে ছোট আয়নাটা বার করে টেবিলের ওপর দাঁড় করাল।

কিছুক্ষণ নিজের প্রতিবিম্বের দিকে শিখা চেয়ে থাকে। চুল আঁচড়ায় অনেকক্ষণ ধরে। মনে হয়, চুলের মধ্যেও ধুলোবালি ঢুকেছে—এখুনি সব ময়লা সাফ করে ফেলা দরকার। সাবান মেখে মুখটা চড়চড় করছে, শুকনো। ক্রিমের শিশিটা বার করে দেখল খালি। কবেই ফুরিয়েছে, আর আনা হয়নি। সাদা কাচের গায়ে আঙুলের দাগ জমেছিল, তাই চেঁচেমুছে দু'গালে বুলিয়ে নেয়। বুলোতে বুলোতে বলে, 'কেউ তোমায় বিয়ে করবে না, জেনে রাখো।'

যা অনুমান করেছিল ঠিকই। দুর্গাপুর থেকে মাসির চিঠি। দু'পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ চিঠি। শব্দগুলো টপকে টপকে দ্রুত পড়ে ফেলে শিখা। একটা জায়গা দু'বার-তিনবার পড়ে: বড়দিনের ছুটিতে আসিবে বড় আশা করিয়াছিলাম...টেস্টম্যাচ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছ, তাহাও কম কথা নয়...তুমি যাহাতে আনন্দ পাও তাহাতেই আমাদেরও আনন্দ জানিবে, তোমার বাবা জানাইতে বলিলেন, সোমবার তো ম্যাচ নাই, একদিন আসিয়া ঘুরিয়া যাও না, আমাদের খুব ভাল লাগিবে।

আবৃত্তি করে: 'আমাদের খুব ভাল লাগিবে! নেকু! তারপর বিছানায় এলিয়ে দেয় শরীর। ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত।

লেপের মধ্যে পায়ের তলায় সুড়সুড়ি লাগল। জেগে গেল শিখা। পাশ ফিরল। দেখল, বিছানায় বসে আছে পাপড়ি। টেবিলের ওপর ছোট্ট ট্রানজিস্টারে গান বাজছে।

'কখন ফিরলি?'

'এই খানিকক্ষণ। চা খাবি?' পাপড়ি উত্তর দেয়।

'খেতে পারি। ক'টা বাজে রে?'

পাপড়ি ঘড়ি দেখে কবজি উলটে। সাড়ে আট।

শিখা লেপ নামিয়ে উঠে বসে। হাই তোলে। দু'হাত ঝাঁকিয়ে ঘুম তাড়ায়। বলে, 'খাবার ঘণ্টা বাজতে এখনও দেরি আছে। খিদে পেয়েছে। বাদাম আছে, খাবি?'

'রক্ষে করো! আমার পেটে আর একটুও জায়গা নেই। গলা দিয়ে মাংস উঠছে।' তৃপ্তিময় মুখ করে পাপড়ি হাত নাড়ে—'রতনদা চা আনতে যাচ্ছে, তোর জন্যে একটা কাটলেট আনতে বলি? আমি পয়সা দেব!'

'বল বল, তোর যা ইচ্ছে বল,' শিখা জোর করে না। তারপর বাদামের ঠোঙাটা কোলের ওপর, লেপের ওপর রাখে। একটা-দুটো করে বাদাম ভাঙে। ঘুম-জড়িত জিভে উপভোগ করে প্রত্যেকটি বাদামের আলাদা স্বাদ।

একটু পরে পাপড়ি ফিরে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বিছানায়। শিখা অনুমান করে, ও কিছু বলতে চাইছে। তবু মুখে কোনও কৌতূহল প্রকাশ না করে ও জিজ্ঞেস করে 'কত টাকা খরচ করলি আজ?'

একগাল হেসে পাপড়ি বলে, 'বাইশ টাকা।'

'বাইশ টাকা! কী খেলি অত টাকা দিয়ে। কে কে ছিলি?'

কে কে আর। পার্থদা, চন্দনদা আর আমি। খেতে আর কত খরচ। ট্যাক্সি ভাড়াই তো বারো টাকা ষাট। কী মজা হয়েছে না! পার্থদা বলল, ম্যাটিনি শোয় সিনেমা দেখাবে। আঃ, দোতলায় টপ সিট। আঃ, কী অ্যাকটিং শাম্মি কাপুরের! তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা ফাউল কবিরাজি, কেক খেলাম। খেয়ে...

'চন্দন খাওয়াল?' শিখা জানে, খরচ যা করার, করে পাপড়ি একাই, তবু দুষ্টুমি করে প্রশ্ন করে।

'ধ্যাৎ, ও কোথা থেকে খাওয়াবে? ও কি চাকরি করে?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, তারপর?'

'তারপর না—পার্থদা বলল, ট্যাক্সি করে হাওয়া খাব আমরা। আমি বললাম চলো। আমরা গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে রেড রোড দিয়ে ঘুরে—সে অনেক ঘুরে সব রাস্তার নামও জানি না—তারপর ফিরলাম। ওঃ যা মজা হয়েছে না আজকে। শুধু চন্দনদার জন্যে একটু কষ্ট হচ্ছে—'

'কেন, কী হল ওর?'

কণ্ঠস্বর গাঢ় করে পাপড়ি এবার বলতে লাগল, 'পার্থদাটা একটু অসভ্য আছে জানিস। চন্দনদার সামনে হঠাৎ আমায় কিস করল। এমন জোরে জড়িয়ে ধরল না—আমার দম আটকে যায় আর কী। আমিও হাত ছাড়িয়ে নিয়েছি, তখন ও বলল, পাপড়ি তো আমাদের দু'জনেরই বন্ধু তাই না? তুই সেলফিশ হোস নে চন্দু, নে, তুইও নে।'

এতগুলো কথা বলে হঠাৎ থেমে গেল পাপড়ি। চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। শিখা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, কিছু বলছে না, দেখে বলল, 'ওরা দু'জনেই আমায় ভালবাসে।'

শিখা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। রতন চা দিয়ে যায়। কাটলেট দিয়ে যায়। শিখা কাটলেট খায়। শিখা চায়ে চুমুক দেয়। পাপড়ি চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে চমকে ওঠে। ওর গোল গোল চোখ, মোটা ভুরু ও উঁচু চোয়াল দুটিতে ব্যথা পাওয়ার চিহ্ন ফোটে মুহূর্তের জন্যে; তারপর মিলিয়ে যায়। নীচের ঠোঁটে আস্তে আস্তে জিভ বোলায় দু'-চারবার। তারপর আঙুল দিয়ে ঠোঁটটা উলটে শিখাকে দেখায়, 'কেটে গেছে, দেখ তো?'

শিখা দেখল, জায়গাটা লাল হয়ে আছে। রক্ত জমে গেলে যেমন হয়।

'তোর কাছে মলমটলম কিছু আছে?'

'না। রেবার কাছে থাকতে পারে। চল।'

রেবার ঘরে চারজনের সিট, তার মধ্যে তিনটে সিটই খালি এখন। উপুড় হয়ে শুয়ে একা, কনুইয়ে ভর করে ও বই পড়ছিল। তিন গুচ্ছির পাকানো মোটা বেণী ওর পিঠের খানিকটা বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল বিছানায়। পা থেকে কোমর পর্যন্ত শরীর নীল কম্বলে ঢাকা।

পাপড়ির হাত ধরে শিখাই ঢুকল। ডাকল, 'এই রেবা, শোন।'

বই পড়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেবা দরজার দিকে তাকায়। চশমার ওপাশ থেকে বলে, 'কী বলবি, কাছে এসে বল। আমি এখন উঠব না।'

উদ্বিগ্ন মুখে দু'জন আলোর নীচে এসে দাঁড়াল। শিখা নিজে এবার পাপড়ির ঠোঁটটা উলটে দেখাল আঙুল দিয়ে। অ্যান্টিসেপটিক কিছু আছে তোর কাছে? দিবি?

ঠোঁটের ভেতরে ও রকম একটা আঘাতচিহ্ন দেখে রেবা প্রথমে 'হিঁ—ঃ' করে ভয় ও বিস্ময়সূচক শব্দ করে। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজেই প্রশ্ন করে, 'কী করে কাটল?'

পাপড়ির দিকে তাকাল শিখা। ওর মুখের নির্বিকার ভাব দেখে বলল, 'চুমু।'

'চুমু?'

'হ্যাঁ। চুমু।'

'সে কী রে। এ তো কেটে গেছে।

'কেটে যাবে কেন? বোকার মতো কথা বলিস না, দাঁত বসে গেছে।'

'এ-মা। কী করে হল রে। সর্বনাশ।' রেবা বিছানায় উঠে বসে।

শিখা অধৈর্য হয়ে বলে, 'সে-কথা পরে হবে, আগে বল, তোর কাছে কোনও ওষুধটষুধ আছে? মলম বা টিনচার আইডিন?'

মুখের মধ্যে ওসব দেওয়া যায় নাকি? দাঁড়া—'

কম্বল সরিয়ে রেবা নামল। ওরা দু'জন বসল পাশের খালি চৌকিটায়।

ট্রাঙ্কটা চৌকির নীচ থেকে টেনে বার করল রেবা। ডালা খুলে তুলো আনল লাল রঙের মারকিউরোক্রোমের শিশি, তুলোর বান্ডিল, সরু লোহার কাঠি। একটু তুলে ছিঁড়ে কাঠিটার মাথায় গোল করে পাকাল। তারপর শিশির মধ্যে ডুবিয়ে পাপড়ির কাছে গিয়ে বলল, 'দেখি।'

পাপড়ি নিজেই ঠোঁট খুলল এবার। ক্ষত জায়গাটায় ওষুধ বোলাতে গিয়ে ওর মুখের ভেতরটা ক্রমশ লাল হয়ে যায়। জিভ বার করে ও লাল টুকটুকে রংটা একবার দেখে নেয়, বলে, 'তেঁতো।'

হেসে ফেলে রেবা। উচ্ছিষ্ট কাঠিটা ওর হাতে দিয়ে বলে, 'যা, বাথরুমে গিয়ে থুথু ফেলে আয়, আর কাঠিটা পরিষ্কার করে আন।'

এত কাণ্ডের পরও যখন পাপড়ি বাথরুম থেকে ফিরে এসে টেবিলে রাখা রেবার গোল আয়নাটা তুলে নিজের মুখ দেখতে উদ্যোগী হয়, তখন শিখা রাগ আর রেবা হাসি চাপতে পারে না।

'একটা কথার জবাব দিবি?' পাপড়িকে জিজ্ঞেস করে শিখা, 'তুই মন থেকে বিশ্বাস করিস, ওই চন্দনদা আর পার্থদা তোকে সত্যিই ভালবাসে?'

'কেন বাসবে না?'

'বেঁকিয়ে জবাব দিস না, পাপড়ি। দু'জন ছেলের সঙ্গে শেয়ার করে এ জিনিস চলে?'

'হ্যাঁ।'

রেবা বলে ওঠে, 'যাঃ!'

শিখা প্রশ্ন করে, 'এর পরেও চন্দনদা তোকে বিয়ে করবে? এখন না হয় চাকরি করে না, চাকরি করলে?'

'হ্যাঁ।' পাপড়ি দৃঢ় ও সরলস্বরে উত্তর দেয়, 'আর যদি না করে, না করল।'

'আমি বলছি, তোর পয়সায় খাবে, ট্যাক্সি চড়ে ঘুরবে, তোর সঙ্গে ফোকটে ফুর্তি করবে, এই ওদের মতলব।'

'এভাবে দেখছিস কেন,' পাপড়ি অনুযোগ করে, 'ফুর্তি তো আমিও করছি। আমারও মজা লাগে খুব। ওদের জন্যে টাকা খরচ করতে আমার একদম খারাপ লাগে না, বিশ্বাস কর।'

রেবা মাঝখান থেকে তার দুর্বল মনের কথা শোনায়, 'কর না, যা খুশি কর, আমরা বাধা দিচ্ছি? ভুলে যাসনি, তুই মেয়ে। এইসব খেলায় মেয়েদের দায়িত্ব বেশি। একটু ভুলে মেয়েদের সর্বনাশ হয়ে যায়। কথাগুলো মনে রাখিস, পাপড়ি।'

খাবার ঘণ্টা পড়ল। দোতলার আরও দু'-একটি মেয়ে করিডর দিয়ে হেঁটে গেল নীচে, খাবার ঘরের উদ্দেশে। নীচের তলায়ও অন্য ব্লকের মেয়েরা খেতে আসছে। ওদের মৃদু কলকল শব্দ শীতের ধোঁয়া ও কুয়াশার চাপে ভারী। ওদের চেয়ে অনেক উঁচু পাম গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে অনুগত দৈত্যের মতো।

রেবা একটা ছোট শাল আলনা থেকে পেড়ে গায়ে জড়িয়ে নিল। শাড়িটা তুলে নিল পেটের ওপর পর্যন্ত। ওরা তিনজনও চলল নীচে।

পাপড়ি শিখার দিকে চেয়ে বলল, তোরা ভারী ভিতু। আমাকে কারুর ভাল লাগছে, আমার সঙ্গ পেয়ে খুশি হয়ে উঠছে কেউ, তোদের কাছে এই ব্যাপারটাব কোনও মূল্য নেই। আমার কাছে এর অনেক দাম।

রাত্রে, যখন পাপড়ি কাটা ঠোঁট নিয়ে তার ঘরে অকাতরে ঘুমোচ্ছে, তখন শিখা স্বপ্ন দেখে, কথা বলতে বলতে ও অনেক ওপরে কোথাও উঠে গেছে, খেয়াল করেনি, নামার কোনও সিঁড়ি নেই। কী করে নামবে ভেবে পাচ্ছে না। পাশ ফিরে ঝুঁকে চেয়ে দেখছে—অনেক নিচুতে লোকজন—কী করে যাবে সেখানে। পা শিরশির করে উঠল, যদি পড়ে যায়। হাওয়া দিচ্ছে প্রচণ্ড জোরে, কোনও রেলিং নেই চারপাশে। শীত। গরম জামাটা যে কেন নিয়ে এল না, কেন যে ভুলে ফেলে এল কাউন্টারে। কাউন্টারের ভেতরে লোকটার চোখে কী মোটা চশমা। চোখ দুটো কী ছোট দেখাচ্ছিল। সে যদি নিয়ে যায় গরম জামাটা। শুধু জামাটা না, ওর ভরতি ট্রাঙ্কটাই তো ওখানে রাখা।

অনেক নীচে ঘোরাফেরা করছে লোকজন। বেলুন ওড়াচ্ছে বাচ্চারা। বেলুনগুলো নাগালের মধ্যেই, একটু নীচে দুপদুপ করে, এ-ওর গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে। ধরতে গেলে পড়ে যাবে, নির্ঘাত পড়ে যাবে অতল শূন্যে।...কোথাও বাবাকে দেখা যাচ্ছে না। বাবা—

ককিয়ে ওঠার শব্দ করে শিখা জেগে ওঠে মধ্যরাত্রে। উঠে জল খায়। তারপরও অনেকক্ষণ জেগে থেকে দুটো বাজার ঘণ্টা শোনে। আর কোনও ঘণ্টা শোনে না।

চার

পরদিন ঘুম থেকে উঠল শিখা, তখন আটটা বেজে গেছে। টিপটিপ করছে মাথাটা।

বালিশের তলা থেকে হাতঘড়িটা বার করল। দম দিল। তারপর রেখে দিল বিছানার পাশের টেবিলটায়। ড্রয়ার টেনে বার করল অ্যাসপিরিন বড়ির পাতা, ঢক ঢক করে জল দিয়ে গিলে ফেলল দুটো বড়ি।

আটটা হলে কী হবে, বাতাসে আচ্ছন্ন ভাব তখনও কাটেনি। কুয়াশা যত না, তার চেয়ে বেশি ধোঁয়া। এই হস্টেলেরই কিচেনের ধোঁয়া, গরম জলের উনুনের ধোঁয়া এখনও পাম গাছের পাতায় পাতায় আটকে আছে। ফাঁক দিয়ে দু'-চারটে সূর্যরশ্মিরেখা ফ্লাডলাইটের মতো আছড়ে পড়েছে বাইরে করিডরে।

মুড়িসুড়ি দিয়ে শিখা ওই একটুখানি রোদে গিয়ে বসে। রতনদাকে ডাক দিয়ে চা চায়, গরম জল চায়। গরম জল এলে চুলে শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করে।

ট্রাঙ্কের একেবারে নীচের দিকে ছিল দু'-একটা ভাল শাড়ি, টেনে বার করে একটা ডুরে—বহুকাল অব্যবহৃত। ম্যাচ-করা ব্লাউজ হাতের কাছে না পাওয়ায়, একটা সাধারণ ব্লাউজ পরে নেয়, তার ওপর আর একটা পশমের,—সাদা কার্ডিগান। ক্রিম নেই, লুকোনো নীল শিশিতে একটু পারফিউম ছিল, কানের লতিতে ছুঁইয়ে নিল।

চারটে ডিম সেদ্ধ করে দিতে বলেছিল রতনদাকে, বেরোবার সময় একটা কৌটোর মধ্যে সেগুলো পুরে নিল। নুন-মরিচ নিতে ভুলল না। ট্রাঙ্কের ওপর বিছানো থাকে একটা ভাঁজ-করা শতরঞ্চি—হলুদ সবুজ ডোরাকাটা—সেটিও ঢুকিয়ে নিল ঝোলা ব্যাগে। শক্ত সিমেন্টে বসতে গিয়ে কাল লেগেছে।

দেরি হয়ে গেছে ভেবে হস্টেল থেকে বেরিয়েই ট্যাক্সি ধরল শিখা। এবং ইডেনে যখন গিয়ে পৌঁছোল, তখন দেখে অনেক আসন ফাঁকা। সময় আছে যখন, একটু গুছিয়ে বসবার চেষ্টা করে শিখা। চুলগুলো বড্ড উড়ছে এলোমেলো। আঁচড়ে নেয়, পিন দিয়ে আটকে দেয় দু'পাশ। শতরঞ্চিখানা লম্বা করে পাতে, অর্ধেকটায় নিজে বসে।

এক-এক করে দর্শকেবা আসছে। জায়গা চিনে চিনে বসছে। আজকের খেলার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে আলোচনা করছে। দু'-একটা কথা শিখার কানে যায়, তারপর ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

কী দরকার ছিল এত কাণ্ড করে আসার। কী দরকার ছিল—ভাবতে গিয়ে নিজের কাছেই লজ্জিত হয় শিখা। কেউ দেখবে। কেউ ইনসপেক্ট করছে। কে, কে? কে এই পাশের লোকটা। ওর নামই তো জানে না। কী ওর পরিচয়, কোথায় থাকে, কী করে—ও ভদ্রলোক না বদমায়েশ, কিছুই তো জানা নেই। সে-ও বলেনি। ববং শিখার পবিচয় খানিকটা সে জেনে নিয়েছে।

চেহারা বা ব্যবহার দেখে শিখার অবশ্য মনে হয়নি, লোকটা মন্দ প্রকৃতিব। বরং ভদ্রলোক, সজ্জনই মনে হয়েছে। শিক্ষিত। পরিচয় জানতে চাইলে ও নিশ্চয় বলত। চাওয়া উচিত ছিল শিখার।

খেলা শুরু হয়ে গেল। নামল ভারতের প্রথম দু'জন ব্যাটসম্যান—নাইক ও ইঞ্জিনিয়র। গতকাল কয়েক মিনিট ওরা খেলেছিল শেষের দিকে। আট রান তুলেছে।

ওপনিং ব্যাট হিসেবে ইঞ্জিনিয়র আদর্শ, ওর ধৈর্য ও সাহসের তুলনা হয় না। শত্রুপক্ষের যাবতীয় প্রারম্ভিক হুংকার ও ভীতিপ্রদর্শন আত্মসাৎ করে ও খেলা জমিয়ে দেয়, তারপর ছাড়ে ব্যাট। অন্তত, এই রকম ওর চরিত্র। কিন্তু নাইক? ওকে কেন নামানো হল? প্রথম দিনের খেলায়—শিখা স্পষ্ট শুনেছে রেডিয়োয়—ও রীতিমতো পালিয়ে বেঁচেছে রবার্টসের ভয়ে। সেই রবার্টস বল করছে আজও, সুতরাং কতক্ষণ টিঁকবে বলা যায় না।

ঠিক। ছ'রান করে একটা ক্যাচ তুলল নাইক। রবার্টসের বল, ধরে ফেলেছে ফ্রেডরিকস। আউট। আম্পায়ারের নিঃশব্দ তর্জনী।

বিদায়ী ও আগন্তুক উইকেটের চোখাচোখি হল মাঠের সীমানার মধ্যে। এই-ই নিয়ম। অটল ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে যোগ দিতে আসছে পার্থসাবথি। থেমে থেমে হাততালি পড়ছে মাঠে।

পাশেব ভদ্রলোক তো এল না এখনও? ব্যাপার কী? শিখা চিন্তিত হয়। কাল কথা হল, দশটায় আসবে। দশটা কখন বেজে গেছে! অ্যাকসিডেন্ট হল না তো? নিজে গাড়ি চালায়, কলকাতার যা রাস্তাঘাট। কিংবা, অসুখবিসুখ? কিন্তু ভদ্রলোককে দেখে তো অসুস্থ মনে হয়নি। তা ছাড়া, খাওয়াদাওয়া সম্পর্কে যা পিটপিটে। তবে, নার্ভের কী যেন গণ্ডগোল আছে বলছিল, সেই সব কিছু হয়েছে বোধহয়। নার্ভের অসুখ কী রকম হয়, তা অবশ্য শিখা জানে না।

এইসব সাতপাঁচ ভাবছে, এমন সময় দেখতে পেল, হাতে ব্যাগ, কাঁধে বায়নাকুলার নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে গ্যালারিতে উঠছে অরণি।

'এত দেরি?' শিখা জিজ্ঞেস করে।

যেন প্রশ্নের অপেক্ষায় ছিল অরণি। বলল, 'আর বলো কেন। প্রথমত বাড়ি থেকে বেরুতে দেরি। রবিবার, আজ আর কারুর কাজে গা নেই। কয়েকটা স্যান্ডউইচ করতে বেলা কাবার। তারপর এটা-ওটা ঝামেলা—কোথায় কলের মিস্ত্রি, কোথায় ইলেকট্রিশিয়ন। সব ব্যবস্থা যেন আমাকেই করতে হবে। ধুত্তোর বলে চলে এলাম তো। মাঝপথে, থিয়েটার রোডের মুখে, টায়ার গেল পাংচার হয়ে। টায়ার

খোলো, স্টেপনি লাগাও—করতে করতে...'; হাত দুটো ছড়িয়ে দেখাল শিখাকে, এই দেখো না হাতের অবস্থা।'

হাত না, শিখা মানুষটাকে দেখছিল। হয়তো সবকিছুই আছে ওর, কিন্তু যেন বড় বেচারা। বলল, 'শতরঞ্চিতে মুছে নিন।'

পার্থসারথি জানে, ও বেশিক্ষণ টিকবে না। তাই কেবল শর্ট রান নেবার চেষ্টা। কিন্তু এক কী, দু'পা এগোয়, আবার পেছিয়ে আসে। বার বার এই কাণ্ড করছে কেন? আর একটু হলে যে ইঞ্জিনিয়র আউট হয়ে যেত। জনতা গ্যালাবি থেকে চেঁচায়, 'পার্থ, স্টেডি।'

কোনওক্রমে ন'টি রান তুলে পার্থ বিদায় নিল। এল বিশ্বনাথ।

পেছন থেকে কে বলে উঠল, এবার খেলা জমবে।

দু'জনেই একসঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে পেছনে চায়। শিখা মৃদু হাসে। অরণি দেখে, টাকমাথা লোকটিব জায়গায় এক ছোকবা। পাশ থেকে মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসে। ছোকরার কোটের পকেটে কলম দেখে, কী মনে কবে, অবণি চেয়ে নেয় কলমটা। চোখের ওপর থেকে জুতোর বিজ্ঞাপন ছাপা টুপিটা খুলে তার উলটো পিঠে খসখস করে কিছু লেখে। তারপব বাঁ পাশে শিখার দিকে এগিয়ে দেয় কার্ডবোর্ডেব টুকরোটা।

হঠাৎ শিখাব চোখে পড়ে, তাতে লেখা—'একজনকে খুব সুন্দব দেখাইতেছে।'

পড়েই চমকে ওঠে। গায়ে কাঁটা দেয় ওর। হঠাৎ পাশে-বসা ভদ্রলোকটির দিকে তাকাতে পাবে না। সুন্দব শব্দটার দিকে দৃষ্টি আটকে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাটা নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা কবে শিখা। সেই কলম দিয়েই কার্ডবোর্ডটায ও লেখে, 'পথিক, তুমি পথ হাবাইয়াছ?'

অরণি এ-পাশে তাকায়। এমন সর্বতোভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, যে শিখার মনে হয়, কেউ ওব মুখেব ওপর আলো ফেলছে। অস্বস্তি বোধ করে ও। অরণি গম্ভীর স্বরে বলে, 'কপালকুণ্ডলে।'

এবার দু'জনেই হেসে ওঠে।

কয়েকটি মুহূর্তের তো ব্যাপাব, তবু এই ছোট্ট ঘটনাও আজ অসমবয়সি দুটি নাবী-পুরুষকে পবস্পরের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করল। ক্রিকেট ম্যাচের হল্লা ও উত্তেজনার অন্তবালে,—কৌতুকে, মজায় গড়ে উঠল এদের বন্ধুত্ব কোনও পরিণতির কথা না ভেবে। খেলাব মাঠের লঘু পরিবেশে রচিত হল অন্য এক খেলা।

পেছনেব ছোকরা বলেছিল, এবার খেলা জমবে। সত্যি, জমে গেল। বিশ্বনাথ ও ইঞ্জিনিয়রের জুটি কিছুতেই ভাঙতে পারছে না দৈত্যের দল। রান উঠছে টুকটাক, কিন্তু খেলার মধ্যে কোনও নাটকীয়তা নেই।

অরণি উসখুস কবে।

শিখা বলে, 'উঠবেন?'

'চলো বোর লাগছে।'

'চলুন। কিন্তু কোথায় যাব এখান থেকে?'

'আগে বেরোই তো তারপর ঠিক করা যাবে। অরণি উঠে দাঁড়ায়।

শতরঞ্চি গুটোতে দেখে শিখাব অন্য পাশে যে বসে ছিল, সেই লোকটি বলল, 'আপনাবা চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।' শিখা উত্তর দেয়।

'আর আসবেন না?'

'আজকে আর ফিরব না, আমরা' শিখাই কথা বলে, 'খেলা চললে কাল, না—না, কাল তো অফ ডে, পরশু আসব।' বলে ঠোঁট ছড়িয়ে একটু হাসে, হাসি বিতরণ করে আর কী।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনল, কেউ বলছে, 'এদের ধরে গেছে রে।'

গেট থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছাড়ল অরণি। হাত বাড়িয়ে শিখার ঝোলাটা কেড়ে নিল কাঁধ থেকে। প্রথমে আপত্তি করলেও মেয়েটা জোর করল না।

গাড়িটার কাছাকাছি এসে অরণি বলল, 'এবার?'

শিখার মুখটা হঠাৎ অপ্রসন্ন। বলল, 'হস্টেলে চলে যাই।'

'মাথা খারাপ। শীতের একটা গোটা দিনের ছুটি, নষ্ট করতে আছে? কত সাধের ছুটি, এমনকী ক্রিকেট থেকেও ছুটি। ভাবা যায়!'

'নষ্ট আবার কী!' এবার মুখে দুষ্টুমি ফুটিয়ে মেয়েটা বলল, 'সারাদিন ঘুম দিতাম লেপ মুড়ি দিয়ে। সে কি কম আরাম।' অরণির কথায় ও আসলে বুঝতে পেরেছে, এই ধরনের মুক্তি মানুষটার কতখানি কাম্য।

অরণি বলল, 'দেখো মেয়ে আমি হিউমার তেমন বুঝি না। যদি সত্যিই তোমার ইচ্ছে সেই রকম, আমি আটকাব না। তোমাকে হস্টেলে ছেড়ে দিয়ে আমি কিন্তু পালাব।'

'ওমা, কোথায় পালাবেন?'

'যে-দিকে চার চাকা যায়। যে-দিকে দু'চোখ যায় বললাম না কেন জানো? দুচোখ তো আকাশে বাতাসে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু হতভাগা পা দুটোকে সেদিকে নিয়ে যেতে পারবি পাগলি?— বলো তো কোন ছবির ডায়ালগ? উদয়ের পথে। দেখেছ? রাধামোহন, বিনতা—আঃ কী অ্যাকটিং!'

শিখা চুপ করে কী ভাবে।

অরণি বলে চলল, 'দেখবে কী করে। তখন তো তুমি জন্মাওনি। কোন ইয়ার তোমার? কোন ইয়ারে জন্ম?'

কোনও দিকে না তাকিয়ে শিখা চেয়ে থাকে। অন্যমনস্কভাবে বলে, 'ফিফটি থ্রি।'

জিনিসপত্র গাড়ির মধ্যে রাখতে রাখতে ফিরে দাঁড়ায় অরণি। ফিফটি থ্রি। আপাদমস্তক চেয়ে দেখে মেয়েটাকে। সবকিছুই যুবতীর মতো—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ত্রুটিহীন। কিন্তু ওর মনে হয়, ভেতরটা একেবারেই কাঁচা। টক। ওর করুণা বোধ হয়। একা শিখার জন্যে নয়, সমস্ত স্ত্রীজাতির জন্যে। এত অল্প বয়সে ওদের শরীর পেকে ওঠে কেন, এত অল্পকাল পরে কেন ঝরে যায়।

মাঠ থেকে হল্লা আসছে কীসের। বাউন্ডারি বা ওই রকম কিছু হবে।

তেমনই অন্যমনস্কভাবে শিখা বলল 'আমারও ইচ্ছে করে পালিয়ে যেতে। খুব দূরে কোথাও। যেখানে হইহল্লা নেই। লোকজন নেই। আপনার সঙ্গেই চলে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু—কিন্তু কী করে যাই! আপনাকে যে একদম চিনি না। মেয়ে হওয়ার না অনেক মুশকিল।'

খুব স্বাভাবিক, অরণি বুঝতে পারে, দ্বিধাটা ওর খুব স্বাভাবিক। খেলার মাঠে দেখা। দু'দিনের পরিচয় মাত্র। অথচ ভাবতে ভাল লাগছে না, এই সামান্য কারণে আজকের আনন্দটা মাটি হবে।

কী ভেবে হঠাৎ ও বলল, 'তোমার কোনও বয়ফ্রেন্ড আছে? আছে নিশ্চয়ই। চলো, তাকেও নিয়ে নিই আমাদের সঙ্গে, কেমন?'

'না। ঘাড় নাড়ল শিখা।—আমার কোনও ছেলেবন্ধু নেই। আমার কোনও বন্ধুই নেই আসলে।'

'চাও না তার মানে। বন্ধুত্ব চাইলে মনের জানলাগুলো খুলে রাখতে হয়। না হলে পাখি আসবে কোন দিক দিয়ে?'

'পাখি? ভাল বলেছেন। আচ্ছা, রেবাকে নেবেন সঙ্গে? হস্টেলের মেয়ে। খুব ভাল মেয়ে, শান্ত।'

এবার হো হো করে হেসে ওঠে অরণি। 'গুণের ব্যাখ্যা দিতে হবে না,' অরণি বলে, 'তোমার পছন্দ হলেই হল। বাব্বা। কত বায়নাক্কা। এদিকে দুপুর গড়াতে চলল।'

সন্ধেবেলা ফিরে আসব তো! বেশিক্ষণ পালিয়ে থাকতে পারব না কিন্তু।' শিখা এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্ত বোধ করে।

সবুজ রঙের মোটরগাড়িটা হস্টেলের গেটে দাঁড়াতেই শিখা লাফিয়ে নামল। ছুটতে ছুটতে ঢুকে গেল ভেতরে।

একটা চটি হিন্দি বই খুলে সুর করে পড়ছিল মিসিরজি, পড়া থামিয়ে তাকাল। দেখল, অরণি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াচ্ছে। টুল থেকে উঠে দাঁড়াল মিসিরজি, অরণিকে বলল, 'ভিতরে গিয়ে বসুন না ভিজিটর রুমে।'

'গাড়িটা দেখো,' বলে অরণিও ঢোকে। মেয়েদের হস্টেল কেমন হয় ওর ধারণা নেই। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, দেখতে লাগল সারি সারি পাম গাছ, দেখল তাদের পেশল স্বাস্থ্য নিয়ে পাহারা দিচ্ছে এই কুমারীমহল। উঁচু পাঁচিল-ঘেরা কমপাউন্ড, তারই মধ্যে কয়েকটা ছাড়া ছাড়া ব্লক। দোতলায় জনবিরল বারান্দা। ডান পাশে একতলায় কয়েকজন ভৃত্যশ্রেণীর পুরুষ কথা বলছে।

কয়েক ধাপ উঠে ভিজিটরদের ঘরখানা। চৌকাঠের ওপর সাদা অক্ষরে লেখা, ভিজিটরস রুম। ঢুকতে যাবে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে, চটির শব্দ করতে করতে ফিরে এল শিখা।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কী বলব রেবাকে?'

'বলবে, অরণি পালিত নামে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে ক্রিকেট মাঠে তোমার আলাপ হয়েছে।' একটু থেমে, কী ভেবে, অরণি আরও বলল, বলতে পারো, খেলা আজ জমেনি বলে তাকে সঙ্গে করে তুমি বেরিয়ে এসেছ মাঠ থেকে। অনেক দূরে, নির্জনে পালিয়ে যেতে চাও, বলেছ। আর, যেহেতু বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির স্বভাবচরিত্র কেমন, তুমি জানো না, তাই রেবাকে এই যাত্রায় তোমার দেহরক্ষী হতে অনুরোধ। বুঝতে পেরেছ?

'দেহরক্ষী বললে ও আসবেই না। চেনেন না, ভা-রী অভিমানী। ভুল কমেন্ট করেছিল বলে লোকাল গার্জেনের বাড়ি থেকে চলে এসেছে।' চোখদুটো বড় বড় করে খুলে, ভুরু তুলে শিখা বলল, 'তার চেয়ে বলি, কাকাবাবু কি মামাবাবুর সঙ্গে গাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি একটু, তুই আসবি?'

'উহুঁ, খবরদার,' অরণি মাথা নাড়ে, 'তা হলে মিথ্যে বলা হবে, পাপ হবে। মজাটা নষ্ট হবে। শুধু বন্ধু পরিচয়ে যদি না কুলোয়, তবে জামাইবাবু গোছের কিছু বলে পরিচয় দিতে পারো আমার।'

ভয় আর দুষ্টুমি মাখানো চোখ দুটো পিটপিট করে শিখা বলল, 'বুঝেছি।'

তারপর ছুটে গেল আবার।

একটু পরেই ফিরে এল। পেছনে রেবা। আলুথালু বেশ। ওর জ্বর, যাবে না।

ওর মধ্যেই একটু হেসে রেবা নমস্কার জানায় অরণিকে।

বলে, 'আপনারা যান। শরীর ভাল থাকলে আমি ঠিক যেতাম। কিছু মনে করবেন না।'

আবার এক মুহূর্তের দ্বিধা। কাটিয়ে উঠে শিখা বলল, 'চলুন।'

সবুজ গাড়িটা স্টার্ট দিতে রেবা হাত নাড়ে।

পাঁচ

শ্যামবাজার, বেলগাছিয়া, দমদম ছাড়িয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা ইটকাঠের জগৎ থেকে বেরিয়ে এল। দু'পাশে খেত। ধান কাটা হয়ে গেছে কিন্তু মাঠ ভরতি আছে খোঁচা খোঁচা শেকড়। তার মধ্যেই ইতস্তত ছড়ানো এক-আধটা সবুজের বরফি—সরষে, পিঁয়াজ, ফুলকপির আবাদ।

দু'জনের কেউই অনেকক্ষণ কথা বলছিল না। কথা ছিল না বলে নয়। উপভোগ করছিল এক প্রকৃতি থেকে অন্য এক প্রকৃতির মধ্যে ছুটে যাওয়াটা। গতির একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে, নির্জনতা সে আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রায় জনশূন্য যশোর রোডের ওপর দিয়ে যেতে যেতে অরণি ভাবছিল।

ওর দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

পাশে, অথচ একটু তফাতে বসা মেয়েটি অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করে, 'কোথায় যাচ্ছি?'

'বাংলাদেশ।'

সামনের দিকে চোখ রেখেই শিখা জানতে চাইল, 'এখান থেকে কতদূর?'

'এক-দেড় ঘণ্টা।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। রাস্তায় দু'-চারজন করে লোক হাঁটতে দেখা যাচ্ছে। কাছেই বসতি। অরণি গাড়ির গতি কমিয়ে আনে। একটা প্রকাণ্ড মাল-বোঝাই লরি দিনের বেলায় হেডলাইট জ্বেলে শব্দ করে পাশ দিয়ে চলে গেল কলকাতার দিকে।

গ্রামটা পার হতেই আবার দীর্ঘ নির্জন। দু'পাশে গাছের সারি—জায়গায় জায়গায় তোরণ বানিয়ে রেখেছে, মনে হয়।

'খিদে পায়নি?' অরণি মুখ ফেরায় এদিকে। তারপর বলে, 'কী দরকার। যা আছে বার করো। ভাগ করে খাওয়া যাক।'

শিখা বলল, 'চলতে চলতে না। কোথাও দাঁড়াই। গাছের নীচে বসে খাব।'

সত্যি সত্যি, একটা বিশাল মোটা অশ্বত্থ গাছের নীচে ওরা শতরঞ্চি পাতল। রাস্তা থেকে নেমে গাছ ঘেঁষে দাঁড় করাল গাড়িটা। একটু আড়াল। মানুষজন কোথায়, আড়াল আসলে আকাশ থেকে,

খোলামেলা বাতাস থেকে একটু। ধুলোর ওপর অজস্র শুকনো পাতার আস্তরণ, তার ওপর শতরঞ্চি পাতা। বেশ একটা গদির আরাম তৈরি হয়েছে তাতে।

খেতে খেতে শিখা জিজ্ঞেস করল, 'এই জায়গাটার নিশ্চয় একটা নাম আছে? আপনি জানেন?'

সেদ্ধ ডিমগুলো ছাড়াচ্ছিল অরণি। টুকরো করে কেটে নুন-মরিচ ছড়াচ্ছিল। আর শুনছিল, এই গাছেই কোথাও, বা কাছাকাছি অন্য কোনও গাছে একটা অদ্ভুত পাখি ডাকছে, বুগবুগ, বুগবুগ কি, বুগবুগ, বুগবুগ কি। এ-ছাড়া কোথাও দূর থেকে আসছে মিহি ঝিঁঝির শব্দ।

কিছু না ভেবে ও বলল, 'ভগবানপুর।'

'এখানে এসেছেন আগে, তার মানে।'

'না। এই প্রথমবার।'

'তা হলে? টাইম টেবিল থেকে জানা।'

'না, মোটেই না। ভগবানপুর ছাড়া আর কী নাম হতে পারে জায়গাটার? এমন সুন্দর জায়গাটাব, তুমি বলো?'

'ওঃ, হো-হো'—হেসে উঠল শিখা। বিষম লাগল একটু। জল খেয়ে শান্ত হল। তারপর প্রসন্নতা ছড়িয়ে গেল ওর মুখময়—ফেস পাউডারের মতো। বলল, 'বানালেন। বেশ বানাতে পারেন তো!'

একটু পরেই দুষ্টুমি পায় শিখার। বলে 'বলুন তো, ডাকছে কী পাখি?'

'একলা।'

'ধ্যাৎ', শিখা হাত দিয়ে ঠেলা দেয় অরণির গায়ে।

'তুমি জানো না,' অরণি গম্ভীর মুখে বলার চেষ্টা করে, রাজস্থানে ও মধ্যপ্রদেশে এই পাখি জন্মায়। দেখতে কিছুটা ঘুঘু, কিছুটা চন্দনার মতো। ছোট ছোট ফল ও পোকামাকড় খায়। সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য পিঁপড়ে। ফাল্গুন মাসে এদের ডিম পাড়ার সময়। তাই শীত এলে এই রকম শব্দ করে সঙ্গীকে ডাকে। আবার কাজ ফুরোলে সঙ্গীকে ভাগিয়ে দেয়। প্রায় মানুষের মতো স্বভাব।'

বলার পর আর হাসি চাপতে পারে না। বিবরণটা বেশ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছিল, নিজেই ফাঁসিয়ে দিল অরণি। তবু জিজ্ঞেস করল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

শিখা বলল, 'হচ্ছে। এই পাখি বোধহয় চিড়িয়াখানায় দেখেছি। বা কাছাকাছি কোথাও।'

খাবারগুলো নিঃশেষ হবার পরও খানিকক্ষণ ওরা চুপচাপ বসে থাকে। ওঠার গরজ নেই বলে ওঠা হয় না। একসময় শিখার মনে হয়, অনেক দূর যাত্রার পথ, এবার ওঠা দরকার। মনের মধ্যে কেমন মধু জমছে বিন্দু বিন্দু। আচ্ছন্ন ভাব, সেটা কাটানো দরকার। একটা বাস চলে গেল!

টুক করে উঠে দাঁড়ায়। শাড়িটা জড়িয়ে নেয় ঠিক করে, তার ওপরে কার্ডিগানের ডান দিকের অর্ধেকটা মেলে দেয় সমান করে।

নিজের ডান হাতখানা ওপরের দিকে বাড়িয়ে দেয় অরণি। বলে, 'টানো তো, পায়ে ঝিনঝিন ধরেছে।'

হ্যাঁচকা টান মারতে অরণি উঠে পড়ে। দাঁড়ায়। সটান শিখার মুখোমুখি। মুখোমুখি ঠিক নয়, উচ্চতায় ছ'ইঞ্চি তফাতে। কী ভেবে মেয়েটার দুই কাঁধে নিজের দুই হাত চেপে ধরে। চোখে চোখ রেখে বলে, 'তুমি এত ইনোসেন্ট যে একটা ইচ্ছের কথা বলতে পারছি না।' বলতে গিয়ে গলা ধরে যায় ওর।

'আমারও একটা ইচ্ছের কথা কিছুতেই বলতে পারছি না', শিখা সপ্রতিভভাবে উত্তর দেয়, 'বড়রা কী করে ওটা খায়, জানি না বলে।' তারপর চাতকের মতো ওপর দিকে চায়।

'এসো, তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি।'

বিচিত্র পাখির ঝাঁক, মৃদু ঝিঁঝিপোকার শব্দ, পাতা ঝরা, বনজ বাতাস ও দুপুর—সব উপেক্ষা করে দু'জন অসমবয়সি নরনারী পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে কিছুক্ষণ। আবেশ লাগে শিখার, টলে যায়, অশ্বত্থ গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। চোখ বুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কাঁপে। অল্প অল্প হাঁপায় অরণি, যেন অনেকটা সময় টেলিফোনে কথা হবার পর কথা শেষ হয় ওদের এক সময়। ওরা হেসে ওঠে।

'ক্যাপসিকামের গন্ধ।'

ছোটবেলায় বাবা বলত, শিখার মনে পড়ল। সাবান আর হরেক রকম ট্যালকম পাউডার ঘষে এ-গন্ধ তাড়াবার চেষ্টা করত মা। যায়নি তা হলে, এতদিন পর জানতে পারল শিখা। কিন্তু সে তো প্রিয় গন্ধ নয়।

বলল, 'আমার ঘামে ক্যাপসিকামের গন্ধ।'
অরণি বলল, 'নেশা ধরে যায়। সাবধান হতে হবে। তুমি আমায় বেশি প্রশ্রয় দিয়ো না।'
আবার ছুটতে থাকে সবুজ গাড়িটা। সামনের সিটে দু'জন। পাশাপাশি কিন্তু একটু তফাতে বসা।
অনেকটা সময় খরচ হয়ে গেছে ভেবে অরণি স্পিড তুলে দিল গাড়ির। ফাঁকা পথ। দু'পাশে গাছের সারি পেছন দিকে ছুটছে।
শিখা জিজ্ঞেস করল, 'এই রাস্তাটা সোজা যশোর অবধি গেছে, না?'
'হ্যাঁ।'—অরণির সংক্ষিপ্ত উত্তর।
'আচ্ছা, আমাদের তো পাসপোর্ট নেই, বর্ডারে আটকাবে না? পুলিশ যদি আমাদের ধরে বসে!'
'দেখা যাক।'
'যদি আমাদের পরিচয় জানতে চায়? বলে, আমি আপনার কে হই?' বলতে গিয়ে হোঁচট খায় শিখা। গাড়িটা স্পিডের মুখে ঝাঁকি খেল।
'বান্ধবী, প্রেমিকা, ফিঁয়াসে—কিছু একটা বলা যাবে।' অরণির মুখের চামড়ায় একটু হাসির ঢেউ খেলে যায়। তারপর বলে, সম্পর্ক। সঙ্গে থাকলে একটা সম্পর্কও থাকা দরকার, তাই না। অন্যায় ব্যবস্থা। ভাঙা দরকার।'
হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ। বমের মতো। আচমকা গাড়িটা ডান দিকে ঘোরে। ঘুরতেই থাকে। স্টিয়ারিংয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অরণি। দ্রুত ঘোরাতে থাকে বাঁদিক, ডান দিক, বাঁ দিক। বেসামাল। গাছে গিয়ে ধাক্কা খায় গাড়িটা। প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা খায়। সামনের কাচ ঝনঝন শব্দে ভাঙে। চেঁচিয়ে ওঠার আগে শিখা অরণির মুখে একটাই শব্দ শুনতে পায়, 'স্টেপনি।'...
বেশ কিছুক্ষণ অচেতন থাকার পর শিখার জ্ঞান ফেরে। ভয়ে ভয়ে চোখ খোলে। না, মরেনি। বেঁচে আছে তা হলে! কিন্তু এ কোথায়? কেন এখানে? বাইরে এখনও একটু একটু দিনের আলো।
কপালের কাছে জ্বালা করছে। হাত তুলতে গিয়ে পারল না। একটা মানুষের দেহ চেপে বসে আছে হাতটার ওপর। মনে পড়ল। জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিল। তাকাল ডান দিকে। দেখল, স্টিয়ারিংয়ের ওপর মাথা, হাত দুটো দু'পাশে ঝুলছে অরণির। আর রক্ত। বেঁচে আছে না মরে গেছে, পরখ করে দেখার মতো স্থির বুদ্ধি ওর থাকার কথা নয়। যা ওর পক্ষে স্বাভাবিক, তাই করল শিখা। কাঁদল। চুপচাপ বসে কাঁদল কিছুক্ষণ। কাঁদতে কাঁদতে ওর কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হল।
অনেক কষ্টে, ঠেলে, বাঁ দিকের দরজা ঠেলে বেরুতে পারল। তারপর দাঁড়াল রাস্তার পাশে।
কোথাও লোকজন নেই। গাছে এখন অনেক পাখি কিচিমিচির করছে। কে কার সঙ্গে শোবে, তাই নিয়ে ঝগড়া চলছে ওদের কিন্তু মেয়েটার সেদিকে মন নেই।
প্রাণপণে ও চিৎকার করতে লাগল, 'বাঁচাও, বাঁচাও।'
হয়তো দশ-পনেরো মিনিট, কিংবা এক ঘণ্টাই কেটে গেছে এইভাবে। শেষপর্যন্ত যখন দূরে তিনটে আলোর বিন্দু ওর চোখে পড়ল, তখন আর গলায় স্বর নেই। শুধু প্রবলভাবে হাত নাড়ছে। বাসটা কাছে আসার আগেই ও পড়ে যায়।
পরদিন সকাল দশটা নাগাদ সামান্য কিছু শুশ্রূষা করে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল শিখাকে। খালাস পাবার আগে স্টাফ নার্সকে ও জিজ্ঞেস করল, 'বলতে পারেন, ভদ্রলোকটি কি বেঁচে আছেন?'
সিস্টার বলল, 'আছেন, তবে সিরিয়াসলি ইনজিয়োর্ড।'
'দেখা করা যায়?'
'না। কোনও ভিজিটর যেতে দেওয়া হচ্ছে না।'
বেরোবার একটু আগে দু'জন ভদ্রলোক এসে ওর কাছে বসলেন। খুব বিনত ভঙ্গিতে স্মিত হেসে বললেন একজন, 'শিখাদেবী, আপনাকে দু'-একটা প্রশ্ন করব, কিছু মনে করবেন না।'
'কী প্রশ্ন?'
'কালকের ঘটনা সম্পর্কে। সৌভাগ্য, আপনার কোনও বিপদ হয়নি। কিন্তু কী না হতে পারত, ভেবে দেখুন।'
শিখা ভেবে দেখার চেষ্টা করল।
ভদ্রলোক বললেন, 'লোকটাকে আপনি কতদিন ধরে চিনতেন?'

শান্তভাবে শিখা উত্তর দিল, 'তিন দিন। না, দু'দিন।'

'মাত্র? কীভাবে পরিচয় হয়েছিল আপনাদের, দয়া করে বলবেন? মানে এমব্যারাসিং কিছু থাকলে, তা বাদ দিয়েই বলুন।'

'ইডেনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গিয়ে আলাপ,' শিখা দেখল অন্য লোকটি খাতায় নোট নিচ্ছেন, 'আমার পাশেই ওঁর—মানে লোকটার সিট পড়েছিল, কথায় কথায়—'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন দু'জন। মুখে সহানুভূতির ভাব এনে ঈষৎ মাথা দোলাতে দোলাতে প্রথম জন নিজের মনে বললেন, 'এ তো হকি বা ফুটবল নয় যে এক-দেড় ঘণ্টায় শেষ। পাঁচদিন ধরে খেলা, সারাদিন বসে বসে দেখা। হতেই পারে। খুব স্বাভাবিক। ইউ ক্যান ফল ইন অ্যান্ড আউট অফ লাভ ইন দিজ ফাইভ ডেইজ। আচ্ছা', এবার তিনি চোখ তুলে চাইলেন, ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'আপনাদের টিকিট নাম্বার দুটো এক হল কী করে?'

এবার ভয় পেল শিখা। কাঁপা গলায় জানাল, তা তো জানে না।

'আপনার জানার কথা নয় শিখাদেবী।' আশ্বাস দেন ভদ্রলোক, জাল হয়েছে, এবার ঢের টিকিট জাল হয়েছে। আর আমাদের সন্দেহ, এই জাল টিকিটের জাল পেতে শুধু টাকাই নয়, দুর্বৃত্তেরা অন্য অনেক কিছুর সুযোগ নিচ্ছে।'

একটু থামলেন ভদ্রলোক। চিন্তা করলেন। বাঁ হাতের তর্জনীর ওপর দাঁতের চাপ দিতে দিতে বললেন, 'আপনাকে জোর করে গাড়িতে তুলেছিল, না স্বেচ্ছায় আপনি—?'

'না, না, জোরটোর করেনি। জোর কেন করবে,' অরণির মুখটা ঈষৎ বিষণ্ণ চোখের সামনে ভেসে উঠল একবার, 'নিজেই গিয়েছিলাম।'

'কেন?'

'দূরে কোথাও চলে যেতে চেয়েছিলাম।'

'কোথায়?'

'বিশেষ কোথাও না। ও বলেছিল, বাংলাদেশ ঘুরে আসব।'

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। পাশের জন নোট নিচ্ছেন।

'এর মধ্যে কোনও রিস্ক থাকতে পারে আপনার মনে হয়নি? মেয়েদের পক্ষে এভাবে একা—আপনি তো বড় হয়েছেন, বুঝতে পারেন।'

শিখা চুপ করে থাকে। একটু পর বলে, 'ভুল হয়েছে।'

ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এসে দেখে, বাবা। পাশে দাঁড়ানো মাসি। দু'জনেরই চোখে জল টলটল করছে। শিখা বাবার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাসি, এখন মা, যাকে ও অন্তর থেকে ঘেন্না করত,—ওর কপালে হাত রাখল। পট্টি দেওয়া জায়গাগুলোয় হাত বুলিয়ে দিল। বলল, 'ভগবান রক্ষা করেছেন।'

যার মা নেই তার মামার বাড়ি কীসের! শিখা কোনওদিন মামার বাড়ি যেত না। মামাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখার দরকার মনে করেনি, যদিও ওরাই লোকাল গার্ডিয়ান।

কিন্তু এই বিপদের সময়ে ওরা আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাসাতেই এসে উঠেছে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে শিখাও সেখানে উপস্থিত হল।

কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। দুর্ঘটনা বিষয়ে কেউ ওকে প্রশ্ন করছে না, দেখে স্বস্তি বোধ করে শিখা। দেড়তলার ছোট্ট ঘরটায় একা শুয়ে-বসে থাকে। বার বার ঘুমিয়ে পড়ে। দুঃস্বপ্ন দেখে জাগে। জানলা দিয়ে লোকজন দেখে। মন খারাপ নিয়ে ট্রানজিস্টার শোনে।

চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস—৩১৬। বিশ্বনাথ হিরো—একাই ১৩৯ রান তুলেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন উইকেটে ১৪৬। অর্থাৎ পঞ্চম দিনে ভারত ১৬৩ রানে এগিয়ে আছে। ওদের হাতে সাতটা উইকেট। ফ্রেডরিকস আউট কিন্তু জমে গেছে কালীচরণ। আড়াই ঘণ্টা খেলে ৪৮ রান বাগিয়ে বসে আছে গ্যাঁট হয়ে। ভাঁড়ামি করলে কী হবে লোকটা অত্যন্ত সাবধানী। তা ছাড়া প্রথম ইনিংসে শূন্য করেছিল তার অপমান সুদে-আসলে উশুল করতে বদ্ধপরিকর।

খেলা দেখাল চন্দ্রশেখর। পঞ্চম দিনের প্রথম পঁয়ত্রিশ মিনিটের খেলায় কালীচরণ লয়েড—দু'জনেই আউট। দম ফুরিয়ে যায় প্রতিপক্ষের। চন্দ্র আর বেদি দু'জন বাঘা বোলার টপাটপ সাবাড় করল সবক'টা ব্যাট। পঞ্চম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আটাত্তর রান মাত্র কোনওক্রমে তুলে লাঞ্চের আগেই বিদায় নিল।

বুকে বালিশ রেখে শিখা বাকি খেলাটা বেতারে শুনল। মাঠে কী প্রচণ্ড উত্তেজনা—অনুমান করতে ওর দেরি হয় না। বিজয়ী খেলোয়াড় দল দর্শকদের অভিনন্দন নিতে মাঠ ঘুরছে। জনতা ফেটে পড়েছে মাঠে। পুলিশ শান্ত প্রসন্নচিত্তে ওদের আনন্দ জয়ের গৌরব উপভোগ করতে দিচ্ছে। পয়লা জানুয়ারি ১৯৭৫।

শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দেয় শিখার। আবার মন খারাপ হয় একটু। কী যে সব হয়ে গেল মাঝখানে!

বাবা আর মাসি দুর্গাপুর ফিরে যাবে পরের দিন। শিখাকেও নিয়ে যাবে সঙ্গে। আড়ালে ওদের কথাবার্তা কিছু কিছু শুনেছে শিখা। বাবা বলছে, কেস করবে লোকটার বিরুদ্ধে। মামা বলছে, কেস তো পুলিশই করবে, তবে, একটা পাবলিক স্ক্যানডাল। কাগজে রসিয়ে রসিয়ে খবর। ভেবে দেখো, কতটা এনকারেজ করা উচিত হবে। ঠিক হয়েছে, শিখাকে সঙ্গে করে হর্ষনাথ আজ বিকেলে লোকটাকে দেখতে যাবে হাসপাতালে।

শেষ দৃশ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, হাসপাতালের একটা কেবিন। চাকা-লাগানো লোহার খাটের ওপর গদি-মোড়া সাদা বিছানা, বিছানাটার পিছন দিক একটু উঁচু করে তোলা। অরণি শুয়ে আছে আধ-বসা ভঙ্গিতে। একটা চোখের ওপর মোটা ব্যান্ডেজ, বহুবার মাথা প্রদক্ষিণ করে এসে কোনাকুনি স্থির সেফটিপিন আঁটা। অন্য চোখটা খোলা। হাতদুটো দু'পাশে এলানো। দুটো সাদা শক্ত কদলিকাণ্ডের মধ্য থেকে যেন কলির মতো আঙুলগুলো বেরিয়ে এসেছে। চাদরে-কম্বলে ঢাকা দেহ সুতরাং দেখা যাচ্ছে না আর কোথাও প্লাস্টার আছে কিনা। সময় বিকেল পাঁচটা হবে।

পাশে চেয়ারে-বসা শুভ্রা। ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা। অস্বাভাবিক রকম নির্বিকার। ঝড় বয়ে যাবার পর বন্দরের মতো শান্ত। অথচ, মুখখানা খুশি, না ঠিক খুশি না। নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততার কারণে উজ্জ্বল। কয়েকটা অদৃশ্য ব্যান্ডেজ যেন ওর শরীরেরও কোথাও কোথাও বাঁধা আছে। মিষ্টু-টাইনি—দু'জনেই ওরা উপস্থিত। কখনও দিদার পাশে বেঞ্চিটাতে বসছে, কখনও বাইরে বারান্দায় দৌড়োদৌড়ি করে আসছে একটু। মিষ্টু গম্ভীর, খেলাধুলো করার ইচ্ছে আছে মনে হয় না। টাইনির জন্যে যতটুকু করার করছে। বাবার শরীরে গভীর আঘাত লেগেছে, বাবার কষ্ট হচ্ছে বুঝেছে মিষ্টু।

দু'জন অপরিচিত ব্যক্তিকেও আমরা এখানে দেখছি। একজন বরুণ পালিত, অরণির দাদা। পঞ্চাশের ওপর বয়স, পাঞ্জাবির ওপর জহরকোট, পরনে ধুতি—সাধারণ ছাপোষা মানুষ। মাঝে মাঝে সিস্টারের সঙ্গে কথা বলছেন। অন্যজন মাখনবাবু, অরণির আপিসের লোক—দেখতে এসেছে, আজ কেমন আছেন সাহেব। দু'-চারটে কাজের কথা বলা যায় কিনা।

নার্স একবার ঘরে ঢুকে এত লোকজন দেখে বলে গেল সকলে একসঙ্গে ঘরে থাকা অনুচিত, কেউ কেউ বাইরে অপেক্ষা করুন। নাতি দুটিতে নিয়ে দিদা বারান্দায় সরে গেলেন। মাখনবাবু দাঁড়াল দরজার চৌকাঠের কাছে। বেশি কথা বলা মানা, তবু অরণি একটু-আধটু কথা বলছিল।

এমন সময় হর্ষনাথ ও শিখা কেবিনে ঢুকল।

'ক্যাপসিকাম!'—খোলা চোখটা মেলে বলে উঠল অরণি।

অভাবিত দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত হয়ে অবাক হয়ে গেছে শিখা। লোকটার—ভদ্রলোকের, কত চোট লেগেছে কে জানে! শেষবার ওকে স্টিয়ারিংয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছিল। আর কোনওদিন হয়তো উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে শিখা। গভীর টেলিফোন-করা গলায় অরণি আবার বলল, 'ক্যাপসিকাম, তোমার বেশি লাগেনি তো?'

শিখা জবাব দিল না। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কেমন আছেন?'

'সেরে উঠব। তবে সময় লাগবে। হাড়গোড় ভেঙেছে—'

'চোখে—?'

'ওটা গেছে চিরদিনের মতো। চিরদিন কেন বলছি, যতদিন বাঁচি, ততদিনের মতো।' বলতে গিয়ে অরণি ম্লান হাসে।

মন শক্ত করে এসেছিল শিখা, কিন্তু পারল না। ছোট্ট রুমাল দিয়ে চোখের কোণ মুছল।

অরণি স্ত্রীকে বলল, 'এই সেই মেয়েটি। শিখা।'

শুভ্রা ঠিক হাত জোড় নয়, কাঁচুমাচুভাবে হাতদুটো জড়ো করে কৃতজ্ঞভাবে বলল, আপনার জন্যেই উনি এত বড় অ্যাকসিডেন্ট সত্ত্বেও বেঁচে উঠলেন। আপনি না থাকলে—'

হর্ষনাথ কথা বলছে না। দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

ভারত জিতেছে, খবরটা দিতে গিয়েও চেপে গেল শিখা। মনে হল, অপ্রাসঙ্গিক।

শুভ্রা বলল, 'বসুন।'

হর্ষনাথ বেঞ্চিটার ওপর বসল। শিখা বসল না। বলল, 'আমাকে আপনি বলবেন না। আমি অনেক ছোট।'

শুভ্রা ওর দিকে বিশদ করে তাকাল একবার। তারপর বলল, 'শুধু বয়েসেই কি ছোট-বড়র বিচার হয়!'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাইরে ছ'টার ওয়ার্নিং বাজে। কেবিনের আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে আসে। বরুণ পালিত মাথা হেলিয়ে ছোট ভাইয়ের কাছে বিদায় নিলেন।

অরণির দিকে তাকিয়ে, ওর খোলা চোখটার দিকে তাকিয়ে শিখা এত দুঃখের মধ্যেও ফিক করে হেসে ফেলে।

'কী কাণ্ড হল বলুন তো। কেন হল?'

'ভালই তো হয়েছে।'—অরণির মুখে হাসি ফোটে আবার। কারণ একটা ছিল সেটা নগণ্য। কিন্তু এখন থেকে আমরা সবকিছু অন্য রকম দেখব, তাই না? অন্য রকম ভাবে বাঁচতে শিখব, সেটা কি কম লাভ!'

১৯৭৬

❀ আড়াল

জীবনে একটা বয়েসে সবাই প্রেমপত্র লেখে। আমিও লিখেছি। যখন অনেক কথা জমে যায় মনের মধ্যে। বেরোবার জন্য আকুলিবিকুলি করে। অথচ যার উদ্দেশে বলার জন্য সেই সব কথার উদ্ভব, সেই মানুষটিকে পাওয়া যায় না নাগালের মধ্যে। আর পাওয়া গেলেও সংকোচ, লজ্জা আর সাহসের অভাব থেকে বলা যায় না। কোনও প্রেমিকার সামনাসামনি বসে বা দাঁড়িয়ে, কিংবা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে যে কথাবার্তা হয়, তার সবই এলোমেলো, বিচ্ছিন্ন ভাবোচ্ছ্বাস। অসম্পূর্ণ বাক্যে ভরা। একলা নির্জনে তার অবয়ব ফোটে। সেই কাঁচা বয়েসে ভাষার ওপর দখল থাকে কম। শুধু আবেগের টানে প্রেমপত্র লেখা হয়ে ওঠে। আজ বয়সের দূরত্ব থেকে এইসব কথা মনে হচ্ছে।

সেই তুলনায় প্রেমপত্র খুব বেশি পাইনি আমি। যা-ও বা পেয়েছি, হারিয়ে ফেলেছি। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। জমিয়ে রেখে আজ এতদিন পর সেগুলি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে পত্রলেখিকাদের অস্বস্তিতে ফেলা হত। আমি আশা করি, আমার প্রেমপত্রগুলোও প্রাকৃতিক নিয়মে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং আমার জীবনের অতীতকাল যেটা, সেখানকার রেকর্ড পরিচ্ছন্ন, কালিমামুক্ত। আমার গার্হস্থ্য চরিত্র নিষ্কলুষ।

এমতাবস্থায় আমার বাড়ির লেটারবক্সে একটি ছোট্ট চিঠি পড়ল। লেখিকা জনৈকা তনুশ্রী মিত্র।

খামের ওপর ডাকটিকিট নেই। কিন্তু খামটা আঠা দিয়ে সাঁটা। ভেতরের রুলটানা কাগজে সাধারণ প্রিয় সম্ভাষণের পর ভদ্রমহিলা লিখছেন, 'আপনি লেখক। মানুষের মন নিয়ে আপনার কাজ। মাঝে মাঝে আপনার লেখা পড়তে পাই। আমাদের বিল্ডিংয়ের সামনে দিয়ে আপনাকে যাওয়া-আসা করতে দেখি। ইচ্ছে করে, আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলি। মনের বোঝা হালকা করি। কিন্তু তা সম্ভব হয় না।

আমার চলাফেরার কিছু অসুবিধা আছে। একদিন আমাদের ফ্ল্যাটে আসুন না। কাল-পরশু। সকাল এগারোটা নাগাদ। তখন বাড়িটাও নিরিবিলি থাকবে।'

এইখানেই ইতি। তনুশ্রী মিত্র। গোটা গোটা হস্তাক্ষর। নামের নীচে, ফ্ল্যাটের নম্বর ২৩। রঞ্জন অ্যাপার্টমেন্টস। ঠিকানা ওই অবধি। চিঠিতে কোনও তারিখ নেই।

এই চিঠিকে কি প্রেমপত্র বলা যাবে? না, বোধহয়। যদিও 'নিরিবিলি' শব্দটার মধ্যে একটা ইঙ্গিত আছে। তবে ওসব ইঙ্গিতটিঙ্গিত এই বয়েসে আর তেমন টানে না। জীবনে অনেক কিছু তো দেখা হল।

'আমার চলাফেরার কিছু অসুবিধা আছে'—এই বাক্যটি আমায় আকর্ষণ করল। ভাবলাম, একদিন গিয়েই দেখি না, কী ব্যাপার।

আমি যে একতলা বাড়িতে ভাড়া থাকি, তার ঠিক পাশেই ওই রঞ্জন অ্যাপার্টমেন্টস। আটতলা বাড়ি। অনেকগুলো ফ্ল্যাট। বছর পাঁচেক হল তৈরি হয়েছে। ওখানে আগে আরেকটা একতলা বাড়ি ছিল। সামনে বাগান ছিল তার। দুটো পাম গাছ। লোহার গেট। গেটের পাশে চাকরদের ঘর। যেতে-আসতে ওই গেটের ভেতর দিয়ে দেখতে পেতাম একটা মোটরগাড়ি কাপড় দিয়ে ঢাকা।

আমারই চোখের সামনে ভাঙা হল বাড়িটা। অনেক ধুলো উড়ল। আমার যাওয়া-আসার পথে বালি আর পাথরকুচির ডাঁই অসুবিধার সৃষ্টি করে জেগেছিল এক বছর। কি তারও বেশি। প্রথম দিকে দেখতাম, পুরনো দরোজার ফ্রেম, বিমের কাঠ আর মার্বেল পাথরের চৌকো চৌকো ফলক ঠেস দিয়ে রাখা আছে ভাঙা দেয়ালের গায়ে। নীলামে বিক্রি হবে। একদিন দেখলাম, সেগুলো আর নেই। তিনতলা ঢালাই হচ্ছে আলো জ্বালিয়ে। ক্রমে আমাদের পাড়াটাকে বামন করে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ওই বিল্ডিং। খোপে খোপে আলো জ্বলল। পরদা ঝুলল। ট্রাক ভরতি করে আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ফ্রিজ, ভাঁজ-করা গদি, পাখা আর ঝাঁটা নিয়ে একে একে ঢুকল বাসিন্দারা। যাওয়া-আসার পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতদিন এই দৃশ্য দেখেছি। ভেবেছি, নতুন ফ্ল্যাটে ওবা নতুন জিনিসপত্র নিয়ে আসছে না কেন। পুরনো সুখ, দুঃখ, তেল আর ঘাম বয়ে নিয়ে আসছে নতুন জীবন শুরু করতে। এ কী করে সম্ভব? সে-সব তো মানাবেও না। ভেবেছি, এত লটবহর ওদেব সঙ্গে, একটাও বই দেখি না কেন? আবার ভেবেছি জায়গা বদলালেই কি জীবনযাপন বদলে নেওয়া যায়? আসবাব বদলালেও যায় না। এই সুযোগে যদি মানুষগুলোকে অদলবদল করে নেওয়া যেত, তো বেশ হত। অভ্যেসগুলো নতুন করে ঝালিয়ে নিয়ে পারত ওরা। এইসব ভাবনাচিন্তা হয়তো আমার মনের ভেতরকার বিরূপতা থেকে জেগেছিল তখন। আমার ভাড়াটিয়া মনের হিংসে থেকে।

একদিন দেখলাম, আমার যাওয়া-আসার পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে। বালি, পাথবকুচি আর একটিও পড়ে নেই। নতুন গেট বসেছে। তার পাশে আলো-দেওয়া কাচের খুপরিতে বিল্ডিংয়ের নাম— লাল অক্ষরে, ইংরেজিতে, রঞ্জন অ্যাপার্টমেন্টস। দাঁড়িয়ে আছে উর্দি-পরা সিকিউরিটি গার্ড। গাড়ি ঢুকছে, গাড়ি বেরোচ্ছে। স্কুলের বাস সকাল-বিকেল বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ায়।

ওখানকার কারুর কারুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। বাজারে দেখা হয়। কেউ কেউ মুটের মাথায় আনাজপত্র নিয়ে গেট দিয়ে ঢোকে। বেশির ভাগই বাঙালি। বেশভূষা, কলপ, টাক থেকে বোঝা যায় না, কে কত বড়লোক।

তো, ভাবলাম, একদিন গিয়েই দেখি না, কী ব্যাপার। নিশ্চয় ওদের ফ্ল্যাটটা সামনের দিকে। না হলে, আমাকে যাওয়া-আসা করতে দেখে কী করে। চিঠিতে লিখছে, কাল বা পরশু। অথচ চিঠিতে তারিখ নেই। কবে থেকে ধরব? আজ থেকেই? নানা কথা ভেবে একদিন পার করে দিলাম।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন দুর্ধর্ষ গল্পকার। ওঁর মতো অত ছোটগল্প বোধহয় আর কোনও বাঙালি সাহিত্যিক লেখেননি। যৌবন বয়সে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কী বিপুল খ্যাতি, তবু একটুও অহংকার ছিল না ভদ্রলোকের। তিনি একবার কথায় কথায় বলেছিলেন, মানুষের জীবনে ছোট ছোট ব্যাপারের মধ্যে কত গল্প লুকিয়ে থাকে, আমরা জানতে পারি না। আমরা জানতে চেষ্টাও করি না। কেবল ঘটনা খুঁজে মরি। জীবনে বড় ঘটনা ক'টাই বা ঘটে, বলো। হয়তো সেই কারণেই তিনি নানা স্তরের লোকজনের সঙ্গে অবলীলায় মেলামেশা করতেন। তাদের মনের খবর নিতেন। পেয়ে যেতেন গল্পের প্লট।

তিন দিনের দিন সকাল এগারোটায় ওই রঞ্জন অ্যাপার্টমেন্টসের গেট দিয়ে ঢুকলাম ভেতরে। একটু

ভয় ভয় করছিল। আমি একটা অচেনা লোক, সিকিউরিটি গার্ড আমায় আটকে না দেয়। যদি জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন? কত নম্বর ফ্ল্যাট? কী নাম? তখন কী বলব? ২৩ নম্বর ফ্ল্যাটের তনুশ্রী মিত্রের সঙ্গে আপনার কী দরকার, জানতে চাইলেই গেছি আর কী। আজকাল বহুতল বাড়িতে নিত্যই ডাকাতি হচ্ছে। তবে আমার যা চেহারা, তাতে ডাকাত বলে মনে করা শক্ত।

ঢুকে পড়ার পর আমার মনে আর কোনও সংকোচ রইল না। বরং কৌতূহলটা বেড়ে গেল। বলা তো যায় না, কোথায় কী গল্প লুকিয়ে থাকে। বেশ সাহসের সঙ্গে ২৩ নম্বর ফ্ল্যাটে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে হাজির হলাম। লিফটম্যানই আমায় পৌঁছে দিল চারতলায়।

বেল টিপতেই দরোজা খুলল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখি, এক ভদ্রমহিলা, বেশ সুসজ্জিত যাকে বলে, আমাকে ভেতরে আসতে বলছে। আমি ইতস্তত করছি দেখে বলল, জুতো পরেই আসুন।

যা ভেবেছিলাম, তাই। ঘরটায় প্রকাণ্ড এক কার্পেট পাতা। দু'পাশে লম্বালম্বা সোফা। ভেলভেটের গদি। রং-করা দেয়াল। যে-দিক দিয়ে ঢুকলাম, তার উলটো দিক থেকে দিনের আলো ঘরে আসছে। ওখানে বোধহয় ব্যালকনি। ফুলের টব, সাদা বেতের চেয়ার দেখে মনে হল। ফ্ল্যাটের মধ্যে জনমানবের সাড়াশব্দ নেই।

ঘরটার মধ্যে মৃদু বিস্কুটের গন্ধ পেলাম। আবার ভাবি, বিস্কুটের গন্ধ এখানে কোথা থেকে আসবে। এ হয়তো সচ্ছলতার গন্ধ। পরিচ্ছন্নতার গন্ধ। ওই গন্ধ পার হয়ে আমরা ব্যালকনিতেই এসে পৌঁছোই। বেতের চেয়ারটা দেখিয়ে ভদ্রমহিলা বলল, সকালবেলাটা ওই চেয়ারে বসেই কাটিয়ে দিই। ওখান থেকেই আপনার যাওয়া-আসা দেখি। সংসারের অনেক কাজ করেন আপনি, আমি ভাবি, লেখেন কখন?

ততক্ষণে আমরা দু'জনেই মুখোমুখি বসেছি। তার প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে আমি পালটা প্রশ্ন করি, চলাফেরার অসুবিধে লিখেছেন, কী রকম অসুবিধে?

এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই জানানো হয়ে যায়, আপনি চিঠি দিয়ে ডেকেছেন বলে এসেছি। আমার নিজের কোনও দরকারে এখানে আসিনি।

এই আমার পা। ডান পা। তনুশ্রী উরুর ওপর হাত রাখল।

শাড়ির ওপর থেকে কিছুই বোঝা যায় না। পায়ের পাতা দুটির দিকে তাকিয়ে দেখি, পরিষ্কার। কোনও খুঁত চোখে পড়ে না। দু'পায়ের নখই লাল রং করা, চকচকে।

কুকুরে কামড়ে ছিল। ইঞ্জেকশান দিতে গিয়ে পা-টা পড়ে গেল। ন'বছর।

কোনও চিকিৎসা নেই।

আছে। করা হয়েছে। কোনও ফল হয়নি। এখনও চলছে, থেরাপি টেরাপি। ও সারবার নয়?

ভদ্রমহিলার মন ভাল করার জন্য বলি, খুব সিরিয়াস কিছু নয়। বেশ তো চলাফেরা করতে পারেন, দেখলাম।

আপনিও স্তোক দিচ্ছেন আমার স্বামীর মতন? অসুখটা বেশ সিরিয়াস। ঘরের মধ্যে ফার্নিচার আছে, ধরে ধরে চালিয়ে দিই, বাইরে বেরোতে হলেই সাপোর্ট লাগে। লোকেরা দেখেই বোঝে পঙ্গু মেয়েমানুষ।

মুখের ভাষায় তিক্ততা থাকলেও, দেখলাম, মহিলার হাসিটি সুন্দর। মুখশ্রীও ভাল। বয়েস চল্লিশের ওপরই হবে। তবে দেখে কম মনে হয়। সুখের শরীর। টাকাপয়সার অভাব তো নেই।

কথা ঘোরাতে চেষ্টা করি। বলি, কতদিন এসেছেন এই ফ্ল্যাটে? খুব সম্প্রতি? আপনাকে আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

বছর চারেক; তার আগে নর্থে থাকতাম। জয়েন্ট ফ্যামিলি। এই ফ্ল্যাটটা কিনে স্বামী আমায় উপহার দিয়েছেন।

এইভাবে কথার পিঠে কথা চলতে থাকে। ক্রমে ক্রমে আমি জানতে পারি, এই তনুশ্রী মিত্র যখন কলেজে পড়ত, তখন তনুশ্রী মিত্র ছিল না, দত্ত বা বসু ছিল হয়তো, সেই সময় ওদের কলেজের কোনও ফাংশানে আমি গিয়েছিলাম। ও আমার অটোগ্রাফ নিয়েছিল। সে-খাতা এখনও আছে ওর কাছে। জানতে পারি, লেখক সম্প্রদায়ের ওপরই আকর্ষণ, আমার ওপর আলাদা কোনও টান নেই। তাতে স্বস্তি

বোধ করি। আমার ক্রমে ক্রমে জানা হয়ে যায়, এই তনুশ্রীর দুই সন্তান, এখন বড় চাকরিবাকরি করছে। দু'জনেই কলকাতার বাইরে। স্বামী ব্যবসা করে। সারা ভারতবর্ষ ব্যবসার কাজে ঘুরে বেড়ায়। বলতে বলতে তনুশ্রীর গলা ধরে আসে।

আমাকে অ্যাভয়েড করার জন্যে বাইরে বাইরে থাকে, বুঝলেন কিনা।

ছেলেরা আসে না ছুটিছাটায়?

তারাও অ্যাভয়েড করে মাকে। কলকাতায় এলে পুরনো বাড়িতে ওঠে। স্বাভাবিক মা আর ক্রিপল মায়ের মধ্যে তফাত আছে না। কে আর সাধ করে অসুস্থ মানুষের সঙ্গে থাকতে চায়। আমি সব বুঝতে পারি। কিছু বলি না। দুনিয়ায় সবাই স্বার্থপর। তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমি এক একা থাকি। নিজের মনে লিখি।

লেখেন?

এবার প্রায় আঁতকে উঠলাম আমি।

কী লেখেন?

কবিতা।

কেন? কবিতা লেখেন কেন?

তাতে মনের পার্গেশন হয়।

ছাপা হয়েছে?

না, না। ছাপার জন্যে তো লিখি না। নিজের জন্যে লিখি। নিজে নিজেই পড়ি। তা ভাবলাম, খাতার-পর-খাতা ভরে যাচ্ছে লেখায়, কী মাথামুন্ডু লিখছি, একবার যাচাই হওয়া দরকার। এতে লজ্জার কী আছে, বলুন। আমি তো মিথ্যে কথা কিছু বলছি না। লোকে জানলে, জানবে। আমিও তো একটা মানুষ।

এই রকম কেস আমি আগেও দেখেছি। এ এক মানসিক রোগ। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে মানুষ একটা বয়েসে এসে এই রোগের কবলে পড়ে যায়। মূল অসুখটা হল নিঃসঙ্গতা। যৌনজীবনে ভাঁটা পড়লে স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ যখন কমে যায়, ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে যায়, স্বনির্ভর হয়, তখন নজর পড়ে বাইরের দিকে। কিন্তু বাইরের জগৎও তাকে বিমুখ করে। অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তখন সেই মানসিক রোগী নানা রকম অছিলায় নিজেকে জাহির করতে চায়। মেয়েদের বেলা এর প্রকোপ বেশি, কেননা তাদের শরীরে বার্ধক্য আসে পুরুষের অনেক আগে। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। ষাট বছর বয়েসের আগে মেয়েরা বার্ধক্যকে মেনে নিতে পারে না। এই মধ্যবর্তী সময় সত্যি বড় কষ্টকর। ইন্দিরা গান্ধীর মতো জাঁদরেল মহিলাও এই সংকটের মধ্যে পড়ে তাঁর পুত্র সঞ্জয়ের ওপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন—এই কথা তাঁর জীবনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

শোনা যায়, বনের পশুপাখি প্রজনন ক্ষমতা হারাবার পর আর বেশিদিন বাঁচে না। মানুষ গৃহপালিত জীব। তাকে রক্ষা করার জন্য সমাজ রয়েছে, তাই তার আয়ুও বেশি। শুষ্ক অপ্রয়োজনীয় শরীর নিয়ে সে টিকে থাকতে পারে। শুধু টিকে থাকা নয়, শুষ্ক অপ্রয়োজনীয় দেহ নিয়ে সে সমাজে প্রতিষ্ঠাও পায়। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের প্রশাসনের ওপর কর্তৃত্ব যাদের, তারা অধিকাংশই তো বৃদ্ধ। প্রাকৃতিক নিয়মে তারা পরিত্যাজ্য। শুধু দুষ্ট বুদ্ধির জোরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির অনেক নিয়ম আমরা লঙ্ঘন করতে শিখেছি। তবু সুযোগ পেলেই প্রকৃতি ছোবল মারতে ছাড়ে না।

খোঁড়া করে দিয়ে তনুশ্রী মিত্রকে প্রকৃতিই মেরেছে। আগেকার দিন হলে সে নাতি-নাতনি নিয়ে ব্যাপৃত থাকত। নিজেকে উপযোগী করে রাখতে পারত। কিংবা ঢুকে পড়ত ঠাকুরঘরে। কোনও ধর্মীয় আশ্রয়ে। কিন্তু সে আধুনিক কালের নারী—ও-সবে তার আস্থা নেই। অতএব কবিতা লিখছে।

দেখতে দেখতে ব্যালকনি থেকে রোদ চলে যায়। সূর্য ওপরে উঠেছে। আমি উসখুস করছি দেখে তনুশ্রী তার পাশে-রাখা একটি খাতা আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

আপনি মানুষের মন নিয়ে কাজ করেন।—তনুশ্রী খুব মিষ্টি করে হেসে বলে, পড়ে দেখুন। মানুষ তো কত রকম সমাজসেবাও করে। ধরুন, এটা সেই রকম একটা। আপনার কেমন লাগল, একটা কাগজে

লিখে জানাবেন দয়া করে। কোনও তাড়া নেই। যতদিন খুশি, খাতাটা আপনার কাছে রাখুন, আমি কিছু মনে করব না।

সেদিন খুব নিরাশ হয়ে চলে এসেছিলাম। প্রেমপত্রের এই পরিণতি! এতক্ষণ বসে রইলাম, তেমন একটা গল্পেরও খোঁজ পেলাম না। তনুশ্রী মিত্র ওই বয়েসের আর সব মহিলারই মতো অসহায়। কেবল খোঁড়া হওয়ার দরুন ওর মনোবেদনা একটু বেশি তীব্র। সব মানুষই যে আসলে একলা, সম্পর্কের বন্ধনে এ-ওর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, এই করুণ অভিজ্ঞতা কার না হয়।

বাড়িতে ফিরে এসে খাতাখানা ফেলে রাখলাম টেবিলের পাশে। হাতে অনেক কাজ। ওই হাবিজাবি পড়ার সময় নেই, প্রবৃত্তিও নেই। এইভাবে মাসখানেক পার হয়ে গেছে।

একদিন কী মনে হল, খাতাটা টেনে নিলাম। হয়তো ভেবেছিলাম, শুধু কবিতা নামের রাবিশ না, একটা চিরকুট গোছের কিছু থাকতেও পারে। যা থেকে গল্পের ক্লু পাওয়া যাবে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এইভাবে—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, করে—কত গল্প পেয়েছেন। তাঁর সেইসব বিখ্যাত গল্প, যেমন, 'চা' বা 'শাল' বা 'এক-পো দুধ', তাতে ঘটনা তো কিছু নেই। আছে লেখকেব পর্যবেক্ষণ। নিহিত সত্যের উদ্‌ঘাটন।

না, তা-ও পাওয়া গেল না। আমার কপালটাই খারাপ। পাতার-পর-পাতা আবেগের উচ্ছ্বাস আর বিলাপ। তনুশ্রীর হাতের লেখা ভাল। গোটা গোটা। পড়তে অসুবিধে হয় না। আর লেখায় মেয়েলি ছোঁয়াটা আছে। আবেগের প্রকাশ নয়, আবেগ জাগানো যে কবিতার মূল কথা, ব্যক্তিগত অনুভবকে বিশ্বজনীন করে তোলা—এসব ও জানে না।

তবু কতকগুলো লাইন পড়ে মজা লাগল। যেমন, 'কিছুই রাখিনি, সব দিয়েছি তোমাকে।' 'পুরুষ কেবল সুখ চায়,' 'ভালবাসা তোমার ছলনা আমি বুঝি,' 'যতদিন বুকে দুধ ছিল, ততদিন তুই ছিলি কোলে,' 'অকৃতজ্ঞ, ভুলে গেছ সেইসব রাত্রির সুষমা।' এই রকম আর কী।

ততদিনে রাগ চলে গেছে। খাতার কয়েক পাতা পড়ে যা বুঝলাম, তাই গুছিয়ে একটা কাগজে লিখলাম। কাগজটা খাতার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিলাম। আমার কাজ শেষ। বাস্তবিক সমাজসেবা গোছের একটা কাজই করা হল। এবার ওটা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে একদিন।

তো গেলাম ওই সকাল এগারোটার সময়। বলা হয়নি, আগের দিন ভদ্রমহিলা ঠান্ডা সন্দেশ আর ঠান্ডা কেক খাইয়েছিলেন। ভাবলাম, এবার আর কিছু খাব না। খাতাটা ধরিয়ে দিয়ে চলে আসব। বলব, আমার মন্তব্য ভেতরে লেখা আছে। পড়ে ওর মাথা ঘুরে যাবে। ওতে বলেছি যে, ছাইপাঁশ না লিখে রোজ একটু করে মহাভারত পড়ুন।

এবার বেল দিতেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলল। ভেতর থেকে ভেসে এল গানের সুর। একটি রংচঙে গেঞ্জি-পরা ছেলে জিজ্ঞেস করল, কাকে চান?

তনুশ্রী মিত্র।

তনুশ্রী মিত্র? ও।

বলেই কী যেন ভাবল ছেলেটা। তারপর বলল, কী দরকার, আমাকে বলুন।

আমার ওঁর সঙ্গেই দরকার। একটু বাইরে আসতে বলবেন?

ছেলেটা ভেতরে চলে গেল। খোলা দরোজার মুখে আমি দাঁড়িয়ে আছি, শুনতে পাচ্ছি, ওব গলা, 'মা, তোমাকেই চায়।'

আমাকেই চায়। এ আবার কী কথা। তুমি যাও, দেখো তো।

বলতে বলতে দেখি, একজন লুঙ্গি আর গেঞ্জি-পরা লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ওর স্বামী, মিস্টার মিত্রই হবে।

আমি আবার বলি। তনুশ্রী মিত্র।

লোকটা আমার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু খারাপ ব্যবহার করল না। শুধু ওইখানে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে চেয়ে হাঁক দিল, একবার এদিকে এসো না তনু।

এবার দেখলাম, আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে, দেয়াল, সোফা, চেয়ারের পিঠ ধরে ধরে তনুশ্রীই বেরিয়ে আসছে। পুরোটা এল না, খানিকটা। দশ ফুট মতো দূরে এসে দাঁড়িয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ বলে, কী চাই? ও। না, না, এখন হবে না।

আমি বললাম খাতাটা—

আমায় যেন চিনতে পারেনি, তেমন মুখ করে বলে, খাতাফাতা দিয়ে কী হবে? বলছি তো, হবে না। যাও।

ওর স্বামী দরোজা বন্ধ করে দিচ্ছে আমার মুখের ওপর। তখন শুনলাম, তনুশ্রী বলছে, যত সব চাঁদাওলার উপদ্রব।

আমি বুঝতে পারি না, ও এমন ব্যবহার করল কেন আমার সঙ্গে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র হলে ওর তরফে উপযুক্ত কৈফিয়ত দিতেন হয়তো।

১৯৯৫

❋ সুভদ্রাহরণ পালা

হঠাৎ আকাশের ব্রহ্মতালুর উপর জমে উঠল খানিকটা চাপ চাপ মেঘ। খোলা ছাতার মতো গোল হয়ে মেঘটা দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি। বলা নেই কওয়া নেই, চাবদিকের আকাশ বেশ ফরসা, সাদা মেঘেব আড়াল থেকে বিকেল চারটের বোদ ঝিলিক দিচ্ছে, ঝকমক করছে সামনের বাস্তা ও রাস্তাপারের গাছপালা—এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

ছ'তলার বারান্দা থেকে দেবরাজ আকাশ দেখছিলেন। এখন, এই অগস্ট মাসে, বাংলায় যাকে বলে শরৎকাল, আকাশের নীল অর্ধবৃত্তাকার প্যানোরামা যথার্থ নাটকীয়তা পায়। দূরে-কাছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। কোনওটা সচল, কোনওটা স্থির-আকৃতি পাহাড় কিংবা জাহাজের মতো। বিভোর হয়ে দেখলে ভ্রম হয় বুঝি কোনও ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হচ্ছে ওখানে। প্রতিদিনই হয়। অস্তসূর্যের আভায় নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়রত ছোট মেঘেরা ক্রমশ চরম পরিণতিব দিকে এগোয়। সন্ধে হতে-না-হতে যবনিকাপতন। দেবরাজ দেখতে পান। নীচে ছোট ছোট গাড়ির মধ্যে বসে অথবা পায়ে হেঁটে ছোট ছোট মানুষেরা কাজকর্ম করছে। আকাশের একান্ত স্টেজে মেঘেদেব নিয়ে নাটকে দেখার অবকাশ তাদেব নেই।

পিছনে কাপ-চামচের ঠুনঠুন ঠুনঠুন শব্দে দেবরাজের চটক ভাঙল।

কোলের ওপর থেকে ইংরেজি কাগজখানা তুলে নিয়ে আবার জাগতিক সংবাদে মন দিলেন। আর তখনই ছোট বিজ্ঞাপনটা তাঁর চোখে পড়ল।

এই পরিবারের ধরনটা একটু বিচিত্র।

পাঁচজন সদস্য পাঁচজনই প্রাপ্তবয়স্ক। পাঁচজনই উচ্চশিক্ষিত বলতে যা বোঝায়, তাই। পাঁচজনই স্বাধীনচেতা। দেবরাজ অবসর নিয়েছেন কয়েকমাস আগে, গত ডিসেম্বরে। না হলে, সকলেই উপার্জনক্ষম ও কর্মরত। এ-পরিবাবে বহুদিন যাবৎ কোনও শিশু নেই।

স্ত্রী মাধবী মহিলা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। পুত্র সুগত ও পুত্রবধূ তিতাস উভয়েই অন্য একটি কলেজে অধ্যাপনা করে। দেবরাজ ছিলেন ব্যাঙ্কার। বিদেশি ব্যাঙ্কের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁর কর্মজীবন কেটেছে। উঁচু দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন সুনামের সঙ্গে। সুযোগ ছিল কিন্তু মেয়েকে তিনি অঙ্কের নীরস জগতে ঢুকতে না দিয়ে এক বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন। রূপার নানা রকম খেয়াল ও ছেলেমানুষি—যাকে ওরা বলে মৌলিক প্রতিভা—ওই বিজ্ঞাপনের কাজে চরিতার্থ হয়।

তিনটি শোবার ঘরে বিভক্ত এই পরিবার। যে-যার নিজস্ব নিয়মে চলে। কিন্তু সংসার তো হোটেল নয়, একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। শিশু না থাকলেও সংসারকে পরিচালনা করতে হয়। এ ব্যাপারে কোনওদিনই তেমন আগ্রহ ছিল না মাধবীর। যতদিন শাশুড়ি বেঁচে ছিলেন, চাবির গোছা ও রান্নাঘর ছিল

তাঁর জিম্মায়। যতদিন ছেলেমেয়ে দুটি স্বাবলম্বী হয়নি, তিনিই ওদের পরিচর্যা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর এসেছে 'রামের মা' নাম্নী এক বিধবা মৃতবৎসা দাসীমাসি। মা এবং দাসীমাসির আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে গড়া দেবরাজের এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অতিসচ্ছল সংসার।

ছোট বিজ্ঞাপনটি ব্লেড দিয়ে কেটে রবিবারের জন্য রেখে দিলেন দেবরাজ। সেদিন সবাই একত্র মিলিত হবে বসার ঘরে। কাজে বেরোবার তাড়া থাকবে না। যে-যার নিজস্ব সুচিন্তিত অভিমত জানাবার সময় পাবে। একবার ভাবলেন, রূপার ব্যাপারে এই প্রস্তাব, আগেভাগে মাধবীর সঙ্গে আলোচনা করে নিলে কেমন হয়। তারপর সে সংকল্প ত্যাগ করলেন। বয়স বাড়ার জন্যেই হোক বা কলেজে পদোন্নতি হবার ফলেই হোক, আজকাল মাধবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আগেকার মতো অন্তরঙ্গ নয়, বরং আনুষ্ঠানিক। নেহাত নিরুপায় বলে একঘরে বসবাস, না হলে দু'জনের পৃথক শয়নকক্ষ থাকাই বাঞ্ছনীয়। উভয়ের পক্ষে স্বস্তিকর হত।

মাধবীর কাছে লোকজন আসে নানা সমস্যা নিয়ে। বাইরের ঘরে বসে আলোচনা হয়। দেবরাজ উঠে যান তখন। টেলিফোন আসে ঘন ঘন, কখনও উত্তেজিত কখনও স্তিমিত কণ্ঠে কথাবার্তা হয়, দেবরাজ ধারে কাছে থাকেন না। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বা কোনও দরকারি চিঠির খসড়া করতে হলে মাধবী একসময় তাঁর নিকটতম মানুষটির পরামর্শ চাইতেন। আজকাল আর দরকার হয় না। চেহারা ভারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাধবীর ব্যক্তিত্ব বেড়েছে। ভাইস প্রিন্সিপালের কাজের সঙ্গে মানায় না বলে তিনি ভুরু ট্রিম করা, চুলে কলপ দেওয়া ও ছাপা শাড়ি পরা ছেড়ে দিয়েছেন একে একে। গম্ভীর রাশভারী মহিলা। দেবরাজ একটু সমীহ করেন বললে তাঁকে ছোট করা হবে না।

সুগত ও তিতাস—অধ্যাপনা করে ওরাও, কিন্তু কেউ মাধবীর মতো গম্ভীর প্রকৃতির নয়। বরং একটু অধিক চপল। শৌখিন, পরিহাসপ্রিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে, গবেষণা করার সময়ে, বছরের-পর-বছর ধরে ওদের কোর্টশিপ চলেছিল, সে-কোর্টশিপ যেন আজও চলছে। এখনও কলেজের পর রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে ওরা। ময়দানে খেলা দেখে, মিটিং শোনে। মিছিলে যায় কথায় কথায়। কিন্তু কোনও দলে ভেড়ে না। সবটাই খেলা-খেলা। সুগতর নিজের ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁকানো চুল, জংলা জামা বা প্যান্টের ওপর একটা রঙিন গেঞ্জি। আর ওর আশকারা পেয়ে বউটাও হয়েছে তেমনি—এলোকেশী, চুলে তেল দেয় না। কপালে সিঁদুর আছে কি নেই, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে হয়। দু'হাত খালি, একটা গয়না পরবে না, না লোহা, না শাঁখা, স্লিভলেস ব্লাউসের ওপর একখানা শাড়ি কোনও রকমে জড়িয়ে নিলেই হল। ফিগার সুন্দর বলে মানিয়ে যায়। নইলে লোকে শাঁকচুন্নি বলত। দেবরাজের মতে, অধ্যাপক হবে প্রাজ্ঞ কিন্তু প্রসন্ন, বিদ্যার দ্যুতি থাকবে চোখে-মুখে। মাধবীর মতো অতটা না হলেও গাম্ভীর্য থাকবে। একটু উন্নাসিকতাও। না হলে ছাত্র-ছাত্রী মানবে কেন। কে জানে হয়তো আজকাল এইসবই চলছে। একাগ্রতা ও নিষ্ঠার যে ছবি তাঁর চোখের সামনে ভাসে, এখনকার ছেলেমেয়েদের রুচির সঙ্গে তা মেলে না। খুব স্বাভাবিক।

প্রাতঃভ্রমণ করতে গিয়ে দেবরাজের কত রকম অভিজ্ঞতা হয়। দেখেন, মোটা মানুষ যারা, তারাই সবচেয়ে দ্রুত হাঁটে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হাঁটে দিনের-পর-দিন। এবং তার পরেও তেমনই মোটা থেকে যায়। টসকায় না একরত্তি। সংসারের নিন্দায় মুখর মানুষেরা নিন্দা করতে করতে ক্রমশ বুড়ো হয়ে যায়, সংসারের অনুপযুক্ত হয়ে যায়। দেবরাজ জেনে গেছেন সেনিলিটির প্রধান লক্ষণ কী কী: এক, 'ছিল আমাদের সময় খাঁটি মানুষ, খাঁটি ঘি, খাঁটি দুধ' জাতীয় ঘোষণা। দুই, 'এখনকার ছেলেমেয়েরা গোল্লায় গেছে, ওদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার' জাতীয় মনোভাব। আর তিন, 'মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষ বোসের মতো নেতা না জন্মালে এদেশের কিচ্ছু হবে না' জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বাস। এই ধরনের কথা যারা অনর্গল বলে, তাদের মন মরে গেছে। যৌবন ফিরিয়ে দিলেও তারা আর নতুন করে বাঁচতে পারবে না। গোল্লায় যাক আর যেখানেই যাক, এই প্রজন্মের হাতে জগতের ঐশ্বর্য ও ঐশ্বর্যরক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েই আমাদের যেতে হবে। ইচ্ছে না করলেও যেতে হবে। তার চেয়ে যতদিন বাঁচো, জীবনটা উপভোগ করো না কেন, শরীরে যতখানি সয়।

রবিবারে অনেকে হাঁটতে আসে না। আর রবিবারেই দেবরাজ দেখলেন, পার্কের কোণের প্রকাণ্ড গাছটায় রাশি রাশি কদমফুল ফুটে আছে। মিষ্টি গন্ধ পেয়েই ওপরে তাকিয়েছিলেন। কী খেয়াল হল, গাছে উঠে গেলেন। হাঁটু একটু কাঁপল, কিন্তু পেড়ে আনতে পারলেন একটা থোকা। আঃ কী সুগন্ধ। সাদা

পাপড়িগুলোর নীচে কী সুন্দর সূর্যোদয়ের রং।

বাড়িতে ঢুকতে দারোয়ান, খবরের কাগজের হকার, দুধের ভেন্ডার আর ঠিকে ঝিয়ের দল দেবরাজকে দেখে মুচকে হাসল। উনি গ্রাহ্য করলেন না। গায়ে টি-শার্ট, পরনে শর্টস, পায়ে কেডস—গট গট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন।

বসার ঘরে এই সময়ে যথারীতি খবরের কাগজ নিয়ে কাড়াকাড়ি। দুটো ইংরেজি কাগজ, একটা বাংলা—এই তিনটে কাগজেও পাঁচজনের কুলোয় না। নানাভাগে বিভক্ত হয়ে হাতে হাতে ঘুরছে। চায়ের প্রথম পাট রামের মা সেরে দিয়েছে। দেবরাজ ফিরলে দ্বিতীয় পাট তিতাস কিংবা রূপার হাতে।

রূপাই প্রথম চমকাল: "বাবার হাতে কী, দেখেছ?"

"ওমা এ যে কদমফুল!" তিতাস কাগজ ছেড়ে এগিয়ে যায়। হাত থেকে ফুলের থোকা নিয়ে একটা শূন্য ফুলদানির মধ্যে রাখার চেষ্টা করে। ফুল আর চুল একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে বেচারা অস্থির।

"কী ভারী! এ যে থাকছে না! ফুলদানিসুদ্ধ পড়ে যাচ্ছে!"

"বড় পেতলের ভাসে রাখো, থাকবে।" মাধবী দূর থেকে বললেন, "কোথায় পেলে?"

জুতো খুলতে খুলতে দেবরাজ বললেন, "কালীবাড়ির সামনে খুব ফুটেছে।"

"লোক দিয়ে পাড়ালে?"

"নাঃ, নিজেই উঠে পেড়ে আনলাম।"

রূপা চা ছাঁকছিল। আঁতকে উঠল শুনে। "বাবা, তুমি গাছে উঠেছিলে ফুল পাড়তে। তোমাব কি ভীমরতি হয়েছে?"

মাধবী খবরের কাগজ নামিয়ে বাইফোকালের ওপর থেকে স্বামীকে দেখছিলেন। ঠান্ডা গলায় বললেন, "একদিন পা ভাঙবে। বুড়ো হাড় জোড়া লাগবে না।"

সুগতর দৃষ্টি ও মনোযোগ খেলার পাতায় নিবদ্ধ। লস এঞ্জেলেস ওলিম্পিকে ভারত হকিদল সোনা পাবে কি পাবে না, তাই নিয়ে ওর দুশ্চিন্তাব অবধি নেই। বহুকাল পর মস্কো ওলিম্পিকে পুরনো খেতাব পুনরুদ্ধার করা গিয়েছিল, সে-খেতাব থাকলে হয়।

মুখ নিচু করেই ও বলে ওঠে, "তোমরা বাবাকে একটু নিজের মতো কবে থাকতে দাও তো! সবতাতে টিকটিক কোরো না।"

দেবরাজ কোনও কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে চা খেলেন। উঠে এগিয়ে এলেন ছেলেব কাছে। বললেন, "তোর একটা কড়া ব্র্যান্ড দেখি।"

তারপর সিগারেট হস্তগত করে বাথরুমের দিকে অগ্রসর হলেন। খবরেব কাগজ তখনও হাতে হাতে ঘুরছে এ ঘরে।

সবাই একবার মুখ তুলে তাকায়। ভাসে-রাখা কদম ফুলগুলি দেখে। মাথাগুলো ঝুঁকে পড়েছে। তবু ঘরময় একটা অদ্ভুত গন্ধ।

একটু বেলায় কথাটা পাড়লেন দেবরাজ। ততক্ষণে সকলে কাগজ ফেলে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

"তোমরা সকলেই আছ। আমি একটা ছোট বিজ্ঞাপন পড়ে শোনাতে চাই।"

উত্তর আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত, দেশে ফিরতে ইচ্ছুক, বাঙালি ডিভোর্সি পাত্র (৪২) শিক্ষিত পরিবারে বিবাহ করতে চায়। পাত্রী সুশ্রী, সপ্রতিভ বয়স অনধিক ৩৪ বাঞ্ছনীয়।"

ছোট্ট ইস্পাতের উখো দিয়ে ধীরে ধীরে হাতের নখ মসৃণ করছিল তিতাস, সুগতর বউ। সবুজ চুড়ি-পরা বাঁ হাতখানা তুলে ও বলে উঠল, "রিজেক্ট।"

"রিজেক্ট কেন?" মাধবী প্রশ্ন করে।

"ডিভোর্সি। রূপা ডিভোর্সিকে বিয়ে করতে যাবে কোন্ দুঃখে?"

আর, দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল সুগত। ব্রাশ দিয়ে স্টিরিয়ো যন্ত্রের ধুলো ঝাড়তে ব্যস্ত। মুখ না ফিরিয়েই সে বলে, "বয়স্ক ব্যাচেলার হলে কি পাত্র হিসেবে বেশি উপযুক্ত হত? তখন বলতে, বিয়াল্লিশ বছর বয়স অবধি যার বিয়ে হয়নি, তার কোনও গোলমাল নিশ্চয় আছে।"

মাধবী বললেন, "এত রিজিড হওয়ার মানে হয় না। রূপার কী মত?"

বসার ঘরের একপাশে ডাইনিং টেবিল। দাঁড়িয়ে স্যালাড কাটছিল রূপা। শশা, টোম্যাটো, পিঁয়াজ, লেবু, কাঁচা লঙ্কা গোটা গোটা একখানা বড় প্লেটে রাখা। কুচি কুচি করে আর একটা প্লেটে তুলছে। বাহু

তুলে মাঝে মাঝে চোখ মুছছে হাউসকোটের হাতা দিয়ে। সম্ভবত পিঁয়াজের ঝাঁজ। ছুরি ও কাঠের বন্ধুত্বপূর্ণ শব্দ—খুটখুট, খুটখুট—ওখান থেকে উঠে আর সব শব্দকে অবহেলা করছে।

রূপা উত্তর দেয় না। বয়স্ক ব্যাচেলার শুনে ওর আপিসের এক প্রৌঢ় মক্কেলের কথা ওর মনে পড়ল, যে প্রায়ই ওকে ডিনারে নেমন্তন্ন করতে চায়।

দেবরাজ ডাইনিং টেবিলের উলটো দিকে বসে ছিলেন। হাত বাড়িয়ে টুকবো কাগজটা রূপার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "নিজে পড়ে দেখো। আমার মতে, একটা চিঠি লিখে বিশদ বৃত্তান্ত জানতে চাওয়া যায়।"

"আমায় তোমরা তাড়িয়ে দিতে চাও।" ঠান্ডা গলায় বলল রূপা। তারপর আবার স্যালাড কাটতে লেগে গেল।

কথা শুনে সকলে ওর দিকে তাকায়। না, মুখে কোনও বিকার নেই। সাদা পাথর দেওয়া নাকছাবির নীচে একটু কৌতুক লেগেও থাকতে পারে।

রূপার বয়স চৌত্রিশ।

ওর শরীরের স্বাস্থ্য ও শ্রী সামান্য ক্লান্ত। কিন্তু এখনও অম্লান। সুন্দরী নয় ও, রং একটু কালোই। তবে চোখদুটি বড় বড়, ঠোঁটদুটি বাঁকানো, কপালের আধখানা চুলে ঢাকা, যদিও উঠে উঠে চুল এখন আব আগের মতো ঘন নেই। সেই কারণে চুল কেটে ফেলেছে অনেকটা, এখন ইউ-কাট চুলে ওর লম্বাটে দক্ষিণভারতীয় মুখখানা বেশ মানিয়ে যায়। আপিসে, বাড়িতে, সর্বত্র। ঝামেলাও কম।

"চেষ্টা তো অনেক করলে, হল কিছু? কেন বার বার আমায় অপমানের মধ্যে ফেলো?" রূপা বলল। ওব চোখ পিঁয়াজের রসে ভেজা, লাল।

"অপমান কেন বলছিস রূপা?" মাধবী এবারে স্পষ্টভাবে হাসতে চাইলেন। "দু'পক্ষ মুখোমুখি না হলে তো বিয়ে হয় না। তা তুমি যখন নিজে থেকে কোনও প্রস্তাব আনতে পারছ না, অগত্যা—"

দেবরাজ এবার সমর্থন পেয়ে বললেন, "বয়স কারুর চুপচাপ বসে থাকে? একেবারে হাল ছেড়ে দেবার আগে—দেখাই যাক, একটা চিঠি লিখলেই তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না।"

আজ নতুন না। এই রকম পরিস্থিতি আগেও হয়েছে কয়েকবার। মেয়ে দেখা। আলাপসালাপ। কিন্তু রূপার বিয়েটা হয়নি শেষপর্যন্ত। এই রকম টেনশনের মুহূর্তে ওর তুহিনকে মনে পড়ে। নরম ওর দাড়িওলা মুখটা রোজ বিকেলে স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। কলেজ-পালানো স্বভাব ছেলেটার। হাতে করে নিয়ে আসত কলেজ ক্যান্টিন থেকে কাটলেট, ফিশফ্রাই। পার্কের ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে ওরা কথা বলতে বলতে ওইসব খাবার খেত। কিছু না থাকলে বাদাম, কাঁচা লঙ্কা দেওয়া নুন। এখনও মনে পড়ে। এক-একটা বাদামের এক-এক রকম স্বাদ, কোনওটা অপুষ্ট, কোনওটা কম ভাজা, কোনওটা একটু পোড়া। ওই স্বাদ আবিষ্কারের কী আনন্দ।

একসময় ওরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যায়। তুহিন বাড়িতেও ঠাকুমার হাতে চা-জলখাবার খেয়েছে। এসেছে। সে-সব অনেক বছর আগের কথা।

রূপার তখন ষোলো-সতেরো বছর বয়স। তুহিন এম. এ. পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়া ছেড়ে দিল। কী রকম অস্বাভাবিক হয়ে গেল ওর ব্যবহার। ওর চালচলন।

ও বলত, "রূপা, তুমি সুন্দর না, আমাদের দেশও সুন্দর না। তোমাকে ছুঁয়ে কিন্তু আমি আমার দেশের মাটিকে ছুঁতে পারি।" ও বলত, "আমার ভালবাসা তোমাকে দিয়ে শুরু, আমাদের অনেক কাজ করার দায়িত্ব আছে। ভিক্ষেয় পাওয়া আমাদের কুড়ি বছরের পুরনো স্বাধীনতা একেবারে ভুয়ো। বিপ্লব ছাড়া স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, বলো?" ওর রোগা চেহারার তুলনায় কণ্ঠস্বর গম্ভীর, ভারী। আত্মবিশ্বাসী।

তুহিন বলতে বলতে কেঁদে ফেলত। মাসের-পর-মাস গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত বাউন্ডুলের মতো। ফিরে এসে বলত, "কী গরিব হতভাগা আমাদের দেশের মানুষ। এতটুকু জমি, তা-ও নিজের নয়। লাঙল, তা-ও ধার করা। ফসল ফললে বেশিরভাগ চলে যায় হাতের বাইরে। বছরে আটমাস জনমজুর খাটে। অথচ ভীষণ ভিতু। প্রতিবাদ করতে ভয় পায়। একজোট হতে ভয় পায়। তাই মার খেয়ে মরছে।"

তুহিন বলত, "স্বাধীন সরকার জমিদারি উচ্ছেদ করেছে। তাতে কী হল? দুশো ছত্রিশ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল জমিদারকে। আরও সাড়ে তিনশো কোটি টাকা দিতে হবে। চাষির কপালে ঢু ঢু। তারাই কিন্তু ফসল ফলায়, ভাবতে পারো রূপা? এ ভণ্ডামি নয়?" কিছু একটা করার জন্য ও অধীর কিন্তু

কী করবে, রূপা বুঝত না। বলা নেই, কওয়া নেই, এই তুহিন একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। রূপাদের পুরনো পাড়ায় তুহিনের বন্ধু, মলয় নামে একটি ছেলে, পুলিশের গুলি খেয়ে মরে। তার নামে শহিদ বেদি হয়েছে। তুহিনকে ওরা কোথায় মেরে পুঁতে দিয়েছে, কেউ জানে না।

আজ এতদিন পরে তুহিনকে মনে পড়ে যখন, রূপার আর আগের মতো রাগ হয় না। দুঃখ হয় না। দিনকাল অনেক বদলে গেছে এখন। অবুঝ বয়সও এখন নেই। মেয়েরা নাকি সব রকম অবস্থায় নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে। এ তাদের জন্মগত প্রবণতা। রূপা ব্যতিক্রম নয়।

রূপা বলল, "আমি তো তোমাদের গলগ্রহ হয়ে নেই মা। আমি তো উপার্জন করি। তবু তোমরা যদি মনে করো, আমার ভালর জন্যে, যা ভাল বোঝো করো।"

তিতাস জিজ্ঞেস করে, "আমেরিকার ঠিকানা দিয়েছে বিজ্ঞাপনে?"

"না, বক্স নম্বর।"

সুগত বলল, "বক্স নম্বরে চিঠির উত্তর আসে না।"

ভুল বলেছিল সুগত।

দশ দিনের মাথায় টেলিফোন বাজল। "দেবরাজ মিত্র আছেন?"

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। দেবরাজ যথারীতি বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আকাশ মেঘলা। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে।

"কথা বলছি।"

"আপনার চিঠি পেয়েছি। আমি, মিসেস মজুমদার, পাত্রের দিদি কথা বলছি। একদিন আপনাদেব সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে। কবে গেলে আপনাদের সুবিধে, যদি দয়া করে বলেন—"

ফাঁপরে পড়লেন দেবরাজ। পাত্রের সম্বন্ধে কিছু জানার আগেই মেয়ে দেখানো—না সেটা ঠিক হবে না। রূপা রাজি হবে না। মাধবীও আপত্তি করবে।

বললেন, "তার আগে কিছু খবরাখবর জানতে পারলে ভাল হত।"

"অবশ্যই। কী জানতে চান, বলুন।"

আবার ফাঁপরে পড়লেন দেবরাজ। কত কিছুই তো জানার আছে। ওদের সঙ্গে পবামর্শ করতে পারলে সুবিধে হত। অথচ, টেলিফোনে—

বললেন, "পাত্র ডিভোর্সি। কতদিন আগে ডিভোর্স হয়েছে? কেন হল? কোনও ইস্যু আছে কিনা—এইসব আর কী। আমি মেয়ের বাপ, বুঝতেই তো পারছেন।"

পাত্রের দিদি বলল, "আমার ভাই পনেরো-ষোলো বছর আমেরিকায় আছে। একটি আমেবিকান মেয়েকে বিয়ে করেছিল বছর পাঁচেক আগে। বিয়ে টেকেনি। না, কোনও বাচ্চাকাচ্চা নেই। সুব্রতর স্বভাবচরিত্র অত্যন্ত ভাল, আমি ওর দিদি, জোর দিয়ে এ-কথা বলতে পারি।"

"পাত্রের সঙ্গে আলাপ করা যাবে কবে?"

"এক মাসের ছুটি নিয়ে ও আসছে আগামী কাল। আমি ইতিমধ্যে মেয়ে-দেখার ব্যবস্থা করে রাখছি। আমার ওপরে এই দায়িত্ব দিয়ে ও নিশ্চিন্ত। যেখানে কথা পাকা হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে। তারপর বউ নিয়ে ও আমেরিকায় চলে যাবে। অবশ্য পাসপোর্ট করতে দেরি হলে, বউ পরে যাবে। তাড়াহুড়ো করা ছাড়া উপায় নেই। আমিও এখানে থাকি না। কলকাতার বাইরে থাকি বুঝলেন কিনা। ওর কাজের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি।"

মহিলার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল দেবরাজের। তা ছাড়া তিনি হলেন মেয়ের বাপ। বিনত নম্র থাকা তাঁরই কর্তব্য। টেলিফোনে আর কথা বাড়ালেন না।

বললেন, "তা হলে আগামী রবিবারেই আসুন। ছুটির দিন, সবাই বাড়িতে থাকবে। কেমন?"

মহিলা বলল, "বিকেল চারটে নাগাদ। অসুবিধা হবে না তো?"

"ঠিক আছে। আমরা অপেক্ষা করব মিসেস মজুমদার। অন্যান্য কথাবার্তা সাক্ষাতে হবে।"

মহিলা বলল, "মেয়ে পছন্দ হলে এবং আপনাদের পাত্র পছন্দ হলে, কথাবার্তা আর খুব বেশি হবে বলে মনে হয় না মিস্টার মিত্র। আমাদের কোনও দাবিদাওয়া নেই।"

সব খবর শুনে একটু অবাক হলেন মাধবী। আবার উৎসাহিতও বোধ করলেন। এ রকম বিয়ে তো আজকাল কত হচ্ছে। দীর্ঘকালের নির্বিকার গাম্ভীর্য ত্যাগ করে যেন তৎপর হয়ে উঠলেন এই

কয়েকদিন। সম্বন্ধটা লেগেও যেতে পারে, তাঁর মনে হল। রূপাকে ঠিকমতো ব্রিফ করা দরকার তার আগে। শনিবার আপিস যেতে না দিয়ে ঘর বন্ধ করে ঝাড়া দু'ঘন্টা ব্রিফ করলেন রূপাকে। সেদিন কে কোথায় বসবে তা পর্যন্ত আগে থেকে স্থির করে দিলেন। রূপা, হাজার হোক পাত্রী। যতই সপ্রতিভ হোক, একটু ব্রীড়া যাকে বলে, তা মেনটেইন করবে। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসার ঘরে ওর আবির্ভাব হবে পরে, ঠিক সময়ে। তিতাস তফাতে বসবে।

তা হলে পাত্রের নাম সুব্রত। সুব্রতকে দেখে প্রথমটা একটু বয়স্ক মনে হয়েছে দেবরাজের। তারপর মনে পড়ে গেছে তাঁর মেয়েও নেহাত তরুণী নয়। সর্বকনিষ্ঠার মতো ঘুরে বেড়ালেও বউমার চেয়েও চার বছরের বড়।

প্রথম আলাপের পর মাধবী দেখলেন, ছেলেটি সুন্দর কথা বলে। এতদিন বিদেশে আছে কে বলবে। অমায়িক, ভদ্র, নিরংহংকার। কথায় কথায় জানা গেল, ও কলকাতার ছেলে, অল্প বয়সে দিল্লি চলে যায়। সেখানে কোনও আত্মীয়ের আশ্রয়ে কিছুকাল কাটাবার পরে আমেরিকা পাড়ি দেয়। নিজের চেষ্টায় প্রভূত কষ্ট স্বীকার করে স্বাবলম্বী হতে পেরেছে।

সুগত প্রকারান্তরে জেনে নিল ওর কাজকর্মের খবর, ওর উপার্জন, ওর সঞ্চয়, ওর বন্ধুবান্ধবের পবিচয়। তিতাস প্রকারান্তরে জেনে নিল ওর বিচ্ছিন্ন বিবাহেব সংবাদ। সুব্রত কিছুই গোপন করতে চায় না। মৃদু মৃদু হাসে আব স্পষ্টভাবে পাত্রীপক্ষের কৌতূহল মিটিয়ে দেয়। ওর কথায় কোনও আড়ষ্টতা নেই। সুন্দর স্বাস্থ্য, একটু রোগা বোধহয়, তবে ওসব দেশে লোকে কিছুতেই মোটা হতে চায় না—এমন কথা দেবরাজ শুনেছেন। কণ্ঠস্বরটি গম্ভীর কিন্তু গর্বিত বা উদ্ধত নয়।

কথায় কথায় রাজনীতির কথা এসে পডল যথারীতি।

দেবরাজ বললেন, "নেতৃত্বহীন এই দেশের হাল কী হবে কে জানে। সর্বত্র শঠতা, ভণ্ডামি।"

সুব্রত অকপটে ঘোষণা করে, "ভিক্ষেয় পাওয়া এদেশেব স্বাধীনতা একেবারে ভুয়ো, মেকি। বিপ্লব ছাড়া এ-দেশের মানুষেব মুক্তি নেই। অথচ আমরা বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত নই। আমরা কোনও রকমে জোডাতালি দিয়ে বেঁচে থাকতে পছন্দ করি, এ-দেশে।"

দেবরাজ বললেন, "সব শুভকাজের নিজস্ব লগ্ন থাকে।"

"আমিও বিশ্বাস করি। আমিও অপেক্ষা করতে চাই।" ইতিমধ্যে রূপা এসে বসেছে। মুখ নিচু করে চা ছাঁকছিল। সুব্রতর কথায় চমকাল। মুখখানা তুলে একবার তাকাল সুব্রতর দিকে। ওর পরিচ্ছন্ন সাজগোজ পাত্র আগেই লক্ষ করেছে।

"দেশের মানুষ ঠিকমতো প্রস্তুত থাকলে স্বাধীন ভারতেব চেহারা এতদিনে অন্য রকম হত।"

দেবরাজ ক্ষুব্ধ সুরে বললেন, "সুভাষবাবুকে কোহিমা থেকে ফিরে যেতে হত না। তুমি কী বলো?"

সুব্রত প্রতিবাদ করল। বলল, "আমি মনে করি, গোলমাল থাকে নেতৃত্বে। দেশেব মানুষ সবাই কোনওদিন একজোট হয় না। নেতৃত্বের ভুলে অকারণ মরে। খুন হয়। দেশত্যাগী হয়।"

চা-জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল যথাযথ। কনে-দেখায় যেমন থাকে। কিন্তু পাত্র বা পাত্রের দিদি কেউই চা ছাড়া কিছু নিল না। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল।

সুব্রত সিগারেট খায় না, লক্ষ করলেন দেবরাজ।

মাধবী মিসেস মজুমদারের সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলছিলেন। এদের আলোচনায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "দেশে ফিরে আসার ইচ্ছে কেন? একবার গেলে কেউ তো ফেরে না।"

সুব্রত হাসে। ফিরে ফিরে সকলের মুখের দিকে তাকায়। দেখে, পাত্রী মাথা তুলে সোজা ওর চোখের দিকে চেয়ে আছে। দক্ষিণ ভারতীয় ছাঁদের মুখ। বড় বড় কালো চোখ। নাকে সাদা পাথরের নাকছাবি। একটু ভারী চিবুক, তবু সুশ্রী, সপ্রতিভ। দেখে, পাত্রীর প্রসাধনযুক্ত পরিণত ঠোঁট দুটোর মাঝখানে সাজানো দাঁতের সারির ইঙ্গিত অবাক ঔজ্জ্বল্যে চিকচিক করছে বিকেলের আলোয়। ওর চোখে গভীর সন্দেহ।

বলে—"আপনাদের মেয়ে যদি আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে রাজি হন, তবে কিছু একটা সাধ্যমতো গড়ে তোলার ইচ্ছে আছে এই বাংলায়। ফেরারি জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আমার।"

এই সময়ে মাধবীর যাবতীয় ব্রিফিং ভুলে গিয়ে পাত্রী হঠাৎ বলে উঠল, "তুহিন। তুহিন না?"

রূপার গলার স্বর কাঁপছে। ওর চোখ-ভরতি জল। কণ্ঠস্বর শুনে প্রথম থেকে ওর সন্দেহ হয়েছে, এ

তুহিন। কিন্তু কিছুতে নিশ্চিত হতে পারছিল না। এবার ধরা পড়েছে। রূপা আবার বলে উঠল, "কী, চুপ করে আছেন কেন? বলুন, আপনি তুহিন না? তুহিন না?"

পাত্র মৃদু মৃদু হাসছে। ওর দু'চোখে দুষ্টুমি।

নৈঃশব্দ্য ভেঙে মিসেস মজুমদার প্রথম কথা বলে।

"তোমার পেটে পেটে এত! এদিকে আমি সারবন্দি কনে দেখার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছি। বিশ্বাস করুন, ঘুণাক্ষরেও আমায় বলেনি—"

"এতদিন পর রূপা আমায় মনে রাখবে, চিনতে পারবে, কী করে জানব? নামটাম বদলে আমি যে অন্য লোক হয়ে গেছি। আমার মধ্যেকার তুহিন তো বেঁচে নেই।"

কান্না চাপতে না পেরে রূপা দ্রুত অন্য ঘরে চলে গেল।

বসার ঘরের একদিকটা খোলা। কোলে বারান্দা। আকস্মিকতায় অভিভূত দেবরাজ সোফা থেকে ছ'তলার বারান্দা ছাড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন।

আকাশের নীল পশ্চাৎপটের ওপর মেঘের পাহাড়। সামনে নানা আকারের মেঘ চলেছে। রথ, ঘোড়া, হাতি, সৈন্যদল—নানা রকম মেঘের ডিজাইন। কোনও পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে নাটক শুরু হয়ে গেছে যেন বিশাল মঞ্চটায়। দেবরাজের মনে হল, সম্ভবত সুভদ্রাহরণ পালা চলছে আজ। সুভদ্রাহরণ পালা।

১৯৮৪

❀ বলিদান

ক্ষিতীশ, আমাদের ক্ষিতীশ দত্ত, সেদিন আপিস থেকে বেরিয়ে আর কোথাও দাঁড়ায়নি। শনিবার এমনিতে হাফ-ছুটি। কিন্তু সে তো অন্যদের জন্যে। যারা ইউনিয়নের মেম্বার, যারা ওয়ার্কমেন, যারা বারগেনেবল স্টাফ, যাদের পাওনাগন্ডা নিয়ে সালিশি হয়, পাঁচ বছর পর পর চুক্তি হয়। সে নিজে তো অফিসার—। তার কাজ দেখে মাইনেপত্র বাড়ে। তার আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে উন্নতি। সুতরাং শনিবারে তার কোনও রেহাই নেই। ওর ওপরওলা, চাকবিতে সকলেরই একটা-না-একটা ওপরওলা থাকবেই, যার সামনে দাঁত বার করে হাসতে হয়, সে-ব্যাটা সারা সপ্তাহ ধরে চুপচুপ কাজ জমিয়ে রাখে। শনিবার বারোটা নাগাদ কাগজের কুচিগুলো ড্রয়ার থেকে বার করবে। ক্ষিতীশকে ডেকে পাঠাবে। বলবে, এগুলো অত্যন্ত কনফিডেনশিয়াল, ওরা সবাই চলে গেলে পর ঠান্ডা মাথায় বসে যেন সে কাজগুলো সেরে রাখে। শুধু কনফিডেনশিয়াল নয়, আবার আরজেন্ট। সুতরাং সোমবারের জন্যে রেখে দিলেও চলবে না। লোকটা নিজে কিন্তু একদিনও থাকে না। কামচোর!

এই শনিবারে সে আসেনি। টুরেফুরে গেছে বোধহয়। না হলে কামাই করার পার্টি সে নয়। লেটেও আসে না। তারও তো ওপরওলা আছে কোথাও, সে ঠিক নজর রাখছে ব্যাটার গতিবিধির ওপর। সুতরাং বারোটা নাগাদ ক্ষিতীশ দত্ত যখন টেবিল সাফ করে কুচো কাগজ ধরার অপেক্ষায় টান টান, এই বুঝি ডাক আসে কাচের ঘর থেকে, না, এল না।

হঠাৎ শনিবারের দুপুরটা কেমন ফাঁকা মনে হল ওর।

জানলা দিয়ে একটা নারকোল গাছের মুন্ডু দেখা যাচ্ছে। অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক মাকড়শার ঠ্যাঙের মতো ছড়ানো পাতাগুলো। ময়লা। একটাও ফল নেই। গাছের পাতা নড়ছেও না। পেছনে ছবি-আঁকার কাগজের মতো ঘোলাটে আকাশ। ওর মনে হল, একজন কেউ, যার কথা কখনও কোনওদিন শনিবার দুপুরে মনে হতে পারে না, সে জানলার বাইরে থেকে ওকে দেখছে। বলছে, কী—, এখন কী করা?

তাই তো। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন হয়ে গেলে নেলসেন ম্যান্ডেলার যেমন মনে হবে এখন কী করা? ক্ষিতীশেরও সেই রকম মনে হল। এখন কী করা। হাতের কাছে টিফিন বাকসটা ছিল। রুমালের বাঁধন খুলে তাকে মুক্ত করল ক্ষিতীশ। তারপর চ্যাপটা অ্যালুমিনিয়মের ঢাকনা তুলে দেখল, একজোড়া পাকানো পরোটা ঘেঁষাঘেঁষি করে শোয়ানো। বন্দিদশা ঘুচিয়ে তাদের যথাবিধি সৎকার করল।

পেটে প্রোটিন পড়ায় রক্ত চলাচল দ্রুত হয়েছে। মন চনমন করছে। যাই যাই ডাক আসছে ভেতর থেকে। এমন সময় ওর বিশ্রবা মুনির কথা মনে পড়ল। রাবণ কুম্ভকর্ণদের জন্মকাহিনী।

রসাতল থেকে মর্তলোকে বেড়াতে এসেছে রাক্ষস সুমালী আর তার সেজোমেয়ে পরম রূপবতী কৈকসী। ওরা দেখল, একটু দূরে লঙ্কার অধিপতি ধনেশ্বর কুবের পুষ্পক রথে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন। ওই রকম একটি তেজস্বী নাতি পেলে জীবন ও বংশ ধন্য হয়ে যেত, ভাবল রাক্ষস। মেয়েকে ডেকে বলল, "দ্যাখো মা, তোমার বিয়ের বয়েস হয়েছে। তুমি এখন আর কচি খুকিটি নও।"

"কী করব? কী করতে হবে তাই বলো বাবা।" কৈকসী বলল।

সুমালী বলল, "বিশ্রবা নামে এক তপস্বী আছেন। মহামুনি ভরদ্বাজের জামাই। ওই যে কুবেরকে দেখলি, ওর বাপ। যা, তার কাছে চলে যা। গিয়ে বল, আমি তোমার বউ হতে চাই। সেবাটেবা করে তাঁকে খুশি কর।"

তো, এই কথা শুনে সরল মেয়ে কৈকসী গিয়ে উপস্থিত হল মহাগিরি পর্বতে বিশ্রবার কাছে। দুপুর পেরিয়ে গেছে। মুনিবর তখন হোমটোম করছেন। কোনও কথা না বলে সে মুখ নিচু করে বসে রইল সেখানে। আর বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে হিজিবিজি কাটতে লাগল। কাজ করতে করতে মুনির নজর পড়ে ওর ওপর।

জিজ্ঞেস করেন, "তুই কে রে? কার মেয়ে? কী চাস?"

কৈকসী বলে, "আমি সুমালীর সেজোমেয়ে কৈকসী। বাবা আসতে বলল, তাই এলাম লজ্জার মাথা খেয়ে। কী দরকার তা মুখ ফুটে বলতে পারব না। আপনি যোগীপুরুষ। ধ্যান করে বুঝে নিন।"

ধ্যান করে বুঝলেন বিশ্রবা। তারপর কুমারী মেয়েটির দিকে অর্থপূর্ণ প্রসন্নচোখে চাইলেন। খুব যত্ন করে তার সঙ্গে সঙ্গম করলেন। তারপর বললেন, "তোর অভিলাষ পূর্ণ হবে। তবে—"

"তবে কী?"

"ভরদুপুরে এ-কাজ করতে হয় না। তোর পেটের বাচ্চা গুন্ডা হবে।"

"ওমা, সে কী! আমার পেটে গুন্ডা জন্মাবে কী গো!" মেয়ে তো কেঁদে আকুল, "না, না, তোমাব কথা ফিরিয়ে নাও ঠাকুর।"

তা কি হয়। অনেক কাকুতিমিনতি করার পর বিশ্রবা রাজি হন, বলেন, "আচ্ছা যা, তোব তিন ছেলের মধ্যে দুটো তো ভীষণ নৃশংস চরিত্রের হবেই। কিছু করার নেই। তবে ছোটটি হবে ধর্মাত্মা।"

মনের ভেতরটা খচখচ করছে ক্ষিতীশের। অসময়। এসবের আবার সময়-অসময় আছে নাকি? পশুদের মেটিং সিজন আছে, মানুষের তো নেই। যত সব বুজরুকি। আবার মনে হল, বলা তো যায় না। শাস্ত্রকাররা যখন বিধিনিষেধ রেখে গেছেন, তখন নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। হয়তো স্বাস্থ্যের হানি হয়। জরায়ু চমকে ওঠে। অথচ খুব ইচ্ছে করছে, চুপি চুপি বাড়িতে ফিরে টুনিকে জড়িয়ে ধরে লেপের নীচে গড়াগড়ি খায়। হোক গে দুপুর।

তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়ে ক্ষিতীশ। দুর্বল বিবেক, তার দংশন চাপা দিতে ছোট ব্রিস্টলের সামনে দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা করে। তারপর ঢুকে যায় ভেতরে। ঢকাঢক দুটো জিন পেঁদিয়ে যখন রাস্তায় নামল ফের, তখন ফুরফুরে হাওয়া লাগছে গায়ে। গলায় গুনগুন করছেন নিধুবাবু। কী মনে হতে, পকেট থেকে চিরুনি বার করে চুলটা আঁচড়ে নিল।

দুপুর দুটো দশ।

অন্যদিন হলে মিনিবাস। আজ ট্যাক্সি। গলিতে ঢুকে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বারণ করল হর্ন দিতে। পাড়া ঘুমোচ্ছে।

সিঁড়ির দরজা ভেজানো। পা টিপে টিপে ও বাড়িতে ঢুকল। নীচের তলা নিঝুম। মা আর দিদি ঘুমোচ্ছে। জুতো-মোজা নীচে খুলে রেখে খালি-পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠল দোতলায়। সেখানেও

অনমানবের সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, পুবদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে কী যেন দেখছে টুনি। টুনির মুখ দেখা যাচ্ছে না। মুখটা ওদিকে ফেরানো। পিঠে একরাশ কালো ঢেউখেলানো চুল, ডগায় গিঁট বাঁধা। পরনে লাল চেক চেক সবুজ রঙের শাড়ি। কতদিন ধরে পরছে ওটা। এর চেয়ে ঢের ভাল আটপৌরে শাড়ি টুনির আছে, অন্তত দশখানা, তবু কেচে কেচে এইটেই পরা চাই। শুধু টুনির না, হয়তো সব মেয়েদের এই স্বভাব—একটা কোথাও মন বসে গেলে সেখান থেকে মন তুলতে পারে না। ঈশ্বর ওদের এইভাবেই তৈরি করেছেন। বেশ করেছেন, ভাবল ক্ষিতীশ।

পা টিপে টিপে এগোতে থাকল। একখানা ঘর পেরিয়েই তো বারান্দাটা, তবু যেন চলা ফুরোয় না। এই বুঝি ঘুরে দাঁড়াল টুনি! না, শুধু মাথাটা নড়ল। কাপড় মেলছে? এত বেলায়? টিফিনের বাকসটা চেয়ারের ওপর নামিয়ে রাখল ক্ষিতীশ। ঠক।

গোড়ালিতে আলতার ছোপ দেখল না। মাজার বেড়ের দিকে ভ্রূক্ষেপই করল না। খেয়াল করলে কনুইয়ের কালচে ছোপ ওর চোখে পড়ত। ওর লোভী চোখের সামনে, মাছরাঙার যেমন মাছ, তেমনই লাল চেক চেক সবুজ রঙের শাড়িতে মোড়া অতি পরিচিত নারী শরীর।

পেছন থেকে গুটি গুটি এসে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল শরীরটার ওপরে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল শরীরটাকে। কে দেখতে পাচ্ছে, না পাচ্ছে, গ্রাহ্য না করে দু'হাতে পাঁজা করে তুলে ফেলল দেহটাকে। হালকা।

দেহটা ছটফট করে ওঠে। চিলের কবলে পড়া গোলাপায়রার মতো দেহটা চিঁ চিঁ করে। এক মুহূর্ত। দু' মুহূর্ত। আর তাতেই ভুল বুঝতে পারে ক্ষিতীশ। দুম করে ছেড়ে দেয় দেহটাকে, যেন ছ্যাঁকা লেগেছে হাতে।

অমনি ছুটে পালিয়ে যায় দেহটা। টুনি নয়, সুমিত্রা। পালিয়ে গিয়ে একেবারে সোজা নীচের তলার শেষ সিঁড়িতে বসে পড়ে। হাত-পা ওর থরথর করে কাঁপে। ভয়, না অপমান, না আকস্মিকতা—ও বোঝে না। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে ওর। দু'হাতের পাতায় মুখ ঢেকে ও নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।

এরপর বিপর্যস্ত লিবিডো নিয়ে দোতলার ঘরে স্তম্ভিত বসে পড়ে ক্ষিতীশ। ফ্যালফ্যাল করে শূন্যে তাকায়। ঘটনাটি এতই আকস্মিক আর উদ্ভট হয়ে গেল যে, পনেরো-ষোলো বছর বয়েসের কাজের মেয়েটাকে "আরে তুই!" ছাড়া আর কিছু বলতেই পারেনি।

প্রায় কুড়ি মিনিট পর বাথরুম থেকে বেরোল টুনি। বেরিয়েই প্রথমে ডাকল, "সুমিত্রা। খাবার দিয়ে দে।" তারপর ক্ষিতীশকে দেখে বলল, "আরে তুমি! কখন এলে?"

দুই

ভেতরে ভেতরে একটা কৈফিয়ত তৈরি করতে চেষ্টা করছিল, দেখল, সেটা দাঁড়াচ্ছে না। হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। ক্ষিতীশের মনে হল, ওর মোটা হাড়গুলোর ভেতর থেকে মজ্জা চুষে নিয়েছে কেউ। মাথার ঘিলু চুষে নিয়েছে। তাকিয়ে আছে ও, কিছু দেখছে না। এরপর যে-সব ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, সেগুলো ছবির মতো ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে।

সুমিত্রা নীচের তলায় শেষ সিঁড়িটার ওপরে বসে আছে। মুখে দু'হাত চাপা দিয়ে কাঁদছে। জোরে কাঁদছে না, ফোঁপাচ্ছে। উপায় থাকলে ও এখুনি বাড়ি চলে যেত। মায়ের কাছে, মাধবপুর গ্রামে। গরিবের কুঁড়েঘর সেখানে, কিন্তু নিরাপত্তা আছে। নিরাপত্তা আছে ভেবে তো এ-বাড়িতে কাজ নিয়েছিল। দেড় বছর কাজ করেছে। এতদিন কিছু হয়নি তো। বাবু আজ কেন যে ওকে জড়িয়ে ধরল পেছন থেকে, তুলে নিল বুকের ওপর! একবার মনে হয়েছিল, একী, বাবু কি ওকে রেলিং পার করে ফেলে দেবে নীচে! বাবুর মুখে মদের মতো গন্ধ ছিল। উঃ, কী ভয়ংকর! আবার চোখ ফেটে জল আসছে। ধুকপুক করছে ওর বুক। নীচের তলায় মা আর দিদি ঘুমোচ্ছে। এখুনি জেগে ওঠার কথা নয়। সুমিত্রার চাপা কান্না শুনে জাগবে। উঠে আসবে।

"কে রে? কে ওখানে?"

"আমি?"

"কী করছিস? এই, কাঁদছিস নাকি? কাঁদছিস কেন?"

চুপ।

"বল না, কী হয়েছে তোর। শরীর খারাপ লাগছে। কষ্ট হচ্ছে কোথাও?"

চুপ।

"মায়ের জন্যে মন কেমন করছে? কীরে, ধাড়ি মেয়ে, আর ন্যাকামি করিস না! বউদি বকেছে? তা, ঠিক করে কাজ না করলে একটু-আধটু বকবে বই কী?"

"না।"

"তবে?"

এরপর কী বলতে পারে সুমিত্রা? দাদাবাবু ওর হাত ধরে টেনেছে, বলবে?

দাদাবাবু পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরেছে, বলবে? দাদাবাবু ওকে কোলে তুলে আদর করেছে, বলবে? দাদাবাবু গায়ে হাত দিয়েছে, বলবে? না, দাদাবাবু অসভ্য কাজ করেছে, বলবে? তার তো অনেক রকম মানে হয়। ক্ষিতীশ নাবালিকা ধর্ষণ করেছে? হতেই পারে না! ছি ছি!

না, মেয়েটা পাজি নয়। ক্ষিতীশ জানে, ওর স্বভাব, ব্যবহার খুব ভাল। চুরিচামারি করে না। জিনিসপত্রে লোভ নেই। কথা বললে কথা শোনে। হাসিমুখে কাজ করে। মাসে, দু'মাসে একবার করে বাড়ি যায়। তিন-চারদিন থেকে আসে। মাঝে মাঝে ওর মা এসে মেয়ের সঙ্গে দেখা করে যায়। ওর মাইনের টাকা নিয়ে যায়। টুনি বলে, "সব টাকা নিয়ে যেয়ো না। ওর হাতখরচের জন্য কিছু রেখে যাও।" সে বলে, "খাওয়া-পরা-তেল-সাবান সবকিছু তো এখানেই পাচ্ছে বউদি, হাতখরচ লাগবে কীসে? টাকা হাতে থাকলে ফুটানি করতে শিখবে। আর, যখন যা বলে, আমি তো কিনে দিয়ে যাই।"

সাজগোজের জিনিস টুনিও কিছু কিনে দেয়। নিজের কত টুকিটাকি বং খানিক ব্যবহার করে, দিয়ে দেয় সুমিত্রাকে। পাউডার, টিপ, রিবন। এই তো সেদিন নিজেব ভেলভেটেব চপ্পল জোড়া ওকে পরতে দিল। কিছুই হয়নি ওটার, একটু রোঁয়া উঠে গেছিল হয়তো।

অথচ, উত্তর একটা সুমিত্রাকে দিতে তো হবেই। কেন দুপুরবেলা সিঁড়িতে বসে কাঁদছে। নিজের মাকে হাড়ে হাড়ে চেনে ক্ষিতীশ। কৌতূহল জাগলে তাব নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই। কেন কাঁদছে কাজের মেয়েটা, যেখানে কান্নার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, সে তো জানা চাই। কেউ কি শখ করে কাঁদে? আসলে, টুনি আর মা—এই দু'জনই সুমিত্রার কর্ত্রী এবং অভিভাবক। টুনি কম, মা বেশি। নীচের তলায় সাংসারিক কাজের ক্ষেত্র—রান্নাঘর, কলঘর, ভাঁড়ার, খাবার টেবিল। ওপরতলাটা স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত আস্তানা। ডাকলে তবে ওপরে আসে সুমিত্রা। নয়তো নীচেই থাকে, নীচেই শোয়। ক্ষিতীশ তো দূরের লোক। ওকে ভয় করে মেয়েটা। সত্যি কথা বলতে কী, সুমিত্রাকে একটা শ্রমের আকরপ্রাণী ছাড়া অন্য চোখে ও দেখেনি কখনও। ওরা আসে, যায়। কেউ ছ'মাস থাকে, কেউ এক বছর। এই মেয়েটাই টিকে গেছে। না, মিথ্যে অভিযোগ আনতে ও সাহস কববে না।

কিন্তু ক্ষিতীশ যে ওকে জড়িয়ে ধরে পেছন থেকে পাঁজা করে তুলেছিল, সেটা তো ঘটনা। হয়তো ওর বুকটুকে হাতও লেগে গিয়ে থাকবে। নিশ্চয় লেগেছে। ও তো গোটানো শেতলপাটি ভেবে নয়, একটু আগে টুনি ভেবেই ওকে ধরেছিল, একটু অবাক করে দিতে চেয়েছিল। কতদিন পর শনিবার সকাল সকাল বাড়ি ফিরেছে, সেটা সেলিব্রেট করবে। কনজুগালি সেলিব্রেট করবে। এই ছিল উদ্দেশ্য। আর কোনও বদ উদ্দেশ্য বা মতলব ওর ছিল না।

ওই লাল চেক চেক সবুজ শাড়িটাই কাল হল। মেয়েটা যদি বলে, দাদাবাবু ওর বুকে হাত দিয়েছে, তো সেটা মিথ্যে নয়। কৈফিয়ত দেওয়ার দায়িত্ব ক্ষিতীশের। কিন্তু কৈফিয়ত দিতে গেলে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে কি? হবে না। যারা দোষী হয়, তারাই মোক্ষম সব কৈফিয়ত তৈরি করতে পারে। তবু মেয়েরা এসব ব্যাপারে কোনও পুরুষকে বিশ্বাস করে না। মা বা টুনি—সেদিক থেকে দু'জনেই সমান। শ্বশুরবাড়ি থেকে ক্ষিতীশের দিদি এসেছে দিন কয়েক হল। পৌষ মাস কাটিয়ে ফিরে যাবে। ফিসফিস করে রটাবার মতো একটা কেচ্ছা সঙ্গে নিয়ে যাবে। কী না অমন সুন্দর একটা জোয়ান বউ থাকতে ভাইটা কিনা ঝিয়ের হাত ধরে টেনেছে। ছি ছি, কী প্রবৃত্তি, কী নোংরা রুচি। কেউ জিজ্ঞেস করবে, "আচ্ছা, নিজের বরকে ধাতে রাখতে পারে না, এ কেমন বউ বাবা।" ওরে সর্বনাশ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা প্রচারিত হলে টুনির কী প্রতিক্রিয়া হবে, তা তো ভাবা হয়নি। সত্যি তো, ওকে বাদ দিয়ে সুমিত্রা? কোথায় নেমেছে ক্ষিতীশ! একটু-আধটু মদটদ খায়, টুনি জানে। সে আজকাল অনেকেই খায়।

যা কাজের চাপ আপিসে, খেতে হয়। কিন্তু মদ খেলেই মেয়েমানুষের দিকে নজর যাবে? এ কেমন কথা! বাপের জন্মে মদ দেখেনি টুনি। ওর মনে হবে, গুরুজনেরা যা বলে গেছে, তা ভুল নয়। ওর সর্বনাশ হয়েছে!

এতদিন নিজের স্বামীকে নিয়ে ওর গর্ব ছিল যে, টুনি ছাড়া আর কোনও মেয়ের পাসপোর্ট ছবি অবধি ক্ষিতীশের মনের মধ্যে নেই। সেই দর্প চূর্ণ হবে। উঃ এত কাছের লোক, ক্ষিতীশকেও বিশ্বাস করা যায় না। বিশ্বাস একবার ভাঙলে আর কোনওদিন জোড়া লাগবে? স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা, প্রেম, পারস্পরিক নির্ভরতা—সবকিছুই তো ওই একটি বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে, তাই না? সামান্য একটা মেয়ে—সুমিত্রা, সেটা নষ্ট করে দেবে? দিল তো।

তার চেয়েও বড় আঘাত বোধহয়, অপমান। শাশুড়ি, ননদ, প্রতিবেশীরা এরপর টুনির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। বা, মুচকি হাসবে। নিশ্চয় ওর গলদ আছে কোথাও। এত সাজগোজ, রূপচর্চা, শাঁখা-সিঁদুরের ঘটা! অফিসার বর নিয়ে কত অহংকার! সব ফাঁকা আওয়াজ! আসলে ভাঁড়ে মা ভবানী! সুমিত্রার মা নীচের তলায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করবে, "ভদ্দরলোকেব বাড়ি ভেবে মেয়েটাকে কাজে লাগালাম, এ কী শুনছি মা? এ কী শুনছি বউদি? তোমরা জলজ্যান্ত থাকতে আমার কচি মেয়েটার গায়ে নোংরা হাত পড়ে। কলকেতা শহরে অনেক ছোটলোক, বজ্জাত, বদমায়েশ আছে, আমি জানি। এই বাড়িব বাবুই যে তাদের মতোই একজন, কী কবে জানব? তোমরা শাসন করতে পাবোনি?" এসব প্রশ্নেব কোনও উত্তর নেই। সুমিত্রার মায়ের বাজখাঁই গলা শুনে পাশের বাড়ির লুঙ্গি-পরা লোকটা জানলাব পবদা ফাঁক করে তাকাবে। পানের পিচ ফেলবে বাইরে। কোনওদিন ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না ক্ষিতীশ। তার কাছে ওর মাথা হেঁট হল! এবপর আর মাথা তুলে রাস্তা দিয়ে হাঁটা যাবে না। এরপর আর কোনও কাজের লোক এ-বাড়িতে আসবে না। এরপর পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। না হলে, পাড়ার ছোঁড়ারাই দুয়ো দিয়ে তাড়াবে ওকে। কোথায় যাবে ও? দুশো চল্লিশ টাকা ভাড়ায় এই দোতলা বাড়ি নকশাল আমলে পাওয়া গিয়েছিল। এখন এর ভাড়া দু'হাজার টাকা। কোথা থেকে দেবে তুমি মাসে দু'হাজার টাকা, ক্ষিতীশ দত্ত? ভাবতে ভাবতে সে গদিওলা চেয়াবেব সঙ্গে মিশে যায়। এর চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল, ওর মনে হয় একবার। আবার মনে হয়, যখন মেয়েটাকে পাঁজা কবে তুলেছিল, ভুল বুঝতে পেরেছিল, সেই মুহূর্তেই যদি ওকে নীচে ফেলে দিতে পারত—তা হলে কোনও প্রমাণ থাকত না। কত হত্যাকাণ্ড তো ঘটে এ রকম। প্রমাণের অভাবে সাজা হয় না। একবার বিশ্রবা মুনিব কথাও মনে পড়ল ওর। মুনির অভিশাপ, ভরদুপুরে এ-কাজ করতে নেই। কবলে, অমঙ্গল হয়।

তিন

বাথরুম থেকে বেরিয়েই ক্ষিতীশকে দেখে অবাক হয়ে গেছে টুনি।

ক্ষিতীশ বলল, "চলে এলাম। আজ তো শনিবার। তোমার এত দেরি?"

"ক'টা বাজে?"

"তাও খেয়াল নেই?" কবজি উলটে ঘড়ি দেখে ক্ষিতীশ বলল, "তিনটে। তুমি তিনটের সময় ভাত খাও?"

"রোজ না। আজ অনেক কাজ করলাম তো। পুরো দোতলার ঝুল ঝাড়লাম। পাখা পরিষ্কার করলাম। ব্লেডগুলো কালো হয়ে গিয়েছিল। দেখো না, একবার তাকিয়ে দেখো। বুঝতে পাবছ না?"

ওপরের দিকে তাকিয়ে ক্ষিতীশ স্বীকার করে। সত্যি, খুব পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে ঘরখানা।

খানিক এ-ঘর ও-ঘর ঘুরঘুর করল টুনি। দু'-এক কলি গান ভাঁজতে ভাঁজতে একবার থেমে গিয়ে বলল, "সুমিত্রাকে ডাকো তো। বললাম, গরম করে খাবার দিয়ে দে।"

"সুমিত্রা আর আসবে না।"

কথাটা শুনতে পায়নি টুনি। বা, পেলেও তার মর্ম বোঝেনি ও। বলল, "এসে পড়েছ যখন, তুমিও কিছু খাও। পোস্ত আছে।"

"আমি তো টিফিন খেয়ে এলাম।"

"ভারী বেয়াদব হয়েছে মেয়েটা," টুনি গজগজ করে, "ওইটুকু খাবার গরম করতে কত সময় লাগে?"

"সুমিত্রা আর আসবে না।" আবার বলল ক্ষিতীশ।
"আসবে না? কেন আসবে না? তোমাকে বলেছে কিছু?"
"নাঃ, মুখ ফুটে কিছু বলেনি। যে রকম ছটফট করে কোল থেকে নেমে গেল—"
"কোল থেকে? কার কোল থেকে..."
"আমার।"
এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার মোড়ায় বসে পড়ল টুনি। এলোচুল পেছন থেকে টেনে সামনে বুকের ওপর এনে ফেলল। দু'হাত দিয়ে বিনুনি পাকাতে পাকাতে ক্ষিতীশের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বইল। বলল, "কী বলছ, আমি বুঝতে পারছি না। তুমি নেশা করে আছ নাকি।"
"একটু।"
"তুমি সুমিত্রার গায়ে হাত দিয়েছ? কেন?"
একটু হেসে ক্ষিতীশ বলল, "ফোর প্লে। তুমিই তো বলো, আমার রসবোধ নেই। আমি কামকলা জানি না। আমি স্বার্থপর। তাই ভাবলাম, আজ বেলিং থেকেই শুরু কবি। আমি কী করে জানব, তোমাব অমন সুন্দব লাল চেক চেক সবুজ রঙের শাড়ি পবে নিসর্গেব শোভা দেখবে তোমার কাজেব লোক। কোলে তুলেই ছেড়ে দিয়েছি। যা হালকা ও।"
"ছি ছি। কী কেলেঙ্কারিটা কবলে!" বলতে গিয়ে হেসে ফেলল টুনি, "তোমাব মতো হ্যাংলা আমি আব একটা দেখিনি। এখন কী করে সামলাই?"
ক্ষিতীশ বলল, "শাড়িটা ওকে দিলে কেন?"
"পচে গিয়েছিল।"
"পচে গিয়েছিল, তা ফেলে দিতে। নিজের কাপড় আর কাউকে পরতে দেয়? সুমিত্রাকে একটা নতুন শাড়ি কিনে দিতে।"
"পুজোর সময় দিলাম তো। আবার দু'মাস যেতে-না-যেতে কিনব? তাই ভাবলাম, এইভাবে কয়েকটা মাস চালাই।"
"তো, আমায় বলোনি কেন? বলে বাখলে তো এই ভুলটা হত না।"
চুল বাঁধা বন্ধ কবে টুনি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, "বুঝতে পেরেছি। এখন কেসটা আমায় সামলাতে হবে। আমার কোর্টে বল।" তারপর দুপদাপ পা ফেলে নেমে গেল নীচের তলায়।
মাথাব মধ্যে দু'পাত্র জিনেব ঘোর ছিল। তীব্র টেনশনের মধ্যে পড়ে সেটা পাপড়ি মেলতে পারেনি এতক্ষণ। এবার ঘুম ভেঙে এল ক্ষিতীশেব চোখে।
চটকা ভাঙতে দেখে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে টুনি। মুখে পান। হাতে পুঁটলি-কবা সেই গোলমেলে শাড়িটা। ওর পেছনে সুমিত্রা। নির্বিকার মুখ।
শাড়ির একটা খুঁট ধরে রইল নিজে। অন্য খুঁটটা ধরল সুমিত্রা। টান করে কাপড়খানা মেলে দিল ক্ষিতীশের চোখেব সামনে। তারপর এক প্রকাণ্ড কাঁচি ওর হাতে দিয়ে বলল, "এইবাব শাড়িটাকে বলি দাও।"
ক্ষিতীশের চোখের সামনে একটা অতি সুন্দর লাল চেক চেক সবুজ শাড়ি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়।
টুনি বলে, "এইবার তুমি আমায় তিনশো টাকা জরিমানা দেবে, কেমন? সেই টাকা দিয়ে আমার একটা আর সুমির একটা, নতুন শাড়ি কিনব। রাস্তার মুখে একটা নতুন কালীবাড়ি উঠেছে, সেখানে গিয়ে শাড়ি দুটো মায়ের প্রসাদী করে আনব। তা হলেই আর কোনও দোষ থাকবে না। কী না কী ঘটেছে, ভুল করে। আমরা সবকিছু ভুলে যাব। তাই না রে, সুমি?"
সুমিত্রা মাথা নাড়ে। একটা নতুন শাড়ি পাবার আশায় ও অপমান ভুলে যায়।
মেয়েটা হালকা। ওর মাথাটা আরও হালকা দেখাচ্ছে এখন।
নিজের বুদ্ধিমতী বউয়ের পান-খাওয়া লাল ঠোঁট দুটি দেখে, ক্ষিতীশ,—আমাদেব ক্ষিতীশ দত্ত, যুগপৎ কাম ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করে।
তার মূল্যস্বরূপ তিনটে একশো টাকার নোট বার করে দেয়।

১৯৮৯

চঞ্চলকাকা প্রায়ই এসে বলে, "বুলবুল সেনের বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল, সেখানে একজনের সঙ্গে কথায় কথায় জানলাম, মানুষের বয়েস নাকি মোটে দশ হাজার বছর। অথচ কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে জীবজন্তু ছিল। যাঃ, আমার বিশ্বাস হয় না।" কিংবা, "আমাদের শরীরের তুলনায় নাক কেন এত ছোট বলো তো? কারণ গন্ধ নিয়ে এখন আমাদের তেমন আগ্রহ নেই। বুলবুল সেনের বাড়িতে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন। আমার বিশ্বাস হয় না।"

একদিন সন্ধেবেলা মাসিরা বেড়াতে এসেছিল। বাইরের ঘরে বড়রা কথা বলছে, টিভি দেখছে। প্রসূন তার নিজের পড়ার ঘরে মাসতুতো বোন চরকার সঙ্গে ক্যারম খেলছে। চঞ্চলকাকা এসে উপস্থিত। কোনওদিন খালি হাতে আসে না। চিজলিঙের একটা ভরতি রঙিন ঠোঙা শূন্যে ছুড়ে নিয়ে বলল, "যে লুফতে পারবে, তার।"

কিছুক্ষণ চলল কাড়াকাড়ি।

তারপর তিনজন মিলে ছোট ছোট নোনতা বিস্কিটগুলো খেতে খেতে গল্প জমাল। চঞ্চলকাকা এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, টিভি দেখা তো দুরের কথা। চরকা ওকে চেনে, এ-বাড়িতে আগে দেখেছে।

"তোমাদের বুলবুল সেনের খবর কী, চঞ্চলকাকা?" চরকা জিজ্ঞেস করে।

"ঠান্ডা লেগে ওর গলা ভেঙেছে। পরশু ওকে দেখতে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বলেছে, এখন কিছুদিন শুটিং বন্ধ। কথা বলা বন্ধ। গান বন্ধ।"

প্রায় সমবয়সি দুই মাসতুতো ভাই-বোন। দু'জনেই এবার মাধ্যমিক দিয়েছে। চরকা মেয়ে তো, একটু ফক্কড়।

"তা হলে সারাদিন কী করেন?" ও জিজ্ঞেস করে হাসতে হাসতে।

"বই পড়ে আর গার্গল করে।" চঞ্চলকাকা বলল, "সেদিন গিয়ে দেখি, এক তরুণ কবি ওকে কবিতা শোনাচ্ছে। আধুনিক কবিতা।"

চরকা বলল, "বুলবুল সেন আধুনিক কবিতা পড়েন? আমার ধারণা ছিল, ফিল্মের লোকেরা অবসর সময়ে সাজগোজ করে আর ইন্টারভিউ দ্যায়।"

"ও অন্য ধরনের মানুষ।" চঞ্চলকাকা বলল, "রূপ আর প্রতিভা, দুই-ই আছে ওর। ওকে আত্মপ্রচার করতে হয় না। সেদিন দেখি, ওর টেবিলের ওপর নীল প্যাডের কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা 'শাশ্বতী, নদীর ধারে রাত দু'প্রহরে খোঁজে তার সামান্য ঘড়িটা।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ওটা?' ও বলল, 'সুররিয়ালিস্টদের একটা বিবৃতি। বাংলা করার চেষ্টা করছিলাম। আর ভাবছিলাম, যা শাশ্বত, যা ধ্রুব, তা কি আমাদের ঘড়ির সময় দিয়ে মাপা যায়? ওরা বোধহয় উলটো করে কথাটা বলতে চেয়েছিল।' আশ্চর্য, না?"

চরকা মিটমিট করে হাসছিল। হয়তো ভাবছিল, চঞ্চলকাকা বাড়িয়ে বলছে। যা ইটার্নিটি, সময়ের মাপে যা ধরা যায় না, তার সঙ্গে ঘড়ির কী সম্বন্ধ? ঘড়ি তো একটা যন্ত্র। ঘণ্টা-মিনিট অবধি মাপতে পারে। অনন্ত কাল তো মাপতে পারে না।.

বিস্কিট চিবোতে চিবোতে চরকা আবার জিজ্ঞেস করে, "সুররিয়ালিস্ট কারা, চঞ্চলকাকা?"

"আমি কী জানি? আমি কি কবিতা লিখি, না ছবি আঁকি? বুলবুল সেন জানে।"

"তোমাকে বলেনি?"

"বলেছে। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। ওসব ফরাসি দেশের ব্যাপার। বড় হলে বুঝতে পারবি।"

চরকা ছাড়ার পাত্রী নয়। বলে, "অনেক বড় হয়েছি। আর কত বড় হব? আমার এক্ষুনি জানতে ইচ্ছে করছে, সুররিয়ালিস্ট কারা। ওরা কি অসুরদের শত্রু? দেবতা?"

চঞ্চলকাকা একটু ভেবে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। প্রসূনের পড়ার টেবিলের ওপর ডান হাতখানা রেখে বলে, "সুর মানে 'ওপর'। এই যে টেবিল, এ হল বাস্তব। সুররিয়ালিস্ট তারা, যারা এর ওপর দিয়ে যায়।"

"তুফান মেলের মতো? তুফান মেল শুনেছি লাইনের দু'ইঞ্চি ওপর দিয়ে যায়। নাকি প্লেনের মতো?"

"দুর পাগলি, এ হল শিল্পীদের কবিদের ভাবনা-চিন্তার একটা রকম। যা কিছু চোখে দেখা যায়, ছুঁয়ে বোঝা যায়, সেসব ছাপিয়ে অবচেতন মন থেকে চাপা-পড়া মালমশলা সব বার করে ছবিতে, লেখায় সেসব ফুটিয়ে তোলা ওদের কাজ। ফ্রয়েড যখন মনের রহস্য আবিষ্কার করলেন, তারপর একসময় অবচেতন নিয়ে ধুম পড়ে যায় ও-দেশে। স্বপ্নের জগৎকে টেনে তুলে এনে ওরা বাইরে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আন্দোলন করেছে, কেননা, স্বপ্নও একধরনের বাস্তব। যা আছে, কিন্তু আমরা মানতে চাই না যে, আছে। চেপে রাখি। ঘুমের মধ্যে ভেসে ওঠে। ঘুম ভাঙলে ভুলে যাই। ভুলে যেতে চাই বলে ভুলে যাই। বুঝলি না? বুলবুল সেন বলছিল এসব। আমি মিস্তিরি লোক, এসব বুঝি না, বিশ্বাসও করি না।"

চরকা এবার চুপ করে যায় খানিকক্ষণ। তারপর ক্যারমের লাল ঘুঁটিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। বলে, "আমি এক-একদিন খুব খারাপ খারাপ স্বপ্ন দেখি।"

প্রসূন বলে, "আমাদের একদিন বুলবুল সেনের কাছে নিয়ে যাবে?"

চঞ্চলকাকা এবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। চলে যাবার উপক্রম করে। প্রসূন হাত ধরে টানল, "না, বলতেই হবে। কবে নিয়ে যাবে?"

"আরে, ও কত ব্যস্ত জানিস না। ওর সময় কোথায়? কত লোক দেখা করতে আসে রোজ, ও সবাইকে ফিরিয়ে দেয়। রোজ অ্যাত্তগুলো করে চিঠি আসে ওর কাছে, ফ্যান মেল। একটারও উত্তর দেয় না। তোদের সঙ্গে দেখা করতে ওর বয়ে গেছে।"

"আ-হা!" চরকা রাগে ঠোঁট ফোলায়। "নিজে রোজ রোজ যায়, তাতে কিছু হয় না। আমাদের বেলাতেই যত। এবার থেকে আর বুলবুল সেনের গল্প করবে না আমাদের সামনে।"

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে মহামুশকিলে পড়ে যায় চঞ্চলকাকা। এরা একেবারে অবুঝ। ও কি গল্প করতে যায় ওখানে? কাজে যায়। বুলবুল সেনের বাড়িতে বারো মাস তিরিশ দিন ইন্টিরিয়র ডেকোরেটরের কাজ লেগে থাকে। আজ এটা ভাঙো, কাল ওটা বদলাও। দেয়ালের অমুক রং পছন্দ হচ্ছে না। মন খারাপ সারাবার জন্য অন্য রং লাগাও। পরদা বদলাও। কে উঠতে উঠতে বলেছে, আপনার বাড়ির সিঁড়িতে এই কার্পেট? অমনি ডাকো চঞ্চলবাবুকে। ওপড়াও কার্পেট, নতুন কার্পেট বসাও। যত সব খামখেয়ালির কাণ্ড।

চঞ্চলকাকা বলে, "আমার কী। আমি কাজ করে দিই, টাকা পাই। বাড়িতে পার্টি ফার্টি হলে নেমন্তন্ন পাই। নানান লোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়, তারাও দরকার পড়লে ডাকে। অন্যায় আবদার করলে বুলবুল সেন শুনবে কেন?"

এবার চরকার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। কানে কানে প্রসূনের সঙ্গে কনসাল্ট করল। প্রসূনেরও সায় আছে, জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমায় কিছু বলতে হবে না। আমরা যদি একটা চিঠি দিই বুলবুল সেনকে, তুমি সেটা পৌঁছে দিতে পারবে তো?"

একটু ভেবে চঞ্চলকাকা বলে, "তা পারব।"

টেবিলের ওপর প্রসূনের একগাদা বই-খাতা ডাঁই করা ছিল। পরীক্ষা তো হয়ে গেছে, ওগুলো আর কোনও কাজে লাগবে না। একটা খাতার পেছন দিক থেকে পাতা ছিঁড়ে ওরা চিঠি মকশো করতে বসে যায়।

ইংরেজিতে লিখবে, না বাংলায়?

চঞ্চলকাকা বলে, "বাংলাতেই লেখ। ও অবশ্য ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, তামিল আর ফ্রেঞ্চ—এই পাঁচটা ভাষা জানে।"

কীভাবে শুরু করবে? মিস লিখবে, না মিসেস? প্রিয় বুলবুল সেন, না পূজনীয় বুলবুল সেন? না, শ্রদ্ধাস্পদেষু?

"প্রিয় বুলবুল সেন লেখা যাক।" চরকা খানিক ভেবেচিন্তে বলল।

প্রসূন বলে, "যাঃ, আমাদের চেয়ে কত্ত বড় উনি। মাসির বয়সি হবেন। গুরুজন। মায়ের মতো। তাঁকে প্রিয় বুলবুল সেন বলা উচিত?"

"আলবাত উচিত।" চঞ্চলকাকা লাফিয়ে ওঠে। "এই হল তোর বুদ্ধির সঙ্গে চরকার বুদ্ধির তফাত।

বুলবুল হল আর্টিস্ট। ফিল্‌ম আর্টিস্টদের বয়স কক্ষনও বাড়ে না। পঁচিশ অবধি উঠে থেমে যায়, তা জানিস না বুঝি? একবার মায়ের রোল করল তো ব্যস, কেরিয়ার শেষ। আমাদের বুলবুল সেন হল সকলের প্রিয় বান্ধবী। সবাইকে ও 'আপনি' বলে সম্বোধন করে, সে যত ছোটই হোক না। আর প্রেসের লোক ছাড়া কেউ ওকে 'আপনি' বললে ওর মন খারাপ হয়ে যায়। সাবধান।"

অনেক কাটাকুটি, কাগজ-ছেঁড়াছিড়ি, তর্কাতর্কির পর একটা চিঠি তৈরি হয়।

প্রিয় বুলবুল সেন,

আমরা দুই ভাইবোন তোমাকে খুব ভালবাসি। আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এখন ছুটি। একদিন আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তুমি কি অনুমতি দেবে?"

ইতি, চরকা ও প্রসূন রায়।

চিঠি নিয়ে চলে গেল চঞ্চলকাকা।

তারপর আর কোনও খবর নেই। দিন যায়। একটা সপ্তাহ পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে। এ-বাড়িতে প্রসূন আর ও-বাড়িতে চরকা সকালে-বিকেলে দু'বার করে চিঠির বাকস দেখে যায়, বুলবুল সেনেব চিঠি এল কিনা। ফিবে যায় হতাশ হয়ে। রোজই বাকস-ভরতি হয়ে থাকে যত আজেবাজে কাগজে, বুকপোস্টের খামে। সেগুলোর ওপর বাবার নাম লেখা। নয়তো মায়ের নাম লেখা মাসিদেব চিঠিপত্র। আসল চিঠির খবর নেই। কতদিন হয়ে গেল চঞ্চলকাকাও আসে না।

চরকা টেলিফোন করে এ-বাড়িতে। দুপুরবেলা, যখন সব নিঝ্‌ঝুম।

"কী রে, কোনও উত্তর এসেছে?"

"না।"

"তা হলে আর আসবে না। আমি জানতাম।" চরকা বলে।

"চঞ্চলকাকা বোধহয় চিঠিটা দেয়ইনি।"

চরকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, "কত আশা করে ছিলাম। দেখলি তো, চঞ্চলকাকা ডিচ্‌ করল।"

"না, না।" প্রসূন বলতে চায়, "চঞ্চলকাকার কোনও দোষ নেই। উনি, ওই বুলবুল সেন, আমাদেব চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। একদিন চল, তোতে-আমাতে মিলে চুপি চুপি ওঁর বাড়িতে গিয়ে হাজিব হই। যাবি?"

চরকা ভরসা পায় না। দরকার নেই বাবা। তারপর যদি দরোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেয়! কুকুর লেলিয়ে দেয়! চোর ভেবে মারধর করে! পুলিশে ধরিয়ে দেয়!

এরপর ওরা ব্যাপারটা ভুলেই গেল।

ছোট ছেলেমেয়েদেব এই একটা বড় সুবিধে। ওদের স্মৃতিশক্তি যেমন প্রখর, ভুলে যাওয়ার শক্তিও তেমনই প্রবল। প্রতিদিন ওরা কত ছোট ছোট কারণে কষ্ট পায়, দুঃখ পায়। কিন্তু তেমন করে কিছু মনে রাখে না। প্রাণের আবেগ ভাসিয়ে দেয় সব খড়কুটো। আর, সেই কারণেই ওরা অবাক হবার ক্ষমতা রাখে।

একদিন সকালবেলা ঠিক আটটার সময় প্রসূনদের আর চরকাদের দু'বাড়ির দরজায় দু'জন সাদা উর্দি-পরা লোক উপস্থিত হয়। দু'জনেরই মাথায় লাল পাগড়ি, পায়ে লাল নাগরা আর নাকের নীচে পাকানো গোঁফ।

এসে বলে, "চিঠি আছে।"

এ-বাড়িতে প্রসূনের বাবা আর ও-বাড়িতে চরকার বাবা তখন ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ছিলেন। এ-বাড়িতে প্রসূনের মা আর ও-বাড়িতে চরকার মা তখন মাছ ভাজছিলেন রান্নাঘরে। দু'বাড়িব ট্রানজিস্টার রেডিয়োয় তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে রবীন্দ্রসংগীত।

কার চিঠি? আবার কার! বুলবুল সেনের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছে দূত। প্রকাণ্ড নীল খাম। তার মধ্যে নীল কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা:

চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরি হল বলে মার্জনা চাইছি। আগামী রবিবার সকালে আপনারা দুই ভাইবোন আমার কুটিরে পায়ের ধুলো দিলে অত্যন্ত খুশি হব। আমার গাড়ি গিয়ে আপনাদের নিয়ে আসবে। অভিভাবকদের বলবেন, কোনও প্রকার চিন্তার কারণ নেই। নমস্কার, ইতি, বিনত বুলবুল সেন।

প্রসুন হতভম্ব। এখন কী করবে ও বুঝতে পারে না। এমন সময় টেলিফোন বাজল।
"চিঠি এসে গেছে।"
"এসে গেছে।"
"কে দিল?"
"একজন সাদা উর্দি-পরা লোক, পাকানো গোঁফ..."
"মাথায় লাল পাগড়ি?"
"হ্যাঁ। আর পায়ে লাল নাগরা।"
"ডুপ্লিকেট।"
চরকা জিজ্ঞেস করে, "যাবি তো?"
প্রসুন পেছন ফিরে একবার বাবার দিকে তাকায়। তারপর বলে, "অফকোর্স।"

দুই

বুলবুল সেনের বেলভিডিয়ার রোডের বাড়িতে বসে আছে চরকা আর প্রসুন। দু'জনের পরনেই নীল রঙের জিনস, কোমরে বেল্ট, পায়ে বুট জুতো। প্রসুন মোটাসোটা, তাই ওর গায়ে ডোরাকাটা জামা। চরকার গায়ে ব্যাগি শার্ট। শ্যাম্পু-করা চুলে নীল রিবন বাঁধা।

বুলবুল সেন ওদের সামনে একটা সাদা বেতের চেয়ারে বসে আছেন। পরনে পিঙ্ক রঙের শাড়ি, পায়ে ম্যাচ-করা চপ্পল। খুব সুন্দর মুখখানা মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত। এমন এক প্রসন্নতা, প্রসাধন যাকে উজ্জ্বলতর করে না।

বিশাল খোলা বারান্দা। একটু দূরে প্রকাণ্ড সবুজ লন। লন ঘিরে বাগান। বাগানে নারকোল গাছ, টগর গাছ, কৃষ্ণচূড়া। নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা ফুটে আছে। হলুদ রঙের বড় বড় গোলাপ ফুটে আছে একদিকে। আকাশ একটু মেঘলা। ঠান্ডা বাতাস বইছে। গাড়ি চড়ে ঢোকার সময় গেটটা বোগেনভেলিয়ায় ঢাকা ছিল বলে ওরা দেখতে পায়নি, এই বাড়ির নাম 'আকুল'।

প্রাথমিক আলাপ পরিচয় শেষ হয়েছে। এখন শ্বেতপাথরের কাপে ওরা গরম চকোলেট খাচ্ছে আর গপ্প করছে।

বুলবুল সেন বলে দিয়েছেন, "আপনারা আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করবেন, কেমন? 'তুমি' আমার খুব মিষ্টি লাগে।"

"আমরা কত ছোট, তুমি যে আমাদের 'আপনি' বলছ? আমরা তোমার পায়ের যুগ্যি নই।"

প্রসূনের এই কথা শুনে বুলবুল সেন চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি তাঁর ফরসা, নীচের দিকটা একটু গোলাপি, পা দুটি পিঙ্ক শাড়ি দিয়ে ঢেকে দিলেন। বললেন, "সে কী! তাতে সম্ভ্রমহানি হয় না? বয়সে আপনারা ছোট বলে আমি কি আপনাদের তুচ্ছ ভাবতে পারি? লোকে ভাবে। লোকে ভুল করে। আমি কাউকে অসম্মান করতে চাই না।"

প্রসূনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল চরকা। ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, "সম্ভ্রম! আমরা কী রকম ব্যবহার পাই, তুমি জানো না। কথায় কথায়, 'এটা কোরো না', 'ওখানে যেয়ো না', 'খবরদার, ফের যদি শুনি এই কথা বলেছ'—এইসব শাসন শুনতে হয়।"

"আর, টিউটর গাঁট্টা মারেন! অঙ্ক ভুল করলেই কানের পাশে চুল ধরে টান দেন।"

"স্কুলের টিচার বলেন, গেট আউট!"

"যাক বাবা, এখন পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে।"

কিছুদিন তো নিশ্চিন্ত। ভাবটা, গুরুজনদের কাছ থেকে নিষ্ঠুর ব্যবহার পেতে পেতে ওরা তাতে

অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ব্যথা পেলে লাগে। অপমান বলে কিছু লাগে না। ছুটির ক'মাস যে শাস্তি থেকেও ছুটি, তাতেই ওরা খুশি।

বুলবুল সেনের চোখে জল এসে যায়। তিনি কিছুক্ষণ হলুদ রঙের গোলাপ গাছগুলির দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। তবু প্রসূনের চোখ এড়ায় না। ও চরকার পায়ে বুট দিয়ে ধাক্কা দেয়। চোখ দিয়ে ইশারা করে। সত্যি, বুলবুল সেনের ঠোঁট কান্নায় ফুলে উঠছে, ওরা দেখল। তিনি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে কান্না চাপছেন।

"তুমি কাঁদছ?" চরকা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল।

"কাঁদব না? যাঁরা বড়, গুরুজন, তাঁরা তাঁদের স্নেহের পাত্র-পাত্রীকে কষ্ট দেন, শুনলে কান্না তো আসবেই।"

"ওঁরা আমাদের ভালও বাসেন।" প্রসূন বলে।

"তাতেই তো বেশি কষ্ট পাই। আপনাদের বয়সটা কী সরল! কত সহজে আপনারা সবকিছু ক্ষমা করতে পারেন! কত অল্পে সন্তুষ্ট হন। জীবনে আনন্দ এত কম কেন, আমি বুঝতে পারি না।"

এমন সময় ভেতরে টেলিফোন বাজে। বুলবুল সেন একটুও বিচলিত হন না। আবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

ভেতর থেকে একজন লোককে এদিকে আসতে দেখা যায়। তার পরনে সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা, মাথায় ধবধবে সাদা চুল। খালি পা।

লোকটি নিঃশব্দে কাছে এসে বলল, "দিদি, তোমার টেলিফোন।"

"কে?"

"চন্ডিকাবাবু।"

"বলে দিন আমি দরকারি কাজে ব্যস্ত আছি, পরে যেন ফোন করেন।"

"বললাম। উনি বলছেন, বোম্বাই থেকে কথা বলছি, এক মিনিটের জন্যে আসতে বলো। খুব দরকার।"

এবার উঠলেন বুলবুল সেন। অনিচ্ছুক পায়ে দুলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে ভেতরে গেলেন।

উনি চলে গেলে পর সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরা লোকটি চরকার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওবা দিদিকে সংবর্ধনা দেবে বলে নেমন্তন্ন করতে চায়। কতদিন থেকে ঝুলোঝুলি করছে। দিদিব গা নেই।"

কী মনে হল, চরকা জিজ্ঞেস করে, "আপনি কি এখানে থাকেন?"

লোকটি বলল, "আমি বনমালী। দিদির সেবায়েত।"

"প্রসূন চুপি চুপি বলে, "সেবায়েত কী রে?"

চরকা অম্লান মুখে উত্তর দেয়, "কাজের লোক। এখানে সবকিছুই অন্য রকম। দেখছিস না? কাজের লোককেও বুলবুল সেন 'আপনি' বলেন।"

বনমালী দাঁড়িয়ে ছিল। একটু পরে নিজে নিজেই বলল, "আপনারা বসুন। আমি যাই। জয়দ্রথ বেরোবে, ওকে খাবার দিয়ে আসি।"

"জয়দ্রথ কে?" প্রসূন জানতে চায়।

"দিদির চিল। ওই নারকোল গাছটার ওপর থাকে। আর-বছর ওব বউ বাজ লেগে মারা গেছে। দিদি ওর দেখাশোনা করে।"

"জয়দ্রথ কি নেমে এসে খাবার খায়? আমার ধারণা..."

বলতে গিয়েও থেমে গেল প্রসূন।

"না, না। আমি কার্নিসে রেখে আসি। ও ছোঁ মেরে নিয়ে নেয়।"

টেলিফোন সেরে খুব দ্রুতপায়ে হেঁটে ওদের কাছে ফিরে এলেন বুলবুল সেন। প্রসূন আর চরকা দু'জনেই লক্ষ করল, তাঁর পরনে আর পিঙ্ক শাড়ি নেই। এবারের শাড়িটা হালকা আকাশি রঙের, নীল। পায়ের কাছে লেসের কাজ-করা, সাদা।

চেয়ারে বসতে-না-বসতে চরকা বলে ফেলল, "তুমি কি রাজি হলে শেষপর্যন্ত?"

"কীসে রাজি?"

"ওই সংবর্ধনা...?"

"কে বলল আপনাদের? বনমালী?"

বুলবুল সেন অপ্রস্তুত বোধ করলেন, মনে হল। "এমন লজ্জায় ফেলেন না এক-এক সময়!"

খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক রইলেন। তারপর বললেন, "রাজি হয়েছি। কী করা! শুধু আমার কথা ভাবলে তো চলে না। আমার জন্যে কেউ কষ্ট পাক আমি চাই না।"

চরকা কিছু একটা বলবার জন্যে উসখুস করছে। কথাটা একবার মনে আসছে, মুখের মধ্যে ঘুরঘুর করছে লজেন্সের মতো, আবার হারিয়ে যাচ্ছে। প্রসূন এমনই অভিভূত এবং মুগ্ধ যে, ওর মুখে কথাই সরছে না। এমন একটা অবস্থা যে ওর মনে হচ্ছে, এক্ষুনি কিছু একটা হবে। ঠিক এমনি সময় খোলা বারান্দার মার্বেল পাথরের ওপর চটপট চটপট শব্দ হতে লাগল। সবাই দেখল, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে।

বৃষ্টি আসে কোত্থেকে! আকাশে তেমন কবে তো মেঘ জমেনি। হঠাৎ বুলবুল সেন যেন ভুলে গেলেন তাঁর ঠান্ডা লাগানো উচিত নয়, তাঁর সঙ্গে আর কেউ আছে। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। ছুটে চলে গেলেন লনের কাছে। বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলেন।

মাথার ওপরে আকাশেব দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওই, ওই। ওই মেঘটা থেকে বৃষ্টি ঝরছে। ভিজবেন তো চলে আসুন, এমন সুযোগ আর পাবেন না।"

কলকাতার রাস্তায় হকাররা এইভাবে খদ্দের ডাকে। চরকা আর প্রসূন দু'জনেরই হাসি পেল। তাবপব ওরা ভাবল, একটুখানি ভিজলে কীই-বা হবে! বকুনি দেবার মতো কেউ তো এখানে নেই।

ওবা দেখল, বুলবুল সেন হাত দু'খানা ছড়িয়ে দিয়ে নাচছেন চিত্রাঙ্গদার মতো। তাঁর খালি দু'খানা হাতে একগোছা চুড়ি নেই, আঙুলে আংটি নেই। তাঁর কানে সোনার দুল নেই। নাকে নাকছাবি নেই। গলায় মুক্তোর হার থাকলে হালকা নীল শাড়ির সঙ্গে আর বড় বড় বৃষ্টিব ফোঁটার সঙ্গে কেমন সুন্দর মানাত, তা-ও নেই। তিনি নাচছেন আর আকাশের দিকে মুখ তুলে, হাঁ করে বৃষ্টির ফোঁটা খাচ্ছেন। তাঁর মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁত থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে।

ওবা আসতে-না-আসতে মেঘটা গেটের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। একটা খণ্ড মাত্র। বৃষ্টি ঝরিয়ে হালকা হয়েছে, আর অমনি দে-দৌড়।

এইবার কথাটা বলল চরকা।

বলল, "তুমি একজন অসাধারণ মানুষ, সত্যি। তোমাকে দেখার আগে আমরা কোনও অসাধারণ মানুষ দেখিনি। বিশ্বাস করো।"

দেখাদেখি প্রসূনও বলে ফেলল, "তুমি কী করে পারো বলো তো। তোমার ভয় করে না?"

"কীসের ভয়?"

"কেন? অসাধারণ হয়ে থাকার ভয়। তুমি কত সুন্দর। তোমাব কত টাকা। পত্রপত্রিকায় প্রায়ই তোমার রঙিন ছবি বেরোয়। তোমাকে নিয়ে কত জল্পনাকল্পনা। অথচ কাউকে তুমি কিছু জানতে দাও না। ওরা ভাবে এক রকম, তুমি অন্য রকম হয়ে যাও। লোকে বিরক্ত হবে না?"

বুলবুল সেন বলেন, "না, না। আমি সুন্দর। আমার টাকা আছে। আমার খ্যাতি আছে। লোকে আমাকে দেখার জন্যে পাগল। আমার মুখ থেকে কথা শোনার জন্যে উদগ্রীব। তাই সবাই আমাকে ভালবাসে। তা ছাড়া..."

"তা ছাড়া, কী?"

"ওই যে আপনারা বললেন, রূপ, টাকা, খ্যাতি, মানুষের প্রশংসা—সব মিলিয়ে এর একটা নাম আছে। সফলতা। সফলতার একটি ছোট ভাই আছে। সে আমার সঙ্গে থাকে।"

"তাই নাকি!" প্রসূন কিছু না বুঝেই কেমন খুশি হয়ে যায়, "তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে?"

"বিয়ে? তা এক রকম হয়েছে বই কী। একসঙ্গে যখন থাকি..."

"আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে না?"

বুলবুল সেন ম্লান হাসলেন। বললেন, "ভারী অদ্ভুত সে। যখন ডাকব, তখন আসবে না। আবার যখন ভাবব, এখন ওকে দরকার নেই, অমনি গা ঘেঁষে দাঁড়াবে।"

চরকা বলে, "তুমি হেঁয়ালি করছ। বলো, তার নাম কী, বলো।"

"তার নাম দুঃখ।" বুলবুল সেন বললেন।

"দুঃখ!"

"হ্যাঁ। আমি বলি, তুমি হলে সফলতার ছোট ভাই। তুমি গরিব, দাদার সঙ্গে তোমার কোনও মিল নেই। ও বলে, যা সুন্দর, তাই-ই শুভ নয়। ও বলে, তুমি কি জানো বুলবুল, কোটি কোটি বছর আগে, যখন পৃথিবীতে মানুষ জন্মায়নি, প্রকাণ্ড সব গিরগিটির দল জলে-স্থলে ঘুরে বেড়াত, সেই সময় হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফুটে উঠেছিল। কত রকম তাদের রং, কী তাদের শোভা। কী মধুর সেই ফুলের গন্ধ। গিরগিটির দল লোভে পড়ে সেইসব ফুল গব গব করে খেতে শুরু করে দিল। আর যায় কোথায়। ফুলের মধ্যে ছিল বিষ। ওরা মরে লোপাট হয়ে গেল একেবারে।"

বুলবুল সেন বললেন, "এইসব গল্প বলে ও আমাকে খ্যাপায়।"

চরকার মন খারাপ হয়ে যায়। ওর মনে হয়, ফুলের মধ্যে বিষ থাকা উচিত না। সুন্দরেব কাছে দুঃখ কেন থাকবে।

প্রসূন বলে, "আমি দুঃখ পাইনি কখনও। ওই যে বলছিলাম না, মা-বাবা বকে কথায় কথায়, টিউটর শাস্তি দেন, ক্লাসটিচার বার করে দেন পড়া না পারলে, ও-সব বোধহয় আমাদেব ভালর জন্যে করেন। তাই রাগ হয়। কিন্তু দুঃখ হয় না।"

"ওকে কোনওদিন কাছে আসতে দেবেন না।"

বুলবুল সেন বললেন, "উপায় থাকলে আমি কখনও ডাকতাম না ওকে। কিন্তু এখন আর উপায় নেই।"

চরকা চুপ করে ছিল এতক্ষণ। এবার বলল, "বুঝেছি।"

এমন সময় টগর গাছ থেকে টুপ করে লাফিয়ে পড়ল একটা সাদা রঙের কাকাতুয়া। বেশ বড়সড় পাখিটা। হলুদ রঙের ঠোঁট। লাফাতে লাফাতে কাকাতুয়াটা ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপব ঠোঁট ফাঁক করে ডাকতে থাকে, "এই, তোমরা কখন যাবে, কখন যাবে, অ্যাঁ?" একেবারে মানুষের কথাব মতো স্পষ্ট।

বুলবুল সেন বকে উঠলেন, "বলাই! আবার অসভ্যতা করছ!"

এই প্রথম চরকা আর প্রসূন বুলবুল সেনকে রাগতে দেখল। এই প্রথম শুনল, তিনি কাউকে 'তুমি' বলে ডাকছেন।

প্রসূন দেখল, কাকাতুয়াটা ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা না উঠলে নড়বে না। ওর সন্দেহ হয়, দুঃখ বোধহয় কাকাতুয়ার মতো দেখতে।

১৯৮৯

মাধুর্য

হাঁদু রায় স্মৃতি টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলায় আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রাক্তন ফুটবলার হিসেবে নয়, আমার নিমন্ত্রণ ছিল হাঁদু রায়ের বন্ধু হিসেবে। ওর বউ ঝুমা—ডাক্তার ঝুমা রায়, আমায় ফোন করেছিল। বলেছিল, দাদা, ওর নামে টুর্নামেন্ট, ফাইনালের দিন অন্তত আসতেই হবে। না, আপনাকে কোনও ভাষণ দিতে হবে না। তার জন্যে ক্রীড়ামন্ত্রী আছেন।

সাত বছর আগে মারা গেছে হাঁদু। পঞ্চাশও পার হয়নি। হঠাৎ ব্লাড সুগার ধরা পড়ে। সত্তর থেকে একশো দশ যেখানে নর্মাল, সেখানে পোস্ট প্র্যানডিয়াল টেস্টে রিডিং উঠল দুশো কুড়ি। অসুখটা অন্তত দু'বছর আগে শরীরে ঢুকেছে। গ্রাহ্য করেনি কেউ। ভেতরে ভেতরে বেড়েছে। ভাগ্যিস আম কাটতে গিয়ে আঙুল কাটে, আর সেই আঙুলের ঘা শুকোবার বদলে পেকে ওঠে। ঝুমা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে

যাচ্ছে, যেমন সব ডাক্তারই দেয় আজকাল, তবু পুঁজ পড়া বন্ধ হচ্ছে না। কেন, কেন, ভাবতে গিয়ে একদিন গাড়ির ভেতর থেকে চোখে পড়ল কে. সি. দাসের সাইনবোর্ড। তখন ওর খেয়াল হল, একবার রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিলে হয়। করতে গিয়ে ধরা পড়ল, দুশো কুড়ি।

অসুখ ধরা পড়লে সব ডাক্তারই তখন লক্ষণ মেলাতে শুরু করে দেয়। হাঁদুর বেলাতেও তাই হয়েছিল। ওর বউ ঝুমা এতদিন লক্ষ করেনি, এবার মনে করতে পারছে তাই তো, মন্টির বাবা বার বার বাথরুমে যায়, বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ে। এক বছরে দু'-দু'বার চশমার পাওয়ার পালটিয়েছে। তুমি নিজে ডাক্তার, পেশেন্ট তোমার এত কাছের মানুষ, হরদম দেখছ ওকে, আগে বোঝোনি কেন? এ প্রশ্ন কে করবে? করলেও ও বলত, যা একগুঁয়ে মানুষ, কারুর কথা শুনবে না, হাউ হাউ করে মিষ্টি গিলবে, তো আমি কী করব? ভেতরের কথা সবাই তো জানে না।

অবশ্য সবাই জানে, হাউ হাউ করে মিষ্টি গিললে কারুর ডায়বিটিস হয় না, ডায়বিটিস হলে মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাকস্থলির নীচে একটা ছোট্ট যন্ত্র থাকে, অগ্ন্যাশয় না কী যেন বলে বাংলায়, যার কাজ খাদ্য হজম করানো আর চিনি ছাঁকার ইনসুলিন তৈরি করা। সে যদি ঠিকমতো কাজ না করে, তবে শরীরের চিনি রক্তে ঢুকে যায়, মানুষের স্বাভাবিক সক্রিয়তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাঁদু রায় একটু মোটাসোটা ছিল ঠিকই, স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি খেত, লোভ থেকে নয়, তাতে অগ্ন্যাশয় বিগড়োবে কেন। চাপ ছিল, ওর মনের ওপর সূক্ষ্ম কোনও চাপ ছিল বলে আমার ধারণা। যা প্রকাশিত হতে না পেরে শরীরকে কুরে খেয়েছে। তারপর চিকিৎসা যা হবার হল। বাইবের শরীরের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা হল হাঁদুর। ভেতরের শরীরের শুশ্রূষা হল না।

এসব সাত বছর আগেকার কথা। এখন আর কারুর তেমন মনে নেই। মনে থাকলেও কেউ তা প্রকাশ করছে না। বাইরের সত্য, যা সবাই জানে, যা সবাই দেখেছে, তার ওপর প্রয়াত স্বামীকে দাঁড় করিয়ে ঝুমা ওকে এক ধরনের অমরত্ব দিতে পারল।

হাঁদু রায় মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা আমি দেখেছি। বকুলতলা প্রতিভা শিল্ড পেল না। শিল্ড নিয়ে গেল মাদ্রাজের সুন্দরম স্পোর্টিস। এক বছর ওদের কাছে থাকবে। পরের বছর যেমন করে হোক হাঁদু রায় নামাঙ্কিত ওই ঢাল আমরা ফিরিয়ে আনব—বকুলতলা প্রতিভার বর্তমান কোচ সর্বজনসমক্ষে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কালো হাফপ্যান্ট আর লাল-সাদা জার্সি-পরা এগারোজন খেলোয়াড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা ভাল খেলেছ, আরও ভাল খেলতে হবে। প্রতিপক্ষের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে নিয়ে স্কোর করতে হবে। যেভাবে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী পরম প্রিয় হাঁদুদা স্কোর করতেন। সে দৃষ্টান্ত আজ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে আছে। ক্রীড়ামন্ত্রী তাঁর ভাষণে বিজয়ী টিমকে সংবর্ধনা জানালেন। বললেন, জেতাটা বড় কথা নয়, আসল হল পার্টিসিপেশন, খেলার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতির প্রকাশ। প্রয়াত হাঁদু রায় প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল সুদীর্ঘ। মন্ত্রীর হাতে একখানা লিখিত ভাষণ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাই দেখে কিছুটা বললেন। তারপর জোশ এসে যাওয়ায় কাগজটা সরিয়ে রাখলেন। হাঁদু রায় ছিলেন ফুটবলে নিবেদিত প্রাণ আর অনমনীয় দৃঢ়চেতা পুরুষ। শত প্রলোভন তাঁকে তাঁর ব্রত থেকে একচুল টলাতে পারেনি। আজকের দিনে এই গুণ দুর্লভ।

ঝুমা বসেছিল মন্ত্রীর পাশেই। সে 'দৃঢ়চেতা' কথাটার ওপর জোর দিতে বলছিল। কিন্তু মন্ত্রী ততক্ষণ রাজ্য সরকারের অতুলনীয় অবদান প্রসঙ্গে সরে গেছেন, আর ফিরে এলেন না। সবাইকে স্বীকার করতে হল, যে রাজ্য সরকার এগিয়ে না এলে, রাজ্য সরকার উৎসাহের হাত না বাড়ালে, প্রয়াত হাঁদু রায়ের স্মৃতিতে এই টুর্নামেন্ট খেলানো যেত না।

বৃষ্টি পড়েনি। তবে আকাশে মেঘ ছিল। বিকেল গড়িয়ে যেতে আমরা পুব-আকাশে বিশাল রামধনু দেখলাম। আর সেই রামধনুর অস্পষ্ট আলোয় শূন্য মাঠের দিকে তাকিয়ে আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম, রোগা চেহারার একা হাঁদু—একলা হাঁদুই সারা মাঠময় ছুটে বেড়াচ্ছে পাগলের মতো। বুট দিয়ে ঘাস সরিয়ে সরিয়ে কী যেন খুঁজছে। মাঠ-ভরতি দর্শক আনন্দে আত্মহারা। গোল হয়েছে, গোল হয়েছে। চলে এসো হাঁদুদা। আমরা তোমায় কোলে তুলে নিয়ে নৃত্য করব। মাঠে আর এখন কোনও কাজ নেই।

কোনও কথাই হাঁদুর কানে যায়নি সেদিন। সে কেবল চৌকো সবুজ প্রান্তরের ওপর একটা পোকার মতো পিলপিল করে দৌড়ে বেড়িয়েছে। মুখে একটাই কথা: আমার জিব, আমার জিব।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, যার জিব নেই, সে কথা বলে কী করে? আমার উত্তর: সে বলতে পারে

কথা। কিছুক্ষণ সে পারেই। পুরনো অভ্যেস থেকে এটা সম্ভব। রিপ্লের অবিশ্বাস্য ঘটনার ওপর বইটায় আমরা পড়েছি, ছবিতেও দেখেছি, একটা মোরগের গলা কেটে দেওয়ার পর সেটা লাফিয়ে টিনের চালায় উঠে বসেছে। মাথাহীন গলাটা নড়তে নড়তে একটু পরে কাত হয়ে গেছে। তেমনই হাঁদু রায়কে ধরে ফেলার পর ও অজ্ঞান হয়ে যায়। নিজের রক্তের স্বাদ অবধি ও টের পায়নি। যখন দেখল, ওর লাল-সাদা জার্সি প্রায় সবটাই লাল হয়ে গেছে, তখনই আঁতকে উঠেছে ভয়ে।

ও ছিল বকুলতলা প্রতিভার এক নম্বর প্লেয়ার। সেটাও ছিল এক টুর্নামেন্ট খেলার ফাইনাল। প্রতিপক্ষ দিল্লির জেসিটি স্পোর্টস ক্লাব। ওদের দলে পাঁচজন সর্দারজি। ইয়া তাগড়া চেহারা। বুটের ঠোক্করে প্রতিভার বাঙালির প্লেয়াররা ছিটকে ছিটকে পড়ছে। তার মধ্যে হাঁদুই দুটো গোল করে। একটা কর্নার কিক। অন্যটা পেনাল্টি শট। জেসিটি দুটো গোলই শোধ করে দেয় হাফ টাইমের পর। টু-টু ড্র চলল অনেকক্ষণ। ফাইনাল হুইস্‌ল পড়ার ঠিক তিন মিনিট আগে প্রতিভার গোলকিপার একটা দারুণ গোল বাঁচায় ঝাঁপ দিয়ে। তারপর সে একখানা বিপুল হাই কিক ছুড়ে দেয় প্রতিহিংসাবশত। সেই বল হাঁদু হেড করল। এমন অ্যাঙ্গেলে হেড করল যে বার ঘেঁষে বল গেল ঢুকে। জেসিটির গোলকিপার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, বলটা ঘাসের ওপর দিয়ে না, মলমের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, কিছু করতে পারল না।

উত্তেজিত হলে হাঁদুর জিব বেরিয়ে আসত। স্কুলে মাস্টারমশাইরা বলতেন হাঁদারাম। তাই থেকে হাঁদু রায়। ওব ভাল নাম যে স্বপনকুমার রায়, তা লোকে ভুলে গেছে। একবার যশ ছড়িয়ে পড়লে কেউ আব নামের মানে খোঁজে না।

সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রেচারে শুইয়ে ওকে নিয়ে যাওয়া হয় মাঠের বাইরে। ক্লাবের ছেলেরা একদল রইল জয়োল্লাস করতে, আর একটা ছোট দল ওর সঙ্গে গেল। সেই দলে ছিল ঝুমা, ওর ফ্যান। তখন ডাক্তারি পড়ছে। ঝুমাই বলেছিল, আমার মাস্টারমশাই মুরলি মিত্র, এই সময় রাউন্ডে আসবেন, চলো কেভিকিয়োর নার্সিং হোমে। উনি সব রকম কাটা-ছেঁড়া জোড়া দিতে পারেন। কত ফিল্‌ম অ্যাকট্রেস ওঁর পেশেন্ট।

ক্লাবের সেক্রেটারি বলেছিল, যত টাকা লাগে লাগুক, হাঁদু রায়কে ভাল করে দিতে হবে।

মুরলি মিত্র জিভ দেখেই বললেন, ওঃ আধখানা গেছে। কাটা জিবটা কই?

মাঠে। পড়ে গেছে। দাঁতের নীচে ছিল তো। হেড পড়ল।

হাঁদুদা নিজেই তো অনেক খুঁজল। কোথাও পেল না। অত ঘাসের মধ্যে কোথায় এক টুকরো জিব। হারিয়ে গেছে।

আমাকে এখন কী করতে বলো তোমরা? আমি জিব জুড়ে দিতে পারি। জিব তৈরি করতে পারি না। তোমরা কেউ জিব ডোনেট করবে? রেগেমেগে ডাক্তার মিত্র বলেছিলেন।

প্রকৃতি মানুষকে প্রায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুটো করে দেন। দুটো চোখ, দুটো কান, দুটো করে হাত-পা। একটা স্ট্যান্ড বাই। একটা বিকল হলে, অন্যটা দিয়ে কাজ চলে। কত লোকের এক চোখ কানা, এক পা খোঁড়া। একটা কানে শুনতে পায় না, অন্য কান দিয়ে শোনে। কিন্তু জিব সে একটাই। সেটা চলে গেলে আর কিছুই থাকে না।

ঝুমা বুদ্ধি করে জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার, নখের মতন চুলের মতন জিব কি বাড়ে না? টিকটিকির ল্যাজ খসে গেলে তো আবার গজায়। ছোটবেলায় দাঁত পড়লে আবার দাঁত ওঠে তো।

ডাক্তার বললেন, এই মেয়েকে দিয়ে ডাক্তারি হবে না। এসো, জিবের চ্যাপ্টার তোমায় পড়িয়ে দিই। একটা কেস যখন পাওয়া গেছে—

এরপর হাঁদুকে অজ্ঞান করে রেখে, সাঁড়াশি দিয়ে তার দাঁতের দু'পাটি ফাঁক করে দিয়েছিলেন প্রফেসর মিত্র। দুঁদে সার্জন তিনি, জিবের ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি, ইতিহাস-ভূগোল বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সরল ভাষায়।

এই হল জিব—শিরদাঁড়াযুক্ত প্রাণীকে এই জিনিসটা প্রকৃতি দিয়েছে। মুখের নিচুতলায় এটা একটা জ্যান্ত পেশি। এক-এক প্রাণী এই জিব দিয়ে এক-এক রকম কাজ করে। যেমন ব্যাং—জিব বার করে পোকা ধরে। সাপ—জিব বার করে আশপাশ বুঝে নেয়। বেড়াল, কুকুর, গরু, গা-সাফাই করে জিব দিয়ে। ওদের জিব লম্বায় অনেক বড়। জিবের ওপর দিকটা খসখসে ছাল দিয়ে মোড়া। ওই ছালের মধ্যে

গাঁথা থাকে যাকে বলে, টেইস্ট-বাড। জিবের নীচের দিক মসৃণ, ওখানে আছে লালা নিঃসরণের গ্রন্থি। খাবার চিবোলে ওখান দিয়ে লালা বেরোয়, খাবার নরম হয়, গিলতে সুবিধে হয়। আবার হজমের জন্যেও লালা দরকার।

এই দেখো, সামনের সরু অংশ, জিবের ডগা, পেশেন্টের যেটা খসে গেছে, ওখানে ছিল মিষ্টি আর নোনতা স্বাদ বুঝবার জায়গা। পেছন দিকে, জিবের গোড়ায় আছে তেতো স্বাদের বোধ। টক বা কষা বুঝতে জিবের দুটো পাশ আর গোড়ার ওপর দিক কাজে লাগে। বনমানুষ থেকে প্রায়-মানুষ যেই উঠে দাঁড়াল দু'পায়ে, সামনের দুটো পা হাত হয়ে কাজ করতে শিখল, অমনি প্রকৃতি তার কিছু কিছু অঙ্গ ছেঁটে দিল বলা যায়। যেমন মানুষের ন্যাজ গেছে খসে, জিব গেছে ছোট হয়ে। নখ আর তেমন বাড়ে না। দাঁতও খুব ধারালো নয়, যেমনটা বাঘের, কুকুরের। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে জিবের সাহায্যে কথা কয়, অর্থাৎ নানা রকম সুর তৈরি করতে পারে। অন্য প্রাণী কেবল স্বরযন্ত্র ব্যবহার করে ডাকতে জানে। এই পেশেন্ট আর কথা কইতে পারবে না।

সে কী স্যার, হাঁদুদা আর কথা কইতে পারবে না?

বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল ওর ক্লাবের এক শিষ্য। তার নাম ছোট ভাস্কর। সে হাঁদুর আন্ডারে গোলে বল ধরা প্র্যাকটিস করছে। বল ফসকালেই হাঁদু ওকে গালাগাল দেয়—শুয়োর, ক্যাবলাকান্ত, চামচিকে, শুঁয়োপোকা! বলে কখনও কখনও লাথি মারে। কথা বলতে না পারলে কী করে ট্রেনিং দেবে হাঁদুদা।

যাও, টাটকা একটা জিব নিয়ে এসো। আমি মেরামত করে দিচ্ছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলে কোনও সুরাহা হবে?

মুরলি মিত্র ঝুমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার বাড়ির কাছে একটা খাটাল আছে না?

দুই

হাঁদু রায়ের ভাগ্য আর মুরলি মিত্রের হাতযশ—এই দুয়ের জোরে আবার ঠিক হয়ে গেল সব। মানে, কাটা জিব জোড়া লাগল। ছোট ভাস্কর উদ্যোগী ছেলে, কোথা থেকে জোগাড় করে এনেছিল টাটকা জিবের টুকরো। সেটাই সেলাই করে দিতে কাজ হয়। ভয় ছিল হাঁদু রায়ের বডি রিজেক্ট না করে। করেনি। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল জোড়া দাগ। হাঁদু রায় আবার আগের মতো নেমে পড়ল মাঠে।

ছ'টা মাস একনাগাড়ে সেবা করেছে ঝুমা। হাঁদু রায় ওর হিরো। তার জন্যে জীবন বিসর্জন দিতেও ও কুণ্ঠিত ছিল না। শেষপর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়নি। তার বদলে হাঁদুকে ও বিয়ে করে ফেলল। বকুলতলা প্রতিভার দেওয়া ফ্ল্যাট বাড়িতে সংসার পাতল ওরা। সেখানেই মন্টির জন্ম হয়।

প্রথমে বুঝতে পারা যায়নি, ক্রমশ আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয় যে, হাঁদু তার নোনতা স্বাদ নেবার ক্ষমতা হারিয়েছে। তেতো, টক, কষা স্বাদ বেশ বুঝতে পারছে ও, ঝাল স্বাদও উপভোগ করতে অসুবিধে হচ্ছে না, বেশ তারিয়ে তারিয়ে আচার খায়। গন্ধরাজ লেবুর রস দিয়ে শরবত খায় খেলার শেষে, কিন্তু শরবতের মিষ্টি স্বাদ বুঝতে পারে না, আচারের নুন লাগে না জিভে।

একদিন ছোট ভাস্করের পেছনে লাথি মেরে ও জিজ্ঞেস করল, কার জিব এনেছিলি?

প্রথমে বলতে চায়নি, পাছে হাঁদুদা ক্ষুণ্ণ হয়, পরে টি-শার্টের কলারে প্রবল ঝাঁকুনি লাগায় বলে ফেলল, ছাগলের। কালীঘাট থেকে নিয়ে এসেছিলাম। কিছুতেই দেবে না। বলে কী, খুঁতে পাঁঠা মাকে বলি দেওয়া যায় না। পঁচিশ টাকা ঘুষ দিলাম, তখন জ্যান্ত পাঁঠার মুখে হাত ঢুকিয়ে খাঁড়া দিয়ে কুচ করে কেটে দিল। মানুষের জিব কোথায় পাব? কে দেবে? সবাই যে স্বার্থপর হাঁদুদা।

ছাগলের জিব পরে থাকার গ্লানি তখন থেকে হাঁদুকে পেয়ে বসে। ছাগলে সবকিছু খায়, গোগ্রাসে গেলে—না গোগ্রাস তো গোরুর মতো খাওয়া—ছাগল খায় মুচমুচ করে। সাহেবদের মতো। ঘাস খায়, বটের পাতা খায়, সেলুন থেকে ফেলে দেওয়া চুল অবধি খেতে দেখেছে চাঁদু। মুখের ছালটুকু ফাঁক করে আস্তে আস্তে চিবোয়। ছাগলের তো ঠোঁট নেই। ছাগল চুমো খেতে পারে না। ছাগলের খিদে আছে কিন্তু জিবে কোনও স্বাদ নেই।

জিবের ডগায় ওর মিষ্টি স্বাদ নেই, নোনতা স্বাদ নেই, একদিক থেকে ভাল, এ আর এমন কী অসুবিধে। কত অভাবগ্রস্ত লোক ফ্যানভাত, শাকসেদ্ধ-ভাত খেয়ে বেঁচে আছে এদেশে, মুখের সুখ

করার অবস্থা ক'জনের? ঝুমা বলে, আমার কত পেশেন্ট লাখপতি, কোটিপতি, ফ্ল্যাটবাড়ির প্রোমোটার, হাইপারটেনশনে ভুগছে, চিনি খাওয়া মানা, নুন খাওয়া বারণ, তারা কি বেঁচে নেই? তাদের শরীর থেকে মায়া-মমতা কি চলে গেছে? তাদের জীবন কি ব্যর্থ?

আলুনো, ভ্যাদভেদে। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, তারা কেউ বউয়ের সঙ্গে শোয় না।. বাচ্চাকে কোলে নেয় না। খোঁজ নিয়ে দেখো। নুনই হল জীবনের স্বাদ। রক্তে নুন, ঘামে নুন, চোখের জল নোনতা। আর মিষ্টি হল জীবনের সার্থকতা। ওদের সঙ্গে আমার তুলনা কোরো না। আমি রাজভোগ খাই, রাবড়ি খাই, সব সাবুর মতো লাগে। হিঙের কচুরির কী সুন্দর গন্ধ, জিবে জল আসে, চিবিয়ে খেতে বটপাতার মতো। আমার মুখে ছাগলের জিব।

সবাই জানে, খেলোয়াড়ের জীবন স্বল্পস্থায়ী। এক সময়ে হাঁদু রায়কেও মাঠ ছেড়ে আসতে হয়েছে। বকুলতলা প্রতিভার এক নম্বর প্লেয়ার জীবনের মাধুর্যবোধ হারিয়ে ফেলার ফলে দ্রুত কর্মক্ষমতাও হারায়। জীবন বিস্বাদ লাগে ওর। মাঠের মধ্যে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপায়। চোখের সামনে প্রতিপক্ষের প্লেয়ার পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে গেলেও ও রুখে ওঠে না। একসময় ক্লাবের সেক্রেটারি ওকে ডেকে বললেন, হাঁদু, হঠাৎ তোমার খেলা এমন পড়ে গেল কী করে?

হাঁদু বলে, কী জানি, বুঝতে পারি না।

এক কাজ করো। এখন থেকে তুমি বকুলতলা প্রতিভার কোচ হয়ে যাও, বুঝলে, খেলতে না পাবলেও খেলা শেখাতে পারবে। টিমের স্বার্থে তোমার আপত্তি করা উচিত নয়।

হাঁদু বুঝল, এটা ওকে ধরে রাখার ফন্দি। যাতে অন্য কোনও টিম ওকে নিয়ে না যায়। তবু ওর মনে আশা ছিল, কলকাতার কোনও দল থেকে ওর সঙ্গে চুক্তি সই করাতে আসবে কেউ। তখন ওদেব ফিরিয়ে দেবে হাঁদু। পুরনো ক্লাবের প্রতি আনুগত্য ও হারায়নি, তার প্রমাণ দেবে। কেউ এল না। সুতরাং মন দিয়ে ও প্লেয়ারদের ট্রেনিং দিতে লাগল। টাকাপয়সার দিক থেকে তেমন লোকসান হয়নি কিন্তু ইজ্জতটা গেল। খবরের কাগজের পাতায় আর ওর ছবি বেরোয় না।

ছোট ভাস্কর বলে, হাঁদুদা, আমায় তুমি ক্যাপ্টেন করে দাও। আমি তোমার হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনব। ক্লাবকে আবার এক নম্বর জায়গায় তুলব, কথা দিচ্ছি।

এদিকে মন্টির বয়স বারো বছর পূর্ণ হয়েছে। মায়ের সঙ্গে স্কুলে যায়। নিজে নিজে ফেরে। হাসপাতাল থেকে ফিরতে ফিরতে এক-একদিন রাত হয়ে যায় ঝুমার। বাড়ি ফিরে দেখে, টিউটরেব কাছে পড়া করছে মেয়েটা। পাশের ঘরে বিছানার ওপর বসে একা একা পেশেন্স খেলছে হাঁদু। নয়তো কিছু একটা খাচ্ছে। হালুয়া, নয়তো ডিমের বড়া।

একদিন মন্টি মা'র কাছে নালিশ করল। বাবা ওকে আদর করতে করতে গাল চেটে দিয়েছে। তারপর ভয় পেয়ে বলেছে, মাকে যেন বলিস না।

সাংঘাতিক কথা। এই লোককে নিয়ে সংসার করা রিস্কি। কোনদিন একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবে। কোনও বিশ্বাস নেই। ঝুমা তার স্বামীর সমস্ত রকম উপদ্রব মুখ বুজে সহ্য করে, কিন্তু এরও একটা সীমা আছে তো।

দিনকয়েক চুপচাপ থেকে দেখল ঝুমা। হাঁদু নিজে থেকে কিছু বলে কিনা।

বলছে না যখন, ও নিজেই কথাটা পাড়ল।

তোমার কী হয়েছে বলো তো?

কী আবার হবে?

আমাকে তুমি এক রাত্তিরও রেহাই দাও না। আমি চুপ করে সহ্য করি। যেদিন সহ্য করতে পারি না, তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাই। তবু তুমি রেহাই দাও না। বলো, ওটা আমার ডিউটি। বলো স্বামীর বিরুদ্ধে রেপ চার্জ হয় না। আমি তা-ও কিছু বলি না তোমাকে। ভাবি, তোমার জিবে তো স্বাদ নেই। কিন্তু তুমি যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাঁদু বলে, নুন খুঁজছিলাম।

নুন খুঁজছিলে? নিজের মেয়ের গালে নুন খুঁজছিলে?

বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলে ঝুমা। এবার তুমি নিজে পাগল হয়ে যাবে, আমাদেরও পাগল করে ছাড়বে। আমি মন্টিকে হস্টেলে দেব।

তা আর করতে হয়নি। হাঁদু নিজেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। সংসারে ওকে আঁটেনি। ওর পক্ষে আসল জায়গা হল খেলার মাঠ। মাঠের পাশে টেন্ট। শেষ জীবনে ও টেন্টেই পড়ে থাকত।

ততদিনে ছোট ভাস্কর খেলা থেকে অবসর নিয়ে কোচ হয়েচে। হাঁদুর একান্ত ভক্ত সে। মাঠ থেকে গলদঘর্ম হয়ে ফিরে দেখত হাঁদুদা টুল বক্সের ওপর কাত হয়ে শোয়া। বলত, হাঁদুদা, বাড়ি যাও। কতদিন আর এভাবে দিন কাটাবে?

যাব, যাব। ওরা তো প্রায়ই খবর পাঠায়, আমি যাই না। খেলা ছেড়ে কোথায় যাব বল! হাঁদু বলত।

এক-একদিন চলে আসত না যে, তা নয়। সন্ধেবেলা হাসপাতাল থেকে ফিরে ঝুমা দেখত, বাইরের ঘরে সোফায় শুয়ে আছে ও। গায়ে শতচ্ছিন্ন জামা। মুখে একগাল দাড়ি। উসকোখুসকো চুল।

মন্টির পড়ার ঘরে ওর বিছানা করে দিত ঝুমা। জোড়া খাটে এখন মা-মেয়ে শোয় পাশের বড় ঘরটায়। ওই দু'-একটা দিন মন্টি শোবার ঘরেই পড়াশোনা করত। এখন ও অনেক বড় হয়ে গেছে। বাবাকে আর আগের মতো ঘেন্না করে না।

মন্টিই বাজার করে আনত। বাবার কথা ভেবে মাছ, তরকারি, মিষ্টি। পানের দোকান থেকে লেবুর আচার। আটত্রিশ মাপের জামা। সাত নম্বরের চপ্পল। ক'দিন পেট ভরে খেয়ে, চুল-দাড়ি সাফ করে, জামাই সেজে হাঁদু আবার ফিরে যেত নিজের ক্লাবে। ঝুমা বলত, সাবধানে থাকবে। ঠান্ডা লাগিয়ো না।

একদিন বাড়িতে আম কাটতে গিয়ে হাঁদুর আঙুল কেটে যায়। ঝুমা দেখে, ও আঙুলটা মুখে পুরে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছে।

রক্ত দেখে ঝুমা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ছুটে গিয়ে হাঁদুর হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নেয়।

তুমি কেন রান্নাঘরে ঢুকেছ, অ্যাঁ? ঝুমা চেঁচিয়ে ওঠে।

আম।

বললে না কেন, আমি কেটে দিতাম।

হাঁদু হতভম্ব হয়ে বলে, রক্ত। মুখে দিলাম, কোনও স্বাদ নেই। ভাতও যা, আমও তাই, রক্তও তাই। আমার বেঁচে থাকার কোনও মানে হয়?

সেই ঘা যখন বিষিয়ে উঠল, তখন ধরা পড়ে, ওর রক্তে চিনি গেছে বেড়ে। আর তাই ওর যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়া। তাই ওর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। জীবন থেকে মাধুর্য চলে গেলে যা-যা হওয়া স্বাভাবিক।

মোটাসোটা চেহাবা ছিল হাঁদুর। পঞ্চাশ বছরও বয়স হয়নি, চুল পেকে গেল ওর। আস্তে আস্তে রোগা হয়ে গেল। কেননা, ততদিনে ওর খাওয়াদাওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ বসেছে। ইচ্ছে করলেও আর মিষ্টি খেতে দেওয়া হয় না ওকে। জিভে স্বাদ না থাক, ভেতরে গিয়ে তো ক্ষতি করবে। রক্তের চাপ বেড়েছিল বলে নুনও প্রায় বন্ধ। হাঁদু রায় হাসতে হাসতে সেদ্ধভাত খেত। ঠোঁট চাটত দেখিয়ে দেখিয়ে। আসলে খাবারের স্বাদ না, মানুষের কাছে আদরযত্ন পাচ্ছে, তার জন্যেই অহংকার! বাইরের চিনি, ভেতরের চিনি, দুটোই বাড়তে বাড়তে তখন একাকার।

জীবনে যতই কষ্ট পেয়ে থাকুক, মারা যাবার আগে হাঁদু রায় জেনে গেছে, ঝুমা ওকে ভালবাসে, মন্টি ওকে ঘেন্না করে না। বকুলতলা প্রতিভার রেখে-যাওয়া ওর খেলার রেকর্ড ওকে অমরত্ব দেবে।

হোক সাত বছর দেরি। হাঁদু রায় স্মৃতি টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলা তো আমি দেখে এলাম। ওই শিল্ড থাকবে। ওর জিবের খবর ভুলে যাবে লোকে। তাই তো দুনিয়ার নিয়ম।

১৯৮৬

কখন যে ঠাকমার ঘুম ভাঙে, টের পায় না কলি। পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা, তখন ওর মাঝরাত্তির।

খুট করে সুইচ টিপে আলো জ্বালবে ঠাকমা। কলির পড়ার টেবিলে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবে কিছুক্ষণ। ঢক ঢক করে এক ঘটি জল খাবে, তারপর বাথরুমে যাবে। স্নান করবে ঠান্ডা জলে—শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা নির্বিশেষে এর কোনও ব্যত্যয় হয় না। সর্দি কাশিও হয় না ঠাকমার।

নিজের একটা আলমারি আছে। ছোট। তার মধ্যে ঠাকমার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি। জামাকাপড়, ছুঁচসুতো, কাঁচি, ওষুধের বাকস, খল-নুড়ি। একটা ছবির অ্যালবাম, একটা পুরনো চিঠির তাড়া আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় যা, সেটা হল সেই সবুজ রঙের থলিয়া—দড়ি টানলেই মুখটা কুঁচকে যায়—যার মধ্যে আছে ঠাকমার তহবিল। এইসব কলি বাইরে থেকে, দূর থেকে, দেখেছে। তহবিলে কী আছে, কত আছে ও জানে না। এইটুকু জানে, পেনসনের টাকা ঠাকমা ওই থলিয়ার মধ্যে রাখে আর ওরই মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টাকা খরচও করে।

ছোটবেলায় কলি বলত, তুমি স্বর্গে যাবার আগে তহবিলটা আমায় দিয়ে যাবে কিন্তু।

এখন মনে করলে লজ্জা পায়। ক্লাস নাইনে উঠল, বড় হয়ে ও বুঝতে পেরেছে, তহবিলের চেয়ে ঠাকমাব দাম অনেক বেশি। স্বর্গে যাবে কী, পিসির বাড়িতেই যেতে দেয় না কলি, ঠাকমাকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

ওই সাতসকালে কম্বলের আসন পেতে ঝাড়া এক ঘণ্টা পুজো করে ঠাকমা। পুজো করে মানে, দেয়ালের দিকে মুখ করে চোখ বুজে বসে থাকে, বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্রতন্ত্র পড়ে। সামনে কোনও গুরুঠাকুর বা দেবদেবীর ছবি কি মূর্তি কিছুই নেই।

বাইরের দরজায় ঠকাস করে শব্দ হবে সাতটা নাগাদ, খবরের কাগজ পড়াব শব্দ। তারপব ও-ঘরে মা-বাবা জাগবে, এই রকম নিয়ম।

মা-বাবা বিস্কিট দিয়ে চা খায়। ঠাকমা খায় মুড়ি দিয়ে। দুধ খাওয়ার কথা কলির, কিন্তু দুধের গন্ধে ওব বমি আসে, সর ছেঁকে দিলেও বমি আসে, তাই প্রথম প্রথম কলিও চা খেত।

ঠাকমা বলল, না, চায়ে আছে কী? কচি মেয়েটা এখন থেকে চায়ের নেশা করবে না।

কত রকম পুষ্টিকর পানীয় পাওয়া যায়। এক-এক করে সবগুলি এনে চেষ্টা করা হল, কিন্তু চলল না। সবগুলিতেই কেমন অসুখ অসুখ গন্ধ। হাসপাতালের সাদা সাদা স্বাদ।

ঠাকমা জানে, কলি হল চকোলেটের যম।

বলল, এক কাপ করে গরম জল দিয়ে চকোলেট খাক। সকালবেলা ফুর্তি পাবে। টিনে করে গুঁড়ো চকোলেট বিক্রি হয়, আমি দেখে এসেছি।

মা তো বেঁকে বসেছিল শুনে।

বলেছিল, আপনি আর ওর মাথাটা খাবেন না। এইটুকু টিনের কত দাম!

ভেবেছিল, এতেই দমে যাবে ঠাকমা।

তোমরা যদি না পারো, ঠাকমা বলেছিল, আমি কিনে দেব।

বড় বড় স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ক্লাস টেনের ফার্স্ট বয়, সবাই বলে, বেশি রাত জেগে পড়া উচিত না। তাতে সুফল কম, ক্লান্তি বেশি। তার চেয়ে, ভোরে উঠে পড়াশোনা করলে সুফল বেশি। কিন্তু এই শীতে লেপ ছেড়ে ওঠা কি সোজা কথা!

ঠাকমা একটা ফন্দি বার করেছে।

নিজস্ব একটা মোটা চিনেমাটির কাপ আছে কলির। বেশ উঁচু। প্রায় দু'কাপ পানীয় ধরে ওই কাপে। মগের মতো এত বড় হাতল। ঠাকমা করে কী, ওই কাপে বেশ ঘন করে গরম গরম চকোলেট বানিয়ে নিয়ে আসে ভোরবেলা। কলির টেবিলের ওপর কাপটা রেখে বড় একটা চামচ দিয়ে নাড়তে থাকে। তাতে চায়ের কাপের মতো টুংটাং নয়, ঠন ঠন, ঠুন ঠুন শব্দ হয় জলতরঙ্গ বাজনার মতো।

কলির স্বপ্ন ভেঙে যায়। কলি পাশ ফেরে। কলি লেপ আঁকড়ে বালিশে মাথা গুঁজে পড়ে থাকে।

জলতরঙ্গের বাজনা বেজেই চলেছে।

বাস্তব জগতে ফিরে এলে পর চোখ খোলে কলি। বুঝতে পারে কীসের শব্দ ওটা। আর তখনই জিভ কেটে জল বেরোয় ওর। জিনিসটা এত প্রিয় ওর, যে আর শুয়ে থাকতে পারে না। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

ঠাকমা মিটি মিটি হাসে তখন। বলে, আগে মুখ ধুয়ে এসো।

ঠান্ডা কনকনে জল। কোনও রকমে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে মুখ মুছতে মুছতে এসে খপ করে ধরে ফেলে কাপটা।

আঃ! কী আরাম! কী সুস্বাদ!

জানলাটা অল্প ফাঁক করে খুলে দেয় ঠাকমা। বাইবে অল্প অল্প আলো ফুটছে।

বাঁ হাতে কলির ফোলা ফোলা দুটি গাল দু'আঙুলে চেপে ধরে ওর চুল আঁচড়ে দেয়। সামনের দিকটা পরিষ্কার করে দেয়।

আদর করে বলে, পাভলভের কুকুরটা।

কী, তুমি আমায় কুকুর বললে ঠাকমা! যাও, আমি পড়ব না।

তোমাকে বলিনি দিদি। তোমাকে দেখে মনে পড়ল। সে একটা গল্প।

ঠাকমার হাত ধরে ঝুলে পড়ে কলি।

বলো, গল্পটা বলো আগে।

না। এখন না। রাত্তিরে বলব। শোওয়ার আগে।

ওঃ, তুমি কী নিষ্ঠুর ঠাকমা! এখন সারাদিন আমি সাসপেন্স নিয়ে থাকব!

ঠাকমা হাসে।—আচ্ছা ঠিক আছে। রাত্তিরে না, বিকেলে বলব। স্কুল থেকে ফিরলে পর।

দুই

বিকেলবেলা যথারীতি কলি যখন বাড়ি ফেরে, তখন ঠাকমা ছাড়া কেউ নেই। মা, বাবা দু'জনেই কাজ থেকে ফিববে সন্ধের পর। আজকে আবার রতনও নেই। ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখতে গেছে।

ধপাস করে পিঠের বোঝাটা পড়ল বেতের চেয়ারে। জুতো ছুটল দরজার গোড়ায়। মোজার গোলাদুটো রান্নাঘর অভিমুখে যেতে যেতে কী ভেবে থমকায়। সোয়েটার পড়ল আয়নার ওপর। কারুর বুঝতে বাকি রইল না যে, কলি স্কুল থেকে ফিরেছে।

টেবিলে ঢাকা দেওয়া জলখাবার। বাটির ঢাকনা তুলে দেখে কলি। বাঃ। তেলমাখা মুড়ি, বাদাম, নারকেল। বারান্দায় চুপটি করে বসে কী করছে ঠাকমা? নাকের ওপর ঝুলে পড়েছে চশমা, হাতে পেনসিল না বলপেন কী যেন রয়েছে। বইটই তো পড়ছে বলে মনে হয় না।

মুড়ির বাটি হাতে করে কলি ছুটল বারান্দায়। গিয়ে দেখে, কোলের ওপর একখানা কার্ডবোর্ড পেতে ঠাকমা ছবি আঁকছে। ছবিতে চারটে পর পর কুকুরের মুখ। কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে কুকুরগুলো। বেচারা।

এবার মনে পড়ে যায় কলির। মনের মধ্যে খচখচ করছিল, বাড়ি গিয়েই কী যেন একটা কবতে হবে। কিন্তু কী যে করতে হবে, মনে পড়ছিল না। এখন মনে পড়ল।

এরাই বুঝি তোমার পাবলিকের কুকুর?—কলি জিজ্ঞেস করে।

পাবলিকের না। পাভলভের।

এরা কী করছে? অমন করে চেয়ে আছে কেন? এদের কি বলি দেবে তোমার বন্ধু—ওই যে পাভলভ না কী যেন নাম বললে?

এরা শিখছে। আসলে একটাই কুকুর। বিভিন্নভাবে প্ররোচিত হয়ে কী রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার মধ্যে, এই ছবিতে তাই দেখানো হচ্ছে। পরিবেশ থেকে শিখে ওর আচরণ বদলাচ্ছে দেখো। আবার শিখতে শিখতে ভুল করল। শেখার এই পদ্ধতি জন্তু জানোয়ারকে নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন রুশ বিজ্ঞানী পাভলভ, এই শতকের গোড়ায়। কুকুর ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সহায়ক।

মুড়ি খেতে খেতে ছবিটা খুঁটিয়ে দেখল কলি। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না কুকুরটা কী শিখল আর ভুল করল কোথায়।

আসল কথা, কলি গল্পটা শুনতে চায়। শর্টকার্টে ওর মন ভরে না।

শরীরকে যদি কারখানার সঙ্গে তুলনা করো, তবে সেই কারখানার হেডঅফিস হচ্ছে মাথা। মাথা মানে মস্তিষ্ক আর শিরদাঁড়া, আর ছড়িয়ে থাকা, স্নায়ু বা নার্ভ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সর্বক্ষণ খবর আসছে হেডঅফিসে আর হেডঅফিস থেকে অর্ডার যাচ্ছে। কখনও সোজা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, কখনও ব্রাঞ্চ অফিস মারফত। যেমন ধরো, তুমি ইস্ত্রির তলায় হাত দিলে। ছ্যাঁকা লাগল। হেডঅফিস খবর পেয়ে বলল, হাত সরিয়ে নাও। বা, গরম গরম লুচির সঙ্গে এক বাটি মাংস দেওয়া হয়েছে তোমায়। ফুলকো লুচি দেখে আর মাংসের গন্ধে হেডঅফিসে খবর গেল। হেডঅফিস শাখা অফিসে জানিয়ে দিল, খেতে হবে। শাখাঅফিস জিভে জল ছাড়তে লাগল। তারপর তুমি খেতে বসলে। দাঁত দিয়ে পিষে লুচি আর মাংস গুঁড়ো করছ যত, তত দ্রুত জিভে জল এসে তা নরম করে দিচ্ছে যাতে গিলতে পারো। আর সঙ্গে সঙ্গে হজমের মশলা মিশিয়ে দিচ্ছে।

কলি বলে, জিভের নীচে কি কল আছে ঠাকমা, যে টপ টপ করে জল বেরুবে?

টপ টপ হচ্ছে জল পড়ার শব্দ। জিভের নীচে কুলকুল করে জল বেরোয়। কম না, সারাদিনে শরবতের বোতলের দু'বোতল। মানুষের জিভ দিয়ে সব সময় জল বেরোয় অল্পবিস্তর, কেননা মুখের মধ্যেটা ভিজে না থাকলে কথা বলা যাবে না। খাবার সময় জলটা বেশি বেরোয়। আর কুকুরের বেলায় শুধু খাবার সময়ই জিভে জল আসে, অন্য সময় আসে না। কুকুর যখন গা চাটে, তখনও জল আসে।

শুধু খাবার সময় কেন বলছ ঠাকমা। কালকে টিফিনের সময় না প্রিয়াঙ্কা আমার স্যান্ডুইচের সঙ্গে ওর আলুকাবলি শেয়ার করল, সেই কথা ভেবে আমার এখন জিভে জল আসছে। তা কী করে হয়?

হয়, কেননা, আমাদের কল্পনাশক্তি আছে। কল্পনাশক্তি দিয়ে আমরা 'নয়'কে 'হয়' করতে পারি। আর মনে মনে একবার 'হয়' তৈরি হয়ে গেলে মুড়ি খাও বা স্যান্ডুইচ খাও, হেডঅফিসে আলুকাবলির কাজ শুরু হয়ে যায়। সেই কারণে পাভলভ তাঁর গবেষণার জন্যে মানুষ না, বেছে নিয়েছিলেন তাঁর পোষা কুকুরটিকে। ধরো, তার নাম গ্রিগ। গ্রেগরি থেকে গ্রিগ।

একটা বন্ধ ঘরে গ্রিগকে পরীক্ষার জন্যে রাখা হল যাতে বাইরের কোনও শব্দ বা আলো ওকে বিরক্ত না করে। যাতে ওর শরীরের মধ্যেকার প্রতিক্রিয়া কোনও কারণে ব্যাহত না হয়। ওকে বকলশ দিয়ে বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল এক জায়গায়। পাভলভ বললেন, গ্রিগ, এখান থেকে একচুল নড়বে না।

ওর জিভ দিয়ে কখন, কীভাবে, কতখানি লালা বেরুচ্ছে, তা পরখ করার জন্যে পাভলভ করলেন কী, গ্রিগের মুখের মধ্যে একটা যন্ত্র বসিয়ে দিলেন যার সাহায্যে ওর মুখের লালা সবটা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। মাপা যায়। পরীক্ষার দিন গ্রিগের উপোস।

প্রথমে খাবারের বাটি এগিয়ে আসে গ্রিগের মুখের সামনে। খাবার দেখে ওর জিভে জল আসে। সেই জল টপ টপ করে বাইরে পড়ে যন্ত্রের সাহায্যে। খাবারের বাটি সরে গেলে পর গ্রিগেব চোখের সামনে একটা আলো জ্বলে ওঠে। আলোর দিকে চেয়ে থাকে গ্রিগ। জিভের গোড়ায় জল আসে না, জল আসার প্রশ্ন ওঠে না। যন্ত্রের নল বেয়ে সুতরাং কিছুই পড়ে না। আলো নিবে যায়।

এবার আবার আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল খাবারের বাটি। গ্রিগের জিভে জল এল। যতক্ষণ ওর মুখের সামনে খাবারের বাটি আর চোখের ওপর আলোর বাল্ব, ততক্ষণ টপ টপ করে পড়তে লাগল লালা। বার বার এইভাবে ওকে প্রথমে আলো জ্বলা, সঙ্গে সঙ্গে খাবার পাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত করে নেওয়ার পর পাভলভ করলেন কী—একবার শুধু আলোটা জ্বালালেন, খাবারের বাটি দিলেন না। দেখা গেল, খাবারের বাটি ছাড়াই গ্রিগের জিভ দিয়ে আগের মতো জল বেরুচ্ছে। তার মানে, আলো জ্বলে উঠতে গ্রিগ ভাবছে, খাবার এল বুঝি। একটু আগে ও যে শিখেছে আলো জ্বালামাত্র খাবার আসে।

কলি বলে ওঠে, বেচারা কুকুরটাকে এত কষ্ট দেওয়া কেন, ঠাকমা? এ তো সবাই জানে। ভোরবেলা যখন শুয়ে শুয়ে আমার কাপের মধ্যে ঠন ঠন ঠুন ঠুন বাজনা শুনি, আমি বুঝতে পারি কী আসছে। আমার জিভে জল এসে যায় চকোলেটের স্বাদের কথা ভেবে।

গ্রিগের জন্যে তুমি ভেবো না দিদি—ঠাকমা তার গামছা দিয়ে কলির মুখের ওপর থেকে মুড়ির

গুঁড়ো মুছে দিতে দিতে বলে, কাজের পর গ্রিগ নিশ্চয় পেটপুরে মাংস-রুটি খেয়েছে। প্রাণীরা যে একটা বস্তু দেখে—যেমন আলো, বা একটা শব্দ শোনে—যেমন ঘণ্টা, আর একটা বস্তু প্রত্যাশা করতে শেখে, এই তত্ত্ব আমরা পাভলভের কাছে পেয়েছি।

মনের মধ্যে কত জটিলভাবে কাজ চলে, কত আশ্চর্য রকম ভাবে একটা ব্যাপার অন্য একটা ব্যাপারকে প্রভাবিত করে, জীবজন্তু ও মানুষ নিজ নিজ সাধ্যমতো পরিবেশ থেকে কী বিচিত্র প্রক্রিয়ায় শিক্ষা গ্রহণ করে প্রতিদিন, আমরা জানতাম না। একশো বছর আগেও জানতাম না।

তুমি একে কি দেখে শেখা বলবে ঠাকমা? না ঠেকে শেখা?

এ একরকম ঠেকে শেখা। গ্রিগকে যদি বার বার ঠকানো হত, মানে আলো জ্বলত কিন্তু খাবার আসত না, তা হলে খানিক পরে দেখা যেত ওর জিভে আর আগের মতো জল আসছে না।

ঠাকমা বলল, দেখে শেখা নিয়ে মজার মজার গল্প আছে। আর একদিন বলব। এখন তুমি বাটিটা রান্নাঘরে রেখে এসো। তারপর জুতো মোজা ব্যাগ সোয়েটার—যা-কিছু ঘরময় ছড়িয়ে এসেছ, একটি একটি করে তুলে—

কলি বলল, যথাস্থানে রাখো।

১৯৮৫

পম্পার একদিন

মদন কবিরাজ লেনের বারোর এক নম্বর বাড়ির দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে নীচের আঁস্তাকুড়টার দিকে চেয়ে চেয়ে পম্পা যেন কোনও অচেনা ফুলের গন্ধ পেল। গন্ধ না শব্দ। নীচের তলায় মাসিমা স্টোভ ধরিয়েছেন।

এখন বিকেল। চারটে-সাড়ে চারটে বাজে। গলিতে অন্ধকার নেমে এসেছে এর মধ্যেই। রোজই অন্ধকার এখানে একটু আগে নামে।

আর একটু পরে বিভাসদা রওনা হবে। জানলা থেকে পম্পা ওর চলে যাওয়ার দৃশ্যটা দেখবে। আপাতত চলে যাওয়া। পারলে একটু হাতও নাড়বে। বিভাসদা যদি একবারটি পেছন ফিরে তাকায়, দেখতে পাবে। না তাকালে ক্ষতি নেই, চোখে চোখে কথা হবে না। আর কথা হওয়ার কোনও দরকার আছে বলে পম্পা মনে করে না।

নীচের তলায় চা-পর্ব চলছে এখন। কাপ-ডিশের টুংটাং শব্দ, টুনুর কণ্ঠস্বর ও আদুরে হাসি ছাপিয়ে একটা কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসছে।

টুনু বলছে, "ছোটমামা যেন এক পা বাড়িয়েই রয়েছে, দেখেছ মা! এতদিন রইল এখানে, আর যাবার সময় কী ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। যেন পালাতে পারলে বাঁচে!"

টুনুর ছোটমামা অর্থাৎ বিভাস হুংকার দিয়ে উঠল, "অ্যাই, বেশি চটরপটর কথা বললে গাঁট্টা মারব।"

"মারো না গাঁট্টা, দেখি কত সাহস!"

টুনুর বয়স তেরো-চোদ্দো হবে, কিন্তু বয়স অনুপাতে ও একটু পাকা। হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল চেহারা, কালো; ছোট কপালের নীচে দুটো উজ্জ্বল চোখ দেখলে বেশ বুদ্ধিমতী মনে হবে, কিন্তু পড়াশোনায় ও কাঁচা। না হলে ক্লাস সেভেনে পড়ে কেউ এ-বয়সে। আর সেভেনে পড়ে বলেই এখনও ফ্রক চালিয়ে যাচ্ছে, দীর্ঘ বেণী দুলিয়ে, হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত দুটি নধর নিখুঁত পা পাড়াসুদ্ধ লোককে দেখিয়ে, চটিতে দুষ্টুমি ও সরলতা মেশানো এক রকম চটাস চটাস শব্দ করতে করতে স্কুলে যাচ্ছে, স্কুল থেকে ফিরছে। ও সেই জাতের মেয়ে যে ঠিক লেখাপড়া করতে, শাস্ত্রচর্চা করতে জন্মায়নি। একটা বয়স পর্যন্ত

এই উলুখড়ের বোঝা বহন করতে সম্মত হয়েছে। যখন সময় আসবে, আসবেই একদিন ওর ধারণা, তখন এইসব জ্ঞানের ঝুড়িগুলো এক ধাক্কায় ছুড়ে ফেলে দেবে, আর কোনওদিন উলটে দেখবে না। পড়াশোনায় মন নেই বলে ও নির্বোধ—এমন কথা বললে ভুল হবে।

বিভাসের মুখে অর্ধেকটা শিঙাড়া তখনও অচর্বিত, সুতরাং ও সাহস দেখাবার চেষ্টা করল না।

টুনুর মা লীলা ছোটভাইয়ের দিকে চেয়ে মেয়ের উদ্দেশে বলল, "আজকের দিনেও তুই ঝগড়া করছিস?"

তারপর বিভাসকে বলল, "আর একটা শিঙাড়া নিবি?"

বিভাস বলল, "না দিদি, দেরি হয়ে যাবে। পাঁচটা পঁচিশের ট্রেনটা না ধরতে পারলে অফিসটাইমের ভিড়ে আর উঠতে পারব না। সঙ্গে বাকসটা আছে। ওটা টুনু খেয়ে নে।"

"উঃ কী দরদ!" টুনু আবার খোঁচা দেয়, "আসলে, মনটা তোমার এখানে আর নেই। আমি কি বুঝি না!"

"তাতে দোষের কী?" লীলা বলল। "ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছে, মা-বাবার কাছে যাচ্ছে কতকাল পরে, খুশি তো হবারই কথা।"

ঢক ঢক করে চায়ের পেয়ালা শেষ করে উঠে দাঁড়াল বিভাস।

আলনার দিকে এগিয়ে গেল। কাবলি জুতো জোড়া পরে সুটকেসটি হাতে তুলে রওনা হবে। কবজি উলটে ঘড়িটা দেখে নিল একবার।

আলনার নীচের পাটায় সারি সারি জুতো রাখা থাকে। জামাইবাবুর নিউকাট ও চপ্পল, ওর নিজের কাবলি, টুনুর চটি ও হিল-তোলা জুতো। সবগুলোই আছে ঠিকঠাক, শুধু ওর জুতো জোড়া নেই।

ঘরের কোণ থেকে ও যেন আর্তনাদ করে উঠল, "আমার জুতো? জুতো কোথায় গেল?"

আজ বিভাস বাড়ি যাবে, জামাইবাবু তাই তাড়াতাড়ি অফিস থেকে চলে এসেছেন। পাশের ঘরে নিজের হেলান-দেওয়া চেয়ারটায় বসে চা খাচ্ছিলেন। উঠে এলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল বিভু, জুতো খুঁজে পাচ্ছ না?"

বিভাস প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "এইখানেই তো ছিল। সকালে পালিশ করে রেখেছিলাম।"

"খাটের নীচে টিচে দেখো, যাবে আর কোথায়।" জামাইবাবু আশ্বাস দিলেন বিভাসকে। "তাড়াহুড়োর মধ্যে কোথাও খুলে রেখেছ, ভুলে গেছ হয়তো।"

লীলা সর্বত্র বাতি জ্বালিয়ে বিভাসের সঙ্গে জুতো খুঁজতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ কাটল জুতো খোঁজাখুঁজিতে। সবাই উদ্বিগ্ন। বিভাস হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নীচে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে, এমন সময় খিলখিল করে হেসে উঠল টুনু। কারও বুঝতে বাকি রইল না, ও-ই লুকিয়ে রেখেছে কোথাও।

বোকা বনে যাওয়াতে বিভাস বেশ রেগে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লীলা বলল, "কোথায় রেখেছিস, বের করে দে হতচ্ছাড়ি, নইলে কান ছিঁড়ে দেব।"

টুনু প্রথমে একটু গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। তারপর বলল, "আগে বলো, আমায় প্রণাম করতে বলবে না!"

জামাইবাবু এতক্ষণ হাসি চেপে ছিলেন। এবার কথা বলে উঠলেন, "ঠিক আছে, তোকে প্রণাম করতে হবে না। বার করে দে, কোথায় রেখেছিস।"

আলমারির পাশে দেয়াল-ঘেঁষে পুরনো খবরের কাগজ ভাঁজ করে রাখা। মাসের শেষে সেগুলো বিক্রি হয়। সেখান থেকে বিভাসের কাবলি জোড়া তুলে এনে মেজের ওপর শব্দ করে ফেলল টুনু। বলল, "এই নাও।"

আর কালবিলম্ব না করে বিভাস রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত। জামাইবাবুকে প্রণাম করল, দিদিকে। টুনুর দিকে ফিরেও চাইল না।

লীলা বলল, "ট্রেনটা পাবি তো? দেরি হয়ে যায়নি?"

জামাইবাবু বললেন, "শেয়ালদা অবধি আমি যাচ্ছি, চলো তোমায় তুলে দিয়ে আসি। হেঁটে গেলেও দশ মিনিটের বেশি না।"

লীলা বলল, "কলকাতায় তো আসা-যাওয়া করবি বিভু, সময় পেলে চলে আসিস।"

বিভাস ওর ব্যস্ততার মধ্যে মুখে হাসি ফুটিয়ে উত্তর দিল, "সে আর বলতে!"

লীলা বলল, "বাড়ির সবাই কে-কেমন থাকে, সে-খবর যেন তোর কাছে পাই, বুঝলি?"

এবার কণ্ঠস্বরে একটু আন্তরিকতার সুর আনার চেষ্টা করল বিভাস। বলল, "আসব বই কী। তুমি বললেও আসব দিদি, না বললেও আসব।"

কথাটা নিজের কানে কেমন খচ করে বাজল বিভাসের।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলিতে পড়তেই বিভাসের ইচ্ছে হল, একবার ওপর দিকে চেয়ে দোতলার জানলাটা দেখে। পম্পা কি দাঁড়িয়ে আছে? হয়তো আছে, হয়তো নেই।

তবু, শূন্যে ছুড়ে দেবার মতো করে ও হঠাৎ বলে উঠল, "শিগগিরই আসছি একদিন। দুপুরের দিকে।"

মা ও মেয়ে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বিভাসের চলে যাওয়া দেখছে। জামাইবাবুর পাশাপাশি হনহন করে হাঁটছে জামাইবাবুর চেয়ে একটু লম্বা ও রোগা বিভাস। টুনু বলল, "আবার আমি একা হয়ে গেলাম।"

জানলা থেকে সরে এল পম্পা।

সুইচ টিপে বাতি জ্বালল। ঘরের ও-পাশটায় দেয়ালে-টাঙানো ফ্রেম-লাগানো আয়না, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মন্থর পায়ে। অন্যমনস্ক। যেন একটা ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু এত অলসভাবে করছে যাতে ভাবনাটা আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়। ঘুরঘুর করে কিন্তু ধরা দেয় না।

আয়নার বাঁ পাশটায় দেয়ালে-গাঁথা তাক, কাঠের তক্তা বসানো। ওপরের ও নীচের তাক দুটোয় সংসারের জিনিষপত্র, মাঝেরটায় চিরুনি, স্নো, পাউডার, কুমকুম প্রভৃতি প্রসাধনেব বস্তু। পম্পা, ওর দিদি বরুণা, দু'জনের।

তাক থেকে বড় চিরুনিটা তুলে চুলে বোলাতে লাগল পম্পা। পিছন দিকে হাত ঘুরিয়ে চুল আঁচড়াবার সময় শরীরের সামনের দিকটা নিজের কাছেই খুব স্পষ্ট মনে হল ওর। নির্জন ঘরে একা আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও ওর লজ্জা হল একটু।

বুকের কাপড় সরিয়ে নিয়ে অল্প হাসল।

নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে তাকেই প্রশ্ন করল "যাবার সময় এমন মন খারাপ লাগছে না, মনে হচ্ছে—কী মনে হচ্ছে"...

বিভাসের মুখটা—সরল ও কাতর মুখটা মনে করে এখন একটু কৌতুক বোধ করল পম্পা। ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করল।

দাদা আপিস গেছে। দিদি গেছে স্কুলে যথাবীতি। মর্নিং কলেজ থেকে ফিরে ও হাতমুখ ধুচ্ছিল, এমন সময় সিঁড়ির দরজায় মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ।

ভেতর থেকে পম্পা জিজ্ঞেস করেছিল, "কে?"

"আমি। আমি বিভাস।"

বিভাস আজ বিকেলে চলে যাবে, পম্পা জানত। টুনুর মুখেই শুনেছে। তা ছাড়া, নীচের তলার কত কত কথাই তো শুনতে পাওয়া যায় ওপরে। অবশ্য, বিভাস যে কখনও ওপরে আসেনি, এমন নয়। কোনও একটা উপলক্ষে এসেছে। দাদার সঙ্গে কথা বলেছে—এই পর্যন্ত। পম্পার সঙ্গে ওর দেখা সাক্ষাৎ যা কিছু, আসা যাওয়ার পথে, গলিতে, মোড়ের বাস স্টপে হয়তো বা। এবং মাঝে মাঝে হঠাৎ নীচের তলায় বিভাসের দিদি কিংবা টুনুর সঙ্গে কথা বলছে, এমন সময়। কী খবর, কেমন আছ, নতুন শাড়ি বুঝি, প্রসঙ্গ এর চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত হয়নি।

পম্পা দরজা খুলল।

"পম্পা, আজ আমি চলে যাচ্ছি। তুমি তো জানো, আমার মা-বাবা আর বাড়ির সবাই এসে পড়েছে, একটা ছোট বাড়ি করা হয়েছে কাছাকাছি, সেখানেই থাকব।"

"ভেতরে এসো। বসো, তুমি হাঁপাচ্ছ।"

"না, ঠিক আছে।" বিভাস কেমন ভিক্ষুকের মতো দৃষ্টি মেলে পম্পার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্ব অঙ্গ বার বার নিরীক্ষণ করল।

আবার বলল, "আজ আমি চলে যাচ্ছি। যাবার সময় এমন মন খারাপ লাগছে না, মনে হচ্ছে" বলতে গিয়ে ওর গলা ভেঙে গেল।

অপ্রত্যাশিত মুহূর্তটির জন্যে প্রস্তুত ছিল না পম্পা। ওর চোখ ছলছল করে উঠল।

একটা ঢোঁক গিলে কাঁপা গলায় বিভাস এবার বলল, "আমি বুঝতেই পারিনি—"

কথাটা শেষ করতে পারল না। ওর দু'খানা হাত বাড়িয়ে পম্পার ডান হাতটা টেনে আনল নিজের কাছে হঠাৎ। নিজের মুখের ওপর চেপে ধরে গন্ধ নিল কয়েকবার। তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে ছুটে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পম্পা শুধু অনুভব করল, বিভাসের হাতদুটো কাঁপছে, বিভাসের মুখের ঘাম লেগে গেছে ওর হাতের পাতায়। এই প্রথম কোনও যুবকের কর্কশ মুখে ওর হাত ছুঁয়েছে। ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত।

বিভাস চলে যাবার পরও বেশ কিছুক্ষণ পম্পা খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘটনাটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছিল। সুখ বা আনন্দের অনুভূতি না, বিস্ময়-মেশা আবছা অস্পষ্ট একটা ভয়ের অনুভূতি ওকে আচ্ছন্ন করেছিল কিছুক্ষণ।

স্নান সেরে সোনামাসি কখন ঘরে ঢুকেছে, পম্পা টের পায়নি।

হঠাৎ শুনল, সোনামাসি বলছে, "ওখানে কী করছ ছোট মেয়ে? চান করে নাও, বেলা হয়েছে।"

দরজা বন্ধ করে খিল দিতে দিতে পম্পা বলল, "যাই"।

সোনামাসি কিছু দেখেনি। ও কিছু অনুমান করতেও পারেনি। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পম্পা এখন, সন্ধের মুখে, সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার বুঝে নিতে চেষ্টা করল।

একটু পরে দিদি ফিরবে স্কুল থেকে। তারপর দাদা ফিরবে। সোনামাসি, বহুকালের পুরনো দাসী, বৃদ্ধা, নিঃসন্তান বিধবা, এ-সংসারের কর্তৃত্বহীন অভিভাবিকা, রান্নাঘরের সংলগ্ন এক ফালি বারান্দাটায় চাদর পেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একটু পবে সে-ও জাগবে, উঠে উনুন ধরাবে, চা করবে। বাড়ির আবহাওয়া বদলে যেতে দেরি নেই।

"না, টুনুর ছোটমামা, তুমি আর এদিকে এসো না। কখনও দুপুরে এসো না অন্তত,—" পম্পা মনে মনে নীচের তলার টুনুর ছোটমামাকে বলল, "যদি জানাজানি হয়ে যায়, তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। এরা আমায় তাড়িয়ে দেবে। কোথায় যাব তখন, বলো?"

ঘরের অন্য দেয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি দুটো তক্তপোশ পাতা। গুটিয়ে রাখা আছে দুটো শতরঞ্চি-মোড়া বিছানা দুই বোনের। তক্তপোশের এক কোণে বসে পম্পা চুল বাঁধা সারল। তিন গুছির সাদাসিধে বিনুনি করে খোঁপা জড়াল।

পাশের ছোট ঘরটা দাদার। সেখানেও একটা তক্তপোশে জড়ানো বিছানা। তক্তার ওপরে একটা মাদুর পাতা, দুটো কাঠের চেয়ার, একটা ছোট টেবিল। লোকজন এলে ওই ঘরটায় বসে। কথাবার্তা বলে।

দাদা ও দাদার বন্ধুবান্ধবদের কথাবার্তার সময়ে পম্পা উপস্থিত থাকে না। ওর উপস্থিতি বাঞ্ছিত নয়, তাই। দিদি থাকে মাঝে মাঝে, আলোচনায় যোগ দেয়। সেই সময় ও এ-ঘরে বসে পড়াশোনা করে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে ওকে এখনও চার বছর এইভাবে কাটাতে হবে।

দাদা ট্রেড ইউনিয়ন করে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপিসের লোকেরা আসে পরামর্শ করতে। কর্তৃপক্ষের কাছে কী কী দাবি নিয়ে দাঁড়ানো উচিত, কী কী দাবি মেটাতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য, আলোচনা করে। পাঠ্যবইয়ের নানান হিজিবিজির মধ্যে ডুবে গিয়েও কয়েকটা কথা ওপাশের ঘরে সবার আড়ালে থেকেও শুনতে পায়। "আমাদের পাওনা আদায় করে নিতে হবে, ম্যানেজমেন্ট নিজে থেকে কিছু দেবে না। দরকার হলে আন্দোলন করব, কাজ বন্ধ করে দেব। চাকা না চললে তখন ওদের টনক নড়বে।" এইসব।

মেয়ে হলেও দিদি এই একই পথের যাত্রী। সোজাসুজি রাজনীতি করে। দিদিও বিশ্বাস করে, দাবি না করে কিছু পাওয়া যায় না। মিছিলে দিদি সকলের সামনে থাকে, পতাকা ধরে হাঁটে। বরুণা ঘোষের বক্তৃতা যে একবার শুনেছে, সে-ই বলেছে এই মহিলা একদিন এম. পি. হবে নিশ্চিত। বরুণা ঘোষকে সমীহ করে সবাই।

আড়ালে থেকে থেকে পম্পার মন এসব ব্যাপারে একেবারে সচেতন হয়নি। পিতৃ-মাতৃহীন পরিবারে ও সবচেয়ে ছোট একজন মানুষ যেন আদায়-করা প্রাপ্তিতে ভাগ বসিয়ে এসেছে এতকাল। দাদার প্রতি দিদির প্রতি ও কৃতজ্ঞ।

আজ কিন্তু ওর দাদা ও দিদির প্রতি একটু করুণা হল। আজই সে প্রথম অনুভব করেছে, এই পৃথিবীতে কোথাও-না-কোথাও ওর একটা জায়গা হয়েছে। ওর জন্ম এবং এতগুলো বছর ব্যাপী নিরন্তর বেদনাময় বেড়ে ওঠা একেবারে ব্যর্থ হয়নি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপা জড়াতে জড়াতে ও নিজের প্রতিবিম্বের উদ্দেশে বলল, "না, আমার কোনও দাবি নেই, আমি আন্দোলন করব না। ভালবেসে, শুধু ভালবাসা দিয়ে, আমি জয় কবব, তোমরা দেখো।"

১৯৮৪

ক্রিস্টিনের পাপা

না, মিউনিখ শহর আমি দেখিনি। মিউনিখ কেন, জার্মানির কোনও শহরই আমার দেখা হয়নি। বিলেত যাবার সৌভাগ্য আর ক'জন বাঙালি ছেলের হয়!

শুধু সৌভাগ্য বললে সবটা বলা হয় না। খানিকটা সৌভাগ্য, অনেকটাই সাহস। ডানপিটে ছেলের বেপরোয়াপনা। যেমন ছিল মন্মথর। আমাদের সহপাঠী মন্মথ দত্ত। বি.এস.সি ফেল করে বিলেত চলে গেল। আর আমি বি.এস.সি পাস করে অঙ্কের মাস্টারি নিয়েছি। আজও আমি অঙ্কের মাস্টার। শুধুমাত্র একপিঠের জাহাজভাড়া সম্বল করে নিরুদ্দেশে পাড়ি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি দু'ভাগ হয়েছে। বিধ্বস্ত ভাঙাচোবা একটা দেশ। শহরের ঘরবাড়ি, কলকারখানা অর্ধেক নিশ্চিহ্ন বোমার ঘায়ে। বিশ্বজয়ের নেশায় হিটারের দেশ তুলে নিয়ে গিয়েছিল হাজারে হাজারে যত তরুণ যুবকদের, তারা অনেকেই শেষপর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি। যুদ্ধশেষে শান্তির উৎসবে যোগ দিতে পড়ে ছিল অগণিত পুত্রহারা বুড়োবুড়ি আর কিছু বিধবা।

মন্মথ চিঠিতে লিখেছিল, "এমন গোঁয়ার আর জেদি এই জার্মান জাত যে, পনেরো বছর যেতে-না-যেতে দেশটাকে আবার নতুন করে গড়ে তুলেছে।"

পশ্চিম জার্মানির দক্ষিণ দিকে আল্পস পর্বত ঘেঁষা এই মিউনিখ শহর। আধা গ্রাম, আধা নগর। ভারী পরিচ্ছন্ন। বিশাল চওড়া তিনটে অটোবান এই শহরে এসে মিশেছে। শহরের বাইরে অপর্যাপ্ত ঢেউ-খেলানো মাঠ, বাগান, শস্যখেত। ছোট ছোট কারখানা। মেশিনেই সবকিছু হয়। বিজ্ঞানকে এরা মানুষের কত দরকারি কাজেও লাগাতে পেরেছে, না দেখলে বিশ্বাস হত না। এ হল উনিশশো চৌষট্টি সালের কথা।

মন্মথ লিখেছিল, "পুরোদমে দেশ গড়ার কাজ তো চলছেই। বিদেশের বাজার দখল করার কাজও পেছিয়ে নেই। ইংরেজ আর ফরাসিদের মতো এরা কালোমানুষদের ঘেন্না করে না, তাই এ-দেশে কাজ করে সুখ। লন্ডন প্যারিসের মতো মিউনিখেও আমরা পাতাল রেল বসাচ্ছি।"

ঘন ঘন নয়, মাঝেমধ্যে ওর চিঠি পেতাম। পাড়ি দেবার পাঁচ বছরের মধ্যে যখন ওর চিঠিতে 'সুখ' আর 'আমরা'এই দুটো শব্দের ব্যবহার দেখলাম, তখন আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, মন্মথ, বি.এস.সি ফেল মন্মথ দত্ত, মিউনিখে শেকড় ছাড়ছে। ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের যোগাযোগ রাখার আর দরকার নেই। তাই ও যখন উদ্বিগ্ন হয়ে লিখল, "কী রে, চুপচাপ কেন, মেদা মেরে গেলি? এখনও বলছি জার্মান ভাষাটা শিখে চলে আয়, কাজের অভাব হবে না", আমি সে-চিঠির জবাব দিইনি।

দুঃখকষ্ট মানুষ নীরবে সহ্য করে, অপরকে জানতে দেয় না। কিন্তু সৌভাগ্যের খবর সে প্রচার করতে চায়। না করে পারে না। এটা সাধারণ মানুষের একটা দুর্বলতা। বন্ধুর এই দুর্বলতা আমি ক্ষমার চোখে দেখেছি।

মন্মথ বুঝতে পেরে গিয়েছিল এতদিনে যে, ওর এই ঘরকুনো বন্ধুটিকে দিয়ে কিস্যু হবে না। তাই আর পেড়াপিড়ি করেনি। অনেকদিন চিঠিপত্রও দেয়নি তারপর। আমার মন থেকে মুছে গেছে মন্মথ।

বাগবাজার স্ট্রিট দিয়ে হাঁটছি একদিন, দেখি গলির মোড়ে কয়েকটা ছেলে হইহই করতে করতে সুতোয় মাঞ্জা দিচ্ছে। ওই দলে মন্টুকেও দেখলাম। মন্মথর ছোটভাই মন্টু। কী ভেবে ওকে ডাকলাম।

মন্টু কাছে আসতে জিজ্ঞেস করি, "দাদার খবর কী?"

"ভাল আছে।"

"চিঠিপত্র লেখে?"

"খুব কম। মাঝে মাঝে টাকা পাঠায় মাকে।"

"কবে ফিরবে কিছু বলে?"

"না। খালি লেখে, একদম ছুটি নেই।"

আরও কিছু কথা ওকে জিজ্ঞেস করার ছিল, তা আর হল না। মন্টুর মন পড়ে ছিল মাঞ্জায়। বন্ধুরা ইশারা করছিল। "আমি যাই", বলে এক ছুটে ও পালিয়ে গেল।

এর মাসখানেক পরে একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, চিঠির বাকসে একটা মস্ত নীল রঙের খাম। খাম দেখেই বোঝা যায়, ওটা বিদেশের চিঠি। অর্থাৎ মন্মথর চিঠি। আর তার সঙ্গে কিছু রঙিন ছবি। ছবির মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধ ও সুশ্রী ইউরোপ দেশটাকে এক চুমুক দেখলাম। লক্ষ করলাম, যত্রতত্র ওদেশে বহুতল বাড়ি উঠেছে।

পাছে বুঝতে না পারি, তাই বুদ্ধি করে মন্মথ প্রত্যেক ছবির পেছনে ছোট অক্ষরে ক্যাপশন লিখে দিয়েছে। তাড়াহুড়োয় লেখা হলেও বেশ মজার ক্যাপশনগুলো। যেমন, 'আমার পাশে ফ্রীডা, আর ফ্রীডার পাশে আমাদের ফোক্‌সভাগন। পছন্দ হয়েছে?' আর একটায়, 'মিলান থেকে বেরিয়ে এখান থেকে জেনোয়া খুব দূরে নয়। সেই জেনোয়া বন্দর যেখানে জাহাজ থেকে নেমেছিলাম।' কিংবা 'এই হল মোনাকো—তোদের ভুটান—নাঃ তত গরিব নয়।

বানান ভুলে ভরতি তিন পাতা চিঠিতে ওর বান্ধবী ফ্রীডাকে নিয়ে সাতকাহন কথা। ও রকম মেয়ে নাকি হয় না। একটুও অহংকার নেই মনে। মন্মথকে ভালবেসে ও নাকি ভারতবর্ষকেই ভালবেসে ফেলেছে। ওখানে যেতে চায়। প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশেষ স্বচক্ষে দেখতে চায়। মন্মথর অভিমত, জার্মানরা কখনও কলোনি গড়েনি, তাই ওদের মনটা উদার। চিঠিতে এক জায়গায় একটু কবিত্বও করেছে মন্মথ: 'তবু দুটি নীলচক্ষু পাওয়া গেছে এই শীত কুয়াশার দেশে/হয়তো কোথাও কারও দেশ নেই, গৃহ নেই/যতক্ষণ একটি হৃদয় খুঁজে পাওয়া যায়/সেখানেই সব ক্লান্তি রেখে বসে পড়তে চাই/নড়ি না কোথাও।

এইসব। সত্যি কথা বলতে কী, ছবি দেখে সেদিন ফ্রীডাকে আমার খুব একটা সুন্দরী মনে হয়নি। ফরসা হলেই কোনও মেয়ে সুন্দর হয় না। ওর নাকটা কেমন ভোঁতা, ওপর দিকে তোলা। ঠোঁটদুটো মোটা। নীল চোখের ওপরেই কপালটা বড়। আর বয়স? মন্মথর চেয়ে একটু বেশি হবে তো কম নয়। তবু রাগ হয় না আমার। প্রেমে পড়লে মানুষ একটু বোকা হয়ে যায়, আমি জানি। তবে এতটা আদেখলাপনা ও না দেখালেই পারত।

বলা বাহুল্য, এরপর মন্মথর সঙ্গে ফ্রীডার বিয়ে হয়েছে। ওদের হনিমুন হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মে ছেলেপুলেও হয়েছে দুটি। বাগবাজারের স্কুলমাস্টার আমি, আমিও কি চুপ করে বসে আছি? স্মিতাকে নিয়ে আমার সংসার ছাপোষা মানুষের সংসার। কোনও রকমে সচ্ছল। সুখী কিনা জোর গলায় বলতে পারব না। আমাদের দশ বছরের মেয়ে নিবেদিতা ইস্কুলে পড়ে। স্মিতা ওকে দিয়ে আসে, আমি নিয়ে আসি। মন্মথ আমার মন থেকে মুছেই গিয়েছিল। যেমন মুছে গিয়েছিল আইবুড়ো বেলার বেহিসেবি আড্ডা আর তাসখেলা। বিয়ের পিঁড়ির নীচে ওই জীবনটা চাপা পড়ে যায়, তাই তো নিয়ম।

এতক্ষণ লেখার পর মনে হচ্ছে, মন্মথকে নিয়ে গল্প শুরু করা আমার উচিত হয়নি। ও কি একটা গল্পের বিষয়? ও কি একটা গল্প লেখার মতো চরিত্র? আজকাল তো আকছার ছেলেরা ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেই বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। সাহেবদের গোলামি করার জন্যে লাইন দিচ্ছে কনসুলেটগুলোয়। ওসব দেশে রোজগার বেশি, আবহাওয়া দূষিত নয়, খাবার জিনিস নির্ভেজাল। জীবন উপভোগ করার উপকরণ অফুরন্ত। চল্লিশ বছর পার হয়ে গেল আমরা স্বাধীন হয়েছি, অথচ সেই

দরিদ্রই রয়ে গেলাম। আগে ইংরেজরা আমাদের শোষণ করত, এখন পৃথিবীর সব শিল্পোন্নত দেশগুলো একজোট হয়ে আমাদের শুষছে। এক-এক সময় ভাবি, এই জন্যে কি আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম? ইংরেজরা থাকলেই কি ভাল ছিল? চার্চিল যে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত নয়, সে-কথা কি ফলে গেল শেষপর্যন্ত?

এই বাগবাজার পাড়ায় আমি অন্তত দশজনকে জানি, যারা কোনও-না-কোনও ছুতোয় পালিয়েছে দেশ ছেড়ে। আর ফেরেনি। এখন আর জাহাজে চড়ে যায় না কেউ। প্লেন হয়েছে। সতেরো দিনের বদলে সতেরো ঘণ্টায় পৌঁছে দেয়। ওই যে কোণের লাল বাড়িটা, যার নীচে সানশাইন লন্ড্রি, ওই বাড়ির ছেলে প্রদ্যুম্ন, গেল জানুয়ারিতে পনেরো দিনের ছুটিতে এসে বিয়ে করে বউ নিয়ে চলে গেল।

বাঙালি মেয়ে। মন্মথটা যদি বাঙালি মেয়ে বিয়ে করত, ভাল হত হয়তো, এখন আমার মনে হচ্ছে। একেবারে হারিয়ে যেত না তা হলে।

কেন মনে হচ্ছে, সেই কথাটা বলি।

ক'দিন আগে স্মিতা খবর দিল, মন্মথ মারা গেছে। রাস্তায় দেখা হয়েছিল মন্টুর সঙ্গে, সে বলেছে। রোববার সকালে আসবে মন্টু।

আমাদের এখন হাফটাইমের পরের জীবন। মৃত্যুর খবর শুনে বিচলিত হই না। প্রায়ই কেউ-না-কেউ মরছে। মন্টুর কাছে তা হলেও সব জানলাম।

"অনেকদিন আগে দাদা একটা রিটার্ন টিকিট পাঠিয়েছিল আমার নামে", মন্টু বলল, "লিখেছিল, চলে আয় একবার। তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। কত বড় হয়েছিস, দেখতে ইচ্ছে করছে। আমি তেমন গা করিনি। পাসপোর্ট-ভিসা করা যা ঝামেলা। নতুন চাকরি। বললেই তো ছুটি দেবে না। শেষপর্যন্ত যখন গেলাম, তখন খুব দেরি হয়ে গেছে। দাদা আর নেই।

বলতে বলতে কাঁদছিল মন্টু।

"কী করে জানব, দাদার অত অসুখ! বুকে হাঁপানি, পেটে আলসার। দবদর করে রক্ত পড়ে। টেনশান থেকে নাকি এইসব অসুখ বাধিয়েছিল দাদা। ছ'-সাত মাস ভুগে মারা গেল। আমি একবার দেখতে যেতে পারলাম না।"

"কেমন দেখলে মিউনিখ শহর?" প্রসঙ্গ ফেরাতে আমি প্রশ্ন করি, "ওখান থেকে আল্‌প্‌স দেখা যায়?"

"ছিমছাম, সুন্দর। লোকজন খুব ব্যস্ত। হু হু করে গাড়ি ছোটে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করলে কারুর সঙ্গে দেখা করা যায় না। রাস্তায় ভিখিরি নেই, কুকুর নেই, পাগল নেই। কেউ চেঁচিয়ে কথা বলে না ওখানে। বউদি এক উইক-এন্ডে গাড়ি করে সব ঘুরিয়ে দেখাল। শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে আল্‌প্‌সের গা ঘেঁষে দাদা আর একটা বাড়ি কিনেছিল। সেখানে মাঝে মাঝে এসে একা থাকত। সারাদিন বসে বসে ড্রিঙ্ক করত আর গান বাজাত। কারুর মানা শুনত না।"

কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল মন্টু।

জিজ্ঞেস করলাম, "ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে?"

মন্টু বলে, "বড়জন ক্রিস্টিন, মেয়ে। আর ছোটটা ম্যাক্স। দুটোই খাঁটি জার্মান। টকটকে ফরসা রং, আপেলের মতো লালচে গাল। সোনালি চুল। কটাস কটাস জার্মান বলে, এক বর্ণ বোঝা যায় না। দাদার কোনও চিহ্ন ওদের মধ্যে নেই।"

আমি বলি, "মন্মথকে ওরা ব্যবহার করেছে। গ্রহণ করেনি।"

"ঠিক তাই," মন্টু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "মিউনিখে অনেক বাঙালি আছে, কারুব সঙ্গে ওবা মেশে না। কেউ ওদের বাড়ি যায় না। এ ব্যাপারে দাদার বউয়ের প্রশ্রয় আছে বলে মনে হয়েছে আমার। তা বলে ওরা কেউ অভদ্র বা উদ্ধত প্রকৃতির নয়। বেশ মিশুক, নম্র। একটু ঠান্ডা। নিজেদের নিয়ে ওরা ভাল আছে নিজেদের দেশে।

"বাংলা জানে?" কী মনে হল, আমি জিজ্ঞেস করে ফেলি মন্টুকে।

'একবর্ণ না। সেইটেই তো আশ্চর্য। ক্রিস্টিন বা ম্যাক্সের কথা বাদ দাও, ওদের মায়ের মুখে একটাও বাংলা শব্দ শুনলাম না। ইংরিজি বলতে পারে। দাদার সঙ্গে এতদিন সংসার করেও ফ্রীডার মধ্যে বাঙালিয়ানার রেশ নেই। আসলে দাদারই দোষ। ওদের বাঙালি করার চেষ্টা না করে নিজে জার্মান হয়ে গিয়েছিল। না হলে—"

জোয়ান ছেলে মন্টুর চোখদুটো আবার ঝাপসা হয়ে যায়। আমি অপ্রস্তুত হই। জার্মানির গল্প আর না টেনে জিজ্ঞেস করি, "তোমার হাতে ওটা কী? বইটই নাকি?"

চোখ মুছতে মুছতে ও বলে, "না। কতকগুলো রেকর্ড। প্যাকেটের ওপর তোমার নাম লেখা আছে দেখে নিয়ে এসেছি।"

প্যাকেট খুলে দেখি, পুরনো সব বাংলা গান। দিলীপ রায়, শচীন দেব বর্মণ, কমলা ঝরিয়া, পঙ্কজ মল্লিক। আমার হাসি পায়। তা হলে মন্মথ তার অস্থাবর সম্পত্তি সব আমার মতো নগণ্য এক বন্ধুকে দান করে গেছে।

স্মিতা চা আর তেলমাখা মুড়ি নিয়ে ঘরে ঢোকে। রবিবারের সকাল। বাঙালি বউদিকে পেয়ে ছেলেমানুষ মন্টু তার বিলেত ভ্রমণের বিবিধ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে থাকে। ইউরোপ থেকে না, যেন কঙ্গো অভিযান সেরে ও সদ্য ফিরেছে। খুব উত্তেজিত।

যাবার সময় মন্টু ফিরে দাঁড়াল একবার। মুখের ওপর থেকে কৌতুকভাবটা তখনও মিলিয়ে যায়নি। বলল, "আর একটা জিনিস নিয়ে এসেছি।"

একটা চিরকুট। ভাঁজ-করা চিরকুটটা পকেট থেকে বার করে মেলে ধরল আমার সামনে। আমি ওটা হাতে নিলাম। ভাঁজ খুলে দেখি, এমন কিছু না। একটা সাধারণ হলদে রঙের কাগজ। তাতে কাঁচা হাতে লেখা কতকগুলো অক্ষর'JAWOHL'।

"এ আবার কী? জার্মান শব্দ?"

"এই বানানে জার্মান একটা শব্দ আছে অবশ্য। তবে এটা জার্মান না।"

মন্টু বলে,

"একদিন ক্রিস্টিন আমায় চুপি চুপি ডেকে নিয়ে এই কাগজটা দেখাল। পাপা মারা যাবার সময় ও ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল না। ডাক্তার এসেছিল অবশ্য। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল। পাপা শেষ সময়ে বার বার একটা কথা বলতে চেয়েছে, যার মানে ও জানে না। যার মানে ও বুঝতে পারেনি। তবু যতটুকু শুনেছে, কাগজটায় টুকে রেখেছে। ক্রিস্টিন জানতে চাইল আমাদের ডায়ালেকটে এ বকম কোনও শব্দ আছে কিনা। আমি বললাম, আছে। জল। তোমাব পাপা শেষ সময়ে একটু জল খেতে চেয়েছিল বোধহয়।"

দৃশ্যটা ভাবতে গিয়ে আমি চমকে উঠি। আল্‌প্‌স পর্বতের সানুদেশে মিউনিখ শহর, ফোকস্‌ভাগন গাড়ি, আঙুরের খেত, আপেলের বাগান, দূষণমুক্ত পরিবেশ—সব একাকার হয়ে যেতে থাকে। বললাম, "মন্টু, ঢের হয়েছে। থামো।"

চিরকুটটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল মন্টু।

১৯৮৭

পিংক লিলি

রঙের গন্ধে টিকতে পারবে না বলে ওরা আগেভাগে বাড়ি থেকে পালিয়েছে।

গোরা তার বউকে নিয়ে গেছে কুলু মানালির দিকে। ছোট ছেলে সোমনাথ মাকে নিয়ে বেড়াতে গেছে দক্ষিণ ভারতে। বিকাশ বাড়িতে একা। এতদিন পর বাড়িটা খালি পাওয়া গেল। মানুষজন ছাড়া জীবন চলে না, একথা যেমন সত্যি, তেমনই এ-ও সত্যি যে, মানুষজনের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে থাকতে একসময় হাঁপ ধরে যায়।

এলা বলেছিল, তোমাদের বাবাকে একা ফেলে আমি কোথাও যাব না। ওর খাওয়াদাওয়ার কষ্ট হবে।

ফেলে আবার কী? নিজের বাড়িতে নিজের মতো করে থাকব।

অনিয়ম হবে। বিশু থাকছে অবশ্য। তবে ও যা ভুলো। বলে বলে কাজ করাতে হয়। ডেকে না তুললে সকালে ওঠে না। হঠাৎ যদি শরীর খারাপ হয়!

ডাক্তার আসবে। টেলিফোন আছে, বিশু আছে। প্রতিবেশীরা রয়েছে। বিপদে পড়লে কেউ কি দেখবে না? বিকাশ বলেছিল, আমি তো কলকাতা শহরেই রইলাম। বরং তোমাদের নিয়ে চিন্তা। কোথায় কোথায় ঘুরবে। ঠিকমতো খাওয়া জুটবে না। সঙ্গে ওষুধবিষুধ গুছিয়ে নিতে ভুলো না যেন।

এইভাবে নিষ্পত্তি হয়। আগাম টিকিট কাটা, হোটেল বুকিং শেষ করে ওরা যাত্রার দিনটির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। এক-এক করে চারজনের আলাদা আলাদা আপিস থেকে ছুটি মঞ্জুর হয়ে আসে। পুজোর ছুটির সঙ্গে আরও দশ দিন। সারাবছরে একবারই এই লম্বা ছুটি পাওয়ার সুযোগ। কলকাতার বাইরে গিয়ে একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচা।

যাত্রার দিন যত ঘনিয়ে আসে ততই ঘ্যানঘ্যান করে এলা। এই, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে।

বিকাশ বলে, তোমরা দুটো গ্রুপ যাচ্ছ দু'দিকে, কাদের সঙ্গে যাব?

গোরার বউ নয়না সপ্রতিভ মেয়ে, সে-ই আগেভাগে বলে ওঠে, আমাদের সঙ্গে চলুন বাবা। খুব মজা হবে।

বিকাশ সঙ্গে থাকলে কেমন মজা হয়, ও জানে না। শেষবার ওরা সবাই মিলে যখন গোয়ায় বেড়াতে গিয়েছিল, সাতাশি সাল, তখন নয়না এ-বাড়িতে আসেনি। গল্প শুনেছে।

সোমনাথ বলে, মনস্থির করো বাবা। টিকিটের জন্যে ভেবো না। ও আমি ম্যানেজ করে নেব।

এলা বলে, তাই যাও। আমি তোমার বোঝা, ওদের সঙ্গেই যাও।

তা হলে বাড়ি রং করার কী ব্যবস্থা হবে, ভেবে দেখেছ? দেয়ালগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো। টিউবলাইটের মাথা, সুইচবোর্ডের আশপাশ কী কালো হয়েছে। পাইপের ড্যাম্প লেগে প্লাস্টার খসে পড়ছে। রান্নাঘরের দিকে তাকানো যাচ্ছে না, এত তেলকালি। সব পড়ে থাক আর আমি বেড়িয়ে আসি। এখন হাতে টাকা আছে। হলে হল, পরে আর আমার দ্বারা হবে না।

মোক্ষম এই যুক্তি।

একজনকে থেকে, এই বৃহৎ কর্মকাণ্ড উদ্ধার করা দরকার। এ-কাজে বিকাশের চেয়ে উপযুক্ত আর কে। ছেলেরা কোনওদিন মিস্ত্রি খাটায়নি। সবাই মিলে বাড়িতে থাকলে রঙের কাজ করানো যাবে না। আসবাবপত্র উলটুল হবে, জায়গা-নাড়া হবে খাট-বিছানা। ধুলো উড়বে বাড়িময়। তার ওপর কাঁচা রঙের উগ্র গন্ধ। এলার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব না। ওর মাথা ধরে বমি হবে রোজ। আগেরবার যখন বাড়ি মেরামত করা হয়েছিল, তখন শাশুড়ি বেঁচে ছিলেন, এগারো বছর আগের কথা, তিনি একাই ধাক্কা সামলেছিলেন। ছেলেদের নিয়ে এলা গিয়েছিল বড়দার কাছে, রায়পুরে। ফিরে এসে সে কী রাগারাগি। আমার শোবার ঘর কেন সবুজ রং হল না? এই অফ-হোয়াইটে আমার চোখ জ্বলে যাচ্ছে।

ক্রমে সবই সয়ে গেছে। ভাল হোক আর মন্দই হোক, হঠাৎ কোনও পরিবর্তন মানুষ সহ্য করতে পারে না। সইয়ে নিতে সময় লাগে। গোরার সঙ্গে বিয়ে হয়ে নয়না যখন এ-বাড়িতে এল, নতুন মানুষ, নিজেদের পছন্দ করে আনা বউ, তখনও এলা কিছু কম অশান্তি করেনি। প্রকাশ্যে কম, নিভৃতে অনেক বেশি। সে ঝক্কি সামলেছে বিকাশ। একা। এখন দেখো, সে নয়না বলতে অজ্ঞান। খেটে খেটে মেয়েটা রোগা হয়ে যাচ্ছে, এ ওর নিত্য অভিযোগ।

মা গেল, পুত্রবধূ এল। এরপর আর এক পুত্রবধূ আসবে, বা তার আগে হয়তো নাতি-নাতনি আসবে। বিকাশ চলে যাবে। সে বয়োজ্যেষ্ঠ, তার কর্মজীবন ফুরিয়ে গেছে। এখন অবসর, তার মানে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা। সংসারেও তার দরকার ফুরিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। সে আর অপরিহার্য নয়। সে চলে গেলে এলা তখন আর চোখে অন্ধকার দেখবে না। তেমনভাবে নির্ভরশীল ও কখনওই ছিল না অবশ্য। যেমন মা ছিল বাবার ওপর। একেবারে বশীভূত, অধীন, অনুগত। তবু বাবা মারা যাওয়ার পর বছর খানেকের মধ্যে শোক-তাপ ভুলে, বা ভুলে নয়, হজম করে, সিঁথি-কবজি পরিষ্কার করে কালোপাড় শাড়ি গায়ে জড়িয়ে মা আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল। কর্তৃত্ব তুলে নিয়েছিল সংসারের। মায়ের এই পরিবর্তন বিকাশ অবাক হয়ে দেখেছে তখন। আশ্বস্তও হয়েছে। না হলে, বিছানায় অসুস্থ শোকার্ত হয়ে পড়ে থাকলে কে দেখত? তবু ওর মনে হয়েছিল, মেয়েরাই পারে এক অবস্থান থেকে আর এক বিপরীত

অবস্থানের মধ্যে চট করে খাপ খাইয়ে নিতে। প্রকৃতি ওদের সেই শক্তি দিয়েছে। এখন এলাকে মায়ের জায়গায় বসিয়ে ভাবলে কিন্তু মনে হয়, মেয়েদের এই শক্তি, এই সহনশীলতা, তেমন প্রশংসার যোগ্য কিছু গুণ নয়। সততার অভাব, শঠতা। বিকাশ চলে গেলে এলা স্বামীকে খুব বেশিদিন মিস করবে না। এমনিতে সিঁদুর তো পরেই না ও, কাজের জায়গায় কেমন বোকা বোকা দেখায়। হাতে ওর শাঁখাও নেই। বিকাশের জন্যে এক ধরনের উদ্বেগ ও মনের মধ্যে পোষে, যৌবনকালে যেখানে আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই উদ্বেগ আর থাকবে না। ও মুক্তি পাবে, বলা যায়।

সবাইকে মুক্তি দিয়ে এই দুনিয়া থেকে একদিন চলে যেতে চায় বিকাশ। খুব শিগগিরই একদিন চলে যেতে চায়। এই বাড়ি থেকে ওর ডেডবডি বেরোবে। এই মোজেক, টালি, মার্বেল, সিমেন্ট, পেন্ট, প্রাইমার, এনামেল ডিসটেম্পার—সবকিছুকে পেছনে রেখে ও বিদায় নেবে। প্রাণ আর এই দেহটাকে বইতে পারছে না, ওর মনে হয়। এ কি ক্লান্তি? না, একাকীত্ব? না, শেষ জীবনে এসে বুঝতে পারা সমূহ ব্যর্থতার সংবাদ? একটা গোটা জীবন পার হয়ে গেল অথচ দুনিয়াকে এক চুল এগিয়ে দিতে পারেনি বিকাশ। এ তো ব্যর্থতাই। থাকল শুধু ওর শরীরের রস থেকে উৎপন্ন ফল, দুই সন্তান। তাদেরও সন্তান হবে। তারা সবাই এই দুনিয়ার জনসংখ্যায় গিয়ে যোগ দেবে। পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করবে। তাদের চোখের কোণে, আঙুলের ডগায়, নখের ভেতর লুকিয়ে থাকবে বিকাশের বীজ, ওদের উৎসাহ দিয়ে বলবে, এগিয়ে যাও, পেছন দিকে তাকাবে না। এগিয়ে কি সত্যিই যায়, না, বরং পালটে পালটে কোনও এক কেন্দ্রের চারদিকে ঘোরে—জীবন কী, বিকাশ আজও বুঝতে পারেনি।

মকবুল এসে দেখে, বাবু মন খারাপ করে বসে আছে। ওর ঘাড়ে একটা পেল্লাই বড় ঘড়াঞ্চি। ওর পেছনে দুই শাগরেদ। তাদের হাতে ছোট ছোট বালতি, বুরুশ। বলল, বাবু, আমরা এসে গেছি। আজ থেকে আমরা কাজ আরম্ভ করব।

বিকাশ বলে, বেশ তো, করো। কোথা থেকে কীভাবে কাজ শুরু করবে নিজেরা ঠিক করে নাও। মোটামুটি কথা তো আমি তোমার সঙ্গে বলে নিয়েছি।

মকবুল বলে, সে আপনাকে ভাবতে হবে না। কাজ দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। ফাঁকি দিয়ে টাকা আমি নিই না, বাবু। নিয়ে পালাব কোথায়? আপনি আমায় ধরবেন না?

মার্ল কেনার জন্যে দু'হাজার টাকা আগাম নিল মকবুল। বলল, যেমন যেমন কাজ এগোবে, তেমন তেমন নোব। আপনি লিখে রাখুন। গরিব মানুষ, না হলে এত বড় কাজ করি কী করে?

প্যান্ট ছেড়ে যে-যার লুঙ্গি পরে কাজে নেমে যায়। দেখতে দেখতে সমস্ত বাড়িটা ধুলোয় ভরে গেল। তার মধ্যে নাকে তোয়ালে চাপা দিয়ে বিকাশ ঘুরে ঘুরে কাজ দেখে। কাজের ধরন দেখে। পরিসর নিয়ে মিস্ত্রিরা মোটেই চিন্তিত নয়, এ-ঘরে ও-ঘরে কোনও পার্থক্য ওরা বোঝে না। ওদের দরকার দেয়াল আর ভেতরকার ছাদ যাকে বলে সিলিং। চারদিক থেকে সমস্ত আলমারি, টেবিল, আয়না, বুকশেল্ফ টেনে মাঝখানে জড়ো করে দেয়ালগুলো খালি করে ফেলেছে। টাঙানো ছবি, ফটোগ্রাফ, ক্যালেন্ডার খুলে খুলে ডাঁই করে রেখেছে বিছানায়।

বিকাশ ধুলোর মধ্যে ঘুরে ঘুরে ঘড়িটা, কলমটা, ওষুধের শিশি, ট্রানজিস্টার, কোলন, কাগজচাপা কুড়িয়ে আনে আর আলমারির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে। ডামাডোলে যাতে না হারিয়ে যায়।

বালিকাগজ দিয়ে দেয়াল ঘষতে ঘষতে দেখল মকবুল। বলল, বাবু আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, একটি জিনিসও হারাবে না।

বিকাশ অপ্রস্তুত হয়ে বলে, তা নয়, জায়গা নাড়া হবে, পরে আর খুঁজে পাবে না ওরা, তাই সাবধান হচ্ছি। তোমাদের কিছু লাগবে?

চেয়ে নোব। আপনার কাজের লোক তো আছে, তার থেকে চেয়ে নোব।

ফিরে এসে বিকাশ তার নির্দিষ্ট সোফায় বসে পড়ে। একটা সিগারেট ধরায়। কিছু করার নেই। কেবল ধুলো খাওয়া আর পাহারা দেওয়া। সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি। মাঝখানে আধঘণ্টা মিস্ত্রিরা খেতে যায়, সেই ফাঁকে চান করে খেয়ে নেওয়া। চারদিকে স্তূপাকার জিনিসপত্র, চাদর বেডকভার দিয়ে ঢাকা, হাঁটাচলার জায়গা বন্ধ। বসে বসে একসময় ঘুমিয়েও পড়ে।

এই রকম এক দুপুরবেলা বিকাশ সোফায় হেলান দিয়ে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন, কে যেন ডাকল, বাবু!

তাকিয়ে দেখে, ঘড়াঞ্চির ওপর থেকে মিস্ত্রিদের একজন ডাকছে।

বাইরের দরোজা খোলা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা, হাতে একটা সুটকেস।

এলাদি নেই?

না। ওরা কেউই নেই। কলকাতার বাইরে গেছে। বিকাশ সংক্ষেপে জবাব দেয়।

এ-মা, তাই নাকি? নেই? কী হবে তা হলে? ভারী মুশকিল হল যে।

বিকাশ সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায়। দরোজাব কাছে এগিয়ে যায়।

মহিলা অল্পবয়সি। পরনে ছাপা শাড়ি। বেশ লম্বা, ছিপছিপে। যামিনী রায়ের ছবির মতো বড় বড় চোখ। বুকে মাংস নেই।

আমি লিলি। এলাদির বোন।

তোমাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

কী করে দেখবেন? এলাদির বিয়ের পর আমার জন্ম।

ভেতরে এসো।

ভেতরে এসে লিলি তার হাতের সুটকেসটা নামিয়ে রাখে দেয়াল ঘেঁষে। ঘরের মাঝখানে চাদর-ঢাকা স্তূপেব ওপর একটা কাঠেব চেয়ার উলটিয়ে রাখা, সেটাই টেনে আনে সোফার কাছে। বসে। ঘাড় উঁচু করে ঘরের চাবদিক তাকিয়ে দেখে।

বং হচ্ছে বুঝি?

হ্যাঁ। দেখো না, কী এলোমেলো অবস্থা। কোথায় যে তোমায় বসতে দিই।

এই তো ঠিক আছে। আপনি, বিকাশদা, উঃ কী বুড়ো হয়ে গেছেন। চেনাই যায় না।

বিকাশ বলে, কী যেন নাম বললে তোমার? লিলি না? তো লিলি, এলা কি জানত তুমি আসবে? কোথা থেকে আসছ এখন?

সকালেব ফ্লাইটে এসেছি। কলকাতায় একটা কনফারেন্স আছে। ভাবলাম, একদিন এলাদির কাছে থাকব। খবরটবর দিতে পারিনি।

বিকাশ ধন্দে পড়ে যায়। বলে, এই তো দেখছ বাড়ির অবস্থা। তোমাকে কী কবে থাকতে বলি?

এ-কথায় ঘাবড়ায় না লিলি। ও ফিরে যাবার জন্যে আসেনি, কার্যসিদ্ধি করতে এসেছে, এই রকম মনোভাব। ইতিমধ্যে শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে নিয়েছে। জিনিসপত্র ডিঙিয়ে এ-ঘর ও-ঘর দেখতে শুরু কবেছে।

ওমা। এতগুলো ঘর। সব তো খালি। থাকার কী অসুবিধে? এই যে ছোট ঘরটা—একখানা খাট দেখছি। থাক, ওটা যেমন আছে থাক। আমি এক কোণে জায়গা করে নেব। মাদুর আছে?

মাদুব? থাকাব তো কথা। কিন্তু কোথায় যে আছে, বলতে পারব না।

সে-সব আমি খুঁজে বার করে নেব। আপনি ভাববেন না বিকাশদা। আপনি নিজে কোথায় শুচ্ছেন?

ওই যে বড় সোফাটায়। চাদবমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকি।

কী কাণ্ড। লিলি বলে, এভাবে চলে নাকি? রাত্তিরে একটা বিছানা পেতে দেওয়া যায় না? মিস্ত্রিরা তো রাত্তিরে কাজ করবে না? তবে? ওরা চলে গেলে ঘর পরিষ্কার করা যায়। যেদিন যেমন সম্ভব। কাজের লোক আছে, না তাকেও নিয়ে গেছে এলাদি?

বিকাশ মৃদু মৃদু হাসে।

না, না, বিশু আছে। ও রান্নাবান্না করে। বাজার করে। রাত্তিরে থাকার কথা। এই এলোমেলো অবস্থায় সে-ও টিকতে পারছে না। কোনও রকমে কাজ সেরে পালিয়ে যাচ্ছে। বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারাদিন। আসবে। চা করতে আসবে একবার।

বিকাশ আমতা আমতা করে বলে, ওটা সোমনাথের ঘর। মিউজিক টিউজিক কী সব আছে ছড়ানো চারদিকে, তার। তুমি বরং ওর পাশের ঘরটায়—গোরাদের শোবার ঘর, বড় আয়না আছে, ওখানে থাকো। কতদিনের কাজ তোমার? এলার বোন বললে না? তুমি লিলি, তোমাকে তো হোটেলে যেতে বলতে পারি না। অসুবিধে হবে। একা আমি কতদিক সামলাই? তোমার যা দরকার, বিশুকে বলে করিয়ে নিয়ো।

সেদিন রাতটা কোনও রকমে কেটে যায়।

পরের দিন সকালে উঠে বিকাশ দেখে, লিলি স্নানটান সেরে জিনস আর ফতুয়া পরে প্রস্তুত। যদিও যামিনী রায়ের ছবির মতো ওর চ্যাপটা ফিগার, তা হোক, বেশ সপ্রতিভ মেয়ে। এলার মতো হংসেশ্বরী না। নয়নার মতো ঘুমকাতুরেও না।

আপনজনের মতো লিলি বলে, ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন আমার পেশা। তোমার বাড়ি আমি সাজিয়ে দেব বিকাশদা। কিচ্ছু ভেবো না।

তোমার কনফারেন্স?

চুলোয় যাক। মনের মতন একটা কাজ পেয়েছি। ওদের ফোন করে দিচ্ছি, প্রথম ক'দিন আমি যেতে পারব না। ওরা কাজ চালিয়ে যাক। পরে আমি ওদের সঙ্গে জয়েন করব। টেলিফোনটা কোথায়?

দেখা গেল, রান্নাঘরের পাশে, মেজের ওপর, গামলা চাপা দিয়ে রাখা আছে। বিশু মাছ ভাজছে ভেতরে। সারা বাড়ি ভাজা মাছের গন্ধে ম' ম' করছে।

মকবুল আসতেই লিলি বলল, দেখো মিস্তিরি ভাই, আমি যে রকম বলব, সেই রকম কাজ হবে। রংটং এখনই কিনো না। বালিকাগজ ঘষার কাজ হয়ে গেছে দেখছি। আজকের দিনটা প্রাইমার লাগাও। আমি বাবুর সঙ্গে কথা বলে নিই। একখানা করে ঘর শেষ করবে, তারপর আরেকটা ঘর ধরবে, কেমন? আমি বুঝিয়ে দেব।

বিকাশকে বলল, আমি কার্পেন্টার পাঠাতে বলেছি। এখুনি এসে পড়বে। তোমাদের এইসব মান্ধাতার আমলের খাট-আলমারি এখন অচল।

বিকাশ বলে, আমার বাজেট কিন্তু অফুরন্ত নয়। আমার ওপর দিয়ে তোমার বিদ্যে জাহিব করতে গেলে মুশকিলে পড়ে যাব।

ডোন্ট ওয়রি। তোমার কাঠগুলো জবরদস্ত। আসল টিক। এখন পাওয়াই যায় না। শুধু লেবাব চার্জ লাগবে। ডিজাইন আমি করে দেব, ফ্রি। কিছু রং, টুকিটাকি। তোমার বাজেট একসিড করবে না।

এরপর থেকে বাড়ির মধ্যে কারখানা বসে যায়। একদিকে মকবুল আর তার দুই শাগবেদ। অন্যদিকে চিনে কার্পেন্টার চু-লিং আর তার সহকারী, শম্ভু। লিলির মাথায় ফেট্টি, পরনে জিনস-ফতুয়া, হাতে ড্রইংখাতা আর গজ-ফিতে। কানে পেনসিল। একটা করে ঘর। বিকাশ দেখছে, ভেঙেচুরে শেষ কবে দেওয়ার পর ধীরে ধীরে ভগ্নস্তূপ থেকে কেমন করে গড়ে উঠছে শোভা। পারিপাট্য।

রান্নাঘরে শ্বেতপাথরের পাটাতন বসল। জানলার ওপরে একজস্ট ফ্যান। বাসন ধোয়াব সিঙ্ক স্টেনলেস স্টিলের, তাব মাথায় কিচেন ক্যুইন। শেলফ, জাল-আলমারি বাতিল করে দেয়াল-জোড়া তাক। সানমাইকা খোপে খোপে, বাসনপত্র থেকে শুরু করে রান্নার সরঞ্জাম রাখার জায়গা। যে বান্না করবে, তাব উচ্চতা তার হাতের নাগাল অনুযায়ী সেইসব খোপের অবস্থান। নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র কাছে। অবরেসবরে ব্যবহারের জিনিস দূরে। ফ্রিজের পাশে দেয়ালে-গাঁথা আলু-পিঁয়াজ রাখাব বাকস। শ্বেতপাথরের পাটাতনের নীচে একদিকে গ্যাস সিলিন্ডার, সে-ও ঢাকনা দেওয়া, অন্যদিকে স্লাইডিং পাল্লা দেওয়া ক্যাবিনেট। রান্নাঘরের দরোজার মাথার ওপর গড়ে উঠল একটি লফ্‌ট। বড় বাসন রাখাব জায়গা। বাইরে কাচের বাসনের পৃথক গৃহ। উনোনের ওপরে এক চিমনি। রান্নাঘরের দেয়ালে তেলরং—পেল ক্রিম। ঘরে আলো হবে। ইচ্ছেমতো সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলা যাবে। বাসন মাজার জায়গায় সাদা টালি। কাজ শেষ হবার পর বিকাশ দেখল, ঘরটায় শোয়া যায়, এমন ঝকমক করছে।

স্পার্টেকের দানাদার টালি বসল বাথরুমের মেজেয়। দেয়ালে মাথা অবধি উঁচু ফিবোজ নীল মসৃণ উজ্জ্বল টালি। নতুন বেসিনের নীচে মাপসই খোপের মধ্যে ঝাঁটা বুরুশ রাখার জায়গা। জানলার পরদা ফেলে দিয়ে ঘষা কাচ। শাওয়ারের নীচে প্লাস্টিকের ঘেরাটোপ।

লিলি বলল, ছোট বাথরুমে ওয়াশিং মেশিন রাখার পয়েন্ট করে দিলাম, যদি কখনও কেনো তোমরা। আর বড় বাথরুমে গিজার পয়েন্ট। তিনটে বেসিনে আলাদা গরম জলের ট্যাপ এনে দিয়েছি। শীতকালে কাজে লাগবে।

বিকাশ বলে, বাড়িটাকে হোটেল করে তুললে যে। ঘরোয়া ভাবটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না?

আমি শুধু জায়গা বাড়িয়ে দিচ্ছি। কলকাতা শহরে জমির কত দাম। ফ্ল্যাটবাড়ি কিনতে যাও, দেড় হাজার টাকা বর্গফুট। এক বর্গফুট জায়গা বাঁচলে দেড় হাজার টাকা লাভ। পদে পদে ঠোক্কর লাগছে ফার্নিচারে, দেখছ না?

দু'খানা কাঠের আলমারি ভেঙে দু'ঘরে খাটের নীচে ড্রয়ার করে দিল। এর মধ্যে লেপ, তোষক, কম্বল, অতিরিক্ত বালিশ মশারি থাকবে। লিলি বলে, আলমারি শুধু পোশাক ঝোলাবার জন্যে, যাকে বলে ওয়ার্ডরোব। গুদোম ঘর নয়।

লিলি বলে, স্বামী-স্ত্রী শোবে, তার জন্যে দু'খানা আলাদা খাট কেন? সাতফুট জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। একখানা জোড়া খাট লাগাও, ছ'ফুটে হয়ে যাবে।

ওটা থাক। বিকাশ আপত্তি জানায়, আমাদের বিয়ের বিছানা। এলা রাগ কববে।

এখনও কি গড়াগড়ি খাবার বয়েস আছে বিকাশদা। ঘেঁষাঘেঁষি শোও।

গায়ে পা লাগবে।

বিছানা কি ফুটবল মাঠ? ভেবে দেখোনি কখনও, তাই এ রকম মনে হচ্ছে। এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি।

তারপর জোর করে বিকাশকে পাশে শুইয়ে পাশ ফিরে, চিত হয়ে, উপুড় হয়ে, লিলি প্রমাণ করে দেয়, একখানা বড় খাট দু'জনার পক্ষে যথেষ্ট। দু'খানা আলাদা খাটের দরকার নেই।

শুয়ে শুয়ে বিকাশ বলে, আমাকে তুমি কী ভেবেছ লিলি? একটা গাছ? আমি মানুষ না? আমার রক্ত গরম হয় না? তুমি যুবতী, তোমার জামার পারফিউমেব গন্ধ আমার নাকে লাগছে। যদি চেপে ধরি, জড়িয়ে ধরি তোমাকে, তোমার দম বন্ধ হয়ে যাবে।

এই তো চাই। লিলি হাসতে হাসতে উঠে বসে, এই যে যুবতী বলে আমায় স্বীকার করলে, তাতেই প্রমাণ হয়, তুমি বুড়ো হয়ে যাওনি। তোমার চুল পেকেছে কিন্তু শরীরের তেজ নষ্ট হয়নি। তুমি এলাদিকে শবীরে পাও না বলে কষ্ট ভোগ করো।

রজনিবৃত্তি ঘটে গেছে ওর। তুমি জানো না—

তাতে কিছু এসে যায় না।

এখন গায়ে হাত দিলে ও হেসে ওঠে। বলে, কাতুকুতু লাগছে, ছাড়ো ছাড়ো।

বলে বুঝি? ওটা মেয়েদের একটা ট্রিক। যাকে চাইছি না, তার ওপর আমিও এই ট্রিক চালাই বিকাশদা। না হলে আঘাত দেওয়া হয়। এখন নতুন রং হল। রঙের গন্ধে কামনা-বাসনা বৃদ্ধি হয়। এলাদিরও হবে।

বিকাশ বলে, তুমি একটি জ্ঞানী বুড়ি।

কাজের ফাঁকে ঘুরতে ঘুরতে লিলি বাব বাব ফ্রিজের কাছে যায়। ওর প্রিয় জিনিসটি আনিয়ে রাখে বিকাশ।

লিলি জিজ্ঞেস কবে, এই সাইজের রসগোল্লা এখন কত করে?

দু'টাকা।

দু-ট-টা-কা। বলতে বলতে রসগোল্লার টুঁটি চেপে ধরে লিলি। একটার-পর-একটা মুখে পুরতে পুরতে বলে, মানুষ কী খেয়ে বাঁচবে? তবু যাই বলো, কলকাতায় একমাত্র রসগোল্লাই ভেজালমুক্ত।

বসার ঘরে দুই দেয়ালে দু'রকম রং করা হল। একদিকে হালকা পেস্তা, অন্য দিকে পিঙ্ক লিলি। সিলিং অফ হোয়াইট। সোফা সেট সরিয়ে দিল লিলি। ওই কৌচে বসলে মানুষের পিঠ বেঁকে যায়। বাইরের লোক সোফায় বসলে আর উঠতে চায় না। এখন সেই উনিশ শতকের আরামের দিন আব নেই। পাতলা গদি-মোড়া বেঞ্চি বসল দেয়াল ঘেঁষে। আর একটা ঝোলা দোলনা।

লিলি বলে, জ্ঞানী বুড়ি নই বিকাশদা, এ আমার পেশা তো, আমি শিখেছি। দোল খেলে মানুষের মাটির ওপর টান বাড়ে, দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন হয়। এ-সবই একঘেয়েমি কাটাবার ওষুধ। তুমি মেজের ওপর চিত হয়ে শুয়ে দেখো, বাড়িটা অন্য রকম দেখাবে। বাড়ির আরেক নাম গৃহ। গৃহ মানে কী বলো তো? যা তোমায় গ্রহণ করবে।

বাড়ির বাইরে ঢাকের শব্দ মিলিয়ে গেছে। দেখতে দেখতে বাড়িটা নতুন সাজে সেজে উঠল। কোথাও একটু আড়াল হল, কোথাও খোলামেলা। প্রবেশদ্বারের মাথায়, ভেতর দিকে, বসল এক চ্যাপটা কোয়ার্জ ঘড়ি, তার দুটো কাঁটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। যেমন এই ডানপিটে মেয়েটা। খেপে খেপে টাকা ছাড়তে ছাড়তে বিকাশ দেখল, খরচ পঁচিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

লিলি বলল, এবার আমি একটা ডেমো দেব।

ডেমো কী জিনিস? খুব দামি কোনও উপহার তুমি আমায় দিতে চাও? আমি কি তার যোগ্য?

বিশুকে বলতে হবে, কয়েক কাপ চা, আর কিছু স্ন্যাক্স। আমার কনফারেন্সের লোকেরা এসে দেখবে, বক্তৃতা দিয়ে যা বোঝানো যায় না, তা করে দেখাতে হয়। মকবুল আর চু-লিং আমাদের গেস্ট অব অনার।

সেদিন রাত্রে ট্রাঙ্ককল এল মাদুরা থেকে।

এলা বলে, হ্যালো। ভাল আছ তো? রং করার কাজ কতদূর?

বিকাশ বলে, প্রায় শেষ। লিলি এসে আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে।

লিলি কে?

তোমার বোন?

ও-নামে আমার কোনও বোন নেই।

তুমি হয়তো জানো না। তোমার বিয়ের পর ওর জন্ম। সেই কথাই তো বলল। ভারী ইন্টারেস্টিং মেয়ে।

কী বলছ তুমি, আমি বুঝতে পারছি না। আমি কার সঙ্গে কথা বলছি? হ্যালো, হ্যালো—

বিকাশ। বিকাশ চক্রবর্তী। তোমার বর। যাকে ধুলোর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে তুমি দেশভ্রমণে বেরোলে। তা বলো, তোমাদের বেড়ানো কেমন হল। কবে ফিরছ?

রোববাব। টিকিট অনুযায়ী রোববার সকাল দশটায় হাওড়া স্টেশন। একটু দাঁড়াও। যেই না আমি বেরিয়েছি, অমনি বাড়িতে লোক ঢুকিয়েছ। জ্বালাতন। শোনো, আমরা হয়তো প্লেনেই ফিবব। শোনো, সুকুমাব বলছে, প্লেনের টিকিট পেলে কালই আসছি। না হলে পরশু।

বিকাশ আস্তে আস্তে বলে, এখানে খুব রঙের গন্ধ। কাল আর এসো না। তা ছাড়া কাল আমাদের ডেমো আছে। লিলি বলছে, পরশু সকালে ও চলে যাবে। তোমরা তারপর এসো। আমার বাড়ি রং কবিয়ে ওর সুনাম হয়েছে।

দোলনায় দুলতে দুলতে লিলি বলে, অন্তত পাঁচ লাখ টাকাব অর্ডার পাব আশা করছি। ওকথা আর বলে কাজ নেই। কলকাতায় এক জামাইবাবু পেলাম, সেটাই বড় লাভ।

১৯৯৪

❀ বালি

পুরুলিয়া থেকে যে-বাসগুলো কলকাতার দিকে যায়, সকাল সকাল বাসস্ট্যান্ডে না পৌঁছোলে সে-বাস ধরা অসম্ভব। তা ছাড়া, দূরপাল্লার বাস, ভরতি হয়েই আসে। সবাই যে কলকাতায় যায়, এমন নয়। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আরামবাগ স্টপে যাত্রী নামে। তবে নামে যত, ওঠে তার চেয়ে বেশি। লোকজন বাড়ছে, মানুষের চলাচল বাড়ছে কিন্তু সে-অনুপাতে বাস বাড়ছে কই।

একটা ভাল রেস্তরাঁয় ঢুকে চিকেনকারি-রাইস খেয়ে নেবে, ভেবেছিল কাঞ্চন। ছ'ঘণ্টার জারনি টোস্ট আর ডিমভাজার ওপর চালানো যাবে না। আবার ভাবল, দুর্গাপুর অচেনা শহর, কাল থেকে ট্যাক্সিভাড়াই গেছে তিপ্পান্ন টাকা। এখন রেস্তরাঁ খুঁজতে খামোকা দশ টাকা উপরি দণ্ড দেবার কোনও মানে হয় না। বাসস্ট্যান্ডের ধারে-কাছে ভাতের হোটেল থাকবেই।

ছিল। বেশ কয়েকটা হোটেল। দেখতে কিন্তু সবগুলোই একরকম। বাইরে জলের ড্রাম, মগ, খেয়ে উঠে লোকে কুলকুচো করছে। ভেতরটা আধো-অন্ধকার, বেঞ্চিপাতা। ঢোকার মুখে বাকস কোলে একটি করে গেঞ্জি-পরা মালিক। মালিকের পেছনের দেয়ালে মূল্যসহ খাদ্যতালিকা ও ছোট কালীমূর্তি।

সবচেয়ে মোটা চেহারার হোটেল মালিককে দেখে কাঞ্চন ঢুকল। হাইজিন ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হল সম্ভবত। মাথায় ছিল চিকেনকারি-রাইস, এখানেও তাই অর্ডার দেয় কাঞ্চন। হাফ প্লেট চিকেন।

স্টেনলেস স্টিলের থালা-গেলাস দেখে হাফপ্যান্ট-পরা ছোকরাকে বলে, "গরম জলে ধুয়ে দেবে বাসন।"

"এখানে সবকিছু গরম পাবেন।" পেছন থেকে ঝাঁকিয়ে ওঠে হোটেল মালিক।

এদিককার ভাতে একটু বালি থাকে, লক্ষ করেছে কাঞ্চন। লোকে কিন্তু তৃপ্তিসহকারে খাচ্ছে। সামনের বেঞ্চিতে-বসা লোকটির পাতে প্রমাণ সাইজের কাতলা মাছের মুড়ো, চোখ বুজে চুষছে। পাইস সিস্টেমের ভাত, কৃপণের মতো পরিবেশন করছে কাঁচের প্লেটে সাজিয়ে অথচ ডাল-আলুভাজা ফ্রি। ভাতের হোটেলের এই হল ঐতিহ্য। কাঞ্চন ভাবে, চা খেয়ে খেয়ে মানুষের পেট মরে গেছে আজকাল, কতখানি ভাত খেতে পারে একজন? সবসুদ্ধ পাঁচ টাকার বিল উঠলে তার মধ্যে চাব টাকাই তো মাছের টুকরোর দাম। ওই কাতলা মাছের মুড়োটা অন্তত একাই ছ' টাকা। তবে, বলা যায় না, গ্রামেগঞ্জে এমন লোক হয়তো আছে যে, শুধু ডাল-ভাত-আলুভাজা খেয়ে ফতুর করে দিতে পারে হোটেলকে। আলুভাজা নুনে পোড়া আর মসুর ডাল শুধুই ফ্যান বুঝতে পেবে ও সরিয়ে রাখল।

মাংসটা ছিবড়ে নয়, সুসিদ্ধ। ঝাল ঝাল ঝোল দিয়ে তিন প্লেট ভাত খেয়ে উঠে পড়ে কাঞ্চন। মোটা চালের ভাত, কিন্তু মিষ্টি। কোমরে বেল্ট এঁটে বসেছে। লোকটির পরনেব ধুতি হাঁটু অবধি গোটানো। একখানা পা বেঞ্চির ওপর তোলা। কাঞ্চন শেষবারের মতো মাছে-মানুষে যুদ্ধ দেখে নিচ্ছিল। মুড়োটাব দু'পাশেব দেয়াল ততক্ষণে ধসে গেছে, দুর্গের একেবাবে মাঝখানে লোকটিব দাঁত।

"কলকাতায় যাবেন?" ওই অবস্থায় লোকটি জিজ্ঞেস কবে।

ব্রিফকেসটা তুলতে তুলতে কাঞ্চন বলে, "হ্যাঁ। এখন বাস আছে?"

"তাড়াতাড়ি গেলে সাড়ে এগারোটার এক্সপ্রেস ধবতে পারবেন। এখান থেকে ছাড়ে।"

দুর্গাপুর থেকে যখন ছাড়ে, তখন বসার জায়গা একটা পেয়ে যাবে ভেবেছিল কাঞ্চন। কিন্তু উপস্থিত হয়ে দেখে, নেই। জায়গা জুড়ে লোক বসে আছে, নয়তো রুমাল পাতা। রুমাল না হলে একটা পুঁটলি বাখা। বাঁ দিকেব সারিতে মেয়ে-যাত্রীব দল কলব কলব কবছে। কোলে-কাঁখে বাচ্চা। গ্রাম্য। গরিব।

নেমে যাবে কিনা ভাবছে এমন সময় শার্ট-প্যান্ট-পবা এক ভদ্রলোক, পরে জেনেছে সে এই বাসের কনডাক্টর সর্বজনশ্রদ্ধেয় যোগীনদা, ওকে জায়গা কবে দিল। ওই বাঁ দিকের সারিতেই। আরাম করে বসে একটা সিগাবেট ধরাল কাঞ্চন।

বাস ছাড়ল দশ মিনিট লেটে।

দেখতে দেখতে বাসেব মধ্যে গিসগিস ভিড়। দড়িবাঁধা পুঁটলি-পোঁটলা যত্রতত্র রেখে অনেকেই দাঁড়িয়ে গেছে হ্যান্ডেল ধবে। পাশেব লোকটির পরনে ময়লা ধুতি, গায়ে সবুজ বঙের পাঞ্জাবি। কড়ে আঙুলেব কাছে তালি-মারা কালো জুতোজোড়াব ওপব পা দুটি অবস্থান করছে। লোকটির তোবড়ানো মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। পায়েব নখ ময়লা। পান চিবোচ্ছে। তার নিশ্বাস থেকে জর্দা-মেশানো পানের কটুগন্ধ পেয়ে কাঞ্চন মন তুলে নিল।

ভিকার্সের কাজটা হয়ে গেলে শ'দুয়েক টাকা মাইনে বাড়বে। সেটা কিছু না। সবচেয়ে বড় কথা হল, ওরা কোয়ার্টার দেবে, ফ্যামিলি কোয়ার্টার। কলকাতায় মেসের জীবন আর ভাল লাগছে না। কোম্পানির বাস তুলে নিয়ে যাবে আবার বাড়ি পৌঁছে দেবে সন্ধেবেলা। ওখানে নাকি ভাল ভাল ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল আছে, একেবারে কেজি থেকে পড়ায়। ওদের কুড়ি পারসেন্ট বোনাস সকলেব জন্যে বাঁধা। জানলার বাইরে সবুজ ছককাটা মাঠ দিগন্ত অবধি বিস্তৃত, তার ওপবে থোবা থোবা ভারী মেঘ। মাঠের ওপর দিয়ে হাইটেনশনের অতিমানবেরা বিদ্যুৎ টেনে নিয়ে চলেছে। কাঞ্চন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে। নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে, যদিও দুর্গাপুর শহরটাকে ওর খানিকটা অবাস্তব মনে হয়েছে। কারখানা আর কোয়ার্টার নিয়ে শহরটা। বাঁচার জন্যে কাজ, না কাজের জন্যে বাঁচা? হাফ প্লেট চিকেনসহ গরম ভাত খাওয়ার তৃপ্তি কাঞ্চনের মনের মধ্যে এই প্রশ্ন হঠাৎ তুলে বসল।

হেসে ফেলে কাঞ্চন। উনত্রিশ বছর বয়সে স্বপ্ন দেখা মানায় না। উচ্চাশাবান ইঞ্জিনিয়র সে, হাতেনাতে কাজ করা মানুষ। অনেকের চেয়ে বেশি কুশলতা ওর আয়ত্তে। পদোন্নতি ওর হবেই। তারাতলার কারখানায় ও দাসখত লিখে আসেনি। যথাসময়ে যোগ্য মর্যাদা ওরা না দিলে অন্য কেউ দেবে। তবে, ফ্যামিলি কোয়ার্টারের আশ্বাস পেয়ে, ওদের সিদ্ধান্ত জানার আগেই, 'ফ্যামিলি' শব্দটা ঘিবে ঘুরে ঘুরে ঘুঙুর পায়ে এক কাল্পনিক নারী এবং একটি কি দুটি কাল্পনিক শিশুর চারদিকে নেচে বেড়ানো

দিবা স্বপ্নেও বাড়াবাড়ি হয়েছে। নিজের কাছে নিজে লজ্জা পায় কাঞ্চন। কবজি উলটে দেখে, ঘড়িতে দুটো বাজতে পাঁচ।

ত্রাহি ত্রাহি শব্দে বাস ছুটেছে। নির্জন দুপুরে ফাঁকা রাস্তায় কেন যে ড্রাইভারকে অবিরাম হর্ন বাজাতে হচ্ছে, কাঞ্চন বোঝে না। একঘেয়েমি জনিত বিরক্তি কাটাবার জন্যে?

বাসের মধ্যে মন ফিরিয়ে আনতেই কাঞ্চন শুনতে পায়, একজন কালো শার্ট-পরা ছোকরা ওর সামনের সিটটা থেকে বলছে, "পাঁচ টাকা আছে যোগীনদা, আর নেই। মাইরি বলছি।"

ইলেকট্রনিক ঘড়ি-পরা ডান হাত বাড়িয়ে ছোকরা পাঁচ টাকার সবুজ দোমড়ানো নোট কনডাক্টরের হাতে ধরিয়ে দিল। যোগীনদা রসিদ কাটল না।

ওপাশ থেকে একটা বাস আসছে। বাসটার কপালে বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'জয়দ্রথ'। দু'খানা বাস পাশাপাশি যাবার মতো চওড়া নয় রাস্তা। জয়দ্রথকে ধুলোয় নেমে দাঁড়াতে হল। এক্সপ্রেসও একদিকের চাকা ধুলোয় ঠেকিয়ে গতি মন্থর করে, কিন্তু থামে না। তারপর এক ঝাঁকানি দিয়ে গতি বাড়িয়ে দেয়। ধুলো ওড়ে, গেরুয়া রঙের ধুলো। ছুটতে থাকে এক্সপ্রেস। জয়ের উল্লাসে বিড়ি ধরায় কেউ কেউ।

সম্ভবত জয়ের উল্লাসেই এক্সপ্রেস তার ভেঁপুতে ছন্দ-পরিবর্তন করে। লাগাতার ত্রাহি ত্রাহি শব্দের বদলে এখন 'আয় চাকার তলায়, আয় চাকার তলায়', এই রকম এক নৃত্যের ছন্দ। ছন্দের দোলায় যাত্রীদের চোখে তন্দ্রা আসে।

কাঞ্চন মন তুলে নিল আবার।

বাইরের দৃশ্যে পটপরিবর্তন হয়েছে, লক্ষ করে কাঞ্চন। উঁচু-নিচু কাঁকুরে মাটি। ছাড়া ছাড়া ধানখেত। শুকনো হাওয়া। ইতস্তত খেজুর গাছ, তালগাছ একলা দাঁড়িয়ে। যেখানে চাষ নেই, সেখানে গোরু-ছাগল চরছে, ঘাস-পাতা খাচ্ছে। দূরে মাঠ পেরিয়ে গ্রাম, জনবসতি কম, তার পিছনে অরণ্য। শালের জঙ্গল। অগস্টের শেষ এখন, বৃষ্টি যা হবার তা হয়ে গেছে, তবু বাতাসের গন্ধে কাঞ্চন টের পায়, এখান থেকে নদী অনেক দূরে। দামোদরের ক্যানাল এদিকটায় কাটা হয়নি। এই রাঢ় লালমাটির দেশে কঠোর পরিশ্রম করলে ফসল ফলে। বৃষ্টিপাতে উনিশবিশ হলে খরায় পুড়ে যায় মাঠের নরম ধান। বাংলার এই অঞ্চল দেখতে অপেক্ষাকৃত রুক্ষ, এই অঞ্চলের মানুষ দরিদ্র। প্রকৃতির অনুগ্রহবঞ্চিত মানুষ অনুভবনশীল হয়।

"একটু সরে বসুন।"

নারীকণ্ঠ কানে যেতেই চটকা ভাঙে কাঞ্চনের। ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝি। পায়ের কাছে ব্রিফকেসটা সোজা করে রেখে সরে বসল ও। ঘড়ি দেখল, পৌনে তিনটে। রোদের তাপে বাসের ভেতরটা বেশ গরম।

কাঞ্চন আড়চোখে দেখে, মেয়েটার পরনে লাল-কালো ফুলছাপ শাড়ি। নাইলন। কোলে এয়ারলাইনের ব্যাগ। শাড়িতে ঢাকা থাকায় পা বা চপ্পল দেখা যাচ্ছে না। চোখে চশমা। বাঁ হাতের মাঝের আঙুলে শাঁখের আংটি। ভাবল একটা সিগারেট ধরাবে, কী ভেবে ধরাল না। সবুজ পাঞ্জাবি-পরা লোকটা গেল কোথায়? বাঁকুড়ায় নেমে গেল নাকি?

সামনের সিটে কালো শার্ট-পরা ছোকরা কানের কাছে চেপে ট্রানজিস্টর বাজাচ্ছে। কী শুনছে কে জানে। বাসের মধ্যে মৃদু সুরেলা কোলাহলটুকু ভাসছে। বাস ছুটছে তিরবেগে ধুলো উড়িয়ে। গেরুয়া রঙের ধুলো। দু'পাশের গাছপালা ছুটছে পিছন দিকে। আতঙ্কগ্রস্ত গোরুবাছুর ভেঁপুর তীব্র শব্দে লেজ তুলে নেমে যাচ্ছে পথ থেকে মাঠে। জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে শিশু যাত্রী এই দৃশ্য দেখে আব খিলখিল করে হাসে।

"দাদুভাই, কোনও খপর আছে আজ?" ভিড়ের মধ্য থেকে এক বৃদ্ধ ছোকরাকে জিজ্ঞেস করে।

"সতর্কবার্তা নাই গো। মৎস্যজীবীদের জন্যে কোনও সতর্কবার্তা নাই।"

"কী কইছে তবে?"

"উনো জমিতে দুনো ফসলের কথা কইছে আবহবার্তায়।"

যাত্রীরা হেসে ওঠে ওদের কথাবার্তা শুনে। কাঞ্চন ওদের হাসির অর্থ বোঝে না।

বাসটা এখন বোধহয় ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে ছুটছে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। দাঁড়ানো যাত্রীরা দুলে উঠছে ঝাঁকুনি সামলাতে।

মেয়েটার হাত থেকে কী যেন ছিটকে পড়ল হঠাৎ। বই। কাঞ্চন ঝুঁকে কুড়িয়ে নেয় বইখানা। মেয়েটা হাত বাড়িয়ে বইখানা নিল।

কাঞ্চন জিজ্ঞেস করে, "শাঁখের আংটি পরলে কী হয়?"
"শাঁখের আংটি পরা হয়। আবার কী হয়?"
"কত দূর যাবে?"
"কলকাতা। আপনিও কলকাতা?"
"হ্যাঁ। ট্রেনে ফিরলেই ভাল হত। যা ধুলো আব ঝাঁকুনি।"
"কলকাতার লোকেরা আজকাল আর বাস চড়ে না, না?"
"কেন?"
"মাটির ওপর দিয়ে, তলা দিয়ে ট্রেন চলছে শুনতে পাই। খুব আরাম।"

সাজপোশাক দেখে মেয়েটাকে শহুরে মনে হয়েছিল। খুব সম্ভব মহকুমা শহরে লেখাপড়া শিখেছে। পল্লিগ্রামের প্রতি মমতা আছে, মনে হয় কাঞ্চনের। একুশ-বাইশের বেশি বয়স হবে না। বেশ সপ্রতিভ।

"আবাম আব কী! সত্তব লক্ষ লোক শহরটায় উপচে পড়ছে।" কলকাতার প্রতিভূ কাঞ্চন আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইল।

"তবু। দেশের দশ ভাগ লোকেব জন্যে কোটি কোটি টাকা খবচ। নব্বই ভাগ লোক দেশময় ছড়িয়ে আছে, তাদেব জন্যে ছিটেফোঁটা জোটে না। এদিকটায় খালবিলে এখনই একটু জল, সারা বছর তো শুকনো। ক্যানেল আসবে আশা করে গ্রামের লোক বছরেব-পব-বছর ঠাকুরতলায় মানত করছে। ওদের কথা মানুষেও শোনে না, ঠাকুবেও শোনে না।"

কাঞ্চন মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটাকে ভাল করে দেখল। লম্বাটে মুখ, সুশ্রী, কপালে খয়েরি রঙের টিপ। পিঠেব বেণী বাঁ কাঁধের ওপর থেকে ঘুরিয়ে এনে বুকের ওপব ফেলা। একটা পাঁচ টাকাব নোট কনডাক্টরের হাতে দিয়ে মেয়েটা বলছে, "কাল ফিরব।"

কাঞ্চন জিজ্ঞেস করল, "আগে কখনও কলকাতায় গেছ?"
"হ্যাঁ। দরকার হলেই যাই।"

"সেখানে কত লোক রাস্তায়, ফুটপাথে, গাড়িবারান্দার নীচে বসবাস করে, দেখোনি? স্যাঁতস্যাঁতে এঁদো গলি, একখানা ছোট্ট ঘরে সাতজন-আটজন কবে মানুষ গাদাগাদি করে শোয়—ওরা মধ্যবিত্ত, তোমাব চোখে পড়ার কথা নয়। কোথায় এ রকম খোলা আকাশ, গাছপালা, ধানখেত? তুমি কলকাতার লোককে হিংসে করো?"

"ওখানে কেউ না খেতে পেয়ে মরে না, শুনেছি। খরাব সময় এখানে মহাজনে ধার দেওয়া বন্ধ করে দেয়। বিলিফ না এলে মানুষ খেতে পায় না। এক মুঠো মুড়ি অবধি ভিক্ষে দেয় না কেউ। কলকাতার লোক বোজ এক লক্ষ টাকা নগদে ভিক্ষে দেয়, খবব কাগজে পড়েছি। ওদের ফেলে দেওয়া এঁটো খেয়ে এক লক্ষ লোক টিকে থাকতে পারে, তাই না? ক'হাজার গ্রাম জড়ো করলে এক লক্ষ লোক হয়?"

মেয়েটা গনগন করছে। তর্কে ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না বুঝে কাঞ্চন ওদিক দিয়ে গেল না আব।
বলল, "তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগছে। কী নাম তোমার?"

বেশ চলছিল বাস, হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে টলে গেল যেন। কাঞ্চন জানলা দিয়ে দেখে, বাসটা রাস্তা থেকে ধুলোয়, আবার লাফিয়ে ধুলো থেকে রাস্তায়, এ-গাছ ও-গাছের গা ঘেঁষে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছে।

এ রকমটা তো স্বাভাবিক নয়! বাসসুদ্ধ লোক চিৎকার করে ওঠে, "কী হল, কী হল যোগীনদা? কোথায় এলাম গো? বিষ্টুপুর এইচে নাকিন?"

মুখের ওপর শাড়ির আঁচল চেপে ধুলো ঠেকাবার চেষ্টা করছে মেয়েটা। ওর মধ্যেই কাঞ্চন শুনতে পায় চাপা স্বর, "ঝরনা।"

নীচে-বসা এক থুরথুরে বুড়ি পুঁটুলির ওপাশ থেকে ডেকে ওঠে, "বিষ্টুপুর এইচে?"

ড্রাইভার নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। যোগীনদাও নেমে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আর এক ছোকরা, ড্রাইভারের সঙ্গী, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে দিয়েছে ওরা, ভুসভুস করে বাষ্প বেরোচ্ছে সেখান থেকে। তিনজনে এমন উগ্রভাবে তাকিয়ে আছে ইঞ্জিনটার দিকে, যেন যন্ত্র না, ওটা এক পাগলা ঘোড়া। বেয়াদব। ওকে শায়েস্তা করতে হবে। ওরা শায়েস্তা করার পরামর্শ করতে থাকে এক নির্জন জারুল গাছে ঠেস দিয়ে।

"গাড়ি যাবে না।" যোগীনদা এসে ঘোষণা করল।

ধুলো বসে গিয়েছিল। গাড়ি যাবে না শুনে গেঞ্জাম শুরু হয়ে যায় বাসের মধ্যে। কী হবে। কী হবে।

কাঞ্চন বলে, "একটা ফাঁড়া কাটল। বোধহয় ব্রেক ফেল করেছে।"

"আর একটু হলে তেঁতুল গাছটায় ধাক্কা লাগত। তা হলেই উলটে পড়ত বাসটা। যে রকম হেলেছিল বাঁ দিকে। বেশ মজা হত তা হলে।"

মজা হত? কাঞ্চন দেখে, ঝরনা হাসছে। টেরিয়ে তাকাচ্ছে ওর দিকে। ওর চোখে কাজল নেই, ঠোঁটে লিপস্টিক নেই। ওর গলা খালি, অলংকারমুক্ত। ছিপছিপে গড়ন, হাতে লোম আছে অল্প অল্প। যুবতী ভদ্রঘরের মেয়ে, অথচ তার শরীর থেকে পারফিউমের গন্ধ বেরোচ্ছে না।

"আমাদের ডেডবডি দুটো পাশাপাশি পেত ওরা। কাগজে খবর বেরোত, এক তরুণ দম্পতিকে শনাক্ত করা যায়নি। একদম শনাক্ত না হয়ে মরে যেতে ভাল লাগে না?"

"ঝরনা, তুমি দেখছি সাংঘাতিক মেয়ে।" কাঞ্চন বলে।

"অবশ্য হাড়গোড় ভেঙে বিষ্ণুপুর কি আরামবাগের হাসপাতালে পড়ে থাকলেও মন্দ হত না। আমাদের দু'জনের দুটো পাশাপাশি বেড, মাথায় ব্যান্ডেজ, কথা বন্ধ হয়ে গেছে অথচ জ্ঞান ফিরে এসেছে। আপনি আমার দিকে তাকিয়ে কিছু মনে করতে পারছেন না। আমি কিন্তু চোখ খুলেই আপনাকে চিনেছি। এই রে, আপনার নামটাই জানি না। আপনি তো আচ্ছা লোক!"

"কাঞ্চন। কাঞ্চন চক্রবর্তী।"

"আমি ডাকলাম, কাঞ্চনবাবু, কাঞ্চনবাবু"

"না। বাবুটাবু নয়। কল্পনার কাঞ্চনে বাবু থাকে না।"

"আচ্ছা, শুধুই কাঞ্চন। আমি ফিসফিস করে ডাকলাম, কাঞ্চন, কাঞ্চন। আমি ঝরনা। চিনতে পারছ না। সেই কলকাতার বাসে পাশাপাশি বসেছিলাম—"

দু'জনেই হেসে উঠল এবার।

কাঞ্চন বলল, "তুমি খুব বাংলা উপন্যাস পড়ো, না? তোমার কল্পনাশক্তি দেখে অবাক হয়ে গেছি।"

"কোথায় আর পাই! তবে সিনেমা দেখি। সেদিন দেখলাম 'পৃথিবী আমারে চায়'। ওঃ, দারুণ।"

বাসটা দাঁড়িয়েই আছে, ওরা খেয়াল করেনি এতক্ষণ। বাসের মধ্যেকার গোলমাল এতক্ষণে শান্ত হয়ে গেছে। অর্ধেক প্রায় খালি। নেমে দাঁড়িয়ে জটলা করছে অনেকে। কাছাকাছি যাবার ছিল যারা, যোগীনদা তাদের তুলে দিয়েছে লোকাল বাসে। ট্রাকেও।

কাঞ্চন ঘড়ি দেখল, সাড়ে চারটে। এখন আর কলকাতায় যাবার অন্য বাস নেই।

"চলো, নেমে দাঁড়াই। সরেজমিন তদন্ত করা যাক।" কাঞ্চন বলল।

বাস থেকে নেমে দেখে, ড্রাইভার ও ড্রাইভারের সঙ্গী শুয়ে পড়েছে চাকার তলায়। যন্ত্রপাতির ঠক ঠক শব্দ চলছে পুরোদস্তুর।

এতক্ষণে আকাশে সূর্য অনেকখানি ঢলেছে পশ্চিমে। ওদিকটায় চাপ চাপ ধূসর রঙের মেঘ সূর্যকে কখনও আড়াল করছে, কখনও ছেড়ে দিচ্ছে খোলামেলায়। বাতাস ঈষৎ ঠান্ডা। রাস্তার দু'পাশে বিস্তৃত নির্জন প্রান্তর, উঁচু-নিচু। কিছু ধানের খেত, কিছু শরবন। আর শালের জঙ্গল, কিন্তু গাছগুলো খুব দীর্ঘ নয়। একটু দূরে কয়েকজন গ্রামবাসী ওই জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা রাস্তা পার হল। জখম বাসটার দিকে, বাসটাকে ঘিরে মানুষের জটলার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় ওরা। নিজেদের ভাষায় কথা বলে। যন্ত্র সভ্যতার দিকে পিছন ফিরে ওরা আবার নেমে পড়ে পিচের রাস্তা ছেড়ে অনুর্বর প্রান্তরে।

যোগীনদা নামে কনডাক্টর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছিল। ওর হাতে একটা বোতল। ওর কাঁধে চামড়ার ব্যাগ, তার মধ্যে অন্তত তিনশোটি টাকা।

কাঞ্চন জিজ্ঞেস করে, "গাড়ি যাবে তো?"

"দেরি হবে।"

"এমন জায়গায় দাঁড়াল, একটা চায়ের দোকান অবধি নেই।"

"সামনে রথতলা। মাইলখানেক পথ। সেখানে সব পাবেন। মুড়ি পাবেন, তেলেভাজা পাবেন, বাতাসা পাবেন।"

ঝরনা কাঞ্চনের হাত ধরে টানে।"এই, খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?"

"তেষ্টা পেয়েছে। কাছেপিঠে একটু খাবার জলও মেলে না? পুকুরটুকুর থাকলে নেমে যেতাম।"

"নদী শুকিয়ে যায় এ-দেশে, তো পুকুর! ওদিকটায় চেয়ে দেখুন, সূর্য পাটে নামছেন, বলাহক জমছে কম্বলপারা বর্ণ, ঠাকুর বিশ্রাম করবেন, তার আয়োজন হচ্ছে ওদিকে। এদিকে খাঁ খাঁ শূন্য মাঠ। নির্জলা।"

অদ্ভুতভাবে কথা বলল ঝরনা। কাঞ্চন তাকায় আসন্ন সূর্যাস্ত যেদিকে, সেই দিকটায়। উঁচু-নিচু অসমতল প্রান্তরের ওপর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে, গাছের ছায়া। ওর মন কিছু একটা অনুভব করতে চায়, পারে না চট করে।

"মা বলে, সৃষ্টিকর্তার কত রকম মহিমা। আমি তো কোনও মহিমা দেখি না।" ঝরনা বলল।

"কী দেখো তবে?"

"ওইটে? আমার মনে হয়, যেন বিশাল চেহারা গেরুয়া বসন বুদ্ধদেব বসে আছেন, শূন্য কোল। জল খাবেন তো যোগীনদার বোতল থেকে খান।"

"ওর হাতে ডিস্টিল্ড ওয়াটার। ব্যাটারিতে দেবার জল।"

"তাই নাকি?" খিলখিল করে হেসে ওঠে ঝরনা।তা হলে কাজ নেই। ডিস্টিল ওয়াটার খেয়ে যদি শরীর খারাপ হয়।"

কথা বলতে বলতে ওরা লোকজনের জটলা থেকে সরে গিয়েছিল। ঝরনা সেখান থেকে ডাকে, "যোগীনদা। আমরা রথতলার দিকে এগোচ্ছি। তুলে নেবেন তো? আমাদের জিনিসপত্র বাসে রইল কিন্তু।"

"পা চালিয়ে যাও। আঁধার নামছে।"

যেতে যেতে কাঞ্চন ভাবে, ঝরনা একটু পাগলি আছে। শহরের মেয়ে হলে একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এইভাবে চলে আসত না। অবশ্য এই বয়সের মেয়েদের খেয়াল খুশির সঙ্গে ও একেবারেই পরিচিত নয়। ঊনত্রিশ বছর বয়স হলে কী হবে কাঞ্চনের স্বভাব ছোটবেলায় যেমন কুনো ছিল, এখনও তাই। চাকরি করতে কলকাতায় এল, আপিসের এক সহকর্মী কৈলাস বোস স্ট্রিটের মেসবাড়িতে ব্যবস্থা করে দিল, তাই চলছে। তিনখানা ঘর নিয়ে ছ'জন বাসিন্দা। একটা কুক-কাম-চাকর। সবাই অবিবাহিত। ও আসার পর দু'জন বাসিন্দা বিয়ে করে সরে পড়েছে, নতুন দুই ব্যাচেলর এসে জুটেছে। অবসর সময়ে ওরা তাস খেলে, দাবা খেলে। রেডিয়োয় বিবিধ ভারতী শোনে। ফুটবলের মরশুমে খেলা দেখে কাঞ্চন। দেশের বাড়িতে একটা ছোট বোন, ঝরনার বয়সি হবে, এই রকম রোগা-পাতলা, এম এ পাশ করে বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করছে। ওর বিয়ে না দিয়ে নিজে বিয়ে করবে না, এই রকম সংকল্প কাঞ্চনের। তবে, দুর্গাপুরের চাকরিটা যদি হয়ে যায়, ওরা ফ্যামিলি কোয়ার্টার দেবে বলেছে, তখন বিয়েটা করে ফেলবে ও। দিদিরা শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রায়ই তাগাদা দেয়, একবার হ্যাঁ বললেই হল। এই ভাবেই সম্বন্ধ করে দিদিদের বিয়ে হয়েছে, ওর বিয়ে হবে, ছোটবোনের বিয়েও ওই ভাবেই হবে। বিয়ের পর ওকে আর মেসবাড়িতে থাকতে হবে না।

ঝরনাই হাত বাড়িয়ে ওর হাত ধরল। রথতলা অবধি এক মাইল পথ পার হয়ে গেল এক নিমেষে।

ব্রিফকেসটা রেখে আসা ঠিক হল কিনা কে জানে। ক্যাশ নেই, তবে ওর মধ্যে ওর দরকারি কাগজপত্র আছে। তা ছাড়া, বাকসটার দামই তো তিনশো টাকা। মনটা খচ খচ করতে থাকে। দূর থেকে শাঁখ বাজার শব্দ ভেসে আসছে।

খড়ের চাল-ঢাকা ছোট্ট দোকান। বাঁশের খোটা পুঁতে বেঞ্চি। কাঠের উনোন। কেরাসিনের কুপি জ্বলছে এক পাশে, তাতে আর কতটুকু আলো! কাঠের উনোনের আলোয় দোকানটা আলোকিত। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ঝুপ করে। দোকানটা দেখাচ্ছে একটা দ্বীপের মতো। বিচ্ছিন্ন পরিত্যক্ত।

বাস বিগড়েছে, সে-খবর রটে গেছে ইতিমধ্যে।

দোকানি তার সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত। এইটুকু দোকানে জনা পনেরো গ্রাহক। যাত্রীদের কেউ কেউ আগেই এসে হাজির হয়েছে। উনোনের ওপর ফুটন্ত তেলে আলুর চপ ভাসছে। কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় বিক্রি হচ্ছে মুড়ি।

একজন বলছে, "ভাদ্দর মাস যায়, ঝড়-বাদলার দিন নাই।"

"রেডিয়োয় সতর্কবার্তা নাই।"

"ভয়ে পরান আইঢাই করে গো। মনসাথানে ঢিল বাঁধলাম।"

"খিদা পাইলে ভাত পাবেক নাই, মুড়ি পাবেক নাই। এ-বছর বাতাসা ভিজাই জল খেতে হবেক গো।"

দোকানি ক্ষিপ্র হাতে কাজ করে আর এইসব কথা শোনে। গ্রামবাসীদের ভয়ভাবনার কথা। আজ ওর কথা বলার সময় নেই। বাস বিগড়েছে। এমন ঘটনা রোজ রোজ ঘটে না। কত বাস যায় সারাদিন এই পথ দিয়ে, ধুলো উড়িয়ে চলে যায়। কেউ দাঁড়ায় না। আজ ওর চালায় কত মানুষের গুঞ্জন।

কাঞ্চনকে চুপচাপ দেখে বলল, "যোগীনের বাস, উ হল ঐরাবত ঘোড়া। হাওয়ার বেগে ছোটে। ভয় নাই, বাবু, আপনি পা তুলে বসুন।" পা তুলে কেন? ঝরনা বলল, "সাপ। অন্ধকারে পোকামাকড় খেতে বেরোয়। ভয় পেলে কাটে, না হলে কিছু বলে না।"

"তুমি যে পা ঝুলিয়ে বসে আছ, তোমার ভয় করে না?"

"আমায় কাটবে না। আমার মনে তো পাপ নেই।"

"আমার মনে পাপ?"

"না তো কী? গুম হয়ে বসে কী ভাবছেন বলুন তো? কী মতলব আঁটছেন?"

মতলব? কাঞ্চন ওর শাঁখেব আংটি-পরা হাতখানা চেপে ধরে হঠাৎ। ফিসফিস করে বলে "তোমাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া দরকার। তাই ভাবছি। রাত হক।"

হিহিহিহি কবে প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠল ঝরনা। এত জোবে হাসল যে, দোকানের লোকজন ওদের দিকে ফিরে তাকায়। চটপট হাত ছেড়ে দেয় কাঞ্চন। হৃদয়াবেগ ঠেকাবার এমন মোক্ষম ওষুধ আব হয় না। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে, দমকে দমকে ডুকরে ডুকরে হাসছে। কী হল? এত হাসির কী হয়েছে?

অন্য হাতটা কাঞ্চনের মুখের ওপর পাতার মতো চেপে ধরল ঝরনা। "চুপ চুপ। কী বলতে কী বলবেন, আমার মাথা কাটা যাবে লজ্জায়। হিহি। হিহি।"

পৃথিবীর সমস্ত ব্যস্ততা ও চলাচলের বাইরে নিক্ষিপ্ত এই অন্ধকার গ্রামাংশ। আশেপাশে ছায়ামূর্তির মতো সব অপরিচিত মানুষ। এ কোন ভৌতিক গহ্বরে আটকে গেল কাঞ্চন! দম যে বন্ধ হয়ে আসছে।

এমন সময় ঝরনা চেঁচিয়ে ওঠে, "ওই ওই। বাস আসে।"

প্রত্যাশিত বাসটি এসে দাঁড়ায়। যোগীন হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় ঝরনাকে।

বাসে উঠে কাঞ্চন ঘড়ি দেখল, ছ'টা চল্লিশ।

কনডাক্টর বলে, ন'টার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে দেবে। খুব জোর সাড়ে ন'টা। এখন রাস্তা ফাঁকা। ফুলস্পিডে দৌড়োবে যোগীনের ঐরাবত।

জানলার শার্সি তুলে দিয়ে বাসের লোক ঝিম মেরে বসে যায়। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঠান্ডা হাওয়া। সারাদিনেব একঘেয়েমি আর ক্লান্তি। ত্রাহি ত্রাহি স্বরে বাস ছুটছে হেডলাইট জ্বেলে। সজাগ সটান মাত্র একজন, সে ওই ড্রাইভার, গাঢ় ঘন অন্ধকার চিরে বাসটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। চলেছে তো চলেছেই। কলকাতা আর কতদূর?

"এই শুনছেন? এই যে—"

"উঁ?"

"কলকাতা এসে গেছে।"

"এসে গেছে? বাব্বাঃ। ক'টা বাজে?"

"ন'টা পঞ্চাশ।"

"আমরা কোথায়?"

"দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে এসেছি।"

"ঠিক আছে।"

"ঠিক আছে কী? উঠুন। ঠিক করে বসুন।"

"বসেই তো আছি। টার্মিনাস এলে তুলে দিয়ো, কেমন।"

"না৷ আপনি এখনই ঠিক করে বসুন।"

"আঃ। বিরক্ত কোরো না।"
"বিরক্ত করছি না। কথা আছে।"
"কথা? কী কথা?"
"আমি আপনার সঙ্গে যাব।"
"আমার সঙ্গে? কোথায় যাবে?"
"বাড়ি। আপনার বাড়ি।"
"অ্যাঁ! সে কী? আমার বাড়ি কোথায়? আরে, আমি তো মেসে থাকি।"
"তা হলে মেসেই যাব। এত রাত্তিরে ঘুরব কোথায়, বলুন!"
"মেসে...মেসে? সেখানে মেয়েরা থাকে না।
"মানুষ থাকে তো?"
"ব্যাচেলর। হিংস্র প্রকৃতির সব ব্যাচেলর। তোমাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে।"
"কী বলছেন কাঞ্চনবাবু! আমি যদি আপনার বউ হতাম—"
"বউ? বউ হলে তুমি কোয়ার্টারে গিয়ে উঠতে। ফ্যামিলি কোয়ার্টার নেই, তো ফ্যামিলিও নেই।"
"যদি আপনার ছোট বোন হতাম—"
"বোন থাকে হাকিমপাড়ায়। বাড়ি থেকে বেরোয় না। বিয়ে হলে বেরোবে।"
"এত রাত্তিরে কোথায় যাব? কলকাতা শহর। কিছু চিনি না।"
"আমি তাব কী জানি। কোথায় যাবে ভেবে বেরিয়েছিলে?"
"দিনে দিনে ফিরলে যেতে পারতাম।"
"বাসে শুয়ে থাকো।"
"কাঞ্চনবাবু। এই কাঞ্চনবাবু।"
"আঃ হাত সরাও। লোকে দেখলে কী ভাববে—"
"কী আবার ভাববে? ন্যাকা!"
"না, হাত সরাও।"
"ভাববে, আপনি আমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছেন। আমার সর্বনাশ করেছেন। এখন ছেড়ে পালাচ্ছেন। হিহি।"
"কী বললে? অ্যাঁ? ফুসলিয়ে এনেছি? সর্বনাশ করেছি? আমি?"
"হ্যাঁ। আস্তে কথা বলুন। যোগীনদা দেখেছে। ড্রাইভার দেখেছে। বাসসুদ্ধ লোক দেখেছে। হিহি।"
"তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ঝরনা? কী যা-তা বলছ!"
"আমি একটুকুন খ্যাপা আছি বটে কাঞ্চনবাবু। বুঝেন নাই?"
"এ যে দিনকে রাত। ব্ল্যাকমেল।"
"ব্ল্যাকমেল মানে কী? কালো গাড়ি? পুলিশের গাড়ি?"
"মানে, অন্যায়। জুলুম।"
"বলছি না, আস্তে কথা বলুন।"
"আস্তেই তো বলছি। আমি পুলিশ ডাকব।"
"ইস! একটা অবলা মেয়েকে সাহায্য করার মুরোদ নেই, পুলিশ! বীর পুরুষ! পুলিশ কী করবে আমার?"
"আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করব।"
"আমিও করব। দেখি কার কথা লোকে শোনে। সাক্ষী আছে অনেক। আপনাকে মেরে পাট করে দেবে ওরা।"
"ওঃ। কী সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা!
"নাক ফাটিয়ে দেবে। দাঁত ভেঙে দেবে। মাথা ফাটিয়ে গারদে পুরবে। সেখানে বস্তায় বেঁধে মারবে। হাড় গুঁড়ো করে দেবে। হিহি।"
"আরে। ভয় দেখাচ্ছ কেন? আমি কী দোষ করলাম?"
"সারাদিন ফষ্টিনষ্টি করলেন। মনে নেই? কত ঢং।"
"সত্যি বলছ? তোমায় ফুসলিয়ে এনেছি! বুকে হাত দিয়ে বলো।"

"বুকেটুকে আর হাত নয়। ঢের হয়েছে। পুলিশকে যদি অত ভয় তবে যা বলছি শুনুন।"

"কী?"

"দু'শো টাকা দিন। এক্ষুনি। দেরি করলেই চেঁচাব। হাউহাউ করে কাঁদব।"

"দু'-দু'শো! অত টাকা কোথায় পাব?"

"ওই হিপপকেটে আছে। শিগগির।"

"নেই!"

"বলছি আছে। ভাড়া দেবার সময় দেখেছি। দিন দিন।"

"একশো নাও, প্লিজ!"

"আবার দর কষাকষি? ভারী সেয়ানা পার্টি দেখছি। এই যে, যোগীনদা, শোনো এদিকে—"

"আচ্ছা, আচ্ছা। দিচ্ছি। রক্ষে করো বাপু। মেয়ে তো নয়, সাপ।"

টার্মিনাসে বাস যখন ঢুকল, সকলে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। নিশ্চিন্ত। একখানা দিন কাটল বটে!

এয়ারলাইনের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে নির্বিকার মুখে উঠে দাঁড়ায় ঝরনা। কাঞ্চন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

"চলি কাঞ্চনবাবু", ঝরনা হাসতে হাসতে বলে. "কিছু মনে করবেন না। দিনকাল বড় খারাপ। উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়। কী করা!"

হতভম্ব কাঞ্চন ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই থাকে। এ কি বাস্তব না দুঃস্বপ্ন?

ঝরনা বাস থেকে নামতে নামতে বলে, "এখন কিছুদিন ছুটি। টাকা ফুরোলে আবার বেরোব। জ্বালিয়ে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।"

বাসের জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে কাঞ্চন থুতু ফেলে। ওঃ। মুখ-ভরতি কিচকিচে বালি! তারপর ডাকে, "ঝরনা এই ঝরনা, শোনো। সত্যি করে বলো তো, এখানে তোমার জানাশোনা কেউ নেই?"

"অত কথায় কাজ কী। এই তো আমি আছি আর আপনারা আছেন। তাই তো বেঁচে আছি। বেঁচে থাকতে খুব ভাল লাগে, জানেন।"

বড় বড় পা ফেলে ঝরনা এগিয়ে যায়। টার্মিনাসের বাইরে চলে যায়। কাঞ্চন দেখে, টার্মিনাসে দিনের মতো আলো। অনেক বাসের জটলা। আরও আসছে। সব বাস এসে একে একে ঘরে ফিরছে। যাত্রীহীন, খালি, হালকা।

হঠাৎ কাঞ্চনেরও মনের মধ্যে কেমন হালকা বোধ হয়। মনে হয়, ঝরনা মেয়েটা ঠিক সাপ নয়, ইঁদুর হতে পারে। ওকে খারাপ মেয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

১৯৮৪

মহাপুরুষ

ভোলাবাবু বলল, 'তা হলে কি আমি অন্যায় করিচি?'

'আলবত অন্যায় করেছ। তোমার বিয়ে-করা বউ এতদূর অবধি ধেয়ে এল আর তুমি তাড়িয়ে দিলে? নিজের দিকটাই কেবল ভাবলে? একবার ওর দিকটা ভাবো তো।'

ভোলাবাবু জীবনটাকে তার বউয়ের দিকে থেকে ভাবতে লাগল? পড়ে রইল ওর গেলাসের অর্ধেক পানীয়। তপেন সরকারের গেলাস খালি। গোলগাল জং-ধরা টিপয়টার ওপর রাখা রামের শিশিও খালি হয়ে গেছে।

ঘরে একটা চল্লিশ পাওয়ারের আলো জ্বলছে। ওই অল্প আলোতেই দেখা যাচ্ছে আলমারির ওপর রাখা সবুজ রঙের টাইমপিস, সাতটা বেজে দশ মিনিট। এমন কিছু রাত হয়নি।

টিপয়টার দু'পাশে দুটো কাঠের চেয়ার। বাঁহাতি জানলার কোলে একটা তক্তপোশ, তার ওপর তোশক পাতা। ডানহাতি আর একটা তক্তপোশ, তার ওপর বিছানাটা গুটোনো। ওই বিছানার মালিক বিকাশ পাল পুজোর ছুটিতে বাড়ি গেছে। দেয়ালেব গা ঘেঁষে একটা নাইলনের দড়ি টাঙানো, তাতে ঝুলছে লাল ছোপ ছোপ একখানা লুঙ্গি। তপেন সবকারের লুঙ্গি। ওই লুঙ্গি পরে ও শোয়।

এগাবো নম্বর রামধন দত্ত লেনের এটি একটি ঘর। একতলায় আর একটি ঘর আছে, তাতেও দুটো তক্তপোশ। তড়িৎ আর দুলাল নামের দুই ছোকরা ওই ঘরটায় থাকে। পুজোর ছুটিতে ওরা মধ্যপ্রদেশ বেড়াতে গেছে। ওপর তলায় থাকে এক ভাড়াটে পরিবার, বাইশ বছরের পুরনো ভাড়াটে। একশো নব্বুই টাকা মাত্র ভাড়া দেয়। এই বাড়ি ভাঙা হলে তবে ওরা উঠবে।

তড়িৎদের ঘরটায় তালা। বাইরের কোনও পুজোমণ্ডপে ঢাক বাজছে। এই বাড়িটার এক মাইল ঘিবে অন্তত পনেরোটা ছোট-বড় বারোয়ারি পুজো হয়। তপেন সরকার চেয়ার ছেড়ে উঠল। বলল, 'আমি একটু বেরোচ্ছি। ঘর খোলা রইল।'

'ঠিক আছে'। ভাবতে ভাবতে ভোলাবাবু বলে, 'সঙ্গে টাকা আছে তো?' অর্থাৎ, এখন যদি ও মেয়েমানুষের কাছে যায়, কাছেই, তার জন্যে প্রস্তুত কিনা।

'আছে, আছে।' বলতে বলতে তপেন সরকার তার প্যান্টের পকেটটা একবার অনুভব করে নেয়। দবোজার মুখে চপ্পলজোড়া পায়ে গলিয়ে নেমে যায় রাস্তায়। উত্তর কলকাতায় একবার রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালে আর কেউ কারও না। এক-একজন যেন মহাবিশ্বে ভ্রাম্যমাণ এক-একটি উপগ্রহ।

বাড়িটা তপেন সরকারের সম্পত্তি। নীচের তলার মেস বাড়িটাও ওর। একা মানুষ। ওপর তলার ভাড়া আর তিনজন পেয়িং গেস্টের দেওয়া টাকায় ওর নিজের খরচ উঠে আসে। ভোলাবাবু এই বাড়ির রান্নাব লোক কাম ম্যানেজার। ওকে নিয়েই এই গল্প।

সাধাবণ রান্নার লোক হলে ওকে 'ভোলা' বলে ডাকা হত। কিন্তু ওর চেহারার মধ্যে এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যে লোকে বাবু না বলে পারে না। মেসের আর সবাই ওকে 'আপনি' সম্বোধন করে প্রথম থেকে। কেবল মনিব তপেন সরকার বলে, 'ভোলাবাবু', 'তুমি'। ওর বয়েস, তপেনের মতোই, পঞ্চাশ-বাহান্নর কাছাকাছি, কিন্তু ওর দৈর্ঘ্য প্রায় ছ'ফুট, মোটাসোটা গড়ন, ওর আঙুলে দুটো আংটি পাথর-বসানো, ডান বাহুতে বাঁধা রুপোর তাবিজ। গলায় মোটা পইতে। মাথায় মুখে লম্বা কাঁচাপাকা চুল-দাড়ি। খবরের কাগজ পড়ার সময় চোখে চশমাও পরে ভোলাবাবু। জামাকাপড়ের জৌলুস ছাড়াই এমন লোককে দেখলে সমীহ করতে হয়। জৌলুস অবশ্য নেই। ভোলাবাবুর পরনে খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া। চুলদাড়ি রুক্ষ, তেলহীন, কিন্তু বিন্যস্ত। সবদিক থেকেই যাকে আমরা মার্জিত ভদ্রলোক বলি, তাই। বিশ্বাসী।

এখন কার্তিক মাস, গত কার্তিক, তার আগের চৈত্রমাসে একদিন দুপুরবেলা, খালি বাড়ি, তপেন সরকার ঘুমোচ্ছে, দরোজায় কড়া। কী ব্যাপার? না, আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম ভোলা শর্মা, বাড়ি মেদিনীপুর, রান্নার কাজ পেলে করি।

এই রকম দশাসই লোককে প্যান্ট-শার্ট পরিয়ে চেয়ার-টেবিলে বসিয়ে দিলে বড়বাবু বলে চালানো যায়। সে কিনা পাচকের কাজ চাইছে। তপেন সরকার প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। বলেছিল, 'আমাদের এটা ছোট মেস, চারজন মেম্বার, সামান্যই রান্নাবান্না। আপনি কী কী রাঁধতে পারেন?'

ভেবেছিল, ভোলা বলবে, চপ-কাটলেট, বিরিয়ানি-চাইনিজ। তা না বলে ও থেমে থেমে বলেছিল, 'বাঙালির সংসাবে রোজ যা খাওয়া হয় তাই। ডাল, ভাত, মাছের ঝোল-ঝাল, মাংস, রুটি, লুচি।'

এর ক'দিন আগেই মেসের যে রাঁধুনি ছিল, সে চলে গেছে। মাঝবয়সি বিধবা। সারাদিন থাকত, সন্ধেবেলা কাজ সেরে চলে যেত মেয়ের বাড়ি শুতে। প্রায়ই কামাই করত সে। তপেন ওর মাইনে কাটার প্রস্তাব করতেই বলে, 'অন্য লোক দেখুন, আমার পোযাবে না।' সেই থেকে হোটেলের খাওয়া চলছে। সারা চৈত্রমাসটাই এ রকম চালাতে হবে ভেবেছিল তপেন। এই সময় কেউ নতুন কাজ চায় না। নতুন কাজ পায় না। তার মধ্যে ভোলাবাবু উপস্থিত। তপেন ওকে ফেরাতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিল,

'কে বলল, এখানে কাজ খালি আছে?'

'হোটেলের ছেলে। যে এখানে খাবার দিয়ে যায়। ও বলল, চব্বিশ ঘণ্টার লোক খুঁজছেন। থাকা, খাওয়া—।'

'কত মাইনে চান?'

এবার ভোলা বলেছিল, আমায় 'আপনি' বলছেন কেন? আমি লেখাপড়া কিছু শিখিনি। যা খুশি দেবেন।'

তপেন সরকার জানতে চেয়েছিল, এর আগে ভোলা কোথায় কাজ করেছে। ও বলেছে, মেদিনীপুরে। সাইকেল সারাই দোকানে। বলেছিল, তিনকূলে ওর কেউ নেই। শ্যামপুকুরে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে এসে উঠেছে। ছ'দিন হল। কোথাও কাজ পাচ্ছে না। ওর চেহারাই সবচেয়ে বড় বাধা।

সত্যি তাই। ওই মহাপুরুষের মতো চেহারা নিয়ে রান্নার কাজ করতে চাইলে কেউ নেবে না। বাধার কথা ও মুখ ফুটে বলল, তাইতে তপেনের বিশ্বাস হয়, লোকটা গৃহত্যাগী বাউন্ডুলে বা আত্মগোপনকারী পলাতক কেউ নয়। মানুষটাকে দেখে বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া, এই মেসবাড়িতে ভয়ই বা কীসের? মেয়েমানুষ, ছেলেপুলে, নেই। চারটে সিঙ্গল পুরুষমানুষ। রান্নাঘরে রাঁধবে। পাশের বারান্দায় শতরঞ্জি পেতে শোবে। বড়সড় চেহারা, হয়তো খাবে বেশি। খাক গে। সব সময়ের লোক বলে কথা। ফাইফরমাস খাটানো যাবে।

ভোলাবাবু থেকে গেছে। একটা নিরুপদ্রব আশ্রয় পেয়ে যেন বেঁচে গেছে ও। বাকি তিনজনও ওকে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে বলা যায়। এইভাবে চলছে প্রায় দু'বছর। সামনের চৈত্রমাসে দু'বছর হবে। এরই মধ্যে ও মেসপরিবারের একজন।

ভোলাবাবু বাজার করে। রান্না করে। ভোলাবাবু পোস্ট আপিসে যায়, ইলেকট্রিক বিল লাগায়। বাজারের ওপর তলায় গিয়ে কর্পোরেশনের ট্যাক্স দিয়ে আসে। কল খারাপ হলে, তার ফিউজ হলে ও নিজেই সারাই করে নেয়।

তপেন সরকার সারামাসের বাজারখরচ একসঙ্গে ওর হাতে তুলে দেয়। এবার তুমি যেমন করে পারো চালাও ভোলাবাবু। ভোলাবাবু চালায়। মাসের শেষে উদ্বৃত্ত টাকা ফেরত দিয়ে দেয়।

দুলাল বলে, 'ভোলাবাবু, আপনি সাধন মার্গের যে-লেভেলে পৌঁছেছেন, তাতে গেরুয়া ধরা উচিত এবার। সাদা পোশাকে আপনাকে আর মানাচ্ছে না।'

তড়িৎ বলে, 'গেরুয়া ধারণ করলে আর কাজ করতে হবে না ভোলাবাবুকে। একটা ভাল গাছ দেখে, তার তলায় বসে পড়ুন। ব্যস, পিলপিল করে ভক্ত জুটে যাবে। তারাই খাওয়াবে পরাবে। সেবা শুশ্রূষা করবে। বাঁজা বউরা এসে পা টিপে দেবে ভোলাবাবুর।'

ওরা নিজেদের রসিকতায় হে হে করে হাসে। অল্পবয়সি ছোকরা, ভোলাবাবু কিছু মনে করে না। বলে, 'মেয়েমানুষে আমার আসক্তি নেই।'

বিকাশ পাল বড় বেশি সিগারেট খায়। হঠাৎ হঠাৎ ওর সিগারেট ফুরিয়ে যায়। অমনি, 'ভোলাবাবু!' রবিবার এলেই মেসবাবুদের বায়না শুরু হয়, 'ভোলাবাবু, আজ খিচুড়ি খাব। পোস্তর বড়া খাব।'

তো ভোলাবাবু পোস্ত বাটতে বসে যায় শিল পেতে। হাঁটু মুড়ে পিঁড়িতে বসে কাজ করতে ওর কষ্ট হয় না। ও যেভাবে ফুঁ দিয়ে কয়লার উনোন ধরায় দেখলে মেয়েরা লজ্জা পাবে।

তপেন সরকার সন্ধেবেলার দিকে ঘরে বসে একটু মদটদ খায়। ভোলাবাবু ওর জন্যে ঝাল ঝাল চাট বানিয়ে দেয় গরম গরম। রোজ খায় না। মাসে চার-পাঁচ দিন। সেদিন তপেনের মেজাজ ভাল থাকে। সকাল থেকে গুনগুন গান শুনে ভোলাবাবু বুঝতে পারে, আজ বাবুর মদ খাওয়ার দিন। আজ বাবু ফূর্তিতে আছে।

তপেন বলে, 'ভোলাবাবু, তোমাকে ভারী রহস্যময় লাগে আমার এক-এক সময়। বুঝলে? তুমি কি রিয়্যাল? না ওপর থেকে নেমে এসে আমাদের ছলনা করছ? ভোলাবাবু, তোমার অতীত জীবনের গল্প বলো, শুনি।'

ভোলাবাবু নেশায় বাধা দেয় না। মুখ টিপে হাসে কেবল। বলে, 'সে আর একদিন হবে। আরেকটু পেঁয়াজ ভেজে দিই?'

বিকাশ থাকলে বলে, 'আসার সময় দেশলাই একটা এনে দেন যদি। কাঠিগুলো এত খারাপ।'

ভোলাবাবু পেঁয়াজ ভেজে নিয়ে আসে। দেশলাইও কিনে এনে দেয়। নিজের অতীত জীবনের গল্প বলে না। এড়িয়ে যায়।

আজ ও ধরা পড়ে গেছে।

পুজোর ছুটি উপলক্ষে মেসবাড়ি ফাঁকা। মনিব তপেন সরকার আর ভোলাবাবু ছাড়া এগারো নম্বর রামধন দত্ত লেনের বাড়িতে কেউ নেই। ওপরের ভাড়াটেরাও গিয়েছে কোথাও। কাছাকাছি কোনও পুজোবাড়িতে ঢাক বাজছে। বাতাসে উৎসবের গন্ধ।

ভোলাবাবু খুটখুট করে কয়লা ভাঙছিল রান্নাঘরের দোরগোড়ায় বসে।

তপেন ডাকল, 'ভোলাবাবু, ও ভোলাবাবু।'

'যাই।'

মহাপুরুষের মতো বিশাল চেহারাখানা নিয়ে উপস্থিত হয় ভোলাবাবু।

তপেন বলে, 'কী করছ এই ভর সন্ধেবেলা?'

'রান্নার জোগাড় করছি।'

'রাখো তোমার রান্নাবান্না।' তপেন বলে, 'দুটো গেলাস আনো দিকি। আর এক পাত্র জল। খাবার জল। হাত ধুয়ে নাও আগে।'

আজ্ঞা পালন করে ভোলাবাবু আবার এসে দাঁড়ায়।

তপেন বলে, 'আমার সামনের চেয়ারটায় বোসো। এই নাও, ধরো শিশিটা। খোলো। খুলে দুটো গেলাসে একটু করে ঢালো তো। আজ তোমার সঙ্গে বসে একটু গল্পসল্প করব বুঝলে।'

ভোলাবাবু কথা বলে না। মিটমিট করে হাসে।

'কী? কখনও মদ খাওনি?'

ভোলাবাবু বলে, 'এককালে অনেক খেয়েছি।'

'এককালে আর কী কী করেছ, আজ তোমার কাছে শুনব।'

ভোলাবাবু দাড়িতে হাত বোলায়। বলে, 'একটু মুড়ি মেখে নিয়ে আসি। আপনি জোর করছেন যখন, তখন বসব। কিন্তু সব কথা শুনে যেন আমায় তাড়িয়ে দেবেন না। আর, দিলে দেবেন।'

তপেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। যেন ছবির দিকে। তারপর বলে, 'তোমার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, আজ সকালে কার সঙ্গে ঝগড়া করছিলে? ভেতর থেকে শুনলাম তোমার গলা। বলছ, 'দূর হয়ে যাও সামনে থেকে। আর কোনওদিন এমুখো হবে না। এইসব কাকে বলছিলে রাগ করে?'

'রাগ করে তো বলিনি বাবু। তবে স্বর একটু চড়ে গিয়ে থাকবে। নইলে রাগ করা আমি ছেড়ে দিয়েছি। রাগ করার অনেক ফ্যাসাদ।'

তপেন সরকার বলে, 'তুমি সত্যি কথা বলো তো। তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড কী? হাতে মদের গেলাস নিয়ে মিথ্যে কথা বলতে নেই। এখানে আসার আগে তুমি কী করতে?'

ভোলাবাবু বলে, 'রান্নাই করতাম।'

'কোথায়?'

'জেলে।'

'জেলে কি রান্নার লোক রাখে? ওখানে তো কয়েদিদের দিয়ে কাজ করায় বলে শুনেছি।'

'আমি লাইফার ছিলাম।'

'লাইফার? লাইফার মানে কী?'

'মানে যাবজ্জীবন। আমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল।'

তপেন সরকার ঢক ঢক করে খানিকটা মদ খেয়ে নেয়। তারপর ভোলাবাবুর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এবার আর ছবির দিকে নয়। ছবিতে প্রাণ এসেছে।

'তুমি লাইফার? বাঃ বা, এত বড় একটা খবর তুমি এতদিন চেপে রেখেছ ভোলাবাবু? তা কীসের জন্যে যাবজ্জীবন পেলে? জোতদার টোতদার মেরেছ? কৃষি বিপ্লবে যুক্ত ছিলে তুমি? বলো, বলো, আমি আগেই বুঝেছি, তুমি সাধারণ মানুষ নও।'

ভোলাবাবু আস্তে আস্তে বলে, 'আমি ডাকাত ছিলাম। আমার একটা ডাকাতের দল ছিল।

এখানে-ওখানে ডাকাতি করে বেড়াতাম। ভাল রোজগার হত। তারপর বিয়ে করলাম। সুন্দরী মেয়ে, কচি কচি মুখ, টানা টানা চোখ, কোমর অবধি লম্বা একঢাল চুল। অনেক গয়নাগাঁটি দিয়ে সাজিয়ে তাকে ঘরে এনে তুললাম। সেই হল কাল। বউ যখন জানতে পারল যে আমি ডাকাতি করি, ডাকাতি করা খাবাপ কাজ, পরের জিনিস লুটপাট করতে নেই, তাতে পাপ হয়, তখন ও বেঁকে বসল। বলল, 'আমি শাড়ি চাই না, গয়না চাই না, আমার সাধআহ্লাদ চুলোয় যাক, তুমি ভাল হও। আমরা গরিব হয়ে থাকব সে-ও ভাল, অধর্মের টাকা ছোঁব না।'

'আমি ওকে বোঝাতে চাই, ও-সব বাজে কথা। ধর্মটর্ম সব বুজরুকি। সমাজের ওপরতলার লোকেরা গরিবদের মন ভোলাতে, গরিবদের ঠান্ডা রাখতে, ওই সব শিখিয়েছে। আসলে, সব টাকার গায়েই ময়লা লেগে থাকে। ওই যে সব বড়লোক ব্যবসা করে, গাড়ি হাঁকিয়ে চলে, দোল-দুর্গোৎসবে দানধ্যান করে পুণ্য বাড়ায়, ওরাও ডাকাত। ওই যারা ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসে। তারপর ক্ষমতার অপব্যবহার করে, দেশের কাজ করতে গিয়ে পদে পদে নিজেদের কোলে ঝোল টানে, রাতারাতি ওদের ভাবভঙ্গি কেমন বদলে যায় দেখোনি? হাত জোড় করে তোমার বাড়িতে এসেছিল যে, কাজ হাসিল হতেই সে সব ভুলে গেল। তোমায় আর চিনতে পারে না, দেখোনি? ওরা দেশকেও ভালবাসে না, মানুষকেও ভালবাসে না। শুধু নিজেদের ভালবাসে। আমরা ডাকাতি করে ওদের বোঝা হালকা করে দিই, তাতে কোনও পাপ নেই। মাঝে মাঝে দু'-একজন খুনও হয়ে যায়। কী কবব? বড় কাজ করার পথে বাধা তো থাকেই। বাধা সরাতে হয়।

'এইভাবে দিনের-পর-দিন বউকে বোঝাতে চেষ্টা করি। কিছুদিন চুপ করে থাকে, আবার ঘ্যানঘ্যান কবে। 'কোনদিন তুমি বিপদে পড়বে, তখন কী হবে? তখন তোমার পাশে কেউ দাঁড়াবে না। তখন সবাই বলবে, ঠিক হয়েছে। ডাকাতের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।' এইসব শুনে শুনে আমার মন নরম হতে থাকে। ডাকাতির কাজ ছেড়ে দেবার কথা ভাবি। তখনই দলের লোকেরা আমায় ধরিয়ে দিল।'

ভোলাবাবু বলে, 'বিচার হল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আমিও দোটানা থেকে বাঁচলাম।'

তপেন সরকাব বলে, 'তারপর?'

'তারপর জেল খাটতে লাগলাম। ভেবেছিলাম যাবজ্জীবন মানে সারাজীবন। আর কোনওদিন জেল থেকে বেরিয়ে সভ্য সমাজে ফিরে আসতে হবে না, ভেবেছিলাম। ওরা আমার স্বাস্থ্য আর চেহারা দেখে রান্নার কাজ দিল। মনের সুখে কয়েদিদের জন্যে ভাত-ডাল-লাবড়া রাঁধি। নিজেও তাই খাই। প্রথম প্রথম কষ্ট হত। তারপর সয়ে গেল। জেলের ওপর মায়া পড়ে গেল।

'বছরের-পর-বছর কেটে যায়। বন্দিরা আসে। বন্দিরা চলে যায়। জেল কখনও খালি থাকে না। কেননা, মানুষ অন্যায় কাজ করেই। কেউ কেউ অন্যায় কাজ করে পার পেয়ে যায়। কেউ কেউ পার পায় না। ধরা পড়ে, জেল খাটে। জেল থেকে বেরিয়ে আবার অন্যায় কাজে নেমে পড়ে।

'জেলের সান্ত্রি, ওয়ার্ডেন পরিবর্তন হয় মাঝে মাঝে। তাদের বদলি হয়, চাকরিতে উন্নতি হয়। অবসরের বয়েস আসে প্রাকৃতিক নিয়মে। আমি লাইফার, আমার কাজ করে যাই এই ভেবে যে, একদিন, আমার খোপে শুয়ে শুয়ে, টুক করে মরে যাব। সংসারও তো একটা জেলখানা—একটু বড়মাপের, এই যা। সেখানেও কেউ স্বাধীন নয়। এইসব ভাবতাম। আমার মনে কোনও কষ্ট ছিল না। এইভাবে তেরো-চোদ্দো বছর কেটে গেছে।

'হঠাৎ একদিন ওরা আমায় ছেড়ে দিল। বলল, আমি আর সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক নই। বুঝুন ঠেলা। বলল, আমার কাজকর্ম, ব্যবহার দেখে সরকার সন্তুষ্ট। আমাকে ওঁরা মুক্তি দিচ্ছেন।

'মুক্তি তো পেলাম। কোথায় যাই? কোথায় আর যাব? সমস্ত দুনিয়াটাই আমার কাছে অপরিচিত ঠেকছে। বিদেশ ঠেকছে। তবু ঘুরতে ঘুরতে গ্রামের দিকে এগোই।'

ভোলাবাবু বলে চলেছে, তপেন গেলাসে একটা করে চুমুক দিচ্ছে আর বলছে—'তারপর?'

'তারপর গ্রামের কাছাকাছি আসতে মনে পড়ল বউয়ের কথা। মনে পড়ল ওর সেই কচি-কচি চেহারা। একমাথা চুলের ঢাল কোমর অবধি ছড়িয়ে নেমেছে। মনে পড়ল, আমার ধরা পড়ার দিন ভোরবেলা ওর সে কী কান্না। কী ভেবে ওর জন্যে এক শিশি সুগন্ধি চুলের তেল কিনলাম। এতদিন ওর নামটা ভুলেও গিয়েছিলাম। বাড়ির কাছাকাছি আসতে মনে পড়ল, ওর নাম লতা।

'পাথরকুচি গ্রাম, দেখলাম, আর আগের মতো নেই। অনেক একতলা-দোতলা বাড়ি উঠেছে। বাজার

বসেছে রেলস্টেশনের ধারে। সেখানে এখন সাইকেল রিকশা চলে। একটা রিকশা নিয়ে চিনে চিনে বাড়ি অবধি যাই। বাড়ির সামনে পুকুর ছিল, সেটা বুজিয়ে খেলার মাঠ হয়েছে। দেখি, বিকেলবেলা ছেলেরা ফুটবল খেলছে সেই মাঠে। ওদের কাউকে আমি চিনতে পারি না। আমার বাড়ি দেখলাম, সেই রকমই আছে। সেই টালির চাল। বাঁশের বেড়া। বাড়ির উত্তর দিকে সেই পাতকুয়ো।

'রিকশা থেকে নেমে ডাকলাম, লতা, লতা। পাতকুয়োর ধারে বাসন মাজছিল এক মধ্যবয়সি মেয়ে। পরনে কালো পাড় শাড়ি। সে এগিয়ে এল।

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, লতা আছে?'

'আমিই লতা। কেন কী হয়েছে?'

'বলতে যাচ্ছিলাম, আমি ভোলা, জেল থেকে বেরিয়েছি। বাড়ি এলাম। তার আগেই লতা হাঁক দিল, বিশু, দেখ তো, কে এসেছে। ভিকিরি টিকিরি হবে। তাড়িয়ে দে।'

'আমি হঠাৎ ওর মাথার ঘোমটা খসে পড়তে দেখলাম। ওমা একী! মাথায় একটুও চুল নেই! পুরো টাক। মেয়েমানুষের মাথায় অমন টাক আমি এ-জন্মে দেখিনি।

'অমনি রাগ উঠে গেল মাথায়। আমি সুগন্ধি কেশতেলের শিশিটা ঠক করে মাটিতে নামিয়ে রেখে পেছন ফিরি। রিকশায় উঠে বসি। তাবপর আর বাড়ির দিকে ফিরে তাকাইনি।'

তপেন সরকার ককিয়ে ওঠে, 'তারপর?'

'তারপর ঘুরতে ঘুরতে এখানে। আপনার আশ্রয়ে। আজ সকালে সেই মেয়েলোকটা এক ছোঁড়ার হাত ধরে এ-বাড়িতে এসেছিল। বলে, ওই আমার বউ। ওই ছোঁড়া নাকি আমার ছেলে। তা কি সম্ভব? আমি তাড়িয়ে দিলাম। বউয়ের তো একটা ছিরি বলে ব্যাপার থাকবে। বলুন?'

তপেন সরকার উত্তর দিচ্ছে না দেখে ভোলাবাবু বলল, 'তা হলে কি আমি অন্যায় করিচি?'

অন্যদিন হলে তপেন সরকার ভাবত, ভোলাবাবু চলে গেলে এখানে রান্না করবে কে? ভোলাবাবুকে আটকে রাখা দরকার। বলত, যা করেছ, বেশ করেছ।

কিন্তু আজ ও একটু নেশা করেছে। আজ পাড়ায় কোথাও সন্ধেবেলা থেকে ঢাক বাজছে দুর্গাপুজোর। আজ ও বেপাড়ায় কোথাও মেয়েমানুষের আদর খেতে যাবে। পকেটে টাকা আছে, মনটা নরম। তাই, রাগ না করে, ভোলাবাবুর বউ লতা, তার দিক থেকে গোটা ব্যাপারটা ভাবতে উপদেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল তপেন সরকার।

তার দিক থেকে ভাবলে ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে যায় না?

১৯৯৩

❀ বাচ্চা হনুমানের সুবর্ণ জয়ন্তী

মোটাসোটা শরীর। পায়ে বাত। প্রায়ই বুক ধড়ফড় করে। গীতামাসিমার বয়েস পঁয়ষট্টি পার হয়ে ছেষট্টি চলছে। তবু বিশ্রাম নিতে পারেন না। চিরকালের অভ্যেস, ও কি এককথায় ছাড়া যায়।

সেদিন সকালে বসার ঘরটায় ঘুরে ঘুরে ফার্নিচারের ধুলো ঝাড়ছেন। হাতে একটা পুরনো কাপড়ের টুকরো। ফটাস ফটাস শব্দ হচ্ছে। প্রতিদিন কোথা থেকে এত ধুলো এ-ঘরে এসে ঢোকে ভেবে পান না গীতামাসিমা। ছোটখাটো জিনিসগুলো, যেমন পেতলের নটরাজ কি কাচের চিনে পুতুল কি টেবিলের ওপরে রাখা কলমদানি টেবিলল্যাম্প—সে তো আর ফটাস ফটাস করে ঝাড়া যায় না, হাতে তুলে মুছতে হয়। তাতে পরিশ্রম বেশি।

মুছতে মুছতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। এ কী? এ কীসের শব্দ? টেলিফোনের রিসিভারটা তখনও বাঁ

হাতে ধরা। কালো যন্ত্রটার ছোট ছোট ফোকর থেকে ভোঁ ভোঁ করে শব্দ হচ্ছে? কানে চেপে ধরলেন। তাই তো, এ যে ডায়াল টোন! ওঁয়া ওঁয়া করে ডাকছে।

মায়ের প্রাণ, গীতামাসিমার চোখে জল এসে গেল। ডায়াল টোনের উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, কখন এসে চুপটি করে বসে আছ, আমায় জানান দাওনি! আমিও তেমনি। ভাবি, ডেড তো ডেড, কোনওদিন একবার কানে তুলে দেখি না।

আসল কথা সেটাই।

গত বছর বর্ষার সময় হঠাৎ একদিন টেলিফোনটা ডেড হয়ে গেল। তাই তো, প্রায় এক বছর হতে চলল। স্পষ্ট মনে পড়ে, গুগলি তখন পলার পেটে। পাকপাড়া থেকে কান্নাকাটি করে চিঠি লিখল, 'মা তোমাদের কী হয়েছে, একবার টেলিফোন করে খবর নাও না, কেমন আছি। যখনই ফোন করি, দেখি এনগেজড। কে এত কথা বলে, মা? মিনু বুঝি? বড় পাকা হয়ে উঠেছে।'

প্রথমে শোনা গেল কেব্‌ল ফল্ট, সারাই হচ্ছে। তারপর ওরা বলল, না, ওয়্যারিংয়ের গোলমাল, আগে ঠিক করান। ছোটাছুটির পর জানা গেল, এক্সচেঞ্জের কানে জল ঢুকে গেছে, টেলিফোন আপিসে বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়ে আর কাজ চালানো যাচ্ছে না। কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করতে না চান, তো টেলিফোন ফেরত দিয়ে দিন।

না, না, ফেরত দেওয়া কোনও কাজের কথা নয়। গীতামাসিমা ফেরত দিতে দেননি। উনি জানেন, ওই মরা টেলিফোন নেবার জন্যই লোকে লাইন দিয়ে আছে। বসার ঘরে একটা টেলিফোন না হলে মানায়। একদিন-না-একদিন ঠিক তো হবেই। ও বেচারি তো খেতে-পরতে চাইছে না।

দেখতে দেখতে সবাই জানল। পলার শ্বশুরবাড়ি জানল, মিনুর অ্যাডমায়ারাররা জানল, চিতুর ক্লাসফ্রেন্ডরা জানল যে, এ-বাড়ির টেলিফোন ডেড। ডাক্তার বকশি, ললিত সরকারের মানে মেসোমশাইয়ের পুরনো আপিস, গানের স্কুল, গয়নার দোকান, গ্যাস—কারুর আর জানতে বাকি রইল না। ক্রমে সকলে ভুলেই গেল যে, এ-বাড়িতে টেলিফোন ছিল একদিন। ক্রিরিং ক্রিরিং করে বাজত সময়ে-অসময়ে। ভুলে গেল, যেমন অনুপস্থিত মানুষকে লোকে ভুলে যায়।

কোথা থেকে কী, বলা নেই কওয়া নেই এতদিন পব টেলিফোনটা আবার ওঁয়া ওঁয়া করে উঠেছে। গীতামাসিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কানে চেপে রইলেন যন্ত্রটা। খানিকক্ষণ ওঁয়া ওঁয়া করার পর কট্ করে শব্দ হল একটা তারপর একটানা সুরে 'গ্যাঁ' করতে লাগল। আবার খানিক পর সেটাও থেমে গিয়ে 'পুক-পুক' ধরনের একটা ছেলেমানুষি শব্দ—যেন যন্ত্রটা খেলায় মেতেছে। ফিক করে হেসে ফেললেন গীতামাসিমা, তারপর এদিক-ওদিক একবার চেয়ে দেখে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন। টিং করে সেই পরিচিত মিষ্টি শব্দটা পাওয়া গেল এইবার। এতক্ষণ পর।

নিজেদের শোবার ঘরে উলঢুল বিছানা। কর্তা হাঁটতে বেরিয়েছেন। ও-ঘরে মিনু আর চিতু ঘুমোচ্ছে এখনও। ওদের বিছানা দুটোর মাঝখান দিয়ে হেঁটে এলেন একবার। মিনুটা ঘুমের মধ্যেও ফিক ফিক করে হাসছে দেখো! স্বপ্ন দেখছে বোধহয়। মাসিমার মনটা হঠাৎ কেমন আনচান করে উঠল। ফিবে গেলেন টেলিফোনের কাছে। যন্ত্রচালিতের মতো ডায়াল ঘোরালেন।

'হ্যালো পলা? আমি মা?'

'কে মা? আপনি কত নম্বর চান?

'পাগল হয়ে গেলি নাকি? আমি মা রে!'

'মা! মানে আমার মা? তাজ্জব ব্যাপার! কোথা থেকে কথা বলছ?'

'কেন, বাড়ি থেকে।'

'টেলিফোন?'

'ঠিক হয়ে গেছে।'

'ঠিক হয়ে গেছে? আরে বলবে তো! ও মা, কতদিন পর টেলিফোনে তোমার গলা শুনছি। তোমরা কেমন আছ? তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

গলা ধরে আসে গীতামাসিমার। বললেন, 'একদিন আয় তোরা।'

'মা, তুমি নেমন্তন্ন করো, না হলে এরা যেতে দেবে না। একটা উপলক্ষ তো হয়েই গেল।'

'ঠিক আছে। কাল এসো তোমরা। গুগলিকে আনবে সঙ্গে।'

'কাল না মা। তোমার জামাই ট্যুর থেকে ফিরবে শনিবার। রোববার আসি? সারাদিন থাকব। চিংড়িমাছ খাব, হ্যাঁ? আর তোমার হাতের কচুশাক।'আর আমড়ার অম্বল পোস্ত দিয়ে। ও আমার লক্ষ্মী মা! আর শোনো—ও-পাড়ায় যখন যাচ্ছি তখন—!

যাঃ লাইনটা কেটে গেল।

'কী ব্যাপার? ভূতের সঙ্গে কথা বলছ?'

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, কর্তা মিটমিট করে হাসছেন।

কেডস-মোজা খুলতে খুলতে পুরো ব্যাপারটা শুনলেন ললিত সরকার। ঘামে-ভেজা টি-শার্টখানা খুললেন গা থেকে। মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'চা খাবো না, একটু হরলিকস করে দাও।'

'কেন? কী হল আবার?'

'বেঞ্চিতে বসে ছিলাম, মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।'

'সে আবার কী কথা। চিতুকে ডাকছি, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসুক।'

'একটা ফোন করে দাও।'

তাই তো। গীতামাসিমা আবার ডায়াল করলেন।

'ডক্টর বকশি? মিসেস সরকার বলছি।'

'কোন মিসেস সরকার?'

'চিনতে পারছেন না? মিনুর মা।'

'ও হো। মিসেস সরকার। তা টেলিফোন...?'

'ঠিক হয়ে গেছে।'

'কংগ্র্যাচুলেশন। মিষ্টি খাওয়ান। এত বড় একটা খবর।'

মৃদু হেসে গীতামাসিমা বলেন, 'সে হবেখন। চেম্বারে যাবার পথে একবার আসতে পারবেন?'

'কার কী হল?'

'ওঁর শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে। তেমন কিছু না, তবু একবার দেখে যান যদি।'

ডাক্তার আসছে জেনে কর্তা-গিন্নি দু'জনেরই দুশ্চিন্তা অনেকটা লাঘব হয়।

সেদিন চিতুর স্কুলে যেতে আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। হবে না? কত দরকারি কথা জমে আছে। বুচি, বান্টি, বুবাই, মুন্না। প্রাণের বন্ধু তো সংখ্যায় কম না। ফুটবল, টিভি সিরিয়াল, রাস্তার ক্রিকেট—নানাবিধ আলোচনার বিষয়। একবার দিদিকেও ধরে ফেলল টেলিফোনে। শুনল, দিদিরা রোববার আসছে। সেদিন সুবর্ণজয়ন্তী সেলিব্রেট করা হবে। এ-খবর কেউ যেন জানতে না পারে। একমাত্র মেজদি ছাড়া। বাবা-মা তো ঘুণাক্ষরে জানবে না।

মাথা ধরেছে বলে মিনু কলেজে গেল না। আজ কতদিন পর টেলিফোন। টেলিফোনে কথা বলার মজাই আলাদা। মুখোমুখি সব কথা বলাও যায় না, শোনাও যায় না।

দুপুরবেলা। আকাশে বেশ মেঘ করেছে। এলোমেলো বাতাস বইছে। একপশলা করে বৃষ্টি হচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ, বাড়িটা শুনশান।

পা টিপেটিপে বসার ঘরে বেরিয়ে এল মিনু। খুব সন্তর্পণে ডায়াল করল ওর নম্বরটা। ও-ঘরে যেন শোনা না যায়।

'এই—'

'কে?'

'বল তো কে?'

'গলাটা চেনাচেনা। কিন্তু সে তো হবে না।'

'সেই।'

'কোত্থেকে?'

'বাড়ি থেকে না তো কি পোস্টাপিস থেকে?'

'টেলিফোন?'

'সেরে গেছে। এ কি মানুষ, যে ডেড মানে একেবারে ডেড?'

'আঃ বাঁচালি।'

'ঘুম ভাঙালাম?'
'দুপুরে আমি ঘুমোই না।'
'তো কী করছিলি?'
'বাজনা শুনছি। শুনতে পাচ্ছিস না?'
'পপ?'
'ঢপ। তুই মিউজিকের কী বুঝিস?'
'গাঁট্টা মারব। এই—'
'কী—'
'পরশু হঠাৎ চলে গেলি কেন? বললি, কথা আছে।'
'পরে বলব।'
'টেলিফোনে বল। আমার জানতে খুব ইচ্ছে করছে।'
'ফেমিনিন ভাইস।'
'কী?'
'কৌতূহল।'
'ভাইস তো ভাইস। বল না বাবা।'
'তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল—'
'কত শখ! এই, রোববাব কী করছিস?'
'কখন?'
'দুপুরে।'
'কেন?'
'আমাদের বাড়িতে আয়। চিংড়ি মাছ খাওয়াব। বিরিয়ানি।'
'অকেশন?'
'পরে জানবি। এই,—পিংক শার্টটা পরে আসবি। নীচে গেঞ্জি পরবি, বুঝলি।'
'কেন?'
'মুখে দাড়ি তার ওপর বুকে চুল—দু'চক্ষের বিষ। দিদি আসছে। এই—'
'কী?'
'কী যেন বলব ভাবছিলাম, ভুলে গেলাম।'
'শ্যাম্পু করেছিস আজ।'
'কী করে জানলি?'
'গন্ধ পাচ্ছি।'
'টেলিফোনে বুঝি গন্ধ পাওয়া যায়।'

একবার টেলিফোনটা ঠিক হয়ে গেলে বুঝি জীবনটা বদলে যায়। পৃথিবীর দরজা খুলে যায়। রবিবার আসার আগের দিনগুলো টেলিফোনে টেলিফোনে ছয়লাপ হয়ে গেল। গীতামাসিমা'র পুরনো বান্ধবী তুহিনা, এখন এম এল এ-র বউ হয়েছে, কোনওদিন ফোন করে না, সে-ও একদিন শাড়ি সমারোহ নামের দোকানে ফোন করতে গিয়ে এই নম্বরে ডায়াল করল। বম্বে থেকে ভুল কল এল একদিন মাঝরাত্তিরে; সারাওগি বোলতা হুঁ, তিন ট্রাক মাল ভেজ দিয়া—ধুৎ তিন ট্রাক মালের নিকুচি করেছে! ঘুমের সময়ে জ্বালাতন! এইসব কাণ্ড।

রবিবার দিনটা বাড়ি গমগম করেছে। পলা, পলার বর সুজিত এসেছে। আজ সুবর্ণ জয়ন্তী। কীসের আবার? যে-কোনও আনন্দের দিনকেই সুবর্ণ জয়ন্তী বলা যায়। এসেছে ওদের আট মাসের বাচ্চা গুগলি—সে তো একাই একশো। মিনুর বন্ধু জয়। ডাক্তার বকশি। চিতুর দুই ফ্রেন্ড। ক্যাসেটে সানাই বাজল। ক্যারমে বেইমানি করে গেম জিতল মেয়েরা, তা নিয়ে চিতু প্রচণ্ড খাপ্পা। সুজিত তখন ওকে বোঝায়, মেয়েদের কাছে হেরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, তুমি বড় হলে বুঝবে।

আহার্যের ত্রুটি হবার কথা নয়। এ-বাড়িতে বাজার যা হবার হয়ে ছিলই, তার ওপর পলা এনে হাজির

করেছিল দু'কিলো পাঁঠার মাংস—পাকপাড়ার পাঁঠা নাকি বিখ্যাত। ললিত সরকারের ব্যবসায়ী বন্ধু কেশব সুচান্তি নিজে আসতে পারেনি, এক চ্যাঙারি গাজরের হালুয়া পাঠিয়ে দিয়েছে।

দুপুরের খাওয়া সারতে সারতে তিনটে। তারপর পাঁচটায় চা। বাড়ি খালি হল গিয়ে সেই সন্ধেবেলা। এক কাপ করে দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। আজ গীতামাসিমা সবচেয়ে ক্লান্ত, কিন্তু ঘুম আসছে না তাঁরই।। অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করলেন, তারপর উঠে এলেন বসার ঘরে। একটা পত্রিকা টেনে এনে ভূতের গল্প পড়তে লাগলেন। গল্পে মজে গেলেন, যাকে বলে।

হঠাৎ শোনেন টেলিফোনের কাছে প্যাঁক প্যাঁক শব্দ হচ্ছে।

তাকিয়ে দেখেন, কালো রঙেব রিসিভারটা বাচ্চা হনুমানের মতো টিভি-র ওপর বসে আছে, তার লম্বা লেজ ঝুলছে মেঝে অবধি। কাছে গিয়ে শোনেন ও বলছে, 'তোমরা সব খেলে, আমায় দিলে না? বারে বাঃ। আমায় দিলে না?'

তাই তো! ওর জন্যেই এত কাণ্ড, আর ওকেই বাদ দেওয়া হয়েছে! কী মনে হল, গীতামাসিমা চুপি চুপি ফ্রিজ থেকে একটু একটু করে বিরিয়ানি, মাংস আব পায়েস বার করলেন। তারপর বাচ্চা হনুমানটাকে কোলে বসিয়ে খাওয়ালেন। একসময় ওর প্যাঁক প্যাঁক নালিশ বন্ধ হয়ে গেল। তখন ওকে আর যন্ত্রটার বোতামের ওপর উপুড় করে না শুইয়ে টেবিলেব একপাশে কাত করে শুইয়ে দিলেন।

সোমবাব সকালে যথারীতি কর্তা উঠেছেন সবচেয়ে আগে। মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে শার্ট প্যান্ট পরে হাঁটতে বেবোচ্ছেন। কেড্‌সের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে ওঁর চোখে পডল, টেলিফোনের রিসিভাবটা শোয়ানো। শোয'নো কেন?

ছুটে গিযে কানে দিয়ে দেখেন, ডেড। শুধু ডেড নয়, তাব ভেতর থেকে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। তখন ব্যাপারটা ওঁর চোখে পড়ল।

চোখে পড়ল, মাউথ পিসের মধ্যে একগাদা খাবার গোঁজা। কালো ইয়াবফোনটা দিয়ে দুধের মতো সাদা কী সব বেরিয়ে জায়গাটা চটচট করছে। একেবারে ডেড। এ আর কোনওদিন বেঁচে উঠবে না।

যেমন ছিল, তেমনি ভাবে রেখে ললিত সরকার তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তিনি জানেন, একটু পবে সারা বাড়িময় শোকের রোল উঠবে।

পার্কের বেঞ্চে বসে বসে ললিত সরকারের মনে নানা চিন্তার উদয় হল। একবার ভাবলেন সংসার মানেই ঝামেলা আর অশান্তি। তারপর ভাবলেন, বেঁচে থাকাটাই ঝকমারি। শেষকালে মনে হল, সভ্যতা মানুষের জীবনে অভিশাপ। ভাবনাগুলো ক্রমাগত মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

ললিত সরকার চোখ তুলে দেখলেন, আকাশের একটা দিক ঝকঝকে পরিষ্কার নীল। অন্য দিকটায় প্রায় অর্ধেক দিগন্ত জুড়ে সাদা থোকা থোকা মেঘের সারি। যেন দেব দেবীদের কাপড় শুকোচ্ছে। দেখলেন, একটা চিল উড়তে উডতে ওই মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেল। একেবারে হারিয়ে গেল। ওই দিকটায় কোনও তাড়াহুড়ো নেই।

১৯৮৬

নতুন বাসা

গত রবিবার তোমরা এই বাসায় এসেছ, মলয়, আজ রবিবার, সাত দিন হল। এই সাত দিনে তোমার স্ত্রী তৃপ্তি দুধের ডিপো, রেশন কার্ড, গ্যাস, জমাদার, কাজের লোক আর খবরের কাগজের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। করে ফেলেছে কেননা তুমি বলেছিলে, এসব সামান্য কাজ, কলকাতায় চলাফেরায় অভ্যস্ত তুমি, কেন পারবে না?

অথচ তুমি কি জানো না, জানো, কলকাতা একটা মাত্র শহর নয়। অনেকগুলো আলাদা রকম শহর

একত্র করে কলকাতা। যেমন ধরো, মানিকতলা—তৃপ্তির বাপের বাড়ি যেখানে—আর ভবানীপুর, যেখানে তোমাদের, মানে তোমার বাবা-কাকাদের পৈতৃক বাড়ি, এই দুটো অঞ্চল কি একরকম? কিংবা নিউ আলিপুর, ওর দিদিদের পাড়া, আর এই যোধপুর পার্ক?

মোটেই তা নয়। অন্তত তৃপ্তির কাছে তা নয়। তোমার কাছে হয়তো একরকম ঠেকবে। তুমি পুরুষমানুষ সবকিছুই বাইরে থেকে দেখো। মানিকতলা অঞ্চলের লোকেরা অনেক কাছের মানুষ। নানান জাতের, নানান প্রকৃতির, নানান রকম আর্থিক সঙ্গতির লোক সে অঞ্চলে বাস করে ঠিকই, কিন্তু চোখে চোখ পড়লেই মনে হয় চেনা। অনেক কালের চেনা, পরিচিত। এক পাড়ার লোক। অথচ হতে পারে, এই প্রথম দেখা হল।

মলয়, তুমি বলবে, মানুষের ছেলেবেলা, স্কুল-কলেজের বয়েস যেখানে কাটে, তার প্রতি অন্য রকম টান। বললে কিন্তু তৃপ্তির প্রতি একটু অবিচার করা হবে। কেননা, শুধু মানিকতলায় নয়, ভবানীপুরেও—শ্বশুরবাড়ির পাড়া, যেখানে বিয়ের পর একটা বছর কাটিয়ে এল তৃপ্তি—এই অন্তরঙ্গ ভাব আছে। আগেকার দিনের লোকেদের মতো কাছাকাছি স্বভাব। মানিকতলা বা ভবানীপুর অঞ্চলের মেয়েরা, মহিলারা, এখনও থোড়-মোচা, ওল বা কচুর শাক, কি ধোঁকার ডালনা রাঁধতে জানে। লুঙ্গি পরে বাজারে যেতে ভদ্রলোকের লজ্জা করে না। গোটা ইলিশ কিনলে কাটিয়ে লুকিয়ে আনার রীতি প্রচলিত নেই। ল্যাজা-মুড়ো সুতলি দিয়ে বেঁধে হাতে ঝুলিয়েই আনবে। 'কী দর?'—জিজ্ঞেস করলে সত্যি কথাই বলবে, মুখ ফিরিয়ে নেবে না, বা চোখদুটো ফোকাস করবে না আকাশে।

দিদির কাছে শুনেছে তৃপ্তি নিউ আলিপুরে যেমন বাড়িগুলো ছাড়া ছাড়া, তেমনই সম্পর্কেও আঠা কম। তবে, যাদের সঙ্গে বনিবনা হয়ে যায় বেশ হয়ে যায়। আত্মীয়-কুটুমের মতো। দুপুরে বা সন্ধেবেলা মহিলাদেব এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার রীতি আছে। একটা টেলিফোন করলে কেউ বিরক্ত হয় না। পাড়ায় ক্লাব আছে, আলাদা পুজো হয়।

সাতটা দিন তুমি তো সকালে ডিমের পোচ আর কর্নফ্লেকস খেয়ে কমলারঙের ফিয়াটখানি বাজাতে বাজাতে চলে গেছ, ফিরেছ সন্ধের পর। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও একদিনও আগে ফেরোনি, একদিনও আপিস থেকে টুক করে বেরিয়ে সংসারের একটা কাজ সারোনি। প্রচণ্ড নাকি তোমার কাজের চাপ। বাতানুকূল ঘরে মোটা গদি-মোড়া চেয়ারে বসে সারাটা দিন ফরমাশ করতে করতে নাকি তুমি গলদঘর্ম হয়ে যাও!

আর এদিকে ট্যাং ট্যাং করে রোদের মধ্যে ছাতা মাথায় তোমার স্ত্রী ঘুরে বেড়াচ্ছে চরকির মতো। একটা সংসার গুছিয়ে তোলা কি মুখের কথা। এটা আছে তো ওটা নেই, ওটা আনল তো সেটা ফুরোল। বাজার দূরে, মুদিমনিহারির দোকানটা, যেখান থেকে একটা টেলিফোন করতে পঁচাত্তর পয়সা নেয়, সেটাও পাঁচ-সাত মিনিটের হাঁটাপথ।

মা বলে দিয়েছিল, মোটা কাজের জন্যে একটা ঠিকে ঝি রাখিস। ওপরতলার মাসিমাকে বলে, ঢের সাধ্যসাধনা করে প্রমীলাকে পাওয়া গেছে। শুধু বাসন মাজা, কাপড় কাচা আর ঝাড়-পোঁছ—তা-ই পঁচিশ টাকা মাইনে। এর মধ্যে দু'দিন কামাই হয়ে গেছে। তা ছাড়া ওর একটু হাতটান স্বভাব আছে, মনে হয়। হাতেনাতে ধরা পড়েনি, তবে তৃপ্তির সন্দেহ, আলুটা পিয়াঁজটা সরাচ্ছে প্রমীলা।

শ্বশুরমশাই বলে দিয়েছেন, জোয়ান চাকর রেখো না। সারাদিন একা থাকবে বাড়িতে, ছোঁড়াগোছের একটা রেখো, যে রান্নাবান্না জানবে, ফরমাশ খাটবে। জোয়ান চাকরেরা নাকি দুষ্টু হয়, তাই ফটিক এসেছে। খেরকুটে চেহারা—দেখে মনে হয় পনেরো-ষোলো, আসলে অন্তত কুড়ি-বাইশ। তৃপ্তির ধারণা, ও মাকুন্দ। বোকা কিন্তু ফিচেল। তৃপ্তির সন্দেহ, ফটিক রোজ এক কাপ করে দুধ খাচ্ছে, আর সেই পরিমাণ জল মিশিয়ে দিচ্ছে ডেকচিতে। কী জল কে জানে! এ-ও ধরা পড়েনি হাতেনাতে, তবে ওপরতলার মাসিমা পুজোর ঘর থেকে নিজের চোখে দেখেছেন, পরশু দুপুরে দই আনতে দিয়েছিল তৃপ্তি—সেই দই ফটিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাটছে। এত বড় আস্পর্ধা ওর! পুজো সেরে যখন খবরটা দিতে এলেন নীচে, তখন দই-ভাত খাওয়া শেষ তৃপ্তির। জিজ্ঞেস করায় প্রথমে অস্বীকার করল, তারপর মাসিমা বাঁদর, জানোয়ার, ভূত—এইসব বলে যখন গালাগাল করলেন, তখন স্বীকার করল ফটিক। স্বীকার ঠিক করল না, বলল ঢাকনা খুলে দেখছিলাম টক দই না মিষ্টি দই।

সেদিন সারা দুপুর তৃপ্তির গা গুলিয়েছে।

রাঁধতে জানে না তৃপ্তি, কোনওদিন নিজ হাতে রাঁধতে হবে ও ভাবেনি, কিন্তু খাবার স্বাদ তো বোঝে। মলয়, তুমি তো তা-ও বোঝো না। তৃপ্তি রোজ খাবার টেবিলে তোমায় বলছে, তরকারিটা, ডালটা, মাছ—দেখতে ঠিকঠাক, কিন্তু স্বাদ কেমন কেমন ঠেকছে না? তুমি রোজই বলছ, কই না তো, নুন-ঝাল তো ঠিকই লাগছে। আসল ব্যাপার ধরা পড়ল কাল—ফটিকের ফোড়ন।

গ্যাসের উনোনটার ওপরে বাঁ দিকটায় সিমেন্ট-বাঁধানো শেলফ আছে দুটো। নীচের শেলফে কতকগুলো ছোট ছোট কৌটো। তৃপ্তি আবিষ্কার করল, কৌটোগুলোর মধ্যে কোনওটায় মৌরি, কোনওটায় মেথি, জিরে, কালোজিরে, সরষে—এইসব রাখা। তারপর রান্নার সময় দেখল, যে-কোনও পদ কড়ায় চড়ানোর আগে ফটিক করছে কী, একটু তেল ঢেলে তার মধ্যে যে-কোনও কৌটো থেকে হাতে যা ওঠে, এক চিমটি ফোড়ন ছেড়ে দিচ্ছে প্রথমে। কী দিলে, জিজ্ঞেস করায় ও খুন্তি দিয়ে জিনিসটা তুলল, তারপর চিনল। ঠিক দিল না ভুল, কী করে জানবে তৃপ্তি? টেলিফোন নেই, যে মাকে ফোন করে দরকারি ব্যাপারটা জেনে নেবে।

এইসব গুরুতর সমস্যার কথা তুমি জানো না, বলতে পারবে না মলয়। প্রতিদিন রাত্রে তৃপ্তি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছে তোমায়। এক কথাই বলেছ তুমি: ক্রমশ স-ব সয়ে যাবে, যে-কোনও জায়গাতেই সেটল করতে একটু সময় লাগে। এমনকী, ঠেস দিয়ে বলেছ: ছোট পরিবার সুখী পরিবার চেয়েছিলে, এই তো পেয়েছ। এখন নালিশ করছ কেন?

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হয়ে তৃপ্তি যে-রাত্রে তোমায় রিপোর্ট দিল, বাথরুমে ও দেখেছে, ফটিক ওর ছাড়া ভেতরের জামা শুঁকছিল, তুমি হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলে। বললে, ছোঁড়াটা রসিক আছে তো। তারপব নিজের মতলবে চলে গেলে।

আসল সমস্যা হল, তোমার টেলিফোন নেই।

মানিকতলায় বাপের বাড়িতে টেলিফোন ছিল। ছোটবেলা থেকে যন্ত্রটি ব্যবহাব করাব সুযোগ পেয়েছে তৃপ্তি। পাঁচ-ছ'বছর বয়েস থেকে ও ডায়াল করতে পাবে। ছোট্ট আঙুল ঢুকিয়ে ঠিকঠাক ছ'টা ডিজিট টানতে পাবত, ডাকত হ্যালো মাসি! তোমাদের বাগবাজারে বিষ্টি হচ্ছে? আমাদের মানিকতলায় খুব জল। কিংবা হ্যালো পিসিমণি, শনিবার আমরা কালীঘাটে পুজো দিতে যাব, তখন তোমাদের বাড়িতে আসব, বোঁদে খাব। এইসব। স্কুলে কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা—সে এক বিশেষ ধরনের বিলাস। বড়রা তো কাজের কথাটুকু বলে রিসিভার নামিয়ে দেয়। ফুরিয়ে যায় ওদেব কথা। কিন্তু সে-বয়েসে তৃপ্তিদের কথা কিছুতেই ফুরোত না।

তারপর বিয়ে হয়ে ভবানীপুর এল। সেখানে তো টেলিফোন ছিলই। বর-কনে বিদেয় হয়ে যাবার আধ ঘণ্টা পরে মা এ-বাড়িতে ফোন করেছে, 'কীরে, ঠিকমতো পৌঁছেছিস তো? কান্নাকাটি করছিস না? কাল যাব, তোকে দেখে আসব।' একটু পরেই আবার তৃপ্তি ফোন করেছে, 'পুরনো চপ্পলটা কোথায়? বাকসে তো দাওনি।' মা জবাব দিয়েছে, 'ভুলে গেছি রে। নিয়ে যাব কাল। একটা দিন নতুন জোড়া পরে চালিয়ে নে।' কাঁদবে কী! টেলিফোন থাকলে কাছের মানুষ কোনওদিন দূরে যায় না। যাকে দেখতে পাচ্ছ না তাকেও কাছে পেতে পারো।

মলয়, তুমি বলেছিলে, পাড়ায় একটু ভাবসাব করে নিয়ো, যাতে অবরেসবরে টেলিফোন ব্যবহার করতে দেয়। তৃপ্তিকে বলেছিলে দরকার মতো তোমার 'লা ফাম'-টা কাজে লাগিয়ো। কিন্তু তুমি জানো না, 'লা ফাম' দিয়ে এ ব্যাপারে সুবিধে হয় না। পুরুষেরা যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন তো তুমিও আসো। তখন তো গাড়িটাও থাকে। যেখানে খুশি যাওয়াও যায়। যত কাজের কথা মনে পড়ে তখনই, যখন তুমি আপিসে, আর তৃপ্তি একা বাসায় বসে পচছে। তখনই খেয়াল হয়, বাবার কাশিটা বেড়েছিল, কেমন আছে জানা দরকার। ছোট ভাইটার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে, কেমন পরীক্ষা দিচ্ছে জিজ্ঞেস করবে না? শাশুড়ির রক্তচাপ বেশি, কেমন থাকেন-না-থাকেন খবর নেওয়া উচিত। ছুটিতে দিদিরা বেড়াতে গিয়েছিল সাউথ ইন্ডিয়ায়, এতদিন ফিরেছে নিশ্চয়। নিউ আলিপুরে একবার টেলিফোন করে জানবে না কেমন বেড়াল ওরা? কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কী কী জিনিস কিনে এনেছে? তা ছাড়া তোমাকে তো টেলিফোন করতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে হয়, এই দুপুর তিনটেয় কী করছ তুমি আপিসে। ক'টার সময় বেরুবে। ফেরার পথে পার্ক স্ট্রীট থেকে অমুক জিনিসটা আনতে যেন ভুলো না। এইসব।

অথচ হাত-পা একেবারে বাঁধা।

ওপরতলার বাড়িউলির সঙ্গে মাসিমা-সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে তৃপ্তি প্রথম দিনেই। বুড়ো মানুষ, পুজোআর্চা নিয়ে থাকেন, নাতিটিকে নিয়ে সময় কাটান—'মাসিমা' বলে দাঁড়ালে অখুশি হন না। তারপর দুটো-একটা কথা বলার পর হাতব্যাগ থেকে টুক করে টেলিফোন নম্বরের ছোট্ট লাল খাতাটা বার করে বলা—'একটা টেলিফোন—'

তারপর মাসিমা অন্যমনস্ক থাকলে কোণে দাঁড়িয়ে সুযোগ মতো আরও একটা, আরও একটা, সেরে ফেলতে হয়।

কিন্তু মাসিমার ছেলের আপিস থেকে খরচ দিলেও প্রতিদিন তো একটা-না-একটা ছুতো ধরে যাওয়া যায় না টেলিফোন করতে।

তখন অগত্যা রিকশা চেপে মনিহারির দোকান। প্রত্যেকটা কল পাঁচাত্তর পয়সা। বেশিক্ষণ টেলিফোন আটকে রাখলে বিরক্ত হয় টেকো লোকটা, তাই জমিয়ে গল্প করা যায় না। কাজের কথা বলেই লাইন রেখে দিতে হয়। তৃপ্তির সন্দেহ হয়, লোকটা কান খাড়া করে সব শোনে, তাই প্রাইভেট কথা একেবারেই বলা যায় না দোকান থেকে। বিশেষ করে, মলয়, তোমাকে: 'তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসো', 'শুনছ, আমার মন ভাল নেই, তোমায় খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করছে'—এই ধরনের কথা, যা শুনে অবশ্য তোমার কোনও বিকাব হয় বলে মনে হয় না। কারণ, তুমি দু'-চার কথায়—'আচ্ছা ঠিক আছে আসব, না না তা তো বটেই'—ধরনের কাটা কাটা উত্তর দিয়ে কাজ সারো। আপিসে গিয়ে পড়লে বাড়ির কথা তোমার একেবারেই মনে থাকে না, অস্বীকার করতে পারো মলয়?

ডায়াল করার পর কক করে শব্দ হল হয়তো। আর অমনি যাকে চাই তার বদলে অন্য দু'জন ঢুকে পড়ল লাইনে। অনেক সময় মজার মজার কথা শোনা যায়। মানিকতলায় ডায়াল করতে গিয়ে সেদিন যেমন:

মেয়ে—এই চুপ করে গেলে কেন?

ছেলে—কী বলব। বলার কিছু নেই।

রাগ করেছ?

নাঃ।

নাঃ-টা তো রাগের কথা।

যার ওপর জোর খাটে, তার ওপরই রাগ করা যায়। তাই না?

তার মানে আমার ওপর তোমার জোর খাটে না। (ফোঁস—দীর্ঘশ্বাস)

খাটে কি?

(প্রসঙ্গ পরিবর্তন) এই জানো, তোমরা কাল চলে যাবার পর উনি নেমে এসেছিলেন। ন্যাকামি করে জিগেস করলেন, কে এসেছিল রে? মিতা বুঝি?

—'উনি' কে?

—মা, আবার কে? তা আমিও বলেছি, হাঁ মিতা। তখন বলছে, ব্যাটাছেলেব গলা পেলাম যেন! কী পাজি, বুঝে দেখো!

কী বললে তুমি?

বললাম, মিতার সঙ্গে ওর দাদু এসেছিল, তুমি তার গলা শুনেছ ওপর থেকে। ব্যস, চুপ। হি হি, হি হি হি হি কেমন দিয়েছি!

—হাঃ হাঃ হাঃ হা, হাঃ হা।...

ক্রস কানেকশন হয়ে গেছে বুঝি?' পেছন থেকে বলে উঠল টেকো দোকানদার। মাউথপিসটা চেপে ধরে তৃপ্তি কথা শুনছিল, ঠিক বুঝতে পেরেছে। বলে, ডিসকানেকট করে দিন। একটু পরে আবার চেষ্টা করবেন। ইনি অপেক্ষা করছেন।' পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, সামনের বাড়ির নীচের তলার ভদ্রমহিলা।

ইন্দ্রাণী ওর নাম। প্রায়ই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে, তৃপ্তির। এই ক'দিনে অন্তত পাঁচ বার। ওপরতলার মাসিমার ওখানে দু'বার। পূর্ণিমাদির বাসায় দু'বার। এই দোকানেই আগে একবার। ওর চেয়ে বয়েসে একটু বড় হবে, তিরিশ টিরিশ। ভারী সেয়ানা মেয়ে। মাসিমার ছেলের বউ চাকরি করে

কোথাও, সকালে যায় আবার খাবার সময় চলে আসে। সেই সুযোগে গিয়ে বউয়ের নিন্দেবান্দা চর্চা করে আসে। মাসিমার মন জোগায়। আসলে সেই ফাঁকে দু'-চারটে টেলিফোন।

সুরতীর্থ-তে পূর্ণিমাদির সঙ্গে গান শিখত তৃপ্তি। বিয়ের আগের ব্যাপার। মোড়টার কাছে হঠাৎ দেখা সেদিন। গাড়ি করে আসছিলেন, গাড়ি থামিয়ে মুখ বাড়ালেন, 'আরে তৃপ্তি না?...এদিকে কোথায়? বাসা নিয়েছ?...কোন বাড়ি?...ওমা তাই নাকি?...কাছেই তো?...কতদিন এসেছ?...বিয়ে হয়েছে কতদিন? কী করেন কর্তা?' অনেক কিছু জানলেন পূর্ণিমাদি। শেষকালে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছিলে?' তৃপ্তি সত্যি কথা বলেছে।

পূর্ণিমাদি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরোজা খুলে বললেন, ভেতরে এসো, আমাদের বাড়ি থেকে ফোন করো। কী উদার মন পূর্ণিমাদির!

পূর্ণিমাদির স্বামী খুব বড় চাকরি করেন। ড্রাইভার সুদ্ধ গাড়ি পান আপিস থেকে। আপিসের টেলিফোন, চাকর, সব। বললেন, 'ফোন করার দরকার হলে এখান থেকে কোরো। কোনও সংকোচ কোবো না।'

ওঁব বাড়িতে গিয়ে দেখে, এই ইন্দ্রাণী ওখানেও ঠিক বসে আছে। পূর্ণিমাদির মেয়ের সঙ্গে বসে হিন্দি-বাংলা মুভি নিয়ে আলোচনা করছে! যার সঙ্গে যে রকম। ওর হাতে একটা সিনেমা-পত্রিকা, নিশ্চয় টেলিফোনেব ঘুষ। অনুমান করতে পাবে তৃপ্তি—এই ধরনেব রসালো আড্ডার পেছনে ঠান্ডা সুচিন্তিত কয়েকটা ফোন কল অবশ্যই আছে।

না মলয়, তোমার স্ত্রীর পক্ষে এ দীনতা সহ্য করা অসম্ভব। একটা ব্যবস্থা তোমায় করতেই হবে। তৃপ্তির ভরণপোষণের ভার তুমি নিয়েছ, ওকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবে—কথা দিয়েছ বিয়ের সময়। সুতরাং এ-দায়িত্ব তুমি এড়িয়ে থাকতে পারবে না। না না, তৃপ্তি, তোমার চোখ মোছার দরকার নেই। শোনো।

একটা পবামর্শ দিই, মলয়, কিছু মনে কোরো না। তোমাদের যোধপুর পার্কে নতুন একসচেঞ্জ থেকে কানেকশন দিচ্ছে। সাধারণ বর্গে তোমার দরখাস্ত দেওয়া আছে, লাইন পেতে কয়েক বছর লাগবে। তার বদলে যদি তুমি নিজের টেলিফোন কিনে নাও, এক মাসের মধ্যে পেয়ে যাবে লাইন।

হ্যাঁ, জানি, পাঁচ হাজার টাকা লাগবে। তোমাব দরখাস্ত বাতিল করে নাও, এক হাজার টাকা ফেরত পাবে কেমন? বাকি চার হাজার? না না, তুমি থামো তৃপ্তি, হাতের বালা খুলতে হবে না। বিয়ের সময় যৌতুকের টাকায় তোমাব শ্বশুর মেয়ের নামে পাঁচ হাজাব টাকার ইউনিট কিনে দিয়েছিলেন। সেই ইউনিট ব্যাঙ্কে জমা রেখে তুমি পাঁচ হাজার টাকাই ধার পেতে পারো, কিন্তু তোমাব দরকার চার হাজার, তাই নেবে। শোধ করে দেবে আস্তে আস্তে। ধার শোধ হয়ে গেলে তৃপ্তির ইউনিট ফিরে আসবে ঘরে। লাভেব অংশ পেতে থাকবে যেমন পাচ্ছ।

কী মলয়? বাজি? হল তো সমস্যার সমাধান? আর দেরি কোরো না, সোমবারেই দরখাস্ত জমা দিয়ে দিয়ো।

এ কী তৃপ্তি? তোমাব মুখে হাসি নেই কেন? এখনও কীসের দুশ্চিন্তা? এ্যাঁ? ইন্দ্রাণী? এ-পাড়ার সব ইন্দ্রাণীর মতো টেলিফোনহীন মহিলারা তোমার বাড়িতে যদি রোজ...সকালে দুপুরে...মুখে তোষামোদের হাসি...হাতব্যাগের মধ্যে ছোট্ট নোটবই...বিনত অথচ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দৃষ্টি...না, না, ভয় পাওয়ার দরকার নেই। উচিত না। দিয়ো, ওদের দু'-একটা ফোন করতে দিয়ো।

১৯৭৬

কল্পনা—কল্পনা মিত্র, বয়স একষট্টি, ফরসা, রোগা কিন্তু মোটামুটি নীরোগ, আপাতত পূর্ণশ্রী আবাসনের অন্যতম বোর্ডার—একে নিয়েই বা এর মতো কিছু মানুষকে নিয়ে আমাদের গল্প।

কলকাতার ধুলো ধোঁয়া আর হট্টগোল থেকে একটু দূরে ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপর ডান দিকে ফাঁকা জায়গায় পুবমুখো এই আবাসন। প্রকাণ্ড গেট। ভেতরে প্রশস্ত একখানি বাগান। তার পেছনে হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। বাড়িটার কপালে জলপটির মতো এক চিলতে জায়গায় 'পূর্ণশ্রী আবাসন' নামটুকু লেখা। আর কিছু না। একটা ট্যাক্সি থামল বাড়িটার সামনে। শার্ট-প্যান্ট পরা দু'জন যুবক নামল ট্যাক্সি থেকে। বাড়ির নামটা দেখতে পেয়েছে ওরা, তবু গেটের ভেতরে বসা খাকি জামা-পরা সিকিউরিটি গার্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা পূর্ণশ্রী আবাসন?'

গেটের বাইবে লোহাব গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল বয়স্ক এক হিন্দুস্থানি রমণী। সিকিউরিটি গার্ড কথা বলছিল তাব সঙ্গে। দুপুরের শেষ অথচ বিকেল তখনও নামেনি ভাল করে। ফাঁকায় ফাঁকায় দাঁড়ানো কয়েকটা গাছ নিশ্চুপ। একটার-পব-একটা ট্রাক শব্দ করে না গেলে বলা যেত, জায়গাটা নিঝুম।

অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল ছোকরা।

"বুড়ো মানুষদের হস্টেল?" যুবকদের একজন এবার নিশ্চিত হতে চায়।

সিকিউরিটি গার্ড ওদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। হিন্দুস্থানি রমণীটিকে দাঁড় করিয়ে রাখে, তাব মানে, আলোচনা আপাতত স্থগিত কয়েক মুহূর্তের জন্য। আগন্তুকদের মোকাবিলা করি।

"হাঁ। কাকে চাই?"

"শেখর সরকার।"

গেটটা একটু ফাঁক করে দিয়ে বলে, "বারো নম্বব ঘর।"

যুবক দু'জন ভেতরে ঢুকে যায়। যে কেউ ওদের দেখলে বুঝত, ওবা উদ্বিগ্ন কিন্তু সিকিউরিটি গার্ড তা লক্ষ কবল না। এ রকম উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত লোকজন ও নিত্যই দেখে।

কয়েক মিনিট পরেই যুবক দু'জন হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসে।

"বারো নম্বর ঘরে তো তালা ঝুলছে।"

"ওহো!" বলে সিকিউরিটি গার্ড টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবার। ওর কর্তব্যবোধ নাড়া খেয়েছে। হিন্দুস্থানি রমণীকে হাতের ইশারায় চলে যেতে বলে।

"শেখর সরকার তো হসপিটালে ভরতি হয়েছেন। কাল সন্ধেবেলা স্ট্রোক হয়ে গেল তো।"

"স্ট্রোক? জ্ঞান আছে?" একজন জানতে চায়। অপরজন জিজ্ঞেস করে "কোন হসপিটাল? পি জি?"

কথার উত্তর না দিয়ে লোকটা বলে, "আমিই তো ট্যাক্সি ডাকলাম। ধরাধরি করে বাবুকে ট্যাক্সিতে তুললাম। ওই যে ঘবটা দেখছেন, ওটা এখানকার লাইব্রেরি। আসুন না।"

ছোট একখানা ঘর। যথেষ্ট আলোকিত নয়। দু'খানা ব্রাউন রঙের সোফা পাতা আছে। দেয়ালে লাগানো পাশাপাশি তিনখানা কাচের আলমারি। আলমারির মধ্যে বই। আরও অনেক বই রাখার জায়গা আছে। মোটা মোটা বইগুলোর বাঁধাই দেখে মনে হয় ধর্মগ্রন্থ, মহাপুরুষদের জীবনী গোছের। ঘরের একপাশে একটা টেবিল, চেয়ার। টেবিলের ওপর ধামসানো খবরের কাগজ ভাঁজ করে রাখা।

"শেখর সরকার বাবু এই সোফাটায় বসে কী করছিলেন জানি না। হঠাৎ ডাকলেন, বঙ্কিম। এক গেলাস জল দাও তো। শরীরটা কেমন করছে। আমি কিচেন থেকে জল এনে দিই। দেখি, পাখার তলায় বসে বাবু খুব ঘামছেন। আমি বলি, কোথাও কষ্ট হচ্ছে আপনার? আমি বলি, বাবু, সোফাটায় শুয়ে পড়ুন। বাবু খালি বুকে হাত বোলাচ্ছেন আর ঘামছেন। বললেন, পাখাটা জোরে করে দাও, মা গো। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অজ্ঞান হয়ে গেলে আর কষ্ট বোঝা যায় না, তাই না?"

যুবক দু'জন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। বলে, "উনি আমাদের কাকা। বাবার নিজের ছোট ভাই। অসুস্থ খবর পেয়ে তো এলাম। এত সিরিয়াস তো জানতাম না। কোথায় গেলে দেখা হবে? কেমন আছেন? ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছে কিনা, জানা দরকার।"

বঙ্কিম বলে, "তা হলে রাখালবাবুর সঙ্গে কথা বলুন। ওনার কাছে সব রেকর্ড আছে। উনি

কেয়ারটেকার। ওই গ্যারেজের ওপরে ওনার ঘর।"

এবং ওদের সঙ্গে যায় রাখালবাবুর ঘর পর্যন্ত।

রাখাল সামন্ত রোগাপটকা মানুষ। বয়স ষাট হবে কি আর একটু বেশি। কলপের রং উঠে গিয়ে মাথার চুলগুলো কোথাও সাদা কোথাও বাদামি। হাঁপানি আছে বলে একটু খিটখিটে। খালি-গায়ে মেজেতে বসে সে পাঞ্জাবি ইস্ত্রি করছিল। দুই যুবককে দরজার মুখে আসতে দেখে সুইচ অফ করে উঠে দাঁড়ায়। কী ব্যাপার?

"আমরা শেখর সরকার, এখানকার বোর্ডার, তাঁর ভাইপো।"

"ভাইপো? কী রকম ভাইপো?" রাখাল সামন্ত জানতে চায়।

"আপন ভাইপো। মানে উনি আর আমাদের বাবা দুই ভাই। দুই সহোদর ভাই।"

"তা এতদিন কোথায় ছিলেন আপনারা? মিস্টার সরকার এই আবাসনে আছেন প্রায় চার বছর; কই, একদিনও তো আপনারা কেউ ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেননি।"

যুবকদের একজন বলে, "কোথায় থাকেন তা জানতাম না।"

অপরজন শুধরে নিয়ে বলে, "যখন চাকরিবাকরি করতেন, ওঁর চেতলার বাসায় কতদিন গেছি। তারপর উনি নিজেই আর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইতেন না। ব্যাচিলর মানুষ, টো টো করে ঘুরে বেড়াতেন।"

প্রথমজন বলে, 'সিরিয়স অসুখ শুনলে কি চুপ করে থাকা যায়?"

"কোথায় শুনলেন? আমার কাছে তো কোনও ভাইপোর ঠিকানা নেই।"

প্রথমজন বলে, "সুদীপ্ত মিত্র বলে কে একজন আমার আপিসে ফোন করেছিল আজ সকালে। বলে, কাকা ভীষণ অসুস্থ আমরা যেন পূর্ণশ্রী আবাসনে গিয়ে তাঁর খবর করি। তার কাছে ঠিকানা পেয়েই ছুটে এসেছি।"

"হ্যাঁ, সুদীপ্ত মিত্র। সে-ই সব দেখাশোনা করছে। আগেও ছোটখাটো অসুখবিসুখ হলে সে-ই এসে খবরাখবর নিত। শেখর সরকার ওর বাড়িতে গিয়ে মাঝে মাঝে থেকে আসতেন। তাক থেকে একটা ফাইল পেড়ে নামায় রাখাল। তারপর হাসপাতালের ওয়ার্ড নম্বর বলে দেয়। জানায় যে রুগি এখন ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে। জ্ঞান ফেরেনি। জ্ঞান ফিরলে বেডে দেবে, আজ সকাল অবধি এই খবর।

যেতে যেতে দ্বিতীয়জন বলে, "কে ওই লোকটা, তুই চিনিস?

"ফিকটিশাস পার্টি, আবার কী।"

"না, না, ও মোটেই ফিকটিশাস পার্টি নয়," পেছন থেকে রাখাল চেঁচিয়ে ওঠে, "বুড়ো মানুষকে কেউ দেখে না দুনিয়ায়। আত্মীয় না হয়ে ও যা করছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।"

নীচের তলায় দু'নম্বর ঘরের কল্পনা মিত্র জানলার পরদা ফাঁক করে এই কাণ্ড দেখল। সন্ধে হলেই আবাসনের ভেতরকার পরিবেশ কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। আজ কতদিন পর একটু কৌতুক বোধ করল কল্পনা।

দুই

নীচের তলা, ওপর তলা মিলিয়ে খান কুড়ি ঘর এই আবাসনে। চৌত্রিশটা সিট। কোনও ঘরে একজন, কোনও ঘরে দু'জন। আবার তিনজন থাকার ঘরও আছে দুটো। যার যেমন পছন্দ। মেয়ে-পুরুষ বোর্ডার এখানে প্রায় সমান সমান।

যার যেমন পছন্দ—কথাটা ঠিক বলা হল না। সঙ্গতির প্রশ্নও জড়িত আছে। দু'জনে ভাগ করে একখানা ঘরে থাকলে খরচ অপেক্ষাকৃত কম, নিজের আলাদা ঘরে খরচ বেশি। কারুর নিজস্ব সঞ্চয় ভাঙিয়ে খরচ চলে, কেউ আত্মীয়স্বজনের দাক্ষিণ্য পায়। বুড়ো বয়সের নিঃসঙ্গ জীবনে একা থাকার চেয়ে কারুর সঙ্গে ঘর ভাগ করে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল কল্পনার। কথা বলার জন্যে অন্তত একজন লোক পাওয়া যায় হাতের কাছে। বিপদে আপদে—না, ওসব কথা ভাবে না সে। এই তো শেখর সরকার সোফায় বসে বসে ঢলে পড়ল। আবাসনের লোকজন দেখাশোনা করছে। ভাইপোর বাড়িতে থাকলে হয়তো মরেই পড়ে থাকত বেঘোরে।

শেখর মানুষটা খোলামেলা। এমন কোনও তীর্থস্থান নেই যা ঘুরে আসেনি। কিন্তু ওর ঘরে কোনও ঠাকুরের ছবি নেই। এখানকার মেয়ে-পুরুষ প্রত্যেকে সুস্থ থাকলে খুব সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠে। অনেকে একটু-আধটু হাঁটে। তারপর স্নানটান করে কোনও একজন ঠাকুর বা গুরুদেবের ছবির সামনে বসে। মনটা তাতে শুদ্ধ হয়। প্রার্থনা করার কিছু আর অবশিষ্ট নেই, শুধু এইটুকু বলা যে, ছেলেমেয়েরা যেন সুখেস্বচ্ছন্দে থাকে, যে-যেখানে আছে, তাদের কোনও অনিষ্ট যেন না হয়। আর, নিজের জন্যে, হাত-পা সচল থাকতে যেন মরি। যেন কারুর ওপর ভার হয়ে না পড়ি, এইটুকু দেখো। আসলে, এসব কথা নিজেকেই বলা।

কল্পনা দেখত, শেখর সরকার ওই সময়ে শুয়ে শুয়ে রেডিয়ো শোনে। বারো নম্বর ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে দেখা যেত, দরজা হাট করে খোলা। আর বাবু বুকের ওপর এক খুদে ট্র্যানজিস্টর বসিয়ে চোখ বুজে প্রোগ্রাম শুনছেন।

কল্পনা ঠাট্টা করেছে, "শেখরবাবুর ওটি ইঁদুর বাহন। সব সময় কিচকিচ করছে।"

"এই, তুমি আমায় গণেশ ঠাওরালে? অ্যাঁ? আমি কি ওই রকম বদখত দেখতে?"

"ওটা গুণবাচক উপমা। সেই গল্পটা জানেন না?" কল্পনা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলেছে, "কার্তিক গণেশ দুই ভাই বিশ্বভ্রমণে বেরোল। দেশদেশান্তর ঘুরে হাঁপাতে হাঁপাতে কার্তিক ফিরল এক বছর পর। এসে দেখে, গণেশ মায়ের পাশে বসে আছে ঘাপটি মেরে। কী রে, তুই যাসনি? গণেশ তখন শুঁড় দুলিয়ে হাসতে হাসতে বলে, অতদূরে কে যায়। মায়ের চারপাশ প্রদক্ষিণ করে এলাম, ওইতেই হয়ে গেল আমার বিশ্বভ্রমণ।"

নাতি-নাতনিকে শোনাবার গল্প এইসব। মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত। হাতের কাছে নাতি-নাতনি কোথায় পাবে কল্পনা। ছেলে থাকে আমেদাবাদে। ওদের দুটি ছেলেমেয়ে। মেয়ে-জামাই বাঙ্গালোরের অধিবাসী। ওদের একটিই সন্তান। ছেলে, সে এখন বড় হয়ে গেছে। ওদের বিশ্ব অনেক বড়, বিরাট।

"তোমরা আমার এখানে চলে এসো" স্বামী বেঁচে থাকতে অনেকবার বলেছিল গৌতম।

"না, কলকাতা ছেড়ে কোথায় যাব?" উনি বলেছেন। "আমরা বুড়ো-বুড়ি এখানে বেশ আছি।"

এখানে, মানে রিচি রোডের বাসায়। মেয়ের বিয়ে হল। নতুন চাকরি নিয়ে ছেলে চলে গেল বিয়ের দু'বছরের মধ্যে। ওরা বোধহয় আলাদাই থাকতে চাইছিল নিজেদের মতো করে। তো থাক। যেখানে মন চায় সেখানে থাকো তোমরা। আমাদের নিয়ে টানাটানি কোরো না। এমন হুট করে উনি মারা যাবেন, কল্পনা ভাবেনি। অবশ্য জন্ম মৃত্যু তো মানুষের হাতে নেই।

এবারও গৌতম বলেছিল, "আমার কাছে চলো মা।"

সে বলার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না যেন। কল্পনার মনে হয়েছিল, গৌতম বউয়ের ব্রিফ নিয়ে এসেছে। এই অনুরোধ সে-ব্রিফের বাইরে। কী দরকার।

"না।"

একজন সর্বক্ষণের কাজের মেয়ে বহাল করে সেবার গৌতম ফিরে যায়। যাবার আগে বাবার পুঁজিপাটা ভাঙিয়ে মায়ের নামে ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়ে যায় ব্যাঙ্কে। মাকে স্বনির্ভর করে দিয়ে স্বস্তি পায়।

বুড়ো বয়সে মা-বাপ সন্তানের গলগ্রহ হয়ে পড়ে মূলত অর্থনৈতিক কারণে। সারাজীবনের উপার্জন আর সঞ্চয় ওরা ঢেলে দেয় সন্তানদের মানুষ করার কাজে। এই করতে গিয়ে হাত খালি হয়ে যায় একদিন। কল্পনার স্বামী বিষয়সম্পত্তি করেননি। বলেছেন, এই ভাড়া বাড়িতেই আমাদের জীবন কেটে যাবে। টাকা আটকে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। উনি বলতেন, সম্বল যা আছে সুদে খাটাব। কারুর কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকতে হবে না। যদি কোনওদিন নিঃস্ব হয়ে যাই, তখন ছেলের কাছে, মেয়ের কাছে হাত পাতব। তার আগে নয়।

কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশিদিন টিকল না।

সময়ে-অসময়ে দেখাশোনা করত বাড়িওলার ছেলেটি। একদিন সে এসে বলল, "মাসিমা, দু'খানা ঘর ছেড়ে দিন। এখানে বুটিক করব।"

"বুটিক কী?"

"জামাকাপড়ের দোকান। আপনি একা মানুষ, একখানা ঘরই তো যথেষ্ট।"

আসলে, একজন বুড়ি বিধবা তিনখানা ঘর জুড়ে পুরো নীচের তলাটা অধিকার করে বসে আছে, এ ওদের সইছিল না।

"আপনাকে তো ভাড়া বাড়াতে বলতে পারি না মাসিমা। না হলে, এই একতলার ভাড়া এখন দেড় হাজার টাকা। আপনি পুরনো ভাড়াই দেবেন।"

গৌতমকে সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখল কল্পনা।

গৌতম লিখল, "বাড়িওলার সঙ্গে ঝগড়া করে তুমি টিকতে পারবে না, মা।"

"তোরা এলে কোথায় শুতে দেব, সেটা ভেবে দেখিস।"

তাতে গৌতম জানায়, ওদের কলকাতায় আসার কোনও নিশ্চয়তা অদূর ভবিষ্যতে নেই।

তা যখন নেই, তখন মায়া বাড়িয়ে আর লাভ কী। একখানা ঘরে সরে এল কল্পনা। এতদিন একা ছিল সে, এবার যাকে বলে একা হয়ে গেল।

সরে আসতে গিয়ে ওর মনে হয়েছে, কত হাবিজাবি জিনিস দিয়ে মানুষ সংসার ভরায়। কাঠকুটো পাতাপুতার রাশি। কোনওটাই না হলে যেন চলবে না। খোকার পড়ার টেবিল, মেয়ের ড্রেসিং টেবিল, আলমারি। কাচের বাসন রাখার ক্যাবিনেট। রাশি রাশি গ্রামোফোন রেকর্ড। গুচ্ছের বই, মাসিকপত্র। দেয়ালে কত ছবি। মানুষ চলে গেল সব ডিমের খোসা। গন্ডারের মতো এক-একখানা খাট ঘর জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কল্পনা বলে, "সুশীল, তুমি এগুলো বিক্কিরি করে দাও। আমার আর কাজে লাগবে না। পাসবুকে কিছু টাকা জমা পড়ুক বরং। অবরে সবরে ওইটেই কাজে লাগবে।"

এককথায় ছড়ানো সংসারটা ছোট্ট এতটুকু হয়ে যায়। মেজের ওপর পাতা একটা বিছানা, একটা মাথার বালিশ। ঘরের কোণে জনতা স্টোভ, জলের কুঁজো আর দু'-চারটে ঘটিবাটি। একটা ট্রাঙ্ক—তার মধ্যে কাপড়চোপড়, কম্বল, শীতের একখানা শাল। দেয়ালের তাকে গোটা চারেক কৌটো। খই, চিঁড়ে, চাল, চিনি।

সুশীলদের কাজের মেয়েটা সকালে দুধ এনে দিত এক প্যাকেট করে। খাবার জল বদলে দিত। মাঝে মাঝে পাঁচ লিটার করে কেরোসিন তেল ধরে দিয়ে যেত সে-ই। কোনদিন রান্না করত কল্পনা, কোনদিন করত না। খইদুধ খেয়ে শুয়ে পড়ত।

শুলেই কি আর ঘুম আসে! হাজার রকম ভাবনা ঘোরে মাথার মধ্যে—ওপরের পাখাটার মতো। সন্তান-সন্ততির জন্যে কষ্ট হয়, ওদের কাছে পেতে ইচ্ছে করে। সে-সব ইচ্ছে আর পূরণ হবার নয়। আধো ঘুমের মধ্যে এক-একদিন মনে হয়, ও বুঝি বিছানাসুদ্ধ ডুবে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার জলে, আবার সিমেন্টের মেজেতে পা ঠুকে গেলেই ঘোর কেটে যায়। না, পায়ের তলায় শক্ত মাটি আছে এখনও। ভয় নেই।

কীসের ভয়? মৃত্যুর! এখন তো তার অপেক্ষাতেই থাকা। জীবনের কোলাহলের মাঝখানে অথচ জীবনের বৃত্ত থেকে বাইরে। এ এক অদ্ভুত অবস্থান। মাথার বালিশের নীচে এক গোছা দশ টাকার নোট। অসময়ে যে-ই এসে ঘরে ঢুকুক, টাকাটা দেখলে ফেলে চলে যাবে না ওকে, মনে মনে এইটুকু ভরসা ছিল কল্পনার।

একদিন সুশীল এসে বলল, "মাসিমা, আমার নিজের কোনও স্বার্থ নেই। খবরটা শুনে ভাবলাম আপনাকে জানাই।"

"কী, বলো।"

"বয়েস হলে মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। এইসব মানুষের কথা কে ভাবে।"

কল্পনা মৃদু হাসে। নিশ্চয় ওর স্বার্থ একটু আছে, না হলে এত ভূমিকা করত না সুশীল।

পূর্ণশ্রী আবাসনের কথা বলল সুশীল। কল্পনার মনে যাতে আঘাত না লাগে, সেই কথা ভেবে গুছিয়ে খবরটা জানাল। অবসরপ্রাপ্ত লোকেদের জন্যে ওরা একটা হস্টেল করেছে। থাকা, খাওয়া, ছোটখাটো অসুখের চিকিৎসা, বেড়াবার বাগান, সব ব্যবস্থা আছে সেখানে। অডিটোরিয়ম আছে—সেখানে জলসা হয়, সিনেমা দেখানো হয়। মেয়েদের আলাদা ব্যবস্থা। তবে খরচটা বেশি।

"কত?" হস্টেল শুনে কল্পনার উৎসাহ জাগে। একসময় হস্টেলে থেকে বি এ পড়েছে ও। কী হুল্লোড়ময় ছিল সে-জীবন। সে-ই প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া। পরিবারের বাইরে সমবয়সিদের সঙ্গে যৌথ জীবন। মনটা উসখুস করে ওর।

"মাসে সাতশো থেকে হাজার টাকা। অনেক দিন হল হয়েছে। এবার পাকা বাড়িতে উঠে গেল।"

টাকার অঙ্কটা সত্যিই বেশি। আর, বেশি বলেই কল্পনার মনে হয়, জায়গাটা অনাথাশ্রমের চেয়ে ভাল হবে।

আবাসনের ট্রাস্টি এক সম্পন্ন মহিলা, একদিন কল্পনা তাঁর সঙ্গে দেখা করে এল। না, সিঙ্গল রুম ও নেবে না, আর একজন মহিলার সঙ্গে ঘর ভাগ করে থাকবে।

ঢোকবার সময় থোক কিছু টাকা দিতে হয়েছিল, সেটা সুশীলই দিয়েছিল। আপত্তি করেছিল কল্পনা, "তুমি কেন দেবে?"

সুশীল বলেছিল, "আপনার জন্যে কোনওদিন তো কিছু করিনি। আমাদের বাড়িতে আপনি কত কষ্ট পেয়ে এলেন। এইটুকু করতে দিন।"

মনে মনে ও হয়তো ভাড়াটে তোলার খেসারতের কথা ভেবেছিল। সে তুলনায় দশ হাজার টাকা ডোনেশন আর তিন মাসের খরচ ডিপোজিট এমন কিছু বেশি না। আসার আগে সামান্য কিছু গয়না যা ছিল, বিক্রি কবে এল কল্পনা। এতদিনে সে সম্পূর্ণ মুক্ত।

তিন

মুক্তির কথা শেখর সরকারও বলেছিল একদিন।

অডিটোরিয়মে এক সাধু এসেছিলেন বিকেলবেলা। জন্ম, মৃত্যু, জন্মান্তব বিষয়ে অনেক দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। বুঝিয়ে বললেন, মোক্ষ কী? না, সংসার চক্রের বদ্ধাবস্থা থেকে পরিত্রাণ। বললেন, সকাম কর্মের ন্যায্য ফল কর্মকর্তাকে ভোগ করতে হবেই। এক জন্মে সে ভোগ সম্পূর্ণ না হলে জন্মাতে হবে আবার। বার বার। মানুষ এমন অজ্ঞান কবলিত জীব যে নতুন জন্মে আবার সে কামনার বশবর্তী হয়ে কাজ করে। আবার তার ফল ভোগে। এই হল সংসারচক্র। এর থেকে মুক্তি লাভ করাই মানবজীবনের লক্ষ্য। নানা শাস্ত্রে সেই মুক্তির উপায় নির্দেশ করা আছে, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করলেন সাধু। আবাসিক মেয়ে-পুরুষ সকলেই উপস্থিত ছিল সভায়। অনেকে হাত জোড় করে বসেছিল চোখ বুজে। সাধুর ব্যাখ্যা বোধগম্য হোক আর না-ই হোক, শোনাতেও পুণ্য। ধর্মের কথা কানে গেলে মন পবিত্র হয়। বৈরাগ্য আসে। সাধু যে পণ্ডিত ব্যক্তি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আবাসন কর্তৃপক্ষের তরফে মিসেস দত্ত উপস্থিত ছিলেন, তিনি নিজের গাড়িতে করে সাধুকে নিয়ে এসেছিলেন, নিজের গাড়িতে করেই তাঁকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। আবাসিক মেয়ে-পুরুষ অনেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাল। প্রণাম করল সাধুকে।

ডাইনিং হলে বসে শেখর সরকার সেদিন বলেছিল, "মহারাজ যাই বলুন, আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে, নিজের মতো করে বুঝেছি যে, মৃত্যু মানে নিবে যাওয়া। কোথাও চলে যাওয়া নয়। আবার ফিরে এসে এই পৃথিবীতে জন্ম নেবার প্রশ্নই ওঠে না। তুমি, আমি, রাখালবাবু, মিসেস দত্ত, ডাক্তার ঘোষ যে যত তালেবরই হই না, একদিন টুপ করে নিবে যাব।"

অথচ মনে হয়, চিরদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু শরীর তো একটা যন্ত্র। প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটা নির্দিষ্ট আয়ু আছে। সব সময় কাজ করে যাচ্ছে, তাদের ক্ষয় হচ্ছে তো। একদিন বিকল হবে না?

"ভাবতে কষ্ট হয়।" কল্পনার রুমমেট হাসিদি বলেছিল, "সংসার চক্রের কথা বললেন না মহারাজ? তা আমাদের তো তার বাইরে ফেলেই দিয়েছে। এখন যে-ক'দিন আছি, একটু আশা নিয়ে থাকি আপনি চান না?"

"তুমি থাকো। কে তোমায় নিষেধ করছে হাসিদি। আমি শুধু বলতে চাই, সামর্থ্যের বেশি পুণ্য করার দরকার নেই আর সম্ভাবনার বাইরে চেয়ো না কিছু। নিজের মতো করে বাঁচো।"

হাসিদি করুণ হাসে। বলে, "জামাইয়ের পাঠানো ডলারে আমার খরচ চলে। এ-জন্মে আর নিজের মতো করে বাঁচা যাবে না। বাইশ দিন হয়ে গেল, মেয়ের চিঠি পাইনি। কেমন আছে ওরা কে জানে।"

"ভেবে কিছু হবে না দিদি", শেখর সরকার সিগারেট পাকাতে পাকাতে বলে, "মেয়েকে তাগাদা দিয়ে চিঠি দাও কাল।"

কী মনে করে একটা গল্প বলেছিল সে।

হিমালয় পর্বত থেকে ভগবান নামছেন মানুষের সমাজে। নামতে নামতে এক গ্রামে এসে পৌঁছোলেন। দেখেন, একদল লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভালই হল, ওদের কিছু তত্ত্বকথা শোনানো যাবে, এই ভেবে ভগবান হাতছানি দিয়ে ডাকলেন লোকগুলোকে। ওরা গ্রাহ্য করল না। জানে না তো ভাগবান ডাকছেন। কাছে অন্য এক জায়গায় গিয়ে ওরা ভিড় করল। কী আছে ওখানে, দেখতে গিয়ে ভগবান দেখেন, দু'দিকে দুই খুঁটির মাঝখানে দড়ি বাঁধা। অনেক উঁচুতে সেই দড়ির ওপর দাঁড়িয়ে একটা চিমসে মতো লোক খেলা দেখাচ্ছে। দড়ির ওপর দৌড়োনোর খেলা। দেখাতে দেখাতে লোকটা হঠাৎ পড়ে গেল নীচে। আর পড়েই মরে গেল।

ভগবান তখন লোকটাকে কোলে তুলে নিলেন আদব করে। বললেন, "পেট চালাবার জন্যে বড় বিপজ্জনক কাজ তুই বেছে নিয়েছিলি। চল, আমি নিজের হাতে তোর সৎকার করব।"

"এর তাৎপর্য কী?" কল্পনা জিজ্ঞেস করে।

"তা আমি জানি না। হঠাৎ মনে পড়ল গল্পটা।"

তা আমি জানি না, বললে কী হবে, কল্পনা শেখর সরকারকে খানিকটা মেপে ফেলতে পেবেছে এতদিনে। শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ কী প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে, পরিশ্রম করতে করতে ক্ষয়ে যায়, তা নিয়ে তামাশা করত শেখর। মানে, অসুখ হবার আগে মাঝে মাঝে তামাশা করত। বলত, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা তো আমার জন্মগত অধিকার। দুনিয়ায় এত খাবাব ফলছে, তৈরি হচ্ছে, গজাচ্ছে, সাঁতরাচ্ছে চারদিকে, আমি তার একটু পাব না তা কি হয়। অতিরিক্ত কিছু পাই তো পরিশ্রম করি।

শেখর সরকাব সাবাজীবন রেলে চাকরি করেছে। সে এক বিশাল আপিস। হাজার হাজার লোক গাদাগাদি করে বসে প্রকাণ্ড সব টেবিলের চারপাশে। গুলতানির শব্দে গমগম করে হলঘর। ডাঁই হয়ে থাকে ফিতে-বাঁধা বড় বড কাগজ। বা কাজ। ঘুরে ফিরে, আড্ডা মেরে, টিফিন খেয়ে, বাজার সেবে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, আব সকলের মতো চারটে নাগাদ সে কাজে হাত দিত, কোনওদিন দিত না। কলম মুছে ড্রয়ারে রেখে উঠে পড়ত। কয়েক ঘণ্টার উপস্থিতি, এই ছিল চাকরির শর্ত। বছরের-পর-বছর। এই করে মাইনে পেত সকলে ঠিকঠাক। মাইনে বাড়ত, বছরে বছরে। ছুটি জমত। আর জমানো ছুটি খরচ করার জন্যে রেলকর্তৃপক্ষ উদারভাবে পাস দিত কর্মচাবীদের। সেই পাস নিয়ে দেশ বেড়াও। তীর্থে তীর্থে ঘোরো যত খুশি। তীর্থগুলোই এই দেশটাকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে।

ও বলত, মানে, হাসপাতালে যাবার আগের দিন অবধি বলেছে, "বেশিরভাগ মানুষের স্বভাব কাকের মতো। সারাদিন খাই খাই করে বেড়ায়। আরে দু'দণ্ড চুপ করে বোস, আশপাশটা দ্যাখ, তা না।"

"আপনি নিজে?"

"আমাব স্বভাব চিলের মতো। খিদে পেলে ছোঁ মেরে একটা পায়রা ধরে ছাড়িয়ে খেয়ে নাও। একজনের পেট! তাবপর আকাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াও, ভেসে বেড়াও। মেঘ থেকে মেঘে। পাহাড়ের শিং থেকে শিঙে। তারপব একদিন নিবে যাও।"

যতদিন চাকরি ছিল, ততদিন আড্ডা মারার একটা জায়গা ছিল। আপিস। কর্মচক্রের সঙ্গে বাঁধা একটা নির্দিষ্ট জীবন। এর মধ্যেই লোকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলেপুলে মানুষ করেছে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, বউয়ের অপারেশন করিয়েছে, বাড়ি করেছে। শেখর সরকারকে এসব কিছুই করতে হয়নি। জীবনটাকে আর সকলের মতো বিমা দিয়ে সুরক্ষিত করেনি অবধি।

একদিনে একুশজন রিটায়ার করল যেদিন, সেদিনই টনক নড়ল শেখরের। গলায় মালা পরা কুড়ি জনের মুখের দিকে তাকিয়ে ও আঁতকে উঠেছিল প্রায়। খেলা শেষ। এইবার কী হবে?

এককাঁড়ি টাকা পকেটে গুঁজে দিয়ে কেউ যেন পেছনে লাথি মেরেছে। সেই লাথির ঘায়ে ছিটকে পড়ল শেখর।

দাদা বলত, অশক্ত জীবনের ভার আর বইতে পারছি না। এবার মানে মানে গেলেই হয়। দুই ছেলের নিন্দে করত দাদা। মানুষ হল না। মাথা গোঁজার জায়গা একটা করে দিয়েছি, রাস্তায় দাঁড়াবে না, কিন্তু নিজেরা খুঁটে খেতে শিখবে তো।

এই দুঃখটুকু সঙ্গে নিয়ে দাদা মারা গেছে।

একদিন শেখর সরকার গিয়ে দেখে, একতলা বাড়িতে দুই ভাইপোর দুটি আলাদা সংসার। রান্নাঘরে দুই বউ দু'দিকে মুখ করে তোলা উনুনে রান্না করছে। যার ছেলেপুলে নেই, তার শোবার ঘরে পরদা, চৌকাঠের পাশে রঙিন পাপোশ। ঘরের কোণে ফুল ফুল প্লাস্টিক চাদর-ঢাকা ডাইনিং টেবিল। কুলুঙ্গিতে ঝালর দেওয়া রঙিন টিভি।

আর যার ছেলেপুলে আছে, তার ঘরে সার সার বিছানা, গোটানো তক্তপোশ। হট্টগোল। দড়িতে ছোট ছোট ছিটের জামা শুকোচ্ছে। ঘরময় চাপা মুতের গন্ধ।

একজনের সচ্ছলতা এসেছে। সে আরও সচ্ছলতা চায়। অন্যজন তার রোজগারে কুলিয়ে উঠতে পারে না। সে অর্থাভাব থেকে মুক্তি চায়। দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি চায়। হিংসেয় জ্বলে। এই জ্বলাপোড়া থেকে কাজের কাজ হয় না কিছু, ওর বউ কেবল গর্ভবতী হয় বার বার।

জগাই-মাধাই দুই ভাই ওকে বলল, "কাকা, তুমি আমাদের সঙ্গে এসে থাকো। চেতলার বাসা তুলে দাও।"

"জায়গা কোথায়?"

"দোতলাটা তুলে নাও। নিয়ে সেখানে থাকো। আমরাও একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পাই।"

জগাই বলে, "বুড়ো হয়েছ, একা একা কেন কষ্ট পাবে?"

মাধাই বলে, "আমাদের বউরা তোমার সেবাযত্ন করবে।"

শেখর সরকারের পকেটে কারেন্সি নোটের তৈরি কুকুরছানারা কুঁই কুঁই করে ওঠে। এখানে নয়, এখানে নয়, ভাবতে ভাবতে পালিয়ে আসে ও।

আর একটা জীবন পেলে আমি অন্যভাবে বাঁচতাম। এইটুকু কথা একদিন কল্পনা মিত্রকে বলেছিল শেখর। বিশ্বাস করত না, তবু বলেছিল।

চার

হস্টেলে থেকে একসময় পড়াশোনা করেছে কল্পনা। সেই হস্টেলজীবন ও আজও ভুলতে পারে না। পূর্ণশ্রী আবাসনও হস্টেল, বলতে গেলে, কিন্তু কোথায় যেন বিশাল এক ফারাক আছে। নিজের নিজের পরিবার আত্মীয়স্বজন ছেড়ে একদল সমবয়সি মানুষ যখন একত্র বসবাস করে, তখন তারা কেউই আর নিঃসঙ্গ থাকে না। একটা সঙ্ঘের মধ্যে ঢুকে যায়। হস্টেলজীবন ছিল সেই রকম। আবাসনে নিঃসঙ্গ মানুষেরা কিন্তু নিঃসঙ্গ রয়ে গেছে। কল্পনা বোঝার চেষ্টা করে—এই তফাত কেন। বয়েস? এই বয়েসে আর নতুন করে বন্ধুত্ব হয় না? না, মন? জীবনের কাছ থেকে আর কিছু পাবার নেই, তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের কথা হয় না বুঝি? না, প্রত্যেকে নিজের নিজের শেষ দিনটি নিয়ে চিন্তিত? সেই চিন্তায় তো কোনও দোসর থাকা সম্ভব না। চলমান জীবনের কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি আসে, মন কেমন করায়। পেছনে টানে, সান্ত্বনা দেয় কই।

একদিন মিসেস দত্ত, আবাসনের ট্রাস্টি, এই আবাসনবাসীদের নিঃসঙ্গতার সমস্যা খানিকটা মোচন করে দিয়ে গেছেন। রঙিন টিভি-টা যেদিন অডিটোরিয়ামে বসানো হল, সেদিন অনেকের মুখে হাসি দেখে মিসেস দত্ত বলেছিলেন, "আপনাদের মুখে একটুখানি হাসি ফোটাতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আবাসনের ফান্ডে এত টাকা নেই যে, দশ হাজার টাকা দিয়ে টিভি কিনতে পারি আমরা, সেই কথা বলেছিলাম মিসেস সাহানিকে। তিনি আমাদের জন্যে এটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ট্রাস্টিদের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের সকলের হয়ে আমি মিসেস সাহানিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" মিসেস সাহানির চুলে মেহেদির কলপ ছিল, সবাই লক্ষ করেছে।

একটা কাঠের বাকসে টিভি-টা রাখা থাকে। চাবি থাকে রাখাল সামন্তর কাছে। সে যেহেতু কেয়ারটেকার। প্রতি সন্ধ্যায় সে নিজে এসে বাকসের ডালা খুলে দেয়। প্রোগ্রাম শেষ হলে পর, কোনও কোনও দিন তার আগেই, সবাই উঠে গেলে পর, ডালা বন্ধ করে দেয়। দুপুরে খেলা থাকলে বঙ্কিম চাবি চেয়ে নিয়ে আসে।

সেদিন ছিল শুক্রবার। ডাইনিং হলে দুপুরের খাওয়া চলছে। বিশাল ওভাল টেবিল ঘিরে বসে খাচ্ছে জনা কুড়ি মেয়েপুরুষ বোর্ডার। রাখাল হঠাৎ এসে ঘোষণা করল, "আজ বেশি রাত্রে খুব ভাল একটা

বিদেশি ছবি দেখাবে। মিউজিকাল ছবি। জিজি। আপনারা ছেলেবেলায় এই ছবি নিশ্চয়ই দেখেছেন। তবে, ও জিনিস পুরনো হবার নয়। আজ না হয় একটু দেরি করে ঘুমের ওষুধ খাবেন। মন ভাল হয়ে গেলে ঘুমের ওষুধ খাওয়ার দরকার না-ও হতে পারে।"

রাখালের রসিকতায় কেউ হাসল না। তবে ফিসফিস করে অনেকে ছবিটার কথা স্মরণ করল। স্মরণ করল মরিস শেভালিয়রকে। সেদিন অধিক রাত্রে অবশ্য যে ঘটনা ঘটল, তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। টিভি-তে শুরু হয়েছে জিজি। ওঃ সেই মরিস শেভালিয়র: হাতে একটা ছড়ি। মাথায় বাঁকানো টুপি। সাদা পোশাক, গলায় কালো প্রজাপতির মতো একটি সুদৃশ্য বো। ধবধবে পাকা চুল, সাদা দাঁত। হাসিখুশি চেহারাটি যুবকের মতো। কথায় কথায় গান—ফরাসি টানে ফরাসি গান ইংরেজি গান। হাঁটছেন যেন ছন্দে ছন্দে। চারিদিকে সুন্দর সুন্দরীদের ভিড়, তার মধ্যে উনি যেন প্রেমের দেবতা। কল্পনা হাসিদিকে নিয়ে এসে সামনের আসনে বসেছে। অডিটোরিয়ম প্রায় ভরতি। কল্পনা দেখল, অভিনয় করতে করতে হঠাৎ থেমে গেলেন মরিস শেভালিয়র। ক্লোজআপে কেবল তাঁর টুপিশুদ্ধ মুখখানা আর গলায় আটকানো কালো প্রজাপতিটি দেখা যাচ্ছে।

টুপি খুলে সামনের দর্শকদের অভিবাদন করলেন। ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, "বন্ধুগণ, আমি চিরকাল জীবনের জয়গান গেয়ে এসেছি। আমি মনে করি, এ-জীবন আনন্দময়। আর আনন্দ উপভোগ করার কোনও বয়ঃসীমা নেই।"

কল্পনা ভেতরে ভেতরে কেঁপে ওঠে। ভাবে, ওঁর বয়েস কত? ওঁর দাঁতগুলো কি বাঁধানো? উনি কি অভিনয় করছেন না?

মরিস শেভালিয়র যেন শুনতে পেলেন ওর মনের কথা। বললেন, "আমার বয়েস আশি বছর। আমি আরও আশি বছর বাঁচব। এই পৃথিবীতে যেখানে যত দুঃখ আছে, কষ্ট আছে সব মুছে দিয়ে তবে আমি এই সুন্দর জীবন থেকে বিদায় নেব। তার আগে কিছুতেই নয়।" অডিটোরিয়মে সমবেত দীর্ঘশ্বাস পড়ার শব্দ হয়।

এবার তিনি আর একটু এগিয়ে এলেন। তাঁর অবর্ণনীয় কালিমাহীন চোখদুটি জ্বলছে। তিনি গেয়ে উঠলেন, লা-ভি এ-গে—!

"আপনারা সকলে আমার সঙ্গে গলা মেলান," বললেন তিনি। কেউ ও গান গাইল না। কল্পনা চেষ্টা করল একবার, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না ওর।

মরিস শেভালিয়র এবার আর একটু এগিয়ে এলেন। বললেন, "পৃথিবীর নানা প্রান্তে আমি গান গেয়ে বেড়িয়েছি। যুদ্ধের সৈনিকদের গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছি। হতাশ মানুষকে দিয়েছি প্রেরণা। আপনারা—এই ছোট্ট অডিটোরিয়মে বসে আছেন যাঁরা, কেন আপনাদের এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে?"

এটা যে পরিত্যক্ত মানুষদের হস্টেল। এই সোজা কথাটুকু কেউ সাহস করে উচ্চারণ করল না।

"আপনারা কি নিঃসঙ্গ?"

উত্তর নেই।

"আপনারা কি উদ্বিগ্ন?"

উত্তর নেই।

"আপনারা কি কারুর জন্যে অপেক্ষা করছেন?"

আবার সমবেত দীর্ঘশ্বাস পড়ল অডিটোরিয়মে। সকলেই তো অপেক্ষা করছে একটি ব্যক্তিগত ঘটনার জন্যে। তা হল মৃত্যু। কেউ তাকে চায় না কিন্তু সে যে কাছাকাছি কোথাও এসে গেছে, যে-কোনও দিন সে যে কাউকে-না-কাউকে ছুঁয়ে দেবে, এ-কথা তো কারুর অজানা নয়। তবে, সাহেবকে এসব কথা বলে কী লাভ।

অডিটোরিয়মে অস্বস্তির আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠছে। সামনের আসনে বসেও কল্পনা টের পায়, এক এক করে উঠে যাচ্ছে দর্শকেরা। ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এগারো নম্বর ঘরের ষষ্ঠীবাবু, পাঁচ নম্বরের রানীদি লাঠি ঠক ঠক করতে করতে নিষ্ক্রান্ত হল। কে যেন ফোঁপাচ্ছে পেছনে? কার হাত থেকে পড়ে গেল চশমা?

মরিস শেভালিয়রের মুখে সেই অম্লান হাসি। তিনি সবই দেখছেন যেন।

হঠাৎ তিনি হাত তুলে দর্শকদের সামনে মেলে ধরলেন একটা কাচের শিশি। প্রায় বিজ্ঞাপনের ভঙ্গিতে।

বললেন, "এর মধ্যে এক বিশেষ পানীয় আছে। আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ এর হদিশ জানে না। সবচেয়ে দীর্ঘায়ু গাছের শেকড় সিদ্ধ করে, সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণীর রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে এটি তৈরি। সিসিলি দ্বীপের নাম শুনেছেন আপনারা? সেই দ্বীপে মাউন্ড এৎনা নামে এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি আছে, তার মধ্যে পাথরের বয়ামে বছরের-পর-বছর রেখে এই পানীয় মজানো হয়। এই পানীয় সেবন করলে মানুষের শরীরে মৃতপ্রায় গ্রন্থিগুলি, কোষগুলি আবার সরস, সক্রিয় হয়ে ওঠে। চান? আপনারা কেউ এই অপূর্ব পানীয় আস্বাদ করতে? তবে আমার সঙ্গে আসুন।" উনি উদাত্ত স্বরে ডাক দিলেন।

তারপর টিভি স্ক্রিন থেকে নিজেই বেরিয়ে এলেন মরিস শেভালিয়র। সবাই দেখল, তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছেন। হাতে ছড়িখান দুলছে তাঁর পায়ের তালে তালে। টিভির মধ্যে নেপথ্য বাজনা বাজছে। সবাই দেখল তিনি ফক্সট্রটের তালে অডিটোরিয়মের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তখন উঠে দাঁড়ায় কল্পনা। হাসিদি ওর হাতে চিমটি কাটে।

"চলো হাসিদি, আমরা ওঁর সঙ্গে যাই।"

"কোথায় যাব?"

"যেখানে উনি যেতে বলবেন।"

হাসিদি বলল, "আমি যাব না। আমার পায়ে ব্যথা। ইচ্ছে হলে তুমি যাও বাপু। তবে, সাবধান!"

"সাবধান কেন?"

"কী হতে কী হয়, কে বলতে পারে।"

সিঁড়ি দিয়ে একতলা থেকে দোতলায়, দোতলা থেকে পূর্ণশ্রী আবাসনের ছাদে উঠে এলেন মরিস শেভালিয়র। তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। মেঘলা আকাশে তারাগুলোও নিষ্প্রভ। বড় রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলা বন্ধ হয়ে গেছে। বাতাসে ছাতিমফুলের গন্ধ।

চোখ বুজে আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রার্থনা করলেন। তারপর চোখ খুলে তাকালেন সস্নেহে। কল্পনা একেবারে ওঁর পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

"একী? তুমি একা? আর কেউ এল না?"

"আমি আছি স্যার।"

কল্পনা পেছন ফিরে দেখে, রাখালবাবু। রাখাল সামন্ত, কেয়ারটেকার।

মরিস শেভালিয়র শিশি খুলে সেই পানীয় খানিকটা গলায় ঢাললেন। তারপর কল্পনার গলায় ঢেলে দিলেন খানিকটা। খানিকটা রাখাল সামন্তর মুখে।

বললেন, "আর অল্পই অবশিষ্ট রইল।"

হঠাৎ কল্পনা বলে ফেলল, "ওটুকু আমাকে দিয়ে দিন। শেখর সরকারের জন্যে রেখে দেব।"

"কে শেখর সরকার?"

রাখাল বলল, "এখানকার একজন বোর্ডার স্যার। হাসপাতালে আছে। কিছুদিনের মধ্যেই ছাড়া পাবে।

সাহেব কল্পনাকে বললেন—"ইয়োর বয় ফ্রেন্ড? ফিয়াসে? সা ভা!"

এবারও কথা বলতে গিয়ে কল্পনার গলা বুজে গেল।

একসময় অবাক বিস্ময়ে রাখাল দেখে, সাহেব এক হাত দিয়ে কল্পনাদির কোমর ধরে আর অন্য হাত দিয়ে ছড়িখান দোলাতে দোলাতে পূর্ণশ্রী আবাসনের ছাদময় নাচ করছেন। ফিকে কুয়াশায় কল্পনাদিকে পরির মতো দেখাচ্ছে।

পাঁচ

এদিকে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে আছে শেখর সরকার। পায়ের কাছে দুই ভাইপো বসে আছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে নিচু স্বরে। কেবিনে একটি মাত্র কাঠের চেয়ার, সেটি দখল করেছে সুদীপ্ত নামের সুশ্রী ছেলেটি। শেখর সরকারের শিয়রে বসে সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার।

"কবে ছাড়বে বলল?"

"সোমবার। তার আগে আর একটা ই সি জি করবে।"
"এখান থেকে সোজা আমাদের বাড়ি।" জগাই বলল।
"নিশ্চয়ই। ছেড়ে দিলে কী হবে, এখন অন্তত ছ'মাস কমপ্লিট রেস্ট। রেগুলেটেড ডায়েট। নিয়ম করে ওষুধ।"
জগাই আবার বলল, "মিলুকে বলেছি, এখন থেকে দুটো সংসারের রান্না তুমি কববে। টুনু করবে কাকার নার্সিং।"
সুদীপ্ত শিয়র থেকে শুনছে কথাগুলো। একসময় ওকে বলতেই হয়, "উনি বোধহয় আবাসনে ফিরে যেতে চান।"
"আবাসনে মানে?" মাধাই বিরক্ত হয়ে তাকায়।" ওই বুড়োমানুষদের খাটালটায়? পাগল হয়েছ নাকি? ওখানে গেলে কাকা এক মাসও বাঁচবে না। কী রকম ম্যাসিভ অ্যাটাক হয়েছিল তুমি জানো?"
শেখর সরকার একবার চোখ দুটো খুলে তাকায়, আবার বন্ধ করে।
"আমি না জানলে কে জানে?" এবার সুদীপ্ত চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, "আমিই তো প্রথম থেকে দেখাশোনা করছি। আপনারা তো পরে এসে জুটলেন।"
"জুটলেন মানে? তুমি তো ভারী বেআক্কেলে ছোকরা!"
"আমি ফোন করে না জানালে কী করে আসতেন, বলুন।"
"জানাতে তুমি বাধ্য। ভগবান না করুন, ভালমন্দ যদি কিছু হঠাৎ হয়ে যেত, তখন কে মুখে আগুন দিত? কাকার কোনও ফ্যামিলি আছে? তবে? বড় আমি, আমাব রাইট প্রথম।" জগাই জানায়। মাধাই বলে, "তার পরেই আমার রাইট।"
এবাব সুদীপ্ত কাতরস্বরে বলে, "আঃ, ওসব কথা আর এখন কেন? এখন তো উনি সেরে গেছেন। বাড়ি ফিরবেন। কী দুঃস্বপ্নের মতো কাটল দুটো মাস, তাই না!"
তাবপব একটু থেমে চুপ করে যেন শেখর সরকারের অনুমতি নিয়ে বলার চেষ্টা করল, "মা বলছিল, আমাদেব বাড়িতে কিছুদিন থেকে যান, আলাদা ঘর আছে। পাশে বাথরুম আছে। কোনও অসুবিধে হবে না।"
জগাই খেপে ওঠে।
"বড়লোকি দেখাচ্ছ? অ্যাঁ? আলাদা ঘব? আমাদের বাড়িতে ঘর নেই? আমরা কি ফুটপাতে শুয়ে থাকি? অ্যাঁ?"
"যত কষ্ট করেই থাকি আমরা, তবু আমরাই কাকার আপনজন।"
"কাকা আমাদের কাছে থেকে স্বস্তি পাবে।" মাধাই যোগ দেয়।
সুদীপ্ত আবার চেষ্টা করে, "মা বলছিল—"
শেখর সরকার মাথা থেকে সুদীপ্তর হাতখানা সরিয়ে দেয়।
বলে, "যা তোরা বাইরে গিয়ে কথা বল। আমার ভাল লাগছে না কথা কাটাকাটি।"
সুদীপ্ত উঠে যায়।
একটু পরে জগাই-মাধাইও উঠে পড়ে।
জগাই বলে, "সোমবার সকাল সকাল আসতে হবে, বুঝলি। আটটার মধ্যে এখান থেকে রিলিজ করিয়ে ট্যাক্সিতে তুলি তো, তারপর দেখা যাবে।"
"বেশি বেগরবাঁই করলে—"
"খাটালে পৌঁছে দেব। কী আর করা। তবে, তার আগে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ডকুমেন্টে সই করিয়ে নিতে হবে।"
মাধাই বলে, "ওই সুদীপ্তটাকে নিয়ে আমার চিন্তা। ও-বেটা খালি মা মা করছে। কাকার সঙ্গে কোনও লটঘট হয়ে থাকলে ও-বেটা দাবিদার হয়ে যাবে।"
"না, না। ওসব কিছু না। তুই আবার বেশি বেশি ভাবিস।"
ওরা চলে যায়। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হবার মুখে কেবিনের পরদা সরিয়ে ঢুকল রাখাল সামন্ত। বাইরে ওর কাশির শব্দ আগেই শুনেছে শেখর।
"কেমন আছেন দাদা?"

"ভালই।"

"সিস্টার বলল, সোমবার ছাড়বে। আপনার ঘরটা কতদিন তালা দেওয়া আছে। ধুলো জমেছে। মাকড়সার জাল হয়েছে। সব পরিষ্কার করিয়ে রাখব। বিশেষ কিছু লাগবে তো বলুন।"

এবপর অনেকক্ষণ ধরে শেখর সরকার আর রাখাল সামন্তর মধ্যে ফিসফিস কথা হয়। কী কথা হয়, তা আমরা শুনতে পাইনি।

নির্দিষ্ট সোমবারের পর আরও পাঁচটা সোমবার পার হয়ে যাবে। আমরা কাহিনীর গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারব না। কল্পকাহিনীর সূত্র অনুসারে রাখাল সামন্তর খুন হয়ে যাবার কথা, কেননা, শেখর সরকার আর কল্পনা মিত্রকে ও-ই যে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, এ ব্যাপারে অনেকে নিঃসন্দেহ। আর কেউ নয়, সে-ই শেখর সরকারকে সকাল ছটায় বার করে নিয়ে গেছে, এ-খবর তো সকলেরই জানা। কিন্তু খুন সে হয়নি। বিপদের সামনে এমন মুখ করে থেকেছে, যেন সে কিছুই জানে না। বোর্ডারদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে ওর মাথা ব্যথা নেই।

এই কাহিনীর যাকে বলে যবনিকা, তা যখন উঠবে আবার, তখন আমরা দেখব, ওই রাখাল সামন্ত আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনে ট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে নামল, তারপর হনহন করে ঢুকে গেল তাজ বেঙ্গল হোটেলেব বাড়িটায়। হাতে ওর একটা ব্রিফকেস। মাথায় কালো কুচকুচে চুল। কানের ওপর থেকে জুলপি কামানো। ভ্রূক্ষেপ না করে ও উঠে যাবে লিফটে, থামবে পাঁচ তলায়, সটান হেঁটে যাবে পাঁচশো বত্রিশ নম্বর ঘরের দরজা অবধি। গিয়ে বেল টিপবে। সময় তখন বিকেল চারটে হবে।

কল্পনা দরজা খুলবে সন্তর্পণে। তারপর বাখাল গিয়ে বসবে ভেতরের সোফায়। কল্পনা ফ্রিজ থেকে একটা ঠান্ডা পানীয় এনে রাখালের সামনে রাখবে, বলবে, "তাবপব? কী খবর বলুন।"

রাখাল বলবে—"খবর ভালই। দাদা নেই?"

"ও একটু ব্যাঙ্কে গেছে। এসে পড়বে এখুনি।"

ব্রিফকেস খুলে কাগজপত্র বার করবে রাখাল সামন্ত। বলবে, "তা হলে তুমিই বুঝে নাও।"

একটি একটি করে সবকিছু বুঝিয়ে দেবে রাখাল।

"এই তোমাদের পাসপোর্ট। এই হল টিকিট। আর এই তোমাদেব আইটিনারি।"

"আইটিনেরারি।" হাসবে কল্পনা।

"ওই হল। ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি সন্ধের ফাইটে তোমবা দিল্লি যাচ্ছ। সেখান থেকে আটাশ ফেব্রুয়াবি মানে আমাদের হিসেবে সাতাশ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত্রে, ফ্র্যাঙ্কফুট হয়ে প্যারিস।"

"পারি—।"

"ওই হল। পারিকে কেন্দ্র করে তোমাদের ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশ ঘোরার ব্যবস্থা হয়েছে ইউরোরেলে। পঁচিশ মার্চ বোম্বাই হয়ে দেশে ফেরা।"

"পারিতে আমরা কোথায় থাকছি?" জিজ্ঞেস করবে কল্পনা।

"এই যে এখানে সব লেখা আছে। রু ডি সেন্ট জন-এর ওপর হোটেল ডি লা কনকর্ড।"

"আঃ! ফরাসি উচ্চারণ আপনার পরিষ্কার হল না এখনও। ওটা হবে রু দ স্যাঁঝাঁ আর ওতেল দ্যলা কঁকদ।"

"ওই হল। এই বয়েসে আর নতুন করে ভাষা শেখা যায়।"

"অ্যাই!" কল্পনা শাসন করবে রাখালকে, "বয়েস নিয়ে এ-জীবনে আর কোনও কথা নয়!"

রাখাল জানতে চাইবে, দেশে ফিরে এসে শেখর আর কল্পনা পূর্ণশ্রী আবাসনেই উঠবে কিনা। কল্পনা বলবে, সেটা তখনও স্থির করা হয়নি। কল্পনা বলবে যে, ক'দিন থেকে শেখরের মাথায় নানা রকম প্ল্যান ঘুরছে দিনরাত। স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ওষুধের কারখানা, পোলট্রি। হানিমুন সেরে এসে ওরা সেইসব প্ল্যান কার্যকর করবে এই রকম ইচ্ছে।

তার মধ্যে প্রধানতম প্ল্যান হল, পূর্ণশ্রী আবাসনের এই কাহিনী নিয়ে একটা টিভি সিরিয়াল করা। কত রকম কাল্পনিক গল্প নিয়ে টিভি সিরিয়াল হয়, আর এ তো সত্যি ঘটনা। লোকে বিশ্বাস করবে না? তবু, কল্পনা সাবধানী মেয়ে, বলেছে, অনেক খাটুনি, তা ছাড়া জমানো টাকা সব বার করে সিনেমায় ঢালবে, যদি টাকাটা জলে যায়। তাতে নাকি শেখর হো হো করে হেসে উঠেছে। বলেছে, কলকাতা শহরে মাছির

মতো নাকি টাকা ওড়ে, যে পারে সে লুফে নেয়। তিনশো বছরের পুরনো কলকাতা শহরে নাকি করিতকর্মা লোকেরই অভাব। খাটুনির কথা ভাবলে কাজ করা যায় না।

সিঁথিতে সিঁদুর, কল্পনার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসবে রাখাল। তাই? এরপর রাখাল সামন্ত বলবে, "আমি ভাবছি, মরিস শেভালিয়রের চরিত্রটা কাকে দিয়ে অভিনয় করাবে তোমরা।"

"মরিস শেভালিয়র নিজেই করবেন", বলবে কল্পনা "তিনি তো বেঁচে আছেন। তিনি তো মরবেন না কোনওদিন।"

১৯৮৩

❀ পতাকা

সুপ্রকাশ বললেন, দেখো তপন, তুমি উকিল, তুমি আমার জামাইয়ের বন্ধু, তোমার কাছে কিছুই গোপন কবব না।

তপন সুপ্রকাশের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। মোটাসোটা চেহারা ভদ্রলোকের। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। মাথায় সিঁথিকাটা কোঁকড়া চুল। টেরি, জুলপি কুচকুচে কালো। মুখটি কামানো, মসৃণ। গা দিয়ে সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে।

চেম্বাবে তখন আর কেউ নেই। শেষ দু'জন মক্কেল একটু আগে চলে গেছে। তাদের ব্রিফ টেবিলের ওপব পাতা। স্টেনো এলে ডিক্টেশন দেবে। স্টেনোগ্রাফার আসে সন্ধে সাতটার সময়। মনে মনে পয়েন্টগুলো তৈরি করছিল তপন। সাজিয়ে নিচ্ছিল পব পর। এমন সময় সুপ্রকাশ প্রবেশ করেছেন। চেম্বাবেব দরোজা এই সময়টায় খোলাই থাকে। তা ছাড়া, টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল, সুতরাং তপন ঠিক অবাক হয়নি। দুঁদে উকিল কিছুতেই অবাক হয় না।

তপন বলল, মেসোমশাই, বলুন।

সুপ্রকাশ বললেন, এখানে আমি তোমার মক্কেল হতে এসেছি, বুঝেছ? মেসোমশাই ডাকো, ঠিক আছে। সুপ্রকাশবাবুও বলতে পারো। মিস্টার ত্রিবেদীও বলতে পারো। মেসোমশাই দু' সিলেবল, ডাকতে সোজা। লক্ষ করলে দেখবে, বেশিরভাগ বাংলা নাম দু' সিলেবলে হয়। আস্তে ডাকলে সা-র্সা আব জোরে ডাকলে সা-পা সুরে বেরোবে। যেমন ত-পন্ আর ত-পো-ও-ন।

আপনি গান-বাজনার চর্চা করেন?

আগে করতাম। মেয়েদের আমিই গান শিখিয়েছি। এখন নানা চাপে আর হয়ে ওঠে না।

মেয়েদের তো বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আর চাপ কী? কাজের চাপ?

সেই কথাই তো বলতে এসেছি। তবে বাবা, তার আগে বলে রাখি, এই কাজে তোমাকে উপযুক্ত ফি নিতে হবে। সম্পর্কের সুযোগ নেব না আমি। তুমি আমার পক্ষ সমর্থন করবে। কোনও বেআইনি কাজ আমি করতে চাই না। তুমি উকিল, আমি মক্কেল। তুমি আমায় পথ বাতলে দেবে। ও-কে?

বলতে গিয়ে সুপ্রকাশ একটু হাসলেন। তাঁর নাকের দু'পাশে দুটি রেখা ফুটে উঠল। কপালে ভাঁজ পড়ল। কুচকুচে চুলের ফাঁক দিয়ে বয়েস বেরিয়ে এল আচমকা। মিলিয়ে গেল আবার।

ঠিক আছে, বলুন। সমস্যাটা কী?

সাধারণ সহজ, সরল ব্যাপার এইসব মক্কেলরা অকারণ জটিল করে তোলে। তারপর নিজেরাই সেই জটে আটকা পড়ে যায়। আর বেরোতে পারে না। তপন এদের চেনে। যুক্তি দিয়ে তপন এদের আত্মাভিমানের জাল সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। না পারলে মামলা হাতে নেয়। এক্ষেত্রেও তাই করবে। তার আগে জেনে নেওয়া দরকার, সমস্যাটা কী। কোথায় আটকাচ্ছে।

সুপ্রকাশ সংক্ষেপে তাঁর সমস্যার কথা বললেন, শেষকালে বললেন, আশাকে আমি সিঁদুর পরিয়ে ঘরে তুলতে চাই।

কিন্তু মাসিমা? তাঁর কী হবে?

সে-ও থাকবে। কামালগাজিতে আমার দোতলা বাড়ি তৈরি প্রায় শেষ। নীচে তিনখানা ঘর। ওপরে তিনখানা ঘর। দুটো করে বাথরুম, একটা করে রান্নাঘর দু'-তলাতেই রয়েছে। হেঁশেল যদি আলাদা হয়, তাতেও আপত্তি নেই আমার। আমি করুণার হাতের রান্না খেয়ে, করুণার সাজা পান চিবোতে চিবোতে আশার ঘরে গিয়ে শোব। আমার বয়েস সাতান্ন, করুণার বাহান্ন, আশার আটাশ। আমার দু'জনকেই দরকার। আমি দু'জনকেই ভালবাসি। আমি কাউকে ছেড়ে থাকতে পারব না। এখন প্রবলেম হচ্ছে, দোতলায় কে থাকবে? আশা, না করুণা? এ ব্যাপারে আমি লটারি করতে রাজি আছি।

তপন বলল, প্রবলেমটা অন্য জায়গায়। আচ্ছা, আগে জিজ্ঞেস করি, ওই আশা নামেব মহিলা কি অবিবাহিত? মানে, আব কারুর স্ত্রী নন তো?

আরে না, না। আর কারুর স্ত্রী হতে যাবে কেন? ও তো আমার স্ত্রী হবার জন্যে জন্মেছে। দেরিতে জন্মেছে। তবে এমন কিছু দেরি হয়ে যায়নি। আমরা প্রেম করছি তিন বছর। আরও সতেরো বছর খুশিসে প্রেম চালিয়ে যেতে পারি। আমার হেল্‌থ দেখে কী মনে হয়? পারি না?

তা চালিয়ে যান। সিঁদুর দিয়ে ঘরে তুলতে চাইছেন কেন?

স্টেটাস। সুপ্রকাশ বললেন, ভদ্রঘরেব মেয়ে। ওর বাবা ছিল আমার সহকর্মী। হঠাৎ স্ট্রোক ফ্রোক কী হয়ে যেন মারা যায়। গান শেখাবার সূত্রে ওদের বাড়িতে আমাব যাওঁয়া-আসা ছিল। বাড়ি মানে ভাড়া বাড়ি। থাকে মা আর মেয়ে। কেউই লেখাপড়া খুব একটা শেখেনি। তবে গল্প-উপন্যাস পড়াব মতো বিদ্যে পেটে আছে। বেশ গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে দু'জনই। কালক্রমে ওরা অর্থকষ্টে পড়ল। শিকেয় উঠল গান।

হঠাৎ থেমে গিয়ে সুপ্রকাশ বললেন, তোমায় বোর করছি না তো বাবা?

না, না। আপনি বলে যান। অর্থকষ্টে পড়ল। সেই অর্থকষ্ট লাঘব কবতে গিয়ে আপনি জড়িয়ে পড়লেন।

অত সহজ নয়। আমি কিন্তু নিঃস্বার্থভাবেই পরোপকার করতে চেয়েছিলাম। পরোপকাব করাব মধ্যে একটু পুণ্য আছে। আশার মা-ই তাতে বাদ সাধল। একদিন বলল, এভাবে চলে না সুপ্রকাশ। কৃতজ্ঞতার বোঝা ভারী হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, ঠিক আছে, তা হলে আর আসব না।

না সেটি হবে না। আশার মা বলল, তুমি আমাকে ভোগ করো। আর মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দাও একটা সুপাত্র দেখে। আমি দেখলাম, ভোগের লাইনেই যদি যেতে হয়, তবে মেয়ে কী দোষ কবল? দেখতে শুনতে ভাল। ওর মায়ের যা বয়েস, কয়েক বছর পরেই ও তোমার মাসিমার মতো শুকিয়ে বুড়ি হয়ে যাবে। দুটো বুড়ি নিয়ে কী করব আমি। এদিকে মেয়ে বলছে, সে বিয়েই করবে না। যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে দিলে, সেই উপার্জন থেকে সংসার চালাবে। মধ্যবিত্তের আত্মসম্মানবোধ, সে ভারী জটিল বস্তু। আমিও পড়ে গেলাম মুশকিলে। একদিকে শেষ যৌবনের খিদে নিয়ে সুন্দরী বিধবা, অন্যদিকে পঁচিশ বছর বয়েসের উপোসী কুমাবী। মাঝখানে স্টেটাস। ওদের মন কষাকষি চলল কিছুদিন। আমি চলতে দিলাম। তারপর একদিন বললাম, আশা, আমি তোমাকে বিয়ে করব। একটু সময় দাও। ওদিকটা গুছিয়ে নিই।

সুপ্রকাশ বললেন, এইভাবে তিন বছর চলেছে। আমি আশাকে ভালবাসি। আশার সংসারে টাকা দিই। আশাকে গয়নাও গড়িয়ে দিয়েছি। আশার মা আমাকে ভালমন্দ রান্না করে খাওয়ায়। আশা তার বেডরুমে আমায় শুতে দেয়। এইভাবে চলছে। এখন ও বিয়ে করার জন্যে চাপ দিচ্ছে। কারণ আমার বাচ্চা ওর পেটে।

তপন জিজ্ঞেস করে, মাসিমা এইসব ব্যাপার কতটা জানেন? তিনি আপত্তি করেননি?

ও সব জানে। ওকে আমি কিছুই লুকোইনি। তুমি বোধহয় জানো না তপন, করুণাকে আমি বিয়ে করেছি, যখন আমার বয়েস পঁচিশ। ওর বয়েস কুড়ি। আমার চাকরি ছিল না। আমরা কৃষ্ণনগরে থাকতাম। ও পুকুরে ডুবে যাচ্ছিল, আমি বাঁচাই। আমাদের ভালবাসা হয়, তারপর বিয়ে হয়। আর, তুমি তো জানো, ও আমাকে দু'-দুটি সন্তান উপহার দিয়েছে। দুটিই মেয়ে, তাতে আমার কোনও ক্ষোভ নেই,

যদিও একটি ছেলে হলে ভাল হত। হয়তো আশা আমাকে সেই ছেলে উপহার দেবে। জানি না। এখন, আপত্তি তো সে করতেই পারে। মেয়েরা যতটা অধিকার সচেতন, ততটা কর্তব্য সচেতন হয় না। আমি ওকে মানব সমাজের গোড়ার কথা বুঝিয়ে বলেছি। জীবনবিজ্ঞানের সারতত্ত্ব—

যে, শরীরের কতকগুলো মৌলিক তাড়না আছে। প্রথম হল খিদে-তেষ্টা। সেটা প্রতিদিন বার বার মেটাতে হয়। মানুষ পরিবারে আবদ্ধ হওয়ার পরে আর কুড়িয়েবাড়িয়ে বা কেড়েকুড়ে খায় না। রেঁধে খায়। প্রত্যেক সংসারে তাই একটি করে রান্নার জায়গা থাকে। খাবার থালাবাসন থাকে। তারপর হল গিয়ে শরীর থেকে আবর্জনা নিক্ষেপের তাড়না। তার জন্যেও সংসারে পৃথক ব্যবস্থা থাকে। তারপর ঘুম, শরীর ঘড়ির মতন চলে সারাক্ষণ কিন্তু স্নায়ুকেন্দ্র চায় রোজ খানিকটা বিশ্রাম। তার জন্যে আমাদের বিছানার ব্যবস্থা থাকে ধনী, দরিদ্র সব সংসারেই। কিন্তু সবচেয়ে তীব্র জৈব তাড়না হল মৈথুন, কাম। জীবনের একটা সময় কাম তেড়ে জেগে ওঠে, কিছুকাল জাঁকিয়ে বিরাজ করে, তারপর একসময় আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। মিলিয়ে ঠিক যায় না, ফণা নামিয়ে দেয় বলতে পারো। এই তাড়না দিয়ে প্রকৃতি প্রাণী জীবনের নিরবচ্ছিন্নতা, ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। এর জন্যেই প্রাণীদের লিঙ্গভেদ সৃষ্টি হয়েছে। যৌন কাজে আনন্দের উপদ্রব যুক্ত হয়েছে। উপদ্রব বলছি—কেননা, এটা না থাকলে অনেক ঝামেলা থাকত না, জীবন সহজ হত হয়তো। সভ্য মানুষ এই উপদ্রবটিকে আয়ত্তে বাখতে চেয়ে বিবাহ নামক উদ্ভট এক ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছে, আমরা যার শিকার ওই রান্নাঘর রাখার মতন। হাত বাড়ালেই কামের খোরাক। যত খুশি খাও। ঘোরাঘুরি করার দরকার নেই।

কিন্তু প্রকৃতি, দেখো, স্ত্রীপুরুষের যৌবনকালের অঙ্কটা দু'রকম ভাবে কষেছে। আমার পাশে শোওয়া করুণা, আমার বউ, পাঁচ বছরের ছোট, দেখতে দেখতে বুড়ি হয়ে গেল। বিছানা সরিয়ে দিল আমার। আমি ভাবলাম, এ কী!

এই তো সেদিন রুমা এসেছিল ওর ছেলেকে নিয়ে। মাঝে মাঝেই নাতিকে দিদিমার কাছে রেখে যায়। তো, সে নাকি দুঃখ করে বলেছে, মা, তোমার ওসব চুকেবুকে গেছে, ভালই হয়েছে। শরীরের শান্তি! মেয়ে বলে, আমি কী করি বলো তো? রোজ রোজ ওই অসভ্য কাজ আমার ভাল লাগে না। আমার অপমান লাগে। তোমার জামাই এত্ত অবুঝ! তাতে করুণা নাকি বলেছে, আমার জামাইয়ের শ্বশুরও কিছু কম যায় না। ওরা সব এক রকম। জানোয়ার। এই হল মায়ের শিক্ষা। আসলে, আমার ওই মেয়ে রুমা ভালবাসতে শেখেইনি। আমার অন্য মেয়ে তো নালিশ করে না?

এখন বুঝে দেখো। একে তুমি কী বলবে? আজ চাব-পাঁচ বছর করুণাকে আমি মুক্তি দিয়েছি, তাতেও এই দুর্নাম। ভাগ্যিস আশাকে পেলাম জীবনে, খুঁজে পেলাম বলা যায়, না হলে কী হত জানি না। যাই হোক জীববিজ্ঞানের তত্ত্বকথা সব তোমার মাসিমাকে বুঝিয়ে বলেছি। যে, আশার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু না। সমর্থ পুরুষের সঙ্গে সমর্থ স্ত্রীলোকের মিলন।

তপন জানতে চাইল, কনসেন্ট দিয়েছেন?

না। ও বলেছে, মাগিকে যদি ঘরে ঢোকাও তো সর্বনাশ হবে। আঁশবঁটি দিয়ে ওর গলা কাটব। বিষ খাইয়ে মেরে ফেলব। কী অন্যায় কথা! তুমি নিজে দেবে না, আর কাউকে দিতেও দেবে না! এ অবস্থায় কী করি, তুমি বলে দাও তপন।

তপন এবার নড়েচড়ে বসে।

জিজ্ঞেস করে, আপনি হিন্দু?

মানে ওই আর কী। হিন্দুর ছেলে। পইতেটইতে নেই।

ওই যে আশা নামের মহিলা তিনিও হিন্দু?

হ্যাঁ। তবে গোরুর মাংস খায়। মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরোই, তখন পার্ক সার্কাসের দিকে গিয়ে কাবাব পরোটা খাই আমরা। কেশর দেওয়া পান খাই। তাতে শরীর গরম হয়।

তপন ঠান্ডা গলায় বলল, আইনত, একজন স্ত্রী জীবিত থাকতে আপনি আর একটা বিয়ে করতে পারেন না মেসোমশাই।

জীবিত থাকলেই হল? তাকে সক্রিয় থাকতে হবে না? এ বাজে আইন। তোমাদের মাথায় কেবল সম্পত্তি আর উত্তরাধিকার, প্রাণের তাগিদ নিয়ে বিবেচনা নেই। তাই দ্বিতীয় বিয়ে বন্ধ করেছ। আমি মানি না এ-আইন। আমি জীবন মানি। প্রকৃতি মানি।

উত্তেজিত হবেন না মেসোমশাই। তপন বলে, প্রবৃত্তির মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে এক বিবাহ প্রথার সূত্রপাত করেছে সমাজ। তাতে সংযম শেখার উপদেশও আছে বোধহয়। একটা সময়ের পর স্বামী-স্ত্রীকে ভাইবোনের মতো থাকতে হয়।

বুলশিট। তুমি আইনের সঙ্গে দর্শনকে গুলিয়ে ফেলেছ তপন। দর্শন শেখার আরও অনেক জায়গা আছে। আমি তোমার কাছে আইনের পরামর্শ চাইতে এসেছি। দু'জনকে ভালবাসা কি অপরাধ?

না। কোনও হিন্দুর পক্ষে দু'জনকে বিয়ে করা অপরাধ। মানে, অপরজন জীবিত থাকতে। চারশো চুরানব্বই ধারায় এর শাস্তি বিধান আছে।

সুপ্রকাশ একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করলেন এক তাড়া কাগজ। নীল রঙের রুলটানা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে বাংলা লেখা।

বললেন, এইসব হল আশার চিঠি। আমাকে লেখা। যেসব কথা মুখে বলতে পারে না, সৌজন্যে বাধে, বা বলতে গেলে কান্না এসে যায়, তা চিঠিতে লেখে। আমার পকেটে রেখে দেয়। আমি এর কী উত্তর দেব বলো।

প্রায় একবছর সময়কালে লেখা, তারিখ দেওয়া, সাতখানা চিঠি উলটেপালটে পড়ল তপন। তারপর বলল, খুব গোছানো চিঠি। মেসোমশাই, আপনি মাসিমাকে ডিভোর্স করুন।

অসম্ভব। সুপ্রকাশ বার বার ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন। ও-কাজ আমি পারব না। ও ব্যভিচারী নয়, ধর্মত্যাগী নয়, পাগল নয়, কুষ্ঠরোগী নয়, যৌন ব্যধিগ্রস্ত নয়, সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়নি। নিরুদ্দেশও হয়নি। আমার সংসারে আজ বত্রিশ বছর ও বহাল তবিয়তে আছে। বছরের-পর-বছর ও দুই মেয়েকে বুকের দুধ খাইয়েছে, হাত ধরে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে, স্কুল থেকে নিয়ে এসেছে। বিছানায় একদিনও আপত্তি করেনি—এই পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত। আমার গেঞ্জি-জাঙিয়া কেচে পরিষ্কার করেছে হাসিমুখে। রোজ আটখানা করে মাছ ভেজেছে। প্রতি রবিবার এক কিলো করে মাংস রান্না করেছে। আজ তাকে কী দোষে ডিভোর্স করব? বুড়ি হয়ে গেছে বলে বাড়ি থেকে বার করে দেব? তোমাদের আইনে সে রকম বিধান আছে?

না। তা হলে আশাকে বিয়ে না করে যেমন চলছে, তেমন চালিয়ে যান। ব্যভিচারে কোনও অপরাধ হয় না।

কনকুবাইন? কেন? কেন সে আমার রক্ষিতা হয়ে থাকবে চিরকাল? সে-ও আমাকে ভালবেসেছে। আমি ওকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাই। ওর পেটে আমার সন্তান আছে, আমি চাই না তার জারজ পরিচয় হোক। আমি করুণা আর আশা—দু'জনের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। সেই জন্যেই তো দোতলা বাড়ি করলাম। একতলায় আশা আর অন্যতলায় করুণা। হেঁশেল যদি আলাদা হয়, হোক। আমি ওঠানামা কবব। দরকাব মতো। মন ভাল থাকলে আশার ঘরে গিয়ে শোব। ভোরবেলার দিকে যুবতী বউকে জড়িয়ে শুয়ে থাকার মধ্যে যে সুখ, তার তুলনা হয় না। আবার মন খারাপ হলে, আমাব চিরসঙ্গিনী করুণার কাছে গিয়ে সুখ-দুঃখের গল্প করব। ওর কোলে মাথা রেখে কাঁদব। আমার ছেলে—যদি ছেলে হয়—নয়তো আমার ছোট মেয়ে—তার নাম রাখব পতাকা—আমার হাত ধরে বাগানে খেলবে। কাউকে আমি বঞ্চিত করতে চাই না। আমার বিষয় সম্পত্তি সবাইকে সমান ভাগ করে দিয়ে যাব। যখন আমার ডেডবডি বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যাবে, তখন, আমি চাই, পেছনে দাঁড়িয়ে পাঁচজন কাঁদুক। ভালবেসেছি যথেষ্ট, ভালবাসা পেয়েছি তার চেয়ে বেশি—এই তৃপ্তি নিয়ে আমি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে চাই। একটাই তো মানুষজন্ম।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন সুপ্রকাশ ত্রিবেদী। পাঞ্জাবির পকেট থেকে সুগন্ধি রুমাল বার করে চোখ মুছলেন।

তুমি পারলে না, তপন। এত সহজ, সরল, প্রাণখোলা প্রস্তাব, তোমাদের আইনে তার সমর্থন নেই।

আমি দুঃখিত, মেসোমশাই।

তপন মাথা নিচু করে বলতে বাধ্য হয়।

সুপ্রকাশ বুকপকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট বার করে টেবিলে রাখলেন।এই রইল তোমার ফি।

তপন কিছুতেই ফি নিল না। বলল, আপনি আর একদিন আসুন। আমি একটু ভেবে দেখি।

সোজাপথে না হোক, বাঁকাপথে আমি একটা সমাধান বার করবই।

তুমি আমার জামাইয়ের বন্ধু। সুপ্রকাশ ধরা গলায় বললেন, অনেক সময় নষ্ট করলাম তোমার। কিছু মনে কোরো না।

চলে গেলেন সুপ্রকাশ ত্রিবেদী।

এরপর প্রায় তিন মাস গত হয়ে গেছে।

এক বর্ষার বিকেলে চেম্বারে লোকজন কেউ নেই। তপন তার ঘোরানো চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে। বৃষ্টি পড়ছে ঝুপঝুপ। জানলার বাইরে একটা টগর গাছ। কালো কালো পাতা। সাদা সাদা তারার মতো ফুল। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে দুলছে কিন্তু খসে পড়ছে না। এই যে ব্যাপার—মেঘ, বৃষ্টি, টগর গাছ, তারার মতো উৎফুল্ল সব ফুল, বাতাসে ভেজা ভেজা গন্ধ—এর নিশ্চয় কোনও অর্থ আছে, মনে হয় তপনের। কিন্তু সে অর্থ ও জানে না। দুষ্টবুদ্ধি মানুষের তৈরি করা যত সব প্যাঁচের আইন পড়ে পড়ে ওর মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে। ওর সামনে লাল সুতো দিয়ে বাঁধা তিনখানা লম্বাটে ব্রিফ। সামনের সপ্তাহে শুনানি আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ঝগড়া। জমি, বাড়ি, টাকাপয়সা নিয়ে মনোমালিন্য। আদালতের কাছে সুবিচার চায়। আদালতে বসে আছে হাত-পা বাঁধা এক বিচারক। দু'পাশ থেকে তাকে কানভাঙানি দিচ্ছে দুই বিবেকশূন্য উকিল। তাদের হাতে মোটা মোটা বই।

তপন দেখল, ছপছপ শব্দ করতে করতে কে যেন এদিকে আসছে। দরোজার কাছে এসে ছাতা বন্ধ করল। ভেজা ছাতাখানা ঝুলিয়ে দিল দরোজার আংটায়।

আসুন মেসোমশাই।

উঠে গিয়ে আলো জ্বালাল তপন। পাখা চালিয়ে দিল। এক মুহূর্তে বাইরের জগত লুপ্ত হয়ে গিয়ে ভেতরের জগতটা জেগে উঠল।

আপনার জন্যে একটা ফন্দি বার করেছি মেসোমশাই। তপন বলল।

কী ফন্দি?

আপনি তো ধর্মটর্ম তেমন মানেন না বলছিলেন। গলায় পইতে নেই। গোরুর মাংস খান। আপনি যদি কলমা পড়ে ধর্মটা বদলে নেন, তা হলে সব গোল মিটে যায়।

তার আর দরকার নেই। হাসতে হাসতে সুপ্রকাশ বললেন।

আশার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। পাঁচজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ডেকে, লুচি-মাংস খাইয়ে, তাদের সামনে আশাকে সিঁদুর পরিয়ে দিলাম। আমাদের মালা বদল হল। তারপর ও চলে গেল নার্সিংহোমে।

তারপর?

একটি মেয়ে হয়েছে। ওর নাম রেখেছি পতাকা। এখন তো মেয়েদেরই জয়জয়কার, কী বলো? মুখখানা একেবারে করুণার মতো। কী করে হয় বলো তো? তাই মেয়েকে করুণার কোলে ফেলে দিয়ে বললাম, একেও তোমার বুকের দুধ দাও। না হলে বাঁচবে না।

করুণা বলে, আমি কেন? এর মা কোথায়?

আমি বলি, তুমি ডাকলেই আসবে।

করুণা বলে, আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি। আমার বুকে দুধ কোথায়?

আমি বলি, আছে। নিশ্চয়ই আছে। বার করো। ওর মুখে মাই দাও।

কী আশ্চর্য তপন, তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, আমি স্বচক্ষে দেখলাম, একটু একটু করে ওর জামা ভিজে উঠল। করুণার চোখে জল, করুণার ব্লাউজ ভিজে জবজবে। কোলে শুয়ে পতাকা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এ কেমন করে হয়, বলো তো।

সুপ্রকাশ বলেন,

আর ক'দিন পরে নতুন বাড়িতে আশাকে নিয়ে যাব। বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারি। মনে হয়, আঁশবঁটি দিয়ে করুণা ওর গলা কাটবে না। আর, কাটে তো কাটুক। আমার কাছে দুই বউ সমান। আইন তো আমি অমান্য করেইছি। এখন তোমরা সবাই মিলে চারশো চুরানব্বই ধারায় আমায় জেলে দাও, আমি হাসতে হাসতে জেলে যাব। দু'জন নারীকে ভালবেসে আমি যে অপরাধ করেছি, তার শাস্তি তো আমাকে পেতেই হবে।

১৯৯৪

❀ দুটি দুটি

একতলার রকে বসে তাপস ইংবেজি নভেল পড়ছিল। দুপুর পড়ে এসেছে। দক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে তিনকোনা মাপের একটুখানি রোদ ওর পায়ের ওপর পড়েছে। শীতকালে এইটুকুই আরাম।

শব্দ পেয়ে হঠাৎ ও চোখ তুলে দেখে, একটা সাইকেল রিকশা ওর বাড়ির সামনে থামল। দু'জন লোক নামল রিকশা থেকে। চেনা না।

পাড়াটা এই সময় বেশ নিঝুম থাকে। ঘরের মানুষ সব ঘুমোচ্ছে। কাজের মানুষ আর পড়ুয়ারা আর কিছুক্ষণ পর ফিরবে। বাস চলাচলের রাস্তা এখান থেকে একটু দূরে। তাই সে কোলাহলের রেশ এই অবধি আসে না। লেখককে যদি কাজের লোক বলা যায়, তা হলে তাপসই একমাত্র কাজের লোক যে জেগে আছে। কিন্তু তাই বলে এই দুপুর সাড়ে তিনটের সময় কেউ কারুর বাড়ি যায় না সচরাচর।

দুই নারী-পুরুষের সংলাপ ক্রমশ কাছাকাছি এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে ও চশমাটা নামিয়ে রেখে চোখ তুলল। খোলা বইখানা উপুড় করে টেবিলে রাখতে গিয়ে শুনল, "ওই তো তপুদা।"

তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে ওরা এবার রকে পৌঁছোবে। ওইটুকু দূর থেকে দেখেও তাপস ওদের চিনতে পারছে না।

মহিলা ও পুরুষ দু'জনেই বয়স্ক। দু'জনেই মোটাসোটা। দু'জনেই খুব লম্বা নয়। দু'জনের চোখেই চশমা। লোকটিব পরনে প্যান্ট, গায়ে ব্রাউন রঙের সোয়েটাব। মহিলাব মাথায় সিঁদুব অবধি ঘোমটা, গায়ে সাদা শাল।

"তপুদা, আমি রেখা। চিনতে পারছ না তো?"

"রেখা মানে?"

"মানে বলছি। আগে দাঁড়াও একটা প্রণাম কবি।"

অগত্যা উঠে দাঁড়ায় তাপস।

লক্ষ করে, মহিলার মাথাব চুল অনেকখানি সাদা, অথচ ফরসা মুখখানায় লাবণ্য আছে। চশমার কাচদুটো বেজায় পুরু, তার ফলে ওর চোখদুটো অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে।

রেখা এবার হাসল। "হি হি, তপুদা এখনও চিনতে পারলে না?"

ওই হাসি দেখে, না না, হি হি শব্দটা কানে যেতে, তাপস প্রায় চিৎকার করে উঠল, "শিমুলতলার রেখা?"

"আমি বিশু। বিশ্বনাথ। এবার মনে পড়েছে তো?"

বিশুকে মনে না পড়লেও তাপস ওকে শনাক্ত করতে পারছে। বৈশিষ্ট্যহীন সাদামাটা চেহাবা লোকটির। মাথার চুল ক্ষীণ কিন্তু স্ত্রীর মতো অত পাকা নয়। ওদের দু'জনকে দেখে চট করে বাঙালি বলে চেনা মুশকিল। বয়স ঢাকার প্রচেষ্টাহীন এক ধরনের নির্বোধ স্বাস্থ্য উভয়কে প্রকৃতির কাছাকাছি রেখেছে, মনে হল তাপসের। মানুষ না হয়ে ওরা একজোড়া মহিষ কি একজোড়া বাঘ হলে বেমানান হত না।

ওরা ভেতরে গিয়ে বসল।

ছাপ্পান্ন বছর একটা বয়স, যখন আচমকা কোনও কিছুতে মানুষ উত্তেজিত হয় না। তবু কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল তাপস। বাড়িতে একটা প্রাণী নেই। ঠিকে কাজের লোকটি দুটোর সময় কাজ সেরে গেছে, আবার পাঁচটায় আসবে। ওর স্ত্রী বর্ণনা কলেজ থেকে ফিরবে তারও পর। এই নিঝুম দুপুরটা ওর লেখালেখির পক্ষে প্রকৃষ্ট, কিন্তু হঠাৎ কেউ এসে পড়লে বেসামাল হয়ে পড়তে হয়।

"একটু পরে চা করতে বলব, এখন একটু গল্প করি, কেমন?" তাপস বলে।

"আমাদের কোনও তাড়া নেই।" রেখা বলল।

গল্প করি বললেই তো গল্প শুরু হয়ে যায় না। কোন দূর অতীত থেকে একটা মেয়ে হঠাৎ ভুস করে ভেসে উঠবে আর বহুদূর অতীতে ছেড়ে-আসা একটা হাত আবার খপ করে ধরা যাবে, জীবন এত সহজ অঙ্ক না। তা ছাড়া শিমুলতার রেখাকে নিয়ে তাপসের কোনও রোমান্টিক স্মৃতি নেই।

যুদ্ধের সময় অনেক বাঙালি পরিবার কলকাতা থেকে সরে বিহারের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়।

শিমুলতলা, মধুপুর প্রভৃতি ছোট ছোট শহরগুলিতে বাঙালিদের আস্তানা আগেও ছিল। শীতকালে বায়ু পরিবর্তনের জন্য তাঁরা যেতেন, দু'-তিন মাস থেকে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে চলে আসতেন। অন্য সময় ফাঁকা পড়ে থাকত বাড়িগুলো দারোয়ানের হেপাজতে। যুদ্ধের সময় জাপানি বোমার ভয়ে পলাতক বাঙালি পরিবারগুলি নিয়মিত বসবাস শুরু করে দিয়েছিল এইসব শহরে। তাপস ও রেখার বাল্যকাল অনেকখানি শিমুলতলায় কেটেছে।

আচ্ছা মনে পড়ছে, অনেকখানি ভুট্টার খেত পেরিয়ে ছিল রেখাদের বাড়ি। খিড়কি দরোজা দিয়ে ঢুকলে সামনেই পড়ত একটা কুয়ো। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। লোহার কপিকল দিয়ে দড়ি-বাঁধা বালতি ঝুলিয়ে জল তোলা হত সেই কুয়ো থেকে। কত নীচে ছিল তার জল।

রেখার মা ওই কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে তাপসকে বলেছিলেন, "রেখা তো বড় হয়েছে। ও আর খেলবে না। তুমি যাও। তুমি আর আমাদের বাড়ি এসো না।"

বয়সে রেখার চেয়ে বড় হয়েও তাপস তখন বুঝতে পারেনি, কেন রেখা হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ করে দিয়েছিল। ওই একটা সময়—বছর চার-পাঁচ—যখন মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। অপমানিত বালক তখন বিভ্রান্ত বোধ করেছিল নিশ্চয়। আজ একটা ছোট্ট ক্ষত—না ক্ষত না, আঘাতের আবছা চিহ্ন তাপসের কোথাও লেগে আছে কেবল। ওইটুকুই। জীবনে অনেক আঘাত তারপর ও পেয়েছে, ভুলেও গেছে। এটা প্রথম বলেই বুঝি তাপসের মনে পড়ল। সেই সময়কার রেখার মায়ের মুখটা মনে পড়ল।

আর মনে পড়ল কনেবউ বেশে রেখাব মুখটা।

তাপস বলল, "তোমার তো অনেক দূবে কোথাও বিয়ে হয়েছিল, তাই না?"

"সাহারানপুর। আমরা সাহারানপুরে থাকি।" রেখা বলে।

"তাই? ওঃ, কত বছর হয়ে গেল তাই না?"

"চল্লিশ।"

"আমার অবাক লাগছে", তাপস বলে, "তোমরা আমার বাড়ি খুঁজে বের করলে কী করে?"

"সে অনেক কাণ্ড!"

স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে বিশু বলল, "তুমি চুপ করো। আমি বলছি।"

"তুমি তো সবকিছুই গুলিয়ে ফেলছ এখানে। কী বলতে কী বলবে। বরং আমি বলি—"

"হেঃ হেঃ, আমি গুলিয়ে ফেলছি?" বিশু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসে, "আদ্দেক জিনিষ তুমিই তো দেখতে পাচ্ছ না। হাত ধরে আমি রাস্তা পার করে দিচ্ছি। ওঃ, কী ভিড় না কলকাতায়!"

কাণ্ড এমন কিছু না। টুকরো টুকরো করে দু'জনের মুখ থেকে তাপস যা শুনল, তা হল এই যে ওরা কলকাতাব এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত চষে বেড়িয়ে, বহুবার ভুল জায়গায় পৌঁছে, পাতাল রেল চক্র রেল কবে তাপসের প্রকাশককে খুঁজে বার করেছে। তারপর তার কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে এখানে। অসময়ে, কারণ সন্ধের আগে টালিগঞ্জে ননদের বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।

"এত জায়গা থাকতে কলকাতায় কেন?" জিজ্ঞেস করে তাপস।

রেখা বলে, "গেল বছর ও তো রিটায়ার করল। হঠাৎ কাজ থেকে একদম ছুটি। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে মানুষ করার দায়িত্ব ছিল, দু'-দুটো ছেলেই দাঁড়িয়ে গেছে, বুঝলে কিনা। ওদের বিয়েও দিয়ে দিয়েছি। আমরা ঝাড়া হাত-পা। তো আমি বললাম, চলো, আমরা দু'জনে কিছুদিন দেশে বেড়িয়ে আসি। এরপর বুড়ো হয়ে যাব, হাত-পা চলবে না। এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা হয়ে কলকাতায়। এবার ফিরে যাব। দু'মাস হতে চলল।"

বিশু বলে, "আর কলকাতায় যখন এসেছি, তখন তপুদাকে খুঁজে বার করতেই হবে, তাই না?"

"তাই।"

হঠাৎ রেখার বড় বড় চোখদুটো উদাস দেখায়।

"তপুদা, তোমার মনে আছে", রেখা নিজের উরুর ওপর আঙুল রেখে বলে, "এইখানটায় এত বড় একটা ফোড়া হয়েছিল? কিছুতেই ফাটছিল না? তো আমাদের বাড়িতে বেটাছেলে বলতে কেউ নেই। ডাকো তপুকে। তুমি আমায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেলে মহিম ডাক্তারের কাছে। ফোঁড়া কাটার সময় তুমি আমার পা চেপে ধরেছিলে। মনে আছে?"

মনে নেই তাপসের। অত ছোটবেলার কথা কি মনে রাখা যায়। এখন মনে পড়ছে কি? না, তা-ও পড়ছে না। ফরসা দুটো শিশু-পা আর কুঁচি দেওয়া একটা সাদা ইজের আয়োডিন তুলো পুঁজ রক্তের স্রোত থেকে ভেসে উঠছে কি? না, তাও উঠছে না।

"আমি তোমায় খুব মেরেছিলাম। সেই দাগ এখনও আছে। ওঃ, মহিম ডাক্তারের কী রকম গোঁফ ছিল, তাই না?"

আবার অন্যমনস্ক দেখায় রেখাকে।

তাপস বলে, "শিমুলতলার অনেক কিছুই মনে নেই। একটা বড় জাম গাছ ছিল তোমাদের বাড়ির সামনে, মনে আছে। আর ওই কুয়োটা। কী গভীর। তোমার বিয়ের দিনটা ভুলিনি। আমি পিঁড়ি ধরেছিলাম। তুমি কাঁদছিলে। কিছুতেই বরের মুখের দিকে তাকাবে না। অথচ—"

"অথচ?"

"সেদিনই বিকেলবেলা আমরা ক'জন ছেলে শামিয়ানার নীচে শতরঞ্চির ওপর বসে আড্ডা দিচ্ছি। তুমি কোথা থেকে ছুটে এলে। আমাদের বকতে লাগলে, বরযাত্রীর ট্রেন আসার সময় হয়ে গেছে আর তোমরা স্টেশনে না গিয়ে এখানে? ছি ছি।"

এই কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে বিশু। তাপসও হাসে। তারপর হঠাৎ সবাই চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ।

রেখা বলে, "কোথা দিয়ে চল্লিশটা বছর কেটে গেল। চোখ তুলে ভাল করে জীবনটা দেখলাম না।"

তাপস বলে, "হুঁ।"

"ও কথা বোলো না। তুমি লেখক, তুমি দেখেছ তপুদা। তুমি আমাদের থেকে আলাদা।"

কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে যায়। তাপসের মনে পড়ে, কাজের লোকটির আসার সময় হয়েছে। কিন্তু এখনও এল না যখন, তা হলে আজ আর আসবে না। ঠিকে লোক নিয়ে এই হল সমস্যা। বর্ণনাকে আজ রান্নাঘরে ঢুকতে হবে। তার মানে, ঢের কথা।

তাপস উঠে দাঁড়ায়। রান্নাঘরে গিয়ে হিটারের ওপর কেটলি চড়িয়ে দিয়ে ফিরে আসে।

জিজ্ঞেস করে, "কলকাতায় কী কী দেখলে বলো। কোথায় গেলে তোমরা?"

বিশু বলে, "আসল কথা জানতে চাইছ, দেহাতি মানুষ আমরা, জাদুঘর চিড়িয়াখানায় গেছি কিনা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, প্ল্যানেটোরিয়ম দেখেছি কিনা। সব দেখেছি ঘুরে ঘুরে।"

রেখা বলে, "বেলুড় গেছিলাম একদিন। কালীঘাটে পুজো দিয়েছি। গঙ্গাস্নান করেছি। অনেক পুণ্য জমে গেছে। তা ছাড়া, এসেছি যখন, নন্দাইকে বললাম, বড় ডাক্তার দেখাব, তুমি ব্যবস্থা করে দাও। আমার চোখ দেখালাম। ওর হার্নিয়া দেখালাম। দু'জনেই বললেন, এখন অপারেশন করার দরকার নেই।"

বিশু বলে, "ফিরে যাবার আগে তপুদার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল।"

মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেখা এদিক-ওদিক চায়। বুঝতে পারছে, এ-বাড়িতে মহিলা একজন থাকে, যদিও তাকে দেখা যাচ্ছে না।

জিজ্ঞেস করে, "তোমার বউ কোথায় তপুদা? তাকে একবার দেখব না?"

"ও চাকরি করে। কলেজে পড়ায়। সন্ধের পর ফিরবে।"

"ও বাব্বা, কলেজে পড়ায়? খুব বিদ্বান নিশ্চয়।"

বিশু যোগ দেয়, "তা তো হবেই। সাহিত্যিকের বউ বিদ্বান না হলে চলে?"

তাপস বলে, "দু'জন রোজগার না করলে কলকাতায় সংসার চালানো যায় না। তোমরা এসব বুঝবে না।"

বলে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় রেখা নিজেই সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল।

"আমি চা করে আনছি।"

"আহা হা, সে কী, তুমি বোসো। অতিথি মানুষ। দু'মিনিটে আমি করে আনব। অভ্যেস আছে আমার।"

"না, সে হয় না।" রেখা নাছোড়। পুরুষমানুষ রান্না করবে। সে কী কথা? আর, মেয়ে হয়ে ও বসে বসে দেখবে। যাব যা কাজ। কে ওকে বোঝাবে, সাহানাপুরের পুরনো নিয়মকানুন কলকাতায় অচল।

দিনকাল এখন অনেক বদলে গেছে। মেয়েরা আর রান্নাঘরে বন্দিজীবন কাটায় না। তারা পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাকরি করছে। ওকালতি করছে, জজিয়তি করছে।.ও কি দেখেনি?

"কোথায় কী আছে, আমাকে দেখিয়ে দাও।" রেখার শেষ কথা।

এবার তাপসের কৌতুক বোধ হল। এই মহিলা ওর অন্দর মহল দেখতে চাইছে। কৌতূহল। রান্নাঘরই যে সংসারের আয়না, এই সত্যটা মেয়েদের শিখিয়ে দিতে হয় না। মিনিট দুয়েকও সময় যায়নি, তার মধ্যে রেখা সব বুঝে নিল।

"খুব ছিমছাম সংসার তোমার তপুদা", রেখা বলল, "বড় বেশি ছিমছাম। তোমাদের ছেলেপুলে নেই?"

"আমার বউ কোনও সন্তান আমায় দেয়নি। তবে, আমার বই আছে। আমার একুশটা বই—ওরাই আমার সন্তান।"

"তাই দেখছি, রান্নাঘরে সব কিছুই দুটি দুটি।"

রেখা অকারণ হাসে। ওর মাথার ঘোমটা খসে গেছে কখন, ও টের পায়নি। মাথার পেছনে মাঝারি মাপের খোঁপা কাঁটা দিয়ে আটকানো। ওর গলায় মস্ত এক সোনার হার দেখতে পেল তাপস। হাতেও কয়েক গাছা করে চুড়ি। সাদা শাঁখা। বাঙালি এয়োর প্রতিমূর্তি একটি।

রান্নাঘবের দবোজার বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে তাপস মজা দেখছে।

"চা ছাঁকতে ছাঁকতে রেখা বলল, "বিনা উদ্দেশ্যে তোমার কাছে আসিনি তপুদা। আমাকে একটা জিনিস দিতে হবে।"

"কী?"

"তোমার একটা বই আমার চাই। যেখানে আমার কথা লিখেছ।"

"তোমার কথা? লিখেছি নাকি? কোন বইতে?"

"আমি তার কী জানি! সেদিন দুপুরে খুব আড্ডা হচ্ছিল। আমি ছেলেবেলার গল্প করছিলাম। হঠাৎ আমার ননদের মেয়ে বলে উঠল, ও মামি, এসব গল্প আমার পড়া। তারপর তোমার নাম বলল।"

টুং টুং করে চায়ের কাপে চামচ নাড়ার শব্দ হয়। রেখা স্বামীর উদ্দেশে কী একটা মন্তব্য করে যার উত্তরে অন্য ঘর থেকে বিশু চেঁচিয়ে উত্তর দেয়, ঠিক আছে। ঠিক আছে।

রেখা বলে, "তাপস মিত্র। শুনে আমি তো হতভম্ব। এই লোকটা আমার ছেলেবেলার কথা জানল কী করে। তারপর ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল, তপুদা নয়তো? তপুর সঙ্গে তাপস মিলে যাচ্ছে। আর তোমবা কায়স্থ ছিলে আমি জানি। মা তোমাকে অপমান করেছিল।"

তাপস বোঝাতে চেষ্টা করে রেখাকে। "আসলে কী হয় জানো? মাঝে মাঝে গল্পের প্লট খুঁজে পাই না তখন স্মৃতি হাতড়াই। যা কিছু উঠে আসে তার ওপর রং চড়িয়ে লিখতে হয়। লিখতে লিখতে গল্পটা দাঁড়িয়ে যায় কোথাও।"

"যে ভাবেই হোক, তুমি তো লিখে রেখেছ তপুদা। আমাকেই দেখো। একটা জীবন কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল, কিছু কি লেখা রয়েছে। মুছে গেছে সব। সঞ্চয় বলতে কিছু নেই। ও তবু রিটায়ার করে বেশ কিছু টাকা পেয়েছে। তার সুদে আমাদের বাকি জীবন চলে যাবে। রিটায়ার করে আমি কী পেলাম? চোখ দুটোয় কেবল ছানি পড়ল।"

বলে খুব একচোট হাসল রেখা।

"কী তপুদা, ভাবছ আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি? না, না, কোনও ভয় নেই। আমি ঠিক আছি। বইটা কিন্তু আমাকে দেবে।"

হইহই করতে করতে এক সময় চলে গেল ওরা। তাপসের একখানা উপন্যাস বগলদাবা করে নিয়ে গেল। প্রায় একরকম দেখতে এক জোড়া মানুষ।

ফিরে এসে নিজের চেয়ারটায় বসে তাপস। চুপ করে বসে থাকে খানিকক্ষণ। মশা কামড়াচ্ছে। পায়ে। সন্ধে হলেই এখানে মশার ঝাঁক নগর সংকীর্তনে বেরিয়ে পড়ে।

কত বয়স হল তাপসবাবু? নিজেকেই প্রশ্ন করল ও। ছাপ্পান্ন।

তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে ভেতরে চলে গেল তাড়াতাড়ি। আলো জ্বেলে রান্নাঘরে চায়ের বাসনগুলো চটপট ধুয়ে ফেলল। চা চিনির কৌটো রেখে দিল যথাস্থানে।

একটু পরেই ফিরবে বর্ণনা। কাজের লোক আসেনি দেখে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। বাস্তবিক, চাকরি থেকে বাড়ি ফিরে কার ইচ্ছে করে হেঁশেল ঠেলতে?

আজকের বিকেলটা চুপচাপ নিজের জন্য রেখে দিল তাপস। বউকে এর ভাগ দেবে না। কাউকেই দেবে না।

১৯৮৭

❀ কাকতালীয়

ভেবেছিলাম, এই গল্প আমি লিখব না। এত প্রকট সত্য ঘটনামূলক লেখা ডায়েরির পাতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকা উচিত। তাকে বাইরে প্রকাশ করতে নেই।

প্রথমত, অমূল্যবাবু, মানে অমূল্যভূষণ চট্টরাজ ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। ওকালতি করতে করতে হঠাৎ একদিন ছেড়ে দিলেন। ইদানীং যেতে আসতে দেখতাম, পা উঁচু করে ইজিচেয়ারে বসে আছেন। কখনও একটা লাঠিতে ভর করে একঘর থেকে অন্য ঘরে যাচ্ছেন। সন্ধের পর জানলার পাল্লা খুলতে গিয়ে প্রায়ই চোখে পড়ত, জোড়া খাটের একটায় হাত-পা ছড়িয়ে ভদ্রলোক শুয়ে আছেন। খালি-গা, বুক-ভরতি লোম, পরনে লুঙ্গি না, পাজামা। আর পাশের খাটে গদির ওপর বসে তাঁর রোগা চেহারার স্ত্রী সেলাইফোঁড়াই গোছের কোনও হাতের কাজ করছেন। দু'জনেই জাগা, কিন্তু চুপচাপ—এই রকম মনে হত আমার।

ওঁদের একটি মাত্র মেয়ে—চন্দনা, না কী যেন নাম, অনেক দিন হল তার বিয়ে হয়ে গেছে। কলকাতার বাইরে কোথাও থাকে। মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসে। সেই সময় অমূল্যবাবুকে সুস্থ অবস্থায় দেখেছি, নাতিকে কোলে নিয়ে পাখি দেখাচ্ছেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হত। আমি ভাবতাম, আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা যুক্তিবাদী হন। তা হলে কী করে বিশ্বাস করছেন পাখিটা আসবে, এসে শিশুর হাতে-ধরা বাটি থেকে মুড়ি খেয়ে যাবে? শিশুদের কল্পনার জগতে কি এত সহজে ঢোকা যায়? কী করে পারেন অমূল্যবাবু?

একটি ভাইপো, ওঁদেব সঙ্গে থাকে, সে আইন পড়ছে। ভবিষ্যতে উকিল হবে। জ্যাঠার জুনিয়র হয়ে প্র্যাকটিস শুরু করবে, এই রকম ইচ্ছে। এখন থেকেই ওর হাবভাব পেশাদার উকিলের মতো। আঙুল নেড়ে কথা বলতে শিখেছে।

বয়স্ক মানুষদের সংসার যেমন হয়, তেমনই, সব কাজকর্ম স্তিমিত, শ্লথগতি। জীবনের কাছ থেকে নতুন করে আর কিছু পাবার নেই। তাই দৌড়োদৌড়িও শেষ। বাকি জীবন কাটাবার রসদ নিশ্চিত সঞ্চিত আছে। এখন শুধু জীবন টেনে যাওয়া। আপ্রাণ চেষ্টায় অসুখবিসুখ ঠেকিয়ে রাখা—কেননা ওই পথ দিয়েই মৃত্যু আসে। এত পরিচিত আর স্পষ্ট রঙের চরিত্রের মধ্যে রহস্য বলতে কিছু নেই।

দ্বিতীয়ত, মৃত্যু নিয়ে গল্প আমি লিখতে চাই না। অনেক লেখককে দেখেছি, নানা চরিত্রের সংঘাতে জড়িয়ে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, হঠাৎ একজনকে মেরে ফেলে গল্পটা সোজা করে নিল। ওটা ঠিক না। যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নেই, যে-ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা হয় না, তা কেন গল্পের মধ্যে আসবে? লেখক তো ভগবান নয়। সে কেন ভগবানের ভূমিকা গ্রহণ করবে? সে যদি ভগবান হত, তা হলে লোকে তাকেই দেখত, তার লেখা গল্প পড়তে চাইত না।

জীবন যে একটা অবিরাম যুদ্ধ, সে-কথা সবাই জানে। আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে অতিরিক্ত যেটুকু জানলাম, তা হল, এই জীবনযুদ্ধে পরাজয় অবধারিত, কেননা মৃত্যুতে এর শেষ হয়। সুতরাং এ

বিষয় নিয়ে লেখালেখির কিছু নেই। অমূল্যভূষণ চট্টরাজের মৃত্যুও সেই রকম একটা ঘটনা। তাই এই গল্প আমি লিখতে চাইনি।

লিখতে বাধ্য হচ্ছি, যেহেতু কাকতালীয়ভাবে এই ঘটনায় আমি জড়িয়ে গিয়েছিলাম। এবং অমূল্যবাবু মৃত্যুর আগে আমায় একটা দায়িত্ব দিয়ে গেছেন।

সবকিছুরই একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকে, আলটপকা পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না, এই রকম ধারণাকে আমি প্রশ্রয় দিই মৃত্যুকে মেনে নিয়েও। তাই, যখন শুনলাম অবসরপ্রাপ্ত অমূল্যবাবুর ক্যান্সার হয়েছে, বাঁ পায়ের গোড়ালি অবধি বাদ গেছে আপাতত, যদি ওখানেই থেমে যায়, ভাল, না হলে হয়তো গোটা পা-ই বাদ দিতে হবে, তখন মনে হল, তাঁর কেন ক্যান্সার হবে?

শরীরের ক্ষয় থেকে ক্যান্সার হয় না। ছোঁয়াচে বা জীবাণুর আক্রমণ থেকেও হয় না। আমি যতটুকু জানি, ক্যান্সার হল শরীরের গঠনগত ভারসাম্যের মধ্যে বিভ্রাট। প্রকৃতি যখন তার অঙ্কটা গুলিয়ে ফেলে, তখন এই বিভ্রাট বাধে। পরীক্ষার হলে অঙ্ক মেলাতে না পারা ছাত্রের মতো তখন সে কেবল কাটাকুটি করে, খাতায় কালি ফেলে, পাতা ছেঁড়ে—এইভাবে যত্নে গড়া একটা শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এর পেছনের কারণ, অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়া বা মদ খাওয়া নয়, বায়ুদূষণ ও পরিবেশ দূষণও নয় প্রত্যক্ষভাবে। আসল কারণ সূক্ষ্ম পীড়ন। ক্ষুব্ধ, অশান্ত, ক্রুদ্ধ, তিক্ত, অপরাধবোধে জর্জরিত, উদ্বিগ্ন, অসহায় মানুষেব মনে যে পীডন অতি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে, সেই মানসিক পীড়ন বা স্ট্রেস ক্যান্সারের জনক। অমূল্যবাবুর সাদাসিধে জীবনে এমন পীড়ন থাকার কথা নয়। অবশ্য, তাঁর মনের ভেতরকার খবর আমি জানতাম না।

দুরাবোগ্য ব্যাধির শিকাব যে-ব্যক্তি, তাকে জানাতে নেই, যে, সে আর সেরে উঠবে না। এই রকম একটা মত বহুকাল ধরে প্রচলিত। কেননা, তাতে রোগীর কষ্ট বাড়ে। তার চেয়ে ভাল, রোগীকে আশ্বাস দিয়ে যাওয়া—তার চিকিৎসা হচ্ছে, সে সেরে উঠছে, একদিন সে একেবারে সুস্থ হয়ে আবার আগেকার মতো চলাফেরা করতে পারবে। অন্যান্য রোগেব বেলা মানুষ যে সেরে ওঠে না, তা নয়, অনেক রকম আশ্চর্যজনক নিরাময়ও আমি ঘটতে দেখেছি। তবে, ক্যান্সার বড় বিশ্বাসঘাতক। কিছুকাল ঘুমিয়ে থেকে সে আবার জেগে ওঠে, পুনরুদ্যমে তার ধ্বংসেব কাজ আবার শুরু করে দেয়। সেই কারণে, শুনেছি, বিদেশে আজকাল ক্যান্সার রোগীকে তার অসুখেব কথা বলে দেওয়া হয়, যাতে সে মনে মনে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে পারে। এর ফলে অনেক রোগী নাকি শান্তি পেয়েছে। অমূল্যবাবুকে কেউ কিছু বলেনি। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ মানুষ। হয়তো নিজে নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি আর বেশিদিন ইহজগতে নেই। কিন্তু তাঁর ভাইপো যখন মিস্তিরি ডেকে এনে কাঠের পা বানাবার মাপ নিয়ে যায়, তিনি বাধা দেননি। এই খবর তাঁব মৃত্যুর সতেরো দিন আগের;

একদিন আমি দেখতে গেছি। তখন সকাল এগারোটা হবে। অমূল্যবাবু শুয়ে ছিলেন। উঠে বসলেন। খালি গা। বুক-ভরতি ঘন লোম। গলায় পইতে নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন?

খাট থেকে পা দুটো ঝুলছিল। একটা পা গোড়ালির পর থেকেই নেই, অন্য পা-টা পরিষ্কার। বুড়ো আঙুল থেকে কড়ে আঙুল অবধি নখ মসৃণ করে কাটা। খাটো পাজামার বাইরে অনেকটাই দেখা যাচ্ছিল।

দুটো পা-ই দোলাতে দোলাতে অমূল্যবাবু বললেন, এখন একটু ভাল। তবে কাঠের পা-টা তৈরি হয়ে না আসা অবধি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারব না।

বইতে পড়েছি, অবধারিত মৃত্যুর কথা জানার পর রোগী প্রথমে প্রচণ্ড আঘাত পায়। কান্নাকাটি করে। অভিযোগ করে, তার উপযুক্ত চিকিৎসা হচ্ছে না। দ্বিতীয় পর্যায়ে তার রাগ আরও বেড়ে যায়। সে ভাবে এত লোক বেঁচে থাকবে, সে কেন মারা যাবে? নিশ্চয় তার বিরুদ্ধে আত্মীয়স্বজন ডাক্তার সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করছে। তাকে সরিয়ে দিয়ে ওরা লাভবান হতে চায়। তৃতীয় পর্যায়ে সে, যা অনিবার্য, তাকে মেনে নেবার চেষ্টা করে। আরও কিছুদিন সময় চায়। বলে, এখুনি না, আরও একবছর, দু'বছর; যাতে বাঁচি, তার চেষ্টা করুন। অনেক কাজ যে বাকি আছে আমার। ডাক্তারের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে একসময় সে অলৌকিক উপায়ে সেরে ওঠার চেষ্টায় ঠাকুরদেবতার শরণও নেয়। শেষ পর্যায়ে তার মনের ভেতর থেকে সব রাগ, বিদ্বেষ, অভিমান, অন্তর্হিত হয়ে যায় হঠাৎ। দেখা যায় আত্মসমর্পিত রোগী নীরবে মৃত্যুর

জন্য অপেক্ষা করছে। পরলোক নিয়ে ভাবছে। তার মন খারাপ, কিন্তু অশান্ত নয়। পর্যায়ক্রমে এই অবস্থা দেখা রোগীর আত্মীয়দের কাছে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

গলায় পইতে আমারও নেই। গেঞ্জি খুলতে গিয়ে বার বার হারিয়ে যেত। আবার বানাতে হত। ছাত্রাবস্থায় আমার একমাত্র বাকসের চাবি পইতে জড়িয়ে বেঁধে রাখতাম। গরমকালে ওই একগুচ্ছ সুতো পিঠ চুলকোবার কাজে লাগত। একসময় ভাবলাম, ধুৎ, গায়ের ওপর এ এক উপসর্গ। চুলোয় যাক। সেই থেকে পইতেহীন ব্রাহ্মণ আমি। মা বলত, এই ছেলে আমার নাস্তিক। আধুনিক যুবক, আমি তাতে গৌরব বোধ করেছি।

তেরো বছর বয়েসে আমার যখন উপনয়ন হয়, তখন কিন্তু আমি গুরুজনদের কথা শ্রদ্ধাসহকারে শুনতাম। বিশ্বাসও করতাম, তাঁরা যা বলেন, আমার ভালর জন্যেই বলেন, আমার শোনা উচিত। তাঁদের মনে কষ্ট দিতে নেই। উপনয়নের সময় মাথা মুড়িয়েছি, কান বিঁধিয়েছি। গেরুয়া ধুতি-চাদর পরে তিনদিন দণ্ডিঘরে নির্জনবাস করেছি। দু'বেলা সামবেদীয় মতে সন্ধ্যাহ্নিক করতাম। গায়ত্রী মন্ত্র ছিল আমার মুখস্থ। মনে আছে, উপনয়নের পর এক বছর নিয়ম অনুযায়ী নিরামিষ খাবার খেয়েছিলাম, একাদশীর উপবাসও করেছিলাম। আজকালকার মায়েরা মূল্যবান পুত্রসন্তানকে সে কষ্টের মধ্যে যেতে দেয় না। আমি যে ব্রাহ্মণ, অনেকের চেয়ে বড় মাপের মানুষ, এই ধারণা আমাকে তখন তৃপ্তি দিয়েছে। কালক্রমে জানলাম, জন্মগত কারণে মানুষ বড় হয় না। কাজ দেখাতে হয়।

জীবনে কিছুই আলটপকা ঘটে না, সবকিছুর পেছনে একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকে। এ-বিশ্বাসও আমাব মনে ক্রমশ সুদৃঢ় হয়েছে। ছোটবেলায় দেখেছি, বীরুকাকার মা কথায় কথায় তাঁর পুত্রবধূব হাতে গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দিতেন। বীরুকাকা এর প্রতিবাদ করত না। বউকে বলত আর ক'টা দিন সহ্য কবো, মা মবে গেলে তুমিই তো হবে এ-বাড়ির কর্ত্রী। সেই বীরুকাকা অকালে যক্ষ্মারোগে ভুগে মাবা যায়। তাব মা-ও বৃদ্ধ বয়সে অনেক কষ্ট পেয়েছে। ওই বউই তখন গঞ্জনা দিত। দেখেছি, ছোট ভাইদের ফাঁকি দিয়ে বাপেব সম্পত্তি গাপ করেছিলেন ধীরেনবাবু, আমাদেরই আত্মীয় তিনি, শেষ জীবনে পাগল হয়ে গেলেন। অবশ্য, সব সময়ে যে এমনভাবে শোধবোধ হয়ে যায়, তা নয়। অন্যায় কাজ করেও মানুষ পাব পেয়ে যায়। তখন ভেবেছি, পূর্বজন্মের পুণ্য ছিল লোকটাব। বা, পরজন্মে এব ফল ভোগ কববে। শাস্ত্রে তো তাই বলে।

অমূল্যবাবুর কেন ক্যান্সার হবে, তার উত্তর নিয়ে ধন্দ থেকেই যায়।

আমি কাছে থাকি, তবু ঘন ঘন দেখতে যাওয়া হয়ে ওঠে না। অমূল্যবাবুকে যে ভুলে যাই তা নয়। যেতে-আসতে দেখতে তো পাই জানলার ফাঁক দিয়ে। ভদ্রলোক বিছানায় শুয়ে আছেন। কাটা ঠ্যাংটা একটু তোলা।

ভাবি গিয়ে কী হবে? কী বলব? কেমন আছেন? হাস্যকর শোনাবে না? মৃত্যুপথযাত্রীকে এ-প্রশ্ন করার মানে হয়? তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন—বললেও অদ্ভুত শোনাবে। তাঁর আত্মীয়দের দেখি, স্ত্রী, মেয়ে, ভাইপো মুখ বুজে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে, সেবা করছে, অথচ চোখের সামনে কোনও আশার আলো নেই। ওদের দেখে মনে হয়, খুবই ক্লান্ত। আর যেন পেরে উঠছে না। তাই বলে তো বলা যায় না, মশাই এবার স্বর্গে যান। আর কতদিন জ্বালাবেন। রোগজীর্ণ শরীরের খাঁচা থেকে পুণ্যাত্মার মুক্তি হোক। বলা যায় না। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। মানুষ চেষ্টা করে যায়।

এইভাবে দিন, মাস চলে গেছে। ক্যান্সারের চাক বাড়তে বাড়তে ওপরের দিকে উঠেছে। পেট ছাপিয়ে বুক অবধি। একদিন রাস্তায় দেখতে পেয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন উনি?

স্ত্রী—ওই, থাকা আর না থাকা সমান।

আমি—খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

স্ত্রী—হ্যাঁ। সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা। ইঞ্জেকশন দিয়ে কমিয়ে রাখা হয়। আবার বাড়ে।

আমি বলি, স্বাস্থ্য ভাল, তাই লড়াই করে যাচ্ছেন। অন্য কেউ হলে এতদিনে হাল ছেড়ে দিত।

ভারী জেদি মানুষ। চিরকাল। স্ত্রী বলেন।

আমি বলি—একদিন দেখা করতে যাব।

কিন্তু যাওয়া হয়নি তার পরেও। খালি ভাবছি, এবার একদিন মৃত্যুসংবাদ পাব। কোনদিন সকালবেলা দেখব বাড়ির সামনে রাস্তার ওপর সর্দারজিদের কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তখনই যাব না হয়।

মৃত্যুদৃশ্যকে এড়িয়ে থাকার চেষ্টাও ভারী হাস্যকর। যেন চিরকাল এড়িয়ে থাকা যাবে। নিজের জীবনে যেন এই দুর্দিন আসবে না। মানুষ এমনই নির্বোধ।

আবার আকর্ষণও অনুভব করেছি।

একদিন, মানে এই সেদিন, বাড়ির সামনে আমাদের পাড়ার ডাক্তারের সবুজ মারুতিখানা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। বুঝলাম, অমূল্যবাবুকে দেখতে এসেছে। কী মনে হল, ভাবলাম, ঢুকে যাই। দরোজা খোলাই ছিল। ঢুকে দেখি, বসার ঘরে অনেক লোক, মেয়ে-পুরুষ। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ চেয়ারে, সোফায় বসা। আবহাওয়া থমথমে। ঘরের কোণে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার দাঁড় করানো।

কেমন আছেন উনি?

ডাক্তার রায় আমাকেও চেনে। কথাব উত্তর দিল না। মুখ ব্যাদান করে বোঝাল, থাকা না-থাকা সমান। বেঁচে আছেন এই অবধি। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিই। খেতে পারছেন কিনা। ঘুম হচ্ছে তো। একসময় জিজ্ঞেস করি, কথা বলতে পারেন?

এখনও পারছেন। তবে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

পাশের অন্ধকার মতো ঘরখানা থেকে অমূল্যবাবুর ভাইপো বেরিয়ে এসে আঙুল দেখিয়ে আমাকে বলল, আপনি যান ওঘরে, উনি ডাকছেন। গলা শুনে চিনেছেন। তো আমি গিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়ালাম। সেখানেও চার-পাঁচ জন শুভার্থী রোগীর খাটখানা ঘিরে বসে আছে। কেউ কেউ হাত বোলাচ্ছে তাঁর মাথায়, হাতে। কেউ কথা বলছে না।

অমূল্যবাবু আস্তে আস্তে বললেন, তোমরা একটু বাইরে যাও। তারপর ইশারায় বসতে বললেন, আমাকে। বসলাম।

খালি ঘরে আমরা দু'জন। অমূল্যভূষণ চট্টরাজ বিছানায় শোয়া। আমি পাশের চেয়ারে বসা। লক্ষ করলাম, পাজামার বাইরে গোটা পায়ের যে-অংশটা বেরিয়ে আছে, সেটা বেশ ফোলা। বাতাসে অসুখের গন্ধ। আমি ওঁর বুকের ওপর হাত রাখলাম।

বিড়বিড় করে অমূল্যবাবু বললেন, আপনি আসবেন, জানতাম।

তাঁর বুকের লোমে আঙুল বুলিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, এত কাছে থাকি, আসবই তো।

অমূল্যবাবু—লেখক। শুধু জীবন দেখবেন? মরণ দেখবেন না?

আমি—সব ঠিক হয়ে যাবে।

মিথ্যে কথাটা বলতে গিয়ে নিজের কানেই বিসদৃশ ঠেকল। সংশোধন করে বলি, খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

অমূল্যবাবু কেটে কেটে বললেন, সংশয় থেকে কষ্ট। কোথাও বিশ্বাস রাখতে পারলাম কই।

আশ্বাস দেবার জন্যে বলি, আমরা প্রার্থনা করছি।

অমূল্যবাবু—কী লাভ!

অমূল্যবাবু লাল চোখদুটো বার করে তাকালেন একবার, খুব ধীরে কিন্তু খুব দৃঢ়স্বরে বললেন, ভগবান নেই। আত্মা নেই। একাই যাচ্ছি। নিবে যাচ্ছি। লিখে রাখুন।

এতগুলো কথা।

মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ কথা ক'টি আমাকে হতভম্ব করে দেয়। আমি ভাবি, কী সাংঘাতিক মনের জোর লোকটার যে, একবার পরজন্মের কথা ভাবল না। পরলোকের চিন্তা জাগল না ওর মনে। বলল, নিবে যাচ্ছি। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও অবসান। আর, এই কথাগুলো শোনাবার জন্যে আমায় ঘরের মধ্যে ডেকে আনল। তার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি, মায়া-মমতা-ভালবাসার সারমর্ম ওই কয়েকটি ছোট ছোট বাক্য—ও বলতে পারল।

আমি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যাই যাতে ডাক্তার আর অন্যসব আত্মীয়স্বজন অমূল্যবাবুর শেষ সময়ে কাছে থাকতে পারে। বেরিয়ে যেতে যেতে দেখি অক্সিজেন সিলিন্ডারে রবারের নল পরানো হচ্ছে।

পাঠক, আর একটু ধৈর্য ধরুন, সবটা আমায় বলতে দিন। এখনও পর্যন্ত আমি দর্শক ও ন্যারেটার। গল্পের বাইরে আছি। এর পরেই আমার নিজের মতিভ্রম হবে। আমি চাই, সম্পূর্ণ সত্যই উদ্‌ঘাটিত হোক।

আমি চলে আসার পরেই অমূল্যবাবু অচৈতন্য হয়ে যান। কিন্তু মারা যান তার দু'দিন বাদে। এই

দু'দিন, ডাক্তারের ভাষায় গ্যাস্পিং চলতে থাকে। ডাক্তার বলে গেল, শ্বাস উঠে গেছে। তবু অক্সিজেন চলুক।

এদিকে আমি নিজের বাড়িতে ছটফট করছি। আমার সমস্ত ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। খেতে বসে খেতে পারছি না। বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারছি না। কাউকে বলতেও পারছি না আমার মনের মধ্যে কী কাণ্ড ঘটে চলেছে।

পরের দিন সকালে দেখি ওদের বাড়ির কাজের লোকটি বাইরের সিঁড়িতে বসে আছে বিমর্ষ মুখে।

জিজ্ঞেস করি, কেমন আছেন?

ওই একই রকম।

আবার সন্ধ্যেবেলা গিয়ে উঁকি দিই।

কেমন আছেন?

একই রকম। শ্বাসকষ্ট চলছে।

মানুষ কতক্ষণ খাবি খায়। এ যেন সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

তার পরের দিন সকালবেলা আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না।

হন্তদন্ত হয়ে খোলা দরোজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাই। দেখি, এর মধ্যে বাড়ির লোক বিছানার চাদর বদলে ফরসা সাদা চাদর বিছিয়েছে। অমূল্যবাবুর পবনেও পাট-ভাঙা পাজামা। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। তাঁর স্ত্রী ফোঁটা ফোঁটা করে জল ফেলছেন অমূল্যবাবুর খোলা মুখে।

কী মনে হল, আমি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম, বড় কষ্ট পাচ্ছেন, আমি কি ওঁর গায়ে হাত রেখে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে পারি?

করুন না। এ আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন? যেন, কিছু একটা করা হোক, তিনিও চান।

গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, কনুই পর্যন্ত ঠান্ডা। ঊর্ধ্বাঙ্গ ঘামে ভেজা। রোমশ বুক উদ্দামভাবে ওঠা-নামা করছে। ওই আগ্নেয়গিরির ওপর আঙুল রেখে আমি দশবার গায়ত্রী মন্ত্র পড়লাম। কতদিন পব, কিন্তু একটুও ভুলিনি।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তে যিনি আছেন, তিনিই আমার মন, চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাইরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা, এক ধারায় মিলছে।

যা কবেছি, তাৎক্ষণিক ভাবাবেগের বশে করেছি। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিনি। অমূল্যভূষণ চট্টরাজের অন্তিম সময়ে আমার কিছু একটা করা দরকার, তাঁর কষ্ট উপশমের জন্য, আমি সামান্য মানুষ, আর কীই বা করতে পাবতাম, এই বোধে, দুরধিগম্য মন্ত্র উচ্চারণ করে নিজের অন্তরের ভার লাঘব করেছি।

তাই, পরে যখন শুনতে হল, আমি গায়ত্রী বলে চলে আসার পরই তাঁর আত্মার মুক্তি হয়েছে, আমি আবার হতভম্ব হয়ে যাই। আমার কেবলই মনে হয়, ওই সৎ, দৃঢ়চেতা, নাস্তিক ভদ্রলোককে কি আমি অপমান করলাম? আত্মা যদি নেই, তবে আমার স্পর্শে তার মুক্তি হয় কী করে?

এই কাহিনী লিখতে গিয়ে বার বার আমার মনে পড়ছে মহাত্মা জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির কথা: "বিশ্বাস না, আত্মসমর্পণ না, সংশয়ই ধর্ম। সংশয় মানুষের অন্তরকে কলুষমুক্ত করে। তার বেদনা, যন্ত্রণা, তার নিঃসঙ্গতা ও উদ্বেগ—সবই জীবনের সঙ্গে যুক্ত, কোনও বাইরের শক্তি তাকে শান্তি দিতে পারে না।" আইনজ্ঞ মানুষ অমূল্যভূষণ দর্শনশাস্ত্র হয়তো পড়েননি। কিন্তু নিজের জীবনে পরম দার্শনিক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

আমি আত্মাভিমানী লেখক তাঁকে ছুঁয়ে তাঁর কাছে ছোট হয়ে রইলাম।

১৯৯৫

কাছাকাছি কোথাও নদী আছে। আর নদী যখন আছে, তখন অরণ্য থাকাও অসম্ভব নয়। কেননা জলের শুশ্রূষা পেলেই তো নদীর দু'পাশে গাছ গজিয়ে ওঠে। গাছ বড় হয়। একসঙ্গে অনেকগুলো গাছ বড় হয়ে উঠলে জায়গাটা ছায়াময় হয়ে যায়। নির্জন, নিস্তব্ধ। ঠিক নিস্তব্ধ নয়—ওপাশে নদীর কুলকুল শব্দ, স্রোতের জল পাড়ের ওপর গড়িয়ে পড়ছে, তার ছলক, আর এপাশে পাতার খসখস, হাওয়ার সাঁই সাঁই, বনের মধ্যে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ পাখির ওড়াউড়ি, সারা দুপুর ধরে তাদের কুরর কুরর পি পিহু পি পিহু ডাক। একেবারে চুপ কি কিছু থাকে? নীরবতা—তারও এক ধরনের শব্দ আছে। খুব মৃদু, সুরেলা, একঘেয়ে।

মুরারি বলে, বিশাল মরুভূমির মাঝখানে যদি একটা উঁচু লাইটহাউস থাকে, আর তুমি যদি সেই লাইটহাউসের একদম উপরে উঠে যাও রাত্তিরবেলা, কী শব্দ শুনবে বলো তো?'

কোথাও কোনও প্রাণী নেই? প্রিয়াঙ্কা অবস্থাটা কল্পনা করার চেষ্টা করে।

না। মাথার ওপরে শুধু তারা-ভরতি আকাশ।

আর নীচে লাইটহাউসেব আলোটা ক্রমাগত ঘুরছে। তখন কী শব্দ শুনব? দাঁড়াও বলছি। একটু ভেবে বলছি।

একটু ভেবে প্রিয়াঙ্কা বলে, নক্ষত্রদের পিটপিট শব্দ।

দিদির কথা শুনে বাজিরাও হইহই করে হেসে ওঠে।

বলে, মরুভূমির মাঝখানে লাইটহাউস কী করে থাকবে মুরারিদা? লাইটহাউস তো থাকে বন্দরে। জাহাজদের নিশানা দেখাবার জন্যে, তাই না?

দেখো, যুক্তি দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু বোঝা যায় না। কথা হচ্ছিল নীরবতার শব্দ নিয়ে।

মুরারি মোড়ায় বসে ছিল। উঠে দাঁড়াল এবার। শহর থেকে দূরে এই ডাকবাংলোয় এখনও ভাল করে সন্ধে নামেনি। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে একপশলা। আকাশের পশ্চিম দিকটা লাল। ডাকবাংলোর বাগানে লাল সুরকির মতো মাটি থেকে ভিজে গন্ধ উঠছে। কেয়ারির মধ্যে সাজানো ফুলগাছগুলো—টগব, জবা, জুঁই—চকচক করছে পরিষ্কার, অল্প হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। একটু পরেই জায়গাটা অন্ধকার হয়ে যাবে। তখন আর বেতের চেয়ারে বসে আরাম করে গল্প করা যাবে না। পায়ের আঙুল দিয়ে ভিজে মাটি খোঁড়ার যে মজা, সে-মজা সন্ধের আগে সেরে না ফেললে বিপদ আছে। শহর থেকে দূরে এই জায়গাটায় দৃশ্যত কোনও নদী নেই, কোনও অরণ্য নেই। একটা পিচের রাস্তা ডাকবাংলোর গা দিয়ে চলে গেছে বেঁকে। ওই বাস্তা দিয়ে কদাচ কখনও দু'-একটা মোটরগাড়ি, ট্রাক যায়। তবু ওই একটি সুতো—ডাকবাংলোর সঙ্গে সভ্যতার ওই একটি যাকে বলে যোগসূত্র।

মুরারি বলল, লজ্জা করার কিছু নেই প্রিয়াংকা, তুমি পা তুলে বোসো। বাজিরাও-এর পায়ে জুতো-মোজা আছে। লতারা এবার বেড়াতে বেরুবেন। কথা হচ্ছিল নীরবতার শব্দ নিয়ে। আমি কিন্তু বিশাল মরুভূমির মধ্যে একটা লাইটহাউস, তার একদম ওপরে উঠে, তারা-ভরা আকাশের নীচে একলা দাঁড়িয়ে পৃথিবী ঘোরার শব্দ শুনেছি। খুব মৃদু কুঁ কুঁ শব্দ।

বাজিরাও এবার আর হাসল না। হতেই পারে। মুরারিদা নানা দেশে ঘুরেছে, অনেক দেখেছে। সেনাবাহিনীতে কাজ করার সময় কত রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে মুরারিদার। আজ ওর একটা চোখ নেই, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কাটা তাই এই ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার হয়েছে।

হঠাৎ কোথা থেকে একদল পাখি এসে টগর গাছটার ডালপালার মধ্যে ঢুকে ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করে দিল। এতক্ষণ ওই পাখিদের বুঝি মনে ছিল না, একসময় বাড়ি ফিরতে হবে। ঘুমোতে হবে। টোটো করে উড়ে উড়ে আড্ডা দেওয়া শেষ করতে হবে একসময়। এখন ঝুপ করে অন্ধকার নামতেই পাখিদের ছুটোপুটি—কে কোথায় শোবে। এটা আমার জায়গা, তুই ওখানে যা, ঘাড়ের ওপর পড়ছিস কেন—কিচিরমিচির ডাকের মধ্যে এসব কথাই ওরা বলছে নিশ্চয়। প্রিয়াঙ্কা ভাবে, কলকাতায় বসে এই রকম একটা নির্জন জায়গার কথা কল্পনা করা যায় না। সেখানে গায়ে গায়ে বাড়ি। থিকথিক করছে মানুষ। আর কী বিকট সব শব্দ।

রাত্রে খরগোশের মাংস দিয়ে চাপাটি খেতে খেতে প্রিয়াঙ্কা বলল, মুরারিদা, কালকে আমাদের

জঙ্গলে নিয়ে চলো। আমি কখনও জঙ্গল দেখিনি।

সে অনেক কষ্টের পথ।

ঝাল ঝাল মাংস খেয়ে বাজিরাও-এর গায়ে জোর বেড়ে গেছে। যদিও ওঁর বয়স মাত্র চোদ্দো বছর, ঠোঁটের ওপর গোঁফের রেখা এখনও তেমন ঘন হয়নি, তবু গলার স্বরে ওর আত্মবিশ্বাস জেগেছে এই কয়েক দিনের সফরে। মাথার ওপরে কোনও গার্জেন নেই, নিত্যনিষেধের বেড়ি নেই পায়ে পায়ে। কী স্বাধীন! দিদির সঙ্গে একা আছে এই ডাকবাংলোয়, কই ওর একটুও ভয় করে না তো।

বাজিরাও বলে, আমরা কষ্ট করব।

অনেকখানি পথ কাঁচা রাস্তা। গোরুর গাড়িতে চড়ে যেতে হয়। তারপর পায়ে হাঁটা তিন কোশ পথ। পারবে?

প্রিয়াঙ্কা জানতে চায়, তিন কোশ কি খুব দূর মুরারিদা?

তোমাদের হিসেবে প্রায় দশ কিলোমিটার।

মুরারি চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। প্রকাণ্ড গোল বাতির চিমনিটাব দিকে চেয়ে চেয়ে কী যেন ভাবে। দুই ভাই-বোন একসঙ্গে লক্ষ করল, মুরারিদার একমাথা সাদা চুলের নীচে লম্বা মতন মুখটা পথকষ্ট ছাড়া অন্য কোনও সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। ওর পাথরের চোখটা একটু বেশি সাদা দেখাচ্ছে।

তোমরা টুয়াটারার নাম শুনেছ? এক ধরনের রেপটাইল। এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শোনা যায়, এই সময়ে ওই জঙ্গলের কাছে টুয়াটারার কোনও প্রজাতি দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।

হিংস্র? বাজিরাও মাংস খাওয়া বন্ধ করে তাকায় মুরারির দিকে।

প্রিয়াংকা বলে, কিলোমিটার খুব বাজে হিসেব। আমরা তিন কোশ পথ হাঁটব। জঙ্গল দেখব। নদীতে চান করব। গাছ থেকে ফল পেড়ে খাব। কেউ বকবে না তো?

তোমার বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ো। বলা তো যায় না—বাজিরাও বিজ্ঞ মানুষের মতো পরামর্শ দেয়।—আর দিদি, তোর ফ্রক কি সালোয়ার-কামিজ ওখানে চলবে না। জিনস আর কেডস।

মুরারি বলে, সম্ভবত হিংস্র না। তবে ভাবী অদ্ভুত নাকি ওদেব ব্যবহার। সব সময় ছুটছে। একসঙ্গে দুশো-তিনশোটা প্রাণী... অন্ধের মতো...উদ্দেশ্যহীন...জঙ্গল থেকে জলে জল থেকে জঙ্গলে চক্কর দিচ্ছে কেবল। আমি স্বচক্ষে দেখিনি, লোকমুখে শুনেছি, ওই জায়গাটার সমস্ত জীবজন্তু, পাখি, পোকামাকড়, সরসর সরসর বুকে হাঁটার শব্দ শুনলে স্তব্ধ হয়ে যায়। কী ভীষণ না?

বেচারা। ওদের কী কষ্ট। আমি একটা টুয়াটারা ধরে এনে পুষব মুরারিদা। প্রিয়াংকা বলল।

কীভাবে ওরা তিনজন পরের দিন গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছেছিল, সে বিবরণ দিতে গেলে এ-গল্প অনেক বড় হয়ে যাবে। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ভোর পাঁচটায় ডাকবাংলো থেকে বেরিয়েছিল ওরা। নদীর ধারে যেখান থেকে জঙ্গল শুরু, নদী আর জঙ্গলের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা মাঠের মতো খোলামেলা, মাঝখানে একলা একটা তেঁতুল গাছ ছাতা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে—জনমানবশূন্য, সেই তেঁতুল গাছের নীচে পৌঁছেছিল বেলা সাড়ে এগারোটায়। আকাশ মেঘলা ছিল, তাই রক্ষে। মেয়ে হলে কী হবে, প্রিয়াংকাই ছিল চাঙ্গা। বীর বাজিরাও পথশ্রমে এত ক্লান্ত যে, তেঁতুল গাছের ছায়ায় শুয়ে ওকে একটা ছোট্ট ঘুম দিয়ে নিতে হল।

নদীটা চওড়া নয়, তবে খুব স্রোত।

প্রিয়াংকা চান করতে চেয়েছিল। মুরারি বলল, না। একবার পা হড়কে গেলে আর তোমায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

জল ছিটিয়ে-ছড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাত-মুখ ধুল প্রিয়াংকা। ওর হর্সটেল চুলের গোছা ভিজে জবজবে। তা হোক গে। সুন্দর হাওয়া বইছে। এখুনি শুকিয়ে যাবে চুল। একটু দূরে শালবন দেখা যায়। মাঝে মাঝে খেজুর আর ইউক্যালিপটাস গাছের সারি।

টিফিন খাওয়া সারা হলে ওরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল। কলকাতার ছেলেমেয়ে এরা, গাছ চেনে না, পাখি চেনে না। এখুনি কিছু একটা ঘটতে পারে, সে ধারণা ওদের নেই।

চিরুনির মতো কুচি কুচি পাতা, ভায়োলেট রঙের ফুল, ওই হল জ্যাকারান্ডা। মুরারি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়। আর ওই গাছটা চালতা। কী বড় বড় পাতা দেখেছ। তোমরা চালতার অম্বল খাও না? অর্জুন গাছের নাম শুনেছ?

এত গাছ দেখে বাজিরাও একেবারে আহ্লাদে আটখানা। ছুটে গিয়ে ও একটা প্রকাণ্ড নিম্ন গাছের ডাল ধরে উঠে পড়ে। গাছে উঠলে কি আর বসে থাকা যায়, কেবল ওপরে উঠে যেতে হয়। মগডালে উঠে ডাকে, দি-দি!

বেশ মজা হচ্ছিল, হঠাৎ বনের পাখিরা একসঙ্গে কিচমিচ করে উঠতেই মুরারি চেঁচিয়ে ওঠে, আসছে। ওই আসছে ওরা। টুয়াটারা। টুয়াটারা।

তারপর নাকি প্রিয়াংকাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল মুরারি। বলেছিল, বাজিরাও, তুমি মগডাল থেকে নামবে না। ওরা পাস করে যাক।

ওরা সত্যি পাস করে গেল।

নদীর স্রোতের ওপর দিয়ে সাঁতরে তিরবেগে এগিয়ে এল ওরা একপাল, মোটা লম্বা বেলুনের মতো দেখতে গাঢ় ব্রাউন, কেউ একটু হলুদ। বিশাল কেঁচোর মতো বুকে হেঁটে ডাঙায় উঠল একসঙ্গে, তারপর সবুজ মাঠ পার হয়ে তেমনই এঁকেবেঁকে তিরবেগে জঙ্গলে ঢুকে গেল। মুন্ডু নেই, লেজ নেই, পা নেই— এ রকম অদ্ভুত প্রাণী ছবিতেও কেউ দেখেনি। শব্দ করল না, থামল না। এল, চলে গেল। অন্তত দুশোটার একটা দল। টুয়াটারা।

সমস্ত জঙ্গল নিস্তব্ধ।

হতভম্ব ভাব কেটে গেলে প্রিয়াংকা জিজ্ঞেস করে, ওরা সব সময় শুধু দৌড়োয়, কখনও থামে না?

মুরারি বলে, না।

ঘুমোয় না?

দৌড়োতে দৌড়োতে ঘুমিয়ে নেয়। ওদের গা যে ভীষণ ঠান্ডা। ওদের চামড়া যে ভীষণ পাতলা। সব সময় চলতে থাকলে গা গরম থাকে। থামলেই মরে যাবে।

আহা রে, টুয়াটারাদের কী কষ্ট। প্রিয়াংকার চোখ ছলছল করেছিল মুরারির কথা শুনে।—আমি যে একটা পুষব ভেবেছিলাম।

প্রিয়াংকা জানত না, পথ আগলে দাঁড়ালে টুয়াটারা তার বেলুনের মতো শরীর নিয়ে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াবে। থরথর করে কাঁপবে কিছুক্ষণ। তারপর তার মুন্ডুর মতো গোল অংশটা চুপসে যাবে একটু। যেখানটায় চোখ থাকার কথা, সেখান দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে জল গড়িয়ে পড়বে। ধরতে গেলে পিছলে যাবে ওর দেহ। শরীরের নীচের দিকে গোলাকার অংশ, যেখানে পা ও পায়ের আঙুল থাকলে ভাল হত, সেখানটা হঠাৎ মচকে গিয়ে পড়ে যাবে সে। চুপচাপ গলে যাবে একটু পরে। ওর কোনও চিহ্ন থাকবে না। মাটি ভিজে যাবে এই যা।

প্রিয়াংকা জানে, জেলি ফিশ থেকে পৃথিবীতে প্রাণীর উৎপত্তি। মহাবিবর্তনের কোন ভুল নিয়মে এই প্রাণীগুলো আজও জেলি ফিশের মতো জলজল রয়ে গেছে অথচ হিংস্র জন্তু কি মানুষের মতো গতিশীল, সে-খবর ও জানবে কী করে। বড়রাই জানে না।

ডাকবাংলোয় ফেরার পথে কেউ কোনও কথা বলেনি অনেকক্ষণ। সন্ধে পড়ে গেলে পর ওরা তিনজন জনবসতির মধ্যে পৌঁছোল।

বাজিরাও বলল, মুরারিদার বন্দুকটা আমার হাতে থাকলে গাছের ওপর থেকে গুলি করতাম।

প্রিয়াংকার দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

মুরারি বলে, আজ যে অভিজ্ঞতা হল তোমাদের, এ-গল্প যেন কাউকে বোলো না। বললেও বিশ্বাস করবে না কেউ। স্বচক্ষে না দেখলে আমিই কি বিশ্বাস করতাম।

আজকেই হঠাৎ ওদের মা-বাবার জন্যে মন কেমন করল।

১৯৮৫

ছুটি

১

নাগাড়ে এক বছর কাজ করলে একমাস ছুটি পাওনা হয়। ছুটিটা দরকার। মাসকাবারে মাইনে যেমন দরকার, তেমনই, কি তার চেয়েও বেশি। শরীরের বিশ্রাম, মনের বিশ্রাম, সংসার বলে একটা ব্যাপার তৈরি করা হয়েছিল, সেদিকে একটু মনোযোগ। সব মিলিয়ে, নিজে দিকে ফিরে তাকানো।

প্রয়োজনটা বীরেশ্বরের যত, অন্য অনেকের তত নয়। ডাক্তার, মাস্টার, উকিল, ব্যারিস্টার, সরকারি কর্মচারী—যারা এগারোটা বারোটায় কাজে বেরোয়, তিনটে-চারটের সময় বাড়ি ফিরে আসে, তাদের তো রোজই হাফ ছুটি। বছরে তিনমাস স্কুল-কলেজ কোর্ট-কাছারি বন্ধ। তা ছাড়া যে-কোনও অজুহাতে কামাই।

পরীক্ষা দিয়ে বা কোনওক্রমে ধরেকরে একটা কাজ জুটিয়ে নিলাম, ব্যস, এক জীবনেব মতো নিশ্চিন্ত, সিনিয়রিটি আমার দেখবে,—এই মনোভাব বীরেশ্বর সমর্থন করেনি কোনওদিন। দেখছে, এল আই সি-তে নিজের ছোট ভাই, মহাকরণে ভগিনীপতি, পৌরদপ্তরে শালাবাবু—গেলেও হয়, না গেলেও হয়, কাজেব প্রতি এদের কোনও আঠা নেই। অবশ্য এদের কেউই খুব দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করে না। প্রাইভেট সেক্টরে একটা ডিপার্টমেন্ট চালাতে হয় না এদের কাউকে। তাই এদের দেখতে পাবে সর্বত্র। ভাইফোঁটার দিন দুপুরে আছে, খুড়তুতো পিসেমশাই মারা গেলেন বিকেল চারটেয়—আছে, মোহনবাগান ম্যাচ খেলছে শনিবার, ইস্টবেঙ্গল বুধবার—দুটোতেই আছে। এমন কী চাকরি কবো বীরুদা, যে চোখ তুলে তাকাবার সময় পাও না? ওরা বলে।

তাই।

পর পর দু'বছর পচিয়ে এবারে পুজোর আগে পুরো একমাসের ছুটি নিল বীরেশ্বর। যাকে বলে ছিনিয়ে নেওয়া, প্রায় তাই। এম. ডি. থেকে শুরু করে নিজের পি.এ. অবধি সকলের এক চিন্তা: আপনার অনুপস্থিতিতে, দেখবেন কিছু আপসেট যেন না হয়।

জুনিয়র কলিগ বটুক সোম চশমার পুরু কাচ মুছতে মুছতে বলল, টেনশন থেকে রিলিফ খুব দরকাব ছিল আপনার। তা ছুটিতে কোথায় যাচ্ছেন? দেরাদুন? না গোয়া?

ইচ্ছে করছে, কোথাও না গিয়ে একমাস শুধু ঘুমোব।

ওই কাজটা করবেন না স্যার। চোখ দুটো কুঁচকে সোম বোঝাতে চায়—বাড়ি থেকে ডেকে আনবে, টেলিফোন করবে, কাগজ পাঠাবে সই করার জন্যে। আপনি কলকাতা থেকে পালান, একেবারে গা-ঢাকা দেওয়া যাকে বলে।

হাসল বীরেশ্বর। মাথা-ভরতি কাঁচাপাকা চুলের নীচে, মোটা কাঁচা-পাকা গোঁফের আড়ালে ওকে প্রসন্ন দেখাল।

সোম ছেলেটা ভাল। ওরই রিক্রুট। কাজ জানে, বুদ্ধিমান, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব। সুযোগ পেলে বীরেশ্বরকে একটু খোশামোদ করে, মৃদুভাবে, যাতে খুশি না হয়ে পারা যায় না।

ট্র্যাভেল করে করে আমি টায়ার্ড। তাই খুব দূরে যাবার কথা ওঠে না। কাশ্মীর, গোয়া, তিরুপতি—এসব অল্পবয়সে সেরে ফেলেছি।

বটুক সোম পরামর্শ দেয়: তা হলে এক কাজ করুন। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। রাঁচি নেতারহাট এরিয়ায় সুন্দর সুন্দর ফরেস্ট বাংলো আছে, পাহাড় প্রকৃতি—আপনার কোলস্টেরল নেমে যাবে। আশ্বাস দেয়: আপিসের কথা ভাববেন না, আমরা মিলেমিশে ম্যানেজ করে নেব। দেখতে দেখতে কেটে যাবে একটা মাস। যা পারব না, রেখে দেব আপনার জন্যে।

প্রস্তাবটা মনে ধরেছে বীরেশ্বরের। বউ-ছেলেকে নিয়ে লং ড্রাইভে কতদিন যায়নি। এই সেদিন জন্মদিনে রাজুকে ক্যামেরা দেওয়া হল, তুলুক, কত ছবি তুলতে চায় তুলুক। পুজোর পরে পরীক্ষা, পাপিয়া গজগজ করতে পারে। ক'টা দিন ঘুরে বেড়িয়ে এলে এমন কী ক্ষতি হবে? এখন একবার বেরিয়ে না পড়লে, পরে কবে সময় হবে কেউ জানে না।

ছুটির প্রথম দিন, সোমবার। বীরেশ্বরের অভ্যেস ছ'টায় ওঠা। প্রাতর্ভ্রমণ সাতটা অবদি। টিভলি কোর্ট থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল অ্যান্ড ব্যাক। একঘন্টা চা ও কাগজ। তারপর স্নান, ব্রেকফাস্ট—আটটা পঁয়তাল্লিশে রওনা। ভেবেছিল, সব রুটিন ভেস্তে গিয়ে আজ আটটা অবধি ঘুমোবে। ঘুম ভাঙল পাঁচটায়। তখন সবে কাকেদের ওড়াউড়ি শুরু হয়েছে। মিলিটারি ব্যারাকের কাছে অন্যান্য পাখিদের কিচিরমিচির অশান্ত হয়ে উঠছে ক্রমশ। পাঁচতলার বারান্দা থেকে দেখছিল বীরেশ্বর আর ভাবছিল, এই তো, শুরু হয়ে গেছে ওদের কাজ, আমার ছুটি।

এক কাপ চা খেয়ে হাঁটতে বেরোয়। তাড়া তো নেই, লোকে বলে, এই অঞ্চলে নানা প্রকার গাছ আছে রাস্তার দু'পাশে, নানা প্রকার ফুল। বীরেশ্বর কোনও গাছ চেনে না, পাতা চেনে না। সব ফুলই ওর কাছে ফুল, তাই সুন্দর। পাপিয়ার দুঃখ, স্বামীর অন্তরে সে শিল্পচেতনা জাগাতে পারেনি। প্রকৃতির কাজের মধ্যে কত রহস্য, কত নিপুণতা, সে বিষয়ে কৌতূহলী করতে পারেনি। মানুষের কাজের মধ্যে আবদ্ধ বীরেশ্বর, যেখানে সুন্দর মানে এফিশিয়েন্ট, ফুল বলতে বোঝায় প্রফিট।

তাতে ক্ষতি কী হয়েছে? পাপিয়াকে শুনতে হয়। কাজের লোক দুনিয়ায় খুব বেশি নেই। তাই কাজের লোকের এত কদর।

কথাটা মিথ্যে নয়। কাজ দেখিয়ে, স্রেফ কর্মক্ষমতা দিয়ে বীরেশ্বর নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছে, তাই না ফোর্বেস কোম্পানি এত খরচ করে ওকে পুষছে। এই প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট, ফার্নিচার, ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনার, বছর বছর নতুন পরদা। গাড়ি, ড্রাইভার, অসুখবিসুখ হলে চিকিৎসার সমস্ত খরচ—তার ওপর মোটা মাইনে,—বীরেশ্বরের মুখ দেখে কি?

রুটিন-ছাড়া ব্রেকফাস্ট তৈরির কাজ চলছে কিচেনে। পাপিয়া আজ স্বামীকে লুচি-আলুর দম খাওয়াবে। এমন সময় টেলিফোন বাজল।

পাপিয়া ঘড়ি দেখল, সাড়ে ন'টা। খেয়াল হল, বীরেশ্বর সেই সকালে কেডস পরে বেরিয়েছে, ফেরেনি এখনও। গেল কোথায় মানুষটা?

টেলিফোনে আপিসের অপারেটরের গলা। মিস্টার ঘোষ আছেন?

না, বেরিয়েছেন একটু।

কখন ফিরবেন?

কী করে বলব? উনি তো ছুটিতে।

জানি। অপারেটর বলল, ফিরলে একবার আপিসে টেলিফোন করতে বলবেন দয়া করে। বিশেষ দরকার।

পাপিয়া রাগ করে টেলিফোন রাখল। রাজু পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কে মা?

কে আবার। বাবার আপিস থেকে ফোন। বিশেষ দরকার। আজকে, ছুটির প্রথম দিনেই এই, তো একটা মাস ওদের চলবে কী করে।

ছোট হলেও রাজু মাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, সিরিয়াস কিছু ঘটেছে নিশ্চয়।

পাপিয়া রেগে যায় হঠাৎ।

ঘটেছে তো ঘটেছে। আর যারা আছে তারা ব্যবস্থা করুক। তোমার বাবা কি ম্যাজিশিয়ান?

পনেরো মিনিট পরে আবার টেলিফোন।

মিস্টার ঘোষ এখনও ফেরেননি?

না।

ফিরলেই যেন একবার টেলিফোন করেন। এম. ডি. কথা বলবেন।

ঠিক আছে। পাপিয়া গম্ভীরভাবে জবাব দেয়।

দশটা নাগাদ বীরেশ্বর বাড়ি ফিরল। হাতে একটা থলি, তার মধ্যে ইলিশ মাছ আর কচুর শাক।

এত দেরি দেখে ভাবছিলাম, ভুলে আপিসে চলে গেছ বুঝি।

বীরেশ্বর ঘামছিল। বলল, হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে গেছি, ভাবলাম, একটু বাজার করে নিয়ে যাই। কতদিন বাজারে যাই না। তারপর ফিরছিলাম, দেখি দলে দলে লোকে আপিস যাচ্ছে। বাসে ট্রামে

মিনিবাসে গাদাগাদি করে, ঝুলতে ঝুলতে। আবার, গাড়ির পেছনের সিটে একা হাত ছড়িয়ে চলেছে কেউ। একমুখো। আমার তো ছুটি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের স্টুপিড মুখগুলি দেখছিলাম। বেশ মজা লাগছিল, জানো।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে রাজু বাবাকে জানিয়ে যায়, আপিস থেকে টেলিফোন এসেছিল।

একটু জিরোতে দাও, এখুনি না জানালে হত না? পাপিয়া রাগ করে ছেলের ওপর। কোনও কাণ্ডজ্ঞান যদি তাকে তোমার।

বীরেশ্বর জানতে চায় কী ব্যাপার?

ফোন করতে বলেছে। এম. ডি। হয়ে গেল তোমার ছুটি।

বীরেশ্বর হতাশ ভাবে বলে, জানতাম।

তবে এত প্রোগ্রাম করলে কেন? গাড়ি সারাই করতে পাঠালে কেন? যদি সবই জানতে তবে কেন হুজুগ তুলে আমাদের খ্যাপালে?

বীরেশ্বর আপিসে টেলিফোন করে। জানিয়ে দেয়, কাল ও রওনা হচ্ছে কলকাতার বাইরে সপরিবারে। না, কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা ওর থাকবে না, ঘুবে বেড়াবে যেখানে খুশি। ছুটি শেষ হলে দেখা হবে আবার।

ওপার থেকে এম. ডি. শুভেচ্ছা জানাল।

৩

ভ্রমণকাহিনী আমরা অনেক শুনেছি। ভ্রমণও কিছু কম করিনি। ছোটদের মুখে ভ্রমণকাহিনী শোনার স্বাদ অন্য রকম। ছোটদের চোখে যে কল্পনার রং থাকে, উত্তেজনা থাকে, বড়দের চোখে তা থাকে না। তাই এই অংশটা আমরা বাজুর মুখে শুনব। বর্ণনা একটু এলোমেলো হলে ক্ষতি নেই।

খুব ভোরে চানটান করে আমরা বেরোলাম। রাস্তায় কোথায় কী পাওয়া যাবে কে জানে, তাই খাবাব জল, স্যান্ডুইচ সঙ্গে আছে। আপেল আছে, চুইংগাম আছে। অনিলদা গাড়ি চালাচ্ছে, পাশে আমি, লোডেড ক্যামেরা। ড্যাশবোর্ডে বড় টর্চ, পায়ের কাছে ছাতা। আমরা ফরেস্টের দিকে যাচ্ছি, বলা তো যায় না, কখন কোন দিক থেকে হিংস্র জন্তু বা দস্যু এসে পড়ে। একটা বন্দুকের কথা বাবাকে বলেছিলাম, বাবা নিল না। বলল, বন্দুক থাকলেই বিপদ বেশি। আমবা তো বেড়াতে যাচ্ছি, শিকার করতে তো যাচ্ছি না। যেখানেই যাই, দিনে দিনে পৌঁছোবার চেষ্টা করব। গাড়ি চলছে, চলছে। খড়্গপুর পার হয়ে গেল। বাবা পেছনের সিটে বসে রোড ম্যাপ দেখছে, মায়ের সঙ্গে আলোচনা কবছে। আমি কিছু শুনছি না, দু'পাশে ধানের খেত, গোরু, ছাগল, গরিবদের ছোট ছোট বাড়ি দেখছি আর অপেক্ষা কবে আছি, গভীর জঙ্গলে কখন ঢুকব।

বাবা হঠাৎ বলে উঠল, অনিল গাড়ি থামাও, রাজু পেছনে এসো।

ভালই হল। আমার গায়ে বিকেলের রোদ পড়ছিল।

গাড়ি চালাতে চালাতে বাবা বলল, বাঁ দিকে ঘুরছি, আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে ফাইভে পড়লাম। এন-এইচ ফাইভও এ-যাত্রায় আমাদের সঙ্গী। মনে বাখবে সবাই। অন্য কোনও রাস্তায় ঢুকে পড়লেও ফের ফিরে এসে এন এইচ ফাইভ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফরেস্ট?

বাবা বলল, সমুদ্র।

মা পেছন থেকে যোগ দিল, মাদার অ্যান্ড লাভার অফ মেন, দি সি।

তারপর কুড়ি দিন ধরে, তিন জায়গা থেকে আমরা সমুদ্র দেখলাম ঘুরে ঘুরে।

প্রথমে চাঁদিপুর। ছোট বিচ, ছোট বাংলো। অল্প লোকজন। মনে হয়, যেন জাহাজডুবি হয়ে কয়েকজন লোক ভাসতে ভাসতে একসময় এখানে পৌঁছেছিল। তারপর আর কোথাও যায়নি। এখানেই থেকে গেছে।

পুরীর সমুদ্র কিন্তু একেবারে অন্য রকম। অনেক লোকজন তাকে ঘিরে থাকে, তার পাশে ঘুরঘুর করে, তাকে উপভোগ করে। কী প্রকাণ্ড ঢেউ, কোঁকড়ানো ফেনা মুকুটের মতো।

যে-ক'দিন ছিলাম, আমরা খুব স্নান করেছি, সমুদ্রের ঝিনুক কুড়িয়েছি। করকরে বালির ওপর শুয়ে

থেকেছি, গড়াগড়ি দিয়েছি। আমি আর বাবা নুলিয়ার হাত ধরে সমুদ্রে ডুব দিতাম, বালির ওপর বিকেলবেলা দৌড়োতাম। মা সমুদ্রের জলে পা ধুত অনেকক্ষণ ধরে, জলে নামত না। ভয়। নিজের মনে গান গাইত, সে-গান আমরা শুনতে পেতাম না। সমুদ্রের শব্দে কি শোনা যায়। হোটেলের ঘর থেকে সেই গর্জন শোনা যেত সারা রাত। মা বলত, দীর্ঘশ্বাস। আমার ঘুম আসত না। ভাবতাম, সমুদ্রের কি প্রাণ আছে যে কষ্ট পাবে, দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। পুরীতে বিশাল জগন্নাথের মন্দির আছে, হাত-কাটা তিনটে কাঠের ঠাকুর। ইয়া বড় বড় চোখ। মা বলে, ওই চোখ দিয়ে সব দেখছেন। যা তুমি মনের মধ্যে ভাবছ, গোপন রেখেছ, তা-ও ঠাকুর টের পান।

আমাদের হোটেলে এক বাঙালি কাপল থাকত একটা ঘরে। ওরাও কলকাতা থেকে এসেছে। হনিমুন করতে। কারুর সঙ্গে মিশত না, কথা বলত না। দুপুরে মা-বাবা যখন ঘুমোত, আমি বেরিয়ে গিয়ে ওয়েটার, বাবুর্চি, মালি আর গেস্টদের সঙ্গে আলাপ করতাম। কী করব, দুপুরে যে আমার ঘুম আসে না। ওরা আমায় চিকলেট দিত প্রায়ই। আর ভদ্রমহিলা আমাকে দেখিয়ে ভদ্রলোককে বলত, বলে দিই। তোমার কীর্তিকাহিনী স-ব ফাঁস করে দিই?

ভদ্রলোক বলত, এ্যাই টুসু, খবরদার!

তারপর দু'জনেই খুব হাসত। জিজ্ঞেস করত, আজ কটা ফিশফ্রাই খেলে বন্ধু?

কী জানি কেন, আমার মনে হত, ওরা কলকাতা থেকে পালিয়ে গেছে। লুকিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে আছে পুরীর হোটেলে। একদিন পুলিশ এসে ওদের ধরে নিয়ে যাবে। এই রকম মনে হত, আমার প্রায়ই।

পুরীর পুলিশরা কিন্তু খুব রোগা। আর পান খায়।

গোপালপুরের সমুদ্র আর হোটেল দেখে বাবা বলল, এ তো বিলেত।

বিরাট লন। তিনদিকে সারি সারি ঘর। সিঁড়ি বেয়ে নেমে নেমে যেতে হয় বিচে। খুব শান্ত। ঝাউ গাছ নারকেল গাছে ঘেরা। সব সময় হাওয়া বইছে, কিন্তু পুরীর মতন হু হু করে নয়। পরিচ্ছন্ন গোপালপুরের একটা সাহেবি ঠাট আছে। বাবার খুব পছন্দ হয়েছে জায়গাটা। আমি কিন্তু একা পড়ে গেলাম। তার ফলে, ডেভিড কপারফিল্ড বইটা ছ'দিন পড়ে শেষ করলাম। হয়তো ডেভিড কপারফিল্ডের জন্যে গোপালপুর, সি-বিচ, হোটেলের বারান্দা, লন, লনের ওপর ছড়ানো-ছিটানো সাদা পেন্ট করা বসার জায়গা—এই সব আমার চিরদিন মনে থাকবে।

ছুটি-সমুদ্র-ছুটি-সমুদ্র করে শেষমেষ আমরা এন-এইচ-ফাইভই ধরলাম, সে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিল।

৪

যেন এতগুলো দিন স্বপ্নে কিংবা নেশার ঘোরে ছিল। কলকাতায় ফিরে এসে দিন দুয়েকের মধ্যে বীরেশ্বরের চটকা ভেঙে গেছে। শরীর থেকে সমুদ্রের নুন, চোখ থেকে নীল ও সবুজ মাখামাখি সমুদ্রের বিশাল বিস্তার সে ধুয়ে ফেলে। আয়ত্তের বাইরে অবস্থিত সম্পূর্ণ জাগ্রত এক মহাবিশ্ব ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। হঠাৎ মাটিতে পা ঠেকতে ও চমকে গেছে। ফোর্বেস কোম্পানিতে বীরেশ্বরের একটা দায়িত্বপূর্ণ পদ আছে। সেখানে অনেক কাজ, অনেক ব্যস্ততা, প্রচণ্ড টেনশন। বিচিত্র সব ব্যবসায়িক সমস্যার মোকাবিলা করার মতো যোগ্য লোক সেখানে বেশি নেই। প্রায় একমাস সে অনুপস্থিত, একবার খোঁজ নেয়নি অবধি, কাজকর্ম কী রকম চলছে।

পাপিয়া বাধ সাধল।

ঢের কাজ করেছ জীবনে। অনিয়ম আর অতি পরিশ্রমের ফলে তোমার শরীরে রোগ ঢুকেছে। একটুতে হাঁপিয়ে যাও। কথায় কথায় রাগ করো।

বীরেশ্বর বিনত হয়ে বলে, একটা ফোন করি অন্তত—

না। যে ক'দিন পুরো ছুটি না ফুরোয়, চুপ করে বাড়িতে বসে থাকো। কাউকে জানিয়ো না, তুমি ফিরে এসেছ।

তা কি হয়। বীরেশ্বর ম্লান হাসে। ভুলচুক কিছু হলে আমাকেই তো পরে সামলাতে হবে।

যখন হবে, তখন হবে। এখন তুমি ফোর্বেসের কেউ নও। এখন তোমার কাজ আমাকে কম্পানি দেওয়া। তোমার ছুটিতে আমারও অধিকার আছে.ভুলে যেয়ো না।

আপিস যাওয়া ছাড়া আর সব কাজে বীরেশ্বর আগের রুটিনে ফিরে গেল। অনুভব করল, ছকের মধ্যে থাকায় এক ধরনের শান্তি আছে। সময় কেটে যায় চমৎকার। এখন কিন্তু আপিসের নির্ধারিত সময় সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা—এই দশটা ঘণ্টা কিছু না করে কাটাতে চাইছে না। ঘুমোবার চেষ্টা করলে পেটে কষ্ট হয়। আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি যাওয়া-আসা অপ্রচল, এখন আর নতুন করে সূত্রপাত করার মানে হয় না। এতখানি সময় প্রতিদিন, কী করবে বুঝে পায় না।

নিজে না জানালেও, ড্রাইভার ফিরে এসেছে, গাড়ি গেছে সার্ভিসিংয়ে, এইসব ব্যাপার থেকে আপিসের লোকেদের টের পাওয়া উচিত, মিস্টার বীরেশ্বর ঘোষ, কমার্শিয়াল ম্যানেজার ইজ ব্যাক ইন টাউন। কী করছেন, কেমন আছেন, খোঁজ করা উচিত, খেয়াল নেই। ক্যালাস!

নিজের স্ত্রী পাপিয়াকে আর কতক্ষণ কম্পানি দেওয়া যায়। বীরেশ্বর হাঁপিয়ে ওঠে বাড়িতে। এটাও একটা অভ্যেসেব ব্যাপার। এতকাল সে কাজে ডুবে রইল আর সংসার সামলাল পাপিয়া? এখন কি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে মানায়? না ঠিকঠাক সাহায্য করতে পারবে বীরেশ্বর? বরং ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। করছে তো। নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে গিয়ে পাপিয়ার এলাকায় ঢিল পড়ছে।

এর চেয়ে কাগজ পড়া, বই পড়া ঢের ভাল। সারা সকাল বীরেশ্বর পড়াশুনা করছে বসার ঘরে। আর কাউন্ট-ডাউন করছে, আর পাঁচ দিন। আব চার দিন। টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে দেখছে বার বার, এই বুঝি বেজে উঠল: হ্যালো। মিস্টার ঘোষ? কথা বলছি। গুড মর্নিং। কী ব্যাপার? না, বাজল না। টেলিফোনটা ডেড নাকি। রিসিভার তুলে দেখে—ডায়াল টোন তো আছে। কল যে আসে না তা নয়। পাপিয়ার দিদি ফোন করে প্রায়ই। রাজুর বন্ধু ফোন করে। শালাবাবু ফোন করে খবরাখবর নেয়।

তবে কি এম. ডি অসন্তুষ্ট হয়েছে? জোর করে ছুটিতে যাওয়া কি উচিত হয়নি। এই ব্যাপারটা বীরেশ্বরকে নতুন করে ভাবায়। শেষ দিনের ফোনে কথাবার্তা কি রূঢ় হয়েছিল বীরেশ্বরের দিক থেকে? তা তো নয়। বেশ প্রসন্নভাবে সকলে ওকে ছুটিতে যেতে বলেছিল। কী ওপরওয়ালা, কী সমকক্ষ, কী অধস্তন—সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে, মিস্টার ঘোষের ছুটি নেওয়া খুব দরকার। না হলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন। কাজ করতে করতে দুম করে হার্টফেল করে মরে গেলাম, ঠিক আছে। কিন্তু ক্রিপলড হয়ে থাকলে? পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষকে কে দেখবে?

এম. ডি বয়সে ছোট। লোক ভাল। বীরেশ্বরকে শ্রদ্ধা করে। জানে, উনি অভিজ্ঞ, পুরনো লোক। কোম্পানির অভিসন্ধি সব তাঁর নখদর্পণে। স্টাফদের প্রত্যেককে অন্তরঙ্গভাবে চেনেন। এই বেয়াদবির যুগে, এখনও, মিস্টার ঘোষ 'বেশি বকবক কোরো না, চুপ করো' বললে ওরা কথা বাড়ায় না। অন্তত তখনকার মতো। এম. ডি. নিজেও তো একবার রিং করে খোঁজ নিতে পারত। কাজে-অকাজে হুটহুট করে ফোন তো করে বাড়িতে। চলেও এসেছে কতদিন রাত্তিরে, ছুটির দিনের দুপুরে। এই ফ্ল্যাটে, ওই সোফায় বসে বিয়ার খেয়ে গেছে, ঝাল ঝাল পাঁপড়ভাজা খেয়ে গেছে, বহুবার। হঠাৎ লোকটা কি বদলে যাবে? বিশ্বাস হয় না বীরেশ্বরের। আবার অবিশ্বাসও হয় না: টাকাপয়সার জগত বড় নিষ্ঠুর, বড় হৃদয়হীন, অকৃতজ্ঞ।

নিয়মিত সুট পরে না বীরেশ্বর, আজ পরল। ছুটির পর প্রথম দিন। আপিসটা কেমন যেন অচেনা লাগছে। অচেনা ঠিক নয়, অল্প চেনা। গট গট করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। দরজায় ওই তো নিজের নেমপ্লেট, চকচক করছে। টেবিল-চেয়ার পরিষ্কার করে ঝাড়া। সবুজ রঙের কার্পেটটা বোধহয় শ্যাম্পু করা হয়েছে ছুটির মধ্যে। কোণের দিকে বইয়ের র‍্যাকটা যেমন ছিল তেমনই, দু'-একটা আইনের বই যুক্ত হয়েছে বোধহয়। মলাটগুলি নতুন লাগছে।

কোটটা হ্যাঙারে ঝুলিয়ে, নিজের জায়গায় বসল। বোতাম টিপে বেল বাজাল। বেয়ারা আসতে ঠান্ডা জল চাইল। আগের মতো সালাম করল বেয়ারা, কিন্তু ছুটির কথা কিছু বলল না।

পি. এ.-কে ডেকে পাঠাল বীরেশ্বর। বেয়ারা এসে জানাল, গুপ্তবাবু সোমসাহেবের নোট নিচ্ছে। হয়ে গেলেই আসবে। বীরেশ্বর চুপচাপ বসে টেবিলের কাচে নিজের মুখ দেখতে লাগল। খুব কি বয়স্ক দেখাচ্ছে? এখনও চার বছর বাকি আছে। তারপর অবসর নেবার কথা। এই চার বছর সময়ে বীরেশ্বর একজন যোগ্য ব্যক্তিকে শিখিয়ে পড়িয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেতে চায়।

টেবিলের ওপর একটিও কাজের কাগজ নেই। ড্রয়ার খুলল বীরেশ্বর, কয়েকটা পত্রিকা, চেম্বার অফ

কমার্সের সার্কুলার। বন্ধ করে দিল ড্রয়ার। ঘরটা কেমন ফাঁকা লাগছে।

একটু পরে গুপ্তর সঙ্গে বটুক সোমও ঘরে ঢুকল। গুড মর্নিং স্যার, ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়র্ক। ছুটি কেমন কাটল?

ভাল। বীরেশ্বরের সংক্ষিপ্ত জবাব।

শরীর ভাল আছে তো?

শরীর তো আমার ভালই আছে বরাবর, একটু হাইপারটেনশন এই বয়সে, আমার মতো পজিশনে থাকলে হবেই।

সোম আবার বলে, তবু আপনাকে বেশ ফ্রেশ দেখাচ্ছে, যাই বলুন।

প্রসঙ্গ বদলে বীরেশ্বর জানতে চায়: কাজের খবর কী? সব ঠিকঠাক আছে তো?

ও ইয়েস।

লিটিগেশনের একটা ডেট ছিল সিটি সিভিল কোর্টে।

অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করে আমাদের পয়েন্টস বুঝিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। তবে ও পক্ষ আবার সময় নিয়েছে।

ব্যাঙ্গালোব থেকে একটা ডেলিগেশন আসার কথা ছিল।

এসেছিল দু'জন। এম. ডি-র সঙ্গে মিটিং হয়েছে। আমিও ছিলাম। একদিন লাঞ্চে বলা হয়েছিল। আগামী সপ্তাহে ওদের অফার আসবে, মনে হয়।

বীরেশ্বব চুপ করে বইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, জানুয়ারি মাস থেকে স্টাফেদের বার্ষিক মাইনে বাড়ার প্রোগ্রাম। কারুর কারুর প্রমোশন হবে। প্রত্যেকটা পার্সোনাল ফাইল ধরে রিভিউ করতে হবে। সময় তো অল্প।

সোম হাসতে হাসতে বলল, কাজ এগিয়ে রেখেছি। এমনকী পারফরমেন্স রিভিউ অবধি হয়ে গেছে। এম. ডি. আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

র' মেটিরিয়াল সাপ্লাই ঠিক শেডিউল মতো হচ্ছে? ব্যাঙ্ক গোলমাল করেনি?

কবেছিল একটু। আমি বুঝিয়েসুঝিয়ে ঠান্ডা করে দিয়ে এসেছি। আপনি ফিরলে দেখা করতে বলেছেন ম্যানেজার।

গোলমালটা কীসের?

মার্জিন নেই।

কোনদিন ছিল? বললেন না কেন, বেশি চাপ দেওয়ার চেষ্টা করলে আমরা অন্য ব্যাঙ্কে চলে যাব।

মোটা কাচের আড়ালে সোমের ছোট ছোট চোখ লজ্জিত হল যেন। মুখ নিচু করে বলল, সে-কথা আপনি বলবেন স্যার। আমার মুখে মানায় না।

খুশি হয় বীরেশ্বর। গুপ্তকে বলে চিঠি লেখো—দি চিফ ম্যানেজার—

বটুক সোম ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। গুপ্ত মন দিয়ে বীরেশ্বরের নোট নিচ্ছে। এমন সময় টেলিফোন বাজল। এম. ডি.।

গুড মর্নিং ঘোষ। ...দিস মর্নিং। ...ও ওয়েল, সো সো।

এম. ডি.: আপনার সঙ্গে একটু বসা দরকার মিস্টার ঘোষ।

বীরেশ্বর: অনেক পেন্ডিং কাজ জমে আছে। একটু ক্লিয়ার করে নিই? সকালটা বাদ দিয়ে যদি লাঞ্চের পর আসি। অসুবিধে হবে?

এম. ডি: ঠিক আছে। লাঞ্চের পরেই আমরা বসব।

টেলিফোন নামিয়ে রাখে বীরেশ্বর। ব্যাঙ্কের চিঠিটা ডিকটেশন দেওয়া শেষ হলে ঘরের মধ্যে একা বসে বসে পা নাচাতে থাকে।

ফন্দি আঁটতে থাকে, আবার কীভাবে নিজের টেবিলের ওপর কাজের পাহাড় জমিয়ে তোলা যায়। কমার্শিয়াল ম্যানেজার বীরেশ্বর ঘোষকে অপরিহার্য প্রমাণ করা যায় কী কী উপায়ে।

ওর পি. এ. গুপ্ত এখনও জানে না, আজ কারও নামে চার্জশিট বেরোবে। কিংবা খরচ কমাবার সার্কুলার। হইচই বেধে যাবে আপিসে। মিস্টার ঘোষ ফিরে এসেছেন, এখন আর চালাকি চলবে না।

১৯৮১

না, এ ব্যাপার নিয়ে রাখালবাবুর কোনও অপরাধবোধ নেই। আপনি যদি নৈতিক প্রশ্ন তোলেন, সে বলবে, হ্যাঁ, বাড়িটা আমার পৈতৃক। ঠিক কথা; আর, বুড়োহাবড়া গলগ্রহ—তাও আমার কেউ নেই; নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, আমি একটু শান্তিতে থাকতে চাই, রবিবার দুপুরে এই দু'-তিন ঘণ্টা সময় আমি পরিবার নিয়ে থাকার মতো থাকি, তাতেই আমার আশ মিটে যায়। শরীরকে উপোসী রাখব কেন, সে বলবে,—আবার মেয়েমানুষের ইচ্ছে পেলে খ্যাপা কুকুরের মতো রাস্তায় ঘাটে বেপাড়ায় ঘুরঘুর করতে আমার রুচিতে বাধে। এই ব্যবস্থাই ভাল।

প্রশ্ন করলে হয়তো এইসব কথা সে বলবে। কিন্তু প্রশ্ন কেউ করেনি ওকে। লেক রোডের এই অঞ্চলটায় একটু যেন আঠাছাড়া ভাব। পাঞ্জাবি, মাদ্রাজি, মারোয়াড়ি—নানান জাতের বাসিন্দা, তার মধ্যে ছড়ানো ছিটোনো বাঙালিরা—সুতরাং জায়গাটা ঠিক পাড়া হয়ে উঠতে পারেনি। দানা বাঁধতে পারেনি আর কী। পাড়ার মধ্যে একটা মনিহারি দোকান এই রাখাল স্টোর্স, ফাই ফরমাশ খাটে যারা, তারা চেনে। হেঁটে বা রিকশায় চড়ে যেতে যেতে উটকো লোকেদেরও নজর পড়ে যায় সারবন্দি লজেন্স, বিস্কুট আর চিকলেট-ভরতি বয়ামের ওপাশে, একটি গোলপানা হাসি হাসি মুখ, চোখে চশমা, কালো ফ্রেম, কপালের ওপরে দুটো টাকের গলি। তার পেছনে ডাঁই করা বেবিফুডের টিন, গুঁড়ো সাবান বা শরীর খারাপের বাকস। এই পর্যন্ত।

ভিন্ন পরিবেশে, অর্থাৎ গাছের তলায় বা ট্রাম স্টপে রাখালবাবুকে দাঁড় করিয়ে দিলে হয়তো পাড়ার লোকেরাই ঠিক চিনে উঠতে পারবে না ঠিক কোথায় দেখেছে ওকে। সুতরাং তার ব্যক্তিগত জীবন, আচরণ ও অভ্যেসগুলি আর কারও লক্ষ করার কথা ওঠে না। বিশেষত, যখন সে বাস্তবিক শান্তিপ্রিয় মানুষ।

আয়না ঘুমোচ্ছিল। বাখালবাবু চোখ বুজে পড়েছিল অনেকক্ষণ। এক-একবার তাকিয়ে দেখছিল আয়নার ঘুমন্ত মুখটা, ওর উঁচু চোয়াল, ট্রিম-করা ভুরু, একটু বড় মুখের প্রসার। ভাবছিল, ওর পুষ্ট স্বাস্থ্যকে স্প্রিংয়ের মতো শরীরেব সঙ্গে মিলিয়ে মুখটা যদি আর একটু সুশ্রী হত, রংটা যদি আর একটু ফরসা হত, তবে আয়নাও এতদিন পড়ে থাকত না। কেউ বিয়ে করে নিত ওকে। আবার ভাবছিল, ভাগ্যিস হয়নি।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজছে দেখে আয়নার কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিল রাখালবাবু। বলল, "এই ওঠো, তোমার যাবার সময় হয়েছে।"

ধড়মড় করে উঠে বসল আয়না। মুখে লজ্জাভাব। অপরের বিছানার আরাম উপভোগ করছিল বলে লজ্জা। একটুক্ষণ। তারপর হাই তুলল শব্দ করে। আলনার কাছে এগিয়ে গেল।

জানলা দুটো বন্ধ, তাই ঘরটার মধ্যে আলো কম। রাখালবাবু সুইচ টিপে আলো জ্বালল, তারপর দরজাটা একটু ফাঁক করে খুলে বেরিয়ে গেল বাকস-মাপের বারান্দাটায়। দু' ভাঁজ করে পরা ধুতি, গায়ে গেঞ্জি, রেলিংয়ে ভর দিয়ে বিকেল পাঁচটার রাস্তা দেখতে লাগল। একটা আইসক্রিমওলা হেঁকে যাচ্ছে চিৎকার করে। ওদিক থেকে আসছে ধবধবে সাদা টুপি-পরা হিন্দুস্থানি চানাচুর গরম।

ছোঁড়াটাকে ডেকে চা করতে বললে হয়, একবার মনে হল রাখালবাবুর। তারপর ভাবল, মেয়েটা চলে যাক।

ভেতরে যে চুল বাঁধছে, সাজগোজ করছে, তার আসল নাম আয়না নয়।.শিপ্রা। রাখালবাবু আয়না বলে ডাকে। আজ দু' বছর ধরে ডাকছে। এর যদি বিয়ে হয়ে যায় বা অন্য রকম কাজ পেয়ে এ যদি আসা ছেড়ে দেয়, তা হলে রাখালবাবু আবার যার সঙ্গে ব্যবস্থা করবে, তাকেও আয়না বলে ডাকবে। কারণ এই বিকল্প ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত আজ থেকে দশ-বারো বছর আগে যাকে দিয়ে হয়েছিল, তাব নাম ছিল আয়না। সে-মেয়েটা লেখাপড়া জানত না। মানুষ বদলে বদলে গেলেও রাখালবাবু এই দীর্ঘ দশ-বারো বছর আয়না নামের মেয়ের সঙ্গেই মেলামেশা করছে। সপ্তাহে একদিন, দু'-তিন ঘণ্টা সময় পবিবার নিয়ে থাকার মতো আছে। বাকি দিনগুলো আর সবক'টা রাত ও একা থাকা পছন্দ করে। একা থাকে, নির্ঝঞ্ঝাট।

নীচের তলার পৈতৃক আমলের ভাড়াটের কাছে যে-টাকা সে পরিশ্রম না করেই মাসে মাসে পায়, তাতে উঠে আসে খরচ। দোকানের আয় থেকে নিজের পেট আর ছোঁড়া চাকরটার মাইনে; আর ট্যাক্স, ইলেকট্রিক বিল। রাখালবাবু সিগারেট খায় না।

ভেতর থেকে শিপ্রা শব্দ করল, "আমার হয়ে গেছে।"

ঘরের মধ্যে মৃদু আলো আর পারফিউমের মেয়েলি গন্ধ। রাখালবাবু দেখল, ওপাশের দরোজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে আয়না, ফিটফাট। কপালে নীল রঙের টিপ। বেশ লম্বা দেখাচ্ছে এখন। পায়ে বোধহয় উঁচু হিলের জুতো। ছাপা সিল্কের নীল এত সুন্দরভাবে ওর গায়ে জড়ানো, যেন বিজ্ঞাপন থেকে এইমাত্র উঠে এসেছে আয়না।

রাখালবাবু জিজ্ঞেস করল, "পরের রোববার দেখা হচ্ছে।"

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে—সেই রকম চমকে শিপ্রা বলল, "না, আমার অসুবিধে আছে। অন্য কোনওদিন—"

"শনিবার? সোমবার?"

"শনিবার না। সোমবার। সোমবারই ঠিক রইল, কেমন?"

সিঁড়ি দিয়ে খট খট শব্দ করতে করতে নেমে গেল শিপ্রা। শব্দগুলো মিলিয়ে যাবার আগেই দরজা বন্ধ কবল রাখালবাবু। তাবপর হাঁক পাড়ল, "শম্ভু, চা কর।"

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে শিপ্রা যখন রিকশা থেকে নামল, দেখে, তপন দাঁড়িয়ে আছে আর ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকছে।

কান-ঢাকা বাবরি চুল, লম্বা ঝুলপি, গায়ে টি-শার্ট। পরনে ছ্যাতরানো পা-ওলা হলুদ প্যান্ট, সামনের দিকের পকেট দুটোর কাছে ময়লা। ঝোলা গোঁফজোড়া ছড়িয়ে তপন হাসে।

"এই।" তপন এগিয়ে আসে, "আজ তোদের বাসায় গেছিলাম সকালে। তুই ছিলি না।"

"আমার গানেব ক্লাস। তুই তো জানিস।"

"মনে ছিল না। মাইরি বলছি। তোর মাকে যখন বললাম, একটা চাকরি এবার হয়ে যেতে পারে, মুখটা কেমন আমসি মেরে গেল জানিস।"

"ওই তো ভয়। তোর চাকরি হলেই যে পাখি উড়ে যাবে।"

"যাবেই তো।"

হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা বড় পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

অন্ধকার নামছে। পার্ক ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। বাবা, মা, ঝি-চাকরদের সঙ্গে বাচ্চারা বল বুকে চেপে বাড়ি ফিবছে। হল্লা করতে করতে খেলোয়াড়রা। ঘামে-ভেজা ওদের শরীর। প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রতি ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

পার্কের বেশ ভেতরে একটা খালি বেঞ্চি পেয়ে ওরা বসে। পাশাপাশি, কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠভাবে না।

তপন বলে, "অনেক দেরি হয়ে গেছে আমাদের। চাকরিটা পেলেই কিন্তু আর দেরি করবো না। আর শোন—"

"কী?" শিপ্রার খুকখুক হাসির শব্দ শোনা যায়। "কী বল না। তোকে যে ভারী একসাইটেড দেখাচ্ছে?"

"নাটকফাটক করা কিন্তু তোকে বন্ধ করতে হবে, বলে দিচ্ছি। আমি এসব পছন্দ করি না।"

"এখনই এত! কর্তামশাই হলে তো হাতে মাথা কাটবি।"

তপন একটু চুপ করে যায়।

বলে, "খুব ভালবাসব তোকে দেখিস। কর্তামশাই কথাটা বেশ মিষ্টি, না? আমার খুব কর্তা হবার ইচ্ছে। লাইফে শালা চাকরের চাকর হয়ে রইলাম।"

"এত বছর ভ্যারান্ডা ভাজলি তপুদা, এখন কাজ পেলে রাখতে পারবি তো? কাজের একটা অভ্যেস—"

কথা শেষ করতে না দিয়ে তপন বলে, "আরে, রাখ। পারব না মানে? এই তো টেস্ট নিল, কুড়িজন ক্যান্ডিডেট, মিনিটে ষাটটা ওয়ার্ড পিটিয়ে দিয়ে এলাম। নির্ভুল। আরে, কেউ তো ইংরিজিই শুদ্ধ লিখতে পারে না।"

"তোর ডিগ্রির কথা বলিসনি তো?" শিপ্রা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

"এত বোকা। একবার যখন বুঝে গেছি, শালা এম এ ডিগ্রিটাই আমার গলগণ্ড। স্রেফ দেখিয়ে দিলাম, হায়ার সেকেন্ডারি সেকেন্ড ডিভিশন, টাইপিং যাট। বলে, ছ'মাসের মধ্যে শর্টহ্যান্ডটাও শিখে নিতে হবে। বললাম, চাকরিটা দাও, তিন মাসে শিখে দেখিয়ে দেব, ঝড় বইয়ে দেব।"

"অত বকিসনি তপুদা, চুপ কর। দশ বছর ধরে মুখেই তোর যত ঝড়।" শিপ্রার দীর্ঘশ্বাস পড়ে, "তোর চাকরিও হবে না, আমাদের বিয়েও হবে না। স্বপ্নটপ্ন দেখে কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে কোনও দোকানে টোকানে কাজ খোঁজ। যেমন চলছে সব, তেমনই চলুক। তোর ধরাকরার লোক নেই, আমার বাবার টাকা নেই—ওসব কথা চিন্তা করিস না।"

তপন আরও উত্তেজিত হয়। বলে, "এইভাবে জীবন চলে মানুষের—? চলা উচিত?"

"আমার কিন্তু মন্দ লাগে না এই নাটক থিয়েটারের কাজ। বেশ সয়ে গেছে। দু'-পয়সা আমদানিও হচ্ছে সংসারে। বাড়িতে ডাঁটের ওপর থাকি।"

হঠাৎ তপন তার থাবাদুটো শিপ্রার উরুর ওপর চেপে ধরে। পাশ ফিরে মুখ নিচু করে বলে, 'আমার মন ভেঙে দিস না লক্ষ্মীটি।"

তপন ভাবপ্রবণ হয়ে উঠছে দেখে শিপ্রা টান হয়ে বসে। কবজি উলটে ঘড়ি দেখে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

পার্কের ওপরে বেনারসি-পাতা আকাশ। ছোট ভাঙা চাঁদ, তারাদের বুটি। ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়ায় না-জানা বুনো গন্ধ।

শিপ্রা উঠে পড়তে তপনও ওঠে। ওদেব কোনও কথা হয় না অনেকক্ষণ। পার্ক থেকে বেরিয়ে ওরা রাস্তায় দাঁড়ায়। কিছুটা হেঁটে ট্রামরাস্তা। আলো।

শিপ্রা আবার ঘড়ি দেখে। এবং ছটফট করে ওঠে।

"একটা ট্যাক্সি ধরে দিবি তপুদা? দেরি হয়ে গেছে।"

তপন অবাক হয়। জিজ্ঞেস করে, 'বাসায় ফিরবি না?'

"না রে, না। আমার প্লে আছে। আটটার মধ্যে হাওড়ায় পৌঁছোতেই হবে।"

"পৌঁছে দেব, না একা যেতে পারবি?" ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করে তপন।

আবার হাসে শিপ্রা। ওর আলতো হাসি আর চলে যাবার জন্যে ব্যগ্রতা তপনের মন আরও খারাপ করে দেয়।

"ট্যাক্সিটা ডেকে দে প্লিজ! নিজেই চলে যাব।"

ট্যাক্সির দরজা খুলে তপন যখন দাঁড়িয়ে থাকে, ওকে বড় বেচারা দেখায়। টি-শার্ট, হলুদ প্যান্ট, জুলপি, কান পর্যন্ত ঢাকা বাবরি সত্ত্বেও। মুগ্ধ চোখে ও তাকিয়ে থাকে শিপ্রার দিকে।

উঠতে গিয়ে শিপ্রা বলে, "কাল সকাল আটটায় কোয়ালিটির সামনে থাকবি, বুঝলি। ঠিক আটটায়।"

তপন মাথা নাড়ে। তারপর একটু ইতস্তত করে বলে, "তোর কাছে দুটো টাকা হবে? ধার।"

পেছনের সিটে বসে শিপ্রা তার হাতব্যাগ খোলে। আন্দাজে ব্যাগের মধ্যে আঙুল নাড়ে। ছোট-বড় নানান সাইজের নোটে আঙুল ঠেকে যায়। শেষে একটা খাপি নোট টেনে বার করে দেখে, পাঁচ। পাঁচটা টাকাই দিয়ে দেয় তপুদাকে।

তপন হাত নাড়ে, "টা, টা।"

কিছুদূর এগোলে পর শিপ্রা ড্রাইভারকে বলে, 'থিয়েটার রোড।"

পরের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা চুকে গেলে চার-পাঁচ দিন ছুটি। ভেবে শিপ্রা এখনই খুশি হয়ে ওঠে। ছুটির দিনগুলো আরাম করে ঘুমিয়ে, সিনেমা দেখে কাটাবে। তপুদাকে ঠকাচ্ছে বলে একসময় প্রথম দিকে, ওর কষ্ট হত। আজকাল আর হয় না। ওর ধারণা, সবাই ব্যাপারটা জানে, কিন্তু চুপ করে থাকে। মেনে নিয়েছে। না হলে, তপুদা টাকা চায় কেন? মা ওর হাতব্যাগ খুলে দেখে কেন। সচ্ছলতার জন্যে লোভ কার না হয়? কে আর দুঃস্থ থাকতে ভালবাসে! শুধু বাবাকে দেখে ওর মনে হয়, তিনি আশা করে আছেন, একদিন-না-একদিন সময় ফিরবে।

নিজের কথা শিপ্রা যখন ভাবে, ওর মনে হয়, এ-ই বা মন্দ কী। বিয়ে হলেই বা কী এমন স্বর্গলাভ হত। সেই তো ছুটিহীন ঘানিটানা আর দাসীবৃত্তি। মেয়ে হিসেবে বরং ওর দাম আরও দশ-পনেরো বছর

চড়াই থাকবে। নাটক-থিয়েটারের মুখোশটা তো আছে। ওটা স্বীকার করে নিয়েছে সবাই। সবাই মানে এক রকমের সমাজ।

ট্যাক্সি থেকে নেমে শিপ্রা একটা দোকান থেকে ফোন করল।

"মিস্টার সেনগুপ্ত? আমি মিস চক্রবর্তী কথা বলছি।"

"শিপ্রা? তুমি কোথায়?"

শিপ্রা জায়গাটার নাম বলল। বলল, "আমাকে নিয়ে যান। আর শুনুন, ভদ্রলোকটি কে? কী রকম?"

সেনগুপ্ত বললেন, "মালহোত্রা? মিস্টার মালহোত্রা? হি ইজ এ ফাইন এ্যান্ড ক্লিন ম্যান। তুমি কেন চিন্তা করছ? কোনও বাজে লোকের সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দিয়েছি তোমায়? বলো?"

"কাল সকাল সাড়ে সাতটায় চলে যাব কিন্তু। ওকে বলে দিন। আমার অন্য এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। গেস্ট হাউসের বেয়ারা চা করে দেবে। চা খেয়ে চলে যেয়ো। আমি আসছি।"

সেনগুপ্ত নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে এলেন। সামনের সিটে—পাশে বসল শিপ্রা।

জিজ্ঞেস করল, "আপনার বউ রাগ করে না?"

সেনগুপ্ত বললেন, "আমি এগারোটার সময় কেটে পড়ব। মিস্টার মালহোত্রা উইল লুক আফটার য়ু।"

গেস্ট হাউস মানে একটি নিরবচ্ছিন্ন ফ্ল্যাট। সাজানো গোছানো। সবকিছুই আছে। এখন শিপ্রাকে নিয়ে সেনগুপ্ত সেই ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলেন। সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছেন মালহোত্রা। হাতে হুইস্কির গ্লাস। মিউজিক চলছে ধীরে।

সেনগুপ্ত পবিচয় করিয়ে দিলেন, "মাই ফ্রেন্ড, শিপ্রা।"

মালহোত্রা উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করলেন। গায়ে পরিচ্ছন্ন সুট, লাল টাই। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। হাসিমাখা দাঁতগুলি ঝকঝকে পরিষ্কার। একটু মোটা।

ভদ্রলোকটির পরিচ্ছন্ন পোশাকের আড়ালে একজন ডোরাকাটা আন্ডারওয়্যার পরা জন্তুর ছবি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল শিপ্রার চোখের সামনে।

বলল, "প্লিজড টু মিট য়ু।"

পবেব দিন সকালে প্রতুলবাবু বাজার করতে যাচ্ছিলেন। লেভেলক্রসিঙের মুখে দেখলেন, তপন আব তাঁর মেয়ে শিপ্রা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে আসছে। তপনের মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। পাছে ওরা আড়ষ্ট বোধ করে, প্রতুলবাবু একটা পানের দোকানের আড়ালে আত্মগোপন করলেন।

ওবা কথা বলছে। কী কথা, উনি জানেন না। প্রতুলবাবু শুধু মনে মনে প্রার্থনা করলেন, ঠাকুর, কবে এদের বিয়ের ফুল ফুটবে, তুমি বলে দাও।

১৯৭৫

❁ কালচারের প্রশ্ন

সারাজীবন ঘুরে ঘুরে চাকরি করেছেন চিরপ্রশান্ত। চাকরিতে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সুনাম হয়েছে। সরকারি কাজে একজন সৎ ও বিবেকবান মানুষের যতখানি উন্নতি হওয়া সম্ভব, তা হয়েছে চিরপ্রশান্তর।

আত্মমর্যাদা জ্ঞান অত প্রবল না হলে কিছু টাকা জমত। আটান্ন বছর বয়সে অবসর নেবার পর এখন মনে হচ্ছে, কেমন যেন নেশার ঘোরের মধ্যে বিদেশ-বিভুঁইয়ে ঘুরে ঘুরে এতগুলো বছর কেটে গেল। পরিবারের ভবিষ্যত ভেবে কিছু করা হল না। সৎ অফিসার সকলের চক্ষুশূল, তাই একটা অতিরিক্ত দিন

আপিসে আসতে দিল না ওরা। অথচ কত লোক দু' বছর-তিন বছর এক্সটেনশন পাচ্ছে।

ন'শো টাকা পেনশন আর সামান্য কিছু সুদ—এই সম্বল। পৈতৃক একখানা বাড়ি ছিল ঢাকুরিয়ায়। নীচে তিনখানা, ওপরে একখানা ঘর। সেই বাড়ির একশো চব্বিশ টাকার ভাড়াটে সল্ট লেকে বাড়ি করেছে, তবু উঠবে না। তাকে দশ হাজার টাকা সেলামি দিতে হল।

"আমি কেস করব," চিরপ্রশান্ত বলেছিলেন, "লোকটার নিজের বাড়ি আছে অথচ আমার বাড়ি ছাড়বে না, এ কেমন কথা? আইন মানবে?"

রুক্মিণী নিরীহ রোগা-পাতলা মানুষ। হোমরাচোমরা পদস্থ স্বামীকে চিরকাল সমীহ করে এসেছে। তবু মিনমিন করে বলতে চেয়েছে, "দেখো, এ হল কলকাতা শহর। এ তোমার বিলাসপুর নয়, লক্ষ্ণৌ নয়। ভাড়াটে এখানে নারায়ণ, বাড়িওলা শয়তান।" কে কার কথা শোনে।"

শেষকালে ওব উকিল ভাইকে ডেকে পাঠাল।

শালাবাবু যখন এসে বলল, "প্রশান্তদা, তুমি যা বলছ, তা যুক্তিযুক্ত, সঙ্গত। ব্যাপারটা হল কোশ্চেন অফ টাইম," তখন টনক নড়েছে প্রাক্তন কমিশনারের। শালাবাবু বোঝায়, "দাদা, শেক্সপিয়র স্মবণ করো। যুদ্ধ নয়, ডিসক্রেশন। ওকে দশ হাজার টাকা অফার করো, এখুনি গিলবে।"

তাই কবলেন অগত্যা। কিন্তু নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে গেলেন।

ঠেকায় পড়লে আবও ছোট হতে হবে। মনে মনে গজরায় রুক্মিণী। লোকে কত আগে থেকে প্ল্যান কবে। ইনি কেবল হান্টার ঘুরিয়ে জীবন কাটালেন।

দুটি ছেলেমেয়ে। বাকা, মেয়ে, বড়। জুলজিতে পি এইচ ডি করছে। লক্ষ্ণৌ-এ পড়ায়। ওখানে পোস্টেড থাকাব সময় বি এস সি-তে বৃত্তি পেল। ব্যস, সেই থেকে হস্টেলে।

সৈকত বি এস সি পাশ করে বসে আছে। ও আর পড়ল না। কোনও লাইনেও গেল না। মাথাটা ওব বাকাব মতো পরিষ্কার নয়, যদিও চালচলনে ঠাট হয়েছে। চেহাবাটা বেশ লম্বা। বাপেব মতো।

সৈকত বলেছে, "বাবা, তুমি আমার জন্যে ভেবো না। ছ'মাসেব মধ্যে একটা কিছু জুটিয়ে নেব। ইন্ডাস্ট্রিতে আমার অনেক বন্ধু আছে।"

ইন্ডাস্ট্রির জগতটা চিরপ্রশান্তব কাছে অপবিচিত। সরকারি চাকবিতে একটা বয়সের পর আর ঢোকা যায় না। সে-বয়সে পৌছোতে সৈকতের দেবি নেই। এই কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করছিলেন। যাক, আশ্বাস পেয়ে বাঁচলেন।

"মেয়েব বিয়ে দেবে কে?" রুক্মিণী একদিন মনে করিয়ে দিল স্বামীকে।

"ওর বিয়ে নিয়ে আমাদের ভাববার দরকার নেই," চিরপ্রশান্ত গর্বভরে ঘোষণা করেন, "রাকা আমাব গুণী মেয়ে। নিজেই দেখেশুনে বিয়ে করবে ইচ্ছে হলে।"

"নিজে করলে কি এতদিন বসে থাকত?"

"বসে আছে কোথায়?" অদ্ভুত রুক্মিণীর কথাবার্তা। "মাত্র এক বছর আগে পি এইচ ডি কবেছে। বিজ্ঞান বিষয়ে ক'টা মেয়ে অতদূর এগোতে পারে, শুনি?"

"এগোতে এগোতে একদিন বিয়ের বয়েস পার হয়ে যাবে।" গজগজ করে রুক্মিণী।

হাসেন চিরপ্রশান্ত। বিয়ের বয়স আজকাল অত চটপট পার হয় না।

"আমার মেয়ে কি ফ্যালনা। খোঁজ নিয়ে দেখো, ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল অধ্যাপকদের কেউ ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করছে।"

এবার রেগে যায় রুক্মিণী।

"তোমার না হয় কাজ নেই, তা বলে কি কাণ্ডজ্ঞানটাও গেছে? সামান্য জিনিস বোঝো না? পড়াশোনা গবেষণা নিয়ে যারা থাকে, তারা তাতেই মশগুল। ধরে বেঁধে ওদের বিয়ে দিতে হয়। নিজে গিয়ে দেখে এসেছ, রাকার কোনও সোশ্যাল লাইফ আছে? নেই।"

"আমি তার কী করব?"

"বাপের কর্তব্য যা, তাই করবে। মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজবে।"

'কাজ নেই' আর 'বাপের কর্তব্য'—এই খোঁচা দুটো চিরপ্রশান্তর অন্তরে গভীরভাবে আঘাত করে। তাঁর মনে হয়, রুক্মিণী এতদিন পর তার আজীবন অধীনতার প্রতিশোধ নিচ্ছে।

আজ নতুন নয়। ঢাকুরিয়ায় আসার পর থেকে প্রায়ই বিভিন্ন টুকিটাকি কাজ, যা এতদিন রুক্মিণী

নিজে করেছে বা ড্রাইভার আর্দালিদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছে, এখন তাঁর ঘাড়ে চাপায়। এখন অবশ্য গাড়ি নেই। কলকাতা শহরে চলাফেরা করা যে-কোনও মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য কে না জানে। কিন্তু দুঃখ হয় যখন ইলেকট্রিক বিলটা দিয়ে এসো, কি গ্যাসের অর্ডার দাও, কি টিভি-র মেকানিককে ডেকে আনো—বলার সময় রুক্মিণী টুকে দেয়, "তোমার তো অন্য কোনও কাজ নেই।" সৈকত যেহেতু বাজার করে, তাই ও অন্য কাজ করবে না। এটা অনুচিত।

কথাটাতেই অপমান। কাজগুলো ছোট, মিনিয়েলদের করণীয়, চিরপ্রশান্তর মতো শিক্ষিত বয়স্ক মানুষকে এইসব পেটি কাজের জন্য ব্যবহার করার কথা নয়। এক-এক সময় ভাবেন, কেন, এই অবসর তো তাঁর উপার্জিত, দীর্ঘকাল কাজের পর ছুটি, তিনি কি শুয়ে বসে কাগজ পড়ে, বই পড়ে শেষ ছুটির আগের ছুটির দিনগুলো কাটাতে পারেন না? সে অধিকার কি তাঁর নেই?

তিনি দেখেন, সামনের বাড়ির বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রত্যহ সকালে নাতিকে স্কুলে নিয়ে যায়, নিয়ে আসে। রেশন তোলে পাশের বাড়ির বিপিনবাবু, মন্মথবাবু। ওদের কাজ নেই। ওরা অবসরপ্রাপ্ত। রুক্মিণী তাঁকে ক্রমশ ওইদিকে ঠেলছে।

পাত্র কোথায় থাকে, কীভাবে তাকে খুঁজে বার করতে হয়, সে সম্বন্ধে তাঁর কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

নানা কৌশলে বহু ফেরারি আসামিকে খুঁজে বার করেছেন জীবনে। ডাকাতি-করা লক্ষ লক্ষ টাকা, গয়নাগাঁটি উদ্ধার করে দিয়েছেন। কিন্তু রাকার পাত্র কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না।

রুক্মিণীর পরামর্শে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখতে শুরু করলেন। ব্রাহ্মণ না হলেও চলবে। আজকাল আর লোকে অত জাত মানে না। পাত্র উচ্চশিক্ষিত হবে, সম্মানজনক কাজে নিযুক্ত থাকবে, তা হলেই হল। আর দেখতে হবে, সে যেন সচ্চরিত্র হয়। রাকার মতো মেয়ে যেন জলে না পড়ে।

বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি দেওয়া শুরু হয়েছিল গত বছর মার্চ মাসে। এক বছর পর প্রথম উত্তর পেলেন চিরপ্রশান্ত। বাগুইআটি শাস্ত্রী বাগান থেকে ডক্টর বাসু পাত্রীর পিতাকে দেখা করতে অনুরোধ করেছেন।

"একশো বাষট্টিখানা চিঠির একটা উত্তর।" ঠোঁট বেঁকিয়ে রুক্মিণী মন্তব্য করে।

"তোমার পরামর্শে যদি লিখতুম, মেয়ে আমার বিদুষী, রূপসি, গৃহকর্মনিপুণা, তা হলে অনেক চিঠি আসত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও সম্বন্ধ টিকত না। আমি জানিয়েছি, মেয়ে পি এইচ ডি, অধ্যাপিকা, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, স্বভাব নম্র ও বিনয়ী, বয়েস ছাব্বিশ। যাকে বলে 'অ্যাকমপ্লিশড'। আর, আমার পরিচয় দিয়েছি যাতে বুঝতে পারে, কোন পরিবার থেকে আসছে। যাদের পছন্দের সঙ্গে মিলবে, সেখানেই কথাবার্তা হবে। বিয়ে হবে। তোমার তো একটার বেশি জামাই চাই না?"

যাবার দিন মুগার ধাক্কা দেওয়া ধুতি পরলেন। তসরের পাঞ্জাবি। সোনার বোতাম। স্ত্রীকে বললেন, "তুমিও চলো। বেয়াই-বেয়ানের সঙ্গে আলাপ করে আসবে।"

রবিবারের সকাল। নরম রোদ। মিনিবাস চল্লিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দিল বাগুইআটির মোড়ে। কাছেই মন্দির। মন্দিরের গা দিয়ে শাস্ত্রী বাগানের রাস্তা।

ছোট হলেও বাড়িটা নতুন। নিচু কাঠের গেট পার হয়ে তিনটে সিঁড়ি, তারপরেই বারান্দা। বেশ বড়সড় মোজেইক টাইল দেওয়া বারান্দা। গেটের ওপর মার্বেল ফলক। বড় বড় ইংরেজি অক্ষরে লেখা—ডক্টর প্রবীর বাসু। তার নীচে, ডক্টর পরিমল বাসু। মার্বেল ফলকে আর-একটা অলিখিত নাম পড়লেন চিরপ্রশান্ত: ডক্টর রাকা বাসু।

ক্যানভাসের রকিং চেয়ারে বসেছিলেন ডক্টর বাসু। লম্বাটে মুখ। মাথায় টাক। বয়স সত্তর না হোক, পঁয়ষট্টি হবে। স্প্যান পড়ছিলেন। ওঁদের দু'জনকে আসতে দেখে যথারীতি অভ্যর্থনা করলেন। বসতে বললেন।

প্রথম প্রশ্ন করলেন, "গাড়ি কি বড় রাস্তায়? আমার গেট অবধি গাড়ি কিন্তু আসে।"

চিরপ্রশান্ত সলজ্জ হাসি চেপে বললেন, "না, আমরা মিনিবাসে এলাম।"

ডক্টর বাসু দু'বার দোল খেলেন চেয়ারে। রুক্মিণী লক্ষ করে, কালো তালতলার চটির মধ্যে ভদ্রলোকের পা দুটি বেশ ফরসা।

"চা? কিংবা ঠান্ডা কিছু? শরবত?"

চিরপ্রশান্ত বললেন, "না, না। আমরা জলখাবার খেয়েই এসেছি।"

"এসব ব্যাপারে জোর করার মানে হয় না।"

জলপানের ওপর দাঁড়ি টেনে ডক্টর বাসু এবার ঘাড় ঘুরিয়ে অন্দরমহলের দিকে তাকালেন। ব্রাউন সুতোর কাজ-করা হলুদ পরদার উদ্দেশে বললেন, "বুলু মা, ফাইলটা দিয়ে যাও তো।"

বুলু মা একটা মোটা ফ্ল্যাট-ফাইল দিয়ে গেল। রুক্মিণী লক্ষ করল, মেয়েটি ফরসা কিন্তু বেশ রোগা। বিয়ে হয়নি। ফাইলের মাঝখানে একটা কাগজ বেরিয়ে আছে। নির্দিষ্ট জায়গায় চোখ বুলিয়ে ডক্টর বাসু বললেন, "ছবি এনেছেন?"

নানা পোজে তোলা রাকার তিনখানা ছবি এগিয়ে দিলেন চিরপ্রশান্ত।

ডক্টর বাসু বললেন, "জুলজি আবার একটা বিষয়? আমার ছেলের হিস্ট্রি—খিলজিদের ওপর অরিজিনাল কাজ করেছে। সত্যি, কী ছিল আমাদের দেশ, আর এখন কী হয়েছে।"

চিরপ্রশান্ত বললেন, "তা যা বলেছেন।"

"ছবিতে তো বেশ ভালই দেখাচ্ছে", হঠাৎ ডক্টর বাসু জানতে চাইলেন, "আপনার মেয়ে কি মিউজিশিয়ান?"

প্লাস পাওয়ারের পেছনে তাঁর চোখদুটো অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছিল।

চিরপ্রশান্ত বললেন, "না তো। আবেদনপত্রে আমি তো বলিনি—"

"লখনৌ শহর মিউজিকের তীর্থক্ষেত্র। সেখানে থাকে বলছেন অথচ গানবাজনার সঙ্গে কোনও সংস্রব নেই, এ কীরকম মেয়ে? অ্যাঁ?"

"বনসাই জানে?" আবার আচমকা প্রশ্ন। আধ মিনিট নীরবতার পর, "আপনি বনসাই মানে জানেন? এক রকম জাপানি পদ্ধতিতে গাছ বামন করার আর্ট।"

এবার রুক্মিণীর দিকে তাকালেন ডক্টর বাসু। এক খিলি পান খেয়ে বেয়ানের সঙ্গে খোশগল্প করতে এসে রুক্মিণী হতভম্ব।

"বলুন তো, অ্যাপল টার্ট কীভাবে করতে হয়?"

"অ্যাপল টার্ট?"

রুক্মিণী নীরবে স্বামীর সাহায্য প্রার্থনা করল, কিছু পেল না। এমন সময় হলুদ পরদার পেছনে কুকারে সিটি দিয়ে উঠল। টাইম আপ।

"পারলেন না। আপনাদের বাড়িতে আভন নেই?"

"না।"

"টিভি-ও নেই?"

রুক্মিণী মস্ত হেসে বলে, "হ্যাঁ টিভি আছে। তবে কালার না।"

"তা হলে বলুন তো ফ্রেসকো কাকে বলে? আর টেম্পেরার সঙ্গে তার পার্থক্য কী? এটা পারা উচিত।"

স্বামী-স্ত্রী মুখ চাওয়াচায়ি করে।

কুকারের সিটির মতো আচমকা ফেটে পড়লেন ডক্টর বাসু।

"এই অ্যাকমপ্লিশমেন্টের বহর? আপনি চিঠিতে লিখেছেন, মেয়ে অ্যাকমপ্লিশড।"

"রাকাকে জিজ্ঞেস করলে সে হয়তো পারত,", আমতা আমতা করে বলতে চাইলেন চিরপ্রশান্ত, "আমরা ঠিক প্রস্তুত হয়ে আসিনি। মানে—"

রুক্মিণীর কন্যাদায়? সে বলে, "যদি আরেকদিন সময় দেন—"

ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, "আমাদের কোনও দাবিদাওয়া নেই, বুঝলেন। আমি লিবারাল হিন্দু। আমি চাইছি, আমাদের পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে পুত্রবধূ যেন খাপ খায়। আর সব গ্যাপ যায় কিন্তু কালচারের গ্যাপ মেকাপ করা অসম্ভব।"

কালচার! নিজের কাছে নিজে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছেন চিরপ্রশান্ত। রাকাকে নিয়ে এতকাল গর্ব ছিল, তা-ও আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

এয়ারপোর্ট থেকে ফিরতি মিনিবাসের জন্য অপেক্ষা করার সময় বিধ্বস্ত চিরপ্রশান্ত অনুভব করেন, মাথার চাঁদিটা গনগন করছে।

রুক্মিণী বলে, "বনসাই নামটা শোনা-শোনা।"

"তুমি অ্যাপল টার্ট বলতে পারলে না কেন?"

"কোনওদিন আভন কিনে দিয়েছ যে বলব? আচ্ছা ফ্রেসকো কি এক ধরনের ফ্রিজ? তুমি জানো?"

"আমাব মুন্ডু! দেখলে তো, লোকটা বাতিকগ্রস্ত।"

রুক্মিণী বলে, "তুমি মেয়ের বাপ। ওসব কথা বললে তো চলবে না। আর, এটা কালচারের প্রশ্ন। কলকাতায় নিশ্চয় এসব শেখাবার স্কুলটুল আছে। খোঁজ করে দেখো। তোমার আর কাজ কী আছে?"

চিরপ্রশান্ত আর প্রতিবাদ কবলেন না।

যার কাজ নেই, কিছু একটা নিয়ে তাকে থাকতেই হবে। তা ছাড়া, গ্যাপ যদি হয়ে গিয়েই থাকে, সেটা মেকাপ কবে ফেলাই উচিত। এটা কালচারের প্রশ্ন। কালচার ছাড়া বাঙালির আর কীই বা আছে।

১৯৮৫

❀ একটি স্মরণীয় ঘটনা

অন্যদিন হলে প্রবাল এই সময়ে ভিডিয়ো চালিয়ে বসে থাকত নিজের ঘবে, বকিং চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে গ্রহান্তবেব দুর্বৃত্তদের কাণ্ডকারখানা দেখত। আজ সন্ধেবেলা ও দিদার ঘরে। সোফায় বসে আছে দিদা, আব কার্পেটেব ওপর পা ছড়িয়ে দিদার পায়ে ঠেস দিয়ে বসে ও গল্প শুনছে।

সুবল ড্রাইভাব এসে বলে, "দাদা, তুমি তৈরি থাকবে, আমবা আটটায় বেরুব।"

"আমি যাব না। তুমি একাই যাও।"

"মা বললেন তোমাকে যেতে।"

"আঃ", প্রবাল বিবক্ত হয়, "রোজ রোজ আমার এয়ারপোর্ট যেতে ভাল্লাগে না। মাকে নিয়ে যাও।"

"চেম্বাবে মক্কেল আছে—"

"আমি তাব কী করব। এখন যাও তো।"

ড্রাইভাবকে বিদায় কবে দিয়ে প্রবাল মুখ তুলে দিদার দিকে চায়। বলে, "তারপর? কৃতবর্মা তাঁবুব মধ্যে ঢুকে দ্রৌপদীর পাঁচটা ছেলেকেই কেটে ফেলল? কেউ কিছু বলল না?"

"তখন তো মাঝবাত্তির। সবাই ঘুমিয়ে আছে। বাচ্চাগুলোও ঘুমিয়ে ছিল।"

প্রবালের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এমনিতে চোদ্দো বছরের ছেলে। বর্তমান প্রজন্ম অত কোমলহৃদয় হয় না। কিন্তু মহাভারতের কাহিনী এত বিশদভাবে ও আগে শোনেনি। মহাভারতের দুঃখী চরিত্রগুলো ওকে দুর্বল করে দেয়।

ফরসা তুলতুলে দিদার গায়ের চামড়া। মুখে দু'পাটি ঝকঝকে বাঁধানো দাঁত। চোখে মোটা কাচের চশমা। ধবধবে সাদা চুল। দিদার কাছ থেকে যা কিছু শোনে, বড় বড় চোখদুটো প্রবালের দিকে তাকিয়ে যা কিছু বলে, তার একবর্ণও অবিশ্বাস করতে পারে না ওই বালক।

দিদা বোঝে সব। তবু নাতির মাথায় হাত বুলিয়ে, ওর খোঁচা খোঁচা চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলে, "গেলে পারতিস। বাবা হয়তো দুঃখ পাবে তোকে না দেখে।"

—"দেখো দিদা", এবার সোজা হয়ে বসে প্রবাল, "বাবা হরদম দিল্লি, বোম্বে, হায়দ্রাবাদ, বাঙ্গালোর যাচ্ছে। যখন ফেরে তখনও সঙ্গে মক্কেলের লোক। ওরা কী সব কথা বলে আমি একদম বুঝতে পারি না। একা-একা বাড়িতে ভাল লাগত না, তাই বাবাকে আনতে এয়ারপোর্ট গেছি। এখন তো তুমি এসে গেছ। আমার ইচ্ছে না করলেও যেতে হবে? বলো?"

প্রবালের বাবা বিক্রম পাল একজন নামকরা ব্যারিস্টার। ওর মা কনক পাল। সে-ও ব্যারিস্টার।

এরকমটা সচারাচর দেখা যায় না। কুইন্স পার্কে ওদের বড়সড় দোতলা বাড়ি। উত্তর কলকাতার দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রিটে ঠাকুরদার পুরনো বাড়িটা এখনও আছে, সেখানে এখন দোকান আর ভাড়াটের বাস। ওই ঘিঞ্জি অঞ্চল ছেড়ে ওরা এখানে নতুন বাড়ি করে চলে এসেছে। এ-বাড়ির বয়স আর প্রবালের বয়স প্রায় সমান সমান।

নীচের তলায় দুখানা গ্যারাজ আর দারোয়ানের ঘর ছাড়া বাকিটাই যাকে বলে চেম্বার। আপিস। বিক্রম পাল আর কনক পালের দু'খানা পৃথক আপিসঘর। সিলিং পর্যন্ত আইনের বইয়ে ঠাসা। কনক মোটাসোটা মানুষ, অল্পে ঘেমে যায়, তাই ওর কামরায় বাতানুকূল যন্ত্র বসানো। বিক্রম পালের চেম্বারে জানলা খুলে দিলে ফুরফুর করে দক্ষিণের বাতাস আসে। সম্প্রতি একটু হাঁপানির টান হচ্ছে ওর, বন্ধ ঘরে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। মাঝখানে হল—হলজোড়া টানা লম্বা টেবিল। তার কোলে সার সার চেয়ার। টাইপিস্ট, স্টেনো, কেরানি আর জুনিয়াররা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে কাজ করে। মক্কেলরা বসে অপেক্ষা করে। স্বামী-স্ত্রী হলেও ওদের মক্কেল দল এক নয়। কোর্টের সময়টুকু বাদ দিলে এবং ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া বাকি, সকাল-বিকেল মিলিয়ে অন্তত আটঘণ্টা, ওদের নীচের তলায় কাটে। মক্কেলকে জেতানো, মক্কেলের হয়ে সর্বক্ষণ যুদ্ধের প্রস্তুতি—এ কাজে মানসিক চাপ থাকে, একঘেয়েমি থাকে না। কনক বিক্রমের মতো নিরন্তর পাইপ টানে না, পানবাহার খায়।

মানুষ স্বভাবত বৈষম্যবাদী। এবং কলহপ্রিয়। বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে তার উদারতা সবচেয়ে কম। যুদ্ধ ছাড়া সে সূচ্যগ্র পরিমাণ অধিকার ছাড়বে না। কলকাতার হাইকোর্ট পাড়ায় কিছুদিন হাঁটাহাঁটি করলেই লক্ষ করা যাবে, কলহের দলিলপত্র বাকসবন্দি করে গাড়ি থেকে নামছে উদ্বিগ্ন মানুষের দল। তারা সলিসিটরদের শরণপ্রার্থী। কোনও কোনও সলিসিটর হয়ত বলবেন, লড়ে যাও, তুমি জিতবেই। তারপর ব্রিফ তৈরি করে পাঠিয়ে দেবেন ব্যারিস্টারের চেম্বারে। সেখানে যাও। আলোচনা করো। মামলার অস্ত্রগুলো শানিয়ে দিয়ে এসো।

ব্যারিস্টারদের কার কত সুনাম, কার কত আয়, তা নিয়ে হাইকোর্ট পাড়া গুজবে মুখর। টাকার লেনদেন কোর্টরুমে হয় না, চেম্বারেও হয় না। সলিসিটরের ঘরে হয়। কেউ বলে, আমার ঘরে বিক্রম পালের বিল হয় মাসে কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার। কেউ বলে কনকদির আয় তার চেয়ে বেশি। কোম্পানি ম্যাটারে কনক পালের জুড়ি নেই।

টাকার এত ঝনঝন শব্দ কিন্তু কুইন্স পার্কের দোতলা অবধি পৌঁছোয় না। সেখানে সংসার। সেখানে একটাও আইনের বই নেই। সেখানে বালক প্রবাল তার নিজস্ব নিঃসঙ্গতা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ছবি দেখে, গান শোনে, পায়ে চাকা লাগিয়ে বাড়িময় ছোটে। সেখানে কেষ্টদা আছে, সর্বাণী ঝি আছে। আমানুল বাবুর্চি আছে। আবাল্য তারা ওর সঙ্গী।

ডিনার টেবিলে বাবা আর মায়ের সঙ্গে প্রবালের দেখা হয়।

প্রবাল হয়তো জিজ্ঞেস করে, "তুমি আবার কবে দিল্লি যাবে বাবা?"

বিক্রম ছেলের দিকে তাকায়। একটু কি রোগা হয়েছে? ওর ঠোঁটের ওপর ওটা কীসের ছায়া? গোঁফের রেখা নাকি? ছেলেটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করে, "কেন?"

"একটা ক্যাসেট এখানে পাচ্ছি না। তুমি যদি এনে দাও।"

চামচে করে পুডিং খেতে খেতে বিক্রম তখন বলবে, "আমার তো মনে থাকবে না। তুমি একটা কাগজে লিখে আমার কোটের পকেটে রেখে দিয়ো।"

প্রবাল জানে, বাবা ঠিক এনে দেবে। ওর প্রতি বাবার মনোযোগ কম, তাই বাবার কাছ থেকে ও অনেক উপহার পায়।

এই সময়টা কনক ছেলের পাশ ঘেঁষে বসে। ওর স্কুলের খবর নেয়। ক্লাস-টেস্টের খবর নেয়। টিউটর এসেছিলেন কিনা জানতে চায়। এই একটি মাত্র সন্তান তাদের কবে বড় হবে, বাবার মতো ব্যারিস্টার হয়ে চেম্বার খুলে বসবে, কবে কালো আলপাকার গাউন পরে আট নম্বর কোর্টে দাঁড়িয়ে জেরায় জেরায় জেরবার করে তুলবে শত্রুপক্ষের সাক্ষীকে—এইসব ভাবনায়, উদ্বেগ আর স্বপ্ন একাকার হয়ে যাওয়া চিন্তায়, অন্যমনস্ক হয়ে যায় কনক।

"আর একটু পুডিং খা। ভাল হয়েছে।"

"নাঃ, পেট ভরে গেছে মা।"

"কিছুই তো খেলি না।"

"সন্ধেবেলা দু'-দুটো ফিশ ফ্রাই খেয়েছি। খিদে নেই।"

কনক মিষ্টি করে বকুনি দেয়, "যখন-তখন যা খুশি খেয়ো না, কতবার বারণ করেছি।"

সে-কথায় কর্ণপাত করে না প্রবাল। সারাদিন ও কী করছে না করছে, কী খাচ্ছে না খাচ্ছে, তার কতটুকু খবর মা রাখে। ওর দেখাশোনা তো কেষ্টদাই করে।

কনক বলে, "একটা হজমের ট্যাবলেট দিচ্ছি, খেয়ে নাও। কেষ্ট কেষ্ট—"

"নিজে উঠে এনে দাও—"

ভারী শরীর নিয়েই ওঠে কনক। ওষুধ এনে ফয়েল খুলে ওর মুখে দিয়ে দেয়। জল এগিয়ে দেয়। ছেলের পিঠের ওপর হাত রাখে।

মায়ের স্পর্শটুকু প্রায় জোর করে আদায় করল প্রবাল। কখনও কখনও এই রকম আদায় করে নেয়। সব রাগ ওর জল হয়ে গলে যায় সঙ্গে সঙ্গে। একদিন এই রকম অন্তরঙ্গ মুহূর্তে প্রবাল বলল, "মা, ইংলিশ টিউটারকে ছাড়িয়ে দাও। আমি ওর কাছে পড়ব না।"

"কেন, কী হল আবার?"

"যেদিন খুশি আসে। ভাল করে পড়া না বুঝিয়েই কোয়েশ্চেন লিখে দেয়। নিজে বসে বসে নভেল পড়ে। অকারণ বকে।"

"তুমি তো বলবে, স্যাব, এটা আরেকবার বুঝিয়ে দিন।"

"ও তো মাইনে পাচ্ছে, ওর ডিউটি করবে না কেন?"

বিক্রম আড়চোখে তাকায় ছেলের দিকে। বিরক্ত। বলে, "একী, টিউটর সম্পর্কে রেসপেক্টফুলি কথা বলো। উনি তোমার গুরুজন।"

বাবাব ভর্ৎসনা একটুও দাগ কাটে না ছেলের মনে।

প্রবাল বলে, "বা-রে, তা হলে কেষ্টদাও তো গুরুজন। ডিউটি না করলে কেষ্টদাকে তোমরা ছাড়িয়ে দেবে না? দু'জনেব মধ্যে কী তফাত, আমি তো বুঝি না।"

বিক্রম আরও রূঢ় ভাষায় ছেলেকে তিরস্কার করতে যাচ্ছিল, কনক চোখ টিপে ওকে থামায়। বলে, "ঠিক আছে, পরের দিন আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব।"

একগুঁয়ে ছেলেটা নিজের জিদ ছাড়ে না। বলে, "আমি দিদার কাছে ইংলিশ পড়ব।"

"দিদা?"

"হ্যাঁ। তোমার মা, আর তুমি জানো না কত ভাল ইংলিশ জানে দিদা? দিদার কাছে পোয়েট্রি বুঝে এবার ক্লাস টেস্টে ষোলো পেয়েছি, জানো?"

"তা নয়,", ছেলেকে শান্ত করার চেষ্টা করে কনক। বিক্রম উঠে গেছে ইতিমধ্যে। ওর ধৈর্য কম। বলে, "দিদা তো অসুস্থ..."

"টিচাররা হার্টলেস।" বলতে গিয়ে গলা ধরে যায় প্রবালের। কনক বোঝে, কোথাও ছেলেটার একটা ব্যথা আছে। উগ্রতার বেশে সেটা প্রকাশিত হচ্ছে। ওকে খুঁচিয়ে দরকার নেই। ওকে শোয়ার ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, 'গুডনাইট' বলে আলো নিবিয়ে দেয় কনক।

পরের দিন সকাল আটটায় ক্লায়েন্টের সঙ্গে কনফারেন্স। রিট পিটিশন ড্রাফট করতে হবে। কোর্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গে পিটিশন ফাইল করা দরকার। একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে কনক। বিক্রমের ঘর থেকে পোড়া তামাকের গন্ধ আসছিল, তবু কনক ওদিকে গেল না।

কোনও কিছুর অভাব নেই বাড়িতে, তবু ছেলেটা ক্রমশ বেয়াড়া হয়ে উঠছে কেন, কেউ বোঝে না। প্রবাল একটু খামখেয়ালি ছেলে, তাই ওর খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে বাড়িতে এতগুলো লোক মজুত আছে। ছোট গাড়িটা বাড়িতেই থাকে সচরাচর। সুবল ওকে স্কুলে নিয়ে যায়, সুইমিংয়ে নিয়ে যায়, ভিডিয়ো গেমসের জায়গায় পৌঁছে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। রাজেশ, প্রীতম, জ্যাকি— প্রবালের এইসব বন্ধুদের ডেকে নিয়ে আসে কেষ্ট, ছাদে ব্যাডমিন্টন খেলে ওরা, হইহই করে রোলার স্কেটিং করে, সে শব্দ একতলার ঘর থেকেও শোনা যায়। প্রবাল বোকা ছেলে নয়, তবু ওর পরীক্ষার ফল কেন খারাপ হচ্ছে? ওর মা-বাবা দুজনেই এত বিদ্বান। বিদ্বান এবং ধনী। বিক্রম এবং কনক,

উভয়েরই পূর্বপুরুষ অভিজাত উচ্চকোটির মানুষ ছিলেন। কলকাতার রাস্তা দিয়ে পায়ে হাঁটেননি কেউ কখনও।

বিক্রম বলে, "ওর ট্রেনিং হচ্ছে না ঠিকমতো। ওকে হস্টেলে দিয়ে দাও।"

ডাক্তারবন্ধু বলেছিল, "লোনলি চাইল্ড। আর একটা ভাইবোন থাকলে এমনটা হত না।"

টিউটর ওর সমস্যাটা পাত্তাই দেননি। তাঁর মতে, এই বয়সে, বয়ঃসন্ধির মুখে, ছেলেরা হঠাৎ বড় বেশি আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। ঠিক সময়ে ওটা কেটে যাবে। অভিজ্ঞ মানুষ তিনি, এই বয়সের ছেলেদের মনস্তত্ত্ব বোঝেন ভাল।

সাতপাঁচ ভেবে, কোনও সুষ্ঠু সমাধানে আসতে না পেরে কনক মাকে আনিয়ে নিয়েছে। অশক্ত হলেও মা ওকে চোখে চোখে রাখতে পারবে। ওর গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখতে পারবে। ছেলেটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে না। গরমের ছুটির সময় এসেছিল দিদা, পুজোর ছুটি পার হয়ে নভেম্বর মাস পড়ল, দিদাকে প্রবাল ছাড়বে না।

উগ্রস্বভাবের ছেলেটা দিদার ছায়ায় থেকে থেকে আস্তে আস্তে ওর পাপড়ি শিথিল করে দিয়েছে। কলকাতার যুবসমাজে ড্রাগের নেশা এক ভয়ানক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে আজকাল, তার ছোঁয়াচ থেকে প্রবালকে হয়তো বাঁচানো গেল। কনক স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে। আর দু'-তিনটে বছর, তারপর প্রথম সুযোগেই ওকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে ওরা। বছর পাঁচেকের জন্য কোনও বিশিষ্ট পাঠক্রমে ভরতি করে দেবে, তা হলেই নিশ্চিন্ত। টাকার যখন অভাব নেই, তখন উচ্চশিক্ষা পেতে প্রবালেব বাধা কোথায়।

দিদা বলে, "যাকে নিয়ে এত প্ল্যান করছ তোমরা, তার মনটাও জানার চেষ্টা কোরো। আমি যতটুকু বুঝেছি, ওর ধারণাটা আলাদা।" কনক বলে, "তুমি জেনে নাও। ও যা চাপা, ওর মুখ খোলায় কে?"

ধীরে ধীরে নাতিকে খোঁচায় দিদা, নাতি সাড়া দেয় কই। আমি কী জানি। মা-বাবা যেমন বলবে, তেমন হবে, আগে সামনের পরীক্ষায় পাশ করি। তারপর তো ওই সব। এইভাবে এড়িয়ে যায় প্রবাল। নিজে কমিট করবে না। অথচ পড়াশোনার ব্যাপারে দিদার ওপর নির্ভরশীল। ওব দিদা আর সব দিদাদের মতো নয়। রীতিমতো গ্র্যাজুয়েট। দেখে বোঝা যায় না।

একদিন চেম্বার সেরে ওপরে উঠছে, সিঁড়ির মুখে মা-মেয়ের মুখোমুখি দেখা।

"কোথায় যাচ্ছিলে মা?"

"তোর কাছেই।"

"কেন?"

দিদা বলে, "ঘরে আয় একবার।"

ঘরে আসতে একখানা খাতা এগিয়ে দেয়। কনক বলে, "কী এটা?"

"প্রবালের খাতা। রচনা লিখেছে বাংলায়, পড়েই দেখ না।"

মাথার ভেতরটা তখনও আইনের কচকচিতে খরখর করছিল। তবু, মায়ের শোবার খাটে বসে কনক খাতাটা পড়তে শুরু করল। "একটি স্মরণীয় ঘটনা"—রচনাটির বিষয়। বেশ খারাপ হাতের লেখা।

"ওই জায়গাটা জোরে জোরে পড়।" দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মাঝখানে আঙুল ঠেকায় দিদা।

ব্যাপারটা আগে বুঝে নেবার চেষ্টা করে অভ্যাসবশত।

তারপর কনক পড়ে।

"আমার বন্ধু নিখিলের সঙ্গে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। খুব ছোট বাড়ি। নিখিলের দিদি আর একজন ছোট ভাই আছে। তার নাম অর্পণ। ওদের কোনও বসার ঘর নেই। দেয়ালে ছবি নেই। জানলায় দরজায় পরদা নেই। ঘরের মধ্যে খাট দেখলাম, টেবিল চেয়ার দেখলাম, আয়না দেখলাম। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো আয়না দেখলাম। কোনওটার সঙ্গে কোনওটা ম্যাচ করে না। মাদুরের ওপর বসে আমরা ক্যারম খেললাম। নিখিলের বাবা স্কুলে পড়ান আবার বাড়ি ফিরে এসে ওর ভাইবোনদেরও পড়ান। নিখিলের মা রান্না করেন। ওদের একটাও চাকর নেই। আমরা সবাই মিলে গরম গরম লুচি আর আলু ভাজা খেলাম। নিখিল বলল, ওরা সবাই একটা ঘরে শোয়। শুধু ওর বাবার জন্যে আলাদা ঘর আছে দেখলাম। সে ঘরে অনেক বই। রবীন্দ্রনাথের ফটো। আমাদের বাড়ির মতো অত সাজানো গোছানো নয়, তাই বাড়িটার মধ্যে কেমন আপন-আপন গন্ধ। ছুটির দিনে বিকেলবেলা নিখিল ওর বাবা-মা'র সঙ্গে

বাসে চড়ে ময়দানে বেড়াতে যায়। ময়দানে বসে চিনেবাদাম খায়। আমি জীবনে কোনওদিন ময়দানে বসে চিনেবাদাম খাইনি।"

একটু পরে লিখছে: "নিখিলের বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বড় হয়ে কী হব। কম্পুটার সায়েন্টিস্ট না অ্যাস্ট্রোনট। নাকি ব্যারিস্টার। আমি বললাম, টিচার হবার ইচ্ছে, কিন্তু বাবা-মা কি তা হতে দেবে। উনি বললেন, যা-ই করো, কাজকে ভালবেসো। আসার সময়ে আমি ওঁদের প্রণাম করলাম। নিখিলের মায়ের পায়ে দেখলাম আলতা। বললেন, আবার এসো।"

পড়া শেষ হয়ে গেলে কনক মায়ের মুখের দিকে চায়। "এই হল স্মরণীয় ঘটনা?" বলতে গিয়ে ওর গলা বুজে আসে।

১৯৮৭

❁ চতুর্ভুজ

ওরা চারজনেই ক্লাস সিক্সের ছাত্র। এক বেঞ্চিতে বসে। একসঙ্গে টিফিন খায়। অনুপম স্যার বলেন চারজন টার্জন। সুদীপ্ত স্যার ওদের নাম দিয়েছেন চতুর্ভুজ। হিমানী আন্টি বাংলা পড়ান। তিনি আদর করে ডাকেন চার ইয়ার। প্রমথ চৌধুরীর বই আছে চার ইয়ারি কথা নামে, সেই থেকে চার ইয়ার। ইয়ার মানে বন্ধু, আবার ইয়ার মানে ফাজিলও হয়। ইয়ার থেকে ইয়ারকি। ওরা একজনও প্রমথ চৌধুরীর লেখা কোনও বই পড়েনি। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা বই পড়তে হলে ওই একজন—সত্যজিৎ রায়। ফেলুদা আর শঙ্কুর কাহিনী। ওরা লালমোহনবাবুর ফ্যান।

এ ছাড়া আর কোথায় মিল ওদের? তাপস রোগা, লম্বা, চোখে চশমা। স্বপন মোটকা, গোলগাল। ওর থাইয়ের ঘের বত্রিশ ইঞ্চি। গৌতম বেঁটে, খেরকুটে। খেরকুটে শব্দটা অবশ্য অভিধানে নেই, মুখে মুখে প্রচলিত। পুব বাংলার লোকেদের কাছে এর মানে, সেই ব্যক্তি যার চেহারা লোমওঠা কুকুরের মতো। না, গৌতম ঠিক ততটা প্যাংলা নয়। বাকি রইল রঞ্জন—সে রোগাও না, মোটাও না। লম্বাও না, বেঁটেও না। কিন্তু অসম্ভব ফরসা। এককথায় ওকে লালটু বলা যায়। যার মানে আদুরে। তাপসরা দুই ভাই, স্বপনরা ভাইবোন, গৌতম একমাত্র। রঞ্জন কেবল তিনজনের একজন, কনিষ্ঠতম যাকে বলে। এত অমিল থাকা সত্ত্বেও কেন যে লোকে ওদের চারজন টার্জন, কি চতুর্ভুজ, কি চার ইয়ার বলে, কে জানে। একটা কারণ হতে পারে। ওদের চারজনেরই অঙ্কে দারুণ ফান্ডা। আর ওরা টি টি খেলায় ওস্তাদ।

একদিন টিফিনের সময় ওরা স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। হঠাৎ তাপস বলল, 'এই স্বপন, দেখি আজ তুই কী এনেছিস।'

মুখ ব্যাজার করে স্বপন বলল, 'কী আবার? আমার তো রোজ একই টিফিন। চাউ আর চাউ। কোনওদিন ঝাল, কোনওদিন টক, কোনওদিন মিষ্টি। খিদে পায় বলে খাই। ভাল লাগে না।'

তাপস ওর কৌটোয় উঁকি দিয়ে দেখল। সত্যি তাই। অবশ্য সেই সঙ্গে দুটো নারকেল নাড়ু আছে। গৌতমের কৌটোয় কেক আর হালুয়া। রঞ্জনের পরোটা আর আলুর ছেঁচকি। তাপসের নিজের টিফিন বাকস সবচেয়ে ছোট, তার মধ্যে দুটি কেনা সন্দেশ। আর ওর বেলায় একটা আপেল। কারোরই টিফিন এমন কিছু আহামরি গোছের নয়। তবে, বন্ধুর বাড়ির টিফিন নিজের বাড়ির চেয়ে বেশি সুস্বাদু হয় বলে, কিংবা যারা মোটা তাদের খিদে বেশি বলে, স্বপন রঞ্জনের কাছ থেকে একটা পরোটা চেয়ে নিল। আঃ, কী তার স্বাদ!

কে না জানে, প্রত্যেকের টিফিনের পেছনে মায়েদের হাত থাকে। কোনও মা নিজে রান্না করে, কারুর বাড়িতে রান্নার লোক আছে। আপিস আর স্কুলের ভাত-ডাল-তরকারি বানাতে হিমশিম খায় সবাই। তার

ওপর টিফিন বানানো একটা উপরি ঝামেলা। এইখানেই শর্টকার্ট করা হয়। আসলে সময়ের অভাব নয়, মায়েদের কল্পনাশক্তির অভাব। রোজ রোজ কত বৈচিত্র্য আনা যায়। তবু, তার মধ্যে, রঞ্জন যেহেতু তিনজনের একজন, এবং কনিষ্ঠতম, ওর টিফিনেই একটু ভ্যারাইটি থাকে।

হঠাৎ রঞ্জন বলল, 'বাবারা তিন প্রকার।'

'কী করে জানলি?'

'আর সব বাবাদের সঙ্গে নিজের বাবাকে তুলনা করে।'

রঞ্জনের পর্যবেক্ষণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং মৌলিক। এর পরিচয় ওর বন্ধুরা আগেই পেয়েছে।

রঞ্জন এবার বলল, 'মনোযোগী, অমনোযোগী আর অ্যাবসেন্ট। বাবারা এই তিন প্রকার। আমার বাবা অমনোযোগী টাইপ।'

কোনও বাবাকে এইভাবে দেখা যায়, তাপস কি স্বপন আগে ভাবেনি। সত্যি, রঞ্জনের মধ্যে ফেলুদার প্রতিভা দু'-এক কণা থাকা অসম্ভব নয়। ওরা নিজের নিজের বাবাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে শনাক্ত করার চেষ্টা করে। স্বপনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মনোযোগী টাইপের একজন বাবা। যে আপিস থেকে ফিরেই দুই ভাইবোনকে নিয়ে পড়াতে বসে রোজ। যে নিজে বাজারে যায় প্রতিদিন। পড়তে পড়তে ঢেকুর তুললেই যে টের পেয়ে যায়, কে এগরোল খেয়ে এসেছে। কে ফুচকা। এমন একজন বাবা, যাকে মনে করিয়ে দিতে হয় না, স্বপনের কখন একজোড়া জুতো কেনা দরকার। স্বপন কতদিন সাবান মেখে চান করেনি। ওর ছোটবোনের গায়ে জ্বর। বছরে একবার ওরা ছুটিতে বেড়াতে যায়, তার প্রস্তুতি শুরু হয় তিন-চার মাস আগে থেকে। এইভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরা হচ্ছে। কোনও এক জায়গায় দু'বার নয়। মনোযোগী বাবার সংসারে মায়ের ভূমিকা পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকের মতো।

রঞ্জন বলল, ওর বাবা অমনোযোগী টাইপ। তাপসের বাবাও তাই। নিজের কাজের জগতে লিপ্ত। নিজের বিষয়ের বাইরে আর কোনও বিষয়ে আগ্রহ নেই। সে বিষয় হল ল। আইন। প্রকৃতিকে টেক্কা দিয়ে মানুষ নিত্যনতুন আইন প্রণয়ন করছে। আজকের আইন কাল পুরনো হয়ে যায়, ক্রমে নিজের গড়া আইনের জালে নিজেই জড়িয়ে গেছে মানুষ। অথচ প্রকৃতির নিয়মে জটিলতা নেই।

তাপসের বাবার অধিবাস প্রধানত নীচের তলায়। সেখানে বিচিত্র সব লোকজনের গতায়াত। শেলফ-ঠাসা চামড়া বাঁধানো বই। সেখানে টাইপ মেশিনের একঘেয়ে শব্দ ছাপিয়ে মক্কেলদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। একদল লোক সেখানে বসে থাকেই, তাদের মনে শান্তি নেই। তাদের গায়ে অপরাধের গন্ধ থাকে বলে তাপসের মনে হয়। শুধু ওর বাবা একমাত্র শান্ত, একটু অন্যমনস্ক, ওই বিচিত্র নীচের তলার জগতে। খেতে আর শুতে ওপরে উঠে আসে বাবা, সেটা হোটেলে আসার মতো। কী রান্না হয়েছে আজ? অনেকদিন ফুলকপি খাই না। এই ধরনের মন্তব্য করে। কখনও কখনও তাপসকে তপন বলেও ডাকে। এই অমনোযোগী বাবার বাড়িতে মা হল নেত্রী। সব প্রতিষ্ঠানের মতো সংসারও একটা প্রতিষ্ঠান। তার একজন লিডার দরকার। যে উপার্জন করে, সেই যে লিডার হবে, এমন কোনও কথা নেই।

এইসব চিন্তা-ভাবনা চলছে, এমন সময় প্যাংলা গৌতম, যার টিফিনে আজ কেক আর হালুয়া, নট ব্যাড, খাওয়া শেষ করে নিজের বোতলের জল খেতে খেতে বলল, 'আমার বাবা অ্যাবসেন্ট। তুই ঠিক বলেছিস রঞ্জন।'

ওদের হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যায়। সত্যি, রঞ্জন ভেবেই দেখেনি, এই ছোট দলের মধ্যে তিন রকম বাবার ছেলেই আছে। অ্যাবসেন্ট বাবা মানে কষ্ট।

কিন্তু গৌতম এমন অদ্ভুত, ও কিনা বলল, 'বাবা থাকার অনেক উপকারিতা আছে। আমি স্বীকার করি। কিন্তু সব সময়ে, প্রতিদিন, বাড়ির মধ্যে বাবার প্রেজেন্স একটা নুইসেন্স। নিজেদেব প্রাইভেসি থাকে না। ডিগনিটি থাকে না।'

ওর কথা শুনে বাকি তিনজনের কষ্ট হঠাৎ উবে যায়। ওরা গৌতমকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, 'তুই মনের কথা বলছিস, না ঢপ দিচ্ছিস? বাবা অ্যাবসেন্ট—আমরা ভাবতেই পারি না।'

'আমি ওই প্রবলেমের মধ্য দিয়ে গিয়েছি বলে আজ জোর গলায় বলতে পারি, থাকলে কিছু করার নেই, সহ্য করতে হবে, তবে না থাকাই স্বস্তিকর। কিন্তু মা—না, মায়ের কোনও বিকল্প নেই।'

এবার রঞ্জন তার পর্যবেক্ষণ শক্তি খাটিয়ে জানাল, 'মায়েরা কিন্তু একপ্রকার।'

গৌতম বলল, 'রাইট।'

তাপস বলল, 'উদ্বিগ্ন। সব সময় উদ্বিগ্ন।'

স্বপন তার মোটকা চেহারা দুলিয়ে একটু দূরে ওদের দুই সহপাঠিনী—রেবা আর শম্পা—গল্প করছে, সেই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রঞ্জন—যার মধ্যে ফেলুদার প্রতিভা দু'-এক কণা থাকলেও থাকতে পারে—বলল, একবার ভাল করে অবজার্ভ কর ওদের। চোখের দিকে তাকা। দেখবি, ভবিষ্যৎ মায়ের উপাদান এখনই ফুটে বেরোচ্ছে। এমনভাবে কথা বলছে ওরা, যেন দুর্ঘটনা ঘটতে আর দেরি নেই। এতে কল্পনাশক্তির ক্ষতি হয়।'

মায়ের একমাত্র সন্তান হলে কী হবে, গৌতমটা রোগাপটকা। প্রায়ই অসুখে ভোগে। চেহারায় জৌলুশ নেই। হয়তো পৃথিবীতে একজনই ওর জন্যে চিন্তা করে। ওর আঙুলে কালির দাগ দেখলে মুছিয়ে দেয়। ও বলল, 'তবু মায়ের কোনও বিকল্প নেই। মায়েরা হল গাছের মতন। একটু বাতাস উঠলেই শোঁ শোঁ করে ওঠে। এই বুঝি ফলগুলো ঝরে পড়বে। হোম ইজ হোয়ের মাদার ইজ। ভাগ্যিস লালমোহনবাবু ধারেকাছে ছিল না। থাকলে নিশ্চয়ই বলত—গৌতমটা হাইলি সাসপিশাস।

১৯৯১

❀ মেরুন রঙের মিনিবাস

লেখাপড়া এমন কিছু নয়, কিন্তু রমেন প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওর ছেলেটিকে নিয়ে বসে। পুরো একটি ঘণ্টা ওকে পড়ায়, হাতের লেখা প্র্যাকটিস করায়, ছবি আঁকতে সাহায্য করে। তাতেও সময় না কাটলে গল্পসল্প করে। বেতালের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, রাজপুতকাহিনী। একটা মাঝারি সাইজের গ্লোব কিনে দিয়েছে গতমাসে। আনন্দকে, ওর ছেলের নাম আনন্দ, আনন্দমোহন, বিভিন্ন দেশ চেনায়, যাতে বড় হয়ে গোটা পৃথিবীটা সম্পর্কে ওর ধারণা অপরিষ্কার না থাকে।

আনন্দমোহন নামটা একটু সেকেলে। ওর ক্লাসের অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের নাম যেমন আধুনিক, তেমন নয়। সায়ণ, প্রবুদ্ধ, রাহুল, অনিরুদ্ধ—এসব নামও, আসলে পুরনোই, কিন্তু এখন আবার ফ্যাশন হয়েছে। রমেন, অনিল, জগদীশএসব নাম কেউ রাখে না আজকাল। তেমনই মেয়েদের নাম সুজাতা, ঊর্মিলা, লোপামুদ্রা। আবার দোলন, রুমকি, ঝুমুর এসবও চলছে। আদুরে নাম বড়লোকের মেয়েদের, যারা পরে কোম্পানি এক্সিকিউটিভদের স্ত্রী হবে, ববচুল ঝাঁকিয়ে, খিলখিল হেসে পার্টি আলোকিত করবে।

রমেন বড়লোক নয়, নিতান্ত মধ্যবিত্ত। কিন্তু ওর ইচ্ছে, ওর ছেলে বড় হয়ে কেউকেটা হোক। আনন্দমোহন বসু, কৃতবিদ্য পুরুষ ছিলেন, সেই যুগের প্রথম র‍্যাংলার, নামটা পেয়ে ওর ছেলে যদি তাঁর ধারে-কাছে যায়।

ঢের জল্পনাকল্পনা হয়েছে এ-নিয়ে রমেন ও সুলেখার। আজ নয়, গত চার-পাঁচ বছর ধরে। যখন ছেলের বয়স দু'বছর মাত্র।

'আরেকটু বড় হোক, তখন ভেবে দেখা যাবে।' রমেন হয়তো বলেছে।

'না।' সুলেখা শোনেনি। ছেলের ভবিষ্যৎ এখন থেকেই প্ল্যান করে ফেলা দরকার। স্কুলে ভরতি হবার বয়স হবার আগেই হয়তো বাসা বদলাতে হবে, টাকা জমাতে হবে। দরখাস্ত করে রাখতে হবে। তুমি যখন মনস্থির করবে, তখন ভাল ভাল স্কুলের দরোজা সব বন্ধ হয়ে গেছে, তাই তো?'

'ভাল ভাল স্কুল বলতে কী বোঝো, বলবে?'

'তুমি বোঝো বুঝি?'

প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন, তর্ক-বিতর্ক, আবার ঠান্ডা মাথায় আলোচনা করে শেষপর্যন্ত ওরা মনস্থির করেছে।

ভাল স্কুল মানে যে-স্কুলে সম্পন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়ে, ইংরেজি শেখায় যত্ন করে, যেখানে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যান্য বিষয়েরও চর্চা করা হয়, বাচ্চাদের চরিত্রগঠন হয় যেখানে, প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়।

মাসে পঁচিশ টাকা ফি, পঁচিশ টাকা বাসভাড়া—এই পঞ্চাশ টাকা বাঁধা। তার ওপর এটা-ওটা লেগেই আছে। এক বছর পর গত জানুয়ারিতে নতুন ক্লাসে উঠেছে আনন্দ। পুরো দু'শো টাকা এককালীন খরচ করতে হল। ছবি দেওয়া ইংরেজি বই শব্দ ও সংখ্যা চিনবার জন্যে, নানান রকম খাতা—রুল-টানা; ঘর-কাটা; লেখবার, আঁকবার। রঙিন পেনসিল, ক্রেয়ন। দু'সেট করে ইউনিফর্ম—প্যান্ট শার্ট টাই, বই-খাতা নেওয়ার বাকস, এইসব। অনেকটা রক্ত যেন শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে।

তা যাক। ছেলেটা যেন মানুষ হয়, রমেন ও সুলেখা শুধু এই প্রত্যাশা নিয়ে সব অসুবিধে সহ্য করে হাসিমুখে। না হলে, সর্বসাকুল্যে সাতশো টাকা মাইনে পাওয়া স্টেনোগ্রাফারের ছেলের জন্যে মাসেমাসে এতগুলো টাকা খবচ করার কোনও অর্থ ছিল না। রমেন নিজে বাংলা স্কুলে পড়েছে, সেখানে সবচেয়ে উঁচু ক্লাসেও তিন টাকা মাইনে ছিল। এখন বেড়ে হয়তো পাঁচ টাকা হয়েছে।

কোথায় পাঁচ আর কোথায় পঞ্চাশ। রমেন অবাক হয় এক-এক সময়। আবার ভাবে, সম্ভবত সেই কাবণেই ও গ্র্যাজুয়েট হওয়া সত্ত্বেও স্টেনোগ্রাফারের চেয়ে উঁচু পদে উঠতে পারল না। ওভারটাইমের দলে একজন স্টাফ হয়ে রইল। সত্যিই তো, ভাল ইংরেজি বলতে পারে না, ম্যানার্স বা কেতা শেখেনি। একস্ট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিস যাকে বলে, স্কুলজীবনে তার সুযোগ পেয়েছে নাকি কোনওদিন। অসংখ্য ছাত্র, তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে হয়তো ড্রামা স্টেজ করা হল, আবার অপর কয়েকজনকে বেছে গড়া হল খেলার টিম। অবহেলিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে থেকে, থার্ড বেঞ্চে বসে, মাঝারি ছেলে রমেন স্কুলের গণ্ডি পার হয়েছে। তারপর স্কটিশের চার বছর একটু খোলা বাতাস লেগেছিল গায়ে। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে সেই সময়টাও নষ্ট করেছে, সুতরাং বি এ-টা পাশ করেছে কোনওক্রমে। ব্যস, তারপর থেকে জীবিকার সন্ধান, জীবিকা অর্জন, জীবিকা নির্বাহ। যে অতিরিক্ত বস্তুটি থাকলে জীবনে উন্নতি করা যায়, তা ওর ছিল না কিংবা গড়ে ওঠেনি।

আনন্দর জীবন অন্যভাবে গড়ে তুলতে হবে, রমেন তাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পাড়াটা ঘিঞ্জি নয়। কাছেই ডিপো। দু'মিনিট হাঁটলে খালি বাসে বসে অফিস যাওয়া যায়। দু'কামরার ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট মানে ওই আর কী—দু'শো টাকা ভাড়া দিয়ে দক্ষিণ কলকাতার কাছাকাছি থাকতে চাইলে যা পাওয়া যায়। দুটো ছোট ঘর, এক চিলতে বারান্দার একপাশে একটা কল-পায়খানা বা বাথরুম, অন্যপাশে ঘুপচি মতো রান্নার জায়গা বা কিচেন, দিনে-রাতে আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। প্রথম ঘরটায় দু'খানা খাট ও আয়না-দেওয়া লোহার আলমারি—বিয়ের সময় পাওয়া, এবং একটা আলনা ছাড়া আর কিছু রাখার জায়গা হয় না। দ্বিতীয় ঘরটায় রাখা সব আসবাবপত্র অবশ্য রমেনের নিজের পয়সায় কেনা। বেতের নিচু চেয়ার তিনটে, একটা নিচু টেবিল, লোকজন এসে বসে, চা-টা দেওয়া যায়। আবার লোকজন যখন থাকে না, তখন আবরণটা তুলে ফেলে ওইখানেই ডাইনিংয়ের ব্যবস্থা। সুলেখার একটু এঁটোকাঁটার বাতিক, ভিজে ন্যাতা দিয়ে মুছে মুছে টেবিলটার পালিশ তুলে ফেলেছে। তবে, ওরই হাতের এমব্রয়ডরি-করা ঢাকনাটা যখন পেতে রাখে, তখন বোঝা যায় না।

এসবের মধ্যেই ঠাসাঠাসি করে একটা ছোট কাঠের টেবিল ও একটা কাঠের চেয়ার ঢুকিয়েছে রমেন। আনন্দর পড়ার ব্যবস্থা। এইখানেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়ম করে ছেলেকে নিয়ে বসে ও। পুরো একটি ঘণ্টা পড়ায়। টেবিলের ওপরে ওরই বইপত্র, খাতা, আঁকার সরঞ্জাম রাখা। এবং একটা গ্লোব।

গ্লোবের ওপর টর্চের আলো ফেলে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রমেন আনন্দকে দিন-রাত্রির পরিক্রমা বোঝাচ্ছিল।

'এই দ্যাখ, এই আমাদের ভারতবর্ষ— তিনকোনা নিমকির মতো, এখানে এখন রাত, অন্ধকার। আর এরই উলটোপিঠে আমেরিকা, সেখানে এখন দিন। আবার ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীটা যখন এই রকম জায়গায় আসবে, গ্লোবের তলা থেকে আঙুল সরিয়ে রমেন বলল, 'তখন আমাদের দেশে দিন, আর ও-দেশে রাত।'

পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দ ঘূর্ণ্যমান গ্লোবটা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, রমেনের মনে হল।

বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'হাঁ করে ভাবছিস কী? বুঝেছিস, আমি যা বললাম?

'বড় হয়ে আমি আমেরিকা যাব বাবা। বোয়িং প্লেনে চড়ে যাব। ওখান থেকে একটা ইলেকট্রিক ট্রেন নিয়ে আসব। সুরজিতের বাবা নিয়ে এসেছে একটা লাল ইলেকট্রিক ট্রেন, প্লাগ লাগিয়ে দিলে লাইনের ওপর দিয়ে চলে।'

'সুরজিৎ কে?' আনন্দর উৎসাহ-ভরা উজ্জ্বল বড় বড় চোখ দুটোর ওপর যেন কথাটা ছুড়ে মারল রমেন।

'আমার ক্লাসে পড়ে, সুরজিৎ গুইন। ওদের না একটা সাদা অ্যামবাসাডার গাড়ি আছে।'

এক মুহূর্তের জন্যে যেন রমেনের চোখের সামনে ভেসে উঠল সুরজিৎ গুইন নামক একটি হৃষ্টপুষ্ট শিশুর অবয়ব, তার খুশিভরা মুখ। মধ্যবয়স্ক, ধনী, ঈষৎ গম্ভীর ওর বাবা মিস্টার গুইন, যিনি প্রায়ই বিদেশে যান অফিসের কাজে, তাঁর সুন্দরী স্ত্রী—ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা দোলানো চুল কাঁধের ওপর, কাটা-হাতা জামা ফলের ওপর খোসার মতো মাপে মাপে বসা, তাঁর দীর্ঘ নীরোম বাহু, তৃপ্ত সন্তুষ্ট নিখুঁত মুখের রেখা। প্রকাণ্ড আলোকোজ্জ্বল তিন-চার কামরার ফ্ল্যাট। ফ্রিজ, রেডিয়োগ্রাম, কার্পেট, এয়ারকন্ডিশনার। দেয়ালে পেন্টিং, পেলমেট থেকে মেজে পর্যন্ত ঝোলানো ব্রোকেডের পরদা। সুরজিৎ সেখান থেকে রোজ সাদা অ্যামবাসাডার গাড়িতে স্কুলে আসে।

নিজের ছেলের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার চেয়ে দেখল রমেন। এত রোগা। গায়ে কিছুতে মাংস লাগছে না। অথচ চেষ্টার ক্রটি তো করা হয় না। নিজে না খেয়ে ওর জন্যে আলাদা দুধ কেনে। মাঝে মাঝে ডিমসেদ্ধ দেয় ছেলেকে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত রোজই দিত, এখন আর পারে না অবশ্য। একবেলা হোক, রোজই মাছ রান্না হয় বাড়িতে। রবিবার মাংস। মাসে একদিন মুরগি।

ছোটবেলায় কিন্তু বেশ মোটা ছিল ও। দেখলেই লোকে কোলে নিত। আদর করত। রমেন ভাবল, লোকের নজর লেগে ছেলেটা গেল শুকিয়ে, একটা-না-একটা অসুখ ওর লেগেই আছে সেই থেকে।

'দিশি কুকুরের বাচ্চা!' রমেনের মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল হঠাৎ।

'কে বাবা?' আনন্দ জিজ্ঞেস করে মুখ তুলে।

'কেউ না। তুই হোমওয়ার্কের খাতাগুলো বার কর তো। আর স্কুলে কী করিয়েছে দেখি।'

খাতাপত্র ওলটাতে ওলটাতে রমেনের মনে হল, যথেষ্ট প্রোগ্রেস হচ্ছে না ওর। পাতায় পাতায় লাল কালির দাগ। টিচাররা কি ওর প্রতি মনোযোগ দেয় না?

জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোন বেঞ্চে বসিস? ফার্স্ট বেঞ্চে বসিস না?'

'আমাকে বসতে দেয় না ওরা', নাকিসুরে জানাল আনন্দ।

'ওরা মানে কারা? আন্টি?'

সুরজিৎ, পাপিয়া, প্রবুদ্ধ—এরা আগে এসে ফার্স্ট বেঞ্চে বসে পড়ে।

'হারামজাদা!' আবার বলে ফেলল রমেন। রাগটা আসলে স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপর। পঁচিশ টাকা করে বাসভাড়া নেয়, স্কুল আরম্ভ হওয়ার অন্তত দেড় ঘণ্টা আগে তোলে আনন্দকে, অথচ ঠিক সময় পৌঁছোয় না। কিংবা, যখন পৌঁছোয়, সারা কলকাতা শহর থেকে বাচ্চাদের তুলতে তুলতে যখন স্কুলে ফেরে, তখন, ততক্ষণে গাড়িওলা সব বাপেদের ছেলেমেয়ে এসে ফার্স্ট বেঞ্চগুলো দখল করে বসে আছে। এই হল দুনিয়ার নিয়ম।

'বসতে দেয় না, ইয়ারকি!' রমেন ছেলের উদ্দেশে বলল, 'জোর করে বসবি, মারলে তুইও মারবি।'

'কিন্তু সুরজিতের গায়ে যে বেশি জোর। কী মোটকা ও।' আনন্দ ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়। ও জানে ও দুর্বল। এবং ভিতু।

'বুলি।' রমেন মনে মনে উচ্চারণ করল। তারপর কী ভাবল একটু। বলল, 'মোটকা তো কী? নাকের এইখানটায় একটা ঘুঁষি মারলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। কত পালোয়ানকে আমি শায়েস্তা করেছি।'

রমেনের মুঠো-করা হাতটার দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল আনন্দ। ওর ধারণা, বাবা প্রচণ্ড শক্তিমান, রেগে গেলে বাবার গায়ে বাঘের জোর এসে জমা হয়। একবার ওদের গলিতে একটা চোর ধরা পড়েছিল, কী মার মেরেছিল বাবা ওকে, রাস্তায় শুয়ে পড়ে লোকটা কাঁদছিল।

'তুমি তো বাঘ।' আনন্দ শক্তিমান বাপকে একটু তোষামোদ করল বোধ হয়। ছ'-সাত বছরের শিশুদের একটু সাধারণ বুদ্ধি থাকে।

'তুই বাঘের বাচ্চা। বড় হয়ে তুইও বাঘ হবি। কাউকে ভয় করবি না।'

পরের দিন অফিস থেকে ফিরে রমেন শুনল, আনন্দ স্কুলে 'পানিশ' পেয়েছে। সিঁড়ির নীচে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে আধঘণ্টা। আন্টি ওকে বকেছেন খুব। উপরন্তু, ওর বই-খাতার বাকসের মধ্যে চিঠি দিয়েছেন, ওর গার্ডিয়ান যেন দেখা করেন পরের দিন।

বুঝল, ফার্স্ট বেঞ্চে বসা নিয়ে মারামারি করে থাকবে। ধনীর দুলালের গায়ে আঘাত লেগেছে, তাই স্কুল কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। মুখে যা-ই বলুক ওরা, আসলে সেই বড়লোকের ধামা-ধরা। অথচ মাইনে তো সবাই সমান দেয়। মাত্র সাতশো টাকা মাইনে পায় বলে রমেনের কাছে কম টাকা নেয় না। রমেনের ছেলে সেখানে ফ্রি বা হাফ-ফ্রি ছাত্র নয়। তবে?

আনন্দকে ও কিছুই বলল না। স্থির করল, পরের দিন আনন্দকে নিয়ে ও নিজে যাবে স্কুলে। ন'টার একটু আগেই গিয়ে পৌঁছোবে। তারপর সেখানে কাজ সারা হলে অফিস। একটু দেরি হবে অফিসে, তা হোক। কোনও একটা অজুহাত দেওয়া যাবে। ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে ছেলেখেলা হতে দেবে না।

আটটার সময় গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল রমেন। বাস এলে পর বলে দিল, আনন্দ যাবে না। ফেরার সময় ফিরবে। বাসায় ফিরে এসে চটপট তৈরি হয়ে নিল। একটা বোঝাপড়া করতে হবে আজ। উত্তেজনায় ওর স্নায়ু চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সাধারণ প্যান্ট এবং বুশশার্ট পরে ও অফিস যায়। জুতোর নীচে মোজা পরে। আজ কিন্তু পরল পুরো-হাতা শক্ত-কলারের সাদা শার্টটা, এবং তুলে-রাখা ব্রাউন সুট। ভাল টেরিলিনের তৈরি, বিয়েব বছর বোনাস পেয়ে করিয়েছিল। ছ'-সাত বছরের পুরনো দেখে বোঝার উপায় নেই। নতুনের মতো এখনও ঝকঝক করছে। সেই সঙ্গে পরল লাল টাই, লাল ঠিক নয়, একটু নীলচে-মেরুন—ওর ওপরওলা বিদেশ থেকে এনে উপহার দিয়েছিল। দেওয়ার মধ্যে সম্ভবত একটু ইংগিত ছিল, ও যেন রোজ টাই পরে কাজে আসে। রমেন গ্রাহ্য করেনি। এখন জিনিসটা কাজে লাগল, ভাগ্যিস অপ্রয়োজনীয় ভেবে দিয়ে দেয়নি কাউকে। ফেলে দেয়নি!

ঝুঁকে জুতোর ফিতে বাঁধতে গিয়ে ওর কোটের বোতামটা গেল ছিঁড়ে। পেটের কাছটা একটু টাইট লাগছে।

সুলেখা চটপট সেলাই করে দিল বোতামটা। বলল, 'লাগাবার কী দরকার, বোতামগুলো খোলাই থাক না, টাইটা পুরো দেখা যাচ্ছে, ভাল লাগছে।'

কথাটা ওর মনঃপূত হল। আয়না-দেওয়া আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো চুল ঠিক করে নিল, কলার ধরে কোটটা টেনে নিল সামনের দিকে। তারপর আনন্দর হাত ধরে বলল, 'চল ট্যাক্সি করে যাব।'

বেরোবার মুখে খুব নরম সুরে সুলেখা অনুরোধ করল, 'মাথা গরম কোরো না যেন।'

স্কুলের গেটে ঢুকে চারপাশটা একবার দেখে নিল রমেন। তখনও লোকজন বিশেষ আসেনি। স্কুল আরম্ভ হতে এখনও কুড়ি-পঁচিশ মিনিট দেরি আছে।

আনন্দ ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল নিজের ক্লাসঘরে । বাচ্চাদের ক্লাস, বেঁটে বেঁটে ডেস্ক ও চেয়ারগুলো দেখে ও বুঝল। প্রত্যেকের আলাদা চেয়ার, আলাদা সিট, বোধহয় ছোটদের ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সামনে, দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা ব্ল্যাকবোর্ড—তার ওপর রঙিন খড়ি দিয়ে একটা প্রজাপতি আঁকা। ডাইনে-বাঁয়ে দুটো দেয়াল দু'রঙের। কয়েকটা প্রকাণ্ড জন্তুজানোয়ারের ছবি ঝোলানো রয়েছে—হাতি, গন্ডার, উট এইসব। বিদ্যাচর্চা থেকে ভয় ব্যাপারটা এরা বাদ দিতে চেয়েছে আর কী, রমেন ভাবল।

ক্লাসঘরে তখনও আসেনি কেউ। রমেন সর্বপ্রথম আনন্দকে নিয়ে, হাত ধরে, প্রথম সারিতে বসাল। বলল, 'এখান থেকে নড়বি না।'

একটু পরে একজন সুশ্রী অল্পবয়সি মহিলা ক্লাসে ঢুকলেন। নীল সিল্কের ছাপা শাড়ি পরনে, গায়ে জড়ানো জালি-কাটা নীল স্কার্ফ, কপালে নীলরঙের টিপ। সিঁথিতে একচিলতে সিঁদুরের রেখা দেখে রমেন বুঝল, মহিলা বিবাহিতা।

সপ্রতিভভাবে মহিলাটি ব্ল্যাকবোর্ডের নীচে নিজের জায়গাটির কাছে এসে দাঁড়ালেন। ওঁকে দেখেই আনন্দ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'গুড মর্নিং আন্টি।'

আন্টি উত্তর দিলেন, 'গুড মর্নিং আনন্দ। বোসো।'

রমেন এবার এগিয়ে গেল ভদ্রমহিলার কাছে।

বলল, 'গুড মর্নিং। আমি রমেন সরকার। আনন্দর বাবা, গার্ডিয়ান।'

রমেনের আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, 'ও, আচ্ছা। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। আসুন।'

দু'-একটা বই ছিল ওঁর হাতে। এবং হাতব্যাগ। সেগুলো নির্দিষ্ট টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ভদ্রমহিলা দরজার দিকে এগোলেন।

ঘরের বাইরে বারান্দা। রমেন তাঁর পিছু পিছু এসে সেই বারান্দায় দাঁড়াল। ইতিমধ্যে কোটের বোতামগুলো আবার লাগিয়ে নিয়েছে।

দুটো-একটা প্রাথমিক সৌজন্যসূচক কথা বলবার পর আনন্দর আন্টি রমেনের দিকে দ্বিধাহীন চোখদুটি মেলে বললেন, "দেখুন, আনন্দ ছেলেটি ভাল। এই বয়সের সব ছেলেমেয়েই ভাল থাকে, বেসিকালি। তবে, এখন ওদের চরিত্র গড়ে তোলার সময়। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোধ ক্রমশ ওদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হয়। লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব শিক্ষা দিতে আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু ভেবে দেখুন, কতটুকু সময় আমরা বাচ্চাদের পাই? দৈনিক তিন ঘণ্টা তা-ও শনি-রবিবার বাদে। অথচ, বারো মাস ত্রিশ দিন, দৈনিক ষোলো ঘণ্টা ওরা এক্সপোসড—যা দেখছে, শুনছে, অল্পবিস্তর বুঝছে, তা-ই অ্যাবসর্ব করছে।'

ভদ্রমহিলা ঠোঁট ছড়িয়ে হাসলেন। সুন্দর দাঁতগুলো দেখল রমেন। ভাল লাগল। বলল, 'সত্যি! একটা বাচ্চা মানুষ করা মুখের কথা?'

'আর এইখানেই বাপ-মায়ের গার্ডিয়ানের দায়িত্ব এসে পড়ে। বাচ্চার পারিবারিক পরিবেশ যদি অনুকূল না হয়, তা হলে, আমরা স্কুলে যা-ই শেখাই না কেন, ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই না?' ভদ্রমহিলা মূল প্রসঙ্গে এলেন এবার, বললেন, 'হারামজাদা', 'কুকুরের বাচ্চা'—এইসব গালাগাল, খারাপ খারাপ কথা আনন্দ শিখছে কোথাও থেকে। ঠিক নয়। আপনাকে, ওর মাকে, এখন থেকে অ্যালার্ট থাকতে হবে। অসৎ সঙ্গ থেকে ওকে গার্ড করতে হবে। আপনারা ওর বেশিরভাগ সময়ের গার্ডিয়ান।'

কথাগুলো বলে ভদ্রমহিলা আবার ক্লাসের দিকে এগোলেন।

লজ্জায় কেমন ছোট হয়ে গেল রমেন। মহিলাকে একটা ধন্যবাদ জানানো ওর উচিত ছিল, ভুলে গেল। বারান্দা থেকে ক্লাসঘরের দিকে চেয়ে দেখল, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে পড়েছে। ছোট ছোট চেয়ার দখল করে বসে পড়েছে ওরা। দূরে, প্রথম সারিতে, আনন্দ—তার পাশে মোটাসোটা একটি ছেলে, দু'জনে ঝুঁকে ছবি-কি কিছু একটা দেখছে। ও-ই বোধহয় সুরজিৎ গুইন, রমেন অনুমান কবল।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রমেন গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। গরম লাগছে। কোটটা খুলে ফেলল গা থেকে। খুলে ফেলল টাইটা, তারপর কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। গলার বোতাম খুলে স্বস্তি পেল এতক্ষণে।

গেটের সামনে অসম্ভব ভিড়। গাড়িতে গাড়িতে ছোট রাস্তাটায় ট্রাফিক জ্যাম। সবাই পুরোদমে হর্ন দিচ্ছে, অথচ একটা গাড়িও নড়ছে না। নড়বার জায়গা কোথায়! বিরক্ত হয়ে কেউ মাঝপথেই গাড়ি থামিয়ে বাচ্চার হাত ধরে পৌঁছে দিচ্ছে স্কুলে। এই হট্টগোলের মধ্যেই আবার গাড়িগুলোর পাশ কাটিয়ে, সামনে দিয়ে, পিছন দিয়ে পিলপিল করে পিছলে শিশুর দল ছুটছে স্কুলবাড়ির দিকে। ওদের হয়তো গাড়ি নেই। ওরা হয়তো স্কুলবাস থেকে বা পাবলিক বাস থেকে নেমেছে এইমাত্র।

'একটা বাচ্চা যদি চাপা পড়ে,' রমেন নিজেকে শুনিয়ে বলল, 'গাড়িগুলোয় আমিই আগুন ধরিয়ে দেব।'

কানে হাত চাপা দিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্কুল গেটের সামনে। না, চাপা পড়ল না কেউ। স্কুল ঘণ্টা বাজল। গেট বন্ধ করে দিল দারোয়ান।

ভিড় ক্রমশ পাতলা হয়ে এল একসময়। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ও লক্ষ করল একটা করে গাড়ি ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বড় রাস্তাটার দিকে, স্টিয়ারিংয়ে বসা উর্দি-পরা ড্রাইভার। কিংবা দামি শাড়ি-পরা কোনও অভিজাত মহিলা। ওদের নিস্পৃহ মুখ, মেশিনের মতো নিপুণ হাতের ভঙ্গি। বড় রাস্তায় পড়ে ও নিশ্চিন্ত হল যেন। ভিড় সেখানেও, কিন্তু যানবাহন থাকায় দ্রুত নিষ্কাশিত হচ্ছে।

কোটের পকেটে গোঁজা মেরুনরঙের বিদেশি টাই, কোটটা হাতে ঝোলানো, স্টেনোগ্রাফার রমেন একটা মেরুন রঙের ছিমছাম মিনিবাসে উঠে পড়ল টপ করে। নরম নিচু সিটটায় গুছিয়ে বসে তারপর সিগারেট ধরাল একটা। দেরি হয়ে যাবে, ট্রাম বা স্টেটবাসের হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া এখন সম্ভব নয়।

১৯৭৩

লৌকিকতার পরিবর্তে

গত বছর আমার ওপর দিয়ে যাকে বলে ঝড় বয়ে গেছে। সেই ঝড়ের দাপটে একেবারে হিমশিম খেয়ে গেছি। ছাপোষা মানুষ, দিন আনি দিন খাই। পারতপক্ষে ধার করতে চাই না। বিপদ আপদের কথা ভেবে আলমারির কোণে একটা বন্ধ খামের মধ্যে হাজারখানেক টাকা লুকিয়ে রাখা থাকে। বলা তো যায় না। ছেলেপুলে নিয়ে সংসার। কলকাতা শহর। হঠাৎ কেউ একজন পা ভেঙে কি মাথা ফাটিয়ে বাড়ি ফিরলে এক রাত্তিরেই অনেক টাকা গলে যাবে। তখন কোথায় হাত পাততে যাব? সেই লুকোনো তহবিলও আমায় ভাঙতে হয়েছিল।

ঠিক করেছিলাম, এ-বছর আমরা কোনও বিয়েবাড়িতেই নেমন্তন্ন খেতে যাব না। তা হলে উপহার দেবার প্রশ্নই ওঠে না। একটা অর্ডিনারি ধনেখালি কি কোটা শাড়ির দাম এখন বাড়তে বাড়তে আড়াইশো টাকা। সে-শাড়ি যাকে দেওয়া, সে আদৌ পরবে কিনা তার কোনও স্থিরতা নেই। হয়তো বিলিয়ে দেবে। দিয়ে কী লাভ! আর তারপর নেমন্তন্ন মানে তো কেটারারের হাতে বিরিয়ানি, চিলিফিশ খাওয়া—ও খেলেই বদহজম হয়। সাধ করে সেজেগুজে গিয়ে অসুখ ডেকে আনার কোনও অর্থ হয়? বরং আমি বলেছিলাম, ক্ষেত্রবিশেষে বিয়ের পর কোনও একদিন নবদম্পতিকে বাড়িতে ডেকে এনে ডাল-ভাত খাইয়ে দেওয়া যাবে।

এই প্রস্তাব ভোটে খারিজ হয়ে গেল। আমি কৃপণ এবং অসামাজিক নামে অভিহিত হলাম। তখন একটা রফা হল এই যে, শাড়িফাড়ি নয়, বিয়ে-পিছু একশো এক টাকার গিফ্‌ট চেক দেওয়া চলতে পারে। হোক অল্প টাকা, তবু নববিবাহিতদের কাজে লাগবে। অনেকগুলো গিফ্‌ট চেক জড়ো করে একটা ভাল জিনিস কিনতে পারে ওরা নিজেদের পছন্দমতো। সারাজীবনের জন্যে সংসার রচনা করতে চলেছে দুটি অনভিজ্ঞ ছেলেমেয়ে, তাদের কত কী শখ থাকতে পারে।

এ-বছর তাই আমি তৈরি হয়ে আছি। পুজোর হিড়িক কেটে গেলেই, জানি, নেমন্তন্ন চিঠি আসতে শুরু করবে। সেইসব লাল রঙের বাহারি খাম, কোনায় হলুদের ছোপ, দেখলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। নভেম্বর মাস থেকে শুরু, চলবে সেই মার্চ মাস অবধি। গত বছর সর্বসাকুল্যে একুশটা এই রকম খাম আমরাই পেয়েছি। অনুমান করা যায়, যারা আমার মতো কৃপণ বা দরিদ্র নয়, যারা সামাজিকতায় অভ্যস্ত, সমাজে যাদের নামডাক আছে, তারা কত বেশি নেমন্তন্ন চিঠিই না পায়!

এক-এক সময় মনে হয়, আমাদের এই বাঙালি হিন্দু সমাজে এই যে জাঁকজমক করে বিয়ে দেওয়া, লোক খাওয়ানো, এ-প্রথা এবার বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। সকলেরই পয়সা নষ্ট। সেই রেজিস্ট্রি করে একটা বিয়ে তো হচ্ছেই। যেটা আইনসম্মত। আত্মীয়স্বজন সাক্ষী রেখে কন্যা সম্প্রদান করা—একসময় তার প্রচলন ছিল, প্রয়োজনও ছিল। এখন শুধু ঐশ্বর্য প্রদর্শনী। বা প্রতিযোগিতায় পাল্লা দেওয়া। কীসের প্রতিযোগিতা? সত্যি কথা বলুন তো, ধনরত্ন নিয়ে লোকদেখানোর দিন আর আছে? দৃশ্যটা ভাবুন : নিভেতিয়া হাউসের প্রশস্ত লন। পার হয়ে বারান্দা, বিশাল বিশাল ঘর। মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন। মার্বল ফ্লোর, তার ওপর কার্পেট। সিংহাসনে কনে বসে আছে। লাল ভেলভেট ঝকমক করছে। উর্দি-পরা

কেটারারের স্টাফ। একদিকে ভেজ, অন্যদিকে নন-ভেজ। একদিকে বসে খাওয়া, অন্যদিকে বুফে বা দাঁড়িয়ে খাওয়া। গাছের নীচে রঙিন ছাতার তলায় জিলিপি ভাজা হচ্ছে গরম গরম। বেরোবার মুখে পান। লোকে এক পেট খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে মন্তব্য করছে—শালার ব্ল্যাকমানি, কিছু বদরক্ত বেরিয়ে গেল আজ। কেউ বলছে, এদের জন্যে বাজারে এখন মাছ একশো-দেড়শো টাকা কিলো। সমাজবিরোধী এরা নয় তো কারা?

আমি জানি, এ-সব হিংসের কথা। আমার মতো যারা একখানা ধনেখালি শাড়ি দিতে গিয়ে হিমশিম খায়, তারাই বলে। বলুক। আমি এবার একশো এক টাকার গিফ্‌ট চেকে উপহার সমস্যার সমাধান করে নিয়েছি। তাতে এক কিলো মাছেরও দাম ওঠে না তো আমি কী করব। আমার বিবেক পরিষ্কার। আমার মনে কোনও দুঃখ নেই।

দুঃখ দিল অনুপম। অনুপম হালদার।

সেদিন মাসের সংসারখরচ বাবদ টাকা তুলতে ব্যাঙ্কে গেছি। চেক দিয়ে টোকেন পেয়েছি হাতে। দশ-পনেরো মিনিট সময় লাগবে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা বসার জায়গা খুঁজছি, এমন সময় অনুপম ডেকে বসাল। ওর হাতেও টোকেন।

আমি হেসে বললাম, আর কোথাও দেখা হয় না, এখানে ঠিক দেখা হয়ে যায় মাসে একবার।

ও বলল, কেন, বিয়েবাড়িতেও দেখা হয় মাঝে মাঝে। সেই যে নিভেতিয়া হাউসে বরুণ চক্রবর্তীর ছেলের বিয়েতে দেখা হল। মনে নেই?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে বই কী। গরম গরম জিলিপি আর গোলাপ জামুন। আলি হোসেনের সানাই। আমার বউ একটা ধনেখালি শাড়ি উপহার দিল।

অনুপম বলল, আটশোজন লোককে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিল বরুণ চক্রবর্তী। কলকাতার এক নম্বর কেটাবার, ভূরিভোজন—তাদের স্পেশাল মেনু। অন্তত দেড়শো টাকা প্লেট। মনে নেই? আমরা বলাবলি করছিলাম, লাখ টাকার ওপর খাওয়াতেই খরচা করে দিল বরুণ। কোনও ভি আই পি বাদ ছিল না।

ওর কথা শুনে মনে মনে ভাবি, তা হলে আমার লস্ হয়নি। গিফট চেকের বদলে আড়াইশো টাকা দামের উপহার দিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে তিনশো টাকা দামের খাবার খেয়ে এসেছি সেদিন। মুখে বললাম, তুমি এত খুঁটিনাটি খবরও রাখো।

অনুপম বলল, আমার পাঁচখানা গাড়ি ভাড়া নিয়েছিল আটদিনের জন্যে। আমারই বিল কুড়ি হাজার টাকা। দুঃখের বিষয়, বিয়েটা টিকল না।

আমি আঁতকে উঠি, সে কী?

ছ'মাসের মধ্যে নতুন বউ পালিয়েছে।

পালিয়েছে মানে?

ফিরে গেছে বাপের বাড়িতে। শ্বশুরবাড়িতে ওর পোষাল না। আজকালকার মেয়ে—

বলতে লজ্জা নেই, অনুপমের দেওয়া এই মারাত্মক সংবাদ পেয়ে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, বৃথা গেল ধনেখালি। দ্বিতীয় চিন্তায় মানবিক বোধ জাগল, তখন মনে হল, বেচারা বরুণ চক্রবর্তীর কোন না দু'লাখ টাকা জলে গেল। এত কষ্টের বিয়ে। শুনেছিলাম, ওরা সেই কলেজবেলা থেকে প্রেম করছে। ওদের নাম দুটিও ছন্দে বাঁধা। নিভেতিয়া হাউসের গেটের ওপর জুঁই ফুল দিয়ে লেখা : 'গৌতম ওয়েডস পৌলমী' এখনও চোখের ওপর ভাসছে। সেদিন ভিডিয়োতে কত ছবি তোলা হল।

ভেতরের খবর জানি না বাপু, অনুপম টোকেন নাচাতে নাচাতে বলে, আমি টেম্পো ভাড়া করে দিলাম, তাতে করে ফ্রিজ, টিভি, গোদরেজের আলমারি আর চারখানা সুটকেস চাপিয়ে মেয়েটা চলে গেল।

প্রথম খবরটায় আঁতকে উঠেছিলাম। তারপর, যেমন বাড়িতে কারুর জন্ডিস হলে ক্রমে ক্রমে জানতে পারা যায়, অনেকের বাড়িতেই জন্ডিস হচ্ছে, তেমনি আমিও একটার-পর-একটা বিয়ে ভাঙার খবর পেতে থাকি। সবক'টা খবরই এই রকম অদ্ভুত ধরনের। মানে, সম্পর্ক জমতে-না-জমতে ছাড়াছাড়ি।

বিয়ে-বিচ্ছেদ আজকালকার দিনে এমন কিছু অভাবনীয় ঘটনা নয়। গল্প, উপন্যাস, নাটকে, টিভি সিরিয়ালে আমরা হামেশা কী দেখি? দেখি, দুটি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হতে হতে ভালবাসা হল, নানাভাবে সেই ভালবাসার প্রকাশ হতে থাকল, যা থেকে বোঝা যায়, একে অন্যকে

ছেড়ে আর এক মুহূর্তও থাকতে পারছে না। তারপর এল বাধা। আগে ছিল জাতপাতের বাধা, পারিবারিক মর্যাদার বাধা, বিধবা-বিয়ের বাধা। এখন সে-সব ঘুচে গেছে তত্ত্বগতভাবে। এখন প্রধান বাধা ধনী-দরিদ্রের মধ্যেকার সম্পর্কে। বা তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে, ঘটতে দেখি। শেষপর্যন্ত অবশ্য সব বাধা কাটিয়ে নায়ক-নায়িকার বিয়ে হয়ে যায়। আমরা নিশ্চিন্ত হই। সেইখানেই পরদা টেনে দিই। ভাবটা, এরপর তারা সুখে স্বচ্ছন্দে 'বসবাস করিতে লাগিল'।

বাস্তবে যুগলজীবনের বসবাস আর তত সহজ নেই। উপরন্তু, গল্প-উপন্যাসে যাই হোক, বাস্তবে শতকরা আশিটি বিয়ে এখনও ভালবাসার সূত্রে নয়, পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন সূত্রে ঘটে। সেখানে নায়ক-নায়িকা বা তাদের পরিবার পরস্পরকে ভাল করে জানবার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। তারপর গোলমালগুলি ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে। সংঘর্ষ বাধে। পত্রপত্রিকায় আমরা পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখি। আর নারী-নির্যাতনের খবর পড়ি। মাঝখানের ঘটনা জানতে পারি না।

তবে, আমি এমন একটি মেয়েকে জানি, যে বিয়ের কিছুকাল পরেই আবিষ্কার করেছিল তার স্বামীর সঙ্গে আর একটি মেয়ের মধুর সম্পর্ক আছে। কেটে যাবে ভেবে সে পাঁচ বছর অপেক্ষা করেছিল। তারপর একদিন বাহুতে ও পিঠে অনেকগুলো সিগারেটের ছেঁকা নিয়ে সে বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। তখন তার একটি সন্তানও জন্মেছে। আগেকাব কাল হলে সন্তানের টানে মেয়েটি তার অশান্তিময় জীবন মেনে নিত। এর উলটোটাও দেখেছি। বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে প্রেমে জড়িত মেয়েকে উদ্ধার করতে তার বাপ-মা খুঁজেপেতে এক আমেরিকাবাসী এন আর আই-এর সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। সে বেচারি গিয়ে দেখে স্বামী লোকটা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। খবরের কাগজে রোজই নানা রকম নাবী-নির্যাতন, বধূহত্যার খবর পড়ি। সেদিন পড়লাম, ফিলিপিনের শান্তশিষ্ট মেয়েরা সুখের সন্ধানে বিদেশে পাড়ি দেবার সময় আজকাল একগুচ্ছ কনট্রাসেপটিভ আর ফেরার প্লেনভাড়ার টাকা সঙ্গে নিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করলে বলে, স্বামীর আসল চেহারা জানার জন্য আর জানার পর এগুলি দরকার হতে পারে। আমার এক বিদেশি বন্ধু গত বছর কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল। কথায় কথায় বলল, উন্নত দেশে এখন বিবাহিত জীবনেব আয়ু গড়ে ছ'বছর। তার পরেই ওরা ফেডআপ হয়ে যাচ্ছে। তবে আমাদের দেশের মতো ওরা আশা করে না যে, বিয়ের আগে পর্যন্ত পাত্র-পাত্রী অখণ্ড কৌমার্য নিয়ে বসে থাকবে। বিয়ের পরে ফেথফুল থাকলেই হল। কৌমার্যের সংস্কার আমাদের দেশে আছে, অবশ্যই। চিরকালের মতো মিলিত হতে যাচ্ছে যে নরনারী, তারা শবীরটাকে শুদ্ধ রাখবে না? মেয়েদের পক্ষে সেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি, কেননা ওদের শরীর দিয়েই শিশু আসে। মায়ের স্বাস্থ্য সন্তানের ওপর বর্তায়।

এইসব অর্জিত জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আমি পৌলমীর সিদ্ধান্ত বোঝবার চেষ্টা করেছিলাম। ধনেখালি শাড়ির শোক ভুলে গেছি ততদিনে।

একদিন অনুপম হালদারের সঙ্গে আবার ব্যাঙ্কে দেখা। ও কর্মচারীদের মাইনের টাকা তুলতে এসেছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, পৌলমীর কোনও খবর রাখো?

কে পৌলমী?

ওই যে, বরুণ চক্রবর্তীর পুত্রবধূ। বিয়ের পরেই যে পালিয়ে গেল শ্বশুরবাড়ি থেকে। তুমিই তো বললে।

পালিয়ে তো যায়নি। সদর্পে গৃহত্যাগ করেছে।

আমি বললাম, ওর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

ও অবাক হল আমার কথা শুনে। ভাববাচ্যে বলল, কচি মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করার বাতিক আছে জানতাম না তো।

আমিও হেসে বললাম, আমার কাছে বয়সের কোনও বাছবিচার নেই।

মেয়ে হলেই হল?

আপাতত তাই।

এরপর আসল কথাটা ভাঙল অনুপম হালদার। বলল, পৌলমী বলাতে ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি ওকে মিস সেন বলেই ডাকি। মেডেন নেম। আমার কার রেন্টাল বিজনেসে নিয়েছি ওকে। অনেস্ট আর খুব এফিশিয়েন্ট।

তো অনুপমের মধ্যস্থতায় ওকে পেলাম। ও বোধহয় ভেবেছিল, কোনও কাগজের আপিসে গাড়ি ভাড়া করা নিয়ে কথা বলতে চাই। রেস্তরাঁয় ঢুকতে-না-ঢুকতে রঙিন কালিতে ছাপা ব্রোশিওর বার করে টেবিলের ওপর রাখছে, আমি বললাম, আমার দরকার অন্য রকম।

সপ্রতিভ মেয়ে, ঘাবড়ে না গিয়ে বলল, কী রকম?

আমি তোমাকে, তোমার মতন মেয়েকে, বুঝতে চাই। এটা আমার কাজের পক্ষে জরুরি। তাই কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব।

কাগজে ছাপবেন?

সেইভাবে না।

বিয়ের কনে হিসেবে যখন দেখেছিলাম তখন ওকে আর সব কনেবউয়ের মতোই দেখেছি। জমকালো শাড়ি। গা-ভরা গয়না। মাথায় ঘোমটা। মুখের চারদিকে কনে-চন্দনের ফুটকি। রেস্তরাঁর টেবিলে সে একেবারে অন্য মানুষ। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল। বড় বড় চোখদুটো বুদ্ধিতে চকচক করছে। মুখে আলতো হাসি। গায়ের রং খুব ফরসা নয়। গলায়, হাতে কোনও অলংকার নেই, একটি হাতঘড়ি ছাড়া। সব মিলিয়ে বেশ আকর্ষণীয় চেহারা কিন্তু খুব মিষ্টি চেহারা নয়।

আমি বললাম, তোমার সঙ্গে গৌতমের অনেক দিনের পরিচয়। তারপর বিয়ে হল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়ে তোমাদের বিয়ে দেখল। আমিও গিয়েছিলাম সেই নিভেতিয়া হাউসের রিসেপশনে। তারপর হঠাৎ তুমি সব ছেড়েছুড়ে চলে এলে। কেন?

পোষাল না। দ্যাটস অল।

না। দ্যাটস নট অল। বরুণ চক্রবর্তীর মত মানী লোকের মাথা হেঁট হয়ে গেছে তোমার অদ্ভুত ব্যবহারে। বুঝতেই পারো। গৌতমের মনের অবস্থা কী রকম হতে পারে, তা না-ই বা বললাম।

পৌলমী বলল, মানুষ তো একসময় ঘুরে দাঁড়াবে।

আমি অনুমান করতে পারি, ওর মনের মধ্যে অনেক ক্ষোভ জমে আছে। আর একটু জানার জন্যে জিজ্ঞেস করি, শাশুড়িকে নিয়ে সমস্যা?

পৌলমী এর কোনও উত্তর না দেওয়ায় আমিই প্রস্তাব করি : আজকাল আধুনিকা শাশুড়িরা অনেক সহিষ্ণু হয়েছে। তবু, একমাত্র ছেলে, হঠাৎ একটা মেয়ে বাইরে থেকে এসে তাকে কেড়ে নিচ্ছে, চোখের সামনে এই ব্যাপার সহ্য করা, হাসিমুখে মেনে নেওয়া, মুশকিল। অবশ্য, নতুন বউ—সেও তো তার সমস্ত অতীত জীবন মুছে দিয়ে সংসার করতে এল—সে ছাড়বে কেন।

না, না, শাশুড়িও ভিকটিম, শুকনো দাঁতের হাসি টেনে ফাঁক করে পৌলমী কেটে কেটে বলল, আসল জিনিস হল পোষা হাতি দিয়ে বুনো হাতি বশ করা, বুঝলেন কিনা। খোঁকাকে নাম ধঁরে ডেঁকো না বৌমা, ওঁটা আমি পঁচন্দ কঁরি না,—

তোর পছন্দের কে কেয়ার করে মাগি? তুই নিজে কী?

আমি হঠাৎ বলে ফেলি, অকারণ হাসো কেন? যখন হাসির কথা হবে, তখন হাসবে।

আমার স্বভাব। ও বলল, অনেক দিনের দাম্পত্য সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়, আপনি মানেন?

আমি বললাম, ওভাবে ভাবিনি। তবে একক জীবন মুছে দিয়েই তো যুগলজীবনে আসা।

ও বলল, ওইটেই ট্র্যাপ। যুগলজীবন বলে কিছু হয় না।

চা এল। মেয়েদের চিরাচরিত ভুমিকা পালন করল না পৌলমী। বেয়ারাকে বলল, ছেঁকে দাও।

একসময় আমি জিজ্ঞেস করি, গৌতমকে তুমি ভালবাসনি?

বন্ধু হিসেবে পছন্দ করেছি। শিক্ষিত, মার্জিত রুচির ছেলে ও। কিন্তু প্রত্যেকবার ইন্টারকোর্সের সময় ও আমাকে অপমান করেছে।

অপমান করেছে?

তা ছাড়া কী? আমার বডির ওপর যেভাবে ধামসেছে, যেন আমি একটা মানুষ না। যেন আমি একটা যৌনযন্ত্র। আমাকে ও কিনে এনেছে, তারপর ঢোলের মতো যেমন খুশি বাজাতে চাইছে। কিন্তু আমি তো ঢোল নই, আমি পৌলমী।

ক্রমশই ওর কণ্ঠস্বর রূঢ় হতে লাগল। কিন্তু মুখের হাসিটা ও পরেই আছে। তাতে ওকে আরও নির্দয়

মনে হয় আমার। এতটুকু মেয়ে। আমার অর্ধেকের চেয়ে কম বয়েস ওর, কিন্তু কথা বলছে যেন আমার সমবয়সি। উকিলের মতো ওর এক-একটা কুযুক্তি।

আমি বললাম, এ জিনিস তো তুমি নিজের বাড়িতেও দেখেছ নিশ্চয়। তোমার বাবা-মা তোমার দাদা-বউদি। তখন কিছু মনে হয়নি?

মনে হয়েছে।

তা হলে বিয়ে করলে কেন?

করতে চাইনি। অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। শেষকালে গৌতম এমন ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল, ভাবলাম দেখি, ব্যাপারটা পবীক্ষা করে দেখা যাক। নিজের ওপর দিয়ে যাচাই করা যাক।

বরুণ চক্রবর্তী এত খরচ করল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেমন্তন্ন করে এনে খাওয়াল। ভিডিয়ো-য় ছবি উঠল কত। লাখ টাকার ওপর—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পৌলমী বলে, যা স্থায়ী নয়, তাকে স্থায়িত্ব দিতে। সম্পর্কের ওপর পেরেক মেরে দেওয়ার জন্যে এই বিয়ে-প্রথার উদ্ভব। পোষা মেয়েশরীর ব্যবহার করে যাতে খিদে মেটে, যাতে বংশবৃদ্ধি নিরাপদ হয়। কী সাংঘাতিক ব্যবস্থা ভাবুন তো। আমি ছিটকে বেরিয়ে এসেছি। আর একটু দেরি করলেই ওরা ধরে ফেলত।

ওরা মানে?

সিস্টেম।

এখন কী করবে?

নিজের মতো করে জীবন কাটাব। কাটাচ্ছি। আমি তো কারুর গলগ্রহ নই।

উঠতে উঠতে আমি বললাম, তুমি একটা পাগলি। এবার খিলখিল করে হাসে পৌলমী। এ-হাসির মধ্যে কোনও তিক্ততা নেই। আমি যে ক্রমশ ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি ওর সপ্রতিভতায়, হোক আমার বয়েস ওর চেয়ে অনেক বেশি, পুরুষমানুষ তো, মেয়ে হয়ে সেটা ও উপভোগ করল।

সত্যি, এ-যুগের ছেলেমেয়েরা অন্য রকম। আমি ভাবি এদের বিয়েতে লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদই প্রার্থনীয়। কিন্তু আমার মতো ছাপোষা মানুষের পক্ষে কি আশীর্বাদ করা সাজে?

১৯৯৫

পাতা ও পাখিদের আলোচনা

ক্লাস শেষ হওয়ার পর বারান্দায় বেরিয়ে শেখর চোখ থেকে তার রিডিং গ্লাসটা খুলে পকেটে রাখল। রুমাল বার করে মুখ মুছল।

ছাত্রছাত্রীরা কলরব শুরু করে দিয়েছে। দেখতে সব বড়সড় হলে কী হবে, স্বভাবে একেবারেই বালক-বালিকা। ওই রকমই সরল। মেয়েরা এ-ওর গায়ে হাত দিয়ে কথা বলছে। হাসছে। ছেলেদের কারুর মুখ গম্ভীর, গালে রোঁয়ার মতো ঝুরঝুরে দাড়ি, কারুর চুল কপাল থেকে ঝুলছে। পরনে ধুতি কিংবা পাজামা। কদাচিত প্যান্ট। মেয়েদের পরনে শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজ। একটু আগে এরাই মুগ্ধ হয়ে শেখরের কথা শুনছিল। সেই বয়েসের ছেলেমেয়ে এরা, যখন বইতে যা কিছু লেখা থাকে, সব বিশ্বাস করে। অধ্যাপকের মুখ-নিঃসৃত বাণী সব খাতায় টুকে নেয়। কলকাতার ছেলেমেয়েদের তুলনায় কেমন যেন একটু বেশি রোগা এরা। শেখরের মনে হয়, হস্টেলে থাকে তো, পেট ভরে খেতে পায় না। একটু দূরে একটা বেঁটে মতন শাল গাছ। তার গায়ে ঠেসান দেওয়া কয়েকটা সাইকেল।

চোখে চোখ পড়তেই শেখর মেয়েটিকে ডাকল ইশারা করে। ওকে অভয় দেওয়া দরকার। ও হয়তো

ভাবছে, স্যারের মুখের ওপর কথাটা বলা উচিত হয়নি। নিজেও এগিয়ে গেল দু'-এক কদম। জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী?

ওর ভিতু চোখের দিকে তাকিয়েছিল শেখর। উত্তরটা শুনতে পেল না।

তোমার প্রশ্নটি আমার ভাল লেগেছে। এককথায় তো এর উত্তর হয় না। একদিন অতিথিশালায় এসো—আমার ঘরে। তোমার সঙ্গে কথা বলব, কেমন? কাউকে সঙ্গে নিয়ে এসো—সকালের দিকে।

মেয়েটি বলল, আমি একাই যাব। হস্টেল থেকে তো কাছেই। আমার সাইকেল আছে। আপনার অসুবিধে হবে না তো?

শোরগোলের মধ্যে ওর সব কথা শুনতে পায়নি শেখর। একটু হেসে বলল, ঠিক আছে।

বাইরে রোদ বেশ চওড়া। শেখর ছাতা খোলে। খানিকটা খোয়ার রাস্তা। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট। বাইরে দুটো সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। রিকশাওলা ওর দিকে তাকিয়ে ঘণ্টি বাজায়। শেখর ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে যায় পিচের রাস্তার দিকে। খানিকটা পথ হেঁটেই চলে যাবে। রিকশা নিলেই দু'টাকা।

যেতে যেতে ভাবে, ছাত্রীকে অতিথিশালায়—ওর ঘরে আসতে বলা কি অনুচিত হল? তা ছাড়া কোথায় আর নিরিবিলি পাওয়া যাবে? ও তো অন্যায় কাজ কিছু করতে চাইছে না। আর, বলল তো, ইচ্ছে করলে কাউকে সঙ্গে নিয়ে এসো। ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষক কথা বলবে—এতে আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে? আসলে, এই সম্পর্কটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না শেখর। ওর নিজের একটা মেয়ে-সন্তান নেই। একটা মেয়ের শৈশব থেকে বড় হয়ে ওঠা প্রত্যক্ষ না করায় অসম বয়সের দুই নারীপুরুষ কতটা পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ হলে মানানসই হয়, কত দূর গেলে সামাজিক সীমা লঙ্ঘন করা হয়ে যায়, ও আন্দাজ করতে পারে না। ছাত্রী—সে তো সন্তানেরই মতো। তবে এখানে আসার পর ছাত্রী-শিক্ষক সম্পর্ক নিয়ে কিছু রটনাও শুনল। শিক্ষক, অধ্যাপক—মাস্টারমশাই তো, তবে বিশেষ একরকম ব্যক্তিত্ব থাকা উচিত। কিন্তু শেখর তো পেশাদার অধ্যাপকও নয়। এখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। কিছুদিন থেকে, কাজ করে চলে যাবে। ও মূলত একজন লেখক। লেখকের সহজাত কৌতূহল ওর আছে। অধ্যাপকীয় নিস্পৃহতা ও বানিয়ে তুলতে পারে না। আর সেটাই বোধহয় কাম্য। না হলে এখানে ওকে ডেকেছে কেন? কেন বলেছে, আপনাকে পাঠক্রম নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না? সাহিত্যকর্মে আপনার অভিজ্ঞতা আব উপলব্ধির কথা ছাত্রছাত্রীদের বলুন। এই মেয়েটি—কী যেন নাম? মনে পড়ছে না—যদি ছেলে হত, ছাত্র হত, তা হলে কোনও সমস্যা ছিল না।

এখনও সমস্যা কিছুই নেই। তবে, সেদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর অতিথিশালার বাইরে, বাগানে, ফুরফুরে হাওয়ায় আকাশের নীচে চেয়ার পেতে বসে, এখানকার কেয়ারটেকারের মুখে যে গল্প শুনল, তাইতেই মনে ধন্দ লেগেছে। কেয়ারটেকার বলছিল দু'বছর আগেকার এক ঘটনার কথা। বাইরের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষক হয়ে এসেছেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। এখানেই উঠেছেন। সারাদিন নানা ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে তাঁর। কত লোক আসা-যাওয়া করেছে তাঁর ঘরে। মধ্যরাত্রে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ওই নীচের তলার পাঁচ নম্বর ঘর। একটি মেয়ে ছুটে এসে কেয়ারটেকারকে তুলল ঘুম থেকে। বলল, এখুনি ডাক্তার ডাকুন, স্যারের বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে। খুব ঘামছেন। বলতে বলতে মেয়েটি কাঁদছিল। সেই রাত্রেই তিনি মারা যান। সব চুকেবুকে যাওয়ার পর কথা ওঠে—ওই মেয়ে, এখানকার ছাত্রী, ওঁর ঘরে ঢুকল কী করে? তা কেয়ারটেকার কী করে জানবে? সে কি ঘরে ঘরে উঁকি দেবে রাত্তিরবেলা? এমনও তো হয়, বাইরে থেকে বাবা কি কাকা এলে হস্টেল থেকে ছাত্র বা ছাত্রী এসে তাঁর সঙ্গে থাকে। তখন তো কেউ কিছু বলে না।

আপনি তো পড়াতে এসেছেন, কেয়ারটেকার বলছিল—এখন আপনার কাছে কেউ যদি পড়া বুঝতে আসে, আমি কি তাকে আটকাব? আমি কি বলতে পারি, আপনারা নীচের বসার ঘরে এসে কথা বলুন?

না। শেখরের ছাত্রীকে ও আটকায়নি। ও সোজা দোতলায় উঠে গেছে। বাইরে থেকে খুব নিচু গলায় ডেকেছে—স্যার, স্যার, আমি এসেছি। দরজা ভেজানো ছিল। শেখর খুলল। ওর কানের পাশে তখনও সাবানের ফেনা লেগে রয়েছে। ঢুকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল মেয়েটি। শেখর বলল, থাক,

থাক। ঘরের দু'পাশে দুটো খাট। দু'জনে দুটো খাটে বসল মুখোমুখি। মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। কুড়ি-একুশ বছর বয়েস হবে। এম এ পড়ছে।

কী যেন নাম বলেছিলে তোমার?

পাতা।

পাতা? শেখর বলল, শুধু পাতা। পাতা কী?

শুধুই পাতা হয়ে এসেছি। গাছের যেমন ফুল হয়, ফল হয়, তেমনি পাতাও তো হয়। তবে স্কুল-কলেজে পড়তে গেলে নামের পরে একটা টাইটেল লাগে। টাইটেল ধরলে পাতা চক্রবর্তী। চক্রবর্তীটা বানানো।

'বানানো' শব্দটা বলতে গিয়ে এমনভাবে হাসল মেয়েটি যে, শেখরের মনে হল, পাতা তার পৈতৃক উপাধিকে তাচ্ছিল্য দেখাচ্ছে। সেদিন ক্লাসেও সে কী একটা প্রসঙ্গে বলেছিল, ওটা বোধহয় বানানো। কবির অনুভূতি থেকে আসেনি। পাতা চুপ করে বসে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরটা দেখছে। কী আর আছে দেখার! খাট দু'খানা বাদ দিলে একটা টেবিল, একটা হাতলওলা চেয়ার। টেবিলে খান কুড়ি বই এলোমেলোভাবে রাখা। একটা ঘড়ি। ঘড়ির কাঁটায় ন'টা বেজে দশ মিনিট। এক পাশে জলের গ্লাস, কাপ, প্লাস্টিকের জাগ। প্লাস্টিকের থলেতে দুটো পাকা কলা আর অ্যালুমিনিয়ামের একটা কৌটো। তার মধ্যে রয়েছে দু'দিনের বাসি মিষ্টি। শেখর বাথরুম থেকে একবার ঘুরে এসে জিজ্ঞেস করল, মিষ্টি খাবে? খুব টাটকা নয় কিন্তু। বিস্কুট দিতে পারি। আর কিছু তো নেই।

পাতা কিছুই খাবে না। ও তো কথা বলতে এসেছে।

শেখর বলল, সেদিন কী যেন পড়াচ্ছিলাম?

জীবনানন্দ দাশের 'পাখিরা'। আপনি রবীন্দ্রনাথের প্রেমধারণার সঙ্গে জীবনানন্দের প্রেমচেতনার তুলনা করছিলেন। ওই জায়গাটা দু'-তিনবার পড়লেন—'ভালবাসা আর ভালবাসার সন্তান/আর নেই নীড়/এই স্বাদ গভীর—গভীর।' তার আগেই ছিল ওই লাইনটা— 'ওদের প্রথম ডিম জন্মাবার হয়েছে সময়।'

না। লাইনটা ভুল বললে। শেখর সংশোধন করে দেয়। ওটা হবে, 'তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়।' জীবনানন্দের শব্দ একদম উলটোপালটা করা যায় না, বুঝলে। সব ওজন করে বসানো।

পাতা বলে, তখন আমি বলেছিলাম, সন্তানের কথা ভেবে কি কেউ ভালবাসে? ওটা কবির বানানো। আমার বলা উচিত হয়নি। কবিতার কতটুকু বুঝি? আপনি রাগ করেননি তো স্যার?

শেখর চুপ করে শুনল ওর কথা।

না, রাগ করিনি। তবে মনে খটকা লেগেছে। কেন তোমার এমন কথা মনে হল, আমি ভেবেছি। তারপর শেখর জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, পাতা, তোমার বাড়ি কোথায়?

আসানসোল।

সেখানে তোমার বাবা-মা থাকেন?

মা থাকে। মা একটা কারখানায় কাজ করে। স্টোরে।

বাবা নেই?

না। মা যাকে বিয়ে করেছে, তাকে আমি বাবা বলি না। সে-ই মিস্টার চক্রবর্তী। আমার পদবির মালিক।

আচ্ছা। এবার যেন তোমায় একটু একটু বুঝতে পারছি। আসলে শেখর অবাকই হয়েছে। যাদের নিতান্ত সরল বালক-বালিকা ভেবেছিল তাদের মধ্যেই একজন, এই মেয়েটি—এর জীবন কী জটিল! কণ্ঠস্বরে স্নেহ মিশিয়ে শেখর বলে, মায়ের দ্বিতীয়বার বিয়ে করা নিয়ে তোমার রাগ আছে। তাই না? তবে, এ রকম তো আজকাল আকছারই হচ্ছে। একদিক থেকে দেখলে, এ তো ভালই। নিঃসঙ্গ হয়ে মানুষ জীবন কাটাবে কেন? ছেলেমেয়েরা তো একদিন বড় হয়ে যাবে। চলে যাবে। তখন কে দেখবে? সময় থাকতে একজন সঙ্গী নির্বাচন করে নেওয়া তো বুদ্ধিমান—মানে বুদ্ধিমতী মহিলার পরিচয়।

আরও অনেক কথা বলল শেখর।

পাতা মুখ নিচু করে শুনছিল। এবার বলে উঠল, আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না স্যার। মায়ের ওপর আমারও কোনও রাগ নেই। মা আমায় খুব ভালবাসে। সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকে মা আমার হস্টেল

খরচ জুগিয়ে আসছে। যতদিন না নিজের পায়ে দাঁড়াই, মা আমার জন্যে সব রকম কষ্ট স্বীকার করবে, আমি জানি। জন্মাবার আগেই মা তো আমায় নষ্ট করে ফেলতে পারত। কুমারী মায়েরা তো তাই করে। তা না করে মা আমায় এই সুন্দর পৃথিবীতে আসতে দিয়েছে। কত সাহস দেখিয়েছে বলুন, আমার মা। আমি বাড়ি যাই না বলে মায়ের মনে কত কষ্ট! নিজেই চলে আসে এখানে মাঝে মাঝে। আসানসোল খুব দূর না।

ছুটির সময় কী করো?

আমি আর মা, দু'জনে কোথাও বেড়াতে যাই। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় আমরা ঘুবে এসেছি। কথাগুলো বলতে বলতে হাসছিল পাতা। ওর দাঁতগুলো ভারী সুন্দর, সাজানো। ওর চোখদুটি উজ্জ্বল। ওর মাথার চুল টান করে পেছন দিকে আঁচড়ানো, কপালের ওপর টিপ নেই, সিঁথি নেই। কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিল। বোধহয় একটু তোতলা মেয়েটা। ওর শৈশবে যে মানসিক চাপ বেচারার ওপর দিয়ে গেছে, তাতে তোতলা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। ওটা পরে কেটে যাবে। শেখর যেন নিজেকেই আশ্বাস দেয়। তারপর প্রসঙ্গ বদলে অন্য কথা বলতে থাকে।

একসময় পাতা বলল, আমি যাই স্যাব। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি সেদিন বলতে চেয়েছিলাম, ওই দু'জন-দু'জন ভাবাতেই আমার আপত্তি। নীড়, ডিম, সন্তান—এসব ব্যাপারে পুরুষদের খুব একটা আবেগ থাকে না বোধহয়। পাখিও যা, মানুষও তাই—পুরুষরা উপভোগ ছাড়া কিছু বোঝে না। জালে জড়িয়ে গেলে সংসারে বাবা হয়ে বসে থাকে। হি হি। আমি দেখেছি।

হাসতে হাসতে চলে গেল পাতা। না না তা নয়, তুমি ভুল বুঝছ—শেখর বলে উঠবে ভেবেছিল, বলা হল না। সিঁড়িতে চটাস চটাস শব্দ শোনা গেল চটির। তারপর জানলা দিয়ে দেখল, পাতা এক লাফে সাইকেলে উঠে বসেছে। মুহূর্তের মধ্যে ওর সাইকেলটা গেট পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সংস্কৃতে 'জৄ' ধাতুব অর্থ জীর্ণ করা, ক্ষয় করা। এরই নিজন্ত করে হয় জরা। যার অর্থ জীর্ণ হওয়া। যে জীর্ণ করে, দাম্পত্যপ্রণয় যে কীটেব ন্যায় জীর্ণ করে, নষ্ট করে, তাকে বলে জার। অর্থাৎ উপপতি, যে সতীধর্মনাশক। সেই পুরুষের ঔরসে যে জন্মায়, সে জারজ। পাতা নামের যে-মেয়েটি এতক্ষণ কথা বলে গেল, সে তার মায়েব জাবজ সন্তান। তার পিতৃপরিচয় নেই। এই হল ব্যাপার। ওর সহপাঠীরা কি জানে সেটা?

শেখর ভাবল, জানলই বা।

পিতার অস্তিত্ব নিশ্চয় আছে। না হলে সে জন্মাল কী করে। সেই লোকটি যে আজ অদৃশ্য কিন্তু মৃত নয়, ওব মায়ের বিবাহিত স্বামী ছিল না, তাই পাতা অনাথ। পাতার চেহারায়, স্বাস্থ্যে, স্বভাবে জারজের কোনও ঘা নেই। শেখর ভাবে, ওর নিজের ছেলে সৌরভ, বা মিঠু, আজ তাব পঁচিশ বছর বয়েস—পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা, নাকের তলায় মোটা কালো গোঁফ, ডাঁটের মাথায় মাল্টিন্যাশনাল ফার্মে চাকরি করছে, কথায় কথায় পুরনো সিস্টেম সব ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়—পারত? শিরদাঁড়া সোজা করে হাঁটতে পারত, পিতৃপরিচয় ছাড়া? শেখর দেখেছে, ওর বায়োডাটায় বড় বড় অক্ষরে লেখা ফাদার্স নেম—মিস্টার শেখর মিত্র। এই নাম ব্যবহার করার জন্মগত অধিকার মিঠু পেয়েছে। পাতার সে অধিকার নেই। পাতা তার মায়ের স্বামীর নাম ধার করে কাজ চালাচ্ছে। যা ও পছন্দ করে না। এ অন্যায়। কেউ মায়ের নাম জানতে চায় না। পুরুষ-প্রধান সমাজব্যবস্থা যখন চালু হয়, তখন মেয়েরা শুধু গৃহকর্ম করত। সতীধর্ম পালন করত। সন্তান উৎপাদন আর প্রতিপালন করত। পুরুষদের ছিল বাইরের জীবিকা। এখন তো মেয়েবাও উপার্জন করছে লেখাপড়া শিখে। তারা একাই পারে সন্তানকে মানুষ করতে। যেমন করছে পাতার মা। সেই মায়ের নাম কেন সন্তানের পরিচয়ে ব্যবহার করা যাবে না? এ সত্যি অন্যায়। আবার ভাবে, তারই বা দরকার কী? মানুষের বাচ্চা মানুষ। এই পরিচয়ই তো যথেষ্ট। মিঠু বলে, আজকাল আমেরিকায় নাকি একক পেরেন্ট স্বাধীন সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছে। গাঁটছড়া বেঁধে স্বামী-স্ত্রী হয়ে একত্র বসবাস করা উঠে গেছে প্রায়। মিঠু খবর রাখে সব। ও ভুল কথা বলেনি। এ-দেশেও সেই প্রথা চালু হওয়া উচিত। মিঠুর বাপ শেখর—সত্যিই তো, এমন কী তার বৈশিষ্ট্য আছে, কোথায় সে আর সকলের থেকে আলাদা, ইউনিক? শেখর না হয়ে ওর বাপ যদি শঙ্কর নামের কেউ হত, কী তফাত হত তাতে? একটা তো স্পার্মের ব্যাপার। তাই নিয়ে এত অহংকার কীসের? আমেরিকায় স্পার্ম-ব্যাঙ্কও হয়েছে, মিঠু বলছিল। সেখান থেকে গর্ভের বীজ নিয়ে আসে। ওরা বাবা নামক প্রতিষ্ঠানকে ক্রমশ খারিজ করে দিচ্ছে।

শেখরের মনে পড়ে যায় ওর এক সহপাঠীর কথা। পুলক। পুলক কাঞ্জিলাল বোধহয়। সে-ও ছিল জারজ সন্তান। ওর অবিবাহিত মা প্রাইমারি স্কুলে পড়াতেন। কাঞ্জিলাল ছিল দাদুর পদবি। পুলক বড় হয়ে জানল, তার বাবা নেই। কখনও ছিল না। আর সকলের যা আছে, তার কেন নেই, সেই ক্ষোভে পুলক ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। মুখে কিছু বলত না। লজ্জা ঢাকত বীরত্ব দেখিয়ে। ক্লাস এইটে পড়ার সময় আন্দোলন করে জেলে গেল। তিনবার ড্রপ করে এম এ পাশ করে। অশ্লীল কবিতা লিখত পত্রপত্রিকায়। কারও কথা গ্রাহ্য করত না। একটার-পর-একটা বিয়ে করেছে, ছেড়েছে, নির্দয় হয়ে উঠেছিল পশুর মতো। শেষে মারা গেল স্নায়ুরোগে ভুগে।

আর একজনের কথাও মনে পড়ে শেখরের। সে-ও মারা গেছে অল্প বয়সে। কী নাম যেন? ময়-দিয়ে নাম। স্বপ্নময় না। প্রীতিময়। প্রীতিময় সন্দেহ করত, সে তার বাবার ছেলে নয়। ওর যখন পাঁচ বছর বয়েস, কেউ একজন আত্মীয় বলেছিল, ওকে ঠিক ব্রজবাবুর মতো দেখতে। ব্রজবাবু ছিলেন পরিবারের বন্ধুস্থানীয়। বিপদে আপদে উপকার করতেন। দিল্লির অধিবাসী। কলকাতায় এলে ওদের বাড়িতে উঠতেন। প্রীতিময়কে আর সব বাচ্চার মতোই ভালবাসতেন। বড় হয়ে প্রীতিময় মাকে ঘেন্না করতে শুরু করল। বাবার কথা শুনত না। যখন-তখন বাড়ি থেকে পালিয়ে যেত। একবার সে দিল্লি অবধি পাড়ি দিয়ে ব্রজবাবুব সঙ্গে দেখা করে।

সরাসরি প্রশ্ন করে, আপনি কি আমার বাবা? সত্যি কথা বলুন। এর চেয়ে স্পষ্ট কবে আপনাকে জিজ্ঞেস কবতে পারছি না। লজ্জা করছে। কিন্তু আমার জানা দরকার।

ভদ্রলোক ওকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, এ-প্রশ্ন অর্থহীন। শুধু শুধুই নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। এতদিন যাঁকে বাবা বলে জেনে এসেছ, তাঁকেই বাবা বলে মানো প্রীতিময়। এতে তোমারই ভাল হবে।

শান্ত হয়ে ফিরে এসেছিল প্রীতিময়। যদিও মন থেকে সন্দেহটা যায়নি। মাকে জিজ্ঞেস কবতে পারত—কিন্তু করেনি। ওর মা নিজে থেকেও কিছু বলেননি। দিনের-পর-দিন দেখেছেন, তাঁর পুত্র—তিন কন্যার পর একমাত্র পুত্র কীভাবে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলল। অভিমানে।

তা হলে? শেখর ভাবে, পিতৃতন্ত্রের এই সংস্কার তো ফ্যালনা নয়। অনেক গভীবে বয়েছে এর শেকড়। একে উপড়ে ফেলা খুব সহজ না। তবু, পাতার মনোভাব দেখে ওর মনে হয়েছে, এই প্রজন্মের ছেলেমেয়ে অনেকটাই সংস্কারমুক্ত। ওদের অভিমান কম। মা-বাপের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করে না ওরা। কৃতজ্ঞতাও কম। ওরা স্বার্থপব হতে শিখেছে। ওরা অতীতের দিকে তাকায় না। বর্তমান নিয়ে ব্যাপৃত। ভবিষ্যৎটা কিছুদূর অবধি বোঝে। এখন দিনকালও তো বদলে গেছে ঢের। সরকারি প্রচারযন্ত্রেও দেখা যায়, নীতির চেয়ে বেশি নিরাপদ থাকার দিকে ঝোঁক। যৌনতা বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলা হচ্ছে। এইভাবেই হয়তো চাপা গোপন পাপবোধ থেকে মুক্ত হবে মানুষ। নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে খোলা বাতাস বইবে। প্রেমের রহস্য বলতে থাকবে না কিছু।

তাতে কি আরও বাড়বে অনাচার? শেখর ঠিক বুঝতে পারে না। ওর পঞ্চান্ন বছর বয়েসের অবস্থান থেকে ও জিনিস বোঝা সম্ভব না। 'অনাচার' শব্দটার সংজ্ঞাই যদি বদলে যায়, তা হলে? যদি বলা হয়, যা অস্বাভাবিক তাই অনাচার? জৈব তাড়নাকে ফুলমালা দিয়ে সাজিয়ে দেখাবার দরকার নেই? তা হলে? জীবনানন্দের ওই লাইন—'তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়'—হাস্যকর শোনাবে না?

দু'জন দু'জন ভাবাতে পাতারও আপত্তি। ও বলে জীবন একতরফা। পুরুষরা উপভোগ ছাড়া কিছু বোঝে না। জালে জড়িয়ে গেলে সংসারে বাবা হয়ে বসে থাকে। ওর মায়ের স্বামীকে ও বাবা বলে ডাকে না। বাধ্য হয়ে তার পদবি ব্যবহার করছে।

শেখর এখানে অধ্যাপক। কলকাতায় ও একজন সাংবাদিক ও লেখক। মানুষের মন নিয়ে ওর কারবার। মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও পর্যবেক্ষণ করে। এ ছাড়া, তার নিজের সংসারে সে বাবাও, তার ছেলের বাবা। তার স্ত্রীর স্বামী এবং প্রেমিক। সত্যি, খুব হাস্যকর কি এই ভূমিকা? ক্লাস করতে করতে মাঝে মাঝে ভাবে শেখর। আবার ভুলে যায়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুঁড়ো হয়ে মিশে যায় ওর সব গভীর ভাবনা।

একদিন দুপুরবেলা লাইব্রেরি থেকে বইপত্র নিয়ে অতিথিশালায় ফিরেছে। নীচের তলায় খাবার ঘরে ঢুকে দেখে, দূরের এক টেবিলে বসে আছে পাতা। আর তার সামনে একজন মধ্যবয়সি মহিলা। খাওয়া

শেষ করে ওরা শেখরের দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। পাতা বলে, আমার মা।

শেখর বলে, আপনার মেয়ে বেশ বুদ্ধিমতী।

আপনারা বুঝবেন। আমি জানি না। মহিলা বলে, ওকে নিয়ে আমার বড় চিন্তা হয়।

শেখর বলে, অত ভাববেন না। এ-যুগের ছেলেমেয়ে ঠিক নিজের পথ তৈবি কবে নেবে।

পাতা বলে, মা, তুমি অকারণ এত ভাবো কেন বলো তো?

মহিলা বলে, ভাবব না? তুমি একা একা কতদিন চলতে পারবে?

মহিলার সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর। কপালে লাল টিপ। মুখশ্রীটি সুন্দর। কালোর ওপব লালের আভা যেন একটু বেশি।

শেখবের ইচ্ছে হল, বলে, পাতাকে আমায় দিয়ে দিন। বলতে গিয়েও বলল না। পাতা তো পাখি নয় যে, খাঁচায় রেখে পুষবে। ও একটা মানুষ। ওর উপযুক্ত পরিচিতি চাই। নিজস্ব জায়গা চাই। বানানো চক্রবর্তী পদবি থেকে মুক্তি দিতে গিয়ে ওকে মিত্র পদবিতে বেঁধে ফেলা হবে না? সেটা কি উচিত? আর, মিঠুই বা ভাববে কী? ওর মনে হতে পারে, সংসারে বাবা হয়ে বসে আছ, থাকো। অন্যের ওপর জুলুম কোবো না।

জুলুম তো কবছে না শেখব। বাবা হয়ে ও শুধু প্রমাণ কবতে চায় যে, বাবা একটা উপকাবী প্রাণী।

১৯৯৬

❀ লালচে কালো চা-পাতা

বাবাসত ছাড়িয়ে কৃষ্ণনগব, বহরমপুর, পৌঁছোবার আগেই সুশ্রী সরকার হয়ে গেলেন নারীবাদীদি, অরিত্র বসু হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধা আর তরুণতম কবিদের প্রতিনিধি পলাশ চন্দর নামকরণ হল জয়ঢাক।

সাদা অ্যামবাসাডর ছুটছে উত্তরমুখে। সামনের সিটে পাইলট তপন আব তার সহকারী বিশু। বারো ঘণ্টায় শিলিগুড়ি পৌঁছোতে হবে। সেখানে কোথাও মুখ-হাত-পা ধুয়ে, পোশাক বদলে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেওয়ার প্ল্যান। হাঁটুর জট ছাড়িয়ে ন'টার মধ্যে রওনা হলেও দার্জিলিং পৌঁছোতে বেলা দুটো। পরদিন সকাল থেকে সেমিনার। পূর্বাঞ্চল কবি সম্মেলন। স্থানীয় আতিথ্যের দায়িত্ব নেপালি সাহিত্য সম্মেলনের। কলকাতার উদ্যোক্তাবা আমন্ত্রিত কবিদের যার-যার ঘাঁটি থেকে অকুস্থলে ডেলিভারি দেবে, এই রকম ব্যবস্থা। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে আগাম টিকিট কাটা ছিল তিনজনের। কলকাতার তিন প্রান্ত থেকে তিন কবি সকাল ছ'টায় শেয়ালদা স্টেশনে হন্তদন্ত হয়ে পৌঁছে শোনে ট্রেন তিনঘণ্টা বিলম্বে ছাড়বে। তারপর দোতলার রেস্তরাঁয় চা আর টোস্ট খেতে খেতে শুনল, কাঞ্চনজঙ্ঘা সেদিনের মতো বাতিল। অতএব বাংলাকে বাদ দিয়েই পূর্বাঞ্চল কবি সম্মেলন হবে, নিয়তির এই বিধান মেনে নিয়ে আবার যে-যার আস্তানায় ফিরে যায়। উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধি এসেছিল স্টেশনে। সে বলেছিল, 'এ হতে পারে না। ওড়িয়া, মৈথিলি, অহম, মণিপুরি আর নেপালি ভাষার কবিদের দিয়ে সম্মেলন সম্পূর্ণ হয় কী করে। বাঙালি কবি পাঠাবার অন্য কোনও ব্যবস্থা করতেই হবে। আপনারা বাড়িতে থাকবেন। আমি ঠিক সময়ে খবর দেব।'

সেই খবর এল দুপুর দুটোয়। তিন কবিকে তুলে নিয়ে মোটরগাড়ি রওনা হবে সন্ধে ছ'টায়।

সাংস্কৃতিক সমাজে বুড়ো মানুষকে বলা হয় বর্ষীয়ান। কানে কালা, পায়ে খোঁড়া, পিঠে কুঁজো, বাঁধানো দাঁত, চোখে মোটা কাচের চশমা পরে এরা সভাপতির আসন অলংকৃত করে। মহিলা হলে বর্ষীয়সী। সেই অর্থে কবি সুশ্রী সরকার বর্ষীয়সী নন। বয়েস ষাট পেরিয়েছে, ছোট করে ছাঁটা হলদে রঙের চুল মাথায়, বেশ তেজি মহিলা। পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে বরাবর কবিতা লিখে আসছেন। তাতেই ওঁর

নামডাক। স্বদেশের চেয়ে বিদেশে তাঁর পরিচিতি বেশি, কেননা, ইউরোপ-আমেরিকায় ওরা তৃতীয় বিশ্বের প্রতিবাদী লেখক-শিল্পীদের ওপর নজর রাখে। মেয়ে হলে তো কথাই নেই, অনুবাদকের দল প্রতিবছর এসে ঘুরে যায়। সামনের প্রজন্মের ওপর মেয়েরাই তো প্রভাব বিস্তার করবে।

অরিত্র বসুর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী কবি। মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি তার পূর্বতন নকশাল-জীবনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জেল, আন্ডারগ্রাউন্ড, গৃহবন্দি—এইসব পর্ব সেরে এখন সরকারি কলেজের অধ্যাপক। একটি দাগি পত্রিকার সম্পাদক। অরিত্ররও অনেক কবিতা বিদেশের পত্রপত্রিকায় অনূদিত হয়েছে। কলকাতার অবক্ষয়ীরা ওকে বিশেষ পাত্তা দেয় না তো বয়েই গেল। ওর পত্রিকায় প্রতি সংখ্যায় নামজাদা বিদেশি প্রগতিবাদী লেখকদের অনুবাদ ছাপা হয়। বলতে গেলে, লাতিন আমেরিকা আর পশ্চিমবাংলার যোগসূত্র হল অরিত্র বসু—যে এক কানে শুনতে পায় না। বর্ষীয়ান বলে নয়, পুলিশের থাপ্পড় খেয়ে ড্রাম ফেটে গেছে বলে। আর পলাশ চন্দ তরুণ রোমান্টিক কবি। দেখতে সুন্দর। মুখে দাড়ি নেই কিন্তু মাথায় উসোকখুসকো চুল। এখন লেখার বয়েস, দু'হাতে লিখে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, নিজেব সমস্ত কবিতা ওর মুখস্থ—সে নারীপ্রেমের কবিতাই হোক আর দেশপ্রেমের কবিতা হোক। একটু বড় করে বলার অভ্যেস ওর, তাতে অনুরণন জাগে। ওর নাকি অনেক প্রেমিকা।

অরিত্রর বাড়িতে গাড়ি প্রথম এসেছে। ও প্রস্তুত ছিল। দরজার ল্যাচ-কি টেনে, একটা অতিরিক্ত তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এল, হাতে একটি মাঝারি মাপের লাল বোঁচকা। দেরি হল সুশ্রী সরকারের আস্তানায়। স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ নিয়ে গোছানো তাঁর সংসার। পুত্রবধূ শাশুড়ির প্লেটে আরও দু'খানা লুচি চাপিয়ে দিয়ে অরিত্রকে জিজ্ঞেস করে, পেট ভরে খেয়ে এসেছেন তো? রাস্তায় কিছু পাওয়া যাবে না কিন্তু।'

'বহরমপুরে খেয়ে নেব। সব পাওয়া যায়। এসব রাস্তা আমাব চেনা। পশ্চিমবাংলার পথঘাট আমাব কররেখার মতো পরিচিত।' অরিত্র হাসতে-হাসতে বলে।

'তা হলেও কিছু খেয়ে নিন।'

লুচিভাজার গন্ধে লোভ ছিল, অরিত্র বিশেষ আপত্তি করেনি।

'খাবার জলটা গাড়ির ভেতরে রাখছি মা। বাকসে আর কিছু ঢোকাবার আছে? বইটই? গরম মোজা নিয়েছ তো? হট ওয়াটার বটল? ওটা বিছানায় নিয়ে শুয়ো, বুঝলে?' উদ্বিগ্ন পুত্রটি মাকে একা ছাড়তে ভয় পাচ্ছে। আবার গর্বিতও।

বলতে-না-বলতে সুশ্রী সরকারের বর্ষীয়ান স্বামী একটা ছোট প্যাকেট হাতে এগিয়ে এলেন। 'তোমার ওষুধ। হাতব্যাগে রাখো।' তারপর অরিত্রকে বললেন, 'স্প্রিংডেল হোটেলে গরম জল দেবে তো? ওনাব হাঁটুতে একটা ব্যথা—পাহাড়ে বেশি হাঁটাহাঁটি কোরো না যেন।' তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে সাজগোজ সমর্থন করলেন, ভাবটা, বেশ দেখাচ্ছে, নিরিবিলি পেলে হয়তো মুখচুম্বন করতেন। তার বদলে ছুটে বেরিয়ে এসে পাইলট তপনকে বললেন, 'খুব সাবধানে গাড়ি চালাবে, ফরাক্কার ওদিকটা বিপজ্জনক, রকেটের পিছু পিছু যাবে। কেমন? স্পেয়ার তেল, স্টেপনি, ফ্যানবেল্ট আছে তো?' তারপর ওর হাতে পঞ্চাশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন। বললেন, 'দিদিকে দেখো।'

অরিত্র মনে মনে ভাবে, এ রকম বহাল তবিয়তে থাকলে পুরুষবিদ্বেষ পোষায়।

পলাশকে নিয়ে কোনও সমস্যাই হয়নি। ও বাগুইহাটির মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তিন-চার জন ভক্ত-বন্ধু ঘিরেছিল ওকে। তাদের বাই বাই করে ও গাড়িতে উঠে পড়ে—সফলতার মতো। নিশ্বাসে মদের গন্ধ। একটু পরেই কবিতার লাইন আওড়ায়—'ভুলিব না, এত বড় স্পর্ধিত শপথে জীবন করে না ক্ষমা।' কার লাইন বলুন তো নারীবাদীদি? পারলেন না। আচ্ছা, এর উলটোটা: 'সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না,'—এটা কার লাইন। মনে পড়ছে মুক্তিযোদ্ধা?' গাড়ি ছুটছে। ও-পাশ থেকে হেডলাইট জ্বালিয়ে আসছে ট্রাকের-পর-ট্রাক, গাড়ির গা ঘেঁসে চলে যাচ্ছে পিছলে, আর সুশ্রী চমকে চমকে উঠছেন। একসময় বললেন, 'তুমি একটি জয়ঢাক, কেবল নিজের কবিতা আওড়াচ্ছ।' অরিত্র বলল, 'দ্বিতীয়টা সুধীন্দ্রনাথ।'

'রাইট।' পলাশ বলল, 'জীবনে কোনওদিন প্রেমে পড়েছিলেন মনে হচ্ছে। সে কি সহযোদ্ধা ছিল, না শ্রেণীশত্রু?' একটা খোঁচা ও দেবেই। ওই মাতালের সঙ্গে কে কথা চালাবে? নিজেই বিড়বিড় করতে থাকে পলাশ। 'জানেন, সামনের পাঁচ দিন ওর সঙ্গে দেখা হবে না আমার। এখন থেকেই মন কেমন

করছে। বৃতা আবার বলে দিয়েছে, নেপালি মেয়েদের সঙ্গে একদম মেলামেশা করবে না, ওরা ভেড়া বানিয়ে দেবে। কী বোকা! জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না!' গান করতে করতে একসময় ও ঘুমিয়ে পড়ল কাত হয়ে। না, না, ভ্রমণ কাহিনী শোনাবার মতলব নেই আমার। চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। পূর্বাঞ্চল কবি সম্মেলনের ইতিবৃত্ত যদি শোনাতে বসি, সে-ও এককাহন কাহিনী, আপনারা আমায় থামিয়ে দেবেন। অথচ বাইরে বেরোবার একটা কেমন যেন মজা আছে, আপনাকে নিজের খাঁটি থেকে উপড়ে তুলে ফেলে দিলেই সে মজা উপভোগ করা সম্ভব। অনেক কিছু আবিষ্কার করার মজা।

এই যে তিনজন বাঙালি কবি একত্র হল, এরা কলকাতা শহরে ভিন্ন ভিন্ন চক্রে ঘোরে। পরস্পরকে চেনে, কিন্তু কেউ কারুর ধার ধারে না। জোর করে এদের এক গাড়িতে তোলা হয়েছে বলে, এক হোটেলে রাখা হল বলে, অবাঙালিদের বিপ্রতীপ শিবিরে ঐক্যবদ্ধ হল ওরা। এই ব্যাপারটা লক্ষ করার মতো। এ-থেকেই ছোটখাটো কিছু একটা আবিষ্কার হয়ে যেতে পারে।

না হলে, ওই পলাশ চন্দ, উদীয়মান তরুণ কবি, যে কিনা অরিত্রর রুমমেট এখানে, পাইলট তপনকে ভজিয়ে যখন-তখন জলের দরে সিকিমি রাম দু'পেগ, তিন পেগ মেরে আসছে, সে লাফাতে লাফাতে দোতলায় উঠে ডাকে, 'এই যে নারীবাদীদি, শিগগির নীচে আসুন, কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককল?'

'আর পারা যায় না!' সুশ্রী সরকার কম্বল থেকে বেরোলেন। সেমিনারের সাফল্যে মন ডগমগ ছিলই, তার ওপর বাড়ির লোক এত দূরেও খবর নিচ্ছে, আর কারুর তো ফোন আসেনি, সেই গর্ব।

পলাশ সিগারেট প্যাকেটে একটা সংখ্যা লিখে দিয়ে বলে, "দিদি, বলবেন এখানে ফোন করে জানিয়ে দিতে যে, আমি খুব মনমরা হয়ে আছি। বৃতা খুশি হবে।'

আর, পুরুষবিদ্বেষ ভুলে সুশ্রী স্নেহ ঝরিয়ে বলেন, 'দুষ্টু!' কলকাতায় কখনও বলতেন না।

আর একদিন সকালে সুশ্রী আলপটকা ঢুকে পড়লেন ছেলেদের ঘরে। অরিত্র গেঞ্জির ওপর সোয়েটার চড়াচ্ছিল। ওর খালি-পায়ের দিকে তাকিয়ে যেন আঁতকে উঠলেন, 'এ কী, এত বড় বড় নখ?'

'কাটা হয়ে ওঠে না। ঝঞ্ঝাট!'

'নেলকাটার আছে। দেব?'

অরিত্র তাড়াতাড়ি মোজা গলিয়ে ঢেকে ফেলে পা দুটো। পায়ের না হয়ে হাতের নখ হলে সুশ্রী হয়তো নিজেই কেটে দিতেন।

এপ্রিল মাসে দার্জিলিঙে গিজগিজ করছে টুরিস্ট। কিন্তু আবহাওয়া প্রতিকূল। সারাদিন মেঘলা। রাত্রে রোজ বৃষ্টি। টাইগার হিল থেকে মুখ চুন করে ফিরে আসছে লোকেরা। শিলিগুড়ি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গিয়েছিল, দার্জিলিঙে একদিনও দেখা গেল না।

অবিত্র বলল, 'রোপওয়ে চড়ে আসি চলুন। ভা-রী থ্রিলিং!'

পলাশ আর সুশ্রী একসঙ্গে বলে উঠল, 'যদি মাঝখানে তার ছিঁড়ে যায়।' সুশ্রীর রুমমেট ওড়িয়া কবি রুক্মিণী মহাপাত্র সঙ্গে ছিল। বলল, 'গেলে যাবে। আমরা হিমালয়ে হারিয়ে যাব।'

অরিত্র রুক্মিণীর সিঁথিতে সিঁদুর দেখল। কপালে টিপ দেখল। কবি সম্মেলনে ও প্রেমের কবিতা পড়েছে। অথচ কী সহজে বলতে পারল হিমালয়ে হারিয়ে যাওয়ার কথা।

তিরিশ টাকার টিকিট। তার মধ্যে জীবনবিমার প্রিমিয়াম ধরা আছে। টিকিট কেনার সময় প্রত্যেককে লিখে দিতে হয় নমিনির নাম। দুর্ঘটনা ঘটলে কাকে দেওয়া হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ। বলা বাহুল্য, পলাশ লিখল বৃতার নাম। সুশ্রী স্বামীর নাম। রুক্মিণী তার শিশুপুত্রর নাম। অরিত্র খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে লিখল, 'তপন হালদার।' পাইলট। খালি গাড়ি নিয়ে যদি ওকে কলকাতায় ফিরতে হয়, সেই দুঃখ খানিকটা ভুলতে পারবে। রোপওয়ে চড়ার উত্তেজনায় কেউ ব্যাপারটা লক্ষ করল না। তারও ছেঁড়েনি।

আগের দিন সন্ধেবেলা বর্ষীয়ান অসমিয়া কবি হীরেন ভট্টাচার্য এসেছিলেন স্প্রিংডেল হোটেলে। অভিনন্দন জানাতে। ভা-রী মেজাজি লোক। অনুষ্ঠানে ছোট ছোট কয়েকটি কবিতা পড়েছেন, একটারও অনুবাদ পড়েননি। একপাত্র রাম খেয়ে আর খেলেন না। বিছানার ওপর অরিত্রর পাশে এসে পা তুলে বসলেন। হাতে হাত রাখলেন। বললেন, 'আপনার কবিতা আমায় মুগ্ধ করেছে। ওই যেখানে শবরীকে প্রশ্ন করছেন, তুমি ছোটলোক বুড়ি, তোমার কী সাহস, রামচন্দ্রকে উচ্ছিষ্ট ফল খেতে দাও? ওই হল টেস্ট। ওই প্রেম খাঁটি যা অন্ধ। আর যা শুনলাম, সব মেটিং কল।' কান ঘুরিয়ে অরিত্র নিজের প্রশংসা

নেয়। নিজের একটা বই পড়তে দেয় হীরেনবাবুকে। কলকাতায় এলে যোগাযোগ করতে বলে।

ফেরার দিন স্থির হল, দুপুরে লাঞ্চ সেরে রওনা হবে ওরা। এবার তো নামা অনেক সহজ। সন্ধের আগে শিলিগুড়ি। সকালে যার যা শপিং সেরে নাও। ওপর থেকে নীচে, স্তরে স্তরে সাজানো দার্জিলিং শহর। নীচের দিকে বাজার। তারও নীচে বস্তি। যাওয়ার দিন আকাশ ফরসা হল, তবু ভাল। বাজারে সবজির চালান এসেছে। বেশ ভিড়। একসময় অরিত্র কার্শিয়াঙে লুকিয়ে ছিল আট মাস।

নারীবাদীদি কিনলেন কম্বল, পুলওভার। দু'শো, আড়াইশো টাকা, সস্তাই। গোল্ড স্টোনের লকেট, চল্লিশ টাকা। পলাশ তার প্রেমিকার জন্যে ছাপা শাল, নব্বই টাকা। আর চা। হ্যাঁ, চা সবাইকেই কিনতে হবে। ওটা পরিবারের জন্যে উপহার। একশো ষাট টাকা কিলো। ফ্রেশ লিফ, লালচে, কড়কড়ে কালো। অরিত্রর চেনা দোকানে গিয়ে জড়ো হল ওরা। কাউন্টারে মধ্যবয়সি নেপালি মেয়েটি ওকে চিনল। হাসল। মুঠোয় মুখেব ভাপ দিয়ে চায়ের গন্ধ শোঁকাল সবাইকে। অরিত্রকেও। এমন পাতা সচরাচর পাওয়া যায় না।

নারীবাদীদি বেরসিক, বললেন, 'ওই এঁটো পাতা আর আমাদের ঠোঙায় মিশিয়ো না।'

লটবহর নিয়ে সবাই গাড়িতে উঠছে, জয়ঢাক কই? ওই তো, নীল জিনস—দৌড়োতে দৌড়োতে আসছে। শেষবারের মতো দু'পেগ সাঁটিয়ে এল। 'তপন, তুমি ও সব খাওনি তো? না, না, তোমাব হাতে আমাদের প্রাণ। 'বিশুও দেখছি সামনের সিটে একটা নতুন সোয়েটার পরে বসে আছে।

অরিত্রব হাতে সেই লাল বোঁচকা। ব্যস। এ কী? আপনি কিছু কিনলেন না? সবাই অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকায়। অরিত্র তার দাড়িব ফাঁক দিয়ে একটু হাসে। মুক্তিযোদ্ধার উপযুক্ত কণ্ঠস্বরে বলে, 'না, উপহাব নেওযাব মতো আমার কেউ নেই কলকাতায়। একটু এঁটো চা-পাতা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

১৯৯৩

❀ সাপ পোষ মানে না

আমি প্রথমে বলেছিলাম, যাব না। আমি সাধারণ এলেবেলে মানুষ। আপিস করি, বাড়ি যাই। ছুটিছাটার দিনে বউকে নিয়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি ভিজিট করি। ওরা চা খাওয়ায়, বিস্কুট-চানাচুর দেয়। ভাজাভুজি, মিষ্টান্ন ছুঁই না আজকাল। ইনটেলেকচুয়ালদের আড্ডায় গেলে মুশকিলে পড়ে যাব। তোমারই অসম্মান হবে।

সত্রাজিৎ ছাড়ে না। বলে, চল চল। ভারী তো সব ইনটেলেকচুয়াল। বাইরে থেকে ওই রকম মনে হয়।

কী বলো ভাই, কাগজে ওদের ছবি বেরোয়। নিত্য নাম ছাপা হয়। সংবর্ধনা হয়। ওদের কত ফ্যান। বইমেলায় দেখিনি?

টমলিন কোম্পানির সিনিয়র পি আর ও সত্রাজিৎ বলল, আমরাই ওদের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখি। শুধু ফিল্মস্টার দিয়ে সব রকম প্রোডাক্ট কভার করা যায় না। লোকে জানতে চায়, প্রতিভাবান ব্যক্তিরা কী বলছে। পুরস্কৃত সাহিত্যিক কোন ব্র্যান্ডের সিগারেট খায়। অর্ধশিক্ষিত লোকের সংখ্যা যে-হারে বাড়ছে। বুঝিস তো।

সেই অর্থে আমিও অর্ধশিক্ষিত। খবরের কাগজ ছাড়া আর কিছু পড়ি না। টি ভি দেখি। টিভির প্রোগ্রাম থেকেও অনেক কিছু শিখি। তবে, যাকে বলে গ্রন্থপাঠ করা, সাহিত্যরস আস্বাদন করা, তত ধৈর্য আমার নেই। বই খুলে বসলেই ঘুম পেয়ে যায়। তার মানে এই নয় যে, যাঁরা কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার—তাঁদের প্রতি আমার অশ্রদ্ধা আছে। বরং উলটোটাই। তাঁদের প্রতি মনে মনে আমার গভীর

সম্ভ্রম। আমি যা পড়ে উঠতে পারি না, তাঁরা কষ্ট করে তাই লিখে চলেছেন, ভাবলে মাথা নুয়ে আসে। তাঁরা জীবনকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখেন, মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করেন। কতখানি অন্তর্দৃষ্টি আর একাগ্রতা থাকলে এইসব কাজ করা সম্ভব, আমি অনুমান করতে পারি। আর পারি বলেই বুঝি, আমি নিজে এসব ব্যাপার থেকে কত দূরে। কত নীচে।

তাই সত্রাজিৎকে বলেছিলাম, তোমার ওই ককটেল পার্টিতে আমায় টেনো না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি জবাব দিতে পারব না। তখন তোমারই অসম্মান হবে। লোকে বলবে, কোত্থেকে একটা ছাগল ধরে এনেছ। কুম্ভীলক মানে কী, তা জানে না। ম্রিয়মাণ আর মুমূর্ষু বলে একই। শোচনীয় অবস্থা।

সত্রাজিৎ বলল, চাল মারিস না। ঘুষি মেরে তোর নাক ফাটিয়ে দেব।

এর কোনও উত্তর হয়। এই কথা শুনে ওর বউ চিনু খিলখিল করে হেসে উঠল। আমি তখন বললাম, আমার ড্রেসও ঠিক সভায় যাওয়ার মতন নয়। তুমি আগে বললে একটু সেজেগুজে আসতাম। ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর, চোখে চশমা তো আছেই—অন্তত বুদ্ধিজীবীব মতন দেখাত আমায়।

ও বলল, এখন কবিরাও বুশশার্ট, প্যান্ট পরে। তুই এক কোণে বসে কাবাব, ফিশফিঙ্গাব সাঁটিয়ে যাবি। স্কচ প্যাঁদাবি। কেউ গায়ে পড়ে গলাগলি করতে এলে, শুনে যাবি চুপচাপ। মাথা নাড়বি। আর মাঝে মাঝে বলবি, 'আমি বিশ্বাস করি না', 'আমি আপনার সঙ্গে একমত নই, মাপ করবেন।' ব্যস, তাতেই মাতাল পার্টি হড়কে যাবে।

ওব জিদ চেপে গেছে। অগত্যা আমি চিনুকেই জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার বলো তো? আমাকে নিয়ে পড়েছে কেন?

চিনুর কথায় ব্যাপারটা পবিষ্কার হল।

মিস্টাব আব মিসেসেব নেমন্তন্ন। চিনু যেতে পারছে না, ওব পা মচকেছে। অথচ বাবুর একজন সঙ্গী চাই। যাব মাথা ঠান্ডা। যে ফেরাব সময় গাড়ি ড্রাইভ কববে। আপনাকে ও আমার প্রক্সি হিসেবে নির্বাচন করেছে, চিনু বলল। আর খিলখিল করে হাসতে লাগল আবার। আমি সঙ্গে না গেলে সত্রাজিৎ ককটেল পার্টিতে যেতে সাহস পাচ্ছে না। অথচ যাওয়ার খুব ইচ্ছে ওব। এক বিখ্যাত পত্রিকার রজত জয়ন্তী। কলকাতার গণ্যমান্যদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আসবে না। ঢালাও ব্যবস্থা থাকবে, সুন্দরীরা থাকবে। এ কনসুলেটের চিপ্পুস ককটেল নয়। চিনু হাসতে হাসতে বলল, যান না। আপনার গাড়ি এখানে নিরাপদ। ওকে গেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আপনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবেন। আমি, এখন নয়, ন'টা নাগাদ ফোন করে আপনার গিন্নিকে জানিয়ে দেব, বাবুর ফিরতে একটু দেরি হতে পারে আজ। তিনি যেন উদ্বিগ্ন না হন।

এইখানে চিনুর সঙ্গে আমাব বউয়ের তফাত। বরাবরই ও বরকে মদত দিয়ে গেছে। ওরা দু'জনেই জীবন উপভোগ কবতে ভালবাসে। হাই সোসাইটিতে ওদের নিবিড় মেলামেশা। তাই তো সত্রাজিৎ চাকবিতে এত উন্নতি করতে পারল। একটার-পর-একটা চাকরি বদলে বদলে আজ ও টমলিন কোম্পানির সিনিয়র পি আর ও। সুপুরুষ চেহারা, দারুণ বলিয়ে-কইয়ে। ড্রিংক হোলড করতে পারে। সম্প্রতি ওর এক সহকর্মী মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার পর থেকে ওই গাড়ি চালানোর ব্যাপারে একটু নার্ভাস, এই যা।

আমরা তো যথাসময়ে—না, যথাসময়ের এক ঘণ্টা পরে আটটা নাগাদ গিয়ে পৌঁছোলাম। বড় ব্যাঙ্কোয়েট হল। ততক্ষণে তিনভাগের একভাগ ভরতি হয়েছে।

ঢোকার মুখেই পত্রিকার স্থানীয় অধিকর্তা তার হেড আপিসের বড়কর্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছে, তার আগেই সে-ভদ্রলোক উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল, হাই জিৎ। তারপর হাত ঝাঁকিয়ে বলল, একা? চিনু কই?

আমি, চিনুর প্রক্সি, একটু সিঁটিয়ে গেছি, সত্রাজিৎ ভ্রূক্ষেপ না করে লোকটিকে বলল, ওঃ, কতদিন পর দেখা! এডিটর হয়ে তুমি কাগজকে কোথায় তুলে দিয়েছ!

লোকটি, সাফারি সুট-পরা এক ছোকরা বলা যায়, যে উঠতি সম্পাদক দিলীপ ধুমে, ততক্ষণে আমি বুঝতে পেরে গেছি। একসময় কলকাতায় কাজ করত। এখন কলকাতার সঙ্গে ওর পুরনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিতে এসেছে।

ও বলল, ইমেজ। আদর্শ। আমাদের পত্রিকা আগে ছিল করমুক্ত ছবির মতো। ভাল, কিন্তু হল ফাঁকা

যায়। আমি সেইটা বদলে দিয়েছি। জানো তো, এখন সবকিছুরই হালকা হাওয়ার দিকে ঝোঁক। জানো তো, এখন আমার সুনামের চেয়ে দুর্নাম বেশি। লোকে কাড়াকাড়ি করে আমার কাগজ কেনে, হাপুস হুপুস শব্দ করে পড়ে ফেলে, তারপব ছিঃ ছিঃ করে। কী ছিল আর কী হয়েছে!

সত্রাজিৎ বেশ গুছিয়ে বলল, তুমি পাঠককে বোরডম থেকে মুক্তি দিয়েছ।

গ্যাসটা খেয়ে গেল দিলীপ ধুমে। আমরা সেই ফাঁকে ব্যাঙ্কোয়েট হলে ঢুকে পড়লাম।

সেখানেও শোরগোল পড়ে যায়। হ্যালো জিৎ, হ্যালো জিতু। চিনু কই? চিনু কই? তারপর নতুন অভ্যাগত আসতে-না-আসতে সেই শোরগোল মিলিয়ে যায়। আমরা দুই বন্ধুতে একটা কোণে গিয়ে দাঁড়াই।

ঠান্ডা মেশিনের আবাম, সিগারেট আর অ্যালকোহলের মৃদু সুঘ্রাণ, তার সঙ্গে আহ্লাদজনিত গুঞ্জরনে পার্টি জমে ওঠে।

ফুটবল মাঠের গ্যালারিতে বসে লোকে যেমন করে খেলোয়াড়দের চিনিয়ে দেয়, সত্রাজিৎ সেই বকম ভাবে দূর থেকে আমার সঙ্গে বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-সম্পাদক- সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দিল। ওদের নামেই চিনতাম।

ওই যে কুমুদ বিশ্বাস, দৈনিক অর্ধসত্যর নিউজ এডিটর। ওই সূর্যকুমার বসু। বেস্ট সেলার। এক নম্বরের ফেবেব্বাজ। ওই দ্যাখ, তিনজন মহিলা ঘিরে রয়েছে যাকে—ওদের কারুর বয়েস পঁয়তাল্লিশের কম নয়, বিউটি পার্লার থেকে খুকি সেজে এসে ন্যাকামি করছে—মুখে সিগারেট, লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে যে, সে হল রূপকমল চৌধুরী। ওকে টিভি-তে দেখিস তো। দ্যাখ দ্যাখ, ওই যে ঢক ঢক কবে গেলাস খালি করে ঠক করে নামিয়ে বাখল—একমাথা পাকা চুল, চিনতে পেবেছিস নিশ্চয়।

আমি বলি, কবি রঞ্জন মুস্তাফি তো?

রাইট। ওর ওই স্বভাব। যা কবে, এক নিশ্বাসে করে।

একসময় সত্রাজিৎ বলল, মেঘনাদ রায়কে দেখছি না? ও কি এখন বিদেশে? না, তা হলে কাগজে পড়তাম। তৃষ্ণা বসুরায় বিদেশ গেছে আমি জানি, শিকাগোয় তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য-বিষয়ে সেমিনাব হচ্ছে। কিন্তু মেঘনাদ, মেঘনাদ...বলতে বলতে ওর নজর পড়ল আর একজনেব ওপর। সে হল প্রতীক নন্দী। বিখ্যাত কিন্তু জনপ্রিয় নয়। ভেরি পাওয়ারফুল। অফবিট নভেলিস্ট। সত্রাজিৎ বলল, লেখকদের লেখক। দিলীপ ধুমে ওর চারখানা গল্প ইংরেজি করে ছাপিয়েছে। ও মাল চেনে। মেঘনাদের ইন্টারভিউও ছেপেছে দিলীপ, যাতে ও বলেছিল, কার্ল মার্কস পাঁচশো বছর আগে জন্মালে মানবসমাজ অনেক দুর্গতি থেকে বক্ষা পেত। কী একখানা স্টেটমেন্ট, ভেবে দ্যাখ! মেঘনাদ পারে। ওকে ভাবতে হয় না। না হলে একাধাবে ডাকসাইটে গ্রন্থকার এবং সাপ্তাহিক কল্পলতার সম্পাদক হতে পাবে?

বলতে বলতে প্রতীক নন্দী আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। হাতে গেলাস। নিরন্তর দুষ্ট মানুষের প্রতি ঘেন্না পুষে পুষে ওর মুখ বাঁকা হয়ে গেছে। রোগা চেহারা। ভেতরের দিকে দু'-একটা দাঁত ভাঙা হতেও পারে। এক ধরনের লোক থাকে না, সব জায়গায় অন্যায় অনাচার দেখছে, তার প্রতিকার কবতে পারে না, না পেরে কেবল কলম ঘষে। তাদের কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে ফ্যাসফেসে হয়ে যায়। রস শুকিয়ে গেলে যা হয় আর কী। প্রতীক নন্দী তাই।

এসেই বলল, টেরাকোটাকে দেখছি না? টেরাকোটা হল মেঘনাদ রায়ের কোডনাম। সত্রাজিৎ জানে। আসলে পোড়ামাটির পুতুল, খেলনাপাতি, সাহেবরা দুর্মূল্য শিল্পবস্তু বলে কিনে নিয়ে যায়, এই শ্লেষ আছে ওই নামকরণে। ওদের দু'জনের মধ্যে ভীষণ রেষারেষি।

প্রতীক নন্দী এক চোখ বুজে ব্লেডের মতো ধারালো হাসি হাসল।

ওর পাঞ্জাবির পকেটে একটা পাঁইট। টের পেয়ে সত্রাজিৎ বলল, এখানে এলাহি ব্যাপার দেখছেন তো। পকেটে ভরে মাল আনার দরকার ছিল? তার ওপর স্বয়ং এডিটর আপনার ফ্যান। চান তো, এখানে শোয়ার ব্যবস্থাও করে দেবে।

আমি লেখকের দিকে তাকিয়ে আছি। ওর বাঁ হাত পাঞ্জাবির পকেটে।

সত্রাজিতের কানের কাছে মুখ নামিয়ে ও ফিসফিস করে বলল, মাল না, ওতে সায়ানাইড আছে। আমি শুনতে পেলাম।

সায়ানাইড?

হুঁ, হুঁ।

কেন?

টেরাকোটার গেলাসে যাবে। ব্লেডের ফাঁক দিয়ে ও বলল, আজ দেখব, ওর মধ্যে কতখানি সোনা আর কতখানি খাদ। সায়ানাইড ছাড়া এ-পরীক্ষা হয় না।

বলতে বলতে সূর্যকুমারের দিকে এগিয়ে গেল প্রতীক নন্দী।

আমি বললাম, আজ একটা কেলো হবে এখানে। চল, আমরা পালাই।

সত্রাজিৎ বলল, ধুর! এরা মুখে অনেক কিছু বলে।

তারপর এক ঢোঁকে গেলাস খালি করে আর একটা তুলে নিল বেয়ারার ট্রে থেকে। ককটেল সসেজ ছিল গরম গরম, আমরা দু'জনে টুথপিক বিঁধিয়ে কয়েকটা তুলে নিলাম।

সত্রাজিৎ বলল, মেঘনাদ আজ আসবে না। এখনও যখন এল না।

আমি বিশ্বাস করি না। আমি তোমার সঙ্গে একমত নই।

আমি মনে মনে বলি, ভয় তুমিও পেয়েছ বন্ধু। এখন প্রার্থনা করছ, ও যেন না আসে। ও যেন প্রাণে বেঁচে যায়।

কিন্তু তা বোধহয় হবাব নয়। একটু পবেই দেখি, পাখির মতো ফিনফিনে বউকে সঙ্গে নিয়ে মেঘনাদ বায় হেলতে দুলতে ঢুকছে। মেয়েদের দল অমনি ছুটে এসে কিচিরমিচির শুরু কবে দেয়, এ কী! এত দেবি কেন? আমবা ভাবছি—ও বুঝতে পেরেছি, তোমবা আর কোথাও গিয়েছিলে!

মেঘনাদ ধীরে ধীরে কিন্তু অব্যর্থভাবে হলের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে দাঁড়ায়।

রঞ্জন মুস্তাফি ততক্ষণে কয়েক গেলাস গিলেছে। ও গিয়ে মেঘনাদকে জড়িয়ে ধরল। একটু কি টলে গেল টেবাকোটা? আমি ভাবি। কার্ল মার্কস যদি আরও পাঁচশো বছর আগে জন্মাতেন, আমি ভাবি। প্রতীক নন্দী গেল কোথায়? ওকে দেখছি না কেন? একসময় সত্রাজিৎও আমার কাছছাড়া হয়ে যায়। ও কি খববটা দিলীপ ধুমেকে জানাতে গেল?

ব্যাঙ্কোয়েট হলে কোলাহলের শব্দমাত্রা ক্রমে ক্রমে ষাট, সত্তর ছাপিয়ে আশি ডেসিবেলে পৌঁছে গেছে। ঘড়ি দেখলাম, দশটা পঁচিশ। মন্থর মেঘেব মতো আড়াই ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে ভেসে চলে গেছে, টেব পাইনি।

আমি ভিড়েব মধ্যে ঘুবতে লাগলাম। অনেকেই কোনায় কোনায় রাখা সোফায় বসে পড়েছে ততক্ষণে। ছোট ছোট দলে আড্ডা দিচ্ছে। কারুর কারুর সঙ্গে আমার ধাক্কাও লাগল। কেন ঘুরছি? কী খুঁজছি, নিজেই মনে কবতে পারছি না।

হঠাৎ সাদা ঢাকনা দেওয়া টেবিলের ওপব কতকগুলো খালি, আধাখালি গেলাসের মাঝখানে একটা পাঁইট দেখতে পেলাম। তুলে নিয়ে দেখি, তার মধ্যে কিচ্ছু নেই। ছিপি খোলা। ওদিকে বেয়ারার ট্রে থেকে একটার-পর-একটা সোনালি রঙের গেলাস নিয়েই যাচ্ছে টেরাকোটা। ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রথমে মাথা ঘোবে, তারপর গা গুলোয়। সায়ানাইডের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমি শুনেছিলাম, তারপব বমি হয়ে গেলে ভাল। না হলে আস্তে আস্তে জ্ঞান হারিয়ে যাবে। অজ্ঞান অবস্থাতেই হার্টের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আমি ক্রমাগত ভিড়েব মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকি। দিলীপ ধুমে গেল কোথায়? ও কি পুলিশে খবর দিতে গেল? আমি দেখতে পাই, প্রতীক নন্দী হাত নেড়ে নেড়ে কুমুদ বিশ্বাসকে বোঝাচ্ছে, সাপ নির্বোধ আর অনুভূতিপ্রবণ। সাপ স্মৃতিশক্তিহীন। সে বেশিদূর দৌড়োতে বা তাড়া করতে পারে না। বিপদসংকেত পেলে সে আক্রমণ করে। সাপ পোষ মানে না। প্রতিহিংসাপরায়ণ হবার ক্ষমতা সাপের নেই। এইসব হল বৈজ্ঞানিক সত্য। ভুল মিথ প্রচার করে যারা সাহিত্য করে, তারা ধোঁকাবাজ।

রূপকমল চৌধুরী বলছে, না, আজ সে গান গাইতে পারবে না। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে, তারপর চোখে পড়ল, একটা সোফায় দেহ এলিয়ে মেঘনাদ রায় ঘুমুচ্ছে।

তার পাশের সোফায় বসে ওর পাখির মতন ফিনফিনে বউটা আর দু'জন মহিলার সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে—আমি না, আমি না...পেলেই কিনব। কেউ মেঘনাদকে দেখছে না।

ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মেঘনাদবাবুর কী হয়েছে?

ও বলল, ওই রকম হয়। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে। আজ খুব টায়ার্ড। একটু পরেই জেগে উঠবে।

তারপর আবার সঙ্গিনীদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। ও একটা কথার শিশি।

সত্যি, কী পরিশ্রম করতে হয় ব্যস্ত লেখকদের। কী অন্তর্দৃষ্টি আর একাগ্রতা নিয়ে মানুষের মন খুঁড়ে খুঁড়ে কাহিনী বুনতে হয়! নিজেদের ভেতরটা ঝাঁজরা হয়ে যায় না! ওর বউটা কিছু বোঝে? লোকে বলে, ও নাকি ভারী অহংকারী। আমি ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। কই, অহংকারের কোনও চিহ্ন নেই। আসলে, আমি হয়তো অহংকার না, ওর ঠোঁটের কোণে ফেনা আছে কিনা খুঁজছি—মনে হতেই চোখ সরিয়ে নিই।

আমি বিপন্ন বোধ করলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল, দু'হাত তুলে চিৎকার করি, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনারা কি জানেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে একটি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে? এবং সেই খুনিকে আমি চিনি? আপনারা তুরীয় জগৎ থেকে একবার বাস্তবে অবতরণ করবেন দয়া করে, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন? এর প্রতিবিধান করবেন? কিন্তু কে শুনবে?

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমারকে তার সঙ্গীরা যখন পরিত্যাগ করে চলে যায়, তখন নদীতীর ত্যাগ করে সে বহুক্ষণ বালুকাস্তূপের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করেছিল অন্ধকার রাত্রে। শেষে তাকে ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত সমুদ্রগর্জন ও হিংস্র পশুর ভয় থেকে উদ্ধার করে কাপালিক বলেছিল, মামনুসর। আমাকে অনুসরণ করো।

ঠিক তাই ঘটল আমার বেলাতেও। এতক্ষণ পর হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হল সত্রাজিতের। কনুই দিয়ে পিঠে খোঁচা মেরে বলল, এখানে হাঁ করে কী দেখছিস? চটপট একটা প্লেট নিয়ে আয়। খেয়ে নে। দেখলাম তার হাতে খাবার-ভরতি প্লেট। কাঁটায় আটকানো মাংসের টুকরো। মামনুসর।

আর অমনি ঘুম ভেঙে সোজা হয়ে উঠে বসল মেঘনাদ রায়। ওর চোখদুটো টকটকে লাল। পাশে-বসা বউকে ডেকে বলল, এই, আমায় খেতে দাও, খিদে পেয়েছে। দেখে তো আমি হতভম্ব।

আমি খেতে খেতে ওর খাওয়াও দেখতে লাগলাম। বেশ স্টেডি। ভাবলাম, আশ্চর্য হুইস্কির সঙ্গে সায়ানাইড কি হজম করে ফেলল? নাকি, সম্পাদক-কাম-বিখ্যাত সাহিত্যিক বিদেশ থেকে লিভারে স্টিল জ্যাকেট পরিয়ে এনেছে?

ফেরার পথে আমার হাতে স্টিয়ারিং। বেশ রাত হয়েছে। রাস্তা ফাঁকা। পাশে বসে সত্রাজিৎ কী সব বিড়বিড় করছে, বোঝা যায় না। আমার মাথায় একফোঁটা নেশা নেই।

ব্যাপারটা কী হল, বল তো? আমি জানতে চাই।

কীসের ব্যাপার?

ওই যে সায়ানাইড? প্রতীক নন্দী পকেটে করে এনেছিল?

ব্লাফ! ও শালা একের নম্বরের গুলবাজ।

সত্রাজিৎ জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, অবচেতন কাকে বলে জানিস? অবচেতন? ও শালা সব সময় অবচেতনে থাকে। ওকে বিশ বছর ধরে চিনি আমি। ও একটা অসুখ। ওই অসুখ ভাঙিয়ে লেখে শালা। কী যেন একটা ইংরিজি নাম আছে অসুখটার। তুই জানিস?

আমি বলি, স্কিজোফ্রেনিয়া?

উত্তর না দিয়ে ও আবার বিড়বিড় করতে থাকে। করুক গে। ভালয় ভালয় এখন ওকে গেটে ঢুকিয়ে দিতে পারলে আমি বাঁচি।

১৯৯১

দেয়ালে টাঙানো গোল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রতন শিকদার দাড়ি কামাচ্ছিল। এখন সাড়ে পাঁচটা, ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ, তবু জ্বলছিল ঘরের আলোটা। স্টাফ কোয়ার্টারের পশ্চিম ঘেঁষে এই ঘরখানা, আলো আসে কম। এপ্রিল মাস, না ঠান্ডা না গরম, তবু এই সাতসকালে স্নান করবে না রতন। বড়সড় গোলপানা মুখে ঘন দাড়ি, বাধ্য না হলে রোজ ডিউটিতে যাবার আগে অবশ্যই কামাত না। কিন্তু হোটেলের চাকরি, হলই বা রুম-ওয়েটার, গেস্টের সামনে আলুথালু বেশে দাঁড়ানো বারণ।

প্লাস্টিকের মগে যতটুকু জল অবশিষ্ট ছিল তা দিয়েই মুখ ধুল, মাথার চুলগুলো ভিজিয়ে নিল একটু। দেয়ালের আর একটা পেরেকে ঝুলন্ত গামছাটা শুকিয়ে কাঠ, তা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে রতন ভাবল, এবার একটা তোয়ালে কেনা দরকার। বড়সড় সাদা তোয়ালে যা দিয়ে মুখ মোছাও যাবে, চান করাও যাবে।

হাতের চেটোয় একটু পাউডার ঢেলে বুলিয়ে নিল মুখে। মেরুন রঙের ড্রেস —অর্থাৎ জ্যাকেট আর পাতলুন যা হোটেল থেকে পাওয়া—পরার আগে চুল আঁচড়াচ্ছে, বটুক ওর পার্টনার শুয়ে শুয়ে মন্তব্য করে: রতনদা, এর মধ্যে রেডি?

একটা গ্রুপ এসেছে কাল, জানিস তো, রতন গম্ভীর দায়িত্বপূর্ণ গলায় বলে, ছ'টা বাজতে-না-বাজতে বেড-টি চাইবে।

বটুক পাশ ফিরে শুল। ওর হাউসকিপিং ডিউটি আটটায় শুরু। গেস্টরা বেড-টি খাবে, কাগজ পড়বে, স্নানটান করে তারপর তৈরি হতে হতে দু'ঘণ্টা। ঘর খালি করে ব্রেকফাস্ট খেতে নীচে নামলে পর বটুকদের দল চেম্বার মেডদের নিয়ে ডিউটিতে নামবে। কাল সন্ধেবেলা ডিউটি শেষ করার সময় ফ্রন্ট অফিসের ফ্রান্সিস বলছিল, পঁচিশজনের গ্রুপ, শুটিং করতে আসছে। ফিল্মি পার্টি মানে বেশি রাত করে শোয়া, দেরিতে ওঠা, হাউসকিপিং শুরু হতে অন্তত ন'টা। সুতরাং বটুক নিশ্চিন্তে আরও দু'ঘণ্টা বিছানায় গড়াগড়ি দিতে পারে।

স্টাফ কোয়ার্টার থেকে দু'মিনিট হাঁটলেই হোটেল—মানে হোটেলের খিড়কি। মাঝখানে লন, বাগান, উঁচু ঝাউজাতীয় বিদেশি গাছ দিয়ে ঘেরা হোটেলের চৌহদ্দি। হোটেলের কোনও ঘর থেকে স্টাফ কোয়ার্টারের দরজা জানলা তো দূরের কথা, অ্যাসবেসটসের ছাদ পর্যন্ত দেখা যায় না।

আগে চা তারপর অন্য কথা। রতন প্রথমে সোজা কিচেনে ঢুকে পড়ে। ব্রেকফাস্ট ডিউটি আবদুলের, বলে, গরম গরম চা দাও মিঞা।

মিঞাকে বলতে হয় না। বিশাল কেটলিতে ব্রোকন ডাস্ট ফুটছে, একটা টিনের ট্রের ওপর থরে থরে সাজানো পাউরুটির পাশের স্লাইস। এক মগ করে চা আর দু'স্লাইস রুটি খেয়ে নেমে পড়। একবার অর্ডার আসতে শুরু করলে আবদুলের দু'পাশে ডিম আর মাখনের পাহাড় বিধ্বস্ত হতে থাকবে। ওয়েটারের ব্রেকফাস্ট বন্ধ।

চা শেষ করে কিচেন থেকে বেরুবার আগেই রুম সার্ভিস ইনচার্জ ডিসুজা ধরে ফেলল। রতনকে নিয়ে ছ'জন রুম ওয়েটার একসঙ্গে দাঁড়িয়ে তখন শক্তি সঞ্চয় করছিল।

ডিসুজা বলল, দু'শো দশ, তিনশো পাঁচ আর পাঁচশো বাইশ—এই তিন রুমে ঠিক ছ'টায় চা, চারশো আঠারোকে ডিসর্টাব করবে না, ও যখন খবর দেবে, ঘরেই কফি আর ব্রেকফাস্ট। আর বাকি যেমন যেমন অর্ডার।

রতনকে আলাদা করে ডেকে: রট্ন, চারশো আঠারো তোমার এবিয়া, লুক আফটার হিম; ডিফিকাল্ট গেস্ট।

আজ নতুন নয়, দু'দিন-তিনদিন পর পর ডিসুজা এই রকম সাতসকালে সারপ্রাইজ ভিজিট দেয়। আসল উদ্দেশ্য, দেখা, ওয়েটাররা কেউ লুকিয়ে টোস্ট, ডিম বা গেস্টদের চা খাচ্ছে কিনা।

রতন বলল, জানি।

হ্যাঁ, রতন সত্যিই জানে। এই হোটেলে চার বছর, তার আগে কলকাতা, দীঘা, দুর্গাপুর, কাশীতে কাজ করে এসেছে। বার, রেস্টুরেন্ট, কফি শপ—সর্বত্র ও বিভিন্ন চরিত্রের গেস্টদের সঙ্গে পরিচিত

হয়েছে, ওদের ধরনধারণ ভঙ্গি লক্ষ করেছে কাছাকাছি থেকে। মানুষ চিনতে রতন শিকদারের আজকাল আর সময় লাগে না।

ও জানে, হোটেলের এইসব গেস্টদের অনেকেই বাড়িতে নিয়মিত তেলাপিয়ার ঝোল আর আলুভাতে ভাত খেয়ে আপিস যায়, রাত্তিরে কদাচ লুকিয়ে চুরিয়ে কোথাও দু'পাত্র মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে চোরের মতন। একটু বাড়াবাড়ি করলে বউয়ের কাছে 'ঝাড়' খায়। ট্যুরে বেরোলেই এদের চেহারা অন্য রকম। পান থেকে চুন খসলে তুলকালাম। কফি চাই পাইপিং হট, চিকেন চাই ফাইবারলেস, চাউমিয়েন কেন নানকিংয়ের মতো হয়নি, এইসব হাজারো বায়নাক্কা। আবার, একটু তোয়াজ করলে এরা চট করে গলে যায়। হোটেলের ম্যানেজার সুরেশ মেহরা সেই কথাই বলে বার বার, প্রত্যেক স্টাফকে,—দেখো গেস্টের প্রয়োজন তো মেটাতে হবেই কিন্তু হোম কমফর্টই শেষ কথা নয়। ইগো, গেস্টের ইগো স্যাটিসফাই করাও আমাদের কর্তব্য। খুব খাঁটি কথা।

বিশেষ যে ডিফিকাল্ট গেস্টের কথা ডিসুজা মনে করিয়ে দিয়ে গেল, তাকে কাল রাত্রে এক লহমা দেখেছে। ফরসা, দশাসই চেহারা, ব্যাকব্রাশ করা চুল। গ্রুপটা চেক ইন করেছে রাত আটটার পর। সকলেই ক্লান্ত। যে-যার ঘরে গিয়ে স্নান সেরে সোজা ডাইনিং রুমে। এর মধ্যেই চারশো আঠারো ম্যানেজারের কাছে নালিশ করে গেছে, কার্পেট যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। না, ব্যক্তিটি ফিল্মের হিরো বা ডিরেক্টর নয়, সম্ভবত হিরোর ম্যানেজার। তবু, হাউসকিপিং চিফকে বলে দিয়েছে মেহরা, কাল সকালে যেন ফ্রেশ কার্পেট পড়ে যায়। আর গেস্টকে অনুরোধ, একটা রাত কোনও রকমে সহ্য করুন স্যার, কাল ঠিক করে দেব। নো প্রবলেম।

একতলায় লিফটের পাশে সার সার ঘর-নির্দেশক আলো। রতন ফিসফিস করে লিফটম্যান সহদেবকে বলল, বটুক আরাম করছে কোয়ার্টারে, জানে না, এসেই কার্পেট ঠেলতে হবে।

খুব ধীরে ধীরে সকাল হয় এখানে। পুবদিকে ঝাউ গাছগুলোর ফাঁকে সূর্য উঠেও ওঠে না। সিকিউরিটি গার্ডদের ডিউটি বদল হয়। দুধের গাড়ি আসে। একটি-দুটি করে জানলা খোলে। এয়ারকন্ডিশন মেশিনের গোঁ গোঁ শব্দ থামে। ঘুম ভাঙে হোটেলেব।

দু'জন-চারজন করে স্টাফ ডিউটিতে আসছে সকালবেলা। নব্বইজন স্টাফ, সকলেই কোয়ার্টারে থাকে না। অফিস ডিউটি, ডে ডিউটি যাদের তারা শহরে বাসা করেছে নিজের নিজের। বউ বাচ্চা নিয়ে থাকে। ছোকরা স্টাফ আছে একদল, তাদের নিজস্ব মেসবাড়ি।

যে-যার জায়গায় মোতায়েন। ফালতু কথাবার্তার জায়গা এটা নয়। তবু ঘুরতে ফিরতে অনেকেই ছুঁকছুঁক করছে রিসেপশনের কাছাকাছি। মিস রোজের কাছে রুম অ্যালোকেশন চার্ট, কৌতূহল, কে কে আছে এই শুটিংয়ের গ্রুপে, কে কোন ঘরে। মিস রোজ কাউকে পাত্তা দিচ্ছে, কাউকে দিচ্ছে না।

ফ্রান্সিসের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য নামগুলো জেনে নিয়েছে রতন। হিরো তো নামকরা লোক, তার জন্যে ডি-লুকস সুইট। হিরোইন আসেননি। এখানকার আউটডোরে তিনি নেই। তিনজন সাইড ক্যারেক্টর—তার মধ্যে একজন মাত্র মহিলা। তা ছাড়া ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যান, স্টিল ফোটোগ্রাফার, মেকআপম্যান; ভাঁড় চামচাই বেশি। ফ্রান্সিস বলল, হোটেল থেকে কুড়ি মাইল দূরে ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে একটা দারুণ প্যানোরামা না কী যেন আছে, সেখানে ফাইটিং সিন তোলা হবে। তিন দিনের বেশি এরা থাকবে না।

ন'টা নাগাদ কোথা থেকে ছ'খানা জিপ আর দুটো গাড়ি এসে হাজির হল হোটেলে। গমগম করে উঠল জায়গাটা। ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্টের টুংটাং শব্দ আর কফির গন্ধ মিলিয়ে গেল একসময়। ওয়েটার আর স্টুয়ার্ডদের প্রচণ্ড উত্তেজনা ও টেনশনের উপশম ঘটিয়ে পঁচিশজনের গ্রুপ হুস করে বেরিয়ে গেল।

দশটা বাজতে-না-বাজতে রতনের প্রাতঃকালীন ডিউটি শেষ। আবার সন্ধে ছ'টা থেকে রাত এগারোটা অবধি। সেই সময়টায় দৌড়ঝাঁপ বেশি। ফ্রন্ট অফিসের ওপর চাপ কিন্তু সকাল ন'টা থেকে বারোটা। গেস্টরা চেকআউট করে, টাকাপয়সার লেনদেন হয়। বিদেশি হলে কথাটা বেশি। নতুন গেস্ট আসে, খাতায় পত্রে তাদের নাম-ধাম লেখানো, বুঝে বুঝে ঘর দেওয়া, ব্যাগেজ পাঠানো, ব্যাগেজ নামানো—দম ফেলার সময় থাকে না। তারপর টেলিফোন। এদিকে ম্যানেজার এসেই খোঁজ করবে আজ ওকুপেনসি কত, কোন কোন ঘর খালি আছে, কত টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে, এইসব। সারাদিনে

আরও কতজনের আসার কথা, তাদের ঘর ঠিক করা আছে কিনা। হিসেবপত্র নখদর্পণে রাখো আবার কান পর্যন্ত দেঁতো হাসি টেনে গুড মর্নিং স্যার, গুডবাই স্যার, থ্যাংকিউ স্যার অনর্গল আউড়ে যাও, ফ্রান্সিস বলেই পারে।

বটুক এসেই খেপে আগুন। কার্পেট বদলাবে না আরও কিছু! পঞ্চাশখানা ঘরে প্রতিদিন চাদর তোয়ালে, বালিশের খোল পালটানো, বাথরুম ধোয়া মোছা, ডাসটিং ব্রাশিং করতে বারোটা কাবার হয়ে যায়। চারশো আঠারোর কার্পেটে ময়লা নয়, দাগ আছে কিছু, কফি বা মদ ফেলেছিল কেউ, শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে হালকা সবুজের খানিকটা। ও শ্যাম্পু না করলে যাবে না। পাশের ঘর চারশো ষোলো আজ খালি হয়েছে, ডিফিকাল্ট গেস্টের জিনিসপত্র সেখানে সরিয়ে আনল বটুক।

সকলে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, ম্যানেজার সুরেশ মেহরা সুট পরে টাই ঝুলিয়ে শুধু ঘুরে বেড়ায়, অনেকের ধারণা। আসলে ওর হোটেল চালানোর পদ্ধতি নিজস্ব। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে আলাদা কর্তা আছে, তাদের কাজ তারা নিজেরা দেখাশোনা করবে। মেহরা শুধু রাউন্ড দেয়। ফ্রেশ বাজার অর্থাৎ মাছ মাংস তরিতরকারি পৌঁছোলে তাদের কোয়ালিটি চেক করে। স্টোরে ঢুকে দেখে সব জিনিস ঠিকঠাক সাজানো আছে কিনা। রান্নাঘরে গিয়ে গন্ধ শোঁকে। ডিশওয়াশিং এরিয়ায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আধঘণ্টা। মাস্টার-কি পকেটে নিয়ে একতলা থেকে চারতলা টহল মারে লিফট ছাড়াই। হঠাৎ একেকটা খালি ঘরে ঢুকে পড়ে, চেকআপ করে সব ছিমছাম কিনা, অ্যাশট্রেতে ছাই নেই তো, ফ্লাস্কে ঠান্ডা জল আছে তো? বাথরুমে নতুন সাবান? দেয়ালে ঝুল? রেস্টুরেন্ট, বার-এ ঢুকে এক কোণে একটা ড্রিংক নিয়ে বসে সন্ধেবেলা লক্ষ করে, স্টুয়ার্ডদের, ওয়েটারদের তৎপরতা, প্রসন্নতা অর্থাৎ সার্ভিস। গেস্টদের চাহিদা, তৃপ্তি—অর্থাৎ স্যাটিসফ্যাকশন। লিন আওয়ার্স যখন অর্থাৎ দুপুর তিনটে থেকে পাঁচটা, সেই সময় ওর নিজস্ব কামরায় বসে মিটিং করে, ত্রুটি বিচ্যুতির আলোচনা করে, ওয়ার্নিং দেয়। আবার সাবাস দিতেও মেহরার কুণ্ঠা নেই। হোটেল স্টাফ ম্যানেজারকে ভয় করে মান্য করে, কিন্তু ফ্রান্সিস বা ডিসুজার মতো ইনচার্জদের প্রতি অপ্রসন্ন, বিরক্ত। কথায় কথায় ওরা খুঁত ধরে, হুক দেখায়।

চারশো আঠারো থেকে চারশো ষোলোয় শিফট করার ফলে, ভয় ছিল ডিফিকাল্ট গেস্ট বোধহয় খচে যাবে। যায়নি। অত্যন্ত সাবধানে বটুক দাবার ঘুঁটির মতো এঘরে যেখানে যা, ওঘরে সেখানে তাই সাজিয়ে রেখেছে। রুমে হেয়ার ক্রিম, বাথরুমে আফটার শেভ। টুথপেস্টের পাশে শেভিং টিউব স্বামী-স্ত্রীর মতো করে শোয়ানো। নগ্ন মলাটের ইংরেজি পেপারব্যাক বেডসাইড টেবিলে তেমনই উপুড় করে রাখা।

রতন শিকদারের জন্যে চারশো ষোলোর আলো জ্বলল রাত আটটার পর।

নক করে রতন।

কাম ইন।

গুড ইভনিং জানায় রতন। দেখে, ডিফিকাল্ট গেস্ট ছাড়া আরও দু'জন উপস্থিত। ফিল্মের মহিলাটি আর একজন চামচা।

বেয়ারা, মহিলা জিজ্ঞেস করে, দাদা কি শুয়ে পড়েছে?

দাদা মানে হিরো না ডিরেক্টর ঠিক বুঝতে না পারলেও রতন বলে দেয়, ডিনার হয়ে গেছে, বই পড়ছেন।

ড্রিংকস অর্ডার দেবে কিনা জানতে চাইবার আগেই ডিফিকাল্ট গেস্ট বলল, এক বাকেট বরফ আর ছ'টা সোডা।

মহিলা বলল, আমার জন্যে একটা সফট কিছু বলো পঙ্কজ।

স্ন্যাকস? কী পাওয়া যাবে?

রেশমি কাবাব, ফিশ ফিংগার, মটন শিক, ফ্রায়েড চিকেন।

ঠিক আছে, পঙ্কজ বলল, সবগুলোই এক প্লেট করে দাও।

চামচা একগাল হেসে বলে, এত খাবার খাবে কে পঙ্কজদা?

আরে খাও খাও। ডিফিকাল্ট গেস্টের কণ্ঠস্বরে উদারতা ঝরে পড়ে।

অনেকগুলো ঘরের ডিউটি করতে হচ্ছে রতনকে, তার মধ্যে চারশো ষোলোর প্রতি বিশেষ নজর।

পঙ্কজ নামের লোকটা খামখেয়ালি। ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যে আজ অন্য ঘরগুলোয় সার্ভিস খতম। একটু-আধটু ড্রিংক করে গেস্টরা ডাইনিং রুমে চলে এসেছে।

দশটায় বার বন্ধ হয়ে যাবে। একটু আগে রতন চারশো ষোলোর দরজায় নক করল। ঢুকে দেখে, অভ্যাগত দু'জন চলে গেছে নিজেদের ঘরে।

পঙ্কজ একা। চেয়ারে হেলানো মাথা। নেশায় চোখ দুটো অর্ধেক বোজা। ঘরে শোঁ শোঁ করে এয়ারকন্ডিশন চলছে, বনবন ঘুরছে পাখা। ঘর-ভরতি আলো, সিগারেটের ধোঁয়া। পঙ্কজের সামনে, পাশে, দূরে ড্রেসিং টেবিলের ওপর, সাইড টেবিলের সর্বত্র, খাবার প্লেট। অল্প খাওয়া, না-খাওয়া খাবার-ভরতি প্লেট সব।

লোকে এক রকম খায়। এই খামখেয়ালি লোকটা উদারতা বা অন্য কোনও দুর্বলতার কারণে তন্দুরি চিকেন, বিরিয়ানি, চিলি প্রন, কাবাব পরোটা, আ-লা-কিভ—সব এক নিশ্বাসে আনিয়েছে। অভ্যাগত দু'জন একটু-আধটু ঠুকরে চলে যাবার পর নিজেও খেতে পারেনি।

রতন জিজ্ঞেস করে, আরও কিছু লাগবে স্যার?

পঙ্কজ মাথা নাড়ে, না।

ডিনার খাবেন না?

একটু চুপ করে থেকে পঙ্কজ বলল, ওই চিকেন থেকে একটা টুকরো তুলে আমার মুখে ফেলে দেবে?

রতন দেয়। রুম সার্ভিস ওয়েটার রতন শিকদারের কর্তব্য গেস্টকে খুশি করা। গেস্টকে শুশ্রূষা করা। ওর মেরুন রঙের ড্রেস সার্ভিসের প্রতীক।

হাঁটু মুড়ে কার্পেটের ওপর বসে রতন একটু একটু করে সব প্লেট থেকে কাঁটায় চামচে খাবার তুলে ডিফিকাল্ট গেস্টের মুখে ঢুকিয়ে দিতে থাকে। দিতে গিয়ে ওর নিজের জিভে জল এসে যায়।

গ্রিসি, স্পাইসি, টেস্টি, হট—একটা করে শব্দ ওর চকচকে মুখ থেকে ঢেকুরের মতো উঠে আসে। লোকটা কুপকুপ করে খাচ্ছে আব হাসছে মৃদু মৃদু। রতন দেখল ওর থুতনির নীচে আর এক থুতনি অল্প অল্প কাঁপছে।

একসময় ও বলে, তোমার নাম কী?

রতন শিকদার।

লোকটাও শুনল, রতন শিকদার। বলল, বেশ নাম। তা রতন তুমি একটু খেয়ে নাও না এখান থেকে। অনেক তো আছে। এঁটো নয় বিশ্বাস করো।

না স্যাব।

কেন না? আমি নিয়েছি, আমি পয়সা দেব। আমি তোমাকে খেতে বলছি। এতগুলো দামি খাবার নষ্ট হবে?

না স্যার। আমাদের গেস্টফুড খেতে নেই।

বার বার ঢোক গিলছে রতন। লোকটাকে খাওয়াতে গিয়ে খাবার নাড়াচাড়া করার ফলে, খাবারের সঙ্গে ওর মুখের ব্যবধান বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। রাগ হল, একবার মনে হল লোকটাকে গলা টিপে মেরে ফেললে কী হয়। আবার ভাবে, ছি ছি। ওর কর্তব্য ওকে করতে হবে।

প্লেটগুলো নিয়ে যাই, আপনি শুয়ে পড়ুন স্যার।

ঠিক আছে। লোকটা বলল, লোভে পড়ে গেলাম বুঝলে রতন। তোমার পয়েন্ট আমি বুঝতে পেরেছি। খাবার খেয়ে চাঙ্গা হয়েছে। লোকটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বাথরুমে গিয়ে অনেকটা পেচ্ছাপ করল। ফ্ল্যাশ টানল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, থ্যাংক ইউ রতন্। ইউ আর নট রতন্ রিয়ালি।

বলে ওকে দশটাকা টিপ্‌স দিল লোকটা।

রতন বলল, থ্যাংক ইউ স্যার। গুড নাইট স্যার।

ট্রে-ভরতি প্লেট, কাঁটা, চামচ, ছুরি, খাবারের জঞ্জালের পাহাড় নিয়ে রতন চারশো ষোলো নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। একটু পরে তার ডিউটি শেষ হবে। স্টাফ ক্যান্টিনে মাছ-ভাত খেয়ে শুয়ে পড়বে। কাল ভোরে উঠে ডিউটি।

পকেটে দশটা টাকা কুটকুট করছে। ডিসুজা ঠিকই বলেছিল, এই রকম গেস্ট সচরাচর আসে না।

১৯৮৪

যেমন পাজামা, যেমন ছাতা

পৃথিবীতে কেউই অপরিহার্য নয়, জ্যোতির্ময় বহুবার তার পরিবারের কর্ত্রীদের বোঝাবার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ মা আর বউকে। তবু কাজের মেয়েটা যখনই ছুটি চায়, তখনই ওরা হাঁ হাঁ করে ওঠে: এখনই তোমার ছুটির দরকার হল? এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। বউ বলল, 'কাল থেকে বুবুনেব পরীক্ষা। সোমবার পিসিমা আসবে সিউড়ি থেকে। ছানির ডাক্তারের সঙ্গে দিন ঠিক করা আছে। এই হাঁপানি নিয়ে মা হেঁশেলে ঢুকবেন, না আপিস কামাই করে আমি বাড়িতে বসে থাকব?'

'পোষ সংক্রান্তিতে একবার বাড়ি যাবনি?' অবাক হয়ে শুধোয় মায়া।—'কখনও তোমরা যেতে দাও না। এবার আমি যাব।'

'এদিকে খেতে পাও না। অথচ বারো মাসে তেরো পার্বণ তোমাদের লেগেই থাকে।' ওর বউ ক্রমশ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে, 'কী হবে পোষ সংক্রান্তিতে শুনি? গোকুলপিঠে বানাবে, না পাটিসাপটা? চিনি দশ টাকা কিলো। নারকোল তিন টাকায় একটা। কেরোসিন তেল পাওয়া যায় না গ্রামে। কী দিয়ে মোচ্ছবটা হবে? সে সব দিন আর নেই। তুমিও জানো, আমিও জানি। খালি মাইনে বাড়াবার ফিকিব।'

মায়া গাঁইগুঁই করে, 'ওই দিনটা বাড়িতে থাকতে হয়। মাঘ মাস পড়লেই তো চলে আসব। ক'টা দিন একটু সামলে নিতে পারবেনি?'

'তা হলে লোক দিয়ে যাও।'

'লোক কোতায় পাব এখন! সবাই তো দেশে যাচ্চে। আর বস্তির মেয়ে কেউ বদলি করবে নে। তা হলে কাজ ছেড়ে যেতে হয়।' ইঙ্গিতটা মারাত্মক। বুঝতে পেরে কেসটা স্বামীর কাছে এনে ফেলে ওব বউ। বলে, 'ও যাবেই যাবে। জিদ। তোমার প্রশ্রয়ে ওর এই বাড় বেড়েছে। কতবার বলেছি, ওর রান্নার প্রশংসা কোরো না।'

তখন জ্যোতির্ময খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। গ্যাসটা বেরিয়ে যেতে দেয়। তারপব আস্তে আস্তে বলে, 'কেউই অপরিহার্য নয়।'

বিশদভাবে ব্যাখ্যা কবতে ভয় পায় জ্যোতির্ময়। কারণ, তাতে নিজেদেব মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ঘটে যাবার সম্ভাবনা। আমরা প্রত্যেকেই ভাবি, আমি না থাকলে সংসার অচল হয়ে যাবে। ভাবতে ভালবাসি। নিবাপদ বোধ করি। এই ভাবনা মনের মধ্যে কাজ করে বলে জীবন অর্থহীন মনে হয় না। এই এক মধুর মিথ্যে আমাদের কত বড় অবলম্বন। বা হয়তো মিথ্যে নয়।

'চাব দিন বলে যাচ্ছে বটে, চব্বিশ দিন পরে ফিরবে ও। দেখে রেখো। এদের কথার কোনও মূল্য আছে নাকি? একেবারে না-ও ফিরতে পারে। তখন।'

কী উত্তর দেবে জ্যোতির্ময় এইসব প্রশ্নেব? বলতে পারত, ক্রীতদাস প্রথা উঠে যাবার পর থেকে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। কী করা যাবে বলো। যত গরিবই হোক, কাজ না করার স্বাধীনতা মায়ার রয়েছে। ওকে তোমরা বেঁধে রাখতে পারো না। কিন্তু অত সব গুরুতর প্রসঙ্গে না গিয়ে বলল, 'রাজীব গান্ধী ছাড়াও তো এত বড় দেশ চলছে। মায়া ছাড়া আমাদের সংসার অচল হয়ে যাবে? ওকে যেতে দাও। একটা ঠিকেফিকে জোগাড় করা যাবে'খন। চব্বিশ দিনও দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

মনিব হিসেবে মামলার রায় দিল জ্যোতির্ময়।

কিন্তু যেখানে ও মনিব নয়, একজন কর্মচারী মাত্র, সেখানকার অবস্থাও একই রকম।

ছোট আপিস। বেসরকারি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। সতেরো বছর আগে ওখানে কেরানি হয়ে ঢুকেছিল, আজ ও হেডক্লার্ক। সবাই বলে বড়বাবু। নামেই বড়বাবু। পদটা খুব একটা হিংসে করার মতো না। ওর ওপরে ছোটসাহেব, মেজোসাহেব, বড়সাহেবরা আছে। জ্যোতির্ময়ের তুলনায় তিনগুণ-চারগুণ তাদের মাইনে।

তারা ট্যুরে যায়। একনাগাড়ে পনেরো দিন-কুড়ি দিন কাটিয়ে, হাওয়া বাতাস খেয়ে আপিসে ফেরে। তারা যত্রতত্র মিটিং করে, সেখানে কতটা কাজ হয়, কতটা আড্ডা হয়, কেউ তার খোঁজখবর রাখে না। তারা ছুটিতে যায় হরদম। মুখে মুখে মঞ্জুর হয়ে যায় ওদের ছুটিছাটা। কোনও রেকর্ড থাকে না তার। জ্যোতির্ময়ের কাছে খেপে খেপে তাদের খরচের ভাউচার আসে। ওর কাজ হল, বিনা প্রশ্নে সেগুলো

চুকিয়ে দেওয়া আর তারপর নানান খাতে সেগুলো ঢোকানো। যাতে দেখতে বিসদৃশ না হয়।

ওরাই হয়তো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্মী। তাই ওদের এত কদর।

তবে দায়িত্ব আছে জ্যোতির্ময়ের। ধনরক্ষক আর যক্ষ, কিন্নরদের অধিপতি এই বড়বাবুকে আপিসের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়। বেয়াদবকে শাস্তি দিতে হয়। অন্যের দ্বারা উপার্জিত ধনের অপচয় যেন না ঘটে, সেদিকে রাখতে হয় প্রখর দৃষ্টি। ওপরতলার ব্যাপারে কিছু করতে না-পারার ক্ষোভ সে সুদে-আসলে মিটিয়ে নেয় নীচের তলার নিয়ন্ত্রণে। ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটা বেতালা ওভারটাইম কি ট্যাক্সিভাড়া গলিয়ে দেওয়া দুঃসাধ্য। কুবের—জ্যোতির্ময় নিজেকে কুবেরের সঙ্গে তুলনা করে কখনও কখনও। যদিও সে ততটা কুচ্ছিত না। একটু মোটাসোটা, তা একচল্লিশ বছর বয়েসে সকলেরই একটু মেদবৃদ্ধি হয়। বিশেষ করে, হাতলওলা গদি-মোড়া চেয়ারে বসে বসে যার কাজ। আপিসের যক্ষ আর কিন্নরেরা ওকে পছন্দ করে না, ও জানে, ঘেন্না কুড়োনোতেই ওর সফলতার পরিচয়। জ্যোতির্ময় হেডক্লার্ক, বড়বাবু, প্রশাসক—ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন নয় যে, সহকর্মীদের নিরন্তর এনথু জুগিয়ে যাবে। যার যা ডিউটি, ঠিকমতো না করলে বড়বাবুর কাছে ঝাড় খেতে হবে—সে-কথা বেয়ারা, পিয়োন, টাইপিস্ট, ড্রাইভার, দারোয়ান ও কেরানিকুল সবাই হাড়ে হাড়ে জানে।

আপিসের চাবি থাকে জ্যোতির্ময়ের জিম্মায়। সকলের আগে ও আপিসে আসে আর সবাই চলে গেলে পর বাড়ি যায়। আপিসের গাড়ি ওকে নিয়ে আসে রোজ সকাল সাড়ে আটটায়, আবার পৌঁছে দেয় সাতটার পর। এই নিয়ে লোকেদের হিংসের শেষ নেই। কত বড় দায়িত্বের বোঝা ওর ঘাড়ে, ওবা একবার ভেবে দেখে না। শুধু ফুরসতের অভাবে বছর বছর ওর কত পাওনা ছুটি যে পচে গেল, সেদিকে কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রতিষ্ঠানের যিনি বড়সাহেব, খোদ মালিক, মিস্টার এল কে গুপ্ত, তাঁরও নেই।

আমরা মানুষের অপরিহার্যতা নিয়ে কথা শুরু করেছিলাম। পৃথিবীতে কেউই অপরিহার্য নয়, এ বিষয়ে জ্যোতির্ময়ের নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যয় আমরা অবগত হয়েছি। এখন অবাক হয়ে ভাবতে পাবি, তা হলে কেন ও কর্মস্থলে ক্রমে ক্রমে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলল? তার বিপজ্জনক দিকটা দেখল না!

বাড়ির কাজের মেয়ে মায়া যখন পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেল, আর তারপর থেকে সংসার ঠেঙাতে মা আর বউ যখন হাব্বাতাব্বা খাচ্ছে, তখন, তখনই, বুকের ব্যথার অজুহাতে জ্যোতির্ময় ছুটির দরখাস্ত করল বড়সাহেবের কাছে। একমাস—নিদেনপক্ষে দু'সপ্তাহ ছুটি ওর চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য দরকার, তার উপযুক্ত প্রমাণপত্রও পাঠিয়ে দিল দরখাস্তর সঙ্গে। বাড়িতে থাকলে সংসারের কাজে যদি কিছু সাহায্য করা যায়, এমন ভাবনা ওর মনে ছিল, আমরা ধবে নিচ্ছি।

এল কে গুপ্ত কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

ভাবলেন, ব্যাপার কী। যে-লোকটা কথায় কথায় পেটি ম্যাটার নিয়ে ঘরে ঢুকে আসে, সে আজ চিঠি পাঠাল কেন? ডেকে পাঠালেন জ্যোতির্ময়কে।

'কী ব্যাপার? হঠাৎ ছুটির দরখাস্ত?'

ক্রীতদাস প্রথা উঠে যাবার যুক্তিটা ওর বাড়িতে মনে হয়েছিল, বলতে পারেনি। এখানেও মনে হল, বলতে পারল না।

'শরীরটা ভাল যাচ্ছে না কিছুদিন হল। একটা বড় কিছু বিপদে যাতে পড়ে না যাই, তাই কিছুদিন...আমি তো কখনও ছুটি নিই না, আপনি জানেন স্যার।'

'জানি বলেই তো অবাক লাগছে। অন্য কোনও মতলব নেই তো? মানে মাইনেপত্র ব্যাপারে কোনও ক্ষোভ, কোনও অসন্তোষ'—

জ্যোতির্ময় এবার একটু লজ্জিত হয়। ছিঃ ছিঃ, ও কি মায়া? ওর রোজগার মায়ার চেয়ে অনেক বেশি।

এল কে গুপ্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ও নিজের বউয়ের মুখটা খোঁজে। মনিব। একেবারে হৃদয়হীন মনিব। অথচ অনেক ব্যাপারে এরা দু'জনেই মানুষ হিসেবে উদার, মহৎ। ক্ষমাশীল।

'সে-কথা বললে স্যার, পৃথিবীতে কে আর সন্তুষ্ট। তবে ছুটিটা আমার দরকার।'

ওর কণ্ঠস্বরে মায়ার দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে ও লক্ষ করে, বড়সাহেব তাঁর শুঁড় সরিয়ে অস্বস্তিকরভাবে নাড়াচ্ছেন। গুড়ের ওপর বসা আরশোলা হঠাৎ বিষের গন্ধ পেলে যেমন নাড়ায়।

'না, না, সে তো বটেই। আমি ভাবছি কাকে লাগাব আপনার জায়গায়। অনেস্ট, এফিসিয়েন্ট, লয়্যাল

একজনকে তো চাই।' ঠিক মায়ার মতো। কিন্তু তেমন বদলি ও কোথা থেকে এনে দেবে? একেবারে খাপে খাপে কি মেলে? জ্যোতির্ময় বলল, 'সুধীরবাবুকে ট্রাই করতে পারেন। সিনিয়র লোক। আমি সব পেনডিং কাজ ক্লিয়ার করে যাচ্ছি।'

বলল না, পৃথিবীতে কেউই অপরিহার্য নয়।

ঠিকে লোক একটা জোগাড় করা গেছে। সে মোটা কাজগুলো করে দিয়ে যাচ্ছে রোজ। হাঁপানির কষ্ট নিয়ে মাকে ঢুকতে হয়েছে রান্নাঘরে। সকালের ঝক্কি সামলাচ্ছেন তিনি। আপিস থেকে ফিরে এসে হাল ধরে বউ। দোকানে বাজারে হাঁটাহাঁটি—সে-ও কম নয়—জ্যোতির্ময় নিয়ে নিল। এই তো, একজনের কাজ তিনজনে ভাগ করে নিলে কারুরই গায়ে লাগে না।

বড়সাহেব ওদিকে সুধীরবাবুকে ট্রাই করছেন। জ্যোতির্ময় জানে, একা সুধীরের পক্ষে সব দিক সামলানো অসম্ভব। ওই কাচে-ঢাকা টেবিল আর গদিওলা চেয়ার আসলে একটি রাবড়ির কড়াই। ওপর থেকে হাওয়া দেবে আর নীচের দিক থেকে জ্বাল দেবে সর্বক্ষণ। তার মাঝখানে বসে ঠান্ডা মাথায় কাজ করবে সুধীর? একদিন এমন এক কাণ্ড করে বসবে যে, পালাতে পথ পাবে না। তবে, বড়বাবু হওয়ার ভারী শখ ওর, এই সুযোগে সেটা মিটে যাক।

দিন কয়েক যেতে-না-যেতে ক্রমশ প্রকাশ হতে লাগল—অনেস্ট, এফিশিয়েন্ট আর লয়্যাল বলে যাদের ধরে নেওয়া হয়েছিল, ততটা গুণের অধিকারী তারা নয়। না জ্যোতির্ময়, না মায়া।

মা বললেন, 'মায়া নির্ঘাত চায়ের পাতা চুরি করে। চিনি চুরি করে।'

জ্যোতির্ময় বলল, 'মা, হাতেনাতে তো ধরতে পারোনি। সন্দেহ করছ। মানুষের চরিত্রে সন্দেহ করা অনুচিত।'

একদিন সুধীর বড়সাহেবের কামরায় ঢুকল একগোছা চেক হাতে নিয়ে। সই-করা সব চেক সাপ্লায়ারদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা। বড়বাবুর ড্রয়ারে পড়ে ছিল। পাঠানো হয়নি। অথচ ওরা তাগাদা দিচ্ছে।

সুধীর বলল, 'হেডক্লার্ক নিশ্চয় কমিশন নিতেন চেক দেবার সময়।'

বড়সাহেব হাসলেন শুনে। বললেন, 'ওগুলো ডেসপ্যাচ করে দিন। নিছক সন্দেহের বশে কারুর ওপর দোষারোপ করতে নেই।'

সিউড়ি থেকে পিসিমা এল ডাক্তার দেখাতে। সঙ্গে তার দেওর। চোখ পরীক্ষা করে ছানির ডাক্তার বলল, এখনও পাকেনি। তিন মাস পরে আবার দেখিয়ে যাবেন। ততদিন একটা লোশন লিখে দিচ্ছি, দিনে দু'বার করে লাগান। প্রেসক্রিপশন আর ওষুধ নিয়ে পিসিমা ফিরে গেল।

বুবুনের পরীক্ষা ছিল স্কুলে। তা-ও নির্বিঘ্নে শেষ হল একদিন। মায়ার জন্যে কিছুই আটকাল না।

এইসব কাণ্ড চুকেবুকে যাওয়ার পর এক রাত্রে শুয়ে শুয়ে জ্যোতির্ময়ের বউ ফিসফিস করে বলে, 'শুনছ। ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

'না। কেন, কী হয়েছে?'

'বলব বলব করছি। সময় পাচ্ছি না।'

'কী বলবে, বলো।'

'আমার সেই সবুজ ছাপা শাড়িটা—পুজোর সময় কিনেছিলাম। মনে আছে? ভেতরে মাস্টার্ড কালারের বুটি। দু'শো তিরিশ টাকা দাম। ওটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কোথায় আর যাবে? দেখো, কোনও বাকসের তলায় ঢুকিয়ে রেখেছ। বা, কাচতে দিয়েছ, ফেরত আনোনি।'

'সব দেখেছি। আমার মনে হয়, মায়া সরিয়েছে শাড়িটা।

'মায়া? না, না, ও কেন নেবে? ও কোনওদিন কিছু নেয়নি।'

'আর কে নেবে?'

আর কে নেবে। সত্যি। কেন, ঠিকে মেয়েটা?

তার আগেই গেছে?

বউয়ের দিকে পাশ ফিরে জ্যোতির্ময় লেপের স্তূপটার দিকে তাকায়। স্তূপের বাইরে একটা ছোট্ট

মাথা বেরিয়ে আছে। দুটো উদ্বিগ্ন উদ্‌ভ্রান্ত চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে—স্বল্প আলো সত্ত্বেও বুঝতে পারে ও। বলে, 'অকারণ কারুর ওপর সন্দেহ করতে নেই।'

মনে মনে অবশ্য ভাবে, বলা যায় না, পৌষ সংক্রান্তির উৎসবে ব্যবহার করার জন্যে নিয়েও থাকতে পারে মায়া। গরিব মানুষ তো। কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে ওকে কিছু বলা উচিত হবে না। তবে, ফিরে আসুক একবার। জিজ্ঞেস করা যায়, শাড়িটা কোথায়, তুমি জানো? আর নয়তো ওকে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়। চুরি না করুক, কামাই তো করছে। একজন লোক পেলেই ওকে ছাড়িয়ে দেবে।

এল কে গুপ্তও ভেবেছিলেন, এই অপরাধে জ্যোতির্ময়কে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়, যখন সুধীর একদিন রিপোর্ট করল, সাত্তার মিস্ত্রির নামে পাঁচ হাজার টাকা অ্যাডভান্স এক বছর হল নিষ্পত্তি হয়নি। তার চেয়ে বড় কথা, ওই টাকা সাত্তার মিস্ত্রি নিয়েছে বলে স্বীকার করছে না। কোনও রসিদ নেই আপিসের ফাইলে। জ্যোতির্ময় হয়তো নিজে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ওর নামে খাতায় ডেবিট করিয়ে রেখেছে, কোনও এক সময় ওর কাজের সঙ্গে খাইয়ে দেবে, এই ভরসায়। কিন্তু এখন ব্যাপারটা অডিটরের নজরে আসতে বাধ্য। সুধীর কোনও কৈফিয়ত দিতে অপারগ।

'কৈফিয়ত যা দেবার, জ্যোতির্ময়বাবু ফিরে এসে দেবেন। আপনাকে তা নিয়ে ভাবতে হবে না।' এই কথা বলে সুধীরকে নিরস্ত করলেন আপাতত।

পৃথিবীতে কেউই অপরিহার্য নয়, এই অভ্রান্ত সত্য নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম। বেতনভুক কর্মচারী তো বটেই, এমনকী বাবা, মা, বউ, বন্ধু, ডাক্তার, স্বামী, পুত্র—যাদের নিয়ে সংসার, তারা প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয় আমাদের জীবনযাপনে। কিন্তু এদের কাউকে না হলে আমাদের চলবে না, এমন তত্ত্বে আমরা বিশ্বাস করি না। মানুষের সঙ্গে মানুষ এখন প্রয়োজনের সম্পর্কে যুক্ত। যেমন পাজামা। যেমন ছাতা। অপরিহার্যতার প্রতিনিধি হিসেবে মায়া ও জ্যোতির্ময়কে তো আমরা উপস্থিত করলাম। একটু পরীক্ষা করে দেখতেই ধরা পড়ে যাচ্ছে যে, এই বিশ্বাস ঠুনকো। লয়ালটি, এফিশিয়েন্সি আর অনেস্টি দিয়ে মানুষ যে স্থান কেনে, তার নীচে আছে চোরাবালি। ওই তিনপায়া টেবিলটা তেমন ভারসহ না। ল্যাকপ্যাক করে। টলে। আসলে নীতি দিয়ে কিছু বিচার করার প্রথা এখন উঠে গেছে।

আর তাই মায়া যেদিন দেশ থেকে ফিরে তার কালো লম্বাটে মুখখানা উদ্ভাসিত করে বলল যে, ওর জ্বর হয়েছিল বলে ঠিক সময়ে ফিরতে পারেনি, চব্বিশ দিনও পার হয়ে গেল, তখন, সেই সোমবারের প্রাতঃকালে মা, বউ আর জ্যোতির্ময়—এই তিন বিচারক যুগপৎ যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচে যায়। ওর একটি অপরাধও ক্ষমা না করে বলা হয়, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন, কাজে লেগে যাও। মাছগুলো আঁশ ছাড়িয়ে ভাল করে ভাজো। তার আগে সাবান দিয়ে হাত-পা ধুয়ে এসো নীচ থেকে। যত রাজ্যের নোংরা ময়লা সঙ্গে করে এনেছ!'

দেখাদেখি জ্যোতির্ময়ও আপিসের গাড়ি ছাড়াই পৌঁছে যায় সোমবার ন'টার আগে। তখনও ওর ছুটি ফুরোতে চার দিন বাকি। ওকে আসতে দেখে নিশ্চিন্ত সুধীরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। টেবিলের ওপর স্তূপাকার ফাইল, কাগজ। ড্রয়ারে চাবির থোকা। কাচের তক্তার ওপরে রাখা চায়ের পেয়ালা থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে।

'ভাল আছেন তো বড়বাবু?' জনে জনে জিজ্ঞেস করে যায়। সারা আপিসে ফিসফাস স্বরে রটে যায়, বড়বাবু ফিরেছেন, আর কোনও চিন্তা নেই।

ওকে ছাড়িয়ে দেবার কথা উঠেছিল, বেমালুম ভুলে গিয়ে বড়সাহেব নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। যেন কিছুই হয়নি।

বললেন, 'চা খাওয়া হলে একবার ঘরে আসবেন জ্যোতির্ময়বাবু। অনেক পেনডিং কাজ জমে আছে, বুঝিয়ে দেব।'

মনিব ও ভৃত্য উভয় পটভূমিতে জ্যোতির্ময়কে স্থাপন করে জীবনে অপরিহার্যতার প্রসঙ্গ আলোচনা এইখানে শেষ হল।

১৯৯২

❀ আপেলে দ্বিতীয় কামড় বা আপেক্ষিকতা

দুলাল মূলত বালিগঞ্জ প্লেসের ছেলে।

ওর বাবা শিবপুরের যৌথ পরিবার থেকে উঠে এসে বালিগঞ্জ প্লেসে যখন জমি কিনেছিলেন, বাড়ি করেছিলেন, তখন সেখানে বিশেষ জনবসতি ছিল না। ঝোপঝাড়, জঙ্গল আর ডোবা ছিল জায়গাটা জুড়ে। ধোপারা কাপড় কাচত। পাথরের ওপর কাপড় পেটানোর শব্দ পাওয়া যেত দিনেরবেলা। পা-বাঁধা ধোপাদের গাধাগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে চরে বেড়াত সারাদিন। স্বাধীনতার কামনা জাগলে চিৎকার করত পরিত্রাহি। বিকেলবেলা বাতাসে সোডার গন্ধ মুছে গেলে আর পিঠের ওপর দেড়মণ, দু'মণ ওজনেব বোঝা চাপলে শান্ত হত ওরা। গাধাদের যা স্বভাব। ওদের নিজেদের মন বলে তো কিছু নেই।

রাত্তিরে শেয়াল ডাকত বন্ডেল গেটের দিক থেকে। ওটা রেল কোম্পানির দেওয়া লেভেল ক্রসিংয়েব নাম। লোকে বলত, বোঁদেল। বোঁদেলের ওপাবে কী আছে, অনেকেই জানত না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কত বিশাল।

দুলাল জন্মেছে উনিশশো চল্লিশ সালে। তার ন'বছর আগে বালিগঞ্জ অ্যাভেনিউয়ের নাম রাসবিহারী অ্যাভেনিউ হল। বালিগঞ্জ প্লেসের নাম কিন্তু বদলায়নি।

তবে তার চেহারা দ্রুত বদলে গেছে। একতলা-দোতলা বাড়ি উঠেছে ছাড়া ছাড়া। পুকুর বুজিয়ে খেলাব মাঠ হযেছে। ওই মাঠে ফুটবল খেলার স্মৃতি আজও মোছেনি। খেলতে খেলতে যে-কোনও বাড়িতে ঢুকে 'মাসিমা জল খাব' বললে কেউ কিছু মনে করত না। কেউ কেউ জলের সঙ্গে বাতাসা দিত। আব একটু বড় হয়ে তপনকাকা সুহাসকাকার সামনে পড়ে গেলে হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট ফেলে দিয়েছে দুলাল, তাও মনে পড়ে। এ যেন কলকাতা না, ঢাকুর ওতোরপাড়ার মতো এক শহরতলি।

দেখতে দেখতে একসময় বালিগঞ্জ প্লেস আস্তে আস্তে কলকাতায় ঢুকে যায়। কলকাতা ফুলে ফেঁপে ওঠে ইট-কাঠের বৈভবে। প্যারিস লন্ডনের মতো কলকাতার মানুষও ক্রমে অ্যাননিমিটির সুবিধে পেল। তার মানে, বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তায় নামলেই তুমি ভিড়ের একজন। তোমায় কেউ লক্ষ করছে না। এই যে মহানাগরিক একলা মানুষের ভিড়, পাশাপাশি ঠেসাঠেসি নিঃসম্পর্ক মেয়ে-পুরুষ, অপরিচিত জনস্রোত—এই আলগা সুখের স্বাদ প্যারিস আর লন্ডনে গিয়েই প্রথম অনুভব করেছিল দুলাল। ততদিনে সিঙ্গাপুবি কলা, ব্রয়লার মুরগি আর তেলাপিয়া মাছ কলকাতাবাসীর জীবনে প্রবেশ করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা একজন একজন করে পরলোকে যাওয়া শুরু করেছেন।

ততদিনে দুলাল খবরের কাগজে বিশেষ সংবাদদাতা। হোমরাচোমরাদের সঙ্গে ওর গলাগলি বন্ধুত্ব। বা, বলা যায়, বন্ধুত্ব পাতাবার তাড়নায় ও লিপ্ত।

ততদিনে ও জেনে গেছে যে জাতিধর্ম বিত্তবর্ণ লিঙ্গশৃঙ্গ নির্বিশেষে পৃথিবীর মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। আপেক্ষিকভাবে। এক, যারা গুরুত্বপূর্ণ, সংখ্যায় কম, আকর্ষণীয় ব্যক্তি, আর বাকি সব জনতা, যাদের পিপল বা 'মাসেস' বলা হয়। আপেক্ষিক এই কারণে যে, এই বিভাজন জল-স্থলের মতো ধ্রুব নয়। নিত্য পরিবর্তনশীল।

দুলাল তখন ল্যাডার অফ লাইফ নামক মই বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। আর অনুভব কবছে বালিগঞ্জ প্লেসের পিছুটান। তপনকাকা, সুহাসকাকার ছেলেরা—যারা ওর স্কুল কলেজের সহপাঠী ছিল, ফুটবলমাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—এখন কেরানি, মাস্টার কি উকিল, কি ইঞ্জিনিয়ার, মানে পিপল, কাগজে যাদের নাম বা ছবি ছাপা হয় না, তারা ওর সঙ্গ ছাড়ছে না। প্রধানত ওদের কাটাবার জন্যেই দুম করে দুলাল একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ফিয়াট গাড়ি কিনে ফেলল।

ম্যাজিকের মতো কাজ হল তাতে। বালিগঞ্জ প্লেসের যে-ক'টা বেণীদোলানো মেয়ের তখনও বিয়ে হয়নি, তারাও হাল ছেড়ে দিল এবার। দুলালদা নাগালের বাইরে চলে গেছে। সেটা উনিশশো একাশি সাল।

উঁচু বংশের মুসলমান মেয়ে নাজমার সঙ্গে তারপর ওর সংক্ষিপ্ত প্রণয় এবং বিবাহ। বালিগঞ্জের লেক ওদের মেলামেশায় খুব সাহায্য করেছে। চমৎকার নিরাপদ লুকোবার জায়গা ছিল ওটা। রাজনৈতিক নেতার ভাইঝি, আলোকপ্রাপ্ত মেয়ে নাজমা। ওর বাবা-মাও সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। এর

ফলে মই বেয়ে আরোহণ দুলালের পক্ষে হল ত্বরান্বিত। আর সেই সঙ্গে বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে ওদের বসবাস করা হয়ে উঠল দুঃসাধ্য।

জায়গার অভাব ছিল না সেখানে। ওপর তলায় ছোটভাই কুণাল, তার বউ-বাচ্চা আর বিধবা মা। নীচের তলায় ওরা দুটি প্রাণী। শাঁখা-সিঁদুর বাদ দিলে নাজমা আর সব বাঙালি মেয়ের মতোই লাবণ্যযুক্ত, শ্যামাঙ্গী, পতিব্রতা এবং একটু অ্যানিমিক। বোরখা না, শাড়ি পরেই কলেজে পড়াতে যায়। সাম্প্রদায়িক সংহত্তির প্রবল প্রবক্তা দুলাল নিজের সংসারে সাম্প্রদায়িক সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে হিমশিম খাচ্ছে।

এমন সময় 'মডার্ন এজ' ইংরেজি দৈনিকের সহ-সম্পাদক জন গ্রিফিথ বলল, "দুলু, তোমরা আমার বাড়িতে চলে এসো। হঠাৎ একলা হয়ে গিয়ে বড় বিপদে পড়ে গেছি।"

আসলে, ওর মেমবউ গেছে পালিয়ে। ওর একমাত্র মেয়ে আমেরিকায় পড়তে গিয়ে আর ফেরেনি। তার এগাবো বছর পর বউটাও ছেড়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় কলকাতার অসহনীয় জীবনকে দোষ দিয়ে গেল, যেখানে খাদ্য পানীয় ওষুধ বাতাস—সবকিছু দূষিত, যেখানে খুব শিগগিরই একদিন মহামারি বাধবে। গৃহত্যাগের আসল কারণ যে আসন্ন মহামারি না, ওই বুড়ো ট্যাঁশ, মদ্যপ ব্যাধি মন্দির, জন গ্রিফিথ তা জানত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই জানাজানি অতি গোপন এবং সুনিশ্চিত।

ডিভোর্স করার অনেক সুযোগ এর আগে পেয়েছিল আইভি। তখন করেনি। ঠিক অকেজো হয়ে যাওয়ার মুখে স্বামীকে ফেলে কেটে পড়ল। একটা আধমরা মানুষের সেবাশুশ্রূষা করে, গু-মুত ঘেঁটে ও বাকি জীবন কাটাতে চায়নি। জীবন যে দুর্ভোগ পোহাবার জন্য তৈরি হয়নি, উপভোগ করার জন্য তৈরি হয়েছে, এই বিশ্বাস নিয়েই ও ইয়োরোপে জন্মেছিল। বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধ না ঘটলে কোনও খাঁটি ইয়োরোপীয় তরুণকেই বিয়ে করতে পারত ও। ইন্ডিয়ায় এসে পচতে হত না।

"বেড়াল, সাপ আর মেমবউ কখনও পোষ মানে না।" দুলাল বলল। নাজমা বলল, "তা কেন, অমুকদিকে দেখো না, মিসেস তমুককে দেখো, তারা তো বুড়ো বরকে ছেড়ে যায়নি।"

দুলাল বলল, "ব্যতিক্রম নিয়মকে প্রমাণিত করে। একসময় তো আমি লন্ডন প্যারিস ভিয়েনায় থেকে কাজ করেছি। সেখানে দেখেছি, সহজ সান্নিধ্যে আকৃষ্ট হয়ে মেম বিয়ে করেছিল যারা, সেইসব বাঙালি বাবু মধ্য বয়সে এসে কী কলে আটকে গেছে। না পারে ওদের সমাজে এক হয়ে মিশে যেতে, না পাবে দেশে ফিরতে। ওদের ছেলেমেয়েরা বাপকে ঘেন্না করে। জন গ্রিফিথ তো মেমকে কলকাতায় টেনে আনতে পেরেছিল। বলতে পেরেছিল, এ-শহর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। ওই লোয়ার সার্কুলার রোডের পাশে আমার কবর খোঁড়া হবে। আমার ঠাকুরদার বাবা ওইখানে শুয়ে আছেন।"

এর মধ্যে গর্ব করার মতো কী আছে, বুঝতে পারে না নাজমা। একটু চুপ করে থেকে বলে, "লোকটা কিন্তু একটা ক্লাউন, যাই বলো। আইভি ঢের ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। শেষপর্যন্ত যখন পারেনি টিকতে, তখনই পালিয়েছে, তাই না?"

"তাই তো আমাদের ডাক পড়েছে", দুলাল বলে, "এই সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না। লি-রোডে অত বড় ফ্ল্যাট, সাউথ অফ পার্ক স্ট্রিট। জীবনে কোনওদিন নেড়িকুকুরমুক্ত ওই পাড়ায় থাকতে পারব ভেবেছি? সত্যিকারের অ্যাননিমিটি ওখানে পাবে।"

বালিগঞ্জ প্লেস ছাড়ার তাগিদে নাজমা রাজি হয়ে যায়। শুধু বলে, "আমি ওই বাউন্ডুলে লোকটার নার্সিং করতে পারব না কিন্তু। সে জন্যে আলাদা লোক রেখো।"

জন গ্রিফিথ বলেছিল, "ফ্ল্যাটের ভাড়া আমি দিয়ে যাব। তোমাদের কিছু দিতে হবে না। তোমরা সংসার সামলাও। আমি তোমাদের নন-পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে চাই।"

দুলাল হিসেব করে দেখল, তাতে লাভ বই লোকসান নেই। একজন বাবুর্চি ছিল, মেমসাহেবের আমলের পুরনো লোক, তার সাতশো টাকা মাইনে। ঘোর মাতাল এবং ছিঁচকে চোর। তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে নাজমা প্রকৃত গৃহিণীর মতো বুদ্ধি খাটিয়ে দু'জন স্বামী-পরিত্যক্তা পরিচারিকা এনে রাখল রাজনৈতিক অনাথাশ্রম থেকে।

একজনের নাম ছায়া—সে হিন্দু থেকে খ্রিস্টান হয়েছিল। নানা রকমের খাবার বানাতে জানে। কেক, কাবাব, কচুরি—কিছুতেই সে ঘাবড়ায় না। উপরন্তু, সে ভারী পরিচ্ছন্ন ও নম্র স্বভাবের মেয়ে। কেন যে যিশু ওর দাম্পত্যসুখে বাধ সাধলেন, কে জানে। অপরজন লায়লা, ছায়ার চেয়ে বয়েসে কিছু ছোট, তবে

ত্রিশের ওপরে। সে মুসলমান থেকে খ্রিস্টান হয়েছিল, তাকেও উদ্ধার করেননি যিশু। থাকা, খাওয়া, নিরাপত্তা আর অল্প বেতনের বিনিময়ে ওদের একটা মনের মতন আশ্রয় জুটল এই লি-রোডের ফ্ল্যাটে।

এমনও হতে পারে যে, জন গ্রিফিথের দুর্ভোগ ঘটিয়ে যিশুই ওদের উদ্ধার করলেন। পলাতকা আইভি উপলক্ষ মাত্র। আইভি কালো খ্রিস্টানের সংসার ত্যাগ না করলে ওরা কি সেখানে ঢুকতে পারত? তাঁর করুণা কীভাবে অর্শায়, কেউ জানে?

এই অবধি ব্যাপারটাকে দুলালের দিক থেকে দেখা হল। এরপর ও ডিউ এল রয়—এই বিকৃত ইংরেজি নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব আমাদের আর ওর সম্পর্কে তেমন কৌতূহল নেই।

জন গ্রিফিথের দিক থেকে এটা ছিল ওর জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট। তখন 'টার্নিং পয়েন্ট' নামেব সদ্য প্রকাশিত এই বই পড়ে ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

তাতে বলছে, একজন মানুষকে আমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টি না ভেবে টুকরো টুকরো করে দেখি। হিন্দু না মুসলমান, কালো না ফরসা, পুরুষ না নারী, মিশুক না ঝগড়াটে, গরিব না বড়লোক। এটা ঠিক না। ডাক্তাব—যে মানুষেব চিকিৎসা করে, সে-ও সম্পূর্ণ মানুষটাকে খুঁটিয়ে বুঝতে চায় না। সে দেখে, রোগটা পেটেব না বুকের। ব্যথা গলায় না হাঁটুতে। যেমনটি দেখে, তেমনটি ওষুধ দেয়। তাতে সাময়িক নিবসন হয়তো হয়, কিন্তু অসুখ সাবে না। কারণ অসুখ অন্যত্র।

তাতে বলছে, আজকেব দিনে অনেক মানুষই কোনও-না-কোনও ভাবে অসুস্থ, ক্লিষ্ট, রুগ্ণ। কেন? না, তার ভেতরকার আটঘাটবাঁধা যে সিস্টেম আছে, নানাবিধ মোচড়ে তার জোড়গুলো টিলে হয়ে যায় বা ভেঙে পড়ে। মানুষের অস্থির অবস্থান আর পরিবেশ তাকে সব সময় পীড়ন করছে সূক্ষ্মভাবে। অথচ পীড়নেব প্রকৃত সূত্র সে জানে না ঠিক কোথায়, তাই সে কেবল সাধ্যমতো পীড়ন সহ্য করে যায়। ফলে, তাব দেহ ও মনেব নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রগুলি ভারসাম্য ও প্রতিবিধিৎসা হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। তখনই চেপে ধবছে বোগ, যখন আত্মবক্ষা কববার ক্ষমতা তাব সবচেয়ে কম। প্রকৃত সূত্র জানা দরকার। জানলে সে হয়তো রুখে উঠত। কি চম্পট দিত। পীড়ন থেকে নিষ্কৃতি পাবাব সে এক আদিম উপায়। সকল প্রাণী এই প্রক্রিয়ায টিকে থাকতে শিখেছে। আধুনিক মানুষেব জটিল জীবনে সূক্ষ্ম পীড়ন বা স্ট্রেস থেকে নিষ্কৃতি পাবার অন্যতর পথ আছে, ফ্রিৎজফ্ কাপ্রার বই পড়ে গ্রিফিথ জেনেছিল। তার একটা হচ্ছে, জীবনযাপনের ধবনটাই বদলে ফেলা। তাতে ওই দুর্বল সিস্টেমের পুনর্বিন্যাস ঘটে। জীবনকে শক্ত করে ধরতে শিখলে ক্রমে ক্রমে মানুষ মৃত্যুকেও বুঝতে সমর্থ হয়। খানিকটা খটোমটো ঠেকলেও তত্ত্বটা ওর মনে ধবেছিল।

'হঠাৎ একলা হয়ে গিয়ে বিপদে পড়েছি'—দুলালকে ও বলেছিল বটে। কিন্তু আসলে লাইফ স্টাইল বদলাবার সেটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। তারপর সংসারটা আপনাআপনি নতুনভাবে গুছিয়ে উঠল। কে আত্মীয়, কে অনাত্মীয়—এ নিয়ে সংকীর্ণ অনমনীয় মনোভাব ও রাখেনি। সবটাই তো আপেক্ষিক। ওর স্ত্রী না হয়েও নাজমা কি কম আত্মীয়? আইভির জায়গায় কেমন মানিয়ে গেছে ওকে।

গ্রিফিথের মনে হয়, ওই আপেক্ষিকতার তত্ত্বই জ্ঞানরূপ নিষিদ্ধ আপেলে মানুষের দ্বিতীয় কামড়।

যাই হোক, নতুন ব্যবস্থায় একখানা বড় ঘরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে জন গ্রিফিথ। ফেলে দিয়েছে পুরনো অ্যালবামগুলো। সেখানে রেখেছে ওর টাইপরাইটার, টেলিফোন আর টিভি। আছে বইয়ের তাক, টেবিল-চেয়াব আর একটা বিছানা। ঘরের দেয়াল ঘেঁষে আরও দু'খানা গদি-মোড়া বসার জায়গা। একটা পরদার আড়াল। ঘর-সংলগ্ন নিজস্ব বাথরুম।

ব্রেকফাস্টে, ডিনারে, আড্ডার সময়ে বেরিয়ে আসে ও নিজের ইচ্ছেমতো। অন্য সময়ে নিজের ঘরে ও একা। নাজমা কোনও ব্যাপারে ওর ওপর জোর করে না আইভির মতো, কিন্তু ওর স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মন রাখে। নিজে দেখাশোনা তো করেই, ছায়া আর লায়লাকেও নিযুক্ত রাখে। মানুষটা নিঃসঙ্গ, অসুস্থ, আমরা যেন মনে রাখি। বৃহৎ স্বার্থ কখনও কখনও নির্দয়কেও উদারতার দিকে ঠেলে দেয়।

সূক্ষ্ম পীড়নের অপব উৎপত্তিস্থল ছিল ওর কর্মস্থল।

সেখানে প্রতিদিন সকাল সাড়ে দশটায় সম্পাদকের ঘরে সহকর্মীদের নিয়ে বৈঠক। পৃথিবীর সমূহ ঘটনার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ। আর, বৈঠকের শেষে সম্পাদক নিজে বলে দেয়, কে কী বিষয়ে সেদিন সম্পাদকীয় আর উপসম্পাদকীয় স্তম্ভ রচনা করবে। তাতে কোন দিকে ঝোঁক থাকা দরকার। ওর অভিমতই হল পত্রিকার পলিসি। তুমি একমত কিনা, সেটা বড় কথা নয়। যা লিখতে বলা হচ্ছে, তা

উত্তমরূপে প্রকাশ ও প্রমাণ করা তোমার কাজ। বহুদিন এই কাজ ও করেছে। নানা সম্পাদকের অধীনে থেকে এই কাজ করে ও প্রশংসা পেয়েছে। তখন একটা নীতি থাকত। এখন মেথরের কাজ—জন গ্রিফিথের মনে হয় এক-এক দিন। বিশেষ করে, অভদ্র লোকটা যখন 'মাস্ট' শব্দটা বার বার ব্যবহার করে আজকাল, তখন ওর ভেতরটা জ্বলে যায়। ঢুলুনি আসে। পেটের ডান দিকটায় ব্যথা করে। বাঁ হাতটা একটু একটু কাঁপে। সম্পাদক ওর হলদে চোখের দিকে তাকিয়ে হাসে মিটিমিটি। বুড়ো অসহায় লোককে অপমান করতে পারার সার্থকতা ফুটে ওঠে ওর মুখে, যখন লোকটা হঠাৎ বলে ওঠে, "কী ব্যাপার, জন? কাল কি খুব বেশি আহ্লাদ হয়ে গেছে?"

বারোটা থেকে খুব জোর দুটো অবধি—এই দু'ঘণ্টা টাইপরাইটার থাবড়ানো। তাবপর একটু কাটাকুটি করে মালটা ভেতরে পাঠিয়ে দেয়। জানে, সম্পাদক, অকারণ হলেও, তার ওপর খানিক কলম চালাবেই। চালাক। জন গ্রিফিথ, অ্যাননিমাস, ততক্ষণে আপিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজস্ব পানশালায় ঢুকে পড়েছে। জিন-লাইমে চুমুক দিয়ে ভাবছে, ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখার জন্য যারা ব্যাকুল, তাবা বেশি বোকা, না যারা সেই লেখা পড়ে বিশ্বাস করে, তারা? ভাবছে, আজকাল বিটার্স পাওয়া যায় না কেন? জিনের সঙ্গে ওই তিতকুটে স্বাদটা বেশ জমত।

কোনও রকম রাগ না করে, সম্পূর্ণ উদাসীনতাবশত, একদিন চাকরিটা ছেড়ে দিল জন গ্রিফিথ। বাড়ি ফেবার পথে জানবাজার থেকে কিনে নিয়ে এল একটা পুরনো গিটার।

সূক্ষ্ম পীড়নে আব তজ্জনিত স্থূলতর প্রতিপীড়নে ওর ভেতরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে ছাপ্পান্ন বছর বয়েসেই। আর কতদিন বাঁচবে ও? বড় জোর পাঁচটা বছর। কি, তাও না। ওর সঞ্চয় তেমন কিছু নেই। হিবেব ওযেডিং রিং ছিল, বেচে দিল। অবসর নেওয়ার ফলে হাতে যে টাকা পেল, তাতে পাঁচটা বছব চালিয়ে নেওয়া যাবে। অন্তিমকালের চিকিৎসা বাবদ হাজার দশেক টাকা ও আলাদা সরিয়ে রাখল। যাতে বেঘোবে প্রাণটা না যায়। তখন যেন দুলালের কাছে হাত পাততে না হয়। দুলাল ওর প্রতি কৃতজ্ঞ, দরকার পড়লে দশ হাজার কেন, বিশ হাজাব টাকাও সে প্রসন্ন মনে খরচা করবে, কবরখানায় মার্বেল ফলক বসাবে, গ্রিফিথ জানে, তবু দুঃস্থ সাংবাদিক হিসেবে ও মৃত্যুবরণ করতে রাজি না। নির্ভয়ে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়াব মধ্যে এক ধরনের শান্তি আছে, ক্যান্সার প্রসঙ্গে কাপ্রা তাঁর বইতে এমন কথা বলেছেন।

সূক্ষ্ম পীড়ন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবার পর থেকে জন গ্রিফিথ আর দিনেরবেলা জিন-লাইম খায় না। সকালবেলা একটু করে হাঁটতে যায় ময়দানে। অ্যালকোহলের মতো না হলেও ফ্রেশ এয়ারের গন্ধটাও মন্দ না। বেশ খিদে পায়। লায়লার হাতেব মুচমুচে টোস্ট আর কালো কফির স্বাদ বিকল্প হিসেবে অনেক বেশি পছন্দের।

লেখালেখি নিয়ে কোনও অপমানজনক বাধ্যবাধকতা নেই সত্যি, তবু অনুরোধে-উপরোধে মাসে একটা-দুটো স্বাক্ষবিত প্রবন্ধ লেখে ও। 'মডার্ন এজ' ছাড়া দিল্লি-বম্বের কাগজ থেকেও টেলিফোন আসে—"জন, অমুক ব্যাপারে তুমি কী ভাবছ, একটু লিখে জানাও। হাজার শব্দের মধ্যে। আমাদের লোক গিয়ে নিয়ে আসবে।" কখনও সাড়া দেয়। কখনও 'শরীর ভাল যাচ্ছে না' বলে কাটিয়ে দেয়। নিজের মনে গিটারের সঙ্গে সুরে সুরে কথা বলে। সাংবাদিক মহলে সবাই জানে, এই লোকটা অভিজ্ঞ, এর ইংরিজি অসামান্য। কেবল অনিয়মে অত্যাচারে নিজেকে নষ্ট করল। ওর শরীরের ভেতরটা রাগে পচে গেলেও মাথার ঘিলুতে শান আছে এখনও। যতদিন ওর আঙুল চলবে, ততদিন থাকবে। কিন্তু রাজনীতির হট্টগোলেব চেয়ে গিটারের তারে হাত বুলিয়ে বেশি আরাম পায় জন। এটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা ওর।

বেশ চলছিল। মানে, মূল্যবোধ বদলে বদলে পৃথিবী যেভাবে চলে কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে।

লি-রোডের বাড়িতে নিত্য পার্টির কামাই নেই। চেনা-অচেনা লোকের সমাগম, হুল্লোড়। দু'-পাত্র পেটে পড়লে গ্রিফিথের গিটার শুরু হয়ে যায়। লোকে বলে, তোমার নতুন রসিকতা শোনাও। ভেতর থেকে ছায়ার তৈরি বিচিত্র সব মুখরোচক খাবার আসে। নাজমাও যোগ দেয় হুল্লোড়ে, গান গায়। কোথাও কোনও টেনশন নেই। জীবনের ওপর চমৎকার ভেসে থাকা।

দেখতে দেখতে সাতটা বছর কেটে গেল কোথা দিয়ে। অজ্ঞাতসারে। কত বড় বড় ঘটনা কানের পাশ দিয়ে চলে গেল, ভ্রূক্ষেপই করল না গ্রিফিথ।

বলা হয়নি, ইতিমধ্যে নাজমার একটি বাচ্চা হয়েছে। মেয়ে। ক্লাউন জন ঠাট্টা করে বলেছিল, মেয়ের পেটে তো মেয়েই হবে। আপেল গাছে কি অরেঞ্জ ফলবে নাকি? ভাবটা, নিজে যেন ওর বাপের পেট থেকে

বেরিয়েছিল। হেসেছিল নাজমা, আবার ওকেই বলেছিল, "তুমি এর একটা নাম রেখে দাও।"

"লি-রোডের বাড়িতে ওর জন্ম, ওর নাম হবে লিজা।" হাসতে হাসতে বলেছিল জন, "ভাল নাম এলিজাবেথ। তুমি কি জানো নাজমা, গথিক, ইটালিয়ন আর ফ্লেমিশ—এই তিন ধারার সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছিল যে রমণীয় স্থাপত্য, তাকে এলিজাবেথান স্টাইল বলা হয়? আমাদের লিজার মধ্যে প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের অঙ্কুর আছে। ওকে ঠিক করে মানুষ করতে হবে।"

ঠিক করে মানুষ করা মানে, তিন বছর বয়েস থেকে স্কুলবাসে চড়িয়ে দেওয়া নয়। বাস তো না, ওগুলো মুরগির খাঁচা। "কেমন মুখ বার করে থাকে বাচ্চাগুলো, দেখেছ?"—বলেছিল জন। "ওকে আমি লেখাপড়া শেখাব।" সুতরাং হিন্দুমতে দুলালের মেয়ের হাতে খড়ি হল না। ইংরিজি অক্ষরে তালিম নিচ্ছে মেয়ে। দেশ-বিদেশের রূপকথা শুনছে। টাইপমেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচ বছরের মেয়ের এখন জ্ঞানের পরীক্ষা হয়।

একদিন সকালবেলা টেলিফোনে কথা বলছিল জন গ্রিফিথ। দুলাল, নাজমা চলে গেছে যে-যার কাজে। ঘরের ওপাশে খবরের কাগজ দেখে এক-একটা অক্ষর ছাপছিল লিজা। খট খট শব্দে বাধা পড়ছিল কথায়। টেলিফোন নামিয়ে গ্রিফিথ জিজ্ঞেস করল, "কী করছ ওখানে?"

"দেখো তো আঙ্কল, ঠিক লিখেছি কিনা।" লিজা বলল। কারুর সাহায্য ছাড়া দারুণ একটা কাজ করেছে, ওর মুখের ভাবখানা সেই রকম।

জন এগিয়ে এসে দেখে, টাইপমেশিনে চড়ানো ওর প্রবন্ধ লেখার ধবধবে বন্ড কাগজ। আর তার ওপর অনেক হিজিবিজির মধ্যে লাল কালিতে ছাপা ডি ই এ ডি—চার অক্ষরের এক ডার্টি ওয়র্ড: ডেড। সেদিনের কাগজে নৌকোডুবি নিয়ে ছিল হেডলাইন। ওখান থেকে মোক্ষম শব্দটা ছেঁকে তুলে এনেছে মেয়েটা।

জন দেখে, লাল অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে 'মৃত' শব্দটা। যার কথা এতদিন মনেই পড়েনি ওর। তাই তো, ওর মরে যাওয়া উচিত ছিল এতদিনে। মরোনি কেন, জন গ্রিফিথ, তুমি প্রস্তুত পর্যন্ত হওনি কেন? কী করছিলে এতদিন? আয়ু ফুরিয়ে গেলে কি বাঁচা উচিত?

কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে লিজার কচি মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকে আঙ্কল। নিজের চোখের দোষে বাচ্চাটাকেও একটু হলুদ দেখায়। কিছু একটা তাৎপর্য আছে মনে করে ভাবে, ও কি একটি সরল শিশু মাত্র? নাকি, ঈষৎ হলুদ রঙের ওই মেয়ে আসলে যিশুর বার্তা নিয়ে এসেছে জন গ্রিফিথের কাছে? মনে করিয়ে দিচ্ছে, অনাচারে অনিয়মে জর্জরিত শরীর তোমার। তার মধ্যে আর জীবনীশক্তি নেই। জীর্ণ। তুমি বেঁচে রয়েছ কীসের জোরে, জন? তোমার ওজন কত? ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কত, একবার হিসেব করে দেখেছ কি?

শূন্য। সত্যিই শূন্য। মনে মনে ভাবল গ্রিফিথ।

তাতে কী। এদিকে নিজেরই অজান্তে ওর মধ্যে যে ফোঁটায় ফোঁটায় জমে উঠেছে বাঁচার ইচ্ছে। বাঁচার ক্ষমতা। তার কী হবে? তাকে ও ফেলবে কী করে?

খবরের কাগজটাকেই ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। যিশুর বার্তা হয়ে নিয়ে এসেছে যে, সেই রমণীয় স্থাপত্যটিকে কোলে বসিয়ে নিজে চেয়ারটায় বসল ও। তারপর শিশুর নিষ্কম্প হাত দিয়ে নিজের জবাব পাঠাল ঈশ্বরের কাছে। প্রথমে লাল কালির 'একস' অক্ষর দিয়ে জাবড়ে দিল অশুভ শব্দটা। তারপর সাদা ধবধবে কাগজটাকে মেশিনের মাঝখানে এনে লিজাকে বলল, "একটুখানি ভুল হয়েছে মা।"

ওর কচি আঙুল ধরে টাইপমেশিনের চাবি ঠুকতে ঠুকতে বলল, "ওটা হবে ডি ই এ আর। ডিয়ার। ডিয়ার মানে কী?" লিজা বলল, "প্রিয়।"

প্রিয়। খুব প্রিয়। বলতে বলতে অঙ্কুরটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকে জরাজীর্ণ জন গ্রিফিথ। তারপর হঠাৎ উঠে গিয়ে দেয়াল থেকে গিটারখানা পেড়ে আনল। গান ধরল—'এ চাইল্ড সো হাই ইউ আর!'

আর ওইটুকু মেয়ে, মেয়ে তো, চুপটি করে বসে বসে দেখল সব। বুঝল সবকিছু। কোনও রকম অস্বস্তি প্রকাশ করল না। হাসল না। ডেড আর ডিয়ারের মধ্যবর্তী আপেক্ষিকতা ওকেও খানিকটা অভিভূত করে থাকবে। অভিভূত, নিশ্চিত না। কারণ জ্ঞানবৃক্ষের আপেলে ও কামড় দেয়নি এখনও।

খবরের কাগজে কখনও কখনও ভুল কথা ছাপা হয়, আজ ও জানল। তাতে তো কোনও ক্ষতি হয়নি।

১৯৯২

দেবগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কচ। বুদ্ধিমান ছেলে। পড়াশোনায় বরাবরই খুব ভাল। ক্লাসে প্রথম হয়। জীবনবিদ্যায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে স্নাতক হবার পর দেবগণ তাকে বললেন, দেখো বাপু, তোমাকে ছোটবেলা থেকে আমরা লক্ষ করছি, তুমি অসাধারণ প্রতিভাধর ছাত্র। তুমি কষ্টসহিষ্ণু, মেধাবী এবং একাগ্রচিত্ত। আমাদেব ইচ্ছে, তুমি স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে এবার মর্ত্যে যাও।

উচ্চশিক্ষা নিতে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে? কচ জিজ্ঞেস করে—সেখানে কে এমন পণ্ডিত আছেন, যিনি আমার পিতৃদেব, এখানকার অধ্যক্ষ বৃহস্পতির চেয়েও বিদ্বান?

দেবগণ তাকে বুঝিয়ে বললেন, দেখো বৎস, তোমার পিতৃদেবের প্রতি কোনওপ্রকার অসম্মান প্রকাশ করছি না আমরা। তবে একজন ব্যক্তি তো সর্ববিদ্যাধর হতে না-ও পারেন। বৃহস্পতির পাণ্ডিত্যের তুলনা হয় না। তবে একটি বিশেষ বিদ্যা—মৃতসঞ্জীবনী টেকনোলজি বা প্রকৌশল—আমাদের এই দেবলোকে এখনও পর্যন্ত কারুর অধিগত নয়। দৈত্যদেব গুরু শুক্রাচার্য এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি মৃতকে জীবন দান করতে সক্ষম। ম্রিয়মাণকে সঞ্জীবিত করতে পারেন।

তখন কচ বলল, দেবগণ তো অমর। তাঁদের মৃত্যু হয় না। মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা এখানে কী কাজে লাগবে? আমি ববং অঙ্ক পড়তে চাই—যে-অঙ্ক সমস্ত ত্রিলোক ধারণ করে রেখেছে।

তখন আবার দেবগণ তাকে বোঝাতে লাগলেন। দৈত্যেরা শুক্রাচার্যের কাছ থেকে এই বিদ্যা শিখে এখন একেবারে বেপরোয়া। বার বার দেবলোক আক্রমণ করে আমাদের পর্যুদস্ত করছে। মার খাওয়া অমরদের কী কষ্ট তুমি জানো না। শোনো বাবা। শুক্রাচার্য পণ্ডিত বৃহস্পতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর তিনি একমাত্র বৃহস্পতির পুত্রকে এই মহামূল্য বিদ্যা দান কবতে সম্মত হয়েছেন। তিনি তো অসুরদের বেতনভুক কর্মচারী। তাঁব আশ্রম, যা একটি ছোটখাটো বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ, তার মধ্যে পাঠগৃহ, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস, প্রমোদভবন, সবকিছুই আছে, তাব সমস্ত খরচ দৈত্যবাজকোষ থেকে বহন করা হয়। মেধাবী অসুরসন্তানগণ সেই আশ্রমে বিনামূল্যে থেকে পঠনপাঠন করতে পারে। নীতিগতভাবে, কচ, তোমার প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। অনেক কষ্টে এবং প্রভূত পরিমাণ অর্থ ও উৎকৃষ্ট সোমরস উপহার দিয়ে আমরা আচার্যকে রাজি করিয়েছি এই প্রস্তাবে। তুমি সেই আশ্রমে যাবে, চুপচাপ নিজের কাজটি হাসিল করে আবার স্বর্গে ফিরে আসবে। আশ্রমমধ্যে কোনওপ্রকাব মোহে বিভ্রান্ত হয়ে কর্তব্যচ্যুত হবে না। মনে রাখবে, তুমি আমাদের দেবলোকের বৃত্তি নিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষালাভ করতে যাচ্ছ। সেই শিক্ষার ফল স্বর্গলোকের অধিবাসীর প্রাপ্য।

দেবতারা কচকে এ-কথা বলেও সাবধান করে দিলেন যে, মর্ত্যবাসী দৈত্য ও মনুষ্যদের কন্যারা দেখতে খুব সুশ্রী নয়। দেবকন্যাদের তুলনায় তারা কুৎসিতই। তবে শুক্রাচার্যের নিজের একাধিক অনূঢ়া কন্যা আছে। তুমি যেন তাদের কারুর খপ্পরে পোড়ো না।

আমরা জানি, এইসব উপদেশ শিরোধার্য কবে কচ শুক্রাচার্যের আশ্রমে গিয়েছিল। মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাও সে যথাসময়ে আয়ত্ত করেছে। কিন্তু তার ছাত্রজীবন সেখানে খুব একটা নিরাপদ ছিল না। অসুরগণ তাকে নানাভাবে নাস্তানাবুদ করেছে। আজকের ভাষায় যাকে বলে র‍্যাগিং। প্রত্যেক বারই তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে শুক্রাচার্যের এক কন্যা—যার নাম দেবযানী। বিদ্যালাভ করে সে যখন গুরুর অনুমতিক্রমে স্বগৃহগমনে উদ্যুক্ত হচ্ছে, তখন দেবযানী তার পাণিপ্রার্থনা করে বসল। বলল, আমাকে বিয়ে করে নিয়ে যাও। কচ দোনামনা করছে। এ কী করে সম্ভব? আমি যে তোমাকে আপন বোনের মতো স্নেহের চক্ষে দেখেছি। তুমি আমার ঢের উপকার করেছ। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু তার প্রতিদানে বিয়ে করতে তুমি আমায় বাধ্য করতে পারো না। এ ব্ল্যাকমেইল। ফিরে গিয়ে আমায় স্বর্গরাজ্যের অতি দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হতে হবে। আমি একা ফিরে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এদিকে দেবযানীর খুব ইচ্ছে, কচকে বিয়ে করে স্বর্গরাজ্যে বসবাস করতে যায়। সেখানে কত সুখ। শুক্রাচার্যের আশ্রমে ফল-মূল খেয়ে বড় হয়েছে সে। বাবা মাস্টারমশাই, নিজের পড়াশোনা আর ছাত্রদের শিক্ষাদান নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। অবসর সময় সোমরস পান করে বুঁদ হয়ে থাকেন। মেয়েদের সাধ-আহ্লাদ মেটাবার দিকে তাঁর কোনও লক্ষই নেই। দেবযানী চেয়েছিল এই একঘেয়ে অনাড়ম্বর

পরিবেশ থেকে মুক্তি। আর চেয়েছিল, কচের মতো সুপুরুষ, বিদ্বান, সুউপায়ী একজন বর। যার সংসারে কর্ত্রী হয়ে সে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে পারবে। সে নাছোড়বান্দি।

কচ শেষ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্তে অটল রইল। দেবযানী তখন রেগেমেগে তাকে অভিশাপ দিল এই বলে যে, তার সমস্ত লব্ধ বিদ্যা বিফল হবে। কচ বলল, তা হোক, আমি যাদের এই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দান করব, তারা এর প্রয়োগ করে সফল হলেই আমি সন্তুষ্ট। ওদের বিয়ে হল না। আমরা জানি, পরে যযাতি নামের এক প্রৌঢ় রাজাকে দেবযানী বিয়ে করেছিল। তাতেও সে সুখী হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে কচ দেবযানীর উপাখ্যান অবশ্য অন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেখানে দেবযানীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত ও দুর্বলতা আমরা লক্ষ্য করি। সেখানে কচ একজন প্রবঞ্চক প্রেমিক, যদিও আচরণে সে অতীব ভদ্র ও বিনয়ী।

আমাদের আসল গল্পের এটা ভূমিকা মাত্র। আমাদের গল্পের নায়ক কচ নয়। তার নাম কচি। ওটা ওর বাবা-মায়ের দেওয়া ডাকনাম। ভাল নাম, তন্ময়। এ-কাহিনী দ্বাপর যুগের নয়। এই কলিযুগের।

কচিও মেধাবী স্থিতধী ছাত্র ছিল। প্রথম বিভাগে আশি শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে। তারপর, আর সব মেধাবী ও স্থিতধী ছাত্রদের মতো সে জয়েন্ট এবং আই. আই. টি. পরীক্ষা দেয়। দুটিতেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কানপুরে পড়তে যায়।

কচির বাবাও অধ্যাপক। শহরতলির এক কলেজে তখন ইতিহাস পড়ান। সেই সময়ে অধ্যাপকদের এত হাজার হাজার টাকা উপার্জন ছিল না। কষ্টেসৃষ্টে তিনি কচিকে হস্টেলে রেখে পড়িয়েছেন। চার-চার বছর তার সমস্ত খরচ চালিয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁর কন্যা তনুকাকে সুপাত্রে সম্প্রদান করেছেন। কচি যখন তার স্বদেশি অধ্যয়নপর্ব শেষ করে বি. টেক উপাধি লাভ করে.উপার্জনের জন্য প্রস্তুত, তিনি ভাবলেন, এবার সুদিন আসবে। তাঁর অবসর গ্রহণকাল আসন্ন, তাতেও তিনি উদ্বেগ বোধ করলেন না। এখন থেকে কচি বাপ-মায়ের দায়িত্ব নেবে। সামান্য সঞ্চয়ের অর্থ দিয়ে তিনি শহরতলির এক প্রান্তে একটি ছোট বাড়ি করলেন। যাকে মাথা-গোঁজার জায়গা বলা যেতে পারে। সেই বাড়িতে কচির জন্য আলাদা একটি ঘর হল। তার সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম।

এমন সময় কচি একদিন বাবাকে প্রণাম করে বলল, বাবা, আমি বি. টেক ছাড়া জি. আর. ই আর টোয়েফেল দুটো পরীক্ষায় পাশ করেছি।

জি. আর. ই আর টোয়েফেল বলতে কী বোঝায়, অধ্যাপক সুবিনয় তরফদার নিশ্চয় জানতেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। বললেন, বাঃ, খুব ভাল খবর। এতে কি চাকরি পেতে সুবিধে হবে?

কচি বলল, আমি আমেরিকা যাব। সেখানে পি. এইচ. ডি করব। এ দুটো তার প্রবেশিকা পরীক্ষা।

সুবিনয় এতদিন ভাবছিলেন, বি. টেক পাশ করে আর সব ছেলেরা টকাটক চাকরি পেয়ে যায়, কচি কেন পাচ্ছে না? আসলে ও চাকরির চেষ্টাই করেনি। তার বদলে এইসব পরীক্ষার জন্যে বাড়িতে বসে তৈরি হচ্ছিল। আর দুটো টিউশন ধরেছিল। সেই আয় থেকে পরীক্ষার ফি দিয়েছে। তখন মাঝে মাঝে মাকে হাতখরচ বাবদ দু'-তিনশো করে টাকাও দিয়েছে। পুত্রের উপার্জনের অর্থ হাতে পেলে কোন মায়ের না গর্ববোধ হয়। সে যত সামান্যই হোক না। কচির মা জানতেন, এই দু'-তিনশো টাকা একদিন দু'-তিন হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন আর সংসারে অভাব থাকবে না। কচি তৈরি হয়ে উঠেছে। লম্বায় সে ছাড়িয়ে গেছে বাপকে। স্নান করে যখন সে বাথরুম থেকে বেরোয়, তখন তার মসৃণ কামানো গাল, তার নাকের নীচে ছোট করে ছাঁটা গোঁফ, তার জামার ভুরভুরে কোলনের গন্ধ তাঁকে মুগ্ধ করে। দামি শার্ট-প্যান্ট পরা ছেলের পাশে পাঞ্জাবি-পাজামা পরা, একটু কুঁজো ও বুড়োটে বাপকে বেশ নিষ্প্রভ দেখায়। কচির মা, সান্ত্বনা, এক-এক সময় অজান্তে অবচেতনায়, সুবিনয়কে খারিজ করে কচির প্রেমে পড়ে যান। লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলের রুমাল ইস্ত্রি করে রাখেন। মোজা কেচে দেন।

সুবিনয় বললেন, আমেরিকা? সে যে অনেক দূর। সে যে অনেক খরচের ব্যাপার।

তখন কচি বাবার সাধারণ জ্ঞানের অভাব দেখে হেসেই ফেলেছিল।

কত দূর? কুড়ি ঘণ্টার পথ। কলকাতা থেকে ট্রেনে বম্বে যেতে ছত্রিশ ঘণ্টা সময় লাগে। তার চেয়ে কম। আর খরচ? সে তুমি ভেবো না বাবা। আমি তিনটে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভরতির চিঠি পেয়েছি। যেখান থেকে সবচেয়ে বেশি বৃত্তি পাব, সেখানে যাব। ওদের টাকায় পড়াশোনা করব। তোমাকে টাকা

পাঠাব। তারপর একবার পি. এইচ. ডি. হয়ে গেলে আর আমায় কে পায়।

সান্ত্বনা—না, নামটা ভুল বলেছিলাম, কচির মায়ের নাম সর্বজয়া, এইসব কথা শুনে সর্বজয়া স্বামীকে বললেন, কী গো, অমন গুম হয়ে বসে রয়েছ কেন? বৃত্তি পেয়ে ছেলে আমেরিকা যাচ্ছে, ওকে ঠিকমতো জামাকাপড় গড়িয়ে দাও। আনন্দ করো।

সুবিনয় বললেন, যে-কচি আমেরিকায় যাবে, সে-কচি আমেরিকা থেকে ফিরবে না। যে ফিরবে, যদি সত্যি ফেরে, সে হবে অন্য মানুষ। কানপুরে গিয়েই ওর কেমন পরিবর্তন হয়েছে দেখতে পাও না?

তা বলে আমরা কি ওকে চিরকাল আগলে রাখব? ছেলেকে আগলে রাখা যায়? ও মানুষ হবে না?

মানুষ হবার জন্যে এরপর থেকে যা-যা করা দরকার, সব কচি নিজেই করেছে। বার বার কলকাতা যেতে হয়েছে ওকে। এই শহরতলির বাড়ির ডাকবাকসে কত অজানা দেশ থেকে নীল রঙের চিঠি এসেছে তন্ময় তরফদারের নামে। সবক'টার উত্তর ইংরেজি ভাষায় কচি একাই দিয়েছে। বাবার কাছ থেকে কোনও সাহায্য নেয়নি।

কেবল বিদেশ যাত্রার মাস দুয়েক আগে ও বাবাকে বলল, তুমি শুধু এক পিঠের প্লেনভাড়াটা দাও। বাইশ হাজার টাকা। আমি গিয়েই ওটা শোধ করে দেব। এই প্রথম ও বাবার কাছ থেকে ধার চাইল। সুবিনয় কলেজ থেকে ধারধোর করে টাকাটা জোগাড় করে দিলেন। সেই আমলে বাইশ হাজার টাকা মানে তাঁর দশ মাসের মাইনে। সেই আমলে ডলারের দাম পনেরো টাকা। পনেরোশো ডলার মাত্র পাঠালেই বাইশ হাজার টাকা ঋণ শোধ হয়ে যাবে। সুবিনয়ের চাকরি এখনও চার বছর আছে। ততদিনে কচির উচ্চশিক্ষা অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এই কথা ভেবে খানিকটা আশ্বস্ত হলেন সুবিনয়।

মনে আছে, সেটা অক্টোবর মাস ছিল। পুজোর কিছু আগেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনে কচির সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন। দমদম এয়ারপোর্টে ছেলেকে সি-অফ করে এলেন। সর্বজয়া দুঃখ করে বললেন, আর কিছুদিন পরে গেলে পুজোটা কাটিয়ে যেতে পারতিস। সুবিনয় বোকার মতো বলে ফেলেছিলেন, একেবারে অন্য দেশ, অন্য কালচার, নিজেকে সামলে রেখে চলতে পারবে তো?

যাবার আগে কচি বলে গিয়েছিল, তুমি কিচ্ছু জানো না বাবা। তারপর সংশোধন করে বলেছিল, তুমি কিছু ভেবো না, আমি ঠিক আছি। আমি ঠিক থাকব।

শুক্রাচার্যের আশ্রমে আসার সময়ে কচও নিশ্চয় তার বাবা দেবগুরু বৃহস্পতিকে এই রকম আশ্বাস দিয়েছিল। মহাভারতের গল্পে কচের আশ্রমজীবনের বর্ণনা আছে। আমাদের কাহিনীর পরবর্তী অংশ কচির প্রবাসজীবন অবলম্বন করে তৈরি করা। কারণ, সে তো আর ফেরেনি। কিছু চিঠিপত্র তার দলিল। এইসব চিঠিপত্রও আমরা হাতে পেতাম না, যদি সুবিনয়ের শহরতলির বাড়িতে একটা টেলিফোন থাকত। আজকাল কচ তার কমে-আসা নাতিদীর্ঘ চিঠিগুলিতে প্রায়ই নালিশ জানায়, এত ব্যস্ত থাকি, চিঠি লেখার সময় করে উঠতে পারি না। তোমরা একটা টেলিফোন নিচ্ছ না কেন?

সর্বজয়াও বাড়িতে বসে নালিশ করেন, একটা টেলিফোন নাও না গো। তা হলে মাঝে মাঝে ছেলেটার গলা শুনতে পাই। টেলিফোন পাওয়া যে কী কঠিন ব্যাপার, তিনি জানেন না।

অ্যারিজোনা থেকে নিউ জার্সি। নিউ জার্সি থেকে পেনসিলভেনিয়া। সেখান থেকে ওক্‌লাহোমা। সর্বজয়া আমেরিকান উচ্চারণ ভাল বলতে পারেন না। ইলিনয়কে বলেন ইলিনয়েস। কানেটিকাট্‌কে বলেন কানেক্‌টিকাট। ছেলেটা কোথায় কোথায় না ঘুরছে। চিঠি পড়ে রোমাঞ্চিত হন সর্বজয়া।

সুবিনয় বলেন, এতদিন হয়ে গেল। তুমি কিচ্ছু শিখলে না। একটুও বদলালে না।

শ্রীমান ইন্দ্রনাথ মজুমদারের উপরোধে এই গল্পটি লিখতে বসে কোনও নিহিত সত্যের উদ্‌ঘাটন করার বাসনা আমার নেই। আমি ভাবছি, বিদিত সত্য নিয়েও তো গল্প হয়। শিবরাম চক্রবর্তী মশাইয়ের একটি রচনা আছে, তার নাম 'মেয়েরা হারাবেই'। তার দু' রকম অর্থ। আমার গল্পের নাম 'ছেলেরা হারাবেই'। সেদিক থেকে আমার এই অকিঞ্চিৎকর রচনার নামেও কোনও মৌলিকতা নেই। তবু, এবার কথকের ভূমিকা ত্যাগ করে উত্তমপুরুষে চরিত্রের ভূমিকায় নেমে দেখি না, কী হয়।

সুবিনয়কে আমি চিনি। মাঝে মাঝে তার বাড়ি গেছি। সে-ও কলকাতায় এলে একবার আমার আস্তানায় টুঁ মারত। আজকাল আর পারে না। বছর খানেক আগে ওর বাঁ দিকের অঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে।

এ রকম কিছু একটা ঘটবে, আমি আশঙ্কা করেছিলাম। কারণ, একদিন ও আমাকে বলে, কাল

সারারাত এক ফোঁটা ঘুমোতে পারিনি। আজকাল প্রায়ই এ রকম হচ্ছে।

কেন? কী হল আবার?

কাল শনিবার ছিল তো।

শিবরাত্রি ছিল নাকি? আমি জানতে চাই।—নাকি, রাত জেগে টিভি-তে সিনেমা দেখেছ?

ও বলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করেছি। এখানকার রাত মানে তো ওখানকার দিন। প্রত্যেক শনিবার কচিরা শিকাগো থেকে নিউ ইয়র্কে আসে। আবার রবিবার রাত্রে শিকাগোয় ফিরে যায়। এত র‍্যাশ ড্রাইভ করে না। আমার কেবল ভয় করে, রাস্তায় কোনও দুর্ঘটনায় না পড়ে যায়।

আমার ইচ্ছে হল, জিজ্ঞেস করি, দশ হাজার মাইল দূর থেকে কি তুমি ওর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে? যদি না পারো, তবে উদ্বিগ্ন হয়ে কী লাভ? কচি তো কচিখোকা নয়। তার বদলে জিজ্ঞেস করলাম, কচিরা মানে?

মানে কচি আর আইরিন। তোমাকে বলিনি বুঝি? দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওদের ছবি এনে দেখাই।

দেখলাম ছবি। তিমিমাছের মতো একটা সবুজ রঙের মোটরগাড়ি। তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। কচি আর আইরিন। কচির মাথায় একটা হলদে রঙের টুপি। তা সত্ত্বেও সোনালি চুলের দাঁত বার-করা মেয়েটা ওর চেয়ে অন্তত এক ফুট লম্বা।

আমি বলি, বিয়ে হয়ে গেছে?

না। এখন ওরা এনগেজড। কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস করে বনিবনা হচ্ছে কিনা, বুঝতে পারবে। তারপর বিয়ে। ও-দেশে এই রকমই নিয়ম। তুমি কিচ্ছু জানো না।

আঘাত ঢাকতে ও আমাকেই আঘাত করল। তাতেই বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, ওদের বনিবনা হচ্ছে কিনা, তা নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা হয় না? মেয়েটাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, সাতঘাটের জল খাওয়া। ওর এড্‌স আছে কিনা নিশ্চয় জেনে নিয়েছে কচি।

সুবিনয় এবার অপ্রতিভ হয়ে বলল, খুব দুশ্চিন্তা হয়। আমি লক্ষ করলাম, ওর চোখের নীচে থলি, পায়ের পাতা পাঁউরুটির মতো গোল।

ও তারপর একটা চিঠি দেখাল আমায়। চিঠিটা খুবই সংক্ষিপ্ত। "প্রিয় মা ও বাবা, আশা করি তোমরা ভাল আছ। আমার শরীর ভাল আছে, তবে কাজের চাপ খুব বেশি। পড়াবার চাকরি করে যা রোজগার করি, নিজের থাকা-খাওয়া, ইউনিভার্সিটি যাতায়াতে তার সবটাই প্রায় খরচা হয়ে যায়। একটা পুরনো গাড়ি কিনেছি, তার জন্য ধার শোধ করতে হচ্ছে। তাই দু'মাস টাকা পাঠাতে পারিনি।"

তারপর আরও কিছু শপ-টক। শেষকালে কচি লিখছে, "এ-মাস থেকে আইরিন আমার অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এল। খরচটা দু'জনে শেয়ার করব। আগস্ট মাসে তোমাকে একশো ডলার পাঠাতে পারব। এখন তো ডলার ওখানে পঁয়ত্রিশ টাকা।"

সেয়ানা ছেলে। আমি বলেছিলাম, দেখো ভাই, ছেলেপুলে হল গাছের ফল। গাছ থেকে একসময় পড়ে যায়। যেতে দাও। তুমি ওইসব চিঠিপত্র আর রঙিন ছবির গুচ্ছ পুষে রেখে যত চিন্তা করবে, তত মুশকিলে পড়বে। কোনদিন একটা বড় অসুখ বাধিয়ে না ফেলো, এই আমার চিন্তা। এখন অবসর নিয়েছ, নিজের মনে থাকার চেষ্টা করো।

এর কিছুকাল পরেই সুবিনয় একদিন টিভি-তে খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায়। পনেরো দিন হাসপাতালে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরে আসে, তখন পাড়ার লোক, আত্মীয়স্বজন, মেয়ে-জামাই দেখল, ওর শরীরের বাঁ দিকটা অসাড়।

ওর অসুখের খবর পেয়ে আমার একবার দেখতে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু স্বীকার করছি, আমি যাইনি। এইভাবে এক বছর কেটে গেছে।

একদিন সকালে দরোজায় বেল পড়ল। দরোজা খুলে দেখি, অশৌচের পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক। আমার হাতে একখানা 'ওঁ গঙ্গা' মার্কা খাম ধরিয়ে দিয়ে বলল, আমি সুবিনয়বাবুর জামাই।

ভেতরের কার্ডখানা পড়ে আমি হতভম্ব।

জিজ্ঞেস করলাম, কচি এসেছে?

ও বলল, না। আমি ফোন করেছিলাম। বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে খুব কাঁদল টেলিফোনেই। তারপর

বলল, আমি গিয়ে তো বাবাকে দেখতে পাব না। যা করার তুমি করো ভাই। তো, আমিই মুখাগ্নি করেছি। আমিই শ্রাদ্ধ করব।

একবার আসতে পারল না? আমি বিরক্ত হয়ে বলি, মায়ের কথা ভেবেও তো আসতে পারত।

জামাই বলল, আমার আপিসে ফ্যাক্স করে মাকে চিঠি লিখেছে। আমাকে একশো ডলার পাঠিয়েছে। জানিয়েছে যে, আইরিনকে বিয়ে করার ফলে ওর মার্কিন নাগরিক হয়ে যাওয়ার পথ এখন পরিষ্কার। আর কোনও বাধা নেই। সেই মর্মে দরখাস্তও করেছে সরকারি দপ্তরে। এখন দেশ ছাড়া বিপজ্জনক। যে-কোনও সময়ে ওর ডাক আসতে পারে সরকারি দপ্তর থেকে। নাগরিকত্ব পেয়ে গেলেই ওরা দু'জন এখানে আসবে মায়ের আশীর্বাদ নিতে।

আমি নিজে কখনও আমেরিকা যাইনি। তবে, ওর কথা শুনে সবটাই বুঝলাম। মার্কিন নাগরিক হওয়া কচির এখন খুব দরকার। ভারতীয় নাগরিকের কোনও মূল্য নেই ও-দেশে। যে-কোনও সময়ে ওরা তাড়িয়ে দিতে পারে। আমি ভাবি, সেই সময়ের কথা, আজ থেকে তিনশো বছর আগে, যখন মার্কিন দেশের ইউরোপীয় অধিবাসীরা আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের ধরে নিয়ে যেত, ক্রীতদাস করে রাখত। আজ সারা পৃথিবীব মানুষ ওই ধনী মুলুকে ক্রীতদাস হবার জন্যে হামলে পড়ছে। কচি তাদের একজন। সে আর স্বদেশে ফিরবে না।

শ্রাদ্ধের দিন আমি যাইনি। তারপরে এক রবিবার শেয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে, তারপর নির্দিষ্ট স্টেশনে নেমে রিকশা ধরে ওদের বাড়িতে গেলাম। ভাবলাম, সর্বজয়ার অবস্থাটা একবার দেখে আসি।

সে-দৃশ্য ফলাও করে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সর্বজয়া শুয়ে ছিল, আমায় দেখে উঠে বসল। করুণ বিধবাব বেশ। পরনে কালো পাড় শাড়ি। ঘরের দেয়ালে সুবিনয়েব মালা-দেওয়া বড়সড় ফোটোগ্রাফ। তার পাশে কচি আর আইরিনেব যুগল রঙিন ছবি। জানলার পরদা ময়লা। বিছানার চাদর ময়লা। একটি ঝি এসে আমায় এক কাপ চা ধরিয়ে দিল। জানলাম, শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাওয়ার পর তনুকা শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।

খুব বেশি কথা বলল না সর্বজয়া। আমি ওর প্রয়াত স্বামীর বন্ধুস্থানীয় একজন নগণ্য মানুষ, আমার সঙ্গে আর কী কথা বলবে। ওর কষ্ট অত্যন্ত ব্যক্তিগত।

বালিশের তলা থেকে এক গোছা চিঠি বার করে আমাকে পড়তে দিল সর্বজয়া। ওর সর্বজয়া নাম এখন ওকে ব্যঙ্গ করছে বলে মনে হল আমার।

সেইসব চিঠিতে কচির নিজস্ব হস্তলিপি। তার মা পাঁচ বছর ধরে জমিয়ে রেখেছে। খুব বেশি না, খান পনেরো হবে। প্রথম দিককার চিঠিগুলো দীর্ঘ। দু'পাতা, তিন পাতা, চার পাতার। তাতে ওর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম, কঠোর পরিশ্রম, অর্থাভাব আর বাড়ির জন্য মন কেমনের কথা। ক্রমশ চিঠিগুলি আকারে ছোট হয়ে এসেছে। এরোগ্রামে আট-দশ লাইন। চিঠির ভাষা দায়সারা। মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাবার বার্তা আছে। শেষ চিঠিটা ওই ফ্যাক্স—বাবাব মৃত্যুর পর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে লেখা।

সর্বজয়া জিজ্ঞেস করল, কী বুঝলেন?

আমি বললাম, কী শুনতে চান?

কচি কি ফিরে আসবে?

আমি বললাম, কচ ফিরে গিয়েছিল স্বর্গরাজ্যে। কচি স্বদেশে ফিরবে বলে মনে হয় না। আপনি বরং ওর কাছে গিয়ে থাকুন। তন্ময় তরফদারের মাকে ওরা ভিসা দেবে।

আর সব সর্বজয়ার মতো এই সর্বজয়াও বলল, এ-ভিটে আমি ছাড়ব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও একদিন ফিরে আসবেই। ওই ঢ্যাঙা কুচ্ছিত বউ ওর রক্ত চুষে খাচ্ছে। এই বিয়ে ভেঙে যাবেই। আমি পাশের ঘরখানা ওর জন্যে সাজিয়ে রেখেছি। ফিরে এলে আমি এই ঘরে ওর নতুন বউ আনব। বাঙালি মেয়ে, যে ওকে বুঝবে, ওর যত্ন করবে। যতদিন কচি না ফিরছে, আমি বেঁচে থাকব। যত কষ্টই হোক, মরব না।

১৯৯৬

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার বাঁ দিকে উঁচু পিঠওলা চেয়ারে বসে আছে একজন মোটামতো লোক। তার গা সাদা পোশাকে ঢাকা। তার মাথা জুড়ে জড়ানো কুঁচি-দেওয়া কান-ঢাকা টুপি। খুব দূরে নয়। ওর ঘুম-লাগা লালচে চোখদুটো ক্লান্ত আর নিস্পৃহ—এবং দুটো মোটা মোটা ঠোঁট, তেলতেলে কামানো গাল—এইটুকুই দেখা যাচ্ছিল। টুপিটা বোধহয় টাক ঢাকবার জন্যে পরেছে। এই রকম মনে হচ্ছিল আমার, না হলে ওই ভ্যাপসা গরমে দুপুরবেলা কেউ সং সেজে বসে থাকে ওভাবে?

চারদিকে খুব কথাবার্তা হচ্ছিল। অনেক লোকের ভিড় ঘরটার মধ্যে। কেউ বেঞ্চিতে বসা, কেউ দাঁড়ানো। কেউ ঘন ঘন পায়চারি করছে। বাইরে বেরোবার একটাই দরোজা, সেটা ভেজানো। সেই ভেজানো দরজা ঠেলে কেউ কেউ কেবলই ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। আর তাতেই ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর করে শব্দ উঠে আসছে বাতাস চিরে। আর কিছুতে নয়, কেবল ওই বিশ্রী শব্দটা উঠলেই স্থির নিশ্চল ঘাড়খানা বিরক্তিতে একটু হেলিয়ে দিচ্ছে সং সেজে বসে থাকা লোকটা।

এই বকম দৃশ্য চোখের সামনে দেখলে সাধারণত আমি কৌতুক বোধ করি। স্বাভাবিকতার ব্যত্যয় বা অসংগতি দেখলে কার না হাসি পায়। আমি কিন্তু তখন কৌতুক বোধ কবছিলাম না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এই রঙ্গভঙ্গ থেকে চমকপ্রদ আর খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও একটা ঘটনা ঘটবে। খুব শিগগিরই ঘটবে। ওই সং সেজে বসে থাকা ক্লান্ত আর নিস্পৃহ লোকটা সেই ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে। বস্তুত, আমাব একটু ভয় ভয়ই করছিল।

ঠিক তাই ঘটল।

লোকটার হাতের কাছে যে একটা কাঠের হাতুড়ি আছে, তা এতক্ষণ লক্ষ কবিনি। সেই হাতুড়ি দিয়ে টেবিলের ওপব দু'বার ঠক ঠক শব্দ কবে লোকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, অর্ডার অর্ডার। অমনি ঘরের মধ্যেকাব সমস্ত কলবব, কোলাহল থেমে গেল ম্যাজিকের মতো। যে যেমন অবস্থায় ছিল, হয়ে গেল স্থিব। কেবল মুখগুলো লোকটার দিকে ফেরানো।

অনেকক্ষণ ধবে নিরুত্তেজ গলায় বিড়বিড় করে কী সব বলতে লাগল লোকটা। বাংলায় বলছে, না ইংরেজিতে বলছে, আমি বুঝতে পারি না। কেউই বুঝতে পারে না। কেউই মন দিয়ে শুনছে না। পুরুতঠাকুব মন্ত্র পড়ার সময় যেমনটা হয় আর কী। কখন শেষ হবে তার জন্য অপেক্ষা করে লোকে। শেষটা শোনে।

শেষটা সবাই শুনল: সাহিত্যসভায় যেমন বলা হয়, আমাদের অনুষ্ঠান এইখানেই শেষ হচ্ছে। বাইরে কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা আছে—আপনারা গ্রহণ করলে আমরা বাধিত হব। সেই রকম শান্ত ধীর লয়ে লোকটা বলল, "হি উইল বি হ্যাংড টিল ডেথ।" অর্থাৎ যে আসামি, তার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল ওই ক'টি কথায়। দণ্ডদাতা মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে পেছন ফিরে চলে গেল অন্য কোনও ঘরে। তখন লক্ষ করলাম, সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু আমার ফাঁসি হবে কেন? এই জায়গায় এসে স্বপ্নটা ভেঙে গেল।

এক অকিঞ্চিৎকর মানবজীবন আমার। ঠোক্কর খেতে খেতে প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি। দেহের ভেতর ক্ষয়জনিত আধিব্যাধি এসে বাসা বাঁধছে। তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করি, শত্রু মনে করি না। জানি, যত চেষ্টাই করি এদের সরিয়ে রাখতে, আমি পারব না। একদিন দল বেঁধে এসে এরা আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে দেবে। আমি চাই তাই হোক। স্বাভাবিকভাবে আমার এই অকিঞ্চিৎকর মানবজীবনের নিষ্পত্তি হোক। যেমন স্বাভাবিকভাবে একসময় মায়ের জরায়ু থেকে নির্গত হয়েছিলাম, তেমনই স্বাভাবিকভাবে তেল ফুরিয়ে যাওয়া লণ্ঠনের মতো একদিন নিবে যাব। নিবে যাওয়ার চার ঘণ্টার মধ্যে আমি চাই এই মরদেহের অন্ত্যেষ্টি হয়ে যাক। তিনদিন বরফ চাপা দিয়ে রেখে মিছিল সমারোহে শ্মশানযাত্রা আমার অভীষ্ট নয়। জীবনকে ভালবেসেও আমি তাই মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন বলা যায়। তবে, ফাঁসিকাঠে ঝুলতে আমি চাই না। ওটা অত্যন্ত অপমানজনক।

খবরের কাগজে রোজই একটা-না-একটা মৃত্যুসংবাদ থাকে। আজকাল বেশিই থাকে। জীবৎকালে

মানুষ যে সাম্যপন্থী নয়, বৈষম্যপরায়ণ, তা তো আমাদের জানতে বাকি নেই। পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে যে যাই বলুক না কেন। লক্ষ করেছি, মৃত্যুর পরেও মৃত্যুসংবাদেই এই বৈষম্য সবচেয়ে বেশি প্রকট। আগে সকলেই পরলোকগমন করত, এখন সে রীতি উঠে গেছে। মানুষ চাঁদে পা দেবার পর থেকেই পরলোকের ভিত গেছে নড়ে।

এখন প্রবীণ জননেতার জীবনাবসান হয়। সাতাশি বছর বয়েসে প্রাক্তন সমাজসেবী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। কোনও দুর্ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি জড়িত হয়ে পড়লে তাদের প্রাণহানি ঘটে। বিষটিস খাওয়ার পর অথবা আকস্মিকভাবে পথেঘাটে অসুস্থ হয়ে সাধারণ মানুষ যখন হাসপাতালে যায়, তখন তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এ-ব্যাপার আমি লক্ষ করেছি। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হলে মৃত্যু হবে। শেষ নিশ্বাস বা জীবনাবসান হবে না। জঙ্গিরা আক্রমণ করলে নিহত।

অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা আজকাল কথায় কথায় কীটনাশক, বাথরুমের অ্যাসিড খেয়ে ফেলছে। পরীক্ষায় ফেল করলে তাদের কিছু বলা যাবে না। পিকনিকের নাম করে প্রণয়ীর সঙ্গে হোটেলে রাত্রিবাস করে এলেও প্রশ্ন করা যাবে না কেন গিয়েছিলে? আর কে ছিল তোমার সঙ্গে? বললেই পরের দিন ভোরবেলা দেখা যাবে তার দেহ সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে। এরা যতটা না প্রেমিক বা প্রেমিকা, তার চেয়ে বেশি প্রতিবাদী। এগুলি আত্মহত্যার ঘটনা হিসেবে প্রকাশিত হয়। খ্যাতিমান ব্যক্তি অনুরূপ কাণ্ড করলে বলা হবে তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছেন। যেন মহাভারতের ভীষ্ম।

এ-সবই সহনীয়। তবু, হোক স্বপ্নে, তা হলেও আমার ওপর ফাঁসির হুকুম হয়ে যাওয়াটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারিনি। আমি শুনেছি শহিদ ক্ষুদিরাম, সেই ১৯০৮ সালে, তখন তাঁর বয়েস মাত্র উনিশ বছর, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের ফাঁসির হুকুম শুনতে শুনতে হেসেছিলেন। আসলে, দেশপ্রেমে বা বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তিনি ছিলেন এতই উদ্বুদ্ধ যে, নিজের বেঁচে থাকা বা না-থাকা তাঁর কাছে ছিল সমান তুচ্ছ। আমি নিজে কখনও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইনি। বালক বয়েস থেকে যারা উদ্বুদ্ধ করে, কাঁচা মনের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধু বানায়, সেইসব দেশনেতাদের সন্দেহের চোখে দেখেছি আমি। আজও প্রবীণ দেশনেতাদের আমি বিশ্বাস করি না। সন্দেহের চোখেই দেখি। ক্ষুদিরামের বয়সি ছেলেরাও আজকাল যথেষ্ট সেয়ানা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর তো দু'-দুটো প্রজন্ম পার হয়ে গেল। রাজনৈতিক নেতার নির্দেশে তারা যে বিপজ্জনক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে না, তা নয়, কাবণ ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও সমাজ নিঃশত্রু হয়নি, শত্রুর চেহারা বদল হয়েছে কেবল, তাই মৃত্যুবরণ কাজ এখনও চলছে, তবে সেটা গিভ অ্যান্ড টেক পদ্ধতিতে। সেই যে নেতাজি ইম্ফল না কোথা থেকে যেন বেতারে ঘোষণা করতেন না: হে ভারতবাসী, তোমরা আমায় বক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব—মনে আছে? এই গিভ অ্যান্ড টেক পদ্ধতি আরও স্থূল ও বস্তুবাচক। জান কবুল করতে রাজি আছি, এরা বলে, তার আগে টাকাটা ছাড়ো।

স্বপ্নে হলেও আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল। আমি স্বচক্ষে সে-দৃশ্য দেখলাম, স্বকর্ণে সে-আদেশ শুনলাম। সাধারণত, স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর আর কিছু মনে থাকে না। কিন্তু এই ফাঁসির হুকুম আমি জেগে উঠেও ভুলতে পারছি না। কোর্টরুমের সমস্ত লোক বিচারক উঠে যাওয়ার পর আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, কেবল আমারই দিকে, স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু কেন? এ-প্রশ্নের উত্তর আমি পাইনি।

আমার মনের ভেতরকাব অস্বস্তি তাড়াবার জন্যে নিজেকে বার বার বোঝাই, স্বপ্ন তো একটা অলীক ব্যাপার। জাগ্রত জীবনের চিন্তাভাবনা আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক আছে? ফ্রয়েড অবশ্য বলেছেন যে, সচেতন মনের আড়ালে অবচেতন মনের একটা কুঠরি আছে। আমাদের জীবনের যত অপ্রিয় অভিজ্ঞতা, অসহায়তা, যত নিষিদ্ধ ভাবনা আর কল্পনা—যার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে আমরা ভয় পাই; যা লুকিয়ে রাখি বা ভুলে যেতে চাই—কিছুই লুপ্ত হয়ে যায় না। ওই অবচেতন খোপে গিয়ে বসে থাকে। হয়তো আরও নীচে অচেতন স্তরে চলে যায়। ঘুমিয়ে থাকে না। ঘুরপথে আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে।

ঘুমিয়ে থাকে না বলেই ঘুমের মধ্যে তারা উঠে আসে। ছায়াচিত্রের মতো অভিনয় করে তারা স্বপ্নের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের মনের গূঢ় স্তরের ইচ্ছা পূরণ করে দেয়। ফ্রয়েডের এই তত্ত্ব থেকে মনোজগতের অনেক অজানা তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু ইচ্ছাপূরণ নয়, আমরা যাকে বিবেকদংশন বলি, তা-ও ওই অবচেতন মনের নিঃশব্দ প্রতিবাদ। তার সুতরাং ভাল-মন্দ দু'রকম ভূমিকাই আছে।

আসলে মন তো বুকের কাছাকাছি কোনও জায়গায় থাকে না, থাকে মস্তিষ্কের মধ্যে স্নায়ুকেন্দ্রে। নিদ্রিত মানুষের পেশি যখন শিথিল ও নিষ্ক্রিয়, ওই স্নায়ুকেন্দ্র তখন সবচেয়ে বেশি সচল।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, ঘুমের নানা স্তর আছে। অগভীর, গভীর, অতিগভীর—এই রকম। অগভীর আর গভীর এই দুই স্তরের মাঝামাঝি অবস্থায় আমরা স্বপ্ন দেখি। একবারে এক মিনিট-দেড় মিনিটের বেশি কোনও স্বপ্ন স্থায়ী হয় না। বিজ্ঞানীরা ওই স্বল্পকালের ছায়াচিত্রবহুল নিদ্রাবস্থাকে বলেন আর.ই.এম স্লিপ। অর্থাৎ যখন বোজা অবস্থায় চোখের মণি দ্রুত ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরে। ঘুমন্ত মানুষ কখন স্বপ্ন দেখছে বাইরে থেকে লক্ষ করলেও বোঝা যায়। এটা যে মিথ্যে নয়, আমি পরখ করে দেখেছি।

পরবর্তীকালে হবসন নামের এক বিজ্ঞানী ফ্রয়েডের তত্ত্বকে বেমালুম অস্বীকার করে বলেছেন যে স্বপ্ন একেবারে অর্থহীন। জাগ্রত জীবনের প্রভাব তাতে থাকতে পারে, তবে স্বপ্নের আসল কাজ মস্তিষ্কের কোষগুলিকে সজীব রাখা। স্বপ্ন না দেখলে, তার মানে, মানুষ ঘুমের মধ্যেই মরে যেত। এখনকার বিজ্ঞানীরা এমন কথাও বলছেন যে, শারীরিক পরিশ্রম জনিত ক্ষয় পূরণ করার জন্যে বিশ্রাম দরকাব, তবে ঘুমটা খুব জরুরি নয়। অন্ধকার রাত্রে কর্মহীন সময় বিশ্রাম করে কাটাবার উদ্দেশ্যে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী ঘুমোতে শিখেছিল। তাতে টিকে থাকার সুবিধে হয়েছে। কালক্রমে জৈবিক বিবর্তনে নৈশ ঘুম একটা অভ্যাসে এসে দাঁড়িয়েছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, রাত্রে ঘুম না হলে যারা কষ্ট পায়, তাদের অসুখটা শারীরিক না, মানসিক। বর্ষীয়ান হবার পর থেকে আমি রাত্রে ঘুমের বড়ি খাই।

কোর্টরুমের একপাল লোক—কেউ বেঞ্চিতে বসা, কেউ দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ ব্যস্তসমস্ত ভাবে চলাফেবা করছে যেন কত কাজ, এখনই না করলে নয়। সবাই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। এই স্বপ্ন আমি আবার একদিন দেখলাম। সেদিন কোর্টরুমের উঁচু সিলিং থেকে লম্বা ডান্ডায় ঝোলানো একটা পাখা ঘুরতে দেখেছি। এটা আগের দিনের স্বপ্নে ছিল না। পাখাটা আস্তে আস্তে ঘুবছে আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ হচ্ছে। লোকগুলো কেমন কৌতুক-মাখা চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। দেখে বিবক্ত হয়ে আমি নিজেই চেঁচিয়ে উঠলাম: কেন? আমার কেন ফাঁসি হবে?

স্বপ্নের মধ্যেই ঘবের কোনা থেকে কে একজন বলে উঠল: হবে না? এ যে মার্ডার। কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার।

স্বপ্নের মধ্যেও স্মৃতিশক্তি কাজ করে। আশ্চর্য! না হলে তখনই আমার মনে পড়ে যাবে কেন এই সেদিন ঘটে-যাওয়া বারুই হত্যাকাণ্ড? সজল আর রঞ্জিতের নাম—যারা ঠান্ডা মাথায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের খুন কববে, ষড়যন্ত্র করেছিল। তাদের বয়েসও বিপ্লবী ক্ষুদিরামের মতো আঠারো বছরের নীচেই। মৃত্যু দণ্ডাদেশ শুনে অবজ্ঞাভরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছিল সজল। হেসে ফেলেছিল রঞ্জিত।

এবা তো অপরাধী। আমি তো কোনও অপরাধ করিনি। তবু ভাবলাম, আমিও ওদের মতো হেসে উঠি। হাঃ হাঃ, তোমরা আমায় ফাঁসি দেবে। মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে একজন নির্দোষ মানুষকে—

এমন সময় চোখে পড়ল, ওই কোনায় দাঁড়িয়ে থাকা, ধুতি আর ফুলশার্ট পরা লোকটাকে আমি চিনি। ও তো সন্তোষ। সন্তোষ চক্রবর্তী। স্কুলে আমরা সহপাঠী ছিলাম। ওর সামনের দাঁতদুটো এখনও এতদিন পরে আগেব মতো উঁচু। পরীক্ষায় প্রথম হত। খেলাধুলোয় আমার চেয়ে অনেক বেশি সুনাম ছিল ওর। আমরা ওকে হিংসে করতাম। উঁচু দাঁতের জন্যে কিংবা টাকরায় ফুটো ছিল বলে ওর উচ্চারণ ছিল বিকৃত, আমরা তাই নিয়ে ওকে ভেঙাতাম। রবীন্দ্রনাথের গানের কলি নকল করে বলতাম। ঘিৎকমনে নাঙা নেনু উঁ—

ও বলত, 'গান্না মেনে মানা ফানিয়ে নেমো।'

একবার শুধু দৌড় প্রতিযোগিতায় ওকে হারিয়ে আমি ফার্স্ট হই। সেটা ছিল অঙ্কের রেস। আধখানা মাঠ দৌড়ে থামতে হবে। একটা অঙ্ক কষতে হবে। তারপর অঙ্কের কাগজটা হাতে নিয়ে বাকি আধখানা মাঠ দৌড়ে পার হতে হবে। সবচেয়ে আগে সন্তোষই পৌঁছেছিল, আমি দ্বিতীয়। কিন্তু ওর অঙ্ক ভুল হওয়ায় আমি প্রথম হই। প্রাইজ পাই। ওই একবারই আমি প্রাইজ পেয়েছি। তাও ফাঁকতালে। সেই রাগ ও আজও ভোলেনি।

কী সাংঘাতিক মানুষ রে বাবা! ভাবতে গিয়ে আমার আর হাসা হল না। মৃত্যুভয়ে আমি কেঁপে উঠলাম। যখন ঘুম ভাঙল, দেখি, ঘামে আমার গায়ের গেঞ্জি ভিজে গেছে।

আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে নানাভাবে ঠোক্কর খেতে খেতে আজ এই অধিক বয়সে এসে

পৌঁছেছি। কলকাতা ছেড়ে আর কোথাও যাব না, বরাবর এমন একটা সংকল্প ছিল মনে। তবু গ্রাসাচ্ছদনের তাগিদে বার বার আমায় কলকাতার বাইরে কোথাও-না-কোথাও যেতে হয়েছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে। বসবাস করতে হয়েছে, কাজ করতে হয়েছে এমন সব মানুষদের সঙ্গে যাদের আমি স্বাভাবিক অবস্থায় এক মুহূর্তের জন্যে সহ্য করতে পারতাম না। মানুষের নীচতা নির্লজ্জতা, স্বার্থান্ধ আচরণ—তার যে কত বিচিত্র রূপ, কত রংবেরং পোশাক—দেখে দেখে অনেক সময় আমার মনের মধ্যে তিক্ততা জেগেছে। কিন্তু কখনও কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা জাগেনি। প্রতারিত হয়ে মনে মনে হয়তো ভেবেছি, ওই প্রতারক বা প্রতারিকা মরে থাক, স্বপ্নের মধ্যে দেখেছি যে, সে মরে গেছে, আমি তার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছি—আসলে কাঁদছি না, কান্নার ভান করছি পাছে অন্যেরা না বুঝে ফেলে, তাব মৃত্যুতে আমার আনন্দই হয়েছে—কিন্তু আমি ভিতু মানুষ, না পেরেছি শত্রুকে প্রকাশ্য যুদ্ধে আহ্বান করতে, না পেবেছি এমন কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে যার ফলে তার, কী যেন বলে, জীবনাবসান কী প্রাণহানি ঘটে। এই একই কারণে আমার মনে কখনও আত্মহত্যা করার ইচ্ছে জাগেনি। আত্মহত্যা করতেও তো সাহস লাগে। তা ছাড়া, জীবনকে আমি ভালবাসি। দেহযন্ত্র ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ না হতে আমি মরব কেন? কোন বৃহত্তর স্বার্থে?

যতবাব দূব করে দিয়েছে, ততবার আমি ফিরে এসেছি এই দুঃসহ কলকাতা শহরে। এক-এক সময় এক-এক অঞ্চলে থেকেছি। ঘুরেছি রাস্তায় রাস্তায়, পাড়ায় বেপাড়ায়,—দেখেছি, সাধাবণ মানুষের চবিত্র মূলত ভাল। সাধারণ মানুষ মূলত সরল। নিজের গায়ে চোট না লাগলে কেউ কারুর ক্ষতি করতে চায় না। তবু কয়েকজন থাকে, অতি অল্পসংখ্যক তারা, যারা তাদের যা প্রাপ্য, তার চেয়ে বেশি পেতে চায়। এদের আমি কোনওদিন বুঝে উঠতে পারিনি। একজন প্রাপ্যেব চেয়ে বেশি পেলে যে আর একজন তার প্রাপ্যের চেয়ে কম পাবে, এই বোধ তাদের মধ্যে থাকে না। এরা অদূরদর্শী। আপাত সুখের লোভে দৌড়োয় কিছুকাল, কিন্তু শেষপর্যন্ত এরা যে সুখী হয় না, এ-ঘটনাও আমি আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনে একাধিকবার ঘটতে দেখলাম।

এদের মধ্যে কেউ কেউ যখন বিলাপ করে, বলে, দেখো, যা চেয়েছিলাম, সবই তো পেলাম, কোথাও হেরে যাইনি, তবু আমার মনে শান্তি নেই, তবু কেন আমায় কষ্ট পেতে হয়, তখন ইচ্ছে করে, তাকে বলি, এ কি তুমি জানতে না? পাপ, পুণ্য, ভাগ্য, বিধাতা—এসব মানো আর না-ই মানো, একটা জিনিস তো তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, এই বিশ্বপৃথিবী একটা অঙ্কের নিয়মে চলে। অঙ্কটা তুমি যদি প্রথমেই ভুল করো, তা হলে কীসের জোরে জিতবে? ওই যে প্রথম জীবনে অঙ্কের দৌড়ে ফার্স্ট হয়েছিলাম সন্তোষকে হারিয়ে, তখন থেকেই হয়তো এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, দৌড়টা বড নয়, অঙ্কের সঠিক উত্তর করাটাই বড় কথা।

অথচ আমারই ওপর—মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হল।

আত্মপক্ষ সমর্থন করার ভঙ্গিতে এতগুলো কথা বললাম একটু আগে। বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, মানুষ হিসেবে আমি কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার করার যোগ্য নই। আবার স্বীকার করতে আমার কোনও দ্বিধা বা সংকোচ নেই যে, এতদসত্ত্বেও আমি আমার আচরণ দিয়ে সমস্ত মানুষকে খুশি করতে পারিনি। একজন ছাড়া সেই ক্ষুব্ধ নবনারীর দল আমার স্বপ্নের কোর্টরুমে আসেনি। হয়তো ফাঁসির দিন আসবে।

এই তো কিছুদিন আগে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে উড়িষ্যার এক শহরে গিয়েছিলাম। পুরী নয়।

এপ্রিল মাস। ভেবেছিলাম, খুব গরম হবে। তবু যাই। নিজের খরচে দেশ ঘোরার সামর্থ্য নেই আমার। এই আমন্ত্রণের সুযোগে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে। তিন-চারটে দিন তো। কেটে যাবে দেখতে দেখতে। চাই কী, সুযোগ পেলে, দেশ থেকে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়া হোক, এমন একটা বক্তব্যও রেখে আসতে পারি।

সেখানে এক বড়সড় হোটেলে বাতানুকূল ঘরে ওরা আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিল। বাতানুকূল মোটরগাড়ি পাঠিয়ে প্রতিদিন অনুষ্ঠান মণ্ডপে নিয়ে গেছে। অনুষ্ঠান শেষে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছে। সেখানে আমার প্রধান অতিথির ভাষণের বিষয় ছিল সাম্প্রতিক সাহিত্যের ওপর, সামাজিক জীবনের ওপর, গণমাধ্যমের অশুভ প্রভাব। গণমাধ্যম বলতে টিভি, রেডিয়ো আর সংবাদপত্র। যাদের প্রধান কাজ মানুষকে অবহিত করা। আমোদ বিতরণ করা নয়।

মঞ্চে আমার পাশে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছিলেন। তাঁদের একজন বললেন, আপনি সাংবাদিক-লেখক হলে এত তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে পারতেন না।

আমি বললাম, সেই কারণেই আমি সাংবাদিক-লেখক নই। সংবাদ মাধ্যমের সেবা করলে সাহিত্যিকের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।

পাশে বসে ছিলেন সেদিনের সভাপতি প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী রঙ্গনাথ মিশ্র। তিনি বললেন, আপনার ভাষণ খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনের ওপর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কুপ্রভাব অপরিসীম। এই বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে আমি আন্দোলন শুরু করেছি। একে রুখতেই হবে। মৃত্যুদণ্ড তুলে দেবার জন্যেও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। দরকার হলে আমি আপনার সহায়তা চাইব। আপনি সহযোগিতা করবেন তো?

আমি বললাম, অবশ্যই।

এই যে একটাই ভাষণ—একজনকে সন্তুষ্ট করল, আর একজনকে করল না। আমি কী করব? আমি তো গায়ক বা অভিনেতার মতো পারফর্মিং আর্টিস্ট নই। লেখক হিসেবে আমি মনে করি, শুধু সৃজনশীল বচনা প্রকাশ করলেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। জনমত প্রতিষ্ঠা করতেও তাকে ভাবতে হয়। তার প্রধান কাজ উপরিস্তরের জঞ্জাল সরিয়ে নিহিত সত্যের উদঘাটন। এ-কাজে অনেক বাধা।

এই বাতানুকুল হোটেলেই আমার চরিত্রের দুর্বলতা বেরিয়ে পড়ল।

সেদিন সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরোব। গাড়ি আসবে ন'টায়। আমি প্রস্তুত হয়ে ডাইনিং রুমে নেমে গেছি। স্টুয়ার্ড মেনুকার্ড দেখাল। তাতে ডিম দিয়ে তৈবি নানাপ্রকার সুখাদ্যের ফিরিস্তি আছে। টোস্টের সঙ্গে মাখন, জ্যাম, দুধ, ক্রিম। এ-সবই আমার পক্ষে নিবিদ্ধ খাদ্য। একসময় খুব খেয়েছি। এখন সহ্য হয না। তবু লোভ হল। গগনবিহারী চিল যেভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নামতে নামতে রাস্তার ওপর থেকে থ্যাতা ইঁদুরেব দেহ ছোঁ মেরে নিয়ে আবার গগনে ফিরে যায়, প্রায় সেইভাবে আমি ওই নিষিদ্ধ সুখাদ্যগুলি গলাধঃকরণ করে নীরবে মুখ মুছলাম ন্যাপকিনে। ভাবটা, যেন কিছুই হয়নি। মুড়ি আর পাকা পেঁপে খাওয়া মুখে কতদিন পর ডিমের, ক্রিমের সুস্বাদ লাগল। তখনও বুঝিনি।

রাত্রে ডিনার খেতে আবার নেমেছি। মনটা ভাল আছে। মেনুকার্ড দেখে খুঁজতে লাগলাম সবচেয়ে দামি আইটেম কোনটা। দেখলাম, চিংড়ি মাছ। চিংড়ি মাছের এক চিনে খাবার। এক প্লেট একশো ষাট টাকা।

স্টুযার্ডকে ডেকে জিজ্ঞেস কবি, এই প্রন কি ঘুষো চিংড়ি?

সে বলল, না না, এগুলো বড়। বাগদা। চাঁদিপুর থেকে আনা।

আমি এক প্লেট তাই অর্ডার দিলাম। সঙ্গে একটু ভাজা ভাত।

লোকে বলে চিংড়ি মাছে তো চর্বি নেই। ও খেতে দোষ কী। কিন্তু শান্তনু ডাক্তার আমায় বলেছে, চিংডিতে থাকে খুব বেশি পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড যা হার্টের পক্ষে অপকারী। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আসলে, চিংড়ি মাছের দাম এত বেশি যে, আমার মতো ছাপোষা মানুষ তা কিনতে পারে না। আমি নিত্য বাজারে যাই। মাছের বাজারে ঘুরি। চিংড়ি মাছের দর করি। আড়াইশো টাকা, তিনশো টাকা কেজি। শীতকালে যখন বাঙালি পরিযায়ীরা কলকাতা আক্রমণ করে, তখন গলদা চিংড়ি—বড় সাইজ, তিনটেতে এক কিলো—পাঁচশো টাকাতেও বিক্রি হতে দেখেছি। সব ঘোরা শেষ হয়ে গেলে আমি পোনা মাছ কিনে বাড়ি ফিরি। এইভাবেই জীবন চলছে।

একেবারে খেতে পাই না বললে ভুল বলা হবে। বছরে একবার, আমার জন্মদিনে, আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ঠিক মনে করে কয়েকটি বড় চিংড়ি মাছ পাঠিয়ে দেন। সেই একটা দিন আমরা বাড়ির সকলে মিলে ভাগ করে চিংড়ি মাছের মালাইকাবি খাই।

প্লেট যখন এল, গুনে দেখলাম, আটখানা মাছ। মাথা বাদ দিয়ে এক একটা কিংসাইজ সিগারেটের মতো লম্বা। বেশ মোটা, মশলা মাখানো। নরম। হিসেব করলাম, এক একটার দাম কুড়ি টাকা। চোখ বুজে বেমালুম খেয়ে নিলাম সবগুলো। একটু ঝাল ছিল, তাই পরে আবার আইসক্রিম খেলাম। সেটা ছত্রিশ টাকা। এবার একটু লজ্জা করল নিজের দুর্বলতা দেখে।

শোবার আগে ঘুমের বড়ি খাওয়া অভ্যেস আমার। সেদিন ঘুমের বড়ি খেয়েও ঘুম হল না। পেটে বুকে অস্বস্তি নিয়ে রাতটা কাটল। একবার মনে হয়েছিল যদি মরে যাই। তখন নিজেকেই সান্ত্বনা দিয়েছি

এই বলে যে, আমার ব্যাঙ্কে তো জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। সংসারের চাকা চলবে, স্বাভাবিক মৃত্যুতে তো আমার আপত্তি নেই।

পরের দিন ভোরে উঠে তিন-চার মাইল হেঁটে এলাম। স্নান করে এক গ্লাস লস্যি খেয়ে শরীরটা বাগে এল।

এসব কথা বাইরের লোকেব জানার কথা নয়। অনুষ্ঠান নিজের নিয়মে চলছে। আমাবও শিক্ষা হয়ে গেছে। আর বেহিসেবি খাওয়া চলবে না। লাঞ্চে নিরামিষ আর ডিনারে মুরগি সেদ্ধ—বাকি দু'দিন সেইভাবেই কেটেছে।

এক বিকেলে দু'জন বিপোর্টার এল সাক্ষাৎকার নিতে। তাদের সঙ্গে সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি নিয়ে অনেক কথা হল। আমি সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলাম। ওরা ওড়িয়া ভাষায় কথা বলল, আমি সরল বাংলায় কথা বললাম। কারুরই অসুবিধে হল না।

একবার বলল, আপনার পরিচিতি থেকে জানছি, আপনি সবসুদ্ধ মাত্র তেইশখানা বই লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখকদের বইয়ের সংখ্যা দেড়শো-দুশো।

আমি বললাম, আমি প্রধান লেখকদের একজন নই।

আমরা দেখছি, আপনি কোনও পুরস্কার পাননি। ইহা কি সত্য?

না। আমি একবাব অঙ্কেব দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলাম। তারপর থেকে পুরস্কার আমাকে পায়নি।

আপনাব মতে সবচেয়ে শক্তিশালী আধুনিক কবি কে?

বাংলায় জীবনানন্দ দাশ। হিন্দিতে মুক্তিবোধ। অন্য ভাবতীয় ভাষায় বচিত সাহিত্যেব সম্পর্কে আমি অবহিত নই।

আমার মনে হল, এই নামদুটো ওরা প্রথমবাব শুনছে। রিপোর্টাররা যেমন হয়। দু'বাব করে বললাম, জীবন-আনন্দ দাস। মুক্তি-বোধ। ওরা বোধহয় রবীন্দ্রনাথ শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল।

তারপর বিষয় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক?

আমার উত্তর: কোনও দলেব না।

সামনের নির্বাচনের পর কোন দল মন্ত্রীসভা গঠন করবে?

জ্যোতির্ষার্ণবেব মতো মুখ করে বললাম, কংগ্রেস।

পশ্চিম বাংলায়?

একটু ধাক্কা খেলেও মার্কসিস্টরা।

আপনাব মতে, দেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি কে?

আমি বললাম, টি. এন. শেষন।

হঠাৎ বলল, আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

আমি বললাম, লিখে যাওয়া।

আপনার নিজের কোন রচনা সবচেয়ে প্রিয়?

একটিও না। প্রিয়তম রচনা লেখা হয়ে গেলেই তো লেখা থামিয়ে দিতে হবে।

তার আগে যদি মৃত্যু এসে আপনাকে নিয়ে যেতে চায়?

আমি রেডি।

বলেই আমার মনে পড়ল গতবাত্রের কথা। তাই, আমি রেডি বলার পর যোগ করলাম, তবে অপঘাতে মৃত্যু হোক আমি চাই না।

অপঘাত মানে?

বুঝিয়ে বললাম, অপঘাত মানে আকস্মিক দুর্ঘটনায়। যেমন গাড়ি চাপা পড়ে, জলে ডুবে, আগুনে পুড়ে, বন্দুকের গুলিতে। যেভাবে আলবের কামু, গান্ধীজি, জীবনানন্দ মারা গেছেন। খুবই দুর্ভাগ্যজনক সে-মৃত্যু। খুবই অপমানজনক।

তখন ফাঁসির কথা মনে হয়নি। পরের দিন প্রজাতন্ত্র পত্রিকায় সেই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হল। নিজের ছবি দেখে চিনলাম। কিন্তু ভাষা না জানায় কী লিখেছে পড়তে পারলাম না।

তিন দিন ওখানে কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছি। হাওড়া থেকে বাড়ি অবধি পঞ্চান্ন টাকা ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে

দেবার পরও দেখলাম, আমার পকেটে দেড়শো টাকার কিছু বেশি অবশিষ্ট আছে। ওদের দেওয়া রাহাখরচ থেকে টাকাটা বেঁচেছে। তখনই মনস্থির করি, এই টাকা দিয়ে বাড়ির জন্যে চিংড়ি মাছ কিনব। বিবেক দংশন হচ্ছে। টাকাটা সরিয়ে রাখলাম পাছে অন্যভাবে খরচা হয়ে যায়।

বাজারে দেড়শো টাকা দিয়ে দশটা মাঝারি সাইজের চিংড়ি পেলাম। বাগদা। আরও দু'টাকা খরচ হল সেগুলো কুটিয়ে পরিষ্কার করে আনতে। ছ'টাকা দিয়ে একটা নারকোলের মালা নিলাম। ভাল কাঁচা লঙ্কা এক টাকার। সরষে বাড়িতেই আছে।

বাড়ি ফিরে নীল রঙের প্লাস্টিকের পুঁটলিটা রান্নাঘরে নামিয়ে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হই। আজ সবাই মিলে চিংড়ি মাছের মালাইকারি খাব। আমরা তিনজন তিনটে করে ন'টা। আর কাজের মেয়ে একটা। ওকে বলি, মাছগুলো ভাল করে ধোও, নারকোলটা কুরে দাও। দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সরষে বেটে তার ওপর একটু তেল ঢেলে রাখো। তবে ঝাঁজটা বেরোবে। হয়ে গেলে আমাকে ডেকো। আমি রান্না করব। ওই মূল্যবান জিনিস কারুর হাতে দিয়ে নষ্ট করতে চাই না।

আমি বাইরের ঘরে বসে কাগজ পড়ছি আর কান রয়েছে রান্নাঘরের দিকে। কাজ এগোচ্ছে। হঠাৎ কাজের মেয়েটা চিৎকার করে ওঠে। গেল! গেল! নিয়ে গেল মাছ! ছুটে গিয়ে দেখি, মেয়েটা মশলা-মাখা হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

কী হয়েছে?

কাগে নিয়ে গেল একটা মাছ। আমি এদিক ফিরে কাজ করছি। অমনি পেছন থেকে ঢুকে তুলেই পালিয়ে গেল। আমি শুধু একটা কালো ছায়া দেখলাম। কী হবে এখন।

ঢাকা দিয়ে রাখোনি?

রাখেনি, তা তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে। প্রথমে ভাবি, তাব ওপর রাগটা ঝাড়ব। এত দামের মাছ। তোমার আর কী। তখনই দেখতে পাই জানলার বাইরে পাশেব বাড়ির কার্নিশে বসে একটা কাক খুঁটে খুঁটে মাছটা খাচ্ছে। আর ঘাড় বেঁকিয়ে এক চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত বিবেক, বিবেচনা, বুদ্ধি বিচক্ষণতা, শিক্ষা, উদারতা, ক্ষমা, সহ্য করার ক্ষমতা সব লোপ পেয়ে যায়। আমি প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে উঠি। দপ করে জ্বলে উঠে স্থির হয়ে যাই।

আমাব পনেরো টাকা দামের একখানা চিংড়ি মাছ! তোকে খাওয়াচ্ছি হারামজাদা। একটু দাঁড়া। মনে মনে বলি।

কাকটা এক পা দিয়ে মাছটা চেপে ধরে আছে। আব কালো ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ছে তার মাংস। আমাকে দেখে ঘাড় তুলে ঠোঁট ফাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল। কে কোথায়। আয় রে আয়। লুটের মাল কাকেই খায়।

প্রচণ্ড ক্রোধের মধ্যেও আমি হেসে ফেললাম। না, সুকুমার রায় স্মরণ করলে ওকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। এদিকে দেখতে দেখতে আরও চারটে কাক এসে কাছাকাছি পোজিশন নিয়েছে।

বহুকাল কলকাতায় বসবাস করার ফলে কাকচরিত্র সম্বন্ধে আমি খানিকটা জানি।

কাক দেখতে কুচ্ছিত। তার শরীরে লাবণ্য নেই। তার কণ্ঠস্বর কর্কশ। স্বভাবে সে চোর—অর্থাৎ লোভী এবং ভিতু। কাক সদা সতর্ক, সন্দিগ্ধ, সন্ত্রস্ত। সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন, অস্থির। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করলে দেখবেন, সব কাক অম্লশূল রোগে ভোগে। জৈব কারণে কাককে বাসা বানাতে হয় ডিম পাড়ার জন্যে, বাচ্চা ফোটাবার তাড়নায়। কিন্তু সে কাজে ওর যত্ন নেই। দিনের আলো ফুটতে-না-ফুটতে সব পাখিই খিদের জ্বালায় ছুটে বেড়ায় দিগ্বিদিক। আমি জানি কাক ছুটে আসে মানুষের উচ্ছিষ্টের সন্ধানে। মানুষ ওকে ঘেন্না করে, কাক জানে। সে-ও মানুষকে ঘেন্না করে। ভিক্ষুক যেমন দাতাকে ঘেন্না করে, তেমনই। আমার ধারণা, কাকের এক চোখ কানা, তাই সে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায় যখন কিছু লক্ষ করে। কাকের মনে শান্তি নেই।

এই কাকটাও আমার দিকে টেরিয়ে তাকাচ্ছিল। আমি দু'বার ওকে তাড়াবার চেষ্টা করলাম। একটুখানি উড়ে গিয়ে আবার আগের জায়গায় এসে বসল। ওকে দেখতে দেখতে আমার মাথায় খুন চেপে যায়।

কাজের মেয়েটাকে বললাম, একটা চিংড়ি মাছ আমার হাতে দাও তো। সে ইতস্তত করছে দেখে নিজেই থালা থেকে তুলে নিলাম। তারপর পাউরুটি-কাটা ছুরি দিয়ে মাছটাকে ফালা ফালা করে কাটলাম। বেগন-বিষের লাল গুঁড়ো নিয়ে এসে মেশালাম মাছে। বাথরুমে ছিল মিউরিয়াটিক অ্যাসিড।

বোতলের ছিপি খুলে খানিকটা ঢাললাম তার ওপর। ধোঁয়া বেরোতে লাগল দেখে একটু দুধ দিলাম। তারপর বেশ করে মাখলাম।

কাজের মেয়েটা ভয়ে ভয়ে বলে, বাবু, কাগ মারে না। কাগ হল যম।

আমি বলি, যমেরও যম আছে। ফ্রিজ খুলে আধখানা সন্দেশ বার করে দাও তো।

খুব ঠান্ডা মাথায় তৈরি করলাম জিনিসটা। বেশ মাখো মাখো লালচে রং হয়েছে। তারপর একটা কাগজের ওপর সেটা রেখে রান্নাঘরের জানলার বাইরে পেতে দিলাম। মনে মনে বললাম, আয়, আর একটা চিংড়ি মাছ খেয়ে যা। এটা কাঁচা নয়। আমি রান্না করে দিয়েছি। পনেরো টাকার বেশি খরচ পড়ল। এর নাম প্রণ-আ-লা-মর। কাজের মেয়েটা জানলা ভেজিয়ে দিল।

জানলা থেকে সরে গিয়ে এবার আমি ছাদে উঠে যাই। আসল যে চোর, সে ব্যাটা কোনও অশুভ ইঙ্গিত পেয়ে চ্যাঁচাতে থাকে। মনে হল, অন্য কাকগুলোকে বলছে, যাস না। মানুষকে বিশ্বাস নেই। ওপর থেকে দেখলাম, ওর মাথার লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে।

তবু দুটো কাক বিষ-মাখা মাছটার দু'পাশে এসে বসল। একটু একটু করে ঠোকরাতে লাগল। খানিকটা খেল বলে মনে হল আমার। কাড়াকাড়ি করা ওদের স্বভাব। এইবেলা দুটোর কেউই কাড়াকাড়ি করল না। বেশিরভাগ মাছটা সাবাড় করে ওরা উড়ে এল ছাদে। তখন দেখি যে-কাকটা আমার কাছে এসে বসেছে, তার গলায় একটা থলি ঝুলছে। ওই থলি থেকে মাছটা উগরে দিচ্ছে। উগরে দিয়ে ডানায় দু'-চারবার ঠোঁট ঘষে কাকটা পালিয়ে গেল। আর দেখলাম, সরাসরি গিলে ফেলাব ফলেই হয়তো অন্যটা একটু দূরে বসে বসে পাখা ঝাপটাচ্ছে। উড়তে চাইছে, পাবছে না। হঠাৎ একসময় এই দ্বিতীয় কাকটা বঁটির মতো কাত হয়ে পড়ে যায়। চোরটাব কিছু হল না। মরল একটা নির্দোষ প্রাণী। ঠিক আছে কাকের বদলে কাক।

তখন সকাল ন'টা হবে। ওই চোর কাকটার ডাকে আগেই কাকেদেব মধ্যে কিছু উত্তেজনাব সঞ্চাব হয়েছিল। এবার সারা পাড়ায় সাড়া পড়ে যায়। এক এক করে একদল—প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা কালো হিংস্র পাখি ওই মরা কাকটাকে ঘিরে চেঁচাতে থাকে। উড়ে উড়ে দূবে চলে যায়, আবার ফিরে আসে। ওপব দিকে মুখ তুলে সাঁড়াশির মতো ঠোঁট ফাঁক করে চিৎকার করতে থাকে। একই রকম কর্কশ গলার স্বর ও ভাষা। আমার মনে হয়, ওরা সমবেত স্বরে হিন্দি ভাষায় বলছে, কাহে? কাহে? কেন? কেন? ওদেব বিপুল কলরোল ক্রমশ বেড়ে উঠছে দেখে আমি ছাদ থেকে নেমে আসি। বস্তুত পালিয়েই আসি।

একে যদি মার্ডার বলা হয় তো আমি খুনি। স্বপ্নের মধ্যে সন্তোষ বলেছিল, কোল্ড ব্লাডেড মার্ডাব। তার মানে, ঠান্ডা মাথায় ষড়যন্ত্র করে কাউকে হত্যা করা। আমি ঠান্ডা মাথায় ষডযন্ত্র কবেছি। যদিও একা একা, চিংড়ি মাছে বিষ মিশিয়েছিলাম। কাজের মেয়েটা বলেছিল, কাগ মারে না বাবু। আমি ওব কথা শুনিনি। আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গিয়েছিল তখন।

তাই বলে ফাঁসি হবে আমার? জীবনে আমি সব সময় সৎ থাকতে চেয়েছি, তবু সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। আমার আচরণে কেউ কেউ কষ্ট পেয়েছে। তাদের একজন সেদিন কোর্টরুমে আমাব সাজা হচ্ছে, সেই হুকুম নিজের কানে শুনতে এসেছিল। বাকি সবাই হয়তো ফাঁসির দিন আমার গলায় দড়ি পরানো হচ্ছে দেখতে আসবে।

মরতে আমার ভয় নেই। উড়িষ্যার সাক্ষাৎকারে আমি স্পষ্ট বলেছি, মৃত্যু যদি আসে, আমি রেডি। কিন্তু অপমৃত্যু আমি পছন্দ করি না। ওটা অপমানজনক। বাঁচার আনন্দে, বাঁচার কষ্টে ক্ষয়ে ক্ষয়ে এই শরীরের পতন হবে একদিন। আমি নিবে যাব। আমার প্রাণ আর কেউ কেড়ে নিয়ে যাবে, এ আমি সহ্য করি কী করে?

তাই ভাবি, এই হুকুম রদ করতে হবে। পরের বারের স্বপ্নে আমি উচ্চতর আদালতে আপিল করতে চাই। সেই উদ্দেশ্যে একখণ্ড ভারতীয় দণ্ডবিধি কিনলাম। সেখানে দেখি, এই তো—৩০০ নম্বর ধারায় পরিষ্কার বলা আছে, যদি কেউ অকস্মাৎ প্ররোচিত হয়ে নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং তার ফলে যে প্ররোচক, তাকে বা ভুলক্রমে আর কাউকে হত্যা করে, তার অপরাধ ২৯৯ ধারায় বিচার করতে হবে। ২৯৯ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অবধি হতে পারে। মৃত্যুদণ্ড হয় না। একটা পথ পাওয়া গেল।

আমার কত কষ্টের উপার্জন থেকে কেনা পনেরো টাকা দামের বাগদা চিংড়ি মাছ যদি কেউ অন্যায়ভাবে চুরি করে, তা কি যথেষ্ট প্ররোচনা নয়। আমি ভাবি। তা ছাড়া অপরাধী কাককে আমি আর

কীভাবে শাস্তি দিতে পারতাম? এই ঘটনার পেছনে আমার স্ত্রীপুত্র পরিবারের প্রতি মমত্ববোধের একটা পরিচয়ও আছে। আমি যদি আমন্ত্রিত হয়ে উড়িষ্যার অনুষ্ঠানে না যেতাম, যদি সেখানে বাতানুকূল ভোজনশালায় বসে স্বার্থপরের মতো একা বসে বসে আট-আটখানা চিংড়িমাছের তরকারি, যার দাম একশো ষাট টাকা, না খেতাম, এবং সে কারণে আমার মনে যদি অনুশোচনা না হত, তা হলে এই দুর্ঘটনা আদৌ ঘটতে পারত কি? পারত না। কাকজাতির প্রতি আমার জাতক্রোধ নেই। যেমন মনুষ্যজাতির প্রতিও নেই। এটাও একটা পয়েন্ট।

আর একটা পয়েন্ট আমি ভারতীয় দণ্ডবিধির ষোলো নম্বর পরিচ্ছেদে আবিষ্কার করেছি। যার মধ্যে ২৯৯ ও ৩০০ নম্বর ধারা পড়ে। সেখানে কেবল মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুর আচরণের শাস্তি বিধান রয়েছে। দুষ্টস্বভাব কাকের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা কোনও আইনের আওতায় পড়ে না। সুতরাং আপিলে আমি জিতবই। এখন কেবল পরবর্তী স্বপ্নটির জন্য অপেক্ষা করে থাকা। সেদিন সব কথা খুলে বলব বিচারককে। আমার শত্রুরাও শুনবে।

১৯৯৬

ছুট

লতা ফ্রক পরে ঘুরে বেড়ায়। মায়ের সঙ্গে সকালবেলায় কলকাতায় আসে। সন্ধেবেলা ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরে। বাবুদের বাড়ি এটা-ওটা কাজ করে সারাদিন। দুপুরের খাওয়া আর দেড়শো টাকা মাইনে পায়। সব রান্না শিখে নিলে মাইনে বাড়িয়ে দেবে বলেছে ওরা। লতা সব রান্না শিখতে চায় না। কী হবে? টাকাটা তো মা নিয়ে নেবে। কথায় কথায় মা ওকে বকে। ও যত বড় হচ্ছে, মায়ের বকুনি তত বাড়ছে। ও জানে, দেশে-ঘরে মা ওর বিয়ে দিয়ে দেবে একদিন। তবে সব শান্তি।

গলির মোড়ে এগরোলের দোকান দিয়েছে স্বপনদা। স্যান্ডো গেঞ্জি পরে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরোটা বানায়। এক আঙুল দিয়ে ডিম ভাঙে। বাবুর সিগারেট কিনে ফেরার পথে এক-এক দিন স্বপনদা ডাকে, এই লতা। কী। তোর বয়স কত? জানি না। তোর ওজন কত? জানি না। আমি কি আলু-পটল? একদিন স্বপনদা ওকে রোল খাওয়াল। ডিম ছাড়া। গরম গরম ঠোঙাটা হাতে নিয়েই ছুট লাগাল লতা। পাছে দাম চায়।

বাবুদের বাড়ি থেকে শাড়ি দিয়েছে ওকে। হলুদ শাড়ির সঙ্গে হলুদ ব্লাউজ। আর একটা বডিস। বডিস গায়ে দিলে ওর গায়ে কাঁটা দেয়। মা বকল কিন্তু পরতে বারণ করল না। রথের দিন লতা বাবুদের দেওয়া শাড়ি-ব্লাউজ-বডিস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। থমথমে মুখ।

স্বপনদা ডাকল, এই লতা। কী। শোন এদিকে। লতা রোলগাড়ির কাছে এগিয়ে যায়। স্বপনদা জিজ্ঞেস করল, তুই পান খেয়েছিস? কই; না তো। তোর ঠোঁট কেমন লাল দেখাচ্ছে। তারপর একটু থেমে বলল, তুই সুন্দর।

তাই নাকি? এ-কথা তো কেউ বলেনি ওকে। কী মনে হতেই ও ছুট লাগাল উলটো দিকে। গায়ে বডিসের ঘষা লাগছে। শাড়ির ঘেরে আটকে যাচ্ছে পা।

বাবুদের বাড়ির বউদি বলল, কী হয়েছে। হাঁপাচ্ছিস কেন? লতা বলল, এমনি। তারপর চুপি চুপি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ও মা সত্যিই তো। শুধু ঠোঁট না, সারা মুখটাই ওর কেমন লাল হয়ে গেছে। নিজেকে চিনতে পারছে না।

১৯৯৯

ছায়ানট

১

আলিপুরের পার্ক অ্যাভেনুর ওপর উঁচু পাঁচিল। বিশাল লোহার গেট। গেটের গায়ে দারোয়ানের ঘর। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, এটা ছায়ানটী চন্দ্রিকা দেবীর বাড়ি। কোনও নেমপ্লেট নেই। শুধু একটা নম্বর ৩৯। আর শুধু সাদা অক্ষরে শুদ্ধ বাংলায় লেখা তিনটি শব্দ: কুকুর হইতে সাবধান। যে বোঝার সে এই দেখেই বোঝে। টেলিফোন করে আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করলে চন্দ্রিকা দেবী কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।

গেট দিয়ে ঢুকে খানিকটা ড্রাইভওয়ে। তারপর আসল বাড়িটা। তার আগে দু'পাশে সবুজ কমদছাঁট ঘাসজমি বা লন। বাগান। পশ্চিমের পাঁচিল ঘেঁষে মোটরগাড়ি পার্ক করার জায়গা, গ্যারাজ। পুবদিকের পাঁচিল ঘেঁষে সার সার চাবখানা নিচু চালার ঘর। চাকরবাকরদের থাকার আস্তানা।

গেটেব খুপবির মধ্যেই একটা টেলিফোন আছে। কেউ এলে দারোয়ান আগে টেলিফোনে কথা বলে নেয় ভেতবে। ভেতরে মানে বরেনবাবুর সঙ্গে। বরেনবাবু যদি বলে আসতে দাও, তবেই আগন্তুক ঢুকতে পাববে।

একতলায় একখানা বডসড় ঘব। তার মধ্যে দু'সেট সোফা ও কার্পেট পাতা। দেয়াল-জোড়া পরদা। এখানে অপেক্ষমান ব্যক্তিরা এসে বসে। বসে বসে কবজি উলটে ঘড়ি দেখে। কখনও খুব বেশি অধৈর্য হয়ে পড়লে পাশের আপিসঘবে বরেনবাবুকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, ম্যাডামেব সঙ্গে দেখা হবে তো? মানুষকে খুব বেশি অধৈর্য দেখলে মিনি ও চিনি নামের দুটো কানঝোলা গোদা কুকুর তাদের জামাকাপড়ে ঢাকা মতলব শুঁকতে এগিয়ে আসে। খুব শান্ত আর খুব হিংস্র ওই দুটি ভাইবোন। বা স্বামী-স্ত্রী। ডাকে না। কামড়ায় না। রোজ দু'কিলো করে সেদ্ধ মাংস খায়। আর বরেনবাবুর সঙ্গে গাড়িতে চড়ে ময়দানে দৌড়োতে যায়।

সকলের জন্যে এত কড়াকড়ি কিন্তু প্রফুল্লর বেলা সাতখুন মাপ।

প্রফুল্ল যখনই আসে, হন্তদন্ত হয়ে ঢোকে গেট দিয়ে। ওর মাথায় এক ঝাড় উসকোখুসকো চুল। ওর বাঁ কাঁধে একটা মস্ত কালো চামড়ার ব্যাগ। ঘর্মাক্ত শরীর আর জামাপ্যান্ট থেকে উগ্র সেন্টের গন্ধ বেরোয়। সোজা হেঁটে যায় বাড়ি অবধি। কোনও দিকে তাকায় না। বসার ঘর আর আপিস ঘবের পেছনে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। ওর কো-ভাদিস চপ্পল জোড়া সিঁড়ির নীচে খুলে রেখে উঠে যায় তরতর করে। মিনি আর চিনি আর কেউ হলে একলাফে গলার টুঁটি কামড়ে ধরত। কিন্তু প্রফুল্লকে আসতে দেখলে চুপচাপ জিভ বার করে শ্বাস ছাড়ে। আড়চোখে তাকায়। কিছু বলে না। ওরা জানে, এখন ম্যাডামের ছবি তোলার সময়।

ম্যাডাম বাথরুম থেকে বেরোচ্ছেন। পরনে হয়তো শুধুই ড্রেসিংগাউন। চুল মুছছেন তোয়ালে দিয়ে। প্রফুল্ল ছবি তুলে নেবে। ম্যাডাম হাতদুটি তুলে চুল আঁচড়াচ্ছেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, আর হয়তো গান গাইছেন গুনগুন করে—আখতারি বাইয়ের সুরে: 'গলি দিয়ে চলে যায় —আয়—লুটিয়ে— অমনি পাশ থেকে ওই পশচার ধরে রাখবে প্রফুল্ল। আবার, কখনও বিছানায় বসা, উপুড় হয়ে শুয়ে বই পড়া, স্তনের খাঁজ দেখা যাচ্ছে, কখনও হাতের ওপর মাথা রেখে কাত হয়ে চিন্তামগ্ন—একজন সুন্দরী নারীকে যত দিক থেকে দেখা সম্ভব, সবকিছু প্রফুল্লর ক্যামেরায় ধরা থাকে। ও হল চন্দ্রিকা দেবীর ছবিদাস।

ও যখন আসে, ফোলডার ভরতি করে নিয়ে আসে নানা মাপের এনলার্জমেন্ট। কালো-সাদা, রঙিন। ম্যাডাম বেছে বেছে তাঁর পছন্দের ছবিগুলি রেখে দেন। তাঁর বাড়ির আলমারিতে এইসব ছবির অন্তত দেড়শোটা অ্যালবাম জমে গেছে গত পাঁচ-সাত বছরে। এই ৩৯ নম্বর বাড়ি থেকে প্রফুল্লর রোজগার কিছু কম হয় না। তবু কলকাতা শহরে একটা স্টুডিয়ো না থাকায় সে গরিবই রয়ে গেছে। ম্যাডামের চোখে গরিব মানে মধ্যবিত্ত।

ওর ফিগার ভাল। ফটোগ্রাফার না হয়ে ও যদি ছায়াচিত্রে অভিনয় করত, তা হলে আর কিছু না হোক,

কলকাতা শহরে একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারত প্রফুল্ল। বারুইপুরের ভাড়াবাড়িতে থাকতে হত না। সেখানে দু'খানা ঘর নিয়ে ওর সংসার। বউ আর একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা। তার মধ্যে একখানা ঘর ওর স্টুডিয়ো।

সাতসকালে দুটি ভাত খেয়ে বেরিয়ে যায়। রাত ন'টার পর ফেরে। ওর বউ বলে এই ফেরিওলার কাজ ছেড়ে দাও। বাড়ি ফিরেও তোমার বিশ্রাম নেই। আমার সঙ্গে কোনও কথা নেই। একটা জ্যান্ত মেয়েমানুষ বাড়িতে তোমার পথ চেয়ে বসে থাকে সারাদিন, আর তুমি অন্ধকার ঘরে বসে বসে ছবির মেয়েদের দিকে তাকিয়ে রাত কাটাও। একদিন আমি এই সব ছবি—বেহায়া মেয়েদের গা-দেখানো ঢঙের ছবি, ছিঁড়েখুঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে দেব।

প্রফুল্ল হাসে। শান্তা কী বুঝবে এইসব ছবির কদর। মনের ভেতরে হিংসে থাকলে শিল্প চেনা যায় না। হ্যাঁ। শিল্প। চন্দ্রিকা দেবী ওকে কতবার বলেছেন, প্রফুল্ল, তোমার চোখ দুটো শিল্পীর। তুমি আমার মধ্যে কত সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছ, নিজেও জানো না। আমি যখন পুরোনো অ্যালবামগুলো বার করে আগেকার আমাকে দেখি, অবাক হয়ে যাই। ভারী ভয় করে। একদিন হয়তো তুমি আমার ছবি আর তুলতে চাইবে না। আমি তোমাকে আরও কাছে পেতে চাই।

শুনলে মনে হবে প্রেমের ডায়ালগ। ম্যাডাম যখন বলেন, তোমার আসতে দেরি হলে আমার বুকের ভেতর কেমন করতে থাকে...তোমার একটা টেলিফোন নেই...এত দূরে থাকো যে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে আসব, তারও উপায় নেই...তখন প্রফুল্লর বুক টিপ টিপ করে না। ও জানে, উনি ওভাবে কথা বলতেই অভ্যস্ত। প্রেমিকার অভিনয় করে করে প্রেমিকার মুখের ভাষা ছাড়া আর কিছু শেখেননি। উনি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসেন না। ওঁর দেহ আছে, অন্তর নেই।

চন্দ্রিকা দেবীকে নিয়ে অনেক স্ক্যান্ডাল রটে সিনেমার পত্রপত্রিকায়। অনেকদিন থেকেই রটছে। একসময় শোনা যেত, উনি উত্তমকুমারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ওঁদের দু'জনার ঘনিষ্ঠ পোজের ছবিও ছাপা হয়েছিল রঙিন পাতায়। তারপর রটল উনি এক অধ্যাপককে বাড়িতে এনে রেখেছেন। এই খবরে সে-ভদ্রলোকের সংসার ভেঙে যায় প্রায়। তারপর শোনা গেল, একজন নামকবা সংগীতশিল্পী চন্দ্রিকা দেবীর অনুরাগী। শিগগিরই ওঁদের এনগেজমেন্ট ঘোষণা করা হবে। সে অবশ্য অবিবাহিত। এ ছাড়া বরেনবাবুকে নিয়ে কুৎসা তো আছেই।

প্রফুল্ল বলেছিল, আপনি প্রেসের লোক ডেকে এইসব গুজব অস্বীকার করুন।

চন্দ্রিকা দেবী তখন বলেছিলেন একটি সার কথা। স্ক্যান্ডাল না থাকলে আমাদের লাইনে টিকে থাকা যায় না। যেদিন সত্যি সত্যি আমি কাউকে বিয়ে করব, সেই দিন থেকে আমার বাজার নষ্ট হয়ে যাবে। অ্যাকট্রেসকে সব সময়, অ্যাভেলেবল আছে, এমনতরো ভাবমূর্তি ধরে রাখতে হয়। সতীলক্ষ্মী গৃহবধূ নায়িকা কেউ চায় না। তুমি জানো না? প্রত্যেকবার স্ক্যান্ডাল রটার সময় তোমার তোলা কত স্টিল ছবি আমি চড়া দামে বিক্রি করেছি। লোকেরা সেইসব ছবি গোগ্রাসে গিলেছে।

ফুলের রূপে মুগ্ধ হলে মানুষ কী করে? দূর থেকে দেখে। দেখে আনন্দ পায়। আর নয়তো ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে। ফুল শুদ্ধ। ওর মধ্যে কাম নেই। টকটকে আঙুর বা টুকটুকে আপেল দেখলে মানুষের ইচ্ছে করে কামড় দিতে। চিবিয়ে, চুষে খেয়ে ছিবড়ে করে দিতে। কেননা, ফলের মধ্যে কাম আছে। মেয়ে-শরীরের মধ্যেও তেমনই কাম আছে। পুরুষ তার রূপ নিংড়ে ধ্বংস করতে চায়। আমি কাউকে আমার গায়ে কামড় বসাতে দেব না।

চন্দ্রিকা দেবী প্রফুল্লকে ওঁর ছবিদাস বলেই খোলাখুলি বলতেন, লক্ষ লক্ষ লোক তাদের ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নে, আমাকে ছিঁড়ে খায়, আমি জানি। সে তোমার ছবির গুণে। বাথরুমে আমার গা-দেখানো পোর্ট্রেট সাঁটিয়ে রাখে। তাতে ওদের ধর্ষকাম চরিতার্থ হয়। এই আমার সোশ্যাল সার্ভিস।

একদিন এমনই হন্তদন্ত হয়ে ঢুকেছে প্রফুল্ল, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছে দোতলায়। দেখে, ম্যাডাম সেজেগুজে বসে আছেন। তাঁর চোখে চশমা। খুব মনোযোগ দিয়ে কী সব কাগজপত্র দেখছেন।

প্রফুল্লকে দেখে বললেন, আজ কোনও ছবির কথা না। আজ তোমার সঙ্গে আমার কাজের কথা আছে।

ছবি ছাড়া আর কী কাজের কথা থাকতে পারে, প্রফুল্ল বুঝে উঠতে পারে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ম্যাডাম বললেন, চুপ করে বোসো। কাঁধের বস্তাটা নামিয়ে রেখে হালকা হও আগে।

সেদিন যে-কথা হয়েছিল, তার সারমর্ম হল এই:

ঝাউতলায় ম্যাডামের একটা জমি আছে। চার কাঠার প্লট। পার্ক সার্কাস আর বালিগঞ্জের মাঝামাঝি জায়গাটা। বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। ওই জমিটা ম্যাডাম প্রফুল্লকে দিতে চান।

আমি চাই, তুমি ওটা নাও। ওখানে বাড়ি করে থাকো।

আমার কী সাধ্য—বলতে যাচ্ছিল প্রফুল্ল, ওকে বাধা দিয়ে ম্যাডাম বললেন, সে-সব আমি ভেবে রেখেছি।

২

প্রফুল্লর বাবা ছিলেন জঙ্গিপুর হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক। ১৯০৯ সালে জন্ম। ১৯২৯ সালে বি এ। ১৯৩১ সালে মাসে তিরিশ টাকা মাইনের চাকরি। ১৯৩৪ সালে বিবাহ। রোগা লম্বা চেহারা ছিল তাঁর। সৎ ও আদর্শবাদী পুরুষ ছিলেন। সেই তুলনায় প্রফুল্লর মা ছিলেন ছোটখাটো মানুষ। ফরসা, মুখচোরা। পনেরো বছর বয়েস থেকে সংসার করেছেন নিপুণ হাতে। আর, একটির-পর-একটি সন্তান প্রসব করে গেছেন নিঃশব্দে। তখনকার দিনে এখনকার মতো গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে আউপাতালিপনা ছিল না, মা হবার পর তার স্তন নিষ্কাম হয়ে যেত।

দারিদ্র্য ছিল। রোগভোগ ছিল যথেষ্ট। তবু শিক্ষক হওয়ার সুবাদে বাবা স্থানীয় সমাজে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রতিবেশীরা খাতির করত। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বিনাপয়সায় ওষুধ দিত। ছাত্রদের বাড়ি থেকে নিঃশর্ত উপহার আসত ফল-মূল-আনাজ। পুকুরের মাছ। নিচু জাতের মেয়ে-পুরুষ ডাক পেলেই বিনামূল্যে শ্রমদান করে যেত। বিনা বাক্যব্যয়ে ধারে জিনিসপত্র দিত পাড়ার মুদি। মাসকাবারে হাতজোড় করে সে টাকা চাইতে আসত—বাবা তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন। যেন সে-ই অধমর্ণ। এ-দৃশ্য বাল্যকালে প্রফুল্ল স্বচক্ষে দেখেছে। স্বচক্ষে যাকে দেখেনি সে হল শান্তিয়া নাপতিনি, যে ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কুড়ি-একুশ বছরে আটবার মায়ের নাড়ি কেটে এক-একটি সন্তান প্রসব করিয়ে গেছে। কনিষ্ঠতম সন্তান সে। তার জন্মের কিছুকাল পরে শান্তিয়া ওলাওঠা রোগে মারা যায়।

পাঁচ বছর বয়েস অতিক্রম করার আগেই তিন সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় আদর্শবাদী শিক্ষক তাদের নামকরণ করে যাননি। বাকি পাঁচজন যারা টিকে গেছে, তাদের মানুষ করে তুলেছেন শিক্ষকসুলভ নিষ্ঠায়।

জঙ্গিপুরের স্কুল চত্বরে ওরা যে-বাড়িতে থাকত, সেখানে শোবার ঘর বলতে ছিল দুটি। ছোট ঘরটি বাবার একার। সেখানে একটি তোষক-ঢাকা তক্তপোশ ছিল। জানলার ধারে ছিল বাবার লেখাপড়ার টেবিল আর একটি হাতলওলা বেতের চেয়ার। আর দেয়াল ঘেঁষে দুটি আলমারি—বইয়ে ঠাসা। তক্তপোশের নীচে বাবার নিজস্ব জামাকাপড়ের ট্রাঙ্ক। দেয়ালে গাঁথা দুই পেরেকে বাঁধা থাকত ছেঁড়া শাড়ির পাড়। তাতে ঝুলত বাবার খদ্দরের ধুতি আর গামছা। পেরেকে ঝুলত বাবার খদ্দরের পাঞ্জাবি। ওই পাঞ্জাবি গায়ে দিলে বাবার পিঠের কাছে পেরেকের দাগ উঁচু হয়ে থাকত। তখন জামাকাপড় ইস্ত্রি করার রেওয়াজ ছিল না বাড়িতে। ধোপার বাড়ির কাপড় এলে তাতে নতুন বইয়ের মতো পরিচ্ছন্নতার সুগন্ধ বেরোত।

বড় শোবার ঘরে ছেলেপুলেদের নিয়ে মা শুতেন। বড় চৌকির ওপর বিছানা, তাতে মায়ের দু'পাশে দু'জন। সবচেয়ে ছোট যারা। বাকিরা মেজের ওপর মাদুর আর তোশকের বিছানায়। বিছানা, মশারি পাতা হয়ে গেলে ঘরের মধ্যে আর নড়াচড়ার জায়গা থাকত না। তবু, প্রফুল্লর মনে হয় এখন,, তারই মধ্যে মা নিশ্চয় মাঝে মাঝে বাবার ঘরে যেত। কখন যেত, কীভাবে যেত, কল্পনা করতে পারে না প্রফুল্ল। এই রকমই ছিল তখনকার দাম্পত্যজীবন, অতি নিভৃত ও গোপন স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক।

সবচেয়ে ছোট ছেলে প্রফুল্ল। বাবার দেওয়া নাম। বড়দার নাম প্রশান্ত। মেজদা প্রকাশ। সেজদা প্রণয়। ফুলদা প্রমোদ। সকলের নামের আদ্য অক্ষর 'প্র'। বাবা বলতেন, 'প্র' হল সেই উপসর্গ, যা মূল শব্দের অর্থকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। শান্ত মানে ধীর, কিন্তু প্রশান্ত মানে অতিশয় ধীর বা অবিচল। তেমনই প্রফুল্ল মানে অতিশয় বিকশিত।

বাংলার মাস্টারমশাই বলতেন, আপনি তো নাম দেগে দিলেন। সবাই কি বড় হয়ে নিজের নামের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে?

বাবা বলতেন, যোগ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা থাকবে।

আমি আমার ছেলের নাম দিয়েছিলাম অনেক ভেবেচিন্তে—বিবেকানন্দ। ভেবেছিলাম, তাঁর ছিটেফোঁটাও যদি পায়। কী হল? ছেলেটা মামার বাড়িতে গিয়ে মানুষ হল না। একেবারে বখে গেল। এখন তার নাম, বিবেকানন্দ, ছোট করে বিবেক, ওকে ব্যঙ্গ করে।

প্রফুল্লর বেলাতেও এই বাণী বর্ণে বর্ণে ফলে গেছে। সে পূর্ণ বিকশিত হওয়ার আগেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। অথচ তার আর চার ভাই নিজের নিজের মতো করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক-এক করে তারা চলে গেছে কাজের জায়গায়। বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। বাবা প্রথম দু'জনের বিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তৃতীয়জন, প্রণয়, অসবর্ণ বিয়ে করায় মা অসন্তুষ্ট হয়ে অসুখে পড়ে যান। বেকার প্রফুল্ল কেবল ফটো তুলে বেড়ায়, জীবনে সে থিতু হল না এই দুঃখ নিয়েই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। জঙ্গিপুরের বাস উঠে গেছে আজ আঠারো বছর।

তারপর কলকাতার আশপাশে, বলতে গেলে কলকাতাতেই, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ওরা পাঁচ ভাই। উত্তরপাড়ায় বড়দা। তার একটি মাত্র ছেলে। মেজদা, মেজবউদি পাইকপাড়ায়, তাদের কোনও সন্তান নেই। সেজদারা থাকে বিরাটিতে। ওদের একটি মাত্র মেয়ে, তনুশ্রী, এবার বি এ পরীক্ষা দেবে। ফুলদারা থাকে ঢাকুরিয়ায়—ওদের দুই মেয়েই স্কুলে পড়ে।

জঙ্গিপুরের বাসায় একখানা ঘরে শুয়ে বসে, একই লণ্ঠনের আলোয় পড়াশোনা করে বড় হয়েছে ওরা। কিন্তু পরে তারা যাকে বলে ছত্রভঙ্গ। ভাইয়ে ভাইয়ে বড় একটা, দেখাসাক্ষাৎ অবধি হয় না। সকলেই নিজের নিজের সংসার নিয়ে চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। কারুরই সময় হয় না। চিঠিপত্রে খবরাখবর আদানপ্রদান চলে, তাও বউদিদের মধ্যে। প্রফুল্লই শুধু বিজয়ার পর বছরে অন্তত একবার দাদাদের বাড়ি গিয়ে প্রণাম করে আসে। তার কোনও বাঁধা চাকরি নেই। ছোটবেলার নেশা ফটো তোলা, দাদার দেওয়া বক্স ক্যামেরা দিয়ে যার শুরু, আজ তাই ওর পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছোট ছোট একক পরিবারে সুখী মানুষ যে আসলে কত অসহায়, জানা গেল বড়দা মারা যাবার সময়। হিন্দ মোটরে কাজ করত। অবসর নেবার সময় হয়েছে, অথচ নিজের একটা মাথাগোঁজার ব্যবস্থা হল না, ছেলেটা বি এস সি পাশ করে বেকার বসে আছে আর নানা রকম উৎপাত শুরু করেছে বাড়িতে। বড়বউদির রক্তচাপ ওপরের দিকে, প্রায় অবিচল। এমত অবস্থায় একদিন ভোররাত্রে প্রশান্ত বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। স্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্যে যতটুকু চিকিৎসা হবার হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। সকাল আটটায় প্রশান্ত মারা যায়। বাড়িতে টেলিফোন নেই, লোকমুখে খবর পাঠানো হয়েছিল ভাইদের কাছে। কেউ সে-খবর পেয়েছিল, কেউ পায়নি। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে অগত্যা বিকেল চারটের সময় মরদেহের সৎকার হয়। একমাত্র সেজদা তার মোটরসাইকেলে চড়ে উপস্থিত হতে পেরেছিল।

প্রতিবেশী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল প্রণয়, মানুষ ভোররাত্রেই বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় কেন?

ডাক্তার বলে, এর প্রধান কারণ স্ট্রেস। একক সংসারে মনের মধ্যেকার সূক্ষ্ম পীড়ন সবচেয়ে বেশি। আমি তো এসে দেখি, মা আর ছেলে মিলে প্রশান্তবাবুকে বাথরুম থেকে টেনে হেঁচড়ে বার করার চেষ্টা করছে। ওখানে শুইয়ে রাখলেই ভাল হত।

ডাক্তার বলেছিল, আসল কথা কী জানেন? বাথরুমে গিয়ে কেউ অজ্ঞান হয়ে পা পিছলে পড়ে যায় না। হার্ট অ্যাটাকের প্রকৃষ্ট সময় ওই ভোররাত্রি। যখন শরীরের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা সবচেয়ে শিথিল, যখন অবচেতন থাকে সক্রিয়, সেই থেকে আঘাতটা আসে। পেশি আলগা হয়ে যায় বলে বাথরুমের দিকে যেতে চায় রোগী। বিছানা নোংরা করতে চায় না। ভাবে, চুপচাপ সামলে নেবে। তাতে বিপদ আরও বাড়ে।

হাসতে হাসতে ডাক্তার প্রণয়কে জিজ্ঞেস করে, আপনি কোথায় থাকেন।

বিরাটি।

নিজের বাড়ি?

না, না, ভাড়া। অবসর নেবার পর থোক টাকা হাতে পেলে একটা ফ্ল্যাটট্যাট কিনব, ইচ্ছে আছে।

ডাক্তার বলে, সকলের মনেই এই রকম ইচ্ছে থাকে। নিজের পরিবারের জন্যে একটা মাথাগোঁজার ব্যবস্থা করে যাবার চেষ্টায় নিজের আয়ু ক্ষয় করে দেয়। এই ভদ্রলোককে কতবার বলেছি, প্রশান্তবাবু, একটু নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। উনি বলতেন, আর দুটো বছর। তারপর বিশ্রাম নেব। কলকাতার কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাট যদি কিনতে পারি, তবে আমার আশা মেটে। দেখলেন তো, ওভারটাইম খাটতে খাটতে মানুষটা মরেই গেল। প্রণয় ছোটভাইকে পরে বলেছিল, আমাদের সকলেরই এক অবস্থা। প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত।...

ম্যাডাম বলেছিলেন, আমার ইচ্ছে, ওই চার কাঠা প্লটটা তুমি নাও। এখন ওখানে জমির দাম লাখ টাকা কাঠা। আমি তোমাকে পঁচিশ হাজারে দিয়ে দেব।

এক কাঠা জমির দাম পঁচিশ হাজার টাকা হলেও চারকাঠার প্লটে লাখ টাকাই খরচ পড়বে। তারপর বাড়ি তৈরি। তাই প্রফুল্ল অসম্ভবের দিকে মানুষ যেভাবে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সেইভাবে কাতরোক্তি করেছিল, আমার সাধ্য কী?

চন্দ্রিকা দেবী বলেছিলেন, জমিটা নিয়ে কোনও প্রমোটারকে ধরিয়ে দাও। ফ্ল্যাট করতে আর আলাদা টাকা লাগবে না। এখন তো আকছার লোকে তাই করছে।

প্রমোটারের কথা বলায় প্রফুল্লর মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল তখন। ওরা পাঁচ ভাই মিলে জমিটা নিলে কেমন হয়। চাঁদা করে পাঁচটা ফ্ল্যাট করা যায় না? আজকাল তো ফ্ল্যাট তৈরি করার জন্যে লোনও পাওয়া যায়। জমিটা যদি নিজেদের টাকা দিয়ে কেনে ওরা, তারপর যে-যা পারে দেবে। বাকিটা লোন। সবাই মিলে শোধ করবে। প্রফুল্লর নিজের একটা ফিকস্‌ড ডিপোজিট আছে। পঁচিশ হাজারের। পঁচানব্বই সালে কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে ওর ছবির একটা প্রদর্শনী হয়। তাতে এই টাকাটা ও পুরস্কার পায়। সেই সঙ্গে একটা রুপোর পরি, পাখা মেলা। এই পুরস্কারের পেছনে ম্যাডামের হাত ছিল বলে ওর সন্দেহ। কিন্তু সেটা প্রকাশ করেনি। পরিটা নিজের বউকে দিয়ে প্রফুল্ল বলেছিল, এটা আমাদের স্বপ্ন। সাবধানে রেখে দাও।

এরপর পাঁচ ভাইকে একত্র করা নিয়ে যে টেনশন আর দৌড়োদৌড়ি, বড়দার অবর্তমানে বড়বউদিকে রাজি করানো, বিরাটি, ঢাকুরিয়া, পাকপাড়া, উত্তরপাড়া আর বারুইপুর জুড়ে ছত্রভঙ্গ এক যৌথ পরিবারকে ঝাউতলায় একত্র করা—সে এক দীর্ঘ কাহিনী। তার বর্ণনা এখানে অবান্তর। আমাদের এটুকু জানলেই চলবে যে, শেষপর্যন্ত পাণ্ডব নামের একটা তিনতলা বাড়ি সত্যি সত্যি বাস্তবে রূপায়িত হল। গৃহপ্রবেশের দিন চন্দ্রিকা দেবী কিছুক্ষণের জন্য এসে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন।

সকলেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি, দক্ষিণ কলকাতার এমন একটা অভিজাত পল্লিতে ওরা কোনওদিন বসবাস করার অধিকার পাবে। প্রফুল্লর মুখখানা সেদিন ছিল রক্তদান শিবির থেকে সদ্য-বেরিয়ে-আসা যুবকের মতো আনন্দিত।

নীচের তলার আধখানা জুড়ে একটা বড় বসার ঘর আর দুটো বাথরুম। একটুখানি বারান্দা। এই অংশটা এজমালি। বাকি আধখানা কংক্রিটের ঘেরাটোপের নীচে শান-বাঁধানো খালি জায়গা। তার চারপাশে পিলার। ফার্স্ট ফ্লোরে দুটো ফ্ল্যাট। একটায় বড়বউদি আর সুমন, অন্যটায় মেজদা, মেজবউদি। সেকেন্ড ফ্লোরে সেজদা প্রণয়, সেজবউদি আর ওদের মেয়ে তনুশ্রী একদিকে, আর অন্য দিকে প্রমোদ, তার বউ আর দুটি মেয়ে—তুষ্টি আর মিষ্টু। থার্ড ফ্লোরে আধখানা ছাদ, বাকি আধখানায় প্রফুল্লর দু'কামরার ফ্ল্যাট। আর একটা বেশ বড়সড় স্টুডিয়ো। সব ফ্ল্যাটেই দুটো করে বাথরুম, রান্নাঘর, একটি করে বারান্দা। এক পরিবারের চোদ্দোজন মানুষ অনেকদিন পরে এক গৃহে আশ্রয় পেয়েছে।

বড়বউদি বলে, দু'বছর আগে এই ব্যবস্থা হলে উনি মারা যেতেন না। সুমন বলে, মা. এবার আমি একটা মোটরবাইক কিনব। ওর নতুন চাকরি হয়েছে এ-বাড়িতে আসার পর।

আমি জানি না কিছু। তুমি সেজোকাকার সঙ্গে কথা বলো। বড়বউদি ছেলেকে ওপর তলায় পাঠিয়ে দেয়।

প্রণয় শুনে বললে, আমার বাইকটা তুই নে। আমি তো আপিসের গাড়িতেই যাওয়া-আসা করছি। তেমন দরকার পড়লে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনে নেব। গাড়ি রাখার জায়গার তো অভাব নেই।

এখন,তনুশ্রী যাদবপুরে এম. এ. পড়ছে। শাড়ি পরে না। প্যান্টির ওপর ফ্রক পরে। জিনস পরে, তার

ওপর সাদা ফতুয়া। আর নয়তো সালোয়ার-কামিজ পরে ঘুরে বেড়ায়। এক লাফে কলকাতার কালচারে ঢুকে গেছে ও। এক-এক দিন মোটরবাইক স্টার্ট করার শব্দ পেলে ও ছুটে নীচে নেমে আসে। আবদার করে বলে, ও সুমনদা আমাকে পৌঁছে দিয়ে তুমি কাজে যাও।

সুমন বলে, পেছন উঠে বোস।

তুষ্টি আর মিষ্টুর স্কুলবাস ঢাকুরিয়ায় না গিয়ে আজকাল ঝাউতলা থেকে ওদের তুলে নিয়ে যায়। সকাল আটটার বদলে সওয়া নটায়। বিকেল সাড়ে চারটের সময় বড় রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যায়। সেখান থেকে দু'মিনিটের হাঁটাপথ—পাণ্ডববাড়ি। ওরা দৌড় দিয়ে এক মিনিটেই পৌঁছে যায়। কাছেই একটা ইংলিশ মিডিয়াম কে. জি স্কুল আছে। নাম, 'চেরি ব্লসম'। প্রফুল্ল তার মেয়ে জিনিয়াকে ওখানে ভরতি করে দিয়েছে। শান্তা সকালে সঙ্গে করে নিয়ে যায় ওকে। দুপুর বারোটায় আবার গিয়ে নিয়ে আসে। তারপর মেয়েকে নিয়েই ওর দিনের বেশিরভাগ সময় কেটে যায়। প্রফুল্লর চাকরি নেই, আবার কামাই বা ছুটিও নেই। এখানে এসেও বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে, স্টুডিয়োয় বসে কাজ করে। আর নয়তো কোনও এক দাদার ফ্ল্যাটে গিয়ে আড্ডা দেয়। শাসন রোড, নতুন বাজারের চেয়ে এই অঞ্চল অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম, শান্তার পক্ষে এইটেই আরাম।

এ-বাড়ির সব বউই গৃহবধূ। এক শীলা ছাড়া। ও হল মেজভাই প্রকাশের বউ। ওদের ছেলেপুলে নেই। শীলা স্কুলে চাকরি করে। ছোটবউদিও চাকরি করত একসময়। মার্চেন্ট আপিসে টাইপিস্ট ছিল। সেখানেই প্রমোদের সঙ্গে আলাপ। ভাব-ভালবাসা। পরে মা-বাবার অমতে বিয়ে। পর পর দুটি বাচ্চা হওয়ার পর কাজটা ছেড়ে দিয়েছে। সংসার আর চাকরি—একসঙ্গে সামলানো যায় না। প্রমোদ বলেছে, একটা কাজই মন দিয়ে করো। সব চাকরিই চাকরের কাজ। টাকার বিনিময়ে শ্রম দেওয়া। আর অপমানটা ফাউ। সংসারের চাকরিতে অপমান নেই। তোমার যা দরকার, আমি তো আছি, সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেব। আমাদের তো একটি পুত্রসন্তানও হওয়া দরকার।

বউদি রেগেমেগে বলেছে, স্বার্থপর। শীলাও বলে, পুরুষেরা ভারী স্বার্থপর। এ-বাড়িতে আসায় ও-বেচারি একটু অসুবিধেয় পড়েছে। পাকপাড়ার বাসা থেকে মানিকতলায় স্কুলে পড়াতে আসতে সময় লাগত কুড়ি মিনিট। এখান থেকে যেতে লাগে পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। মৌলালি, শিয়ালদা—দু'জায়গায় জ্যাম পার হতে হয়। স্কুল থেকে ফিরে আর রান্নাবান্না করার দম থাকে না।

অনেক সময় বড়বউদি ডেকে নেয় ওকে।

এই শীলা। এখনই ঢুকতে হবে না। এখানে চা খেয়ে যাও। কড়াইশুঁটির কচুরি করেছি।

শীলা ল্যাচ কি ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, চান করে আসছি। নিজের বাড়ির খাবারের চেয়ে পরের বাড়ির খাবার সকলেরই বেশি পছন্দ।

যৌথ পরিবার, কিন্তু একান্নবর্তী নয়। সবকিছুই নিজের নিজের। তবে এক বাড়িতে থাকা একটা বিরাট ভরসা।

রবিবার ছুটির দিনে ভাইয়েরা নীচের তলার বড় ঘরটায় গিয়ে জড়ো হয়। নিজেদের মধ্যে গল্পসল্প করে। ক্যারাম খেলে। ঠিকে কাজের লোক চলে গেলে পর বউরাও কেউ কেউ এসে যোগ দেয়। কোনও একটা ফ্ল্যাট থেকে মুড়ি আর তেলেভাজা আসে। বাচ্চারা এ-ফ্ল্যাটে ও-ফ্ল্যাটে, সিঁড়িতে, বারান্দায় ছুটোছুটি করে খেলে। কেউ বেড়াতে এলে নীচের তলার ঘরেই বসে সাধারণত। ওই ঘরে বসেই ছুটির দুপুরে বাড়িসুদ্ধ সবাই ভিডিয়ো ছবি দেখে।

সব ভাইক'টি কাজের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। সচ্ছল, মধ্যবিত্ত। তবু ওরই মধ্যে সেজোজন, প্রণয়, একটু বেশি অবস্থাপন্ন যাকে বলে। ওর ফ্ল্যাটে আপিস থেকে টেলিফোন দিয়েছে। আর কারুর টেলিফোন নেই। তাতে কী, দরকার পড়লে সেকেন্ড ফ্লোরে চলে যাও। ফোন করো। কেউ কিছু মনে করে না। ফোন এলে পাশের ফ্ল্যাটের তুষ্টি বা মিষ্টু কেউ ছুটে গিয়ে খবর দিয়ে আসে। নয়তো সেজোবউদি কাজের লোককে বলে, যাও তো, নীচের দোতলায় মেজোবউদিকে বলো, ফোন আছে। তেমন বেশি ফোন বাইরে থেকে কারুরই আসে না। তবু জিনিসটা আছে, এ এক বিরাট ভরসা।

প্রফুল্লর ফোন আসে একটু বেশি। ম্যাডামের বাড়ি থেকে বরেনবাবু করেন। অন্য পার্টিরাও ফোন করে ওকে। পাছে বেশি অসুবিধে হয়, ও বলে রেখেছে আমাকে ডাকতে হবে না। মেসেজ নিয়ে রেখো, তা হলেই চলবে। ওর মেসেজ লেখার জন্যে একটা প্যাডও দিয়ে রেখেছে প্রফুল্ল। যেতে-আসতে

সেজদার ফ্ল্যাটে ঢুঁ মেরে যায়। কোনও মেসেজ আছে? জিজ্ঞেস করে বউদিকে।

বউদি ঠাট্টা করে বলে, তোমার প্রেমিকার ফোন। চন্দ্রিকা দেবী কাল সকালেই তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।

প্রফুল্ল হাসে। প্রেমিকা? ভাল বলেছ। উনি আর লোক পেলেন না। সত্যি কথা যদি বলতে চাও তো বলো, প্রভু। উনি আমার প্রভু। প্রভুরা ভৃত্যকে যে রকম ভালবাসে, ম্যাডামও তেমনই ভালবাসেন আমায়।

বউদি বলে, তার চেয়ে একটু বেশি। তা না হলে এই জায়গা কেউ ওমনি ছেড়ে দেয়?

ওমনি কোথায়? আমরা তো তার জন্যে মূল্য দিয়েছি।

ভাবের ঘরে চুবি কোরো না ঠাকুরপো, বউদি বলে, ওই মূল্য হল নামমাত্র। ওটা দানও বলা যায়। এতে লজ্জা পাবার কী আছে। আমরা তো তোমার সৌভাগ্যে গর্বিত। শুধু চিন্তা হয়—

কী চিন্তা হয়?

শান্তার কপালটা না পোড়ে। ও বেচারি তো অতশত বোঝে না।

প্রফুল্ল এবার রেগে যায়। তিলকে তাল কোরো না বউদি। আজগুবি চিন্তার একটা সীমা থাকা দরকার।

একদিন সন্ধেবেলা সেজোবউদি প্রফুল্লকে দেখে বলল, ঠাকুরপো তোমাকে একটা কথা বলব। কিছু মনে করবে না তো?

কী কথা? খুব গোপন কিছু?

আমাব ভয় করছে। অথচ কাউকে বলতে না পেরে স্বস্তি পাচ্ছি না। তোমার সেজদাকেও বলিনি।

শুনি।

সেজোবউদি সোফার গদির তলায় হাত ঢুকিয়ে একটা কাগজ বার করল। রুলটানা খাতা ছেঁড়া একটা কাগজের টুকরো। তাতে লেখা, 'সুমন আমার সুমন। কিছুই বুঝতে না পেরে কি জেগে জেগেই ঘুমোন।' প্রফুল্লর হাতে কাগজটা দিয়ে বললেন, তনুর বালিশের তলায় ছিল এটা।

প্রফুল্ল কাগজটা ফেরত দিয়ে বলল, ভারী মিষ্টি কবিতা। এতে ভয় পাবার কী আছে?

নেই, তুমি বলছ?

ওরা ভালবাসতে শিখছে। শিখুক না।

যদি কোনও বিপদ ঘটে? ভাইবোনের মধ্যে কি ভালবাসা হওয়া উচিত?

প্রফুল্ল বলে, ছোটবেলা থেকে যদি ওরা একসঙ্গে এক বাড়িতে থেকে বড় হত, তা হলে এটা হত না। বড় হওয়ার মুখে ওরা পরস্পরকে পেয়েছে। এটা বয়েসের ধর্ম। সব সময় উচিত-অনুচিত মানে না।

এটা বন্ধ করতে হবে।

তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও, প্রফুল্ল আশ্বাস দিয়ে বলে, একদিন সুবিধে মতো আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব। কাজিনদের মধ্যে এটা হয়। আবার কেটে যায়।

গজগজ করে সেজোবউদি।—কী জানি বাবা। এক এক সময় মনে হয়, বিরাটিতে আমরা বেশ ছিলাম। এখানে উঠে এলাম বলেই অশান্তির কারণ ঘটছে।

হঠাৎ এই কথা শুনে খুব আহত বোধ করল প্রফুল্ল। এত বড় একটা সংসারকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এনে এক বাড়িতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে বলে ওর মনে একটা গর্ববোধ ছিল। বাবা, মা, কেউ যদি বেঁচে থাকতেন আজ অবশ্যই আশীর্বাদ করতেন ওকে। অথচ, এখনও দু'বছর পার হয়নি, এর মধ্যে কারুর কারুর মনে হতে শুরু করেছে, এখানে না এলেই ভাল হত। ওরা ভুলে গেল, আপাতত একজন অন্তত, যে কী কম খরচে এগারোশো বর্গফুটের নিরুপদ্রব বাসস্থানটি পাওয়া গেছে। দাদাদের কত সাশ্রয় করে দিয়েছে ও। প্রফুল্ল, যে ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে কম শিক্ষিত, প্রায় চিরবেকার, অপদার্থ, সে-ই তো এই উপকারটা করেছে। কী দরকার ছিল তার এই ঝঞ্ঝাটে?

হতে পারে এটা সেজোবউদির একার মনের কথা। তাই যেন হয়। হয়তো মনের কথা নয়, মনের বিকার। সেজোবউদির বয়েসে এসে মেয়েদের নানা রকম মানসিক বিকার দেখা দেয়। সন্দেহবাতিক তার একটা। নিরাপত্তার অভাববোধ আর একটা লক্ষণ। অথচ কীসের অভাব আছে ওদের। প্রফুল্লর মনে হয়; বিরাটিতে থাকলে ওর মেয়ে তনুশ্রী কি এর চেয়ে বেশি অসুবিধেয় পড়ত না। ছেলেদের সঙ্গে

মেলামেশা করত না? ও কি কচি খুকি?

প্রফুল্ল চুপ করে আছে দেখে বউদি বলে, তোমরা ভাইয়েরা এখানে একত্র হয়েছ, সবাই খুব খুশি। কিন্তু আমরা বউয়েরা তো পাঁচ বোন নই। এই বাড়ির নাম পাণ্ডব। পাণ্ডবদের একটামাত্র বউ ছিল, সেটা ভুলে যেয়ো না। আসল কথা কী জানো? এখানে আসার পর থেকে তোমার দাদা আর আমার দিকে মন দেয় না। মেয়েটাও পর হয়ে যাচ্ছে। আমি কী নিয়ে থাকি বলো তো? শান্তা কিছু বলে না?

প্রফুল্ল বলে, না, তোমার মতো কমপ্লেক্স শান্তার নেই। ও সাদাসিধে মানুষ। আর, আমরা তোমাদের তুলনায় অনেক গরিব তো, তাই আমাদের সমস্যা অনেক কম। স্বপ্ন বলতে একটা রুপোর পরি—শান্তার আলমারিতে রাখা থাকে।

রাগ করেই সেদিন চলে গিয়েছিল প্রফুল্ল। বেরিয়ে গিয়ে মনে হল, একবার বড়বউদির ফ্ল্যাটে ঢুঁ মারলে কেমন হয়।

কয়েকটা সিঁড়ি নীচে।

দরোজা খোলা আছে দেখে ঢুকে পড়ল প্রফুল্ল। ঢুকেই বুঝতে পারে মায়ে-ছেলের ঝগড়া চলছে।

সুমন বলছে, এত কী বকবক করছ তখন থেকে? টু দি পয়েন্ট কথা বলো।

বউদি বলছে, এই বয়েসে আর নতুন করে টু দি পয়েন্ট কথা বলতে পারব না বাবা। এটা তো আপিস নয়, বাড়ি। আমাকে পছন্দ না হলে ফেলে দাও।

প্রফুল্লকে দেখে হঠাৎ ওরা চুপ করে যায়।

বড়বউদি বলে, তুমি এসে গেছ, ভালই হয়েছে।

প্রফুল্ল দেখে, সুমনের এলোমেলো ঘরের মধ্যে খাটের ওপর বসে আছে তনুশ্রী। কাঁদছে। ঘন ঘন রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে।

কী হল আবার?

বড়বউদি বলে, তুমিই বলো ভাই, এত রাগারাগি করার কী হয়েছে? সুমনকে বোঝাও তো। তনু যদি তোর নিজেব বোন হত, সহ্য করতে পারতিস কি না। এত একলসেঁড়ে হলে চলে? ওর নিজের কোনও বন্ধু নেই। বন্ধুত্ব করার মনই নেই। একটা কচি মেয়ে চারখানা লুচি খেয়েছে বলে হিংসে! ওর নিজের ভাগে কম পড়ে যাচ্ছে!

মা, তুমি আবার হেজাচ্ছ! গর্জন করে ওঠে সুমন, আমি শুধু বলেছি, অন্য ঘরে বোস। আমি যখন বাড়িতে থাকব না, তখন আমার ঘরে কেউ ঢুকবে না। ও এলেই আমার জিনিসপত্র ঘাঁটে। সব উলটোপালটা করে দেয়। ক্যাসেট খুঁজে পাই না।

বড়বউদি বলে, কত সাজানোগোছানো ঘর তোমার! একটা কাকের বাসাও এর চেয়ে ভাল!

যাক, খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় প্রফুল্ল। ব্যাপারটা তা হলে একতরফা। এখনও খুব বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছোয়নি। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে তনুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করে, সুমনকে ভালবেসে ফেলিসনি তো? ওটা করিস না।

তনু বলে, ও ভারী নিষ্ঠুর। সেলফিশ।

তাতে তোমার কী? ওর সঙ্গে মিশো না।

কার সঙ্গে মিশব? কে আছে আর?

প্রফুল্ল বোঝে ভয় নেই, এরা ভালবাসতে শেখেনি।

তারপর বড়বউদিকে বুঝিয়ে বলে, এ হল ওয়ান চাইল্ড প্রবলেম। এক-এক জনের মধ্যে এক-এক ভাবে প্রকাশ পায়। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগ নিঃসঙ্গতায় ভোগে। আমরাই এর জন্যে দায়ী। ছোটবেলায় আমরা পাঁচ ভাই একখানা ঘরে শুয়ে বসে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মানুষ হয়েছি। আমাদের সময় এ-সমস্যা ছিল না। সুমন, তনু, তোরা পরস্পরের বন্ধু হবার চেষ্টা কর। তার জন্যে কিছুটা ছাড়তে হয়, ছাড়।

কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয়, কে না জানে।

বন্ধু হতে গিয়ে প্রফুল্লকেও কিছুটা ছাড়তে হল শেষপর্যন্ত। এবার অন্যভাবে।

একদিন চন্দ্রিকা দেবীর গাড়িতে শুটিং সেরে ফিরছে। ম্যাডামের মন খারাপ। চুপ করে বসে আছেন পাশে। মন খারাপের কারণ প্রফুল্ল জানে। আজ এক-একটা দৃশ্য বার বার রিটেক করতে হয়েছে। টিভি

সিরিয়ালের ছবির নায়ক-নায়িকাকে অনেক কম দূরত্বে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে হয়। ম্যাডাম কিছুতেই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আবেগ ফোটাতে পারছিলেন না। ছবির নায়ক ওঁর চেয়ে বয়েসে অনেকে ছোট, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে বার বার সিঁটিয়ে সরে যাচ্ছিলেন। অথচ উপনায়িকা মেয়েটি ছিল খুব ফ্রি। সে বডি অ্যাকটিং দেখিয়ে আবেগে টগবগ করছিল। প্রফুল্ল স্টিল ছবি তোলে। আজ ও সেই উপনায়িকার অনেকগুলো ছবি ধরতে পেরেছে। কথামতো একখানা রাখবার মতো অ্যালবাম তাকে দিতে পারবে।

৩৯ নম্বর বাড়ির কাছাকাছি এসে ম্যাডাম বললেন, প্রফুল্ল, আজ আমি আউট অফ মুড আছি। তুমি কাল সকালে একবার এসো। কথা আছে।

৩

পরের দিন চন্দ্রিকা দেবী প্রফুল্লকে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন তুমি এখন থেকে আব কারুর ছবি তুলবে না। তুমি আমাব। তুমি একলা আমার কাছে থাকবে। মিনি আর চিনি দুই কুকুর এই কথা শুনে বাখল।

প্রফুল্ল জানত না, ববেনবাবুকে উনি ইতিমধ্যে ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আমার তো একটা সংসার আছে ম্যাডাম। আপনি—

আপনি নয়, তুমি। ম্যাডাম নয়, চন্দ্রা। তোমাব ক্যামেরা দিয়ে এখন থেকে তুমি প্রকৃতির ছবি তোলো, আমাব আপত্তি নেই। মেয়েমানুষেব গায়েব চেয়ে প্রকৃতি অনেক সুন্দর। তোমাকে আমি মাসে পাঁচ হাজাব টাকা মাইনে দেব। শনি-রবিবাব ছুটি দেব। বাকি সময় তুমি লেন্সের বাইরে থেকে আমাকে দেখবে। ছোঁবে। সারাক্ষণ আমার বাড়িতে থাকবে। আমার গা ঘেঁষে ঘুরঘুর করবে।

হাসতে হাসতে প্রফুল্ল বলে, সারাজীবনেব বেকার আমি। এতদিন পর একটা চাকবি পেলাম।

না, প্রফুল্ল। এটা ভালবাসার চাকরি। এতদিন আমি গ্রাহ্য করিনি। এবার থেকে আমরা নতুন কবে জীবন শুরু কবব। তুমি শিল্পী। তোমাকে বেঁধে রাখতে চাই না আমি। দিয়ো, তোমার সংসারকে যতটুকু না দিলে নয়, দিয়ো। আমি তো সে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। একজন পুরুষ তো দু'জন মেয়েকে ভালবাসতে পারে। তাই না? তুমি কি লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় ভালবাসোনি? এখন থেকে তোমার ভালবাসা শবীবে অনুভব কবতে চাই। তুমি না কোবো না।

নীল পরদা-ঘেরা ঘরের মধ্যে চন্দ্রিকা দেবী প্রফুল্লকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁব ঈষৎ-শিথিল কোমল অঙ্গেব সুবাস এই প্রথমবার প্রফুল্লকে আচ্ছন্ন করে দেয়। ওর চোখ জলে ভবে যায়। ভালবাসায় না করুণায়, ঠিক বুঝতে পারে না।

১৯৯৬

❀ বি-হাই

রেডিয়ো বলেছিল, বঙ্গোপসাগরের ওপর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। সেই সম্ভাবনার বাস্তব রূপ দেখল সবাই চারদিন ধরে। দিন নেই, রাত নেই, এক নাগাড়ে বৃষ্টি। কখনও প্রবল বেগে, কখনও ঝুপঝুপ করে নিঃশব্দে। রাস্তার জলকাদা শুকোয়নি একটুক্ষণের জন্যেও। আকাশ চাপ চাপ কালো মেঘে ময়লা আর ভারী। জবজবে ভিজে বাতাস বাড়ির মধ্যে ঢুকে সবকিছু স্যাঁতসেঁতে করে রেখেছিল। ঘরের মধ্যে দড়ি টাঙিয়ে পাখা চালিয়ে কাপড় শুকোতে হয়েছে। পাছে গলা বসে যায়, সেই ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোয়নি ভাস্বতী।

আজ সকালে উঠে দেখল রোদ উঠেছে। ঝুপসি অন্ধকার ভাবটা কেটে গিয়ে আলো ফুটেছে বাইরে।

আকাশে মেঘ একেবারে যে কেটে গেছে, তা নয়, তবে ফাঁকে ফাঁকে নীল রং দেখা যায়। মাসি চা দিতে এসে বলল, অম্বুবাচি কাটল, বৃষ্টিও থামল। বলেছিলাম না, শনির সাত মঙ্গলের তিন।

ভাস্বতী জিজ্ঞেস করল, রতন কোথায়?

বাজারে গেছে। বাবু নিয়ে গেছে।

বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ভাস্বতী। বলল, হাসিকে ডেকে দাও, বিছানা তুলে দিক। আলমারি থেকে একখানা লাল ছাপা বেডকভার বার করে রেখেছিল আগেই, হাসি আসতে বলল, পুরনোটা সরিয়ে রাখো, কাচতে যাবে।

ফরসা বেডকভার পাতার ফলে ঘরখানা আলোকিত হয়ে ওঠে। মন প্রফুল্ল হয়। মনের মধ্যে সংকল্প জাগে, আজ একটু না বেরোলে চলবে না। বাড়ির মধ্যে আটকা থেকে দম বন্ধ হয়ে এসেছে প্রায়।

কিন্নরীতে পম্পার সঙ্গে দেখা।

পাতলা খোলের ছাপা সুতি শাড়ির সন্ধানে এখানে ঢুকেছিল ভাস্বতী। যা চট করে শুকোবে। এই সময়ে সবাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সিনথেটিক পরে। সে-ও পরে। কিন্তু কেমন ঘেন্না করে আজকাল।

দোকানে তখন বিশেষ ভিড় নেই। চার-পাঁচ জন মহিলা খদ্দের ঘুরঘুর করছে। কে কী খুঁজছে, জানার কৌতূহল তো হয়। সেই রকম কৌতূহল থেকে ওর নজরে পড়ল, ওদিকের কাউন্টারে কিন্নরীর সবচেয়ে অভিজ্ঞ যে কর্মী, একটু বয়স্ক, কপালটা উঁচু, তাতে গোল বড় টিপ, সে খানতিনেক কাঁথাস্টিচ শাড়ি মেলে ধবে রয়েছে যার সামনে, সে পম্পা না? অত বড় খোঁপা, কান দেখা যায় না। জুলপির তলা অবধি নেমে এসেছে চুলের ধারা, হাতে লাল-সাদা শাঁখা, এ আর কে হবে? কিন্তু পম্পার তো ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, ডিভোর্সি কি সধবা, না বিধবা? না, কুমারী?

ভেবেই হাসি পায় ভাস্বতীর। আচ্ছা, ডিভোর্সি মেয়েদের বুঝি কাঁথাস্টিচ পরতে নেই! কী বিচিত্র মানুষের মন! পুরনো সংস্কারের পোকা মরেও মরে না। নিজের কাছেই লজ্জা হয় ওর। লজ্জা থেকে কৌতূহল আরও বাড়ে। হাসতে হাসতে ও এগিয়ে যায় ওদিকের কাউন্টারের দিকে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, পম্পা না?

পম্পা ওব দিকে তাকাল। সেই রকম ঢ্যাঙা, লম্বা। বড় বড় চোখ। কালো রঙের ভরাট মুখ। আর সরু চেরা সিঁথির ওপর লম্বা সিঁদুরের লাইন। ভুরু কুঁচকে দু'-এক মুহূর্ত চেয়ে থাকার পর হেসে বলল, তোমাব কী চেহারা হয়েছে ভাস্বতী! চেনাই যায় না!

বৈচিত্র্যহীন দীর্ঘ দাম্পত্যে মেয়েদের চেহারা ক্ষয়ে যায়। বা নিজেকে আকর্ষণীয় করে রাখার অনিচ্ছায় স্বাভাবিক যে ক্ষয়, তা প্রকট হয়ে ওঠে। ভাস্বতীর তাই হয়েছে। ধরাবাঁধা জীবন। তার ওপর, জেদ করে ও গানের চর্চা জিইয়ে রেখেছে এখনও। শরীরের ওপর তার ধকলও পড়ে।

না হলে সংসারে তো ওর কোনও অভাব নেই। ওর স্বামী, শান্তনু, একজন অধ্যাপক। ডিগ্রি কলেজে ইতিহাস পড়ায়। হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ নয় ওর। এখন মাইনেপত্রও ভাল হয়েছে। একধরনের আদর্শবাদী। নানা সভা-সমিতির সঙ্গে যুক্ত। তাই ওর অবসর কম। বাড়ির তিনঘর-ভরতি বই। সারা জীবনের সঞ্চয়। যতটুকু অবসর পায়, বইপত্র পড়ে কাটায়। এই ঢাকুরিয়ার বাড়িখানা পৈতৃক। তিনতলা। সামনে খানিকটা বাগান। তাতে কয়েকটা স্থায়ী রঙ্গন আর টগর গাছ। ধারে ধারে দোপাটি ফুটেছে এখন। এই গাছপালার জন্যেই নীচের তলাটা একটু অন্ধকার মতো। সেখানে রান্না, ভাঁড়ার আর চাকর বাকরদের থাকার ব্যবস্থা। একখানা ঘর তালা দেওয়া থাকে। শান্তনুর ছাত্র বা বাইরের কোনও অতিথি থাকতে এলে ওই ঘরখানা খুলে দেওয়া হয়। শান্তনু প্রাইভেট টুইশন বা কোচিং ক্লাস করে টাকা রোজগার করা পছন্দ করে না। উপার্জন আর জীবনকে আলাদা করে দেখে।

ভাস্বতীকে সংসারের কোনও কাজ করতে হয় না। তিনজন কাজের লোক আছে। একজন গেলে আর একজন আসে। থাকার জায়গা পায়, কাজের স্বাধীনতা পায়। পরিশ্রম কাউকেই খুব বেশি করতে হয় না। ছুটিছাটায় দুই ছেলে হস্টেল থেকে বাড়ি এলে তাদের দেখাশোনা করতে হয়। সেটা এমন কিছু নয়। ওদের সয়ে গেছে। ভাস্বতী স্বামীর সুখ-সুবিধের দিকে নজর দেয়। আর থাকে নিজের গানবাজনা নিয়ে। সেই ব্যাপারে কেউ কেউ বাড়িতে আসে মাঝে মাঝে। কখনও কখনও গানের আসর বসে বাড়িতে। দোতলার বড় ঘরটায় ফরাশ বিছিয়ে। হারমোনিয়ম, তবলা, তানপুরা, সব বাড়িতেই আছে। সেই সব দিনে শান্তনু একটু বেশি উৎসাহ দেয় বউকে। আসরে বসে গান শোনে তো বটেই। অতিথি

নির্বাচন, নিমন্ত্রণ, তাদের অভ্যর্থনা—সব বিষয়েই দায়িত্ব নিয়ে ভাস্বতীকে সাহায্য করে। রেডিয়োর প্রোগ্রাম থাকলে বা কোনও সভায় গান গাইবার আমন্ত্রণ থাকলে, ভাস্বতীর সঙ্গে যায় শান্তনু। তবে, পেশাদার আর্টিস্ট বলতে যা বোঝায়, ভাস্বতী তা নয়, যদিও আকাশবাণীর খাতায় ওর দর যাকে বলে বি-হাই।

তোমার কী চেহারা হয়েছে, বলাতে ভাস্বতী একটু থমকে গেল। বাড়ির কেউ তো এ-কথা কখনও বলেনি। সেই মুহূর্তে ওর মনে হল পম্পা খুব সুখী। ওর চেয়ে বেশি সুখী। দূর থেকে দেখেও তাই মনে হয়েছিল।

কতদিন পরে দেখা। পনেরো—তা পনেরো বছর তো হবেই। শৈলজারঞ্জন—মাস্টারমশাই তখন বেঁচে, গান তুলতে কালীঘাটে তাঁর ক্লাসে গেছে এক রবিবার, সেখানেই বোধহয় শেষবার দেখা হয়েছিল পম্পার সঙ্গে। ভাস্বতীর তখন বিয়ে হয়ে গেছে। পম্পার হয়নি। সেখানেই বোধহয় বিয়েব কথা জিজ্ঞেস করায় পম্পা বলেছিল, আমাব বর মোটরগাড়ি চড়ে আসছে না, আমেরিকা থেকে প্লেনে চড়ে বিয়ে করতে আসছে। শুনেছি খুব বড়লোক। কেমন ভয় ভয় করছে রে।

সেই বিয়েতে ভাস্বতী যায়নি। বন্ধুরা অনেকেই খবর পায়নি, নেমন্তন্ন পায়নি। পনেরো দিনের ছুটিতে এসে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করে বউ নিয়ে চলে গেছে নতুন বর। অজন্তা ছিল পম্পার বেশি ঘনিষ্ঠ, সম্পর্কে কী রকম আত্মীয়, তার মুখে এই খবর অনেক পরে শুনেছিল ভাস্বতী। তার মুখেই আরও অনেক পবে শুনেছে পম্পার ফিরে আসার খবর। তখন ওর কষ্ট হয়েছিল।

শাড়ি কেনার কথা একদম ভুলে গিয়ে দুই বন্ধু গল্প জুড়ে দেয়। কিন্নরীর কর্মী খানিকক্ষণ অপেক্ষা কবে কাঁথাস্টিচ শাড়িগুলো আবার ভাঁজ করতে থাকে। ওরা আস্তে আস্তে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে।

বাইবে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে।

ভাস্বতী জিজ্ঞেস করে, তোমার খবর কী বলো। ভেবেছিল, জিজ্ঞেস করবে, কতদিনের জন্যে ইন্ডিয়ায় আসা? যেন ওর ডিভোর্সের খবর জানে না, এমনটা ভান করবে। পারল না।

পম্পা বলল, আবাব বিয়ে কবেছি।

সে তো সিঁদুর দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

ভাবছ, কী বেহায়া! একবার ঠেকেও শিক্ষা হয়নি, তাই না?

ও মা, তা কেন ভ'বব? সরল গলায় ভাস্বতী বলে, আজকাল তো কতই হচ্ছে এ রকম। আমার হলে আমিও করতাম।

তারপর একটু থেমে বলে. আমাকে অবশ্য কেউ বিয়ে করত কিনা সন্দেহ। পর পব দুটো বাচ্চা হয়ে শরীরটা পড়ে গেছে। তুমি কত সুন্দর আছ।

পম্পা এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর বলে, সে-কথা নয়। যথেষ্ট হয়েছে, আর ও-পথ মাড়াব না, আমিও ভেবেছিলাম। চার বছর চুপচাপ ছিলাম, জানো। একটা কেজি স্কুলে চাকরি নিয়েছিলাম। কিন্তু ইন্দ্রনীল এসে এমন করে ধবল, সে একেবারে নাছোড়বান্দা, আমি আর না করতে পারিনি।

বলতে বলতে একটা কালো রঙের মারুতি এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়।

পম্পা বলে, এসো না আমার সঙ্গে। আমার বাড়িতে। কতদিন পরে দেখা, অনেক কথা জমে আছে। দু'জনে মিলে একটু মনের কথা বলাবলি করি।

কোথায় থাকো তুমি?

বেশি দূরে নয়। লাভলক প্লেস।

ভাস্বতী ঘড়ি দেখল। পৌনে বারোটা। বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে না? আজ কী বার?

মঙ্গল।

তা হলে ঠিক আছে। খানিকক্ষণ কিন্তু। বেশিক্ষণ না। বাড়িতে বলে আসিনি। ওরা ভাববে। ওরা মানে মাসি, হাসি আর রতন।

গিয়ে একটা ফোন করে দিয়ো না হয়।

ভাস্বতী বলল, আমাদেব বাড়িতে ফোন নেই।

গাড়িতে উঠে বসার পর পায়ের কাছে একটা বাকস দেখে পম্পার মনে পড়ে যায়, ডবল ডেক বেকর্ডারটা তুলে নিতে হবে। বারোটার সময় দেবে বলেছে। আসলে ওটা নেবার জন্যেই বেরোনো।

হাতে সময় ছিল, তাই কিন্নরীতে ঢোকা।

পম্পা বলল, কিছু মনে কোরো না ভাই। একটু ঘুরে যাব। একটা জিনিস মেরামত করতে দিয়েছি। তুলে নিয়ে যাব দোকান থেকে। রেডি করা থাকবে।

দোকানের সামনে গাড়িটা দাঁড়াবার পর পায়ের কাছ থেকে পিচবোর্ডের বাকসটা তুলে পম্পা ড্রাইভারের হাতে দেয়। তারপর দু'জনেই গাড়ি থেকে নেমে যায়। মিনিট পনেরো পরে ওরা ফেরে। ভাস্বতী দেখল, সেই বাকসয় ঢোকানো একটা বিশাল কালো মতন যন্ত্র। বাকসটার গায়ে বড় বড় ছাপার অক্ষরে কী সব লেখা। খুব ভারী নয়। বাকসসুদ্ধ যন্ত্রটা ড্রাইভার নিজের বাঁ পাশে রাখে খুব সাবধানে।

কী ওটা?

পম্পা বলল, ডবল ডেক স্টিরিয়ো রেডিয়ো রেকর্ডার। বম্বে থেকে আনতে গিয়ে কোথাও চোট লেগেছিল। ঠিক চলছিল না। মাঝে মাঝে আটকে গিয়ে ভোঁ ভোঁ শব্দ হত। বিদেশের তৈরি জিনিস তো ভাই, এখানে সারানো ভারী ঝঞ্ঝাট। এরা বলল, পারবে। দেখি গিয়ে—

ভাস্বতীব বাড়িতে হারমোনিয়ম আছে। সেটা এর চেয়েও বড়ো আর ভারী। ফিলিপসের একটা ছোট রেডিয়োও আছে। কোনওটাই এত দামি নয়। তবে কাজ চলে যায়।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের পেছন দিকে একটা সরু রাস্তায় ঢুকে খানিক এঁকেবেঁকে গিয়ে গাড়িটা একটা মস্ত বহুতল বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকল। পম্পা গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল লিফটের দিকে। একটু পেছনে ভাস্বতী। ড্রাইভার জিনিসটা নিয়ে পরে আসবে।

তিনতলায় উঠে প্রকাণ্ড একপাল্লা দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে পম্পা বেল টিপল না। হাতব্যাগ থেকে চাবি বাব করে দরোজা খুলল। ভেতরে ঢুকে সুইচ টিপে ফটফট করে কয়েকটা আলো জ্বালাল। ভাস্বতী দেখল, এক প্রশস্ত হলঘর, দেয়াল থেকে দেয়াল অবধি নীল কার্পেট দিয়ে মোড়া। তিন-চারটি দ্বীপপুঞ্জের মতো গদি মোড়া ফার্নিচাব। কাচের আলমারি—তার মধ্যে হাজার রকমের নাম-না-জানা আসবাব। মনে হল, বাড়িতে কেউ নেই।

তখনই কোথা থেকে ছুটে এসে একটা ছোট্ট সাদা রঙেব লোমওলা কুকুর ঝুমঝুম শব্দ করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পম্পার গায়েব ওপব।

পম্পা আদর কবে ডাকল, লাকি, লাকি।

ভাস্বতীকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল পম্পা। ভাবটা, নিভৃতে কথা বলার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা ওটা। আসলে, ওটা ওর নিজের ঘব। দেয়ালে বড় বড় আয়না গাঁথা। পাশাপাশি গাঁথা আলমারি, শেলফ, শোকেস। জানলার দিকে মোটা পবদা টাঙানো।

ভাস্বতী একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের কাজের লোক নেই?

না। পম্পা বলে, লোক মানেই ঝামেলা। ইন্দ্রনীল বলে, এক-একজন মানুষ এক-একটি সমস্যাব বান্ডিল। দরকার কী? এখন মেশিন হয়েছে। যা চাও, মেশিন করে দেবে। তা ছাড়া, আজকাল যা খুন-ডাকাতি চলছে কলকাতায়, লোক রাখা বেশ বিপজ্জনক।

ভাস্বতী আবার সরল মনে জানতে চায়, তোমাদের ছেলেপুলেও নেই?

না ভাই। পম্পা হাসতে হাসতে বলে, ওই ব্যাপারটা আমেরিকায় গিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম। কেউ ছেলেপুলের ঝামেলায় যেতে চায় না। জন্ম দিলেই তো শুধু হয় না, বলো, মানুষ করতে হয়। নিজেদের জীবন উপভোগ করা শিকেয় তুলে আদর্শ বাবা-মা সেজে থাকতে হয়। সে অনেক স্যাক্রিফাইস। ইন্দ্রনীলের প্রস্তাবে যখন রাজি হলাম, তখনও ওকে দিয়ে শর্ত করিয়ে নিয়েছি : বাচ্চা চাইবে না। আমার শরীর তো মানুষ তৈরির কারখানা নয়। আমি সুস্থ থাকতে চাই, ফ্রি থাকতে চাই।

ভাস্বতীর মনে হয়, সত্যি। সংসারের বন্ধনে ও বড় বাঁধা পড়ে গেছে। আর একটু যদি ফ্রি থাকা যেত। কী রকম সে ফ্রিডম, তার স্পষ্ট ধারণা ওর নেই।

আরেকটা কথাও আমি ভেবেছি।

পম্পা ফিশফিশ করে বলে, ইন্দ্রনীল না আমার চেয়ে বয়েসে ছোট। বিয়ে হয়ে আমি যখন ব্লুমিংটন যাই তখন ও ওখানে পি.এইচ.ডি করছে। আমাদের বাড়িতে ছুটিছাটায় আসত। আমার টানেই আসত। ক্রমশ আমার ভেঙে পড়া ও স্বচক্ষে দেখেছে। একটা ড্রাগ অ্যাডিক্টের পাল্লায় পড়ে আমার কী নির্যাতন, দেখে ও বলত, একটি বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে আনলেই ও শুধরে যাবে না, আমি জানতাম, শুধু

তারই সর্বনাশ হবে। কিন্তু কী করব? তোমার ঠিকানা জানলে তখন উড়ো চিঠি দিয়ে সাবধান করে দিতাম। তোমাকে তো চিনতাম না।

দেশে ফিরে এসে বম্বেতে চাকরি পেল। আমায় খুঁজে বার করল। আমাকে উদ্ধার করল বলতে পারো। এখন আমারও তো কর্তব্য, ওকে খুশি রাখা। বলো? ওর ভালবাসার কী যে দাপট, তুমি ভাবতে পারবে না ভাস্বতী। জানি না, কতদিন আমি পারব। মেয়েরা তো তাড়াতাড়ি বুড়ি হয়ে যায়। আমি না, কিছুতেই নিজেকে বুড়ো হতে দেব না।

কথায় কথায় বেলা বেড়ে যায়।

পম্পা বলে, দাঁড়াও। লাঞ্চটা বানিয়ে ফেলি। তোমার চান হয়েছে?

ভাস্বতী মিথ্যে কথা বলতে পারে না। বলে, ঠিক আছে।

না, না। ঠিক আছে কী? তুমি আমার বাথরুমে চলে যাও। গিজার আছে। টাব আছে। শাওয়ার আছে। তোমাকে একটা ফ্রেশ টাওয়েল দিই। একটা শাড়ি দিই।

চান করে বেশ আরাম হল ভাস্বতীর। বাথরুম যে শুধু শরীর পরিষ্কার করার জায়গা নয়, মন চাঙ্গা করার জায়গাও, এই প্রথমবার উপলব্ধি করল সে। দেয়াল-জোড়া আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। ছত্রিশ বছর বয়েসেই বেশ ঝুলে গেছে শরীর। কেমন বেঢপ লাগল নিজেকে। ওই বাথরুমেই ওর চোখে পড়ে, কত ছবি টাঙানো আছে। সব খুশির ছবি। যেন সিনেমা হলের করিডর। বড় বড় ফটোগ্রাফ। তার মধ্যে পম্পা আর ইন্দ্রনীলের যুগল ছবিও। ইন্দ্রনীলের মাথায় টাক, তবে মুখটা বেশ কচি কচি। ভাস্বতীর মনে হল, শান্তনু, ওর বর, বয়েসে ইন্দ্রনীলের চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড়, অধ্যাপনা করে মুখটা পেকে গেছে, তবে মাথায় টাক নেই। ভাগ্যিস। কাঁচা-পাকা চুলে ওকে বেশ সম্ভ্রমযোগ্য মনে হয়। যে বয়েসের যা, তাই তো হওয়া উচিত। ভাস্বতী দেখেছে, পম্পার বাথরুমে চুলে কলপ দেওয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থা আছে। তা হলে, চুল পেকেছে ওর। ভাস্বতীর তো পাকেনি এখনও।

কোণে ওটা কী? ওজন নেবার যন্ত্র। উঠে দাঁড়াল কী ভেবে। আটচল্লিশ কেজি। মাত্র!

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ভাস্বতী দেখে, পম্পাও চান সেরে অন্য একটা শাড়ি পরেছে। হলঘরের কোণের দিকে দাঁড়িয়ে কী নিয়ে খুটখুট করছে।

এখন তুমি রান্না চড়াবে নাকি?

পম্পা বলে, দেখো না, কী মজাটা করি।

তারপর ডিপ ফ্রিজ খুলে দুটো প্লাস্টিক-মোড়া প্যাকেট বার করল। খুলে ঢালল একটা প্লেটে। ফ্রিজ থেকে সেদ্ধ আলু, টম্যাটো, বিন আনল। আরেকটা কী যন্ত্র টিপে নানা রকমের সস, মশলা ফোঁটা ফোঁটা করে ছড়াল তাতে। কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা গুঁজে দিল।

হঠাৎ ভাস্বতীকে জিজ্ঞেস করল, তুমি পোর্ক খাও তো?

পোর্ক মানে তো শুয়োর। কখনও খাইনি বাবা।

তা হলে চিকেন নিই। বা মাটন। যা তোমার ইচ্ছে।

ভাস্বতী কী ভেবে বলে, দাও আজ পোর্কই খাই। কী আর হবে।

প্লেটের ওপর সবকিছু জমা হলে পর একটা মেশিনের মধ্যে ঢেলে দিল সেটা। মাখামাখি হয়ে বেরিয়ে এল একটা মণ্ড মতন। সেই মণ্ড আবার আরেকটা বাসনে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল ছোট একটা ইলেকট্রিক খাঁচায়। খাঁচা বন্ধ করে বোতাম টিপে দিতেই ভেতরে বাসনখানা ঘুরতে থাকে, যেভাবে গ্রামোফোন যন্ত্রে রেকর্ড ঘোরে।

পম্পা বলল, এটা মাইক্রোওয়েভ। সাত মিনিট লাগবে। যেমনকার তেমনই জিনিসটা রান্না হয়ে যাবে।

এইসব করছে যখন, তখনই দেয়ালে টাঙানো একটা ব্যাঙের মতো জিনিস পিক পিক করে বেজে ওঠে।

লাল টিপের মতো আলো জ্বলে আর নেবে। পম্পা ওটা তুলে এনে কানের কাছে রাখে। হ্যালো।

ভাল আছি।

....

খাবার বানাচ্ছি। একজন বন্ধু এসেছে, দুজনে মিলে খাবো।

....

হিঃ হি। হ্যাঁ বাপু, মেয়ে বন্ধু। অনেকদিন পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

... .

হ্যাঁ। সারাই হয়েছে। নিয়ে এসেছি। তোমার ফেরার প্রোগ্রাম—

....

ও কে। কী আর করব। লাকিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকব। হিঃ হি।

....

—আচ্ছা আচ্ছা বাবা, হয়েছে। সব বুঝতে পারছি। এয়ারপোর্টে গাড়ি যাবে।...উঁ...হুঁ...হামি।

পম্পা ভাস্বতীর দিকে চেয়ে বলে, এই হলেন আমার বাবু। সব সময় এইদিকে মন। জোহানেসবার্গ গেছে আপিসের দরকারি কাজে। মিটিং থেকে বেরিয়ে ফোন। ওখানে সকাল সাড়ে ন'টা, এখানে দুপুর একটা, অতএব খোঁজ নিতে হয়, খেয়েছি কিনা। বলল, দুবাই হয়ে ফিরব, তোমার জন্যে একটা সোনার চেন আনব। ভাবলাম বলি, কেন, ভালবাসার চেনে বিশ্বাস হয় না? সোনা দিয়ে মুড়তে হবে কেন? আর বললাম না। মনে কষ্ট পাবে। অত ভেবে চিন্তে তো কথা বলে না। যা মনে হয়, বলে ফেলে বেচারি।

সাত মিনিট হতেই লাল টিপের মতো আলো জ্বলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ঘোরা। পাল্লা খুলে বাসনটা বার করে আনে পম্পা। ধোঁয়া উঠছে। আঃ, কেমন সুগন্ধ বেরিয়েছে বলো। আমি বিরিয়ানি বানাতেও জানি, দেখলে তো।

ভাস্বতী বলে, আমি রান্নাবান্না সব ভুলে গেছি।

কী নিয়ে থাকো?

গান। বাজনা। অজয় চক্রবর্তীর কাছে ক্লাসিকাল শিখি।

ও ব্বাবা। ওঁর তো এখন খুব নাম। আমিও মডেলিং করি অবশ্য।

কেজি স্কুলেব চাকরিটা—

ছাড়তে হল। বম্বে চলে গেলাম না। তারপর কলকাতায় ফিরেছি এই দেড় বছর আগে। ইন্দ্রনীলকে বললাম, আবার লেগে যাই। আমার হাতখরচটা অন্তত রোজগার করি। ও বলে, তোমার স্কুল যত দেবে, আমি তার ডবল দেব। তুমি চাকরি করবে না। অন্য কিছু করো যাতে স্বাধীনতা আছে। আমি তো ফ্রিলান্স করি। এতে কাজ কম টাকা বেশি। টিভি-তে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন থাকে প্রাইম টাইমে। ওটা আমি। তুমি টিভি-তে প্রোগ্রাম করো না?

কল পেলে করব। তবে আমি রেডিয়োয় কাজ করে বেশি স্বস্তি পাই।

পম্পা বলল, আজকাল রেডিয়ো আর কে শোনে—এত রকম গ্যাজেট বেরিয়ে গেছে।

ভাস্বতী কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছে। আট হাজার, দশ হাজার, পঁচিশ হাজার এক একটার দাম। শান্তনু বলে, বড়লোকেদের খেলনা। টিভি-ও কি তাই? এখন তো ঘরে ঘরে টিভি। ওদের টিভি নেই। থাকলে প্রাইম টাইমে শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনটা দেখতে পেত। ওদের ফ্রিজও নেই। গিজার নেই। ওয়াশিং মেশিন নেই। দশ মিনিট মাত্র সময়ে কী সুন্দর বিরিয়ানি রান্না করল পম্পা। সে তো মাইক্রোওয়েভটা ছিল বলে। ভারী তৃপ্তি করে খেল ভাস্বতী। কাঁটা চামচ সরিয়ে রেখে হাত দিয়েই খেল।

পম্পা বলল, ডেসার্ট কী খাবে? আইসক্রিম খেতে আপত্তি আছে? তোমার তো আবার গানের গলা।

সারা ঘরটার গুনগুন গুনগুন করে সুর বাজছে। পম্পা বলল, ওটা চ্যানেল মিউজিক। মন ভাল রাখে। ওটা না থাকলে বোরডমে মরে যেতাম। এ-সি চলছে কোথাও পরদার আড়ালে, না হলে এই গুমোট গরমে পাখা ছাড়া ওরা থাকতে পারত না। ভাস্বতী কেমন মুগ্ধ, মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুখে ভাসছে, নিজের ওপরে যেন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই কিছু না ভেবেই বলল, আইসক্রিম কি বাড়িতে বানিয়েছ?

পম্পা বলল, না, ক্লাব থেকে আনা। ডিপ ফ্রিজে ঠিক থাকে।

তোমার সেই কুকুরটি কোথায় গেল। কী যেন নাম? ঢোকাব সময় দেখলাম, তারপর আর দেখছি না?

কে, লাকি? ও নিজের বিছানায় শুয়ে আছে। বাবুর কুকুর তো। বাবু যখন আমাকে পায় না, তখন ওকে চটকায়। আমাকে ও হিংসে করে, ভাবতে পারো? এই যে তুমি এসেছ, তোমাকে অ্যাটেন্ড করছি,

তাতেও হিংসে! থাক উপোস করে।

এবার আমি যাই।

একসময়ে ভাস্বতীকে বলতেই হল। ভেতর থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সব পরদা দিয়ে ঢাকা। নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, ওমা, চারটে বাজে! এত দেরি হত না, যদি খাওয়ার পরেই চলে যেত। পম্পা জোর করল, আজ মঙ্গলবার, তোমার কর্তা নিশ্চয় দেরিতে ফিরবেন, একটু ভিডিয়ো দেখে যাও। আমাদের সময়কার মন মাতানো ছবি—রোমান হলিডে—তার ক্যাসেট আছে। তা-ও দেখল, দু'জনে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে, সলটেড পেস্তা খেতে খেতে। সত্যি, পম্পা খুব সুখী।

কী উদার ব্যবহার পম্পার! এই ঘোরের মধ্যে ভাস্বতী ছিল এতক্ষণ। রাস্তায় পা দিয়ে মনে হল, পম্পা ওকে ঐশ্বর্য দেখাবার জন্যে নিয়ে যায়নি তো? ভাবনাটা মনে জাগতেই চেপে দিল ভাস্বতী। ছি, ওভাবে নিতে নেই। বলল তো, ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়েছে, থাকতে বলা হয়নি, না হলে গাড়ি করে বাড়িতে পৌঁছেও দিত। চাকুরিয়া তো? ফোন নাম্বারটা? ভাস্বতী আবার বলেছে, আমাদের ফোন নেই। বরং তোমার নাম্বারটা দাও। আমি যোগাযোগ করব। আমাদের বাড়ির কাছেই এখন অনেক বুথ হয়েছে।

একটা মিনিবাস ধরে ভাস্বতী বাড়ি ফিরে আসে।

আমাদের একটা ফোন অবধি নেই!

রাত্রে স্বামীকে সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা জানাবাব পর অভিমান করে বলেছিল ভাস্বতী। চুপ করে শুনেছে শান্তনু।

তারপর বলল, এতদিন তো মনে হয়নি তোমার? আজ অপরেব বৈভব দেখে কষ্ট হচ্ছে? ওটা কি খুব দরকাবি জিনিস, একবার ভেবে দেখো তো। যার তোমাকে দরকার, সে তোমার কাছে আসবে। তোমার যাকে দরকার, তুমি তার কাছে যাবে। নয়তো চিঠি লিখবে। দু'দিন-তিনদিনে চিঠি পৌঁছে যায়। এত তাড়াহুড়ো কীসের? এখুনি ইচ্ছে হল, আর তখুনি কথা বলতে হবে! এতে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। ধৈর্যশক্তি কমে যায়। ওই যে গ্যাজেটগুলো দেখে এসেছ, সবকিছুর উদ্ভব হয়েছে সময় বাঁচাবার জন্যে, তাই না? আচ্ছা বলো তো, ওই যে সময়টা বাঁচে, সেই সময় আর কোন কাজে লাগে?

একবার ভেবে দেখো, শান্তনু বউকে বোঝায়, ওদের বাড়িতে এত সব ব্যবস্থা তো, একটা কাজের লোক নেই। আমাদের তিনজন কাজের লোক। তার মানে, আমরা কি বোকা? অন্য মানুষদের নিয়ে ঘর করি, অন্য মানুষদের পরিশ্রমে নিজেদের আরাম কিনি, সেটা কি বেশি আনন্দের নয়? মেশিন কি মানুষের বিকল্প? মানুষকে যারা সমস্যার বান্ডিল মনে করে, গ্যাজেটগুলোকে ভাবে স্টেটাস সিম্বল, তারা অসভ্য। অটোম্যাটিকের ধারণাটাই অলীক।

শান্তনুর কথার সুরে কোনও রাগ নেই। সে ইতিহাসের অধ্যাপক। সে সভ্যতার ক্রমবিকাশ উপলব্ধি করে। তাই নিয়ে সমালোচনা করে। সে মানুষের ভোগবাসনার ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করেছে। নিজের বিশ্বাস থেকে কথা বলে, তাই বিশ্বাসযোগ্য শোনায়।

একবার ভেবে দেখো, আমাদের বাড়িতে দু'বেলা বাজার হয়, দু'বেলা রান্না হয়। আমরা টাটকা খাবার খাই। ওরা বড় বড় মেশিনের মধ্যে বাসি খাবার রেখে অনেকদিন ধরে ব্যবহার করে। কী সুখ এতে? তুমি নিজে গান করো। আমাদের বাড়িতে যখন গানের আসর হয়, লোকে জ্যান্ত মানুষের গলায় গান শোনে। জ্যান্ত মানুষের হাতে বাজনা শোনে। ওরা মেশিন ঘুরিয়ে মরা গান, পচা ছবি উপভোগ করতে অভ্যেস করেছে। তা করুক, যার যা ইচ্ছে করুক। আমার আপত্তি হল এই জন্যে যে, এর মধ্যে গর্ব করার কিছু নেই। বরং ওদের লজ্জিত হওয়া উচিত। ওরা অক্ষম, ওরা অসুস্থ। ওরা বিভ্রান্ত। আচ্ছা, তুমি একটা কথা বলো তো, ভাস্বতী, শান্তনু একটু থেমে বলল, ওই কার্পেট-মোড়া ফ্ল্যাটে তুমি একটাও বইয়ের তাক দেখেছ? এদিকে-ওদিকে ছড়ানো বই দেখেছ? পত্রিকা? খবরের কাগজ? ডিকশনারি?

না।

বাড়ির আনাচেকানাচে কোনও ফুলগাছ দেখেছ?

না।

একটা মানুষ, একটা মানুষী, আর একটা কুকুর। বাকি সব মেশিন। এই নিয়ে সংসার। নব ঘুরিয়ে কেবল এ-ওকে চটকাচ্ছে। বাইরের জগত বলতে ওদের উপার্জনের জগত। আর ক্লাব, মানে মদের আড্ডা। আর কোনও বোধ নেই। এই কি জীবন?

এবার চুপ করে থাকতে না পেরে ভাস্বতী বলে, ভালবাসা আছে। ওই ইন্দ্রনীল ভদ্রলোক পম্পাকে পাগলের মতো ভালবাসে।

বেশ। শান্তনু শুয়ে শুয়ে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল বউয়ের দিকে।

বলল, পাগলের মতো না হলে তুমি যখন বুঝতে পারো না, তা হলে এবার থেকে আমিও পাগলের মতো ভালবাসব। মাসি দেখবে, হাসি দেখবে, রতন দেখবে। আমার ছাত্রছাত্রীরা এসে দেখবে। তোমার আচার্যদেব এসে দেখবেন। তোমার তবলচি দেখবে, মাস্টারবাবু তাঁর আর্টিস্ট বউকে এত ভালবাসেন যে, কখনও কাছ ছাড়া করেন না। পুতুলের মতো সব সময় কোলে নিয়ে খেলা করেন।

এবার হস্টেল থেকে যখন বাড়ি আসবে অমিত আর রাজীব, তুমি যেন ওদের দিকে মন দিয়ো না। তুমি আর আমি শোবার ঘরে দরোজায় খিল দিয়ে থাকব। এই রকম সুখ তুমি চাও, তা আগে বলবে তো।

মশারির মধ্যে ভাস্বতী স্বামীর খোলা হাতখানা নিজের জামা-পরা বুকের ওপর বিছিয়ে দিতে দিতে স্তিমিত স্বরে বলল, অনেক হয়েছে। এবার থামো।...আমি কিন্তু একদিন পম্পাকে নেমন্তন্ন করব।

সেদিন বাড়িতে গানের আসর বসবে।

সেদিন ছেলেবা বাড়িতে থাকবে।

সেদিন মাসি, হাসি আর রতন—তিনজন মিলে সারাদিন ধরে পরিশ্রম করে অনেক পদ রান্না করবে।

সেদিন তুমি আর আমি দূরে দূরে থাকব। যেন কেউ কাউকে চিনি না। ভালবাসার কথাবার্তা যা হবে সব চোখে চোখে। মনে মনে। গানের সুর আর খাবারের সুগন্ধের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে। কেমন?

আর মেশিন বলতে সেদিন চলবে শুধু হারমোনিয়ম, তানপুরা আর ডুগি-তবলা। মানুষের হাত না লাগলে যা থেকে সুর ফোটে না।

১৯৯৬

❀ সেতু

অনুরূপ বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। লম্বা, রোগাটে চেহারা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। মুখে দু'দিনের না-কামানো দাড়ি। পরনে রং-ওঠা জিন্‌স আর সাদা টি-শার্ট। পায়ে ধ্যাবড়া পাওয়ার শু। বয়েস কুড়ি-একুশ। চারমিনারে শেষ টান দিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে দেয়, তারপর জুতো দিয়ে চেপে ঘষে দেয় ওটাকে। যেন একটা পোকা মারছে। ওর কাঁধে একটা বস্তা।

এবার বেল টিপল। বাড়ির কাজের লোক সুধার মা এসে দরজা খুলে দেয়। ওর দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে বলে, এসো।

কোনওদিকে না তাকিয়ে অনুরূপ সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। কাঁধের ব্যাগটাকে বিছানার ওপর পটকায় সজোরে যেন ওটা একটা বোমা। জুতো জোড়া পা থেকে খুলে কিক মেরে পাঠিয়ে দেয় আলমারির নীচে। আবার যে ও-দুটো টেনে বার করতে হবে, খেয়াল নেই। তারপর বিছানায় গড়িয়ে নেয় কিছুক্ষণ।

শুয়ে শুয়েই কবজি উলটে দেখল, এগারোটা দশ। এই সময়ে ঠিকে ঝি-টা আসে। ঘরদোর ধোয়া-মোছা করে, ও জানে। তারপর কাপড় কাচে। কী মনে হল, অনুরূপ তড়াক করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। ব্যাগটাকে কাছে টেনে আনল। চেন খুলে তার মধ্যে থেকে বার করল দুটো গেঞ্জি আন্ডারওয়ের, রুমাল। দলা পাকিয়ে সেগুলো রেখে এল বড় বাথরুমের বালতিতে।

সুধার মা রান্নাঘর থেকে জিজ্ঞেস করল, কিছু খাবে?

ওমলেট আর দুটো টোস্ট।

এরপর নিজের ঘরের দরজা ভেজিয়ে কী সব করতে থাকে, কেউ জানে না। দরজা ফাঁক করে উঁকি দিলে দেখতে পাওয়া যেত, ও নিজেব টেবিলের কাগজপত্র ঘাঁটছে। ড্রয়ার থেকে বার করছে একটা একটা করে রঙের বাকস, ব্রাশ, ড্রইং কাগজ, বোর্ড, অসম্পূর্ণ কিছু আঁকাজোকা। পেড়ে আনছে শেলফ থেকে আর্ট শেখার বই। বিশ্ববিখ্যাত সব শিল্পীদের ছবির অ্যালবাম। বোতল থেকে জল ঢালছে গেলাসে। গেলাসের মধ্যে ব্রাশ ডোবাচ্ছে। এই ওর শখ। বিজ্ঞানের ছাত্র, এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে কলকাতার বাইরে গেছে। হস্টেলে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ বাড়ি চলে আসে। দু'-দিন-তিন দিন বাড়িতে থেকে আবার চলে যায়। ওর চালচলনে কেমন আঠাছাড়া ভাব। এখন দূরে থাকে বলে নয়, উচ্চ মাধ্যমিক অবধি তো এই বাড়িতে, এই ঘরেই কাটিয়েছে অনুরূপ, তখনও এই ভাবটা ওর মধ্যে ছিল। ও যেন এ-বাড়িব কেউ নয়। ও যেন অবাঞ্ছিত এক অতিথি। চন্দ্রা বলে, এই বয়েসের ছেলেমেয়েরা খুব বেশি অ্যাটেনশন চায়, না পেলে অভিমান করে। এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।

টোস্ট এবং ওমলেট খেয়ে জঠরের জ্বালা শান্ত হলে পর অনুরূপ হাঁক দেয়: বাড়িতে কেউ নেই? ভাবটা, এতদিন পর বাড়ি ফিরলাম। আমায় কেউ সংবর্ধনা জানাচ্ছে না কেন?

সুধাব মা এবার তার শাড়ির ময়লা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সে-ও তো ছেলেপুলের মা, অনুরূপের দিকে মিষ্টি করে তাকিয়ে বলে, ভাল আছ দাদাভাই? আজ তো কাজেব দিন, তোমার মা-বাবা কাজে বেরিয়েছে। দিদিভাই আছে। চানটান করছে বোধহয়। তুমি আর কিছু খাবে?

খানিকটা সুস্থ হয়ে অনুরূপ বলে, এখন না। আমি একটু বেরুব। লন্ড্রিতে কাপড় দেব। দুটো প্যান্ট দিয়েছি, আনতে হবে। তারপব সেলুনে গিয়ে দাড়ি কামাব। একটু আড্ডা দিয়ে একটা নাগাদ ফিবে ভাত খাব। কেমন? আমার ভাত আছে তো?

আবার একটু হেসে সুধার মা বলল, কুলিয়ে যাবে। ঠাট্টা করে বলা।

না হলে অতিরিক্ত একজনের খাবার বানাতে এমন কী পবিশ্রম লাগে। ফ্রিজেব মধ্যে প্লাস্টিকের ঠোঙায় মুবগিব মাংস আছে। একটা বেগুন ভেজে দেবে। খানিকটা গোবিন্দভোগ চালের ভাত ফুটিয়ে দেবে চটপট।

বলল বটে বেবোবে। কিন্তু অনুরূপ নিজের ঘরের মধ্যেই বসে রইল। টেবিলেব ওপর ছড়ানো আঁকার জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওর চোখে পড়ল একটা ড্রইংয়ের খাতা। তার মধ্যে পাতায় পাতায় আঁকিবুকি। পেনসিল স্কেচ। আগের বার এসে মানুষের নানান অঙ্গভঙ্গি ধরাব চেষ্টা কবেছিল, সেগুলো খাপছাড়া অবস্থায় ছড়িয়ে আছে ওই খাতায়।

স্কুলে পড়ার সময় যার কাছে ও ছবি আঁকা শিখতে যেত, সেই অনিলদা বলতেন, তোমার হাত ভাল। ছবি আঁকার অভ্যেসটা যেন ছেড়ো না। এ এমন এক ব্যাপার যাতে আর কাউকে ইনভলভ করতে হয় না। সামনে প্রকৃতি পড়ে আছেন। তাঁকে দেখো, খুব খুঁটিয়ে দেখো, দেখবে কত রহস্য তাঁর মধ্যে। কোনও গাছ আরেকটা গাছের মতো না। কোনও পাতা আরেকটা পাতার মতো না। আকাশে মেঘের ডিজাইন মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। বিশেষ করে শরৎকালের আকাশ। প্রকৃতির রচনায়, রং বলো, রূপ বলো, অদ্ভুত এক সামঞ্জস্য আছে। হারমনি—মানুষ কিছু না বুঝে হারমনি নষ্ট করে। দেখো না, এই শহরে ওই যে চৌকো চৌকো অট্টালিকাগুলো উঠছে, তার সঙ্গে পরিবেশের কোনও মিল নেই। কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে থাকে একরাশ খোপ। মানুষের বানানো মানুষের বাসা। তুলনা করো একটা পাখির বাসার সঙ্গে, মৌমাছির চাকের সঙ্গে, উইটিবির সঙ্গে, দেখবে কী নিখুঁত তাদের কাজ। কী পরিপাটি। ওদের কোনও মাস্টার লাগে না। হাজার হাজার বছরের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা ওদের জিনে থাকে।

অনিলদা বলতেন, নাচ, গান, বাজনা চর্চা করতে হলে অপরকে জড়িয়ে ফেলতে হয়। তাই না? পাশের ঘরের লোক, পাশের বাড়ির প্রতিবেশী বিরক্ত হতে পারে। হস্টেলের ঘরে একজন ছাত্র যদি বাঁশি বাজাতে বসে, বেসুরো না হলেও দেখবে, সহপাঠীরা তার পেছনে লাগছে। আঁকা আর লেখা চুপচাপ করা যায়। ভুল করো, ভুল সংশোধন করো, পরীক্ষা নিরীক্ষা করো—তুমি আর তোমার খাতা। ওইখানেই সব সংগ্রাম। ওর মধ্যেই সব আনন্দ আর ব্যর্থতা। নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই। জগৎ সংসারের সঙ্গেও নিজের লড়াই।

এই কথাটা খুব মনে ধরেছিল অনুরূপের। সেই সময়, ছ'বছর, সাড়ে ছ বছর আগে, ওর বাবা-মায়ের যখন বিচ্ছেদ হয়। বিচ্ছেদের আগে, সম্পর্কের মধ্যে যখন ঠিক আগুন জ্বলে ওঠেনি। ধোঁয়া বেরোচ্ছে মাত্র—মনোমালিন্য থেকে তর্কাতর্কি, থেকে বিবাদ, একজনকে আর একজন সহ্য করতে পারছে না; দরজা বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করছে, তখন থেকেই অনুরূপ টের পেয়েছে কোথাও দুই সমবয়সি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে, শ্রেষ্ঠতার প্রতিযোগিতায় একটা অবধারিত ভুল হচ্ছে অঙ্কে। এই রকম ভুল হওয়া উচিত নয়। ওর খুব কষ্ট হত তখন। শূন্যের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করত, আবার যেন সব ঠিক হয়ে যায়। শুয়ে শুয়ে কাঁদত। মাকে, বাবাকে—কাউকেই দোষী করতে পারত না। দু'জনেই ওর প্রিয়জন যে। কাকে ছেড়ে কাকে রাখবে। ওই সময়টায় ওর প্রধান সঙ্গী হয়ে উঠেছিল ছবি। ছবি আঁকা। প্রকৃতির ছবি আঁকা। যেখানে ঘর্ষণ নেই।

আজ, এতদিন পর, সেই কষ্ট ওর সহ্য হয়ে গেছে।

মায়ের বাড়ি থেকে সরে এসেছে বাবা। আর একজন মহিলাকে বিয়ে করেছে। ক্রমশ বুঝতে পেরেছে, এই ভদ্রমহিলা, যার নাম চন্দ্রা, এ-ই মা আর বাবার বিচ্ছেদের কারণ। তখন নাবালক ছিল, প্রতিপালক হিসেবে বাবা ওকে এ-বাড়িতে নিয়ে আসে। বাবার আশ্রয়ে, বাবার অর্থসাহায্যে ও বড় হচ্ছে। এখনও ও স্বাবলম্বী নয়। বাবাকে ওর দরকার। তবে নিজের মাকে ও ত্যাগ করতে পারেনি। প্রথম প্রথম এই বাড়ি ওর অসহ্য মনে হত। কুঁকড়ে থাকত সব সময়। চন্দ্রাকে ও মা বলে ডাকতে পারত না। হস্টেলে গিয়ে পরে ও স্বস্তি পেয়েছে। এখন কোনও কোনও ছুটিতে ও নিজের মায়ের কাছে যায়। সেটা ওর মামার বাড়ি। ওখানে মায়ের জন্য একখানা ঘর আছে অবশ্য। মা প্রাইমারি স্কুলে সামান্য একটা চাকরি করে। সেদিক থেকে মা কারুর গলগ্রহ নয়। অনুরূপের ইচ্ছে, বড় হয়ে, স্বাবলম্বী হয়ে, মাকে ও নিজের কাছে নিয়ে রাখবে। অবসর নেওয়ার পর মামাদের ওপর যেন আর নির্ভর করতে না হয়। তারা কেউই খুব বড়লোক নয়। ছাপোষা মানুষ। অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে অক্ষম।

অনুরূপ হয়তো জানে না বা জানতে চায় না যে, চন্দ্রার জীবনেও দুঃখ আছে। বহুগামী স্বামীকে সে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। নিজের দিক থেকে ওর কোনও খামতি যে ছিল, তা নয়। ওর স্বাস্থ্য ভাল, ও দেখতেও সুশ্রী। চন্দ্রা চেয়েছিল, একমাত্র কন্যাসন্তান শিখাকে নিয়ে ওর সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আসুক। কিন্তু পবিত্র নামের স্বামীকে ও পবিত্র রাখতে পারেনি। সে অধ্যাপক, সে প্রাজ্ঞ শিক্ষক। সে সমাজের বুদ্ধিজীবী স্তরের মানুষ। কিন্তু ছাত্রীদের সম্পর্কে অত্যন্ত দুর্বল। অনেক সময় চন্দ্রা ভেবেছে, যৌনজীবনে পবিত্রকে সে তৃপ্ত করতে পারছে না, এমন নয় তো? কিন্তু সে তো তার স্বামীর কোনও ইচ্ছেই অপূর্ণ রাখে না। তবে কেন সে অন্য নারীর পেছনে ঘোরে? চন্দ্রার অনুপস্থিতিতে তাদের কাউকে-না-কাউকে বাড়িতে নিয়ে আসে নানা ছলে। মেয়েরাও পরীক্ষায় ভাল ফল পাবার আশায় পবিত্রর জালে পড়ে। আশা করে, অমূল্য কোনও সম্পদ ওর কাছ থেকে পাবে, যা আর কোনও ছাত্রী পাবে না। তার জন্যে একটু স্বার্থত্যাগ করতে হলে ক্ষতি কী। তাদের যুক্তি, কেরিয়ারই সব। অল্পবিস্তর স্পর্শে নারীশরীর চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যায় না। কিন্তু একটা ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি চিরদিনের সম্পদ।

একদিন ধরা পড়ে যাওয়ার পরে পবিত্র নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমেই চন্দ্রা ছাত্রী মেয়েটিকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বলে, চরিত্র বিক্রি করে ডিগ্রি নিতে এসেছ? লজ্জা করে না! তুমি নিশ্চয় ভদ্রঘরের মেয়ে। উচ্চশিক্ষা পেতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছ। এই কি তার নমুনা? ছি, ছি!

মেয়েটি ভয় পেয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

তখন চন্দ্রা পবিত্রকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কী চাও?

পবিত্র নির্লজ্জভাবে বলেছিল, আমি ভোগ করতে চাই।

আমাকে দিয়ে তোমার ভোগ-বাসনার তৃপ্তি হয় না?

না। তোমার শরীর আমার কাছে পুরনো হয়ে গেছে।

চন্দ্রা এই কথা শুনে কেঁদে ফেলেছিল। বলেছিল, শরীরই সব? ভালবাসা কিছু নয়?

পবিত্র বলেছিল, ভালবাসা একসময় ফুরিয়ে যায়।

শিখার বয়েস তখন মাত্র ন'বছর। বড়দের জৈব সমস্যা বোঝার ক্ষমতা নেই তার। তবু, আর কাউকে না পেয়ে ওই কচি মেয়ের কাছেই চন্দ্রা তার দুঃখের কথা জানায়। অপমানের কথা জানায়। মেয়ের সামনে শরীর খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, দ্যাখ তো, আমি বুড়ি হয়ে গেছি?

শিখা আতঙ্কে মায়ের শরীরের দিকে তাকাতে পারেনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে-ও কাঁদে। জগৎ সংসারের কাণ্ডাকাণ্ড বিষয়ে ওর কোনও ধারণা নেই। তবু, সেইদিন, মায়ের কষ্টে কষ্ট পেয়ে সে বলেছিল, চলো মা, আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

চন্দ্রা বলেছিল, আমি এর প্রতিশোধ নেব।

সেই প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে মেয়ের হাত ধরে একদিন চন্দ্রা এ-বাড়িতে প্রবেশ করেছিল। দুই ভাঙা সংসার এসে জোড়া লেগেছিল এখানে। ছ'বছর, সাড়ে ছ'বছর আগে। অনুরূপ চন্দ্রাকে মা বলে ডাকতে পারে না। কিন্তু শিখা বিজনকে অবলীলায় বাবা বলে ডাকে। নিজের বাবার প্রতি এত ঘৃণা সে সঞ্চয় করেছে ন'বছর বয়েস থেকে। আজ পনেরো বছর বয়েস পার করে ওর ইচ্ছে করে, কেউ ওকে ভালবাসুক।

আঁকার টেবিলে বসে ক্রমশ অস্থির আর বিরক্ত হয়ে উঠছে অনুরূপ। কখনও ক্রেয়ন ঘষছে কাগজে। কখনও সরু করছে পেনসিলের শিস। ব্রাশ দিয়ে রঙের রেখা টানছে। হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না। প্রকৃতি আঁকার দক্ষতা সে রপ্ত করেছে অনেক দিন আগে কিন্তু মানুষ আঁকতে গিয়ে পড়েছে মুশকিলে। বিশ্ববরেণ্য সব শিল্পীর অ্যালবাম খুলে দেখছে কনটুর আর জেসচারের বাঁকগুলো। আপাতচোখে খুব সহজ মনে হয় কিন্তু প্রাণ সঞ্চারিত হয় না। দিকপাল সব আঁকিয়েরা বলে গেছেন, শুধু চোখ দিয়ে নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মডেলকে দেখো। ছুঁয়ে দেখো, টিপে দেখো, হাত বুলিয়ে দেখো। তবেই তার মধ্যে গতি আনতে পারবে। অনুরূপকে অনিলদা বলতেন, রবীন্দ্রনাথ ড্রইংয়ের প্রশিক্ষণ পাননি বলে শেষ বয়েসে যখন কলম ছেড়ে রং-তুলি ধরলেন, ব্রাশ টেনে টেনে বিষণ্ণতা ফোটাতে চেষ্টা করলেন, লোকে বলল, আহা, দেখো, সারাজীবনের কষ্ট, রাগ, ক্ষোভ ফুটে বেরোচ্ছে। তখনও তিনি হাতের মুঠো পায়ের পাতা আঁকতে পারেন না। অনিলদা বলতেন কনটুর আঁকার সময় কাগজের দিকে তাকিয়ো না, বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো। খুঁটিয়ে দেখো, মানুষ শরীরে হারমনি কোথায়। মাথার সঙ্গে পিঠ, পিঠের সঙ্গে পা, হাতের দুই ডানা আর পাছার আকৃতির মধ্যে অঙ্ক আছে, খুঁজে বার করো। হাড় আর পেশি কেমন জড়াজড়ি করে রয়েছে পুরুষে, মেদ নারীতে। বিষয়বস্তুকে একটি অবস্থান থেকে লক্ষ করো—কী নয়, কেমন দেখতে—না। দেখো বিষয়বস্তু, কী করছে, কীভাবে করছে। বসা মানুষটা খুশি না বিবক্ত, অলস না ক্লান্ত, ফুটিয়ে তোলো। অনুভব থেকে প্রাণ আসবে।

গভীর অস্বস্তির মধ্যে অনুরূপ অত্যন্ত বিচলিত। হঠাৎ ও লক্ষ কবল প্যাস্টেলের বাকসটা টেবিলে নেই। এ কী? কোথায় গেল ওটা? টেবিলের বাঁ দিকের কোণেই তো ছিল। ওই অবস্থায় অত্যন্ত রেগে ও চেঁচিয়ে ওঠে, আমার প্যাস্টেল কোথায়? আমার প্যাস্টেল? কে নিয়েছে আমার রঙের বাকস?

কেউ সাড়া দেয় না।

তখন ও উঠে দাঁড়ায়। সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজে। নেই। এঘর-ওঘর খুঁজে বেড়ায়। একসময় ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। আর তখনই ওর চোখে পড়ল, শিখা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে টিপ পরছে। ওর পরনে একটা ডোরাকাটা তোয়ালে, খালি-গা, চুল এলিয়ে রয়েছে বাঁ কাঁধের ওপর থেকে বুকের ওপর। ডান হাতের তর্জনী দুই ভ্রূর মাঝখানে।

দপ করে জ্বলে উঠেছিল অনুরূপ। এই দৃশ্য দেখে হঠাৎ দপ করে নিবে গেল। এ ও কী দেখছে?

শিখা একটুও না চমকে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে? এত চেঁচাচ্ছ কেন?

আমার প্যাস্টেল। অনুরূপের গলায় তখন আর জোর নেই।

আমি নিয়েছি। দিচ্ছি। একটু দাঁড়াও।

অনুরূপ বলে, আরে, কী সুন্দর তুমি। কী পারফেক্ট!

আজ প্রথম দেখলে?

হ্যাঁ। তোমাকে আঁকব। তুমি এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকো প্লিজ। নড়বে না। আমি খাতা পেনসিল নিয়ে আসি।

ফিরে এসে দেখে, শিখা দাঁড়িয়ে নেই। কোমরে জড়ানো তোয়ালেটা দূরে ফেলে দিয়েছে। হাঁটু মুড়ে বসে আছে। মুখখানা ডান কাঁধের ওপর আলতো করে রাখা। দুটো হাত এমনভাবে হাঁটুর নীচে জড়িয়ে ধরা, যে উরুর পাশ থেকে ওর নগ্নতা ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু শরীরটা রেখায় রেখায় স্পষ্ট। বগলের নীচে অল্প কয়েকটা রোম।

শিখা, আমি তোমায় আঁকি। কিছু মনে করবে না তো?

শিখা খুব শান্ত স্বরে বলে, আঁকো। আমি ঠিক যেমনটি।

একটু ঘুরে বসবে?

না। আমি ঠিক যতটা দেখাতে চাই, ততটাই তুমি দেখবে। তার বেশি না। বাকিটা কল্পনা করে নাও। আঁকা হয়ে গেলে দেখব, আমি সত্যি সুন্দর কিনা। মায়ের চেয়ে সুন্দর কিনা। দেখতে চাই, আয়না আমায় ঠকাচ্ছে, না ঠকাচ্ছে না।

ঘরটার মধ্যে আবছা আলোছায়া। শিখা মেজের ওপর বসে আছে। চৌকাঠ পার হয়ে অনুরূপ ঘরের ভেতর ঢুকে এল। ভেজিয়ে দিল দরোজা। ওর মুখোমুখি পুবের জানলায় অর্ধেক পরদা টানা। ওইখান থেকে অল্প আলো আসছে ঘরের মধ্যে।

খাটের ওপর বসে খুব নিবিষ্টভাবে অনুরূপ শিখার দিকে নয়, শিখার শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকে। উত্তেজনায় ওর হাত কাঁপছে। কিন্তু সে উত্তেজনায় কাম নেই। কেবল এক খুদে শিল্পীর ব্যাকুলতা। ও কি পারবে? শিখাকে কাগজে তুলে আনতে পারবে কি? ঠিক যেমনটি?

একবার মনে হল, এই শিখা কি ওর বোন? এই শিখা কি ওর বন্ধু? না, ও কেবল একটি মডেল। এতদিন উপযুক্ত একটি প্রাণী মডেলের অভাবে ওর ছবি আঁকার কাজে কিছুতেই আবেগ সঞ্চারিত হয়নি। আজ এখুনি আঙুলের কাঁপন থেমে গেলেই পেনসিল চালাবে অনুরূপ। তারপর ওর মায়ের চেয়ে অনেক বেশি টাটকা শরীর নিয়ে, প্রেরণা নিয়ে শিখা ওর আয়ত্তে আসতে বাধ্য। অনুরূপ অনুভব করে এইমাত্র ও নারীশরীরের হারমনি আবিষ্কার করেছে। গাছ, ফুল, ফল, পাতা, আকাশ—এদের সঙ্গে শিখার আব কোনও তফাত নেই।

১৯৯৭

জলভ্রমি

দিন চারেক কলকাতার বাইরে ঘুরে আসার পর কাউকে সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বলার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে অভিজিৎ। প্রথমে ভেবেছিল, খবরের কাগজে চিঠি লিখবে। জনসাধারণকে সাবধান করে দেবে। কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসে দেখল, কিছুতেই জমানো যাচ্ছে না। রোমহর্ষক বৃত্তান্তটা কেমন ছানা কেটে যাচ্ছে।

এই রকম টালবাহানায় কয়েকটা দিন কেটে যায়। ক্রমশ অভিজিতের মনে হতে থাকে, ঘটনার স্মৃতি ওর নিজের মনেই আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এরপর হয়তো একেবারে মুছে যাবে। তখন এক রবিবার ও সোজা চলে এল বেলেঘাটা মেন রোড থেকে ঢাকুরিয়ার সেলিমপুর রোডে রাহুলদার বাড়ি। রাহুলদা ম্যাচিওর মনের মানুষ। একসময় পত্রিকা চালাতেন। ব্যাপারটা উনি ঠিক বুঝবেন।

জুলাই মাস। ঘোর বর্ষাকাল। মাঝে মাঝেই তেড়ে বৃষ্টি আসে। বিশেষ করে দুপুরের পরে পশ্চিম দিক থেকে ভাসতে ভাসতে কালচে মেঘ এসে কলকাতার মাথায় ওপর ছাতার মতো দাঁড়িয়ে যায়। বিপদ টের পেয়ে কাকেরা চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। কিছুক্ষণ গুমট চলার পর আরম্ভ হয়ে যায় প্রবল বেগে যাকে বলে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টি। দুঃখের দিনের মতো যেন শেষই হতে চায় না। তারপর যথেষ্ট ভোগান্তি ঘটিয়ে, দুঃখের দিনের মতোই একসময় বৃষ্টি থেমে যায়। ছাতা বন্ধ করে তখন বাবুরা, বিবিরা ছপছপ শব্দ করতে করতে বাড়ি ফিরে আসে। আকাশে তারাও দেখা যায়।

অভিজিৎ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। দেয়াল লিখন মুছে ফেলার পর দেয়ালের মতো চেহারা। ঘষা ঘষা। কালচে, নীলচে, সাদাটে দাগ। কখনও কোনও বদ মতলব ছিল

বলে মনে হয় না। তবু, ওকে বিশ্বাস করা যায় না, ভেবে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে ফোলডিং ছাতাটা ভরে নিল।

রাহুলদা মন দিয়ে ওর বৃত্তান্ত শুনলেন। লক্ষ করলেন, বলতে বলতে অভিজিতের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। আসলে অভিজিৎ গল্প থামিয়ে মাঝে মাঝে ডান হাতখানা তুলে বলছিল এই দেখুন, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

বৃত্তান্ত বলা শেষ হয়ে গেলে পর অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, রাহুলদা, আমি কি কাওয়ার্ড? আমি আর কী করতে পারতাম? ওই ডিভিসি এলাকায় চারদিক শুনশান অন্ধকার। কাছেপিঠে কোথাও জনবসতি নেই। শুধু জল আর জল—বাঁধে আটকানো জল ভরতি টইটম্বুর। একটা বিরাট জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা, তার মাঝখানে ওই ছোট্ট টুরিস্ট লজ। নীচে তিনখানা ঘর। ওপরে তিনখানা ঘর। নীচের ডবল বেড রুমটায় আমি আর রেখা। পাশে একটা স্টোর মতন ঘুপচি। তার ওদিকে ওই মনোরঞ্জন নামের কেয়ারটেকার লোকটা একা শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

আপনি ভেবে দেখুন রাহুলদা, আমাদের সবচেয়ে কাছে যে ঘরটা, সেটা হল-মতো। তাতে চারজন বয়স্ক লোক এসে উঠেছে। সবাই পুরুষ। সারাদিন ধরে তারা মদ খাচ্ছে আর বার বার খাবার আনাচ্ছে। সন্ধের পর তারা ক্লান্ত। জেগে থাকলেও আচ্ছন্ন অবস্থা। তার ওদিকে ডাইনিং রুম, কিচেন। রাত্তিরে ফাঁকা—জানি না, ফাঁকা ছিল কি না।

দোতলার সমস্ত ঘরগুলো জুড়ে, আপনি ভেবে দেখুন রাহুলদা, এসে উঠেছে একদল ছোকরা সরকারি চাকুরে। চার আর দুয়ে ছয় আর চারে দশজন। তারা আরও বেপরোয়া। ভাবছে, এই বাংলো ওদের সম্পত্তি। এই চারদিকে ঘেরা লন আর বাগান ওদের সম্পত্তি। সমস্ত ডি.ভি.সি-টাই ওদের জিনিস। সকালবেলা ওদের দু'-একজনকে নীচের তলায় গামছা পরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি আমি। আমাদের ঘরের দিকে টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছিল। কান পর্যন্ত জুলপি, কালো ঘন গোঁফ। বিকেল থেকে ওরাও মদ খাওয়া শুরু করেছে। আর গান বাজাচ্ছে। চিৎকার করছে। নীচের তলায় লোকেরা বয়স্ক, তা ছাড়া পাশের ঘরে একজন মহিলা আছে, সে বিষয়ে সচেতন। বলতে গেলে, ওই সমস্ত এলাকায় অতগুলো পুরুষের মধ্যে রেখা—আমার বউ—একমাত্র মেয়ে। যুবতী। আমার ভয় করবে না? আমার দুশ্চিন্তা হবে না, বলুন? সেদিন বিকেলবেলা আবার রেখা দারুণ সেজেছিল। ওকে ষোলো বছরের মেয়ের মতো দেখাচ্ছিল। আমরা দু'জনে ড্যামের ওপর অনেকক্ষণ দৌড়োদৌড়ি করেছি। খেলা করেছি। ওর শাড়ির নীল আর হলুদ রেশমি আঁচল হাওয়ায় উড়ছিল। ওকে দেখাচ্ছিল প্রজাপতির মতো। আমি বাড়িয়ে বলছি না রাহুলদা। ওরাও দেখেছে।

রাহুলদা এবার ডিটেকটিভের মতো আড়চোখে অভিজিতের দিকে তাকালেন।

বললেন, ওখানে কোনও সিকিউরিটি গার্ড ছিল না?

ছিল হয়তো। কিন্তু অনেক দূরে। হয়তো ঘুমোচ্ছিল ওরা। এমনও হতে পারে, ওরাও ছিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

রাহুলদা হঠাৎ জানতে চাইলেন, তোমার ভূতের ভয় আছে? ভূত বিশ্বাস করো?

একেবারেই না। বিয়ের আগে আমি অত্যন্ত ডেয়ার ডেভিল প্রকৃতির ছিলাম। অনেক বিপজ্জনক জায়গায় একলা চলে গেছি। একটুও পা কাঁপেনি। ভূত আমার পুত।

খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন রাহুলদা। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ঘরে যখন প্রথমবার ধাক্কা পড়ল, তখন ক'টা বাজে?

ঠিক বলতে পারব না। তবে বারোটা টারোটা হবে।

শুধু দরোজায় ধাক্কা। কী রকম ধাক্কা? লাথি মারার মতো? না, টোকা?

দুমদাম লাথির শব্দ। মনে হচ্ছিল, দরোজা ভেঙে যাবে। ছিটকিনি খুলে যাবে।

কোনও চিৎকার? কারুর গলা শোনা গেছে?

না।

তুমি বেরিয়ে না এসে, চ্যাঁচামেচি না করে, ঘরের টেবিলটা চেপে ধরলে দরোজার ওপর। রেখাকে বললে খাটের নীচে গিয়ে লুকোতে। কেন?

সত্যি কথা বলব রাহুলদা? আমার প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল, ওরা রেখাকে রেপ করবে। ভেতর থেকে আমি চিৎকার করেছি। বার বার ডেকেছি—মনোরঞ্জন! মনোরঞ্জন।

আসেনি ও?

এসেছে অনেক পরে। তখন আর শব্দ নেই। আমি বলেছি, কে আমাদের দরোজায় অমন করে ধাক্কা মারছিল? ও বলল, আমি তো কিছুই শুনিনি। আমি বলেছি, শোনোনি? পাশের ঘরে থেকেও শুনতে পাওনি? এত শব্দ হচ্ছিল, বুঝি দরোজা ভেঙে যাবে। আমি কতবার চিৎকার করে ডাকলাম। ও বলে, আপনার ডাক শুনেই তো এলাম। কই, কোথাও তো কেউ নেই। ওর মুখ থেকেও মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল। এটা প্রথমবার।

তোমার মনের ভুল নয়? স্বপ্নটপ্ন দেখে ভয় পাওনি তো? এমনও হয় কিন্তু।

রাহুলদা, আমি একা নই। রেখাও তো আমার সঙ্গে ছিল। দ্বিতীয়বার যখন ধাক্কা পড়ল, তখন শুধু দরজা নয়, জানলাতেও, ভাগ্যিস গ্রিল ছিল জানলায়। রেখা বলল, তুমি বেরোবে না। বেরোলেই তোমাকে মেরে ফেলবে ওরা।

রাহুলদা হেসে ফেললেন। বললেন, তুমি ভাবছ ওরা রেখাকে রেপ করবে, ওকে বাঁচাতে চাইছ। আর রেখা ভাবছে, ওরা তোমাকে খুন করবে। ও তোমাকে বাঁচাতে চাইছে। কিন্তু তোমরা কেউই সাহস দেখিয়ে এগিয়ে গেলে না?

আমরা যে নিরস্ত্র।

তবু তোমরা দু'জন ছিলে। ঘরে কোনও লাঠিফাটি ছিল না? যা নিয়ে রুখে দাঁড়ানো যায়?

দরোজার একটা হুড়কো ছিল। কাঠের। খাটের ছতরি ছিল। সরু সরু। ওদের সঙ্গে ভোজালি, রিভলভার থাকলে কী করে ঠেকাতাম?

রাহুলদা আবার একটু চুপ করে রইলেন। মনে মনে হয়তো অনুভব করলেন, বিপদের মধ্যে পড়লে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। মানুষ নার্ভাস হয়ে গেলে তার পক্ষে উচিত কাজ করা সম্ভব হয় না। সারাদিন ধরে অভিজিৎ আর-সব পুরুষ বোর্ডারদের উদ্দাম আচরণ করতে দেখেছে। দোতলায় মদ খেয়ে হুল্লোড় করেছে যুবকের দল। বাইরে উন্মুক্ত বাগানে, লনে, ড্যামের ওপর ছুটোছুটি করেছে। বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজেছে। উচ্চস্বরে গান গেয়েছে, গান বাজিয়েছে। মধ্যরাত্রে এদের কারুর মনে দুষ্টবুদ্ধি জাগতেই পারে।

অভিজিৎ বলছে, সেদিন বিকেলে রেখাও নাকি খুব সেজেছিল। মাথার বেণী দুলিয়ে, আঁচল উড়িয়ে মেতেছিল খেলায়। ওদের সঙ্গে কোনও বাচ্চাকাচ্চা নেই। এমনও মনে হয়ে থাকতে পারে ওই সব যুবকদের যে, এই মহিলা অভিজিতের বিবাহিতা স্ত্রী নয়। ফুর্তি করার জন্যে আনা কোনও সঙ্গিনী। ফুর্তিই যদি আসল ব্যাপার হয়, তবে তা থেকে ওরাই বা বাদ পড়ে কেন?

কিন্তু অভিজিৎ একবার দরোজা ফাঁক করে, বা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে, দেখার চেষ্টা করলে পারত—কে বা কারা ওদের ভয় দেখাচ্ছে এমন করে। এমনও তো হতে পারে যে, মনোরঞ্জন একাই গোলমাল করছিল। ওটা ওর অভ্যেস। অনেকে আছে না, কারুর ওপর রাগ ঝাড়তে না পেরে দেয়ালে লাথি মারে!

রাহুলদা জিজ্ঞেস করলেন, মনোরঞ্জনকে তোমার সন্দেহ হয় না? সে অবশ্য ভিরু প্রকৃতির মানুষ এক কেয়ারটেকার—তার চাকরি যাবার ভয় আছে, সে অমন নির্বোধের মতো ব্যবহার করবে না। যতই মদ খেয়ে থাকুক।

নিজেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, সবসুদ্ধ কতবার এই উৎপাত হয়েছিল সেই রাত্রে?

অভিজিৎকে কষ্ট করে স্মরণ করতে হল না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, পাঁচবার। ধরুন, আধঘণ্টা পর পর। প্রত্যেকবারই আগের বারের চেয়ে বেশি প্রবলভাবে। একবার আমি শব্দ থেমে যাবার পর টর্চ নিয়ে বেরিয়েছিলাম। রেখার কথা শুনিনি। তবে ওকে দরোজা বন্ধ করে রাখতে বলে বেরিয়েছি।

দেখি অন্ধকার, সব শুনশান। কে বলবে, খানিক আগে লাথির ঘায়ে দরোজা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ড্যামের ওপরে লাইটপোস্টগুলো টিমটিম করছে। ঝিঁঝি ডাকছে। ব্যাঙ ডাকছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে জলের কলকল শব্দ। আকাশে তারা নেই। ওই অন্ধকারে জলের মধ্যে কাউকে ফেলে দিলে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দেখলাম, মনোরঞ্জনের ঘরের দরোজা আধখানা ভেজানো। ভেতরে আলো জ্বলছে। কিন্তু লোকটা ঘুমোচ্ছে। পাশ ফিরে নাক ডাকাচ্ছে। আমি ঠেলা মেরে ওকে জাগালাম। ও ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আমার কথা শুনে আবার যেন আকাশ থেকে পড়ল লোকটা। টুরিস্ট লজে এমন কাণ্ড কখনও হয়নি। আমি তখন ওকে বাইরের বাগানে নিয়ে গিয়ে জানলার ভাঙা কাচ দেখালাম। বললাম, সিকিউরিটি গার্ডকে ডেকে আনো।

ও তখন বলল, এই কাচটা ভাঙাই। আপনি ভয় পাবেন না বাবু। আপনারা শুয়ে পড়ুন গিয়ে। আমি দরোজার বাইরে বিছানা নিয়ে গিয়ে শুচ্ছি। তখন রাত দেড়টা। তারপর আর উৎপাত হয়নি। অভিজিৎ বলল, রেখা বিছানায় বসে রাগে গরগর করছিল। আমি ওকে দুটো ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিলাম। রাগলে ওর চোখ দিয়ে জল পড়ে। ও খালি বলছিল, এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে আমাকে? তুমি একটা কাওয়ার্ড।

রাহুলদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে?

সাড়ে ছ'বছর।

বাচ্চাকাচ্চা হয়নি?

না। রেখার ইউটেরাসে গোলমাল আছে।

রাহুলদা বললেন, ধরো, তোমরা যদি ওই সময় দরোজায় টেবিল ঠেসে না দিয়ে, হাতে একটা কিছু নিয়ে রুখে দাঁড়াতে, কী হত তা হলে? তোমার কী মনে হয়? অন্তত কালপ্রিটকে শনাক্ত তো করতে পারতে।

অভিজিৎ বলল, আমার মনে হয়, ওরা প্রথমেই আমার মাথায় কিছু দিয়ে মেরে বা আমার পেটে ছুরিটুরি চালিয়ে ফেলে দিত। তারপর সবাই মিলে এসে রেখাকে ধরে নিয়ে যেত ওপর তলায়। রেখা আপত্তি করলে ওখানেই আমাদের ডবল বেডে শুইয়ে, চেপে ধরে, একজন একজন করে—ওঃ আমি এ-দৃশ্য ভাবতে পারছি না। আমি রেখাকে ভালবাসি।

রাহুলদা বললেন, দেখো, তোমার বউকে আমি চিনি না। তবে জানি, ও একটা সরকারি চাকরি করে। ও যদি বুদ্ধিমতী হয়, তা হলে সে-অবস্থায় একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়লে, বলত, ঠিক আছে, তোমরা যা চাইছ, তাতে আমি রা'জি। তবে একজনকে আমি নেব। তোমরা কে আসবে ঘরে, নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নাও। বাকিরা চলে যাও। কখনও কখনও বিপদে পড়লে বুদ্ধি খুলে যায় মেয়েদের।

এর দু'রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারত অভিজিৎ, তুখোড় গোয়েন্দার গলায় রাহুলদা বললেন, এতেই ওদের মধ্যে মারামারি লেগে যেত—কে রেখাকে উপভোগ করবে, তাই নিয়ে। তাতেই জেগে যেত আর সবাই। আর নয়তো, যে ওদের রিং লিডার, সে এগিয়ে আসত। আর সবাই পেছিয়ে যেত তারই নির্দেশে। কেউই নারীর ভাগ অপরকে দিতে চায় না। তারপর

—তারপর?

তারপর ওয়ান-টু-ওয়ান।

আমি মাটিতে পড়ে পড়ে তাই দেখতাম?

আহা, জ্ঞান থাকলে তুমিও উঠে এসে ওকে উচিত শিক্ষা দিতে পারতে। দু'জন মিলে ওকে পেটাতে। আর, জ্ঞান না থাকলে তুমি জানতেই পারতে না কী হল। রেপ করা অত সোজা নয় অভিজিৎ। মেয়েরা অনেক ট্রিকস জানে। বুদ্ধি থাকলে রেখা ওই রিং লিডারকে অনেকভাবে নাস্তানাবুদ করতে পারত, আমার মনে হয়।

অভিজিৎ তার ডান হাতখানা তুলে বলে, দেখুন রাহুলদা, আবার আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

কেন?

রেখাকে নিয়ে আমার অন্য ভয় আছে।

কী রকম ভয়? খুলেই বলো না।

আমি ওর জীবনে প্রথম এবং একমাত্র পুরুষ। আমি কাওয়ার্ড—এ-কথা ও আরও অনেকবার বলেছে। যদি আমার উলটো চরিত্রের একজন সাহসী বেপরোয়া পুরুষকে দেখে এক মুহূর্তের জন্যে ও দুর্বল হয়ে পড়ত, তা হলে? আমি পরে যতই আপত্তি করতাম, ওকে দোষ দিতাম, ও তো বলতই, তুমি

কাছে থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারলে না, এখন কোন মুখে কথা বলতে এসেছ? বলতে পারত, একটু লাইসেন্স দিয়ে আমি দু'জনের প্রাণ রক্ষা করেছি। এতে এমন কী ক্ষতি হয়েছে? তখন? তারপর থেকে আমাদের জীবন, সম্পর্ক, ভালবাসা কোথায় দাঁড়াত গিয়ে? আমি কি ওকে আর আগের মতো ভালবাসতে পারতাম? ওর কাছ থেকে ভিক্ষে পাওয়া জীবন নিয়ে কী করতাম আমি? আত্মহত্যা? এর চেয়ে কাওয়ার্ড হয়ে থাকা অনেক বেশি বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি।

রাহুলদা এবার মিটিমিটি হাসছেন। বললেন, কিছু মনে কোরো না অভিজিৎ, আমার ধারণা, পোকাটা তোমার মনে। ডি. ভি. সি. এলাকায় বেড়াতে গিয়ে ওটা বেরিয়ে পড়েছে। আচ্ছা, এবার বলো, পরের দিন সকালে কী হল? তুমি পুলিশে খবর দিয়েছিলে?

না।

ডি. ভি. সি.-র আপিসে গিয়ে রাত্রের দুর্ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলে?

না। পরের দিন ছিল বন্ধ। বাংলা বন্ধ। ফেরার কোনও উপায় ছিল না। ওই মনোরঞ্জনকে পঞ্চাশ টাকা ঘুষ দিয়ে আর একটা বাংলোয় উঠে গেছি। বন্ধের পরের দিন কলকাতায় ফিরেছি। মনোরঞ্জন বলেছিল, একটু হেঁটে গেলেই বিহার বর্ডার। ওখানে বন্ধ নেই। আপনারা ঘুরে বেড়িয়ে আসুন। আমি রাজি হইনি। বর্ডারের ওপারে বিহার একটা মাফিয়ার রাজ্য। ওই বাংলোয় শুয়ে-বসে দিনটা কাটিয়ে দিয়েছি। সত্যি, রেখার ওপর দিয়ে যা গেল, ও জীবনে ভুলবে না।

একটা সুযোগ এসে হাতছাড়া হয়ে গেল বলছ? রাহুলদা বললেন, জীবনে এমন সুযোগ কমই আসে।

সুযোগ? অভিজিৎ অবাক হয়ে বলে, কীসের সুযোগ রাহুলদা?

গোলমালটা ওব ইউটেরাসের না অন্য কিছুর জানার সুযোগ। এ-কথা শুনে তুমি যেন পাগল হয়ে যেয়ো না। রাহুলদা ইচ্ছে করে কড়া কথাটা বললেন, যাতে ও শক পায়।

অভিজিৎ ছাতার প্যাকেট হাতে নিয়ে উঠতে উঠতে বলল, পাগল আমি হয়েই গেছি বোধহয়। কলকাতায় ফিরে এসে আমি যতই রেখাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছি, ও বলছে, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? বন্ধের দিন আমাকে আপিসে আসতেই হবে। না হলে চার্জশিট দেবে, সরকারি সার্কুলার বেরিয়েছিল। আমি তোমার সঙ্গে গেলাম না। মনে পড়ে? তখন তুমি বললে, তা হলে আমি একাই ঘুরে আসি। খামোকা অ্যাডভান্সের টাকাটা নষ্ট করি কেন। মনে পড়ে? আর এখন একলা বেড়িয়ে ফিরে এসে আজগুবি গল্প শোনাচ্ছ? বলছে আর হাসছে। ওর হাসিটা কেমন অস্বাভাবিক।

অথচ আমার স্পষ্ট মনে আছে ওই বীভৎস রাত্রির অভিজ্ঞতা। বার বার পাঁচবার দরোজা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছে ওরা। রেখা কি সেটা ভুলতে চাইছে, না আমাকে ভোলাতে চাইছে, রাহুলদা? কে পাগল হলাম? আমি, না রেখা, আপনি বলে দিন।

১৯৯৬

❀ রাতকানা

অনেক বছর পরে সংবাদপত্রে একটা খবর পড়ে পুরনো ভাবনা আবার আবজে উঠেছে। খবরটা নিরুদ্দেশ হওয়া সংক্রান্ত। আপনারা সবাই পড়েছেন, তাই ঘটা করে বলতে চাইছি না। আর বলতেই যদি হয়, পরে না হয় বলা যাবে। কাগজের পাতায় অল্প একটু জায়গায় এমন নৈর্ব্যক্তিকভাবে সংবাদটির বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, তা থেকে কোনও ভাবাবেগ জাগায় না। ফুলল আর মরল—এই ধরনের। একটা লোক অসুখে পড়ে ঝাড়গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে হাসপাতালে ভরতি হয়েছিল। অনেকদিন আগে। তারপর হাসপাতাল থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। নাকি বলা উচিত, 'নিরুদ্দিষ্ট' হয়ে যায়। মানে,

ইচ্ছে করেই, কারুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নয়, খুন হয়ে নয়, পরিচিত সমাজ থেকে দূরে সরে যায়। তারপর পঁচিশ বছর পরে সে আবার স্বগৃহে ফিরে আসে। ঠিক ফিরে আসে না। ফিরে এসে মুখ দেখিয়ে আবার চলে যায়। এই খবরের কাগজে বিবৃত কাহিনীটির মধ্যে অনেক ফাঁকফোকর আছে। সেগুলির মীমাংসা না করলে এই অতিসরলীকৃত ঘটনা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। অন্তত, কারুর কাছে বলা উপযুক্ত মনে হচ্ছে না। এমনও হতে পারে, এটি আপাতসাধারণ নিরুদ্দেশের ঘটনা নয়।

বিহারের এক মফস্‌সল শহরে আমার শৈশব কেটেছে। ওই সময়, মানে ষাট-সত্তর বছর আগে এই রকম ছোট ছোট শহরে বিশ-পঁচিশ ঘর বাঙালি থাকত। এক-একটি বাড়ি এক একটি যৌথ পরিবার। স্থানীয় হিন্দিভাষী মানুষেরা প্রায় সবাই অশিক্ষিত, দু'-এক ঘর ব্রাহ্মণ ছাড়া। তাদের জীবিকা ছিল, হয় জমিদারি, মহাজনি, নয় কুলি খাটা। উকিল, মোক্তার, মুনসেফ, ডাক্তার আর মাস্টার লেখাপড়া-জানা এই সম্প্রদায় ছিল মূলত বাঙালি। কাছাকাছি চিনিকল থাকলে, তার কেরানিরাও বাঙালি থাকত।

অঙ্কটা খুবই সোজা। ব্রিটিশরা এদেশে ঢুকেছিল বঙ্গদেশ হয়ে। ইংরেজি শিক্ষাব প্রসার বঙ্গদেশেই শুরু হয়। তারপর খুব ধীরগতিতে ক্রমশ ভেতরের দিকে অগ্রসর হয়। ভাগ্য অন্বেষণে বাঙালিরা একটা দল কলকাতাব দিকে ঝুঁকে থাকে, আর একটা দল ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত গ্রাম ছেড়ে পশ্চিমে চলে যায়। কালক্রমে সেখানে জাঁকিয়ে বসে। আব সব শহরের মতো আমাদেব ওখানেও বাঙালিটোলা নামে বাঙালিদেব একটা আলাদা পাড়া ছিল। বাবুরা কাজে যেতেন, মহিলারা আবরুব মধ্যে থেকে ঘর-সংসার করতেন। কিন্তু প্রত্যেকের হাঁড়ির খবর প্রত্যেকেব জানা। অসুখে শুশ্রূষায়, বিবাহে উৎসবে, শ্রাদ্ধে শবদাহে একত্র। অন্য সময় নিজের নিজের। অন্য প্রদেশে বসবাস করলে কী হবে, ঐতিহ্যটা পুরনো, লৌকিক, গ্রাম্য।

আমার মা ছিল অন্য এক প্রবাস থেকে আনা পাত্রী। সেটা সমুদ্রতীবেব ওপর ছোট শহব। খোলামেলা। দেশের বহু প্রান্ত থেকে সারা বছব ধরে যাত্রীবা আসা-যাওয়া করত। মেলামেশা হত তাদের সঙ্গে। এ রকম এক যাত্রীর সঙ্গে পবিচিত হওয়ার পরে আমার দাদু সেই যাত্রীকে ধবে তাঁব তিন মেয়েকে রবীন্দ্রনাথের গান শেখান। তখন সেখানেও প্রকাশ্যে মেয়েদেব গান গাওয়ার খুব প্রচলন ছিল না। স্কুলে যাওয়া তো দূরের কথা। তবু টুবিস্টদেব কল্যাণে জাযগাটা বদ্ধ জলাশয় ছিল না। খোলা হাওয়া বইত।

সেখান থেকে বিহারের মফস্‌সলে আমার মা সংসার করতে আসে। বউ কেমন হল, দেখতে ছুটে আসে প্রতিবেশী মহিলারা। আগেই তারা কিছু কিছু খবব পেয়েছে জায়েদের কাছ থেকে। ধরে বসল, নতুন বউ, আমাদেব গান শোনাও। সরল মনে মা তাব শেখা গানগুলির মধ্যে থেকে বেছে একটা গান শোনাল। সেই গানের পদে 'প্রিয়' শব্দটির ব্যবহার ছিল। মেয়েমানুষের কণ্ঠে উচ্চস্বরে ওই অশ্লীল শব্দ শুনে সমস্ত বাঙালিটোলায় ঢি-ঢি পড়ে যায়। মা তো কেঁদেই আকুল। তোমরা জানতে দিদি, তবে আগে থেকে বলে দিলে না কেন! জ্যাঠাইমা বলেছিলেন, যা হয়েছে, হয়েছে, আর গেয়ো না।

তারপর আমার জন্ম হয়েছে। আমার বয়েস যখন চাব কি পাঁচ, এমন সময় একদিন বাড়িতে ফিসফিস, কান্নাকাটি শুনলাম। কী ব্যাপার, বুঝতে পারি না। বাড়িতে কেউ কিছু বলে না। শেযে প্রতিবেশীদের একটি বয়স্ক ছেলে আমায় একদিন ডেকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে তোর জ্যাঠা নিরুদ্দেশ হয়েছে বুঝি?

সেই আমার প্রথম নিরুদ্দেশ ব্যাপারেব সঙ্গে পবিচয়। এই ছিলেন, এই নেই। আমাদের যৌথ বাড়ির পুবদিক ঘেঁষে জ্যাঠাইমাদেব দু'খানা ঘব। তারই একটা খোলা জানলায় বসে জ্যাঠামশায় রোজ সকালবেলা রোগীদের ওষুধ দিতেন। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত বাচ্চা কোলে করে আর রোগের বিবরণ দিত। হোমিওপ্যাথির পুরিয়া জানলা দিয়ে গলিয়ে পাতা হাতের ওপর টপ কবে ফেলে দিতেন। রুগিকে ছুঁতেন না, রুগির নাড়ি দেখতেন না। আসলে জ্যাঠামশাই একেবারে ডাক্তারি জানতেন না তা নয়। একসময় কলকাতায় হস্টেলে থেকে মেডিকাল স্কুলে পড়তেন, কিন্তু পরীক্ষা পাশ করতে পারেননি। সেই যোগ্যতার জোরেই ডাক্তার হয়েছিলেন। গরিব দুঃখীদের মধ্যে নামডাকও হয়েছিল। আর, সবাই জানত হোমিওপ্যাথির কোনও দাম হয় না। ও বিনামূল্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁর রোজগাব বলতে কিছু ছিল না। তবে নিচুজাতের লোকেরা প্রায়ই ফল সবজি ঘি দুধ, মুসলমান রুগিরা লুকিয়ে লুকিয়ে মুরগির ডিম, ভেতর-বাড়ির উঠোনে দিয়ে যেত।

ওদের মধ্যে সিধুয়ার মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের সম্পর্ক ছিল বেশি অন্তরঙ্গ। ও আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসত ঘুঁটে সাপ্লাই করতে। তারপর মায়ের সঙ্গে অনেক সুখ-দুঃখের গল্প করে সন্ধেবেলা বাড়ি যেত। ওরা দোসাদ, আমরা জাতে ব্রাহ্মণ। ওরা গরিব, আমরা বড়লোক না হলেও সচ্ছল মধ্যবিত্ত। গ্রামের দিকে ঠাকুরদার কেনা জমিজমা আছে—সেখানে ধান, আলু আর আখ হয়। চাল বাড়িতে আসে, আখ বিক্রি হয়। গরমকালে গোরুর গাড়িতে করে আম আসে। আমরা সে-জমি দেখিনি, কেবল চাষের ভাগ পাই। রান্নাঘরে একসঙ্গে সারা পরিবারের রান্না হয়। রান্না করে এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর। তার গায়ে ইয়া লম্বা পইতে। সেই পইতে কানে জড়িয়ে ও ভোরবেলা ঘটি হাতে মাঠে যায়। ওর মাথার পেছনে ফাঁস দেওয়া টিকি। সে-ও যথেষ্ট গরিব, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলে আমাদের সমকক্ষ ছিল। মাংস-ডিম স্পর্শ করত না। নিবন্ত উনোনে কয়লা দিয়ে হাঁড়ি চাপিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেত। বাড়ির মহিলারা আমিষ রান্না করতেন। মাঝে মাঝে মাকে হাঁড়ি ঠেলতে দেখেছি। দেখেছি সিধুয়ার মাকে পুরনো শাড়ি দিতে। লুকিয়ে লুকিয়ে।

কার্যকারণ সম্বন্ধ ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না। তখন বুঝতাম না, ক্রমশ বুঝেছি যে, টানটা ছিল দু'দিক থেকেই। আমার বয়সি সিধুয়া—তার বাপ ছিল রাতকানা। মাঠ থেকে চাষকাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকার নেমে এলেই ও আর চোখে দেখতে পেত না। তখন আর কারুর কাঁধ ধরে ধরে দোসাদটোলায় আসত। জ্যাঠামশাই ওষুধ দিয়েছিলেন। তাতে ওর কোনও উপকার হয়নি। শেষে মায়ের দেওয়া ওষুধে ওর অসুখ সেরে যায়। কী ওষুধ দিয়েছিলে? মাকে জিজ্ঞেস করেছি অনেকবার, কিন্তু মা বলেনি। ও মন্ত্রতন্ত্র আছে, বলে এড়িয়ে গিয়েছিল। একদিন জ্যাঠামশাই আড়াল থেকে ডেকে বললেন, বউমা, তোমার রাতকানার ওষুধটা আমায় বলে দাও। বাড়ির মধ্যে ছোটলোক ব্যাটাছেলে ঢুকুক এ তো শোভা পায় না। শেষকালে দিদিমার কাছে শেখা মন্ত্র মা জ্যাঠাইমা মারফত জ্যাঠামশাইকে দিয়ে দেয়। মায়েব ভয় ছিল, মন্ত্র হস্তান্তর করলে হয়তো কাজ হবে না। তিনি বুঝিয়ে বললেন, হবে হবে। পানপাতার রসে ভিটামিন এ থাকে। ওটার অভাবেই এদের চোখের অসুখ হয়, জানো। আমি পান ছেঁচে রস করে শিশিতে ভরে রাখব। অনেকের উপকার হবে। তোমার পুণ্য হবে।

সিধুয়ার বাপের চোখ সারিয়ে দেবার অনেক আগে আমার শিশুবয়সে, মায়ের যখন খুব অসুখ করেছিল, তখন আমি ছ'-সাত মাস ধরে, সিধুয়ার মায়ের বুকের দুধ খেয়েছি। সে ঘটনা আমার মনে পড়ে না। মায়ের কাছে পরে শুনেছি,—তখন রোজ খুব সকালবেলা সিধুয়ার মা চুপি চুপি আমাদের খিড়কি দরোজা দিয়ে ঢুকত। তার কাছেই ছিল কুয়োতলা, সেখানে চান করত, তারপর ভেতরের বারান্দায় এসে আমাকে মায়ের কোল থেকে নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধরত। আমার কোনও বাছবিচার ছিল না। সিধুয়ার পাওনা দুধ পেট ভরে খেয়ে আমি ওকে ছেড়ে দিতাম। এমনও হতে পারে, সেই সময় মায়ের বুকের দুধের চেয়ে সিধুযার মায়ের বুকের দুধ আমার মুখে বেশি মিষ্টি লেগেছে। পাছে এ নিয়ে পাড়ায় নিন্দে হয়, তাই তখন অত্যন্ত গোপনে এই কাজ সারতে হয়েছে। লোকনিন্দার উলটোদিকে সন্তানের বাঁচামরার প্রশ্ন ছিল।

অনেকদিন হল, ওই ছোট শহর ছেড়ে আমরা চলে এসেছি। সিধুয়ার মায়ের মুখও এখন মনে পড়ে না। এতদিনে সে নিশ্চয় মরে গেছে। আমার মা-ও আর বেঁচে নেই। বড় হয়ে মাকে আমি খুব একটা সুখে রাখতে পারিনি। এ জন্য অনুশোচনা হয় আর, মাঝে মাঝে, অনেকদিন পর পর, মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে যখন আর ঘুম আসতে চায় না, তখন বালিশে মুখ গুঁজে, চোখ বুজে মাথা ঘষতে ঘষতে কখনও কখনও, আমি এক কোমল সুস্থ বাহুর ওপর উলকির সবুজ আঁকাজোকা দেখতে পাই। দোসাদ মেয়েদের গায়ে ওই ছিল অলংকার।

তো, জ্যাঠামশাই নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। বাড়িতে এতজন লোক, তার মধ্য থেকে একজন উবে গেলেন হঠাৎ। দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে জ্যাঠাইমা একা রয়ে গেলেন। সংসার চলতে লাগল সংসারের মতো। আমরা বড় হতে লাগলাম।

কোথায় গেলেন, কাউকে বলে যাননি। কোনও চিরকুট লিখে রেখে যাননি। পরেও আর চিঠি লেখেননি। বছরের-পর-বছর এই রকম চলতে লাগল। পাড়ার বর্ষীয়সী মহিলারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমবেদনা জানিয়ে যান: কী করবে বউ, কপাল না হলে এমন শিবের মতো স্বামী সন্নিসি হয়ে যায়! স্বামীর সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করা একজন যুবতী মহিলার পক্ষে কতখানি অপমানজনক, জ্যাঠাইমা

নিশ্চয় বুঝতেন। তিনি দেখতে আমার মায়ের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী ছিলেন। কখনও কেউ কেউ বলত, ঠিক একদিন এসে হাজির হবে দেখো। যাবে কোথায়। জ্যাঠাইমা বলতেন, ও পোড়া মুখ আমি আর দেখতে চাই না। কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর পরতেন। বারো বছর পার হয়ে গেলে, তারপর সিঁদুর মুছবে, তার আগে নয়। এই হল শাস্ত্রের নিয়ম। লোকেরা বিধান দিত। তখনই আনুষ্ঠানিকভাবে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির সৎকার হবে।

আমি ভাবি, জ্যাঠাইমা কি জানতেন কেন চলে গেল লোকটা? মনে মনে কিছু অনুমান করেছিলেন? হাবভাব দেখে অস্বাভাবিক কিছু আঁচ করতে পারেননি? হয়তো আঁচ করতে পেরেছিলেন কিন্তু বুঝতে পারেননি। এমন তো হয়। মানুষের ভুল হয়। হয়তো বুঝেও চুপ করে ছিলেন। মানুষটার মনের কোণে কোথাও হয়তো একটা ঠোক্কর লেগেছিল যার আঘাত কখনও মোছে না, যার ঘা কখনও সারে না। কিন্তু এ রহস্যের মোচন হয়নি। আজকের দিন হলে সব খোলাখুলি কথা হয়ে যেত। পরিষ্কার হয়ে যেত। আজ আর কেউ লোকনিন্দার ভয় করে না। সতীত্ব বজায় রাখতে ভেতরে ভেতরে গুমরে মরে না।

এই অবধি বুঝতে পারি। কিন্তু এরপর আর বুঝতে পারি না। সব নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া মানুষ যে সন্ন্যাসী হয়ে যায়, এ-তত্ত্ব আমি মানি না। সন্ন্যাসী হওয়া এত সহজ নয়। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন, এমন কাউকে কাউকে আমি জানি, যাঁরা পরে তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করেছেন। অভীষ্ট পথে বাধা পড়বে এই আশঙ্কায় আগে বলেননি। ধর্মীয় প্রেরণা তাঁদের আধ্যাত্মিকতার দিকে টান দিয়েছিল। সংসারের জালে জড়িয়ে থাকলে সেদিকে যাওয়া যায় না। এক ধরনের ভোগী জীবনযাপন থেকে আর এক ধরনের সর্বত্যাগী ভিক্ষুকের ঈশ্বরমুখী জীবনযাপনে সরে যাওয়া, কারুর কারুর কাছে তা বাঞ্ছিত মনে হতে পারে। আমার এতে কোনও আপত্তি নেই। এদের নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথাও নেই।

কিন্তু যে লোকটি—'এসব আর ভাল লাগছে না' ভেবে, বা হঠাৎ নিঃসঙ্গ বোধ করে, বেরিয়ে চলে আসে—একেবারে খাঁড়ি থেকে মহাসমুদ্রে, জনারণ্যে, ভিড়ের মধ্যে একজন একক মানুষ, সে কি পাগল? সে যদি কিছুই না করতে চায়? ব্যস্ত কর্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে না পড়ে সে যদি কেবল ভাসতেই চায় সারা জীবন? না কি তা সম্ভব না? আমি ভাবি।

জ্যাঠামশায়ের বেলা শুনেছি, কেউ কেউ বলত, ও বোধহয় পাগল হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনের বাঁধাধরা ছক যাদের বেলা মিলত না, তখন তাদের পাগলই বলা হত। এখন মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, তথাকথিত অস্বাভাবিক চরিত্রের মানুষ মাত্রেই পাগল নয়। তার বিভিন্ন ভেদ আছে। স্তর আছে। এমনও তো হতে পারে, সেই একজন অস্বাভাবিক মনের মানুষটিই সুস্থ, আর সবাই পাগল! গণতন্ত্রের কারা সংখ্যায় বেশি, সিংহভাগ, কারা কম, এই নিয়ম দিয়ে কি এর বিচার হয়? সে-ক্ষেত্রে এই পাগল-ভরা দুনিয়ায় একজন কি দু'জন মানুষ তাদের নিজস্ব পন্থায় স্রোতের বিপরীতে বাঁচতে চাইলেও বাঁচবে কী করে? বাঁচতে না পারলে মরে যাবে। অর্থাৎ পাগল হয়ে যাওয়া বা মৃত্যুবরণ করা—এই দুটিই হল খাঁচা থেকে নিষ্ক্রমণের পথ। নিরাময়ের নামে বিজ্ঞানীরা যে সব ওষুধপত্র আবিষ্কার করেছেন, তার বেশিরভাগ হল স্নায়ু শিথিল করার বিষ। যাতে রোগীর মনের উগ্রতা, তেজ, তীক্ষ্ণতা কমে যায়। তারা ক্রমে পাঁচজনের একজনে পরিণত হয়। সিংহভাগে ঢুকে যায়।

তবে রাজনৈতিক কারণে বা সামাজিক সংঘর্ষের ফলে হঠাৎ এক-এক জন লোক উধাও হয়ে যায়। তারপর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিংবা তার মৃতদেহ পরে কোথাও পড়ে থাকতে দেখা যায়। এ হল অন্য রকম ব্যাপার। এরা আমার এই লেখার বিষয় নয়। আমার চিন্তা পলাতকদের সম্পর্কে। পলাতক শব্দটা কি ঠিক ব্যবহার করা হল? না বোধহয়। আমি যাদের কথা ভাবছি তারা স্বেচ্ছায়, ঠান্ডা মাথায়, কোনও কারণে বিরক্ত হয়ে বা জীবন অসহ্য বোধ হলে, একটা অবস্থান থেকে নিঃশব্দে সরে গেছে।

যেমন, আমি একটি ছেলেকে জানতাম যে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দীঘায় বেড়াতে গিয়েছিল। ছুটি কাটাতে কয়েক দিনের জন্যে। চারদিনের মাথায় তিনজন বন্ধুর মধ্যে দু'জন ফিরে এল কলকাতায়, ওদের সঙ্গে ওই ছেলেটির জামাকাপড়, বাকস। কী ব্যাপার? না, নিখিল নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। একদিন সকালবেলা উঠে আমরা দেখলাম, নিখিলের ঘরে নিখিল নেই।

ওদের কথা বিশ্বাস করেননি নিখিলের বাবা। পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিলেন দীঘায়। সর্বত্র খোঁজ

করেছেন। কোনও দুর্ঘটনার খবর নেই। কেউ জলে ডুবে মরেনি। বন্ধু দু'জন বলল, আগের দিন রাত্তিরে আমরা স্বাভাবিকভাবে খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়েছি। তখন বোঝা যায়নি, ওর মনে কোনও মতলব আছে। ঘুম থেকে উঠে দাঁত মেজেছে, দাড়ি কামিয়েছে, সে-সব চিহ্ন বাথরুমে ছিল। ওর ভিজে তোয়ালে বাইরের দড়িতে শুকোচ্ছিল। কেবল মানুষটা উবে গেল।

এরপর যা-যা হয় সবই হল। খবরের কাগজে, টিভি-তে ছবি সহ বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে খোঁজ নেওয়া হল, সেখানে গেছে কিনা। কোথাও থেকে কোনও সুসংবাদ নেই। সেই সময়ে আরও কয়েকজন নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া লোকের ছবি আমি দেখেছিলাম। তাদের মুখ বিষণ্ণ। নিখিলের মুখে কোনও বিষাদ ছিল না। অনেকদিন হয়ে গেল, সে আর ফিরে আসেনি বাড়িতে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক, ওর বাবা, একসময় হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

আর একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের কেস জানি। বছর দুয়েক আগের কথা। উঁচু পদে সরকারি কাজ করতেন। অবসর নিয়ে একটি ছোট স্কুলে মাস্টারি নেন। বিপত্নীক ছিলেন। একমাত্র মেয়ে—তার বিয়ে হয়ে গেছে। স্কুল সংলগ্ন একখানা ঘরে একা থাকতেন। চুপচাপ ধরনের মানুষ। চার-পাঁচ বছর ওই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্থানীয় লোকেরা ওঁকে সম্মান করত।

একদিন ভোরবেলা স্কুলের দারোয়ান দেখল, মাস্টারমশাই গেট খুলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তখন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। সে হেঁকে বলেছিল, মাস্টারবাবু, একটা ছাতা নিয়ে যান।

না, দরকার নেই। বলে তিনি বেরিয়ে চলে যান। আর ফেরেননি। তাঁর ঘর খোলা। ভেতরে জামাকাপড় আলনায় ঝোলানো যেমনকার তেমনই। স্টোভে চা করে খেয়েছেন বেরোবার আগে। বিছানার ওপর মশারিটা তখনও টাঙানোই আছে। এইসব দৃশ্য থেকে লোকে অনুমান করেছিল, ভদ্রলোক হঠাৎই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রস্তুতির কোনও চিহ্ন নেই কোথাও। একটা চিরকুটও লিখে রেখে যাননি। শুধু 'দরকার নেই' বলে চলে গেলেন। একে পলায়ন না, হয়তো অপসরণ বলে। বা প্রস্থান।

এখন, কাগজে যাকে নিয়ে খবরটি বেরিয়েছে, তার নাম তপন মাহাতো। তেইশ বছর আগে, যখন তার বয়েস পনেরো, সে ঝাড়গ্রাম থেকে চিকিৎসা করাতে এসেছিল কলকাতার হাসপাতালে। সেখানে সুকুমার নামে ওর এক আত্মীয় মাঝে মাঝে এসে তার সঙ্গে দেখা করে যেত। একদিন তপনের বাবা বিভূতি মাহাতো হাসপাতালে এসে শোনে, সেই দিনই তার ছেলে মারা গেছে। সুকুমারকে এই খবর দেওয়া হয়েছে এবং শেষকৃত্যাদি করার জন্য সে দেশে চলে গেছে। অগত্যা বাড়ি ফিরে যায় বিভূতি। যথারীতি শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সম্পন্ন হয় তপনের। সব চুকেবুকে যায় নির্বিঘ্নে। তারপর তেইশ বছর পার হয়ে গেছে। আর এক প্রজন্ম এসে গেছে সংসারে।

দিনকয়েক আগে সেই তপন হঠাৎ তার গ্রামের বাড়িতে এসে হাজির। তার বয়েস এখন আটত্রিশ। এখন সে সাধু। নিজের পরিচয় দিয়ে সে বলে, সেদিন সে মরেনি। তার গায়ে খুব জ্বর ছিল বলে হাসপাতালের লোকেরা ওর মাথা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল। সুকুমার চাদর-ঢাকা শরীর দেখে ভেবে নিয়েছিল তপন মারা গেছে। তাই হাসপাতালের ডোমের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে সে মৃত্যুসংবাদটুকু নিয়ে দেশে চলে যায়। ভেবেছিল, ডোমেরা ওর সৎকারের ব্যবস্থা করে দেবে। সে নিজে শ্মশানে যায়নি। সে ডেথ সার্টিফিকেটও নেয়নি। এবার আবির্ভূত হয়ে শুধু একমুষ্টি ভিক্ষা গ্রহণ করে সাধু তপন আবার তার বর্তমান আশ্রম এলাহাবাদে ফিরে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে সেই সময় হাসপাতাল থেকে ওকে ছেড়ে দেওয়ার পর একা তপন বাড়ি ফিরে না গিয়ে বা যেতে না পেরে কালীঘাটে এক আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল।

খবরের কাগজকে দেওয়া এই তথ্যের মধ্যে অনেক গোঁজামিল আছে, আমার সন্দেহ। গোয়েন্দা লাগালে আসল ঘটনা জানা যেতে পারে। তপন বা তার জীবিত আত্মীয়দের এই ঝামেলায় যাওয়ার আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে অন্য খবর এসে এই খবরকে মুছে দিয়ে গেছে—দুনিয়ার যা নিয়ম।

কিন্তু খোঁচাটা আমার মনের মধ্যে লেগে আছে। কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, সেই তেইশ বছর আগে তপন মাহাতো কলকাতার হাসপাতাল থেকে আগেই পালিয়েছিল। প্রকাশিত কাহিনীটা সম্পূর্ণ বানানো।

এতগুলো বছর ধরে নানা ঘাটের জল খেয়ে সে অবশেষে সাধুজীবন বেছে নিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের হিন্দি বেল্টে এখনও সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি মানুষের ভক্তি আছে। খাটাখাটনির জীবনের চেয়ে হয়তো সহজ ভিক্ষুকের জীবন তার বেশি পছন্দ। ধরে নেওয়া যায়, সে ভালই আছে। কিন্তু এতদিন পর সে, একবার মুখ দেখাবার জন্য হলেও, বাড়ি ফিরে এসেছিল কেন? গৃহ কি টেনেছিল সন্ন্যাসীকে? অভ্যর্থনা পেলে সে কি থেকে যেত? যথেষ্ট অভ্যর্থনা নেই বলে কি আমাদের মনে এত অশান্তি?

শৈশবে যখন সিধুয়ার মায়েব বুকের দুধ খেয়েছি তখন মনে হয়নি। এখন এক-এক সময় আমারও ইচ্ছে করে, নিরুদ্দেশ হয়ে যাই। চলে যাই কোথাও। যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা এই জেনে। এ বৈরাগ্য নয়, এ বিপন্ন বিস্ময় যাকে বলা হয়, হয়তো তাও নয়। এ হয়তো এক জীবনে অনেক জীবন যাপন করার ইচ্ছে। আমারও এক-এক সময় আশপাশেব মানুষকে বড অচেনা মনে হয়। নিজের মধ্যেই প্রশ্ন জাগে, এরা কে? কেন এখানে আছি? এই কি আমার জায়গা?

পাঠক, আপনি সেই নিখিল ছেলেটির কথা স্মরণ করুন। যে দীঘায় গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। স্মরণ করুন মাস্টারমশাইয়ের কথা, যিনি স্কুলের গেট খুলে টিপ টিপ বৃষ্টিব মধ্যে একদিন চুপচাপ চলে গেলেন। কেন, আমার জ্যাঠামশাইয়ের কথা—যিনি মাকে বলেছিলেন, বউমা, ওই রাতকানার ওষুধটা কী, আমায় বলে দাও। আমি গবিব দুঃখীদের দেব। ওদের উপকার হবে। তোমার পুণ্য হবে। অথচ নিরুদ্দেশ হয়ে তিনি আব ফেরেননি। বাবো বছর পরে ঘটা করে জ্যাঠাইমার হাতের শাঁখা ভেঙে, নোয়া খুলে, মাথাব সিঁদুব ধুযে ফেলে তাঁকে বিধবা কবা হয়েছিল।

আমার ধাবণা, এরা কেউ আত্মহত্যা কবেনি। এরা এক ধবনের জীবন ছেড়ে দিয়ে, অভ্যর্থনা পাবার আশায় আব এক জীবন বেছে নিতে বেরিয়ে পডেছিল। আর কোনও উদ্দেশ্য কি লক্ষ্য ছিল না। শুধু ছিল অন্য কোনওখানে চলে গিযে যাচাই করার বাসনা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এ-বাসনা থাকে। কিন্তু অভ্যর্থনা কোথায় পাওয়া যায়, কীভাবে পাওয়া যায়, আমবা জানতে পারি না। জানাব সাহসও হয় না।

১৯৯৭

❀ যেহেতু মানুষ

সুকুমাব কাগজ পড়তে পডতে হঠাৎ সামনের দিকে মুখ তুলে তাকাল। খানিকটা খোলা আকাশ চোখে পড়ল ওর। চারকোনা একটা আয়তক্ষেত্র। নীলচে রঙের সানমাইকা দিয়ে মোড়া এমন মসৃণ। একটু আগে নীচের তলার ফুটপাথ থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে কয়লার ধোঁয়া উঠতে দেখেছে সে। সেটা এখন আর নেই। তার মানে, উনোন ধরে গেছে। এখন গনগনে আঁচে ফুটছে সসপ্যানের কালো জল।

আন্দাজ না। যেতে-আসতে বহুদিন দোকানটা চোখে পড়েছে সুকুমারের। পোস্ট আপিসের একেবারে সামনে। সকাল ছ'টায় আসে ওরা—একটা তিনজনের ফ্যামিলি। দশটা বাজার আগে উঠে যায়। একটা ডেকচি-ভরতি দুধ—তা অন্তত দশ লিটার হবে—নিয়ে আসে কাছের মাদার ডেয়ারি থেকে। আর, এক-দু'বালতি জল। এই সব কাজ করে ওই জোয়ান লোকটা। ওর বউ উনোন ধরায় একটু দেরিতে এসে। তাব শ্বশুর, অর্থাৎ জোয়ান লোকটার বাপ, বাকি সব সরঞ্জাম আস্তে আস্তে এনে জড়ো করে। তার মধ্যে আছে একটা কেরাসিনের স্টোভ। শিঙাড়া জিলিপি বানাবার জন্যে মাখা তৈরি-করা ময়দা আলাদা আলাদা পাত্রে। টিনে টিনে দালদা, চিনি। লোহার কালো কড়াই। সুকুমার অবাক হয় এই ভেবে যে, ওই দশ লিটার দুধের চা ওরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বেচে ফেলে কী করে। বাঁধা খদ্দের আছে অনেক। হাঁটিয়ে বাবুরাও বাড়ি ফেরার পথে এক গেলাস করে চা খেয়ে যায় অনেকে। কেউ কেউ দুধ খায়।

কেবল জিলিপি আর শিঙাড়া সবটা কাটে না ওই অল্প সময়ে। ওই জোয়ান লোকটা একটা ঝুড়িতে ভরে ওগুলো পরে বাজারে নিয়ে যায়। ওর নাম মন্টু। মন্টুকে ও বাজারে ঝুড়ি নিয়ে ঘুরতে দেখেছে। বেলা বাড়লে ওর বাপ জিলিপি ভাজার হাত ধুয়ে মুছে গায়ে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি চড়িয়ে নেয়। তখন ওর কাজ বাড়ির দালালি। তখন ওর আঙুলের ফাঁকে বিড়ির বদলে সিগারেট। সব পেশারই একটা নিজস্ব পোশাক আর ভাবমূর্তি থাকে, ভেবেছে সুকুমার।

মন্টুর বউয়ের নাম আলো। কিন্তু গায়ের রং ওর বেশ কালো। কালো রঙের মেয়ের নাম কেউ আলো রাখে নাকি? কালো ওরা তিনজনেই। বোধহয় দক্ষিণবঙ্গের লোক। নোনা বাতাস লেগে রং কালো হয়ে গেছে। তা হোক, আলোর মুখটা বেশ মিষ্টি। এবং সে মোটেই গ্রাম্য স্বভাবের মেয়ে নয়। ওর দালাল শ্বশুর ওকে বউমা বলে ডাকে, কিন্তু মন্টু—ওর বর—মধ্যবিত্ত ভদ্দরলোকের গলায় ওকে বলে, আলো, এদিকে দুটো চা, দুটো শিঙাড়া দাও তো। আলো, আমার হাত জোড়া, পাঁচ টাকার নোটটা ভাঙিয়ে দাও। আলো, খুন্তিটা এগিয়ে দাও না।

আলো মাথায় ঘোমটা দেয় না। ওর ছোট খোঁপায় লাল রঙের রিবন থাকে। ওর সিঁথির সিঁদুর খুব প্রকট নয়। শহরে বউদের মতো একটা লাল লাইন। ওর কপালে টিপ থাকে না। না থাকাই স্বাভাবিক। উনোনের আঁচে কাজ করতে করতে কতবার মুখ মুছতে হয়, টিপ পরলেও মুছে যেত। আলো শাড়ি আর ব্লাউজ ম্যাচ করে পরতে শেখেনি হয়তো, বা ইচ্ছে করেই পরে না। কিন্তু ব্লাউজের নীচে বডিস পরে—এটা লক্ষ করেছে সুকুমার। আলোর হাতের পাতাও নরম। আঙুলের চামড়া বাসন মেজে মেজে খরখরে হয়ে যায়নি। এমনও হতে পারে—আলোর বাড়িতে কাজের লোক আছে। কেননা, ওদের রোজগার তো কম না। দিনে অন্তত একশো টাকা কামায়। মানে, মাসে তিন হাজার টাকা। ক'টা মধ্যবিত্ত বাড়িতে মাসিক আয় অত টাকা হয়। শ্বশুরের ইনকাম না হয় বাদ দেওয়া গেল।

ওদের একটা বাচ্চা আছে। এখন তার বয়েস পাঁচ-ছ'বছর হবে। যখন আরও ছোট ছিল, বছর তিনেক, তখন একবার ও স্কুটার চাপা পড়ে। হাতে প্লাস্টার দেখে সুকুমারই জিজ্ঞেস করেছিল, কী হল রে? গাছ থেকে পড়ে হাত ভেঙেছিস? তখন ওর মা, আলো, নিজে থেকেই উত্তর দেয়, এখানে গাছ কোথায়? গাড়িতে ধাক্কা দিয়েছে। যা দস্যি ছেলে।

সুকুমার বলেছিল, ওকে একটা ভাইবোন দাও, তা হলে শান্ত হয়ে যাবে।

বয়স্ক পুরুষমানুষের মুখে এই রকম কথা শুনে একটুও অবাক হয়নি বউটা। পাছে ওর নিজের উর্বরতা নিয়ে সংশয় জাগে প্রশ্নকর্তার, সেই সংশয় নিরসন করতে উত্তর দিয়েছিল, বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর দিয়েছিল, তা তো দেওয়াই যায় কিন্তু ওর বাপের মত নেই।

মুঠোর ফাঁকে শিঙাড়া গড়তে গড়তে মন্টু বলেছিল, বেশি বাচ্চাকাচ্চা হলে মেয়েদের শরীর খারাপ হয়ে যায়। তারপর নিজের বাপের দিকে একনজর তাকিয়ে 'শরীর' কথাটার ব্যাখ্যা দেয়—গতর খাটিয়ে আমাদের রোজগার, সেটা নষ্ট হলে চলবে কী করে বলুন। এই শরীর আর গতর শব্দ দুটোর যে আলাদা মানে, তা মন্টু ভাল করেই জানে। আলোও জানে। তাই, জিলিপি, শিঙাড়া খদ্দেরদের হাতে আলোই ধরিয়ে দেয়। সুকুমারের ধারণা, আলো না থাকলে মন্টুর দোকানে এত ভিড় হত না। মন্টু ওকে দিয়ে পি. আর করায়। খোঁপায় লাল রিবন আর গায়ে বডিস ও-ই পরিয়েছে। খদ্দেরদের সঙ্গে আঙুলে আঙুলে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি যে করে আলো, তাতে ওর বরের সম্মতি আছে।

এসব কি ব্যভিচার প্রবণতা? সুকুমার তা মনে করে না। গ্রামের লোক শহরে এসে বাস করতে শুরু করলে কালক্রমে এসব আচরণ দেখে দেখে শিখে নেয়। গ্রামাঞ্চলে মেয়ে-বউদের দেখেছে সুকুমার। তাদের গায়ে জামা থাকে না কিন্তু মাথায় ঘোমটা থাকে। তাদের কোলে-কাঁখে বাচ্চারা ঝুলে থাকে। তাদের স্তনে আঁট নেই। পুরুষদের তুলনায় তাদের স্বাস্থ্য খারাপ। দারিদ্র্য নিশ্চয় এর একটা কারণ। সচেতনতার অভাবও আরেকটা কারণ। মোট কথা, এই পরিবারটিকে অনেক বছর ধরে দেখে দেখে ওর মনে হয়েছে, এরা সুখী। সচ্ছল। কেউ কারুর বার্ডেন নয়। কাজটাও এদের আনন্দের সঙ্গে যুক্ত। না হলে, মাঝে মাঝেই—সপ্তাহে অন্তত দুটো দিন কেন এরা পোস্ট আপিসের সামনে পসরা সাজিয়ে বসে না? তার মানে, নিজেদের কাছে নিজেরাই এরা ছুটি নেয়। কারুর কাছে ছুটি চাইতে হয় না। শুয়ে বসে কাটায় দু'দিন। রোজগারের চেয়ে সুখটাকে বড় করে দেখে।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে সানমাইকা মোড়া আকাশের দিকে তাকিয়ে এইসব সাতপাঁচ

ভাবছিল সুকুমার। বাতাসে টক টক জিলিপি ভাজার গন্ধ ভেসে আসছে।

একটু আগে খবরের কাগজে একটা খবর ওর চোখে পড়ল।

জীববিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের আচরণ নিয়ে গবেষণা করার প্রক্রিয়ায় প্রথমে ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করেন। সেই রকম এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে যে, অপুষ্ট, দুর্বল ইঁদুরেরা নিজেদের মধ্যে বেশি ঝগড়া মারামারি করে। আর, অপুষ্ট, দুর্বল ইঁদুরদেরই বেশি করে বাচ্চা হয়। পেটভরে খেতে দিয়ে পুষ্ট ও সন্তুষ্ট করে রাখলে সেই একই ইঁদুর ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করে বলে বিজ্ঞানীরা অভিমত দিয়েছেন। এবং মানুষের ওপর এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে জানাচ্ছেন যে, সাধারণভাবে সমাজে দারিদ্র্যমোচন করতে পারলে, খাওয়াপরার অসুবিধা দূর করতে পারলে, অশান্তি আর জনসংখ্যা বৃদ্ধি দুটোই কমে যাবে।

একটু পরে ঠিকে ঝি আসবে। রাত্রের এঁটো বাসনকোসন মেজে, ঘরদোর মুছে, কাপড় কেচে, মশলা বেটে দিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে বাজারে যাবে সুকুমার। সুকুমারের বউয়ের নাম অমৃতা। সকালে উঠে মুখহাত ধুয়ে গলা থেকে পা অবধি ঢোলা জামা পরা অবস্থায় চা করে অমৃতা। স্বামীকে দেয়, নিজে নেয়। সুকুমারের চায়ে চিনি দেয় না আজকাল, নিজে দুধ-ছাড়া চা খায়। সবই স্বাস্থ্যের কারণে। সেই সঙ্গে একখানা করে শুকনো টোস্ট। আর নিজের নিজের ওষুধের বড়ি।

একটা বয়েসের পরে খাওয়া নিয়ে আর বিলাসিতা করা যায় না। সুকুমার যখন চাকরি করত, ওর ওপরঅলা একদিন বলেছিলেন, জানো, যখন হজম করতে পারতাম, তখন ভাল ভাল জিনিস কিনে খাওয়ার সঙ্গতি ছিল না। স্কাইরুমে কি ফারপোয় যাওয়া ছিল স্বপ্নের মতো। সে সব সুখাদ্যের স্বাদ এখনও জিভে লেগে আছে। আর, এখন আমার টাকার কোনও অভাব নেই ভগবানের কৃপায়, রোজই ওসব জায়গায়, কি নামকরা ক্লাবে গিয়ে পেটভরে খেয়ে আসতে পারি। কিন্তু শরীর এখন আর নিতে চায় না। যা কিছু সুস্বাদু জীবনে, তাই নিষিদ্ধ।

আজ সুকুমারের সেই অবস্থা। স্বাস্থ্যটা একটু একটু করে ভাঙছে। অমৃতাও খুব সুস্থ নয়, তবু এখনও রান্নাটা নিজের হাতে করে যাচ্ছে। ও বলে, এই কাজটা যদি ছেড়ে দিই, তা হলে একেবারে শুয়ে পড়ব। তখন তোমাকে আমার সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে। ওটা আমি চাই না। আমি চাই, তোমার আগে চলে যেতে। টপ করে। কাউকে কষ্ট না দিয়ে। এমনভাবে বলে, যেন, মানুষের ইচ্ছের ওপরে নির্ভর করে তার মৃত্যু।

কী মনে হল, সুকুমার ওইভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ডাকল, শুনছ?

অমৃতা ঘরের ওপাশ থেকে সাড়া দেয়, কী?

একটু এদিকে এসো না। একটা খবর পড়ে শোনাই তোমাকে। খুব ইন্টারেস্টিং।

আরেকটা মন্ত্রী ধবা পড়েছে? ওরা তো সবাই চোর।

না, না। অন্য রকমের খবর।

তা হলে গণধর্ষণ? তোমার তো ওইসব নোংরা খবরেই যত ইন্টারেস্ট।

সে রকম খবর যে নেই তা নয়। এক পাতাতেই তিনটে। কিন্তু আমি যেটার কথা বলছি, সেটা মানুষদের নিয়ে নয়। ইঁদুরদের নিয়ে।

ইঁদুরদের নিয়ে আবার কী খবর হতে পারে—ভেবে অমৃতা এদিকে এগিয়ে আসে। সুকুমার খবরটা জোরে জোরে পড়ে শোনায় বউকে।

অমৃতা চুপ করে শোনে। শোনার পরেও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ইঁদুরের সঙ্গে মানুষের তুলনা হয় না।

কেন হয় না? বিজ্ঞানীরা তা হলে মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা করতে ইঁদুরকে আর বাঁদরকেই বেছে নেন কেন? নিশ্চয় ওরা মানুষের চেয়ে বেশিদিন এই পৃথিবীতে আছে।

অমৃতা বলল, থাকলেও ওদের স্বভাব বদলায়নি। জৈব তাড়না ওদের এখনও চালায়।

আর, মানুষ সমাজ গড়েছে। মানুষের বিবর্তন হয়েছে। যাকে বলে ক্রমবিকাশ, তাই ঘটেছে মানুষের শরীরে, মনে—এই কথা বলতে চাও তো? যাকে বলে সভ্যতা—নিজের প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার কৌশল, ক্রমে ক্রমে মানুষ তা শিখেছে। ইঁদুরেরাও নিজেদের মতো করে টিকে থাকার কৌশল যদি না শিখত, তা হলে এতদিনে ধ্বংস হয়ে যেত না? হয়নি তো।

আসলে, আমার কী মনে হয় জানো? এই সভ্যতা মানুষের চরিত্রের অনেক কাঁচা আর অনিবার্য

রিপুগুলো কাপড়চোপড় দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখে। হাসি আর বিনয় দিয়ে বিভ্রান্ত করে। বুঝতে দেয় না। তাদের মনের গভীর স্তরের খবর অনুসন্ধান করার জন্যে তাই ইঁদুরকে কাজে লাগাতে হয়। সুকুমার বউকে একটু জ্ঞান দেবার চেষ্টা করল।

তাই যদি হবে, তবে খেয়ে পরে যারা সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে বলে আমরা ভাবি, তাদের মনে শান্তি নেই কেন? তারা কেন নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে?

সুকুমার বলতে যাচ্ছিল, এটাও বিবর্তনের মধ্যে পড়ে। স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে মানুষ নিজেদের অশান্তি ডেকে এনেছে বলে আমার ধারণা। হাতের কাছে সুখ ধরিয়ে দেবার জন্যে বিয়ে-প্রথা চালু করেছে, সেই গিঁট এখন গলায় গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু বলার আগেই দরোজায় বেল পড়ল।

কাজের লোক শীলা এসেছে ভেবে দরোজা খুলল অমৃতা। দেখল, না, শীলা নয়। ওপর তলার মানসী।

দবোজার গোড়ায় দাঁড়িয়েই মানসী গড়গড় করে বলে গেল, বউদি বলেছে, রোজ রোজ এক টিফিন ভাল লাগে না। মা যেন আজ নতুন কিছু বানিয়ে দেয়।

বলেই ছুটে চলে যাচ্ছিল, অমৃতা জিজ্ঞেস করল, এত তাড়াহুড়ো করে চললি কোথায়?

দাদার সিগারেট আনতে। আর বউদিরও একটা জিনিস আনতে যাচ্ছি। দাদা মানে তপন। বউদি মানে সোমা।

কী জিনিস সেটা আর মুখ ফুটে বলল না।

অমৃতা গজগজ করতে থাকে। রোজ রোজ নতুন টিফিন আমি কি আবিষ্কার করব?

সুকুমার বলে, কালকে কী দিয়েছিলে?

ডিম দিয়ে চাউ বানিয়ে দিয়েছি।

পরশু?

আমার অত মনে নেই বাপু। অদ্ভুত এক বউ হয়েছে। নিজেদের খাবার নিজেরা বানিয়ে নিলেই তো পারে। তা করবে না। ব্যস্ত। যত চাপ আমার ওপর।

অমৃতার বিরক্তির কারণ বুঝতে পারে সুকুমার। রান্নাঘরেই ওর সারাটা জীবন কেটে গেল। ভেবেছিল, ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনবে। তারপর আস্তে আস্তে তার ওপর সংসারের ভার অর্পণ করে অমৃতা নিজে বিশ্রাম নেবে। যেভাবে অমৃতা নিজে একসময় শাশুড়ির কাছ থেকে কাজ তুলে নিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তা হবার নয়। এখনকার ছেলেমেয়ে কেবল টাকা রোজগার করতে শিখেছে।

তপন আর সোমা দু'জনেই চাকরি করে। কেউ কারুর চেয়ে ছোট কাজ করে না। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা মাইনে পায়। কিন্তু গুছিয়ে সংসার করার দিকে ঝোঁক নেই ওদের। অমৃতা হয়তো ভাবে, তপন ইচ্ছে করলেই সোমার ওপর একটু চাপ দিতে পারত। বলতে পারত, আপিসের পর তুমি সোজা বাড়ি চলে যাও। বিশ্রাম করো। একটা উপযুক্ত রান্নার লোক রাখতে পারি আমরা। তাকে খাটাও। আজকাল কত গ্যাজেট বেরিয়েছে, আমরা কিনতে পারি। আমার ফিরতে দেরি হলেও তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। কিন্তু এ-কথা বলার সাহস তপনের নেই। আপিসের পরেও, সন্ধেবেলা, ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সোমার কাজ থাকে। সে-কাজ কতটা জরুরি, কতখানি না করলেই নয়, কেউ জানে না। ভাবটা, তপনের কথা ভেবে সোমা নিজের কেরিয়ার নষ্ট করবে কেন? বেশি চাপ দিলে হয়তো ওদের বিয়েটাই ভেঙে যাবে। বিবাহিতা স্ত্রী স্বাধীন, সে কোনও দিক থেকেই স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হবে না। যে-যার নিজের কেরিয়ার সামলাবে, এই যদি এখনকার নিয়ম হয়, তবে বিয়ে করার কী দরকার ছিল? স্বার্থত্যাগ না করলে কি ভালবাসার বোধ জাগে, অমৃতা ভাবে। বিবাহিত জীবনে তোমার সুখ আমার সুখ, তোমার কষ্ট আমার কষ্ট—এই মনোভাব খুব জরুরি।

সুকুমার বলল, আমি তা হলে বাজার যাচ্ছি। দু'খানা খবরের কাগজ—উলটেপালটে দেখেছে—ভাল করে পড়া হয়নি। আপাতত ভাঁজ করে রাখা থাক। পরে পড়ে নেবে। ওর তো সারাদিন অফুরন্ত সময়।

কী কী আনতে হবে বলো। একটু ভেটকি মাছ আনব? ফ্রাই করে দেবে? ছোট ছোট চিংড়ি পরিষ্কার করিয়েও আনতে পারি যদি ফ্রায়েড রাইস করে দাও। তপন চিংড়ি মাছ ভালবাসে।

সোমার অ্যালার্জি। অমৃতা গম্ভীরভাবে মন্তব্য করে।

তা হলে আজ লুচি বেগুনভাজা করে দাও। বাড়িতে ময়দা আছে তো? না, নিয়ে আসব?

অমৃতা এবার রূঢ় স্বরেই বলল, তুমি যেন জানো না, তপন বেগুন ছোঁয় না। চিরকাল ও বেগুন খাওয়া নিয়ে ঝামেলা করেছে। আমি একটু আলু-পিঁয়াজ ভেজে দেব বরং। তুমি খানিকটা কাঁচা লঙ্কা আনতে ভুলবে না। আর টম্যাটো।

সুকুমার ঝুড়ি হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। মনে মনে বলে, টম্যাটো কুড়ি টাকা কিলো।

একসময়, মানে তপনের বিয়ের আগে অবধি, ওরা সবাই একসঙ্গে দোতলায় থাকত। তপনের নিজস্ব পড়ার ঘর ছিল দেড় তলায়। নিচু ছাদ। তার নীচে গ্যারেজ। বাইরে এক চিলতে খোলা জায়গায় বাগান। তিনতলায় থাকত এক ভাড়াটে পরিবার। তারা সল্টলেকে বাড়ি করে উঠে যাওয়ায় ওপরের তিনখানা ঘর খালি হয়ে যায়। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে সেটাকে বাসযোগ্য করেছে সুকুমার। তবু যে পুরনো ভাড়াটে নগদ টাকা ক্ষতিপূরণ চায়নি, সেটাই সৌভাগ্য। ক্ষতিপূরণ দিতে হলে খরচ গিয়ে ঠেকত লাখ টাকায়।

ছেলে, ছেলেব বউ নিয়ে মিলেমিশে থাকবে, এ রকম একটা স্বপ্ন ছিল সুকুমারেরও মনে। যেমন সব বাপেরই থাকে। একদিন পরের ঘরের মেয়ে এ-বাড়িতে দুধেআলতায় পা ডুবিয়ে দাঁড়াবে, সেই মেয়েকে এ-বাড়িতে আপন করে নিতে হবে। কার্যক্ষেত্রে দেখল, সোমা শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে চাইছে না। তপনকেও এ ব্যাপারে রাজি করিয়েছে। ওদের কালচার আলাদা।

একদিন তপন বলল, বাবা, আমার আপিস থেকে ফ্ল্যাট দেবে বলেছে। ভাবছি, নিয়ে নিই।

কী সুবিধে হবে তাতে? তবু সুকুমার জানতে চায়।

আমার আপিসের লোকজন, বন্ধুবান্ধব আসে, সোমার আত্মীয়স্বজনরাও আসে প্রায়। তোমাদের অসুবিধে হয়। তাই বলছি। সকলকে তোমাদের পছন্দ না-ও তো হতে পারে। মনে হতে পারে, ওরা জুলুম করছে।

তাই? না, তাদের পছন্দ হয় না তোমার মা-বাবাকে?

ইচ্ছে করেই কড়া কথাটা শুনিয়ে দিয়েছিল সুকুমার। কেননা, ওর মনে হয়েছিল, তপন বউয়ের শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে।

তপন কী উত্তর দেবে এ-কথার, ভেবে পাচ্ছিল না। তখন সুকুমারই আবার বলেছিল, কোম্পানির ফ্ল্যাট নিলে তোমার বাড়িভাড়া কাটা যাবে না? সেটা তো খুব সামান্য টাকা নয়। তার চেয়ে একটা কাজ করো।

এরপর তিনতলাটা পুরোই ওদের ছেড়ে দিয়েছে। ওদের আলাদা করে দিয়েছে বলা যায়। থাকুক, ওরা নিজেদের নিয়ে নিজেদের মতো করে সুখে থাকুক। তবু তো এক বাড়িতে রইল। দূরে চলে গেল না। একেবারে পর হয়ে গেল না। বিপদেআপদে 'তপু' বলে ডাক দিলে এসে সাহায্য করতে পারবে। একটা মাত্র সন্তান—ও ছাড়া আর কার ওপর ভরসা করতে পারে সুকুমার বা অমৃতা?

কথায় কথায় সেই 'সুখে থাকার' প্রশ্নই উঠল। পোস্টআপিসের গায়ে নীচের তলার শিঙাড়া জিলিপি চায়ের দোকান যাদের, সেই পরিবারকে অনেকদিন ধরে দেখে দেখে সুকুমারের মনে হয়েছে, ওরা সুখী। যদিও সে ওদের খানিকক্ষণের জীবন দেখেছে। দূর থেকেই দেখেছে। ওদের চোখে-মুখে দেখেছে এক দীপ্তি, তৃপ্তি আর শান্তভাব, তা থেকেই মনে হয়েছে, সুখী ওরা। ইঁদুর-জীবনের কিছুটা কাছাকাছি।

কিন্তু তপন আর সোমার দাম্পত্যজীবন কি সুখের হয়েছে? খুব নিশ্চয় করে ও বলতে পারবে না। সুকুমার আর অমৃতার নিজেদের দাম্পত্যজীবন দেখতে দেখতে তিরিশ বছরের বেশি পুরনো হয়ে গেল। ওরা সুখী হয়েছিল? কী দিয়ে মাপা যায় দাম্পত্যজীবনের সুখ-দুঃখ? অমৃতা জানলেও সুকুমার জানে না।

যে-পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার, কেউ কারুর চেয়ে কম বা বেশি নয়, সেখানে আর যাই থাকুক, শান্তি থাকে না, এ জিনিস সুকুমার স্বচক্ষে দেখেছে। একজনকে ছোট হতে হবে। একজন অপরজনকে অনুসরণ করবে, কথায় কথায় তর্ক করবে না, এটাই সভ্যসমাজে কাম্য। সংসার তো একটা প্রতিষ্ঠান। একজনকে সেখানে নেতৃত্ব দিতে হবে। অন্তত এতদিন তাই ছিল। যে সমাজে তা নেই, সেখানে দাম্পত্যজীবন ক্ষণস্থায়ী বা স্বামী-স্ত্রী সে-পরিবারে দিনে দিনে তিলে তিলে পরস্পরের আয়ু

কমিয়ে দেয়। বা, পরস্পরকে গ্রাস করে—বলা যায়।

ধরা যাক না, মহাত্মা গান্ধীর কথা। কেমন স্বামী ছিলেন তিনি? কেমন পত্নী ছিলেন কস্তুরবা? প্রায় সমবয়সি এই দুই বিখ্যাত মানুষের বিবাহ হয়েছিল তেরো বছর বয়সে।

ইঁদুরের গল্পের মতো একদিন সেই গল্প অমৃতাকে শুনিয়েছিল সুকুমার।

১৯০১ সাল। গান্ধী তখনও মহাত্মা হননি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওকালতি করেন। আব অভিবাসী ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে লড়াই চালাচ্ছেন শ্বেতাঙ্গ প্রশাসনের বিরুদ্ধে। অনেক অত্যাচারও তাঁর ওপর চলছে, তিনি সহ্য করছেন। আবার প্রতিবাদও কবছেন। তখন তাঁব বয়েস বত্রিশ বছর। এমন সময় সেখানে বুয়রদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ বাধল। বুয়ররা ছিল ওলন্দাজ উপনিবেশীদের বংশধর। তাদের অধিকৃত অঞ্চলে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার সেই অঞ্চলে অভিযান চালায়। তাই নিয়ে যুদ্ধ।

গান্ধী তাঁর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন স্থগিত রেখে তখন ভারতে ফিরে আসতে চান। ভারতীয় অভিবাসীরা কিছুতেই তাঁকে ও-দেশ থেকে চলে যেতে দেবে না। শেষকালে তিনি কথা দিলেন, ওদের ডাক পেলেই তিনি আবাব দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে আসবেন। ওই সময় ঠিক এক বছর গান্ধী ভারতে এসে বাস করেছেন। কংগ্রেসেব কাজকর্মে অংশ নিয়েছেন। ভেবেছেন, রাজকোটে নতুন করে ওকালতি শুরু করবেন। অথবা বোম্বাই শহরে। ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর ফিরে যাবার ডাক এল। চলে গেলেন।

গল্পটা অন্য জায়গায়।

গান্ধী চলে আসছেন। ছ' বছর ওদেশে থেকে, কাজ করে তাঁর অনেক বন্ধু ও বড়লোক ভক্ত তৈরি হয়েছে। তাবা ঠিক কবল, উপযুক্তভাবে গান্ধীকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হবে। ওদেব কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে গান্ধী অনেক উপহার পেলেন। তার মধ্যে প্রচুর সোনা, রুপো, এমনকী হিবের গহনা ছিল। কস্তুরবার জন্যে বিশেষ মূল্যবান একটা জড়োয়ার নেকলেসও ছিল। দামি ঘড়ি ছিল।

গান্ধী দুশ্চিন্তায় পড়লেন। ওইসব বহুমূল্য অলংকার, সোনাদানা নিয়ে কী কববেন তিনি, এই চিন্তায় রাত্রে তাঁর ঘুম হয় না। মন বলছে, ওগুলো বিক্রি করে সেই টাকায় স্থানীয় দুঃস্থদের জন্য কোনও একটা ব্যবস্থা করে যেতে। আবার পারিবারিক দায়িত্বের কথাও মনে হচ্ছে তাঁর। স্ত্রী, দুই ছেলে তখন ছোট, তাদের ভবিষ্যৎও ভাবা দরকার। তাঁর যে আইনজীবীর পেশা, অর্থ উপার্জন—সে-সব তো পরিবারকে সচ্ছলতা দেবার জন্যেই। সত্যি কথা বলতে কী, স্ত্রীর যা কিছু গহনা ছিল, সে-সব তিনি আগেই বিক্রি করে সংসার চালিয়েছেন। মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করাই একমাত্র মহৎ কাজ, পুরস্কারের প্রত্যাশা কবা অনুচিত, এইসব সাধুবাক্য বুঝিয়ে এসেছেন। এখনও সেই কথার পুনরুক্তি করলে কি কস্তুরবা শুনবে তাঁর কথা?

প্রস্তাব শুনে বেঁকে বসেন গান্ধীর স্ত্রী কস্তুরবা। বললেন, তোমার দরকার না থাকতে পারে ওসব তুচ্ছ পার্থিব জিনিসে, আমার দরকার আছে। উপহারে পাওয়া সব সামগ্রী আমি নিয়ে যাব। আমার গয়নাগাঁটি সব তুমি নষ্ট করেছ। সে সব কোনওদিনও ফেরত দেবে না, আমি জানি। ছেলেদেরও তুমি সাধু বানাতে চাও, কিন্তু ওদের বউরা যখন আসবে, তখন কী পাবে ওরা? তোমার বংশধরের স্বার্থ, শ্রীবৃদ্ধি রক্ষা করা তোমার কর্তব্য নয়?

কস্তুরবা বললেন, তা ছাড়া, ওরা আমার ব্যবহারের জন্যে যে জড়োয়ার নেকলেস দিয়েছে, সেটা তুমি নিতে পাবো কোন অধিকারে? ওটা তো আমার।

গান্ধী বললেন, আমার কাজের সুবাদেই ওটা তুমি পেয়েছ। তুমি ওদের জন্যে কী করেছ?

কস্তুরবা বললেন, তোমার কাজ মানেই আমারও কাজ। তোমার জন্যে আমাকে দিনরাত পরিশ্রম করতে হয় না? অনবরত তোমার কাছে লোকজন আসে, তাদের দেখাশোনা করতে হয়, খাওয়াতে হয়, দিনের-পর-দিন তোমার বাড়ি ফেরার পথ চেয়ে বসে থাকতে হয়; সে উদ্বেগ, সে কষ্ট, তার কোনও মূল্য নেই বুঝি? কোথা থেকে হয়েছে এসব—কোনওদিন তুমি খোঁজ করেছ? আমাকে দিয়ে কেবল তোমার দাসীবৃত্তি করিয়েছ চিরকাল। বড় বড় কথা তোমার মুখে শোভা পায় না।

বিচলিত হয়েছিলেন গান্ধী এইসব স্পষ্ট কথা শুনে। এর একটাও মিথ্যে নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর কথা তিনি মান্য করেননি। বস্তুত, স্বামীর ইচ্ছার দাসী হতে হতেই কস্তুরবা মহত্ত্ব পেয়েছেন। মহৎ হয়ে জন্মাননি গান্ধী-পত্নী।

শুনতে শুনতে অমৃতা বলেছিল, সারদামণি সম্পর্কেও আমার এই কথা মনে হয়। শ্রীশ্রীমা হওয়া ছাড়া তাঁর কি অন্য কোনও পথ খোলা ছিল? মেয়েদের এই ভাগ্য।

সুকুমার বলেছিল, এর উলটো দিকও আছে। ইন্দিরা গান্ধী তো আদর্শ স্ত্রী ছিলেন না। বিখ্যাত বাবার ভাবমূর্তি তাঁর যৌবনকালে স্বামীকে অবজ্ঞা করতে শিখিয়েছে। স্বামীকে ছেড়ে প্রায়ই জওহরলালের কাছে চলে আসতেন ইন্দিবা। ফিরোজ গান্ধী সেটা পছন্দ করতেন না। ইন্দিরা ও ফিরোজের দাম্পত্যকলহ ঘনিষ্ঠজনের কাছে অবিদিত ছিল না। অনেকবাব বিবাহবিচ্ছেদ হতে গিয়েও হয়নি, এমন কথা শোনা যায়।

দুটো বাচ্চা ছিল বলে ওদের বিয়ে ভাঙেনি। আমার তো তাই মনে হয়। অমৃতা বলেছিল মুখ ঘুরিয়ে।

একটু বাঁকা হাসি হেসে অমৃতা খোঁচা দিয়েছিল, মাঝখানে তপু না থাকলে আমাদেরও ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত বোধহয়।

সে ঘটনা তুমি আজও ভুলতে পারোনি?

ভোলা যায়!

তুমি বিশ্বাস করো, আমি ওই মহিলা—কী যেন নাম ছিল তার, হ্যাঁ মনে পড়েছে, অপবাজিতা, আমি অপবাজিতার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

অমৃতা বলে, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু আসে যায়? তুমি তো ভেজা বেড়াল। তোমার মুখ দেখে পেটেব কথা কে বুঝবে? কিন্তু ভুলে গেছ, সে আমাকে রোজ বোজ ফোন করে উত্ত্যক্ত কবত। বলত, আপনি সুকুমারদাকে ছেড়ে দিন। আমি সুকুমারদাকে ভালবাসি। সুকুমারদার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

এইসব বলত?

এমন তার সাহস? এ-কথাও বলেছে, আপনি সুকুমারদাকে স্যাটিসফাই করতে পারেন না। কেন তাকে আগলে রয়েছেন? আমাদের জীবন থেকে সরে দাঁড়ান। এসব কথা ওর মুখে আসে কী করে, যদি তুমি না বলতে?

কতদিন আগেব কথা। দশ বছর। বারো বছব। ওই অপবাজিতা নামের মহিলা তখন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে এ-পাড়ায় একটা বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসে। ভাল গান গাইত। বেডিয়োয় প্রোগ্রাম কবত। অনেকেই আসত ওর সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে, মেলামেশা কবতে। একসময় সুকুমারও ঢুকে পড়েছিল। কী সূত্রে ওখানে গিয়ে পড়ে, আজ আর মনে পড়ে না। কিন্তু ওকে দেখে সুকুমারের ভাল লেগে যায়। অমৃতার চেয়ে অন্তত পনেরো বছরেব ছোট বয়েসে। দেখতেও ভাল। হাসিখুশি। স্বভাবটা মিশুকে। দেখতে দেখতে ওদের ঘনিষ্ঠতাও হয়।

ব্যাপার জানতে পেরে অমৃতা খুব কান্নাকাটি করে প্রথমে। ওর বাপের বাড়িতে খবর দেয়। অমৃতাব মা ছুটে চলে আসেন। সে এক কিম্ভূত কাণ্ড। তপন সে-সময় হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে। অমৃতা ওকেও এমনভাবে চিঠি লেখে যে, বেচারা মাকে বাঁচাতে বাড়ি চলে আসে। হয়তো লিখেছিল আত্মহত্যা করবে, বা ওই রকম কোনও ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা। অকারণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, ভয় পেয়ে এমন এক নাটক পাকিয়ে তুলল যে সবাই সন্ত্রস্ত।

এদিকে উত্তেজনা যত বেড়েছে, ততই স্থির-গম্ভীর হয়ে উঠেছিল সুকুমার। সবাই মিলে যেন ওকে অপ্রিয় সম্ভাবনার দিকেই ঠেলে দিচ্ছিল। কিন্তু মনে মনে ও জানত, অপরাজিতা আর দ্বিতীয়বাব সংসারে বাঁধা পড়তে চায় না। তার স্বভাব অন্য রকম। নিজের সংসার ভেঙেছে। অন্যের সংসাব ভাঙতে পারলে ওর আনন্দ। ও অনেক পুরুষকে জড়িয়ে রেখে জীবন কাটাবে। সুকুমার ছিল ওর একটা টোপ মাত্র। মানুষের না হয়ে ইঁদুরের জীবন হলে এটা কোনও সমস্যাই হত না।

সম্ভবত মায়ের পরামর্শে সেই সংকটের সময় অমৃতা এক বুদ্ধির চাল চেলেছিল। ওই অপরাজিতা মেয়েটার সঙ্গে নিজে গিয়ে ভাব করে নেয়। বাড়িতে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে ওর গান শোনে। ওর কাছে গান শিখতে শুরু করে। লড়াই করে যার সঙ্গে জিততে পারত না, বন্ধুত্ব করে তার মোকাবিলা করল। ক্রমে দেখা গেল সুকুমারের চেয়ে অমৃতার সঙ্গেই অপরাজিতার ঘনিষ্ঠতা বেশি। টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে বা কলকাতার বাইরে কোনও জলসায় গান গাইবার ডাক পেলে অমৃতার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসে।

অপরাজিতা বলে, দিদি, হঠাৎ পাঁচ হাজার টাকা হাতে এসে গেছে। কোথায় রাখব। হারিয়ে টারিয়ে

ফেলব। তোমার কাছে রেখে দাও। পরে চেয়ে নেব।

অমৃতা বলে, না, না। আমার কাছে রাখবে কেন? তোমার দাদাকে জিজ্ঞেস করো।

সুকুমার টাকাটা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপজিট করে দেয়।

অপরাজিতা বলে, বার্নপুরে গান গাইবার ডাক পড়েছে। গাড়িতে যাওয়া-আসা। ওখানে দু'রাত্তির থাকা। আর কোনও মেয়ে-আর্টিস্ট নেই। যাব?

অমৃতা বলে, দাদাকে জিজ্ঞেস করো।

সুকুমার হয়তো পরামর্শ দেয়, ওদের বলো, এখান থেকে অন্তত আর একজন ফিমেল আর্টিস্ট না গেলে তুমি যাবে না। এই রকম।

নিষেধ যে তাড়না বাড়িয়ে দিয়েছিল, প্রশ্রয় তার প্রশমন ঘটাল। কিছুকাল পরে অপরাজিতাকে আর খুব আকর্ষণীয় সঙ্গিনী বলে মনে হল না। মন তুলে নিল সুকুমার। এর মধ্যেও কোথাও নিশ্চয় ইঁদুর জীবনের দর্শন লুকিয়ে ছিল।

অমৃতার বাপের বাড়ি বিলাসপুরে। মধ্য প্রদেশের ছোট ছোট শহর ছিল তখন প্রায় গ্রামেরই মতো। আব সেখানে তখন ব্রিটিশ আমল সদ্য উঠে গেছে, তবু সাহেবপাড়া একটা করে থাকতই। যেমন একটি করে বাঙালিটোলা। উকিল, বেল কর্মচারী, মাস্টার, কাপড়কল কি চিনিকলের কেরানি—সব বাঙালি। ডাক্তার কবিরাজ বেশিরভাগ বাঙালি। তিরিশ-চল্লিশটি পরিবার হত এক-এক শহরে। তার মধ্যেই সম্পূর্ণ একটি বাঙালি সমাজ—তার কুসংস্কার, তার স্ত্রী-আচার, তার ব্রত-পার্বণসহ টিকে থাকত। বিলাসপুব সেই রকম এক মহকুমা ছিল।

তাদের ছেলেমেয়েবা খেলা করত মাঠে, বাগিচায়। পুকুরপাড়ে, কুয়োতলায়। অমৃতাদের ছিল তিনপুরুষেব বাড়ি। সংলগ্ন ফলের বাগান। আতা গাছ, জাম গাছ, আম, লিচুও ছিল। বাড়ির পেছন দিকে ছিল কলাগাছের ঝোপ। কাঁচকলা। তাই পাকলে ওরা চিড়ে দিয়ে দুধ দিয়ে ফলার করে খেত। সুকুমার, অমৃতা প্রায় একবয়সি দশ-এগারো বছর বয়েস অবধি ওই বাগানে আর সব বালক-বালিকাদের সঙ্গে খেলা করেছে। সুকুমার স্কুলে যেত, অমৃতা যেত না কিন্তু বাড়িতে ওদের একজন অধিবাসী মাস্টারমশাই' থাকতেন, তিনি সব ছেলেমেয়েদের পড়ার দায়িত্ব নিতেন। ওদের বড় পরিবারে এ বয়সের অনেক পড়ুয়া থাকত সব সময়ে।

ওদের বাগানের জামতলায় ঘটেছিল সুকুমারের সঙ্গে অমৃতার প্রথম প্রেম যদি বলা যায় তো তাই। কেননা, কোনও মেয়েকে না বলে সে তার প্রথম ঘনিষ্ঠজীবন প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা সুকুমারকে বলতে গিয়েছিল কেন। ওর কাকিমার কথা। দুপুরবেলায় কাকার সঙ্গে খাটের ওপর শুয়ে আছে। ওই ঘরেরই মেজেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল অমৃতা। সে স্পষ্ট শুনল, কাকিমা ফিসফিস করে বলছে, আঃ, রোজ রোজ তোমাব এই ঢং ভাল লাগে না। ফিসফিস করে কাকা বলছে, আঃ, যা বলছি শোনো। গেরোটা খোলো না। তাবপর কাপড়চোপডের খসখস শব্দ, ঘুমোবার ভান করে পড়ে ছিল সে। কাকা একটু পরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কাকিমা লক্ষ করল, আর একটা প্রাণী ওই ঘরেই রয়েছে।

ডাকল, এই অমি, অমি।

যেন গভীর ঘুম থেকে সদ্য জেগে উঠল এমন ভান করে উঠে বসেছিল অমৃতা।

কাকিমা বলেছিল, মেজেতে শুয়েছিস কেন? আয় বিছানায় উঠে আয়। অমৃতা তখন ফ্রক পরে। কাকিমা ওকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ আদর করেছিল। কাকিমা অমৃতার মুখে চুমু খেয়েছিল। সেই চুমুতে কী রকম পান-পান গন্ধ।

এই অভিজ্ঞতার কথা সুকুমারকে বলতে গিয়ে হাঁপাচ্ছিল অমৃতা। এমন চেপে আমায় জাপটে ধরেছে যে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কেন এমন করছে কাকিমা। আমি তো ছোট বাচ্চা নই।

খানিকটা বুঝেছিল, যখন কাকিমা বলে. এ-কথা কাউকে বলবি না কিন্তু। তিন দিব্বি দিলাম। তার মানেই ব্যাপারটা নিষিদ্ধ, গোপনীয়, সর্বসমক্ষে আলোচ্য নয়। তার মানেই, অমৃতার মনে হয়, এ-কথা আজকেই সুকুমারকে বলা দরকার।

সেই জামতলায় কী করে চুমু খেতে হয় অমৃতাই প্রথম শিখিয়েছিল সুকুমারকে। কী করে জড়িয়ে ধরতে হয়। সেই জামতলায় সুকুমার প্রথম ছুঁয়েছিল অমৃতার কচি কচি দুটি স্তন। কী তুলতুলে। অমৃতার

গায়ের ঘামে কী রকম আলাদা গন্ধ, সেইদিনই টের পেয়েছিল সুকুমার। ভয়ে, উত্তেজনায়, ভিজে গিয়েছিল ওর প্যান্ট।

অমৃতা বলেছিল, কাউকে বলবে না কিন্তু। তিন দিব্বি দিলাম।

এরপর একদিন সুকুমার ওদের বাড়িতে খেলতে গেছে, অমৃতার মা ওকে ডেকে বললেন, তুমি আর আমাদের বাড়িতে এসো না। অমি তো বড় হয়েছে, ও আর খেলবে না।

বলেছিলেন, এত বড় ছেলে, তুমি মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলো না কেন? মেয়েদের মতো এক্কা দোক্কা খেলা কি বেটাছেলেকে মানায়? যাও, বাড়ি যাও। আর কোনওদিন এসো না।

বাড়ি ফিরে গিয়ে সেদিন ও খুব কেঁদেছিল।

সেই অমৃতা আরও বড় হল। লম্বা হল। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে শুরু করল। দূর থেকে দেখে সুকুমার। কিন্তু ওদের মধ্যে আর বাক্যালাপ হয় না। বারোয়ারি পুজোয়, বিয়েবাড়ির উৎসবে পরিবারেব লোকেদের সঙ্গে সেজেগুজে আসে অমৃতা। যেন অন্য কোনও মেয়ে। সে সুকুমারের দিকে ফিরেও তাকায় না। ওই এক বিকেলে জামতলায় যে মধুব দুর্ঘটনা অমৃতা নিজেই ঘটিয়েছিল, তা যেন সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।

ওকে তো বিয়ের জন্যে তৈরি হতে হবে। বিয়ের পাত্রীকে পবিত্র কুমাবী থাকতে হয়। না হলে ববপক্ষ পছন্দ করবে কেন? পাড়ায়, প্রতিবেশীদের কাছে তারা খোঁজখবর নেবে, মেয়েটি সচ্চবিত্র কিনা। সব দিক থেকে আকর্ষণীয় আর শুদ্ধ প্রমাণিত হলে, তবে তো মেয়েদের বিয়ে হয়। অমৃতাব ভয় ছিল, ও পাপ করেছে। ওর হয়তো কোনওদিন বিয়েই হবে না।

ইঁদুরজীবন পেলে এর মধ্যে কত ছানাপোনা হয়ে যেত অমৃতার।

ইঁদুরজীবনে পুরুষকে উপার্জনক্ষম হতে হয় না। পাত্রীকে হতে হয় না সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা বা লাবণ্যময়ী। ইঁদুবদের পাত্রীপক্ষ জানতে চায় না পাত্রের শিক্ষাদীক্ষা কেমন, তার বাস-বিবরে কত গ্রাম শস্য জমিয়ে রাখা আছে। পাত্র একলাফে কতদূর যেতে পারে। পাত্রপক্ষ পাত্রীর লেজের দৈর্ঘ্য বা দাঁতের সূক্ষ্মতা ও ধার যাচাই কবার আগেই পাত্রপাত্রীর মিলন হয়ে যায়। ইঁদুবদের কামনা বাসনা সবই স্বপ্রকাশ। কিছুই অবদমিত থাকতে পারে না। দমনের ক্ষমতাই নেই ইঁদুবের। তাই ইঁদুব স্বপ্ন দেখে না। মানুষ স্বপ্ন দেখে। প্রজনন ক্ষমতা নিঃশেষিত হলে ইঁদুর এবং ইঁদুবের মতো অনেক প্রাণী আপনিই মরে যায়। মানুষ তার যুক্তি, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা আব বিজ্ঞান চেতনা খাটিয়ে আবিষ্কাব করেছে ঈশ্বব, পরজন্ম, গাত্রাবরণ, বাথরুম, আয়না এবং অপ্রয়োজনীয় স্বজাতির দীর্ঘজীবন। যাবা প্রজননক্ষম নয় বা কখনওই ছিল না, তাদের হাতেই মানুষ-সমাজের পরিচালনা ভাব ন্যস্ত। সুতরাং তারা কেবলই শাসিয়ে যায় জন্মহার কমাও। একটা বয়েসের পব স্বামী-স্ত্রী ভাইবোনের মতো বাস করবে। না পারলে পুরুষকে নির্বীজ করো, নারীর জরায়ু নিষ্ক্রিয় করে দাও। বৃদ্ধবহুল মানব সমাজকে দেখে ইঁদুরেরা—দূর থেকে দেখে, কাছ থেকে দেখে। আর নিশ্চয় হাসে। হাসলে ওদের দাঁতে প্রচণ্ড সুড়সুড়ি লাগে। সেই সুড়সুড়ি থামাতে ওরা নিরন্তর লেপ, তোশক, বালিশ, ধুতি শাড়ি কেটে গুঁড়ো করতে থাকে। তাতে যদি মরে বুড়োবুড়ির দল, কারণ মানুষের গায়ে প্রাকৃতিক লোম খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে। তাতে শীত আটকায় না।

একবার শুধু কোনও এক বারোয়ারি পুজোর সময় সুকুমার অমৃতার মুখোমুখি হয়েছিল। হলুদ রঙের শাড়ি পরেছিল অমৃতা। পিছনে দুলছিল দীর্ঘ বেণী। কপালে ছিল লাল রঙের টিপ। সখীদের সঙ্গে ঘুরঘুর করছিল পুজোমণ্ডপে আর অকারণে খুব হাসছিল।

সুকুমারের পরনেও ছিল পাটভাঙা ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি। ওর মাথায় টেরিকাটা ঢেউ খেলানো চুল। মসৃণ, কামানো গাল, সরু গোঁফ।

অমৃতাকে একটু একা পেয়ে সুকুমার ডাকল, এই শোনো।

অমৃতা মুখ ফিরিয়ে রইল। যেন শুনতে পায়নি।

সুকুমার আবার ডাকল। এই অমৃতা। একটা কথা শুনবে?

কী কথা? এমন ভুরু কুঁচকে কথাটা বলল যেন সুকুমার কোনও কুপ্রস্তাব করেছে।

কাছে এসো, বলছি।

ওখান থেকেই বলো।

তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।
ওঃ, এই।
আর, তুমি কেমন আছ?
কেমন আবার থাকব?
পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছ? পরীক্ষা দাওনি?
এত খবরে তোমার কী দরকার সুকুমার? তোমাকে আমার সঙ্গে মিশতে মানা করে দেওয়া হয়েছে, মনে নেই?
সুকুমাব একটু অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল। তবু সাহস সঞ্চয় করে, খানিকটা বেপরোয়াভাবেই বলল, কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে চাই। তোমাকে যে আমার ভাল লাগে।
আমার লাগে না। কেন তুমি আমার ক্ষতি করতে চাও?
ক্ষতি? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি, অমৃতা?
কেন তুমি আমায় চিঠি লিখেছিলে?
সে তো একবার। তুমি কি তার জন্যে বকুনি খেয়েছ বাড়িতে? আচ্ছা, আর কখনও লিখব না।
আমাদের বাড়ির কেউ তোমাকে পছন্দ করে না। তুমি জানো।
সুকুমার বলেছিল, আমিও খুব চেষ্টা করি তোমাদের বাড়ির সবাইকে অপছন্দ করতে। তোমার বাবাকে, মাকে তোমার দাদাদের আমার একটুও ভাল লাগে না। কিন্তু, কিন্তু কিছুতেই তোমাকে অপছন্দ করতে পারি না যে। তুমি কত ভাল। তুমি কত সুন্দর।
অমৃতা সন্ত্রস্ত হয়ে বুকের ওপর আঁচলটা টেনে নেয়। বলে, আবার অসভ্যতা করছ?
সেই সময়, অমৃতা একেবারে দূরে চলে যাওয়ার আগে সুকুমার শুধু আর দু'-একটা কথা বলতে পেরেছিল।
বলেছিল, তুমি স্বপ্নে যখন আসো, তখন কত ভাল ভাল কথা বলো আমাব সঙ্গে। কত ভালবাসার কথা বলো। আর এখন আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছ। আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করেছিলাম।
বিপুল উপেক্ষার হাসি হেসে অমৃতা বলেছিল, তোমার স্বপ্নে যেতে আমার বয়ে গেছে।
তারপর আবার সখীদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল সেদিন। নিভৃতে যে গোপন ব্যক্তিগত কথাগুলো বলেছিল সুকুমার, তাই নিয়ে হাসাহাসি করেছিল ওরা। ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে ওরা সবাই মিলে হেসেছিল খুব। খুব রাগ হয়েছিল সুকুমারের। সেই রাগ রাত্তিরবেলা কান্না হয়ে গলে পড়েছিল মাথার বালিশে।
এরপর সে কলকাতায় চলে আসে।
কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে আবার যখন বাড়ি ফিরে যায়, তখন শোনে, অমৃতার বিয়ে ভেঙে গেছে। বহু পাত্রপক্ষেব সামনে পরীক্ষা দিতে দিতে যখন সে ক্লান্ত, তখন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বর্তমানে কলকাতা শহরের এক পাত্রপক্ষ ওকে পছন্দ করেছিল। দেনাপাওনার দরাদবিতেও মীমাংসা হয়েছিল একরকম। তারপর যখন আশীর্বাদের দিন সব ঠিকঠাক, তখন পাত্রপক্ষের কাছে এক উড়ো চিঠি যায়। চিঠি এই মর্মে যে, এই পাত্রীর এক প্রেমিক আছে। এখানে বিয়ে দেওয়া নিরাপদ হবে না। এতদিন ধরে পরিশুদ্ধ কৌমার্য রক্ষা করার পরও ওদের কাছে অমৃতা গ্রহণযোগ্য হল না।
অমৃতার বাবা অনেক চেষ্টা করেছিলেন ওদের মন থেকে সংশয় নিরসন করতে। বলেছিলেন, আমি বাপ হয়ে বলছি, এ রকম কোনও ব্যাপার নেই। থাকলে, আমি জানতাম। আমি তো মেয়ের জীবনে অশান্তি আসুক তা চাই না। এ কোনও অনিষ্টকারী প্রতিবেশীর কাজ। আপনারা এই উড়ো চিঠির মূল্য দেবেন না।
তবু তারা ঝুঁকি নিতে চায়নি। পিছিয়ে গেছে। অমৃতার বাবার হাতে চিঠিখানা দিয়ে দিয়েছে। ওঁরা সন্দেহ করছেন এ হয়তো সুকুমারের কাজ। কিন্তু সে তো কলকাতার কোনও মেসেটেসে থাকে। এখানকার খবর এত বিশদভাবে ওর জানার কথা নয়। তবু, আর কাউকে সন্দেহ করতে না পেরে অমৃতার বাড়ির লোকেরা সুকুমারকেই এই চিঠির লেখক হিসেবে শনাক্ত করলেন। কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করলেন না। তাতে মেয়ের নামে কলঙ্কই বাড়বে। বিলাসপুরের বাঙালি সমাজ খুব ছোট।

বিয়ে ভেঙে গেছে, এই খবরটুকু জেনেই সুকুমার ওদের বাড়ি গিয়েছিল। আর কিছু ও জানত না।

অনেকদিন আগে অমৃতার মা সুকুমারকে বলেছিলেন তুমি এ-বাড়িতে আর এসো না। তখন পরিস্থিতি ছিল অন্য রকম। আজ এতদিন পর পরিস্থিতি অনেক বদলেছে। ও-বাড়ি আগে যেমন গমগম করত এখন সেই তুলনায় অনেক স্তিমিত। বাড়ির ছেলেরা বড় হয়ে বাইরে টাইরে চলে গেছে। মেয়েদের অনেকের বিয়ে হয়ে গেছে। অমৃতার মাকে দেখে সুকুমারের মনে হল, তাঁর বয়েস গত সাত-আট বছরে যেন কুড়ি বছর বেড়ে গেছে। শরীরে এসেছে বার্ধক্যের ছাপ।

এবারে তিনি সুকুমারের সঙ্গে অপ্রিয় আচরণ করলেন না। কিন্তু কথায় কথায় ওই বেনামি চিঠির উল্লেখ করলেন। বললেন, অপরের অনিষ্ট করে কার কী লাভ হয় কে জানে। সুকুমার বলল, এ ভারী অন্যায়। এ কোনও কাপুরুষের কাজ মাসিমা।

মাসিমা ওদের নাম ধাম পরিচয় দিলেন। কলকাতার ঢাকুরিয়ার কাছাকাছি কোথায় বাড়ি করেছে তার ঠিকানার কাগজ দেখালেন। পাত্র কোথায় চাকরি করে, তাও জানালেন। বললেন, অবস্থাপন্ন ঘর, তবে দেশ-ঘর ছেড়ে আসার পর ওদের অবস্থা খানিকটা পড়ে গেছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের লোকেরা তো খুব উদ্যোগী হয়, আবার দাঁড়িয়ে উঠছে। অমৃতাকে ওদের পছন্দ হয়েছিল।

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এদের চেনো?

না মাসিমা। আমি কী করে চিনব? আমি তো কলকাতার একেবারে উলটো দিকে থাকি। এতদিন নিজের পড়াশোনা করেছি। অবসর সময়ে টিউশনি করেছি। সামাজিকভাবে মেলামেশা করার কোনও অবকাশই ছিল না।

তা হলে কে এই চিঠি লিখল?

হঠাৎ হকচকিয়ে গিয়ে সুকুমার বলে, আপনারা কি আমাকে সন্দেহ করছেন? ছিঃ ছিঃ, আমি এ-কাজ করতে পারি? অমৃতার অনিষ্ট আমি করতে পারি? কী করে ভাবলেন আপনারা?

মাসিমা বললেন, কলকাতায় থাকো তো। তাই মনে হল আর কী।

কলকাতা কি এতটুকু জায়গা মাসিমা!

অমৃতাকে তো তুমি পছন্দ করতে। তাই বলছি।

ইঙ্গিতটা বুঝল সুকুমার। ইতিমধ্যে অমৃতা চা নিয়ে এসেছে। সঙ্গে কিছু জলখাবারও। কথাবার্তা বলছে স্বাভাবিকভাবে। প্রসন্নভাবে। চিঠিটার প্রসঙ্গে ও বলল, মা, কেন তুমি অকারণ ভাবছ বলো তো? তোমার ভাবনার কোনও মাথামুন্ডু নেই। আমার কী মনে হয় জানো?

কী?

ওই চিঠি ওরাই তৈরি করেছে নিজেরা। তুমি তো বাঙালদের চেনো না। ওদের মেয়েরা সব কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেখে। পাশ করে ছেলেদের মতো চাকরি করে। কলকাতার রাস্তায়ঘাটে ঘোরা ওদের অভ্যেস। আমি ওদের সংসারে খাপ খেতাম না। আমার কোনও ডিগ্রি নেই। চাকরি করার যোগ্যতা নেই। এইসব কথা হয়তো পরে ভেবেছে ওরা। তখন তো কথা ফিরিয়ে নিলে অভদ্রতা হয়, তাই এই চালাকিটা করল। আর তুমি তাতেই ভেঙে পড়লে। কলকাতার লোকেরা এই রকম। আমরা দূরে থাকি তো। বুঝতে পারি না।

সেদিন এইভাবেই কথাবার্তা শেষ হয়েছিল।

আজ এতদিন পরে সব কথা স্পষ্টভাবে মনে পড়ে না। এটুকু স্মরণে আছে যে, অনেক হাঁটাহাঁটি করে, কলেজের অধ্যাপকদের কাছ থেকে সুপারিশ আদায় করে শেষপর্যন্ত একটা স্কুলের মাস্টারির কাজ জোগাড় করেছিল সুকুমার। সরকারি চাকরির জন্যে পরীক্ষাও দিয়েছিল। কিছুদিন মাস্টারি করার পর সরকারি চাকরিটা ওর জুটে যায়। বদলির কাজ। কৃষ্ণনগরে পোস্টিং। সেখানে দু'খানা ঘর ভাড়া করে পুরোপুরি চাকরিজীবন শুরু করেছিল। সুকুমারের মা-বাবা তখন ওকে বিয়ে করার জন্যে চাপ দিতে শুরু করেন।

কলকাতা থেকে আত্মীয়দের চিঠি আসতে শুরু করে। সেইসব চিঠির মধ্যে পাত্রীদের ঠিকুজি-কোষ্ঠীর নকল, ফটোগ্রাফ—তাদের বংশপরিচয়। চিঠি-চালাচালি চলতে লাগল মহা উৎসাহে।

একবার ছুটিতে বিলাসপুরে গিয়ে শুনল সুকুমার যে, আয়োজন সব প্রস্তুত। ওকে তিনখানা ছবি দেখানো হবে, তার মধ্যে থেকে যেটা ও বেছে নেবে, সেই ওর জীবনসঙ্গিনী নির্বাচিত হচ্ছে বলে গণ্য

হবে। ছবি দেখে জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করা। বাকি কাজ আত্মীয়স্বজনেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করে রেখেছেন। আলাপ পরিচয় ভালবাসা—এ-সব স্বাভাবিক নিয়মে বিয়ের পরে তো হবেই। সাতপুরুষ ধরে এই প্রক্রিয়ায়ই তো হয়ে আসছে।

সুকুমার বলেছিল, ছবিটবি দেখার আগে আমি অমৃতার সঙ্গে কথা বলে আসতে চাই।

অমৃতা! আকাশ ভেঙে পড়েছিল বাড়ির লোকজনের মাথায়। কেউ বলেছিল, ওবা তো কায়স্থ। কেউ বলেছিল, ওর বয়েস অনেক বেশি। কেউ বলেছিল, অমৃতার কোনও গণ্ডগোল আছে, যে জন্যে ওর বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে বার বার। অমৃতা মোটেই সুকুমারের উপযুক্ত নয়।

সাইকেল নিয়ে ছুটে গিয়েছিল সুকুমার। বাড়ির কোনও নিষেধই মানেনি সে। অমৃতাকে গিয়ে সোজা প্রশ্ন কবেছিল, আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, তুমি কি রাজি হবে?

অমৃতা নাবালিকা নয়। সে বলেছিল, তোমার তো অন্যত্র বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে বলে শুনেছি।

কথাবার্তা চলছে বাড়িতে। আমাকে না জানিয়ে ওরা খানিকটা এগিয়েও গিয়েছে। এ-কথা ঠিক। কিন্তু আমাব সম্মতি ছাড়া তা কী করে সম্ভব? সম্মতি জানাবার আগে আমি তোমার মতামত জানতে চাই।

তুমি কি সবদিক বিবেচনা করে বলছ?

হ্যাঁ।

তা হলে, চলো, আমরা মায়ের কাছে যাই। তাঁর সামনেই কথা হোক।

সুকুমার বলেছিল, মাসিমা, আজ আর বলতে সংকোচ নেই, অমৃতাকে আমি অনেকদিন ধরেই ভালবাসি। আজ সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। আমি ওর হাত ধরে সংসার জীবনে প্রবেশ করব, এমন আশা আমার ববাববের। কিন্তু মুখ ফুটে এ-কথা এতকাল প্রকাশ কবিনি। অমৃতার ইচ্ছে কী, তাই জানতে আজ এলাম।

মুখ ফুটে কিছু বলোনি, এ-কথা ঠিক নয় তো সুকুমার। অমৃতা ছলছল চোখে হাসতে হাসতে বলেছিল, তোমাব সেই চিঠিখানা আমার কাছে এখনও আছে।

তুমি তো সে-চিঠিব উত্তর দাওনি।

অমৃতা বলেছিল, উত্তব দিয়েছি। অন্যভাবে।

অন্যভাবে কী উত্তর দিয়েছিল অমৃতা, সেটা সুকুমার জানল বিয়ে হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুকাল পরে। কৃষ্ণনগরের বাসায় দু'জনে এসে উঠেছে। খুবই ছোট জায়গা। নামেই দু'খানা ঘর। একটা খুবই ছোট। রান্নার জায়গা, বাথরুম বাসার পেছন দিকটায়, খানিক তফাতে। অমৃতাকে উনোন ধরাতে হয়। জল টানতে হয়।

সুকুমার ওর বউয়ের কষ্ট দেখে বলেই ফেলেছিল, বেনামি চিঠিটা না গেলে, আজ তুমি এর চেয়ে অনেক সুখে থাকতে।

অমৃতা বলল, ওই চিঠিটা আমিই লিখেছিলাম।

তুমি? আব তোমাদেব বাড়ির লোক আমাকে সন্দেহ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, আমি বিয়ে ভেঙে দিয়েছি তোমার। কী অন্যায়। সেটা যে কিছুতেই সম্ভব ছিল না, তোমবা একবার ভাবোনি! কিন্তু, তুমিই বা কেন লিখলে?

তুমিই তো আমাকে দিয়ে লিখিয়েছ। একদিন স্বপ্নের মধ্যে এসে বললে, এ-বিয়ে তোমাব হতে পারে না অমৃতা। তুমি জানিয়ে দাও, আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। স্বপ্নেও তুমি এমন বোকা বোকা কথা বলতে যে, জেগে উঠে আমি হেসে মরি।

বলে, অমৃতা সুকুমারের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

তার পরের বছর তপনের জন্ম হল। তখন সুকুমারের মা ওদের সংসারে এসে অনেকদিন ছিলেন। পা ছড়িয়ে রোদে বসতেন। শিশুকে টান করে শুইয়ে তেল মাখাতেন গায়ে। বলতেন, ইঁদুরছানার মতন চোখ পিটপিট করে কেন রে?

ইঁদুর আর ইঁদুরি, বাঘ আর বাঘিনী, বেড়াল আর বেড়ালির বেলা যেটা ঋতুভিত্তিক জৈব তাড়না, মানুষের বেলায় সেটা ভালবাসা। সেটা প্রেম। তাতে কত বৈচিত্র্যের ঘটা। কত রাখঢাক। কত লজ্জার মধুরতা। সকল প্রাণী আর উদ্ভিদের স্রষ্টা—তেমন স্রষ্টা যদি কেউ থাকেন—দূর থেকে হয়তো সবকিছু সমানই দেখেন। তাঁর কাছে অট্টালিকা আর উইঢিবির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। মানুষ ভাবে, সে ছাড়া

আর কোনও প্রাণীর মন নেই। সত্যি কি নেই? মন না থাকলে ওই ক্ষুদ্র পিঁপড়ে এই মার্চ মাসে সার বেঁধে কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে? কেন প্রত্যেক পিঁপড়ের মুখে একটি করে ডিম?

সেদিন রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে সুকুমার এইসব এলোমেলো চিন্তা করছে। ঘুমের ওষুধ খেয়েছে ঠিক সময়ে কিন্তু ঘুম আসছে না। তপু আর সোমা এখনও ফেরেনি। অন্যদিন ওদের গাড়ির শব্দ, গেট খোলার ক্যাঁচ, কানে এলে বুঝতে পারে ওরা ফিরল। বাবাঃ, নিশ্চিন্ত। এত দেরি করে না রোজ। আজ কী হল ওদের? কোনও বিপদআপদ ঘটেনি তো?

ডবল বেডের বাকি আধখানা জুড়ে অমৃতা শুয়ে আছে। গায়ে চাদর ঢাকা। মুখটা শুধু বার করা। ওই মুখের ওপরে ঠিক নয়, পাশটাতে, বালিশের ওপর, বাইরে থেকে আলো পড়েছে। পরদার ফাঁক দিয়ে জলের ছিটের মতো ঢুকছে আলোটা। ওর ওই রকম পাশ ফিরে শোয়া, তানপুরোর মতো ওর মাজার ছাঁচ সুকুমারের সবচেয়ে প্রিয় দৃশ্য। আজ তিরিশ বছর ধরে দেখছে, অনুভব করছে, তবু যেন ফুরোয় না। পুরনো হয় না।

না। এ-কথা ঠিক নয়। অমৃতা ফুরিয়েই গেছে। ওর শরীরে আর আগের মতন তেমন রস নেই। শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে একসময় সুকুমারের শরীরে উত্তেজনার বোধ জাগে। উদ্বেগ আর স্মৃতি ফেরাফেরি করতে করতে কামভাব জাগিয়ে দিয়ে যায়। অনেকদিন পর ওর স্নায়ু গরম হয়ে উঠেছে পশুর মতো।

একবার ভাবল, অমৃতাকে ডাকবে। আবার ভাবে, থাক, ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। অনেকদিন ধরেই তো ও সুকুমারকে এই অবস্থায় সাহায্য করছে না। এই কামের উপশম ও এককভাবে করে নেবে। অমৃতার এই দিকটা বুজে গেছে, তবু বেঁচে আছে ও। ইঁদুরি হলে ওকে বাঁচতে হত না। আছে, যেহেতু মানুষ।

বাথরুম থেকে বেরোচ্ছে, এমন সময় নীচে সত্যি সত্যি গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। চুপি চুপি জানলার ফাঁকে গিয়ে দাঁড়াল প্রশমিত স্নায়ু সুকুমার। পরদা সরিয়ে দেখল। তপু নামছে, সোমা অন্য দরোজা দিয়ে নামল। দু'জনেই একটু একটু টলছে। তপু গেট বন্ধ করল। আবার ক্যাঁচ করে পরিচিত শব্দটা। গাড়ির দরোজায় চাবি দিল তপু। দরোজাটা টেনে দেখছে বন্ধ হয়েছে কিনা। কাচগুলো ছুঁয়ে দেখছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকবক করছে সোমা। ইংরেজি, বাংলা মিশিয়ে কী বলছে, দোতলা থেকে বোঝা যাচ্ছে না। সুকুমার শুধু দুটো শব্দ শুনতে পাচ্ছে বার বার। 'হোয়াই' আর 'না'। এত 'হোয়াই' আর এত 'না' অমৃতা সাবাজীবনে সুকুমারকে শোনায়নি।

কৃষ্ণনগর থেকে বদলি হয়ে রামপুরহাট। রামপুরহাট থেকে প্রমোশন পেয়ে ডায়মন্ডহারবারে থেকেছে সুকুমার। তারপর থেকে কলকাতায়। তপু ইংরেজি মিডিয়ম স্কুলে পড়েছে ক্লাস ফাইভ থেকে। তারপর স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে চলে গেছে খড়্গপুর কলেজের হস্টেলে। ওদের ক্লাসে ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে পড়ত। এই সুবিধে সুকুমারদের সময়ে ছিল না। থাকলেও ওর ভাগ্যে মেলামেশার সুযোগ জোটেনি। এম. এ পড়ার সময় ছাত্রীরা অধ্যাপকের সঙ্গে ক্লাসে ঢুকত। ফার্স্ট বেঞ্চে বসত। আবাব ক্লাস শেষ হলে অধ্যাপকের পিছু পিছু বেরিয়ে যেত।

সুকুমার জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে, তোর কোনও মেয়েবন্ধু নেই?

না।

কেন? ওরা কি ছেলেদের সঙ্গে মেশে না?

মেশে। খুব মেশে। ভাল ছেলেদের পেছনে পেছনে ঘোরে। চালিয়াত ছেলেদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে।

তুইও তো ভাল ছেলেদের একজন।

আমি ওদের পছন্দ করি না।

মেয়েদের কম্পানি পছন্দ করিস না? সে কী রে? আমাদের সময় মেয়েরা একটু কথা বললে, কি একটু হাসলে তো আমরা বর্তে যেতাম। অন্যরা হিংসে করত।

ওরা ভারী মিন হয়। তপন ঠান্ডা গলায় বলেছিল।

মেয়েরা মিন হয়, স্বার্থপর হয়, কেবল ভাল ছেলেদের কাছ থেকে নোট আদায় করার জন্যে তাদের পিছু পিছু ঘোরে। মাস্টারমশাইদের খোশামোদ করে, সেক্স অ্যাপিল দেয়, এইসব গুরুতর অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণ ক্লাস নাইনে ওঠার আগেই তপুর হয়ে গিয়েছিল।

সুকুমারের মনে হত পরের প্রজন্মে এই মানসিক ঝোঁক, এই টানের অভাব, এই আলাদা-আলাদা

ভাব খুব সুস্থ লক্ষণ নয়। এরা প্রথম জীবনে পরস্পরকে বুঝতে চাইছে না, পরে পরস্পরকে ভালবাসবে কী করে? প্রকৃতিকে, প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করে এদের জীবন চলবে? মানুষ বুদ্ধিমান হবে অবশ্যই, বিচক্ষণও হবে। মানুষের মনে একটু মোহও তো থাকা দরকার।

মোহ সৃষ্টি করে আবেগ। আবেগ আনে জীবনের প্রতি আকর্ষণ। সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেলে মানুষ অসামাজিক, নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে। তপুর হাবভাব দেখে ওর ভয় করে।

দেখতে দেখতে ওর ছেলে বড় হল। বাবা-মাকে বুড়ো করে দিয়ে তপু ঢ্যাঙা হৃষ্টপুষ্ট এক যুবক হয়ে ওদের ঢেকে ফেলল প্রায়।

অমৃতা ঘ্যান ঘ্যান করত, এবার বল, তোর বিয়ের জন্যে চেষ্টা করি।

তপু বলত, থামো তো মা।

তপু মোটরবাইক কিনল। অমৃতা তাতেও বাধা দিয়েছিল। সুকুমার বলেছিল, আরও কিছুদিন সবুর করে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনলে পারতিস। অনেক নিরাপদ।

তখনও তপু বলেছিল, তোমরা থামো তো।

ওরা তো থেমেই আছে। দেখছে, সকাল আটটা বাজতে-না-বাজতে তপু আপিস যাচ্ছে। রাত দশটায় ভটভট শব্দ করতে করতে বাড়ি ফিরছে। রবিবার কি ছুটির দিনে নিজের দেড়তলার ঘরে বসে একা একা গান বাজায়। টিভি দেখে। মনে স্থিরতা নেই। কোনও একটা চাকরিতে লেগে থাকছে না। বাড়ি সম্পর্কেও ছাড়া-ছাড়া ভাব। অমৃতা মা, তার একমাত্র সন্তানকে তার পছন্দমতো খাবার রান্না করে খাওয়ায়। তার জামা কেচে দেয়। আর কোনওভাবে ওকে সাহায্য করার ক্ষমতা অমৃতার নেই। মাকে দিয়ে পুরুষের সব প্রয়োজন মেটে না।

এই ছেলেই একদিন মোটরবাইকের পেছনে বসিয়ে সোমাকে বাড়িতে নিয়ে এল। পরিচয় করাল, আমার কলিগ। সেই কলিগ কিছুদিন পর খাতায় সই করে বউ হয়ে এল বাড়িতে। সুকুমার তিনতলাটা মেরামত করিয়ে ছেড়ে দিল ওদের। অমৃতা গুছিয়ে দিয়ে এল ওদের প্রাথমিক সংসার। নতুন বউয়ের জাত-গুষ্টি বংশপরিচয় কিছুই জানল না। দেখল, এরপর মোটরবাইক গিয়ে নতুন মারুতি এসেছে।

কিন্তু কেমনতবো এ-সংসার, ওরা বুঝে উঠতে পারে না।

সুকুমার বলেছিল, কোম্পানির ফ্ল্যাটে থাকলে বাড়িভাড়া বাবদ ভাতা পাবে না। এখানে থাকলে সেটা পাবে, বাঁচবে। উপরন্তু, তুমি যে হারে চাকরি বদলাচ্ছ, তাতে কোনও এক আস্তানায় বেশি দিন থাকবেই বা কী করে। নিজের বাড়িতে থাকো, তোমাদের স্বাধীনতার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সেই যে ভাতাটা বেঁচে গিয়েছিল, তপু টাকাটা বাবাকে প্রতি মাসে দিয়ে যাচ্ছে। ভাড়াটে যখন ছিল, সে দিত মাত্র আড়াইশো টাকা। তপু দেয় বারোশো। আর, যেহেতু এটা ওর নিজের বাড়ি, তার অনেক সুবিধে তপুরা এমনিই পেয়ে যাচ্ছে।

একদিন সকালে তিনতলাব কাজের লোক মানসী একটা বিগশপার বোঝাই কাপড়চোপড় দোতলায় নামিয়ে দিয়ে গেল। লন্ড্রিতে দিতে হবে। সেই সঙ্গে একটা খাম—টাকার খাম।

ও যেমন ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসে, তেমনই দ্রুত, মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা না করে বলে গেল, এর মধ্যে দাদার দুটো প্যান্ট, চারটে শার্ট, বউদির একটা জিন্স, তিনটে শাড়ি আছে। বউদি বলেছে, শাড়ির রং যেন নষ্ট না হয়। দাদার সাদা প্যান্টে একটা দাগ আছে, সেটা যেন তুলে দেয়।

সুকুমার দাড়ি কামাচ্ছিল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলে, এগুলি তুমি দিয়ে আসতে পারো না?

আমি ও-দোকান চিনি না।

চলো, আমি তোমায় চিনিয়ে দিচ্ছি। এত বোঝা রোজ রোজ আমি টানব কেন?

মানসী বলে, এ বাড়ির লন্ড্রি তো যাবেই, সেই সঙ্গে দিয়ে দেবেন। ওরা যখন বেরোয় তখন দোকান খোলে না।

আর একদিন ওপর তলার চাবিখানা অমৃতার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মানসী বলে, বাথরুমের কল থেকে জল পড়ে যাচ্ছে। মিস্ত্রি ডেকে বন্ধ করতে হবে। আমি বিকেলবেলা এসে চাবি নিয়ে যাব।

সুকুমার চেঁচিয়ে উঠে বলে, এ-সব কি আমার কাজ? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে মানসী অপেক্ষা করে না।

অমৃতা বলে, তুমি বাড়িওলা বাবা, তোমার জলের ট্যাঙ্ক যাতে খালি হয়ে না যায়, সেই জন্যে

মেরামত করতে বলেছে। না করলে জল পড়ে যাবে। বার বার পাম্প চালাবে। আগের ভাড়াটের জন্যে কি তুমি করোনি। তোমার তো কোনও কাজ নেই। সংসারের দুটো-একটা সামান্য কাজেও যদি না লাগো, তো কর্তা হয়ে বসে আছ কেন?

তুমি যাও না। তুমি তো এ-বাড়ির গিন্নি।

আমি তো রান্না করি। দুটো সংসারের রান্না আর ভাঁড়ার সামলাতে আমায় হিমশিম খেতে হয়। এ-কথা তুমি বলতে পারলে! তপু আসুক, কাঁদো কাঁদো গলায় অমৃতা বলে, আমি ওকে বলব, ওরা যেন উঠে যায়।

সুকুমার এ-কথায় আবও রেগে যায়।

তপু আসুক! কত ঘন ঘন আসছে।

সময় পায় না।

নীচের তলায় মা-বাবার সঙ্গে এক মিনিট দেখা করার সময় পায় না। রোজ এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছে! তুমি আর ওদের গুণ গেয়ো না। দিন দিন সেনাইল হয়ে যাচ্ছ।

অমনি দপ করে জ্বলে উঠল অমৃতা। আর তুমি দিন দিন নবকুমার হচ্ছ বুঝি? মুখটা তো ঝুলে গেছে। চোখের নীচে দুটো ফোলা ফোলা ব্যাগ। যত বলছি, একবার ব্লাড প্রেশারটা দেখাও, কথা কানেই নিচ্ছ না। আমি যেন এ-বাড়ির ঝি।

টু দি পয়েন্ট কথা বলো অমৃতা। কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে গেলে। না পারো তো চুপ করে থাকো।

অমৃতা বিড়বিড় করে—সারাদিন চুপ করেই তো থাকি। কথা বলার লোক কোথায়?

সুকুমার ঠেস দিয়ে বলে, কেন, ওপর তলায় ছেলে-বউ আছে। ওদের বাড়ি একদিন বেড়িয়ে এসো না। নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খেলা করে এসো। তারা ঠামা ঠামা করে তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইচ্ছে করলে ওখানে থাকতেও পারো।

অমৃতা বলে রাগের মাথায়: থাকতে পারি বই কী। ইচ্ছে করলেই পারি। তোমার কথা ভেবে থাকি না। তোমার সেবা করতে করতে সারাজীবন গেল আর এখন বুড়ো বয়েসে তোমাকে ছেড়ে চলে যাব, দেখতে খারাপ লাগবে।

এবার সুকুমার গজগজ করে, আঃ, কত পিরিত।

ক'দিন ধরে গাড়িটা বেরোচ্ছে না। একদিন সুকুমার অমৃতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, ওরা কেমন আছে কে জানে।

উদ্বেগ একটা ছিল মনে। মানসী মেয়েটাও ক'দিন ধরে আসছে না। উৎপাত করুক আর বিরক্তই করুক, ওব মারফত তো খবরাখবর আদান-প্রদান হচ্ছিল।

সুকুমার সেদিন একটু সকাল সকাল ভাত খেয়ে বেরিয়েছে। ব্যাঙ্কে কী সব কাজ আছে। সেরে ফিরবে। অমৃতা এক বাটি মোচার ঘণ্ট নিয়ে চুপি চুপি ওপর তলায় উঠে গেল। একটু ভয় ভয় করছিল ওর। কী জানি, গিয়ে কী দেখবে।

তিনতলায় উঠে গিয়ে দেখল, দরোজা ভেজানো। পাল্লাটা একটু ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপর পা টিপে টিপে এ-ঘরে ও-ঘরে উঁকি মারল। দেখল দু'ঘরে আলাদা বিছানা। আলমারি, আলনা, লেখাপড়ার টেবিল যেন নিজের নিজের। একটা ঘরের বিছানায় তপু শুয়ে ঘুমোচ্ছে। অন্য ঘরটা উলটুল।

পায়ের শব্দ পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল তপু।

আরে, মা! তুমি! তুমি কেন?

কেন আবার? তোকে দেখতে এলাম।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে তপন বিছানা থেকে পা দুটো ঝুলিয়ে ঠিক করে বসে। অমৃতা দেখে, ওব চোখ দুটো বেশ লাল। মুখে অপ্রস্তুত থমথমে ভাব। কাছেই একটা চেয়ার ছিল, সেটাতে বসে পড়ে।

কী বলবে ঠিক করতে না পেরে তপন বলে, দরোজা কি খোলা ছিল? তুমি বেল দাওনি। ওহো, কালকে টেনে দিতে ভুলে গেছি।

সারারাত এইভাবে দরোজা খোলা রাখিস, কোনদিন চুরিটুরি হয়ে যাবে।

তপন বলে, তোমার হাতে ওটা কী?

একটু মোচার ঘন্ট। কোথায় রাখব?

তুমি আমাকে দাও। তপনের মুখে কৃতজ্ঞতা ফোটে।

মোচার ঘন্টর বাটিটা হাতে নিয়ে তপন ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে দিয়ে আসে। বাথরুমে যায়। মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে আবার বেরোয়।

তোর শরীর খারাপ?

না তো।

সোমাকে দেখছি না?

ও ট্যুরে গেছে। শনিবার ফিরবে।

কী মনে হয়, অমৃতা উঠে গিয়ে ছেলের কপালে হাত রাখে। না জ্বর নেই। টেবিলটার ওপরে এক প্রকান্ড অ্যাশট্রে। তার মধ্যে পোড়া সিগারেট ডাঁই হয়ে আছে।

এত সিগারেট খাস কেন? ভাল না।

তপন একথার উত্তর দেয় না। বলে, বাবা ভাল আছে? তোমার শরীর ঠিক আছে তো?

অমৃতা বলে, ওই ভালয়-মন্দয় মিলিয়ে আমরা আছি। তুই মাঝে মাঝে খবর নিলে তো পারিস। একেবারে ভুলে গেলি আমাদের।

সময় হয় না মা।

বলতে গিয়ে নিজের কানেই খটকা লাগল। একটু থেমে বলল, আমি বুঝি, তোমরা আমার সম্পর্কে হতাশ হয়েছ। আসলে কী জানো? আমরা দু'জনেই কাজ করি তো। বাড়িতে ফিরেও কাজ করতে হয়। ওই দেখো না, আপিস থেকে মেশিন বসিয়ে দিয়েছে।

টাইপ মেশিন?

মৃদু হেসে তপন বলে, কম্পিউটর। ক'দিন ছুটিতে আছি। রাত জেগে অনেক কাজ করতে হয়েছে। বিশ্রাম নিচ্ছি। মোটা টাকা মাইনে দেয় কোম্পানি, তার বিনিময়ে রক্ত শুষে নেয়।

আলটপকা অমৃতা বলে, তোরা আলাদা ঘরে শুস? জোড়া খাট করে দিলাম, সরিয়ে দিলি?

পোষায় না মা। আমাদের অনেক অভ্যেসই একরকম নয়। ও পাখা ছাড়া শুতে পারে না। আমার পাখায় শীত লাগে। ওর আলোয় কষ্ট হয়, আমি আলো জ্বেলে পড়াশোনা করি অনেক রাত অবধি। এই বকম আর কী। দু'খানা শোবার ঘর যখন আছে, তখন কষ্ট করব কেন?

কষ্টই তো করছ বাবা। স্বামী-স্ত্রী মিলেমিশে থাকতে ইচ্ছে করে না? অসুবিধে একটু আধটু হলে সহ্য কববে। সহ্য আমবা করিনি?

ও তুমি বুঝবে না, মা। এখন দিনকাল অনেক বদলে গেছে। তুমি তো কোনওদিন স্বাধীন ছিলে না। তপু বলল।

স্বাধীনতাব কথায় একটু থমকে যায় অমৃতা। কথা ঘুরিয়ে বলে, বাড়িতে একটা বাচ্চাকাচ্চা নেই। খেলনাপাতি নেই। এতেই সুখ তোমাদের। এত টাকা রোজগার করছ দু'জনে মিলে। কার জন্যে?

তপন বলে, নামেই এত টাকা! হাতে কিছুই থাকে না আমাদের। এই দেখো না, মার্চ মাসে আমাকে সাত হাজার টাকা ট্যাক্স দিতে হল। সোমাকে তিরিশ হাজার টাকার ইউনিট কিনতে হয়েছে।

এই যদি অবস্থা, তা হলে আমাদের কী করে চলছে একবার ভেবে দেখেছিস তপু?

কেন, বাবার তো পেনশন আছে। জমানো টাকা থেকে সুদ পায়। আমি বারোশো টাকা করে দিই।

তাতে আর কুলোয় না।

আমাকে বললেই পারতে মা। আরও কিছু টাকা বাড়িয়ে দিতাম।

অমৃতা বলে, ওসব কথা আমি কোনওদিন বলব না। বললে, তোর বাবাই বলবে। যতদিন খুব ঠেকায় না পড়ছে, ততদিন মুখ ফুটে বলবে না। বাবাকে তো তুমি চেনো।

তপন একটুক্ষণ কিছু চিন্তা করল। তারপর নিজের ঘরের লোহার আলমারিটা খুলল আস্তে আস্তে। দুটো পাঁচশো টাকার নোট বার করে মায়ের হাতে দিয়ে বলল, এটা তোমার কাছে রাখো মা। তোমার খুশিমতো খরচ করবে। বাবাকে দিয়ে দিয়ো না যেন।

ছেলের দেওয়া রোজগারের টাকা গর্বের সঙ্গেই হাত পেতে নিল অমৃতা। জিজ্ঞেস করল, দুপুরে খাবি কী?

ফ্রিজে সব সেদ্ধ করে রাখা আছে। কয়েকটা বার করে মেশিনে ঘুরিয়ে নেব। আর তোমার দেওয়া মোচার ঘণ্ট তো পেয়ে গেলাম।

সুকুমার এসব কিছুই জানে না। অমৃতা বলেনি। মেশিনে ঘুরিয়ে দিলে রান্না হয় কী করে, সে-কথাও জানতে চায়নি সুকুমারের কাছে।

সুকুমার বাইরে বেরিয়েছিল। সেখান থেকে অন্য সব কাজ সেরে একখানা চিঠি টাইপ করিয়ে নিয়ে এসেছে। তপনের আর সোমার যুগ্মনামে উদ্দেশ করা সে চিঠির বয়ান। খুব যত্ন করে ছাপা।

তাতে বলা আছে, সামনের মাস থেকে তোমাদের থাকার খরচ নিম্নরূপে নির্ধারিত হল। সেকেন্ড ফ্লোরে দু'খানা বেডরুম যুক্ত সম্পূর্ণ একটি ফার্নিশড সুইট। দৈনিক তিনশো টাকা। টিফিন সাপ্লাই—দৈনিক তিরিশ টাকা হারে মাসে ন'শো টাকা। রুম সার্ভিস, লন্ড্রি, লিনেন, গ্যারাজ প্রভৃতি ফেসিলিটি বাবদ দশ শতাংশ অতিবিক্ত। সর্বসাকুল্যে মাসে এগারো হাজার টাকা। পরের মাসেব সাত তারিখের মধ্যে পেমেন্ট করলে এক হাজাব টাকা ডিসকাউন্ট। এই চিঠির সঙ্গে গাঁথা একটা বিল। তাতে হিসেবের অঙ্ক।

চিঠিব শেষে একটা ছোট প্যারাগ্রাফ:

এই ব্যবস্থায় অসুবিধা থাকলে বাড়ি ছেড়ে দেওয়া যাবে। এই চিঠিকে সে-ক্ষেত্রে তিনমাসেব নোটিশ হিসেবে গণ্য করবে। সরু নিব দিয়ে ইঁদুবের দাঁতের মতো মিহি আর সূক্ষ্ম অক্ষরে সেই চিঠির নীচে সই কবল সুকুমাব সান্যাল। মানুষ। ব্রাহ্মণ।

১৯৯৬

❁ মাছের ডিম ও মহাপুরুষ

আমি জানি, মানুষেব ওপব বিশ্বাস হারানো পাপ। আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনে বহুক্ষেত্রে চেষ্টা কবেছি মানুষকে বিশ্বাস করতে। মোটামুটিভাবে সফলও হয়েছি, এ-কথা কবুল করতে আমার লজ্জা নেই।

কিন্তু গত বাইশ বছরের বাজার করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, মাছুয়া আর মাছকাটুয়া, এই দুই প্রজাতির মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না। শিবরাম চক্রবর্তী বলতেন, মেয়েরা হারাবেই, আমি বলি, মাছুয়া ঠকাবেই। এই কথা নিয়ে সেদিন কৃষ্ণার সঙ্গে ঝগড়াই—না, ঠিক ঝগড়া নয়, সরব মতান্তর হয়ে গেল।

ও বলল, আপনাদের গড়িয়াহাট বাজারে হতে পারে, আমাদের দমদমে ওরা অনেস্ট৷ উচিত দাম নেয়, উচিত জিনিস দেয়। ছিমছাম।

মল্লিকা সাধারণত বিতর্কে যেতে চায় না। সে-ও বলল, আমাদের লেক মার্কেটেও ওরা খুব ভদ্র। দু'-তিন জন চেনা মাছওলা আছে। পছন্দের মাছ যার কাছে থাকে, তাকে বলে যাই; এক কিলো আমার জন্যে রেখে দাও, ফেরার সময় নিয়ে যাব। আধ ঘণ্টা পরে তরিতরকারি কিনে এসে দেখি, ঠিক রাখা আছে। কেটেকুটে পরিষ্কার করে ডবল প্লাস্টিকে গিঁট দিয়ে রাখা আছে আমার জিনিস। বাড়িতে আর খাটুনি করতে হয় না।

দু'জনেই অধ্যাপিকা এবং সুগৃহিণী। বাঙালি সমাজে মেয়েরা উপার্জন করলেও রান্নাঘর থেকে তাদের নিষ্কৃতি নেই। রোজ না হলেও মাঝে মাঝে তাদের বাজার করতে হয়। কেননা, মাছ কেনার সুসময় যখন, সকাল সাতটা থেকে সাড়ে আটটা, তখনই মৌজ করে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ারও সুসময়। সেই মৌজ ছেড়ে বাবুরা অনেকে বাজারের নোংরায় ঢুকতে চায় না। পুরুষরা সহজাতভাবে স্বার্থপর, কে না জানে। তবে স্ত্রীকে অন্যভাবে পুষিয়ে দেয় নিশ্চয়। না হলে সংসার টিকত

না। ওদের খোসা পাতলা, তাই পাকা কলার মতো জোড়া লাগতে পারে সহজেই। আমার খোসা মোটা, পুরু। আমি বুঝতে পারি, বৃহত্তর স্বার্থে ওরা নিয়মিত ভাবে ঠকছে, কিন্তু ঠকাটা গ্রাহ্য করছে না। গড়িয়াহাট বাজারেও আমি অনেক সুবেশ মহিলাদের দেখি। পেছনে ঝাঁকামুটে নিয়ে ঘুরছেন। মাছুয়ারা ওঁদের খাতির করে।

আমি পেশাদার বাজার সরকার। রং দেওয়া পটল, করলা, কামানো ফুলকপি, দুধ বার করা কাঁচা পেঁপে আমি দেখেই চিনতে পারি। ল্যাজে হাত দিয়ে বুঝতে পারি ট্যাঁড়শ কচি না বুড়ো। ওজন করার আগে চালকুমড়োর গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে নিই, রোঁয়া আছে কিনা। টাটকা কচি বেগুনের গায়ে যে সাহেবদের জুতোর মতো ঝকঝকে পালিশ থাকে, অনেকে লক্ষ করে না। আমি করি।

ছুঁয়ে দেখলে বোঝা যায় ভেজিটেবলও ভেতরে ভেতরে প্রাণীর মতো স্নেহলোলুপ। যেমন পুঁই ডগা। আপনি হাত বুলিয়ে আদর করুন, দেখবেন, কুকুরের মতো আহ্লাদে ল্যাজ নাড়ছে। এইসব তরিতরকারি আমি পারতপক্ষে চাষিদের কাছ থেকে কিনি, স্টল থেকে কিনি না। একটু ভোর ভোর যেতে হয়। না হলে ভাল মালগুলো স্টলওলারাই আগেভাগে পাল্লা হিসেবে তুলে নেয়। এক পাল্লা মানে পাঁচ কেজি। আমি পাশে থাকলে ওই দর দিই। স্টলে উঠলেই সবজির ডাঁট বেড়ে যায়। শিশিরভেজা মেথিশাক টাকায় চার আঁটি থেকে উঠে যায় দু'আঁটিতে।

এত কথা বললাম এই কারণে যে, আপনারা বিশ্বাস কববেন, আমার পেছনে বাইশ বছরের অভিজ্ঞতা আছে। আমাকে স্বচক্ষে দেখলেও বুঝতে পারতেন। দাঁড়ালে একটু ডান দিকে হেলে থাকি, ওটা প্রতিদিন বোঝা বওয়ার ফল। কিনতে কিনতে ছ'কেজি-আট কেজি হয়েই যায়। লোভ সামলাতে পারি না। লাউ, আলু, কচুর শাক থাকলে বোঝা ভারী হয়ে যায়। তখন মুঠোয় ব্যথা লাগে। দেখছেন না, হাতের আঙুলগুলো কেমন সজনে ডাঁটার মতো শক্ত হয়ে গেছে।

আজকাল ঝুঁকতে গেলে ঘাড়েও ব্যথা লাগে। তাই মাঠের দিকে রোজ যাই না। ওখানে হাঁটু মুড়ে বসতে হয়। তাতে মাথা ঘোরে। অনেক সময় স্টলের চেয়ে ভাল পছন্দসই মাছ বাজারের উঠোনে আসে। তখন ঝুঁকতেই হয়। না হলে ওবা ঠকাবে। ওই যে বাব বার মাছের ওপর জল ছেটায় আর চেঁচায়, আপনাকে ডাকে, না মাছের দিকে টানে, মাছুয়াদেব ওটা নিজস্ব টেকনিক। আর কোথাও তো অমন হল্লা হয় না। হল্লা বাধিয়ে যেমন করে হোক, এক-দেড় ঘণ্টায় নিজের মাল আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া মাছুয়ার উদ্দেশ্য। তাড়াহুড়োয় আপনি মাছ দেখবেন, না ওজন দেখবেন?

এই দেখুন, কথায় কথায় সেই মানুষের প্রতি অবিশ্বাসের প্রসঙ্গেই এসে গেলাম। সব মানুষ না, আমি কিন্তু আগেই বলেছি, মাছুয়া আর মাছকাটুয়াদের কথা। ওদের বিশ্বাস করা যায় না। এ আমার ধারণা নয়, এ আমারও বিশ্বাস। ওদের রক্তে, যাকে বলে স্কুপলস—তা নেই।

কত আর উদাহরণ দেব।

বেশ কিছুদিন আগের কথা বলছি।

গড়িয়াহাট একটা বড় বাজার। সেখানে মাছ নিয়ে বসে অন্তত আড়াইশো জন বিক্রেতা। সকালের দিকে অন্তত এক হাজার খদ্দের এ-ওর গায়ে গুঁতো মেরে, ঠেলাঠেলি করে নিজের নিজের মাছ সংগ্রহ করে।

আমি বার দুয়েক চক্কর দিলাম। অর্জুনের নয়, শকুনের চোখ দিয়ে মাছ দেখছি। এক সময় চোখে পড়ল, বলাই, বিজয়ের ভাই, উঠোনে অল্প কিছু পারশে মাছ নিয়ে বসেছে। মাঝারি সাইজ কিন্তু বেশ চকচকে, রুপোলি গা। বাধ্য হয়ে আমায় কোমর বাঁকিয়ে ঝুঁকে একটি একটি করে চোদ্দোটা মাছ তুলতে হল। ওর গামলায় রেখে বললাম, ষাট টাকা মেনে নিচ্ছি, তুমি ঠিক ওজন দেবে।

বলাই আমার খুব চেনাদের মধ্যে একজন। সে বলল, আমার কাছে জালজোচ্চুরি পাবেন না কাকাবাবু। এতদিন তো দেখছেন। দুটো পয়সা চেয়ে নেব কিন্তু চুরি করব না।

আমার সংসারে রোজ সাত টুকরো মাছ লাগে। আমরা তিনজন। দু'বেলা, তিন দু'গুনে ছয়, আর কাজের লোক এক—সাত। দু'দিনের চোদ্দো পিস। আমার আন্দাজ পারশেগুলোর গড় ওজন ষাট গ্রাম করে হবে। তা হলে চোদ্দো টুকরো—ছয় চোদ্দোং চুরাশি, সাড়ে আটশো গ্রামই ধরুন। একান্ন টাকা। এক-একটার দাম পড়বে সাড়ে তিন টাকার কিছু বেশি। এক টাকা ওকে কম দিয়ে যদি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে রক্ষা পাই, তবে সেই টাকাটা কাটুয়া নেবে। আমি সাধারণত তিনটাকার মধ্যে এক টুকরোর দাম রাখতে

চাই। পোনা মাছ হলে পেরেও যাই। পারশে বলে একটু বেশি পড়ছে, পড়ুক।

বলাই পাল্লা তুলে বলল, এক কিলো।

অমনি আমার সমস্ত হিসেব বানচাল হয়ে গেল। বললাম, হতেই পারে না।

ও একটা পঞ্চাশ গ্রামের বাটখারা কিলোটার ওপর ঠুকে বলল, দেখুন, একটু বেশি আছে তো কম নেই।

তার মানে এক পিসের দাম চার টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অসম্ভব। রাগে আমার অন্তরাত্মা রি-রি করে ওঠে। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। বলাই বলল, কুটে দিই?

না, থাক। বলে প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে মাছগুলো ভরে নিলাম। কোনও বাক্যব্যয় না করে গুণে গুণে ষাট টাকা ওকে দিয়ে দিলাম। তারপব ধীর গতিতে বেরিয়ে আপিসের পাল্লায় বসিয়ে ঠোঙাটা ওজন করলাম। সাড়ে আটশো, পাক্কা। একবার মনে হল, আপিসের লোকটাকে নিয়ে বলাইয়ের কাছে ফিরে যাই। ওর জরিমানা হোক। তারপর, কী মনে হল। কাউকে কিছু বললাম না। সোজা নিজেই ফিরে গেলাম। গিয়ে দেখি, ও অন্য খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত। আমার দিকে তাকাচ্ছেই না। একটু খালি হলে পর ওকে বললাম, বলাই, তুমি আমায় ন'টাকা ফেরত দেবে, না পঞ্চাশ টাকা ফাইন দেবে? তোমার বাটখারা জালি। পুরনো লোক হয়ে তুমি আমায় ঠকালে?

বলাই এতটা ভাবেনি। ও বোয়াল মাছের মতো নির্বিকার চোখ তুলে আমাব দিকে তাকায়। মুখে লজ্জার কোনও চিহ্ন নেই। একটা মাছ তুলে আমার ঠোঙাতে ফেলতে যাচ্ছে, আমি বললাম, না, আমাব গোনাগুনতি মাছ। তখন বস্তার আসন ফাঁক করে দ্বিতীয় ভাঁজ থেকে একটা দশটাকার নোট এগিয়ে দিল আমার দিকে। আমি নোটটা পকেটে পুরলাম। এক টাকা ফেরত দিলাম না। একটু হেসে ওকে বললাম, টাকাটা প্রদীপের মজুরি।

কিছু বলল না ও। আমাদেব সম্পর্কেব এইখানেই শেষ, ও বুঝেছে। বা বোঝেনি। লোক ঠকানোব অভ্যেস থেকে আমাকেও ঠকিয়ে ফেলেছে, তাব জন্যে অনুশোচনা পবে হবে।

আর একবার চিত্ত আমায় ঠকিয়ে মনে বড় ব্যথা দিয়েছিল। ও ছিল বয়স্ক মাছুয়া। সকলের বিশ্বাসী—ওজন, কোয়ালিটি দু'দিক থেকেই। দু'কিলো-আড়াই কিলো ওজনের দিশি কাতলা রাখত। তাই কেটে ছেঁটে, ল্যাজা, মুড়ো, তেল, ডিম বাদ দিয়ে বেচত। এক দর, ষাট টাকা কিলোয় কুড়ি পিস সলিড। গড়ে তিনটাকা পিস। ওর স্টলে ভিড় থাকত সবচেয়ে বেশি। ন'টার মধ্যে পঞ্চাশ কিলো মাছ বেচে, বঁটি কাত করে উঠে পড়ত। বেশি খাটতে পারত না। সারা জীবন মাছ কেটে, মাছ বেচে, ওর দু'হাতের আঙুলে ছিল সাদা সাদা হাজা, একটা-না-একটা আঙুলে ব্যান্ডেজ—ওর বঁটিব আদব, তার ওপর ঘাড়ে কুঁজ। মোটাসোটা মানুষ, উবু হয়ে বেশিক্ষণ বসলে ভুঁড়িতে চাপ পড়ত বেচাবির। চোখদুটো সব সময় লাল। একটা পিঁড়ি ছিল। তার নীচে রাখত টাকাপয়সা।

আমি বলতাম, চিত্ত, তুমি মাল খাওয়া বন্ধ করো, নইলে বাঁচবে না।

চাকাপানা মুখখানা একটু বেঁকিয়ে ও হাসত। খানিকটা নির্বোধের, খানিকটা অসহায়তার হাসি। উত্তর দিত না।

আমি বলতাম, আমাকে দেখো, ছ'বছর হল ছেড়ে দিয়েছি। মানুষ ইচ্ছে করলে কী না পারে।

চিত্ত বলত, ছেলেটা বড় হোক আর একটু, এই কাজই ছেড়ে দেব। বড্ড খাটুনি।

প্রথম দিকে আমি বুঝতাম না, এই ব্যবসায় এত খাটুনি কীসের। বাজার তো তিন ঘণ্টায় খতম। যাবা সকালে বসে, তারা আর বিকেলে বসে না। পরে জেনেছি, আসল কাজ শুরু হয় ভোর তিনটেয়। যখন মাছের নিলাম হয়। কোথায় হয় জানি না। মনে হয় শেয়ালদা বাজারের কাছে কোথাও। আমরা সবাই জানি, কলকাতায় যা মাছের চাহিদা, তার দুই তৃতীয়াংশ আসে অন্য রাজ্য থেকে—ওড়িষা, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, হয়তো বা আরও দূর থেকে, বরফ-চাপা ট্রাকে। লোকাল মাছও এসে জড়ো হয়। একবার আমরা কয়েকজন বন্ধু ক্যানিং গেছিলাম মাছের বাজার দেখতে। রাত্তির আটটা-ন'টায় মাছের হাট একদম ফাঁকা। বাঁশের খুঁটির ওপর চালা খাটানো—সর্বত্র আঁশটে গন্ধ। জায়গায় জায়গায় খালি ঝুড়ি আর বারকোশের ডাঁই। অল্প কয়েকজন লোক ঘোরাফেরা করছে। কেউ তাস খেলছে। চোলাই মদ আর তেলেভাজা বিক্রি হচ্ছে হাটের বাইরে।

রাত তিনটে নাগাদ আমাদের চৈতন্য হল। তখন দেখি, বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে ক্যানিংয়ের হাট। নৌকোয় করে মাছ আসছে। মহাজনে মহাজনে দরাদরি হচ্ছে। কথাবার্তা সব সাংকেতিক ভাষায়।

তারপর মাছ চলে যাচ্ছে স্টেশনের দিকে। প্রথম ট্রেনে শেয়ালদা পৌঁছোবে। পুরো ব্যাপারটা লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটে যায়।

তো, সেদিন চিত্তর কাছ থেকে মাছ নেওয়া মনস্থ করলাম। বললাম, মুড়ো-ল্যাজা বাদ দিয়ে পুরো গাদাটা দাও। তাতে ন'শো গ্রাম হল। বললাম, আঠারো পিস করো। গুণে গুণে আঠারো টুকরো করে প্লাস্টিকের ঠোঙায় ভরে দিল। আমি দাম দিয়ে চলে গেলাম। তিন টুকরো আরও লাগবে ভেবে একটা ছোট মুরগিও নিলাম। বাড়িতে গিয়ে মাছ ভাগ করতে গিয়ে দেখা গেল ষোলো পিস। দু'পিস কম, তার মানে ছ'টাকা লোকসান। তার চেয়ে বড় কথা, চিত্ত আমায় ঠকাল ভেবে প্রচণ্ড গ্লানি আর অপমান বোধ হল। ঠোঙাটা হাতে নিয়ে আবার ছুটলাম বাজারে। চিত্ত কিছুতেই মানবে না, ও কম মাছ দিয়েছে। আমিও নাছোড়বান্দা। শেষকালে ওর পিঁড়ির তলা থেকে দু'টুকরো মেডেল মাপের গাদা মাছ বেরোল। কুটতে কুটতে কখন পেছন দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এই ঘটনার পর চিত্তর কাছে মাছ নেওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি। একদিন ওর স্টলের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখি, ওর ন্যাড়া মাথা ছেলেটা গোটা মাছ বেচছে।

এইভাবে একটা-না-একটা তুচ্ছ ঘটনায় মাছুয়া আর মাছ কাটুয়াদের ওপর বিশ্বাস আমার চলে গেছে। কী করব।

এইভাবে দিন যায়। বিশ্বাস আর বিশ্বাসভঙ্গের মাঝখান দিয়ে জীবন চলে। প্রয়োজনের চেয়ে উপার্জন যাদের বেশি, বা যারা অপরের উপার্জনের টাকা হাত খুলে খরচ করে, তাবা ছোটখাটো ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। আমি পারি না।

আমি খবরের কাগজে আজ দু'বছর ধরে দেখছি, মূল্যমান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু জিনিস সস্তা হচ্ছে না। কাচের শিশিতে ভরা অতি জনপ্রিয় মহান শক্তিদাতা যে ব্র্যান্ডের ছাতু এই সেদিন অবধি উনত্রিশ টাকা ছিল, বাড়তে বাড়তে সেটা হয়েছে একাত্তর টাকা। ফাইন চাল ষোলো টাকা কিলো, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হচ্ছে না। গম বাজাব থেকে উবে গেল, ফিরে এল প্যাকেটের আটা হয়ে—দাম ডবল। কিনছি। দশ টাকা কিলোব নীচে কোনও সবজি নেই। কিনছি। জনরব শুনছি, এবার আমের ফলন ভাল। হিমসাগর পাঁচ টাকায় নেমে আসবে। দেখি। বিশ্বাস হয় না।

মাছেব বাজার সারাবছর একরকম যায় না, আমি জানি। তার প্রধান কারণ কেটারার। শীতকালে এন আর আই। এবছব চৈত্রমাসে, যখন বাজারে কেটারার নেই, এন আর আই-রা যে-যার প্রবাসে ফিরে গেছে, তখনই হঠাৎ মাছের বাজার আগুন হয়ে উঠল।

শুরু হয়েছিল ট্রাক ধর্মঘট দিয়ে। বাইরে থেকে মাছ আসছে না, তাই আকাল। ষাট টাকার মাছ আশি টাকায় একশো টাকায় চড়ে গেল। ধর্মঘট মিটে যেতেই খবর বেরোল সারা দেশে মাছের অসুখ ছড়িয়ে পড়ছে। কই, মাগুর, সিঙি মাছেব গায়ে জলবসন্ত। পুকুরে, ভেড়িতে মরা মাছ ভেসে উঠছে শয়ে শয়ে। কারণ কী? না, অক্সিজেন পাচ্ছে না। অক্সিজেন সব গেল কোথায়? না, কচুরিপানায় খেয়ে নিচ্ছে। কচুরিপানা তুলে ফেলো। না, তা হলে গুন্ডারা মাছ চুরি করে ফাঁক করে দেবে। কেউ কেউ বলছে, প্রত্যেক বছরই তো এই সময়টায় একটু আকাল হয়, কেননা, জল শুকিয়ে গেলে মাছ মরতে থাকে। বৃষ্টি পড়ুক, সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যি?

আমার হিসেবের বাজার। এক টুকরো মাছ যখন পাঁচ টাকায় উঠল, তখন ভেবেছি হাল ছেড়ে দিই। বাড়িতে ডিমের ডালনা আর নিরামিষ চালু করে দিই। কিন্তু মন মানে না। বাঙালি মধ্যবিত্তের পেটে কতটুকু বা প্রোটিন জোটে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা মাছ ছেড়ে মুরগির মাংস খাচ্ছে। গড়িয়াহাটের মতো বাজার—সাপ্লাই নেই, ডিমান্ড নেই। রুই, কাতলা, ভেটকি, চিতল, আড়, চিংড়ির অভাবে খাঁ খাঁ করে। পোলট্রির ডিম খাওয়া আমাদের দু'জনেরই মানা।

আমার মনে হয়, এ-সবই বানানো সমস্যা। কিন্তু একা আমি কী করতে পারি? সহ্য করি। বাজার ঘুরে ঘুরে চারা পোনা, তেলাপিয়া, হাইব্রিড পুঁটিমাছ, পমফ্রেট কিনে আনি। ওরা ভাল আছে। ওদের অসুখ কবেনি। বিয়েবাড়ির কেটারার ওসব মাছ ছোঁয় না।

তবে সে-মাছ কুটিয়ে আনতে হয় বাজার থেকে। বাড়িতে কেউ মাছ কুটতে পারে না। একদিন জোর-জবরদস্তি করায় কাজের মেয়েটার আঙুল কাটল। শেষে খুনের দায়ে পড়ব ভেবে বলি, আর দরকার নেই, ঢের হয়েছে।

মাছকাটুয়াদের মধ্যে প্রদীপ আমার সবচেয়ে প্রিয়, কেটারারের কাজ থাকলেও আমায় অবহেলা করে না। মাঝে মাঝে টিভি-তে আমার ছবি দেখে ওর ধারণা হয়েছে, আমি একজন মহাপুরুষ। গরিব মহাপুরুষ হিসেবে আমাকে একটু করুণাই করে। ক'দিন হল দেখছি, সে উধাও। ওর পাশে বসে শংকর। তাকে জিজ্ঞেস করি, প্রদীপের কী হল?

ও বলে, অন্য ধান্ধায় লেগে গেছে। বাজারে কাজ কই?

দাম বাড়লেও লোকে মাছ খাচ্ছিল। এখন অসুখের ভয়ে অনেক বাড়িতে মাছ যাচ্ছে না। বিয়েবাড়ির মেনু থেকে ফ্রিশ ফ্রাই, ফিশ রোল, মালাই কারি, চিতল মাছের পেটি উঠে গেছে। দিনে দশ টাকাও ইনকাম হচ্ছে না।

মাছকাটুয়ার ন্যায্য মজুরি কিলোয় এক টাকা। আমাদের গড়িয়াহাট মার্কেটে এখন সেটা দু'টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এর প্রতিবাদ করেছিলাম। বলেছিলাম, কতটুকু কাজ। পাঁচ মিনিটও লাগে না। তা ছাড়া, কই মাছ, শোল মাছ, চিংড়ি মাছ হলে এমনিতেই বেশি রেট পাও তোমরা। উপরি পাওনা মাছের তেল, পটকা, কানকো—সেগুলো বিক্রি করো। প্রদীপের সাগরেদ বুলু—সে রুই-কাতলার মুড়ো থেকে কুরুশে করে বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রক গ্রন্থি বার করে শিশিতে ভরে, এবং নিশ্চয় বিক্রি করে—বলতে চেষ্টা করছিল, আশি টাকা, একশো টাকা কিলো দরে মাছ কিনছেন হাসতে হাসতে, বাবুদের এখানে একটাকা বেশি দিতে বুক ফাটে। প্রদীপ চোখ রাঙিয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। বলে, কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানিস না। চুপ করে থাক শালা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, কিছু মনে করবেন না, ওর মাথায় গড়বড় আছে। বুলু ঠিক কথাই বলতে উদ্যত হয়েছিল। আমরা কিছুরই প্রতিবিধান করতে পারি না। কেবল মাছকাটুয়ার পেট মারার চেষ্টা করি। প্রদীপ জানে যে আমি জানি, মাছের তেল, পটকা, নাড়িভুঁড়ি কিছুই ফেলা যায় না। যারা বেড়াল পোষে, তারা কেনে। জলের দোকানে যারা চাট বানায়, তারা কিনে নিয়ে যায়। সুতরাং মাছকাটার মজুরি ওদের একমাত্র রোজগার নয়।

এখন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে। শংকর বলে, রোগের ভয় দেখিয়ে আসলে কলকাতার মাছ সব বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। অন্ধ্র প্রদেশের ট্রাক ডাইভার্ট হচ্ছে বর্ডারে। এর মধ্যেও মারোয়াড়িদের পলিটিক্স! বুঝলেন না। শংকর খবরের কাগজ পড়ে। প্রদীপ, বুলু এরা সবাই টিভি দেখে রাত্তিরে। শিক্ষিত হয়নি ওরা, কিন্তু জ্ঞানী হয়েছে মাস মিডিয়ার কল্যাণে।

প্রদীপ অন্য ধান্দায় চলে যাবার পর অগত্যা আমি বিপিনের শরণাপন্ন হই। একই চাতালে পিঠোপিঠি বসে ওরা। বিপিন বয়স্ক। এক চোখ কানা। ওর যাবার জায়গা নেই কোথাও, তাই শেষ অবধি লড়বে। খুব রোগা চেহারা। ওর ঘাড়ে স্পন্ডিলোসিস, তাই হাঁটুর ওপর থুতনি চেপে রেখে কাজ করে। আমি বলেছিলাম, কলার পারো। ও বলে, কলার আছে, ও পরে কাজ করা যায় না। বঁটির ওপর না ঝুঁকলে মাছ দেখবে কী করে? বাড়িতে পরে। শোবার সময় খুলে রাখে। তাতে উপকার হয় না। ওর অন্য চোখে আবার ছানি আছে। এখনও পাকেনি। আমি ভাবি, গরিব মানুষের ঘরেই যত রোগ।

জষ্ঠিমাসে একদিন আলটপকা বাজারে ঢুকে দেখি, প্রায় দশ কিলো খোশল্লা মাছ নিয়ে উঠোনে বসে আছে বলাই। আমাকে দেখে ডাকল। অতীতের অভিমান ভুলে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর সামনে। জিজ্ঞেস করলাম, কী দর?

ও বলল, আপনার জন্যে পঞ্চাশ।

আমি বললাম, দর করছি না কিন্তু ওজন নিয়ে যেন তঞ্চকতা কোরো না। আমাকে তো চেনো।

ও বেছে বেছে এক কিলো মাছ পাল্লায় তুলল। গুণে বলল, সতেরোটা। আমি আর বাক্যব্যয় না করে মাছের পুঁটলি নিয়ে আপিসের দিকে না গিয়ে বিপিনের কাছে এলাম। দু'টাকায় রফা হল।

অনেকে খোশল্লা মাছ ঠিক চেনে না। দেখতে একটু কুৎসিত কিন্তু স্বাদ প্রায় পারশে মাছের মতো। খুব টাটকা। গায়ে তখনও নাল লেগে আছে। পেটে ডিম। এই সময়ে সব মাছের পেটেই ডিম থাকে। তারা স্ত্রীমাছ। পুরুষমাছগুলো যায় কোথায়। মাছ সমাজে মৈথুনের রীতি নেই। তারা গর্ভিণী হয় কী করে, সে রহস্য না জেনেই এতকাল মাছ খেয়ে যাচ্ছি।

বিপিনের বঁটির নীচে আঁশ নাড়িভুঁড়ি কাদা ছড়ানো। একফোঁটা রক্তও নেই। ওর ডানপাশে একটা প্লাস্টিকের বালতিতে জল। আমার মাছগুলো কেটেকুটে বালতিতে ধুয়ে ওব স্টিলের গামলায় রাখছে। সবক'টা কুটে ফেলার পর নতুন প্লাস্টিকে ভরতে যাবে, এমন সময় আমি বললাম, একটু দাঁড়াও, গুণে

নিই। সতেরোটা মাছ আছে কিনা দেখি।

দেখতে গিয়েই ধরা পড়ে গেল বিপিন। না, মাছ ঠিক সতেরোটাই আছে। কিন্তু তাদের পেটে ডিম নেই। আমি বলি, ডিমগুলো কী হল?

ডিম তো ছিল না। পেট ভরতি ময়লা। আমি পিত্তির সঙ্গে ফেলে দিয়েছি।

ময়লা? এবার আমার মাথায় পিত্তি চড়ে গেছে। বললাম, কোথায় ফেলেছ, দেখাও।

ও লোক-দেখানো ভাবে নোংরার ডাঁই খোঁচাতে থাকে। আমি বলি, বালতিটা আমাকে দাও। বলে অপেক্ষা না করে নিজেই টেনে নিই। হাত ডুবিয়ে দেখি, জোড়ায় জোড়ায় নবম তুলতুলে সাদা কাজুবাদামের মতো সতেরোটা ডিম, পরিষ্কার জলের তলায় অমলিন। সব মিলিয়ে একশো গ্রাম তো হবেই, বেরিয়ে এল।

এ তুমি কী করলে বিপিন? সামান্য এক কিলো মাছ কুটতে দিলাম, দু'টাকাতেই রাজি হয়েছি, আর তুমি আমায় ঠকালে?

বিপিন কিছু বলল না। ওর ভাল চোখটা ছলছল করে উঠল। আমিও, মানুষকে বার বার বিশ্বাস করতে চাইছি, কিন্তু পারছি না, কেবল ঠকে যাচ্ছি। এই হতাশায়, বেদনায়, প্রায় স্তম্ভিত হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ও বলল,

এ-মাছেব ডিম খেতে ভাল না। টক টক। অম্বল হয়।

সে আমি বুঝব। তুমি না বলে কেন নেবে?

আমাব হাতের মুঠোয় লোভনীয় কাজুবাদামের মতো সাদা, তুলতুলে, একরাশ খোশল্লা মাছেব ডিম। ওকে দিয়ে দেব, না ব্যাগে ভরব ভাবছি, তখনই ভেঙে পড়ল বিপিন। বলল, বাবু, আমি চোর নই। কখনও চুরি করিনি। পনেরো বছর এখানে মাছ কুটছি। সারাদিনে কাঁটাপোঁটা যা জমে, তাই বেছেবুছে বাড়ি নিয়ে যাই। পাঁচটা খাবাব লোক, দু'বেলা দু'কিলো চালের ভাত ফোটে। মোটা চাল। তার দাম যোলো টাকা। ওই কাঁটাপোঁটা ঝাল দিয়ে রান্না করে আমার বউ। তাতেই ভাত উঠে যায়। আজ দেখুন, আমাব সামনে শুধু কাদা আর পেটের ময়লা। দশ টাকাও রোজগার হয়নি। বাজারে মাছ নেই। কী খেতে দেব ওদেব? এইসব ভাবতে ভাবতে ভুল হয়ে গেছে।

অন্যান্য বছব জষ্ঠিমাসে বাজারে ইলিশ মাছ এসে যায়। ভেটকি মাছেব ফ্রাই কেটে কাঁটা মুড়ো ফেলে দিয়ে যান সল্ট লেক, আলিপুর থেকে আসা টি-শার্ট আর হাফপ্যান্ট পবা ফবসা রঙের বাবুরা, কলপ-দেওয়া ববছাঁট চুলের মেমসাহেবরা। গমগম করে গড়িয়াহাটের বাজার। মাছকাটুয়াদের রক্ত-মাখা বঁটির নীচে থোবায় থোবায় ব্যাঙের মতো বসে থাকে কাতলা মাছের তেল। কেটারারের দালাল কোমবে হাত দিয়ে সিগারেট ফোঁকে। ওরা সব কোথায় গেল? মাছেব অসুখ কি আর কোনওদিন সারবে না?

আমি সতেরোটা মাছ আজ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছি। কাটাই খরচ দু'টাকা। তার মানে তিন টাকা পিস। ডিমগুলো চলে গেলেও সতেরোটা মাছ তো হাতে থাকবে। আমার মনে পড়ল প্রদীপের কথা। টিভি-তে মাঝে মাঝে আমার ছবি দেখে ও আমাকে ছোটখাটো একজন মহাপুরুষ ভেবেছিল। সে-ও চলে গেছে অন্য কোনও ধান্ধায়।

মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। আমি তো বিশ্বাস হারাতে চাই না। এরাই আমার বিশ্বাস বার বার কেড়ে নিচ্ছে। একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত আমি, গুণে গুণে মাছ কিনি। ওজন যাচাই করি যাতে ঠকতে না হয়। আমি তো কারুর প্রতি অবিচার করছি না। তবু, সবকিছু জেনে, বুঝে, ক্ষমা করে, আঁশগন্ধ বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল, সস্তায় মহাপুরুষ হওয়ার একটা সুযোগ এসেছে। দিয়ে দিলাম ডিমগুলো। বিপিনকে বললাম, নাও, তুমি এগুলো নিয়ে যাও। বাজারের হাল নিশ্চয় একদিন বদলাবে। শিগগিরই বদলাবে। কতদিন আর মাছ না খেয়ে থাকবে বাঙালি? ডিমের সঙ্গে একটু আশাও দিলাম।

জীবন হল টিকে থাকার জন্য লড়াই। টিকে থাকতে হলে ছোট হয়ে যেতে হয়। যেভাবে ডাইনোসর ছোট হতে হতে এখন টিকটিকি হয়ে টিকে আছে। হিংস্র, খুবই হিংস্র। কিন্তু পোকা ধরেই দেয়াল-ছবির পেছনে লুকিয়ে পড়ে। চোর-চোর ভাব। যেভাবে অক্টোপাস ছোট হতে হতে মাকড়সা হয়ে টিকে গেছে। জল ওকে রক্ষা করত, এখন জাল ওকে বাঁচিয়ে রাখে। বুদ্ধিমান, ভীষণ বুদ্ধিমান। জাল ফেলে না রাখলে

শিকার ধরবে কী করে। ওই তো এক ফোঁটা শরীর, সরু সরু ঠ্যাং। নিজে কিন্তু দেয়ালের কোণে লুকিয়ে থাকে। এই হল ছোট হয়ে টিকে থাকার টেকনিক। বিপিন, টিকে থাকার পরীক্ষায় আজ তুমি পাশ করেছ। আমি কৃষ্ণাকে, মল্লিকাকে গিয়ে বলে আসব। ওরা সুগৃহিণী, আমার কথা বুঝবে।

ভেবেছিলাম বিপিনকে বলব কথাগুলো। কী ভেবে আর বললাম না। হয়তো এইটা ওর প্রথম চুরি নয়।

১৯৯৭

ভালবাসার দাগ

সবাই জানে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উঁচু পদে যারা কাজ করে, তাদের ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রীপুত্রকন্যা পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করবে বলেই কাজ করতে আসা। তার প্রয়োজন না থাকলে কি কেউ বেরোত কাজ করতে? এই বঙ্গদেশেই একসময় অনেক জমিদার ছিলেন। তাঁরা জীবিকা উপার্জন বলতে যা বোঝায়, তা কখনও করেননি। রাজস্বের টাকা খরচ করে খোশ মেজাজে জীবন কাটিয়ে গেছেন।

সে সব দিন আর নেই। এখন সবাইকেই পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রমের অবশ্য তারতম্য আছে। কেউ কেউ কারখানায় কি আপিসে আট ঘণ্টা কাজ করে, আট ঘণ্টা ঘুমোয় আর বাকি আট ঘণ্টা নিজের ইচ্ছেমতো কাটায়। অর্থাৎ জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় বিক্রি করে সেই অর্থে, বাকি দুই তৃতীয়াংশ সময় নিজের জন্য রাখে।

সাত্যকির জীবন সে রকম না। তার সবটা সময়ই মনিবের কাছে বিক্রি হয়ে আছে। যতটুকু বিশ্রাম না করলে নয়, ততটুকুব জন্য বাড়িতে আসা, বাকিটা আপিসের কাজে উৎসৃষ্ট। দিন নেই, রাত নেই, টেলিফোন, লোকজন, ট্যুর, ক্লাব, মিটিং, ঠিকেদার, অধস্তন কর্মচারীদের নিয়ে ও ব্যস্ত। এই ব্যস্ত শব্দটা খুব অর্থপূর্ণ।

অরুন্ধতী প্রথম প্রথম জিজ্ঞেস করত, কী এত কাজ তোমার? যে, আর কেউ করতে পারে না? আমাদের জন্যে খরচ করার সময় নেই। নিজের মা-বাবাকে দেখতে যেতে পারো না! আর সকলে ছুটি পায়, তোমার ছুটিও নেই?

সাত্যকি বলত, কোম্পানি তো সব পুষিয়ে দিচ্ছে, বাবা। কীসের অভাব আছে তোমার সংসারে?

কাজপাগল লোকটাকে বোঝানো যাবে না জেনে ও হাল ছেড়ে দিয়েছে। অভাববোধটাও গেছে দেখে ওর দুঃখ হয়। আজকাল আর দুঃখও হয় না। সয়ে গেছে এই ভোগসর্বস্ব জীবনের দুর্ভোগ।

এই সাত্যকি একবার ভুবনেশ্বর গেছে ট্যুরে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘোরাঘুরি। গোটা অঞ্চলটার কাজ-কারবার পরিদর্শন। হাজারো সমস্যার মোকাবিলা। একদিন রাত্রে হোটেলের ঘরে বসে একা-একা হুইস্কি পান করতে করতে ওর মনে ক্ষণিকের জন্য অভাববোধটা জেগে উঠল। মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা। বউয়ের কথা। হস্টেলে থাকা ছেলেমেয়ের কথা। পরদিন সকালে পাছে ভুলে যায়, হোটেলের প্যাডে খসখস করে কিছু লিখে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

পরদিন স্থানীয় ম্যানেজার সুরেশ মহান্তি, আর তার বউকে সঙ্গে নিয়ে অনেক কিছু বাজার করল সাত্যকি। স্যারের চরিত্রে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখে মহান্তি তো অবাক। ওর বউ সাহস করে বলে ফেলল, স্যার, মিসেসের জন্যে কিছু কিনবেন না?

কী কেনা যায় বলো তো?

চলুন, এম্পোরিয়মে যাই। দেখি না—

এইভাবে, নেহাত কাকতালীয়ভাবে, একখানা দামি কটকি শাড়ি কিনে এনেছিল সাত্যকি। খুব বেশি বাছাবাছি করে সময় নষ্ট করেনি। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ওর অভ্যেস।

সেই শাড়ি পেয়ে হাসতে হাসতে অরুন্ধতী বলেছিল, বাঃ, ভা-রী সুন্দর। এটা বাঁধিয়ে রাখব।

কেন? পরবে না?

এই রং আমি পরি? তুমি দেখো না?

কেন, এ তো চমৎকার রং। পিয়োর সিল্ক।

এত ভারী, আমি কোমরে রাখতে পারব না। তুমি একটা সিল্কের বেল্ট কিনলে না কেন এর সঙ্গে?

এক-আধদিন স্বামীর মন রাখতে শাড়িটা অঙ্গে তুলেছিল অরুন্ধতী। সেই শেষ।

ভাবা যেতে পারে, এই প্রসঙ্গের এইখানেই ইতি। বাড়ি-ভরতি হাজারটা মূল্যবান আবর্জনার সঙ্গে আর একটা যুক্ত হল।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তা হয়নি।

অরুন্ধতীর ছোটমাসির মেয়ে খেয়া এসেছে কলকাতায়। কলেজ-মাস্টারির পরীক্ষা দিতে। তিন-চারটে দিন একজন কথা বলার লোক পাওয়া যাবে (আর বৈভবও দেখানো যাবে) ভেবে অরুন্ধতী ওকে বেখে নিয়েছে। আর এক মাসির বাড়ি বাঘাযতীনে যেতে দেয়নি। কোন ফাঁকে হঠাৎ সেই কটকি পিয়োর সিল্কখানা উঠে এল ওর হাতে। খেয়াকে দিয়ে বলল, এই নে। এটা পরবি। তোকে মানাবে।

খেয়া বলে, ও মা, এত দামি শাড়ি আমি পরি না। কোথায় যাব এসব পরে?

অরুন্ধতী বলে, জাহান্নমে যাস।

আর কালবিলম্ব না করে সুশ্রী রোগাপটকা অল্পবয়সি মেয়েটা সে-দিনই সন্ধেবেলা পরে ফেলল শাড়িখানা। সাত্যকি গাড়ি পাঠাবে। দিদি ওকে নিয়ে নিউ মার্কেটে যাবে বলেছে। খেয়া কখনও নিউ মার্কেট দেখেনি।

বসার ঘর সংলগ্ন বিশাল বারান্দা। নানা রকম ফুলের টব দিয়ে ঘেরা। সামনে উঁচু উঁচু ঝাউ গাছ। পশ্চিম দিকে বিশাল আকাশ টাটিয়ে লাল হয়ে উঠেছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল খেয়া রেলিংয়ে বুক চেপে। আর মধুব কোনও দিবাস্বপ্নও দেখছিল হয়তো।

না হলে, অত বড় গাড়িটা গেট দিয়ে ঢুকল, ও দেখতে পায়নি। গাড়ির দরোজা বন্ধ করার শব্দ পায়নি!

অরুন্ধতী বাথরুমে। ওদেব বাথরুমের পাশে এক প্রকাণ্ড ড্রেসিং রুম আছে তিন দিকে আয়না দেওয়া। সেখানে ওর নানাবিধ সাজগোজের সরঞ্জাম। সাজতে একটু সময় লাগে অরুন্ধতীর। গাদা গাদা শাড়ির পাহাড় থেকে উপযুক্ত একখানা শাড়ি বাছা এক ঝকমারি। তার সঙ্গে মিলিয়ে জামা ঠিক করা। মুখ, চুল তৈরি করা—কাজ তো অল্প নয়। তারপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে দেখা। খটকা লাগলে আবার সবকিছু বদলানো। হলই বা একঘণ্টা দু'ঘণ্টার জন্যে। যা-তা ভাবে তো বাড়ি থেকে বেরোনো যায় না। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ভাববে কী? দোকানিরাই বা খাতির করবে কেন? লোকে যদি একবার অবাক হয়ে তাকিয়ে না দেখল, তো নারীজন্মই বৃথা।

খালি গাড়িখানা বাড়িতে না পাঠিয়ে, কী ভেবে, সাত্যকিও চলে এসেছে সেদিন। খামখেয়ালের বাসনা, বউকে অবাক করে দেবে। খুব মজা হবে। বিকেলে একটা মিটিং ছিল ক্লাবে। হালকা চালে কিছু প্ল্যান-পরিকল্পনার আলোচনা হয়েছে সেখানে। সফলতার পরিবেশে। দু'-এক পাত্র করে সরেস পানীয় পড়েছে পেটে। মোট কথা, সাত্যকি বেশ খুশ মেজাজে বাড়ি ফিরল। আকাশে তখনও আলো আছে।

বসার ঘরে ঢুকে দেখে, উজ্জ্বল পেতলের থালায় জয়পুরী ফুলদানির ওপর একগুচ্ছ টাটকা ফুলের ঝাড় চারদিক আলো করে রয়েছে। আর, একটু দূরে, বারান্দায়, চেনা চেনা, কে আবার! মাঠের মতো কার্পেট মাড়িয়ে ও অগ্রসর হয়।

খেয়া প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারেনি। পেছন থেকে কেউ ওকে জাপটে ধরেছে। বুকের ওপর ঘষছে দু'খানা হাত। ঘাড়ের ওপর চুকচুক করে শব্দ হচ্ছে আদরের। হঠাৎ ওর মুখখানা ঘুরিয়ে সেই হাত একটা পুরুষ মুখের ওপর চেপে ধরল। এক-দুই মুহূর্তের বিভ্রম। আচ্ছন্নভাব কাটতেই খেয়া বুঝল, সাত্যকিদা। মুখে মদের গন্ধ। লালচে চোখ।

এ কী করছেন? ছাড়ুন ছাড়ুন। ছেড়ে দিন। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না খেয়ার। এক-একটা মেয়ে

থাকে না, অনেক বয়েস অবধি অচুম্বিত, অস্পৃষ্ট থাকে, নিজের চারদিকে কল্পিত বেড়া বানিয়ে ঘুরে বেড়ায়, খেয়াও তেমনই। তা ছাড়া, এই একজন মানুষ, তার রক্ষক, তার কাছ থেকে এমন ব্যবহার ও তো স্বপ্নেও ভাবেনি। ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে রেলিং আঁকড়ে ধরল।

ওমা, তুমি!

থাবাদুটো খেয়ার শরীর থেকে আচমকা তুলে নিয়ে সরে দাঁড়াল সাত্যকি। কী কাণ্ড! আমি ভাবলাম—

কাজের জগৎ আর ব্যক্তিগত জীবনের জগৎ একেবারে সম্পর্কহীনভাবে আলাদা হয়ে গেছে সাত্যকির ক্ষেত্রে। বস্তুত, ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই। কাজ থেকে ফাঁক পেলেই এদিকে ঢুকে একটু সময় কাটিয়ে নেওয়া। সঙ্গী যারা আছে, তাদের মানসিক প্রস্তুতি হয় না, পরস্পরের জন্যে প্রতীক্ষার অবকাশ নেই—এ এক অদ্ভুত যান্ত্রিক জীবন। মন নেই এখানে, মন আছে অন্য কোথাও। কোথায়? অর্থ উপার্জনের দিকে?

চুপ করে বসে ভাবতে গেলে হাসি পাওয়ার কথা। এত তুচ্ছ, অথচ কী ভীষণ তার প্রতাপ, প্রভাব। যে-প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সাত্যকি, তাদের ব্যবসা যন্ত্রপাতির, ছোট ছোট যন্ত্রাংশের। সে-সব যন্ত্রাংশ মোটরগাড়ি, ট্রাক, বাস, ট্রাক্টর চালাতে কাজে লাগে। পুনায় তার কারখানা আছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিপণনকেন্দ্র। বিদেশেও চালান হয় সেই পণ্য। সাত্যকি সেই প্রতিষ্ঠানের পূর্বভারত অধিকর্তা। ওকে প্রতিযোগীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে থাকতে হয়। নিয়ত যুদ্ধের আবহে সে পর্যুদস্ত। তার কত রকম জটিলতা। কত রকম মানুষকে জড়িয়ে তার টিকে থাকার সংগ্রাম। ওর আপিসঘরে সেইসব পণ্যের ছবি আছে, মাপজোখ আছে, উপযোগিতা বিষয়ে বিস্তর খবর সুন্দরভাবে তৈরি করা আছে। আর আছে কিছু কাগজ, যোগাযোগের যন্ত্রপাতি। বাতানুকূল পরিবেশ। সুশ্রী কিছু মহিলাকর্মী। নরম আলো, নরম গদি, কাচের দেয়াল। মাসকাবারে মুঠো মুঠো পারিশ্রমিকের টাকা। সেই অনর্থের অর্থ দিয়ে একটা নয়, দশটা পরিবার স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হতে পারে। ওর সম্পূর্ণ মনোযোগ কিনে নেবার জন্য এই এলাহি ব্যবস্থা। ওরা যখন ওকে ছেড়ে দেয় দিনের শেষে, তখন সাত্যকির মধ্যে এক বিধ্বস্ত মানুষরূপী পশু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেই পশুটাই কখনও বাড়ি ফেরে, কখনও এখানে-ওখানে আরামের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

খেয়া ছুটে তার নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দিল। প্রচণ্ড কান্না পেল ওর। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এদিকে অরুন্ধতী দাঁতে-ধরা আধ-পরা শাড়ি-জড়ানো অবস্থায় বেরিয়ে এসে দেখে, সাত্যকি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

কী হল?

চলে এলাম।

আমাদের সঙ্গে যাবে?

যেতে পারি। যেতে ভাল লাগত। একটা সন্ধে। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল।

গোলমাল? কেন?

তুমি ওই শাড়িটা কী নাম যেন, খেয়া, খেয়াকে দিয়ে দিয়েছ, আমি জানব কী করে? আমি ভাবলাম, তুমি দাঁড়িয়ে আছ রেলিং ধরে। পেছন থেকে জড়িয়ে ধরতেই ও চেঁচিয়ে উঠল। কী ভাবল বলো তো।

ভাবল, তুমি একটা পাষণ্ড। আদিখ্যেতার আর সময় পেলে না।

শাড়িটা, সেই কটকি সিল্ক, ওটাই কালপ্রিট। যখন কিনেছিলাম, তখনই মিসেস মহান্তি বলেছিল ওর রং আর নকশার মধ্যে কাম উদ্দীপক ব্যাপার আছে। নিয়ে যান। তুমি নিজে না পরে ওটা দান করে দিলে ওকে। আমি আর কী করব?

বুঝতে পেরেছি। এখন একটু শান্ত হয়ে বোসো। চা-টা খাও। আমি ওদিকটা দেখছি।

শাড়িটা কোমরে গুঁজে অরুন্ধতী খেয়ার ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। খানিক লজ্জিত। খানিক গর্বিত। খানিক উদাসীন।

সেদিন খেয়াকে ঘর থেকে বার করা যায়নি। কয়েকবার ডাকাডাকি করে ব্যর্থ হয়ে ওরা নিজেরাই নিউ মার্কেটের দিকে রওনা হয়ে যায়। এমন একটা লটারির-মতো-পেয়ে-যাওয়া সন্ধে বিফলে নষ্ট করা

যায় না। খেয়ার সমস্যাটা ক্রমে তুচ্ছ হয়ে আসে ওদের দু'জনেরই মনে।

আজকালকার মেয়ে, এত কী হয়েছে যে কেঁদে কূল পাচ্ছে না? অরুন্ধতী বলে।

আমি তো স্বীকার করলাম, ভুল হয়ে গেছে। আমি তো মাপ চাইলাম। আর কী করতে পারি?

ক্রমে বিস্রস্ত অবস্থা কাটিয়ে ওঠায় সাত্যকি বলে, আমি তো রেপ করিনি খেয়াকে। এত আপসেট হবার কী হয়েছে?

খুব কি ঘষাঘষি করেছ? হাসতে হাসতে জানতে চায় অরুন্ধতী। তোমার উচিত শিক্ষা হয়েছে। কতবার বলেছি একটু সংযত হও।

আচ্ছা, বলো, শেষমেশ সাত্যকি তার বউকে বোঝায়, ও তো আমার সম্পর্কে শ্যালিকা, ওর সঙ্গে একটু ফষ্টিনষ্টি তো আমি করতেই পারি। পারি না?

এইভাবে ব্যাপারটা মিটে যায় তখনকার মতো। ঘণ্টাতিনেক বন্ধ ঘরে আকাশপাতাল উচাটন করার পর শান্ত হয় খেয়া। কলুষিত দেহখানা শুদ্ধ করে নিতে আর একবার স্নান করে নেয়।

ভুল হয়েছে, বোঝে খেয়া। ওই শাড়িটাই যত নষ্টের গোড়া। শখ করে আনা জিনিসটা দিদি কেন ব্যবহার করল না, ও বুঝতে পারে না। ভালবাসার মর্যাদা দেওয়ার মন কি ও হারিয়ে ফেলেছে? সাত্যকিদার স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে অল্পবিস্তব নিন্দে শুনেছে ও অরুন্ধতীর কাছে। সবটা তখন বিশ্বাস করেনি। এখন মনে হচ্ছে, হতেও পারে বা! এত ব্যস্ত মানুষ, এত বড়লোক, খামখেয়ালি হওয়া স্বাভাবিক। অরুন্ধতীকে দেখে তো মনে হয় না, ও খুব দুঃখী। শেষকথা ও বলেছে খেয়াকে সেদিন বাত্রিবেলা, শুতে যাওয়াব আগে। ব্যাটাছেলেরা ওমনিই হয়। খেয়া কী করে জানবে। এত কাছ থেকে কোনও পুরুষমানুষকে ও আগে দেখেনি।

দিন দুয়েক পর। খেয়া চলে যাবে বলে বাকস গোছাচ্ছে। সকাল এগারোটা। হাওড়ায় ওকে পৌঁছে দিয়ে আসবে বলে একখানা গাড়ি নীচে অপেক্ষমাণ।

অরুন্ধতী ঘবে ঢুকল।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, শাড়িটা ফেরত দিয়ে দে।

খেয়া ওর কথায় কান দিল না। বাকস গোছাতেই থাকল।

ওটার জন্যেই তুই দুঃখ পেয়ে গেলি।

খেয়া বলল, অনেক ভেবে দেখলাম। ওটা আমি রেখেই নেব।

তোকে অন্য একটা শাড়ি দিচ্ছি। আরও ভাল শাড়ি। এটা তো অপয়া।

একবার দিয়ে কি উপহার ফেরত নেওয়া উচিত দিদি? খেয়া বলল, ওটা আমার কাছেই থাক। ওতে ভালবাসাব দাগ আছে। তুমি তো বাতিল করেই দিয়েছিলে। আরও কত শাড়ি আছে তোমার। তাই না?

পুনশ্চ:

অনেকদিন আগে এই গল্পের একটা প্রাথমিক খসড়া লিখে লেখক তাঁর অনুরাগী প্রতিবেশিনীকে শুনিয়েছিলেন। তাতে অরুন্ধতী চরিত্রের জয় হয়েছিল। শাড়িটা ফিরে পেয়ে নষ্ট করে ফেলেছিল সে। গল্পটি শুনে প্রতিবেশিনী বলেছিলেন, এটা অন্যভাবেও শেষ করা যেত। মেয়েদের মন আপনারা বোঝেন না। এখন পুনর্লিখিত এই রচনাটি তাঁর পছন্দ হবে কিনা, কে জানে। সারা জীবন তো মেয়েদের জটিল মনের অলিগলি খুঁজতেই কেটে গেল লেখকের।

২০০০

ডাক্তারবাবু, আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছিলাম, হিন্দু সমাজে বড় হয়েছি। মা-বাবা আমার হিন্দু ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, আমার সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই ছিল না। তবু ঝোঁকের মাথায় আমি বাড়ি চলে এলাম। কলেজে সোশ্যাল ওয়ার্ক করতাম, সেই সূত্রে এই মিশনের সঙ্গে পরিচয় হয়।

আমার এক বান্ধবী সহকর্মী ছিল খ্রিস্টান—অনিতা, সে বলল, আয়, আমরা মিশনে যোগ দিই। মিশনের হয়ে কাজ করি। এরা অনেক ত্রাণ-সেবার কাজ করে। গরিব-দুঃখীর বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সাহায্য করে। মাদারের সঙ্গে দেখা করে আমাদের মনের কথা বললে মাদার আমাদের নিয়ে নেবেন।

আসলে হিন্দু ধর্মে আমার কোনও শ্রদ্ধা ছিল না। ওটা কোনও ধর্মই নয়, আমার মনে হত। হাজার গন্ডা ঠাকুরদেবতা ওদের। কোনটাকে ছেড়ে কোনটাকে ধরব। হিন্দুদের মন্দির হল সবচেয়ে নোংরা জায়গা। মানুষ পাগলের মতো সেখানে জড়ো হয়ে কেবল চ্যাঁচায়। আর, একদল লোক প্রিস্ট সেজে তাদের এক্সপ্লয়েট করে। খোলাখুলি। তাদের লজ্জা নেই। বাবা বলতেন, এ-সবের পেছনে নাকি অনেক ইনার মিনিং আছে। বড় হলে আমি জানতে পারব।

আমাদের বাড়িতে একটা ঠাকুরঘর ছিল, ডাক্তারবাবু, দোতলায়। বাবা ছিলেন নামকরা উকিল। কোর্ট-কাছারি আর মক্কেল নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত। নীচের তলায় নয়তো বাড়ির বাইরে তাঁর দিনের ষোলো ঘণ্টা সময় কাটত। সংসারের কোনও ব্যাপারে তিনি মাথা খাটাতেন না। সব দায়িত্ব মায়ের ওপর। মা প্রতিবাদ করলে টাকা দিয়ে মায়ের মুখ বন্ধ করে দিতেন।

কিছু করতে না পেরে, বাবার সাহচর্য পর্যন্ত না পেয়ে, মা একটা বয়েসে এসে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। বাড়িতে চাকরবাকর ছিল চার-পাঁচ জন। একজন মাসি ছিল যে আমার দেখাশোনা করত। মা ঠাকুরঘরে বসে থাকতেন আর কাঁদতেন। কাকে ডাকলে তাঁর মনের অশান্তি কাটবে, বুঝতে না পেরে মা তাঁর ঠাকুরঘরে অনেক মূর্তি আর ছবি রেখেছিলেন। তার মধ্যে স্বর্গের ঠাকুর ছিল আবার মানুষ ঠাকুরও ছিল। সবাইকেই ফুল-মালা দিয়ে পুজো করতেন মা। খাবার খাওয়াতেন। শীতকালে তাদের ছবিতে, প্রতিমায় কম্বল জড়িয়ে দিতেন। রাত্তিরে ঘুম পাড়াতেন তাদের। সে ছিল ছোট মেয়ের পুতুল খেলার মতো। বাবা হয়তো মাকে ভোলাবার জন্য এইসব কৌশল করেছিলেন, কেননা, তিনি কখনও মায়ের ঠাকুরঘরে ঢুকতেন না। অথচ ক্রাইম নিয়ে বাবার কারবার, বাবাকে নিশ্চয় কখনও কখনও প্রেয়ার করতে হয়েছে।

আমার এক ছোট ভাই ছিল ডাক্তারবাবু। সে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। বাড়ির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না। মাঝে মাঝে ছুটিতে আসত। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করত। বাবার কাছে টাকা চাইত। তারপর আবার ফিরে যেত হস্টেলে। মা-বাবার শোবার ঘরে ছিল একটা প্রকাণ্ড বিছানা। মোটা গদি পাতা। তার ওপর দামি সাটিনের বেডকভার। মাঝে মাঝে সেই খালি ঘরটায় গিয়ে দাঁড়াতাম আমি। আর ভাবতাম, ওই বিছানার আরামে আমাদের দুই ভাইবোনের জন্মের বীজ বোনা হয়েছে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় কি ঈশ্বরের করুণা ছিল এক ফোঁটাও? নাকি কেবল জৈব তাড়নায় একজন পুরুষ আর একজন নারীর অনিচ্ছুক মিলন থেকে আমরা জন্মেছি। যেভাবে চিড়িয়াখানায় বাঘ আর বাঘিনীর বাচ্চা হয়? এই সংসারে আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল, এই কথা বোঝাতে আপনাকে এত কথা বললাম। নইলে আপনি বুঝবেন না, কেন আমি বৈরাগ্যে উদ্বুদ্ধ হই অত অল্প বয়সে।

তো, আমি আর অনিতা মাদারের কাছে গেলাম একদিন। তখন আমার বাইশ বছর বয়েস। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পার করেছি। সামনে একটা বিশাল অন্ধকার ভবিষ্যৎ। ভাবছি, এই জীবনটাকে নিয়ে কী করব? মানুষ জন্ম সার্থক হবে কীসে? ক্ষুদ্র স্বার্থ আর আত্মসুখ আমার কাম্য নয়। মাদার বললেন, ঈশ্বরের কাজে লাগো। সব মানুষের সেবার মধ্যে ঈশ্বর আছেন। মাদার বললেন, লোকের দোষ ধরো না, তা হলে লোকে তোমার দোষ ধরবে। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে অর্পণ করো। তিনি করুণাময়, তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন। মাদার বললেন, দরিদ্র ও দীন মানুষকে সাহায্য করো, তাদের দুঃখ ঘোচাও, ঈশ্বর তোমায় পুরস্কৃত করবেন। ডান হাত দিয়ে দান করো—যেন আর কেউ না

জানতে পারে। এমনকী বাঁ হাতও না জানতে পারে। দান তখনই পুণ্য যখন দিতে গিয়ে তোমার কষ্ট হয়। এই পুণ্যের ফল এই জগতে না পেলেও স্বর্গে গিয়ে পাবে। মাদার বললেন, ভালবাসা দিয়ে শত্রুকে বশ করো। যে তোমার বিরুদ্ধে শত্রুতা করছে, তুমি তার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। মাদার বললেন, যে-গাছে অনেক ভাল ভাল ফল ফলে, লোকে তাকে ভাল গাছ বলে যত্ন করে। যে-গাছে ফল হয় না, লোকে সে-গাছ কেটে ফেলে তার কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালায়। এ-জীবনে সৎ কাজ করে পাপমুক্ত হও। তার জন্যে দেহকে পবিত্র রাখতে হয়। দেহ তো নশ্বর, মৃৎপাত্রের মতো।

আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম, মাদার, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন? আপনি স্বর্গ কোথায় জানেন? তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, তাঁকে দেখা যায় না। তাঁকে উপলব্ধি করতে হয়। আমি প্রতিনিয়ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করি আমার অন্তরে। অন্যায় কাজ করলে মানুষ শাস্তি পাবে, এ-জন্মে না পেলে পরের জন্মে পাবে। কিন্তু তুমি তাকে শাস্তি দিয়ো না, তুমি তাকে ক্ষমা করো। যথার্থ খ্রিস্টানের এই হল আদর্শ আচরণ। আর যদি কোনও পাপী যিশুর শরণাপন্ন হতে চায়, তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না।

আজ আমার বয়স সাঁইত্রিশ বছর ডাক্তারবাবু। এখন আমার নাম সিস্টার মলি। আমার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল তুফানি। আমি গির্জায় গিয়ে খ্রিস্টান হয়েছি। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেছি এই ভেবে যে, সেখানে আমার মনের শান্তি নেই। হিন্দু ধর্মে বড় বেশি অনাচার, ভণ্ডামি। হিন্দুধর্ম বড় এলোমেলো। খ্রিস্টধর্ম সেই তুলনায় অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন। এই মিশনে সকল কর্মী এক ভাব-আন্দোলনের শরিক, হলুদ পাড় দেওয়া সাদা শাড়ি মাদারও পরেন। তাতেই দিব্যজ্যোতি বেরোয়।

আমি মাদারের মিশনে সন্ন্যাস নিলাম ডাক্তারবাবু, প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হলাম, যাতে ঈশ্বরের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করা যায়। যাতে আর কোনও টান না থাকে। আমি এই নারী শরীরের প্রয়োজনকে, এই নারী শরীরের দাবিকে তুচ্ছ করে ফুলের মতো উৎসর্গ করেছি।

আপনি জানতে চান কী আমার কাজ ওই মিশনে? কীভাবে আমি সময় কাটাই? কারা আমার সঙ্গে কাজ করে? আপনার কাছে কেন ছুটে এলাম আজ? সব বলছি, ডাক্তারবাবু। আপনি মনোরোগের চিকিৎসক, আপনি আমার মনের কথা বুঝুন আমি চাই।

প্রথমেই বলি, আর সব প্রতিষ্ঠানের মতো আমাদের মহিলা মিশনও একটা প্রতিষ্ঠান। এরও যাকে বলে হায়ারারকি আছে। সবচেয়ে ওপরে আছেন মাদার। তাঁর নীচে—নীচে ঠিক নয়, আমাদের মিশনে উচ্চনীচ কোনও প্রভেদ নেই—তাঁকে সাহায্য করতে আছেন কয়েকজন সিনিয়র নান বা সন্ন্যাসিনী। তাঁরা প্রত্যেকে এক একটি বিভাগের প্রধান। এঁদের প্রত্যেককে সাহায্য করতে আছে একটি করে জুনিয়র সন্ন্যাসিনীর ছোট দল। তারপর ব্রহ্মচারিণীরা, যারা নতুন ঢুকেছে এবং কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করছে। এ ছাড়া আছেন বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবিকা—তাঁরা বাইরের লোক, কিন্তু আমাদের মিশনের প্রতি অনুরক্ত। ভক্ত বলতে পারেন। তাঁদের ঘরগেরস্থালি আছে। সংসার আছে। তাঁরা সবাই আবার খ্রিস্টানও নন। অবসর মতো আসা-যাওয়া করেন, মিশনের কাজে সাহায্য করেন। অর্থসংগ্রহ করেন। তাঁরা অধিকাংশ বয়স্ক, সংসারের মোহমুক্ত মহিলা।

মিশনের কাজের দুটি দিক আছে। একটা সামাজিক আর একটা আধ্যাত্মিক। আমরা যে কাজই করি, ঈশ্বরের নামে করি। দিনের অনেকখানি সময় আমাদের প্রেয়ার ও ধর্মবিষয়ক আলোচনায় খরচ হয়। সমাজ কল্যাণের কাজ, শিক্ষা প্রসারের কাজ, স্কুল চালানো, অনাথাশ্রম ও হাসপাতালের পরিচালনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ সাহায্য নিয়ে গ্রামে গ্রামে যাওয়া—যা-ই করি, কাজের শেষে ফিরে আসি আমাদের আশ্রম মন্দিরে। আমাদের ঈশ্বরের আশ্রয়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে, রাত্রে শোয়ার আগে—দিনের কাজে নানান সময়ে, খাওয়ার আগে, আমাদের প্রার্থনা করতে হয়। ঈশ্বরকে স্মরণ করতে হয়। তখন আমরা সবাই সমান। ওই সময়ে ছোটরা, নতুনরা, বড়দের কাছ থেকে শৃঙ্খলা আর আধ্যাত্মিকতার শিক্ষাও পায়। তাদের মনে কোনও সংশয় জাগলে তার নিরসন হয় কখনও সর্বসমক্ষে, কখনও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে। ডাক্তারবাবু, আমি আমার সমস্যা নিয়ে সেখানে না গিয়ে আপনার কাছে এসেছি কেননা আমার গুরুজনদের কাছে সদুত্তর পাইনি, তাঁরা বলেছেন, এ-সব চিন্তা মন থেকে দূর করো। যিশুর কাছে ক্ষমা চাও তোমার মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে বলে। তোমার জীবন তাঁর সেবায় উৎসর্গীকৃত। তোমার নিজের বলতে কিছুই নেই, এ-কথা সব সময় মনে রাখবে—এই তাঁদের উপদেশ। এ নিয়ে তর্ক চলে না।

এই যে উৎসর্গীকৃত প্রাণী আমরা, তার চিহ্ন এই সন্ন্যাসিনীর বেশ। আমাদের কেশ-শূন্য ঘোমটা-ঢাকা

মাথা, আমাদের ঢিলেঢালা সস্তা দামের পরিচ্ছদ, মুখমণ্ডল আর পা যুগল ছাড়া আবৃত সমস্ত দেহ—নারীদেহ, পুরুষের সংস্রবহীন, বৈচিত্র্যহীন, শ্রমপাত্র। এই বেশবাস নিয়েই আমরা সমাজের সেবা করি। আমাদের মধ্যে ডাক্তার আছে, জনসংযোগকর্মী আছে। আর্টিস্ট আছে, যে সব উৎসব অনুষ্ঠানে শোভা সঞ্চার করে। আর আছে বিপুল কর্মক্ষম সব অর্থসংগ্রাহক। তারা জনসাধারণ, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত জায়গা থেকে ফান্ড তোলে। সেই ফান্ড থেকে জনসেবা হয়। আমাদের ভরণপোষণও হয়। আমরা তো উপার্জন-নির্ভর কোনও কাজ করি না। মেয়েদের স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু প্রযুক্তি আছে। তাতে অনুদান দিতে হয়। সুতরাং, আপনি যে বললেন, একদিকে ইশ্বর অন্য দিকে অর্থসম্পদ, একদিকে প্রার্থনা অন্য দিকে প্রচার, একদিকে দরিদ্রের সেবা, অন্য দিকে ধনীকে তোষামোদ—এই নিয়ে আমাদের মিশনের জীবনের ভারসাম্য, তা খানিকটা সত্যি। কিন্তু আমরা পরজীবী নই।

ধর্মগ্রন্থে আছে, সুচের ছিদ্র দিয়ে একটি উটকে পার করে দেওয়া হয়তো বা সম্ভব, কিন্তু ধনীকে স্বর্গলোকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব না। পৃথিবীতে ধনী না থাকলে দরিদ্রও থাকত না, আপনি বলছেন, আমরা ধনীব বোঝা কিছুটা হালকা করে দিই। রাষ্ট্র আয়কবে রেহাই দিয়ে তাতে সাহায্য করে। কিন্তু ধনীকে নির্ধন করার ক্ষমতা কারুর নেই। অসাধারণ কর্মক্ষম আর বুদ্ধিমান মানুষই ধনসৃজন করে। ঈশ্বর তাকে ওই রকম ভাবে সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ এই সেদিন বললেন, আপনার মনে আছে? যে, তিনি ঈশ্বরেব অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু কেউ যদি বিশ্বাস করে এবং সমাজের উপকার করে, তাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন।

পনেরো বছর হল, ডাক্তারবাবু, আমি মিশনে আশ্রিত। এখন আমি একটি বিভাগের প্রধান। প্রকাশনা বিভাগ। অনেক স্তর পার হয়ে, যোগ্যতা প্রমাণ করে আমি এ-দায়িত্ব পেয়েছি। কাজের মধ্যে আমি আনন্দ পাই, কেননা, যিশুর মাহাত্ম্য আমি প্রচার করি নানাভাবে। শিক্ষিতদের মধ্যে একভাবে, অশিক্ষিতদের মধ্যে অন্যভাবে। বয়স্কদের মধ্যে একভাবে, শিশুদের মধ্যে অন্যভাবে। পুরুষ সন্ন্যাসীরা এই কাজ অনেক সহজে করতে পারে। শরীরের জৈবতা তারা উপেক্ষা করতে পারে। করুণাময় তাদের সেই রকম করে গড়েছেন।

কনভেন্টে থেকে, এতগুলো বছর পার করে দেখলাম, শরীবের জৈবতা উপেক্ষা করা মেয়েদের পক্ষে সহজ না। কেননা, মেয়েদের কণ্ঠস্বরে, শারীরিক গঠনে, জৈবতা জড়িত। তা ছাড়া ডাক্তাববাবু, আমি দেখলাম, যে মেয়েরা ব্রহ্মচারিণী হয়ে আশ্রমে যোগ দেয়, আধ্যাত্মিক জীবন বেছে নেয়, তাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় এ-পথে আসে না। আমি স্বেচ্ছায় এসেছিলাম বলে আমি বুঝতে পারি। তারা অরক্ষণীয়া, মা-বাবা তাদের বিয়ে দিতে পারছে না। ঘরেও রাখতে পারছে না। মেয়ে বলেই তারা পুরুষদের মতো নিরাপদে জন-অরণ্যে মিশে যেতে পারে না। আদর্শ নিয়ে ছুটতে পারে না। তাদের ভেতরকার গৃহীসংস্কার আধ্যাত্মিক আবহে বন্দি থেকে আস্তে আস্তে ঈশ্বরমুখী হয়। এই প্রক্রিয়ায় কেউ কেউ মধ্যপথে মিশন ত্যাগ করেছে আমার চোখের সামনে। হাসি নামের এক ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাস নেওয়ার মুখে এক যুবক মোটর-ড্রাইভারের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়। যাওয়ার সময় সে বলে গেল, বাব্বাঃ, এতদিনে বাঁচলুম! কী জঘন্য এই উক্তি! ব্রহ্মচর্য যদি বাধ্যতামূলক না হত, তা হলে হাসিকে হয়তো রাখা যেত, আমার মনে হয় ডাক্তারবাবু। আমাদের কর্মযজ্ঞের শৃঙ্খলা যে অপ্রতিরোধ্য।

মানুষজন্মের সার্থকতা কীসে, আপনি আমায় বুঝিয়ে বলুন ডাক্তারবাবু। আমাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল বলে মানুষ পাপী, কেননা সে কাম, ক্রোধ লোভের শিকার। ঈশ্বরের করুণায় সে পাপমুক্ত হতে পারে, এ ছাড়া মুক্তির আর কোনও পথ নেই। সৎকাজ করো—তার মানে নিজের প্রয়োজনের কথা না ভেবে অপরের উপকার করো। শত্রুকে ভালবাসা দাও। অন্যেরা অন্যায় করবে কিন্তু তুমি তার বিচার করবে না। ঈশ্বর তাদের উচিত শিক্ষা দেবেন যথাসময়ে। তুমি কেবল প্রার্থনা করো। গোপনে এবং নিঃশব্দে। তুমি হিংসার আশ্রয় নেবে না।

অথচ আমি তো সমাজে বাস করি। আমি তো প্রত্যহ দেখছি, লোকে ঈশ্বর-নির্দিষ্ট আদর্শ মানছে না। মানুষ মানুষের ওপর অত্যাচার করছে, শোষণ করছে, তাদের কোনও শাস্তি হচ্ছে না। তা হলে ঈশ্বর কি ঘুমিয়ে আছেন। এই যে ধর্মশাস্ত্র—খ্রিস্টানদের বলুন আর হিন্দুদের বলুন বা অন্য যে-কোনও ধর্মের বলুন, এ-সব পণ্ডিতদের রচনা? সমাজের উচ্চকোটির মানুষ যারা সংখ্যায় হয়তো এক লাখে একজন,

মূর্খদের জন্য, সরলবিশ্বাসী সাধারণ মানুষের জন্য এইসব শাস্ত্র রচনা করে প্রচার করে, কিন্তু নিজেরা এর আদর্শ মান্য করে না? গরিবরা প্রতারিত হয়। তারা মন্দির, মসজিদ, গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করে কিন্তু প্রতারকের মুখোমুখি দাঁড়ায় না ভয়ে—পাছে তাতে পাপ হয়! এ কী রকম সার্থকতার কথা ধর্ম আমাদের শিখিয়েছে ডাক্তারবাবু? আমাদের এই যে প্রব্রজ্যার জীবন—এ কি কৃত্রিম, স্বভাববিরোধী নয়? আপনি এই বিরোধকে কী বলবেন? জীবনের উর্ধ্বগতি? সাবলিমেশন? অরক্ষণীয়া কন্যাকে আশ্রমে ঢুকিয়ে দিয়ে চিরকালের জন্য বিনা বেতনের দাসী বানিয়ে দেওয়ার মধ্যে অনাচার নেই? হাসি কি ব্রহ্মচর্য ত্যাগ করে উচিত কাজ করেনি? অবশ্য তার পরেও সে সুখী হয়নি। পর পর কয়েকটি সন্তানের জন্ম দিয়ে সে তার স্বাস্থ্য নষ্ট করেছে। দারিদ্র্য বরণ করেছে। স্বামীর সঙ্গে তার নিত্য কলহ। ছুটে ছুটে সে বার বার কনভেন্টে আসে। সাহায্য চায়। আমরা তাকে প্রার্থনা করতে বলি।

ডাক্তারবাবু, আমার কোনও অনুশোচনা নেই। এই জীবন আমি নিজে বেছে নিয়েছি। ঈশ্বরেব নামে আমি সমাজের কাজ করি। অজ্ঞান মানুষের মনে চেতনা জাগাই। পরজন্ম আছে কি না, আমি জানি না, স্বর্গ আছে কি না, আমি জানি না। কনভেন্টের যৌথজীবনে থেকে আমি নিঃশব্দে আমার আরব্ধ কাজ করে যাব। একটা জীবন—অকিঞ্চিৎকর জীবন—অন্যের সন্তানকে নিজের সন্তান মনে করে কাটিয়ে দেব। মাদার বলেন, এব চেয়ে সুখের আব কী আছে! কিন্তু মাঝে মাঝে আমাব মনে অমঙ্গলের চিন্তা আসে যে।

একটু আগে আপনাকে অনিতার কথা বলছিলাম। তার আশ্রমনাম সিস্টার বারবারা। সে আমাব চেয়ে অনেক বেশি পবিশ্রমী। অনেক বেশি অনুগত। সে অনাথ বালিকাদের স্কুল চালায়। মাদারের সঙ্গে ঘুবে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে। আজকাল মাদার আর নিজে বেশি ঘোরাঘুরি করতে পাবেন না। বয়েস হয়েছে। ও একাই দিল্লি, মুম্বই, বাঙ্গালোর ঘুরে মিশনের ফান্ড জোগাড় করে। মিশনের পত্রিকার জন্যে বিজ্ঞাপন আদায় করে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে। ওকে ফেরাতে পাবে না কেউ। ওর কর্মদক্ষতার খবর সুদুর ভ্যাটিকান অবধি পৌঁছে গেছে। স্বয়ং পোপ ওকে আশীর্বাণী পাঠিয়েছেন। এই সেদিন অবধি আমরা, কনভেন্টের কর্মীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম যে, সিস্টার বারবারাই ভবিষ্যতে আমাদের মাদার হবে। ওব মধ্যে দিব্যজ্যোতি আছে।

কিন্তু গত সেপ্টেম্বর মাসে তার ক্যান্সার ধরা পড়ল। আপনাকে বলা হয়নি, এর আগে আরও কয়েকজন বয়স্ক সন্ন্যাসিনী ক্যান্সার বোগে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁদের আত্মার শান্তি হোক। কিন্তু বারবারা তো আমার বয়সি। চল্লিশ পূর্ণ হয়নি ওর। উপাসনায় ছিল একাগ্র আর অবিচল। কর্মক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। ওর শরীর ছিল নিষ্কলুষ, পবিত্র—চন্দন কাঠের মতো, এমন তীব্র ছিল ওর ব্রহ্মচর্যের সাধনা।

কিন্তু ঈশ্বরের এমনই পরিহাস, ওর ক্যান্সার ধরা পড়ল স্তনে। আমরা তো নারী, সন্ন্যাস নেওয়ার সময় স্তন তো ফেলে আসতে পারি না। বহন করতে হয়, যেমন বহন করতে হয় নীরোম মুখমণ্ডল, গর্ভকোষ। চিকিৎসক বললেন, দেরি হয়ে গেছে। যেমন অন্যদের বেলায় তাঁরা বলেছিলেন। ক্যান্সারে কেবল দেরি হয়ে যায়। তখন আব কিছু করার থাকে না। ওর একটা স্তন কেটে বাদ দেওয়া হয়। কেমোথেবাপি চলতে থাকে। দেখা যায় রোগের শিকড় ফুসফুস পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। মাথার দিকে উঠছে।

আমি ওর কষ্টভোগ দিনের-পর-দিন চুপ করে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। যন্ত্রণা ক্রমশই ছড়াতে থাকে। প্রথমে নিশ্বাসের কষ্ট, গলায় জ্বালা। তারপর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেল। সে-দৃশ্য দেখা যায় না। আমি আর বর্ণনা দিয়ে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না।

আমি যা বলতে চাইছি ডাক্তারবাবু, তা হল এমন পুণ্যাত্মা কর্মী বারবারার মুমূর্ষু অবস্থার কথা। যখন সে আর মুখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। যে যখন ওর কাছে গেছে, তাকেই বলত।

ও বলত, আমি কেন কষ্ট পাব? আমি তো কাউকে কখনও কষ্ট দিইনি। আমি তো দুঃস্থের সেবাই করে এসেছি। কেন আমাকে এত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তুফানি? তুফানি আমার পূর্বাশ্রমের নাম। এতদিন পর ওই নামে আমায় ডাকল।

ও বলত, কী পেলাম আমি জীবনে? ঈশ্বরের কাজ করে কী লাভ হল আমার? মানুষের সেবা করে কী পুণ্য হল আমার?

ওব পূর্বাশ্রমের নাম ধরে আমি বলতাম, ঈশ্বর তোমাকে কোলে তুলে নেবেন অনিতা। তুমি নিজেকে তাঁর কাছে অর্পণ করে দাও। তার উত্তরে ও কী বলত জানেন ডাক্তারবাবু? সাংঘাতিক কথা। তখন ওর

দুটো চোখই অন্ধ হয়ে গেছে। চোখের মণিদুটো একপাশে সরে গেছে, আমরা দেখতে পেতাম, চোখ দুটো টকটকে লাল।

বলত, আমি তো ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি যে শুধুই অন্ধকার দেখছি। তবে কি তিনি নেই? মাদারকে জিজ্ঞেস করো তো তুফানি, ঈশ্বর কি একটা ব্লাফ?

আমি ভুলতে পারছি না সেই সব দৃশ্য। সেই সব কথা ওর। আমার বিশ্বাসের ভিত নড়ে গেছে ডাক্তারবাবু। এখন আপনি বলুন, আমি, আমরা মিশনারিরা কি ভুল আদর্শের পেছনে দৌড়োচ্ছি? ঈশ্বর-ধারণা কি একটা ব্লাফ? ভাঁওতা? মানুষকে বশ করার চালাকি? বাস্তবজীবন থেকে পালানো? আমি এখনও নতুন করে জীবন শুরু করতে পারি। এখনও হয়তো খুব দেরি হয়ে যায়নি। আপনি বলুন, আমি কি ভুল করেছি? আমি কি ভুল কথা প্রচার করেছি এই পনেরো বছর? আমি কি মিশনের প্রীতিবন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসব?

নাকি অপেক্ষা করব, যত দিন না আমার মনের মধ্যেকার সূক্ষ্মপীড়ন থেকে, সংশয় থেকে, জৈবতা থেকে—ক্যান্সার ফুটে বেরোয়?

১৯৯৯

আপনারে পর

আমেরিকার গল্প করতে আমারও ভাল লাগে না। গেছি, বেড়িয়ে এসেছি, তাই নিয়ে ভ্রমণকাহিনীও লেখা হয়ে গেছে—আবার কী? এবার ভুলে যাওয়া দরকার। না হলে লোকে বিরক্ত হয়।

আমি নিজেই বিরক্ত হয়ে আমার মাসতুতো বোন বাসবীর বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ওরা খুব বেড়াতে ভালবাসে। ওর বর প্রত্যেক বছর আপিস থেকে সপরিবারে দেশভ্রমণের খরচ পায়। ওদের বাড়ি গেলেই সেই দেশভ্রমণের গল্প শুনতে হবে। জনে জনে বলবে—একই গল্প—তার না আছে ধারাবাহিকতা, না আছে কোনও স্মরণীয় ঘটনা। এ-ও না হয় খানিকক্ষণ সহ্য করা যায়। দু'-একবার 'তারপর'? 'তারপর'? বলে আগ্রহ দেখানো যায়। কিন্তু সেখানে তো শেষ নয়। গল্প শোনা হয়ে গেলে পর ছবির অ্যালবাম দেখতে হবে। বাসবীর বড় ছেলেটা এখন ক্যামেরা নিয়ে খেলতে শিখেছে। সে তার কেরামতি দেখাবে। অ্যাঙ্গল, জুম, সিলুয়েট চেনাবে। ওরা দেখি বাড়িসুদ্ধ সবাই উত্তেজিত, কেননা ওরা সবাই ওই ভ্রমণ অভিজ্ঞতার অংশীদার। আমি তো তা নই। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা জুলুম বলে মনে হয়।

ওদেশের লোক চিঠিপত্র বিশেষ লেখে না। ফোন করে কথায় কথায়। সেই রকম ফোনাফুনি চলল কিছুদিন ধরে। তারপর আস্তে আস্তে সব ঝিমিয়ে এসেছে। কেবল রবার্ট—আমার অনুবাদক বন্ধু, এবং নিজেও কবি—মাঝে মাঝে তার ল্যাপটপ কম্পিউটারে ছাপা সুন্দর সুন্দর চিঠি লেখে। অনুবাদের খসড়া পাঠায়। ওর ধারণা, আমার বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ একদিন বই হয়ে বেরোবে। তারপর দেশে দেশে খ্যাতি ছড়াবে আমাদের। এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—বিশেষ করে ভারতবর্ষ নিয়ে এখন আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে গভীর চর্চা শুরু হয়ে গেছে। ওরা পৃথিবীর এই অঞ্চলের মানুষকে. সমাজকে তাদের ঐতিহ্যকে স্পষ্ট করে জানতে চায়। সেই সূত্রে রবার্ট আমাকে ধরেছে। কিন্তু ও জানে না, আমাকে দিয়ে ওর সুবিধে হবে না। আমি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য পড়া বাঙালি লেখক। আমার লেখায় সেই এথনিক কাদার গন্ধ নেই। ও বাংলা পড়তে পারে, বলতে পারে না। চার-পাঁচখানা অভিধান আমি ওকে কিনে দিয়েছি।

আমেরিকার গবেষকের দল যে এশিয়া নিয়ে পড়েছে, এতদূর পাড়ি দিয়ে এসে মাসের পর মাস, বছর

থেকে, ঘুরে, আমাদের ভাষা শিখছে, আমাদের লোক সাহিত্যের মানে বুঝতে চাইছে, এর একটা কারণ আমি আন্দাজ করতে পারি। ভারত প্রেম নয়, হুজুগ এর প্রধান কারণ। ওদেশের সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নানা রকম বৃত্তি দিচ্ছে, সেগুলো বাগানো। এরা কেউই স্বামী বিবেকানন্দ বা মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। এরা হিপিও নয়।

এ-সবের পেছনে রাজনৈতিক কারণটা হল বাজার। সে আমি ওদেশে গিয়েই টের পেয়েছি। খোলা বাজারের কল্যাণে ওদেশের মূলধন এবং ভোগ্যপণ্য জনবহুল এশিয়ায় এসে আছড়ে পড়ছে কয়েক বছর ধরে। ধনী-দরিদ্রের তফাত না মিটলেও ওরা জানতে পেরে গেছে যে, এইসব দেশে এক দুর্নীতিগ্রস্ত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। কৃষক, মজুর আর কেরানি মাস্টারের হাতেও এসেছে কাঁচা টাকা। তারা খরচ করার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু কী চায় তারা? এই খবর জানতে ওদের মনের ভেতরে ঢোকা দরকার। শুধু সাক্ষাৎকার নিয়ে সিদ্ধিলাভ হবে না। বছর পাঁচেক আগে শুধু মহিলা কবিদের রচনা অনুবাদ করার উদ্দেশ্যে একজন মহিলা গবেষক কলকাতায় এসেছিলেন। বছর তিনেক ছিলেন। আর একজন মহিলা গবেষক একই উদ্দেশ্যে ওড়িষায় গিয়ে তাদের ভাষা শিখে অনুবাদের বই প্রকাশ করে ফেলেছেন। বৃত্তির টাকা সদ্ব্যবহার করার পর ওদের কৌতূহলও মিটে যায়। এখন যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তারা এইসব কবিতা-গল্পের অনুবাদ থেকে এশিয়াব আত্মা আবিষ্কার করুক। আত্মা মানে লোকজনের কামনা-বাসনা, দুর্বলতা, আকাঙ্ক্ষা,—এইসব। তাবপর সেই মতো ভোগ্যপণ্য তৈরি করে চালান দেবে। মজার মজার নাম দিয়ে চারগুণ দামে বেচবে।

আমার সঙ্গে ববার্টের সম্পর্ক ভিন্ন প্রকারের। ও বয়সে ছোট, খুব নরম মনের কবি। আমাকে একটু-আধটু শ্রদ্ধাই কবে। ওর ব্যক্তিগত কথা জানায়। ওব মধ্যে নাকি এক চতুর্থাংশ আইরিশ রক্ত আছে। সেবার চিঠিতে লিখেছিল, তোমরা তো চলে গেলে, তখন এখানকার 'ফল' কী চমৎকার দেখে গেলে। তাবপর এক মাস যেতে-না-যেতে বরফ পড়া শুরু হল, আর সেই সঙ্গে ঠান্ডা কনকনে হাওয়া। আমরা গৃহবন্দি হয়ে বইলাম অনেক দিন। তারপর বেলচা দিয়ে বরফ সরিয়ে সরিয়ে গাড়ি বাব করতে পেরেছি। এই রকম।

রবার্ট লিখেছে, এখন এপ্রিল মাস। এখানে পুরোপুরি বসন্তকাল। যেমন সুন্দর, তেমনই আনন্দময়। চেবি আব প্লাম—এই ফল গাছগুলোয় এখন ফুল ধরেছে। আর সেই সঙ্গে জেগে উঠেছে ড্যাফোডিল আর টিউলিপ আব প্যান্‌সি। মরা গাছের ডালে বিনবিন কবে পাতা গজাচ্ছে। তাব ওপর সূর্যের আলো। যেন কতদিন পর তার মুখ দেখলাম। এই সময় এলে আমাব মনে হয়, তোমরা কী লাকি। বারোমাস সূর্যের কিরণ পাও।

এই রবার্টই যখন কলকাতায় এসেছিল, আমায় বলেছিল, তোমাদের হল অকৃপণ প্রকৃতির দেশ। তাই আগাছা বনজঙ্গল আর পোকামাকড়ের উৎপাত বেশি। উদ্ভিদ আর প্রাণীদের উৎপাদনের পক্ষে এই রকম জলবায়ু আদর্শ। এই একই কারণে মানুষ বেশি কামুক হয়, বেশি জন্মায়। জলবায়ুর তাড়নায় তারা নিজেদের মধ্যে মারামারিও করে। তোমরা যত প্রাণীহত্যা করো, আমাদের তার এক শতাংশও করতে হয় না। বললে তুমি বিশ্বাস করবে? ভেবে দেখো, মশা, মাছি, পোকা, পিঁপড়ে, আবশোলা—কত প্রাণী রোজ মারতে হয়। এর ফলে স্বভাবেও হিংসার ছাপ পড়ে। ওর দ্বিতীয় পক্ষের বউ জুডি অবরেসবরে কাজে লাগবে বলে হোটেলঘরের মধ্যেই একটু চিনি এনে রেখেছিল। ক'দিন পরে দ্যাখে, থিকথিক করছে পিঁপড়ে। গুঁড়ো দুধের কৌটোয় ল্যাটলেটে পোকা। সবসুদ্ধ গার্বেজ বিনে ফেলে তবে রক্ষা পায়। জুডির তৃতীয়পক্ষের বর রবার্ট তার বউকে ঠাট্টা করে বলেছিল, সব প্রাণীর মধ্যেই আত্মা আছে। তুমি এতগুলো প্রাণীহত্যা করলে, তোমার কত পাপ হল ভেবে দেখেছ? প্রভূত প্রাণীজন্ম আর প্রভূত প্রাণীহত্যা থামাতে মহাপুরুষরা এদেশে জন্মান।

আমার এ-গল্প অবশ্য রবার্টকে নিয়ে নয়। কুমুদকে নিয়ে। কুমুদ জানা। কবি এবং কৃষক। নিজের হাতে ধান চাষ করে। লাঙল চালায়। থাকে সুন্দরবন অঞ্চলে। গোসাবা ছাড়িয়ে খানিকটা বাস। খানিকটা হাঁটাপথ। সেখানে ওর কুঁড়ে, খড়-ছাওয়া বাড়ি। আমার চেয়ে বয়েসে কিছু ছোট। কুমুদের কবিতার ভাষা ভারী পরিচ্ছন্ন, খুব আন্তরিক ওর বলার ভঙ্গি। কলকাতার অধ্যাপকদের মতো ছক কষে আধুনিক বা উত্তরাধুনিক কবিতা ও লেখে না। কখনও লেখেনি। ও প্রেমের কবিতা লেখে। আর সেই কারণেই কৃষক কুমুদকে অনেকে পাত্তা দেয় না, কিন্তু আমি স্নেহ করি। ও বড় একটা কলকাতায় আসে না। ডাকে

কবিতা পাঠায়। কলকাতায় এলে রাস্তা পার হতে ওর বুক ধড়ফড় করে। ওর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে—আমি জানি। কিন্তু ঠিক ক'জন, তারা কী করে, কী করে ওর সংসার চলে, এত প্রশ্নে আমি নিজেকে জড়াইনি। শুনেছি, সম্পন্ন সাহিত্যরসিক ব্যক্তিরা কেউ কেউ কুমুদকে অর্থ সাহায্য করেন মাঝে মাঝে, তাঁদের স্ত্রীরা মন-উঠে-যাওয়া শাড়িটাড়ি ওকে দেন, সরকারি অনুদান তালিকায় ওর নাম সম্প্রতি ঢুকেছে।

আমেরিকান গবেষকদের কথা বলছিলাম। আমাদের মার্কিন সফরে চার-পাঁচটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ ছিল। সব ওই এশিয়ান বা ইন্ডিয়ান স্টাডিস বিভাগে। সেই রকম এক জায়গায় আন্তর্জাতিক লেখন প্রকল্প বিষয়ের অধ্যাপিকা এবং কবি জেনি ডলড্রামস-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। মহিলার বয়েস পঁয়তাল্লিশ মতো হবে। সম্ভবত ডিভোর্সি। একটি মেয়ে সন্তান আছে, তার বয়েস কুড়ির বেশি, সুতরাং সে আলাদা থাকে। কাজ করে অন্য শহরে। নিজের ঘর, নিজের গাড়ি, নিজের বয়ফ্রেন্ড সব আছে। তা সত্ত্বেও মাকে ও ভোলেনি। প্রত্যেক সপ্তাহান্তে মায়ের সঙ্গে মেয়ের ই-মেলে কথা হয়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা, ই-মেলে চুমু খাওয়া যায়? জেনির চোখ ছলছল করে উঠেছিল।

আমেরিকা একটা ভাঙাচোরা সংসারের দেশ। অর্ধেক মেয়ে-পুরুষ সেখানে বিয়ে না করেই একসঙ্গে বসবাস করে। যারা বিয়েথা করে, তাদের জুটিও পাঁচ-ছ'বছরের মধ্যে ভেঙে যায়। ওদেশে চিরকালীন বলে কিছু নেই। তাই দাম্পত্য কলহও নেই।

জেনি বলেছিল, আমি বাংলা জানি। আমার বাড়িতে অনেক বাংলা অভিধান আর কবিতার বই আছে। আমি একটা কবিতা সংকলন সম্পাদনা করব—বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদে। তাতে ভারত, বাংলাদেশ, দুই দেশের জীবিত কবিরা থাকবে। আশা করছি, সামনের বছর একটা বৃত্তি পাব। পেলে সোজা কলকাতায় আসব আগে। তুমি ওখানকার কবিদের সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দেবে তো?

আমি বলেছিলাম, অবশ্যই।

জেনি বলেছিল, তোমরা নিজেদের কবিতা যা ইংরেজিতে অনুবাদ করো, সেগুলো কিছুই হয় না। তা ছাড়া, আমেরিকান ইডিয়ম ব্রিটিশ ইডিয়মের চেয়ে একদম আলাদা। অনেক খোলামেলা। আমি লেখকদের সঙ্গে বসে অনুবাদ করব। তারপর—

হঠাৎ একদিন সকালবেলা জেনির ফোন। আমি তো আসন্ন নির্বাচনের জটিলতায় জড়িয়ে আছি। সামনে তিনখানা খবরের কাগজ আর একমগ চা। এমতাবস্থায় ফোন তুলে শুনি, দিস ইজ জেনি ডলড্রামস।

জিজ্ঞেস করি, ফ্রম হোয়্যার?

ক্যালকাটা।

বলে একটা ছোট হোটেলের নাম করল।

বুঝলাম, ও সেই বৃত্তিটা পেয়েছে। এখন অন্তত মাস ছয়েক থাকবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর সঙ্গে একজন উৎসাহী তরুণ কবির আলাপ করিয়ে দিতে হবে। যে ওকে সাহায্য করবে। নিয়ে নিয়ে ঘুরবে কবিদের বাড়ি। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে নিয়ে যাবে। ফুচকা খাওয়াবে। আমি এই বয়েসে আর অত দৌড়োদৌড়ি করতে পারব না। তবে সাহায্য করব সাধ্যমতো।

দিন যায়। আমি স্বপন নামের এক প্রতিশ্রুতিমান বাঙালি কবির সঙ্গে জেনিকে জুড়ে দিয়েছি। সে একটা ছোট পত্রিকা প্রকাশ করে। সেই সূত্রে সব কবিদের সঙ্গে ওর পরিচয় আছে। তাঁরা ওকে স্নেহ করেন। স্নেহবশে এক-আধটা কবিতা ওর দিকে ছুড়ে দেন, তাতেই স্বপন কৃতার্থ। জেনির সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে স্বপন খুশিই হল।

জেনিকে ছেড়ে দিয়ে আমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, তা নয়। আমি মাঝে মাঝেই ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি। ওর কাজ কী রকম অগ্রসর হল, জানতে চাই। যদি কেউ ওর সঙ্গে সহযোগিতা করছে না জানতে পারি, তখন আমিই সেই কবির সঙ্গে কথা বলি। তাঁকে বোঝাই ব্যাপারটার মধ্যে কোনও অভিসন্ধি নেই, কোনও সি.আই.-এর ষড়যন্ত্র নেই। একটা সাংস্কৃতিক হুজুগ চলছে, বন্ধু হিসেবে এদের একটু সাহায্য করুন। যদি কোনওদিন একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে আপনার রচনার অনুবাদ থাকবে। আপনার কথা বিদেশের পাঠক জানবে। এ-দেশের পাঠকও, যারা বাংলা পড়তে পারে না, তাদের কাছে পৌঁছোবে সেই বই। এতেই কাজ হচ্ছে। জেনি বোধহয় স্বপনকে মাঝে মাঝে

ভাল ভাল রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়ায়। জেনির বাংলা ভাষা জ্ঞানে যে খামতি আছে সেটা তো স্বপন মিটিয়ে দিচ্ছে। ওটা ওর প্রাপ্য।

একদিন জেনি এক অদ্ভুত সমস্যা নিয়ে সটান আমার বাড়িতে এসে হাজির। ও শুনেছে, পশ্চিমবাংলার গ্রাম-গাঁয়ে অনেক কবি থাকে। তাদের লেখাও কিছু কিছু স্বপন পড়িয়েছে ওকে। অনেকগুলো অনুবাদও করেছে ওরা দু'জনে মিলে। খুব সহজ ওদের চিন্তাভাবনা। ওদেব রাগ, অভিমান খুব স্পষ্ট। উনন আর প্রকৃতিব সঙ্গে ওদের যোগাযোগ একেবারে প্রত্যক্ষ, সেইটেই জেনির ভাল লেগেছে। কিন্তু—

কিন্তু কী? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এদের কারুর সঙ্গে আলাপ হয়নি।

আমি বললাম, তা হলে তো তোমাকে গ্রামে যেতে হয়।

যাব, স্বপন আমাকে নিয়ে যাবে।

কিন্তু থাকবে কোথায়? খাবে কী? তোমরা হলে দূষণমুক্ত দেশের লোক। কলকাতায় এত সাবধানে থেকেও পেটের অসুখ, সর্দিকাশিতে ভুগছ প্রায়ই। আমি খবর পাই সব। তবে এ হল মূলত কালচাব শক, কালক্রমে সহ্য হয়ে যাবে। কিন্তু গ্রামে গিয়ে যদি আমাশা কি ম্যালেবিয়ায আক্রান্ত হও, তোমাকে বাঁচানো যাবে না। তোমাদের দেশ থেকে যারা কয়েকমাসের জন্যে এদিকে আসে, তারা গ্রাম বলতে শান্তিনিকেতন অবধি যায়। মেদিনীপুব, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় যায় না। অথচ ওখানেই কবিব সংখ্যা বেশি। কষ্ট থেকেই তো কবিতাব উদ্ভব, তুমি জানো।

জেনি ডলড্রামস মন দিয়ে আমার কথা শোনে। তারপর বলে, শহবেব কষ্ট অনেকটা বানানো। অনেকটা দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আর্তনাদ। প্রতিবাদ। আমি রিয়াল কষ্ট দেখতে চাই।

তখনই আমার কুমুদের কথা মনে পড়ল। কুমুদ জানা। কবি এবং কৃষক। নিজের হাতে সে ধান চাষ করে। লাঙল চালায়। আর অনর্গল কবিতা লিখে যায়। পরিচ্ছন্ন বাংলায় নির্ভুল ছন্দে লেখা ওব প্রেমের কবিতা অনেক শহুরে কবির ঈর্ষার কারণ—কিন্তু গ্রামে থাকে, মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে ওব মেলামেশা নেই, তাই ওর তেমন কবিযশ হয়নি। গ্রামাঞ্চলে অবশ্য লোকে যথেষ্ট মান্য করে ওকে।

আমি জেনিকে বললাম, একজন খাঁটি কবিকে আমি জানি যে আবাব ফার্মার। খড- ছাওয়া, মাটিব দেযাল দেওয়া ঘরে থাকে। খুব গরিব। জায়গাটা সুন্দরবন অঞ্চল।

সুন্দরবন! জেনি উৎফুল্ল হয়ে বলল, তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। আমি কুমুদ জানাকে জানতে চাই।

শুনে আমার হাসি পায়। আরে, সেখানে যেতে হলে প্রথমে ট্রেনে করে ক্যানিং। তারপর ভটভটি। তারপর বাস, নৌকো—শেষকালে হাঁটা, ভ্যান। ভ্যান মানে কী জানো? খোলা সাইকেল রিকশা—তক্তা-পাতা, পা ঝুলিয়ে যেতে হয়। রাস্তা খুব খারাপ। বর্ষাকালে যাওয়াই যায় না। এখন প্রচণ্ড শক্ত অসমতল মাটি, তোমার শরীরের জোড় খুলে যাবে।

নেভার মাইন্ড। আমি যাব। তুমি যদি—

আমি বলি, তার ওপর জলে কুমির ঘুরছে, ডাঙায় কোবরা আর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। কখন পেছন থেকে খপ করে ধরবে, তুমি জানতেও পারবে না।

কোথায় ভয় পেয়ে যাবে, তা নয়, জেনি বিপদের গন্ধ পেয়ে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল। উত্তেজিত স্বরে হাততালি দিতে দিতে বলল, ফ্যানটাসটিক! ইনক্রেডিব্‌ল! আত্মরক্ষার উপযুক্ত অস্ত্র আমার কাছে আছে। তুমি ব্যবস্থা করো।

অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে আমি ওকে সুন্দরবন অভিযান থেকে নিরস্ত করলাম। বললাম, চিঠি লিখে আমি কুমুদ জানাকে কলকাতায় আসতে বলছি। আজ সোমবার, সামনের রবিবার তুমি কোনও কাজ রেখো না। চিঠি পেলে ও ঠিক চলে আসবে।

তিনদিনের মাথায় আমি গোসাবা থেকে কুমুদের ফোন পেলাম। ও বলল, গড়িয়ায় ওর ভাগনে থাকে। তাকে সঙ্গে করে ও রবিবার সকাল নাগাদ জেনির হোটেলে চলে আসবে। আমি বললাম, নাগাদ টাগাদ নয়, এরা বিদেশি এদের সঙ্গে সময় ঠিক করে দেখা করতে হয়। ও বলল, আপনি বলুন দাদা। আমি বললাম, ঠিক সাড়ে দশটা। সেই বুঝে গড়িয়া থেকে বেরোবে। ট্যাক্সি করে আসবে।

আমি তোমার খরচ পুষিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

কুমুদ বলে, কিন্তু আমি তো ইংরেজিতে কথা বলতে পারব না।

আমি বললাম, আমি থাকব। কোনও চিন্তা নেই। তোমাকে যা প্রশ্ন করা হবে, তার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। তোমার বই দু'-তিনখানা পারলে সঙ্গে এনো। ফেরত না-ও পেতে পারো, সেই বুঝে।

এদিকে জেনিকেও খানিকটা প্রস্তুত হয়ে থাকতে বললাম।

বললাম, কুমুদ হয়তো খালি-পায়ে আসবে, তুমি কিছু মনে কোরো না। ওর পায়ের পাতা সেগুন পাতাব মতো বড বড়। ওর পায়ের আঙুল এই রকম ছড়ানো, ফাঁক ফাঁক। ওর পায়ের বুড়ো আঙুল আলুব মতো গোল। ও জুতো পরতে পারে না, পাযে কষ্ট হয়। কৃষক তো, বুঝতেই পারো।

তারপর বললাম, তুমি ঘন্টাখানেকের মধ্যে সাক্ষাৎকার সেরে নেবে। ও বই উপহার দিলে নিয়ে নেবে। অনুবাদ কবতে কাজে লাগবে। আমি সাহায্য করব। আর, সাক্ষাৎকার শেষে তুমি ওকে একশো টাকা দেবে ওব খবচ বাবদ। তার বেশি নয়।

জেনি বলল, ও কুমুদের ছবিও তুলতে চায়।

কুমুদ যেন মঙ্গলগ্রহের মানুষ।

কাল সেই সাক্ষাৎকার ভালয় ভালয় হয়ে গেছে। আমরা তিনজন ছিলাম—আমি, কুমুদ আর জেনি ডলড্রামস। স্বপন আব ভাগনে একঘন্টাব জন্যে ছুটি পেল। আমবা হোটেলেব লাউঞ্জে বসলাম। জেনি কফি খাওয়াতে চেয়েছিল। কিন্তু কুমুদ তো চা-কফি খায় না। তাতে ওব ঘুম নষ্ট হয়। কোকাকোলা বলাতে বাজি হল। তাব মানে, আমি বুঝি, ওই কালচাব সুন্দরবনে ঢুকে গেছে।

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অনেক কথা উঠে এল যা আমি জানতাম না।

কুমুদ আসলে মেদিনীপুরের লোক। সেখানে ওব দশ কাঠা (মানে, ধরো, সাত হাজার বর্গফুট) চাষের জমি ছিল। তার বদলে দশ বিঘা (কুড়ি গুণ) চাষেব জমি সরকাব দিচ্ছে। সেই লোভে বাইশ বছর আগে ও সুন্দরবনে আসে। এসে দ্যাখে, সেই জমি উর্বব নয়। প্রত্যেক বছর বর্ষায নোনা জল ঢুকে মাটি নষ্ট করে দেয়। অনেক পরিশ্রম করেও ফলন ভাল হয় না।

কুমুদ ক্লাস ফাইভ অবধি পড়েছে। তাবপর ওর বাবা মারা যায়। মা আগেই মারা গিয়েছিল। কাকাদের সঙ্গে থেকে বড় হয়েছে। বাবাব ভাগেব জমিতে চাষ কবেছে। ওখানেই ওব বিয়ে হয। বউযের নাম গীতা।

ওব তিন মেয়ে—লতা, ছবি আর ছুটি। দুই মেয়ে জন্মাবার পর ওরা মেদিনীপুর ত্যাগ করেছিল। ছোট মেয়েটি সুন্দরবনে আসার পর জন্মেছে। গোসাবা সরকারি হাসপাতালে। ছেলে যখন হল না, তখন আশাব মুখে ছাই দিয়ে ছোট মেয়ে জন্মাবার সময় গীতাব জরায়ু বাদ দেওয়া হয। তাই মেয়ের নাম রেখেছে ছুটি।

মেয়েরাও লেখাপড়া তেমন শেখেনি। ঘরের কাজ করে। তাতে সংসারের সাশ্রয় হয়। ওদেব বিয়েও হয়নি। দেখতে সুশ্রী নয়, টাকাপয়সাও নেই, কে নেবে? বড় মেয়ে দুটো অলস আর আইবুড়ো থেকে থেকে কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে। কেবল মায়েব সঙ্গে ঝগড়া করে। ছোট মেয়েটা গ্রামের একজনেব কাছে সেলাই শেখে। ওর গান শেখার খুব শখ, কিন্তু কুমুদ তাতে মত দেয়নি। জায়গাটা ভাল নয়—বেকার ছোঁড়াদের উৎপাত আছে। যেমন সব জায়গায়। ওরা পাঁচজন লোক রোজ তিন কিলো চালেব ভাত খায়।

ওর কবিতার কথা উঠল।

আমি বললাম, এত দুঃখ-কষ্টেব জীবন তোমাব, অথচ ববাবব প্রেমের কবিতা লিখে গেলে।

বলা বাহুল্য কুমুদের সঙ্গে আমার বাংলায় কথা হচ্ছে, ও বাংলায় উত্তর দিচ্ছে। তারপর আমি প্রশ্ন এবং উত্তর দুটিই ইংরেজি করে জেনিকে জানিয়ে দিচ্ছি। ও নোট নিচ্ছে। প্রথমদিকে অনেকক্ষণ জেনি অবাক হয়ে কুমুদের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর কথা বলার সপ্রতিভতা লক্ষ করছিল হয়তো। কিংবা দেখছিল ওর রোগা শরীরটা, মোটা মোটা হাড়, চওড়া চোয়াল। বড় মাথাটা ভরতি কাঁচাপাকা কদমছাঁট চুল। ওব ফরসা ধুতি আর পাঞ্জাবি—কিন্তু ইস্ত্রি করা নয় বলে কুঁচকোনো। ওর পায়ে হাওয়াই চপ্পল। না, কুমুদ খালি পায়ে আসেনি। কলকাতার রাস্তাকে ও কলকাতার মানুষের মতো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। আবার ওদের ছাড়া চলেও না কুমুদের।

পাঞ্জাবির ওপর কুমুদের গলাটা লম্বা আর সরু। আর খাড়াই সোজা। আমার প্রশ্নের উত্তরে ও বলল, প্রেমের কবিতা লিখেই জীবন শুরু করেছিলাম। তারপর বিয়ে হয়ে গেল। প্রেমের মানুষকে কাছে পেলাম।

প্রথম যৌবনে তোমার কোনও প্রেমিকা ছিল না? সত্যি করে বলো। আমি চেপে ধরলাম।

জয়শ্রী নামে একটি মেয়ে ছিল আমাদের মেদিনীপুরের গ্রামে। বড়লোকের মেয়ে। ওর বাবার বাসনের ব্যবসা। আমার সঙ্গে কথা বলত সে। হাসি মশকরা করত। কিন্তু ঠিক প্রেমিকা যাকে বলে, তা না। আকর্ষণ যা ছিল, আমার দিক থেকেই—ওই কবিতার মাধ্যমে আমার ভাবাবেগ প্রকাশ পেত। তারপর একদিন ওর বিয়ে হয়ে গেল। তার অনেক পরে আমার বিয়ে হয় গীতার সঙ্গে—সে চাষির ঘরের খেটে-খাওয়া মেয়ে। সমান সমান পালটি ঘর। কাকারা সম্বন্ধ করে বিয়ে দেয়। গীতা আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট। জয়শ্রীর বিয়ের পর আর দেখা হত না। তারপব যা হয়, চর্চার অভাবে আমাব টানও শুকিয়ে গেছে। আমার স্ত্রী-ই আমার প্রেমিকা। আমাদের অভ্যস্ত জীবন।

আমি বলি, কিন্তু কুমুদ, আমরা ভাবি, তোমার এই যে জীবনসংগ্রাম, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই, তোমাব মাটি আর প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, এদিকে সমাজের ভেতরকার শোষণ আর দুর্নীতি—এসব তুমি কবিতার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করোনি? যাকে বলে অস্তিত্বের সমস্যা!

একেবারে নিইনি বললে ভুল হবে দাদা। কুমুদ লজ্জিত মুখ করে বলল, ওই যে দু'খানা বই দিয়েছি তাব মধ্যে সমাজসচেতন কবিতাগুলো দাগ দেওয়া আছে।

আমবা বই'দুটো নাড়াচাড়া করলাম খানিকক্ষণ। দাগ-দেওয়া কবিতাগুলো পড়ে শোনালাম জেনিকে—দু'-তিনটে। যেখানে ও অভাব আর ব্যর্থতার কথা বলছে, ওর অপারগতাব বেদনা ফোটাবার চেষ্টা করছে। ইংরেজিতে সাদামাটা করে মানেও বলে দিলাম। ও ব্যাপারটা বুঝল। পেনসিল দিয়ে নোট করল বইয়ের মধ্যে।

এইসব করতে কবতে সময় পার হয়ে যায়। আর বিশেষ কিছু কথা থাকে না। জেনি ডলড্রামস ওর কয়েকটা ছবি তুলল। আমি ওদের দু'জনকে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলে দিলাম জেনিব ক্যামেরায়। তারপর আমি হঠাৎ কী মনে হতে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা, কুমুদ, ওই যে নাম বললে, জয়শ্রী, তাব সঙ্গে তোমার আব দেখা হয়নি?

একবার দেখা হয়েছিল। পরিবারকে নিয়ে মেদিনীপুবে এক মেলায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখি, ও চুলের রিবন কিনছে, কাচের চুড়ি কিনছে। গীতাও কাচের চুড়ি কেনাব জন্যে দাঁড়িয়েছিল। একেবারে মুখোমুখি দেখা। জিজ্ঞেস করল, কী গো কবিমশাই, কেমন আছ? আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, ঠাকুর যেমন রেখেছেন। ওব চেহারা এত বদলে গেছে, ও এত মোটা হয়েছে, গায়ে-গতরে এত গয়না—দেখে আমার গা ঘিনঘিন করে উঠেছিল। লোক ঠকিয়ে ওর স্বামী টাকা করেছে। তাই সোনা হয়ে উঠেছে জয়শ্রীব গায়ে, ভাবলে ঘেন্না লাগে না বলুন দাদা?

এই কথা বলে কুমুদ মেমসাহেবের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর হাসতে হাসতে বলে, তবু, আমার এমনি ভাগ্য, গীতা বলে, তোমার সব কবিতা জয়শ্রীকে নিয়ে লেখা। আমাকে নিয়ে তুমি একটাও কবিতা লেখোনি। অথচ গীতাই তো আমার সব।

সেদিন সাক্ষাৎকারের শেষে, জেনি কুমুদকে আমাদের কথামতো একশো টাকা দিয়েছিল। কুণ্ঠা সত্ত্বেও নিয়েছিল কুমুদ। তারপর বলেছিল, আমাকে নিয়ে আপনি যদি কিছু লেখেন, আর সেই লেখা যদি ছাপা হয়, তা হলে এক কপি কাগজ যেন আমি পাই। আমার বউ আর মেয়েরা জানবে, আমি একেবারে ব্যর্থ নই। এক কপি না, দু'কপি দেবেন।

জেনি বলে, অতি অবশ্য। আপনি কিছু টাকাও পাবেন। আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে তো?

কুমুদ বলল, 'আছে। গোসাবায়। বাড়ি থেকে পাঁচ-কিলোমিটার দূরে। সরকারি অনুদান তো ওখানে জমা হয়।

এরপর দু'দিনও পার হয়নি, হঠাৎ আজ বাড়িতে কুমুদের ফোন। কী ব্যাপাব? আমি জিজ্ঞেস করি, কাল ভালয় ভালয় বাড়ি পৌঁছেছিলে তো?

ও বলল, হ্যাঁ দাদা। আমি অন্য একটা কথা বলার জন্যে ফোন করছি। বাড়ি থেকে গোসাবায় এসে ফোন করে ফিরব। নইলে বিবেকদংশন থেকে নিষ্কৃতি পাব না।

কীসের বিবেকদংশন?

আমি সেদিন একটা মিথ্যে কথা বলেছি, দাদা—লজ্জার মাথা খেয়ে সত্য কথা কবুল করতে পারিনি। ভেবেছিলাম, সেইটেই উচিত কাজ হল। পরে ভেবে দেখলাম, না, উনিও তো কবি, ঠিক আসল ব্যাপার ধরে ফেলবেন।

আসল ব্যাপার কোনটা? আমি কৌতূহল চাপতে পারি না। কুমুদ একটা সাদাসিধে গ্রাম্য কবি, তার আবার আসল-নকল—এমন ঝঞ্ঝাট করে এরা।

কুমুদ থেমে থেমে টেলিফোনের ওপার থেকে বলল, আসল ব্যাপার হল আমি প্রেমের কবিতা ছাড়া আর কিছু লিখিনি জীবনে। ওই দাগ-দেওয়া রচনাগুলো ফাঁকি। চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে। নিজেকে যুগোপযোগী রাখার উদ্দেশ্যে। আর একটা আসল ব্যাপার হল, আমার সব কবিতাই জয়শ্রীকে ভেবে লেখা। এই সত্য কাল গোপন করেছিলাম। আজ স্বীকার করছি, সারাজীবন ধরে আমি জয়শ্রীকেই লিখছি। গীতাকে নিয়ে একটি শব্দও লিখিনি। কী করব দাদা? যেদিন মাঠের কাজ থাকে না, আমি বাড়ির সামনে বকুলগাছের তলায় একটা পাটাতন আছে, সেখানে এসে বসি কাগজ-পেনসিল নিয়ে। পাখির ডাক শুনতে শুনতে আমার কল্পনা জেগে ওঠে। সেই কল্পনায় কেবল জয়শ্রীর মুখ। ওর গোলগাল ফরসা চেহারা। ওর দুষ্টুমি-ভরা হাসি। আমি আর লেখা থামাতে পারি না তখন। কথাটা ভদ্রমহিলাকে বলে দেবেন দাদা। আমার ব্যবহারের জন্যে আমি লজ্জিত।

জেনিকে বললাম। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, হোয়াট এ পিটি।

কেন?

ও ইংরেজিতে যা বলল, তার বাংলা মর্মার্থ হল, কুমুদ একজন ভালবাসা না-পাওয়া মানুষ। আনলাভ্ড়। জয়শ্রী ওকে ভালবাসেনি কোনদিন, ও যতই কবিতা লিখুক। আর গীতাও ভালবাসেনি ওকে। কেন বাসবে? একজন আনফেইথফুল স্বামীকে? বা আনমাইন্ডফুল লোককে?

কিন্তু সংসার তো করছে। আমি বলি।

ও বলল, ওটা ওর প্রতিবাদ। অকৃপণ প্রকৃতির মধ্যে জন্মানো ভারতীয় মেয়েরাই পারে ওইভাবে প্রতিবাদ জানাতে। আমরা পারি না।

১৯৯৮

মানুষের মাপ

আশ্চর্য, এত বড় একটা অপমান সহ্য করতে হল, কিন্তু শ্রীধর কিছু মনে করলেন না। মুখে বললেন, 'বলব বলব করে বলা হয়নি। তারপর ভুলে গেছি। আমিও তো বুড়ো হচ্ছি, সবকিছু মনে রাখতে পারি না। টাকাটা আমি ভরে দেব।'

নামকরা এবং অত্যন্ত ব্যস্ত সার্জেন স্বপন, জামাই স্বপন মিত্র, দুই অপারেশনের ফাঁকে কয়েক মুহূর্তের অবকাশে কাগজপত্র ঘাঁটছিল। কথাগুলো শুনল। তারপর আত্মাভিমানী শ্বশুরমশাইকে আশ্বস্ত করার সুরে বলল, 'সামান্য পনেরো হাজার টাকা নিয়ে কে মাথা ঘামায় বাবা। আসলে, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। শ্যামল টাকাটা নিয়ে গিয়েছিল একদিন সকালবেলা—ওর বোন না শালী কাকে যেন ম্যাড্রাসে শঙ্কর নেত্রালয়ে নিয়ে যাবার তাড়ায়। এমার্জেন্সি কেস, হাতে টাকা নেই। মাসখানেক পরে টাকাটা ফেরত দিয়ে যাবে, কথা দিয়েছিল, মনে আছে। আপনার সামনেই কথা হয়েছিল তো, যতদূর মনে পড়ে। যতদূর মনে পড়ে, বাবা, আপনিই তো ও-ঘর থেকে টাকাটা এনে দিলেন, দুটো বান্ডিল, একটা একশো টাকার আর একটা পঞ্চাশ টাকার বান্ডিল।

'শ্যামল আমার অনেকদিনের বন্ধু। ভাল চাকরিও করে। এমন কিছু অভাবগ্রস্ত নয় ও। তবু, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি বাবা, হঠাৎ অত টাকার দরকার পড়লে সঙ্গে সঙ্গে আলমারি খুলে বার করে দিতে পারে, এমন লোক খুব বেশি নেই। আমি সেটা বুঝি। আমাব বিয়ের সময় এ সচ্ছলতা আমার ছিল না, আপনি তো জানেন। যদি হাড়ের অপারেশন হত, আমি নিজেই হয়তো বিনা পয়সায় করে দিতাম, এখানে, এই কলকাতায়, আমার নার্সিংহোমে। এ একটা সোস্যাল কস্, আমাদের প্রোফেশনে এটা মানতে হয়। আফটার অল, মানুষকে রোগ থেকে মুক্ত করাই তো আমাদের কাজ। উপার্জনটা পেছন পেছন আসে।

'তো চোখের ব্যাপার শুনে আমি অসহায় বোধ করেছিলাম। কাগজপত্র দেখলাম। ওরা ডেট দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। এরা ট্রেনের টিকিট অবধি কেটেছে। আমি কিছু টাকা দেওয়া ছাড়া আর কীভাবে সাহায্য করতে পারতাম শ্যামলকে, আপনি বলুন। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, টাকাটা দেওয়ার পরই ব্যাপারটা আমি ভুলে গেছি। কেন ভুলে গেছি? কারণ, আমার টাকাপয়সার হিসেব—জমা, খরচ, ইনভেস্টমেন্ট, ট্যাক্স—সব আপনি দেখাশোনা করেন, আমি নিশ্চিন্ত। আপনি আমার শ্বশুরমশাই, কল্পিতার বাবা, আমার বাবার মতোই। আপনার কাছে থাকাও যা, আমার কাছে থাকাও তাই। ববং—

'আপনি মনে করে দেখুন, এই ঘটনার মাস তিনেক পর, কী, আব একটু বেশিই হবে, আপনি একদিন খাবার টেবিলে, কী কারণে চোখের চিকিৎসার কথা উঠতে, হঠাৎ জানতে চাইলেন, শ্যামল পনেরো হাজার টাকা ফেবত দিয়েছে কিনা। আমি বললাম, দিলে আপনি জানতে পাবতেন। তখন আপনি ঠিক কথাই বললেন ক্যাশ টাকা হয়তো অন্য টাকার সঙ্গে গুলিয়ে গেছে। তো, আমি বললাম, না, তবে খবর পেয়েছি যে, সেই রোগী বোন না শালী ম্যাড্রাসে অপারেশনের পর ভাল হয়ে গেছে।—এ নিয়ে আর—

'তখন আপনি ওকে তাগাদা করতে শুরু করলেন। আমার এতে সম্মতি ছিল। আপনিই আমাকে বোঝালেন যে, ধাব ইজ ধার অ্যান্ড দান ইজ দান। যে, শ্যামল ধাব নিয়েছে যখন, টাকাটা ওর শোধ দেওয়া উচিত। ঠিক সময়ে শোধ দেওয়া উচিত ছিল। সে দেয়নি। সে যত বড় চাকুরেই হোক, সে এক্ষেত্রে ডিফলটাব। ডিফলটার হয়ে শ্যামল যদি পার পেয়ে যায়, তো আমারই অপমান। এখন ঠিক মনে পড়ছে না বাবা, সে সময় কী এক জটিল যুক্তি দেখিয়ে এটা আপনি প্রমাণ করেছিলেন। বলেছিলেন, প্রথমেই যদি দান হিসেবে টাকাটা নিত, তা হলে ফেরতের কথা উঠত না। তা তো ও নেয়নি। বলেছিলেন, এমনও হতে পারে, অপারেশনের পুরো খরচ ও বিমা কোম্পানিব কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। অলরেডি। আজকাল তো লোকে এসব বিমা করে রাখে। আগে খবচটা করতে হয়, পবে ক্লেইম করে আদায় করে নিতে হয়। সামান্যই বার্ষিক প্রিমিয়ম। আপনি বোধহয় বলেছিলেন যে, প্রাপ্য টাকা না পেলে লোকে ধরে নেয়, টাকাটা তোমার দরকার নেই। টাকাটা তোমার হিসেব-বহির্ভূত। উপরি। উপার্জিত নয়। পরিশ্রমের রোজগার নয়। যাকে বলে ব্ল্যাক মানি। অপমানের বীজটা বোধহয় ওইখানে ছিল। সে যাই হোক, আমি তাগাদায় রাজি হলাম। এবং আবার ব্যাপারটা ভুলে গেলাম। কেননা, আপনি যা করার করবেন।'

পাঠক, এই পর্যন্ত এসে মনে হচ্ছে, দেওদার স্ট্রিটের ওপর খ্যাতিমান হাড়ের ডাক্তার স্বপন মিত্র আর তার বউ কল্পিতার এই যে দোতলা একখানা বড়সড় বাড়ি—নীচের তলায় চেম্বার এবং একটি ছোটখাটো ব্যায়ামাগার আর এখন আবার সেই ডাক্তারের শ্বশুর শ্রীধর দত্তর একটি বড়সড় আস্তানা—ওপরে সংসার, সেখানে দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে কল্পিতা থাকে আর সারাদিন ধরে চাকরবাকর-ড্রাইভার-দারোয়ান খাটায়—এই অবস্থানের একটি ব্যাখ্যাও দরকার। মানে, শুধু বিবরণ নয়। একটু কার্যকারণ সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা।

শ্রীধর শিক্ষা-দীক্ষায় আইনজ্ঞ কিন্তু ওকালতি করেননি কখনও। তাঁর বাবা এক মহকুমা শহরে উকিল ছিলেন। শ্রীধরেব বাল্য-কৈশোর সেই মহকুমা শহরেই কেটেছে। শ্রীধর তাঁর মায়ের কাছে শুনেছেন যে, তাঁর বাবা প্রথম জীবনে আদর্শবাদী দেশসেবক ছিলেন। গান্ধীজির স্বদেশি আন্দোলনের প্ররোচনায় যে কয় সহস্র নবীন যুবক সেই ১৯২০-২১ সালে স্কুল-কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে দেয় এবং আপন আপন ভবিষ্যতের সর্বনাশ ঘটিয়ে ব্রিটিশ বিতাডন যজ্ঞে নিজেদের আহুতি দেয়, শ্রীধরের বাবা শশধর ছিলেন তাদের একজন। তিনি অধিক বয়সে আবার লেখাপড়া শুরু করেন, ওকালতি পাশ করেন এবং স্বাধীন পেশা হিসেবে কালো কোটধারী উকিল হন। কাছারির বাইরে বরাবর খদ্দরের জামাকাপড পরেছেন। যে

পরিমাণ সুনাম তিনি অর্জন করেছিলেন একজন সৎ মানুষ হিসেবে, সে পরিমাণ অর্থ তিনি উপার্জন করতে পারেননি। বরং একসময়ে অর্থাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছেন। বিপর্যয়ই সততার পরীক্ষা, বাবার কাছে শুনেছেন শ্রীধর, কিন্তু সে অনেক পরে।

শ্রীধর স্বচক্ষে তাঁর বাবার সততার বিচ্যুতি ঘটতে দেখেছেন, যখন বিয়াল্লিশের কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন দমনের চেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য সমস্ত কোর্ট-কাছারি বন্ধ করে দিয়েছিল। মামলা-মোকদ্দমা বন্ধ হয়ে গেলে ওকালতির আয়ও বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময়ে শ্রীধর দেখেছেন কীভাবে তাঁর বাবা শশধর দত্ত সংসার চালাতে একটি একটি করে মায়ের গহনা বিক্রি করেছেন। বাড়িতে আশ্রিত ছিলেন দিদিমা, যাঁর সেবা ও শুশ্রূষায় বালক শ্রীধর বসন্ত রোগ থেকে সেরে উঠেছিলেন এগারো বছর বয়সে। মাসিরা দিদিমাকে প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা-ত্রিশ টাকা করে সাহায্য পাঠাত। সেইসব মানিঅর্ডার শশধর আত্মসাৎ করেছেন অভাবের তাড়নায়। বলেছেন দেশ জুড়ে টালমাটাল, সরকারি কাজ বন্ধ, না, কোনও টাকা আসেনি। তারপর একদিন মায়ের সাহায্যে শ্রীধর একগুচ্ছ কুপন বাবাব টেবিলের ড্রয়ার থেকে আবিষ্কাব করেন। এ নিয়ে চাপা কলহ শ্রীধর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন যার শেষে মায়ের কান্না এবং বাবার ক্ষমা প্রার্থনা তাঁকে অভিভূত করেছিল। আজও সেই ঘটনার কথা মনে করলে শ্রীধরের মনে হয়, পিতার বিরুদ্ধে পুত্রকে ব্যবহার করা তাঁর মায়ের পক্ষে উচিত কাজ হয়নি। আবার মনে হয়, শ্রীধরকে—একটা বারো বছরের ছেলেকে মাঝখানে সাক্ষী হিসেবে না রাখলে স্বামীকে নিবস্ত্র করতে পারতেন না মা। তাঁর মায়ের টাকা, অন্য মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া মাসোহারা ঘুরেফিরে এই সংসারেই তো খরচ হয়, হত, মনের শান্তি সেই যখের ধন তাঁর জামাই আত্মসাৎ করবে, কেউ জানতে পারবে না, তা তো হতে দেওয়া যায় না। এই ঘটনায় শ্রীধরের দিদিমা লজ্জিত হয়েছিলেন। মেয়েকে ভৎ´সনা করেছিলেন এই বলে যে, সে মানী লোকের মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে। পুরুষমানুষের চরিত্রের খুঁটিনাটি ত্রুটিবিচ্যুতি গণ্য করতে নেই। বিশেষ করে, সে যখন সকলের অভিভাবক। সে যা ভাল বুঝেছে, করেছে, ইত্যাদি। এবং এর কিছুকাল পরে তিনি অন্য মেয়েব কাছে চলে যান।

একসময়ে আবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। কিন্তু বাবার মতো একজন মানুষের অসাধুতা শ্রীধর কখনও ক্ষমা করতে পারেননি। আজ সেইটেই সবচেয়ে হাস্যকর পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন শ্রীধরকে কে ক্ষমা করে।

বেসবকারি প্রতিষ্ঠানে আইনকানুন সংক্রান্ত বিভাগ পরিচালনা করেছেন সারাজীবন। শ্রীধর মনে করতেন, একজন মাত্র মনিব থাকা অনেক ভাল। সব চাকরিই চাকরের কাজ। একজনের হুকুম তামিল করা অনেক সোজা ও সম্মানজনক। ওকালতি পেশায় আজকাল সব মক্কেলই এক একজন মনিব। তারা উকিলের চেয়ে বেশি আইন বোঝে। তারা উকিলের হাত দিয়ে অন্যায় কাজগুলো করিয়ে নেয় অর্থের বিনিময়ে। নিজেব জীবনে তাই ওই নোংরা পেশায় যাননি। ধনী উকিলকে শ্রীধর কখনও শ্রদ্ধাও করেননি। তাদের উপার্জনের নিহিত চক্র কোথায়, তিনি জানতেন। তিনি জানতেন, তারা কেউ চিত্তরঞ্জন দাস বা শরৎ বসু নয়। তারা অন্যায় আর দুর্নীতির পরিপোষক। যে সলিসিটর ভদ্রলোকের সঙ্গে শ্রীধরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, সে একজন বাঙালি হয়ে শয়ে শয়ে বাঙালির সম্পত্তি, কলকাতার জমি, বাড়ি, কারখানা কীভাবে ছলে-বলে মারোয়াড়ির হাতে তুলে দিয়েছে, দেখে তাঁর কষ্ট হয়েছে। সে গর্ব করে বলত, দেখবেন মিস্টার দত্ত, কলকাতা শহর সবটা একদিন মারোয়াড়িরা কিনে নেবে। দেশ পার্টিশন না হলে এতদিনে অবাঙালি মুসলমানরা শহরটা কিনে নিত। হিন্দু জমিদারবাবুদের নাতিপুতিরা সম্পত্তি রাখতে শেখেনি। অথচ দেখবেন, তারা মুখে স্বামী বিবেকানন্দের বুলি আওড়ায়।

চাকরির কল্যাণে কোম্পানির দেওয়া বাংলোয় সারা চাকরিজীবন বসবাস করেছেন শ্রীধর। কোম্পানির দেওয়া মোটরগাড়ি ব্যবহার করেছেন বাইশ বছর। উর্দি-পরা ড্রাইভার সমেত। নিজে কখনও গাড়ি চালাননি। পেছনের সিট ছাড়া সামনের সিটে বসেননি। কল্পিতা ওই বাংলোয় বড় হয়েছে। আপিসের গাড়ি কল্পিতাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। স্কুল থেকে নিয়ে এসেছে। ওই বম্পাস রো-র বাংলোতেই শামিয়ানা খাটিয়ে কল্পিতার বিয়ে হয়। স্বপন মিত্র তখন সদ্য পাশ করা ডাক্তার। হাড়ের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হয়েছে কিন্তু সরকারি চাকরি করে। হাসপাতালে প্রায়ই নাইট ডিউটি থাকত তখন। ওদের যৌথ পরিবার ছিল ভবানীপুরে। আরও ভাই, বোন, কাকা, জেঠা নিয়ে বিশাল পরিবার। তাই

বিয়ের পরে কল্পিতা স্বামীর দীর্ঘক্ষণ অনুপস্থিতিতে হাহুতাশ করেনি। আর সেই ফাঁকে স্বপন মানুষের গোটা হাড় ভেঙে আর গন্ডায় গন্ডায় ভাঙা হাড় জোড়া লাগিয়ে হাতটা পাকিয়ে ফেলেছে।

তারপর একসময় ওরা দেওদার স্ট্রিটের বাড়িটা কিনল। শ্রীধরের সলিসিটর বন্ধুই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। একটা বাড়ি অন্তত মারোয়াড়ির কবল থেকে বেঁচেছে—ভেবেছিলেন শ্রীধর। ততদিনে তাঁর স্ত্রীর অকালমৃত্যু ঘটেছে। মেয়ে বলল, 'বাবা, তুমি এসো, আমাদের সঙ্গে থাকবে।'

শ্রীধর বলেছিলেন, 'দেখো, আমার লাইফ স্টাইল আলাদা। তোমাদের জেনারেশনের সঙ্গে বনবে না। তা ছাড়া যতদিন না কাজ থেকে অবসর নিচ্ছি, ততদিন এ-প্রশ্নই ওঠে না। ওরা আমাকে আরও দু'বছর থাকতে বলছে।' শ্রীধর তখন ছেষট্টি।

সত্যি সত্যি যখন অবসর নিলেন, তখন দেখেন, এককালীন যে টাকাটা হাতে এল, তার অধিকাংশ যদি নিজের জন্য একখানা ফ্ল্যাট কিনতে খরচ হয়ে যায়, তা হলে হাতখরচের টাকায় টান পড়বে। ফ্ল্যাট একটা ভাড়া করা যেতে পারে, কিন্তু সেটা দেখাশোনা করবে কে? বরং ভাড়ার টাকাটা যদি জামাই নিতে রাজি হয়, তা হলে তিনি ওদের বাড়ির একতলার একটা অংশ অধিকার করতে পারেন। স্বাধীনভাবে থাকতে পারেন। আর, বৃদ্ধ বয়সে একজন ডাক্তার জামাইয়ের আশ্রয় সব শ্বশুরেরই কাম্য। কলকাতা শহরে বসে বেঘোরে মরতে হবে না।

তখন কল্পিতা বলেছিল, 'বেশি স্বাধীনতা তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, বাবা। তুমি নীচের ঘরে ইচ্ছেমতন থাকবে, কাজ করবে, পড়াশোনা করবে। আমি পার্টিশন করিয়ে এ. সি. মেশিন বসিয়ে তোমার একটা শোবার জায়গাও করে দেব। কিন্তু দিনে তিনবার, চারবার তোমায় ওপরে উঠে আসতে হবে। আমাদের সঙ্গে খেতে হবে। গল্পসল্প করতে হবে তোমায়। দেখছ তো, তোমার জামাই কতটুকু সময় বাড়িতে থাকে। সকালে অপারেশন, সারাদিন এখানে-ওখানে চেম্বার। সন্ধেবেলা নিজের বাড়িতে চেম্বার। তার ওপর ফুটবল খেলোয়াড়দের সঙ্গে আড্ডা মজলিশ আছে। ক্লাবে যেতে হয়। ওটাও নাকি তার পেশার অঙ্গ। আমি কী নিয়ে থাকি সারাদিন, তুমিই বলো।'

করুণা করে শ্রীধর তখন রাজি হয়েছিলেন। নিজের বসবাসের দিকটা তৈরি করে নিয়েছিলেন' নিজের খরচে। একটা নতুন মারুতি গাড়ি কিনেছিলেন। বাইরের কাজ থাকলে ঠিকে ড্রাইভার আসে। জামাইয়ের ওপর তিনি কোনও দিক থেকে নির্ভরশীল নন। এইভাবে সাতষট্টি বছর বয়েস থেকে ন'বছর কাটল। মাঝখানে একটা অপারেশন হয়ে গেছে। এখন বুকের ভেতর পেসমেকার আর মনের মধ্যে মৃত্যুভয় ঘড়ির মতো টিকটিক করে।

তার চেয়েও বড় মাপের একটা ভয় শ্রীধরকে কিছুকাল যাবৎ উদ্বিগ্ন করে রাখছে। উচ্চারণ করে বললে লোকে এর গুরুত্ব স্বীকার করবে না। হয়তো আড়ালে হাসবে। কিন্তু ভয়টা সত্যি। সেটা হল, শ্রীধরের নির্ধারিত একটা আয় আছে। তাঁর সঞ্চয় থেকে সেই আয় হয়। আজ থেকে ন'বছর আগে ভাবা গিয়েছিল, সেই আয় একজন লোকের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ক্রমশ যে-হারে এদেশে সুদের হার আর অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে এবং এখনও কমছে, তাতে শ্রীধরের মনে হয়, খুব বেশি দীর্ঘজীবী হলে একদিন-না-একদিন তাঁকে জামাইয়ের কাছে হাত পাততে হবে। এটা তিনি চান না। তিনি জানেন, স্বপনের এ সমস্যা নেই কারণ তার উপার্জনও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এখন সে আর নিজের উপার্জনের হিসেব রাখতে পারে না। আয়কর দেবার সময় শ্বশুরমশায়ের সাহায্য নিতে হয়। শ্রীধর অনুমান করেন, তাঁর অজ্ঞাতসারে স্বপন কল্পিতাকে আলাদাভাবে কিছু কিছু মোটা টাকা দিয়ে দেয়। সে টাকা কল্পিতা কোনও গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখে। বাবাকেও বলে না। এতে তিনি ক্ষুণ্ণ হন না অবশ্য। তাঁর চিন্তা নিজের দীর্ঘজীবন বনাম ক্রমহ্রাসমান উপার্জন নিয়ে। বা, উপার্জনের ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে। আত্মাভিমান নিয়ে। এক একবার ভাবেন, মারুতিটা বেচে দিই। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

শ্যামল সম্পর্কে স্বপন শ্রীধরকে যা বলেছিল, তার এক বর্ণ মিথ্যে নয়। মনে মনে স্বপন বোধহয় চেয়েছিল শ্যামলের দেনাটা মকুব করে দেবে। নিজে থেকে ও যদি এসে টাকাটা দিয়ে যায় কোনওদিন, ঠিক আছে, নিয়ে নেবে। কিন্তু কী হে, টাকাটা ফেরত দাও, বলে তাগাদা করবে না। বন্ধুর কাছে ওভাবে টাকা চাওয়া যায় না। আর সত্যি কথা বলতে কী, ওই পনেরো হাজার টাকার অন্তত চারগুণ স্বপন মিত্র প্রতি অপারেশনের দিন রোজগার করে। ফুটবল ক্লাবগুলো এক-একটা টাকার পাহাড়। বাঘ-সিংহের মতো মূল্যবান সম্পত্তি হল ওদের পোষা খেলোয়াড়গুলো। যতদিন তাদের ফর্ম আছে, ততদিন যা চাও,

ক্লাব তাই দেবে। আর, দুটো পা, দুটো হাত কোমরের শিরদাঁড়া—এই তো ওদের ক্যাপিটাল, জখম হলে সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করে ফেলা দরকার। কে করবে? কলকাতা শহরে দুর্গা ভটচাজ মারা যাওয়ার পর এখন স্বপন মিত্র এক নম্বর। নিন্দুকেরা বলে, হাড়ের ডাক্তারি তো ছুতোর মিস্ত্রির কাজ। হার্টের ডাক্তার হল আর্টিস্ট। হার্টে চোট হলে সম্পূর্ণ ফিট করতে পারে কেউ? এক-একটা প্লেয়ারকে দেখো, হাঁটু ফাটিয়ে কি গোড়ালি উলটিয়ে হাজির হল চিৎকার করতে করতে। চার মাসের মাথায় স্বপন তাকে আবার মাঠে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। বলে, যা, খ্যাল গে যত খুশি। শুধু মেরামত না, ফিজিওথেরাপি, ঠিকমতো ডায়েট, ব্যায়াম, মনে ফুর্তি, উৎসাহ, প্রতিযোগিতার নেশা—সবকিছু মিলে একটা প্লেয়ারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। এক-একটা বাচ্চা ছেলে, কতদিনই বা মাঠে থাকার অধিকার পায়? ম্যাকসিমাম আট বছর। এই আট বছর সে সকলের চোখের মণি। খবরের কাগজের হেডলাইন, চার কলামের ছবি। ক্লাব তাকে আগলে আগলে রাখে। শত্রুপক্ষ যেন আলটপকা লেঙ্গি মারতে না পারে। ক্লাবে ক্লাবে ঝগড়া মারামারি বাধলে অনেক সময় স্বপন মিত্র গিয়ে মিটিয়ে দিয়ে আসে। ক্লাবের পার্টিতে বা স্পনসরের নেমন্তন্নয় কোনও প্লেয়ার বেশি মদ খেয়ে ফেললে, তাকে থাপ্পড় মারার সাহস ওই একজনের। কোচেরও নয়। ডাক্তারের। স্বপনের কাছে ওদের পা বাঁধা।

এইসব ভাবনাচিন্তা করতে গিয়ে মনে পড়ে, ওই শ্যামল, তার ছোটভাই, মোহনবাগানে একবার চান্স পেয়েছিল খেলবার। সুবিধে করতে পারেনি। তারপর সে খেলা ছেড়ে দেয়। স্বপনই তাকে স্টেট ব্যাঙ্কের চাকরি জুটিয়ে দিয়েছে। যাই হোক—

শ্রীধর একদিন শ্যামলকে ফোন করলেন। 'উনি তো বাড়ি নেই। কলকাতার বাইরে গেছেন', ওর বউ বলল। শ্রীধর বললেন, 'একটা মেসেজ রেখে দিন, আমি ফোন করেছিলাম, শ্রীধর দত্ত আমার নাম, স্বপন মিত্র আমার জামাই। উনি ফিরলে যেন আমায় রিং ব্যাক করেন।'

যা হয়ে থাকে, শ্যামল আর রিং ব্যাক করেনি। হয়তো ওর বউ বলতে ভুলে গেছে, ভেবে, এবং টেলিফোনের কোনও রেকর্ড থাকে না, ভেবে, এবার শ্রীধর একখানা খুব নরম করে চিঠি ছাড়লেন।—এতই সামান্য ব্যাপার, তিনি লিখলেন, যে, মনে থাকার কথা নয়। তবে কিনা, হঠাৎ স্বপনের কিছু থোক টাকার দরকার পড়েছে। এই সময় ওই সামান্য পনেরো হাজার টাকাও কাজে লাগত। মোলায়েম চিঠি—ভুলো মনকে জাগানোই শুধু উদ্দেশ্য। সাধারণ ডাকে ব্যক্তিগত ছাপ মেরে—পাঠিয়েছিলেন শ্রীধর। তারপর চার মাস চুপ।

যখন ওদিক থেকে কোনও সাড়া মিলল না, তখন বুঝলেন, সোজা আঙুলে ঘি বেরোবে না এখানে। এবার ক্যুরিয়র দিয়ে আর একখানা চিঠি পাঠালেন। এর সুর একটু কড়া। এর প্রাপ্তি রসিদ হস্তগত হয়েছে। শ্রীধর জানতেন, শ্যামল পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করতে পারে। সোজা স্বপনের মুখের ওপর হয়তো করত না। কিন্তু তুমি কে হে শ্রীধর দত্ত? শ্বশুরগিরি ফলাচ্ছ? সূর্যের তাপের চেয়ে বালির তাপ বেশি? এই কথা ভেবেই তিনি এবার চিঠিতে পরিষ্কার ভাষায় লিখলেন, 'এমার্জেন্সি বুঝে দেওয়া হয়েছিল, রসিদ নেওয়ার কথা তখন স্বপন বা আমার, কারুর মনে হয়নি। সুতরাং প্রমাণ দেখাতে পারব না। তবে, স্মরণ করাবার জন্যে জানাই, সেদিন আমিই স্বপনের কথামতো পাশের ঘর থেকে দুটো বান্ডিল—একটা একশো টাকার নোটের আর একটা পঞ্চাশ টাকার নোটের—এনে আপনার হাতে দিয়েছিলাম। অর্থাৎ, আমরা দু'জন সাক্ষী আছি এই ঘটনার।'

এরপর একমাস-দেড়মাস পরে একদিন হঠাৎ ডাকে শ্যামলের চেকখানা এল। পনেরো হাজার টাকার অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক। সঙ্গে একটা ছোট চিরকুট। দুটোই শ্রীধর দত্তর নামে। সেটা মার্চ মাসের মাঝামাঝি।

চেকটা ফেরত দিতে পারতেন শ্রীধর দত্ত। লিখতে পারতেন, নগদ টাকা নিয়েছ, নগদে ফেরত দাও। কিংবা স্বপন মিত্রর নামে চেক হবে। সেই তো ঋণদাতা। কিন্তু কী ভেবে ফেরত দেননি। প্রথম কথা, স্বপনের নামে চেক এলে তার আয়কর দিতে হবে স্বপনকে। নগদ টাকাটা খাতায় তোলা হয়নি তখন। চেক জমা করলে হিসেবে আনতেই হবে। তা হলে দশ হাজার টাকা তো ট্যাক্সেই বেরিয়ে যাবে। ওর যা বার্ষিক আয়, অন্তত যা দেখানো হয়, তাতে ওপরের দিকে শতকরা পঁয়ষট্টি টাকা কর পড়ে যায়। দিতে গা করকর করে। তারপর স্বপন শুনলে বলবে, এত কান্ড করে কী উপকার করলেন বাবা! এর চেয়ে দান করাই ভাল ছিল।

অবসরপ্রাপ্ত শ্রীধরের আয় সেই তুলনায় অনেক কম। ট্যাক্সের আওতায় পড়ে যায় অবশ্য, কিন্তু কিছু এন. এস. সি. কিনে ফেললে আর কিছু দিতে হয় না। পনেরো হাজার টাকার এন.এস.সি. কিনলে তার পাঁচ ভাগের একভাগ—তিন হাজার টাকা ট্যাক্স বাঁচাতে পারেন। এখন মার্চ মাস, বছরের শেষ মাস। তিন হাজার টাকা আয়কর দেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন শ্রীধর। কিন্তু হঠাৎ তাঁর নামে পনেরো হাজার টাকার চেকটা এসে যাওয়ায় সব প্ল্যান গেল ভন্ডুল হয়ে।

চুপি চুপি শ্রীধর চেকটা নিজের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দিলেন। জামাইকে বাঁচালেন। ভাবলেন, একসময় ব্যাঙ্ক থেকে নগদ টাকা তুলে জামাইয়ের হাতে দিয়ে বলবেন, এই নাও তোমার বন্ধু শ্যামলের কাছ থেকে আদায় করা টাকা। কড়ায় গন্ডায় শোধ। যদিও সুদ দেয়নি। তখনও ওঁর বিবেক পবিষ্কার ছিল।

যে ঋণ নেয়, সেই ঋণের কথা ভুলে যায়। যে ঋণ দেয়, সে আজীবন মনে রাখে। এই রকম একটা প্রবচন আছে। কিন্তু স্বপনের বেলা এই প্রবচন খাটেনি। শ্রীধরের বেলা খাটল। টাকাটা জামাইকে ফেরত দেবার কথা তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন।

মাস ছয়েক পার হয়ে গেছে তারপর। একদিন সকালে দুই অপারেশনের ফাঁকে নীচের তলার ঘরে বসে বসে স্বপন ব্যাঙ্ক থেকে পাঠানো হিসেবের কাগজ উলটেপালটে দেখছিল। শুধু জমা আর জমা। মাঝে মাঝে থোক টাকা তোলার অঙ্ক। ওগুলো সঞ্চয় বা বিদেশ টিদেশ যাওয়ার খরচ। বিরক্তিকর। আয়কর আইনটাই পরম বিবক্তিকর লাগে স্বপনেব। রোজগারের টাকা হাতে দিয়ে আবার কেড়ে নেওয়াব কোনও মানে হয়!

শ্রীধর পাশের চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি ওর বিরক্তি দেখে হাসেন। বলেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জনের এই হল অভিশাপ। দেওদাব স্ট্রিটের কোণে যে পানওলাটা বসে, সকালবেলা চুন আর খয়েবের দুটো পেতলের ঘটি মেজে সোনার মতো ঝকঝকে করে তোলে, দেখেছ? তার মুখখানাও ওই পেতলের ঘটির মতো প্রসন্ন। কোনও উদ্বেগের লেশ নেই। ওকে আয়কর দিতে হয় না।

হঠাৎ স্বপন বলল, 'শ্যামল ফোন করেছিল, বলল, টাকাটা ও ফেরত দিয়ে দিয়েছে।'

শুনে শ্রীধরের মাথায় বজ্রাঘাত হয়। তবু বুঝতে না দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। সে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আদায় করতে হয়েছে। তোমাকে বলা হয়নি বুঝি।'

স্বপন বলল, শ্যামল হাসতে হাসতে বলে, 'একখানা শ্বশুর বানিয়েছ বটে! কাবুল দেশ থেকে আমদানি করা খাঁটি কাবলিওলা।'

শ্রীধর এই বসিকতা উপভোগ করতে পারলেন না। ওঁর কানদুটো তখন ভোঁ ভোঁ করছে। কোনও রকমে বলতে পারলেন, 'অদ্ভুত লোক, চেকটা তোমার নামে না পাঠিয়ে আমার নামে পাঠিয়েছিল। একবার ভেবেছিলাম, ফেরত পাঠিয়ে দিই। তারপর কী ভেবে রেখে নিলাম।'

স্বপন বলল, 'তাই ব্যাঙ্কের হিসেবে টাকাটা জমা দেখছি না। আমি নিশ্চিন্ত আছি, আপনি যখন দেখছেন, তখন ভুল হবার জো নেই। আমি শ্যামলকে খামোকা শুনিয়ে দিলাম, ভেবেছ দেবে, এখনও দাওনি। পেলে আমি শ্বশুরমশায়ের কাছে জানতে পারতাম ঠিক। কী কাণ্ড! এখন ওকে কী বলব?—কতদিন আগে এসেছে টাকাটা?'

শ্রীধর বললেন, 'মার্চ মাসে। বলব বলব করে বলা হয়নি তোমায়। তারপর ভুলে গেছি। তুমি আমায় ক্ষমা করো স্বপন। টাকাটা আমি শিগগিরই ভরে দেব।'

বলতে বলতে মাথা হেঁট হয়ে গেল। নিজের বাবার কথা মনে পড়ল শ্রীধরের। যাকে তিনি মনে মনে ঘৃণা করেন। মনে পড়ল, বহুকাল আগের সেই দৃশ্যটার কথা। মা কাঁদছেন আর বাবা বার বার বলছেন, আমায় তুমি এবারটা ক্ষমা করে দাও। আমি সব ক্ষতি একদিন পুষিয়ে দেব। মনে পড়ল ধূর্ত শ্যামলের মুখখানাও। ও ইচ্ছে করে শ্রীধরের নামে চেক দিয়েছিল। পরীক্ষা করেছিল। তাতে জিতেছে। শ্রীধরকে চোর প্রতিপন্ন করেছে। উনি এখন কার কাছে ক্ষমা পাবেন?

সব ক্ষতি পূরণ করা যায় না, অনুভব করলেন শ্রীধর দত্ত। মনে মনে প্রার্থনা করলেন, স্বপন যেন কল্পিতাকে খবরটা না বলে দেয়।

১৯৯৮

❀ উবে যাওয়া না-যাওয়া

সত্যি কথা বলতে কী, বিদেশ যাওয়া বলতে যা বোঝায়, বিভাসের তা এই প্রথমবার। সতেরো মাস মালয়েশিয়ায় কাটিয়ে বাড়ি ফিবেছে। নাইনটি ফাইভ ডিসেম্বরে যে বিভাসকে তার বাবা, মা, দুই মাসি আর এক কাকা অভয় দিতে দিতে দমদম এয়ারপোর্টে সি-অফ করে আসে, সপ্তাহে একবার অন্তত টেলিফোন করার কথা মনে কবিয়ে দেয়, মা আবার তাতে সন্তুষ্ট নয়, বলে, মাসে একটা চিঠি লিখতেই হবে সমস্ত খবরাখবর জানিয়ে, আর এই জুন মাসে যে বিভাস জিন্‌স আর ধ্যাবড়া জুতো পরে নিজস্ব ট্রলির ওপর সুটকেস চাপিয়ে চাকা টানতে টানতে দমদম বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এল, এরা এক ব্যক্তি নয়।

অথচ কলকাতা থেকে মালয়েশিয়া কতটাই বা দূর। কালচারের দিক থেকে কতটাই বা তফাত। না, সিঙ্গাপুর ধরলে তফাত আছে। ওটা একটা আলাদা দেশ, আলাদা বিশ্ব। মালয়েশিয়ার সঙ্গে লাগা সিঙ্গাপুর, যেমন চিনের সঙ্গে লাগা হংকং। কী ব্যাঙ্কক। এরা ইউরোপ, আমেরিকার টুকরো এশিযায় বসানো। আলো, অট্টালিকা আর উচ্চাশা সুদ্ধ।

তবু তো ইউবোপ নয়। বাবা ছাত্রবয়সে ইউবোপ গিয়েছিল। কাকা আমেরিকা ঘুবে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়েব আমন্ত্রণে। তবে, বিভাস ভাবে, এই তো সবে শুরু। সিঙ্গাপুরে, কুয়ালালামপুরে যেসব প্রজেক্ট করে এসেছে, ও একা নয় অবশ্য, সঙ্গে আবও তিনজন ছিল—বিপ্লব, সুব্রত আর রাঘবন, যে, বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে আবার জাপান না যেতে হয়। বস্টনে একটা প্রজেক্ট ঝুলে আছে অনেকদিন, কোম্পানি গিলতে ভরসা পাচ্ছে না, বিভাসের কাছে জানতে চেয়েছে ওটা একটু জটিল, ও পারবে কিনা। অর‍্যাক্‌ল-৭-এর কাজ। এদেশে ছয় অবধি পৌঁছেছে, বিভাসের শেখা আছে ছয অবধি। তবে বাকিটা শিখে নিতে কী লাগে। আপিসে উৎপলদার সঙ্গে পনেরো দিন লেগে থাকলে চ্যালেঞ্জটা নেওয়া যায়। কিন্তু উৎপলদার সময় কই। সাউথ আফ্রিকা থেকে ফিরেই একমাসের জন্যে ওব জার্মানি যাওয়ার কথা। আপিসে কিছু নতুন মেশিন আসছে। বাকস থেকে বেরোলেই আপাতত ওগুলো নিয়ে লেগে পড়তে হবে। এই হল কম্পিউটব সফ্‌টওয়্যরের ওয়ার্ক কালচার। কাজ নেই তো নেই, বসে বসে কাঁচের পবদায় ইঁদুর চরাও। কাজ এসে পড়লে মাথা তোলাব সময থাকবে না। তখন রাত জাগো। শনি-রবিবাব এসে কাজ তুলে দাও। আগের জেনাবেশনে যারা বিদেশে গেছে, তাবা এই ঘোড়দৌড় দেখেনি।

বাইরে থেকে একই রকম আছে বিভাস। একটু মোটা হয়েছে। সাতাশ বছর বয়সে পৌঁছে বাঙালি ছেলেরা আস্তে আস্তে মোটা হতে শুরু করে। এটা সেই রকম শুরু। ঊনচল্লিশ মাপেব দামি শার্টগুলো ফেলে দিতে হল, কলার টাইট, টাই পরা যাচ্ছিল না। এখন একচল্লিশ। বিয়াল্লিশ হলে ঢিলে ফিটিং। চশমা নিতে হয়েছে বলে মুখটা গম্ভীর দেখায়। ওর মা বলে, সারাক্ষণ ওই ভিডিয়ো নিয়ে কাজ করা, চোখ খারাপ তো হবেই। তোদের আপিসে আর কোনও কাজ নেই?

বিভাস হাসতে হাসতে বলে, আছে মা। তাকে বলে ফ্যাকলটি। কম্পিউটর শেখানো। পিলপিল করে ছেলেমেয়েরা এখন কম্পিউটর শিখতে আসছে, ভাবছে ওই পথেই সেরা চাকবি। তাদের জন্যে মাস্টার দরকার। আমাদের কোম্পানিরই ট্রেনিং সেন্টার আছে তিনটে—এই কলকাতায়। বলো তো সেখানে ঢুকে যাই। প্রতিম স্যারের মতো থিতু হয়ে সারাজীবন ছাগল চরাই। কিন্তু ওই কাজে ওবা পনেরো হাজার টাকা মাইনে দেবে না। বিদেশে গেলে বাড়ি, গাড়ি, ক্লাব, মেডিক্যাল, টেলিফোন—সব ক্রেডিট কার্ডে, কোম্পানি দিয়ে দেয়। তার ওপর হাতখরচ ফেলে ছড়িয়েও মাস গেলে হাতে হাজার ডলার থাকে। দেবে না। আমরা হলাম দেশের ট্যালেন্ট এক্সপোর্ট।

আবার আশ্বাসও দেয় বিভাস। তুমি কিছু ভেবো না মা। চিরদিন এ রকম চলবে না, আমি জানি। আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কয়েকটা বছর খেটে কিছু কামিয়ে নিই। পৃথিবীটা ঘুরে নিই ভাল করে। তুমিই বলো মা, মালয়েশিয়ায় না গেলে আমি কি এই নতুন ফ্ল্যাটের জন্য টাকা পাঠাতে পারতাম! তবু তো যোধপুর পার্কে নিতে পারলে না। এই নিউ বালিগঞ্জে আসতে হল। ভেবে দেখো, গড়িয়ার চেয়ে এটা ভাল নয়? বড় নয়? কত খোলামেলা।

আগে কথায় কথায় রেগে যেত। এখন শান্ত হয়েছে, যুক্তি দিয়ে কথা বুঝতে চেষ্টা করে। যুক্তি দিয়ে বোঝায়। বাবা-মায়ের কথা কাটাকাটি হলে প্রথমটা চুপ করে থাকে। মাথা গলায় না। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সালিশি করতে এগিয়ে আসে। নয়তো এমন একটা প্রসঙ্গ তোলে যে, সব চেঁচামেচি মুহূর্তে ঠান্ডা হয়ে যায়।

একদিন সে রকম মুহূর্তে বিভাস হঠাৎ বলল, জানো বাবা, রাঘবন, আগের ট্রিপে নাইরোবি গিয়েছিল, ফেরার সময় আবুধাবি থেকে সাত-সাতটা গোল্ড কয়েন কিনে এনেছে। এক-একটার তিরিশ গ্রাম মানে তিন ভরি ওজন। কত টাকার মাল একবার ক্যালকুলেট করে দেখো। বলে ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে গেল অঙ্ক কষতে।

আগে খাওয়া নিয়ে ভারী জ্বালাত বিভাস। লাউ খাব না। ঢ্যাড়শ খাব না। পেঁপে দু'চোখের বিষ— সে কাঁচা হোক আর পাকাই হোক। ওর বাবা রোজ ব্রেকফাস্টে পাকা পেঁপে খায়, বিভাস বলত, ওটা তো ফ্রুট নয়, ভেজিটেবল। কী করে খাও?

যেভাবে লোকে পাকা কলা খায়।

ঘাবড়ে না গিয়ে বিভাস বলত, ও দুটো এক হল না। কাঁচকলা আর পাকা কলার জাত আলাদা। তুমি কি পাকা পটল খাবে? পাকা করলাকে ফ্রুট বলবে? আপেল খাও, মুসুম্বি খাও। আনারস, আম, আতা, পেয়ারা কত ফল আছে। কলকাতায় বারোমাস পাওয়া যায়।

বড় বেশি দাম রে!

শুনেই চুপ করে যেত, তখন এই চাকরিটা পায়নি। এম এস সি পাশ করে প্রোগ্রামিং শিখছে। বারো হাজার টাকা ফি দিয়েছে বাবা, যদিও খেপে খেপে দিতে হয়। ওর গা জ্বলে যায় টাকা দেবার সময়। একদম ধাপ্পা দিয়ে কী টাকা কামাচ্ছে এরা। কয়েকটা টেকনিকাল বই আর মেশিন টাইম, তার জন্য এত টাকা ফি? এর কোনও মানে হয়। বিভাস ভাবত, একদিন ও এর শোধ তুলবে।

মালয়েশিয়া থেকে ফিরে ও সবকিছুই আগ্রহ করে খাচ্ছে দেখে মা খুব খুশি। ওসব দেশে লোকে গোরু খায়, পোকামাকড় খায়। বেচারা হয়তো ডিমসেদ্ধ-ভাত খেয়েছে দিনের-পর-দিন। কী, রাঘবনের সঙ্গে বনিবনা করে দই-ভাত খেয়েছে। অখাদ্য কুখাদ্য ছাইপাঁশ খাবে কুসঙ্গে পড়ে, বিভাস এমন ছেলেই নয়। জিজ্ঞেস করলে ও মুখ খোলে না। তবু ওর মা ছেলে বিদেশ থেকে ফেরার পর থেকেই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে, গোরুর মাংস খাসনি তো? আরও কোনও নিষিদ্ধ কাজ করেছে কিনা, জানার ইচ্ছে এই একটা প্রশ্নের আড়ালেই আছে, বিভাস জানে, তাই ও কোনও উত্তর দেয় না। ওর বাবা বরং ওর হয়ে বলে, কেন রোজ রোজ জ্বালাতন করো? যদি খেয়েই থাকে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? যে-দেশে যেমন আচার, তা পালন করতে হবে বই কী। গ্লাসগোয় আমাদের এক বিহারি ব্রাহ্মণ সহপাঠী রোজ ঠান্ডা জলে চান করতে গিয়ে নিউমোনিয়ায় মরেই গেল।

এসব ওর মায়ের কানে ঢোকে না। এ তো কৌতূহল নয়, উদ্বেগ। যতই সদুত্তর দাও, থাকবেই। একদিন না হলে খাওয়ার টেবিলে, সেদিন কাকা এসেছিল ডিনারে, মা বলল, জানো ছোড়দা, বিভাস ওদেশে কাজ করতে গেছে, শুনে আমাদের আগের বাড়ির ভাড়াটে গিন্নি বলেছিল, ওখানে যেতে দিলে? ওদেশের মেয়েরা শুনেছি বড় বেহায়া। দুমদাম শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে। ওই তো অমুকের তমুক ব্যাঙ্কক গিয়েছিল, সেখান থেকে 'এড্‌স' নিয়ে ফিরেছে। সেই দিন থেকে আমি ভেবে মরি, আমার বাছার যেন এড্‌স না হয়। একটু পেট কামড়ালে কি জ্বর হলে ও সইতে পারে না।

কাকা হো হো করে হাসে। বিভাস বলে, সেসব দিন আর নেই মা। এখন আমি অনেক কিছু সইতে পারি। ঠেকে ঠেকে সইতে শিখেছি। জানি, কীসে এড্‌স হয়, কীসে হয় না। তুমি আর রিমোট কন্ট্রোল করে কতদিন চালাবে? এই ক'মাসে তুমি নিশ্চয় বুঝেছ, পৃথিবী দ্রুত বদলাচ্ছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে আমরা পেছনে পড়ে থাকব। পৃথিবী থেকে চিঠি লেখা যে উঠে গেল বলে, তা বুঝতে তোমার বাকি নেই। অনেক দেশে চিঠি বিলি বন্ধ হয়ে গেছে। পোস্ট আপিসে গিয়ে নিয়ে আসতে হয়। এখন ই-মেল এসে গেছে মা। ইন্টারনেট দিয়ে সারা দুনিয়ায় যোগাযোগ রক্ষা শুরু হয়ে গেছে। তুমি আর দেরি না করে ই-মেলে ঢুকে পড়ো শিগগির। সামনের মাসে আপিস থেকে আমায় একটা যন্ত্র বাড়িতে আনতে দেবে। তখন তোমাকে একটা পার্সোনাল কোড দিয়ে দেব। আর কোনও ঝঞ্ঝাট থাকবে না।

কাকা বলে, দেখো চেষ্টা করে। তবে আমার বিশ্বাস বিভাস, তোমার মা ই-মেলে চড়বে না। যতদিন এদেশে এয়ার মেল আছে, ডাক পিয়োন আছে, টেলিগ্রাম আছে, টেলিফোন আছে—ততদিন আমরা আব অগ্রসর হব না। তোমার মালয়েশিয়া যাওয়ার কল্যাণে অনেক কষ্টে আমরা ফ্যাক্সটা শিখেছি, ব্যস আর না।

নিউ বালিগঞ্জে উঠে আসার সময়, বিভাস তখন সিঙ্গাপুরে, সপ্তাহান্তিক টেলিফোন সংলাপে বিভাস পবিষ্কার ভাষায় মাকে বলে দিয়েছিল, আমার একটা জিনিসও তোমরা ফেলবে না। নতুন বাড়িতে আমার ঘরে সব এনে ডাঁই করে রেখে দেবে। আমি ফিরে গিয়ে নিজ হাতে সব বাছাবাছি করব। যা রাখার তা রাখব। যা ফেলার তা ফেলে দেব। সেইভাবেই সব বাখা আছে।

এখন ওর ঘরে যদি পি.সি. আসে, তা হলে তার জন্যে জায়গা করতে হবে তো। নতুন ইলেকট্রিক বোর্ড বসাতে হবে।

একদিন নিজের ঘরখানা সাফ করতে লেগে গেল বিভাস। ওঃ, কত হাবিজাবি বই, খাতা, তাড়া তাড়া জেরক্স নোটের পাহাড় জমিয়ে রাখা আছে। ওর ক্যাসেট প্লেয়াব, ন্যাশনাল, বাবা সমবায়িকা থেকে কিনে দিয়েছিল এগাবোশো টাকা খরচ করে—ঘোমটা দিয়ে রাখা আছে। তার পাশে ছড়ানো শ' খানেক ক্যাসেট, ফেলুদা-মার্কা বই গোটা চল্লিশ। একজোড়া ডুগি তবলা—তা-ও ঢাকা-দেওয়া ঢাকনার নীচে ফুটো হয়ে বসে আছে।

ইসকুলের সময়কার অঙ্কব খাতা মায়া কবে ফেলা হয়নি। ইতিহাসের বই, যা আব কোনওদিন পডা হবে না, দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে দড়ি-বাঁধা এনিড ব্লাইটন—বিভাস নেড়েচেড়ে দেখল। একদিন এবা কত আনন্দই না দিয়েছে। পরীক্ষার পড়ার ফাঁকে ফাঁকে এইসব ছিল ওব আনন্দেব আয়োজন। আজ আর দরকার নেই।

কিছু তুলছে, কিছু ফেলছে। ছোটবেলাকার স্মৃতি সব। মাসির দেওয়া উপহার সঞ্চয়িতা। তারও আগেকাব আবোল তাবোল হ য ব র ল ধুলো মুছে মুছে তুলে রাখল শেলফে। এই দেখো, সহজপাঠও আছে। সেই সময়কার হাতের লেখা। কী খারাপ! বরাবরই ওর হাতেব লেখা খাবাপ। ভাগ্যিস হাতের লেখার আর দরকাব থাকছে না।

ঘাঁটতে ঘাঁটতে এম এস সি-র কিছু খাতা উঠে এল ওর হাতে। রুলটানা কাগজে সুতো দিয়ে বাঁধানো। গোটা গোটা হস্তলিপি। এ তো বিভাসের নয়। তবে কার? বান্ডিলটা বাব করে আনল। দড়ির বাঁধন খুলে ফেলল চটপট।

দেখো কাণ্ড! পাঁচ-পাঁচটা খাতা-ভরতি সুন্দর হাতের লেখায় নানা পেপারের নোট। কষে-দেওয়া অঙ্ক আব সে বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশ। যেন ক্লাসের খাতা নয়, এগুলো কোনও বইয়ের পাণ্ডুলিপি। মলাটে নিরহংকার অক্ষরে এক কোণে নাম লেখা কাঞ্চন সেনগুপ্ত। ফার্স্ট ইয়ার এম.এস.সি। ১৯৯১। ইংরেজি অক্ষরে, কালো কালিতে। চারপাশে লাল বর্ডার। এক ধরনের লোক থাকে যার সব ব্যাপাবেই যত্ন, কিছুই অবহেলা ভরে করতে পারে না। কাঞ্চন তাই।

খাতাগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যায় বিভাসের। বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের দিনগুলো। কাঞ্চন এক বছর এগিয়ে। পরের বছরে বিভাস আর মিতুল। আরও কত ছেলেমেয়ে। মেয়েরা সংখ্যায় কম। মিতুলের মতো কেউ না। আর সবাই ক্লাসের ফাঁকে সিঁড়ির কোণে জড়ো হয়ে কেবল নিজেদের মধ্যে উচ্চস্বরে প্রাইভেট কথা বলত। সেই সাউথ পয়েন্ট থেকে দেখছে, সহপাঠিনীরা শুধু নিজেদের কথা বলে, আর কারুর কথা শোনার ধৈর্য নেই। অকারণে চেঁচায় আর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দেয়। আমি না-আমার না-আমাদের না-এই ছিল ওদের কথার ধরন। ছেলেদের সঙ্গে মিশ খেত না। মিতুল অবশ্য আলাদা।

মনে পডে যায় এ.পি. স্যারকে। পুরো নাম বোধহয় অতুল কি অপূর্ব পাকড়াশি। বোর্ডে অঙ্ক কষতে গিয়ে বার বার চক ভাঙতেন মট মট করে। ওই ছিল ওঁর বাতিক। হেড ছিলেন এস.এন.সি-র। এতদিন বোধহয় রিটায়ার করেছেন। তখনই বলতেন, একদিনও বেশি এখানে কাজ করব না। এটা কি বিশ্ববিদ্যালয়, না গাধার খাটাল। বিভাস ওই খাটালের একটা গাধা। এম.এস.সি-তে সেকেন্ড ক্লাস। পঞ্চান্ন পার্সেন্টও নম্বর পায়নি। তাই কম্পিউটরে চলে গেল। মিতুল অঙ্কের জন্যে ফার্স্ট ক্লাস মিস করল। সে কী কান্না! তখনই বেরিয়ে পড়ল ও ছেলে নয়, মেয়ে। কাঞ্চন দু'জনকেই আশ্বাস দিয়েছিল,

ঘাবড়াসনি। সারাজীবন সামনে পড়ে রয়েছে। ও তো বলবেই। নিজে ফার্স্টক্লাস পেয়েছিল। ইচ্ছে করলে ডক্টরেট করার জন্যে বিদেশ যেতে পারত। গেল না। ওর এক গোঁ—আই.এ.এস হবে। তার জন্যে তৈরি হতে লাগল। ওর ছিল মিতুলের প্রতি অপরিসীম স্নেহ আর দুর্বলতা।

খাতাগুলো সাজিয়ে আবার বেঁধে রাখতে একটা চিরকুটে চোখ পড়ল বিভাসের। তাতে কাঞ্চন লিখছে, বিভাস, তোর হয়ে গেলে এগুলো মিতুলকে দিয়ে দিবি। ব্যস। আসলে মিতুলকেই দেওয়া খাতাগুলো, একবছর আগের নোটস, বিভাস কেবল বাহক। ও ভেবেছিল, জেরক্স করে নেবে। তারপর একদিন নিউ আলিপুরে গিয়ে মিতুলকে দিয়ে আসবে। তখন নিশ্চয় ছুটি চলছিল। আস্তে আস্তে বিভাসের মনে পড়ল, ইচ্ছে করেই ও খাতাগুলো মিতুলকে দেয়নি।

হিংসে। আজ এতদিন পর ওর হাসি পেল এইসব ভেবে। একবার কোনও একটা সামান্য কারণে, বোধহয় টিফিন শেয়ার করতে গিয়ে, কাঞ্চনের সঙ্গে বিভাসের প্রায় হাতাহাতি হয়ে যায়। কাঞ্চন থাকে হস্টেলে, মেদিনীপুরে বাড়ি। মিতুল থাকে কাকার বাড়িতে, নিউ আলিপুরে, আশ্রিত, কেবল বিভাস আর সব সাধারণ ছেলেমেয়েদের মতো মা-বাবার সঙ্গে থাকে। ও মা-বাবার একমাত্র সন্তান—ওরা দু'জন তা নয়, ওদের ভাইবোন আছে। মিতুলের বাবা কৃষ্ণনগরের স্কুল টিচার। কাঞ্চন তিন ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ।

বিভাস চাউ নিয়ে গেলেই মিতুল তাতে ভাগ বসায়। বিভাসের টিফিন কৌটোয় মাঝে মাঝে কারিপাতা দেওয়া নোনতা হালুয়া থাকে, মিতুল ছোঁ মেরে তা থেকে এক খাবলা নেবেই। বিভাস কিছু মনে করে না। বরং ওর ভালই লাগে মিতুলকে খাবার দিতে। মিতুলের জন্যে স্যাক্রিফাইস করতে। কাঞ্চন দেখে, হাসে। ওর হাসিটা নিরানন্দ। বিভাসের বাকসে মিষ্টি লাড্ডু ফাড্ডু থাকলে দয়া করে কাঞ্চন একটা নিল হয়তো। সাধারণত ও চা আর টোস্ট খায়। মিতুল আনে মাখন-মাখানো চাব স্লাইস পাউরুটি। ওদের খাবারে বৈচিত্র্য নেই স্বাভাবিকভাবেই। তাতে বিভাসের কী দোষ।

সেদিন বোধহয় টিফিনের পর ক্লাস পালিয়ে কাঞ্চন আর মিতুল সিনেমা দেখতে যাচ্ছিল। মিতুল বলল, বিভাস, কাল ক্লাসনোটগুলো তোর খাতা থেকে টুকে নেব। বিভাস বলল, আমাব টিফিন খাস আর আমার জন্যে একটা টিকিট কাটতে পারিস না। না হয় তিনজনেই যেতাম। মিতুল বলল, কাঞ্চন টিকিট কেটেছে বে। কাঞ্চন বলল, এটা আমাদেব প্রাইভেট ব্যাপার। টু ইজ অ্যালায়েন্স, থ্রি ইজ ক্রাউড।

এই নিয়েই হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। সেদিন মিতুল, আশ্চর্য, দূরে দাঁড়িয়ে পুতুলের মতো কৌতুকে আহ্লাদে এদের ঝগড়া দেখেছে। উপভোগ করেছে কাঞ্চনের নিষ্ঠুর বাঁকা হাসি আর বিভাসের নির্বোধ ক্রোধ। মারামারি হলে বিভাসই জিতত যদিও কাঞ্চনও বলবান।

দুই

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পরেও ওদের যোগাযোগ ছিল। কাঞ্চন আর মিতুলের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতায় পবিণত হয়। রাস্তায়ঘাটে, মেট্রো স্টেশনে, নন্দনে, রবীন্দ্রসদনে, প্রায়ই ওদের একত্র দেখতে পাওয়া যেতে লাগল। বিভাস কেরিয়ার তৈরি করতে ব্যস্ত। প্রাণ দিয়ে ও কম্পিউটারের অঙ্ক শিখছে। ক্ষতিপূরণ করছে। এদিকে কাঞ্চনের মুখে কোনও বিকার নেই।

ফার্স্টক্লাস পাওয়ার সুবাদে একটা রিসার্চ স্কলারশিপ জোগাড় করে নিয়েছে। এখন দু'বছর নিশ্চিন্ত। হস্টেলের ঘরখানা ধরে রেখেছে। কিন্তু পড়াশোনা যা করে, তা আই.এ.এস. প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার জন্যে। প্রতিভাবান ছেলে কাঞ্চন, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ওর মন। ও জানে, নিজের বিষয়ে নব্বইয়ের ঘরে নম্বর তুলতে পারলে, আর সব বিষয়ে মিলিয়ে ধরলে ওপরের দিকে ওর জায়গা থাকবেই।

মিতুল কাঞ্চনের সঙ্গে লেগে আছে। সে-ও আই.এ.এস দেবে। কাঞ্চনের নোট, খাতা মন দিয়ে পড়লে ওরই বা নম্বর উঠবে না কেন? এম.এস.সি-র বেলায় তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছে। এটা অবশ্য ছুতো।

একদিন টের পেল, কৃষ্ণনগর, নিউ আলিপুরের মধ্যে চিঠি চালাচালি শুরু হয়েছে। এবার মিতুলের জন্যে পাত্র দেখা দরকার। উচ্চ শিক্ষা যা হওয়ার তা হয়েছে। একটা চাকরি চেষ্টা করলে ও জোগাড় করে নিতে পারে কলকাতায়। কোনও স্কুলে বা কলেজে। না হয় বি.এড কোর্সে এক বছর কাটিয়ে

যোগ্যতা অর্জন করে নেবে। আজকাল স্কুলে আর কলেজে মাস্টারদের মাইনের তেমন ফারাক নেই। এটা দরকার। গানবাজনা না জানলেও চলে, গৃহকর্ম রান্নাবান্না করার জন্যে নারী জাতির জন্ম হয়নি। তারা এখন পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি করছে। ওটাও বাদ দেওয়া যায়। পরে দরকার পড়লে না হয় শিখে নেবে। এমন কী শক্ত কাজ। কিন্তু পাত্রপক্ষ এখন উপার্জনশীল পাত্রী চায়। একজনের উপার্জনে সংসার চলে না। উপরন্তু নিজের একটা কাজ থাকলে মনে জোর থাকে, আমি কারুর লায়াবিলিটি নই। তোমার আমার দু'জনের চাঁদায় সংসার চলছে। কথায় কথায় স্বামীর কাছে হাত পাততে হচ্ছে না। আর, ভগবান না করুন যদি কোনওদিন বিচ্ছেদ টিচ্ছেদ হয়ে যায়, মেয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াবে না। আজ না হয় মা-বাবা আছে, ওরা তো চিরদিন থাকবে না।

মিতুল সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ও এখন বিয়ে করবে না। ও আই.এ.এস পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈবি হচ্ছে। কাঞ্চন সাহায্য কবছে ওকে। কাঞ্চনকে বাড়ির লোক সবাই চেনে। মিতুলের বন্ধু, প্রায় সমবয়সি, খুব উজ্জ্বল ছাত্র। ভদ্র। হস্টেলের ছেলেরাও, কর্মীরাও কাঞ্চনকে অনেকদিন ধরে দেখছে। ও যে খুব একটা মিশুকে, তা নয়, কিন্তু মুখের ওপর একটা অমায়িক প্রসন্নতা পরে থাকে। শারীরিকভাবে স্বাস্থ্যবান, কিন্তু স্বাস্থ্যবানদের মতো রাগী নয়। কাঞ্চনের দাঁতগুলি সুন্দর, সাজানো। ওর হাসি সুদৃশ্য। যখন কাউকে আঘাত কবে, তখনও মুখে ওব হাসি লেগে থাকে।

মিতুল কাঞ্চনের সঙ্গে প্রায়ই হস্টেলের ঘরে আসে যদিও মেয়েদের আসার নিয়ম নেই। তাই নিয়ে অন্য ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। এ-ও হিংসে। একদিন বাইশ নম্বব ঘরেব বিশ্বনাথ চান সেরে গামছা পরে কাচা পাজামা আর গেঞ্জি গাছে গাছে আঁটা তারে শুকোতে দিচ্ছে, এমন সময় দেখে, হন্তদন্ত হয়ে কাঞ্চন ঢুকছে। বিশ্বনাথ কী ভেবে হঠাৎ বলে উঠল, কী ব্যাপার কাঞ্চনদা, আজ একা, সঙ্গে পরিবার নেই যে! দোতলাব বারান্দায় কে একটা কালো মতন ছোঁড়া দাঁড়িয়ে ছিল। তখন সকাল এগারোটা হবে। সে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল বিশ্বনাথের কথা শুনে।

এইটুকু ঘটনা। কাঞ্চন নিজের ঘরে না গিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বিশ্বনাথের ঘবে গিয়ে দাঁড়ায়। ওব হাতে দড়ি-বাঁধা দুটো চাবি। চাবুকের মতো ওই চাবি ঘুরিয়ে বিশ্বনাথের মুখে মারল কাঞ্চন। হাসতে হাসতে বলল, আর একবাব বল সোনা। বিশ্বনাথ চোখে হাত দিয়ে বসে পড়ল। ওর চোখে জল। কাঞ্চন বলল, আমার সঙ্গে পরিবার আছে কি নেই, তাতে তোর কী? নিজের চরকায় তেল দে না বাপু!

বলে হাসতে হাসতেই ফিবে যায়। সিনিয়রকে ওভাবে ঠাট্টা করা উচিত হয়নি, বোঝে বিশ্বনাথ। আর এ-ও টেব পায় যে, কাঞ্চনদা হাসতে হাসতে মানুষ খুন করবে একদিন।

ওর পার্সোনালিটিকে খানিকটা ভয় করে মিতুলও। আবার সেই কারণে শ্রদ্ধাও কবে। কাঞ্চন ফেকলু ছেলে নয়। ও দায়িত্ববান। ওর ওপর নির্ভব কবা যায়। এ এমন একটা অভিজাত গদিওলা চেয়ার যাব ওপর ঠেসান দিয়ে বসা যায় আরামে। তাই ওর কটু বাক্য শুনলেও মিতুলের মান খোয়া যায় না।

একবার বেশ কিছুকাল আগে—একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাঞ্চন মিতুলকে বলেছিল, আচমকাই, এই তুই জিন্স্ পরিস না।

কেন?

কদর্য দেখায়।

আমাব ড্রেস নিয়ে তোর মাথা না ঘামালেও চলবে।

কাঞ্চন বলেছিল, প্রত্যেক শরীরে একটা নিজস্ব গড়ন আছে, মানিস তো? আর শবীরকে সুন্দর, মানানসই করে ঢাকাই তো ড্রেস পরার উদ্দেশ্য। মানিস তো? জিন্স্ পুরুষদের পোশাক, কারখানার কুলিদের পোশাক আসলে, এখন সবাই পরছে, কারণ এই হল ফ্যাশান। ঠিক আছে। মেয়েরা পবলে পেটের কাছটা বেঢপ দেখায়। এ হল রূঢ় সত্য। কী করা যাবে? আমি যদি পাঞ্জাবিব নীচে গেঞ্জি না পরে ব্রেসিয়ার পরি, কেমন দেখাবে। তুই ভাব। অথচ ব্যক্তি স্বাধীনতা খাটিয়ে আমি পবতেই পারি।

শুনে মিতুল হেসে বাঁচে না। কাঞ্চনের গেরুয়া পাঞ্জাবির নীচে ব্রেসিয়ার পরা, সামনেটা ফুলে আছে, এ-দৃশ্য মনে করলে হাসি চেপে রাখা যায় না।

মিতুল বলল, ভেতরে ভেতরে তুই বেশ পিউরিটান আছিস কাঞ্চন। আজকালকার ভাষায় ফান্ডামেন্টালিস্ট বলা যায়। বেমালুম ফতোয়া দিচ্ছিস।

হাসতে হাসতে কাঞ্চন বলে, না, না। আমি বলার কে? তোর শখ হলে পরবি। শুধু ভেতরে, জাঙিয়ার নীচে একটা প্যাড বেঁধে নিস, তা হলেই দৃষ্টিকটু লাগবে না। আমার মনে হয়, বেশিরভাগ মেয়েরা তাই করে, তুই জানিস না।

বলে, মিতুলের কাঁধের ওপর আদরের হাত রাখে কাঞ্চন। কিছু মনে করলি না তো? ওর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বলে, তোকে ভালবাসি তো। তাই যা ভাবি, তাই বলে ফেলি।

তারপর ওর মন ভোলাতে হাত ধরাধরি করে ওরা ধাবায় গিয়ে চিকেন রোল খেয়ে আসে।

সতেরো মাসের অনুপস্থিতিতে ওদের সঙ্গে বিভাসের সম্পর্কটা ফিকে হয়ে গেছে খানিকটা। আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড। তবু বিভাসের কী মনে হল, আবার কবে জাপানে কি সাউথ আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেবে। তার আগে একবার মিতুলের সঙ্গে দেখা করে আসি। টেলিফোনেও কথা বলা যায়। কিন্তু খাতাগুলো? কাঞ্চনের দেওয়া খাতাগুলো ফেরত দিতে হবে না? না হয়, একটু দেরি হয়ে গেছে। আর, ওর জন্যে একটা ছোট শিশি পারফিউম এনেছে, সেটাও দেবে উপহার, বুঝিয়ে দেবে—'সুধা ওকে ভোলেনি'। সেই ডাকঘরের ডায়লগ।

আগে অনেকবার এসেছে। সাধারণত, নিউ আলিপুরের এই দোতলা অংশ নিঝুম থাকে। কাকা আর কাকিমা। তৃতীয় ব্যক্তি বলতে এই মিতুল। কলকাতায় এসে থাকে, এ-বাড়িতে আশ্রিত ঠিকই কিন্তু তাতে কাকাদের যে উপকার হয়নি, তা নয়। একটা অল্পবয়সি ছেলে কি মেয়ে বাড়িতে থাকলে কত সময় কাজে লাগে। এই মেয়ে তো ছেলেরই সমান। বাড়ির নীচের তলায় দুটো দোকানঘর।

আগে, অনেক সময় এমন হয়েছে যে, গিয়ে দেখে, মিতুল নেই। তখন ওর কাকিমা বেরিয়ে আসতেন। চা করে দিতেন। ফ্রিজ থেকে মিষ্টি বার করে দিতেন। গল্পসল্প করে প্রতীক্ষাব সময় উতরিয়ে দিতেন কাকিমা। তারপর ওযুধ কিনে কি মিস্ত্রিকে খবর দিয়ে মিতুল ফিরলে পব ওদের গল্প করতে ছেড়ে দিয়ে কাকিমা ভেতরে চলে যেতেন। বিভাস একটু জোরে কথা বলে, কথায় কথায় হাসায়। তাই ওদের প্রাইভেট টকে তেমন কোনও গোপনীয়তা থাকতে পারত না। তবু, ওর চোখের দৃষ্টি দেখে, আসলে মেয়ে, মিতুল বুঝত, আড়ালে একটা প্রার্থনা আছে। আছে তো আছে। এই বয়সটা মেয়েদের প্রতি ছেলেদের মুগ্ধ হবার বয়স। মানুষ উন্নত শ্রেণীর প্রাণী, তাই নারী-পুরুষের আকর্ষণ কত মধুব। তাকে কত রকম ভাবে গোপন করতে শিখেছে। জৈব টানকে ফুলমালা দিয়ে ঢেকে প্রেম নামে তার প্রচার করে মানুষই। অন্য প্রাণী হলে লোকে মিতুলকে দেখে বলত, 'দি বিচ ইজ অন হিট।'

পাট-ভাঙা পাঞ্জাবি পাজামা আর কোভাদিস চপ্পল পরে, কাঁধে ঝোলা নিয়ে হাজির হয়ে দেখে, বাড়িতে অনেক লোকজন। তবু বিভাস তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়। ওই সিঁড়িতেই এক অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ও বলে, স্যরি।

কলিংবেল টিপতে হল না। সদর দরজা খোলাই ছিল। সামনের ঘরে দু'জন অচেনা ভদ্রলোক খালি-গায়ে লুঙ্গি পরে সোফায় বসে আছেন। মাথার ওপর বনবন করে পাখা ঘুরছে।

বিভাসকে দেখে ওঁদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাই?

মিতুল আছে?

বন্ধুবান্ধবদের আর শেষ নেই—এই রকম একটা কিছু মন্তব্য বিড়বিড় কবে ভদ্রলোক হাঁক দিলেন, মিতুল, কে এসেছে। দেখ।

অন্য সময় হলে বিভাস ভেতরে গিয়ে বসত। কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে রাখত। আজ ও চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়েই রইল। মনে মনে ভাবছে, খাতা আর উপহারটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যাবে। পরে ফোনে কথা বলবে না হয়।

আরে বিভাস, তুই? আমি ভাবতেই পারিনি। মিতুল বেরিয়ে এসে বিভাসের হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে আসে আর কী। বলে, শুনেছিলাম, তুই এন.আর.আই হয়ে গেছিস।

কিছু দিনের জন্যে। মালয়েশিয়ায় একটা প্রজেক্ট ছিল। শেষ হয়ে গেল। চলে এলাম। গত সপ্তাহে এসেছি। ভাবলাম, একবার খোঁজ নিই কে কেমন আছে বন্ধুরা।

কেঁদো মোটা হয়েছিস দেখছি। শুয়োরের মাংস খেয়ে? ভদ্রলোক দু'জন এদের প্রগলভ বাক্যালাপ শুরু হতেই গাত্রোত্থান করে ভেতরে চলে গেলেন।

মিতুলের পরনে একটা চাঁপা রঙের শাড়ি। গলায় সোনাব হার। বাঁ হাতের কবজিতে সুতো বাঁধা।

চুলের বাঁকা সিঁথি এখন কপালের মাঝ বরাবর সোজা হয়ে যাওয়ায় ওকে কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছে। সেটা ও পাত্তা দিতে চাইছে না।

মিতুল সহজভাবে বলার চেষ্টা করে, মালয়েশিয়া থেকে অনেক লোকে এড্‌স নিয়ে আসে। তুই ঠিক আছিস তো? বলে নিজেই খিলখিল করে হাসে।

সোফায় বসতে বসতে চোখের ইশারায় বিভাস জিজ্ঞেস করে, ব্যাপারটা কী? এরা কারা।

আমার বাবা। আমার মেসোমশাই।

তা এখানে কী করতে? যাবার আর জায়গা ছিল না?

মিতুল বলল, তুই কিছু শুনিসনি? আমার বিয়ে। আজ মঙ্গলবার। সামনের শনিবার। কৃষ্ণনগরে। তোকে কার্ড দেব। আসতেই হবে। বিয়ে! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জানলা দিয়ে কাক দেখতে লাগল বিভাস। নিউ আলিপুরের কাক আর নিউ বালিগঞ্জের কাক একটু আলাদা। এখন সকাল এগারোটায় যাদের খাবার জোটেনি, তারা চেঁচাচ্ছে ঠোঁট ফাঁক করে। যাদের খাবার জুটেছে তারা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে বসে আছে চুপচাপ। নিউ বালিগঞ্জ নতুন পাড়া। সেখানে জনবসতি কম। আবর্জনা কম। কাক কম। যে ক'টা কাছাকাছি পল্লি থেকে আসে খোঁজখবর করতে, তারা অপেক্ষাকৃত রোগাটে। গরিবদের আবর্জনা খেয়ে আর কত মোটা হবে?

বিভাস গম্ভীর স্বরে বলল, কাঞ্চনকে পাঁচ বছর ধবে সহ্য করছি, বাসর ঘরে তোর পাশে বসে কড়ি খেলছে, সে-দৃশ্যও সহ্য কবতে বলছিস?

কাঞ্চন নয়, এর নাম সুবোধ। কাঞ্চনের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বিভাস।

সে কী? এ যে অবিশ্বাস্য।

দু'জনেই আই.এ.এস দিলাম। ও খুব সিরিয়াস। আমারটা খেলা খেলা। বীভৎস বেজাল্ট হল। পবীক্ষা দিয়েই ও বুঝেছিল প্রথম একশোব মধ্যে ওর জায়গা হবে না। খুব মুষড়ে পড়ল। আসলে ওর অহংকারে চোট লেগেছে। তার প্রতিশোধ নিল আমার ওপব।

একদিন নন্দনের গাছতলায় বসে সিগারেট টানতে টানতে একটু হেসে কাঞ্চন বলল, তুই এবার কেটে পড় মিতুল। আমাকে দাঁড়াতে দে। আমার অনেক দায়িত্ব। কেরিয়ার জলাঞ্জলি দিয়ে আমার পক্ষে প্রেম করা অসম্ভব।

আমি বুঝলাম, এই ক'টা কথার পেছনে অনেক চিন্তা আছে।

বললাম, ঠিক আছে। তাবপর আর দেখা হয়নি।

কতদিন আগের ঘটনা?

ছ'মাস। না, এতদিনে সাত মাস হয়ে গেছে।

বাড়ি থেকে চ'প ছিলই। হেরে গিয়ে আমি সেই চাপেব কাছে নতি স্বীকাব করলাম, বুঝলি। মায়ের কাছে গিয়ে বললাম সব কথা। খুলেই বললাম। এখন তোমরা যাকে বাছবে, আমি তাকেই গ্রহণ করব। আমার কোনও নির্বাচন নেই।

এই লোকটা কে? কী করে? যাকে বিয়ে করছিস?

বললাম তো, এর নাম সুবোধ। বিজ্ঞাপন থেকে উঠে আসা এক পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের সুপাত্র। বিদেশি ব্যাঙ্কে কাজ করে উঁচু পদে। ব্যাঙ্কিং বোঝে আদ্যোপান্ত, ব্যাঙ্কিং ছাড়া আর কিছুতে ইন্টারেস্ট নেই। অনেক টাকা যৌতুক নিয়েছে।

তুই দেখেছিস ওকে? তোর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে? নাকি একেবারে ছাদনাতলায় চোখাচোখি হবে? বিভাস জানতে চাইল।

না, না, তা তো হয়েছেই। বোকাসোকা ভালমানুষ টাইপ। আমি ওকেই ভালবাসতে চেষ্টা করব। কাঞ্চনের সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করার পর আমি আর একক-জীবন ভাবতে পারি না।

বলে, উঠে পাশের ঘরের দিকে গেল মিতুল। একটু পরে, এক প্লেট মিষ্টি আর একটা ঢাউস বিয়ের নেমন্তন্ন কার্ড নিয়ে এসে হাজিব। বিভাস প্রথমে ভেবেছিল, খাবার জিনিস ছোঁবে না। পরে ভেবে দেখল, না, তাতে আরও বোকামির পরিচয় প্রকাশ পাবে। সে সব মিষ্টিগুলোই খেল একটা একটা করে। জল চাইতে পেল এক বোতল ঠান্ডা কোক। ইতিমধ্যে মিতুল কার্ডে নাম লিখে ফেলেছে।

আসবি তো?

চেষ্টা করব।

এই দ্যাখ কৃষ্ণনগর স্টেশনে নেমে আমাদের বাড়ি অবধি রুট এঁকে দিয়েছি খামের ওপর। আসতেই হবে কিন্তু।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বিভাস হঠাৎ বলল, আমরাও তো বন্ধু ছিলাম মিতুল। তুই আমাকে একটা চান্স দিলে পারতিস। বোধহয় ঠকতিস না। কাঞ্চন একটা ফ্রড। আমি জানতাম। মিথ্যেই তুই—

শুনে মিতুলের চোখে জল এল। বিভাসের হাতের ওপর ওর সুতো-বাঁধা হাতখানা রেখে বলল, ভেবেছিলাম। বিশ্বাস কর, তোর কথা আমার মনে হয়েছিল। চেষ্টা করলে, তুই যেখানেই থাকিস, তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতাম। কিন্তু আমি পেছিয়ে এসেছি এই ভেবে যে, তুই ভারী পিয়োর বিভাস। আমি তোর যোগ্য হব না। এই যে সুবোধ, এর সঙ্গে আমাকে অনেক ন্যাকামি, অনেক আদিখ্যেতা করতে হবে। করে যেতে হবে বছরের-পর-বছর। যাতে ওব ইলিউশন কখনও না ভাঙে। যখন কাঞ্চনকে একদম ভুলে যাব, তখনই সুবোধের সঙ্গে প্রেম হবে। কতদিন লাগবে জানি না। তার আগে হয়তো দু'-একটা বাচ্চাও হয়ে যাবে। তোর সঙ্গে এটা পারতাম না। পাপ হত।

একটু পরে উঠে পড়ে বিভাস। মিতুলকে শেষবার ভাল করে দেখে নেয়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। তারপর ঊনত্রিশ নম্বর ট্রামে উঠে ঘড়ি দেখে, সাড়ে বারোটা। বাড়ি পৌঁছোতে দেড়টা হয়ে যাবে। থাকগে।

ফাঁকা ট্রামে বসে বসে আকাশপাতাল ভাবতে থাকে বিভাস।

খুব যে একটা কষ্ট হচ্ছে, তা নয়। ও জানে কাঞ্চন পরের বছর আই.এ.এস পরীক্ষায় ওপরের দিকে নম্বর পাবেই। আন্ডার সেক্রেটারি হয়ে চাকরি জীবন শুরু করবে। ও মেধাবী ছেলে, উন্নতিও করবে তাড়াতাড়ি। ও হৃদয়হীন, সরকারি পরিচালকের পদে ওকে মানাবে ভাল। মিতুলও বোধহয় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ঝোলার মধ্যে বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দেখল, কার্ডটা ঠিক আছে। এখনই ছিঁড়ে ফেলার দরকার নেই। মেজাজ হলে চলে যাবে কৃষ্ণনগর। এই তো জীবন। এত সেন্টিমেন্টাল হবার কী আছে জীবনে। তারপরেই হাত পড়ল গোল করে পাকানো খাতার বান্ডিলটায়। আর সেই পারফিউমের শিশি যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনই আছে। দিয়ে আসা হল না। নিনা রিচি। মেয়েদের সেন্ট। পরে আর কাউকে দিয়ে দিলেই হবে না হয়। এত তাড়া কীসের। এখুনি তো উবে যাচ্ছে না।

১৯৯৭

❀ জয়যাত্রা

ব্লু ডার্ট কোম্পানির নতুন ঝকঝকে প্লেনখানা কাঁটায় কাঁটায় সকাল বারোটা দশ মিনিটে দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছে গেল। পুলক, ডা. পুলক বোস, ভেবেছিল, প্রাইভেট এয়ারলাইন, এই প্রথমবার চড়ছে, মাঝপথে ভেঙে না পড়ে। আগুন না লেগে যায়। কিন্তু রবিবারে আর কোনও ফ্লাইটে টিকিট পাওয়া গেল না। অগত্যা ট্র্যাভেল এজেন্টের পরামর্শই মানতে হল। তারা বলল, চিন্তা করবেন না স্যার, এদের পাইলট, ক্রু, সব ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত। দেড়া মাইনে দিয়ে ভাঙিয়ে এনেছে। শুধু এয়ার হোস্টেসরা নতুন রিক্রুট। কারুর বয়েস পঁচিশের বেশি নয়। খাবার তাজ বেঙ্গলের। একবার ব্লু ডার্ট চড়ে ঘুরে আসুন। এরপর আর কোনও এয়ারলাইনস মনে ধরবে না।

সত্যি দু'ঘণ্টা সময় বেশ আরামেই আসা গেছে। সাড়ে দশটায় কাজু বাদাম, চকোলেট আর কোক দিল—ব্রেকফাস্ট নয়, মুখের সুখ। সাড়ে এগারোটায় লাঞ্চ—অতি উত্তম। সোনালি আর কালো

কম্বিনেশন পরা কচি কচি মুখ এয়ার হোস্টেসদের, মুখে লেগে আছে খুশির হাসি, তা দেখে মন জুড়িয়ে যায়। পুলকের সিট ছিল আইলে, পাশ দিয়ে যেন হেঁটে যাওয়া-আসা করছে মেয়েমানুষ নয়, অপ্সরা, ওদের খসখসে ড্রেস থেকে আবজে উঠছে নিনা রিচির সুগন্ধ। পুলক মনে মনে ভাবে, মুক্ত অর্থনীতির হামলায় জাতীয়তা আর টিকবে না।

প্লেনের ভেতর যাত্রী ছিল অনেক, তবে বেশ কিছু জায়গা—বিশেষ করে জানলা আর আইলের মাঝের সিটগুলো, প্রায় খালি। পুলক লক্ষ করল সামনের দিকে জানলা-ঘেঁষে বসে আছেন এক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। বাইরের আকাশ দেখছেন। নীচে মেঘের পুঞ্জ, ওপরে অফুরন্ত বিশুদ্ধ নীল। এইখানে কোথাও স্বর্গরাজ্য আছে, ভাবছেন বোধহয়। মানুষ মরে গেলে তার বুড়ো আঙুল মাপের আত্মা যেখানে আসে। তার কর্মফলের বিচার হয় যেখানে যমরাজের কাঠগড়ায়। তারপর পুনর্জন্মের হুকুম পেয়ে আবার ফিরে যায় মর্ত্যে। আশ্চর্য, মানুষ এখনও এইসব গাঁজাখুরি গল্পে বিশ্বাস করে ভেবে অবাক হয় পুলক। সে ডাক্তার, দেহের চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, তার কাছে মৃত্যু মানে শরীর যন্ত্রের নিবে যাওয়া। তারপর আর কিছু নেই।

তাবপর আব কিছু নেই? শুনে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠবেন মহাত্মা সদানন্দ। তা হলে কীসেব ভরসায় বাঁচি আমরা?

ঈশ্বব যা করেন মঙ্গলের জন্য, পুলক বলবে। এইসব মিথ্যে স্তোক রাজন্য আব পুরোহিত-যাজকেরা মিলে বানিয়েছে, যাতে গরিব, সরলপ্রাণ, নিরীহ মানুষের দলকে আচ্ছাসে চুষতে পাবে। তাব নাম দিয়েছে শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র—।

মহাত্মা সদানন্দ বলবেন, মানুয অকারণ উদ্বেগে ভোগে। একটা অবলম্বন ছাড়া বাঁচতে পারে না। বিশ্বাসহীন জীবন দুঃসহ।

আবও অনেক তর্ক বিবাদ হবে দু'জনার মধ্যে। পরে, দু'-একদিন পরে। আগে ওদের মধ্যে আলাপ পরিচয় হোক।

মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে জানিয়েছিল, রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠান সোমবার সকাল এগারোটায়। আপনি শনিবারের মধ্যে চলে আসুন। পুলকের পক্ষে তা সম্ভবপর ছিল না। শনিবার সকালে ছিল পর পর তিনটে অপারেশন। বিকেলে রিসার্চ সেন্টারের কমিটি মিটিং। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি থাকছে সেই মিটিংয়ে। নতুন প্রজেক্ট নিয়ে কথা হবে। অনেক টাকার ব্যাপার। পুলক মানব সম্পদের কলকাতা আপিসকে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, আমি রবিবারেব কোনও একটা ফ্লাইট ধবে যাব, সোমবাব সন্ধেব ফ্লাইটে ফিরব। হাতে অনেক কাজ।

পুলকের বয়েস ষাটের নীচেই। ওর পবনে ইস্পাত-নীল রঙেব সাফারি সুট। হাতে একটা বড়সড় হ্যান্ডব্যাগ। ব্যস, আর কোনও ব্যাগেজ নেই। সুতরাং প্লেন থেকে নেমে ওকে আব বিমানবন্দবে অপেক্ষা করতে হল না। গট গট করে বেরিয়ে এল। অশোকা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা আছে। একটা ট্যাক্সি ধরে নেবে।

বেরিয়ে দেখল ও-ই প্রথম না। ওর আগে আর একজন যাত্রী বেরিয়ে দাঁড়িয়ে বয়েছে। সেই গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী, ন্যাড়া মাথা, গেরুয়া টুপিতে ঢাকা। তাঁর কাঁধে একটা ঝোলা। পায়ে মোজাব ওপর চপ্পল। একটু দূরে একটা দাড়িওলা লোক, আচকান পরা, দু' হাতে একটা প্ল্যাকার্ড তুলে ধরে রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তারও মাথায় টুপি। কালো পশমের টুপি। প্ল্যাকার্ডে দুটি নাম ইংরেজিতে লেখা—'ডক্টর পুলক বাসু/মহাত্মা সদানন্দজি। ওয়েলকাম টু দেলহি।'

লোকটা এগিয়ে এল। সম্ভবত গেরুয়ারই টানে। বলল, আসুন, আপনাদের জন্য গাড়ি আছে।

পুলক আর সন্ন্যাসী এক টি-মার্কা সাদা মারুতি এস্টিমে গিয়ে উঠে বসে। পেছনের সিটে। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে ওই মানবসম্পদের প্রতিনিধি। অশোকা হোটেল খুব দূরে নয়। সেখানে নেমে, দু'জন অতিথিকে নিজের নিজের ঘরের চাবি ধরিয়ে দিয়ে চলে যায়।

ওর কাছে যতটুকু খবর পাওয়া গেল, তা হল, এই হোটেলে আরও বারোজন অতিথি আছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছে তারা। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন পেশার লোক। মহিলা ও পুরুষ—দুই-ই আছে সেই দলে। ওরা সবাই বিশিষ্ট দেশসেবক। এরা সবাই আগামীকাল, সোমবার, সকাল এগারোটায় রাষ্ট্রপতি ভবনে উপস্থিত হয়ে, খোদ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এক লক্ষ টাকা করে পুরস্কার, মানপত্র ও

তাম্রফলক উপহার পাবে। এরা ভারতমাতার গৌরব। জনসাধারণের সেবায় ও সমাজের উন্নয়নে এরা নিবেদিতপ্রাণ অক্লান্ত কর্মী। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ—এইসব অর্থহীন উপাধি বিতরণ করার পুরনো প্রথা উঠে যাওয়ার পর—বিশিষ্ট দেশসেবকদের এইভাবে সংবর্ধনা জানানোর প্রথা চালু হয়েছে। এ হল প্রতিভাবান ও কীর্তিমান মানুষদের সর্বভারতীয় স্বীকৃতি। আগামীকাল একটি সুদৃশ্য স্মারকগ্রন্থও প্রকাশিত হবে। তার মধ্যে দেশসেবক চোদ্দোজন আমন্ত্রিত অতিথির সংক্ষিপ্ত জীবনী, ছবি, কীর্তিকথা বিধৃত থাকবে। হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকা এই উপলক্ষে সোমবার এক বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করছে। অনুষ্ঠানে অবশ্য দিল্লির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, মন্ত্রিসভার সদস্য, সাংসদবৃন্দ, দিল্লিবাসী লেখক-শিল্পীরাই উপস্থিত থাকবেন। সাধাবণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সাধারণ দেহাতি মানুষ রাষ্ট্রপতি ভবনেব বিশেষ সভাকক্ষে যদি ঢুকতেই পারবে, তা হলে এর মর্যাদা রইল কোথায়! তারা টিভিতে অনুষ্ঠান দেখুক। এগারোটা থেকে এগারোটা চল্লিশ পর্যন্ত সরাসরি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য কাল কাজের দিন। ওই সময়ে সকলেই স্কুল-কলেজ-আপিস-কাছারিতে থাকবে। তা থাকুক। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলল, এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য তো কোনও স্পনসর পাওয়া যায় না। তাই প্রাইম টাইম দেওয়া যায়নি। তবে খবরে এর সারাৎসার কাল তিন-চার বারই থাকছে। কাগজেও বেরোবে।

হোটেল লাউঞ্জে পুলক আড়চোখে মহাত্মা সদানন্দকে দেখছিল। গান্ধী ছাড়া আর কোনও 'মহাত্মা' এদেশে জন্মেছেন, ওর ধারণা ছিল না। অঙ্গের অধিকাংশ এঁর উজ্জ্বল গেরুয়া বসনে ঢাকা, মুখখানা দেখে বাঙালি বলেই মনে হয়, তবে গড়গড় করে যেভাবে হিন্দি বলছেন, তাতে অবাঙালি হওয়াও অসম্ভব নয়।

যাওয়ার আগে আচকান-পরা প্রতিনিধি বলে গেল, আজ রাত আটটায় এই অশোকা হোটেলের বিশেষ সভাকক্ষে, এক নম্বর ব্যাংকোয়েট হলে, মাননীয় অতিথিদের জন্য পৃথক ডিনারের বন্দোবস্ত হয়েছে। আহ্বায়ক, মাননীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী। বিশেষ অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ওই সময়ে আপনারা যেন ভেতরেই থাকবেন। অর্থাৎ ডিনারে উপস্থিতি খানিকটা বাধ্যতামূলক। তবে সারাদিন ঘোরাঘুরি করার কোনও বাধা নেই। চারখানা ট্যুরিজমেব গাড়ি মোতায়েন রাখা হয়েছে। একটা করে তেরঙা ব্যাজ দু'জনকে দেওয়া হল। ওটা বুকের ওপর আঁটা থাকলে সিকিউরিটি অফিসাররা বিরক্ত করবে না। দেশের রাজধানী, ভি আই পি-দের জায়গা, সিকিউরিটির তাই এত কড়াকড়ি।

অনেকদিন পর একা হওয়া গেছে। পুলক ঠিক করল, স্নান করে আরামসে একটা ঘুম লাগাবে। এখন খিদে নেই। খিদে পেলে না হয় রুম সার্ভিসের অর্ডার দিয়ে বিকেলের দিকে কিছু আনিয়ে নেবে।

দিল্লিতে বহুবার এসেছে পুলক। ডাক্তারদের কনফারেন্স থাকে। ওর লাইনে, অর্থাৎ চোখের চিকিৎসায় ও অস্ত্রোপচারে কলকাতায় ও একনম্বর, মতভেদে এক নম্বরদের একজন। সার্জনদের সম্বন্ধে—হাসপাতাল, নার্সিংহোম আর ডাক্তারদের দক্ষতা, মনোযোগ, সব মিলিয়েই, কলকাতার খুব সুনাম নেই। চোখের চিকিৎসা করাতে লোকে আজকাল মাদ্রাজ ছোটে। কিন্তু পুলক বোস যদি সময় দেন তা হলে আর অত দূর ভ্রমণের ঝুঁকি নেয় না। আলিপুরে ওর চেম্বার, ক্লিনিক, নিজস্ব অপারেশন থিয়েটার। রুগিদের থাকার জায়গা এবং একটি রিসার্চ সেন্টার। সব একটা পুরো ফ্লোর জুড়ে। চোখ নিয়ে আজকাল হাজার রকম গবেষণা চলছে দেশে বিদেশে। বায়ুদূষণ, পরিবেশদূষণ, অপুষ্টি এর প্রধান কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুন্নত আর উন্নয়নশীল দেশে চক্ষুরোগের বিস্তার দেখে উদ্বিগ্ন। তারা সেই সব দেশের সরকারকে প্রভূত পরিমাণে অর্থসাহায্য দিচ্ছে, যাতে রোগ নিবারণ ও নিরাময় উভয়ত সচেতন হয় বিশেষজ্ঞরা। সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। ভারত সরকারও উদার হস্তে অনুদান দিচ্ছে গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে। এই সামাজিক কর্মক্ষেত্রে পুলক বোস একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। বার বার তার দিল্লিতে ডাক পড়ে। তার নিজস্ব গবেষণাকেন্দ্রে তিন-তিন জন বিজ্ঞানী এই কাজ নিয়ে লেগে আছে আজ প্রায় চার বছর। পুলক তাদের পরিচালক। এই কেন্দ্রের পরিকল্পনা-প্রকল্পগুলি ও তাদের সফলতা বিষয়ে জানান দিতে প্রায়ই ওকে পেপার পড়তে যেতে হয় ইউরোপ আমেরিকায়। সেই অনুপস্থিতির সময়ে রুগিরা হাপিত্যেশ করে বসে থাকে। ফিরে আসার পর দিনে ছ'টা-আটটা পর্যন্ত অপারেশন করে ওকে বকেয়া মেটাতে হয়। ওর দু'জন জুনিয়র আছে, কিন্তু কেউ ওদের দিয়ে চোখ কাটাবে না। চোখ বলে কথা। খরচ বেশি হয় হোক, ডক্টর বোসকেই চাই।

এইসব নানা কারণে কলকাতায় ওর বিশ্রাম হয় না। সপ্তাহে পাঁচদিন সকাল আটটা থেকে রাত দশটা অবধি ওর কাজ। সকালে একটার-পর-একটা অপারেশন। বিকেল থেকে চেম্বার। সেখানে অন্তত দৈনিক পঁচিশজন রুগি। জুনিয়ররা কাজ কিছু এগিয়ে রাখে তাই রক্ষা, নইলে প্রতিদিন অতগুলি রুগি দেখা ওর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠত। শনিবারই একটু হালকা—সেদিন রিসার্চ সেন্টারে কাজ দেখে। আর কচি কচি মেয়ে বিজ্ঞানীরা শাড়ি আর অ্যাপ্রন পরে বাতানুকূল ঠান্ডায় ঘুরঘুর করে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। রবিবার ওর সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিন। স্ত্রী আর দুই ছেলেমেয়ে ওই একদিন মূল্যবান মানুষটার সান্নিধ্য পায়। বাড়িতে এ নিয়ে চাপা অশান্তি আছে, ও জানে, কিন্তু উপায় কী। ওই রবিবারেই একটু আড্ডায় যায় ক্লাবে। স্ত্রীকে গয়নাগাঁটি দিয়ে আর বাচ্চাদের ভিডিয়ো খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে হয়।

এই কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এত ব্যস্ততা ওর ছিল না। ডাক্তারের জীবনে ব্যস্ততা আসে বেশি বয়সে। তখন ও মেডিকাল কলেজে অধ্যাপনা করত। আর অবসর সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় দুটি চেম্বারে তিন দিন করে রুগি দেখত। ওই দুই পাড়ায় দুটি নার্সিংহোমের সঙ্গে চুক্তি ছিল। ওদের অপারেশন থিয়েটার ব্যবহার করত। নিজের ফি ছাড়া একটা কমিশন পেত। তখন অপারেশন বলতে বুড়োদের ছানিকাটা আর ছোটদের কনট্যাক্ট লেন্স লাগানো। এখন রোগ বেড়েছে, রুগি বেড়েছে। পসার বেড়েছে। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রিসার্চ সেন্টারের দায়িত্ব—যেটা দেশের কাজ। ডাক্তারের পেশা তো উকিল ব্যারিস্টারের পেশার মতো না। এর মূল কথা হল অর্থ উৎপাদন নয়, সেবা।

হোটেলের ঘরে এক ঘুম লাগিয়ে বেশ আরাম পায় পুলক। এখানে শুধুই বিশ্রাম। অ্যাপয়েন্টমেন্টের খাতাটা ওকে তাড়া করছে না। রাত্রে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ডিনার—এই হোটেলেরই ব্যাংকোয়েট হলে। কাল সোমবার সকাল এগারোটায় রাষ্ট্রপতি ভবনে পুরস্কার নেওয়া আর সংবর্ধনা গোছের কিছু একটা। বড় জোর বারোটা অবধি। ও তো একা নয়। আরও তেরোজন পুরস্কার পাবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে তারাও নিঃস্বার্থ কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ওর ইচ্ছে, কাল সন্ধের ফ্লাইটে কলকাতায় ফিরে যাবে। কোনও কারণে আটকে গেলে ফোন করে জানিয়ে দেবে। দিল্লিতে ফালতু সময় নষ্ট করার মানে হয় না।

এমন সময় টেলিফোন বাজল।

হ্যালো।

ডক্টর পুলক বাসু বলছেন?

হ্যাঁ।

বাংলায় কথা বলছে। পুলক অবাক হয়ে ভাবে, এখানেও কোনও রুগি ওকে ধাওয়া করল নাকি?

আমার নাম সুশান্ত। সুশান্ত সরকার। মনে পড়ছে?

সুশান্ত! সুশান্ত সরকার! মেডিক্যাল কলেজের সুশান্ত নাকি?

ঠিক ধরেছ।

তা এখানে কী ব্যাপার?

তোমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে ফোন করছি। শেষপর্যন্ত তুমি শিখরে উঠলে তা হলে।

কথাটায় একটু চমকে যায় পুলক।

শিখরে মানে?

টেলিফোনের ও-প্রান্ত থেকে লোকটি বলল, তুমি বলতে না, পাহাড়চূড়ায় একজনই উঠতে পারে। আর সবাই উপত্যকায় গড়াগড়ি খায়। তুমি বলতে, শেষ পাঁচশো ফুট চড়াই পথে কেউ কারুর বন্ধু নয়। সকলেই প্রতিযোগী। পড়ে গেলে কেউ হাত ধরে তোলে না।

পুলক বলল, না, এসব কথা আমি কোনওদিন বলিনি। আমি বরং বন্ধুদের সাহায্য করেছি। তোমাকেও সাহায্য করেছি।

পরোক্ষভাবে। লোকটি টেলিফোনেই হাসছে, শুনতে পেল পুলক।

তারপর শুনল, ও বলছে, যেমন, আমার বই ধার নিয়ে ফেরত দাওনি। আমার নোটবুক হারিয়ে ফেলেছ। স্যারের কাছে কোয়েশ্চেন জেনে এসেও আমাকে মিসগাইড করেছ, যাতে আমি তোমার চেয়ে বেশি নম্বর না পাই। তার ফলে থার্ড ইয়ারে আমি ফেল করে গেলাম। ডাক্তারি পড়া ছেড়েই দিলাম। ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বিলেত চলে গেলে তুমি বৃত্তি পেয়ে। ওই বৃত্তি আমার পাওয়ার কথা ছিল।

আজ এতদিন পর এইসব পুরনো কথা, সত্যি-মিথ্যে শোনাবার জন্যে টেলিফোন করছ সুশান্ত? একে কি অভিনন্দন বলে? পুলক এবার বিরক্তি প্রকাশ করে।

না, না। তোমার বিশ্বাসঘাতকতার ফিরিস্তি আরও অনেক লম্বা। আমি একা না, ওই তালিকায় আরও কেউ কেউ আছে। যেমন, অমরেশ মিত্র, সেলিম আখতার। বীণাপাণি। তোমাকে লজ্জায় ফেলতে ফোন করছি না বন্ধু। শুধু জানাতে চাইছি, পাহাড়চূড়ায় আমিও আছি। পাহাড়চূড়ায় ওঠার একাধিক পথ আছে।

বাঃ, এ তো আনন্দের কথা। কোথায় আছ? কী করছ এখন? জানতে ইচ্ছে করে।

জানবে। ক্রমশ জানবে। আজ ডিনারেই হয়তো দেখা হবে। বলে লাইন কেটে দিল লোকটা।

তার মানে, কালকের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপকদের দলে সুশান্তও আছে। ওই চোদ্দোজনের একজন। এই হোটেলেই আছে। কত নম্বর ঘর ওর?

পুলকের একবার মনে হল, রিসেপশনে ফোন করে সুশান্ত সরকারের রুম নম্বরটা জেনে নেয়। কিন্তু ওর অহমিকায় বাধল। ওর দিক থেকে আগ্রহ দেখালে সুশান্তর মনে হতে পারে, পুলক ভয় পেয়েছে। পুরনো রাগ ও মনে মনে পুষছে এখনও, ভুলে যায়নি। সেটা জানিয়ে দিল। কী মতলব আছে কে জানে। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে নেই তো? ভাবল, সিকিউরিটিকে কি একবার খবর দেওয়া উচিত?

আবার ভাবল, এখন আর কীভাবে প্রতিশোধ নিতে পারে ও? এখন পুলক নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। ওর আন্তর্জাতিক খ্যাতি, ওর ডাক্তারি পসার তো কেড়ে নিতে পারবে না। মনে পড়ছে, বন্ধুত্ব বিচ্ছেদের মুহূর্তে ও সুশান্তকে বলেছিল, সেই সব দিন আর নেই। আমার পথ আলাদা হয়ে গেছে। আমাকে এখন একাই এগিয়ে যেতে হবে। পিছুটান রাখা আর সম্ভব নয়।

এই কথা শুনে অমরেশ আর সেলিম ব্যথা পেয়েছিল খুব। বলেছিল, তুই হঠাৎ এমন বদলে গেলি কী করে? বীণাপাণি কোনও কথা বলেনি। চুপ করে ছিল অভিমানে। ওরা কোথায় কী করছে, কেমন আছে কে জানে। নিজেদের মতো করে ব্যর্থ জীবনটাকে মেনে নিয়েছে নিশ্চয়। যেভাবে সব হেরে যাওয়া মানুষ মেনে নেয়, মানিয়ে চলে। এই তো জীবনের নিয়ম। সকলের কি আশানুরূপ সফলতা আসে জীবনে? আসে না। জীবনে হারজিত আছেই। তা বলে কি কেউ পিছু পিছু ধাওয়া করে প্রতিশোধ নেওয়াব জন্যে? টেলিফোনের লোকটা অদ্ভুত। মদফদ খেয়ে টং হয়ে ছিল বোধহয়।

আজকের সুশান্তর সম্পর্কে কিছুই জানে না পুলক। অন্যদের মতো সেও মন থেকে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু আড়াল থেকে কি ও পুলকের অগ্রগতির ওপর লক্ষ রাখছে? কোনও অসতর্ক মুহূর্তে ধরবে বলে? সে কি ওর রোজগারের খবর রাখে? রিসার্চ সেন্টারের ছকটা জানে? সে কি দিল্লির রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে খবর দিয়ে ওর ক্ষতি করার চেষ্টা করবে এখন? ওর সুনাম নষ্ট করবে? সত্যি তো, এই প্রতিষ্ঠা, সুনাম—এ-সবের ভিত খুব শক্ত নয়। পাহাড়চূড়া বড় পেছল। রাজনীতির ক্ষেত্রে হামেশাই দেখছে লোকে, আজ যে সর্বত্যাগী দেশপ্রেমী বলে শ্রদ্ধেয়, রোজ যার কৃতিত্বের কথা, বক্তৃতা প্রচারিত হচ্ছে খবরের কাগজের প্রথম পাতায়, ছবি ছাপা হচ্ছে, টিভি-তে সাক্ষাৎকার দেখানো হচ্ছে—কাল হয়তো একটা ছোট্ট খবরের ধাক্কায় সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল! ধূলিসাৎ না হলেও চিড় ধরে গেল মহত্ত্বে। দেখছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীরাও সহসা ঘুষ নেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত। কেনেডি, জওহরলাল, মিতেরঁ নারীঘটিত কলঙ্কে লিপ্ত ছিলেন। ছাল ছাড়িয়ে দেখলে অতীতের কি বর্তমানের কাউকেই আর মহাপুরুষ বলা যাচ্ছে না। পুলকও মহাপুরুষ হওয়ার দাবি করে না। সাধারণ মানুষের চেয়ে ও একটু বড় মাপের—এই ভাবমূর্তিটুকু ও অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমে গড়ে তুলেছে, এর জন্য কিছু হীন কাজও করেছে হয়তো। জীবনে দাঁড়াতে গেলে, সফলতা পেতে হলে, সেটুকু করতেই হয়। তবু—। তবু কি? দেখাই যাক না। ডাইনিং হলে আগে ওর সঙ্গে দেখা হোক।

মার্চ মাস। শীত শেষ হতে চলেছে। কলকাতায় শীত আর নেই। লোকে পশমের পোশাক সব কেচে তুলে ফেলেছে। লেপ-কম্বল সরে গেছে পায়ের তলা থেকে। কিন্তু দিল্লিতে শীতের কাঁটা আছে এখনও। অশোকা হোটেল থেকে বেরিয়ে একটু পায়চারি করতে গিয়ে টের পায় পুলক। ভেতরটা তো বাতানুকূল। অনেক ভেবেচিন্তে পুরোপুরি সুট পরার সিদ্ধান্ত নেয়। একরঙা ধূসর রঙের গরম সুট, সঙ্গে মিহি ডোরাকাটা শার্ট আর মেরুন টাই, কালো জুতো, সবচেয়ে অভিজাত। আটটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে নেমে এসে দেখে, সেই দাড়িওলা আচকান-পরা লোকটা আর এক বয়স্ক মহিলা ছুটোছুটি করছে। একদিকে বিশাল ডাইনিং টেবিল সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। টেবিলটার চারপাশে গোটা কুড়ি কালো

মেহগনি কাঠের চেয়ার। অন্যদিকে পানীয়ের সরঞ্জাম। নানা ধাঁচের গেলাস। বিস্তৃত হাঁটাচলার জায়গা। পায়ের নীচে পুরু লাল কার্পেট। হোটেলের লোকেরা ক্রকারি সাজাচ্ছে। মাথার ওপর ঝুলছে দু'-দুটো ঝাড়বাতি।

লোকটার নাম মহিন্দর সিংহ। মানবসম্পদ উন্নয়নের ডেপুটি ডিরেক্টার না কী যেন পদ। অতিথিরা কেউ কেউ এসে গেছে। মহিন্দর সিংহ ওদের সঙ্গে ডক্টর পুলক বাসুর আলাপ করিয়ে দেয়। দু'জন মহিলাও আছেন। দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধি। জমকালো শাড়ি পরা। নাকে-কানে হিরের ফুল। আর একজন সালোয়ার-কামিজ পরা, গায়ে পশমের ওড়না, সম্ভবত পাঞ্জাবি। দেখতে দেখতে এসে পড়ে সবাই। শেষকালে একজন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। তাঁর মাথায় রেশমের উষ্ণীষ। পায়ে চকচকে ব্রাউন জুতো। চোখে চশমা। দেখলে আপনিই মাথা নুয়ে আসে। পুলক চিনতে পারল ইনিই সেই সহযাত্রী। আজ সকালে ওরা এক প্লেনে এসেছে। ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল মহিন্দর সিংহ। আর সেই বয়স্ক মহিলা। এমনকী, পারিষদ সহ বিভাগীয় মন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রী যখন পাজামা-পাঞ্জাবি, জহরকোট আর খদ্দরের টুপি পরে হাজির হলেন, তাঁরাও প্রণাম করলেন পূর্ব পরিচিত মহাত্মা সদানন্দজিকে। পুলক প্রথমে ধন্দে পড়ে গিয়েছিল। সুশান্ত কই? একটু পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে এগিয়ে তাঁর কাছে এসে মাথাটা ঝুঁকিয়েছে। এমন সময় হাসিমুখে মহাত্মা সদানন্দ বাংলায় বললেন, থাক, থাক। এতেই হবে। এতদিন পর ভিন্ন বেশে দেখে সুশান্তকে চেনা যায় না।

অনুষ্ঠান যেমন হয় তেমনই হল পরেরদিন। চোদ্দোজন দিকপাল সমাজসেবী এক লক্ষ টাকা করে পুরস্কার পেল। সেই সঙ্গে একটি তাম্রফলক আর মানপত্র। রাষ্ট্রপতির পায়ের অসুবিধে আছে। তা সত্ত্বেও তিনি নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে উঠে খানিকটা হেঁটে প্রত্যেককে পুরস্কার দিলেন। পাকানো মানপত্র নিজ হাতে খুলে পাঠ করলেন। পুরুষদের সঙ্গে করমর্দন করলেন, মহিলাদের নমস্কার জানালেন দুই হাত জোড় করে।

দিল্লির বাছা বাছা বিশিষ্ট শ'খানেক নাগরিক সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন সভায়। ছিল রেডিয়ো আর টিভি থেকে আসা রিপোর্টার আর তাদের বিপুল যন্ত্রপাতি। খবরের কাগজের ক্যামেরা। নিরস্ত্র উর্দি-পরা প্রহরী আর সশস্ত্র ব্ল্যাক ক্যাট। কিছু পেশাদার ফটোগ্রাফার। অনুষ্ঠান শেষ হতে-না-হতে একগুচ্ছ রঙিন ছবি দুই গম্বুজের মাঝখানে টেবিলেব ওপর ছড়িয়ে দিল সেই বয়স্ক মহিলা যে মহিন্দর সিংহের সঙ্গে হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে গিয়েছিল কাল। বিক্রি হবে। একটু আগেব ঘটনা, তার ছবি সব। এখনও গরম আছে। এক-একটির দাম চল্লিশ টাকা। পুলক খান পাঁচেক কিনল নিজের জন্যে। যে সব ছবিতে ও আছে। তিনখানা ছবি কিনে উপহার দিল মহাত্মা সদানন্দজিকে। একটা স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এই স্মরণীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে। তার মধ্যে প্রত্যেক পুরস্কার প্রাপকের ছবি ও জীবনচরিত আছে। প্রত্যেক অতিথি ও দর্শক এক কপি করে সেই স্মারক গ্রন্থ বিনামূল্যে পেয়েছে। যাদের দরকার তারা যত্ন করে তুলে রাখবে। পরবর্তীকালে জীবনীকারদের কাজে লাগবে। যাদের তেমন দরকার নেই, তারা পড়ে বা না পড়ে ফেলে দেবে। রাষ্ট্রপতি ভবনে এ রকম স্মরণীয় ঘটনা নিত্যই ঘটে। আজ একজন সুদর্শন, দীর্ঘকায় মহাত্মার উপস্থিতি অনুষ্ঠানটির উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। লোকেরা ভিড় ঠেলে এসে তাঁকে প্রণাম করেছে। সন্ন্যাসী ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করা আসলে ঈশ্বরকেই প্রণাম জানানো। মহিলাদের আবার সন্ন্যাসীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকে। সন্ন্যাসী হলেন কামজয়ী সংসারত্যাগী পুরুষ। উদার ও নিস্পৃহ। তাঁর মুখ সদা হাস্যময়। সদানন্দজি আবার মহাত্মা। সবাই দেখে, স্বার্থপর স্বামী নামক পুরুষ সংসর্গে তিতিবিরক্ত বয়স্ক মহিলারা রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে ছেড়ে হুড়োহুড়ি করে সদানন্দের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ডক্টর গবেষক পুলক বাসু সেই মহিলাদের উন্নত পাছাগুলি দেখতে দেখতে মৃদু হাসে। কেউ ওর অটোগ্রাফও চাইল না।

রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে হোটেলে ফিরে আসার পর লাউঞ্জে বসে সদানন্দ কয়েকজনকে ইন্টারভিউ দিলেন। তারপর পুলককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আজ সন্ধের প্লেনেই কলকাতায় ফিরছ?

তোমার কী প্ল্যান? জানতে চাইল পুলক।

আমি এখান থেকে লক্ষ্ণৌ যাব। সেখানে আমার আশ্রম আছে।

কীভাবে যাবে সুশান্ত?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সদানন্দ বললেন, ওটা আমার পূর্বাশ্রমের নাম। ও নামে আমায় ডেকো না

পুলক। গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে আমি সদানন্দ হয়েছি। ভক্তরা আমায় মহাত্মা বলে। তুমি ভক্ত নও, শুধু সদানন্দ নামেই ডেকো, কেমন? আপত্তি নেই তো?

তারপর বললেন, একটা গাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। কাল ভোর চারটে নাগাদ এখান থেকে রওনা হব। সন্ধে নাগাদ পৌঁছে যাব। তুমি আসবে নাকি আমার সঙ্গে?

পুলক বলল, ভাবছি। তোমার যদি অসুবিধে না হয়। ফিরে গেলেই তো আবার রুগি আর অপারেশন।

আর গবেষণা!

তার চেয়ে বরং দু'দিন ছুটি বাড়িয়ে নিয়ে তোমার সঙ্গে ঘুরি। তোমার কাজের জগৎটা স্বচক্ষে দেখি।

আমার কাজের জগতে কোনও ফাঁকি নেই। কেবল আনন্দ আর শান্তি। কেবল উৎসব। ধনী-দরিদ্র সেখানে সমান। এক টাকা আর এক লক্ষ টাকা প্রণামী আমার কাছে সমান। ডান হাতে গ্রহণ করি, বাম হাতে বিতরণ করে দিই। লক্ষ্ণৌ আশ্রমে আমাদের একটি ছোট অতিথিশালা আছে। আশ্রম আর মন্দির থেকে একটু তফাতে। তুমি থাকার জন্য একখানা ঘর পেয়ে যাবে সেখানে। দু'বেলা প্রসাদ পাবে। নিরামিষ কিন্তু।

পুলক রাজি হয়ে যায়।

পরদিন ঠিক ভোর চারটের সময় ওরা রওনা হয়ে যায় লক্ষ্ণৌ অভিমুখে। দিল্লি থেকে ছ'শো কিলোমিটার। একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি হোটেল থেকে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তৎসহ সাদা উর্দি পরা ড্রাইভার। তার নাম রঘুনন্দন মিশ্র।

শীত শেষের ভোরে রাস্তায় গাড়িঘোড়া নেই বললেই চলে। কিন্তু প্রচণ্ড কুয়াশায় আচ্ছন্ন শহর। হেডলাইট জ্বালিয়ে ধীর গতিতে গাড়ি চলতে থাকে। পুবদিকে আর কিছুটা গেলে ন্যাশনাল হাইওয়ে।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, গাড়ি ঠিক আছে তো রঘুনন্দনজি?

রঘুনন্দন সামনের সিট থেকে বলল, থোড়া গরম হোনে দিজিয়ে, তব ঘোড়া জেইসে দৌড়েগি।

পেছনের সিটে পুরনো বন্ধু দু'জন পাশাপাশি বসা। কারুর মুখে কথা নেই। আস্তে আস্তে আকাশ ফরসা হচ্ছে। নিবে যাচ্ছে তারাগুলো। কালো পিচের রাস্তা শিশিরে ভেজা। দু'পাশে সারি সারি গাছ থেকে টপ টপ করে শিশির ঝরছে। পাতা ঝরছে।

নৈঃশব্দ্য ভেঙে পুলক প্রথম বলল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব সদানন্দ?

করো।

তুমি কবে থেকে সন্ন্যাস নিলে? কেন নিলে?

সদানন্দ বললেন, থার্ড ইয়ারে ফেল করে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম। একদিন এই রকম ভোরবেলায় কাশীপুর ঘাটের সিঁড়িতে বসে আছি। ভাবছি বীণাপাণির কথা। ওকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু তুমি তখন ওকে নিয়ে খেলছ। এর কী পরিণতি হবে আমি জানতাম। তুমি ওকে আমার প্রতি বিমুখ করেছ। আমার সামনে কোনও পথ নেই। আলো নেই। ভাবছিলাম, গঙ্গায় ঝাঁপ দেব কিনা। সাহস পাচ্ছিলাম না। এমন সময় কে যেন আমার মাথায় হাত রাখল। তাকিয়ে দেখি, এক সাধু। মোটাসোটা চেহারা। খালি-গা। গলায় মোটা পইতে। মুখে সাদা দাড়ি-গোঁফ। মাথায় জটা।

সাধু বললেন, হতাশ হয়ে কোনও লাভ নেই। জীবনে অনেক কাজ করবার আছে। তুই আমার আশ্রমে চলে আয়। শান্তি পাবি। ওঁর পিছু পিছু চলে গেলাম। তিন বছর তিনি আমায় পরীক্ষা করলেন। তারপর যখন বুঝলেন, আমার মনের অবিশ্বাস কেটেছে, তখন দীক্ষা দিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আমি সেই আশ্রম পরিচালনা করছি।

পুলক বলল, বীণাপাণিকে আমি ঠকিয়েছি। ওকে বিপদের মধ্যে ফেলে আমি বিদেশে চলে যাই। বলেছিলাম, অ্যাবর্শন করিয়ে নাও, ও কিছুতে রাজি হচ্ছিল না। আমিই বা কী করব? আমার সামনে কেরিয়ার।

তোমার অনুশোচনা হয় না?

প্রথম প্রথম হত। তারপর ভুলে গিয়েছিলাম। জীবন কি থেমে থাকে? এখন জানতে ইচ্ছে করছে, ও কি বেঁচে আছে? কোথায় আছে?

সদানন্দ বললেন, বেঁচে আছে। ভাল আছে। আর কিছু জানতে চেয়ো না।

গাড়ি এখন তিরবেগে ছুটছে। রোদ উঠে গেছে। রাস্তার দু'পাশে গাছের পাতা ঝলমল করছে নরম রোদের আলোয়।

পুলক বলল, তুমি কি আমার ওপর এখনও রেগে আছ?

সদানন্দ বললেন, এতদিন ছিলাম। শুধু রেগেছিলাম না। তোমায় আমি মনেপ্রাণে ঘেন্না করেছি। ডাক্তারি পেশায় প্রধান কর্তব্য হল সেবা। অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তোলা। তা থেকেই উপার্জন হয়। উপার্জন থেকে জীবনযাপন। ভাল করে বাঁচা। অপরের কাজে লাগা। তুমি শুধু উপার্জন করতে শিখেছ। বাঁচতে শেখোনি। এক নম্বর হয়ে থাকার লোভে ন্যায়-অন্যায় বোধ তোমার নষ্ট হয়ে গেছে। ওটা গেলে আর কী থাকে?

পুলক রাগল না। একটু নড়েচড়ে বসল। তারপর বলল, তুমি আমার ওপর অবিচার করছ ভাই।

অবিচার? না। আচ্ছা, তুমিই বলো, মাসে তোমার কত টাকা রোজগার হয়?

তা, দু' লাখ-আড়াই লাখ।

এত টাকাব প্রযোজন আছে তোমার?

সবটা তো হাতে থাকে না। ট্যাক্স দিতে হয়। দানধ্যান করি। গরিব আত্মীয়দের সাহায্য পাঠাই।

মিথ্যে কথা বোলো না পুলক। তুমি পুরো রোজগাবের ওপব আয়কর দাও না। তোমার উপার্জনেব কত শতাংশ দানধ্যানে যায়? তুমি রিসার্চ সেণ্টার খুলেছ, চোখে ধুলো দিয়ে সরকাবি অনুদানে ভাগ বসাতে। ওখানে কোনও গবেষণা হয় না। যে-মেয়েরা ওখানে কাজ করে, তাদের একজন তোমার রক্ষিতা।

এত কথা কী করে জানলে? আমি জানি, প্রফেশনে আমাব অনেক শত্রু আছে, তারা এসব রটায়। আমি গ্রাহ্য করি না। এত বড় পাপী হলে আমি এত ওপরে উঠতে পারতাম না। যদিও তোমাব মতো 'মহাত্মা' আমি হতে পারিনি। পুলক আস্তে আস্তে বলল।

সদানন্দ মহাত্মা কথাটার খোঁচা কোথায় বুঝতে পারলেন। বললেন, দেখো পুলক, আমরা দু'জনেই আজ যে-যার শিখরে পৌঁছে গেছি। এতে যেমন পুলকিত হওয়াব কিছু নেই তেমনই লজ্জিত হওয়ারও কোনও কারণ নেই। তোমার মূল্যবোধ আলাদা, আমার মূল্যবোধ আলাদা। আমি মনে করছি তোমাব সফলতাব মধ্যে ফাঁকি আছে। তোমারও মনে করার যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে যে, আমার মতো থার্ড ইয়ারে ফেল করা লোক মহাত্মা হতে পারে না। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। একসময় তুমি হয়তো ভেবেছিলে, পরিণত জীবনে তুমি ওস্তাদ হবে, আর আমি হব তোমার তবলচি। তার বদলে দেখলে, লোকে তোমার চেয়ে আমাকেই বেশি সম্ভ্রম দেখাল। কী করা যাবে। আমার কাছে ভক্তরা আসে, তারা কিছুই প্রত্যাশা করে না। তাদের কষ্টের কথা শোনবার জন্যে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে মনে করে আমাকে। আমি মন দিয়ে শুনি। উপদেশ দিই, যাতে তাদের মন শান্ত হয়। আশ্বস্ত হয়ে চোখ মুছতে মুছতে তারা চলে যায়। অনেকে প্রণামী হিসেবে টাকাকড়িও দেয়। আমি তাদের ফেরাই না। ওই টাকা দিয়ে আর এক ধরনের দুঃখীর সেবা করি। আমি মাধ্যম মাত্র।

পুলক বলল, তুমি ধর্মের কথা শোনাও। ধর্ম, উপদেশ, আধ্যাত্মিকতা দিয়ে রোগের নিরাময় হয় না। ওগুলো ট্র্যাংক্যুইলাইজারের মতো। আমি রোগ সারাই। অন্ধকে দৃষ্টিদান করি। তাতে আমার পুণ্য হয় বলে আমি মনে করি। পেশেন্টদের আশীর্বাদ আমার মূলধন।

গাড়িটা হাইওয়ে ধরে ছুটছে। দু'পাশে দিগন্ত জোড়া মাঠ। গোরু-ছাগল চরছে। রবিশস্য তোলা হয়েছে কোথাও, কোথাও বা পেকে ঝুঁকে রয়েছে মাঠের ওপর। মাঝে মাঝে এক-একটা গ্রাম। বাজার। টালি-ছাওয়া লাল লাল বাড়ি। বাড়ির আশেপাশে মুরগি চরছে। আম গাছে বোল ধরেছে। আম-মুকুলের গন্ধ নাকে লাগছে।

রঘুনন্দন হঠাৎ গাড়ির গতি কমিয়ে আনছে টের পেয়ে পেছনে তর্করত যাত্রীরা সচকিত হয়ে ওঠে।

পুলক বলে, হামলোগ কাঁহা আয়া ড্রাইভারসাব?

মোরাদাবাদ আনে বালা হ্যায় জি।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করেন, গাড়ি বিগড়া তো নেহি?

নহি মহারাজ। মগর থোড়া গরম হো গয়ি। রেডিয়েটরমে পানি দেনা পড়েগা। হুড খোলকে সুস্থানা পড়েগা।

তব মোরাদাবাদমে পহুঁচকে হম ঠহরে আধা ঘণ্টা।

সদানন্দর প্রস্তাবে উৎসাহ পেয়ে পুলক বলে, কুছ নাস্তা ভি কর লে।

জরুর। ভুখ লগি হোগি।

ক্যা মিলতা হয় এহাঁ পর? সদানন্দ জানতে চান।

সব কুছ মিলতা হ্যায় মহারাজ। দহিচুড়া চাহিয়ে কি পুরিভাজি? জলেবি ভি মিল যায়গি। অগর চাহতে হ্যাঁয় তো গরম দুধ লা দুঁ।

ক'টা বাজে? পুলক ঘড়ি দেখল ন'টা বাজতে দশ মিনিট। দহিচুড়া খুব টক হবে। এরা কি চিনি দেবে?

সদানন্দ বললেন, আটার লুচি হজম করতে পারব না। কিছু ফলটল পেলে খাওয়া যায়। এদেশে সব মোষের দুধ। খুব ঘন। খেয়ে দেখবে নাকি? আধ ইঞ্চি পুরু সর। জিলিপিটা হয়তো তেলেভাজা।

একজন সন্ন্যাসী আর একজন ডাক্তার বিদেশবিভুঁইয়ে এসে উপযুক্ত পথ্য নিয়ে মুশকিলে পড়ে গেল।

রঘুনন্দন মিশ্র ব্রাহ্মণ। গাড়ির পেছন দিক থেকে একটা প্লাস্টিকের বালতি বার করল। তারপর উর্দির ভিতব থেকে পইতে টেনে এনে কানে জড়াল দু'-তিন পাক। এবং দোকানপাটের পেছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সদানন্দ গাড়ি থেকে নামলেন। অনেকদিন পর দুই বন্ধু একত্র হওয়ায় পুরনো স্মৃতিগুলো জেগে উঠছে। একবার চার বন্ধু মিলে দুর্গাপুর না বরাকর কোথায় গিয়েছিলেন গাড়ি ভাড়া করে। ফেরার সময় রাত দুটো নাগাদ বর্ধমানের কাছে আসতেই অল্পবয়সি ড্রাইভার বলল, গাড়ি আর যাবে না। তেল ফুরিয়ে গেছে। ওর পায়ের কাছে আধ লিটাবের মতো পেট্রোল ছিল একটা কৌটোর মধ্যে। সেটা ট্যাঙ্কে ঢেলে কোনও রকমে পাম্প অবধি গাড়িটা চালিয়ে আনল বেচারা। বন্ধুরা দেখল, ফূর্তি করতে গিয়ে সব টাকা খরচ হয়ে গেছে। কারুর কাছেই টাকাপয়সা নেই। চাঁদা করে দশ টাকা উঠল। সেই দশ টাকা ড্রাইভারকে দিয়ে ওরা বলেছিল, এই আছে, যেমন করে হোক তোমায় কলকাতায় পৌঁছোতে হবে।

তখনও অনেক পথ বাকি। দশ টাকায় কিছুই হবে না জেনেও ড্রাইভার শোঁ করে পেট্রোল পাম্পে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। যাত্রীরা মজায় মত্ত, কেউ লক্ষ করেনি, ওর মতলবটা কী। শেষে কুড়ি লিটার তেল তুলে শোঁ কবে গাড়ি বার করে নিয়ে সে ফুল স্পিডে চালিয়ে দিল। পাম্পে ওই মধ্যরাত্রে একজন কি দু'জন প্রহরী। আশপাশের লোকেরা সব খাটিয়া পেতে ঘুমোচ্ছে। ওরা চিৎকার করতে লাগল। কারুর কানে গেল না।

সদানন্দ সেদিন বলেছিলেন, এটা কী করলে? টাকা না দিয়ে পালিয়ে এলে? ও বেশ মজার একটা কথা বলেছিল তখন। বলেছিল, তেল ছাড়া তো গাড়ি চলবে না। কী করে কলকাতা অবধি যাব বলুন। আপনারা বললেন, দশ টাকা আছে, আর নেই। তো আমি কী করব?

অন্যায় কাজ। কিন্তু এখনও ভাবলে হাসি পায়। বিপাকে না পড়লে মানুষের বুদ্ধি খোলে না। গল্পটা পুলককে বললেন, জিজ্ঞেস করলেন, মনে পড়ছে? পুলক হো হো করে হেসে উঠল, এ-ঘটনা কি ভোলা যায়! সেদিন ধরা পড়লে আমরা সবাই বেদম মার খেতাম। হাসি থামলে বলল, কী সব দিন গেছে তখন। কী বেপরোয়া ছিলাম আমরা। কেউ যে খুন হইনি, আমাদের ভাগ্য।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করে।

পেছনের সিটে-বসা দুই যাত্রী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। বাইরের দৃশ্য দেখে।

একসময় সদানন্দ বলেন, মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কামনা-বাসনা মেটবার আগেই মৃত্যুর ঘণ্টা শোনা যায়। মানুষ মরতে চায় না, তাই তখন আঁকুপাঁকু করে সান্ত্বনা পাওয়ার আশায়। বিরাট বিশ্বের যিনি নিয়ন্তা, তাঁর আশ্রয় খোঁজে। তার মনে নিঃসঙ্গতা জাগে। সে ভাবে, ঈশ্বর তাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

আর তখনই ধর্মব্যবসায়ী তোমরা ওদের ধরে ফেলো। ভগবানকে ডাকতে বলো। দীক্ষা দাও, যেন মন্ত্রবলে সে বৈতরণী পার হবে। দানধ্যান করে পুণ্য অর্জন করতে বলো। যার জোরে সে আশানুরূপ একটা পুনর্জন্ম পাবে। এই ধোঁকা দেওয়ার কোনও মানে হয়? ভগবান বলে কেউ যদি থাকেনও, তিনি শুধু ভক্তকেই দেখবেন, অভক্তর প্রতি বিমুখ থাকবেন, এ তো হয় না। তাঁকেও একটা নিয়ম মানতে হয়।

সে নিয়মটা কী, বিজ্ঞান তার সন্ধান করতে পেরেছে? তোমরা পেরেছ?

বিজ্ঞান খুঁজছে। একটু একটু করে সন্ধান পাচ্ছে। কিন্তু অজ্ঞাত অঞ্চল যে বিশাল, বিপুল। প্রকাণ্ড

একটা গ্লোবের ওপর একটি ছোট্ট পিঁপড়ে হাঁটছে, দৃশ্যটা কল্পনা করো সদানন্দ, আর অবাক হয়ে ভাবছে কোথায় এর শেষ।

তার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকাটা হাস্যকর নয়। তার খুঁজে বার করার চেষ্টা হাস্যকর। কতটুকু ক্ষমতা তার?

না ভাই, মানতে পারলাম না। তার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকাটা আধ্যাত্মিকতা বলতে পারো। তার খুঁজে বার করার চেষ্টা হল বিজ্ঞান, বিজ্ঞানচেতনা, যুক্তিবাদ। পুলক বলল, বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দিয়ে মানুষের বুদ্ধি আর বিচারশক্তিকে ব্লক করে দিয়ো না তোমরা। বিশ্বাস মানুষকে ভোঁতা করে দেয়, এটা তো মানবে?

একটুখানি চুপ করে থেকে সদানন্দ বললেন, বিশ্বাসের মধ্যে আরাম আছে। শান্তি আছে। ক্ষণস্থায়ী জীবনের বেদনা সবাই সহ্য করতে পারে না।

তা হলে ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়ে গড়লেন কেন? ধরে নিচ্ছি ভগবানই গড়েছেন। প্রাকৃতিক নিয়মে জড়জগৎ, জীবজগৎ গড়ে ওঠেনি।

তর্কটা বেশি দূব এগোতে পারল না। হঠাৎ এক বিকট শব্দ করে গাড়িটা টলে গেল। আব একটু হলে গাছে ধাক্কা লাগত। কবজির জোর খাটিয়ে গাড়িটা ঠিক সময়ে থামিয়ে দিল রঘুনন্দন। আর একটু হলে ভীষণ বিপদ ঘটত।

ক্যা হুয়া ভাইয়া? পুলক ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। সদানন্দকে চোখ বুজে থাকতে দেখে ওর গায়ে ঠেলা দেয়।

পাংচাব। ঘাবড়াইয়ে মৎ। জরা উতর যাইয়ে হুজুব। হম দো মিনিটমে স্টেপনি লগা দুঙ্গা।

ততক্ষণে রোদ পড়ে এসেছে। কাছেপিঠে জনমানুষ নেই। দু'জনে গাড়ি থেকে নেমে বাস্তায় দাঁড়ায়। একটু দূরে তাকিয়ে দেখে একপাল গোরু নিয়ে এক ছোকরা রাখাল মাঠের মধ্যে দিযে চলেছে। ঘরে ফিরছে। নেংটি-পরা রাখালটা একটা গোরুর পিঠে বসে আছে আর মনের আনন্দে বাঁশি বাজাচ্ছে। আবও দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা লাল-হলুদ ট্রাক্টর।

সদানন্দ এ-দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন।

বললেন, বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে এই রকম মধুর স্বরে বাঁশি বাজাতেন। স্বর থেকে ঈশ্বর। ওই বংশীধ্বনির মধ্যে ওঙ্কার আছে।

পুলক বলল, বেসুরো। হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া এর চেয়ে অনেক ভাল বাঁশি বাজান। সুরেলা, শাস্ত্রীয়।

তবু রাধা এতেই মুগ্ধ। এই বাঁশির সুর শোনার জন্যে পাগল। আসলে বাঁশিটা বড কথা নয। বড় কথা হল ভালবাসা। যাব টানে সে ঘরে টিকতে পারে না। আকুল হয়ে ছুটে বেবিয়ে আসে।

পুলক হাসতে হাসতে বলল, দেখেছ ওই ট্রাক্টরটাই মাঠের মাঝখানে? দ্বাপর যুগে ট্রাক্টর আবিষ্কৃত হলে গোটা বৈষ্ণব ধর্মই লোপাট হয়ে যেত। কল্পনা করো, কৃষ্ণ অর্জুনেব বথ না চালিয়ে ট্রাক্টব চালাচ্ছেন।

সদানন্দ বললেন, কৃষ্ণ তো প্রতীক। রাধার আকুলতা ছিল ভগবানের প্রতি। তাই সে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য।

আর কৃষ্ণ তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। মথুরায় গিয়ে তাকে মনেও রাখলেন না।

তুমি যেমন বীণাপাণির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। তার গর্ভে তোমার সন্তান আছে জেনেও তুমি ফিরে তাকাওনি।

পুলক জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কেমন আছে বীণাপাণি? সেদিন তুমি বলতে গিয়েও বললে না। তার আগেই রঘুনন্দনেব গলা শোনা গেল। আইয়ে মহারাজ। গাড়ি ঠিক হো গয়ি।

গাড়িতে উঠতে উঠতে পুলক বলে, কৃষ্ণের সঙ্গে আমার ওইটুকুই মিল। আমরা দু'জনেই কেরিয়ারিস্ট।

পুলক ওইটুকু খোঁচা দিয়েই ছেড়ে দিল। তারপর ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, হম কাঁহাতক আয়ে হয়ঁ। কব লক্ষ্ণৌ পৌঁছেঙ্গে?

জি। সীতাপুর পিছে রহ গয়া। অব পুরব ছোড়কে দক্ষণ যা রহে হঁয়। সুরজ পিছে থা, অভি দায়না তরফ আ গয়া। ঔর তিন ঘণ্টা সমঝিয়ে।

পুলক এবার সদানন্দর দিকে ফিরে তাকায়।

সদানন্দ ওর মনের কথা বুঝতে পেরে নিজে থেকেই ওর কৌতূহল মিটিয়ে দেন। লক্ষ্ণৌ শহর পার হয়ে কিছুটা দূরে গোমতী নদীর তীরে তাঁর আশ্রম। প্রায় দশ বিঘা জায়গা জুড়ে পাঁচিল ঘেরা। ভেতরে একটা মন্দির আছে। মন্দিরের পাশে মেডিটেশন রুম। মেডিটেশন রুমে কোনও ঠাকুরদেবতার মূর্তি বা ছবি নেই। কেবল একটি বড়সড় পেতলের পিলসুজের ওপর একটি প্রদীপ। চব্বিশ ঘণ্টা জ্বলে। মেজে-জুড়ে মাদুর পাতা। যার যখন ইচ্ছে, যতক্ষণ ইচ্ছে, ওই মেডিটেশন রুমে বসে ধ্যান করতে পারে। করে।

অন্য বিভাগগুলির সঙ্গে কোনও ধর্মীয় সম্পর্ক নেই। সকলের জন্য খোলা। একটি মেয়েদের স্কুল। একটি মহিলাদের কর্মশালা—নানা হাতের কাজ শেখানো হয়, যাতে তারা কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারে। তারপর মহিলা কল্যাণ কেন্দ্র—সেখানে স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, জন্মনিয়ন্ত্রণের চর্চা হয়। এক পাশে আশ্রমিক আবাস। তারপর অতিথিশালা। খানকয়েক ঘর। ওই অতিথিশালার ওপরতলায় সদানন্দর আস্তানা। এখানে এলে ওই আস্তানায় বাস করেন।

সবটাই নারীকেন্দ্রিক।

হ্যাঁ। কেননা নারীরাই তো সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত। সমাজে, পরিবাবে সর্বত্র। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। এখানে মুসলিমরা সংখ্যাধিক।

পুলক শুনে অবাক হয়। বলে, আমার ধারণা ছিল নারী জাতি পুরুষের তুলনায় বেশি আদৃত। আকর্ষণী শক্তি দিয়ে তারা পুরুষকে বশীভূত করে। এ-দেশে যেখানেই যাও, দেখবে পদে পদে শাড়ি আর সালোয়ারের দোকান। প্রসাধন দ্রব্যের পসরা হাজার রকম। জুয়েলার। সব তো তাদেরই ব্যবহারের জিনিস। তাদের আঁচলে সিন্দুকের চাবি।

আকর্ষণী শক্তি বললে, তাই না? তার মানে যৌবন। মেয়েদের যৌবন কতদিন থাকে? তাদের শরীর যতদিন ব্যবহার্য, যতদিন তাদের রূপে সম্ভোগের প্ররোচনা আছে, আসলে বংশরক্ষার প্রাকৃতিক ষড়যন্ত্র ওটা—ততদিনই তাদের আদর। যখন সে আর সে-কাজে উপযুক্ত থাকে না, তখন পুরুষ তাকে অবজ্ঞা করে। বয়স্ক মহিলা-পুরুষ কেউ কেউ সুখী দম্পতি সেজে ঘুরে বেড়ায় অপরকে ঈর্ষান্বিত করার জন্যে। ভেতরে খোঁজ করে দেখো, তাদের মনে শান্তি নেই। কেননা, যৌন সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। মহিলারা চেষ্টা করে সংসারে গৃহিণীর ভূমিকা নিয়ে মানিয়ে চলতে। এক ধরনের সার্ভিস দিতে অপারগ হয়ে অন্য ধরনের সার্ভিস দিয়ে নিজেকে অপরিহার্য রাখতে। পুরুষের পাশাপাশি উপার্জনে নামে আর ক'জন? পশ্চিমবাংলার তুলনায় উত্তরপ্রদেশ অনেক পেছনে। এখানে পরদা প্রথা এখনও খুব শক্তিশালী। পরদার আড়ালে থেকে ওরা গন্ডায় গন্ডায় সন্তান প্রসব করে। আমাদের মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকারা ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়। লুকিয়ে লুকিয়ে আশ্রমে নিয়ে আসে।

পুলক বলে, বৃথাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ সদানন্দ। ব্রহ্মচর্য পালন করছ আজীবন। মহিলাদের সমস্যা নিয়েই দেখছি তুমি বেশি ব্যাপৃত।

নিজের সংসার থাকলে কি পারতাম?

সদানন্দ বললেন, আমাদের কাশীপুর আশ্রমে বেদান্ত চর্চা হয়। সেখানে আমি নিয়মিত বক্তৃতা দিই। উপনিষদ পড়ে শোনাই।

কারা আসে তোমার বক্তৃতা শুনতে?

যা ভাবছ, তাই। বৃদ্ধেরা। আর বয়স্ক মহিলারাই বেশি। কিছু কৌতূহলী বিদেশি পর্যটক। বক্তৃতার শেষে তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে কথা হয়। আমি ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়ে ত্যাগস্বীকার করার পরামর্শ দিই। আমি বোঝাই, সংসারে লিপ্ত থাকলে দুঃখ বাড়বে। নির্লিপ্ত হও, আসক্তি থেকে মুক্ত হও। ওরা মুগ্ধ হয়ে আমার কথা শোনে।

তারপর বেবিয়ে গিয়ে সব ভুলে যায়।

হয়তো যায়। একদিন কী হল জানো? একজন ভদ্রমহিলা, ধনী ব্যক্তির গৃহিণী, হঠাৎ বলল, মহাত্মাজি, আমি একা আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। বললাম, তা হলে একটুক্ষণ অপেক্ষা করো।

সবাই চলে গেলে পর আমি তাকে কাছে ডাকলাম। সে প্রণাম করে আমার সামনের চেয়ারে বসল। জিজ্ঞেস করলাম, কী তোমার কথা, বলো। সে খানিকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। ভাবতে লাগল, কী বলবে, কতটা বলবে। তারপর তার হাতে-ধরা একটা চামড়ার থলি খুলে একরাশ গয়না

আমার টেবিলের ওপর ঢেলে দিল। সোনা হিরে জহরত। বলল, এগুলো আপনি নিন মহাত্মাজি। আমি বলি, এসব দিয়ে আমি কী করব? সন্ন্যাসীমানুষ। ভিক্ষে করে আশ্রম চালাই। সে বলল, এসবে আমার আর কোনও প্রয়োজন নেই। এর বদলে আমায় একটু আশ্রয় দিন। ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, সব থাকতেও সে নিঃস্ব। তার স্বামী একজন ব্যস্ত চিকিৎসক, তার ছেলেমেয়ে তাকে উপেক্ষা করে। সংসারে চাকরবাকর অনেক, তার নিজেব সময় কাটে না। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বলল, আমায় যে-কোনও কাজ দিন। আমি তাকে ঠাকুরঘর দেখাশোনার কাজ দিলাম। গয়নাগুলো ফিরিয়ে দিলাম। বললাম, সকাল-বিকেল এসে এখানে কাজ করো। বাকি সময় ঈশ্বরচিন্তা করো, ধ্যান করো। মনের মালিন্য কেটে যাবে। গৃহত্যাগ করার দরকার নেই তোমার। গৃহকে তোমার মন্দির করে তোলো। সে বেঁচে থাকার মূল্য ফিরে পেয়েছে।

ডাক্তার পুলক বোস উৎফুল্ল হয়ে উঠল এই কাহিনী শুনে। বলল, আমার স্ত্রীকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তো! ওরও ওই এক সমস্যা। সব আছে। কিন্তু মনে শান্তি নেই।

সদানন্দ বললেন, যদি বলি, এই মহিলাই তোমার স্ত্রী? তার কাছ থেকেই তোমার জীবনযাপনের খবর পেয়েছি, তা হলে কি তুমি রাগ করবে?

হঠাৎ সবাই লক্ষ করে, দূরে আলো দেখা যাচ্ছে। ঝলমলে শহরের আলো। রঘুনন্দন ঘোষণা করে, অব হমলোগ আ গয়ে লক্ষ্ণৌ।

পুলক বিষণ্ণ হয়ে বসে ছিল।

সদানন্দ বললেন, এবার আশ্রমের দিকে গাড়ি ঘোরাতে বলি?

না ভাই, হজরতগঞ্জে কোনও একটা হোটেলে আমায় ছেড়ে দাও। আমি যাব না ওখানে।

সদানন্দ বললেন, গেলে ভাল লাগত। স্বচক্ষে আমাদের কাজকর্ম দেখতে পেতে। বীণাপাণির সঙ্গে দেখা হত।

সে ওখানে কী করে?

এই আশ্রমের কর্ত্রী সে। সন্ন্যাসিনী নয়। স্বেচ্ছাসেবিকা। তাব গর্ভের প্রথম সন্তানকে সে নষ্ট করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই অনুশোচনায় সে মরে যাচ্ছিল। একটা স্কুলে কাজ করত কিন্তু মনে শান্তি ছিল না। পাপবোধে ভুগত। একটা একটা করে অসুখ গ্রাস করছিল ওকে। আমি ওর করুণ অবস্থা দেখে কষ্ট পেয়েছি। একসময় তো ভালবাসতাম!

এদিকে আমার গুরুদেব দেহরক্ষা করলেন। আশ্রমের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ওপর। কাজ বাড়তে লাগল। আমি মানুষের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করব মনস্থ করলাম। আমি স্বামী বিবেকানন্দ পড়েছি আবার কার্ল মার্ক্সও পড়েছি। বুঝেছি, এ-দেশে বিপ্লব হবে না কোনওদিন। বিপ্লবের মধ্যেও ধ্বংসের বীজ থাকে। মানুষ শেষপর্যন্ত ঠিক পথ পেয়ে যায়। আমি বুঝেছি, কিন্তু ভুল পথগুলো পরীক্ষা না করে নয়। যে কাজ রাষ্ট্রের, তা আদর্শবাদী মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে চালিয়ে যেতে হবে। কালক্রমে আমাদের আশ্রমের কাজ আরও বিস্তৃত হল। ব্যারাকপুরে শান্তিকেন্দ্র খোলা হয়েছে। ভোপাল, ঢেঙ্কানল, সাসারাম, লক্ষ্ণৌতে আমাদের শিবির বসেছে দুঃস্থদের কল্যাণে। রাজনীতির মধ্যে দুর্নীতি ঢুকলেও আমি কিছু কিছু সরকারি সাহায্য পেয়েছি। তাতে রাজনীতিজ্ঞদের ভাবমূর্তি উন্নত হয়েছে। সাধারণ মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের অর্থ সাহায্য করেছে। বড়লোকেরা মোটা টাকা দান করে। হয়তো আয়কর বাঁচাতে। তাতে আমার কী। দু'হাত মেলে সব ভিক্ষে আমি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করি। আমাদের লোকবলও বেড়েছে পাশাপাশি। বীণাপাণিকে আমি দলে নিয়ে নিলাম। এখানে ওর নাম দয়াময়ী। হিন্দিভাষীরা ওকে দয়াময়ীজি বলে ডাকে। এখন ওর অগুনতি সন্তান। মানুষের আদর্শবোধ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে আমি মানি না।

সদানন্দ কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। একসময় চুপ করে গেলেন।

পুলক বলল, আমি দেখেছি সাধুসন্ন্যাসীরা সামাজিক জীবনেও নারীসংসর্গ এড়িয়ে চলেন। ঠাকুর বলতেন, স্ত্রীলোক দর্শনেও রমণ হয়। আর তুমি দেখছি, নারী জাতিকেই সংগঠিত করে কাজ করছ। বাধা পাও না?

চশমার পেছনে সদানন্দর বড় বড় চোখদুটি ধীরে ধীরে উন্মীলিত হয়। কিছু একটা ভাবছিলেন। চিন্তার সূত্র যেন কেটে গেল পুলকের এই কথায়।

ঠাকুর ছিলেন সাধক। সর্বক্ষণ ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর মনে হয়ে থাকবে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নারীপুরুষ সর্বক্ষণ একত্র জড়িত থাকলে ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাঘাত ঘটবে। আমি মনে করি, কেবল ভোগ্যবস্তু হিসেবে নারীকে দেখা আমাদের পুরুষকেন্দ্রিক সভ্যতার এক কুসংস্কার। নারী চরিত্র এতে অপমানিত হয়। বহুদিনের অভ্যাসে নারীও তার নিজের মানবিক মূল্য ভুলে বসে আছে। এই বিভ্রম কাটিয়ে দিলে দেখা যায়, বৃহত্তর কাজে নিয়োজিত, গার্হস্থ্য থেকে মুক্ত, নারীর শ্রমমূল্য পুরুষদের চেয়ে বেশি। তাদের ওপর নির্ভর করা যায়। একমুখী আন্তরিকতায় তারা অতুলনীয়। সাধারণত তারা আবেগপ্রবণ, প্রকৃতি তাদের এইভাবে গড়েছে। একটু নেতৃত্ব দিলে প্রশিক্ষণ দিলে মেয়ে কর্মীদের কাছ থেকে উন্নতমানের কাজ পাওয়া যায়। আমি পেয়েছি। আমাদের সঙ্ঘে মাত্র পাঁচজন সন্ন্যাসী আর সাত-আটজন ব্রহ্মচারী কর্মী আছি, এই লোকবল নিয়ে কি ছ'টি কেন্দ্র চালানো যেত? এত কথা বললাম, তোমার মনের সংশয় দূর করার জন্য। একবার স্বচক্ষে এসে দেখে যাও না।

পুলক বলল, না ভাই। বীণাপাণির মুখোমুখি আমি হতে পারব না। আমার সে সাহস নেই। আমার একটা প্রস্তাব আছে, তুমি কি শুনবে?

বলো।

তুমি যদি আমার এই রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের এক লক্ষ টাকা আমার কাছ থেকে দয়া করে গ্রহণ করো, আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব। সত্যি, এই টাকার প্রয়োজন নেই আমার। তোমাকে দিলে কোনও সৎ কাজে লাগবে। নেবে? বলো, ঘেন্না করে ফিরিয়ে দেবে না? আমাকে একটু হালকা হতে দাও।

ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মহাত্মা সদানন্দর মুখে মৃদু হাসি ফুটল এতক্ষণে। বললেন, ওঁ স্বস্তি। দান গ্রহণ করার সময় আমাদের এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। তবে এটা যদি ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাও, আমি নেব না।

১৯৯৭

❀ চাহিদা

বাইরের দরোজায় বেল পড়ল। খবরের কাগজ। তার মানে সাতটা। তন্দ্রাচ্ছন্ন সুরভি চিত হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় মাথাটা ডানদিকে একটু ঘুরিয়ে টেবিলে রাখা ঘড়িটা দেখে নেয়। তারপর মাথাটা বাঁদিকে একটু ঘুরিয়ে পাশের বিছানাটা দেখে। যথারীতি ফাঁকা। চাদর উলটুল, পাশবালিশ চটকানো। পরদার ফাঁক দিয়ে তার ওপর রোদ পড়েছে। গৌরব হাঁটতে বেরোয় ছ'টায়, সাড়ে সাতটার আগে ফেরে না। হাঁটার পর আজকাল আবার লাফিং ক্লাব করে দল বেঁধে অট্টহাসির ব্যায়াম শুরু হয়েছে। বাড়ি ফেরার আগে লেবু চা খেয়ে আসে।

বাইরের দরোজায় আবার বেল পড়ল। এবার বিরক্ত হয় সুরভি। কেউ দরোজা খুলছে না কেন? সীতা কী করছে? অন্যদিন এই সময়ে পাউরুটির পোড়া গন্ধ পাওয়া যায়। বাসনের টং টং শব্দও কানে আসে।

বর্ষাশেষের শরীরে সর্বত্র ব্যথা। চোখ খুলতে ইচ্ছে করে না, আলো লেগে কষ্ট হয়। তবু সেই শরীরটাকেই টানতে টানতে বিছানা ছেড়ে উঠল। আড়চোখে পাশের বন্ধ ঘরটার দিকে তাকাল একবার। বউ-মেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে স্বপন। তিনটেই কুড়ে, ঠেলে তুলতে হয়। বেল শুনেও উঠছে না।

যা ভেবেছিল তাই। বসার ঘরে চেয়ার সরিয়ে মাদুর পেতে ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে আছে সীতা। ওঠার কোনও লক্ষণ নেই। ওর চোখের ওপর অবধি চাদর চাপা। গজগজ করতে করতে সুরভি ওকে ডিঙিয়ে দরোজা অবধি গেল। ঠিকে ঝি। বাসন মাজতে এসেছে। সুরভি ওকেই বলল, গ্যাসে জলের কেটলিটা চড়িয়ে দাও তো।

তারপর সীতার কাছে এসে রুক্ষস্বরে বলল, পা সরা। কী হয়েছে তোর? বেল বাজল দু'-দু'বার, শুনতে পাস না?

কালো কালো সরু দুটো পা গুটিয়ে নিল সীতা। পাশ ফিরল। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, কাজ করতে পারব না।

মৃদু কণ্ঠস্বর, কিন্তু তার ওজন বেশ ভারী। সুরভির আচ্ছন্নতা কেটে এসেছে। রান্নাঘরে গিয়ে ঠিকে ঝি-কে বলল, দেখো তো, কী হয়েছে ওর। কেন উঠছে না? সে কোনও কথা না বলে ভেজা হাত আঁচলে মুছল। তারপর সীতার কাছে এসে ঝুঁকে ওর কপালে সেই হাত ছোঁয়াল একবার। কোনও রকম বিস্ময় বা উত্তেজনা প্রকাশ না করে বলল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বলে, নির্লিপ্ত নিরাসক্তভাবে সদর দরোজা খুলে বেরিয়ে গেল তড়িঘড়ি। অন্য বাড়ির বাসন মাজার কাজে। এখানে আটকে গেলে ওর চলবে না।

সীতার বয়েস পনেরো-ষোলো হবে। দেখায় বারো-তেরোর মতো। অপুষ্ট চেহারা। ফ্রক পরে। মাস চারেক হল এখানে এসেছে। রান্নার কাজ করে। ফাইফরমাশ খাটে। ঠিকে ঝি কামাই করলে ঘর ঝাঁট দেয়, ফিনাইল-জল দিয়ে তিনখানা ঘর মোছে। কাপড় কাচে না।

ঠিক এইভাবে ওরা আসে। দু'বছর, তিনবছর কাজ করে। মধ্যবিত্ত পরিবারে ওদের শোষণ করা হয়, একভাবে দেখলে তাই। কেননা, পরিবারের ওই বয়সের মেয়ে বা ছেলে সংসারের কোনও কাজই করে না। তাদের ঘুম থেকে তুলতে হয় সকালবেলা। রাত্তিরে টিভি-র সামনে থেকে ছিঁড়ে আনতে হয়। আর শোষিত হওয়ার মধ্যে ওই কাজের মেয়েরা দু'বেলা দু'থালা ভাত আর সংসারের যাবতীয় অতিরিক্ত খাদ্য—তরি তরকারি মাংসের ঝোল খেয়ে পুষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর একসময়ে ওদের বিয়ে হয়ে যায়। ওদের বাপ-মা কেউ একজন প্রতিমাসে এসে মাইনের টাকাটা নিয়ে যায় আর দেখে যায় মেয়েটা কেমন বাড়ছে। যাতে ঠিক সময়ে একটা ঝগড়া পাকিয়ে নিজের সঞ্চয় সব পুঁটলিতে বেঁধে চলে যেতে পারে। চিরদিনের মতো।

গৌরব সেই কারণে ঢোকার সময়েই মেয়েটার ওজন নিয়ে রাখে। যাবার সময় আর একবার। তাতেই সমস্ত অভিযোগের খণ্ডন হয়ে যায়। সীতার আগে যে শিশুশ্রমিক ছিল তিন বছর, তার নাম হাসি, এসেছিল আঠারো কেজি, শোষিত হয়ে গেছে আটত্রিশ কেজিতে। সীতা পনেরো কেজি ওজন নিয়ে এসেছে। এখনও ওর গায়ে-পায়ে তেমন মাংসের প্রলেপ পড়েনি। হাসির ছিল টিভি দেখার নেশা। ওইখানে থেকেই ও জীবনের যাবতীয় দর্শন, জ্ঞান আহরণ করেছে। শেষের দিকে গৌরব বকুনি দিলে হাসি শতাব্দী রায়ের মতো চোখ করে ওর দিকে তাকাত। চুলের বিনুনি বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের ওপর ফেলে, আড়চোখে চেয়ে পরীক্ষা করত কী রকম এফেক্ট হচ্ছে। একদিন প্রৌঢ় গৌরব বলতে বাধ্য হয়, ওরকম করে তাকাবি না, আমার বুক ধড়ফড় করে। টিভি-র শব্দ কমা। সীতার সে রোগ নেই। ও চুরি করে শুধু দুধ খায়।

মনে মনে সুরভি কী ভাবে আমরা জানি না, তবে খবর হিসেবে মাঝে মাঝে যা বলে, তা হল, সীতা কোনও কম্মের নয়। সকালে দু'ঘণ্টার কাজ, তা-ও অত্যন্ত অগোছালোভাবে করে, তারপর সারাদিন ছুটি। ফ্রিজ সাফ করা, গ্যাসের বন্ধ ছ্যাঁদায় কাঁটা মারা, খাবার টেবিলের ওপর থেকে তেলের দাগ তোলা, এমনকী অসময়ে অতিথি এসে পড়লে চা করে দেওয়া, সব সুরভিকেই করতে হয়। সীতা দই পাততে পারে না। গৌরব জানে, ওই কাজটা শক্ত। ওই কাজে কিছু টেকনিক আছে যা সুরভি সীতাকে শেখায়নি এখনও।

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে শুনে সুরভি বিচলিত বোধ করে। এতগুলো চা, টোস্ট এখন করতে হবে ওকে। পাতা-চা সরিয়ে রেখে ও টি-ব্যাগ বার করল। ফ্রিজ থেকে মাছের পুঁটলি এনে রাখল রান্নাঘরের সিঙ্কে। বরফটা গলুক। আটটায় টুকুনের ইসকুল, ন'টায় স্বপনের ভাত, দু'জনের টিফিন। এগারোটায় গৌরব আপিসে বেরোবে, তার অবশ্য ঢের দেরি আছে। ও-ঘরে ওরা টের পেয়েছে কিছু একটা গোলমাল বেধেছে সাতসকালে, কিন্তু না স্বপন, না কেকা, কেউ একবার বেরিয়ে আসছে না। টুকুনকে নিয়ে খেলাধুলো চলছে। বাচ্চা মেয়েটার হাসি আর চিৎকারের শব্দ আসছে। সুরভি ভাবল একবার কেকাকে ডাকে, এসো হাত লাগাও,' কিন্তু কী ভেবে ডাকল না। আগে গৌরব আসুক। সীতা মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে পিটপিট করে দেখছে সব।

আধুনিক টেকনোলজির যুগের ছেলে স্বপন। দু'বার বিদেশ ঘুরে এসেছে। দেখে এসেছে, কোথাও, কোনও উন্নত সমাজে চাকরবাকরের কনসেপ্ট আর নেই। মেশিন আছে, তাই দিয়ে রান্না করো, মেশিন দিয়ে ঘর পরিষ্কার করো সপ্তাহে একদিন। রোজ রোজ ঘর ঝাঁট দেওয়ার কী দরকার? মেশিন দিয়ে কাপড় কাচো। কাজের লোক মানেই প্রবলেম। হিটারের ওপর বসিয়ে আগে টোস্ট সেঁকা হত। এখনও হয় সীতার হাতে। স্বপন অবশ্য একটা ইলেকট্রিক টোস্টার এনে দিয়েছে। সুরভি সেটার ধুলো ঝাড়ছে। একটা মাইক্রোওয়েভ অভেন, মাত্র তেরো হাজার টাকা দাম, দশ মিনিটে যে-কোনও জিনিস তুলতুলে সুস্বাদু হয়ে যায়—এনে ফেলেছিল প্রায়, গৌরব বাধা দিয়েছে।

বলেছে, আগে ঠিক করো, ওই মেশিন কে সাফ করবে। আধঘণ্টা পর পর বাজারে ছুটতে হয়—সরষে আছে তো আদা নেই। আদা আছে তো জিরে নেই। কথায় কথায় আলু শেষ, চিনি শেষ। বাড়িতে কোনও প্ল্যানিং আছে? নেই। কোনও মেশিন এত হ্যাপা পোহাবে না। যতদিন চিপ লেবার পাচ্ছ, ব্যবহার করো, তারপর স্বপন, তুমি ডিশওয়াশিং মেশিনে লোহাব কড়াই মেজো। তুমি যে-সব দেশ দেখে এসেছ, সেখানে সবাই সেদ্ধ খায়। কাঁচা শাক পাতা খায় সস দিয়ে। ঝিঙেপোস্ত, ছ্যাঁচড়া, ধোঁকার ডালনা, নিম-বেগুন—এসব আগে বন্ধ করো, তারপর মেশিন।

ঘর্মাক্ত হয়ে গৌবব যখন ফিরল, তখন বাড়িতে যাকে বলে প্যান্ডিমোনিয়াম। অন্য দিনের মতো দাঁত মাজা, মুখ ধোয়া নিয়ে ন্যাকামি করতে গিয়ে চড় খেয়েছে টুকুন। কাঁদছে। গাঁক গাঁক করছে স্বপন। গলা ভাতেব ফ্যান গালতে গিয়ে অর্ধেক ভাত বেসিনে পড়ল। বাকি অর্ধেক ফ্যানেব সঙ্গে মিশে রইল ডেকচির মধ্যে।—এই জন্যই বলেছিলাম, একটা রাইস কুকার কিনতে। কোনও ঝঞ্ঝাট থাকত না। এখন সামলাও।

সুবভি বলছে, সীতা তো রোজ সামলায়। তুই এত অগা জানলে আমি ভাত নামাতাম। এখন মাছের আঁশ ছাড়াও। টুকুনকে ইসকুলের বাসে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত কেকার ফুরসত নেই। ও কাঁচা পাউরুটির ফাঁকে ফাঁকে শশার কুচি ঢোকাচ্ছে, টুকুনের টিফিন। একটা সন্দেশও যাবে।

স্বপন ডেকচির ভেতরের মণ্ডটা মাকে দেখিয়ে বলল, খানিকটা মাখন দিয়ে রাখি? টেস্ট হবে। তার সঙ্গে মাছভাজা। আজকের লাঞ্চ। ফ্রায়েড ফিশ উইথ হচপচ। সুরভি নিজেব ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারে না। ওর দেড়া হাইট। পরনে একটা লাল রঙের বারমুডা, বুকে থিকথিক কবছে লোম। মাসে পঁচিশ হাজার টাকা মাইনে পায়, অথচ একেবারে অপদার্থ! এক হাঁড়ি ভাত ফোটাতে পারল না!

স্বপন বলল, আমি আঁশফাঁশ ছাড়িয়ে ধুয়ে দিলাম। নুন-হলুদ মাখিয়ে বাখছি। কেকা এসে ভাজবে। কেমন? ও মাছ ভাজায় এক্সপার্ট। বলে লাফাতে লাফাতে ঢুকল বাথরুমে।

এবার গৌরব টুকুনের হাত ধরল। ওব গায়ে অবশ্য টি-শার্ট, পরনে সাদা শর্টস থাকে, বাঙালরা বলে হাফপ্যান্ট। বইয়ের বস্তা, টিফিনের কৌটো, জলের বোতল সব কেকার হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে বলল, যাও, তুমি রান্নাঘরে ঢোকো শিগগির। মাকে ছেড়ে দাও। জানো তো, ওর চোখে ভাপ লাগা ক্ষতিকর। তারপর নাতনিকে উদ্দেশ করে বলল, চল বেটি, আর টাইম নেই। এখুনি বাস এসে যাবে। এই টিফিনের কৌটোয় কাঁচা পাঁউরুটির ওপর কাটা শশা, বারোটা নাগাদ গাঁজিয়ে উঠবে। এগুলো ফেলে দিয়ে তোকে মিহিদানা ভরে দেব আজ।

টুকুন বলে, ভাগ্যিস সীতাদির জ্বর হয়েছে।

সীতা তখনও তার বিছানাটা, মানে মাদুরটা, দেয়ালের একপাশে সরিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে। আর আড়চোখে এদের কাণ্ড দেখছে।

একসময় সুরভি বিড়বিড় করে বলল, একবার উঠে এসে দুধটা তো জ্বাল দিতে পারে। কয়েকটা আলু কেটে দিতে পাবে। কী এমন জ্বর। তা নয়, ওনঠে পড়ে আছে। এটা ওর ইচ্ছের অভিব্যক্তি। হুকুম করবে এমন সাহস নেই। বলা তো যায় না কত জ্বর। আজকাল ম্যালেরিয়ায় ১০৬° অবধি ওঠে।

স্বপন আর টুকুন চলে যাওয়ার পর বাড়িটা একটু ঠান্ডা হয়। তখন সুরভি স্বামীব কাছে এসে বলে, খবরের কাগজ ছেড়ে এবার ওঠো। আজকে তোমার আপিস যাওয়া হবে না।

কেন।

সীতার একটা ব্যবস্থা করো আগে। তারপর ওর বদলি—

গৌরব এইবার খেপে ওঠে। বলে, ওর জ্বর কত, একবার কপালে হাত দিয়ে দেখেছ? মুখে থার্মোমিটার দিয়েছ? বদলির কথা মনে পড়ল আগেই।

আমাদের থার্মোমিটার ওর মুখে? সুরভিও খেঁকিয়ে ওঠে। তোমার কাণ্ডজ্ঞানটাও গেছে? ভাবলে না, আমার ছোট বাচ্চার সংসার। তুমি যাও, ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে এসো। এতক্ষণে অমিতাভ চেম্বারে এসে গেছে।

গৌরবও গজগজ করে: কথায় কথায় বদলি! দু'-দু'জন বাড়িতে রয়েছে কী করতে? নিজেদের কাজ নিজেরা করে নিতে পারবে না দু'-একদিন? আমাকে আপিস কামাই করতে হবে, কী করে বললে এ-কথা? আমার কাজ কাজ নয়?

ছাই কাজ। বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকার জন্য বেরোও। নইলে সরকারি আপিস ছাড়া কোথায় বারোটায় গেট খোলে? চারটেয় বন্ধ হয়?

কথাটা খানিকটা সত্যি। অবসর নেবার পর ওপরওলার অনুরোধে গৌরব কম টাকায় কম সময়ের চাকরি করছে। বাড়িতে সর্বক্ষণ নাগালের মধ্যে থাকলে এরা চাকরের মতো খাটাবে। ওরাও আর বদলি নেয়নি। যতদিন এইভাবে চলে। তা হলেও চাকরি তো। সব চাকরিই চাকরের কাজ। কামাই করলে কৈফিয়ত দিতে হয়। গৌরব সীতাকে ডেকে বলল এবার, ওঠ ওঠ। আর পড়ে থাকিস না। তোকে ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে আসি।

সুরভি ফিসফিস করে পরামর্শ দেয়, পুরো ফি দিয়ো না। কাজের মেয়ে তো। অমিতাভ গরিব দুঃখীকে এমনিই দেখে। ওর ডিসপেনসারিতেই ওষুধ বানিয়ে দেয়। মিক্সচার। তাই নিয়ে এসো। শুধু জেনে এসো হাম-বসন্ত কিনা। ম্যালেরিয়া কিনা। তা হলে দেশে পাঠিয়ে দেব। যতদিন আর একটা লোক না পাই, ওই ঠিকেটাকেই আটকাব। বেলায় এসে কাজ করবে। তখন তো ফাঁকা থাকে।

এসব গৃহিণীদের কূটনীতি। গৌরবের মনে হয়, এ ভারী নীচতা, স্বার্থপরতা। অকৃতজ্ঞতা। ও ডাক্তারকে পুরো ফি-ই দেয়। নিজের নাতনি হলে যা দিত। অমিতাভ তার বিনিময়ে ওকে চারটে কড়া ক্যাপসুল দিল, না চাইতেই। আব কিছু ভিটামিন। ওর স্যাম্পল স্টক থেকে। বলল, আজকেই তিনটে পড়ুক, আফটার ব্রেকফাস্ট, আফটার লাঞ্চ আর আফটার ডিনার।

শুনে গৌরব হঠাৎ হা হা করে হেসে ওঠে। বলে, এর আবার ব্রেকফাস্ট কী? বাসি রুটি চা দিয়ে খায়। লাঞ্চ, ডিনার মানে একথালা করে রেশনের আতপ চাল—তার ভাত, আর আমাদের যাবতীয় সারপ্লাস। কাঁচা লঙ্কা। ঝোল।

সীতা গুনগুন করে বলে, আমি ভাত খাব না। পাঁউরুটি খাব দুধ দিয়ে।

ভাইরাল ফিভার। মুখে অরুচি। খাক, খাক, দু'দিন তাই খাক। গৌববের ইচ্ছে হল, ওর গালে আঙুল দিয়ে একটা টোকা মারে। সীতার জ্বর খুব বেশি নয়। একশো এক। জিভ ময়লা। চারটে ক্যাপসুলেই ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওদের ভার্জিন বডি। পুরো কোর্স খেতে হয় না। ওর যেটা দরকার, যেটা চাইছে ও তা হল মনোযোগ, অ্যাটেনশন। আমরা দিই না। এখন সকলের নজর ওর দিকে। বাড়ির যে কর্তা, সে রিকশা করে ওকে নিয়ে এসেছে ডাক্তারখানায়। পঞ্চাশ টাকা ফি দিয়েছে। বাড়ির যে গিন্নি এবং ওর সবচেয়ে বড় শত্রু, কথায় কথায় খুঁত ধরে—সে ওকে দুধ-পাউরুটি খেতে দেবে। প্রহরে প্রহরে ক্যাপসুল আর ভিটামিন এনে ধরবে ওর মুখের কাছে। এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে। ভাবতেই ওর মনের জ্বর এক ডিগ্রি নেমে যায়। ওরা বাড়ি ফিরে আসে। সীতা বলে, হেঁটেই যেতে পারব। গৌরব অবাক হবে না, যদি আগামীকাল সকালেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে মেয়েটা। আর সবাই ঘুম থেকে ওঠার আগে, রান্নাঘরে শোনা যায় টুংটাং, ঠংঠং শব্দ, কুকারের শিস। বাতাসে পোড়া পাঁউরুটির গন্ধ ভাসে।

১৯৯৮

পরাশর আসে। হ্যাঁ, পরাশর এ-বাড়িতে প্রায়ই এসে হাজির হয়। কোনও দরকার ছাড়াই। কোনও কাজ ছাড়াই। আর, এলে অন্তত এক ঘণ্টা থেকে যায়। বকর বকর করে নিজের মনে।

হাজার হোক একটা মানুষ তো। স্নিগ্ধা ওকে ফেলতে পারে না। বলতে পারে না, এবার তুমি যাও পরাশরদা, আমার কাজ আছে। কাজের কথা যখন উঠল, তখন স্নিগ্ধার মনে পড়ে, প্রথম প্রথম ও পরাশরকে দিয়ে সংসারের টুকিটাকি কাজ করিয়ে নিত। স্নিগ্ধা যদি বলত, আমার কাজ আছে, অমনি পরাশর বলত, কী কাজ? দাও আমি করে দিচ্ছি। দুষ্টুমি করে হয়তো স্নিগ্ধা বলত, কাপড় কাচতে হবে।—এ আর এমন কী কাজ। দাও আমি কেচে দিচ্ছি। আমি তো নিজের জামাকাপড় কাচি রোজ।

বলে লাফাতে লাফাতে চলে যেত বাথরুমের দিকে। বালতির মধ্যে ভেজানো কাপড় বার করে থুপ থুপ করে সত্যি কেচে আনত। গৌতমের লুঙ্গি, গেঞ্জি, রুমাল। বুবুনের ফ্রক, ইজের। নিজের সায়া, ব্লাউজ। এমনকী ব্রেসিয়ারও।

নিংড়ানো কাপড়গুলো হাতের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে যখন বেরোত পরাশর, একমুখ হাসি, পা-গুটোনো প্যান্ট, অর্ধেক ভেজা, মুখে ঘাম, জিজ্ঞেস করত, কোথায় মেলতে হবে বলো, তখন স্নিগ্ধা আর চুপ করে থাকতে পারত না। লজ্জা পেত।

তুমি কি পাগল পরাশরদা? এসব কেউ করে? রোগা চেহারা পরাশরের। একটু কুঁজো। থুতনিটা একটু বসা। রগ দুটোও বসা। অথচ মাথায় একজঙ্গল চুল। রোজ দাড়ি কামায় না। চোখের দৃষ্টি খুব প্রখর নয়। ঘোলাটে।

পাগলই তো। ঠিক উন্মাদ পাগল নই। ছিটগ্রস্ত বলতে পারো। ওষুধ খেয়ে খেয়ে ঠিক থাকি। আমায় কেউ কোনও কাজ করতে বলে না। পাছে ভুল করি। এই যে সরকারি চাকরিটা করছি, নিজের এলেমে নাকি? না, না। বাবার বদলি। বাবা মারা গেল হঠাৎ। আপিসে বসে বসে হার্ট অ্যাটাক হল। ওদের দায়িত্ব। আমি তখন বি এস সি পড়ছি। ওদের অফার পেয়ে ঢুকে গেলাম। কিন্তু আমার তেমন কোনও দায়িত্বপূর্ণ কাজ নেই। ভদ্দরলোকের ছেলে, বাবা ছিল স্টোরকিপার, আমি তো পিয়োনের গ্রেড পেতে পারি না। তাই আমার ক্লারিকাল গ্রেড। আড়াই হাজার, সাড়ে চার হাজার বেসিক। সব মিলিয়ে সাত হাজার টাকা হাতে পাই। তা থেকে দেড় হাজার টাকা ওষুধে যায়। এক হাজার যায় যাতায়াত আর টিফিনে। মাসে হাজার টাকা করে জমাই ভবিষ্যৎ দুর্দিনের কথা ভেবে...

বলতে বলতে পরাশর বিসর্গ-দেওয়া হাসি হাসে। হুঃ, হুঃ, হুঃ, হুঃ।

বলে, জানো, আমাদের গলিতে একটা বুড়ি ভিখিরি থাকত। খুব বুড়ি। একেবারে কুঁচকোনো ঝুলঝুলে চামড়া। গর্তের মধ্যে চোখ। মুখে একটাও দাঁত ছিল না। লোকে তাকে বেশ ভিক্ষে দিত। দিনে কুড়ি টাকার ওপর খুচরো পয়সা ও রাজা স্টোর্সে ভাঙাত টাকায় পঁচিশ পয়সা বাটা নিয়ে। বাটা কাকে বলে জানো? কমিশন।

পরাশর যে এক বিষয় থেকে হঠাৎ হঠাৎ বিষয়ান্তরে চলে যায়, ওর মাথার অসুখ তার কারণ; কী একটা ইংরেজি নাম আছে অসুখটার, এখুনি মনে পড়ছে না, কিন্তু স্নিগ্ধা তা জানে। তাই জিজ্ঞেস করে, ভবিষ্যৎ দুর্দিনের সঙ্গে কমিশনের কী সম্পর্ক?

আছে, আছে। পরাশর বলে, ধৈর্য ধরে শোনো। সেই বুড়ি তা হলে দৈনিক পঁচিশ টাকা রোজগার করত। খাওয়া-থাকা ফ্রি। সেই পঁচিশ টাকা পুরোটা সে জমাত। কেন? না, ভবিষ্যৎ দুর্দিনের কথা ভেবে!

আমার কথা হচ্ছে, যে-লোকটা বর্তমান কালেই ঘোর দুর্দিনের মধ্যে আছে, তার ভবিষ্যৎ দুর্দিনের কথা ভাবার দরকার কী? ওই বুড়ি কি ভাবত, এমন দিন আসতে পারে এ-দেশে, যখন লোকে আর ভিক্ষে দেবে না! ভাবত, তখন কী করে চলবে ওর? যদি রাস্তায় শুতে না দেয় তো ওকে ঘর ভাড়া করতে হবে! মরার পর দেখা গেল, ওর মাথার নীচে পুঁটলির মধ্যে একশো টাকার নোটে আঠারো হাজার টাকা!

মাকে তুমি কত টাকা দাও পরাশরদা?

তিন হাজার দিই। চলে যায়। যদি বিয়ে করতাম, তা হলে চলত না। বলে আবার বিসর্গ-দেওয়া হাসি হাসতে থাকে পরাশর।

আমাকে কে বিয়ে করবে বলো তুমি? ধরো, যদি একটা কালো-কুচ্ছিত অরক্ষণীয়া বা অনাথ মেয়ে রাজিও হয়, আমি কেন বিয়ে করব তাকে? আমি তো তাকে সুখী করতে পারব না। ঘুমের ওষুধ খেয়ে খেয়ে...

খাও কেন এত ওষুধ যা ক্ষতি করে?

না খেলে হয়তো উদোম পাগল হয়ে যেতাম। তার চেয়ে তো ভাল আছি। আমার জেনারেল হেলথ খাবাপ না। নার্ভাস সিস্টেমটা একটু গড়বড়ে। যোগ-বিয়োগে ভুল হয়ে যায়। তো, এই সেদিন অবধি মা আমার পেছনে লেগে ছিল। একটা বিয়ে কর, তোর অসুখ সেরে যাবে। মা একটা অনাথমেয়ে জোগাড়ও করেছিল। তার ফটো দেখেছি। নট ব্যাড...আচ্ছা স্নিগ্ধা, অনাথ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কী হবে?

স্নিগ্ধা বলে, যার নাথ নেই, সে অনাথ। অনাথই তো স্ত্রীলিঙ্গ।

না না, এত সহজ নয় দিদি। তুমি জানো, ধব মানে স্বামী। গৌতমদা তোমার ধব। গৌতমদার অবর্তমানে তুমি কী হবে? অধব? না, বিধব, না বিধবা? না, বিধবিনী? বলো? বিধবা-ই প্রচলিত শব্দ। তা হলে অনাথের স্ত্রীলিঙ্গ হওযা উচিত অনাথা। লোকে অনাথিনীও লেখে।

স্নিগ্ধা বলে, আমি বিধবা হব না। গৌতম যাওয়ার আগে আমি চলে যাব, দেখো। কেবল বুবুনকে নিয়ে ভাবি। ও বড় হয়ে যাওয়ার পর যদি যাই, তা হলেই আমি নিশ্চিন্ত। নিজের জন্যে ভাবি না। আমাব তো বেঁচে থাকার কথা নয়। ধার-করা জীবন নিয়ে কাজ চালাচ্ছি। গৌতমের জন্যেও ভাবি না। ওকে বলে বেখেছি, আমি চলে গেলে ও যেন আবার বিয়ে করে। ও বলে, অসম্ভব।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয নিয়ে সেইসব নিভৃত কথোপকথন। কিন্তু পরাশবকে বলা যায় বলেই পরাশরকে বলে স্নিগ্ধা।

আমি বিশ্বাস করি না পরাশবদা। আমি জানি, কিছুদিন আমার অনুপস্থিতি ওকে কষ্ট দেবে। এ-ঘবে, ও-ঘরে, আলমারিতে, বিছানায়, ড্রেসিং টেবিলে—সর্বত্র আমার জিনিসপত্র ছড়ানো। আমি ছড়িয়ে আছি। আমার গন্ধ, স্পর্শ, আমার ছায়া, আমার কণ্ঠস্বর। আমাব টুকরো টুকরো হাতের লেখা। ধোপার খাতাই বলো আর মুদির হিসেব বলো। আমাকে লেখা মায়ের চিঠি। আমার কাপড়চোপড়, চিরুনি, কাঁটা, ক্লিপ। আমার চপ্পল, ক্রিমের শিশি। অ্যালবাম।

দিনের-পর-দিন রাত্রে হাত বাড়িয়ে যখন আমাকে ছুঁতে পাববে না, তখন এইসব আটপৌবে স্মৃতিগুলো আস্তে আস্তে মুছে যেতে শুরু কববে। আমি জানি। তখন আব একজন স্ত্রীলোকের জন্য আকুলিবিকুলি করবে ওর শরীর, ওর মন। বিবেকদংশনে ভুগবে কিছুদিন। তাবপব সেটাও আব থাকবে না। জানো পরাশরদা, গৌতম একবাব তো ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে গেছে। যখন আমাব বাঁচার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না, তখনই ওর সব ভাবা হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়। তারপর আমি যখন বেঁচে উঠলাম, ভাল হয়ে গেলাম, এখন তো একেবারে যাকে বলে নর্মাল হয়ে আছি—ও সেই সংকটের সময়টা ভুলে আছে। ভুলে যায়নি। আমার চিকিৎসা-বাবদ মোটা টাকা জমা করে রেখেছে। তার মানে, মনে মনে গৌতম আমার ধার-করা কিডনিটা একদিন বিকল হযে যাবে, এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত। সেই কারণে, হয়তো ও তোমাকে পছন্দ করে না।

পরাশর বলে, না না, তুমি ওকে এত ছোট ভেবো না। আমি আসলে কোনও দিক থেকেই ওর সমকক্ষ নই। তোমাদের সমকক্ষ নই।

এ সব প্রথম দু'-এক বছরের কথা।

২

পরাশর এখনও আসে। প্রায়ই হঠাৎ হঠাৎ এসে হাজির হয়। এমন সময়ে এসে উপস্থিত হয়, যখন গৌতম বা বুবুন কেউ বাড়িতে থাকে না। স্নিগ্ধাকে একটু দেখে যায়। ওই সকাল এগারোটায়, কি বিকেল তিনটের সময় যখন স্নিগ্ধা ঝড়ের বেগে একটার পর একটা সংসারের কাজ সেরে এবং পরবর্তী একগুচ্ছ সংসারের কাজ-কর্তব্য ঘাড়ে পড়ার আগে একটু বিশ্রাম করছে, তখন টানা একঘেয়ে বেল বাজলে ওর বুক কেঁপে ওঠে আজকাল। সাত বছর পার হয়ে গেছে, এখন অষ্টম বছর চলছে, বোঝাই যায়, ধার-করা কিডনিটাকে শরীর মেনে নিয়েছে। এখন আর সেই ঘটনার স্মৃতিচাবণ করতে ইচ্ছে করে না। ভুলে যেতে ইচ্ছে করে।

এক-একদিন দুপুরে কিছু না ভেবেই ও ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়ায়। একলা। পেটিকোটের দড়ি নাভির নীচে খানিকটা নামিয়ে নিজেকে দেখে। দু'দিকে দুটো অস্ত্রোপচারের চিহ্ন। একটা বুবুন হওয়ার সময়কার, সিজেরিয়ান সেকশন—সেলাইয়ের দোষে তিন ইঞ্চি মতো দাগ এখনও দেখা যায়। ছুঁলে হাতে লাগে। ওটা আর এ-জীবনে সমান হবে না। বুবুনের বয়স পনেরো বছর হল। দেখতে দেখতে কী দ্রুত বেড়ে উঠল মেয়েটা! ছোটবেলায় মায়ের অনুগত ছিল। এখন মাকে রাক্ষুসি ভাবে। স্নিগ্ধার ইচ্ছে হয় ওকে ডেকে এনে একদিন কাটা দাগটা দেখায়। ওকে বলে, কেন মায়ের প্রতি ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেন সব মায়ের প্রতি সব সন্তানের চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আর-একটা কাটা দাগ বেশ সুন্দরভাবে মিলিয়ে গেছে প্রায়। অন্য সব ফাটা দাগের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। ওর ভেতরে রয়েছে সেই ধার-করা কিডনিটা। সে এক কাণ্ড!

কিছু কোথাও নেই, হঠাৎ পেচ্ছাপের সঙ্গে রক্ত দেখা গিয়েছিল, চেষ্টা করে আজ স্মরণ করা যায়। প্রথম দিকে গ্রাহ্য করেনি স্নিগ্ধা। তারপর পায়ের গোড়ালির কাছটা ফুলতে শুরু করল। মুখখানা ফোলা ফোলা, যা দেখে স্বাস্থ্যের চিহ্ন বলে মনে হয় না। যখন-তখন ঘুম পায়, বমি পায়। হঠাৎ অকারণে পেটখারাপ হতে লাগল। মনে হল ওজন কমছে।

তখন শাশুড়ি বেঁচে ছিলেন। একদিন তাঁকে এই সব কথা বলল। তিনি ভাবলেন, এ হয়তো দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার লক্ষণ। এই সময়টায় মেয়েদের শরীরের মধ্যে নানা রকম জটিলতা দেখা দেয়।

একসময় গৌতম জানল। শুরু হল সব পরীক্ষা, ডাক্তার দেখানো। শেষকালে জানা গেল, ওর দুটো কিডনিই নষ্ট হতে বসেছে। কেন? এ-প্রশ্নের যথাযথ উত্তর কোনও ডাক্তারই দেয় না। দেয়নি তখন। তারা কেবল জানাল যে, ওই দুটি কিডনির মধ্যে যক্ষ্মার বীজ পাওয়া গেছে। এখন যক্ষ্মার চিকিৎসা অনেক সহজ হয়ে গেছে। সুতরাং শরীরের অন্যত্র সে-অসুখ ছড়াতে পারেনি। প্রকৃতি মানুষের দেহে, কেন, প্রায় সব উন্নত প্রাণীব দেহে দুটি দুটি করে যন্ত্র দিয়ে রাখেন। একটি নষ্ট হলে যাতে অপরটি দিয়ে কাজ চলে। যেমন চোখ, কান, নাসারন্ধ্র, ফুসফুস এবং এই কিডনি—বাংলায় বলে বৃক্ক।

কিন্তু দুটোই যদি অজান্তে আক্রান্ত হয়, তখন মানুষ কী করবে? চিকিৎসা করবে? কী চিকিৎসা? বৃক্ক হল শরীরে ছাঁকনি। তরল বর্জ্য পদার্থ মূত্রনালি দিয়ে বার করে দেয়। না বেরোলে তা রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে বক্তকে দূষিত করে। সমস্ত দেহ যন্ত্রকেই বিষিয়ে দেয়। স্নিগ্ধা এই আকস্মিক, কার্যকারণহীন পরিণতির জন্যে কোনওভাবে প্রস্তুত ছিল না। যখন সপ্তাহে একদিন করে নার্সিংহোমে গিয়ে শরীরের ময়লা রক্ত ফেলে দিয়ে পরিষ্কার রক্ত নেওয়া শুরু হয়, তখনও ও ভেবেছিল, হঠাৎ একদিন ওই কিডনি আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

তা হয়নি। অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে ঝুঁকতে থাকে। তখন কথা ওঠে, আজকাল চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে নষ্ট কিডনি কেটে ফেলে সেই জায়গায় কোনও দাতার একটি ভাল কিডনি লাগিয়ে দেওয়া হোক। তাতে রোগী ভাল হয়ে যায়। দাতারও তেমন ক্ষতি হয় না। তখন জানা গেল, এই রকম কিডনি বাজারে কিনতেও পাওয়া যায়। এর নাকি ফলাও ব্যবসা আছে। তবে তা যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ এবং নতুন যন্ত্রটি শরীর ব্যবহার করবে কিনা তার একশো ভাগ স্থিরতা নেই।

গৌতম সর্বস্ব পণ করে এই সংকটের মোকাবিলা করেছিল, আজ তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু উপযুক্ত মানের বিকল্প পাওয়া যায়নি। স্নিগ্ধার ব্লাড গ্রুপ 'ও' এবং আর এইচ ফ্যাক্টর নেগেটিভ—অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার মাসতুতো ভাই পরাশরের রক্তের সঙ্গে এর মিল পাওয়া গিয়েছিল।

কিডনি দান প্রায় অর্ধেক জীবন দানের মতো। খুব নিকট আত্মীয়ের পক্ষে হয়তো তত জটিল নয়, কিন্তু পরাশর কেন স্নিগ্ধাকে তার দুটি কিডনির একটি দান করবে? এই প্রশ্ন গৌতম, স্নিগ্ধা, গৌতমের মা এবং তাদের শুভার্থী সকল আত্মীয়বন্ধুর মনে প্রধান হয়ে ওঠে। ওর কাছে গিয়ে কি চাওয়া যায়? ওকে কি একদিন বাড়িতে ডেকে এনে নেমন্তন্ন খাইয়ে এই প্রস্তাব রাখা যায় এবং তখন কিছু মূল্য দেওয়া হবে, সে ইঙ্গিতও দেওয়া যায়? পরাশর ধনী নয়। ওর মা-ও সহজ সরল মানুষ। বলা যায় না, ও রাজি হয়ে যেতেও পারে। গৌতম স্থির করে, পরাশরকে এক লক্ষ টাকা যৎসামান্য মূল্য হিসেবে দেওয়ার প্রস্তাব করবে প্রথমেই। তারপর, রাজি না হলে টাকার অঙ্ক বাড়াবে ধাপে ধাপে। যতক্ষণ না সে সম্মত হয়। পরাশরকে রাজি করার জন্য স্নিগ্ধাকেও একটি রমণীয় ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল তখন। মৃত্যুর

সম্মুখীন হলে মানুষের শোভন-অশোভনের বোধ চলে যায়।

নিমন্ত্রণ করতে হয়নি। পাগল পরাশর অর্থমূল্য নিয়ে আলোচনার মধ্যেই গেল না। সে কেবল গৌতমের কাছে এসে বলল, শুনলাম আমার কিডনি স্নিগ্ধার কাজে লাগবে। আমি দিতে রাজি আছি। তোমরা অপারেশনের দিন ঠিক করো।

গৌতম বলে, কিন্তু নিজের দিকটা ভাল করে ভেবে নাও ভাই। তোমার কস্টে আর একজন জীবন ফিরে পাচ্ছে। তোমার ক্ষতি করে—

ক্ষতি কেন? পরাশর বলেছিল, আমার তো আর একটা কিডনি রইল। বাঁচবার হলে তার জোরেই বাঁচব।

কিন্তু আর একটি কথা বলেছিল পরাশর, যা আর কোনও স্বাভাবিক মানুষ বলত না হয়তো। বলেছিল, আমি তো অপদার্থ। আমি যে কারুর কাজে লাগছি, এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে?

শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়।

একসময় সব যথানিয়মে চুকেবুকে যায়। আজ আট বছর হতে চলল, কোথাও কোনও বিঘ্ন হয়নি। পরাশরের কাছে স্নিগ্ধা এবং আর সকলে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। কালক্রমে সে এ-বাড়ির একজন স্থায়ী অতিথি হয়ে গেছে। এবং ওর ঘন ঘন এ-বাড়িতে আসা এক উৎপাত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গৌতম বাড়িতে উপস্থিত না থাকলেও সব জানতে পারে। অফিস থেকে ফিরলে স্নিগ্ধাই বলে, আজ আবার পরাশরদা এসেছিল।

গৌতম টাইয়ের গিঁট খুলতে খুলতে বলে, কী চায়?

কিছুই চায় না।

তুমি না চাইতে কী দাও ওকে?

আগে চা দিতাম। নোনতা, মিষ্টি থাকলে তা-ও এনে দিতাম। সে-সব বন্ধ করে দিয়েছি।

আর?

সঙ্গ দিতাম। যতক্ষণ থাকত, ওর সঙ্গে কথা বলতাম। আসলে পরাশরদাই কথা বলে। আমি বসে বসে শুনি। ওর অনেক কথা আছে। শোনার লোক নেই। আমি আর পারছি না। ও আসছে জানতে পারলে আমার বুকের মধ্যে প্যালপিটেশন হয়। দম বন্ধ হয়ে আসে। ওর উপস্থিতি আমাব মধ্যে পুরনো পচা কৃতজ্ঞতাবোধ নতুন করে জাগিয়ে তোলে। মনে হয়, ওর কিডনি ওকে ফেরত দিয়ে দিই। তারপর শান্তিতে মরে যাই।

গৌতম এইসব কথা শুনে বিব্রত বোধ করে। কিছু একটা করা দরকার—মনে হয় ওর।

দিন দুয়েক আগে পবাশর এসেছিল। সেই সুযোগে কিছু একটা বিহিত গৌতম করেছে। সেই কথা বলতেই এই গল্প ফেঁদে বসা।

পরাশরকে স্নিগ্ধা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কেন আসো তুমি রোজ রোজ?

তোমাকে দেখতে আসি।

আমি চাই না তুমি আর আসো পরাশরদা। আমার অসুবিধে হয়। তুমি বুঝবে না। তুমি এলেই আমার বুক কাঁপে। মনে হয়, তুমি বলবে, স্নিগ্ধা, অনেক দিন তো হল, এবার আমার কিডনিটা ফেরত দাও। আমার দরকার আছে।

এমন সময় ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে গৌতম। এসে সোজা পরাশরের কলার চেপে ধরে।

তুমি কী চাও, বলো। কিডনির বদলে কী চাও?

মাইরি বলছি, আমি কিচ্ছু চাই না। শুধু স্নিগ্ধাকে দেখতে আসি।

কী দেখতে আসো? মেয়েমানুষ কখনও দেখোনি শুয়ার?

ছি-ছি, এমন কথা বলতে নেই। পাগল পরাশর তার ঘোলাটে চোখদুটো তুলে শুধু বলল, আমি কিছু পারি না, আমার জীবনে এই একটি ছাড়া আর কোনও সফলতা নেই। রোজ তাই আসি। দেখে যাই, যদি বারণ করো তো আর আসব না।

স্নিগ্ধার কষ্ট হোক আমি চাই না গৌতমদা।

১৯৯৮

প্রার্থী

লোকনাথ ভৌমিক সামান্য স্কুলমাস্টার। ভূগোল পড়ায়। কলকাতার উপকণ্ঠে বাস। বয়স বিয়াল্লিশ। বউ আছে, গৃহবধূ, আর দুটি মেয়ে। তাদের এখনও ফ্রক পরার সময়।

লোকে বলে, লোকনাথ আট হাজার টাকা মাইনে পায়। একথা সত্যিই না-ও হতে পারে। তবে সম্প্রতি ও একটি মাথা গোঁজার জায়গা করেছে দু'কাঠা জমির ওপর। একতলা। দোতলার ভিত। বাইরেটি এখনও অসম্পূর্ণ। সামান্য একটু খালি জায়গা আছে বাড়ির পেছনে। সেখানে বাগান হতে পারত কিন্তু ইটের টুকরো, সিমেন্ট, পাথরকুচি জমে থাকার কারণে গাছের চারা মাথা তুলতে পারছে না।

লোকে যা-ই বলুক, স্কুলমাস্টারের চাকরি যে আজকাল সামান্য নয়, সে-কথা সবাই জানে। মাইনেপত্র এখন অনেক বেড়ে গেছে। তার ওপরে যারা প্রাইভেট টিউশন করে, তাদের তো কথাই নেই। অঙ্কের মাস্টারদের রোজগার এখন মাসে পঁচিশ হাজার টাকা। লোকনাথ কিন্তু প্রাইভেট টিউশন করে না। দরকার হলে স্কুলে বেশিক্ষণ থেকে ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য তৈরি করে দেয়। সেই কারণে শিক্ষকমহলে, ছাত্রমহলে ওর আদর্শবাদী বলে সুনাম আছে।

সেই সুনামের কারণেই সম্ভবত একদিন এই রাজ্যের বিরোধী দলের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি দুই প্রতিবেশীকে সঙ্গে করে লোকনাথের বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁর চুলে কলপ ছিল, হাতে মোবাইল ফোন ছিল। ওখানে থাকতে থাকতেই দু'বার ফোন বাজল, উনি সংক্ষেপে কথা সারলেন, আবার আলোচনার খেই ধরলেন। রাজনীতির নেতারা কখনওই আলোচনার খেই হারান না, সে যত বাধাই আসুক, লোকনাথ স্বচক্ষে দেখেছিল সেদিন।

সেই ভদ্রলোকের নাম জেনে আমাদের কাজ নেই। তিনি এই দৃশ্যের পর আর আসবেন না এই গল্পে। তবে অন্তরাল থেকে কাজ করবেন।

মোবাইলখানা পকেটে পুরে তিনি আবার মুখ খুললেন।

যে-কথা বলছিলাম লোকনাথবাবু, আমরা চাই যে আপনি এবার নির্বাচনে দাঁড়ান।

আমি? নির্বাচনে? কেন?

ভাবটা, আমি তো কোনও দোষ করিনি। তবে এই শাস্তি কেন? প্রশ্ন শুনে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মৃদু হাসলেন।

লোকনাথ ভৌমিক একটু দম নিয়ে বলে, আমি তো রাজনীতি করি না। আমি কোনও দলে নেই, কখনও ছিলাম না।

তার কারণ আপনি একজন আদর্শবাদী লোক। আপনি শিক্ষক। নতুন প্রজন্মের সামনে আপনি এক পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি। এবং দেশ আপনাকে চায়।

শেষ বাক্যটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথ বুকের দুটো বিট মিস করল। তারপরই ধাতস্থ হয়ে বুঝল, ওটা কথার কথা। উনি বলতে চান, বিরোধী দল আপনাকে চায়। কেন চায়? লোকনাথের মুখ থেকে এই প্রশ্ন কেড়ে নিয়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত তিনজনকেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন সেদিন। এবারের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলকে হারানো আমাদের একমাত্র লক্ষ। জনসাধারণও তা-ই চায়। তারা পরিবর্তন চায়। তারা এ-রাজ্যে একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন চায়। হিংসার রাজনীতি অনেকদিন চলছে, আর নয়। আপনি দেশবাসীর পাশে দাঁড়ান।

এরপর তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। লোকনাথ কিছুতেই ওর নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হোক, এমন কাজ করবে না। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার আদর্শে ও বিশ্বাস করে না। স্বাধীন দেশে সবাই ভালভাবে বাঁচবে সেটাই কাম্য। আর, সবচেয়ে বড় কথা, নির্বাচনে দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার মতো সঙ্গতি ওর নেই। ভেতরে ভেতরে লোকনাথ যে একেবারে প্রলুব্ধ হয়নি, তা নয়। মানসচক্ষে ও দেখতে পায়, দেয়ালে দেয়ালে ওর নাম প্রচারিত হচ্ছে। খবরের কাগজে ওর বিবৃতি বেরোচ্ছে। টিভি-র লোকেরা ওকে ছেঁকে ধরেছে রাস্তায়। শেষপর্যন্ত রফা হল, নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবে। খরচখরচা যা-কিছু বহন করবে একজন বিশেষ ব্যক্তি। কিন্তু লোকজন নিয়ে ঘোরাঘুরির কাজটা তো ওকে করতেই হবে।

পদযাত্রা, পরিক্রমা, পথসভা—সর্বত্র ওকে বলতে হবে যে, অনেকদিন পরে এবার প্রশাসনে পরিবর্তন আসছে। আপনারা আমার হাত শক্ত করুন।

প্রায় তিন মাস চলেছিল এই যজ্ঞ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই ব্যক্তি হাজার হাজার লিফলেট ছাপিয়ে দিয়েছেন। ওর বাড়িতে টেলিফোন এনে দিয়েছেন। নির্বাচন এলাকার দু'জন প্রভাবশালী যুবককে জুড়ে দিয়েছেন লোকনাথের সঙ্গে। একটি মোটরগাড়ি, দুটি অটো ওর হুকুমের অপেক্ষায় থেকেছে দিনরাত। দেয়াল লিখন, ফেস্টুন, পোস্টারে সারা পল্লি ছয়লাপ। লোকনাথের বউ তার স্বামীকে কোনওদিন খুব একটা শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি। একদিন সে-ও স্বীকার করল, তোমাকে লিডার-লিডার দেখাচ্ছে সত্যি। মেয়ে দুটি একদিন জিজ্ঞেস করল, বাবা, এরপর কি তুমি মন্ত্রী হবে? পাড়ার লোকেরা এর মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করেছে।

হল্লা যখন জমে উঠেছে বেশ, এমন সময় একদিন লোকনাথের বাড়িতে টেলিফোন এল রাত এগারোটা নাগাদ। গম্ভীর পুরুষকণ্ঠ খুব নম্রস্বরে বলল, লিডার হওয়ার শখ তো মিটে গেছে দাদা, এবার মানে মানে সরে দাঁড়ান।

লোকনাথ এ-কথায় ঘাবড়ায়নি। ও বলেছিল, এখন তো আব সরে দাঁড়াবার উপায় নেই ভাই।

ওদিক থেকে পুরুষকণ্ঠ বলল, এটা পার্টির আসন, আপনি নির্দল প্রার্থী। বুঝতেই পারছেন কেউ আপনাকে ভোট দেবে না। জামানত অবধি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

অনেক ধন্যবাদ। বলেছিল লোকনাথ। তাবপর ওর মদতদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল, জামানতের পাঁচ হাজার টাকা ফেরত পেতে হলে কম-সে-কম কত ভোট পাওযা দবকাব। উত্তব পেয়েছিল, ছয় থেকে সাত হাজার।

এত লোক আমাকে ভোট দেবে কেন?

দেবে দেবে। ভালবেসে দেবে। আপনি ক্যাম্পেন চালিযে যান। বুঝছেন না, ওবা ভয় পেয়ে গেছে বলে আপনাকে শাসিয়েছে।

সেটাও তো ঠিক কথা নয়।

ডোন্ট ওরি দাদা। সে বলেছিল, এখন থেকে আপনার সঙ্গে একজন কবে বডিগার্ড থাকবে। আর ভোটের তিন দিন আগে আমাদের সাইকেল চিহ্ন ছাপ-মারা টি-শার্ট বিতবণ হবে বস্তি অঞ্চলে। সেদিন আপনাকেও একটা হলুদ টি-শার্ট পরে ঘুবতে হবে। নিজে হাতে করে বিতবণ কববেন। এখন এ-কথা কাউকে বলবেন না যেন।

কলকাতায় বা শহরের উপকণ্ঠে এমন কোনও পাড়া নেই যেখানে শুধু বড়লোক কি শুধু গরিব মানুষ থাকে। এখানে রাস্তার ওপর উঁচু পাকা বাড়ি। তার পেছনেই ঘিঞ্জি বস্তি। লোকনাথের শাগরেদেরা বলত হাইরাইজে ঢুকে লাভ নেই, শুধু সময় নষ্ট। এরা ভোট দেয় না। তা ছাড়া এক-একটা বাড়িতে গুটিকয়েক করে ভোটার। তার চেয়ে চলুন ঘিঞ্জি পাড়াতেই হেঁটে হেঁটে ঘুরি। সেখানে ঘরপিছু ঢের বেশি ভোটার। ওদের জপাতে পারলে বেশি লাভ।

ঘুরতে ঘুরতে ওর মনে হয়েছে, খুব কষ্টে আছে মানুষ। এত ঘেঁষাঘেঁষি সব বাড়ি, গাযে গায়ে লাগা ঘর, আলো ঢোকে না, জলের অভাব, তার মধ্যেই মেয়ে-পুরুষ কচিকাঁচা নিয়ে দিন কাটায় লোকে। যেখানে শোয়া-বসা, তার কাছেই রান্না। বাচ্চারা সারাদিন রাস্তায় খেলা করে। এক-একটা ঘরে ছ'জন-আটজন করে শোয়। বস্তির ভেতরে ঢুকে লোকনাথ জানল সেখানে কুড়ি-পঁচিশ জন পিছু একটা করে পায়খানা। যুবতী মেয়েদের আবরু অবধি নেই। অথচ জীবন চলছে সরবে। সকালে মাছ ভাজার গন্ধ, বিকেলে কয়লার ধোঁয়া। ভোট চাইতে গিয়ে এদের অনেকের সঙ্গে কথা বলেছিল লোকনাথ। বুঝেছিল, এদের মনে ঢের অসন্তোষ আছে, হতাশা আছে। বস্তুত জনপ্রতিনিধিদের ওপর এদের কোনও আস্থা নেই। তবু ভোট দেয়। কাকে দেয়? কেন দেয়? ওর মুখের ওপর অনেকেই বলল, ভোটের সময় আপনাদের দেখা মেলে দাদা, তাবপর কোথায় উধাও হয়ে যান। আমাদের কথা কেউ মনে রাখে না। মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ লোকনাথ ভৌমিক। স্কুল শিক্ষক। ভূগোল পড়ায়। মাসে আট হাজার টাকা মাইনে পায় বলে অনেকের ধারণা। নিজের একটা ছোট বাড়ি আছে। ওর মনে এক-এক সময় অপরাধবোধ জাগে। মনে হয়, অন্যায়ভাবে সমাজের কাছ থেকে ও প্রাপ্যের অধিক সুবিধে নিচ্ছে। মনে হয়, এই নির্বাচন এক প্রহসন।

মহাপুরুষেরা বার বার বলেছেন, মানুষকে ভালবাসো, হিন্দু-মুসলমান মুচি-মেথর তোমার ভাই। লোকনাথ ভাবে, এত সোজা? ভালবাসা এত সহজ? অনাত্মীয়কে ভাই মনে করে বুকে টেনে নেওয়া সম্ভব? বরং সহানুভূতি জানানো যায়। এদের উপকার হয় এমন কাজ আন্তরিকভাবে করা যায়। হ্যাঁ, লোকনাথ বিধায়ক নির্বাচিত হলে অবশ্যই এইসব দুঃখী পরিবারদের জন্যে কিছু কাজ করার চেষ্টা করবে। অন্তত এদের কষ্ট খানিকটা লাঘব করার ব্যবস্থা ও করবেই।

একদিন পাড়ার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল লোকনাথ। বোঝাচ্ছিল কেন কোনও দলীয় প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে একজন নির্দল প্রার্থীকে জেতানো দরকার। কারণ নির্দল প্রার্থীর কাজ করার স্বাধীনতা অনেক বেশি। সে অনেক রাজনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্ত। লোকনাথ নিজে একজন শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতির মালিন্য তার গায়ে লেগে নেই। এইসব।

এমন সময় একটি ছেলে এসে ওর পেছনে দাঁড়ায়। কত বয়েস হবে। বছর বারো-তেরো কি তার একটু বেশি। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর ও বলল, আপনি একটু আমাদের বাড়িতে আসবেন?

তোমাদের বাড়িতে? কেন?

বাবা ডাকছে। বাবা তো হাঁটতে পারে না। তাই আপনাকে যেতে বলল।

লোকনাথ ওর প্রচার সহচর নিতাইয়ের দিকে তাকায়। নিতাই বলে, কে তোর বাবা? নাম কী? কত নম্বরে থাকিস তোরা?

ছেলেটা বলল, বারোর পঁচিশ।

ও জয়শ্রী হালদার। নার্স? ঠিক আছে, বল আসছি আমরা।

নিতাই ইশারায় জানাল, ভয়ের কোনও কারণ নেই। চলুন।

ওই আলো-আঁধারি ঘর একখানা। সকাল এগারোটায় ঘরে চল্লিশ পাওয়ারের আলো জ্বলছে। একটা বড়সড় তক্তপোশ, বেশ উঁচু। তার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে একজন লুঙ্গি-পরা লোক। ঘরের কোণে একটা কাঠের আলমারি। তার মাথায় টিভি। পাশের টুলে টেবিলফ্যান, ঘরময় অসুখের গন্ধ।

ছেলেটার বাবা নয়, মা ওই জয়শ্রী হালদারই টেবিলফ্যান লোকনাথের দিকে ঘুরিয়ে দিতে দিতে কথা বলল। কী, চিনতে পারছ লোকনাথদা?

চিনতে পারছে না। বোকা বনে যায় লোকনাথ।

আমি জয়শ্রী। বিশুর বোন। মনে পড়ছে?

ও তুমি। খুব মনে পড়ছে এবার। তা তুমি এখানে কেন?

কপাল ফের, লোকনাথদা। ইনি আমার স্বামী। দু'বছর ধরে বাড়িতে বসা। কী অসুখ ধরা যাচ্ছে না। পা দুটো শুকিয়ে যাচ্ছে। তিনটে বাচ্চা। সংসার চালাব কী করে? তাই সেবিকাদের সেন্টারে নাম লিখিয়েছি। ডাক এলে ডিউটি করি।

লোকনাথ বলে, আগে তো তোমরা ভবানীপুরে থাকতে। তাই না? এখানে এলে কবে?

দু'বছর। ওটা তো ওঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল। অনেক শরিক। নিজের অংশ বিক্রি করে আমরা আলাদা আছি।

জয়শ্রী বলল, তুমি এখন কত বড় মানুষ হয়ে গেছ লোকনাথদা। আমাদের বাড়িতে এক কাপ চা খাবে?

লোকনাথ ফাঁপরে পড়ে যায়। মানুষকে ভালবাসো। মহাপুরুষেরা বলে গেছেন। কিন্তু জায়গাটা যা অপরিচ্ছন্ন। এখন ও কী করবে?

ব্যাপার বুঝতে পেরে নিতাই রক্ষা করল। বলল, আজ থাক দিদি। আর একদিন ওঁকে নিয়ে আসব।

লোকনাথ যে জয়শ্রীকে চিনত, এ তো সে নয়। এ তার কঙ্কাল। সে ছিল ওর খেলার সঙ্গী। হৃষ্টপুষ্ট, ফরসা কিশোরী। ওরই টানে একসময় লোকনাথ প্রতিদিন বিশুদের বাড়ি যেত। সে ছিল পাকা বাড়ি। ওই জয়শ্রী একদিন লোকনাথকে বলেছিল, তুমি আর আমাদের বাড়িতে এসো না লোকনাথদা। আমি বড় হয়ে গেছি। আমি আর তোমাদের সঙ্গে খেলব না।

খুব ব্যথা পেয়েছিল লোকনাথ তখন। কালক্রমে ভুলে গেছে। আজ আবার ব্যথাটা অন্যভাবে চাগিয়ে উঠল। কিন্তু কীই বা সে বলবে ওকে? কষ্টেসৃষ্টে বলতে পারল, শোনো, এখানে থাকলে উনি কোনওদিন ভাল হবেন না।

একটা এল আই জি ফ্ল্যাট পাইয়ে দাও না লোকনাথদা। খালের ধারে অনেক সরকারি ফ্ল্যাট উঠছে। তুমি একটু চেষ্টা করলেই পারবে।

নিশ্চয় চেষ্টা করব, কথা দিয়েছিল লোকনাথ। নিতাইয়ের হাতে একটা দরখাস্ত লিখে দিয়ো। এ আমার কর্তব্য। মনে মনে লোকনাথ ভেবেছিল, ভোটে জিতলে জয়শ্রীর স্বামীর উপযুক্ত চিকিৎসারও ব্যবস্থা ও করে দেবে। যাতে লোকটা আবার দাঁড়িয়ে উঠতে পারে। জয়শ্রীকে সেবিকার কাজ করতে না হয়।

ভোটে হেরে যাওয়ার পর লোকনাথ ভৌমিক আবার স্বস্থানে ফিরে এসেছে। আগে যারা ক্ষমতায় ছিল, তাদের প্রার্থী আবার জিতল এই কেন্দ্রে। শুধু ব্যবধান কমেছে একটু। বিরোধী পক্ষের নেতা বলে গেলেন, এবার হলুদ কার্ড দেখিয়ে ছেড়ে দিলাম। পরের বারে মহাকরণ আমাদের অধিকারে আসবে। এ-সবই জল্পনাকল্পনা। একসময় থিতিয়ে যাবে। আপাতত দেশ লোকনাথকে চায় না।

শুধু ওর পকেটে একটা খাম দুমড়ে মুচড়ে গেলেও টিকে থাকে। ফেলা যায় না। দরখাস্তকারী সুরজিৎ হালদাব। বারোর পঁচিশ ডোমপাড়া লেন। ওর একটা এল আই জি ফ্ল্যাট চাই। লোকনাথ দিতে পাববে না। কথাটা জয়শ্রীকে গিয়ে বলেও আসতে পারবে না।

কিছু হাসি, কাশি আর ঘামের গন্ধ

আজ আমাব সাতষট্টি নম্বরের জন্মদিন। আমি যখন জন্মাই, তখন সেই দিনটার কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না। আমাব জন্মাবার ফলেও সেই দিনটার কোনও উজ্জ্বলতা বাড়েনি। তবে অন্য একটা কারণে, কাকতালীয়ভাবে, পরবর্তীকালে, বছরের সেই বিশেষ তারিখটা সর্বভারতীয় ছুটির দিন বলে গণ্য হচ্ছে। লোকে ছাদেব ওপর উঠে সেদিন প্রাতঃকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে, তারপর জাতীয় সংগীত গায়। আমার কথা কেউ বলে না। আসলে এসব ব্যাপারে আমার কোনও হাত ছিল না। এখনও নেই।

আমি জন্মদিন মানি না। বছবের প্রত্যেকটা দিন, আমার মতে, আমার বাকি জীবনের প্রথম দিন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দিনটা ভোলাও যায় না। যতদিন মা বেঁচে ছিল, ততদিন ঠিক মনে করে আলাদা দুধ আনা হত, পায়েস রান্না হত বাড়িতে। ভাই-বোন বাড়িসুদ্ধ লোক আমার কল্যাণে সেদিন এক বাটি করে পায়েস খেতে পেত। নানা সময়ে আমাদের পরিবারে অভাব অনটন দেখা গিয়েছে, বাবার রোজগার কমে গেছে, তখনও পায়েসটা বাদ পড়েনি। মা মারা যাওয়ার পর প্রতিবছর জন্মদিনে পায়েস খাওয়াবাব দায়িত্ব পড়েছে আমার স্ত্রীর ওপর। তার কখনও ভুল হয় না কিন্তু পায়েসের পরিমাণ সম্পর্কে সে বড় কৃপণ। এক বাটি এখন এক হাতায় এসে ঠেকেছে। না হলে হয়তো এতদিনে মরেই যেতাম। পায়েস যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এ-খবর মায়েরা রাখে না।

জন্মদিনে নতুন জামা পাওয়া যায়। সেই জামা পরে, একদিনের জন্য সকলের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকার আনন্দই আলাদা। জাতীয় উৎসবের সামগ্রিক হট্টগোলের মধ্যেও আমি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। যেখানে আর সকলে অবহেলিত, উপেক্ষিত হচ্ছে। সারাজীবন এই দিনটিতে তাই পরম কৃতজ্ঞতায় আমার সমস্ত গুরুজনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে এসেছি। তাঁরা আমার দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন।

তাঁদের শুভকামনার ফলেই হোক বা কখনও সচেতনভাবে কোনও অন্যায় কাজ না করার জন্যই হোক, আমি দীর্ঘজীবন পাওয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছি ক্রমে ক্রমে। সকলকে সুখী করতে পারিনি আমি জানি, কেননা প্রতারণা না করলে সকলকে সুখী করা যায় না। এ নিয়ে আমার মনে কোনও অনুশোচনা নেই।

দীর্ঘজীবনের ফল, আজ অনুভব করছি, আমার গুরুজনের সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রণাম করার যোগ্য প্রাচীন পা একজোড়া দু'জোড়ায় নেমে এসেছে। আমার মায়ের ছোট বোন—আমার ছোটমাসি—তাদের একজন। একাশি বছর বয়সে ছোটমাসির পা দুটো বাতে বেঁকে গেছে, তবে প্রণাম করা যায়। ছোটমাসি একমাত্র আমায় ডাক নাম ধরে ডাকে যখন দেখা করতে যাই।

আমার জন্ম পুরীতে। যাকে অনেকে জগন্নাথধাম বলে, যেখানে শ্রীচৈতন্য ইহলীলা সাঙ্গ করেছিলেন। ভক্তলোক বলে, নীল আকাশ আর সমুদ্রের মাঝখানে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। মৃদু গুঞ্জন শুনি, তাঁকে নাকি খুন করা হয়েছিল। ওই জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যেই তাঁকে পুঁতে ফেলা হয়েছে। কী সাংঘাতিক কথা—আমি ভাবি, এ নিশ্চয় সত্য নয়। অমন মহাপুরুষকে কেউ হত্যা করে? আবার ভাবি, মহাপুরুষকেই তো লোকে হত্যা করে। তাঁরা যে সত্যের স্বরূপ দেখান, তাতে আমাদের চোখ ঝলসে যায় না। আমার জন্ম পুরীতে তার কারণ সেখানে আমার মায়ের বাপের বাড়ি। আর, তখনকার দিনে মেয়েদের সন্তানসম্ভাবনা হলেই বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হত। আপনারা দিকপাল সব বাঙালিদের জীবনীগ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখবেন, তাঁদের অধিকাংশের জন্ম মাতুলালয়ে। ভিতরের সত্য হল, নারী যখন সাংসারিক কাজে অপারগ, তখন তাকে শ্বশুরালয় থেকে বিদায় দেওয়া হত। আমার মাতামহের সাত-সাতটি মেয়ে, তাই তাঁর পুরীর দোতলা বাড়ির পেছন দিকে উঠোনের কোণে একটা পার্মানেন্ট আঁতুড়ঘর ছিল। অসংখ্য শিশুর জন্ম হয়েছে সেই ঘরে। আজ তারা, তাদের সন্তান-সন্ততি এবং তাদেরও সন্তান-সন্ততি সারা ভারতের কোণে কোণে ছড়িয়ে রয়েছে—থিকথিক করছে। উপার্জন করছে, ভোগ করছে, পরিবেশের মধ্যে দূষণ ছড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত। পোকাদের মতো, নির্বিকারভাবে।

একটি পুত্রসন্তান লাভ করার আশায় আমার মাতামহ চার বার বিবাহ করেছিলেন। প্রথম দু'জন অকালে গত হন। পরের দু'জন টিকে যান। চতুর্থজন ঠাকুরের কৃপায় একটি পুত্রসন্তান উপহার দিতে পেরেছিলেন মাতামহকে, তৃতীয়জন তখন পঞ্চম কন্যাকে গর্ভে ধারণ করে অপেক্ষমান। অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার পর মাতামহ আর কাম-ক্রোধে লিপ্ত থাকেননি। দীক্ষা নিয়ে গুরুদেবের চরণে নিজের সংসারের ভবিষ্যৎ সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। একজন প্রবাসী অসফল আইনজীবীর পক্ষে আর কী-বা করার ছিল। উক্ত পঞ্চম কন্যাই আমার ছোট মাসি। আমার মা তাঁর চতুর্থ কন্যা।

লিখতে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা কেমন আজগুবি, অস্বাভাবিক ঠেকছে। কিন্তু তখন এসব খুব মসৃণভাবে গ্রহণ করা হত। আমার দুই দিদিমার নাম নিভাননী আর ননীবালা। দাদু কারুর প্রতি পক্ষপাত না দেখাতে দু'জনকেই 'ননী' বলে ডাকতেন। যে সাড়া দিত, তাকেই পান সেজে দিতে বলতেন। ওঁদের সংসারে সতিনদের মধ্যে কলহ ছিল না, বোঝাপড়া ছিল। কী রকম বোঝাপড়া, আমি কল্পনা করতে চাই। পাখিদের মতো?

আমার মাতামহের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন জানকীনাথ বসু। তিনি রাজধানী কটকে ওকালতি করতেন। পুরীতেও তাঁর একটা নিজস্ব বাড়ি ছিল। ছুটিছাটায় প্রায়ই পুরীতে আসতেন বেড়াতে। তাঁর অনেকগুলি পুত্রসন্তান ছিল। ইচ্ছা করলে তিনি হয়তো আমার মাতামহকে কন্যাদায় থেকে সম্পূর্ণ না হোক কিছুটা উদ্ধার করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা কায়স্থ, অসবর্ণ, সুতরাং এ-প্রশ্ন কখনও ওঠেনি। তা ছাড়া তাঁরা কত ধনী।

কলাগাছের মতো মেয়েরা একে একে বড় হয়ে উঠতে লাগল। কী করে তাদের বিবাহ হবে সেই চিন্তায় দাদু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ঠাকুরকে ডাকতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত ঠাকুরই পথ বলে দেন। এক, বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দাও আর দুই, চেঞ্জারদের দিকে নজর রাখো। চেঞ্জার মানে এখনকার ভাষায় ট্যুরিস্ট। পুরী বরাবরই বাঙালি ট্যুরিস্টদের কাছে প্রধানতম আকর্ষণ। সেখানে তীর্থক্ষেত্রের পুণ্য আছে আবার সমুদ্রসৈকতের মুক্তবায়ু আছে। সেই উনিশশো পঁচিশ সালে যক্ষ্মারোগের কোনও নিশ্চিত নিরাময় ছিল না। লোকে পুরীতে শরীর সারাতে যেত। এই তিন রকমের যাত্রীদের জন্য পুরীর সমুদ্রতীরে তখনই একাধিক হোটেল গড়ে উঠেছিল। সবচেয়ে অভিজাতটির নাম বি.এন.আর. হোটেল। এ ছাড়া বাঙালি বাসিন্দারা নিজেদের বাসগৃহের ঘরও চুক্তিতে ভাড়া দিত। দাদু তাঁর দুই স্ত্রী এবং সাত কন্যাকে নিয়ে সমুদ্রকিনারে বেড়াতে যেতেন মাঝে মাঝে। এক চেঞ্জার পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাওয়ায় তারা আমার এক মাসিকে বরণ করে নিয়ে যায়। বর্ধমান জেলার কালিকাপুর গ্রামে আমার সেই

মাসির শ্বশুরবাড়ি। সেখানে বেড়াতে গিয়ে আমি প্রথম কাঁঠাল খেয়েছিলাম।

বাংলা কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এবং বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আর সব মাসিদের বিয়ে হয়েছিল বলে শুনেছি। কেউই শেষপর্যন্ত পড়ে থাকেনি। ওই বিজ্ঞাপনে পাওয়া মেজো জামাই ছিল ধনী ঠিকেদার। তাই সে ভদ্রলোক এমন ঈশ্বরানুরাগী ও নিরাসক্ত শ্বশুরকে দেখে অত্যন্ত চমৎকৃত হয় এবং কালক্রমে সকল কন্যার বিবাহের আর্থিক দায়িত্ব বহন করে। এ-ও ঠাকুরেরই কৃপা। কেবল ছোটমাসিকে গ্রহণ করে মেজো জামাইয়ের অধস্তন সহকর্মী। ঘরে ঘরে সম্বন্ধ। তখন সোনার দাম একুশ টাকা ভরি, বেনারসি শাড়ি পঞ্চাশ টাকা। একটা মেয়ের বিয়েতে খরচ পড়ত তিন হাজার টাকা মাত্র।

অনেকদিন আগে, মা বেঁচে থাকতে, ছোটমাসির কাছে শুনেছিলাম যে বিয়ের আগে একজন চেঞ্জার যুবক মাকে গান শেখাতে আসত। দাদু সব মেয়েকেই অল্পবিস্তব গানবাজনা শিখিয়েছিলেন। তাঁর নিজের গানের গলা ছিল। ঠাকুরদেবতার গান গাইতেন, ব্রহ্মসংগীত তখন খুব জনপ্রিয় বাঙালি মহলে। কিন্তু মায়ের বেলা দাদুর আর সে ক্ষমতা ছিল না। ওই চেঞ্জার ছেলেটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গান শেখাতে রাজি হয়। এবং এই কাজের জন্য সে কোনও বেতন নিত না।

ছোটমাসির এই কথার মধ্যে অন্য কোনও ইঙ্গিত থাকতে পারে। কারণ ছোটমাসির গান শেখা হয়নি।

বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দাদু উত্তর বিহারের পাত্রপক্ষকে চিঠি লেখেন বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। তাবপর বাবার সঙ্গে আমার মায়ের বিয়ে হয়ে যায়। তখন মায়ের বয়স পনেরো। মায়ের ষোলো বছর বয়সে আমার জন্ম। তফাতটা খুব বেশি না। আমার যখন পঞ্চাশ বছর বয়স, মায়েব তখন ছেষট্টি। ছোটমাসির চৌষট্টি। ছোটমাসি ঠাট্টা করে বলতেই পাবে, ছোড়দি, ওই লোকটার কী যেন নাম ছিল? আমি সেখানে উপস্থিত। এই কলকাতা শহরেব এক বাঙালি পল্লিতে।

মা বলেছিল, 'কোন লোকটার?'

'ওই যে, তোকে গান শেখাত পুবীতে?'

'অতশত আমার মনে নেই।'

'আমার মনে আছে' ছোটমাসি বলেছিল, 'ওর নাম ছিল তারক। বোগা চেহারা। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।'

'আর কী মনে আছে তোব?'

মা স্পষ্টত অপ্রসন্ন।

কলকাতা শহরে আমাব সামনেই এইসব সংলাপ আদান প্রদান হয়। আমার মেয়ের বয়স তখন সতেরো। সে অবশ্য উপস্থিত ছিল না। সে তার প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরছিল কোথাও। ছোঁড়াটা ওর সহপাঠী, আমি বাধা দিইনি।

ছোটমাসি বলে, 'ও ছিল আইবুড়ো।'

'ভাগ্যিস'। মা একটু রেগে গিয়েই বলে, 'শোন খোকন, একটা নির্দোষ লোকেব নামে কেচ্ছা রটাসনি। লোকটা টিবি থেকে সেরে উঠে স্বাস্থ্য ফেরাতে পুরীতে এসেছিল। বাবার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে আলাপ। বাবা বলে, আমার মেয়েদেব একটু গান শেখান না। এখানে তেমন মাস্ট'র নেই। তো তিন-চার মাস—'

'আমাকে তো শেখায়নি। শুধু তোকেই শেখাত। বাবা বলত, আমার গলায় গান নেই, আমি যেন লেখাপড়া শিখি। দাদার কাছে আমি ইংরিজি পড়তাম। বাবার মনে মনে নিশ্চয়—'

মা বলে, 'যাই থাক, ওই চোদ্দো বছর বয়সে আমার মনে কোনও পাপ ছিল না। গান-জানা লোক, আমায় কয়েকটা গান শিখিয়ে দিয়ে গেছে। ব্যস। তারপর তো আমার বিয়ে হয়ে গেল। ডাকু পেটে যখন আবার এলাম, শুনলাম, সে চলে গেছে। তারপর বাবা মারা গেল।'

ডাকু আমার ডাকনাম। আগেই বলেছি, দুই বোনের কথোপকথনের সময় তখন আমার বয়স পঞ্চাশ, মায়ের ছেষট্টি, ছোটমাসির চৌষট্টি আর আমার মেয়ে ঝুমকির সতেরো। এখন আমার সাতষট্টি হল। দাদু, দিদিমারা কেউ বেঁচে নেই। বাবাও মারা গেছে। মা নেই। ছোটমাসি একাশি বছর বয়সে বাত নিয়ে টিমটিম করে জ্বলছে। তার দুই ছেলে, তিন মেয়ে। ছোটমাসি ইংরেজিতে নাম সই করতে পারে। মা পারত না। বাবা যতদিন বেঁচে ছিল, মায়ের চিঠিতে বাংলা বানান ঠিক করে দিয়েছে। ওই তারক যদি আমার বাবা হত, সে-ও দিত নিশ্চয়। আমি তো আমিই থাকতাম।

ছোটমাসি সেদিন প্রায় প্রতিহিংসাবশত বলেছিল, 'তোমাকে গান শেখাতে আমার ভাল লাগে, লোকটা তোকে বলেনি?'

'তাতে কী বোঝায়?' বলে হঠাৎ কেঁদে ফেলেছিল মা। হ্যাঁ, কেঁদে ফেলেছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'ইয়ারকির একটা সীমা আছে।'

আমরা সেদিন উঠে এসেছিলাম। তারপর মা কিছুদিন ছোটমাসির বাড়ি যায়নি। আবার সব মিটমাট হয়ে গেছে। অনেক বছর ঘুরে গেছে তারপর। সধবা মাসিরা বিধবা হয়েছে। বিধবা মাসিরা মারা গেছে একজন একজন করে। আমার মাসতুতো ভাইবোনেরা এবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সবাই তারা মুঠো মুঠো ক্যাপসুল খায় আর ঠাকুরঘরে বসে গুরুদেবের পুজো করে। তিনি হাত ধরে বৈতরণী পার করে দেবেন। ওই বিশ্বাস নিয়ে স্বস্তিতে আছে।

আজ সাতষট্টি বছরের জন্মদিনে ভাবছি একবার ছোটমাসির বাড়ি যাব। নিজের ডাকনামটা শুনে আসব। আব জেনে আসব, কে কোথায় আছে, কেমন আছে, কে আর নেই। আমার সঙ্গে কারুর যোগাযোগ নেই তেমন। ছোটমাসিই গেজেট।

না। তারক মাস্টারের কথা আমি তুলব না। ও প্রসঙ্গ চুকেবুকে গেছে। সেইদিনই, ছোটমাসির বাড়ি থেকে ফেরার পথে রিকশায় বসে মা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বল তো ডাকু, তোমাকে গান শেখাতে আমার ভাল লাগে, এটা কি কোনও খারাপ কথা?'

আমি বলি, 'তুমি হঠাৎ কেঁদে ফেললে কেন? ছোটমাসি ঠাট্টা করছিল।'

'ঠাট্টা না। হিংসে।' তারপর মা চুপ করে যায়। আমি, বাবার প্রতিনিধি, মায়ের কৈফিয়ত তো শুনলাম। অন্তত বুঝলাম, এই ঘটনার কথা মা কখনও বাবাকে বলেনি।

আমার শোবার ঘরে মা-বাবার জোড়া ফটো বাঁধানো আছে দেয়ালে। আমার শ্বশুর-শাশুড়ির ফটোও দেয়ালে ঝোলে। এরা সবাই এক জীবন করে পোকার মতো বেঁচে তারপর স্বাভাবিক ভাবে মারা গেছে। আর কিছুদিন পর ছোটমাসিও যাবে। মেসোমশায়ের ছবির পাশে জায়গা হবে তার। সেখানে দাদু আর দুই দিদিমার ছবি আছে। তারপর আমি যাব। পোকার মতোই। কিছু হাসি, কাশি আর ঘামের গন্ধ রেখে যাব। ধোপার বাড়ি থেকে কেচে আসবে।

কিছু তো থাকে না। আত্মাফাত্মা সব বুজরুকি। আমি বুঝে গেছি। শুধু দুটো-একটা কথা, আলটপকা বলা কথা, যেমন, 'তোমাকে গান শেখাতে আমার ভাল লাগে,' থেকে যায়।

১৯৯৯

জোড়া খাট

নির্মলবাবু বাজার থেকে বাড়ি ফিরে দেখলেন, বাড়ির ভেতরে কেমন এক ছমছমে নীরবতা বিরাজ করছে। মিনা ওঁর হাত থেকে বাজারের ভারী থলিটা নিয়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। খানিক পর একটা সন্দেশ আর এক গ্লাস ঠান্ডা জল এনে সামনে রাখল। নির্মলবাবু তখন পাখার নীচে সোফায় বসে পড়েছেন।

কী ব্যাপার? আজ এত খাতির করছ যে!

খাতির না। যত্ন। পরিশ্রম করে এসেছ, একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খাও।

জল খেয়ে বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে ব্যাপারটা চোখে পড়ল নির্মলবাবুর।

পাশাপাশি দু'খানা শোবার ঘর। একখানা ঘরে জোড়া খাট। ড্রেসিং টেবিল। টেলিফোন। অন্য ঘরে দুটি আলমারি। বইয়ের তাক, লেখাপড়া করার টেবিল। দুটি চেয়ার। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর

এই ব্যবস্থা বহাল ছিল। এখন দেখলেন একটি খাট ও-ঘর থেকে এ-ঘরে এসেছে আর একটি আলমারি এ-ঘর থেকে ও-ঘরে গেছে।

এটা কী হল?

এখন থেকে তুমি এই ঘরে শোবে। আর আমি যেমন ছিলাম, ওই ঘরে।

আমাকে আলাদা করে দিলে?

ওভাবে ভাবছ কেন? আমবা তো এক বাড়িতেই আছি। শুধু শোবার সময় দু'জনে দু'ঘরে। তোমার যা নাক ডাকে! আমার ঘুম হয় না।

নির্মলবাবু এবার খেপে গিয়ে বললেন, আমার নাক পঁচিশ বছর ধরে ডাকছে। আজ তোমার খেয়াল হল? এতদিন ঘুমোলে কী করে!

মিনা বলল, তা হলে সত্যি কথা বলি, রাত্তিরে তোমার বড় হাত চলে। আজকাল ওটা আমার পছন্দ হয় না। এবাব নির্মলবাবু একটু থমকে যান। উনি বলতে চান, এই জন্যেই তো মানুষ বিয়ে করে। স্ত্রী-পুরুষ ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করবে, পরস্পরকে জানবে। মনে হবে, তোমার কষ্ট আমার কষ্ট, তোমার আনন্দ আমার আনন্দ। কিন্তু বললেন না, কারণ ওঁর বয়েস এখন বাহান্ন, ওদের একমাত্র মেয়ে রুমিব বিয়ে হয়ে গেছে এক বছর হল। ওরা আবুধাবিতে থাকে, এবং নির্মলবাবু সম্প্রতি দশ ঘণ্টা আপিস করার পব যতটুকু সময় বাড়িতে থাকেন, খবরের কাগজ পড়েন আর টিভি দেখেন। সংসারের কাজ বলতে সপ্তাহে দু'দিন বাজাব করা। ব্যস, বউয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ কোনওদিন দেননি। আজও দেন না। মেয়ে চলে যাওয়ার পর মিনা একদম নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। রাত্রে যেটুকু ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সুযোগ ছিল তা-ও এবাব হাত থেকে বেরিয়ে গেল।

নির্মলবাবু বললেন, হার্ট অ্যাটাক হলে মবে পড়ে থাকব। তুমি জানতে পারবে না।

মিনা বলল, কাল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ব্লাড প্রেশাব বেড়ে গেছে। ওষুধ দিল। আর কয়েকটা রক্তপবীক্ষা করাতে বলল। ডাক্তার বলল, চেঞ্জ অফ লাইফ। এই সময়টা খুব সাবধানে থাকবেন। টেনশন এড়িয়ে চলবেন। ডাক্তার বলেছে, এর পরে যেদিন আসবেন, নির্মলবাবুকে সঙ্গে কবে আনবেন। ওঁর সঙ্গেও কিছু কথা আছে।

নির্মলবাবু বললেন, তোমাব ডাক্তারের কাছে যেতে আমার বয়ে গেছে!

চেঞ্জ অফ লাইফ ব্যাপাবটা নির্মলবাবু জানেন, মেয়েদের আগে হয়। যৌবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হওয়া। শবীবের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রত্যাহার। মিনার সেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। অথচ বাহান্ন বছর বয়েসের নির্মলবাবু চুলে কলপ দিয়ে যুবকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আট বছর বাদে ওঁর কর্মস্থল থেকে অবসর নেওয়ার কথা। কাজের জায়গায় সবচেয়ে অভিজ্ঞ মানুষ তিনি, তাঁর ওপর অনেক দায়িত্ব। আর কিছুদিন পরে আপিসের গাড়ি এসে ওঁকে নিয়ে যাবে, ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। ওঁর শরীরে তেমন কোনও অসুখবিসুখও নেই।

দু'জন লোকের এই বাড়িতে এবার অশান্তি দেখা দিল।

বিয়ের সময় মিনার কতকগুলো বিশেষ গুণ ছিল। যেমন, সে নাচ জানত। চেহারা ছিল ঝরঝরে। বিয়ের পর কোন মেয়ে আর নাচে, সুতরাং শরীরের ওই ব্যায়ামটা চলে যাওয়ায় ও একটু মোটা হয়ে গেছে। ও ছিল অর্থনীতি বিষয়ে ডিগ্রিধারী। চর্চা চলে যাওয়ায় ও অর্থনীতির সূত্রগুলো ভুলে গেছে। শুধু সূত্র ভুলে গেছে, তাই নয়, ওর পড়াশোনার অভ্যেসটাও চলে গেছে। এখন মিনা বাংলা কাগজের হেডিং আর রগরগে ঘটনার খবর ছাড়া আর কিছু পড়ে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, আমার সময় কই। যতদিন মেয়ের বিয়ে হয়নি, ততদিন একরকম চলে যাচ্ছিল, এখন আর সময় কাটে না।

নিজের ঘরের কোণে মিনা একটা ঠাকুরের আসন বসিয়েছে। ওইখানে কিছু সময় কাটে। স্বামীর জামাকাপড় আর খাবারদাবারের বিষয়ে এবার অধিক মনোযোগ দিতে শুরু করল। রান্নার কাজে নিযুক্ত ছিল একজন মাসি, এখন তার ওপর খবরদারি শুরু করায় সে দু'বার কাজ ছেড়ে দেবে বলে হুমকি দিয়েছে। মিনার অভিযোগ, সেই পুরনো মাসি কেন মশলা ছাড়া কোনও পদ সুস্বাদু করতে পারে না। সে কি জানে না যে, গরম মশলা, সরষে, শুকনো লঙ্কা খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর? বয়স্ক লোকের খাওয়া উচিত নয়? এইসব বিষয় নিয়ে নির্মলবাবুর কাছে অভিযোগ করতে এলে তিনি মিনার মুখের

দিকে চেয়ে থাকেন। দেখেন, ক্রমশ ওর গাল চড়িয়ে যাচ্ছে, চুল উঠে যাচ্ছে, ভুঁড়ি বেড়ে যাচ্ছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে খেয়ে ওর চোখের কোণে কালি।

খুব চাপাচাপি করলে নির্মলবাবু বলেন, তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখন কথা কম বলো। মেডিটেশন করো।

এক-এক সময় তিতিবিরক্ত নির্মলবাবুর মনে আরও কিছু চিন্তার উদয় হয়। কিছুদিন মিনাকে বাপের বাড়িতে রেখে আসা যায় কিনা। আবুধাবিতে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়! আজকাল তো অনেক বৃদ্ধাশ্রম হয়েছে। সেখানে ভরতি করে দিলে কেমন হয়? আর সব বুড়োবুড়ির সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। ডিভোর্স করার কথা একবার মনে জেগেছিল, সঙ্গে সঙ্গে চাপা দিয়ে দিয়েছেন এই ভেবে যে, তা হলে ও মরে যাবে। বাহান্ন বছর বয়েসে বিপত্নীক হওয়ার সুবিধে-অসুবিধে দুটো দিকই আছে অবশ্য। রবীন্দ্রনাথ কত বছর বয়েসে বিপত্নীক হয়েছিলেন? জওহরলাল নেহরু?

কোনও সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে নির্মলবাবু একদিন বেয়াই বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এরা নতুন কুটুম কিন্তু বেয়াই মশাই বয়েসে কিছুটা বড়। অভিজ্ঞ মানুষ। আর 'মাই ডিয়ার' ভদ্রলোক। খোলাখুলি সব কথা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা যায়।

গিয়ে দেখলেন, বেয়ান বাথরুমে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছেন। সেবিকা পায়ে সেঁক দিচ্ছে। বেয়াই মশায় নিজে একজন ডায়াবিটিক, তিনি ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন। দু' ঘরে দু'খানা শোবার খাট।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নির্মলবাবু কথাটা পাড়লেন। বেয়াই মন দিয়ে ওঁর সব কথা শুনলেন। তারপর বললেন, আমিও এই সবের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি নির্মলবাবু। কষ্ট হয়। এমনটা হবে জানলে বিয়েই করতাম না। তবে এটার মেয়াদ দু'-চার বছর। যখন স্বামী-স্ত্রীকে ভাইবোনের মতো থাকতে হয়।

তারপর?

তারপর ব্যাপারটা সহ্য হয়ে যায়। আর, এক সময় দেখা যায়, স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্ত্রীর হাতে লাগাম চলে গেছে। বাকিটা জীবন স্ত্রীর অধীনে থাকার ভারী সুখ। দেখবেন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ছেলেমেয়ে—এরা কেউ আপনজন নয়। আপনজন একজনই—আপনার বিবাহিতা স্ত্রী। আপনি বুড়ো হলে মারা যাবেন। তিনি ধিকিধিকি করে অনেকদিন বেঁচে থাকবেন।

দুই প্রজন্ম

রোজ সকালবেলা যখন বিছানা থেকে নেমে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই, ঠান্ডা রোদের আলো দেখি, ফুরফুরে বাতাসে নিশ্বাস নিই, মনটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। আর এক দিনের জীবন পাওয়া গেল মনে হয়। এ-বয়সে সেটাই কি কম লাভ। আমার সমবয়সি অনেকে একে একে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে পৃথিবী থেকে প্রস্থান করেছে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, বয়স্ক মেয়েপুরুষ মাথায় টুপি আর পায়ে কাপড়ের জুতো পরে হনহন করে হাঁটতে বেরোচ্ছে কিংবা হেঁটে ফিরছে। ওরা আমার চেয়েও বেশিদিন বাঁচবে। এক এক সময় ভাবি, ওরা বোধহয় কর্মফল বা পরজন্মে বিশ্বাস করে না। না হলে এই নোংরা জনবহুল দুনিয়ায় সেঁটে থাকতে চাইবে কেন।

আমার পায়ে ব্যথা। তাই আমি এখন এক কাপ গরম চা নিয়ে বাইরের ঘরে বসব। আর খবরের কাগজ পড়ব। সাতটা চল্লিশ বাজলে রেডিয়ো খুলে রবীন্দ্রসংগীত শুনব। এই সময়টায় আর কিছু করতে

ইচ্ছে করে না। টেলিফোন এলে বিরক্ত হই। একটা সময় ছিল যখন সকাল সাড়ে সাতটায় আপিসে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হতে হত। সাড়ে আটটায় গাড়ি আসত। ন'টায় আপিসে পৌঁছোতাম। সন্ধে সাতটায় আপিস থেকে বিধ্বস্ত হয়ে ফিরতাম। মেজাজ খাপ্পা হয়ে থাকত। সে-পাট অনেকদিন চুকে গেছে। এখন গরিব হয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি।

সেদিন সাড়ে সাতটায় টেলিফোন বাজল।

কে বলছেন?

আপনি কি অমুক?

হ্যাঁ।

আমার নাম শঙ্কর কুণ্ডু। আমি মধ্যমগ্রাম নেতাজিনগর গ্রন্থাগারের সেক্রেটারি। সামনের বাইশ তারিখে আমাদের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব। আমরা আপনাকে প্রধান অতিথি হিসেবে পেতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে একটা বহু পরিচিত ছবি ভেসে ওঠে। এইসব সভা কী রকমের হয়।

প্রখর আলো। সশব্দ মাইক্রোফোন। স্মারক গ্রন্থের প্রকাশ, স্মারক উপহার, পুষ্পগুচ্ছ আর একটি মিষ্টির প্যাকেট। বিনিময়ে কিছু একঘেয়ে বক্তৃতা বা ভাষণ। উদ্বোধন আর সমাপ্তি সংগীত গাইবে কোনও স্থানীয় তরুণী, প্রভাবশালী ব্যক্তির কন্যা বা পত্নী—যার সুরজ্ঞান যথেষ্ট নয়। অনেকটা সময় খরচ করে যাওয়া। অনেক সময় খরচ করে ফেরা। পুরো সন্ধেটা নষ্ট।

আমি বললাম, আমার পায়ে ব্যথা। শরীরের জুত নেই। আমাকে বাদ দিন।

সে কী।

লোকটি অবাক হয়ে বলেন, আপনি হলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের অন্যতম। উনিশশো তিপান্ন সালে এই গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন কয়েকজন যুবক। তাঁদের মধ্যে দু'জন মাত্র এখন বেঁচে আছেন। একজন অমিয়কান্তি সেন, এখানকার বাসিন্দা। আর একজন আপনি—অনেক বছর হল নেতাজিনগর ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছেন। কিন্তু আমরা আপনাকে মনে রেখেছি। অমিয়বাবু আপনার টেলিফোন নম্বর দিলেন। আমাদের কমিটি মিটিংয়ে আপনার নাম অনুমোদিত হয়েছে। আপনাকে আসতেই হবে স্যার।

এবার আমার মনে পড়ল নেতাজিনগরের কথা। মধ্যমগ্রাম স্টেশনে নেমে সোদপুর রোড ধরে কিছুক্ষণ হাঁটার পর বাঁ দিকে পড়ে। শ' পাঁচেক প্লটের একটা পল্লি। দেশ ভাগ হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীরা এই বাংলায় আসতে শুরু করে। তখন বনগাঁ লাইনের দু'পাশে বসতি গড়ে ওঠে। বেশিরভাগ জবরদখল করা জমিতে হ্যাঁচাবেড়ার ঘর, মাটির মেজে, টিনের চাল, কাঁচা রাস্তা। নেতাজিনগর কিন্তু গড়েছিলেন একজন বিচক্ষণ প্রমোটার। খানিকটা ধানজমি কিনে একটা বাগানবাড়ি জুড়ে, ইতস্তত রাস্তা ফুটিয়ে ছোট ছোট প্লট বিক্রি করেছিলেন। সেখানে খুলনা জেলা থেকে আসা অবস্থাপন্ন শরণার্থীরা জমি কিনে বাড়ি করেন। আর আসেন কলকাতার ভাড়া বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত কিছু মধ্যবিত্ত পরিবার। একশো-দেড়শো টাকা থেকে লাফিয়ে দক্ষিণ কলকাতার মশা ও খাটাল-অধ্যুষিত এলাকার বাড়িভাড়া তখন তিনশো টাকার ওপরে উঠে যায়। জমির দাম উঠে যায় দশ হাজার টাকা কাঠা। উত্তর কলকাতার কিছু নিম্ন মধ্যবিত্ত পুরনো ভাড়াটে ছাড়া আর কারুর পক্ষে কলকাতায় বসবাস করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গের ধনী শরণার্থী আর পশ্চিমবঙ্গের ধনী মারোয়াড়িরা মিলে কলকাতার বিষয়সম্পত্তি কিনে নিতে থাকে।

চারশো টাকা কাঠা দরে চার কাঠা জমি কিনে আর পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে একটি দু'কামরার বাড়ি তৈরি করে আমরা তখন নেতাজিনগরে আসি। দূরে দূরে এক-একটা বাড়ি, অনেকখানি খোলা জায়গা। গাছপালা। খোয়ার রাস্তা গেট থেকে ঢুকে সোজা ভেতরে চলে গেছে সুইমিং পুল পর্যন্ত। আসলে ওই নামের একটা বড় পুকুর খুঁড়ে সেই মাটি দিয়ে ইট বানিয়ে ভেতরের রাস্তা পাকা করা হয়েছিল। পুকুরের চারদিকে ছিল ঝাউ গাছ। রাত্তিরবেলা হাওয়া উঠলে হু হু করে শব্দ উঠত।

আমরা ছিলাম চার ভাই, এক বোন। আর মা। বাবার ছিল বদলির চাকরি। মাঝে মাঝে এসে থাকতেন। এই এতজন লোক দু'খানা ঘরে। বাইরে একটা রক ছিল দশ ফুট বাই দশ ফুট, ঘর করা যায়নি টাকার অভাবে, সেখানে ছেলেরা সকালের দিকে আর মা বিকেলবেলা বসে গল্পগুজব করত। আমরা বড় দু'ভাই কলকাতায় আসতাম সকাল ন'টা বাইশের ট্রেনে। শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছোতাম দশটায়।

বাজার করে ফিরতাম রাত আটটায়। প্রথম দিকে বিদ্যুৎ ছিল না, লণ্ঠনের আলোয় হাতপাখা চালিয়ে পড়াশোনা করেছি। বিদ্যুৎ আসতে দু'ঘরে দু'খানা পাখা টাঙানো হল। কষ্ট? ছিল। কিন্তু আমাদের মা ছিল ইতিবাচক মনের মানুষ, মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই হয়েছে, এতেই মা খুশি। আর যা-কিছু আস্তে আস্তে হবে। বর্তমানকে উপেক্ষা করে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থেকে লাভ নেই। এই ছিল মায়ের বিশ্বাস। আর অন্যান্য প্রতিবেশী যাঁরা শরণার্থী ছিলেন, পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে আসা মানুষ, তাঁরা ভাবতেন অতীতকাল আর ফিরবে না, বর্তমানের ওপর দিয়েই ভবিষ্যৎ আসবে। ছেলেপুলেরা বড় হলে সুদিন ফিরবে আবার। মোট কথা, নেতাজিনগরের দিনগুলি ছিল পাতার ওপর ভেসে থাকার সময়। শিকড় উপড়ে চলে আসা বয়স্ক মানুষ যাঁরা, তাঁদের পক্ষে সময়টা ছিল দুঃসহ। তাঁরা কিছুতেই শিকড়ের শোক ভুলতে পারতেন না। ট্রেনে যাতায়াতের পথে শুনতাম, তাঁরা বলাবলি করছেন, যদি খুলনা জেলার বদলে মুর্শিদাবাদ জেলা পাকিস্তানে চলে যেত, তা হলে তাঁরা বেঁচে যেতেন দুর্ভোগ থেকে। আদৌ দেশবিভাগ না হলে কী হত। তাঁরা ভাবতেন না কেন, জানি না। হিন্দু-মুসলমান সমাজে সম্পর্কের অবনতি তাঁরা চাক্ষুষ দেখেছেন। এই অবনতির ইতিহাস তাঁরা জানতেন। আর সেই ইতিহাস মূলধন করে রাজনীতির খেলা তাঁরা আটকাতে পারেননি।

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ছিল অনেকের কথা। শক্তিবাবু ছিলেন উগ্র প্রকৃতির সংস্কৃত পণ্ডিত, সরকারি চাকরি করতেন। বিমলবাবু ছিলেন বার্ড কোম্পানির বড়বাবু। নৃপেনবাবু ছিলেন রেলের অফিসার, পণ্ডিত মানুষ, নেতাজিনগরের একমাত্র দোতলাবাড়ির বাসিন্দা। ওই বাড়ির ছেলে সৌরীন ছিল এম এ ক্লাসের ছাত্র—আমাদের বন্ধু। পরে ওকালতি পাশ করে হাইকোর্টে যেতে শুরু করে। সুনু, অমল, নির্মলদা, বুড়ো, অসিত, লালু। করুণাডাক্তার—পল্লির প্রথম চিকিৎসক।

আমরা ঠিক করলাম, নেতাজিনগরে একটি গ্রন্থাগার হওয়া দরবার। আমাদের উৎসাহ দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার অধিকর্তা ও প্রতিবেশী প্রমিল বসু। আমরা ঘুরে ঘুরে চাঁদা আর বই সংগ্রহ করতে লাগলাম। একটা সাইনবোর্ড বানানো হল। সদস্যদের টাকায় আলমারি কেনা হল। একজন বাসিন্দা বাসগৃহের একটি ঘর ছেড়ে দিলেন গ্রন্থাগারের জন্যে। যতদূর মনে পড়ে, হাজারখানেক বই নিয়ে গ্রন্থাগারের পত্তন হয়। ফেরাফেরি করে একজন সন্ধেবেলায় গ্রন্থাগার খোলে, বই দেওয়া-নেওয়া করে, রাত ন'টার সময় তালা বন্ধ করে বেরিয়ে যায়। সদস্যসংখ্যা টুক টুক করে বাড়তে বাড়তে পঞ্চাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ওই একটি সামান্য প্রতিষ্ঠান—তাই গড়ে তোলার জন্যে কী পরিশ্রম, কত ত্যাগস্বীকার, কত সংঘাত, মন কষাকষি। কী উৎসাহ আমাদের। নতুন বই কেনা হবে—কী কী বই, তাই নির্বাচন করা নিয়ে কী প্রবল তর্ক-বিতর্ক। প্রবন্ধ না উপন্যাস? কার উপন্যাস? কার ভ্রমণকাহিনী? কার রচিত জীবনীগ্রন্থ? অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা চারখণ্ডে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সবে বেরিয়েছে। তাই নিয়ে চারদিকে হইচই কাণ্ড। ওটা কিনতেই হবে। একশো টাকায় পঁচিশখানা বই। শুধু কেনা নয়। কলেজ স্ট্রিট থেকে টানতে টানতে নিয়ে আসা। তাতেই আমাদের আনন্দ।

অমিয়কান্তি সেন ছিলেন দমদম কলেজের গ্রন্থাগারিক। তিনি বইয়ে নম্বর দেওয়া শুরু করলেন। মনে আছে। এর বছর পাঁচেক পর আমরা নেতাজিনগর ছেড়ে চলে আসি। কলকাতা থেকে এত দূরে থেকে নতুন পাওয়া চাকরি করা অসম্ভব ছিল বলে।

শঙ্কর কুণ্ডুকে বললাম, আমি যাব। কিন্তু আমায় নিয়ে যেতে হবে। আমার পায়ের অসুবিধে আছে। নির্ধারিত বাইশ তারিখে গাড়ি নিয়ে শঙ্কর কুণ্ডু স্বয়ং উপস্থিত। তখন বিকেল চারটে। আমি প্রস্তুত ছিলাম। ঘণ্টাখানেকের পথ গল্প করতে করতে যাওয়া হল। ওর কাছে জানলাম, ইতিমধ্যে মধ্যমগ্রামের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। জায়গাটা আর নির্জন গ্রামাঞ্চল নেই। কলকাতার এত কাছে—লোকসংখ্যা, ঘরবাড়ি, দোকানপাট, সব বেড়ে গেছে। সোদপুর রোড দিয়ে সন্ধেবেলা হাঁটা যায় না, এত ভিড়। আর, আমাদের বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়ি এখন বেড়ে দোতলা হয়েছে। যদিও নামফলকটি আছে অক্ষত।

যেতে যেতে এটা বুঝতে পারছিলাম। যশোর রোড অনেক চওড়া হয়ে গেছে। তার দু'পাশে কলকারখানা গজিয়ে উঠেছে। অনেক নতুন বাড়ি উঠেছে। আগে এই পথ দিয়ে দু'খানা প্রাইভেট বাস যেত। এখন বোধহয় দশখানা বাস যায়। ট্রেনে ডাবল লাইন হয়েছে। এখন একতলা বাড়ি খুব কম। নেতাজিনগরে তিন চারতলা বাড়িই এখন বেশি। শঙ্কর কুণ্ডু বলল, একটা ছোটখাটো সল্টলেক ভেবে নিন। আমাদের নিজস্ব পুরসভা হয়েছে। লোডশেডিং হলে সঙ্গে সঙ্গে জেনারেটারে আলো দেবার

ব্যবস্থা আছে। কেব্‌ল টিভি বসেছে। শঙ্কর কুণ্ডুকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন বাড়ির ছেলে?

আমরা পরে এসেছি। ও বলল, আপনার মতো অনেকেই ওখানকার জমি-বাড়ি বিক্রি করে কলকাতায় চলে এসেছেন। ওই রকম একটা প্রপার্টি কিনে পুরনো বাড়ি ভেঙে আমি নতুন বাড়ি বানিয়ে নিয়েছি। গাড়িতে গড়িয়া থেকে বিবাদি বাগ যত দূর, মধ্যমগ্রাম থেকেও তত দূর। এবং যানজট কম, কেননা ভি আই পি রোড ধরে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

আমার মতো নয়। আমরা চলে আসি বাধ্য হয়ে। আর যারা এসেছে, তারা বোধহয় দ্বিতীয় প্রজন্ম। অধিবাসীদের প্রথম প্রজন্ম মারা যাবার পর।

শঙ্কর কুণ্ডু বলল, হ্যাঁ তা হতে পারে। যাঁরা সত্যিকারের রিফিউজি ছিলেন, যথাসর্বস্ব নিয়ে এ-দেশে পালিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা বেশিদিন বাঁচেননি। নতুন জায়গায় মানিয়ে নেওয়া তো সহজ নয়।

পঞ্চাশ বছরের পুবনো গ্রন্থাগারের সামনে নয়, নতুন ভবনের সামনে গাড়ি থামল। অমিয়কান্তি সেন এগিয়ে আসতেই আমি চিনতে পারলাম। সেই রকম রোগাটে, ফরসা, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। একটু কুঁজো হয়ে গেছেন মনে হল। সেই পুরনো সুইমিং পুলের পাশে নিজস্ব জমিতে গ্রন্থাগারের দোতলা বাড়ি। সারি সারি আলমারি দাঁড় করানো। প্রচুর বই। সামনে একটি প্রস্তরফলকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। তাতে মাল্যদান করে আমরা সভাকক্ষে গেলাম। সভাকক্ষটি করুণাডাক্তারের স্মরণে নির্মিত। মঞ্চের ওপব বসে আমি সমবেত জনতার দিকে তাকিয়েছিলাম। সবাই অচেনা। অনেকেই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়ে। বা, তাদেব মা-বাবা। নতুন অধিবাসী। দু'-চারজন পুরনো অধিবাসীর সঙ্গে দেখা হল, যাবা ছোট ছিল তখন, এখন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে। পুরনো আমলের কথা বলতে গিয়ে অমিয়বাবু বললেন, গ্রন্থাগাবের প্রথম আলমারিটি স্টেশন থেকে মাথায় করে যাঁবা এনেছিলেন, আমাদের প্রধান অতিথি তাঁদেব অন্যতম।

মঞ্চ থেকে নেমে আসতেই একটি বয়স্ক লোক আমায় প্রণাম করল। তার মাথা-ভরতি পাকা চুল।

বলল, আপনি চিনবেন না। আমি বকু। বসুধা আমার দিদি।

ওঃ বসুধা। সে কেমন আছে? কোথায় আছে?

বেহালায় ওর শ্বশুরবাড়ি। এই ক'দিন আগে ওর নাতির অন্নপ্রাশন হল।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকি।

আমার মনে পড়ে যায়, গ্রন্থাগাবের একটি বই ফেবত দিতে এসে বসুধা তার মধ্যে আমাকে একটি চিঠি দিয়েছিল। বইটি বাড়িতে আনার পর চিঠিখানা মায়ের চোখে পড়ে। মা তখন আমাকে আর ওকে দু'জনকেই আলাদাভাবে কড়কে দেয়। আমাদের মধুব সম্পর্কের সেখানেই ইতি। ওর মুখটাও মনে পড়ে না।

আজ মা নেই। আজ আমারও নাতির অন্নপ্রাশন হয়ে গেছে কিছুকাল আগে। বসুধার নাতি আমাব নাতি হলে কী ক্ষতি হত। কালস্রোতে সবাই তো শরৎকালেব মেঘের মতো ভেসে চলেছি আমরা। আমি মনে মনে ভাবি, একটা মধুর সম্পর্কের সম্ভাবনাকে মূলে আঘাত করে মা বোধহয় উচিত কাজ করেনি।

❀ বিজ্ঞাপনের বিরতি

এখন সুভদ্রর বয়েস বত্রিশ। সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সসম্মানে বি.টেক. পাশ করার পর দরখাস্ত না করেই চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। ছ'মাস যেতে-না-যেতে ওরা ওকে বদলি করে দিল ব্যাঙ্গালোরে। তথ্যপ্রযুক্তির কাজে ওটাই নাকি স্বর্গ। সেই স্বর্গে গিয়ে অনেক নতুন কাজ শিখেছে সুভদ্র কিন্তু হারিয়েছে মনের সন্তোষ। বছর দুয়েক পর অন্য একটা কাজ ধরে ফিরে এল কলকাতায়। ততদিনে দুই ভাইয়ের হাত ধরে ওর মা-ও চলে এসেছে কৃষ্ণনগর ছেড়ে কলকাতায়। ডোভার লেনে বাসা ভাড়া করেছে তিন হাজার টাকায়। এখন তো আর অর্থাভাব নেই আগেকার মতো।

বেশি দিন সুখ সইল না। ন'মাসের মাথায় ওরা বলল, প্রজেক্টের কাজে জার্মানি যেতে হবে। বার্লিন। বেশি দিনের জন্যে নয়। বছর দেড়েক। ওখানে থাকা-খাওয়া-যাতায়াত সমস্ত ব্যবস্থা ক্লায়েন্টের দায়িত্ব। তার ওপর ওরা নগদে দেবে দৈনিক পঞ্চাশ ডলার হাতখরচ। এখানকার মাইনে যথারীতি ব্যাঙ্কে জমা হতে থাকবে। সব মিলিয়ে অনেক টাকা।

তখনই প্রথম কথাটা উঠেছিল।

কাছেই থাকে সুভদ্রর বড়মাসি। সে যথেষ্ট ধনী। অ্যাটর্নির বউ। গেটওলা তিনতলা বাড়ি ওদের। মার্বেল পাথরের মেজে, সিঁড়ি। একসময় ওই বাড়ির সামনে সার দিয়ে মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত সন্ধেবেলা। নীচের তলার তিনখানা ঘর জুড়ে ছিল অ্যাটর্নি সাহেবের চেম্বার, টাইপিস্ট-কেরানিদের আপিসঘর। দেয়ালের র‍্যাকে থাক-বন্দি চামড়া-বাঁধানো আইনের বই। প্রথমবার হার্ট অ্যাটাকের পর চেম্বারে ঠান্ডা মেশিন বসানো হয়। চেম্বারের জানলায় ফ্রেম লাগিয়ে ঠাকুরদেবতার ছবি ও মূর্তি বসে। গৌতম বুদ্ধ থেকে শুরু করে সাঁইবাবা অবধি সকলেই আপন আপন মহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিদিন সকালে একজন পুরোহিত এসে সেই সব ছবি ও মূর্তির ওপর ফুল আর গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে যেত। এই ব্যাপারটা মক্কেলদেরও খুব প্রিয় ছিল। ওদের বিশ্বাস ছিল আটর্নি সাহেবের ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে। তাই যে রকম মামলাই হোক, তিনি জিতিয়ে দেবেন। এর ফলে হয়তো দায়িত্ব বেড়ে যায় তাঁর। তাই দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাকের পর তিনি আর বাঁচেননি। তখন তাঁর বয়েস মাত্র বাহান্ন।

মৃত্যুর আগে তিনি স্ত্রীকে বলে গিয়েছিলেন, শান্ত দেশে ফিরুক আর না ফিরুক, তোমাকে কখনও অর্থকষ্টে পড়তে হবে না। একতলাটা ভাড়া দিয়ে দিয়ো। সেই টাকায় মেরামত, দারোয়ান, কর্পোরেশন ট্যাক্স কুলিয়ে যাবে। আমার জন্যে সংসারে অনেক বাজে খরচ হয়। আমি যখন থাকব না, তখন সেগুলো বাদ যাবে। বড়মাসি তখন কেঁদেছিল কিন্তু পরে বুঝেছিল, কত মূল্যবান এইসব কথা। শান্ত পাঁচ বছরের জন্যে আমেরিকায় যায়। বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দেশেও আসে কিন্তু এক মাসের বেশি থাকে না। তারপর থেকে দু'বছর-তিনবছর পর পর একবার করে কিছুদিনের জন্যে মায়ের কাছে আসে। মাকে দেখে যায়। দুটি বাচ্চা নিয়ে ওর পাঞ্জাবি বউ এসেছিল একবার। এখন আর আসতে পারে না। শান্ত মাঝে মাঝে মাকে ডলার পাঠায়। ফোন করে নিয়মিত।

সুভদ্র শান্তদার চেয়ে এগারো বছরের ছোট। এখন সুভদ্রর বয়েস যদি বত্রিশ হয়, তবে শান্তদার বয়েস তেতাল্লিশ। ছোটবেলায় ওদের দু'জনের বন্ধুত্ব ছিল আত্মীয় হিসেবে কিন্তু তেমন হৃদ্যতা ছিল না। সুভদ্র কৃষ্ণনগর থেকে এসে বড়মাসির বাড়িতে থেকেছে অনেক বার। শান্তর ছিল ক্যামেরা কেনার বাতিক, মোটরগাড়ি চালাবার নেশা । শান্ত অল্প বয়েস থেকেই দামি সিগারেট খেত। গরিবের ছেলে সুভদ্রর এসব বরদাস্ত হত না। একবার ছবি তোলার লোভে শান্তদার ক্যামেরাটা একটু ব্যবহার করতে চায় সুভদ্র, তখন শান্ত বলেছিল, তুই আনাড়ি, ভেঙে ফেলবি। যখন নিজের ক্যামেরা হবে, তখন যত খুশি ছবি তুলিস। সুভদ্র মনস্থ করেছে, এবার জার্মানি গিয়ে প্রথমেই একটা দামি ক্যামেরা কিনবে।

বি.টেক পড়ার সময় প্রায় তিন বছর এক নাগাড়ে বড়মাসির বাড়িতে ছিল সুভদ্র। তখন ওই বিশাল গেটওলা বাড়ি প্রায় খাঁ খাঁ করছে।

অ্যাটর্নি সাহেবের কথামতো একতলাটা ভাড়া দিয়েছিল বড়মাসি ন'শো টাকায়। ছ'বছরে সে ভাড়া এক পয়সাও বাড়াতে পারেনি। এদিকে কর্পোরেশন ট্যাক্স বেড়ে গেছে। ইলেকট্রিক খরচ, টেলিফোন, গ্যাস হয়েছে দ্বিগুণ। নীচের ভাড়াটে আস্তে আস্তে সেখানে আপিস বসিয়ে দিল। এমন কথা তার সঙ্গে ছিল না। বাড়ির সামনে একটা বিশ্রী সাইনবোর্ড ঝুলতে লাগল। হাজার রকম উটকো লোকের আনাগোনা চলতে লাগল সারাদিন। কখনও কখনও অনেক রাত অবধি। বড়মাসি তখন ভাড়াটেকে উঠে যেতে বলে। সে একশো টাকা ভাড়া বাড়িয়ে তখনকার মতো স্থিতাবস্থা বজায় রাখে। শেষ অবধি মামলা করে তাকে তুলতে হয়েছে। স্বামীর বন্ধুস্থানীয় এক অ্যাটর্নি সাহায্য না করলে এ-কাজ সম্ভব হত না। খালি বাড়ি যখন হাতে পেল বড়মাসি, তখন দেখে, জানলা-দরোজা সব ভাঙা, মেজের পাথর তুলে ফেলা হয়েছে। নোংরা দেয়াল। সবক'টা কল থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে।

পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে সেই একতলা আবার ব্যবহারযোগ্য হবার পর বড়মাসি প্রতিজ্ঞা করে, আর নয়। দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল অনেক ভাল।

শূন্য গোয়ালের একখানা ঘরে থাকত সুভদ্র। নীচের তলার বড় বাথরুমটা ব্যবহার করত। ছোট

বাথরুমটা ছিল বাড়ির অধিবাসী তিনজন কাজের মেয়ের এক্তিয়ারে। তিনতলায় ওদের শোয়ার ব্যবস্থা রান্নাঘরের পাশে। দোতলায় খাবার টেবিল, মাসির নিজের ঘর আর একটা খালি ঘর শান্তদার জন্যে সাজিয়ে রাখা। যে কখনও ফিরবে না। রোজ ধোওয়া-মোছা হয় আর তারপর তালাবন্ধ থাকে।

ভাড়া না দিলেও নীচের তলায বড় ঘরটায় মাসি মাঝে মাঝে পেয়িং গেস্ট রাখত। দু'জন বসবাস করার মতো ফার্নিচার দিয়ে সাজানো সে ঘরখানা। খাট, আলমারি, পড়ার টেবিল, খাওয়ার টেবিল, একটা ছোট সোফা, খানকয়েক চেয়ার। বাথরুমটা ওই ঘরের লাগোয়া। বাইরে থেকেও তার একটা দরোজা ছিল। সুভদ্র থাকার সময় সেই ঘরে কয়েক মাস এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন অরুণা সেন নামের এক ভদ্রমহিলা। জাস্টিস সেনের মেয়ে। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর ডিভোর্স হওয়া পর্যন্ত ওখানে ছিলেন তিনি।

বেশিরভাগ সময় নিজের ঘরেই বন্দি—স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে থাকতেন অরুণা সেন। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস হবে তখন। সাজগোজ করলে পঁচিশ বছরের মতো দেখায়। সাজগোজ না করলে পঁয়তাল্লিশ। মাসির কাজের লোকেরা ওঁর ঘরে ব্রেকফাস্ট আর ডিনার দিয়ে আসত। হিল-তোলা জুতো পরে খুট খুট করে হাঁটতেন তিনি, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেন, যখনই টেলিফোন করার দরকার হত।

চেহারাটাও মনে পড়ে সুভদ্রর। মুখখানা সুশ্রী, মাথায় ঝাঁকড়া তিন-থাক করে কাটা পিঠ পর্যন্ত লম্বা চুল, শাড়ি পরতেন না, আঁটাসাঁটো ফ্রকে ওঁর নিতম্বদেশটি একটু অস্বাভাবিক রকম বড় মনে হত। শাড়িতে মেয়েদের শরীরের অনেক খুঁত ঢাকা পড়ে যায়। সাহেবি পোশাকে সেগুলিই প্রকট হয়ে ওঠে। হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পা দুটি একটু ফোলা ফোলা। নীরোম, চকচকে—যেন কাঠের পা। সব মিলিয়ে কৃত্রিম—এই একটি শব্দে সে-রূপের ব্যাখ্যা হয় না। বরং উপমা দিয়ে বললে, স্মরণ করিয়ে দেয় শেষের কবিতার কিটিকে। অমিতের সঙ্গে শেষপর্যন্ত যার বিয়ে হয়। লাবণ্যর সঙ্গে হয় না।

সুভদ্রর যেটা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে, তা হল সুগন্ধ। লোকে বলে গন্ধের স্মৃতি নাকি স্থায়ী হয় না। যেমনটি কিনা দৃশ্যের বা স্বাদের স্মৃতি হয়, আনন্দের কিংবা কষ্টের স্মৃতি হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে তত্ত্ব খাটছে না। অরুণা সেন যখন যে-পথ দিয়ে হেঁটে যেতেন, সে-পথ অনেকক্ষণ এক রকমের উগ্র সুগন্ধে ভরে থাকত। পোকা-মারার ওযুধ ছড়ালে যেমন হয়—দম-আটকে যাওয়ার মতো উগ্র সে গন্ধ। নিশ্চয় এক বা একাধিক কোনও বিদেশি প্রলেপের, পারফিউমের। মূল্যবান। এ-দেশে পাওয়াই যায় না। বড়লোকের মেয়ে-বউরাই ওইসব দামি জিনিস ব্যবহার করতে পারে। সুভদ্র ভাবত। তাই এত অপরিচিত এর ধাক্কা।

অরুণা সেনের স্বামী নিশ্চয় এই কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ করেনি। সে-ও এসবেই অভ্যস্ত। তা ছাড়া এই গন্ধ তো একদিক থেকে উত্তেজকও বটে। তা না হলে মেয়েরা ব্যবহার করবে কেন?

বম্বের কোম্পানি ফ্ল্যাটে একটাই মাত্র বেডরুম। তুই ভেবে দ্যাখ, সব সময় স্বামী স্ত্রীকে দেখছে, একসময় তো ফেডআপ হয়ে যাবেই।

হাসতে হাসতে মাসি বলেছিল সুভদ্রকে। আর কাকেই বা এই মজার কথাটা বলবে। তারপর সামলে নিয়ে বলেছিল, তুই ছেলেমানুষ, এসব বুঝবি না।

বোঝার কথাও নয়। এক ঘরে থাকলে নাকি স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তার মানে, ওদের আলাদা আলাদা ঘর থাকা উচিত ছিল। দরকারের সময় ওরা তৃতীয় একটি ঘরে গিয়ে মিলিত হবে। বাঃ! ব্যাপারটা একটু বেশি নবাবি হয়ে গেল না? দু'জনের জন্যে তিনটে বেডরুম। যে-দেশে একখানা ঘরে পাঁচজন লোক শোয়, অধিকাংশ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। ছেলেমেয়েদের পাশে নিয়ে মা-বাবা শোয় এক বিছানায়। তাদের বিচ্ছেদ হয় না। সুভদ্র ভাবে, বিচ্ছেদের অন্য কোনও কারণ আছে। যত ধনী পরিবার থেকেই আসুক অরুণা সেন, বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া করে থাকুক, ব্রিটিশ আদবকায়দা রপ্ত করে থাকুক, এতখানি বিলাসিতা অবিশ্বাস্য।

পরে অবশ্য জার্মানিতে গিয়ে ও-দেশের লোকের জীবনযাপন স্বচক্ষে দেখে এসেছে।

এক বাড়িতে, প্রায় পাশাপাশি ঘরে দিনের-পর-দিন বসবাস করলেও অরুণা সেন সুভদ্রকে মানুষ বলে গণ্য করত না। অথচ দু'জনেই আশ্রিত। ও হয়তো কিছু টাকা দেয় মাসিকে, তাতে কী? ওর বর তো তাড়িয়ে দিয়েছে ওকে, ওর তো যাবার আর কোনও জায়গা নেই। তাই না এখানে এসেছে। কোথায় ও সুভদ্রর থেকে আলাদা? সুভদ্রও ওদিক ঘেঁষত না। কেবল কমন বাথরুম নিয়ে একটু সমস্যা ছিল।

তবে অরুণা সকাল ন'টার আগে ঘুম থেকে উঠতেন না। তার অনেক আগেই বাথরুমের কাজ সেরে ফেলত সুভদ্র। তারপর, দিনের বেশিরভাগ সময় তো কলেজে। কখনও এ নিয়ে সংঘাত হয়নি। ওঁর ব্যবহারের কোনও জিনিস অরুণা বাথরুমে রাখতেন না। একটা বড় তোয়ালে ছাড়া। ওঁর শোবার ঘরেই ছিল একটা প্রকাণ্ড তিনআয়নাওলা ড্রেসিং টেবিল।

তবু দুর্ঘটনাটা ঘটল একদিন।

সাজানো ব্রেকফাস্টের ট্রে। তার ওপর থরে থরে চিনেমাটির পাত্র। ওপরে ঢাকনা। মাসি বলল, বাবা, এটা একটু নীচে দিয়ে আসবি? কাজের মেয়েটা আসেনি।

কিছু না ভেবেই সুভদ্র বলল, ঠিক আছে। কী আর এমন শক্ত কাজ।

দোষের মধ্যে, ও অরুণার দরোজায় টোকা দেয়নি। দু'হাত জোড়া, তাই টোকা না দিয়েই দরোজা ঠেলে ঢুকে পড়েছিল। বিহ্বলতা কেটে যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করেছিল, এটা কোথায় রাখব?

অন্যদিন একজন কাজের মেয়ে আসে। তাকেও মানুষের মধ্যে গণ্য করেন না অরুণা। সেদিন একজন শার্ট-প্যান্ট-পরা যুবক ট্রে-হাতে দরোজার মুখে দাঁড়ানো। যাকে উনি চেনেন না, এমন নয়। অরুণা তখন বিছানার ওপর উবু-হয়ে-বসা এক বেঢপ শরীরের মহিলা। গায়ে একটা পাতলা গোলাপি রঙের সেমিজ।

তাঁর অবিন্যস্ত চুল মুখের চারদিকে ছড়ানো। কিছু কাঁচা কিছু পাকা। রং-ওঠা একটা সাদা মুখ। চোখের ওপর ভুরু নেই, ঠোঁটে লিপস্টিক নেই। গাল ঝুলে গেছে। খোলা হাত দুটোর নীচে থেকে ওপর অবধি এক গাছি লোম নেই। চোখদুটোর চারিদিকে কাজলের কালো লেপটে রয়েছে, যেন পেঁচার চোখ, ফুলকপির মতো মুখ। একটা অভিব্যক্তিহীন মাংসপিণ্ড। ঘরের চারদিকে ছাড়া-পোশাক ছড়ানো। এখানে-ওখানে নানা রঙের শিশি আর কৌটো। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে বনবন করে। আর, যা সবচেয়ে উৎকট, ঘরময় সেই অপরিচিত সুগন্ধ যা সঙ্গে সঙ্গে শেষের কবিতার কিটিকে মনে পড়ায়। আর অমিত রায়ের জন্য দুঃখ হয়।

সেই দিনের বিহ্বলতা, আকস্মিকতা, জীবনে প্রথম একজন যুবতীকে এত কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা মনে আছে সুভদ্রর। আর কিছু মনে নেই আজ। অরুণা কি রাগ করেছিলেন? অরুণা কি ছুটে বাথরুমে ঢুকে গিয়েছিলেন? অরুণা কি হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন? কিছুই মনে পড়ে না। ওই বীভৎস দৃশ্যের ওপরে যাকে বলে ড্রপসিন, তাই পড়ে গেছে।

সেবার দেড় বছর জার্মানিতে থেকে প্রজেক্টের কাজ শেষ করে ফিরে এসেছিল সুভদ্র। কথা উঠেছিল, ওকে বিয়ে দিয়ে পাঠাও। বিদেশ বলে কথা। ওসব দেশে মেয়েরা অবিবাহিত ছেলে দেখলে তার ওপর নাকি ঝাঁপিয়ে পড়ে। বড়মাসিই চাপ দিয়েছিল বেশি। সুভদ্র রাজি হয়নি। ফিরে এসে বলেছিল, এত কাজেব চাপ, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করার সময় পেলাম কখন। ছুটি পেলেই ঘুমোতাম।

এখন, ওর বত্রিশ বছর বয়েসে, আবার এক বছরের জন্যে বিদেশে যাবার কথা উঠেছে। এবার আমেরিকা। সুভদ্রর মা এবার আর ছাড়তে রাজি নয়।

সুভদ্র বলে, তোমরা দেখেশুনে ঠিক করো। আমাকে একবার দেখিয়ো কথা দেবার আগে। ওর পছন্দের কোনও বান্ধবী নেই। সে-কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

কাছাকাছি দুই বোনের বাড়ি এখন। মা আর বড়মাসি মিলে মনের আনন্দে পাত্রী দেখে বেড়াচ্ছে। ভাল রকম রোজগার করে ছেলে। বার বার বিদেশ যায়। ওর চাহিদা খুব বিয়ের বাজারে। কিন্তু উপযুক্ত মেয়ে পাওয়া সহজ নয়।এমন মেয়ে, যে কিনা সুভদ্রর যথার্থ সঙ্গিনী হতে পারবে। সুশ্রী, শিক্ষিতা, সপ্রতিভ, আকর্ষণীয়া। সচ্ছল পরিবারের পছন্দসই পাত্রী বেছে বেছে ওরা সুভদ্রর সামনে হাজির করে।

আজকাল রেওয়াজ হয়েছে, একটা পর্যায়ের পর পাত্রপাত্রী নিজেরা আলাদাভাবে কথাবার্তা বলবে, কিছুদিন মেলামেশা করে বুঝবে ওরা পরস্পরের পরিপূরক কিনা, ওদের বনিবনা হবে কিনা। একজন অপরজনকে পছন্দ করতে পারছে কিনা। জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার ব্যাপার খুব সহজ নয়।

কিন্তু পর পর তিন জনকে খারিজ করে দিল সুভদ্র। তাদের কোনও খুঁত ছিল না। সাজগোজ করলে সুন্দরী বলেই মনে হয়। আধুনিক চালচলন তাদের রপ্ত। গড়গড় করে ইংরেজি বলতে পারে। কোথায় যে আটকাচ্ছে কেউ বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করলে সুভদ্র বলে, চলবে না, ব্যস।

শেষ যে মেয়েটিকে নির্বাচন করল ওরা, সে সুস্মিতা। এক মিশনারি কলেজে শিক্ষকতা করে। তিন বোনের মধ্যে সে-ই বড়। অন্য দু'জন পড়াশোনা করছে এখনও। ওদের বাড়ির অবস্থা ভাল, যদিও সুস্মিতার বাবা ধনী নন।

ঠিক হল, এক রবিবার সুভদ্র আর সুস্মিতা নন্দনে সিনেমা দেখবে, তারপর পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে কোথাও নিরিবিলি জায়গায় চিনে খাবার খাবে। তখনই কথা হবে না হয়।

শনিবার সকালে সুভদ্র কী ভেবে নিজেই সুস্মিতাকে ফোন করল। জিজ্ঞেস করল, আমাদের দেখা হওয়াটা একদিন এগিয়ে আনা যায়?

কিন্তু এদিকে যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

কী এমন ব্যবস্থা যে বদলানো যায় না? তুমি আজ বিকেলে ফ্রি আছ কিনা, সেটাই জানতে চাইছি।

সুস্মিতা বলল, পাঁচটাব পর ফ্রি হব। কলেজে মিটিং আছে। কিন্তু ওই অবস্থায়, একটু ফ্রেশ না হয়ে, কি হবু বরের সঙ্গে দেখা করা উচিত হবে? মাকে জিজ্ঞেস করি।

সুভদ্র বলল, মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। এমনকী, ব্যবস্থার যে পরিবর্তন হল, সেটাও মাকে জানাবাব দরকার নেই। পাঁচটায় আমি তোমায় কলেজ থেকে তুলে নেব। আটটায় বাড়িতে পৌঁছে দেব, কেমন? আমাব নিজের তো গাড়ি নেই। একটা গাড়ি ভাড়া করব। ঘুরব কিছুক্ষণ, কথা বলব। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার সঙ্গে কারও থাকারও দরকার নেই।

সুস্মিতা বলল, গাড়ি কী হবে। আমবা তো মেট্রোতেও ঘুবতে পারি। মাঝে মাঝে নেমে পেপসি খাব, চিপস খাব।

কথাটা পছন্দ হল সুভদ্রর।

তার ফলে আজ ওরা অনেকক্ষণ ধরে মেট্রোর দক্ষিণ থেকে উত্তরে, আবার উত্তর থেকে দক্ষিণে, ঘুরে বেড়িয়েছে। মাঝে মাঝে নেমে সিঁড়িতে বসেছে।

একটা লন্ড্রি থেকে পালিশ-কবা শাড়ি ব্যাগে নিয়েছিল সুস্মিতা। কলেজ থেকে বেরোবাব সময় তাই শাড়িটা বদলাতে পারল। মুখে সাবান দিল বাথরুমে গিয়ে। একটু ঘাড়ে-গলায় পাউডার। ব্যস। পারফিউমের শিশিটা আনা হয়নি। ওকে খানিকটা বেপরোয়া দেখাচ্ছিল সেই সময়। যা হবাব তা হবে। বিয়ের জন্য ও খুব ব্যাকুল নয়।

সুস্মিতার বয়েস ছাব্বিশ। সুভদ্রর চেয়ে ছ'বছরের ছোট।

বেলের কামরায় দু'জন পাশাপাশি বসে আছে। শনিবার সাড়ে পাঁচটায় তেমন ভিড় নেই আজ।

সুস্মিতার পরনে তাঁতের ডুরে শাড়ি। গুছিয়ে খোঁপা না বাঁধলেও বোঝা যায়, মাথায় অনেক চুল। যত্ন আছে কিন্তু জৌলুস নেই। দু'হাতে দু'গাছা চুড়ি। কানে সোনার টপ। নাকের বাঁদিকে একটা সবুজ পাথর দেওয়া নাকছাবি। কালো রঙেব ব্লাউজের হাতা কনুই অবধি নামানো। তাব নীচে কবজি অবধি ফবসা চামড়ার ওপব লালচে হালকা লোম। হাতের আঙুলে একটাও আংটি নেই। কিন্তু হাতেব নখ সুন্দর করে কাটা। এটা বোধহয় শিক্ষায়তনের নিয়ম। কিন্তু নখের পিংক রংটা স্বাস্থ্য।

ওরা নানা বিষয়ে কথা বলছে।

সুভদ্র একসময় সুস্মিতাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আজকে তোমাকে সাজতে দিলাম না।

সুস্মিতা বলল, কেন, আমি তো সেজেছি। এই যে ভাঁজ-ভাঙা কাপড়টা পরে এলাম। আর এই নাকছাবি।

তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

সুভদ্র ওই কামরার মধ্যে বসেই সুস্মিতার ছড়ানো আঁচলের একটা প্রান্ত তুলে নিয়ে নিজের নাকের কাছে ধরে।

তারপর বলে, আঃ, কী সুন্দর ধোপার বাড়ির গন্ধ। ন্যাপথলিন, কাচা কাপড়ের এই গন্ধ আমার খুব প্রিয়।

সুস্মিতা বলল, মাঝে মাঝে আমি পারফিউমও মাখি। আজ মাখা হয়নি।

পকেট থেকে একটা ক্যাডবেরির ফালি বার করল সুভদ্র। রাংতার মোড়ক খুলে আধখানা ভেঙে সুস্মিতাকে দিল। বলল, এইটুকু এখন খাও, তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়। বাকি আধখানা নিজে দাঁত দিয়ে ভাঙল। জিজ্ঞেস করল, কোথায় এলাম?

পার্ক স্ট্রিট।
নামবে?
আর একটু ঘুরি। ভাল লাগছে।
বলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, বান্ধবীদের নিয়ে আপনি বোধহয় ক্লাবটাবে যান। আজ বাধ্য হয়ে মেট্রোয় চড়তে হল।
সুভদ্র বলল, আমার কোনও বান্ধবী নেই। অথচ যেখানে চাকরি করি সেখানে অনেক মেয়ে আমার সহকর্মী। ওদের কাছে যাওয়া যায় না। এত বড় বড় নখ। এত উগ্র পারফিউম। আচ্ছা, মেয়েরা শরীরে এত গন্ধ মাখে কেন বলো তো! শরীরের নিজস্ব একটা গন্ধ তো আছে। সেটা ঢাকতে। বিদেশেও দেখেছি, স্বাভাবিক যে রূপ, তার ওপর কত রঙের প্রলেপ, কত কারিকুরি । পুতুল পুতুল।
এসবে আপনার অ্যালার্জি কেন? লোকেদের তো ভালই লাগে।
সুভদ্র একবার ভাবল, অরুণা সেনের গল্পটা সুস্মিতাকে শুনিয়ে দেবে। মাথার মধ্যে গেঁথে-থাকা একটা স্মৃতি। তবে এখানে নয়। ওপরে উঠে। কফি খেতে খেতে। তারপর ভাবল, না, আজ নয়। ওই গল্প বলার অনেক সময় পাওয়া যাবে জীবনে।

ছাগল

সতেরো বছর আগে বিষ্ণুর সঙ্গে যখন ওর বিয়ে হয়, তখন মৌলী ভেবেছিল, এর পরের জীবন সুখে ভরপুর হবে। জীবনের প্রথম বাইশটা বছর তো শরীরটা পুষ্ট করে সুখের জন্য তৈরি করতেই কেটে গেল। কিন্তু সুখের দিন যদি না আসে বা আসতে দেরি করে, তখন যাতে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যায়, মায়ের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যাতে ধরে রাখা যায় জীবন, সেই কথা ভেবে লেখাপড়াও যথেষ্ট শেখা হয়ে গেছে, গানের ডিপ্লোমা এসে গেছে হাতে, চাকরি না জুটলেও ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে উপার্জনও মন্দ হচ্ছিল না। মৌলী আয়নায় নিজের মুখ দেখত বার বার। ঠোঁট বাঁকিয়ে নানা ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করত। হাত তুলে খোঁপা ঠিক করতে গিয়ে লক্ষ করত বুকের পেশি কতখানি উন্নত হচ্ছে। মানে আকর্ষণী শক্তি বজায় আছে কিনা।
বিয়ের আগে ঠোঁটে চুমো খেয়ে বিষ্ণুই জাগিয়েছিল ওর মনে সুখের প্রত্যাশা। আবার বিষ্ণুই বলেছিল, দেখো আমার চাকরিটা টেম্পোরারি, যদি কখনও গাছতলায় দাঁড়াতে হয়, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে তো? ভেঙে পড়বে না? মৌলী বলেছিল, তোমার পাশে থাকতেই আমার সুখ। সুখ মানে কী, কী কী জিনিস পেলে মানুষ সুখী হয়, সে বিষয়ে মৌলীর কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না।
তারপর সতেরো বছরের নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্যজীবন। কোথা দিয়ে কেটে গেছে টের পায়নি মৌলী। মাথা ধরা না থাকলে যেমন মাথা ধরা না-থাকার কথা মনে রাখে না মানুষ।
বারো বছরের ছেলে রাজু স্কুল থেকে জ্বর নিয়ে ফিরল। তখনও ওর চটক ভাঙেনি। বিষ্ণু ডাক্তার ডেকে আনল, তিনি যথারীতি অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন। ঠিকঠাক নিয়মে বিষ্ণু আট বছরের মেয়ে শানুকে নিয়ে পাশের ঘরে শুতে গেল রাত্রে। ওদের শোবার ঘরে মৌলী রইল ছেলের পাশে। পরের দিন সকালে দেখা গেল রাজুর জ্বর খানিকটা নেমেছে। পুরো ওষুধ খাওয়া শেষ হলে সবটাই নেমে যাবে। ডাক্তারবাবু আশ্বাস দিয়েছেন।
বিছানার ওপর পেছনের বালিশে ঠেশ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে রাজু। গায়ে গেঞ্জি। পা দুটো চাদরে ঢাকা। দুধ আর বিস্কুট খাচ্ছে। মৌলী বিছানার অন্য প্রান্তে বসা। শানুকে তুলে নিয়ে গেছে স্কুলের বাস অনেক

আগেই। বিষ্ণু আপিসে বেরোবার আগে ছেলের পাশে এসে দাঁড়াল। তখনই রাজু নালিশটা জানাল।

বলল, কাল রাত্তিরে জলতেষ্টা পেয়েছে, কতবার ডাকলাম তোমাকে মা, তুমি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতেই থাকলে।

মৌলীর চটক ভাঙল যখন বিষ্ণু ছেলেকে বকে উঠল, ঘুমোবে না তো কি সারারাত জেগে থাকবে? তুমি উঠে জল খেলেই পারতে। ওই তো কাছেই।

রাজু কিছু বলল না। মৌলী উঠে গেল বাথরুমের দিকে। যেতে যেতে পেছন ফিরে তাকাল একবার। দেখল, বিছানায় বসে আছে এক অপরিচিত বালক আর তার পাশে দাঁড়ানো একজন পুরনো অভ্যস্ত পুরুষমানুষ। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চোখে চশমা। একটু কুঁজো।

এরা কারা? ওব মনে হয়েছিল প্রথমে। সতেরো বছর ধরে আমি এদের জন্যে জীবন ক্ষয় করলাম কেন। ভাবতে ভাবতে মনটা নিজের দিকে গুটিয়ে এল মাদুরের মতো। তারপর সেই মোক্ষম কথাটা মনে হল বহুদিন পর—এই প্রথমবার। কী সুখ পেয়েছি জীবনে।

বোঝা যায় একটা পরদা ছিঁড়ে গেছে।

সেই থেকে মৌলী অসুখী। ও কেবল হিসেব কষে। কী দিয়েছি। কী পেয়েছি তার বদলে। এতদিন কি আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। যোগের চেয়ে বিয়োগ বেশি হয়ে যায়। একতলার উঠোনে কাপড় মেলতে গিয়ে ও বার বার ফিরে তাকায়—এই যে দু'খানা ঘর, বারান্দা, একটা ময়লা রান্নাঘর, কড়াই, ডেকচি, খুন্তি, সাঁড়াশি, সন্তানের নামে দুটো আগ্রাসী পোকা,—বিষ্ণু, এইটুকুই কি আমার প্রাপ্য ছিল? তোমাদের কাছ থেকে? না, তোমরা আমাকে নানা ছলে-বলে এতদিন ঠকিয়েছ? নাকি, তখনই, সেই সতেরো বছর আগে, সব জেনেশুনে আমায় ফুসলিয়ে এনেছিলে?

কতদিন থেকে বলছি। একটা কালার টিভি। এখনও কিনে দেবাব সামর্থ্য হল না তোমাব। তোমার চাকরি তো বহুকাল হল পাকা হয়ে গেছে। বছর বছর তোমার মাইনে বাড়ে। গাছতলায় দাঁড়াবার ভয় দেখিয়ো না, বিষ্ণু। তুমি স্বার্থপর। আমার উপার্জন করার ক্ষমতা তুমি কেড়ে নিয়েছ। এই চক্রে না ঢুকলে আজ আমি—

বলতে গিয়ে ওর মনে পড়ে প্রতিবেশী জয়িতার কথা। গলির মোড়ে অধ্যাপক হাজরার কথা। খুড়তুতো বোন বাঁশরির কথা। ওরা সবাই কত সুখী।

একটা ছোট্ট ঘটনা। অসুস্থ ছেলের পাশে শুয়ে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে থাকেনি সারারাত। মা তো মানুষ নয়, মা কেন জেগে থেকে ছেলের শুশ্রূষা করবে না? এই সংসারের সমস্ত ঝক্কি মা একা কেন বহন করবে না? সকলের এই দাবি। এতকাল মুখ বুজে এই দাবি মিটিয়ে এসেছে মৌলী। এই ছোট্ট ঘটনা ওর চোখ খুলে দিল। সমবেদনা জানিয়ে বিষ্ণু ধরিয়ে না দিলে ও লক্ষই করত না হয়তো। ছেলের বকুনি চুপ করে হজম করত।

একদিন আফিস যাওয়ার সময় ব্যাগে টিফিনের কৌটো ভরতে গিয়ে বিষ্ণু রাগ করল। রোজ একই জিনিস দাও, খেতে ভাল লাগে না। রুটি চামড়ার মতো শক্ত হয়ে যায়।

আমি তার কী করব? মৌলীও ফুঁসে ওঠে।—সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে মেয়েকে রেডি করব, তোমাদের মাছের ঝোল ভাত রান্না করব, খেতে দেব, সঙ্গে টিফিন দেব দু'জনকে, তার মধ্যে আবার বৈচিত্র্য চাই। কত আবদার!

বিষ্ণু বলে, পোলাও কালিয়া চাইছি না। একটু বদলে বদলে—ধরো একদিন পরোটা দিলে, একদিন চাট, একদিন স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিলে। দরকার কল্পনাশক্তি, সেটাই তোমার নেই।

আর কী কী নেই? রূপ নেই, যৌবন নেই, কর্মক্ষমতা নেই। সব ছিল। তোমাদের ভোগে লেগে শেষ হয়ে গেছে। এবার আমাকে ফেলে দাও।

আর কথা বাড়ায় না বিষ্ণু। জুতো জোড়ায় পা গলিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

আপিসে কাজের মধ্যেও মনটা খচখচ করতে থাকে। আমাকে ফেলে দাও।—বলার সময় মৌলীর গলা কেঁপে গিয়েছিল। বিষ্ণুর মনে হয়, সত্যি, মৌলির দিকটাও ভাবা দরকার।

ক্যান্টিনে টেবিলের উলটো দিকে বসে সরোজ মিত্র। অভিজ্ঞ লোক। সে-ও আপিসের খাবার খায় না। টিফিন আনে। সে বলে, ওই চিকেনকারি-রাইস, কি লুচি-আলুর দম, ওসব ছেলেমানুষদের খাদ্য। যাদের গ্যাসট্রিক প্রব্লেম নেই।

বিষ্ণু তার কাছে নিজের প্রব্লেমের কথা বলে।

সরোজ মিত্র বলল, সমস্যাটা মনের। বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না। বছর দুই হল, আমি তো একটা রান্নার লোক রেখে দিয়েছি। বউকে বুঝতে দেওয়া দরকার যে, আমিও তোমার কথা ভাবি।

খরচ। ঠিকে হলেও মাসে তিনশো টাকা।

সিগারেট খাওয়া কমিয়ে ওটা বার করতে হবে।

বিষ্ণু জিজ্ঞেস করে, তাতেও কি শান্তি আসবে? সুখ?

সুখ? সরোজ মিত্র হো হো করে হেসে উঠল হঠাৎ। এত হাসার কী হয়েছে বিষ্ণু বুঝে পায় না।

সুখ কী জিনিস আমি জানি না ভাই। শান্তি—হ্যাঁ, শান্তি হল অশান্তির অনুপস্থিতি। অশান্তিব বীজ দেখলে আমি সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলি। জীবন হল একটা ফাটা রবারের বল, একদিক ঠিক করো, আর একদিক চুপসে যাবে।

মৌলী কিন্তু এ রকম ছিল না। হঠাৎ একটা ছোট্ট ঘটনায়—

অভিজ্ঞ লোক এবারও ওর কথা কাটল। বলল, ঘটনাটা কাকতালীয়। এই সমস্যা হতই। আজ না হয় কাল। এর মূলে আছে জীবনের একঘেয়েমি। কত বয়স হল তোমার গিন্নির?

চল্লিশটল্লিশ।

ভোগাবে। খুব সাবধানে এখন ব্যাট করতে হবে। ছোট ছোট স্ট্রোক। এক রান, দু'-রান করে যতদিন চলে।

ইঙ্গিতটা মোটামুটি বুঝল বিষ্ণু। সে-ও ঘোরেব মধ্যে ছিল এতদিন। সেই প্রথম যেদিন চুমু খেয়েছিল মৌলীর ঠোঁটে; অনভ্যস্ত; বুকের ওপর চেপে ধরেছিল ওর চুলের সুগন্ধসুদ্ধ মাথাটা, মৌলী বলে উঠেছিল, ছাড়ো ছাড়ো দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কী ভয় তখন, কেউ দেখে ফেলল বুঝি। সেই আবেগ ক্রমশ সহজ হয়ে গেছে বিবাহিত জীবনে, তবু ঘোর কাটেনি। এখন বুঝতে পারে, সবটাই ছিল একতরফা। মৌলীর দিক থেকেও একতরফা। আদানপ্রদানের কথা মনে হয়নি। এখন থেকে ভাবতে হবে। খুব সাবধানে ব্যাট করতে হবে, বলল সরোজ মিত্র, অভিজ্ঞ লোক।

রান্নার ঠিকে মেয়ে নিযুক্ত হবার পর সুখ না হোক, কিছুটা স্বস্তি এসেছে সংসারে। অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেছে মৌলীর। উপরন্তু একজন কাজের লোকের ওপর তদারকি করতে পারছে। কর্তৃত্বের অভাব নিয়ে যে বেদনা জমছিল ওর মনে সেটা কেটেছে। ছেলেমেয়ের সংসারে একটু অবসর এসেছে। তবু মৌলী ছটফট করে। এত সময় নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না। শেষকালে শানুর টিউটর ছাড়িয়ে দিয়ে মৌলী মেয়েকে পড়াতে শুরু করল নিজেই।

কোনও কারণ নেই, তবু নিজের ওপরেও রাগ হয় মাঝে মাঝে। সেই রাগ দ্রুত চালান করে দেয় ছেলেমেয়েদের ওপর। স্বামীর ওপর তত নয়। তার একটা কারণ, প্রায়ই মৌলী বিছানায় শুয়ে স্বামীকে হতাশ করছে। গা থেকে হাত সরিয়ে দিচ্ছে বিষ্ণুর। যে-মানুষ একসময় নিজে এগিয়ে আসত, জিজ্ঞেস করত, কী গো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? এইখানটা একটু হাত বুলিয়ে দাও না, টনটন করছে, সে-ই এখন বলে বিরক্ত কোরো না, ভাল লাগে না রোজ রোজ এই এক ঢং।

ঢং আবার কী!

ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। বুঝতে পারে সব।

ওরা তো অন্য ঘরে।

তা হলেও।

বলো, তোমার ইচ্ছে নেই।

আসলে তাই। কিন্তু মেয়ে হয়ে কী করে এ-কথা স্বীকার করে মৌলী। কোনওদিন হয়তো মৃদুভাবে বলে, ব্যথা লাগে। বিষ্ণু বোঝে। বুঝতে চেষ্টা করে। হাল ছেড়ে দেয়। সরোজ মিত্রর হুঁশিয়ারি মনে পড়ে ওর। আবার ভাবে সম্ভোগ শেষের এইভাবেই কি আরম্ভ? সামনে অনেকখানি জীবন পড়ে আছে যে।

শানু আর রাজু বাবা-মায়ের সম্পর্ক নিয়ে এত জটিলতার অর্থ বোঝে না। কিছুটা সহ্য করে। প্রতিবাদও করে ওঠে মাঝে মাঝে।

তোমার কী হয়েছে বলো তো মা? গরম লাগছে আমার, আর তুমি বলছ পাখা বন্ধ করো?

আমার শীত করে। মেয়েকে পড়াতে বসে মৌলী বলে।

তুমি তা হলে গায়ে চাদর মুড়ি দাও।

তোমার ঠান্ডা লাগবে। জ্বর হবে। তখন আমাকেই ভুগতে হবে। বাবা তো আপিসে গিয়েই মুক্ত। সংসারের সব ঝামেলা আমার ঘাড়ে।

শানু বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, তুমি যাও, আমি একাই পড়া তৈরি করছি।

টিভি দেখা নিয়েও রোজ রোজ অশান্তি। ছেলেমেয়ে মায়ের কথা শোনে না। কথায় কথায় তর্ক কবে।

এরই মধ্যে একদিন বাড়িতে কালার টিভি এল। বিষ্ণু ধন্দে ছিল, এ নিয়ে আবার অপ্রীতিকর কিছু না ঘটে। দেখল, না, সবাই খুশি। এই একটা ব্যাপারে বাড়ির সকলের মুখে হাসি ফুটেছে। আর, কী সুন্দর সব রং, কতগুলো চ্যানেল। রিমোট কন্ট্রোল টিপে টিপে চ্যানেল বদলানো। তার মজাই আলাদা।

মেয়েদের কোনও বন্ধু হয় না মাঝখানে পুরুষ না থাকলে। তবু এর মধ্যে একদিন বিকেলবেলা মৌলী দু'জনকে চা খাবার নেমন্তন্ন করে বসল। একজন জয়িতা, ওদের প্রতিবেশী। তিনখানা বাড়ি পরেই থাকে। মৌলীব সহপাঠী ছিল স্কুলে। জাহাজের ইঞ্জিনিয়াবের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। স্বামী বছরের মধ্যে আট মাস বাইরে থাকে। দু'টি পুত্র নিয়ে জয়িতা থাকে একলা। ওর এক দেওর আছে, সে মাঝে মাঝে এসে কয়েকদিন করে থেকে যায়। ওদের দোতলার ঘব থেকে হঠাৎ যখন প্রখর আলোব দ্যুতি দেখা যায় রাত্রে, শোনা যায় উদ্দাম ইংরেজি গানের হল্লা, তখন বোঝা যায়, জয়িতার স্বামী জাহাজ থেকে নেমে ছুটিতে বাড়ি এসেছেন। এখন চার মাস ও-বাড়িতে উৎসব চলবে। স্বামী অনুপস্থিত থাকলেও জয়িতা সুখী। ওব অনেক টাকা। ওর নিত্যনতুন শাড়ি। ওদের একটা গাড়িও আছে। ওর ছেলেবা সেই গাড়ি চড়ে স্কুলে যায়। সেই গাড়ির ড্রাইভাব জয়িতার বাজার করে দেয়। জয়িতা নিজে রান্না কবে না। একজন মাঝবয়সি মহিলা আছে, সে-ই সব কাজ করে বাড়ির। মৌলীর মতে, জয়িতা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুবে বেড়ায়। একটু মোটা হলেও জয়িতাব শবীবে চটক আছে। দামি শাড়ি পরলে ওকে সুন্দর দেখায়। জয়িতা সিঁথিতে সিঁদুর পরে না, কপালে বড় কবে টিপ পবে। সিঁদুরে নাকি চুল উঠে যায়। যদিও ওব চুল ঘাড় অবধি ছাঁটা। মেমসাহেব।

আর একজন ওর খুড়তুতো বোন বাঁশবি। সে থাকে চেতলায়। আপিসে চাকবি কবে। অনেক টাকা মাইনে। কথায় কথায় ওকে বরের কাছে হাত পাততে হয় না। সংসাবে মাথা উঁচু করে থাকে বাঁশবি। ঘুবে ঘুরে শাড়ি কেনে । প্রত্যেক বছর ওর উকিল স্বামী আর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে ছুটিতে বেড়াতে যায় দূরে কোথাও-না-কোথাও। ওরা আবার লেক ক্লাবের মেম্বার। মৌলী কখনও লেক ক্লাবে যায়নি। মৌলীর একটাও কাঞ্জিভরম শাড়ি নেই। টেলিফোনে বাঁশরি বলল, সামনের মাসে ওরা ভাড়াবাড়ি ছেড়ে নিজেদের ফ্ল্যাটে শিফট করবে। সেই ফ্ল্যাটের তিন-তিনটে শোবার ঘর। প্রত্যেক ঘরের মেঝে মার্বেল পাথর দেওয়া। বান্নাঘবে, বাথরুমে টাইল। সত্যি, বাঁশরির মতো সুখী মেয়ে হয় না।

বিকেল চারটে নাগাদ ওরা এক-এক করে এল। জয়িতা ঢুকতেই ছোট্ট বসাব ঘরখানা বিলেতি পারফিউমের সুগন্ধে ভবে যায়। বাড়িতে তখন কেউ নেই। কেবল রান্নার মেয়েটিকে আটকে রেখেছে মৌলী। চা-জলখাবার দেবার জন্যে। ও লুচি ভাজবে। মাছের চপ বানাবে। ওরা দু'জনেই হাতে একগোছা করে ফুল নিয়ে এসেছে। ফুলদানিতে বিষ্ণুর আনা রজনীগন্ধা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল মৌলী। সেগুলো ফেলে দিল। তার বদলে বসিয়ে দিল রঙিন ফুলের গুচ্ছ। ঘরটা ঝলমল কবে উঠল ফুলেব আর মানুষের শোভায়।

প্রথম পর্বে তিনজনের আলাপসালাপ চলছিল স্তিমিত গতিতে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধনদৌলত আর স্বামী সন্তান নিয়ে গর্ব করছিল।

বাঁশরি বলে, আমার কর্তাকে নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই ভাই। আলুভাতে-ভাত দাও, তাই খেয়ে কোর্টে চলে যায়। ও যখন ফেরে, আমি বাড়িতে থাকি না, নিজে নিজে চা করে খায়। আমার মেয়েটা আমাকে যা ভালবাসে না, কী বলব। একটু মাথা ধরলে অমনি জড়িয়ে ধরবে, মা, তুমি শোও, আমি তোমার মাথা টিপে দিই।

জয়িতা বলে, উনি থাকেন না, তখন একরকম। ছুটিতে এলে সেই তিন-চার মাস এক মিনিট কাছ-ছাড়া করবেন না। গাদা গাদা উপহার নিয়ে আসেন আমার জন্যে। ছেলেদের জন্যে। যত বলি, এত কেন, এসবের দরকার নেই। কে-কার কথা শোনে।

মৌলী বলতে চায় ওর নিজস্ব সুখের কথা । কিন্তু বলার মতো কিছু খুঁজে পায় না। একবার শুধু মৃদুভাবে

বলতে পারল, এই দেখো না, কথা নেই বার্তা নেই, বিষ্ণু সেদিন এই কালার টিভিখানা নিয়ে এল। বলল, তোমার জন্মদিনের উপহার। আমি বলি, কী দরকার ছিল এত টাকা খরচ করার। ছেলেমেয়ের মাথা খাওয়া। ও বলে, ভালবেসে আনলাম, একটু খুশি হও।

বাঁশরি আর জয়িতা দু'জনেই প্রায় সমস্বরে বলে, এটা বুঝি নতুন? ও-মা, তাই তো। আমাদের কালার টিভি কবে এসেছে।

হারতে হারতে একসময় মৌলীই তার দুঃখের কথা বলতে শুরু করে। ততক্ষণে আলাপের গতি অনেক বেড়ে গেছে।

দুঃখের বৃত্তান্ত একবার শুরু হলে তিনজনের কারুর কথাই আর শেষ হতে চায় না। কথার পিঠে কথা এসে পড়ে। কীভাবে আলাপ শুরু হয়েছিল, মনে থাকে না কারুর। একসময় দেখা গেল, তিনজনেরই চোখে জল। সব গোপন কষ্ট ফাঁস হয়ে গেছে। পরস্পরকে হিংসে করার কোনও পয়েন্ট নেই। টাকাপয়সা, ঐশ্বর্য, সব তুচ্ছ। আসলে তিনজনেই বড় দুঃখী। এদের মনের কথা কেউ বোঝে না। কেউ শুনতে চায় না। বলতে গেলেই থামিয়ে দেয়—টু দি পয়েন্ট কথা বলো মা। এত সলিলকি ছেড়ো না। এটা তো বাড়ি। স্টেজ নয়। টু দি পয়েন্ট দিয়ে জীবন চলে?

খানিকটা কেঁদে নেওয়ার পর তিনজনেই বেশ হালকা বোধ করে। লুচি খায়। মাছের চপ খায় তৃপ্তি করে।

আলাপের সুর কেটে হঠাৎ জয়িতাই বলে উঠল, প্রফেসর হাজরাকে চেনো? গলির মোড়েই থাকেন।

বাঁশরি বলল, ফিলসফির অধ্যাপক কি?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

মৌলী বলল, যেতে-আসতে দেখা হয়। আলাপ পরিচয় হয়নি। নির্বিবাদী মানুষ বলে মনে হয়। ওঁরা দু'জনেই।

জয়িতা বলে, একদিন ওঁর কাছে গেছিলাম। ছেলের ভরতি নিয়ে পরামর্শ করতে। কথায় কথায় সুখের কথা উঠল। উনি কী বললেন জানো?

কী?

বললেন, কী কী নেই ভেবে কষ্ট পেয়ো না। কী কী আছে ভাবার চেষ্টা করো। যেমন, মা আছে। চাকরি আছে। বাথরুমে আয়না আছে। বাড়িতে গীতবিতান আছে। বললেন, সংসারে ময়লা তো থাকবেই। আমরা কেউই তো সাধুসন্ত নই। আত্মপরায়ণ মানুষ। তবে যে অপরকে সুখী দেখায়, তার কারণ, সে ময়লা ঢেকে রাখার আর্ট শিখেছে। কেউ কাজ দিয়ে ময়লা ঢাকে, কেউ সৌজন্য দিয়ে। কেউ গৃহিণীপনা দিয়ে। ওই সব দেখে প্রতারিত হয়ো না। সুখ একটা ধারণা। অসুখের অনুপস্থিতি। তার ধারক হল মন। সহ্য করো।

তিনজনে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

বাঁশরি বলে, ভাবতে গেলে, জীবন জোড়া কেবল অপমান। বয়স বাড়লে বেশি। এসব আমি গায়ে মাখি না। ভাবি, অপমান আবার কী। এরা তো আমার নিজের লোক। আমার হাত-পা যেমন। আমার থেকে আলাদা না। আবার মাঝে মাঝে ভুলে যাই। তখন কষ্ট পাই। নইলে, অনেকের চেয়ে তো ভাল আছি বলো।

এইসব কথা যখন হচ্ছে, তখন হঠাৎ দুড়দাড় করে রাজু আর শানু বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ওদের খেলা শেষ হয়েছে। সন্ধে হয়েছে। এতখানি সময় কী করে কেটে গেল, টের পায়নি কেউ।

মায়ের কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শানু বলে, মা, খেতে দাও, খিদে পেয়েছে। ছাগলছানা যেন ঢুঁ মারে পেটের ওপর।

রাজু বলে, মা, তোমার চোখে জল কেন?

এবার মৌলী ওদের দিকে নতুন চোখে তাকায়, বোঝার চেষ্টা করে। অধ্যাপক হাজরার কথা, জয়িতা যেভাবে বলল, কতটা সত্যি। বাঁশরি যা বলল, তা ঠিক কি না। ওর শরীবের মধ্যে কোথাও ক্ষরণ হচ্ছে। সে কি সুখ, না কষ্ট? শানুর নরম গালটা একবার চেটে দেবে নাকি?

১৯৯৯

কন্যাপক্ষ

মৃদুলের নাতনির নাম মিতুন। মৃদুলের বয়েস এখন সাতষট্টি, মিতুনের বয়েস সাত। মৃদুল জীবনের ঘোড়দৌড়, উপার্জনের অপমান আর ইন্দ্রিয়ের তাড়না থেকে নিষ্ক্রান্ত আর মিতুন তার সামনের পাটির দুটি ভাঙা দাঁত আর আখের মতো সরু কিন্তু মিষ্টি হাত-পা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের ঘোড়দৌড়ে ঢোকেনি। একেবারে ক্লাস ফাইভে পরীক্ষা দিয়ে ভরতি হবে, আমি ওকে তৈরি করে দেব, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মৃদুল, ছেলে, ছেলের বউ বাধা দেয়নি। একটা মেয়ে তো, যেমন-তেমন করে মানুষ হলেই হল। ওদের মা মারা যাওয়ার পর মৃদুল বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল, তিনটে বাচ্চার একটাকে, সবচেয়ে প্রেশাসটিকে ওরা দাদুর হাতে অর্পণ করেছে। তাতে উদ্বেগ কমে গেছে এক তৃতীয়াংশ। সাংবাদিকতার কাজে সারা বিশ্ব ঘুরে আসা লোক মৃদুল এখন নিজেকে গ্যারাজ করে দিয়েছে। পাড়ার মধ্যেই ঘুরে বেড়ায় নাতনির হাত ধরে। দাদুর একটা মোটা আঙুল মিতুন ধরে থাকে তার কচি মুঠোয়। আর প্রশ্ন করে। ওর সমস্ত প্রশ্নই সিলেবাসের বাইরের। যেমন, সেদিন ব্যাঙ্ক থেকে ফেরার পথে মিতুন জানতে চাইল, গাছের ছায়া আকাশে পড়ে না কেন? কুকুরদের সঙ্গে বেড়ালদের কেন বন্ধুত্ব হয় না?

এর কোনও উত্তর হয় না। তাই মৃদুল নাতনিকে বলে, তুমি আর একটু বড় হলে বুঝতে পারবে। তখন ও জানতে চায়, ওর জন্মদিন কবে? মৃদুল বলে, শীতকাল আসুক।

সেদিন সন্ধেবেলা পাট-ভাঙা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে মৃদুল বেরোচ্ছিল। মিতুনের পরনেও পুজোয় পাওয়া নতুন জামা। হঠাৎ রাস্তায় নেমে মিতুন জিজ্ঞেস করে, আমরা কোথায় যাচ্ছি দাদু?

শুভামাসির বাড়ি।

শুভামাসি কে?

মৃদুল বলে, শুভামাসি আমার মায়ের ছোট বোন। আশি বছর বয়েস। খুব বুড়ি হয়ে গেছে। শরীর ভাল না।

আশি বছর বয়েস হয়ে গেলে তো লোকে মরে যায়, তাই না দাদু? শুভামাসি কী করে বেঁচে আছে? মৃদুল বলে, কেউ কেউ বাঁচে। আয়ু ফুরোলে তো মরবে?

আয়ু কী?

অন্য কেউ হলে বলত, হাতের রেখায় যা আঁকা থাকে। কী কপালে লেখা থাকে কে কতদিন থাকার জন্যে এই দুনিয়ায় এসেছে। কিন্তু মৃদুল তার প্রিয় নাতনিকে এই রকম ভুজুং দেবে না। তার বদলে বরং বলবে, শরীর নামের এই মেশিনটা যতদিন চলছে ততদিন তার আয়ু। অসুখবিসুখ করলে মেরামত করা যায়। কিন্তু কম্প্রেসর বা পিকচার টিউব জ্বলে গেলে আর বাঁচানো যায় না।

এইসব কথা ভাবতে গিয়ে ওর মনে পড়ল, শুভামাসির ঠিকুজিতে আয়ু লেখা ছিল উনচল্লিশ বছর। মায়ের কাছে শোনা গল্প। তারপর সাদা পাতা। জাতিকার গভীর রিষ্টিযোগ ও রাহুর দশা। তারপর দাঁড়ি। ওই উনচল্লিশ বছর বয়েসে শুভামাসি না মরে বিধবা হয়। যারা কিছুতেই জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস হারায় না, তারা বলেছিল, শুভা ওর ফাঁড়াটা বরের ওপর চালান করে দিল। বরের আয়ু নিয়ে এবার ও অনেকদিন বাঁচবে। এটা কী রকম কথা? কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল শুভামাসি, আয়ু কি চালান করার জিনিস? তোমরা তো মানুষটাকে দেখেছ—ওই রকম অনিয়ম করলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়? তোমরা মিথ্যেই আমার ওপর দায়িত্ব চাপাচ্ছ। আমার বাঁচার কোনও ইচ্ছে নেই। একচল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে তারপর। ছ'টা ফ্ল্যাটওলা তিনতলা বাড়িতে দুই মেয়ে দুই ছেলে নিয়ে কায়ক্লেশে ও অনিচ্ছায় বেঁচে আছে শুভামাসি। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে যথাসময়ে। তাদের ছেলেপুলেরাও এখন স্কুল-কলেজে পড়ে। ছেলেদুটো ভাল মতন মানুষ হল না। গ্রামে পঁচিশ বিঘে জমি ছিল। চাষ হত। তার ওপর দিয়ে বড় রাস্তা হওয়ায় সরকার থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা আর ছোট ছেলের চাকরি দিয়েছিল। তাদেরও বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে বিরাট সংসার। একতলা, তিনতলা ভাড়া। শুভামাসির নামে বাড়ি, ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভাড়ার টাকা জমা হয়। শুভামাসি চেক কেটে ট্যাক্স দেয়। বড় ছেলে আবির, সিগারেটের এজেন্সি করে। সে-ই মায়ের বিষয়সম্পত্তিও দেখাশোনা করে এসেছে এতকাল। আর পারছে না। ছোট ভাই আশিসকে বলছে, এবার তুই বুঝে নে। আমার কিছু একটা হয়ে গেলে মুশকিলে পড়বে সবাই। শুভামাসি হাসে। আমি

জলজ্যান্ত বেঁচে থাকতে তোর আবার কী হবে?

আবির বলে, তুমি বেঁচে আছ বলে কি আমার বয়েস থেমে আছে মা? একষট্টি পার করলাম। ব্লাড প্রেশার, সুগার এসে গেছে। দুশ্চিন্তায় রাত্তিরে ঘুম হয় না। রোজ একটা-না-একটা ছুতোয় ভাড়াটেরা জ্বালাতন করছে। পাম্পে ঠিকমতো জল উঠছে না। নতুন পাম্প কিনতে অন্তত পঁচিশ হাজারের ধাক্কা।

সে-টাকা আমি দেব। শুভামাসি বলে, তোমার দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই।

তোমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নেই মা। চল্লিশ বছরের পুরনো বাড়ি। বছরে কত টাকা মেরামতে খরচ হয়— খেয়াল আছে? এবার ওপরের ট্যাঙ্কটাও ভেঙে নতুন প্লাস্টিকের ট্যাঙ্ক বসাতে হবে। তবু তো সংসারের জন্যে পাঁচ হাজারের বেশি তুলি না।

ছোট ভাই আশিস চাকরি করতে কল্যাণী যায় রোজ। সন্ধে সাড়ে সাতটায় ফেরে। ফিরেই ওর ভাগের পরোটা, আলুরদম জলখাবার চাই। যাওয়ার সময়ও পরোটা, শুকনো তরকারি টিফিন সঙ্গে নিয়ে যায়। পারতপক্ষে গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে না। রেলের মান্থলি টিকিট ছাড়া।

মৃদুলের সঙ্গে দুই ভাইয়েরই দেখা হয় রাস্তায়ঘাটে। বাজারে। আশিস সুযোগ পেলেই দাদার অমিতব্যয়িতা নিয়ে সমালোচনা করে। দাদার হাতে মায়ের টাকা নয়ছয় হচ্ছে, এমন ইঙ্গিত দেয়। অথচ, নিজের কিছু করার মুরোদ নেই।

মৃদুলের আস্তানা থেকে শুভামাসির বাড়ি খুব একটা দূরে নয়। তবুও যাওয়া হয়ে ওঠে না। ওই পুজোর পর বিজয়ার প্রণাম করতে একবার যায়। সেটা এখনও চালিয়ে যেতে পারছে। গেলেই অবশ্য অনুযোগ শুনতে হয়, এত কাছে থাকিস একবার খোঁজখবর করিস না, বেঁচে আছে না মরে গেছি। তারপর অসুখের ফিরিস্তি শুনতে হয়।

এক-একজন লোক থাকে, ঘুরে ঘুরে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গিয়ে কে-কেমন আছে, খবর নেওয়া যার হবি।

শুধু খবর নেওয়া নয়, উপকার করাও। কাউকে গানের স্কুলে ভরতি করিয়ে দিচ্ছে, কারুর টিউটর জোগাড় করে দিচ্ছে। কারুর জন্যে দুষ্প্রাপ্য ওষুধ সংগ্রহ করে আনছে। এতেই তার আনন্দ। মৃদুল জানে, এই ধরনের কাজ মানে পুণ্য। কিন্তু নিজে করে উঠতে পারেনি কখনও। সাংবাদিকতার কাজে ঘোরাঘুরি করেই কেটে গেল জীবন, আর কত খবর নেবে!

গত বছর গিয়ে দেখেছিল, শুভামাসি আর নিজের পায়ে হাঁটতে পারছে না। শোবার ঘর থেকে ধরাধরি করে নিয়ে এসে বাইরের ঘরে চেয়ারে বসাল বড় ছেলের বউ। প্রণাম করতে গিয়ে লক্ষ করল, হাতের-পায়ের আঙুলগুলো আদার টাটির মতো বেঁকে গেছে।

কী করে হল?

বাতে।

ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

সব রকম চিকিৎসা হয়েছে। বড় বউমা বলল, এ সারবে না। একজন এসে মালিশ করে দিয়ে যেত, তার মুখে এমন দুর্গন্ধ যে, মা ছাড়িয়ে দিলেন। আসলে টাকা বাঁচানোর তাল।

শুভামাসি তখন চুপি চুপি বলেছিল মৃদুলকে, অসুখ সারবে কী করে? সংসারে যা অশান্তি।

কীসের অশান্তি।

মেয়েরা উকিলের নোটিস দিয়েছে। ভাবতে পারিস, নিজের পেটের মেয়ে, রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে আমাকে শাসিয়েছে যে, এখনই উইল না করলে মামলা করবে।

কিছুই জানে না মৃদুল।

বলে, কীসের মামলা?

এই বাড়ির ভাগ চাই। ওরা বলছে, একটা করে ফ্ল্যাট ওদের নামে লিখে দিতে হবে। কেন দিতে হবে? আমি লাখ টাকা খরচ করে এক-একজনের বিয়ে দিইনি? চল্লিশ ভরি করে সোনা দিইনি? দিয়েথুয়ে সব চুকিয়ে দিয়েছি। ওদের কোনও অভাব নেই ঠাকুরের দয়ায়। এখন কিনা ভাইদের সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে চাইছে। মেয়েরা কবে স্থাবর সম্পত্তির ভাগ পেয়েছে, তুই-ই বল? মৃদুল খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল। ভেতরে ভেতরে একটু মজাও পাচ্ছিল। বড় বউমা এসে মিষ্টি দিয়ে গেল। শাশুড়িকে গরম হরলিক্স আধ কাপ। যা বরাদ্দ। মাসির বয়েস তখন উনআশি। শুভামাসি বলল,

বারোমাস এরা আমায় দেখছে, সেবা করছে, কই মেয়েরা এসে তো থাকে না একদিনও। ছোট বউ দিনের-পর-দিন রাত জেগেছে যখন পেটের অসুখে মরতে বসেছিলাম।

মৃদুলের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল ছোট বউ। সে ফিসফিস করে বলল, পেটের অসুখ কি এমনি? জোর করে চার-চারটে নারকেল নাড়ু খেলেন মা। বললেন, পেসাদে ক্ষতি হবে না। ওই পোড়া গুড় সহ্য হয়।

মৃদুল সেই সময় অবশ্য বলেছিল, আইনত মেয়েরা তোমার সম্পত্তির চারভাগের একভাগ পায়। এখন এই নিয়ম চালু হয়েছে। এ-বাড়িতে ছটা ফ্ল্যাট, প্রত্যেক তলায় দুটো করে। তাই তো?

দুটো ফ্ল্যাটে তো আমরা বাস করি।

তা হলেও আরও চারটে ফ্ল্যাট থাকে।

সে তো ভাড়া দেওয়া।

তুমি তো মালিক। ফ্ল্যাট থেকে ভাড়া পাও।

হ্যাঁ। আবার তাই থেকে ট্যাক্স যায়।

মৃদুল বুঝিয়ে বলেছিল, শোনো মাসি। তুমি যাই বলো। ওরা দু'ভাই দু'বোন প্রত্যেকে একটা করে ফ্ল্যাট পাবে। যদি উইল করে না দাও, তা হলে, তোমার মৃত্যুর পর আরও বেশি জায়গা দাবি করতে পারে ওরা। না দিলে ভাড়া বন্ধ করে দেবে কোর্ট থেকে নোটিস লাগিয়ে। তখন ছেলেদের সংসারে টান পড়বে না? সেটা ভাবো।

শুভামাসি বলে, সম্পত্তি থাকলেই জ্বালা। তো মৃদুল ফিসফিস করে বলল, মাসি, সম্পত্তি আছে বলে তো এত খাতির যত্ন পাচ্ছ। এই দুনিয়ায় কোথায় আজকাল বউরা শাশুড়িব সেবা করে, বলো? সম্পত্তির চাবির গোছা নিজের হাতে রেখে একটা উইল করে দাও। উইল তো বদলানো যায়। মেয়ে হয়ে তুমি মেয়েদের বিরুদ্ধে যেয়ো না।

এ-বছর বিজয়ার পর নাতনিকে নিয়ে হাজির হল মৃদুল। বিজয়ার প্রণাম করল। মিতুনও প্রণাম করল দেখাদেখি।

চোখে মোটা কাচের চশমা। তবু ঠিক চিনতে পেরেছে বুড়ি। জিজ্ঞেস করল, নাম কী?

মিতুন।

মিতুন মানে কী?

তারপর নিজেই বলল, আজকাল ছেলেমেয়েদের নাম রাখা হয় তার কোনও মানে হয় না। ডাক নাম হলে না হয় কথা ছিল। ভাল নামও এইরকম সব আজগুবি। মিতা কি মিতালী হলে কী ক্ষতি হত বল? আদিখ্যেতা।

শুভামাসিব সমালোচনা পছন্দ হচ্ছে না মিতুনের। বুঝতে পেরে মাসি নিজেকেই শুধরে নেয়। বলে, মিতুন অবশ্য শুনতে মিষ্টি। আদরেব নাম। শুনতে শুনতে কানে সয়ে যাবে।

মৃদুল লক্ষ করল, এই এক বছরে মাসি বেশ ধসে গেছে। সামনের পার্টির তিনটে দাঁত ছিল আগের বছর। এবার একটাও নেই। হাত-পায়েব আঙুল আরও বেঁকে গেছে। কোমব সোজা কবে বসতে পাবে না। এবারও শোওয়ার ঘব থেকে তুলে নিয়ে আসা হল।

মৃদুল বলল, তুমি কষ্ট কোরো না। আমরা ভেতরে আসছি।

না, না। তা কি হয়। বুড়ির জেদ ভীষণ। বিজয়ার প্রণাম বসে বসে নেব। বলল, হাঁটুতে জোর নেই একদম। ছোট জামাই কাশ্মীর থেকে এই লাঠিটা এনে দিয়েছে। এর ভেতরে আবার হাতির দাঁতের কাজ করা। দ্যাখ, কী সুন্দর না।

মৃদুল মাসির হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে। তারপর স্বগতোক্তির মতো চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে, উইলটা হয়েছে?

শুভামাসি চোখ পিটপিট করে মাথা নাড়ল। বলল, মেয়েদের সাক্ষী রেখে একটা করে নীচের তলাব ফ্ল্যাট দিয়েছি যাতে, পরে আর গোলমাল করতে না পারে। এখন আমি মরলে ওরা বাঁচে।

যথারীতি বড় বউমা, ছোট বউমা চা, জলখাবার দিয়ে যায়। মিতুন খানিকটা ন্যাকামি করে সবই খেল। একসময় শুভামাসি ওদের ডেকে বলল, ছবিগুলো দেখাবে না?

কীসের ছবি?

বলতে বলতে আবির এসে ঢুকল। মৃদুলকে দেখে বলল, এ-বছর আমরা মায়ের আশি বছরের

জন্মদিন সেলিব্রেট করলাম। থার্ড সেপ্টেম্বর। মোমবাতি জ্বালিয়ে কেক কাটা হল।

তারপর বউকে বলল, ছবিগুলো এনে দেখাও না। দারুণ ইন্টারেস্টিং। একটা ভিডিয়ো ক্যাসেটও করা হয়েছে। এক তাড়া রঙিন ফটোগ্রাফ এনে কোলের ওপর রাখল ওরা। শুভামাসি একা, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শুভামাসি, নাতি নাতনিসহ মাঝখানে শুভামাসি—সে এক বিরাট গ্রুপ। কেউ বাদ নেই। কোনও বাছবিচার নেই।

মৃদুল হাসতে হাসতে বলল, এই একটা কাজের কাজ করেছ তোমরা। বংশধর ক'জন?

মাসি বলল, সতেরোজন। মাঝখানে আমাকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে। তাই না রে?

তুমিই তো হিরো। বলে ফেলে মৃদুল সংশোধন করল। হিরোইন অফ দি শো।

চোখের ওপর মোটা কাচের চশমা। মুখখানা চুপসে এইটুকু। গায়ের চামড়া কুঁচকে লুচ লুচ করছে। শুভামাসি ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আশি বছর বয়েসে এই আমার প্রথম জন্মদিন।

তার মানে?

আগে কখনও আমার জন্মদিন হয়নি। মেয়েদের জন্মদিন হওয়ার রেওয়াজ তো ছিল না তখন। আমরা তোর মাকে নিয়ে পাঁচ বোন, এক ভাই। ওই, দাদার জন্মদিনে আমরা সবাই একবাটি করে পায়েস পেতাম।

বিয়ের পর?

বিয়ের পর তো মা। মায়ের জন্মদিন কে কবে মনে রাখে?

সাংবাদিক মৃদুল এবার নড়েচড়ে বসে। ওর ভেতরকার কৌতূহলী সত্তা জাগ্রত হয়েছে।

একটা কথা সত্যি করে বলো তো মাসি। মামার ওপর তোমার, তোমাদের হিংসে হত না? এই অবিচার—

না। একদম না।

কেন?

আমরা তো জানতাম, জন্মদিন শুধু বাড়ির ছেলেদেরই হয়। আশা না থাকলে না পাওয়ার কষ্টও থাকে না।

মৃদুল চমকে উঠে বলল, লাখ কথার এক কথা বললে। পৃথিবীর সমস্ত লোকের বেলা এই কথা সত্যি। মানুষ যত শিক্ষিত হচ্ছে, সচেতন হচ্ছে, তত তার প্রত্যাশা বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে অশান্তিও বাড়ছে। কেননা, সব চাহিদা তো মেটে না। তবে আশি বছরে এসে এমন একটা জন্মদিন। যদি কোনও সুপ্ত বাসনা থেকেও থাকে, তা-ও আর অপূর্ণ রইল না তোমার।

বলল—না, এবার তুমি নিশ্চিন্তে মরতে পারো।

❀ যাচাই

যতখানি রেখেঢেকে লেখা সম্ভব, তাই লিখছি, তবু আমি মনে মনে চাই, এই গল্প বেশি লোক না পড়ুক। এর মধ্যে একজন শিক্ষিত মানুষের অমানবিক চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের কথা বলা হয়েছে। অথচ সে সচেতনভাবে অমানবিক কাজ করছে না। সে সত্যনিষ্ঠ হতে চাইছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, যা সত্য তা উদ্‌ঘাটিত হোক, সে সত্য যদি নিষ্ঠুর হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কিছু ব্যাপার আছে যা জানতে না চাওয়াই ভাল, যা আড়ালে থাকলে ক্ষতি কী—এই রকম ভিতু মানসিকতাকে সে প্রশ্রয় দেয় না। কেননা সে মনে মনে জানে, ওই আড়াল থেকেই যত ভুল বোঝাবুঝির শুরু।

একেবারে না লিখলেই বা কী ক্ষতি হত, ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে—না, তা হলে বিবেক দংশন থেকে মুক্তি পাওয়া যেত না। সব কথা পাঠকের কাছে খুলে বলি। পাঠকই বিচার করুন, যা করেছি, ঠিক করেছি কিনা।

উত্তমপুরুষে লিখতে লজ্জা করছে। তাই আমার প্রতিনিধি চরিত্রটির একটা নাম দিলাম। ধরা যাক বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী। এইভাবে শুরু করছি।

বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তীর বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। পেশায় অডিটর কিন্তু বিভিন্ন সমাজকল্যাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত। সংসারী মানুষ। সচ্ছল, আত্মতৃপ্ত। মোটামুটি সুস্থ। এ বয়সে একটু-আধটু রক্তচাপ বা হৃদ্‌কম্প যা থাকার তা আছে। ধর্মনিরপেক্ষতা—অনুপ্রবেশ, নবজাগরণ বা আণবিক দূষণ—যেখানে তার কিছু করার নেই, তা নিয়ে সে ভাবে না। অল্প স্বল্প সাহিত্যের বই পড়ে। জীবনীগ্রন্থই বেশি পছন্দের। সম্প্রতি ধূমপান করা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ধূমপানের আকাঙ্ক্ষা যায়নি।

এক রবিবাব সকালবেলা তার লেক টাউনের বাড়ির বসার ঘরে কাগজ পড়ছে আর মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিযে বাবান্দার পাশে নিমগাছ, নিমগাছের ডালে তৎপর কালো কাকের ওড়াউড়ি, তার ওপারে ফেনা-ওঠা নীল আকাশ দেখছে, এমন সময় টেলিফোন বাজল। নাগালের মধ্যেই থাকে টেলিফোনের রিসিভার। অন্যমনস্কভাবে সেটা তুলে কানে লাগিয়ে জিজ্ঞেস কবল, হ্যাঁ বলুন।

ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠ বলল, আমার নাম অনিমেষ দত্ত। আপনি আমায় চিনবেন না।

কী ব্যাপার?

একটা ব্যক্তিগত কাজে আপনার সঙ্গে দেখা কবতে চাই। টেলিফোনে সব কথা বলা যাবে না। কখন দেখা হতে পাবে, যদি দয়া কবে বলেন।

এমন কিছু অবাক হওয়ার মতো টেলিফোন নয়। কিন্তু লোকটি একেবারেই অপরিচিত। বৈকুণ্ঠ ভাবল, রবিবাব ছুটির দিনে একে বাড়িতে না ডাকাই ভাল।

বাড়িতে তো সুবিধে হবে না ভাই। আপনি ববং কাল সকালে আমাব আপিসে আসুন। কাল সোমবাব—না, না, আপনি ববং পরশু সাড়ে দশটায়—আমাব আপিসেব ঠিকানা জানেন তো। নামটা আরেকবাব বলুন তো।

অনিমেষ দত্ত।

কী করেন আপনি?

খববের কাগজের আপিসে কাজ করতাম। কাগজ উঠে গেছে। এখন ফ্রি-লানস করি।

ঠিক আছে। দেখা হলে কথা হবে।

লোকটি বলল, একটু নিরিবিলিতে—বেশিক্ষণ সময় নেব না।

সেই লোক, অনিমেষ দত্ত এসেছিল। মোটামুটি চেহারা। বছর চল্লিশেক বয়স হবে। পরনে পাঞ্জাবি-পাজামা, হাতে কাগজপত্র ঠাসা ফোলডাব। চোখে রিমলেস চশমা। দেখে বেকার বলে মনে হয় না। ভেজা ছাতাখানা ঘরের কোণে ঠেস দিয়ে রাখল।

সামান্য সৌজন্য বিনিময়ের পর সে যা বলল তার সারমর্ম এ বকম:

লোকটি বিবাহিত। দুটি ছেলেমেয়ে আছে। পার্ক সার্কাসের কাছে ভাড়া বাড়িতে থাকে। কাগজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংসারে টানাটানি। তবু যেহেতু সে পেশায় সাংবাদিক, অনেকদিনের অভিজ্ঞতা, এদিক-সেদিক লিখে সংসার চলে যায়। তা ছাড়া ওর স্ত্রী একটা স্কুলে পড়াত, দু'জনের বোজগাবে—

এখন পড়ায় না? স্কুলটাও উঠে গেল নাকি?

লোকটি থতমত খেয়ে যায় এই প্রশ্নে।

ব্যাপারটা সহজ করে দেওয়ার জন্যে বৈকুণ্ঠ বলে, না, না, আপনি বলুন। আমি ভাবছিলাম, এই দেশে সবই সম্ভব। মানুষের দুর্ভোগের তো শেষ নেই। হলেই হল।

স্ত্রীর কানের ভেতর একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল কয়েক মাস থেকে। চোখ দিয়ে জল পড়ত। বাবোমাস অদ্ভুত কাশি। অনেক ডাক্তার দেখালাম, কিছু পাওয়া গেল না। শেষকালে ব্রেন স্ক্যান করে ধরা পড়ল, মাথার ভেতর টিউমার।

একটু থেমে অনিমেষ দত্ত ফোলডার থেকে কাগজপত্র বের করার চেষ্টা করে। তাকে থামিয়ে দিয়ে

বৈকুণ্ঠ বলে, আগে কথা শেষ করুন।

কোঠারিতে টিউমার অপারেশন করা হয়েছে দু'মাস আগে। চিকিৎসা চলছিল। সুস্থ হয়ে আসছিল প্রণতি। সামনের মাসে স্কুলে জয়েন করার কথা। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন কান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে বালিশ ভিজে যায়। আবার ছুটি কোঠারিতে। ওরা রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এখন ভেলোরে নিয়ে যেতে হবে। অনেক খরচের ধাক্কা। এখানে এরা আর কাটাকুটি করতে চাইছে না।

এদিকে আমি সর্বস্বান্ত। আমার পুরনো মনিবের কাছে গেলাম। সেখানে অনেক টাকা পাওনা আছে। কিন্তু আপিস তো বন্ধ। তিনি নিজের থেকে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। সাংবাদিকদের সংগঠন থেকেও দশ হাজার টাকা পেয়েছি। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা—লেখক, শিল্পী, চলচ্চিত্র জগতের হোমরাচোমরা—সবাই কিছু কিছু সাহায্য করছেন। কিন্তু সময় কম হাতে। এ-মাসের একুশ তারিখে ওখানে ডেট দিয়েছে। আজ ন' তারিখ। সতেরো তারিখের ট্রেনের টিকিট কাটা। এই দেখুন।

কাগজপত্রের ওপর হাত চাপা দিয়ে বৈকুণ্ঠ বলল, ম্যালিগন্যান্সি ধরা পড়েছে?

মনে মনে সবকিছুর জন্য তৈরি হয়ে যাচ্ছি।

বৈকুণ্ঠ আড়চোখে কাগজপত্রের দিকে তাকায়। যতটুকু চোখে পড়ল: কোঠারির একটা ছাপা কাগজ আর দু'-একটা চেকের জেরক্স কপি। নামকরা লোকের সই। এর বেশি কিছু পরীক্ষা করার সাহস হল না ওর।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বৈকুণ্ঠ বলল, আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কতটুকুই বা সাহায্য করতে পারব?

অনিমেষ বলল, আপনি তো অনেক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। যদি কোথাও বলে দেন একটু। ধনী শিল্পপতিদের কাউকে তো আমি চিনি না।

সেদিন দু'হাজার টাকার একটা বেয়ারার চেক অনিমেষ দত্তকে দিয়েছিল বৈকুণ্ঠ। আর একটা চিঠি দিয়েছিল প্রভাস আগরওয়ালকে। ওর অনেক ট্রাস্ট ফান্ড আছে। সেখান থেকে যদি কিছু দিতে পারে। চিঠিতে লিখেছিল, অনিমেষ দত্ত ওর অনেক দিনের চেনা। বিশিষ্ট সাংবাদিক। খুব মুশকিলে পড়ে গেছে।

চেক আর চিঠি নিয়ে ফোলডারের ভেতরে ঢোকায়। বলে, চেষ্টা করে দেখি। আপনাকে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব।

বৈকুণ্ঠ তার টেবিলের ওপর রাখা নোটবুকখানা এগিয়ে দিয়ে বলে, এখানে আপনার নাম ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লিখে দিন। আর কোনও ভাল খবর হলে আমাকে জানাবেন। দু'দিন পর অনিমেষ দত্ত আবার ওর বাড়িতে ফোন করে জানায় যে, মিস্টার আগরওয়াল চিঠি দেখেই দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। কাগজপত্র কিছু দেখতে চাননি।

এ রকম ঘটনা মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে ঘটে। এর মধ্যে কোনও অভিনবত্ব নেই। বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা সকল নাগরিকের কর্তব্য। বৈকুণ্ঠ তাই করেছে। তারপর ব্যাপারটা ভুলে গেছে।

না। ঠিক ভুলে যায়নি।

পরের রবিবার ওর বাড়িতে বেড়াতে আসে সস্ত্রীক ওর শ্যালক। সে হাইকোর্টের উকিল। ভাল পসার। বৈকুণ্ঠ যে মোটরগাড়িতে চড়ে, তার চেয়ে অনেক বেশি দামি ওর মোটরগাড়ি। তিনবছর অন্তর সে গাড়ি বদলায়। মিডলটন স্ট্রিটে ওর বাড়ি ও চেম্বার। যে ক'টি বাড়ি এখনও বহুতল হয়নি, তাদের একটি।

শ্যালক এলে বৈকুণ্ঠ আলমারি থেকে স্কচ হুইস্কির বোতল বার করে। নিজে আসক্ত নয়, তবে সঙ্গ দেওয়ার জন্য একটা গেলাস নিয়ে বসে। আর, ওর প্যাকেট থেকে দু'-একটা বিদেশি সিগারেট খায়। বউয়ের আপত্তি সত্ত্বেও। এক-আধদিন ওই একটু অনিয়ম।

সেদিন সান্ধ্য আড্ডায় ও কথায় কথায় অনিমেষ দত্তর ঘটনাটা উল্লেখ করেছিল। সরল মনে। আর তাতেই ওর শ্যালকবাবু হইহই করে উঠে বলল, তুমি একটা অডিটর, তোমাকে ও ঠকিয়ে নিয়ে গেল অতগুলো টাকা? এখুনি চেকটা স্টপ পেমেন্ট করে দাও।

তার আর সময় নেই। ও চেক ভাঙানো হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি অবিশ্বাস করছ কেন? এ রকম কি সত্যি হয় না?

হয়। তবে এক্ষেত্রে হয়নি বলেই মনে হচ্ছে। কাগজপত্র যাচাই করলেই বুঝতে পারতে লোকটা ফ্রড।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি কোঠারির লেটার হেড।

লেটার হেড ছাপাতে এখন দশ টাকা লাগে। কম্পিউটারে—যে রকম ডিজাইন দাও। তুমি ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারতে, প্রণতি দত্ত নামে কোনও ব্রেন-কেস ওরা ট্রিট করেছে কি না। ডাক্তারের নাম জেনে নিতে।

আমি চেকের জেরক্স দেখেছি, তাতে নামকরা লোকেদের সই।

তোমার চেকবইখানা দাও। আমি পাতায় পাতায় মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব গুহ, রঞ্জিৎ মল্লিক সই করে দিচ্ছি অনিমেষ দত্ত-র নাম লিখে। তারপর সেগুলো জেরক্স করে নিয়ে চেকগুলো ছিঁড়ে ফেলে দাও। প্রমাণ রইল?

বৈকুণ্ঠকে হঠাৎ বোকা বনে যেতে দেখে ওর বউ বলে ওঠে, আসলে তুমি ওকে বিশ্বাস করেছিলে প্রথম থেকে। তাই যাচাই করার কথা মনে হয়নি। টাকাটা দেওয়ার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করবে তো।

তার সময় ছিল? বৈকুণ্ঠ খেঁকিয়ে ওঠে। আপিসে বসে কথা হচ্ছে, তুমি কোথায় তখন?

অমনি শ্যালকের স্ত্রী হাসতে হাসতে নিজের বরের দিকে তাকিয়ে বলে, ওহে বুদ্ধিমান রামধন, তোমার কাছ থেকে কী করে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে সরে পড়েছিল জজ সাহেবের সহপাঠী? সে গল্পটা বলো।

গল্পটা শুনে আরও ঘাবড়ে যায় বৈকুণ্ঠ। এই রকম:

একদিন ফোন এল· আমি জাস্টিস রায় কথা বলছি। কেমন আছেন? অনেকদিন ক্লাবে আসেন না। তারপরই আসল কথা, আমার এক পুরনো সহপাঠী, একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি, খুব মুশকিলে পড়েছে। তার ছেলের দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে। বম্বে যাবে চিকিৎসা করাতে। অনেক খরচ। আমি যা পারি দিয়েছি। আর বন্ধুবান্ধবদের বলছি যদি কিছু কিছু করে সাহায্য করে। ওকে পাঠাব আপনার কাছে? ওর নাম পবিত্র। তো সেই পবিত্র এল পরের দিন। জাস্টিস রায়ের কাছ থেকে আসছি। ওঁর মুখে তো সব শুনেছেন। তুমি ক্যাশ পাঁচ হাজার দিলে। পঞ্চাশ টাকার বান্ডিল আমি আলমারি থেকে বার করে দিলাম। তারপর? পরের দিন জাস্টিস রায় আবার ফোন করলেন ধন্যবাদ জানাতে। বললেন, শুক্রবার সন্ধেবেলা আসুন। ক্লাবে নিরিবিলিতে একটু গল্প করা যাবে। কোথায় তিনি? ভোঁ ভাঁ। এই ওদের ছক।

কে জাস্টিস রায়? তার পুরো নাম কী? ওই পবিত্র লোকটার কাগজপত্র ছিল কিনা কিছু দেখেছ তুমি? শুধু জাস্টিস শুনেই গলে গেলে। ওরা জানে তোমাদের দুর্বলতা।

এই হয়। এরা হল কেপমার। নতুন নতুন কায়দায় লোক ঠকায়। অনিমেষ দত্তও তেমনই এক ঠগ। যদি ওর নাম অনিমেষ দত্ত হয়।

২

মানুষ পরোপকার করতে ভালবাসে। এটা একদিকে যেমন মহৎ গুণ, অন্যদিকে তেমনই চরিত্রের দুর্বলতা। অন্যের উপকার করলে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। সমাজের মানুষ হিসেবে গর্ববোধ হয়। বৈকুণ্ঠেরও তাই হয়েছিল কিন্তু তার ওই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কেউ প্রতারণা করে গেল ভেবে মনটা আবার তেতো হয়ে যায়।

নিজের দু'হাজার টাকার লোকসান ওর তত গায়ে লাগেনি। প্রভাস আগরওয়াল ওর চিঠি পড়ে এককথায় দশ হাজার টাকা দিয়েছে লোকটাকে, দু'বার ভাবেনি, এই চিন্তা ওকে বেশি কামড়ায়। আমার অনেকদিনের চেনা—কেন যে ও লিখেছিল চিঠিতে। সত্যি তো ওর অনেক দিনের চেনা নয় অনিমেষ। মিথ্যে কথা বলায় দোষের ভাগী সেও হয়েছে। যদি কোনওদিন আগরওয়াল জানতে পারে টাকাটা জলে গেছে, কী ভাববে ও? বৈকুণ্ঠ নির্বোধ! ছিঃ ছিঃ।

আবার মনে হল, টাকাটা তো সে ঘর থেকে দেয়নি। কোনও একটা ট্রাস্ট ফান্ড থেকে দিয়েছে। ওইসব ফান্ডের কাজই হল দুঃস্থের উপকার করা। ট্যাক্স বাঁচাবার জন্যে বড়লোকরা নানা রকম দান-খয়রাতের ট্রাস্ট বানায়, সেই টাকা তো কত সময় অন্য কাজেও লাগে, বৈকুণ্ঠ জানে। অতএব আপশোস করার মানে হয় না। বৈকুণ্ঠর মনে পড়ে যায়, পরের দিন লোকটা ফোন করে জানিয়েছিল

আগরওয়াল টাকা দিয়েছে। তার মানে আর একজনকে ও চোট দিয়েছে। কত ফুর্তিতে না খবরটা ও দিয়েছিল ভাবলে রাগে ওর সর্বশরীর আবার রি রি করে ওঠে। এর একটা বিহিত করা দরকার।

পুলিশে খবর দেবে? না থাক। তাতে ওর বোকামিরই প্রচার হবে। ভাবতে ভাবতে ওর চোখ পড়ে যায় নোটবুকে। এই তো, নাম ঠিকানা সব এখানে লেখা আছে। এই কাজটা তো বুদ্ধি করে করেছিল ও। ওর শ্যালক যা করেনি।

আপিসে বসে বৈকুণ্ঠ লোকটার দেওয়া টেলিফোন নম্বরে ডায়াল করল। রিং হয়ে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না। জানা কথা। ঠগ কি আর ঠিক নম্বর দেবে। কী সাংঘাতিক। পরের দিন আপিসে আসার পথে পার্ক সার্কাসের ঠিকানা খুঁজে বার করে। বাড়ির নম্বরটাও মিলে যায়। কিন্তু হতাশ হয়ে দেখল, টিউবওয়েলের পাশে হলদে রঙের একতলা বাড়িটার বাইরে একটা বড় তালা ঝুলছে। কাছাকাছি একটা লন্ড্রিতে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, ওই বাড়িটায় কি অনিমেষ দত্ত নামে কেউ থাকে? হিসেব মেলাতে ব্যস্ত লন্ড্রির মালিক উত্তর দিল, এটা পাঁচ জাতের পাড়া মশাই, কে কোথায় থাকে কেউ জানে না। আপনি পোস্ট আপিসে গিয়ে বরং খোঁজ করুন। ওরা বলতে পারে।

না, পোস্ট আপিস অবধি বৈকুণ্ঠ যায়নি। একদিন কী মনে হল, ড্রাইভারকে বলল, চলো কোঠারি মেডিক্যাল হাসপাতাল। আলিপুর। বিড়লা হার্ট রিসার্চের পাশে। সে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। আগে কখনও ওখানে যায়নি। লোকটা বলেছিল, বউয়ের নাম প্রণতি। প্রণতি দত্ত। কাউন্টারে গিয়ে জানতে চাইল, ওই নামের কোনও রুগি এখানে ভরতি হয়েছিল কি না।

কবে?

এই ধরুন তিন-চার মাস আগে। ব্রেন কেস। টিউমার।

আপনি কেউ হন?

না, না। এমনি। জানতে চাইছি সে বেঁচে আছে কি না।

মহিলা সাফ জানিয়ে দিল, এই রকম উটকো এনকোয়ারির জবাব ও দিতে পারবে না। ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে হবে। পুলিশ কেস হলে, প্রপার চ্যানেল দিয়ে এলে, পুরনো রেকর্ড ঘাঁটা সম্ভব।

বৈকুণ্ঠ একবার শেষ চেষ্টা করে বলে, এখন তো কম্পিউটার হয়েছে। দেখুন না, নামটা কল করে, যদি কোনও খবর মেমারিতে থাকে।

থাকবে না। মহিলা বলল। এখানে সব কারেন্ট কেস। আপনি ডাক্তার দাশের সঙ্গে দেখা করুন না। সকাল এগারোটার পর। পেশেন্ট আপনার রিলেটিভ?

থাক পরে একদিন আসব। বলে, পেছন ফেরে বৈকুণ্ঠ। আড়চোখে দেখে, কাউন্টারের মহিলাও ওকে আড়চোখে দেখছে।

হাল ছেড়ে দিল তখনকার মতো।

বৈকুণ্ঠ মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, আর কখনও পরোপকার করবে না।

দেখতে দেখতে কলকাতার বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেল।

একদিন বাইপাস ধরে লেক টাউন ফেরবার পথে পার্ক সার্কাসে পৌঁছে কী মনে হল বৈকুণ্ঠর, ড্রাইভারকে বলল, গাড়ি ঘোরাও। টিউবওয়েলের পাশে একটা হলদে রঙের একতলা বাড়ি, অনেকদিন আগে এসেছিলাম, চিনে যেতে পারবে? ড্রাইভার ঠিক চিনে বার করল বাড়িটা। বৈকুণ্ঠ দেখল, আজ তালা ঝুলছে না। তখনও সন্ধে হয়নি। সেদিনের কাদা আজ শুকিয়ে ধুলো হয়ে আছে। তার মধ্যেই খেলছে বাচ্চারা।

ঢুকবে কি ঢুকবে না, ইতস্তত করতে করতে ঢুকেই পড়ল দরোজা ঠেলে।

ঢুকে হাঁক দিল, কেউ আছেন?

একজন অল্পবয়সি মহিলা শাড়ির আঁচল গায়ে জড়াতে জড়াতে বেরিয়ে আসে। ছোটখাটো চেহারা।

বৈকুণ্ঠ জিজ্ঞেস করে, এটা কি অনিমেষ দত্তর বাড়ি?

মহিলা মৃদুস্বরে বলে, উনি তো বাড়িতে নেই।

কোথায় গেছেন?

দোকানে। ন'টার সময় ফিরবেন।

আপনার কেউ হন উনি? আচমকা প্রশ্ন করে বৈকুণ্ঠ।

স্বামী।

স্বামী! আপনার নাম কি প্রণতি? আপনার কি ব্রেন টিউমার হয়েছিল? ভাল হয়ে গেছেন?

মহিলা বলল, না, উনি ছিলেন আমার দিদি। কোঠারি হাসপাতালে অপারেশন টেবিলে মারা যান।

কতদিন আগে?

তা বছরখানেক হল। খুব কষ্ট পেয়েছেন। ওঁকে কিছু বলতে হবে?

বৈকুণ্ঠ পকেট থেকে তার একখানা ভিজিটিং কার্ড মহিলার হাতে দেয়। দিয়ে বলে, ওঁকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। দরকারি কথা আছে। তারপর কীভাবে ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়, লোকটা একটা ঠগ আমি জানতাম না।

হনহন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও নিজের গাড়িতে ওঠে।

সেই অনিমেষ দত্ত আজ বৈকুণ্ঠর আপিসে আবার এসেছিল। মোটাসোটা চেহারা। গায়ে ডোরাকাটা বুশশার্ট, পরনে দামি প্যান্ট। চোখে রিমলেস চশমা। দেখে ঠগ বলে মনে হয় না। এবারে আর হাতে ছাতা নেই।

কথা বলার জন্য তৈরি ছিল বৈকুণ্ঠ।

প্রথমেই বলল, আপনি একজন ভদ্রবেশী ঠগ, জোচ্চোর। মিথ্যে কথা বলে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছেন। আপনাকে আমি পুলিশে দেব।

অনিমেষ মৃদু হেসে বলল, তা আপনি দিতেই পারেন। কিন্তু আমি ঠগ, জোচ্চোর নই।

নন? আপনার স্ত্রী একবছর আগে মারা গেছে, তার পরেও আপনি তার চিকিৎসার নাম করে টাকা তোলেননি?

তার আগেও তুলেছিলাম। সেই টাকা ওর চিকিৎসা করাতে খরচ হয়েছে। কিন্তু প্রণতি আমাকে পথে বসিয়ে দিয়ে পালাল। দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি আতান্তরে পড়ে যাই। নিজের রোজগার নেই, প্রণতির রোজগারও বন্ধ হয়ে গেল। আমি কী করব? তখন টাকা জোগাড়ের অভ্যেস হয়ে গেছে। ওইসব কাগজপত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াই দরজায় দরজায়। দয়ালু মানুষ কিছু কিছু ভিক্ষে দেন। তাতেই কোনও রকমে চালাই। তারপর একদিন নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেল। বাচ্চা দুটোকে ওদের মামার বাড়ি হাওড়ার শ্যামপুর থানার ছোট রাধানগর, সেখানে রেখে কোথাও চলে যাব ঠিক করলাম। বা, আত্মহত্যাই করব।

বৈকুণ্ঠ চোখ তুলে বলল, এটাও কি বানানো গল্প? আপনি সেদিন এইভাবেই আপনার স্ত্রীর অসুখের গল্প বানিয়ে বলেছিলেন। মনে আছে? একটুও গলা কাঁপেনি।

অনিমেষ বলে, বললাম যে, তখন টাকা চেয়ে চেয়ে আর টাকা পেয়ে চাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে। বলার সময় ভুলে যেতাম যে, প্রণতি নেই। ওর মারা যাওয়ার দুর্ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না, স্যার। আমাকে বিশ্বাস করুন। ওর স্মৃতিজড়ানো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে—একটা সহজ উপার্জনের পথ—কী করে বোঝাব—

রিমলেস চশমা খুলে লোকটা টেবিলে রাখল। তারপব রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। বৈকুণ্ঠর মনে হল এটাও ওর অভিনয়। একবার ইচ্ছে হল, ফোন করে ওর উকিল শ্যালককে ডেকে আনে আপিসে। সেই একে জেরা করুক।

সংযত হয়ে বৈকুণ্ঠ নিরুৎসাহ গলায় বলল, তারপর?

আমার হাতে তখন বিয়াল্লিশ হাজার টাকা। নগদ। হরিদ্বারে বা কাশীতে গিয়ে থাকতে পারতাম একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে। কিন্তু ওখানে, ওই ছোট রাধানগরে, থাকতে থাকতে একদিন প্রণতির ছোট বোন, স্বামী পরিত্যক্তা যাকে বলে, দুই দাদার গলগ্রহ, আমার হাত ধরে বলল, অনিমেষদা, জীবনটা আবার নতুন করে শুরু করা যায় না? বলল, আমি তো মরমে মরেই যাচ্ছি, তুমি যদি সাহস জোগাও, একবার চেষ্টা করে দেখি না। ও যেচে এসে বলল।

নতুন করে শুরুর কথা শুনে চমকে উঠেছি।

তারপর কী যে হল, আমি পালাইনি, টাকা নয়ছয় করিনি, আবার সংসার বেঁধেছি। নির্লজ্জের মতো। মিনু আমার চেয়ে অনেক ছোট। ওর দাদারা কিছু টাকা দিল। এখানে ওষুধের দোকান লিজ নিয়েছি। মালিক চালাতে পারছিল না। এখন আমি চালাই। জীবনটা পচে যেতে বসেছিল, আবার চাগিয়ে তুলছি।

আমরা দু'জন মিলে। আর কিছুদিন যাক। বাচ্চা দুটোকেও মামার বাড়ি থেকে নিয়ে আসব। পারব না?

একটু পরে অনিমেষ থেমে থেমে বলে, মিনুর জন্যে প্রণতি খুব ভাবত। ওর কী হবে। দাদারা কতদিন দেখবে ওকে। ওর বরটা পাষণ্ড। গয়নাগাটি সব কেড়ে নিয়ে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এমন কিছু লেখাপড়াও জানে না যে কোথাও একটা চাকরি করবে। জানলেই বা কী। চাকরি কোথায়? আমিই কি আর একটা কাজ জোগাড় করতে পারলাম! অবশ্য প্রণতি কখনও ভাবেনি, মিনু এসে ওর জায়গাটাই দখল করবে।

খুব বিষণ্ণ একটা হাসি ওর মুখের ওপর ভাসছে।

একসময় বৈকুণ্ঠকে বলতেই হল, ঠিক আছে। আপনি এবার আসুন।

যেতে যেতে অনিমেষ বলল, যদি বলেন, আপনার দেওয়া টাকাটা আমি আস্তে আস্তে শোধ করে দেব স্যার। একসঙ্গে পারব না।

বৈকুণ্ঠ বলল, থাক।

আপনাদের দেওয়া দানে একজনকে বাঁচানো যায়নি। দু'জনকে বাঁচানো গেছে। এটাও তো পুণ্য, তাই না? আমি কি অন্যায় কথা বললাম?

এই প্রথম বৈকুণ্ঠ অনিমেষের কথা শুনে লজ্জা পেল।

ও চলে গেলে পর বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী—অডিটর—একবার ভাবল, এখন কি শ্যালকবাবুকে ফোন করে বলা যায় যে, বিশ্বাস করবে আমি ঠকিনি?

দরকার নেই। মনটা নরম হয়ে গেছে। আবার চালাক চালাক কথা বলে ও যদি বিষিয়ে দেয়।

জরিমানা

মীরা যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন নিঃসঙ্গতার প্রকৃত চেহারা কী রকম, বুঝতে পারেনি ক্ষিতীশ। মীরা মারা যাবার পর বাড়িটা শুধু না, ওর সমস্ত অস্তিত্ব কেমন অর্থহীন হয়ে গেল। কী হবে এই বিষয়সম্পত্তি নিয়ে, কেনই বা অর্থ উপার্জনের জন্য এত ছোটাছুটি। বাড়ি-ভরতি এত ফার্নিচার, কার্পেট, ছবি, গানবাজনার যন্ত্র কার জন্য? এসব জিনিসে ক্ষিতীশের কোনও আসক্তি নেই। শুধু নীচের বসার ঘরে টিভি-টা মাঝে মাঝে ও চালায়। প্রোগ্রাম যা পায়, তাই দেখে। সময় তো কেটে যায়।

সাড়ে চার বছর ভুগেছিল মীরা। দুটো কিডনি একসঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল। কী করে এ রকম হয় জিজ্ঞেস করায় বেলভিউয়ের বড় ডাক্তার বলেছিলেন, ইনফেকশন থেকে হয় আবার উঁচু রক্তচাপ অনেকদিন চিকিৎসা না করালেও কিডনি বিকল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বোধহয় তাই হয়েছে। মীরার রক্তচাপ ১২০/১৮০তে দাঁড়িয়ে ছিল কতকাল কে জানে। ও কিছু বলেনি। টেরও পায়নি। বা টের পেয়েছিল, গ্রাহ্য করেনি। বা, দু'-একবার ক্ষিতীশের কাছে নালিশ করে থাকবে, ও উড়িয়ে দিয়েছে। যাদের জীবনে, কাজে টেনশন আছে, তাদের রক্তচাপ ওঠানামা করতে পারে, ক্ষিতীশ হয়ত ভেবেছে, মীরার কী টেনশন? খাচ্ছেদাচ্ছে আরামে আছে, সংসারের কাজ সব কাজের লোক করে। বাড়িতে একটা বাচ্চা নেই, বুড়োবুড়ি নেই যে রাত জাগতে হয়। আর স্বামী হিসেবে ক্ষিতীশ নিজেও কোনও অর্থে বেহিসেবি নয়। আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে যত কাজই থাক। সুতরাং ঘাড়ে ব্যথা নিশ্চয় শোওয়ার দোষে হয়েছে। সেঁক দাও। অসুখের সময় মীরার বয়স ছিল তেতাল্লিশ, মারা গেল সাড়ে সাতচল্লিশ বছর বয়সে। ক্ষিতীশ তখন বাহান্ন।

সপ্তাহে দু'বার, কখনও তিনবার ডায়ালিসিস করতে হয়েছে এতদিন। তাইতেই মাসে পাঁচ হাজার টাকা খরচ। তা ছাড়া আরও আনুষঙ্গিক খরচ ছিল। অসুবিধে ছিল। আপিসের কাজে টুরে যেতে পারেনি বলে ওপরওয়ালা অসন্তুষ্ট হয়েছে। একবার তো বাধ্য হয়ে মীরাকে বেলভিউতে ভরতি করে রেখে যেতে হল। পাঁচ দিন পর এয়ারপোর্ট থেকে সোজা নার্সিংহোম হয়ে বাড়ি ফেরা। তখন গাড়িতে বসে মীরা বলেছিল, আর বাড়িতে কেন যাওয়া। এখানেই রেখে দাও আমায়। এদের খাওয়াদাওয়া ভাল। নার্সদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

আসলে, সবাই জানত, এ-রোগ সারে না, যতদিন এভাবে চলে চলুক। তারপর একদিন ওর শরীর আর নতুন রক্ত নিতে পারবে না। প্রথম দিকে একটা আকস্মিকতা ছিল, উত্তেজনা ছিল, মনে মনে হয়তো আশাও ছিল যে, বলা যায় না, হঠাৎ কিডনি চালু হয়ে যেতে পারে। ক্রমে সেটা নিবে যায়। বেঁচে থাকার ইচ্ছে আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলে মীরা। শেষদিকে ও বলত, আমি চলে গেলে তুমি কষ্ট পাবে। আবার খানিকটা নিশ্চিন্তও হবে। আর কিছুদিন কষ্ট সহ্য করো, তারপর আমি ফ্রি তুমিও ফ্রি।

বকুটার জন্যে ভাবনা হয়, মীরা মাঝে মাঝে বলত। ওই একমাত্র ছেলে আমেরিকায় পড়তে গেছে। হয়তো কোনওদিন আর ফিরবে না। বাড়িতে দেখে গেছে অসুখ নিয়ে এক দমবন্ধ আবহাওয়া, পালিয়ে বেঁচেছে বলতে গেলে। অবশ্য প্রত্যেক সপ্তাহে ফোন করে মায়ের সঙ্গে কথা বলে, মাকে উৎসাহ দেয়। দিয়ে গেছে, যতদিন বেঁচে ছিল মীরা। মারা যাবার খবর শুনে কেঁদেছিল টেলিফোনে, জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কি আসব? আমার সামনে পরীক্ষা। ক্ষিতীশ বলেছে, দরকার নেই।

জলের মতো টাকা খরচ বন্ধ হয়ে গেছে। টেলিফোন বিল নেমে গেছে অনেক। কমে গেছে লোকজনের আসা-যাওয়া—এ-সবের যোগসূত্র ছিল মীরা। যতই রোগাভোগা হোক, গৃহকর্ত্রী ছিল তো। মরে মরেও অতিথি আপ্যায়ন করে গেছে। সামাজিকতা বাদ দেয়নি। অসুখের মধ্যেও সন্ধেবেলা চুল বেঁধে ক্ষিতীশের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকত রোজ। এখন কেউ ওর অপেক্ষা করে না। কাজের লোক দু'জন অবসর সময়ে ঘুমোয়। কতটুকু রান্না, কতটুকু কাপড়কাচা—সবটাই তো অবসর ওদের। তবু ছাড়ায়নি। থাক, বাড়িটা অন্তত পাহারা দিক।

আপিসের দিন তবু একভাবে কেটে যায়। ছুটির দিন আর কাটতে চায় না ক্ষিতীশের। একে-ওকে টেলিফোন করে অকারণ। কাজের লোকদের খাটায়—মিস্ত্রি ডেকে এনে বাড়ি সারাই করে, ঝুল ঝাড়ায়। তারপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে একসময়। দুপুরে স্নানের আগে একচুমুক ঘুমিয়ে নেয়। খাওয়ার পর আবার ঘুম। সন্ধেবেলা টিভি—জোরে চালায় ও। তাতে নিঃসঙ্গতার বেদনা খানিকটা কমে। কী করবে? আর তো কোনও কাজ নেই। কথাও নেই কারুর সঙ্গে। জীবন কেমন ভারী হয়ে গেছে।

এমনি অবস্থায় চিত্রা মিত্রর সঙ্গে ওর আলাপ হল।

ইংরেজি কাগজে ব্যক্তিগত কলামে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল ওর। বাংলা করলে এই রকম দাঁড়ায়: নিঃসঙ্গ মহিলা, সুশ্রী। স্বনির্ভর (৪২), উদারচরিত্রের ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক। উদ্দেশ্য বিবাহ।

প্রথমে টেলিফোনে কথা হয় দু'জনের। তারপর বায়োডাটা বিনিময় হয় লিখিতভাবে। তারপর সাক্ষাৎকার। ক্ষিতীশ দেখল, মহিলা সুশ্রী বটে। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা কালো চুল। চোখে চশমা। একটু মোটাসোটা চেহারা। ছাড়া ছাড়া ভাবে ওদের যে সংলাপ বিনিময় হয়, তা এই রকম:

উদ্দেশ্য বিবাহ, আপনি বিজ্ঞাপনে বলেছেন। কিন্তু আমাদের দু'জনের কারুরই এটা বিবাহের বয়েস না, তাই না? (ক্ষিতীশ)

কোনটা বিবাহের বয়েস? যখন দু'জন নারীপুরুষ একত্র বসবাস করতে চায়। পরস্পরকে ভালবাসতে চায়। সন্তান উৎপাদন করতে চায়। আমাদের সে বয়েস পার হয়ে গেছে হয়তো। আমাদের দরকার নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি। বন্ধুত্ব। তার কি কোনও বয়েস আছে? (চিত্রা)

আমাদের দু'জনেরই নিজস্ব ঘাঁটি আছে। কে ঘাঁটি ছাড়বে? আমি তো না। (ক্ষিতীশ)

ঘাঁটি আমাকে ছাড়তে হবে। সে জন্যে আমি মনে মনে প্রস্তুত। এতদিন মা বেঁচে ছিল, মাকে নিয়ে থাকতাম। দাদার পরিবারও একই বাড়িতে থাকে। আলাদা ব্যবস্থা। বাড়ির একটা অংশ আমার। সেটা দাদা কিনে নিতে চায়, আমি যদি রাজি থাকি। এখন কথা হল, আমি একটা কালো গাড়ি থেকে লাফিয়ে আর একটা কালো গাড়িতে না পড়ি। (চিত্রা)

সিদ্ধান্ত কে নেবে? আপনি, না দাদা? (ক্ষিতীশ)

আমি। তাই কিছু কিছু খবর জানা দরকার। যা বায়োডাটায় নেই। মানে, জানা দরকার আপনার আস্তানা আমার পক্ষে কতখানি নিরাপদ—মানে স্বস্তিকর হবে। (চিত্রা)

এই তো দেখছেন। এটা ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট। নীচে বসার ঘর, খাওয়ার জায়গা—বেশ বড়সড়ই। ওধারে রান্নাঘর, একটা ছোট বাথরুম। আর কাজের লোকের জন্যে একটা ঘেরা জায়গা। ভেতর দিয়ে ওই সিঁড়ি। ওপরে দুটো শোবার ঘর, সঙ্গে বাথরুম। একটা স্টাডি মতন। বারান্দা। দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট। (ক্ষিতীশ)

তিনজনের পক্ষে? (চিত্রা)

হ্যাঁ, আমার ছেলে এসে থাকলে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। মনে হয় না ও এখানে থাকতে আসবে। বেড়াতে এলে দু-চার সপ্তাহ। তবে এখন থেকেই ওকে বাদ দিয়ে ভাবতে চাই না। (ক্ষিতীশ)

আমি কলেজে পড়াই। দর্শন। আমার কিছু সহকর্মী, পরিচিত পরিজন আছে। তারা আসা-যাওয়া করবে। আমারও নানা রকম কাজ, দায়িত্ব আছে। সে জন্যে আমার স্বাধীনতা দরকার, একলা থাকার অধিকার থাকা দরকার। কর্তৃত্ব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। বাড়িতে ঢোকার একটা চাবি পেলেই হল। আপনি অনেক বছর বিবাহিত ছিলেন। মীরা দেবী নিশ্চয় আপনাব অনুগত ছিলেন সব ব্যাপারে, সব বাড়িতেই যেমন হয়। তো, এই নতুন রকম সিস্টেম আপনার সহ্য হবে তো? (চিত্রা)

ভেবে দেখতে হবে। কেননা, পুরনো জীবনে তো আর ফেরা যাবে না। কিছু স্বার্থ ছাড়তে হবে, দরকারটা তো আমারও। মানে সঙ্গীর। আপনাকে দেখে আমার পছন্দ হয়েছে। মানে, মনে হচ্ছে, একটা ব্যবস্থায় আসা যাবে। তবে একটা কথা—এমনিই জিজ্ঞেস করছি। কিছু মনে করবেন না। (ক্ষিতীশ)

বলুন। (চিত্রা)

আপনি বিয়ের কথা ভাবেননি এতদিন। মাকে বলে এসেছেন, বিয়ে করব না, তা তো বলছি না। এখন করব না। যখন ইচ্ছে হবে তখন করব। তার মানে কি ধরে নেব আপনি ভার্জিন আছেন? ইচ্ছে না করলে এ-প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। (ক্ষিতীশ)

কথা যখন সোজাসুজি হচ্ছে, হোক। না, সেই অর্থে আমি ভার্জিন নই। এই প্রশ্ন অবশ্য ছেলেদের করা হয় না। ডক্টরেট করার সময় পণ্ডিতমশাইকে প্রথম শরীর দিতে হয়েছিল। তিনি আমার কৌমার্যহারক গুরুদেব। তারপরও মাঝে মাঝে এক্সপোজার হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে। তবে যৌনজীবনে আমি আপনার মতো অভ্যস্ত নই। কখনওই ভাল লাগেনি ওটা। আমি জানতাম, এই কথা উঠবে। (চিত্রা)

আর কোনও পার্টির সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে? এমনি জিজ্ঞেস করছি। বিজ্ঞাপনের উত্তরে আরও কেউ যোগাযোগ করে থাকতেই পারে। আপনার সঙ্গে আমার কথা এই প্রথম অবশ্য। (ক্ষিতীশ)

দু'জনের সঙ্গে কথা হয়েছে। একজন অবাঙালি। ব্যবসায়ী। সে পুরনো ধরনের মানুষ। একদম আলাদা কালচারের লোক। সে রক্ষিতা খুঁজছে। আর একজন সরকারি চাকুরে। ডিভোর্সি। ডায়বিটিসের রোগী। খুব ছোট একটা ফ্ল্যাটে থাকে। তার সেবিকা দরকার। শেষ সময়ে যে ওর দেখাশোনা করবে। তাকে ও যথাসর্বস্ব দিয়ে যেতে রাজি। কিন্তু আমি এই বয়েসে একজন অসুস্থ লোককে বেডপ্যান দেওয়ার জীবন বেছে নিতে রাজি নই। এরা দু'জনেই অবশ্য ভালবাসাও চায়। ভালবাসতে চায় আপন আপন শর্তে। আপনার কী কী অসুখ আছে জিজ্ঞেস করতে পারি? (চিত্রা)

এতদূর আসার পর ক্ষিতীশ মন খুলে হাসতে পারে। ওর দেখাদেখি চিত্রাও হাসে। ইতিমধ্যে বাড়ির চাকর গৌরাঙ্গ ট্রে-তে করে চা ও কিছু নোনতা খাবার নিয়ে এসেছে। সোফার সামনে নিচু টেবিলের ওপর সেগুলো রাখল। চিত্রা বলল, আমি চা ছাঁকছি। তুমি যাও। ফরসা গেঞ্জি আর পাজামা-পরা যুবক গৌরাঙ্গ পেছন ফিরে আড়ালে চলে গেল।

চিত্রা জিজ্ঞেস করল, কতদিন কাজ করছে ও?

ক্ষিতীশ বলল, তা ন'-দশ বছর হবে। ষোলো বছর বয়েসে এসেছিল, এখানেই বড় হয়েছে। বকুর সমানবয়সি। মানে, আমার ছেলের। বিয়েথা হয়েছে, ওর ছেলেপুলেও আছে। বছরে একবার-দু'বার বাড়ি যায়। সাতদিন বলে দেড়মাস পরে ফেরে। মীরা বহুবার ওকে ছাড়িয়ে দেবে বলেছে কিন্তু ছাড়ায়নি। বিশ্বাসী। সব কাজ জানে।

চিত্রা চা ছেঁকে ক্ষিতীশকে কাপটা এগিয়ে দিল। বলল, বাড়িখানা তো পরিষ্কারই রাখে দেখছি। নাকি আপনিও হাত লাগান?

না, না। আমি ওসব পারি না। পারিনি কখনও। মীরা চলে যাওয়ার পর—একটু আধটু দেখাশোনা করতে হচ্ছে। একেবারে তো এদের ওপর সবকিছু ছেড়ে দেওয়া যায় না।—ক্ষিতীশ বলল, আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলি, তেমন কোনও বড় অসুখ আমার নেই এখনও। একটু বেশি সিগারেট খাই বলে সকালের দিকে একটা দমকা কাশি হয়। ব্লাডপ্রেশার ছিল না, মীরার অসুখের সময় ধরা পড়ল। ওষুধ খেয়ে চেপে রাখি। না, না, বেডপ্যান দেওয়ার সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে নেই।

চিত্রা বলল, সিগারেট খাওয়া কমাতে হবে।

সেদিন কথাবার্তা এই অবধি। একসময় কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল দু'জনেরই। বোঝা যাচ্ছিল, একসঙ্গে বসবাস করার বিষয় নিয়ে ওরা নিজের নিজের মতো করে আরও ভাবতে চায়। সময় চায়।

শুধু যাবার সময় চিত্রা জানতে চাইল, ধারেকাছে বিশেষ বইপত্র দেখছি না।

ক্ষিতীশ বলল, আছে কিছু। সব ওপরে। তবে লাইব্রেরি যাকে বলে, তেমন কিছু না। একটা কাচের আলমারিতে কিছু বই আছে। রবীন্দ্ররচনাবলী, শেকসপিয়র, শরৎচন্দ্র, আগাথা ক্রিস্টি—এইসব। পড়ার জন্যে নয়, রাখার জন্যে। মীরা সব সময় তালা দিয়ে রাখত, সেইভাবেই আছে। চাবিটা কোথায় খুঁজে দেখতে হবে।

আমার কিন্তু অনেক বই। রাখার জায়গা হবে তো?

খুব স্বাভাবিক। পড়াশোনা আপনার পেশা। মানুষ থাকলে বইও থাকবে। আসলে আমাদের বই পড়ার অভ্যেস নেই। সময় কোথায়? খবরের কাগজ পড়াই পড়া। এবার অভ্যেস হবে। চাবির কথায় মনে পড়ল, আপনি ড্রাইভিং জানেন?

না। গাড়ি থাকলে তো ড্রাইভিং। মাস্টারির কাজ করে গাড়ি মেনটেইন করা যায় না। তা ছাড়া, কলকাতায় পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এত রকম আছে, গাড়ির দরকার হয় না। চলে যায় গাড়ি ছাড়াই। জার্মানিতে দেখেছি, প্রত্যেক লোকের একটা করে গাড়ি। রাস্তা দিয়ে কেউ হাঁটে না।

আমেরিকাতেও। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে লোকে তাকিয়ে দেখে। আমার ছেলে, বকু, ওখানে পড়ছে, ওরও গাড়ি আছে।

শিখে নিতে হবে। বলেছিল চিত্রা। শেখার কি আর শেষ আছে।

মাসখানেক পরে একটা নিষ্পত্তি হল সমস্যার। অনেক ভেবেচিন্তে, ঠিক হল, আপাতত চিত্রা এখানে পেয়িংগেস্ট হয়ে থাকবে। ওর নিজস্ব আলাদা ঘর থাকবে। ওপরের একখানা ঘর। খাওয়াদাওয়া একসঙ্গে—রাত্রে। দিনেরবেলায় যার যেমন প্রয়োজন। কেউ কারুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। প্রথম দিন চিত্রা বলেছিল, বাড়ি ঢোকার একটা চাবি পেলেই হল। এখন যোগ করল, বেরিয়ে যাওয়ার পথটাও খোলা রাখা উচিত।

বাড়ি বদলের দিন চিত্রার দাদা এসেছিলেন। বিমলবাবু। সবকিছু দেখে খুব একটা অনুমোদন করেননি বোনের এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু আপত্তিও করেননি সম্ভবত তাঁর স্ত্রীর পরামর্শে। তাঁকে দু'দিক ভেবে চলতে হয়। তাঁর মনের কথা, বিয়েটা হয়ে গেলে হত। এভাবে থাকায় সমাজের স্বীকৃতি নেই। ময়নার বোঝা উচিত।

আমি তো টাকা দিয়ে থাকছি দাদা। দু'জন পরিণত বয়েসের মানুষ প্রতিবেশীর মতো থাকতে পারে না? তুমি আমার চুলকাটার সময়েও বলেছিলে, সমাজ। সমাজ কোথায়? সমাজ তোমার মনে।

ক্ষিতীশ আবার লক্ষ করে যে চিত্রার মাথার চুল ছোট করে কাটা। মেমসাহেবদের মতো। কুচকুচে কালো চুল এই বয়েসে। নিশ্চয় কলপ দেয়। চিত্রার স্বাস্থ্য ভাল। পরিশ্রম করা চেহারা। কপালে টিপ। চোখে কাটা কাচের চশমা। এক হাতে চুড়ি, অন্য হাতে ঘড়ি। গালের হাড়দুটো একটু উঁচু হয়ে থাকলেও চেহারায় লাবণ্য আছে। ঠোঁটে রং মাখে না চিত্রা। হাসলে ওকে সুন্দর দেখায়। সেটা ও জানে। তাই

কথায় কথায় হাসে। প্রথম দিন চিত্রা শাড়ি পরে এসেছিল। আজ সালোয়ার কামিজ পরে এসেছে।

গৌরাঙ্গ জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করল। কাজের মেয়ে বেশিক্ষণ থেকে ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। পেছনের বারান্দায় ওর শোবার জায়গা।

ক্ষিতীশ দেখল, সবটাই কেমন একা-একা। মীরা যখন ওর সংসারে আসে, তখন কত লোকজন, কত হইহই। মীরার কী জড়োসড় ভাব। চোখের জল তখনও শুকোয়নি। ওর গায়ে কত গয়না ছিল। মাথায় ঘোমটা ছিল। আবার মনে হল, মীরার সঙ্গে চিত্রার তুলনা করাটা ঠিক হচ্ছে না।

সেদিন রাত্রে বকুর টেলিফোন আসে আমেরিকা থেকে। সাপ্তাহিক কল। দেওয়া-নেওয়ার মতো তেমন খবর দু'-তরফের কারোর নেই। থাকলেও এখন বলা যাচ্ছে না।

পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকলেও এটা যে ক্ষিতীশ আর চিত্রার লিভ-টুগেদার করার প্রস্তুতি, তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। কিছুকাল এক বাড়িতে থেকে ওরা পরস্পরকে বুঝতে চায়। কম বয়েসে ভাবাবেগের তাড়না থাকে, তাতে দু'জন নারীপুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগে না। এখন এই পরিণত বয়েসে দু'জনেই অভিজ্ঞ, সাবধানী, তাই ভাবাবেগের বদলে বিবেচনার ভূমিকা বেশি। তবু, এর মধ্যেও ক্ষিতীশ তার অতিথিকে প্রায় প্রত্যহ জিজ্ঞেস করতে ভোলে না, তার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো। সকালের দিকে দু'জনেই কাজে যাওয়াব জন্যে ব্যস্ত থাকে। অনেক টেলিফোন আসে ক্ষিতীশের। ও কাজে বেরিযে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পর চিত্রা তৈরি হয়ে কলেজে বেরোয়। ও ফেরার আগেই চিত্রা ফিবে আসে বাড়িতে। স্নানটান সেরে নীচে বসার ঘরে নেমে যায়।

গৌরাঙ্গ চা-জলখাবার এনে দেয়। চিত্রা টিভি চালিয়ে বসে হয়তো। না হলে একটা বই খুলে পাতা ওলটায়। ওই ঘরেই একটা মিউজিক সিস্টেম আছে। বহুদিন অব্যবহৃত ছিল, পরিষ্কার করে ধুলো ঝেড়ে চালু করে নিয়েছে। কখনও একখানা ক্যাসেট লাগিয়ে বসে থাকে। আর অপেক্ষা করে ক্ষিতীশের গাড়ির শব্দ শোনার জন্য। রাত্রে গুডনাইট বলে নিজের নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে।

এইভাবে চার মাস কেটে গেল।

একদিন চিত্রা লক্ষ করল, বাড়ি ফিরে আপিসের পোশাক বদলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ক্ষিতীশ গুনগুন করে গান গাইছে। 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি'।

খুব যে ফুর্তি দেখছি আজ, কী ব্যাপার? চিত্রা জিজ্ঞেস করল।

জানো, আজ আপিসে এক কাণ্ড হয়েছে।

কী রকম?

আমার সেক্রেটারি মিসেস ডি সিলভা হঠাৎ বলে, অনেকদিন পর স্যারকে নিজের ফর্মে দেখছি। অমনি আমি ওকে চার্জ করলাম। কীসে দেখলে? কাজের জায়গায় আমি বরাবর ফর্মেই থাকি। একটু ঘাবড়ে গিয়ে ও বলল, তা হলেও।—তা হলেও কী?—ও বলল, আই কানট এক্সপ্লেইন।

—এই কথা বলল? চিত্রা হেসেই অস্থির। বেচারা। মেয়ে তো, বুঝতে পারে, মুখ ফুটে বলতে পারে না। বস যে।

এতক্ষণ একটা কথা পাঠকদের বলা হয়নি।

যে, ক্ষিতীশ আর চিত্রার মধ্যে একটা গোপন চুক্তি হয়েছিল। যদি কোনওদিন গৃহস্বামী ও পেয়িং গেস্টের শারীরিক সম্পর্ক হয়, তবে যে সেটা প্রস্তাব করবে, তাকে পাঁচশো টাকা জরিমানা দিতে হবে। চিত্রার ইচ্ছাতেই এই চুক্তি হয়। খুব ছেলেমানুষি চুক্তি সন্দেহ নেই।

সেদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর গল্প করতে করতে হঠাৎ ক্ষিতীশ বলে বসল, আজ আমি পাঁচশো টাকা জরিমানা দিতে চাই।

বলে, চিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল প্রার্থীর মতো।

ব্যাপারটা বুঝে উঠতে এক মুহূর্ত সময় লাগল চিত্রার। তারপর মুখ নিচু করে বসে রইল খানিকক্ষণ।

কী হল?

চিত্রা বিড়বিড় করে বলল, আমার ভয় করছে।

কিচ্ছু ভয় নেই। বলে ক্ষিতীশ চিত্রার হাত ধরে,—চলো ওপরে যাই। ওপরে উঠে চিত্রা বলে, দাঁড়াও দাঁত মেজে আসি।

ক্ষিতীশের ঘরে ঢুকে কিন্তু চিত্রার পা কাঁপতে থাকে। ঘরের মধ্যে অপরিচিত গন্ধ। বইয়ের শেলফের ওপরে যেখানে মীরার ছবি রাখা থাকতে দেখেছে একদিন, সেখানে আজ একটা ফুলদানি। তাতে কিছু লাল ফুল। ওই লাল ফুলের গুচ্ছের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ চিত্রাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। ওর মুখখানা উঁচু করে নিজের কাছে টেনে আনে। গভীরভাবে চুমো খায়।

চিত্রার শরীরের মধ্যে অজানা ঢেউ উঠছে। নিজেকে ও আর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারছে না। টলে পড়ে যাবে মনে হচ্ছে। একী! ক্ষিতীশ ওর কোমর জড়িয়ে ধরে নিয়ে এল বিছানার কাছে। চিত্রার মনে হল ও যেন সমুদ্রের ওপর একটা ছোট নৌকোয় চড়ে ভাসছে। আর বাতাস বইছে ভীষণ জোরে। সেই বাতাসে ওর পরনের জামাকাপড়-ব্রেসিয়ার সব উড়ে যায় বুঝি। কিছুতেই ও সামলাতে পারছে না।

চিত্রা ভেবেছিল ক্ষিতীশকে কনডোম পরতে বলবে, তাড়াহুড়োতে বলতে ভুলে গেল। সঙ্গমের শেষে ক্ষিতীশ রুমাল দিয়ে মুছে দিল জায়গাটা।

ক্ষিতীশ গুনগুন করছে অন্ধকারের মধ্যে: তোরা শুনেছিস কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি। একটু ভুল গাইছে। হোকগে।

কার পায়ের ধ্বনি? কার পায়ের ধ্বনি। ভাবতে ভাবতে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে একসময়।

এই ঘটনার পর দু'দিন কি তিনদিন চিত্রা বিভ্রান্ত ছিল।

সকাল সকাল উঠে তৈরি হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। কলেজে যাবার আগে বহুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। মেট্রোয় চড়ে টালিগঞ্জ থেকে দমদম গেছে, দমদম থেকে রবীন্দ্রসদন। ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছে যাতে নিজেকে নিজের সামনাসামনি হতে না হয়। দেরি করে বাড়ি ফিরে একেবারে শুয়ে পড়েছে নিজের ঘরে। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলেনি।

ক্ষিতীশ লক্ষ করছিল কিন্তু ওকে বিরক্ত করেনি একবারও। আত্মসমর্পণ তো, তাব একটা শক পেয়েছে চিত্রা, বোঝাই যায়, সুস্থ হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে, ও জানত। মেয়েদের জীবনে এই শক অনেক কম বয়েসে আসে। তখন শরীর সেটা সহ্য করতে পারে। শরীর আরও অনেক কিছু সহ্য করার ক্ষমতা রাখে তখন। বিয়াল্লিশ বছর বয়েসে মেয়েদের শরীর-মন কিছুই তেমন নমনীয় থাকে না। খুব ব্যক্তিগত গোপন জায়গায় আঘাত পেয়ে ভেঙে পড়েছে মেয়েটা, ওকে সারিয়ে তুলবে ক্ষিতীশ। ওকে বোঝাবে, ক্ষতি হয়নি কোথাও।

রবিবার এসে যাওয়ায় এর ছেদ পড়ল।

সেদিন ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে গম্ভীর স্বরে চিত্রা বলল, কাজটা ভাল করিনি আমরা।

ক্ষিতীশ খাওয়া থামিয়ে বলল, চুক্তি অনুযায়ী জরিমানার টাকা আমি ওই বাকসে রেখে দিয়েছি। আমারই দোষ। আর যাতে এর পুনরাবৃত্তি না হয় আমি দেখব।

আমি তা বলিনি।

তোমার সংস্কারে লেগেছে ময়না। (ময়না ওর ডাকনাম, বিমলবাবুর কাছে জেনেছিল), কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিনি।

জানি না, কোথায় পৌঁছোব এভাবে। একটু হাসার চেষ্টা করল চিত্রা। সেদিন তোমার যা উৎসাহ আর উদ্যম দেখলাম, জানি না, কতদিন তোমার আগ্রহে সাড়া দিতে পারব আমি। এই শরীরটাব আর ভাঙার বয়েস নেই।

ব্যথা পেয়েছ। ঠিক হয়ে যাবে। ক্ষিতীশ বলে, আমার বয়েসও কি বসে আছে? তোমার চেয়ে আমি বারো বছরের বড়। তাই বলছিলাম, দিন ফুরিয়ে যাওয়ার আগে আমাদের অনেক টাকা জরিমানা জমিয়ে ফেলা দরকার।

বলে নিজেই হাসল ক্ষিতীশ। চিত্রা ওর দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙাল, যেন গৌরাঙ্গ কথাটা শুনে

ফেলবে। শুনুক না, গোপন কথার অর্থ উদ্ধার করতে পারবে না।

তারপর?

তারপর আর জরিমানা দিতে হবে না। জমানো টাকায় বাকি জীবন চলে যাবে আমাদের।

তুমি ভরসা দিচ্ছ? চিত্রা বলে, আচ্ছা, তুমি রাত্তিরে ভাল করে ঘুমোও না কেন? কেবল উসখুস করো?

অভ্যেস।

তোমার জন্যে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এত খাটাখাটুনির পর যদি ঘুম না হয় ঠিকমতো—

এই দুশ্চিন্তাটাও ভাল লক্ষণ ময়না। বোঝা যায় দই বসেছে।

দই?

হ্যাঁ। দই পাতা খুব শক্ত কাজ। তুমি পারো?

শিখে নেব।

সেদিন ঘুরে ঘুরে বাড়ির অনেক কিছু যাচাই করে চিত্রা। আবিষ্কার করে, ক্ষিতীশের বিছানার পাশে দেয়ালে গাঁথা একটা সুইচ।

এটা কীসের?

এটা পাশের ফ্ল্যাটের সঙ্গে লাগানো একটা কলিং বেলের। বলেছিলাম, একলা থাকি, ক্রাইসিস হলে ডাকব। বলা তো যায় না, কখন বুকে ব্যথা উঠবে। ওদের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি। খুব ভাল লোক। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই।

চিত্রা বলল, আজই আলাপ করব গিয়ে। বলে আসব, কলিংবেলের আর দরকার নেই। আমি এসে গেছি।

❀ সভাঘরে একদিন

এটা কবিতা লেখার থিম। পাছে গুছিয়ে উঠতে না পারি, আর তারপরে ভুলে যাই, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে নামিয়ে দিচ্ছি।

বত্রিশ বছর পর সেদিন কলেজ স্ট্রিট পাড়ার স্টুডেন্টস হল নামক সভাঘরে গিয়েছিলাম। দেখলাম, সবকিছু অবিকল তেমনই আছে। ছাতাপড়া দেয়াল। ঘাড় তুললে লোহার বিম দেখা যায়। বড় বড় জানলায় কোথাও কোথাও কাগজ সাঁটা। বোধহয় ওখানে কাচ নেই। দু'খানা তক্তপোশ জোড়া দিয়ে মঞ্চ। তার ওপর সাদা চাদর পাতা। চেয়ারগুলো সব সবুজ রঙের। মঞ্চের ওপরে সাতখানা কাঠের চেয়ার, মাঝখানেরটা একটু উঁচু। ওটা সভাপতির। সভাঘরের চেয়ারগুলি টিনের। মঞ্চের ওপর সেদিন মাঝখানের চেয়ারটায় বসে শ্রোতাদের দিকে তাকালাম। জনা চল্লিশ হবে। ঘরের অর্ধেকের বেশি খালি। সবসুদ্ধ বোধহয় একশো জনের বসার জায়গা আছে স্টুডেন্টস হলে।

বত্রিশ বছর আগে যেখানটায় দাঁড়িয়ে কবিতা পড়েছিলাম, সে-দিনও ঠিক ওইখানে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়লাম। সামনে মাইক ছিল। সম্ভবত বত্রিশ বছর আগের মাইকটাই। অনেকগুলো টিউবলাইট জ্বলছিল ওপরে। আলো কেমন ঘোলা ঘোলা। সেদিনের সভায়, একেবারে সামনেই প্রেমেন্দ্র মিত্র বসেছিলেন। এবার তিনি নেই। আমার পড়ার মধ্যেও ছিল না কোনও দৃপ্ত স্বর, বরং কেমন যেন একটু স্নেহ ভাব জড়িয়ে ছিল। উদ্যোক্তা শ্রোতা সবাই আমার চেয়ে বয়সে ছোট। তারা আমার সম্পর্কে কিছু কিছু খবর

জানে। যা আগেরবার জানত না।

মাইকম্যানকে দেখে আমি একেবারে চমকে উঠেছি। আমারই মতো বয়স হবে তার। সভায় সবাই সেজেগুজে এসেছে সাধ্যমতো, কেবল ওই একজন—মাইকম্যান, তার পরনের জামাকাপড় একেবারেই সাদামাটা। গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি, তার ওপর একটা চেক চেক সুতির র‍্যাপার। মুখে দু'দিনের বাসি দাড়ি, কাঁচাপাকা। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। আমার মনে হল, আগের বারে ওই লোকটাই মাইক ঠিক করেছিল। ওর নাম ইদ্রিস আলি হলেও হতে পারে। আমি আর জানতে চাইলাম না। যদি মিলে যায়! একবার আমার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। ওর চশমার একটা কাচ মোটা, তার পেছনের চোখটা বড় দেখাচ্ছিল। অন্য চোখটা স্বাভাবিক। মাথার চুল উসকোখুসকো। সভায় যখন গান হচ্ছিল, 'দুই হাতে কালের মন্দিরা যে—সদাই বাজে', তখন আমার মনে হল ওই ইদ্রিস আলিই আসলে মহাকাল।

ঝুমুর মিত্র সেদিন নাচ করল। এগারো-বারো বছর বয়সের মেয়ে। বুকে ছোট ছোট দুটি গুটি। লাল জামা, লালপাড় শাড়ি, কোমরে আঁচল গোঁজা। পায়ে আলতা। ওর গালেও আলতার ছোপ। চোখে কাজল। মুখে হাসি। নাচের শেষে ঝুমঝুম ঝুমঝুম শব্দ করতে করতে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। শুধু বত্রিশ নয়, আমার মনে হল, গত একশো বছর ধরে এই ঝুমুর মিত্ররাই এই রকম সভায় নাচ করে। নাচ হয়ে গেলে পর ছুটতে চুটতে নেমে গিয়ে সভাঘরের চেয়ারে মায়ের পাশে গিয়ে বসে। কিংবা, নাচের দিদিমণিব পাশে। ওর নাচের সময় অনেক ছবি উঠল ফ্ল্যাশে। এপাশ থেকে ওপাশ থেকে। ভিডিয়ো ক্যামেরাও ছিল। মাঝে মাঝেই তেজি আলো ফেলছিল মুখের ওপর। আমার ভাল লাগছিল না।

আমি ভাবছিলাম, আর দশ কি বারো বছর। এই ঝুমুর মিত্রর ৰিয়ে হয়ে যাবে। এ মল্লিকা সারাভাই বা মঞ্জুশ্রী চাকির মতো নাচিয়ে হবে না। এ নাচতে আসেনি পৃথিবীর খ্যাতির মঞ্চে। মুখ দেখলেই বোঝা যায়। আমি বুঝতে পারি। যেমন বুঝতে পারি, কে কবিতা লিখতে এসেছে আর কে কবিতা লিখে, প্রচার করে, পুরস্কার লুটে, নাম করতে এসেছে। কোথায় ওর বিয়ে হবে, ঝুমুর জানে না। দুর্গাপুরে হতে পারে, আবার কলাম্বিয়াতেও হতে পারে। আদর্শ পাত্রী হওয়াব জন্যে সে প্রস্তুত হচ্ছে। এখন নির্ভর করছে কে ওকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

ওর জীবনে ওই একটি বিন্দুতে অনিশ্চয়তা। তারপর নাচফাচ ভুলিয়ে দিয়ে ওকে লাগিয়ে দেওয়া হবে গৃহকর্মে। গৃহকর্মকে আমি ছোট কাজ মনে করি না, কিন্তু মল্লিকা সারাভাই কি হেঁশেলে যান? তো, এই মেয়ের নিজস্ব আলমারিতে একটা অ্যালবাম থাকবে। তাতে ওর আইবুড়োবেলার অজস্র ছবি। সাদাকালো, রঙিন—দু'রকমই। তার মধ্যে এই স্টুডেন্টস হলে নাচের ছবিও। সে প্রতিবেশীদেব কাছে গর্ব করে বলবে, "এই দেখো, কলকাতায় নামী মঞ্চে আমি একসময় নাচতাম। তার খবব অনেক পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছিল।"

জীবিত থাকার ফলে আমি এখন বড় হয়েছি (হায়!)। আমার হাত দিয়ে সেদিন একটি নতুন কবিতা পত্রিকার, আর একটি নতুন কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ঘটল। সবাই প্রার্থনা করলাম, পত্রিকাটি যেন দীর্ঘজীবী হয়। কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা যেন অমর হয়। চকচকে কাগজের মোড়ক খুলে আমি যখন মলাটগুলি মেলে ধরলাম, আর, ফটাফট ছবি উঠল, তখন এ বিষয়ে কারও মনে একটুও সন্দেহ থাকল না। সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাততালি দিল।

কেবল ইদ্রিস আলিকে দেখলাম, নির্বিকারভাবে মাইকের মুন্ডুটা ওঠাচ্ছে, নামাচ্ছে। ডাইনে-বাঁয়ে সরাচ্ছে দরকারমতো। তারপর আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। ঢোলা পাজামার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে-আসা ওর সরু দু'খানা পায়ে কোনও তৎপরতা নেই। ওর হাতেও কালের মন্দিরার মতো কিছু বাজছে না। প্রতিদিন ও এই একই কাজ করে যাচ্ছে সারাজীবন। ছাতা-পড়া এই সভাঘরে দিনের-পর-দিন লোকে এসে হাজির হয়। পেছনের দেয়ালে ফেস্টুন লাগায়। চাদর পাতে মঞ্চের চৌকিতে। শপিং ব্যাগ ভরতি করে নিয়ে আসে গলা-কাটা ফুলের গুচ্ছ, খাবারের প্যাকেট, তবলা, হারমোনিয়ম। তারপর ওর মাইকটাকে পরীক্ষা করে। পরীক্ষা করার কিছু নেই। গত পঞ্চাশ বছর ধরে ওই মাইক হাজার হাজার বক্তার বক্তৃতা, কবির কবিতা, আর গায়ক-গায়িকার গান প্রচার করে এসেছে। ছুড়ে দিয়েছে বিভিন্ন সুরের শব্দ ওই মহাকালের উদ্দেশে।

মহাকাল সেগুলি ধরে রাখছে কিনা ও,—মানে ইদ্রিস—জানে না। আমার মনে হয়, ও জানে সবই তাৎক্ষণিক। কিন্তু সে-কথা ও কাউকে বলে না। অনুষ্ঠানগুলো হতে দেয়। লোকে যদি মনে করে

চিরায়ত, শাশ্বত, স্থায়ী কোনও ছাপ পড়ল কোথাও, সে মনে করুক। ওর কিছু যায়-আসে না। মানুষ তো কিছু নিয়ে থাকবে। সাড়ে আটটা বাজলেই ইদ্রিস আলি ঘড়ি দেখতে শুরু করবে। তাই দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠবে উদ্যোক্তারা। কাকে রাখবে, কাকে বাদ দেবে, ভেবে পাবে না। এই নিয়ে বাদানুবাদ হবে ওদের মধ্যে। বিশৃঙ্খলাও হতে পারে। কেননা, সম্পূর্ণ ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ তো ময়দানের রাজনৈতিক সভা নয়। একটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান।

সভার শেষে এক হাতে গরম কেটলি আর অন্য হাতে ভাঁড়ের কাঁদি নিয়ে ঢুকবে চায়ের ছোকরা। চা খেয়ে, নাস্তা করে চলে যাবে লোকেরা। ন'টা বাজলে নিবে যাবে সভাঘরের আলো। দরোজায় তালা দিয়ে তার নিজের আস্তানায় ফিরে যাবে ইদ্রিস আলি। যদি ওর নাম ইদ্রিস আলি হয়। পরের দিন সন্ধেবেলাটা ধার্য আছে আবার একটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের জন্য।

চারকোণা

শ্যামবাটি ছাড়িয়ে আর একটু এগিয়ে গেলে বাঁদিকে সার সার বাগানওলা বাড়ি পড়ে। ওটা শিল্পীদের পাড়া। শান্তিনিকেতনের সীমানা ছাড়িয়ে জায়গাটা, কিন্তু অধিবাসীরা যেহেতু কোনও-না-কোনও ভাবে কলাভবনের সঙ্গে যুক্ত, তাই তাদের বাড়িগুলিও ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্যের ছাঁচে গড়া। ভেতরের সাজসজ্জাও তদনুরূপ পরিচ্ছন্ন। সেই রকম একটি বাড়িতে চণ্ডীদাস মালের গান শুনতে গিয়েছিলাম। বড় ভাল কাটল একটা সন্ধে।

বেরিয়ে এসে খানিক হেঁটে পিচের রাস্তায় উঠলাম। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশে তারা ফুটফুট করছে। হাওয়া নেই। হিম পড়ছে নিঃশব্দে, কৃতজ্ঞতার মতো। বাইরেটা বেশ অন্ধকার কিন্তু আমার হাতে তিন ব্যাটারির টর্চ ছিল। চিন্তা নেই। মাথার ওপর একঝাঁক মশা গুনগুন করছে।

চুরুট-পোড়া গন্ধ নাকে লাগতেই থমকে দাঁড়ালাম।

পেছন থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, মাত্র সাড়ে সাতটা। এখনই গেস্ট হাউসে ফিরতে হবে?

তাকিয়ে দেখি, ছোটখাটো চেহারার এক বয়স্ক বাঙালি, মাথায় টুপি, মুখময় দাড়ি। পরনে বোধহয় জিনস। গানের আসরে ইনিও একজন শ্রোতা ছিলেন। আলাপ হয়নি। কিন্তু চিনেছেন আমাকে।

তিনি 'বুধুয়া' বলে ডাকলেন। একটা রিকশা এগিয়ে এল। আমরা দু'জন তাতে উঠে বসলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, এখান থেকে কত দূরে আপনার আস্তানা?

প্রান্তিকের কাছে, খুব দূরে নয়।

এই ভদ্রলোকের নাম দেবীপ্রসাদ মিত্র। আমেরিকান সিটিজেন। পেশায় ইঞ্জিনিয়র ছিলেন, অবসর নেওয়ার পর শান্তিনিকেতনে বাড়ি করেছেন। প্রকৃতির ঝোঁক বৃত্ত গড়ার দিকে। প্রযুক্তিবিদ মানুষ তার মাঝখানে সমকোণ তৈরি করে। দেবীপ্রসাদবাবুর বাড়ি অনেকগুলো সমকোণ দিয়ে গড়া, আসবাবপত্রও সে রকম। কফি খাওয়ালেন, তার কাপটাও চারকোণা। আমার ভালই লাগল। একসময় আমি জানতে চাই, লোকে যখন আমেরিকায় যাওয়ার জন্যে লাইন দিচ্ছে, তখন আপনি এই মফস্‌সলে এসে ঘাঁটি গাড়লেন। কী ব্যাপার?

আপনি ভাবছেন, সাংস্কৃতিক মন, কেমন! না, তা নয়। বিশুদ্ধ ব্যবহারিক সুবিধের জন্যে। আমেরিকা কাজের দেশ। বুড়ো বয়সে কেউ দেখে না। সব কাজ নিজেকে করতে হয়। কী দরকার? এখানে বহাল তবিয়তে আছি। ওই রিকশাওলা আমার বাঁধা। ওই পানু, সাঁওতাল, স্বামী পরিত্যক্তা, আমার হাউসকিপার—যে কফি এনে দিল। ওর হাতের গ্রিলড চিকেন খাবেন ডিনারে। সুন্দর মহুয়া বানায়।

আমার বাঁধা। ওর মেয়ে পেয়ারা—বাঁধা। আমি একজন লোক, তিনজন আমার সাহায্যকারী।

ফ্যামিলি?

সব ফিলাডেলফিয়ায়। জীবন উপভোগ করছে।

সাঁওতাল বলতে আমার মনে পড়ল, এই একটি জায়গা যেখানে উচ্চশিক্ষিত বাঙালিবাবু আর নিরক্ষর আদিবাসী পাশাপাশি বসবাস করে। সাঁওতালদের সাক্ষর করা বুড়ো বাবুদের এক প্রিয় কাজ। সামাজিক কাজ। অনেক দিন ধরেই চলছে।

জিজ্ঞেস করলাম। এরা কি সাক্ষর?

দেবীপ্রসাদ মিত্র হেসে ফেললেন। বললেন, এই একটা ব্যাপারে এরা ভারী জেদি। কিছুতেই সাক্ষর হবে না। বলে, পড়ালিখা করে কী হবেক? টিভি-তে সব তো দেখা যায়। তবু আমি চেষ্টা করেছিলাম। পানু বলে, অ-আ শিখতে বললে আলাদা টাকা লাগবে। পেয়ারার একটা দু'বছরের বাচ্চা আছে। তাকে কোলে নিয়ে ছবি তুলতেও দশটাকা চার্জ করে। আমি বাধা দিই না। দু'পয়সা করে খাক।

আমরা যে-চৌকো সোফায় বসেছিলাম, তার বাঁপাশের দেয়ালে দু'জন কোট-পরা লোকের চৌকো ছবি ঝুলছিল। একজন দাড়িওলা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নন। আমি দেখেও দেখিনি।

দেবীবাবু যে একটি সাংঘাতিক লোক আমি ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম। আমার ফেরার কোনও তাড়া নেই। বুধুয়া পৌঁছে দেবে, সে যত রাতই হোক। ইতিমধ্যে দুটি চারকোণা কাচের গ্লাসে বাড়ির তৈরি মহুয়া রেখে গেছে পেয়ারা। ওদিকে মৃদু মাংস পোড়া গন্ধ আসছে।

হঠাৎ আমি জিজ্ঞেস করে বসি, এখানে বেশ মশা। আর নিত্য লোডশেডিং। আপনার অসুবিধে হয় না? আমেরিকায় তো—

ডলার আছে আমার। আমেরিকায় যা এক টাকা, এখানে আনলে তার দাম তেতাল্লিশ টাকা। আমি ও দুটোর প্রতিষেধকও কিনে নিয়েছি। তারপর ঘরের কোণ থেকে কোলে তুলে নিলেন ইলেকট্রিক গিটার। বিদেশি সুর বাজাতে লাগলেন।

পানু খাবার দিয়ে ডাকল, তোমরা এসো গো।

খেতে খেতে একসময় বললেন, রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণেই আমার এখানে আসা। আমি জানতাম, তাঁর এই কলোনিতে অনেক ভক্ত থাকবে। আমি থাকব মূর্তিমান এক চারকোণা প্রতিবাদ।

প্রতিবাদ কেন?

ওই দেয়ালে দু'জনের ছবি দেখছেন? ওঁরা হলেন দুই মহাপুরুষ। আশ্চর্য কাণ্ড, ১৮২১ সালেই এই দু'জন, বোদলেয়র আর ডস্টয়ভস্কি, এই পৃথিবীর দু'-জায়গায় জন্মেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চল্লিশ বছর আগে। তাঁরা যা বলে গেছেন, তা পড়ার পর কিছুই আর সুগোলভাবে প্রসন্ন মনে নেওয়া যায় না।

আমি মৃদু আপত্তি করি, আমাদের ঐতিহ্য...

বুলশিট। এতক্ষণ পর একটা আমেরিকান গালাগাল ছাড়লেন দেবীবাবু, বললেন, হাঘরের ঐতিহ্য, কাঁদুনে গান। আমি এখানে 'মিসফিট', তবে মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে হয়ে সেঁটে আছি।

আমি বুঝলাম এই পাগলের সঙ্গে তর্কে না নামাই ভাল। ওঁর বাঁধা রিকশওলার ওপর আমার গেস্টহাউসে ফেরা নির্ভর করছে।

একটা লাল রঙের বাড়ি। দোতলা। দেয়ালে ইটের দাগ কাটা। দরোজা-জানলা সবুজ রঙের। বাড়ির সামনে তিনখানা সিঁড়ি বেশ লম্বা, প্রায় দশ-বারো ফুট হবে। তারপর ফুটপাথ। ফুটচারেক চওড়া, সিমেন্ট বাঁধানো। খুব মসৃণ নয়। ফুটপাথের পর কালো পিচের রাস্তা, কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু হয়ে আবার নিচু হয়ে গেছে ওপারে।

সকাল আটটা বেজে কয়েক মিনিট হবে। পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে, বাজারের দিকে, একটা ময়লা থলি হাতে যেতে যেতে ছাপ্পান্ন বছর বয়সের আধবুড়ো ভদ্রলোক সাধন শাসমল—পরনে খাটো পাজামা আর গায়ে হাফহাতা পাঞ্জাবি—দেখল, ওই তিনখানা সিঁড়ির সবচেয়ে ওপরের সিঁড়িতে বসে আছে এক মহিলা। উসকোখুসকো চুল কোনও রকমে একটু আঁচড়ানো সামনের দিকটায়, গায়ে জড়ানো একটা সবুজ-হলুদ সিনথেটিক শাড়ি, পায়ে হাওয়াই চপ্পল।

তার পাশে একটা ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর নাম তিলু। মেয়েটার বয়েস নয়ের বেশি হবে না। গায়ে স্কুলের ইউনিফর্ম। মহিলা ওই মেয়েটার জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছে। একটু পরে স্কুলের বাস আসবে। পিঠের ব্যাগে গাদাখানেক বইপত্র আর টিফিনের বাকস আর ড্রইং বোর্ড, হাতে ঝোলানো জল-ভরা প্লাস্টিকের বোতল সমেত ওই ন'বছর বয়েসের মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যাবে। দৃশ্যটা সাধন শাসমল দেখছে আর মিটিমিটি হাসছে। তখনও কিন্তু ও জানে না আর একটু পরেই ওর জীবন একেবারে বদলে যেতে চলেছে।

ঠিক সময়ে নীল রঙের বাস এল। মেয়েটা থপথপ করে উঠে গেল বাসে। বাসের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল জোরে। বাসটা খানিক এগিয়ে, বেঁকে, প্রচুর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে গেল বড় রাস্তার দিকে। পাড়া শান্ত। রাস্তার দু'পাশে মাঝারি মাপের ছাতিম আর কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা অল্প বাতাসে কাঁপছে। একটু তফাতে, লেটারবক্সের নীচে ছোট্ট আঁস্তাকুড়, সেখানে ছ'-সাতটি কাক পরস্পরের সঙ্গে বিতর্কে মেতে আছে খামোকা।

সাধন দাঁড়িয়ে ছিল ফুটপাথের ওপর। এবার একটু একটু করে এগিয়ে এল মহিলার দিকে। মুখে সেই মিটিমিটি হাসি। চোখদুটো ছলছল করছে। মহিলা প্রথমে ওকে লক্ষ করেনি, লক্ষ করার মতো এমন কিছু ব্যাপার নয়, আর অন্যমনস্ক ছিল নিজের ভাবনায়, হাঁটুর ওপর দুটো হাত রেখে উঠে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় দেখল সাধনকে। হাসির বিনিময়ে সে-ও হাসল। অর্থহীন সে হাসি।

সিঁড়ির কাছাকাছি অবধি এসে সাধন জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আমাকে দেখে হাসলেন? আপনি আমাকে চেনেন?

মহিলা আর তখনই উঠল না। সিঁড়ির ওপর বসে রইল। পায়ের কাছে শাড়ির প্রান্ত টেনে দিল নীচের দিকে। পেটিকোট দেখা যাচ্ছে। তারপর মুখ তুলে বলল, কই না তো।

সাধন বলল, কিছু মনে করবেন না। আপনার মুখখানা না ঠিক আমার মায়ের মুখের মতো।

একথা শুনে মহিলা একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তার বয়েস খুব জোর পঁয়ত্রিশ। সে কী করে এই আধবুড়ো লোকটার মায়ের মতো দেখতে হয়? অপ্রস্তুত হয়, কিন্তু বিচলিত হয় না। কারণ, পাড়ায় রোদ আসে আর একটু পর। ন'টা নাগাদ। নিঝুম ভাবটা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করে।

সাধন নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলে, আপনার মতো বয়েসে আমার মা ঠিক আপনার মতো দেখতে ছিল। ঠিক ওই রকম ফরসা, ওই রকম চোখ, ভুরু, গাল, ঠোঁট, ওই রকম দুটো গজদাঁত। হাসলে আলো ছড়াত। কত কষ্ট দিয়েছি মাকে, ভাবলে এখন কান্না পায়।

ওমা, তাই নাকি? এ তো ভারী অদ্ভুত ঘটনা। দু'জন মানুষ কি একরকম হয়? আপনার চোখের ভুল।

সাধন জিজ্ঞেস করল, আপনার ডান কানের লতির পেছনে কি লালরঙের জড়ুল আছে? ঠিক লাল না, ব্রাউন?

মহিলা যন্ত্রবৎ নিজের ডান কানের লতি উলটিয়ে দেখায়। সাধন দেখে, অবিকল সেই রকম একটা জড়ুল, জন্মদাগ, খানিকটা চুলে ঢাকা। মায়ের ওই জড়ুলটায় ও কত সহস্রবার হাত বুলিয়ে দিয়েছে। ছোটবেলায়।

সাধন খানিকটা অভিভূত হয়েই ছিল। এরপর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। সিঁড়িতে বসে পড়ে। অবিশ্বাস্যভাবে মহিলার পায়ে দু'খানা হাত রেখে মিনতি করে, মা, তোমাকে আমি ফিরে পেয়েছি, আর হারাব না, তোমার পায়ে একটু জায়গা দাও আমায়।

মহিলা জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী?

অভিরাম।

আমার নাম অবলীলা। আমার কোনও পুত্রসন্তান নেই। তোমাকে দেখে আমার মনে স্নেহ জেগেছে। এই আমার বাড়ি। যদি চাও, তুমি এখানে থাকতে পারো। যতদিন খুশি। আমার ছেলের মতো।—মহিলা বলল।

সাধন বলে, ছেলের মতো না। ছেলে। এখন থেকে আমি অবলীলা দেবীর ছেলে অভিরাম। মা, তোমার শেষবার অসুখের সময় আমি তোমার সেবা করতে পারিনি, আমি তোমার কাছে থাকতে পারিনি। তুমি বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে মারা গেলে। আমি যখন খবর পেলাম, তখন সব শেষ। আর হবে না। এমন অন্যায় কাজ আর কখনও করব না। এই কান ধরছি।

অবলীলা মৃদু মৃদু হাসে। ওর গজদাঁত দুটি বেরিয়ে পড়ে। গজদাঁত থেকে আলো বেরোয়। সাধন তার হাতের ময়লা থলেখানা ছুড়ে ওপারে ফেলে দেয়। তার অতীত জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেই মুহূর্তে। সেদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে তিলু, মানে তিলোত্তমা, সোজা দুড়দাড় করে দোতলায় উঠে গিয়েছিল। তারপর ঘাড় থেকে এক ব্যাগ ভয়ংকব নামিয়ে, ফেলে দিয়েছিল পড়ার টেবিলের নীচে। পায়ের জুতো যথারীতি ছিটকে চলে গিয়েছিল জানলার পাশে। সোজা খাটের নীচে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল নিজের বিছানায়। এই সময়টা ওর খুব একা-একা লাগে। পিঠ ব্যথা করে।

কেননা, ওর মা অবলীলা, কাজ করে এক বিদেশি ব্যাঙ্কে। ফিরতে ফিরতে সন্ধে ছ'টা। নিজে গাড়ি চালিয়ে যায়। নিজে গাড়ি গ্যারাজ করে। মায়ের সঙ্গে ছাড়া তিলুর বেড়াতে যাওয়া হয় না। রান্নাব যে মাসি আছে, সে আর একটু পরে এক গ্লাস দুধ নিয়ে ওপবে উঠে আসবে। দুধটা ছাঁকে না, মুখে সর ঢুকে যায়। কথা বলার কেউ নেই একজন বাড়িতে। বাবা? তোমাদের বলা হয়নি বুঝি, তিলুর বাবা তুলকালাম চৌধুরী কাজ করেন জাহাজে। ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়র। বছরে দশ মাস এক মহাসাগর থেকে আর এক মহাসাগরে ঘুরে বেড়ান হাজাব বকম কার্গো নিয়ে। এক বন্দরে তোলেন তো আব এক বন্দবে নামান। সেই সময় বাড়িতে ফোন করেন। দশ মাস কাজ করার পর দু'মাস ছুটি। অনেক উপহার নিয়ে বাড়ি আসেন বাবা। বাড়িতে উৎসবের ধুম পড়ে যায়। সেই সময় তিলুর মা-ও দিন কয়েকের ছুটি নেয় ব্যাঙ্ক থেকে। ওরা বেড়াতে যায় নানা জায়গায়। কিন্তু সে এখন ঢের দেরি।

এই একটা বাড়ি যেখানে টাকার অভাব নেই। অভাব আনন্দের।

পাশের ঘর থেকে জিনস-পরা একজন ভদ্রলোককে আসতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল তিলু। আরও অবাক হয়েছিল যখন সে ওর ব্যাগ, জলের বোতল, জুতো, মোজা সব ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখল। তারপর খাটে বসে ওব সঙ্গে গল্প করল অনেকক্ষণ। তখন তিলু বুঝল ও অভিরামদা। মায়ের বড় ছেলে। বয়েস বেশি না, মরুভূমির দেশে লেখাপড়া করতে গিয়েছিল বলে, গরমে চুলটুল পেকে গেছে।

এই একটা বাড়ি যেখানে টাকার অভাব নেই। চৌধুবী সাহেব মাসে তিন লক্ষ টাকা মাইনে পান। খরচ নেই, আয়কর দিতে হয় না। নিজের বাড়ি, গাড়ি কলকাতায়, তবু টাকা জমাচ্ছেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এই মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়াবার চাকরি তিনি আর বেশিদিন কববেন না। তখন যাতে জমানো টাকার সুদে সংসার চলে যায়। এদিকে বেড়ে যাচ্ছে বয়েস, ফুরিয়ে যাচ্ছে আয়ু। একটা করে বছরের আয়ু ছত্রিশ লক্ষ টাকায় বিক্রি করছেন চৌধুবী সাহেব, আর এদিকে সংসারটার জোড় খুলে যাচ্ছে।

দিন তো কাটে না, বাধ্য হয়ে অবলীলা চাকরি নিয়েছে ব্যাঙ্কে। ওর অর্থনীতি পড়া ছিল! কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ নিল ছ'মাস। দেখতে খারাপ না। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াক ইন ইন্টারভিউ, চাকরি। পঁচিশ হাজার টাকা মাইনে। কেটেকুটে হাতে পায় আঠারো হাজার। টাকাটা ও জমায়। ভবিষ্যতের কথা ভেবে। বলা তো যায় না। তুলকালামবাবু কী বেশে ফিরবেন। চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতে বসে-থাকা একটা পুরুষমানুষকে সহ্য করা যাবে কিনা। টাকাই তখন বাঁচাবে।

তা হলে সংসারটা চলে কী করে? এসব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই। এসব তুচ্ছ প্রসঙ্গ। সংসার তো

চলবেই। তবু পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে বলে রাখি, চৌধুরী সাহেব প্রত্যেক মাসে এক হাজার ডলার বাড়িতে পাঠান। তার মানে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। তাই দিয়ে কোনও রকমে কুলিয়ে যায়। এই অশান্তির সংসারে এসে ঢুকল অভিরাম।

অভিরাম এসে তিলুর সব টিউটর ছাড়িয়ে দিয়েছে। দুশো টাকা করে ঘণ্টা ফি ছিল ওদের। মামদোবাজি নাকি! তাও আবার জেরক্স কপি দেখে পড়ানো। বইটই নেই। অভিরামদা পড়াশুনো করে চুল পাকিয়েছে, ও একাই একশো। তিলুর ঘরে একটা ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো হয়েছে ঋত্বিকের ছবি নামিয়ে। তাতে অঙ্ক আর বাংলা বানান শেখানো হয়।

এখন সকালে আর অবলীলাকে আগের মতো বাইরের সিঁড়িতে বসে থাকতে হয় না। স্কুলবাস আসা বন্ধ। গাড়িটা রয়েছে কী করতে? অভিরামদা তিলুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসে রোজ। আবার বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। অবলীলাকেও রাজি করিয়েছে। বলে মা, অত সকালে কলকাতার বিচ্ছিরি রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। আমি তো আছি। পৌঁছে দিয়ে আসি। ফেরার সময় তুমি লিফট নিয়ে নিয়ো। গাড়িটা থাকলে সারাদিনে সংসারের অনেক কাজ সেরে ফেলা যায়। অভিরাম আসার পর বাড়িটার রং ফেরানো হল। কতদিন পর। অবলীলা ছেড়ে দিল ড্রাইভ করা।

একদিন তিলু দেখে, নীচে বসার ঘরে সোফায় বসে আছে মা। অভিরামদা কার্পেটের ওপর পা গুটিয়ে বসা, মায়ের কোলে ওর মাথাখানা। প্রথমেই ওর একটু হিংসে হল, তারপর কৌতূহল। কী করছে ওরা। মা বলল, দাদার চুলে কলপ লাগিয়ে দিচ্ছি।

কলপ কী মা?

সাদা চুল কালো করার ওষুধ। মরুভূমিতে থেকে থেকে চুলগুলোর যা দশা হয়েছে।

অভিরাম চোখ বুজে গুনগুন করে গান গাইছে, হোয়্যার দেয়ার ইজ মাদার, দেয়ার ইজ হোম।

আসলে, পাড়ার লোকেরা নিন্দে করেছিল। এ-মা, তিলুর দাদার চুল পাকা। অবলীলাকে বলছিল, এ আবার তোমার কেমন ছেলে? পিসতুতো না মাসতুতো? চুল সব কালো হয়ে গেলে পর ওকে ঠিকঠাক দেখাবে। জিনস পরলে মানাবে। লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেলেও কেউ কিছু বলবে না।

এখন আর কোনও চিন্তা নেই। অভিরামদা এ-বাড়িতে ফিট করে গেছে। স্কুল থেকে ভাইবোনে মিলে যখন হাত ধরাধরি করে এসে গাড়িতে ওঠে, কেউ আর ট্যারা চোখে তাকায় না। বাড়ি ফেরার পথে ওরা ক্লাবে গিয়ে সাঁতার কাটে রোজ। তার ফলে তিলু এর মধ্যেই বেশ লম্বা হয়ে গেল। খাওয়া নিয়ে আর ঘ্যানঘ্যান করে না। মাসি তাতেই খুশি।

এখন সন্ধেবেলা তোমরা ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে যদি যাও, শুনবে, ভেতরে গান হচ্ছে, গিটার বাজছে, তালে তালে পারকাশন। মহিলা-পুরুষের দ্বৈতকণ্ঠ। যন্ত্রে না, জ্যান্ত। চৌধুরী সাহেব না আসতেই বাড়িতে আনন্দের ঢেউ উঠেছে। অভিরাম এসে বদলে দিয়েছে সবকিছু।

এক-এক সময় অবলীলার মনে হয়, বিয়ের পরে পরে চালিয়াতি করে পরিবার কল্যাণ না করলে তখনই ওরা ছেলে-সন্তান পেয়ে যেত। ছেলে-সন্তান পেতে এত দেরি হত না। তবে, দেরিতে হলেও সে তো এসেছে চিনে চিনে।

তুলকালাম চৌধুরী এসব ঘটনার কিছুই জানেন না। তোলানি শিপিংয়ের জাহাজ স্কাই বার্ড কার্গো নামাতে নামাতে আর কার্গো তুলতে তুলতে কলম্বো, রেঙ্গুন, ব্যাংকক, য়াকোহামা ছাড়িয়ে স্যান ফ্রান্সিসকো বন্দরে এসে ভিড়েছে। বন্দরে নেমেই বাড়িতে টেলিফোন।

কী ব্যাপার, তোমরা সব কেমন আছ? তখন ভোর সকাল। তার ওপর রবিবার। সবাই ওভারটাইমে ঘুমোচ্ছে। শুধু অভিরাম নীচের ঘরে ব্যায়াম করছিল। সে-ই ফোন ধরেছে। গলার স্বর শুনে চিনতেও পেরেছে ওপারে কে।

হ্যালো বাবা, আমি অভিরাম। আমরা সব খুব ভাল আছি। তিলু চার ইঞ্চি লম্বা হয়েছে।

অভিরাম? সে আবার কে?

মায়ের ছেলে। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। চিনতে পেরে আমাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে মা। এখন আমি আর তিলু দুই ভাইবোন। তিলু আর একা নয়। তুমি কবে আসছ বাবামণি? আমরা যে পথ চেয়ে রয়েছি।

পথ চেয়ে রয়েছ? ভারী পাকা ছেলে তো। মাকে দাও। বলো, আমি স্যান ফ্র্যান্সিসকো থেকে কথা বলছি।

বলতে বলতে অবলীলা উঠে বসেছে বিছানায়। ওর খাটের পাশেই ফোনের প্যারালাল লাইন। ফোন তুলে বলল, হ্যালো, কোত্থেকে? কেমন আছ?

ধরা গলা। ঘুম থেকে তুললাম নাকি? এখন ওখানে কটা? খেয়াল করিনি।

বাদ দাও তো। কেমন আছ বলো।

আমি ঠিক আছি। তোমাদের ব্যাপার স্যাপার কী? চিন্তা হচ্ছে। অভিরামটা কে? ওই তো ফোন ধরল।

ও, তাই বুঝি। তোমাকে তো বলাই হয়নি। টোকিও থেকে যখন ফোন করলে, তখন ভুলেই গেছিলাম। অভিরাম আমাব ছেলে।

তোমার ছেলে? বিয়ের সময় তো বলোনি তোমার একটা ছেলে আছে। তোমাকে ভার্জিন জেনেই তো বিয়ে করেছিলাম।

তখন ছিল না। ইচ্ছে হয়ে মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। এই তো সেদিন ঠাকুরের কৃপায় ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও বলল, ওর মায়ের মুখের সঙ্গে আমাব হুবহু মিল। এমনকী আমার কানের জড়ুলটা, তুমি তো জানো, সেটাও। কাছে এনে বেখেছি। আমার কোল ভরে গেছে। বিশ্বাস কবো।

ও পাশ থেকে দু'-তিনবার কাশির শব্দ এল। আবার সিগারেট ধরিয়েছে। আমেরিকান সিগাবেট বড্ড কড়া। খাওয়া উচিত না। অবলীলা বলল, সিগারেট খাওয়া কমাওনি?

তুলকালাম ওপার থেকে কাশতে কাশতে বললেন, তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?

কেন?

জানা নেই, শোনা নেই, কে-না কে, একটা জোচ্চোর, তাকে এনে কোলে বসিয়েছ! এক্ষুনি তাড়াও ওকে।

নীচের টেলিফোন থেকে অভিরাম চেঁচিয়ে ওঠে ঠিক সেই সময়। বাবা, আমি জোচ্চোর নই, আমি অভিরাম। বাবা, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। আমি মাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

অবলীলা গম্ভীর গলায় বলল, অভিরাম, ফোন নামিয়ে রাখো। আমাদের কথার মাঝখানে কেন কথা বলছ?

ঠক করে ফোন নামানোর শব্দ হল।

অবলীলা বলল, কেন তাড়াব? অলৌকিক ঘটনা কি জীবনে ঘটে না? তুমি সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করবে? বিশ্বাস বলে কিছু নেই? অভিরাম না হয় একটু আগে এই পৃথিবীতে এসে পড়েছে। কিন্তু ওর মনটা একেবারে শিশু।

শিশু! ওই শিশু একদিন গলা কেটে রেখে যাবে। ঘরের চাবিটাবি ওকে দাওনি তো?

সবই এখন ওর কাছে থাকে। আমার যা ভুলো মন! তুমি এ নিয়ে টেনশন কোরো না লক্ষ্মীটি। অবলীলা বোঝায়।

সর্বনাশ! লীলা, প্লিজ, আমার একটা কথা শোনো। গুরুতর কোনও ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আগে ওকে নীচের গ্যারাজে পাঠাও আপাতত। চাবিটাবি যা আছে ওর কাছে, সব নিয়ে নাও। ওকে চাকরের মতো ট্রিট করো। তারপর, আমি আসছি। আমি ওকে পরীক্ষা করব। সে পরীক্ষায় পাশ করলে অভিরাম শুধু তোমার না, আমাদের দু'জনের ছেলে বলে গৃহীত হবে। তার আগে নয়। ওকে বুঝিয়ে বলো। যদি এতেই চলে যায় তো যাক। ঠিক আছে? রাখছি।

এদিকে অবলীলা তখন কাঁদছে। মা হয়ে আমি কী করে পারব এত নির্দয় হতে? আমার মুখ চেয়ে বাছা এ-বাড়িতে এল—কোনও দোষ করেনি, আমি ওকে বলব, তুমি চাকরের মতো থাকো অভিরাম! সে আমি পারব না।

কিন্তু অভিরামই রাজি করাল মাকে। হোক না, মা, পরীক্ষা একটা হয়ে যাক। আমি আমার নিজের চেহারায় ফিরে যাই। বিছানার পুঁটলি নিয়ে নীচের ঘরে থাকি। ক'টা আর দিন। বাবু ওখান থেকে ছুটি করে প্লেনেই আসবেন মনে হয়। ভয় বড় খারাপ জিনিস, মা। সারাজীবন আমি ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি।

মরুভূমির জীবন। তারপর তোমাকে পাবার পর আমার ভয় কেটে গেছে। বাবুর মনে এখন ভয় ধরেছে আমাকে নিয়ে। ওটা কাটাতেই হবে।

বিদেশের ফ্লাইট সব ভোরবেলা এসে দিল্লি, মুম্বাই পৌঁছোয়। সেখান থেকে কলকাতা দু'-আড়াই ঘণ্টা। একদিন, বলা নেই, কওয়া নেই, সকাল এগারোটা নাগাদ ট্যাক্সি থেকে নামলেন তুলকালাম চৌধুরী। অবলীলা আপিসে গেছে। তিলোত্তমা স্কুলে। মাসি কার্পেটে শুয়ে ঝিমোচ্ছিল, দরোজা খুলে দিল।

এই মুহূর্তে সময় নষ্ট না করে তুলকালাম মাসিকে বললেন, অভিবামকে ডাকো।

অভিরাম এসে দাঁড়ায়। সেই প্রথম দিনের মতো। সাধন শাসমল হয়ে। পরনে খাটো পাজামা আর গায়ের হাফহাতা পাঞ্জাবি। কাঁচাপাকা মাথার চুল। পায়ে মোকাসিন। চোখে কাটাকাচের চশমা। কাঁধে একটা লাল গামছা।

দেখলেন। নির্দয় হতে গিয়েও হতে পারলেন না তুলকালাম। আঙুলের ফাঁক থেকে জ্বলন্ত সিগারেট ফেলে দিলেন অ্যাশট্রেতে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আগন্তুকের দিকে।

তুমি অভিরাম?

সত্যি কথা বলব। আমার নাম সাধন শাসমল। বয়েস পঞ্চান্ন। সংসাবী মানুষ। চোরও নই, ভিখিরিও নই। একদিন মাকে দেখে আমার কী মনে হল, সব ছেড়েছুড়ে তার আশ্রয়ে চলে এসেছি। মা-ও আমায় ছেলেব মতো নয়, ছেলে মনে করে এখানে ঠাঁই দিয়েছে। বয়েসেব প্রশ্ন অবান্তর হয়ে গেছে। তবে, আপনি হুকুম করেন তো এখুনি চলে যাব। ঢাকুরিয়ায় আমার নিবাস ছিল। আমার বাড়ির লোকেরা কিছুদিন খোঁজাখুঁজি কবে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ফিরে যাব সেখানেই। বা, চলে যাব যেদিকে দু'চোখ যায়।

তুলকালাম বললেন, আপনাকে দেখে কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ক্যালেন্ডারেব ছবিতে এ বকম মুখ আমি দেখেছি। কিন্তু সেটা তো বড় কথা নয়। আমি অবাক হচ্ছি এই কথা ভেবে যে, আপনি পারলেন কী কবে?

জীবনটা বদলে নিলাম। এই যেমন করে লোকে জামা পালটায়। মরুভূমির জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

এত সহজ!

যে কেউ ইচ্ছে করলেই পারে। সাধন শাসমল কাঁধের গামছাটা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে, পাবে না, কাবণ তারা আষ্টেপৃষ্ঠে অভ্যেসের দড়ি দিয়ে বাঁধা। কাল্পনিক দড়ি। আসলে ভয়। অনিশ্চয়তার ভয়। আর, সে বকম সুযোগ তো সকলের জীবনে আসে না। আমি যে রকম পেয়েছি।

সুযোগ?

তা ছাড়া আব কী? সেদিন যদি মা সিঁড়িতে ওভাবে না বসে থাকত, আর আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই গজদাঁত বাব করে না হাসত, আমি জানতেই পারতাম না একটা সুযোগ আছে লাফ দেবার। মায়ের মনের ইচ্ছে মনেই থাকত চিরদিন।

তুলকালাম চৌধুবী সাধনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

সাধন বলল, আমি অভিরাম হয়ে থাকতে চাই। এই বাড়িতে। তিলুর দাদা হয়ে। চৌধুরীবাড়ির ছেলে হয়ে। আপনিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। টাকা জমিয়ে জমিয়ে পৃথিবীতে শান্তি কেনা যায় না, মাকে, বাবাকে, দু'জনকেই আমি বোঝাব।

তারকের মা গঙ্গা। পঞ্চাননতলার কাঠগুদাম লোপাট করে দিয়ে এখন যেখানে উঁচু উঁচু সব রংবেরঙের বাড়ি উঠেছে, চওড়া রাস্তা ফুটেছে, তারই একটার মোড়ে গঙ্গার চায়ের দোকান। স্থায়ী কিছু না। দীর্ঘদিনের অস্থায়ী ব্যবস্থা—যা কলকাতাতেই থাকা সম্ভব।

ইটগুলো সাজানোই থাকে, গঙ্গার বসার আসন। তার বাঁ দিকে তিনখানা বিস্কুটের বয়াম রাখার তাক। ডানদিকে দুধের ডেকচি বসানোর বেদি। আর কোল ঘেঁসে কেরাসিনের স্টোভ, চা-পাতার কৌটো, ছাঁকনি। তিন দিকে ঘেরা ইটের পাঁজা। পেছন দিকে দেয়াল। বড় বাড়ির পাঁচিলের দেয়াল। একটু দূরেই তার গেট। লোহার গেট। দারোয়ান বসে থাকে। দিনরাত মোটরগাড়ি ঢোকে আর বেরোয়। বাদুড় যেমন ওড়ে, তেমনই।

কোনও কাজে না লাগলেও একটা কৃষ্ণচূড়া অবশ্য আছে ওই জায়গাটায়। গঙ্গার মাথার ওপর তার ডালপালা। কাক বসে। বস্তির মানুষদের মতো ঝগড়াও করে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। আর নোংরা করে। খাবার জিনিসের দোকান, উদোম খোলা তো রাখা যায় না, তাই মাথার ওপরে একটা সবুজ রঙের প্লাস্টিক চাদর টাঙিয়ে নেয়। তার একটা খুঁট গাছের কাণ্ডে, একটা খুঁট আলোর থামে আর দুটো খুঁট ওই পেছনের পাঁচিলের গায়ে। চমৎকার চাঁদোয়া। ওই সবুজ রঙের টানে ভোর-সকাল থেকে উঁচু বাড়ির বুড়োবাবু থেকে শুরু করে ওপারের রিকশাওয়ালা ফেরিওয়ালা অবধি সবাই গঙ্গার দোকানে চা খেতে আসে। কেউ কাচের গেলাসে খায়। কেউ ভাঁড়ে। ধুতে হয় দুটোই। এক বালতি জল তো ওই জন্যেই রাখা আছে।

সকালবেলা দু'ঘণ্টা আর বিকেলে দু'ঘণ্টা। মাদার ডেয়াবি থেকে দুধ নামিয়ে দোকান লাগায় গঙ্গা। বারো মাস তিরিশ দিন। কামাই নেই। ডেয়ারির দুধ না পেলে সেদিন গুঁড়ো দুধ ফুটিয়ে নেয় ডেকচিতে।

গঙ্গার আস্তানাটা দোকান থেকে দূরে নয় খুব। ওই উঁচু বাড়িগুলোর পেছনে। রাস্তার ওপরে ওই যে চাপাকল। তার সামনের ফাঁক দিয়ে খানিকটা ভেতরপানে গেলেই বস্তি। আগে অনেক বড় ছিল বস্তিটা, পাঁচশো লোকের বাস ছিল। এখন ছোট হতে হতে তিরিশ ঘরে এসে ঠেকেছে। তার একখানা ঘর গঙ্গার। ছেলেকে নিয়ে ও থাকে। দুলাল বেঁচে থাকতে ওবা ছিল তিনজন। এখন দু'জন।

আধখানা প্যান্ট আর কাপড়ের জুতো-পবা বাবুরা সকালবেলা হেঁটে ফেরার মুখে গঙ্গার দোকানে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ের চা খায়। চিনি দিতে হয় না কিন্তু সমান দাম। এক টাকা পঁচিশ। বয়স্ক মানুষ। ওরা অসুখবিসুখের গল্প করে নিজেদের মধ্যে। খবরের কাগজে যে সব কাণ্ড ছাপা হয়, তার গল্প করে। ওদের মুখে শুনেছে গঙ্গা, এই বড়লোক পাড়া আর বস্তি—পাশাপাশি এ শুধু কলকাতাতেই সম্ভব। ওরা বলে, দুটো আলাদা কালচারের সহাবস্থান। কিন্তু মিলন নয়। যেমন এখানকার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও দেখবেন। মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি কিন্তু ছেলেমেয়ের বিয়ের বেলা পালটি ঘর চাই। ওরা বলে, এই আমাদের ঐতিহ্য।

ঐতিহ্য মানে কী, গঙ্গা জানে না। বোধহয়, অভ্যেস। কত রকম অভ্যেসই তো হয়ে গেল গঙ্গার এই সামান্য মেয়ে-জীবনে। প্রাইমারি স্কুলমাস্টারের মেয়ে হয়ে জন্মেছিল। নীচে আরও দুটো বোন ছিল ওর। লেখাপড়াও শিখেছিল একটু-আধটু। তার জোরেই আজ জমাখরচের হিসেবটা করতে পারে। মনে রাখতে পারে কার কাছে কত পাওনা। এসব ওর করার কথা ছিল না। দুলাল বেঁচে থাকলে ও ঘরের বউ হয়েই থাকত। যেমন ছিল বিয়ের পর প্রথম দশ কি বারো বছর। নিচু জাতের ইলেকট্রিক মিস্ত্রির হাত ধরে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল ষোলো বছর বয়সে। তখন ওর মনে হয়েছিল দুলালের মধ্যে বড় মিস্ত্রি হওয়ার ক্ষমতা আছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বাপের বাড়ি ফেরার পথ, তাতেও ওর কোনও ক্ষতি হয়নি। গ্রামের বাড়ির খড়ের চাল, তার চেয়ে কলকাতার বস্তির এই একখানা ঘর খারাপ না। একখানা বড়সড় তক্তপোশ রেখেও খানিকটা জায়গা পড়ে থাকে। ইলেকট্রিকের আলো আছে।

অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল বেশ। দুলালের সঙ্গে এই ঘরে বসবাস করার সময়ে ভালবাসা কী জিনিস ও জানতে পেরেছিল। তোমার সুখে আমার সুখ। তোমার কষ্টে আমার কষ্ট। গঙ্গার নিজের কোনও চাহিদা ছিল কি? শাড়ি-জামা না চাইতেই পেয়েছে। নাইলনের মশারি, লাল শালুর লেপতোশক, হাতের

একগাছা সোনা দিয়ে বাঁধানো লোহা, শেতলপাটি, সব পেয়েছে। একটা রেডিয়ো অবধি কিনে নিয়েছিল দুলাল। বলেছিল, টিভিও আনব, কয়েকটা বছর সবুর করো। আমার হাতে পার্টি আছে। টেবিলফ্যানটা যদি ম্যানেজ করতে পারি—হ্যাঁ, আর হাতপাখা নয়। ফ্যানের হাওয়া খাব। কী ভেবেছ?

অভাব ছিল একটা ছেলের। দু'-দু'বার গর্ভ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বিয়ের পরে পরেই। তখন গঙ্গার মনে ভয় ঢুকে যায়। নিচু জাতের বর বলে কি বাচ্চা পেটে থাকছে না। তখন চুপি চুপি তারকেশ্বরে মানত করে। ঠাকুর কোলে ছেলে দিলেন। তার নাম রাখল তারক। সেই ছেলেও বড় হতে লাগল। এখন সে লায়েক হয়েছে।

জলমেশানো দুধ উথলে ওঠে কেরাসিন স্টোভের ওপর। গঙ্গা গুঁড়ো চা ফেলে দেয় তার মধ্যে। দুধ নেমে যায়। গঙ্গা দূরের চাপা কলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওই কলের নীচে বসিয়ে কতদিন ছেলেকে সাবান মাখিয়ে চান করিয়ে দিয়েছে ও। ফরসা ন্যাংটো ছোঁড়া ছটফট করত। হঠাৎ কখন মায়ের হাত ছাড়িয়ে বড় হয়ে গেল। আর সেই সময়েই, এমনই কপাল, ইলেকট্রিক শক খেয়ে মারা গেল দুলাল। টিভি-টা হল না।

তখন থেকে ছেলের হাত ধরে গড়ে তোলা ওর এই চায়ের দোকান। দুধ আনতে হয়, জল টানতে হয়, ঘর থেকে বাসনপত্র এনে দোকান বসাতে হয় দু'বেলা। আবার দোকান তুলে ঘরে যাওয়া। এক হাতে তো হয় না। তারকের ইসকুল গেল মাকে সাহায্য করতে গিয়ে। ওই জায়গাটায় আগে একটা মুচি বসত। তাকে সরিয়ে গঙ্গার জায়গা করে দিয়েছে বস্তির লোকেরাই। নাবালক ছেলেকে নিয়ে উপোস করবে নাকি ঘবের বউ? বড় বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে রফা হল রোজ এক টাকা ভাড়া। এখন সেটা তিন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বস্তির কেউ কেউ এখন ওকে হিংসেও করে।

আজ চার-পাঁচ বছর হল তারকও মায়ের কোল ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। কষ্ট হয় গঙ্গার। তা বলে ও জলে পড়ে যায়নি। জীবনের সব ফাঁকই কোনও-না-কোনও ভাবে ভরাট হয়ে যায়। এই হল জীবনের নিয়ম। হতাশ হতে নেই।

পঞ্চাননতলার মোড়ে এক বিহারি রিকশাওয়ালা, তার নাম বুধন, এখন গঙ্গাকে সাহায্য করে। ওর রিকশায় চড়ে বাসনপত্র নিয়ে রোজ সকাল-বিকেল গঙ্গা দোকানে আসে। দোকান তোলার সময়ে সে-ই গঙ্গাকে ঘরে পৌঁছে দেয়। দুধ তোলে, জল টানে, সবুজ প্লাস্টিকের চালা বাঁধে। গেলাস ধোয়। রিকশা টানার ফাঁকে ফাঁকে গঙ্গার খবরাখবর নিয়ে যায়। তার বিনিময়ে কিছু চায় না বুধন। সে তারকের চেয়ে বয়সে বড়, আবার দুলালের চেয়ে ছোট। গঙ্গাকে দিদি বলে ডাকে। যেদিন রাত্তিরে তারক বাড়ি ফেরে না, সেদিন বুধন তার গাড়িখানা টেনে নিয়ে যায় গলির মধ্যে। গঙ্গার ঘরের সামনে গদি মাথায় দিয়ে ঘুমোয়। হঠাৎ বৃষ্টি নামলে গঙ্গা ওকে ঘরে ডেকে আনে। বলে, বুধনভাই, তুমি ভেতরে এসে শোও। কখনও কখনও ওকে খেতেও দেয়। বস্তির লোক কিছু মনে করে না। এই ঘটনা যদি সামনের দিকে ভদ্রপল্লিতে ঘটত, লোকে হয়তো হইচই করে উঠত। কিন্তু এ তো বস্তি। এখানে মানবিক সম্পর্ক অনেক নমনীয়। উত্তর দিকের ঘরটায় স্বামীপরিত্যক্তা সরস্বতী আর তার রক্ষক যে রাতের অন্ধকারে জল বেচে, তেলেভাজা বেচে, কেউ কি জানে না? জানে। দেখতে দেখতে মানুষের অভ্যেস হয়ে গেছে।

গঙ্গা এখন আর আগের মতো ছিপছিপে রোগা নেই। মোটাসোটা চেহারা। ফরসা মুখখানা গোল হয়ে গেছে। সাদা সিঁথি। তার ওপর কালো পাড়ের ঘোমটা ওর খোঁপাটুকু ঢাকে। ও যখন বুধনের রিকশায় চেপে গলি থেকে বেরোয়, ওকে রানির মতো দেখায়। বস্তির কেউ কেউ বলে, গঙ্গা যেন মা দুগ্‌গা আর বুধন যেন অসুর। যার যেমন ভাগ্য।

বাপ মারা যাওয়ার পর, তারকটা বাইরেমুখো হয়ে গেল। বেপাড়ার সব সঙ্গী জুটল ওর। মায়ের কাজে লেগে থেকে ওর মন ভরে না। গঙ্গা বলত, তা হলে লেখাপড়া কর। মিস্ত্রির কাজ শেখ। ও বলে, আমি দেশের কাজ করব। ভবানীপুরে কে এক অতীনদা আছে, তার আখড়ায় ব্যায়াম করতে যেত। লেকে সাঁতারের রেস দিত। বিবেকানন্দ পার্কে ফুটবল খেলে সারা গায়ে কাদা মেখে ঘরে ফিরত তখন। এসেই বলত মা, খেতে দাও, খিদে পেয়েছে। গঙ্গা মুখ বুজে ওর পেটের ভাত জুগিয়ে এসেছে। দিনের-পর-দিন। ছেলে যদি কোনওদিন বড় মানুষ হয়, ও মা হয়ে বাদ সাধবে কেন। নিজের পেট নিয়ে ওর চিন্তা নেই। যতদিন গতর আছে, চালিয়ে নেবে।

একদিন সকাল আটটা নাগাদ গঙ্গা ওর চায়ের পাট গুটিয়ে বসে আছে। বুধন এসে হাত লাগাবে।

সামনের রাস্তায় তখনও আপিসের গাড়ি নামেনি তেমন। এমন সময় দেখতে পেল বুধনেরই রিকশায় চেপে—প্যান্ট আর টি-শার্ট পরা—কে ওটা? তারকই তো। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা কেন? কী হয়েছে রে? গঙ্গা তো হাউমাউ করে উঠেছে। মাকে শান্ত হতে বলে তারক। ও কিছু না। আগেরদিন বিকেলবেলা পুলিশের সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে কেটে গেছে। পুলিশের সঙ্গে মারামারি আবার কী। পুলিশই তো মারে। গরিব মানুষ মার খায়। এই তো জগতের নিয়ম। তারক বলে, আমাদের মিছিল যাচ্ছিল, ওরা আটকাল কেন? তা থেকে বোতল ছোড়া, পাথর ছোড়া, টিয়ার গ্যাস। ওকে ভ্যানে ঢোকাচ্ছিল আর একটু হলে। অতীনদা নামিয়ে এনেছে। অতীনদাই ডাক্তার দেখিয়েছে। এক বন্ধুর বাড়িতে রাত্তিরে শুয়েছিল। ওই বন্ধুই বাইকে চড়িয়ে পৌঁছে দিচ্ছিল, রাস্তায় বুধনের সঙ্গে দেখা।

চারদিন পর জ্বর ছাড়ল সে-যাত্রা। চায়েব দুধ থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ছেলেকে দুধ খাওয়াল গঙ্গা। তক্তপোশের বিছানায় নিজের পাশে শুইয়ে ছেলের শুশ্রূষা করল কয়েকটা দিন। সন্তান তো নয়, একটা বড় মানুষ। একটু ভাল হতেই একটা ফরসা প্যান্ট-শার্ট পরে তারক আবার উধাও।

বুধন বোঝায়, দেশের কাজ করতে গেলে একটু-আধটু চোট তো লাগবে। তুমি কিছু ভেবো না দিদি। তারক আওয়ারা হয়ে যাবে না। ও একদিন লিডার হবে।

গঙ্গা বলে, ওই অতীনদাকে তুই চিনিস? দেখেছিস কখনও।

বুধন দেখেনি। তবে শুনেছে, মাঝে মাঝে তাঁর ছবি আখবারে ছাপা হয়।

আর একবার। বুধনকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়েছিল গঙ্গা। পুজো দিয়ে ফিরছে, দেখে রাস্তায় গাড়িঘোড়া চলছে না। কী হল আবার? বুধন খোঁজ নিয়ে জানল, পথ অবরোধ চলছে। একটা মিনিবাসের সঙ্গে মোটরগাড়ির ধাক্কা লেগেছে। তাই রাস্তা আটকে দিয়েছে পাবলিক। পুলিশ ওদের সরে যেতে বলছে, ওরা সরছে না। হল্লা করছে।

রিকশা থেকে নেমে খানিকটা এগিয়ে গেল গঙ্গা। রাস্তার ওপর বসে আছে কত ভদ্রলোক। পুলিশেব গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তফাতে। তিনটে পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুটপাথে সিগাবেট খাচ্ছে আর গল্প করছে, ও দেখল। ওদের হাতে বন্দুকটন্দুক কিছু নেই।

কী মনে হতে গঙ্গা এগিয়ে গেল ওদের কাছে। বুধনের নিষেধ শুনল না। তার ভয় কীসের। সে তো গৃহবধূ নয় যে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে লুকোবে। সে-ও সংগ্রাম করেই জীবন কাটাচ্ছে। পাড়ার পুলিশ ওর হাতের চা খায় রোজ। বিস্কুট খায়।

মাথার ঘোমটা একটুখানি তুলে এক ছোকরা পুলিশকে কাছে ডাকল গঙ্গা। কী হয়েছে, কীসের অবরোধ—কতক্ষণ পরে রাস্তা খুলবে—এসব কিছুই সে জিজ্ঞেস করল না। গঙ্গা জানতে চাইল, আচ্ছা বাবা—

পুলিশ বলল, এখান থেকে সরে যান। দেখছেন না, গোলমাল হচ্ছে?

যাব, যাব। তার আগে একটা খবর জানতে চাই।

কী খবর? বাচ্চা হাবিয়েছে?

না, না।

জিনিস ছিনতাই হয়েছে?

না রে বাবা। জানতে চাইছি, তারক মণ্ডলকে তোমরা চেনো?

কে সে?

আমার ছেলে। দেশের কাজ করে। পুলিশের হাতে মার খেয়েছে অনেকবার।

তা হলে গুন্ডা! না চিনি না। আপনি লালবাজারে খোঁজ করুন।

এই কথা বলে ছোকরা মুখ ফিরিয়ে চলে গেল অন্য পুলিশের কাছে। হাসাহাসিতে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। কলকাতায় কত দেশপ্রেমিক আছে, কত গুন্ডা আছে, সব খবর কে রাখে। লকআপে ঢুকলে চেনাশোনা হয়। ঘনিষ্ঠতা হয়।

তারক তা হলে গুন্ডাদের দলে নাম লিখিয়েছে। মুখে বলে, দেশের কাজ করছি। ওই অতীনদা না কী যেন—যার নাম করে, সে তা হলে গুন্ডার সর্দার। এই রকম সন্দেহ ওর মনে জেগেছে অনেকদিন থেকেই। ছেলেটা হুটহাট করে ঘরে আসে এক-এক দিন। হুটহাট করে চলে যায়। মুখে একগাল দাড়ি। পাড়ার লোক, যারা গঙ্গার চায়ের দোকানের খুচরো কেনাকাটা নিয়ে কথা বলেনি, বুধনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা

নিয়েও মাথা ঘামায়নি কখনও, তারাই কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, গঙ্গাদির ছেলেটা সমাজবিরোধী হয়ে গেল। মা হয়ে এই নিন্দে ওকে শুনতে হয়। ভাল লাগে না। সেদিন পুলিশের মুখেও শুনল একই কথা।

আজ বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে ময়দান থেকে ফিরছে গঙ্গা। সঙ্গে বুধনও হাঁটছে। ওর মনে আর কোনও দুঃখ নেই। স্বচক্ষে যা দেখে এসেছে, তা অবিশ্বাস করা যায় না।

চায়ের দোকানের পেছনের পাঁচিলটায় পোস্টার পড়েছিল। ময়দানে শনিবার জনসভা। সভাপতি অতীন সরকাব। কাপড়ের জুতো-মোজা পরা এক মাঝবয়সি খদ্দের চা খেতে খেতে আর একজনকে বলছিল কাল, ওই অতীন সরকার নাকি উঠতি নেতা। এই নাম গঙ্গাব শোনা। গঙ্গা ওকে স্বচক্ষে দেখতে চায়।

তাই দুপুর দুপুর চলে গেছে ময়দানে। সভার ভিড়ের মধ্যে আগে থেকে দাঁড়িয়ে থেকেছে। লাল-সাদা কাপড় মোড়া উঁচু মঞ্চ, শূন্য, সেদিকে তাকিয়ে আছে।

আর সেখানেই, সভা শুরু হওয়ার আগে, নিজের ছেলেকে তরতর কবে মঞ্চে উঠে আসতে দেখল গঙ্গা। বুধনও দেখল তারককে। তারক এসে মাইকের সামনে দাঁড়াল সোজা হয়ে। পরনে নীল প্যান্ট, মুঠো করে ধরল মাইকেব মুন্ডুটা। আর বাঘের মতো গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করল, বন্ধুগণ—

বন্ধুগণ। মা-বোনেরা, তারক বলছে। আপনারা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমাদের নেতা অতীন সরকার মশাই এখুনি এসে পড়বেন। তারপবই সভা আরম্ভ হবে। ধৈর্য ধরুন আপনারা।

মুঠোয় মাইক মানে ক্ষমতা। গর্বে গঙ্গার বুক ফুলে উঠেছে। সভা শুরু হওয়া অবধি বসে থাকেনি ও। যা জানাব তা জানা হয়ে গেছে ওর। ও আর কারুর পরোয়া করে না।

কারিগর

মালিক ব্যবসার কতটুকু জানে?

সে বোঝে, সারাদিনে কত টাকার কাজ হল, টোকেন মিলিয়ে দেখে নিল কারিগরদের কত টাকা দিতে হবে, নামে নামে সেই অঙ্ক তুলে নিল খাতায়। আর কী? স্টোর একটা আছে ফল্‌স সিলিংয়ের ওপরে। মাত্র চাব ফুট তার হাইট। সে নিজে কোনওদিন তার মধ্যে ঢোকে না। ওই মইটার ওপব দাঁড়িয়ে থাকে আর নিখিল—এখন সে-ই সবচেয়ে বাচ্চা—হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে চেক করে, কোন মাল কত স্টকে আছে।

ভেতর থেকে নিখিলই হাঁক পাড়ে। হেয়ার ডাই সতেরো, শ্যাম্পু দশ, শেভিং ক্রিম আটাশ, ব্রাশ পাঁচ। ছোট তোয়ালে একত্রিশ, বড় তোয়ালে নয়। বডি কভার—পঁচিশ—তার মধ্যে ন'টা ছেঁড়া, আমি আগেও বলেছি। সরু চিরুনি, মোটা চিরুনি শেষ। আনতে হবে। অডিকলং দু বোতল মাত্তর পড়ে আছে। জলের ফোয়ারা একটা।

মালিক নোট করে। তারপর নিজের খেয়ালখুশি মতো মাল নিয়ে আসে। দোকানে ঠান্ডা মেশিন বসিয়েছে ফাঁট মারতে। রেট বাড়িয়ে দিয়েছে ঝপ করে এগারো টাকা থেকে উনিশ টাকায়, ওনলি। ডবল—অর্থাৎ চুল কাটা, দাড়ি কামানো—পঁচিশ। স্পেশাল কাট—পঞ্চাশ, ডাই—পঞ্চাশ। কমপ্লিট প্যাকেজ একশো টাকা। কিন্তু মাল কেনার বেলায় হেভি চিপ্পুস। নামকরা ব্র্যান্ডের জালি মাল কেনে। ওর বাঁধা সাপ্লায়ার আছে, সে বাজারদরের চেয়ে প্রায় হাফ দামে মাল দেয়। দু'মাসের ক্রেডিট দেয়। কী করে দেয়? দু'নম্বরি না হলে পারত? সেদিন এক কাস্টমার তো বলেই দিল মুখের ওপর। এ কী পাউডার

ধরাচ্ছ ঘাড়ে? দুর্গন্ধে টেকা যায় না? বিউটিক্যুরার কৌটোয় চকখড়ি।

পাশের চেয়ারে হাড়িকাঠের মতো কাঠের খুঁটিতে মাথার ব্যাকসাইড চেপে বসেছিল এক ছোকরা কাস্টমার। আধখানা গালে তখনও সাবান। সে হঠাৎ বলে উঠল, শুধু চকখড়ি নয়, তাতে অগুরু মেশায়, তাই মড়া মড়া গন্ধ। এখানে আর আসা যাবে না।

সবচেয়ে সিনিয়র কারিগর যোগেশ নায়েক ওর কাজ করছিল। গালের আধ ইঞ্চি ওপরে খুরের ফলা। সে গম্ভীরভাবে অথচ নরমসুরে বলল, নড়বেন না, কিছু একটা হলে তো কারিগরের দোষ হবে। গলার কাছে ক্ষুর আর আপনি মশকরা করছেন! ছোকরা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে থম্ মেরে যায়। আর কথা বাড়ায় না।

এই হল যোগেশ। দোকানের নিন্দে করলে সহ্য করবে না। এখন এর নাম 'মি-লর্ড' হয়েছে। পুরনো মালিকের আমলে এই দোকানেরই নাম ছিল 'সুকেশী'। ওনলি তখন পাঁচ টাকা। রেল লাইনের ওপর ব্রিজ তৈরি হতেই সাহাবাবু দোকানটা কিনে নিল। পনেরো ফুট বাই দশ ফুট জায়গা আয়নাফায়না দিয়ে এমন হেভি সাজানো যে আর চেনা যায় না। সে সেই সময় সব কারিগরকে ছাঁটাই করে দেয়। রাস্তার ওপারের সেলুন থেকে কারিগর তুলে নিয়ে আসে সাহাবাবু, যাতে তার ব্যবসাটাও মার খায়। শুধু যোগেশকে ছাড়েনি। পুরনো লোক বলে নয়, ওর হাতের তার দেখে। ক্লিপ বলো, কাঁচি বলো, ক্ষুর বলো—তোমার শরীরের ওপর দিয়ে ঘুরে যাবে, তুমি টের পাবে না। মনে হবে, কেউ হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। শুধু পাখির ডাকের মতো শুনবে একটা হালকা চিক চিক শব্দ। চোখ বুজে থাকো, অন্য জগতে চলে যাবে।

কাজ তো সকলের একই রকম। তবু যোগেশ নায়েক রেট বেশি পায়। অন্যেরা যা পায়, টোকেন পিছু যোগেশ প্রায় এক টাকা বেশি। দিনে পঁচিশটা কাজ করলে পঁচিশ টাকা এক্সট্রা। মজুরির ওপর। তা ছাড়া টিপ্স তো আছেই। মি-লর্ডে অন্তত তিরিশ জন কাস্টমার আছে যারা যোগেশদা ছাড়া আর কারুর কাছে মাথা নোয়াবে না। দরকার হলে আধঘণ্টা বসে থাকবে। ওরা সব রবিবারের খদ্দের। বেশি করে টিপ্স দেয়। যোগেশ ওদের অতিরিক্ত ম্যাসাজ দিয়ে আরাম দিতে ভোলে না। এরা অভিজাত, বয়স্ক ব্যক্তি। পুরনো আমলের লোক। ইউনিসেক্স দেখলে নাক সিঁটকোয়।

শম্ভু আর মান্না—তারাও এক নম্বর কারিগর—আগে গজগজ করত। এখন আর করে না। ওরা জানে, এই সতীলক্ষ্মী কাস্টমারের দিন ফুরিয়ে আসছে। এখন লোকদের হাতে সময় কম। সামনে যে-চেয়ার খালি পায়, তাতেই বসে পড়ে। কারিগর নিয়ে তাদের বাছবিচার নেই। এমনকী স্পেশাল কাট হলেও নেই। মাথাই তো বলে দেয়, কী কাট চাইছে কাস্টমার। গোঁফ নিয়ে যাদের বাতিক আছে, তারা আগেভাগে নির্দেশ দিয়ে দেয়। তারও একটা ছক কারিগরদের জানা হয়ে গেছে।

যোগেশদার রমরমা আর বেশিদিন না। যুগের হাওয়ায় যোগেশদা ভেসে যাবে। লম্বা চুল নিয়ে ছেলেছোকরা আসছে। তাদের হাতে টাকা।

শুধু শম্ভু আর মান্না নয়, মুরলী, হামিদ আর অন্য সহকর্মীরাও যোগেশকে হিংসে করে। মনে মনে জানে, যোগেশদা যাকে বলে নাপিত, সে-স্টেজ পার হয়ে গেছে। সে এখন আর্টিস্ট। মাথার ডৌল দেখে, খুলির ওপর আলতো করে হাত বুলিয়ে ও বুঝতে পারে কী ধরনের কাট ওই মাথায় মানাবে। আয়নার মধ্য দিয়ে কাস্টমারের মুখখানা এক লহমা দেখে নেয়—মুখের গড়ন, মাথা থেকে চিবুক অবধি হাড়-মাংসের কাঠামো, কান—হ্যাঁ কানের কাট, দেখেই ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওই মুখের উপযোগী গোঁফের ডিজাইন। ভাস্কর যেমন একটা পাথরের চাঙড় দেখে তার ভেতরে হাঁটু-গেড়ে-বসা যুবতীর অবয়ব আঁচ করতে পারে, এ-ও প্রায় তেমনই। ভগবান ব্রেনকে রক্ষা করার জন্যে শক্ত খুলি দিয়েছেন। তার ওপর চুল দিয়েছেন। মানুষ সেই চুল দিয়ে সাজতে শিখেছে ভগবানকে টেক্কা মেরে।

লোকেরা জানে না কী তাদের মানায়। তারা অন্যের দেখাদেখি নকল করে। লোকেরা নিজেদের খুঁত দেখেও দেখে না। নিজের মুখকে এত ভালবাসি আমরা, ভাবি, এর চেয়ে সুন্দর কিছু নেই। যোগেশ নায়েকের মতো আর্টিস্ট নিরপেক্ষ চোখে কাস্টমারের মুখ দেখতে শিখেছে। ওর ভেতরে সে প্রতিভা ছিল। তাই সে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারে, স্যার, আপনার জুলপিটা একটু কমিয়ে দিই? আপনার সিঁথিখানা মাঝখানে আনলে দারুণ মানাবে—বলেন তো ঠিক করে দিই? এর আগে কেউ বলেনি আপনাকে? প্রিয়জনও লক্ষ করেনি। এই হয়। আমরা একরকম দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে যাই।

লেখাপড়া শিখলে ও হয়তো চিত্রশিল্পী বা ভাস্কর হত। বা সাহিত্যিক হত। লেখাপড়া ওর শেখা হয়নি। তবে খবরের কাগজটা পড়তে পারে। এখনকার নতুন কারিগররা আর সবাই ওর মতো জাতে নাপিত নয়। নানা জাতের লোক কাজ শিখে, লেখাপড়া শিখে সেলুনে কাজ করতে ঢুকছে। এই দোকানেরই শম্ভু আর মুরলী মাধ্যমিক ফেল। মুরলী বাড়ি থেকে পালিয়ে বম্বে চলে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম জুতো পালিশ করত। তারপর একে একে নানা কাজে হাত পাকায়। ও হোটেলে রান্নার কাজ করেছে, সিনেমা স্টুডিয়োয় মেকআপ ম্যানের কাজ করেছে। তারপর কোথায় যেন হেয়ার ডিজাইনিং শিখে পরীক্ষায় পাশ করেছে। সে কাগজ ও সাহাবাবুকে দেখিয়েছিল। শম্ভুও ম্যাড্রাস ঘোরা। ম্যাড্রাসিরা চুলের কদর বোঝে, বিশেষ করে যারা ব্রাহ্মণ। যোগেশেরই কোথাও যাওয়া হয়নি। উলুবেড়েতে হাতে খড়ি—শ্রীমা হেয়ার কাটিংয়ে চুল ঝাঁট দিত বালক বয়সে। তারপর একটু একটু করে কাজ শিখেছে আর শহরের দিকে এগিয়েছে। কলকাতায় এসেও বরানগর, পাকপাড়া, কাশীপুর—এইসব হাফ-মফস্‌সলে বহু বছর কাটিয়েছে ও। তারপর এখন পরিণত বয়সে পৌঁছেছে দক্ষিণ কলকাতার মতো শৌখিন পাড়ায়। যেখানে চুলকাটার দোকানে সিনেমা হলের মতো ঠান্ডা মেশিন চলে। সেলুন থেকে সাজগোজ করে বাবুরা সোজা বরযাত্রীর গাড়িতে গিয়ে ওঠে। গায়ে ভুরভুর করে সুগন্ধ।

অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয় বেড়েছে ওর। কাজে সুনাম হয়েছে, সে তো আগেই বলেছি। অন্যেরা ট্রেনে বা দূরপাল্লার বাসে চড়ে ডিউটিতে আসে। যোগেশ থাকে পিকনিক গার্ডেনে। লাইনের ওপারে খানিকটা পথ। সেখানে একটা ছোটমতন মাথাগোঁজার জায়গা করেছে ও। মেয়ের বিয়ে দিয়েছে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে। ওর জামাইয়ের রোলের দোকান আছে গড়িয়ায়। রোজগার ভাল। কাজটাতে ইজ্জত আছে। ওর বাড়ি থেকে কাজের জায়গা কুড়ি মিনিটের জার্নি।

আমরা আর্টিস্ট বললে কী হবে। যোগেশের বউ ওকে নাপিতের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেয় না। এই একটা দুঃখ যা ও ভুলতে পারে না মনে মনে। লোকেদের বউ গর্ববোধ করে স্বামীর জন্যে। যেমন ধরো না ওদের প্রতিবেশী ছন্দা। ছন্দা হালদার। অহংকার করে ছন্দা বলে, ওর বামুনের ঘরে বিয়ে হয়েছে। কালীঘাটের হালদার আছে না? মস্ত কুলীন। ছন্দার বর সুধীর নাকি তাদের বংশ। যোগেশ এ-কথা বিশ্বাস করে না। ও অনেক হালদার দেখেছে জীবনে। সব এস. সি., এস.টি.। না হলে ক্লাস নাইনে পড়ে ওর বড় ছেলে, এক পয়সা দিতে হয় না। এ হয় কী করে?

রুবি, যোগেশের বউ, বলে, তুমি হিংসে থেকে একথা বলছ।

ছন্দা বলে বেড়ায়, ওর বর ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। আসলে ও টিভি মেকানিক। রুবি বলে, মেকানিক বললেই হল? সুধীরবাবু যে হাতে অ্যাটাচি ঝুলিয়ে কাজে যায়, দেখোনি?

যোগেশ হাসতে হাসতে বলে, আঃ, অ্যাটাচি না, ওকে বলে ব্রিফকেস। বাবুদের ব্রিফকেসে আপিসের কাগজপত্র থাকে, সুধীরের ব্রিফকেস খুলে দেখো একদিন। মেশিনের পার্টস থাকে, রাংঝাল দেবার যন্তর থাকে। ও কাস্টমারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করে। আমি নিজের ঘাঁটিতে কাজ করি। কাস্টমার আমার কাছে আসে। দোকানে আমি যে ড্রেস পরে থাকি, তা দেখলে তোমার চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

এতেও রুবি বলবে, কাজ মানে তো চুল ছাঁটা।

ওই সুধীর লোকটার রোজগার যোগেশের চেয়ে বেশি নয়, এ কথা ও হলফ করে বলতে পারে। কিন্তু ওর মোটরসাইকেল আছে, সেইখানেই ব্যাটা জিতে যায়। যোগেশের মোটরসাইকেল নেই। সুধীরের বাড়ির অর্ধেকটার ছাদ টালি, তবু সেখানে টেলিফোন আছে। ওর কোম্পানি ওকে দিয়েছে। যোগেশের কোম্পানি যোগেশকে টেলিফোন দেয়নি। এ-কাজে টেলিফোন লাগে না, কে বোঝাবে রুবিকে। কলকাতা শহরে মোটরসাইকেল চড়ে ঘুরে বেড়ায় সুধীর, মাথায় লোহার হেলমেট, গরমকালে জান বেরিয়ে যায়। ও একদিন ঠ্যাং ভেঙে হাসপাতালে যাবে, টেলিফোনে খবর পাবে ছন্দা। সেদিন রুবিরও টনক নড়বে।

ওদের সুখ দেখে তোমার গা জ্বালা করে? কেন গো?

যোগেশ বলে, না, করে না। তিন গেলাসের মুখে ওর কথা জড়িয়ে যায়। যোগেশ বলে, ওরা সুখে থাক, আমরা আমাদের মতো আছি। আমাদের সুখ কিছু কম? আমাদের মতো ক'টা বাড়িতে রোজ মাছ রান্না হয় খোঁজ করে দেখো।

রুবি বলে—আমাদের কালার টিভি নেই।

কথাটা শুনেই ছ্যাঁ করে নিবে যায় যোগেশ। সুধীরের আছে কালার টিভি। ও কি আর নতুন কিনেছে? চোদ্দো হাজার টাকা দিয়ে টিভি কেনার মুরোদ ওর নেই। ওই মোটরসাইকেল কেনার টাকাও ওর নয়, ওর কোম্পানির। কোন কাস্টমারের বাতিল মাল রাংঝাল দিয়ে চালাচ্ছে।

নেশা করতে করতে যোগেশের মনে হয়, একদিন শত্রুতা ভুলে লোকটার সঙ্গে ভাব করবে ও। বউয়ে বউয়ে রেষারেষি, মোদের মুখে মুচকি হাসি—দু'জন পুরুষের মধ্যে এই রকম সম্পর্ক। ভাব করে ওর কাছে একটা কালার টিভি চাইবে কম দামে। নিজেরটা বদলে যদি দু'হাজার পাওয়া যায়, বাকিটা যেমন করে হোক ম্যানেজ করবে যোগেশ। সাহাবাবুর কাছে লোন চাইবে। মেয়েটার বিয়ে দিতে গিয়ে ওর সব জমানো টাকা বেরিয়ে গেল। নইলে কবেই—

রুবি বলে, তুমি নেশাটা ছাড়ো, তাতেই মাসে পাঁচশো টাকা জমবে। লোন করতে হবে না।

যোগেশ থেমে থেমে বলে, বিছানা ছাড়িয়েছ, এবার নেশা ছাড়াবে। এরপর কীসের টানে বাড়িতে থাকব, বলতে পারো। সারাদিন খেটে এইটুকু আরাম কি আমার পাওনা হয় না? কত লোক মাগিবাড়ি যায়, আমি যাই না, কষ্ট সহ্য করি। ভাবি, যতদিন পেরেছ দিয়েছ, আমার নালিশ করা উচিত না। তুমি বোঝো এ কষ্ট? ভাবি, এখনও রাত্তিরে বুকে ব্যথা হলে যদি ডাকি, তুমি নিশ্চই এসে জড়িয়ে ধরবে। যদি পঙ্গু হয়ে যাই, তুমি নিশ্চই বেডপ্যান দেবে। এই তো কত। তুমি জানো এর নাম কী?

এইসব কথা শুনলে যত নিষ্ঠুরই হোক, মানুষের চোখে জল উঠে আসে। রুবিরও আসে। তবু না বলে পারে না। রোজ রাত্তিরে যতখানি করে মদ খায় মানুষটা, বছরের-পর-বছর ধবে খাচ্ছে, তাতে শরীর ভাল থাকবে না। তবু তো খালি পেটে খেতে দেয় না রুবি। বেসনেব ফুলুরি ভেজে দেয়। মুরগি কি মাছের ছাঁটকাট কিনে এনে ঝাল ঝাল কিছু বানিয়ে রাখে, মুড়ি দিয়ে মেখে দেয়। ওই ওর টোপ। ওই লোভেই যোগেশ লাইনের ধারে ঝুপড়িতে ঢোকে না কোনওদিন। বাইবে থেকে হাত বাড়িয়ে শিশি তুলে আনে। ওখানকার চাটও ছোঁয় না বড় একটা—ওদের তেল খারাপ। বড় অম্বল হয়। অম্বল এমনিতেও আছে ওর, ট্যাবলেট খেয়ে চাপা দিয়ে রাখে। রুবি কি জানে না? জানে। চুপ করে থাকে।

রবিবারে সুধীরের ছুটি। যোগেশের কাজের দিন। ওর ছুটি সোমবার। দু'জনেরই ফিবতে ফিরতে রাত ন'টা হয়ে যায়। তাই কালার টিভি-ব কথা আর বলা হয়ে ওঠেনি। তারপব ভুলে গেছে। মানুষ যেটা মনে রাখতে চায় না, সেটাই তো ভোলে।

হাড়ভাঙা খাটুনি যোগেশেব। ইট ভাঙার কি কাঠ কাটার কাজ নয় ওর, যে পিঠের হাড় ভাঙবে। ঠেলাগাড়ি চালায় না, যে পায়ের গুলি ফুলে যাবে। কবজি আর আঙুলের কাজ ওর। চোখের কাজ। বাইরে থেকে ক্লান্তি ধরা পড়ে না। সকালবেলা যখন দাড়ি কামিয়ে, চুলে কলপ দিয়ে ফিটফাট হয়ে কাজে বেরোয়, কে বলবে ওর বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। সাহাবাবুর ভাইপো রবি এসে সকাল আটটায় দোকান খুলে দিয়ে যায়। তার পরেই ঢোকে যোগেশ। কারিগরদের মধ্যে প্রথম। ঢুকেই একবার বাথরুমে যায়। চুলটুল আঁচড়ে গাঢ় নীল রঙের সাফারি ড্রেস পরে নেয়। তারপর ওপরের তাক থেকে স্টিল ফ্রেমের বাইফোকাল চশমাটা নামিয়ে, তার কাচ সাবান দিয়ে ধুয়ে, বেশ করে মুছে, চোখে পরে রেডি হয়ে যায় পনেরো মিনিটের মধ্যে। তখন ওকে দেখলে মনে হবে মি-লর্ডের কারিগর না, যোগেশ নায়েক হল ডাক্তার। ডেন্টিস্ট। নিশ্বাসে বাসি গন্ধ কি মাথার মধ্যে ঝিমঝিম ভাব কিচ্ছু নেই।

ফিটফাটের চাকরি। ফিটফাটের অভ্যেস। একরকম জীবনযাপনে অভ্যেস করেছে সে। কর্তব্যবোধ ওর প্রখর। সততা ওর রক্তে। তাই রবি একঘণ্টা মাত্র থেকে জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে, দোকান চালু করে দিয়ে চলে যায়। সাহাবাবু আসে এগারোটায়। এই দু'ঘণ্টা মি-লর্ডের ম্যানেজারও যোগেশ। টাকা রাখে, টোকেন দেয়, ক্যাশমেমো কাটে। ক্যাশমেমোর নীচে সই করে ইংরেজিতে—ছোট করে জে.এন.—যেমন ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রিপশনের নীচে করেন। ওই সময়টা ওর সহকর্মীরাও ওর সঙ্গে ঠাট্টা রসিকতা করে না। সাহাবাবুকে হিসেব বুঝিয়ে দিলে পর যোগেশ আবার কারিগর হয়ে যায়। কারিগর-কাম-ম্যানেজার থেকে ফুলটাইম কারিগর। এই তাৎক্ষণিক পদোন্নতি ও উপভোগ করে বলে মনে হয়, কেননা এ-কাজের দায়িত্ব নিয়ে বা ঝামেলা নিয়ে ও কোনওদিন মালিকের কাছে নালিশ করেনি। আসলে, পদাধিকারেও মালিকের পরেই তো ও—সবচেয়ে সিনিয়র, সবচেয়ে অভিজ্ঞ, সবচেয়ে পটু ও গ্রাহকপ্রিয়। ও ছ্যাবলা নয় কিন্তু সব সময় ওর মুখে একটা হাসি লেগে থাকে। দাঁত দেখা যায় না। এর নাম প্রসন্নতা। প্রসন্নতা দেখলে গ্রাহক কাছে আসে। যোগেশ একমাত্র কারিগর যে তার

সাফারির প্যান্টের ওপর বেল্ট বাঁধে। এতে শরীরের ঢিলেভাব চলে যায়, যেমন পুলিশদের দেখা যায় না। পৃথিবীতে কোথাও বোধহয় বেল্ট-ছাড়া পুলিশ নেই। সবটাই কাজের অনুষঙ্গ। কাজের মহিমা বাড়ায়, মহিমা বাড়লে মূল্য বাড়ে—এই সামান্য বিপণনের সত্য মান্না কি শম্ভুকে বোঝানো যায় না। টোকেন গোনার ওপরে ওরা কোনওদিন উঠবে না।

একসময় লোকে ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামাত। সেই কারণে দাড়ি কামানোর আর এক নাম ক্ষৌরকর্ম। চামড়ার বা শিলের পাতের ওপর ঘষে ঘষে শান দিতে হত সেই ক্ষুরে। বিজ্ঞাপনের অগ্রগতির সঙ্গে প্রচলিত হল যাকে বলে সেফটি রেজার, নিরাপদ ক্ষুর বা যন্ত্রের মধ্যে ব্লেড। একসময় পেশাদার নাপিত বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাবুদের দাড়ি কামিয়ে দিয়ে আসত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাবুরা নিজেরা সেফটি রেজার দিয়ে দাড়ি কামাতে শুরু করলেন। এতে কোনও দক্ষতা লাগে না। কেটেকুটে যাবার ঝুঁকি বিশেষ নেই। তবু এই ক্ষুর নামক যন্ত্রটি সেলুনে আরও বহুকাল তার অনিবার্যতা বজায় রেখে এসেছে।

এড্‌সের ভয় ঢোকার পর ক্ষুর সেলুন থেকেও বিদায় নিল। এখন একবার ব্যবহার করে ফেলে দেবার দিকে মানুষের ঝোঁক। যেমন ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, যেমন প্লাস্টিকের গেলাস, কাগজের রুমাল। পাছে অপরের অসুখ থেকে নিজের শরীরে ছোঁয়াচ লাগে। সেলুনেও এখন ক্ষুরের মতো দেখতে একটা অস্ত্রের খোপে রেজার ব্লেডের নতুন আধখানা টুকরো ঢুকিয়ে এঁটে দেওয়া হয়। কামানো হয়ে গেলে ফেলে দেওয়া হয় সেই টুকরো। এখন মানুষকে ঘেন্না করা বেড়ে গেছে অনেক। ফিটকিরি বুলিয়ে সে ঘেন্না মোছা যায় না। মনে নেই? বাবুদের পইতের সময় পাওয়া একটা জার্মান ক্ষুর শান দিয়ে দিয়ে একজীবন চলে যেত। একজীবন কেন, একাধিক জীবন। একটা ক্ষুরে বাড়িসুদ্ধ লোক। তার ইস্পাত ছিল অত্যন্ত কঠিন, তাই অত্যন্ত ভঙ্গুর। হাত থেকে পড়ে গেলে কাচের মতো টুকরো টুকরো হয়ে যেত, ঠন করে শব্দ হত। এখনকার হালকা ব্যক্তিগত ব্লেড এখনকার মানুষদের মতো ভোঁতা, চাপ দিলে বেঁকে যায়। প্রত্যেক যুগ তার নিজের দরকার মতো, তার নিজের চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য তৈরি করবে, এটা লক্ষ করেছে যোগেশ। পছন্দ করেনি, কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধেও চলতে চায়নি ও।

সেদিন হঠাৎ এক কাণ্ড হল।

সকাল তখন দশটা কি সাড়ে দশটা হবে। মানে, রবি চলে গেছে নিজের ধান্দায়, সাহাবাবু তখনও আসেনি। এমন সময় একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে সেলুনে ঢুকল। মাথায় লোহার হেলমেট। হাতে ব্রিফকেস। দোকানে ঢুকে হেলমেটখানা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেয়ালের কাঁটায় টাঙিয়ে রাখল। তারপর কোনও আহ্বানের অপেক্ষা না করেই কাছের খালি চেয়ারটায় থপ করে বসে ডাকল, কে আছে? এই বাকসটা কোথাও রাখো।

যোগেশ ওর চশমা পরে প্রসন্নমুখে এগিয়ে যায়।

লোকটা বলে দাড়ি কাটব। তাড়াতাড়ি। আমার একদম সময় নেই।

লোকটা ঘামছে দেখে যোগেশ নিখিলকে ঠান্ডা তোয়ালে দিতে বলে। একটা বরফের বাকসে ছোট ছোট তোয়ালে ভেজানো থাকে, নিখিল একটা এনে দিল। যোগেশ লোকটার মুখখানা ঘাড় পর্যন্ত ভাল করে মুছে দেয়। তারপর চেয়ারের পেছনে হাড়িকাঠের মতো জিনিসটা গুঁজে দেয়। ওর মাথাখানা সেট করে দেয় তার মাঝখানে।

আরাম পেয়ে খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছে, তাড়াহুড়ো ভাবটা গেছে, লোকটা এবার সেলুনের ভেতরটা টেরিয়ে দেখতে লাগল। আর তখনই চিনল প্রতিবেশীকে।

আরে আপনি? রুবিদি, মানে যোগেশ, যোগেশবাবু না? পিকনিক গার্ডেনে থাকেন তো? আপনি এখানে কাজ করেন? জানতাম না।

যোগেশ মৃদু হাসে। আস্তে আস্তে বুরুশ বুলিয়ে ওর গালে সাবান মাখায়। ঘষে ঘষে ফেনা তোলে।

সুধীর বলল, আমার ধারণা ছিল, আপনি গবরমেন্ট সার্ভেন্ট। রাইটার্সে কাজ করেন।

যোগেশ কিছু বলল না। ও বলতে পারত, কী করে মনে হল ও-কথা? রাইটার্সের কোন কর্মী সকাল সাড়ে সাতটায় বাড়ি থেকে বেরোয়? আটটার আগে কাজের জায়গায় হাজির হয়? কোন কর্মী রাত্তির আটটা অবধি কাজ করে? শুধু মৃদু হেসে অস্ফুটস্বরে বলল, সব কাজই তো কাজ।

তারপর একটা নতুন ব্লেড বার করে, ছাল ছাড়িয়ে, লম্বালম্বি ধরে মট করে ভাঙল। একটা আধখানা

পিস ক্ষুরের খাপে ঢুকিয়ে লক করে নিল। গেলাসে ডেটলের জল থাকে, তাতে ক্ষুরখানা ডুবিয়ে লোকটার জুলপির দিকে এগিয়ে আনল হাতখানা। একটু চাপ দিয়ে প্রথম টানটা মারবে, ঠিক তখনই ঠিক সেই মুহূর্তে কী হল ওর মাথার মধ্যে, নাকি কনুইয়ের গোড়ায়, নাকি ডান হাতে কবজির মাঝখানে রক্তধমনীতে, ক্ষুরসুদ্ধ ওর হাতখানা থরথর করে কাঁপতে লাগল। এমন দ্রুত কাঁপছে যেন এখুনি সুধীরের ফুলো গালটা ফালা ফালা করে দেবে। কাণ্ড দেখে যোগেশ নিজেই অবাক।

চোখ বুজে ছিল সুধীর। হঠাৎ তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখে মাথা তুলে উঠে বসল। বলল, এ কী, হাত কাঁপছে আপনার।

এখুনি ঠিক হয়ে যাবে। যোগেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। হাতখানা সরিয়ে আনে নিজের দিকে।

কাঁপুনি থেমে যাওয়ার পর মিনিট দুয়েক জিরিয়ে নিয়ে আবার জুলপির কাছে এগিয়েছে যোগেশ, অমনি কাঁপুনিটা শুরু হল ফের। এবার ক্ষুরের ফলাটা সুধীরের গলার কাছে।

থাক, থাক, ঢের হয়েছে—বলে উঠে পড়তে যাবে, এমন সময় ওপাশ থেকে মান্না এসে দ্রুত ক্ষুরটা ছিনিয়ে নিল যোগেশের হাত থেকে। বলল, তুমি সাহাবাবুর চেয়ারটায় গিয়ে একটু বোসো যোগেশদা। আমি দেখছি।

যতক্ষণ দাড়ি কামিয়েছে মান্না, একটাও কথা বলেনি সুধীর, কিন্তু ভয়ে আর রাগে সে-ও স্থিব ছিল না। তোয়ালে দিয়ে গাল মোছার সময় কথা বেরোল ওর মুখ দিয়ে।

আপনার নার্ভের অসুখ আছে, আমি বলছি। ডাক্তার দেখান। খুব বেশি ড্রিংক কবেন আপনি, আমি জানি, আমি টের পাই। তাই থেকে হয়েছে। সহজে এ-অসুখ সারে না।

যোগেশ পরাজিত স্বরে প্রতিবাদ করে, আগে কখনও হয়নি। আজই প্রথম। বিশ্বাস করুন।

মিথ্যে কথা। ওঃ, আর একটু হলে খুন হয়ে যাচ্ছিলাম আর কী। এই রকম লোককে আপনারা এই কাজে রেখেছেন, আশ্চর্য।

লোকটা তো চলে গেল। ও আর কোনওদিন এ-দোকানে আসবে না। না এল। কিন্তু মুশকিল সেখানে নয়।

যোগেশ চেয়ারে বসে বসে নিজের ডান হাতখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। আঙুল মুঠো কবছে, খুলছে। কেউ ওকে কিছু বলছে না। ম্যানেজারের চেয়ার থেকে উঠলে হয়তো কথা বলে উঠবে ওরা।

যোগেশ চোখ বুজে বসে রইল চুপ করে। ভেতরের চোখ দিয়ে দেখতে পেল, একটা মরা টিকটিকি, তাকে ঘিরে একরাশ পিঁপড়ে, টানতে টানতে নিয়ে চলেছে।

কনুই পর্যন্ত নিজের হাতখানা—নীল সাফারি। ড্রেসের বাইরে বেরিয়ে আছে, ও চোখ খুলে চশমার ভেতর থেকে দেখল। সেটাও একটা বড়সড় টিকটিকির মতো। ওর পোষা, ওর প্রিয়, ওব যথাসর্বস্ব। অচল হয়ে গেলে ফিটফাট প্রসন্ন ওর বাকি শরীরটার কোনও মূল্য থাকবে না।

অনেকক্ষণ নিজেব আত্মাভিমানের সঙ্গে লড়াই করে, হেরে যাওয়াব পর, যোগেশ তার সহকর্মীদের ডেকে বলে, সাহাবাবুকে এখনই বলিস না ভাই। ডাক্তারের কাছে যাব আজই রাত্তিরে। দেখি না কী বলে। সত্যি তো, আগে কখনও হয়নি। আজই প্রথম। তারপর একটু থেমে বিড়বিড় করতে লাগল: লোকটা এমন করে উঠল যেন আমি ওকে খুন করতে যাচ্ছিলাম। এখন ভাবছি, ক্ষুরটা ওর গলায় বসিয়ে দিলেই হত। পুচ করে। তা হলে বেবিয়ে আসত ওর ভেতরকার সব রং। লাল, সবুজ, হলুদ, যা দিয়ে কালার টিভি তৈরি হয়।

১৯৯৮

পরনে খাকি রঙের হাফপ্যান্ট, যাকে বলে শর্টস। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। বাকি অঙ্গ অনাবৃত। ঢ্যাঙা দোহারা চেহারা। গলা থেকে গোড়ালি অবধি শুধু লোম। মুখটা না কামালে ঘোড়ার মতো দেখাত।

বরুণ রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়াল। হাতে মুঠো-করা সবুজ রঙের তোয়ালে। বলল, আমি সমুদ্রে চান করতে যাচ্ছি।

শিশিরকণা সরষে বাটছিল। পাশে কয়লার উনুন গনগন করে জ্বলছে। তার ওপর কালো কড়াই চাপানো। গোটা গোটা পমফ্রেট মাছ ভাজা হচ্ছে। বাতাসে আঁশটে গন্ধ। শিশিরকণা দেখল, দরজার ওপরের চৌকাঠে বরুণের মাথা ঠেকে রয়েছে। বলল, কী হল? বললেন, আজ সমুদ্রে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। সকালটা ঘুম দেবেন।

ঘুম ভেঙে গেল। এত সমুদ্রের আওয়াজ।

অকারণ মুখের ঘাম মুছল শিশিরকণা। ওর ফরসা মুখখানা আগুনের তাপে এমনিই লাল হয়ে ছিল, আঁচলের ঘষা লেগে আরও লাল হয়ে গেল। বুকের কাপড় গলা অবধি তুলে বলল, গিয়েই ওদেব পাঠিয়ে দেবেন। আমি তারপর চানে যাব।

চলো, সমুদ্রেই যাই। আমি না হয় অপেক্ষা করছি। তোমার রান্না হয়ে যাক।

হয়েছে মশাই। আর ভদ্রতা করতে হবে না। জানেন না যেন, আমি সমুদ্রে চান করি না। কানে বালি ঢুকে যায়।

বরুণ জানত। তবু বলতে হয়, বলেছিল। না হলে শিশিরকণা ভাববে, ওকে রান্না করাবে বলে পুরীতে নিয়ে এসেছে শিখা। কেউ ওর দিকে মন দিচ্ছে না।

মালী বলে একটা লোক আছে এই হলিডে হোমে। যদিও বাগান বলতে কিছু নেই তেমন। বালির ওপর কী-বা গজাবে। ওই মালী হল হলিডে হোমের দারোয়ান। আবার গেস্ট এলে তাদেব দেখাশোনা করাও ওব কাজ। বাজার করা, রান্না কবা, জল তুলে আনা, বাসন মাজা, উনুন ধরানো, ঘর ঝাঁট দেওয়া—সব। কিন্তু লোকটা অত্যন্ত রুগ্‌ন আব ছিঁচকে চোর। তাই এখানে এসে অবধি বাজারটা বরুণ করে। রান্না করে শিশিরকণা। লোকটা এখন রকের ওপর চাদর পেতে ঘুমোচ্ছে।

বরুণ বেবিয়ে যাচ্ছে। শিশিরকণা হাঁক দিল, দবজা টেনে দিয়ে যাবেন যেন। বড্ড কুকুর।

পুরী আসার পরিকল্পনা যখন হচ্ছে, তখন বরুণ বলেছিল, এবার আর হোটেলে না, কোনও একটা হলিডে হোমে গিয়ে উঠি। অনেক ব্যাঙ্কেব হলিডে হোম আছে পুরীতে। শিখা বলেছিল, তারা তোমাকে থাকতে দেবে কেন!

দেবে। দেয়। আমি বিজ্ঞাপন দেখেছি। সামান্য ভাড়া। খাট-বিছানা-বাসনপত্র সব ওখানে থাকে। সাহায্য করার লোকও থাকে। তবে—

রান্নাটা নিজেদের করে নিতে হয়, এই তো?

হ্যাঁ।

শিখা বলেছিল, আমি বারোমাস এখানেও রান্না করব আবার বেড়াতে গিয়ে সেখানেও রান্না করব। বাঃ! আমার আব শখ-আহ্লাদ বলে কিছু নেই?

তা কেন। আমরা তো বাইরেও খেতে পারি ইচ্ছে মতন। বাইরে থেকে এনে খেতে পারি। তা ছাড়া দারোয়ান যে থাকে, পয়সা দিলে সে-ও রান্না-বাজার করে দেবে। সেই বরাকরের ডাকবাংলোয় মনে নেই? ঝাল ঝাল মুরগির মাংস!

শিখা বলে, খেয়ে আমার অসুখ করে গেল।

বরুণ বলে, যে টাকাটা বাঁচবে, ভাবছিলাম, সেটা গাড়ি ভাড়া করে কোনারক চিলকা বেড়াতে গিয়ে খরচা করব।

দু'মাস আগে ট্রেনের টিকিট কাটতে হয়। সুতরাং উপযুক্ত একটা হলিডে হোম তখনই বুক করতে হল। আগে থাকার ব্যবস্থা, তারপর যাওয়ার টিকিট। সমুদ্রের যত কাছে হয়।

ওদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট যে ব্যাঙ্কে আছে, সেখানকার ম্যানেজার জানতে পেরে বলল, কবে যেতে

চান বলুন। দেখি, যদি খালি থাকে, আপনাকে দেব। দু'খানা শোবার ঘর আছে। ডবল বেড। আলাদা বাথরুম—অ্যাটাচড না। কিচেন, বাসনপত্র, অল ফাউন্ড। শোবার ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায়। নিজের বাড়ির মতো থাকবেন। যখন খুশি যাবেন, আসবেন, হোটেলের মতো নিয়ম মেনে চলতে হবে না। যদি একখানা ঘর নেন, তা হলে খরচ কম পড়বে।

অমনি বরুণ বলেছিল, না, না। পুরো বাড়িটাই নেব। আমাদের একটি বারো বছর বয়েসের ছেলে আছে। সে আর তার মা এক ঘরে। আমি অন্য ঘরে। দুটো ঘরই দরকার। আর কারুর সঙ্গে শেয়ার করা—আমার স্ত্রী পছন্দ করবে না। ও ভারী খুঁতখুঁতে।

এদিকে বরুণ যখন ব্যবস্থা পাকা করে আনছে, শিখাও বসে নেই। ওর স্কুলের সহকর্মী শিশিরকণা। তাকে বলল, আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবে?

কোথায়?

পুরী।

ওমা, তাই নাকি? পুরী আমি কখনও যাইনি।

সেখান থেকে চিলকা, কোনারক, ভুবনেশ্বর। গাড়ি ভাড়া করে ঘুরব। আমরা তিনজন আর তুমি গেলে চারজন। স্বচ্ছন্দে কুলিয়ে যাবে।

শিশিরকণা ওদের প্রথমে উৎসাহিত হয়ে উঠলেও পরে, একটু ভেবেচিন্তে, বলে, না ভাই, আমি গেলে তোমাদের প্রাইভেসি নষ্ট হবে। আমি একটা অড্ ম্যান আউট!

শিখা বলে, অড উয়োম্যান ইন। আমাদেব আবার প্রাইভেসি! ছেলের বয়েস বারো। ভাইবোনের মতো থাকি আমরা। আমার সম্পর্কে ওর আর আগ্রহ নেই। ঘর কি মুরগি দাল বরাবর বলে না, তাই। তুমি গেলে আমাদের তিনজনেরই ভাল লাগবে।

শিশিরকণা কচি খুকি নয়। স্কুলের হিসেব মেনে নিলে ও শিখার চেয়ে ছ'বছরের জুনিয়র। তার মানে ওর বয়েস সাতাশ। বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা হয়েছে, ছাড়াছাড়ি হয়েছে। এখন ও নির্ঝঞ্ঝাট। ছেলে বাপের দখলে। মুক্ত জীবনে এখন শিশিবকণার আশপাশে পুরুষবন্ধু অনেক। ওবা ছুঁকছুঁক করে, ঠোকরায়, কিন্তু পুরোটা গিলতে চায় না। শিখা বলে, মেয়েমানুষ একলা থাকলে মাছি ভনভন করবেই। তুমিও চালিয়ে যাও যতদিন পারো। দেখো, কেউ জালে পড়ে কিনা।

শিশিরকণা ওদের বলে, কুকুর। রাগ করে কথা বললে ওর থুতনির নীচে একটা ভাঁজ পড়ে। নাকের দু'পাশে সরু রেখা দেখা যায়। একজন পুরুষের খপ্পরে থেকেই ওর যুগলজীবনের শিক্ষা হয়ে গেছে। কী স্বার্থপর, কী নীচ হতে পারে ওরা—ওই পুরুষজাত, ও হাড়ে হাড়ে জেনে গেছে। আর ওই ফাঁদে ও পড়বে না। তবে নির্ভেজাল পুরুষসঙ্গ ওর মন্দ লাগে না। শিশিরকণার সবচেয়ে বড় গুণ ওর হাতের রান্না। ওর গৃহিণীপনা। সংসার করতে ও ভালবাসত। সব মেয়ে আজকাল মন দিয়ে সংসার করতে চায় না। কিন্তু এমনই কপাল, অন্তত শিখার তাই মত, যে ওর বেলাতেই সংসার ভেঙে গেল। ভাইবোনের মতো থাকে, শিখার যে এটা বানানো কথা, তা বুঝেছে শিশিরকণা। বরুণকে ও দেখেছে! শিখাদের বাড়িতেই দেখেছে। কাজ থেকে ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। সেখানে একটা কম্পিউটার যন্ত্র আছে। যন্ত্রটার মুখোমুখি প্রেমিকের মতো বসে ও ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করলে বলে, নতুন নতুন বিদ্যে শিখছি, এই শেখার শেষ নেই। সেটাই শিখার রাগের পয়েন্ট। বকবক করার জন্যে বরুণকে পায় না।

শিশিরকণা রাজি হল যেতে। বরুণ গিয়ে টিকিট কেটে আনল। হলিডে হোমে তো ব্যবস্থা করাই ছিল। শর্ত হল, খরচের চারভাগের একভাগ শিশিরকণা দেবে। না, কারুর গলগ্রহ কেন হবে ও?

শিখা ওর বরকে বলল, আর চিন্তা নেই। একজন রান্নার লোক সঙ্গী পাওয়া গেছে। তুমি একটু অ্যাটেনশন দিয়ো ওর দিকে। কম্পিউটার তো পুরী যাচ্ছে না।

আর শিশিরকণাকে বলল, বরুণ এত ঘরকুনো ছিল না আগে। ওর কামুক চেহারা তো আমি দেখেছি। সাংঘাতিক। দ্যাখ, তুই আবার জাগাতে পারিস কি না।

আমার বয়ে গেছে। শিশিরকণা চোখ পাকিয়ে বলে, তোমার খোকা, তুমি জাগাবে। ট্রেনে ওঠার আগেই তুমি থেকে তুই। শিখা পারে বটে। আসলে সব কাজ থেকে ছুটি পাওয়ার আনন্দে ও গলে গেছে। ট্রেনে উঠে শিশিরকণা হল শুধু কণা।

গলে খানিকটা শিশিরকণাও গেছে। ট্রেনের কামরায় উঠে প্রথমেই নিজের ব্যাগ থেকে ঢাউস মাপের পেপসি বোতল বার করল। টুকুর তেষ্টার জল। ওমা, জল তো আমরা বড় জগটায় এনেছি। শিখার কথায় পাত্তা দেয় না কণা। শোবার সময় চারখানা বিছানাই ও পাতল।

এত ভাল ছিমছাম একটা সংসার পাবে, কেউ ভাবেনি। সবকিছু আছে, কেবল মানুষ নেই। মানুষ আসতেই ভরে গেল সংসার। শিখা বলেছিল, আমি আর কণা একটা ঘরে, তোমরা বাপ-বেটা ওই ঘরটায় যাও। কণা বলে, ওমা, তা হয় নাকি? কর্তা-গিন্নিকে আলাদা করে দিলে আমার পাপ হবে। আমি আর টুকু ও-ঘরে। বরুণদা, আপনি শিখাদির ব্যাগটা এ-ঘরে নিয়ে আসুন তো।

বরুণ মৃদু অনুযোগ করে, তোমাদের ঘরে ড্রেসিং টেবিল নেই। কণাকে বার বার এ-ঘরে আসতে হবে। এই ব্যবস্থা কি ভাল হল? উত্তরের প্রত্যাশা না করে ও একটা রিকশা ধরে বাজারের দিকে এগোয়। কণা ঢোকে রান্নাঘরে। ছেলেকে নিয়ে শিখা সোজা সমুদ্রের ধার। টুকু আবার একটা বল এনেছে। লাল রঙের বলটা ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে ছুড়ে দিল ঢেউয়ের দিকে।

ভোব সকাল থেকে সমুদ্রের ধারে মানুষের ভিড়। উঁচু উঁচু ঢেউয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে রঙিন জামাকাপড়-পরা মেয়ে-পুরুষ। সমুদ্র কাউকে নিচ্ছে না। আছড়ে ফেলে দিচ্ছে তীরে। স্তিমিত চিনিপাতা জীবন থেকে পালিয়ে একদল মানুষ যেন নোনতা জলে হাবুডুবু খেতে এসেছে। করকরে বালির ওপর দিয়ে হাঁটা যায় না। পা ডুবে যায়। ঝিনুক কুড়োতে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছে ছেলেমেয়ের দল। টুকুর হাতে বল, দেখতে দেখতে বল খেলার সঙ্গীও জুটে গেছে ওর। বালির ওপর কাগজ বিছিয়ে বসে থাকে বরুণ আর এইসব দৃশ্য দেখে। শিখাকেও দেখে। শিখার ভিজে চুল লেপটে থাকে গালের ওপর, ঘাড়ের কাছে। সালোয়ার-পাঞ্জাবিতে ওকে অন্য রকম দেখায়। ওব চোখ পড়ে টুকুর এক সঙ্গিনীর দিকে। সে বার বার বল ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে আর টুকু, বোকাটা, জলে ঝাঁপ দিয়ে তুলে আনছে। এই ওদেব খেলা। মেয়েটার পরনে কালো জাঙিয়া, বুকের ওপর কালো রঙের খাটো জামা। বরুণের মনে হয়, টুকু বোধহয় মেয়েটার আকর্ষণেই ফরমাশ খাটছে। একবার ডাকল, এই টুকু, জলে যাবে না। ডাঙায় খেলো। সমুদ্রের গর্জনে সে-ডাক শোনা গেল না।

পিকাসোর একটা ছবি আছে তাঁর নীল-পর্যায়ে আঁকা। একটা হোমরাচোমরা যুবক পাথরের ওপর বসে আছে আর তার সামনে একটা বলের ওপর দাঁড়িয়ে খেলা দেখাচ্ছে একটা খুদে টিংটিঙে মেয়ে। হাতদুটো ওপরে তোলা। এই রকম জাঙিয়া আর জামা পরা। কে কাকে নাচায়! বরুণের মনে পড়ল ছবিটার কথা। কারুর বাড়ির দেয়ালে দেখেছে।

সেদিন রাত্রে বরুণ আর নিস্পৃহ থাকতে পারল না। বিছানায় সরে এসে হাত বাড়িয়ে শিখাকে কাছে টেনে নিল।

শিখা বলল, কী? ছাড়ো তো। আমি ক্লান্ত। ওদিকের কাজ কিছু এগোল?

কোন দিকের?

তোমাকে বলেছিলাম না, কণার দিকে একটু বিশেষ মন দিয়ো। তার কী হল?

মন দেওয়ার চেষ্টা করছি। সে-ও তো খুব ক্লান্ত থাকে। তুমি সমুদ্রে স্নান করে ক্লান্ত আর কণা রান্না করে ক্লান্ত। আমার সুযোগ কোথায়?

সুযোগ খুঁজে নিতে হয়।

শিখা ওপাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করে। তখন বরুণ উঠে উপুড় হয়ে ওর কানের লতির নীচে ঠোঁট চেপে ধরে।

সুযোগ পাওয়া গেল কোনারক থেকে ফেরার দিন। হলিডে হোমে ঢোকার আগে বাজারের কাছে নেমে গিয়েছিল বরুণ। তখনও সন্ধে হয়নি। গাড়ি থেকে নেমেই সমুদ্রের দিকে ছুটল টুকু। বুলা ওকে ডাকছে। কোনারক ওর ভাল লাগেনি। টুকুর পেছন পেছন ছুটল শিখাও।

টুকিটাকি খাবার জিনিস হাত থেকে নামিয়ে বরুণ নিজেদের ঘরে ঢুকে যায় সোজা। কিছু না ভেবেই। আচমকা দেখে, শিশিরকণা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসা। পরনে কালো রঙের পেটিকোট। বুকে কালো রঙের ব্রেসিয়ার। তার চারপাশ পাউডারে সাদা। এর মধ্যে চান সেরে ফেলেছে কণা।

আরে আপনি? সাদা রঙের তোয়ালেটা বুক অবধি তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে কণা।

এ-হে, ভুল করে... তুমি বোসো বোসো।

আমি ভাবলাম বুঝি কুকুর ঢুকল। দরজা টেনে দিয়ে যেতে বলেছিলাম, দেয়নি শিখাদি।

আমি পাশের ঘরে বসছি, বরুণ যেতে যেতে বলে, তুমি তৈরি হয়ে নাও।

কণার চুল শিখার মতো ঘন আর লম্বা নয়। একটা হলুদ রঙের চিরুনি দিয়ে কণা তার জট ছাড়াতে লাগল।

পাশের ঘর থেকে বরুণ জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগল কোনারক?

এমন কিছু না। শুনেছিলাম খুব ইরোটিক ভাস্কর্য।

নয়?

পাথর তো। ঘষা ঘষা। পেইন্টিংয়ে অনেক ভাল ফোটে।

বরুণ এবার রসিকতা করার ভঙ্গিতে বলে, ছবিতেও বা কতটুকু। বিয়েল লাইফের তুলনায়—

ওদিক থেকে কোনও সাড়া আসে না। প্যান্ট-শার্ট পরা অবস্থাতেই বরুণ বিছানায় আড় হয়ে শুয়েছিল। একটু পরে চোখ খুলে দেখল, ঠিকঠাক বেশে কণা সামনে দাঁড়িয়ে। ওর গা থেকে সুগন্ধ বেরোচ্ছে।

কণা বলল, আপনি বিশ্রাম করুন বরুণদা। আমি একটু ঘুরে আসি। চিংড়ি মাছ ভেজে ঢাকা দেওয়া আছে। ফিরে এসে রাঁধব। মালীটাকে দেখতে পেলে বলবেন, যেন নারকোলটা কুরে রাখে। আর দেখবেন, কুকুর—

বরুণ লক্ষ করে, কণার নাকের দু'পাশে দুটো সরু রেখা জেগেই আবাব মিলিয়ে গেল। ওর কোমরে যেন মেদ একটু বেশি। কুকুর ওর অবসেশন।

সেই কথাই ও শিখাকে বলল ফিরে যাবার দিন। শিখা জিজ্ঞেস করেছিল, কতদূর এগোলে—

বরুণ বলে, চেষ্টা করেছিলাম। পারলাম না। ওর মধ্যে আকর্ষণ নেই।

সে আবার কী? অমন যুবতী, ফরসা—

আমি অন্তত খুঁজে পেলাম না। তুমিও তো যুবতী, ফরসা তেমন নও, তবু তোমার মধ্যে আকর্ষণ আছে। আমি খুঁজে পেয়েছি। সেটা কোথায় জানো? তোমার ওই গালের কাছে। কানের লতির পাশে। যেখানে খুচরো চুল সব সময় ওড়ে। ওই জায়গাটায় চোখ পড়লেই...। এখানে এসে এটা আবিষ্কার করলাম। একটা জিনিস তোমার আছে, কণার নেই।

হয়তো এই জন্যেই ওর ডিভোর্স হয়ে গেছে। বেচারা। অথচ কী কাজের মেয়ে ও, ভেবে দেখো। শিখা ভরাট গলায় ফিসফিস করে বলে, দুঃখ হয়, না?

১৯৯৯

ফাইনাল সিলেকশন

সন্ধেবেলার আড্ডাটা যখন বেশ জমে উঠেছে, এমনি সময়ে বাতাসের মুখে একটা পাতার মতো এসে তক্তাপোশটায় পড়ল,—মানে বসে পড়ল আমাদের সবচেয়ে জুনিয়র মেম্বর বেকার সান্ডেল—ওরফে সুদর্শন সান্যাল।

তাসের হাত গুটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—কী রে, কিছু হল?

আরে দুর!—সুদর্শন কপালের ঘাম মুছল।—শালারা একের নম্বরের চোর। যিনি ইন্টারভিউ নেবেন, গিয়ে দেখি কিনা তাঁর পাত্তা নেই। কখন আসবেন? না, বেলায়। এলেন গিয়ে দুটোর সময়। জাস্ট ইম্যাজিন, আমি ঠায় টুলের ওপর বসে। বললাম, আমায় ডেকেছিলেন ওই চাকরিটার ব্যাপারে...। বলতে-না-বলতে আধো আধো সুরে শালা ককিয়ে উঠল যেন—ভেরি সরি, লোক ভরতি হয়ে গেছে

তো! আবার যখন খালি হবে, আপনাকে জানাব, নামটা রেজিস্টার্ড হয়ে রইল।

অনেক জায়গায় চাকরি করার এবং ছাড়ার একটা হাতযশ আছে আমাদের সুরেন সেনের। সে বললে, নিশ্চয় ঠিক সময় মতো যেতে পারোনি সুদর্শন। আজই কি প্রথম গেছলে?

আরে না। এর আগে তিন দিন ইন্টারভিউ হয়ে গেছে, আজ ছিল ফাইনাল সিলেকশনের দিন। এতগুলো সিঁড়ি পেরিয়ে গিয়ে কিনা শেষ পিঠটা কুড়োতে পারলাম না। ...চোর, সব শালা চোর!

আমরা সকলেই পরম সমবেদনা-মাখা চোখে চেয়ে আছি বেচারা সুদর্শনের দিকে। ইতিমধ্যে ব্রজরাখালবাবু—আমাদের ক্লাবের সবচেয়ে সিনিয়র মেম্বর—একরকম আচমকাই, কোণ থেকে একটা সিগারেট ছুড়ে দিলেন সুদর্শনকে। বয়সে প্রায় পঁচিশ বছরের বড় হলেও পরম সৌহার্দ্যের সুরে বললেন,—কুছ পরোয়া নেই পার্টনার! ভালয় ভালয় যে সর্বতীর্থসার এই মহামায়া স্পোর্টিং অ্যান্ড ড্রামাটিক ক্লাবের কোলে ফিরে এসেছ এইটেই অত্যন্ত আনন্দের কথা।

সুদর্শন সিগারেটটা ধরাল, আর না-বোঝা একটা চাহনি মেলে ধরল ব্রজরাখালবাবুর দিকে। বলল—চাকরিই তো হল না, আবার ভালয় ভালয় ফিরলাম কী করে?

নয় তো কী! ব্রজরাখালবাবু হাসলেন।—তবে একটা গল্প বলি শোনো।

তাস চালা আমাদের বন্ধ হয়ে গেল। ব্রজরাখালবাবু শুরু করলেন,—

সেটা ফার্স্ট গ্রেট ওয়ারের সময়কার কথা। হুড়হুড় করে মিলিটারি থেকে লোক নিচ্ছে। কোয়ালিফিকেশন দেখছে না, এক্সপিরিয়েন্স দেখছে না। দেখার মধ্যে শুধু হেল্‌থ। মাইনে—তখনকার দিনে দেড়শো-দু'শো টাকা তো নস্যি! হারু নাপতের যে-ছেলেটা কেবল কুস্তি করত আর পান খেত, সে-ও সেকেন্ড লেফটেনান্টের চাকরি পেয়ে গেল!

ঠিক এমনি সময়ে একটা পোস্টের জন্যে অ্যাডভারটাইস করলে ওরা। মাইনে আড়াইশো—অন্তত ছ'ফুট লম্বা, আটত্রিশ ছাতি আর ম্যাট্রিক পাশ হওয়া চাই। বহুত দরখাস্ত পড়ল। তার মধ্যে একখানা ছিল আমার ক্লাসফ্রেন্ড অনিল বিশ্বেসের। ইয়া লম্বা-চওড়া তার লাশ! তখন কি আর জানত যে সে-ই শেষপর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাবে! কোনও আশাই নেই, তবু আমি বললাম, ঘাবড়াসনি, কিছুদিন ওয়েট কর।

তাই হল। একদিন 'ও.এইচ.এম.এস.' মার্কা একটা চিঠি এসে হাজির। ওর নাম সিলেকটেড হয়েছে। ইন্টারভিউতে ডেকেছে।

ইন্টাবভিউ হল। হাজার হাজার লোকের মধ্যে বাছাই করে দশজনকে ফাইনাল সিলেকশনের জন্যে রাখা হল। এমন ভাগ্য, অনিল বিশ্বেস এই দশজনের মধ্যে একজন ছিল।

আর একটা সিগারেট না ধরানো পর্যন্ত ব্রজরাখালবাবু চুপ করে রইলেন। বেশ আচ্ছা করে একটা সুখটান দিয়ে আবার আরম্ভ করলেন,—

এইটেই হল চরম পরীক্ষা।

সব্বাইকে মিলিটারি ইউনিফর্ম পরিয়ে দেওয়া হল। আর মাথায় দেওয়া হল একটা বেশ লম্বা টুপি। অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, আর প্রায় বিশ হাত দূর থেকে একজন গুলি ছুড়বে যেটা মাথার টুপি ফুটো করে বেরিয়ে যাবে। যে সেই গুলির মুখে স্টেডি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, সেই উতরে গেল।

বন্দুক উঁচিয়ে রেডি, ওয়ান-টু বলতে বলতেই জন পাঁচেক সেইখানেই ফেন্ট হয়ে পড়ে গেল চোখ উলটে। থ্রি বলার একটু আগে তিনজন ধপাস করে বসে পড়ে 'মাগো—মরে গেলাম!' বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আর একজনের অবস্থা এত নোংরা হয়ে পড়ল যে সে-কথা স্পষ্টভাবে এখানে বলে আর কাজ নেই। ভাবো দিকি, কী অমানুষিক ব্যাপার। একেবারে মৃত্যুর সামনে কে পারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে? লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলিটি খুলি ফুটো করে চলে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে!

বাকি রইল আমাদের অনিল বিশ্বেস। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। একটুও টলল না। টুপি ফুটো করে কখন যে গুলি চলে গেছে তা যেন টেরই পায়নি! আশ্চর্য!

পরীক্ষা শেষ হতেই সকলে এসে অভিনন্দন জানালেন অনিলকে। হ্যান্ডশেক করে সাহেব বললেন, তোমার সাহস দেখে খুব খুশি হয়েছি আমরা। কাল থেকে তুমি কাজে লাগতে পারো।

চাকরি পাওয়ার এই কৃতিত্ব দেখে আমাদের সবাইকার চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল। বিশেষ করে সুদর্শনের। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ব্রজরাখালবাবু বলে চললেন—

অনিল বিশ্বেস কিন্তু প্রথমটা এর কোনও জবাব দিলে না। খানিক পরে হেসে বললে,—সাহেব, কী ভেবেছ, এই সামান্য একটা জিনিস পারব না। আমি কি তেমনি ছেলে! এই আমি দাঁড়িয়ে রইছি, মারো তোমরা, পাঁচটা, দশটা গুলি মারো—দেখো, কেমন করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি!

সাহেব বললেন—আর দরকার নেই মিস্টার বিসওয়াস, তুমি তো পাশ করে গেছ। আর পরীক্ষার দরকার নেই।

কে কার কথা শোনে। গোঁয়ারগোবিন্দ বলে চলল,—মারো গুলি, যত খুশি গুলি মারো, আমি দাঁড়িয়ে আছি। গুলি তোমায় মারতেই হবে। বাব্বা, আমি কি তেমনি ছেলে!

চুপ করলেন ব্রজরাখালবাবু। হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে গেছে, এইভাবে আচমকা উঠে পড়লেন,—দেখলে তো, তোমাদের এখানে বসলে বাড়ির সব কাজ ভুলে যাই। আমার যে বাড়িতে নুন কিনে নিয়ে যাবার কথা; তবে যে রান্না হবে! কী সব্বোনাশ, আজ কপালে যে কত দুখ্যু আছে, কে জানে! একদম ভুলে বসে আছি।

বলে হন্তদন্ত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন, সুদর্শন আটকাল। ইয়ারকি হচ্ছে! আধাখ্যাচড়া গল্প বলে চলে যাওয়া চলবে না, বলে দিচ্ছি। বলুন, তারপর কী হল? চাকরি হল তো অনিল বিশ্বেসের? কোথায় পাঠাল তাকে?

তোমাদের জ্বালায় অস্থির!—বিরক্ত হয়ে আবার বসে পড়লেন ব্রজরাখালবাবু।—কী বললে? হ্যাঁ, গভর্নমেন্টই যাবতীয় খরচা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল তাকে। বাড়ি থেকে একটি পয়সা খরচ করতে হয়নি। পাঁচটি বছর সেখানে থাকতেও হয়েছিল। তারপর একদিন হঠাৎ পট করে মরেও গেল!

মরে গেল? সব্বাই আঁতকে উঠলাম আমরা। কীসে? প্লেন ক্র্যাশ না জাহাজডুবি?

দুর বোকা! পাগলাগারদের মধ্যে প্লেন ক্র্যাশ বা জাহাজডুবির জায়গা কোথায়? মারা গেছল ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে; ভেবেছিল, পিঠে বুঝি তার প্যারাসুট বাঁধা আছে।

ব্রজরাখালবাবু কথা শেষ করেই হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। খানিকটা চুপ করে থেকে সুদর্শন বললে, দ্যুস! স্রেফ গাঁজা!

কিন্তু তবু কেমন যেন থমথম করতে লাগল ঘরের আবহাওয়াটা। সুদর্শনের চাকরিটা যে হয়নি, ভালই হয়েছে।

১৯৫৩

জমিন

অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা মার্কেড রোড যেখানে এসে ট্রাম রাস্তায় পড়েছে, সেই মুখটায় বাঁ দিক ঘেঁষে ওর রিকশাটা রাখে মহেশ। হাতে-টানা রিকশা। লাল রঙের গদি। ত্রিপলের কাপড় দিয়ে বানানো চালা, লোহার কবজা ভাঁজ করে খোলা-বন্ধ করা যায়। সেই চালার সঙ্গে একটা প্লাস্টিকের চাদরও বাঁধা আছে। বর্ষা হলে ওটা ফেলে দেয়, না হলে সওয়ারি ভিজে যাবে।

সওয়ারি হল রিকশাওলার লছমি। তার সুখ-সুবিধে দেখতে হবে বই কী। বুঢঢা আদমি বা বুঢটি জনানা হলে অনেক সময় মহেশ তাকে হাত ধরে রিকশায় উঠতে সাহায্য করে। হাতের ব্যাগ তুলে নিয়ে সওয়ারির পায়ের কাছে রাখে। মাথার ওপর রোদ চড়া হলে চালাটা নামিয়ে দেয়। এইসব ওর কাজ। রিকশাওলাকে শুধু গাড়ি টানলেই চলে না। সওয়ারির আরামের দিকেও নজর রাখতে হয়।

নিজের আরাম নিয়ে মহেশ ভাবে না। তিন-চার বছর আগে যখন ও প্রথমবার মতিহারি জেলার মুক্তাপুর গ্রাম থেকে হাওড়া টিসনে এসে নামে, তখন ওর পরনে কী ছিল? লঙোটির ওপর আট-হাতি

ধুতি আর নেড়া মাথায় একখানা পাগড়ি। খালি গা। বগলে একটা পুঁটলি। তার মধ্যে একটা কম্বল, ছাতু আর গুড় আর আচার। ওর বউ রাতিয়া সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল কয়েকদিনের খাদ্য। গাঁয়ে চাষের জমিতে মজুর খাটত মহেশ, খরা হওয়ায় ওর কাজ চলে যায়। তখন ছেদিলাল ওকে কলকাতায় নিয়ে আসে। ছেদিলালই ওকে প্রথম একখানা গেঞ্জি কিনে দেয়। সেই গেঞ্জি ধবধবে সাদা রং থেকে ময়লা হতে হতে যখন ছিঁড়ে যায়, তখন মহেশ নিজের টাকা খরচ করে আরেকটা গেঞ্জি কেনে। ততদিনে ও খানিকটা থিতু হয়েছে।

ছেদিলালও প্রথমে হাত-টানা রিকশা চালাত। সে দশ-এগারো বছর আগের কথা। তারপর সাইকেল রিকশা ধরল। তাতে পরিশ্রম অনেক কম। এখন সেটাও ছেড়ে দিয়ে ফুচকা বেচে। বিকেল হলেই একঝুড়ি ফুচকা, তেঁতুলগোলা জল আর আলুসেদ্ধ নিয়ে মেয়ে-স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মেয়েরা ঘিরে ধরে ওকে। দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যে ওর সব মাল খতম হয়ে যায়। খালি ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ও আস্তানায় ফেরে। ওর কোমরের বটুয়াতে তখন খুচরো আর নোট মিলে একশো, সওয়াশো টাকা। তার আশি টাকাই লাভ। মালের দাম আর কত। খরচ বলতে মেয়ে-স্কুলের দারোয়ানকে মাসে দুশো টাকা উপঢৌকন দিতে হয়।

মাসে দু'হাজার টাকা রোজগার ওর। তা থেকে পাঁচশো টাকা ও মানিঅর্ডার করে গাঁয়ের বাড়িতে পাঠায়। ওর বউ আছে। বড় বড় ছেলেমেয়ে আছে পাঁচজন—বড়টার বয়স আঠারো। ছোটটার বয়স তিন। মেয়ে-স্কুলে লম্বা ছুটি হলে ছেদিলাল মিথিলা এক্সপ্রেস ধরে বাড়ি যায়। ওর বয়েস ছেচল্লিশ, মাথায় কাঁচাপাকা কদমছাঁট চুল। গায়ে ফতুয়া। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। দেহাতে ও জমিজমা কিনেছে, একটা মুদির দোকান করে বড় ছেলেকে বসিয়েছে। করিৎকর্মা লোক। আর কয়েকটা বছর কলকাতায় কাটিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ওর। তখন বড়ছেলেকে গোলগাপ্পার ব্যবসাটা দিয়ে যাবে। এখন কিছুদিন ও বউ নিয়ে ফুর্তি করছে, করুক।

মহেশ পরে টায়ারের চটি। হাঁটাহাঁটির কাজ ওর। হাওয়াই চপ্পল তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়। ওর বয়েস বাইশ। ও যখন প্রথম কলকাতায় আসে, তখন ওর বাচ্চাকাচ্চা বলতে একটি মেয়ে ছিল। আর ওর চেয়ে বয়সে এক বছরের বড় বউ ছিল পোয়াতি। সেই বাচ্চাটাও মেয়ে হয়ে জন্মাল। এমনই দুর্ভাগ্য ওর।

ও যে রিকশাটা চালায়, সেটা বেআইনি। মানে, তার লাইসেন্স নেই। এ-পাড়ায় এগারোটা রিকশার লাইসেন্স আছে—সেই ব্রিটিশ আমল থেকে, তারপর আর নতুন লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। অথচ লোক বেড়েছে, রিকশার চাহিদা বেড়েছে, সুতরাং নতুন নতুন রিকশাও নেমেছে রাস্তায়। একটা রিকশা তৈরি করতে খরচ পড়ে আড়াই হাজার-তিন হাজার টাকা। মহেশ মালিককে রোজ কুড়ি টাকা করে দেয়। রোজগারের বাকি টাকা ওর। সারাদিন খেটে পঞ্চাশ টাকার মতো ওর থাকে। প্রথমদিকে গাছতলায় শুত আরও তিনজনের সঙ্গে। তাদের একজন ওর গচ্ছিত সঞ্চয় চুরি করে পালায়। তারপর মালিককে বলে কয়ে তার বাড়ির বাগানে একপাশে একটু জায়গা করে নিয়েছে। সেখানে রিকশাও থাকে, মহেশও থাকে। গেটের ভেতরে জায়গাটা। তাই নিরাপদ। আসলে নিরাপদ মহেশের জন্যেই। সে-ই তো রাত্রের পাহারাদারও বটে। একবার ওই বাড়ির পাম্প রাতে চুরি হয়ে গিয়েছিল, পাঁচিল ডিঙিয়ে চোর এসেছিল, তালা ভেঙে পাম্প নিয়ে চলে যায়। তখন মালিকের মনে পড়ে মহেশের কথা। একটা দড়ির খাটিয়া কিনে এনে মহেশকে ডেকে আনে।

মালিক মহেশের নামে ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছে। সেখানে ও মাসে মাসে টাকা জমায়। দুশো-একশো টাকা বাড়িতে পাঠায়, রাতিয়ার নামে। সেই মানিঅর্ডারের রশিদ মহেশের ছোটভাই চমনলাল আঙুলের ছাপ লাগিয়ে ফেরত পাঠায়। ওটা হাতে না আসা পর্যন্ত মহেশের মনে অস্থিরতা থাকে, টাকাটা পৌঁছোল কিনা। গ্রামগাঁয়ে টাকা পৌঁছোনো এক বিশাল সমস্যা। বিশেষ কেউ তো লেখাপড়া জানে না। সকলেই টিপছাপ দিয়ে টাকা নেয়। টিপছাপ তো সবই একরকম, আসল নকল ধরা মুশকিল।

সারাদিন খাটুনির পর মহেশ রিকশাটা বাড়ির ভেতরে এনে রাখে। নিজে রাস্তার কলে চান করে আসে। তারপর রান্না করতে বসে। চাপাটি আর সবজি। কোনওদিন ডাল আর চাপাটি। খাওয়াদাওয়া সারা হলে খাটিয়ায় গিয়ে বসে। বিড়ি ধরায়।

তখন ওর রাতিয়ার কথা মনে পড়ে। খুব ইচ্ছে করে ওকে কাছে পেতে। রাতিয়ার মুখের খইনির গন্ধ

পাবার জন্য ওর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মহেশ ওর মাজা পেতলের থালাটা তুলে এনে বাজায় আর গান ধরে:

কুছ তো আরাম মিলি পাশে তনি আই-ত'
কৈসন বেমারি-হ তনি ঘর আই-ত'
টুট নাহি কবি লা আংরেজি দবাই-ই
ধীরে ধীরে দিহিত' কমরিয়া সগাই-ই
কেৎনা যবানি দেয়ায়িল তবাহি
কহ নি ভরতকে বোলাইলি তরাহি
হমকে অকেলে না আওয়ে উধাই-ই
দেবর তনি দে হিঁয়াপর তনকা রজাই-ই।

গান করতে করতে ওর বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে। না, না, চমনলাল, ওর ছোটভাই। খুব ভাল ছেলে। সারাদিন রাস্তায় ইট ভাঙার কাজ করে। বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে ও ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবে সারা রাত। আর রাতিয়াও স্বামীর অনুগত স্ত্রীলোক। মহেশ ছাড়া আর কারুর জায়গা নেই ওর মনের মধ্যে। দেওরকে ও পাত্তা দেবে না।

রাতিয়ার কথা ভেবে মহেশ গায়

কর খেবত করবতিয়া করকে
কংলা খন কে খন সোর করে—
সারি সবকত ভরকতি আঁখিয়া
কহি আয়ি হেঁ পিয়া মোর ঘরে।
মন লাগত নেই কে একো ছন
তন আগ বিরহ সে মোব জরে।
মোর বাত বিতলি যা গলি যা-গল
পাগল মনওয়া নহি ধীর ধরে।
চোরি করিহ পপি-উ-চাঁহে
খিতিয়া ঠো লগাই
হমকে সাড়ি চাহি
কবলো খিতি গওনা কে ছাড়ি
হমকে সাড়ি চাহি ॥

এবার যখন গাঁওয়ে ফিরবে মহেশ, তখন অবশ্য রাতিয়ার জন্যে সিল্কের শাড়ি নিয়ে যাবে। শুধু শাড়ি নয়, বাবু-ভাইয়ার জনানা যেমন পরে শাড়ির নীচে পেটিকোট, বেলাউজ তার নীচে ডবল টোপির মতো বুকের ঢাক্কন সব নিয়ে যাবে ও। গাঁয়ে বউরা খালি-গায়ে থাকে, কিন্তু মহেশ বাড়ি ফিরে বউয়ের গায়ে জামা চড়িয়ে দেবে। তা ছাড়া রুপোর একজোড়া বালা আর একটা হাঁসুলিও কিনে নিয়ে যাবে মহেশ। কত আর দাম হবে তার? দুশো-চারশো রুপিয়া? হোক গে। ব্যাঙ্কে ওর টাকা জমছে তো।

গান করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে মহেশ। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে, রেলগাড়ি চেপে ও কলকাত্তা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। খিড়কি দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে ওর বউ। পাশে ওর মেয়ে, বড়মেয়ে, তার কানে একজোড়া রুপোর মাকড়ি। আর ছোটটা বুকে ধরা।

স্বপ্নের মধ্যে ওর মন আনচান করে ওঠে। রাতিয়ার বাহুতে সবুজ উলকির কারুকাজ ওর নাগালের মধ্যে এসে যায়। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ওর পুরুষাঙ্গ। ওর ঘুম ভেঙে যায়। খাটিয়া থেকে উঠে ও শরীরকে শান্ত করে। একটা বিড়ি খায়। বাড়ির সামনের দিকটায় খানিকক্ষণ পায়চারি করে আসে। তারপর আবার রিকশার লাল রঙের গদিতে মাথা রেখে ও শুয়ে পড়ে খাটিয়ায়।

দৈনিক কুড়ি টাকা মালিককে দিয়ে মহেশ খালাস। রিকশার মেরামত, চাল্লি বদলানো, পুলিশের

মাসোহারা—এ সব মালিকের দায়িত্ব। কিন্তু মাসোহারা পেলেও মাঝে মাঝে পুলিশ রিকশার পেছনে তাড়া করে। তখন গাড়ি ফেলে গদিটা বগলে চেপে ছুট দেয় মহেশ। কোনও গলিতে গিয়ে লুকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। পুলিশের ভ্যান চলে গেলে আবার বেরিয়ে এসে কাজ শুরু করে দেয়। পাড়ায় তেত্রিশটা বেআইনি রিকশা আছে, কেউ না কেউ ধরা পড়ে যায় গাড়িসুদ্ধ। তাদের নামে কেস হয়। মামলা হয়। জরিমানা হয়। এক-আধ রাত হাজতেও থাকতে হয়েছে মহেশকে। পুলিশের লাঠির গুঁতো খেতে হয়েছে পেটে পিঠে। এই ঝক্কিতে মালিকের শেয়ার নেই। ধরা পড়লে ট্যাঁকের পয়সাকড়িও পুলিশ কেড়ে নেয়। ওটা ওদের উপরি পাওনা। মহেশের কোনও রাগ নেই পুলিশের ওপর। মাসে মাসে কয়েকটা করে কেস তো ওদের দিতে হবে। বিনা বাধায় তো বেআইনি ব্যবসা চলতে দেওয়া যায় না।

রিকশা চালানোর এটা যেমন খারাপ দিক, তেমনি কিছু ভাল দিকও আছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দেয় ও, কয়েকজনকে চারটের সময় গিয়ে স্কুল থেকে তুলে নিয়ে আসে। সঙ্গে বাড়ির লোক থাকে না। এর জন্যে ও আলাদা বকশিশ পায়। বাচ্চারা আলুকাবলি কি আইসক্রিম খাওয়ার জন্যে ওকে থামতে বললে ও থেমে যায়। রাস্তা পার হওয়ার সময় ও বাচ্চাদের সামলায়। ওদের তো জ্ঞানগম্যি নেই, নেমেই দৌড়োবে। তখন ওর মনে হয়, এরা সওয়ারি নয়, বুঝি ওর নিজের ঘরের ছেলেমেয়ে। যুবক-যুবতীরা হাতে টানা রিকশা চড়ে না, তবে একটু বেশি বয়সি মহিলারা সেজেগুজে গায়ে সেন্ট মেখে যখন ওর গাড়িতে চড়ে যায়, তখন মহেশের মনেও ফূর্তির আভাস লাগে। বাবুভাইয়াদের বাড়ির জনানা ওরা। বড়লোক, ছোলার ছাতুর মতো গায়ের রং, পাতলা ঠোঁট ছড়িয়ে যখন ওরা হাসে, কী সুন্দর দেখায়। কলকাতায় এসে সুন্দরের ছোঁয়া পেয়েছে বলে সারাদিন ওর বাড়ির কথা মনে থাকে না। ছুটে ছুটে ঘুরে বেড়ায় এপথ-ওপথ, ঘেমে গেলে গামছা দিয়ে মুখ মোছে। রাস্তার কল থেকে আঁজলা ভরে জল খায়। আর পয়সা গোনে। মালিকের টাকা বাদে কত টাকা কামাই হল। যেদিন একটু বেশি রোজগার হয়, সেদিন দুপুরে সাতুয়া না খেয়ে ও আন্ডার তরকারি দিয়ে পাঁওরোটি খায়। ও ভাত খায় না, কেননা, ভাত খেলে ঘুম আসে, রিকশা চালাতে কষ্ট হয়।

একদিন বিকেলে ও মেয়ে-স্কুলের সামনে দিয়ে খালি গাড়ি নিয়ে আসছিল, পথে ছেদিলালের সঙ্গে দেখা।

ছেদিলাল জিজ্ঞেস করল কেমন চলছে ওর গাড়ি চালানোর কাজ।

ও বলল, কামাই মন্দ নয়, তবে পরিশ্রম খুব বেশি।

বাড়িতে টাকা পাঠাস?

ও বলল, মাঝে মাঝে পাঠাই। দুশো-একশো।

বাড়ি থেকে খত আসে?

ও বলল, খত কে লিখবে। কেউ তো লেখাপড়া জানে না। ওর পতাও বাড়ির লোক জানে না।

বউয়ের জন্যে মন কেমন করে না? হাসতে হাসতে ছেদিলাল জানতে চায়।

চুপ করে থাকে মহেশ। বয়সে অনেক বড় ছেদি, ওর কাছে মনের কথা কি বলা যায়!

কিন্তু ছেদিলালই সেদিন ওকে বলেছিল, তিন-চার বছর আছিস এখানে। শরীরকে উপোসি রেখে কী লাভ। বাজারের পেছনে রেণ্ডিখানা আছে, সেখানে জওয়ান আওরাত পাবি। মাঝে মাঝে মৌজ করে আসবি। আওরাত বিনা জিন্দেগি বেকার হই।

এই প্রস্তাব ওর পছন্দ হয়নি। অন্য মেয়ের সামনে গা খুলে দাঁড়াতে ওর লজ্জা করবে না? ওর বাড়িতে বউ আছে। আর ও অন্য মেয়ের সঙ্গে মৌজ করবে? এ অন্যায়। গানের পদ মনে পড়ে ওর—'কহি আয়ি হেঁ পিয়া মোর ঘরে। মন লাগত নেই কে একোছন। তন আগ বিরহ সে মোর জরে।' বিরহে শরীরে আগুন জ্বলে। কোনও কাজে মন লাগে না। প্রিয় কবে আসবে।

ও তো একা নয়। গাঁয়ের বাড়িতে রাতিয়াও কষ্টে আছে। গাঁয়ের প্রায় সব মরদই এক-এক করে শহরে চলে গেছে। তাদের বউরাও কষ্ট পায়।

তখনই ও মনস্থির করল। এবার কিছুদিনের জন্যে ও বাড়ি যাবে। কলকাত্তা সুন্দর শহর কিন্তু সেখানে জান নেই।

রিকশাটা যাতে হাতছাড়া না হয়, তাই মালিককে ছ'শো টাকা দিয়ে বাকি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিল মহেশ। বলল, এক মাহিনাকে লিয়ে ঘর যাইবই বাবুজি। তারপর বউয়ের জন্য শাড়ি, জামা, রুপোর

গয়না কিনল। দুটো বাচ্চার জন্যে জামা কিনল। নাকের নথ কিনল। ভাই চমনলালের জন্যে কিনল ধোতি, গামছা। এইসব কিনে পুঁটুলি বেঁধে ও মিথিলা এক্সপ্রেসে চড়ে বসল একদিন। মন তখন ফুর্তিতে ফুলে উঠেছে।

স্টেশন থেকে নেমে চার কোশ পথ হাঁটা। ওর পায়ে টায়ারের চটি। গায়ে ফতুয়া, কাঁধে গামছা, মাথায় মুরেঠা, তার ওপর জিনিসপত্রের পুঁটুলি। বিস্কুট, নানখাটাই, আলতা, স্টেনলেস স্টিলের থালা। দুপুরের রোদ ভেঙে যখন বাড়ি পৌঁছোল তখন বিকেল। হাঁটু অবধি ধুলো।

কত বছর পরে দেখছে, মেয়েরা বাবাকে চিনতে পারে না। বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল মহেশ। বলল, হম তেরা বাপ হই। বড়মেয়েকে বলল, মাইকে বোলা। কহ কি, বাবুজি আইলন। এক লোটা পানি চাহি। বড়মেয়ে ছুটে খড়ের ছাদের নীচে ঢুকে গেল।

একটু পরে রাতিয়া বেরিয়ে আসে। মাথায় ঘোমটা, সিঁথিতে মেটে রঙের সিঁদুর। শাড়ির আঁচল গায়ে জড়ানো। আর কোলে একটা শিশু—আঁচলের আড়ালে মায়ের বুকের দুধ খাচ্ছে।

ই কৌন হও রে রাতিয়া? মহেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

রাতিয়া বলে, তেরা বেটা, বলে খিলখিল করে হাসে।

বেটা? হমনি কে বেটা? ভগওয়ান কে বহোত কিরপা, তু বেটাকে মা ভইলি।

মহানন্দে মহেশ মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে তার পুত্রসন্তানকে কোলে তুলে নেয়। ও ভুলে যায়, তিন বছরের ব্যবধানে জন্মানো এই বেটার বাপ ও নয়, আর কেউ।

হয়তো ভুলে যায় না। ভাবে, এতদিনের উপবাসে রাতিয়াকে কষ্ট পেতে হয়নি। নিজের শরীর চষে সে মহেশের জন্যে একটি পুত্রসন্তান উৎপাদন করেছে। জমিন তো খালি পড়ে থাকে না।

মহেশ এত উপহার এনেছে, আর রাতিয়া একটা সামান্য উপহার দিতে পারবে না তার স্বামীকে?
